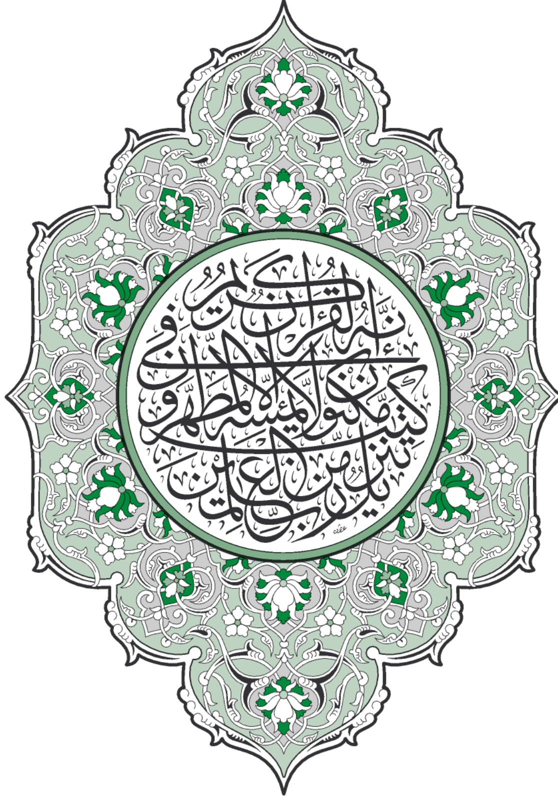
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ



সৌদি আরবের মহামান্য শাসক খাদেমুল হারামাইন আশ্‌-শারীফাইন বাদশাহ সালমান ইবন আব্দুল আযীয আলে সাউদ-এর নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র কুরআনের এ তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর মুদ্রিত হলো।

تشرف بالأمر بطباعة هذا المصحف الشريف وترجمة معانيه
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

وَقفٌ لله تعالى من خادم الحرمين الشّريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولا يجوز بيعه

يُوزّع مجّانًا



وترجمة معانيه وتفسيره
إلى اللغة البنغاليّة

المجلّد الأوّل

من بداية سورة الفاتحة إلى نهاية سورة النّحل

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف

খাদেমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন বাদশাহ সালমান ইবন আব্দুল আজীজ আ'লে সাউদ- এর পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য ওয়াক্ফ স্বরুপ প্রদত্ত

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বিক্রয় নিষিদ্ধ



কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)

প্রথম খণ্ড

সূরা আল-ফাতিহা থেকে সূরা আন-নাহ্ল এর শেষ পর্যন্ত

বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مقدمة

بقلم معالي الشيخ الدكتور
عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
المشرف العام على المجمع

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم:
﴿... قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ﴾.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، القائل:
«خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه».

أما بعد:

فإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله-، بالعناية بكتاب الله، والعمل على تيسير نشره، وتوزيعه بين المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، وتفسيره، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم.

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم إلى جميع لغات العالم المهمة تسهيلاً لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله ﷺ: «**بلِّغوا عني ولو آية**».

وخدمــــةً لإخواننا الناطقين باللغة البنغاليـــة يطيب لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينـــة المنورة أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمـــة إلى اللغة البنغاليـــة التي قام بها الدكتور أبـــو بكر محمد زكريا، وراجعها من قبل المجمع الشيخ كوثر إرشاد والشيخ محمد إلياس بن صالح أحمد.

ونحمد الله ســـبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هـــذا العمل العظيم الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الناس.

إننا لندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم -مهما بلغت دقتها- ستكون قاصرة عن أداء المعاني العظيمة التي يدل عليها النص القرآني المعجز، وأن المعاني الـــتي تؤديها الترجمة إنما هي حصيلة ما بلغـــه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم، وأنه يعتريها ما يعتري عمل البشر كلِّه من خطأ ونقص.

ومـــن ثم نرجو من كل قـــارئ لهذه الترجمة أن يـــوافي مجمع الملك فهد لطباعة المصحـــف الشريف بالمدينة النبوية بما قـــد يجده فيها من خطأ أو نقص أو زيادة للإفادة من الاستدراكات في الطبعات القادمة إن شاء الله.

والله الموفق، وهو الهادي إلى ســـواء الســـبيل، اللَّهُمَّ تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে ।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি তাঁর পবিত্র কুরআনে এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন- ﴿...قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ﴾

অর্থাৎ, "তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ" ।

আল্লাহর কিতাবের প্রতি গুরুত্বারোপ ও এর প্রচার সহজ করা এবং প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে এর বিতরণ নিশ্চিত করা এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ ও তাফসীর করা সম্বলিত খাদেমুল হারামাইন আশ্-শারীফাইন বাদশাহ সালমান ইবন আব্দুল আযীয আলে সাউদ-এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন কল্পে, সর্বোপরি আমাদের বাংলা ভাষাভাষীদের সেবা প্রদানার্থে, মদীনাস্থ বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স সানন্দে সম্মানিত পাঠক সমীপে এই বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর উপস্থাপন করছে ।

মূলতঃ রাজকীয় সৌদি সরকারের ওয়াক্ফ, দাওয়াহ্, ইরশাদ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সকল ভাষায় কুরআনুল কারীমের অনুবাদ করা, যাতে অনারব মুসলিমদের জন্য তা বুঝা সহজ হয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আদিষ্ট "বালাগ" তথা পৌঁছে দেয়ার আহ্বান (অর্থাৎ, "আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, তা একটি আয়াত হলেও")-এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য এটিই সর্বোত্তম প্রচেষ্টা ।

এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর করেছেন, ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া । আর কমপ্লেক্স-এর পক্ষে তা পূনর্পাঠ করেছেন, শাইখ কাউছার এরশাদ ও শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াছ ইবনে সালেহ আহ্মাদ ।

মহান আলাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি এই মহৎ কাজ সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেছেন যা শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই এবং যা দ্বারা সবাই উপকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি ।

অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করি পবিত্র কুরআনুল কারীমের অনুবাদ (যতই সুনিপূণ হোক না কেন) তা আল্লাহর অমীয় বাণীর মর্মার্থ পুরোপুরি আদায়ে সমর্থ নয়; কেননা অনুবাদ হলো অনুবাদকের মেধাশক্তি দিয়ে কুরআনকে বুঝার প্রয়াস মাত্র, যার মধ্যে মানবীয় ভুল-ত্রুটি, অপূর্ণতা থাকা বিচিত্র কিছু নয় ।

তাই সম্মানিত পাঠকদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, যে কোন ভুল-ক্রটি, অপূর্ণতা কিংবা প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় দৃষ্টিগোচর হলে তা নিঃসঙ্কোচে বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআন মুদ্রণ কমপেক্সকে অবহিত করবেন, যাতে আমরা পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধন করে নিতে পারি ।

আল্লাহই তাওফীক দানকারী, সরলপথের দিশারী ।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ

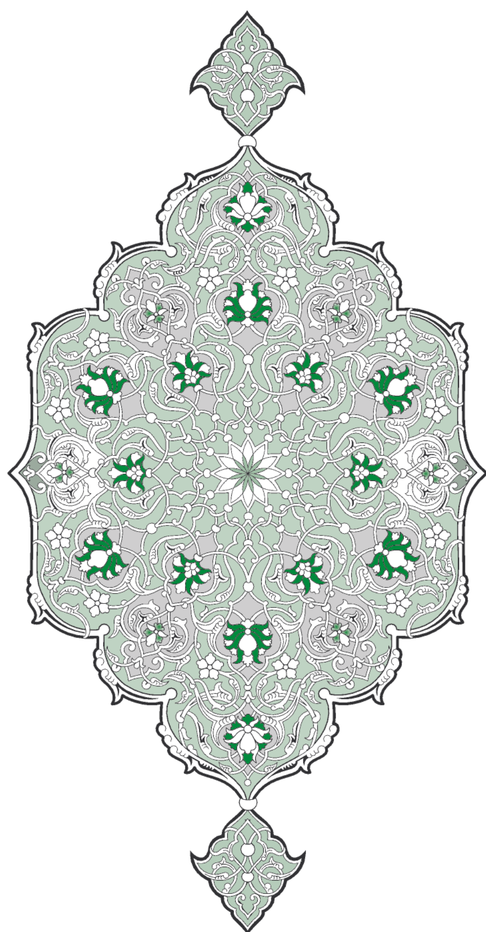
মাননীয় ডক্টর

আব্দুল লতীফ ইবন আব্দুল 'আযীয ইবন 'আব্দুর রহমান আলে শাইখ,

দাওয়াহ, ইরশাদ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রী

জেনারেল তত্ত্বাবধায়ক, কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স

দাওয়াহ, ইরশাদ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।



পবিত্র কুরআনের অর্থানুবাদসমূহের ভূমিকা

মুখবন্ধ

আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার বাণী। শব্দ ও অর্থসহ তা তিনি নাযিল করেছেন তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত, সুসংবাদদাতা, ভীতিপ্রদর্শনকারী, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উদ্দীপ্ত আলোকবর্তিকাস্বরূপ। নিম্নে সংক্ষেপে কুরআন কারীমের পরিচয় ও এর বার্তা তুলে ধরা হলো।

আল-কুরআনুল কারীমের সাধারণ পরিচিতি

এক. আল-কুরআনুল কারীমের পরিচিতি এবং এর নাম ও বৈশিষ্ট্য:

আল-কুরআনুল করীম হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র এমন বাণী, যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত, তার নিকটে এর শব্দ ও অর্থ উভয়টিই ওহী আকারে প্রেরিত, যা মুসহাফে (গ্রন্থাকারে) লিপিবদ্ধ, মুতাওয়াতির সূত্রে (সন্দেহাতীত বহু মানুষ কর্তৃক) বর্ণিত এবং যা তেলাওয়াত করা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা ওহী আকারে প্রেরণ করেছেন, তিনি নিজেই তার নাম দিয়েছেন 'আল-কুরআন' (অধিক পঠিত)। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا﴾ [الدهر: ٢٣] "নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে।" [সূরা আল-ইনসান: ২৩] কারণ, এর বিশেষত্বই এই যে, তা পাঠ ও তেলাওয়াত করতে হবে এবং কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা এর আরেক নাম দিয়েছেন, 'আল-কিতাব' (লিখিত গ্রন্থ)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ﴾ [النساء: ١٠٥] "আমরা তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি।" [সূরা আন-নিসা: ১০৫] কেননা, এর মর্যাদা এমন যে, তা লিখতে হবে এবং একে অবহেলা করা যাবে না।

এছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনুল কারীমের কিছু গুণ বর্ণনা করেছেন। যেমন, ফুর্‌ক্বান (সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী), যিক্‌র

(স্মরণ), হুদা (হেদায়াত বা পথনির্দেশ), নূর (আলো), শিফা' (আরোগ্য), হাকীম (প্রজ্ঞাপূর্ণ), মাউ'ইযাতুন (উপদেশ) ইত্যাদি গুণসমূহ। এগুলো আল-কুরআনুল কারীমের মাহাত্ম্য ও এর বার্তার পরিপূর্ণতার প্রমাণ।

আর 'মুসহাফ' শব্দটি 'সুহুফ' (পৃষ্ঠাসমূহ) শব্দ থেকে গৃহীত, যার উপর আল-কুরআনুল কারীম লেখা হয়েছিল। এ নামটি দ্বারা সাহাবীগণ ঐ গ্রন্থকে বুঝাতেন, যার পৃষ্ঠাসমূহে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বস্তুত আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী, যা জিব্রীল আলাইহিস্সালাম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে নাযিল করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾

[الشعراء: ١٩٢-١٩٥] "আর নিশ্চয় এটি (আল-কুরআন) সৃষ্টিকুলের রব হতে নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত রূহ (জিব্রীল) তা নিয়ে নাযিল হয়েছেন; আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।" [সূরা শু'আরা: ১৯২-১৯৫]

আর এ ব্যাপারে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলদের মধ্যে নতুন নন। তার রাসূল ভ্রাতৃবৃন্দ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম) -এর সবার উপরই জিব্রীল আলাইহিস্সালাম আল্লাহ্র নিকট থেকে ওহী নাযিল করতেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ মহান আমানতের জন্য যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ﴾ [الحج: ٧٥] "আল্লাহ্ ফিরিশ্তাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেন রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৭৫] তিনি ভালো করেই জানেন কে এর জন্য অধিক উপযুক্ত, আর কে এর উপযুক্ত নয়। কারণ, সকল সৃষ্টি তাঁরই তো সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ﴾ [القصص: ٦٨] "আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন।" [সূরা আল-কাসাস: ৬৮]

দুই. কুরআনুল কারীমের নাযিল হওয়া:

৬১০ খ্রিষ্টাব্দের সতেরই রমযান সোমবার সম্মানিত নগরী মক্কার অন্যতম হেরা পর্বতের গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিলের সূচনা হয়। জিব্রীল আলাইহিস সালাম সেখানে এই আয়াতসমূহ নিয়ে নাযিল হন,

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۞ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ﴾ [العلق: ١-٥] "পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন– সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমান্বিত; যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" [সূরা আল-আলাক: ১-৫] এটিই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হওয়া আল-কুরআনুল কারীমের প্রথম অংশ।

তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবারের কাছে শঙ্কিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয়ে ফিরে এলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তার স্ত্রী উম্মুল মুমেনীন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু 'আন্হার কাছে বর্ণনা করে তাকে বললেন, "আমি আমার নিজের আত্মার উপর ভয় করছি"। তখন খাদিজা বললেন, 'কখনো নয়, আপনি বরং সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, যারা বহন করতে অক্ষম তাদের পক্ষ হয়ে বহন করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।' তারপর খাদিজা তাকে নিয়ে ওরাকা ইবন নওফেল এর কাছে গেলেন, যিনি সঠিক মত বা পরামর্শ ও হিকমতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। খাদিজা ওরাকাকে বললেন, 'চাচা! আপনার ভাতিজা থেকে শুনুন।' অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখেছেন তার সংবাদ জানালেন, তখন ওরাকা ইবন নাওফেল তাকে বললেন, 'এই সে-ই নামূস যিনি মূসা আলাইহিস সালামের কাছে নাযিল হয়েছিলেন। হায় আমি যদি তখন যুবক থাকতাম, হায় আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম যখন তোমাকে তোমার জাতি দেশান্তর করবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তারা কি আমাকে দেশান্তর করবে?” ওরাকা বলেন, ‘হ্যাঁ, করবে। তুমি যা নিয়ে এসেছ, অতীতে যিনিই তা নিয়ে এসেছেন তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। যদি আমি সে দিন পাই, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।’ এই সাক্ষাতের কিছু সময় পর ওরাকা মারা যান।

তবে সমগ্র আল-কুরআনুল কারীম একবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয় নি, যেভাবে পূর্ববর্তী নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) -এর কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছিল। বরং তা পৃথক পৃথকভাবে তেইশ বছর যাবৎ নাযিল হয়েছে। একবারে সম্পূর্ণ একটি সূরা কিংবা একটি সূরার কয়েকটি আয়াত নাযিল হতো।

আল-কুরআনুল কারীম পৃথক পৃথকভাবে নাযিল হওয়ার হেকমত হচ্ছে জিব্রীল আলাইহিসসালাম কর্তৃক পুনঃপুনঃ ওহী নাযিল হওয়ার মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর সুদৃঢ় করা, তাকে মযবুত করা এবং তাকে সাহায্য করা; যাতে করে তাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি মুশরিকদের একগুঁয়েমি ও বিরোধিতার মুকাবেলা করতে তিনি অধিক সক্ষম ও স্থির-চিত্ত হতে পারেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু বলেন,

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡلَا نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلۡقُرۡءَانُ جُمۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَۖ وَرَتَّلۡنَٰهُ تَرۡتِيلٗا ﴾ [الفرقان: ٣٢] “আর কাফেররা বলে, ‘সমগ্র কুরআন তার কাছে একবার নাযিল হলো না কেন?’ এভাবেই আমরা নাযিল করেছি আপনার হৃদয়কে তা দ্বারা মযবুত করার জন্য এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।” [আল-ফুরক্বান: ৩২]

পৃথক পৃথকভাবে আল-কুরআনুল কারীম নাযিল হওয়ার মাঝে আরেকটি শিক্ষামূলক মহান উদ্দেশ্য ও হেকমত রয়েছে; তা হচ্ছে, দ্বীনের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জানা ও আমল করার ক্ষেত্রে ঈমানদারদের পর্যায়ক্রমিক সুযোগ দান করা; যাতে করে তাদের জন্য দ্বীন জানা ও বুঝা এবং পূর্বে তারা যে অজ্ঞতা, কুফর ও শিরকের অন্ধকারে ছিল তা থেকে ঈমান, তওহীদ ও জ্ঞানের আলোয় বের হয়ে আসা সহজ হয়।

তিন. আল-কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধকরণ:

যেকোনো ভাষ্য সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে, লিপিবদ্ধকরণ। কারণ, যে কথা লিখে রাখা হয় না তা ভুলে যাওয়ার

সম্ভাবনা থাকে। আর আল-কুরআনুল কারীম যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টিকুলের হেদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছে সেহেতু তা লিপিবদ্ধ হওয়া জরুরি ছিল।

কুরআন লিপিবদ্ধ করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ তত্ত্বাবধান ও গুরুত্ব পেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো কোনো সাহাবী, যারা লিখতে জানতেন তাদেরকে আল-কুরআনুল কারীমকে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন এবং তাদেরকে ওহী লেখক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন, যায়েদ ইবন সাবেত আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখনই কোনো ওহী নাযিল হতো, তখনই তিনি তা হেফয করে নিতেন। তারপর তিনি যা তার কাছে নাযিল হতো তা কোনো এক ওহী লেখককে লেখার জন্য পড়ে শোনাতেন এবং বলতেন, "এ আয়াতগুলো সে সূরায় রাখ যাতে অমুক অমুক বিষয়ের উলেখ আছে।" এভাবে তিনি তাদেরকে সে সূরার নাম বলতেন এবং তাতে সে আয়াতগুলো লিখে নিতে বলতেন। তারপর তিনি সাহাবীগণকে আল-কুরআনুল কারীমের যা নাযিল হয়েছে তা শিখতে এবং হিফয করতে নির্দেশ দিতেন। এভাবে আল-কুরআনুল কারীম পুরোটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিভিন্ন কাগজ বা চামড়ার টুকরোতে লেখা হয়েছিল।

জিব্রীল আলাইহিস সালাম প্রতি বছর আল-কুরআনুল কারীমকে নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একবার পেশ করতেন। আর যে বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেছেন, সে বছর বর্তমানে মুসলিমদের কাছে কুরআনুল কারীমের যে মুসহাফ আছে হুবহু তার আয়াত ও সূরার ক্রমধারা অনুসারে জিব্রীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তা দু' বার পেশ করেছিলেন। আর তা ছিল মহান ও বরকতময় সত্য আল্লাহর এই বাণীর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন:

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ۞ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ﴾ [القيامة: ١٧، ١٨] "নিশ্চয় এর

সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই। কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন”। [সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৭-১৮]

আর এই বাণীরও বাস্তবায়ন:

﴿سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ﴾ [الأعلى: ٦] “শীঘ্রই আমরা আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি ভুলবেন না।” [সূরা আল-আ‘লা: ৬]

চার: আল-কুরআনুল কারীমকে পত্রসমূহে একত্রিতকরণ:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর খলীফাতুর রাশেদ আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আল-কুরআনকে সুশৃংখলভাবে পত্রসমূহে একত্রিত করার নির্দেশ দেন; যাতে হাফেযদের মৃত্যু কিংবা লিখিত কাগজ বা চামড়াগুলো নষ্ট হওয়ার ফলে কুরআনের কোনো অংশ হারিয়ে না যায়। এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন ওহী লেখক যায়দ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। এই নতুন সংকলনটি পুনঃনিরীক্ষা করা এবং চামড়া/কাগজের পত্রসমূহে লিখিত ও অন্তরে সংরক্ষিত ভাষ্যের সাথে তার অভিন্নতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর সেই একত্রিত পত্রগুলো আবু বকর আস-সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর গৃহে তার মৃত্যু পর্যন্ত রাখা হয়। তারপরে দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর গৃহে সেগুলো সংরক্ষণ করা হয়। তার মৃত্যুর পর সেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হাফ্‌সা বিনত উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার গৃহে সংরক্ষিত হয়।

অতঃপর যখন ইসলাম প্রসার লাভ করল, তখন মুসলিমরা কুরআন পড়ার জন্য গ্রন্থাবদ্ধ মুসহাফের প্রয়োজন অনুভব করল। কোনো কোনো সাহাবী খলীফাতুর রাশেদ উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দিলেন একটি ‘মুসহাফ ইমাম’ বা প্রধান মুসহাফে মানুষকে একত্রিত করতে, যার অনুসরণ করে মানুষ কুরআন পাঠ করবে। তখন তিনি আবু বকর আস-সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর যুগে যেসব পত্রে কুরআন সংকলিত হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে যায়েদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নেতৃত্বে একদল লিখতে জানেন এরকম কুরআনের হাফেযকে এই দায়িত্ব দেন। তারা সেই

পত্রগুলোকে একটি মুসহাফে গ্রন্থরূপে সংকলন করেন এবং তা থেকে কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করেন। এর একটি করে অনুলিপি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক বৃহৎ মুসলিম অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং মুসলিমদেরকে সেগুলো থেকে মুসহাফের আরও কপি করে নিতে নির্দেশ দেন।

বর্তমান বিশ্বে পরিচিত সকল মুসহাফ, হস্তলিখিত হোক বা প্রেসে ছাপা হোক, সেসবের মূল হচ্ছে ঐ মুসহাফগুলো, যেগুলো কপি করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল। সেগুলোর পাঠে কিংবা বিন্যাসে কোনো তারতম্য নেই।

আর আজ পর্যন্ত মুসলিমগণ মুসহাফ শরীফ ছাপার প্রতি এবং মুদ্রণ-শিল্পের নিত্য-নতুন পদ্ধতি, কারিগরি ও প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসছে; যাতে করে 'আর-রাসমুল উসমানী' বলে প্রসিদ্ধ কুরআনের মূলপাঠের যে লিখন-পদ্ধতি খলিফাতুর রাশেদ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে গ্রহণ করা হয়েছিল, তা লেখায় সর্বোচ্চ মান ও বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা যায়।

মদীনাতুন নববীয়ায় অবস্থিত বাদশাহ্ ফাহ্‌দ কুরআন শরীফ প্রিন্টিং কমপ্লেক্স অনুরূপভাবে আল-কুরআনুল কারীমের প্রতি সর্বোচ্চ যত্নের অন্যতম একটি স্পষ্ট নিদর্শন। এছাড়াও এটি সৌদি আরব রাজ্যের শাসকগণ কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের প্রতি গুরুত্বারোপ, এর খেদমতের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং মুসলিমদের হাতে সবচেয়ে সুন্দর মুদ্রণ, বাঁধাই, মান, যথার্থতা ও দক্ষতার সাথে পবিত্র কুরআনকে সহজে পৌঁছে দেওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছার সাক্ষ্য বহন করছে।

পাঁচ: কুরআনের বিন্যাস ও বিভাজন:

আল-কুরআনুল কারীম শুরু হয়েছে সূরা আল-ফাতেহার মাধ্যমে এবং শেষ হয়েছে সূরা আন-নাস এর মাধ্যমে। আর তা মোট ১১৪টি সূরা সম্বলিত। এই বিন্যাসটি 'তাওকীফী', অর্থাৎ তা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি গৃহীত; আর তাতে নাযিল হওয়ার ক্রমধারা রক্ষিত হয় নি। যেমন, সূরা আল-আলাক্ব প্রথম নাযিল হওয়া সূরা, অথচ কুরআনে তার ক্রম ৯৬তম। সাহাবীগণ সূরা

ও আয়াতের বিন্যাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন পাঠ থেকে জানতেন।

বর্তমানে কুরআনকে ৩০টি পারা বা জুয্' -এ বিভক্ত করা হয়, যার প্রতিটি পারা দুটি হিয্ব (অংশ) -এ বিভক্ত। তারপর প্রতিটি হিয্বও চারটি রুব' (এক-চতুর্থাংশ) -এ বিভক্ত করা হয়। এই বিভাজনের অধিকাংশই মুসলিমদের জন্য আল-কুরআনুল কারীমের পাঠ সহজ করার উদ্দেশ্যে আলেমগণ কর্তৃক ইজতিহাদ বা গবেষণা ।

ছয়ঃ আল-কুরআনুল কারীম শিক্ষা:

মুসলিমগণ আল-কুরআনুল কারীম যেভাবে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে সেভাবে তা শেখা, তার মূল-পাঠ হেফ্য ও সংরক্ষণ করা এবং তেলাওয়াত করার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। সাহাবীগণের মধ্যে যারা কুরআনের ক্বারী বা হাফেয ছিলেন, তারা তাবে'ঈদেরকে তা শেখানোর কাজে ব্রতী ছিলেন, ফলে তারা এর মূল-পাঠকে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ব করে নিয়েছিলেন। আর তারা সাহাবীগণকে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের কাছে থামিয়ে সে আয়াতসমূহের অর্থ সুক্ষ্মভাবে বুঝে নিতেন। এভাবে তাবে'ঈগণ সাহাবীগণের কাছ থেকে ইলম (জ্ঞান) ও আমল (কর্ম) দু'টোই শিখে নিয়েছিলেন। তারপর তাবে'ঈগণের মধ্যে যারা হাফেয ছিলেন তারা কুরআন তেলাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি, মূল-পাঠের যথার্থ সংরক্ষণ, এর অক্ষর ও শব্দসংখ্যার হিসাব, এর সূরা ও আয়াতসমূহের বিন্যাস, এর তাজভীদ, সুন্দরভাবে আদায় এবং তারতীল পদ্ধতি প্রভৃতি যেভাবে সাহাবীগণ থেকে শিখেছিলেন হুবহু এর অনুসরণ করেই তারা কুরআন শিক্ষাদানের বিভিন্ন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর ফলে অব্যাহতভাবে আজ পর্যন্ত ছাত্র তার হাফেয ক্বারী শিক্ষকদের মুখ থেকে সরাসরি বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় সম্পূর্ণ তরু-তাজাভাবে যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে সেভাবে আল-কুরআনুল কারীমের শিক্ষাগ্রহণ, হেফয ও তেলাওয়াত চলে আসছে।

আর কুরআনুল কারীম বেশ কয়েকটি কেরাআতে পড়া যায়, যেগুলো মূলত আল-কুরআনের অক্ষর ও শব্দ আদায়ের বিভিন্ন

পদ্ধতি ও উচ্চারণের নিয়ম-নীতি; যা তাবে'ঈগণ হাফেয ও ক্বারী সাহাবীগণের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, আর সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে নিয়েছিলেন এবং তিনিও তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন। এসব কেরাআতের মধ্যে আমাদের যুগে প্রসিদ্ধ হচ্ছে, আসেম এর কেরাআত যা তার ছাত্র হাফ্স ইবন সুলাইমানের বর্ণনা; অনুরূপভাবে নাফে' এর কেরাআত যা তার ছাত্র 'ওয়ার্শ' উপাধিতে প্রসিদ্ধ উসমান ইবন সা'ঈদের বর্ণনা। তদ্রূপ আরও রয়েছে আবু আমর আল-বাছরী থেকে তার ছাত্র আদ্-দূরী এর বর্ণনা এবং নাফে' থেকে কালূন এর বর্ণনা।

সাতঃ আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীরঃ

আল-কুরআনের তাফসীর বলতে তার অর্থ বর্ণনাকে বুঝায়। কোনো কথারই উদ্দেশ্য সে পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় না যতক্ষণ না তা কিসের উপর প্রমাণবহ ও তার অর্থ কী তা যথাযথভাবে জানা না যায়। মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাঠকারীদেরকে কুরআনের অর্থ বুঝার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, ﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ [ص: ٢٩] "এক মুবারক কিতাব। এটি আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহে **গভীরভাবে চিন্তা করে** এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রহণ করে উপদেশ।" [সূরা সোয়াদঃ ২৯] আয়াতে উল্লেখিত 'তাদাব্বুর' শব্দটির অর্থ, ভালো করে বুঝা।

সাহাবায়ে কিরামের কাছে আল-কুরআনুল কারীমের অর্থে যা যা খটকা লাগতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করে দিতেন। তবে সে সময়ে তাদের ভাষাগত দক্ষতার ফলে এবং আল-কুরআনুল কারীম তাদের ভাষায় নাযিল হওয়ায় আল-কুরআনুল কারীমের অর্থ সম্পর্কে তাদের অধিক প্রশ্ন করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যতই বছর পেরিয়ে যাচ্ছিল ততই মানুষের নিকট তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে ধরা পড়ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার সাহাবীগণ ও তাদের ছাত্র তাবে'ঈদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ও বর্ণিত আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীরই ইলমুত তাফসীরের মূল বীজের রূপ লাভ করেছে;

যাকে 'আত-তাফসীরুল মা'ছুর' বা প্রামান্য তাফসীর বলে নামকরণ হয়ে থাকে। এটি আল-কুরআনুল কারীম বুঝার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত। কারণ, এটি দ্বারা উম্মতের প্রথম প্রজন্ম তাদের আরবী ভাষায় দক্ষতার কারণে ও আল-কুরআনুল কারীম নাযিল হওয়ার সময়ের যাবতীয় ঘটনা ও সার্বিক অবস্থা অবলোকনের মাধ্যমে আল-কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ যেভাবে বুঝেছেন, তা আমাদের নিকট প্রকাশ পায়।

তাফসীরের প্রকারভেদ:

বিভিন্ন তাফসীরকারক আলেমগণ ইলম ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আগ্রহী ছিলেন; ফলে তাদের (তাফসীরের) পদ্ধতিও বিভিন্ন ছিল। কিছু তাফসীরগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের অভিধানিক ও ভাষাগত দিক বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে, আবার কিছু তাফসীরগ্রন্থ ফিকহের বিধি-বিধান বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। আর কিছু তাফসীরগ্রন্থ ঐতিহাসিক দিক, কিংবা বিবেক-বুদ্ধিগত দিক অথবা আচরণগত দিক ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়েছে। এসব বিবেচনায় এনে আলেমগণ তাফসীরকে দু'ভাগে ভাগ করেন:

এক. আত-তাফসীর বিল মা'ছুর, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার সাহাবীগণ ও তাবে'ঈদের থেকে বর্ণিত।

দুই. আত-তাফসীর বির্ রায়, অথবা যা সঠিক ইলমী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইজতিহাদের মাধ্যমে করা হয়েছে।

তাফসীরের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি ও তার নিয়ম-কানুন:

আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে 'আত-তাফসীর বিল মা'ছুর' বা প্রমাণ্য তাফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তার সাহাবীগণ এবং তাদের ছাত্র তাবে'ঈদের কাছ থেকে প্রাপ্ত, যারা এ বিষয় সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানতেন। যদি 'আত-তাফসীর বিল মাছুর' এর মধ্যে কোনো আয়াত সম্পর্কে এমন বাড়তি বর্ণনা পাওয়া না যায়, যা এ আয়াতগুলো বুঝার ক্ষেত্রে প্রয়োজন, তখন মুফাসসিরকে নিম্নোক্ত নিয়ম-নীতিগুলোর খেয়াল রাখতে হবে:

আয়াতের অর্থ বর্ণনায় 'আত-তাফসীর বিল মা'ছুর' দ্বারা যা সাব্যস্ত

হয়েছে তা খেয়াল রাখা এবং এর বিপরীত কিছু নিয়ে না আসা।

আল-কুরআনুল কারীম সাধারণভাবে যে অর্থগুলো নিয়ে এসেছে এবং নবীর সুন্নাত এ আয়াতসমূহের যে অর্থ স্পষ্ট করে দিয়েছে, তা অনুযায়ী তাফসীর করা। সুতরাং উপরোক্ত অর্থসমূহের বিপরীতে গিয়ে কোনো মুফাসসিরের জন্যই কুরআনের তাফসীর করা বৈধ নয়। কারণ, আল-কুরআনুল কারীমের একাংশ অপর অংশের তাফসীর করে, একাংশ অপর অংশের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আর নবীর সুন্নাত আল-কুরআনুল কারীমের সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনাকারী এবং তাফসীর ও ব্যাখ্যাকারী।

আরবী ভাষার ব্যাকরণ যেমন, শব্দের চাহিদা, বাক্যের গঠনরীতি এবং ব্যবহারগত ভিন্নতা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ, আল-কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, আর তাকে সে ভাষার নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করেই বুঝতে হবে।

মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট আয়াতসমূহকে মুহকাম তথা স্পষ্ট আয়াতসমূহের আলোকে বুঝতে হবে। কারণ, কুরআনের একাংশ অপর অংশের তাফসীর করে। আর কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই ‘মুহকাম’ স্পষ্ট অর্থবোধক। তবে কুরআনের কিছু আয়াত রয়েছে ‘মুতাশাবিহ’ যার অর্থ কখনো কখনো কারও কাছে সন্দেহপূর্ণ মনে হতে পারে, তখন সে সব মুতাশাবিহ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের দিকে ফিরিয়ে দিলে মুহকাম আয়াতগুলো মুতাশাবিহ আয়াতের চাহিদা বুঝতে এবং সেগুলোর অর্থ স্পষ্ট করতে সহযোগিতা করবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ [آل عمران: ٧] “তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কিছু আয়াত ‘মুহ্‌কাম’, এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো ‘মুতাশাবিহ্‌’; সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে শুধু তারাই ফেৎনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, ‘আমরা

এগুলোতে ঈমান রাখি, সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে’। আর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।” [সূরা আলে ইমরান: ৭]

বিশ্বজগত সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করার সময় কেবলমাত্র বিজ্ঞানের প্রমাণিত বাস্তব তথ্যের সহযোগিতা নেওয়া। কোনো ক্রমেই বৈজ্ঞানিক মতবাদ আকারের চিন্তাধারাকে আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীরের প্রবিষ্ট করা যাবে না। কারণ, এতে করে আল-কুরআনুল কারীমের অর্থে এমন কিছু প্রবেশ হতে পারে যা কুরআন সমর্থন করে না।

মহান আল্লাহর বাণীর অর্থকে পবিত্র শরী‘আতের বাস্তব নিয়ম-নীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং আরবী ভাষার ব্যাকরণের ব্যত্যয় ঘটায়, এমন কোনো অপব্যাখ্যা করা থেকে সাবধান থাকতে হবে; হোক তা বিকৃতির উদ্দেশ্যে; অথবা আরবি ভাষা, এর শব্দার্থ ও তা ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে; কিংবা এমন অসিদ্ধ কিছু অর্থ কল্পনা করার কারণে, যেগুলো থেকে আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী মুক্ত ও পবিত্র।

আট. আল-কুরআনুল কারীমের ই‘জায (কুরআন কর্তৃক অন্যকে অপারগ করে দেওয়া)

পারিভাষিক অর্থে ই‘জায হচ্ছে, এমন এক গুণ যা অনুরূপ কোনো কিছু নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যায়, হোক তা কোনো কাজ অথবা মত অথবা পরিকল্পনা। আর মু‘জিযা হচ্ছে নতুন একটি বিশেষণ, যা নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাত ওয়াসসালামের (নবুওয়তের) নিদর্শনাবলি ও প্রমাণাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। আল-কুরআনুল কারীমে এ শব্দটি আসে নি; বরং সেখানে আয়াত (নিদর্শন), বুরহান (প্রমাণ) ইত্যাদি শব্দ এসেছে।

আর আল-কুরআনুল কারীম মহান আল্লাহর কথা বা বাণী; তার অর্থের মধ্যে রয়েছে পূর্ণতা, তার আয়াত, বাক্য ও শব্দশৈলীতে রয়েছে পূর্ণ সৌন্দর্য, যার অনুরূপ কোনো কিছু আনতে সকল মানুষই অপারগ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: ١] “আলিফ-লাম-রা, এ

কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত: প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্তার কাছ থেকে ।” [সূরা হূদ: ১]

মুশরিকরা আল-কুরআনুল কারীমের উৎস সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করতে এবং বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা রটনা ও সংশয় উত্থাপনের মাধ্যমে মানুষকে কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করে নি, তখন আল্লাহ সুবহানাহু বিভিন্ন আয়াত নাযিল করেন, যেগুলোতে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন যে, যদি তারা (তাদের সেসব দাবীতে) সত্যবাদী হয়, তবে যেন এ কুরআনুল কারীমের মত অনুরূপ নিয়ে আসে, অথবা এর মত দশটি সূরা নিয়ে আসে, অথবা একটি সূরা যেন নিয়ে আসে, কিন্তু তারা এতে অপারগ হয় এবং মেনে নেয় যে, আল-কুরআনুল কারীম যদিও এটি আরবী ভাষায় তবুও এর অনুরূপ কিছু তৈরি করা কিংবা এর মতো কিছু নিয়ে আসা কখনও সম্ভব নয় । আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُۖ قُلۡ فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ [يونس: ٣٨]

“নাকি তারা বলে, ‘তিনি এটা রচনা করেছেন’? বলুন, ‘তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’ ।” [সূরা ইউনুস: ৩৮]

আর আল-কুরআনুল কারীম স্পষ্টভাষায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, সকল মানুষ তারপর সকল জিন সবাই একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে একে অপরকে সহযোগিতা করে প্রচেষ্টা চালালেও আল-কুরআনুল কারীমের অনুরূপ নিয়ে আসতে সক্ষম হবে না ।

﴿قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا﴾ [بني إسرائيل: ٨٨] “বলুন, ‘যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না’ ।” । [সূরা আল-ইসরা: ৮৮]

আল-কুরআনুল কারীম এ জন্যই মু‘জিয বা অপারগকারী যে, এটি আল্লাহর বাণী, যা মানুষের বাণীর সদৃশ নয় । এর বাক্য, আয়াত ও ভাষাশৈলীতে; এর বিভিন্ন বর্ণনার রীতি-নীতি ও অলংকারিক বৈশিষ্ট্যে; এর সংবাদ ও সত্য কাহিনীতে; এর মধ্যকার বিধি-বিধান

ও আইন-কানুনে; এর মধ্যস্থিত আত্মিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের শক্তিতে এবং এর মধ্যে যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাক-লাগানো চিরন্তন সত্যের কথা রয়েছে তাতে এটি নিঃসন্দেহে একটি আয়াহ্ বা নিদর্শন ও বুরহান বা প্রমাণ।

বহু পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিদ, জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী তাদের স্ব স্ব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আল-কুরআনুল কারীম কর্তৃক সুক্ষ্ম বিজ্ঞানসম্মত বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বাস্তব সত্যের বর্ণনা ও সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন বিষয়াদির প্রতি ইঙ্গিতের ফলে কতই না বিস্ময়বিহ্বল হয়েছে! একজন নিরক্ষর রাসূল, যিনি একটি নিরক্ষর জাতিতে ছিলেন, যার সময়কার বিশ্ব যে সকল বিষয়াদি সম্পর্কে কিছুই জানত না-- তার কাছ থেকে এ সকল বিষয় বের হওয়া কল্পনাতীত। এ বিষয়টি তাদের অনেকের ইসলাম গ্রহণের কারণও হয়েছিল। কেননা, তারা হৃদয়াঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, আল-কুরআনুল কারীম যা নিয়ে এসেছে তা কোনো মানুষের বাণী হতে পারে না, বরং তা সৃষ্টিজগত ও মানুষের স্রষ্টারই বাণী।

তাছাড়া মহান আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর অপূর্ব সৃষ্টিশৈলীর উপর প্রমাণবহ বহু আয়াত আল-কুরআনুল কারীমে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ﴾ [حم السجدة: ٥٣] "অচিরেই আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাব বিশ্বজগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য। এটা কি আপনার রবের সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব কিছুর উপর সাক্ষী?" [সূরা ফুসসিলাত: ৫৩]

নয়. আল-কুরআনুল কারীমের অর্থের অনুবাদঃ

তরজমা বা অনুবাদ হচ্ছে কোনো কথাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় নিয়ে যাওয়া। অনুবাদ এমনিতেই কঠিন কাজ; কেননা, নস বা মূল-পাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ভাষাগত অভিব্যক্তি ও ভঙ্গি। মূল-পাঠ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করার সময় সেই অভিব্যক্তির ভাষাগত চাহিদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা দূরূহ হয়ে

দাঁড়ায়।

যদি মানুষের রচিত ভাষ্যের অনুবাদকর্ম এরূপ কঠিন হয়ে থাকে, তবে অনুবাদ কাজটি আরও কঠিন হয় যখন আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদ করার ইচ্ছা পোষণ করা হয়। কারণ, সেটি আল্লাহ্‌র বাণী, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আরবী ভাষায় নাযিলকৃত, তার শব্দ ও অর্থ সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীকৃত; আর কোনো মানুষের পক্ষেই এটা দাবি করা সম্ভব নয় যে, সে আল-কুরআনুল কারীমের সকল অর্থ পূর্ণভাবে আয়ত্ব করেছে, অথবা মূল আরবী পাঠে যেরূপ আছে পুনরায় একে নতুন শব্দে সাজিয়ে সেভাবেই সে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে।

আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদ দূরূহ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম আলেমগণ আল-কুরআনুল কারীমের প্রচার ও তার রিসালাত বা মূলবার্তা যমীনের সকল জাতি, তাদের ভাষা যা-ই হোক না কেন, তাদের নিকট তা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন। আর এ কাজটি অনুবাদ ব্যতীত কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

আর আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদ অন্য ভাষায় করতে হলে নিম্নোক্ত দু'টির একটি অনুসরণ করতে হবে,

আল-কুরআনুল কারীমের অর্থের অনুবাদ করা। এটি তাফসীর-বিহীন অনুবাদ, যাতে আল-কুরআনের নস বা মূল পাঠের শব্দসমূহের যে অর্থ তা বর্ণনার উপর নিরস্ত থাকা হয়।

আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীর বা ব্যাখ্যাগত অনুবাদ করা, যাতে স্পষ্টতা ও উদাহরণ পেশের সহযোগিতা নেয়া হয়। এটি মূলত আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীর।

আল-কুরআনুল কারীমের অর্থের অনুবাদ যত সুক্ষ্মই হোক, আর অনুবাদক যতই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হোন এবং আয়াতের অর্থসমূহের ব্যাপারে যতই জ্ঞানী হোন না কেন, সে অনুবাদকে কখনই কুরআন নামকরণ করা যাবে না। এর কারণ দু'টি:

এক. আল-কুরআনুল কারীম মহান আল্লাহ তা'আলার কালাম বা বাণী। তা আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এবং বর্ণনাশৈলী ও নিখুঁত হওয়ার দিক থেকে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে। আর এর আয়াতসমূহকে

আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় নতুন করে সাজিয়ে লেখা তার ‘কুরআন’ নামকরণ বাতিল করে দেয়।

দুই. অনুবাদ মূলত অনুবাদকের উপলব্ধি অনুসারে আল-কুরআনুল কারীমের অর্থ। এটি এদিক থেকে তাফসীরসদৃশ; সুতরাং যেভাবে তাফসীরকে কুরআন বলা যায় না, সেভাবে অনুবাদকেও কুরআন বলা যাবে না।

আর আল-কুরআনুল কারীমের অর্থানুবাদ গ্রহণযোগ্য হতে হলে আলেমগণ আল-কুরআনুল কারীমের অর্থ বর্ণনার যে সকল নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেগুলো তাতে অবশ্যই পাওয়া যেতে হবে। সাথে সাথে সাবধান থাকতে হবে, যাতে অনুবাদক তার অনুবাদকে আল-কুরআনুল কারীমের বিকৃত অর্থ পেশের ঢাকনা হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে অথবা মুসলিমদের বড় বড় নিদর্শনাবলি, চিহ্নসমূহ ও পবিত্র বিষয়াদির প্রতি কোনো প্রকার খারাপ কিছু পেশ করতে না পারে। আর এ কাজটিই অনেক অনুবাদে পরিলক্ষিত হয়, যার অনুবাদ করেছে কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ অথবা অসত্যভাবে ইসলামের দিকে নিজের সম্পর্ক সৃষ্টিকারী কোনো কোনো অনুবাদক; যারা ফাসেদ ও খারাপ আকীদার ধারক-বাহক, মহান দ্বীনে ইসলামের মূল্যবোধকে নষ্ট করতে যাবতীয় প্রচেষ্টাই তারা করে যাচ্ছে, আর এর সহীহ আকীদা ও সহজ-সরল শরী‘আতকে আক্রমণ করতে তারা বদ্ধপরিকর।

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে রেখে মদীনাতুন নববীয়ায় অবস্থিত বাদশাহ ফাহ্‌দ কুরআন প্রিন্টিং কম্প্লেক্স তার কাঁধে বিভিন্ন ভাষায় আল-কুরআনুল কারীমের গ্রহণযোগ্য অর্থানুবাদ বের করার দায়িত্ব নিয়েছে। তার আকাঙ্ক্ষা যে, এর মাধ্যমে আল-কুরআনুল কারীমের মহান রিসালাত বা মূল-বার্তা অনারব ভাষাভাষীদের কাছে তাদের মূল ভাষায় পৌঁছুবে।

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য; আর আল্লাহ সালাত পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, সকল সঙ্গী-সাথী ও কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করবে তাদের সবার উপর।

‘নামূস’ শব্দ দ্বারা জিব্রীল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে।

তিনি সেই ফেরেশতা যাকে নবীদের কাছে ওহী নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

দেখুন: তাফসীরুত তাবারী, ১৯/১০; আবূ শামা আল-মাকদিসী: আল-মুরশিদ আল-ওয়াজীয, পৃ. ২৮।

তাফসীরুত তাবারী ১/২৮।

সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৮৬; সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৮৬; অনুরূপভাবে হাকিমও তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন (হাদীস নং ৩৩২৫) আর বলেছেন, 'এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তের উপর সহীহ, তবে তারা এটিকে উল্লেখ করেন নি।'

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৯২, ৪৫৯৩।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯৮৬; সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ৩১০৩; মুসনাদে ইমাম আহমাদ, হাদীস নং ৭৬।

দানী তার মুক্বনি' গ্রন্থে (পৃ. ৭) ইমাম মালিক ইবন আনাস থেকে তা বর্ণনা করেন।

দেখুন, যারকাশী, আল-বুরহান, ১/১৩।

দেখুন, তাফসীরুত-তাবারী, ১/৩৭; ইবন তাইমিয়্যা, মুকাদ্দামাতু উসূলিত তাফসীর, পৃ. ৩৫।

দেখুন, আয়াতসমূহ, আল-আন'আম (৭); আল-আন'আম (২৫); আল-আম্বিয়া (৫); সাবা (৪৩); ইয়াসীন (৬৯); আস-সাফফাত (৩৬); সোয়াদ (৪); আত-তূর (৩০)।

দেখুন, আয়াতসমুহ, আল-বাকারাহ (২৩); ইউনুস (৩৮); হূদ (১৩) আত-তূর (৩৪)।

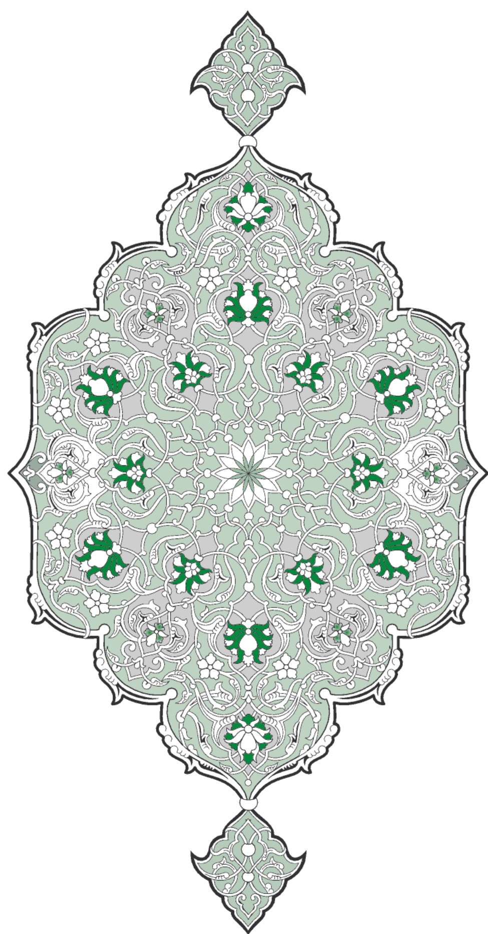
দেখুন, ইবন মানযূর, লিসানুল আরব (শব্দমূল: رجم ও ترجم)।

দেখুন, ইবরাহীম আনীস, দালালাতুল আলফায, পৃ. ১৭১-১৭৫; মুহাম্মাদ 'আওদ্ব মুহাম্মাদ, ফান্নুত তারজামা, পৃ. ১৯।

ইবন তাইমিয়্যা, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪/১১৬।

ইবন তাইমিয়্যা, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪/১১৫, ৫৪২; মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, ১/২৩।

নাওয়াভী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব, ৩/৩৪২।



১- সূরা আল ফাতিহা



সূরার নাম ও কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

সূরা আল-ফাতিহা-ই সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে। [তাবারী, কাশশাফ, আল-ইতকান] সর্বপ্রথম অহীর মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি যে আয়াত বা সূরার অংশ নাযিল হয় তা হচ্ছে সূরা 'আল-'আলাক'-এর প্রাথমিক আয়াত কয়টি। [দেখুন, বুখারীঃ ৩] সূরা আল-মুদ্দাসসির-এর প্রাথমিক কতক আয়াত এর কিছুদিন পর নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৯২২, ৪৯২৪] কিন্তু এই খণ্ড আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার মধ্যে একটিও পূর্ণাঙ্গ সূরা ছিল না। পূর্ণাঙ্গ সূরা প্রথম যা নাযিল হয়েছে, তা হচ্ছে সূরা আল-ফাতিহা।

কুরআন মজীদের ১১৪টি সূরার মধ্যে প্রত্যেকটির জন্য একটি নাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই নামকরণ ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। কোন কোন সূরার নাম রাখা হয়েছে এর প্রথম শব্দ দ্বারা। কোন সূরায় আলোচিত বিশেষ কোন কথা কিংবা তাতে উল্লেখিত বিশেষ কোন শব্দ নিয়ে তা-ই নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোন কোন সূরার নামকরণ করা হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ ভাবধারা ও বিষয়বস্তুকে সম্মুখে রেখে। কয়েকটি সূরার নাম রাখা হয়েছে কোন একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি খেয়াল রেখে। সূরা আল-ফাতিহার নাম রাখা হয়েছে কুরআনে এর স্থান-মর্যাদা, বিষয়বস্তু-ভাবধারা, এর প্রতিপাদ্য বিষয় ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে। এদিক দিয়ে সূরা আল-ফাতিহার স্থান সর্বোচ্চ। কেননা অন্যান্য সূরার ন্যায় সূরা আল-ফাতিহার নাম মাত্র একটি নয়, অনেকগুলো। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হচ্ছে, ১. 'ফাতিহাতুল কিতাব' (فَاتِحَةُ الكِتَاب) কুরআনের চাবি-কাঠি। কেননা, এই সূরা দ্বারাই কুরআনের সূচনা হয়, কুরআনের প্রথম স্থানেই একে রাখা হয়েছে। কুরআন খুলে সর্বপ্রথম এই সূরা-ই পাঠ করতে হয়। কখনও কখনও এই নামের রূপান্তর হয়ে 'ফাতিহাতুল কুরআন' হয়ে থাকে। এতে অর্থের দিক দিয়ে কোন পার্থক্যই সুচিত হয় না। ২. "উম্মুল কিতাব"(أُمُّ الكِتَاب) আরবী ভাষায় 'উম্ম্' বলা হয় সর্ব ব্যাপক ও কেন্দ্রীয় মর্যাদাসম্পন্ন জিনিসকে। সৈন্য বাহিনীর ঝান্ডাকে বলা হয় উম্ম্। কেননা সৈনিকবৃন্দ তারই ছায়াতলে সমবেত হয়ে থাকে। মক্কা নগরের আর এক নাম হচ্ছে, 'উম্মুল কুরা'-'জনপদসমূহের মা'। কেননা, হজ্জের মৌসুমে সমস্ত মানুষ–সকল গোত্র ও জাতি এই শহরেই একত্রিত হয়। ইমাম বুখারী কিতাবুত্ তাফসীর-এর শুরুতে লিখেছেনঃ এর নাম 'উম্মুল কিতাব' এজন্য বলা হয়েছে যে, কুরআন লিখতে ও পড়তে তা-ই প্রথম এবং সালাতের কেরাতেও তা-ই প্রথম পাঠ করতে হয়। ৩. "সূরাতুল-হামদ" (سُورَةُ الحَمْد) তা'রীফ ও প্রশংসার সূরা। হামদ এই সূরার প্রথম শব্দ। ইহাতে আল্লাহর হামদ-তা'রীফ-প্রশংসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে, সেই জন্য এটি এ সূরার

জন্য যথার্থ নাম। ৪. "সূরাতুস-সালাত" (سُورَةُ الصَّلاة)–অর্থাৎ সালাতের সূরা। যেহেতু সব সালাতের সব রাক'আতেই এটি পাঠ করতে হয় সেজন্যই এই নামকরণ হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার সালাত হবে না।' [বুখারীঃ ৭৫৬, মুসলিমঃ ৩৯৪] ৫. "আস্-সাব্'য়ুল মাসানী" (السَّبعُ المَثَاني)–'বার বার পাঠ করার সাতটি আয়াত'। সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত রয়েছে এবং তা বার বার পাঠ করা হয় বলে এর আর এক নাম 'সাব্'য়ুল মাসানী'। অথবা সালাতের প্রতি রাক'আতেই তা পড়া হয় বলেই এর এই নাম। [আল-কাশশাফ, বাগভী, তাফসীর ইবন কাসীর, আল-ইতকান, আত-তাফসীরুস সহীহ]

আয়াত সংখ্যা ঃ

এ ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই যে, সূরা ফাতিহার মোট সাতটি আয়াত রয়েছে। এ জন্য হাদীস শরীফে একে সাতটি পুনরাবৃত্তিমূলক আয়াতের সূরা السَّبعُ المَثَاني বলা হয়েছে। [বুখারী: ৪৭০৩] পবিত্র কুরআনেও একে এ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। [সূরা আল-হিজর:৮৭] এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছেঃ সূরার পূর্বে যে "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম" উল্লেখিত হয়েছে তা সূরা ফাতিহার মধ্যে গণ্য আয়াত ও এর অংশ, না তা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোন জিনিস? এর উত্তরে বলা যায়, কোন কোন সাহাবী "বিসমিল্লাহ"কে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করতেন। পক্ষান্তরে অপর সাহাবীদের মতে এটি এ সূরার অংশ নয়। তবে মদীনা শরীফে সংরক্ষিত কুরআনে এটিকে সূরা আল-ফাতিহার অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাছাড়া অধিকাংশ কেরাআতেও এটিকে সূরার প্রথমে একটি আয়াত ধরা হয়েছে এবং 'সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওলাদ দ্বলীন' পর্যন্ত পুরোটাকে একই আয়াত ধরা হয়েছে। আর যারা বিসমিল্লাহকে সূরার আয়াত হিসেবে গণ্য করেননি তারা ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ পর্যন্ত এক আয়াত, আর তার পরের অংশ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ কে আলাদা আয়াত সাব্যস্ত করে সাত আয়াত পূর্ণ করেছেন। [বাগভী]

নাযিল হওয়ার স্থান ঃ

গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে যে, সূরা আল-ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, এটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কারও মতে এটা একবার মক্কায় এবং আর একবার মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তাছাড়া এর অর্ধেক মক্কায় এবং অপর অর্ধেক মদীনায় নাযিল হয়েছে বলেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ সব মত গ্রহণযোগ্য নয়। তার বড় প্রমাণ এই যে, সূরা আল-হিজর সর্বসম্মতভাবে মক্কী। তার ৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ 'আমরা আপনাকে সাতটি বার বার পঠনীয় আয়াত ও কুরআনে 'আযীম প্রদান করেছি।' এই বার বার পঠনীয় সাতটি আয়াতই হল সূরা আল-ফাতিহা। [বাগভী] তাছাড়া সালাত

মক্কায়ই ফরয হয়েছিল এবং সূরা ফাতিহা ছাড়া কখনই সালাত পড়া হয়নি– এটাও সর্বসম্মত কথা ।

সূরার ফযীলত ঃ

সূরা আল-ফাতিহার ফযীলত বর্ণনায় অসংখ্য হাদীস এসেছে । যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন, আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে সালাতকে আমি দু’ভাগে বিভক্ত করেছি, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায় । বান্দা ﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾ বললে আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে; আর যখন সে ﴿ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ বলে তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ-গান করেছে । আর যখন সে বলে ﴿ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ﴾ তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মানে ভূষিত করেছে । আর যখন সে বলে ﴿ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ﴾ তখন আল্লাহ্ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায় । আর যখন সে বলে ﴿ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴾ তখন আল্লাহ্ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়” । [মুসলিম, ৩৯৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা উম্মুল কুরআন এর অনুরূপ কোন কিছু তাওরাত ও ইঞ্জীলে নাযিল করেন নি । আর তা হলো পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত, যা আমি (আল্লাহ্) এবং বান্দাদের মাঝে দু’ভাগে বিভক্ত ।” [নাসায়ী, ৯১৩, তিরমিযী, ৩১২৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও জিবরিল আলাইহিস্সালাম উপবিষ্ট ছিলেন । তখন হঠাৎ উপরের দিকে (এক ধরণের) শব্দ শুনা গেল । তখন জিবরিল আলাইহিস্ সালাম আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, এটা আকাশের একটি দরজা যা কখনও খোলা হয় নি । ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, অতঃপর সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে দু’টি নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি যা আপনাকে দেয়া হয়েছে, যা আপনার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি । সূরা আল-ফাতিহা ও সূরা আল-বাকারাহ্ এর শেষাংশ । এর একটি অক্ষর পাঠের মাধ্যমে চাওয়া বস্তুও তাকে দেয়া হবে । [মুসলিম: ৮০৬] অনুরূপভাবে আবু সা’য়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে এক জায়গায় অবতরণ করলাম । সেখানে একটি মেয়ে এসে বলল, এ গ্রামের প্রধানকে সাপে দংশন করেছে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি ঝাঁড়-ফুক করার মত আছে? তখন মেয়েটির সাথে এক ব্যক্তি গিয়ে তাকে ঝাঁড়-ফুক করে এল, আমরা তাকে ঝাঁড়-ফুক জানে বলে মনে করতাম না । এতে গ্রাম প্রধান আরোগ্য লাভ করেন । ফলে সে তাকে ত্রিশটি বকরী উপহার দিল এবং আমাদেরকে দুধ পান করাল । আমাদের সঙ্গীকে আমরা বললাম তুমি কি ভাল ঝাঁড়-ফুক করতে জান? সে বলল, আমি শুধু উম্মুল কুরআন দ্বারা ফুঁক দিয়েছি । আমরা সবাইকে

বললাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তোমরা এগুলোকে কিছু কর না । অতঃপর মদীনা পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন, সে কিভাবে জানলো যে, এটি একটি ঝাঁড়-ফুক করার বস্তু! তোমরা এগুলো বন্টন করে নাও এবং আমাকে তোমাদের সাথে এক ভাগ দিও। [মুসলিমঃ ২২০১] অন্য বর্ণনায় আবু সা'য়ীদ ইবনুল মু'আল্লা বলেন, আমি সালাত আদায় করছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি সালাত শেষ করেই তার ডাকে সাড়া দিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমার কাছে আসা হতে তোমাকে কিসে বারণ করেছে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি যে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন তোমাদেরকে ডাকেন সে বস্তুর দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মসজিদ হতে বের হবার পূর্বে আমি তোমাকে কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরা শিক্ষা দিব। ... অতঃপর তিনি বললেন, তাহলো, ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾। এটি হলো সাতটি পূনঃ পূনঃ পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন যা আমাকে দান করা হয়েছে। [বুখারী, ৪৬৪৭] উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সূরাটি সবচেয়ে মহান সূরা।

এই সূরা যদিও আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব কালাম, তবুও এর ধরণ রাখা হয়েছে প্রার্থনামূলক। আল্লাহ্‌র নিকট মানুষকে কোন জিনিসের প্রার্থনা করতে হবে, সে প্রার্থনার নিয়ম ও প্রণালী কি হওয়া উচিত; আল্লাহর সম্মুখে মানুষের প্রকৃত স্থান কোথায় এবং সেই দৃষ্টিতে মানুষের আকীদা বিশ্বাস কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তার জন্য বিশুদ্ধ দ্বীন কি হতে পারে, এই দুনিয়ার অসংখ্য পথের মধ্যে হেদায়েতের পথ–আল্লাহর সন্তোষ লাভের সঠিক পথ–কোনটি, আর কোন পথে নাযিল হয় তাঁর অভিশাপ; এসব কথাই বিশ্ব-মানবের সম্মুখে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এই সূরার মাধ্যমে। আল্লাহর বিশেষ পরিচয় ও গুণাবলীর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে কিয়ামত–বিচারের দিন এবং রিসালাত ও নবুওয়্যাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব দিক দিয়ে এই সূরাকে কুরআনের ভূমিকা বলা যেতে পারে। কুরআনের সমগ্র সূরার মধ্যে এর গুরুত্ব বেশী হওয়ার কারণেই একে কুরআনের শুরুতে স্থাপন করা হয়েছে। অন্য কথায় ত্রিশ পারা কুরআন শরীফে যা কিছু আলোচিত হয়েছে, অতি সংক্ষেপে তাই বর্ণিত হয়েছে এই ছোট্ট সূরাটিতে। অথবা বলা যায়, পূর্ণ কুরআন এই ছোট সূরাটিরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

১. রহমান, রহীম(১) আল্লাহ্‌র নামে(২)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

(১) সাধারণত আয়াতের অনুবাদে বলা হয়ে থাকে, পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। এ অনুবাদ বিশুদ্ধ হলেও এর মাধ্যমে এ আয়াতখানির পূর্ণভাব প্রকাশিত হয় না। কারণ, আয়াতটি আরও বিস্তারিত বর্ণনার দাবী রাখে। প্রথমে লক্ষণীয় যে, আয়াতে আল্লাহর নিজস্ব গুণবাচক নামসমূহের মধ্য হতে 'আর-রাহমান ও আর-রাহীম' এ দু'টি নামই এক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। 'রহম' শব্দের অর্থ হচ্ছে দয়া, অনুগ্রহ। এই 'রহম' ধাতু হতেই 'রহমান' ও 'রহীম' শব্দদ্বয় নির্গত ও গঠিত হয়েছে। 'রহমান' শব্দটি মহান আল্লাহ্‌র এমন একটি গুণবাচক নাম যা অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা জায়েয নেই। [তাবারী] কুরআন ও হাদীসে এমনকি আরবদের সাহিত্যেও এটি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। পক্ষান্তরে 'রহীম' শব্দটি আল্লাহ্‌র গুণ হলেও এটি অন্যান্য সৃষ্টজগতের কারও কারও গুণ হতে পারে। তবে আল্লাহ্‌র গুণ হলে সেটা যে অর্থে হবে অন্য কারও গুণ হলে সেটা সে একই অর্থে হতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রত্যেক সত্তা অনুসারে তার গুণাগুণ নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এখানে একই স্থানে এ দু'টি গুণবাচক নাম উল্লেখ করার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে, আল্লাহ্ 'রহমান' হচ্ছেন এই দুনিয়ার ক্ষেত্রে, আর 'রাহীম' হচ্ছেন আখেরাতের হিসেবে। [বাগভী]

(২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সর্বপ্রথম 'ইক্‌রা বিসমে' বা সূরা আল-'আলাক এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। এতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাম নিয়ে পাঠ শুরু করতে বলা হয়েছিল। সম্ভবত এজন্যই আল্লাহর এই প্রাথমিক আদেশ অনুযায়ী কুরআনের প্রত্যেক সূরা'র প্রথমেই তা স্থাপন করে সেটাকে রীতিমত পাঠ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ বিসমিল্লাহ প্রত্যেকটি সূরার উপরিভাগে অর্থ ও বাহ্যিক আঙ্গিকতার দিক দিয়ে একটি স্বর্ণমুকুটের ন্যায় স্থাপিত রয়েছে। বিশেষ করে এর সাহায্যে প্রত্যেক দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করাও অতীব সহজ হয়েছে। হাদীসেও এসেছে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরার শেষ তখনই বুঝতে পারতেন যখন বিসমিল্লাহ নাযিল করা হতো" [আবু দাউদ: ৭৮৮] তবে প্রত্যেক সূরার প্রথমে ও কুরআন পাঠের পূর্বে এ বাক্য পাঠ করার অর্থ শুধু এ নয় যে, এর দ্বারা আল্লাহর নাম নিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে শুরু করার সংবাদ দেয়া হচ্ছে। বরং এর দ্বারা স্পষ্ট কণ্ঠে স্বীকার করা হয় যে, দুনিয়া জাহানের সমস্ত নিয়ামত আল্লাহর তরফ হতে প্রাপ্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে এ কথাও মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি যে দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন বিশেষ করে দ্বীন ও শরীয়াতের যে অপূর্ব ও অতুলনীয় নিয়ামত আমাদের প্রতি নাযিল করেছেন, তা আমাদের জন্মগত কোন অধিকারের ফল নয়। বরং তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব বিশেষ মেহেরবানীর ফল।

তাছাড়া এই বাক্য দ্বারা আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনাও করা হয় যে, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁর কালামে-পাক বুঝবার ও তদনুযায়ী জীবন যাপন করার তওফীক

দান করেন। এ ছোট্ট বাক্যটির অন্তর্নিহিত ভাবধারা এটাই। তাই শুধু কুরআন তিলাওয়াত শুরু করার পূর্বেই নয় প্রত্যেক জায়েয কাজ আরম্ভ করার সময়ই এটি পাঠ করার জন্য ইসলামী শরীয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ প্রত্যেক কাজের পূর্বে এটি উচ্চারণ না করলে উহার মঙ্গলময় পরিণাম লাভে সমর্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিভিন্ন কথা ও কাজে এই কথাই ঘোষণা করেছেন। যেমন, তিনি প্রতিদিন সকাল-বিকাল বলতেন, بِسْمِ اللهِ الذِيْ لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِه شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيمُ "আমি সে আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যার নামে শুরু করলে যমীন ও আসমানে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না, আর আল্লাহ্ তো সব কিছু শুনেন ও সবকিছু দেখেন।" [আবুদাউদ: ৫০৮৮, ইবনে মাজাহ: ৩৮৬৯] অনুরূপভাবে যখন তিনি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি লিখেন তাতে বিসমিল্লাহ্ লিখেছিলেন [বুখারী, ৭] তাছাড়া তিনি যে কোন ভাল কাজে বিসমিল্লাহ বলার জন্য নির্দেশ দিতেন। যেমন, খাবার খেতে, [বুখারী: ৫৩৭৬, মুসলিম: ২০১৭, ২০২২] দরজা বন্ধ করতে, আলো নিভাতে, পাত্র ঢাকতে, পান-পাত্র বন্ধ করতে [বুখারী: ৩২৮০] কাপড় খুলতে [ইবনে মাজাহ: ২৯৭, তিরমিযী: ৬০৬] স্ত্রী সহবাসের পূর্বে [বুখারী: ৬৩৮৮, মুসলিম: ১৪৩৪], ঘুমানোর সময় [আবু দাউদ: ৫০৫৪] ঘর থেকে বের হতে [আবুদাউদ: ৫০৯৫] চুক্তিপত্র/ বেচা-কেনা লিখার সময় [সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ৫/৩২৮] চলার সময় হোঁচট খেলে [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৫৯] বাহনে উঠতে [আবু দাউদ: ২৬০২] মসজিদে ঢুকতে [ইবনে মাজাহ: ৭৭১, মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৮৩] বাথরুমে প্রবেশ করতে [ইবনে আবি শাইবাহ: ১/১১] হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে [সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ৫/৭৯] যুদ্ধ শুরু করার সময় [তিরমিযী: ১৭১৫] শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ব্যাথা পেলে বা কেটে গেলে [নাসায়ী: ৩১৪৯] ব্যাথার স্থানে ঝাড়-ফুক দিতে [মুসলিম: ২২০২] মৃতকে কবরে দিতে [তিরমিযী: ১০৪৬]। এ ব্যাপারে আরও বহু সহীহ হাদীস এসেছে। আবার কোথাও কোথাও 'বিসমিল্লাহ' বলা ওয়াজিবও বটে যেমন, যবাই করতে [বুখারী: ৯৮৫, মুসলিম: ১৯৬০]

যেহেতু মানুষের শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, সে যে কাজই শুরু করুক না কেন, তা যে সে নিজে আশানুরূপে সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এমতাবস্থায় সে যদি আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করে এবং আল্লাহর অসীম দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি হৃদয়-মনে অকুণ্ঠ বিশ্বাস জাগরুক রেখে তাঁর রহমত কামনা করে, তবে এর অর্থ এ-ই হয় যে, সংশ্লিষ্ট কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার ব্যাপারে সে নিজের ক্ষমতা যোগ্যতা ও তদবীর অপেক্ষা আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের উপরই অধিক নির্ভর ও ভরসা করে এবং তা লাভ করার জন্য তাঁরই নিকট প্রার্থনা করে।

২. সকল 'হাম্‌দ'(১) | اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾

(১) আরবী ভাষায় 'হাম্‌দ' অর্থ নির্মল ও সম্ভ্রমপূর্ণ প্রশংসা। গুণ ও সিফাত সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়ে থাকে। তা ভালও হয় আবার মন্দও হয়। কিন্তু হাম্‌দ শব্দটি কেবলমাত্র ভাল গুণ প্রকাশ করে। অর্থাৎ বিশ্ব জাহানের যা কিছু এবং যতকিছু ভাল, সৌন্দর্য-মাধুর্য, পূর্ণতা মাহাত্ম দান ও অনুগ্রহ রয়েছে তা যেখানেই এবং যে কোন রূপে ও যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তা সবই একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট, একমাত্র তিনিই–তাঁর মহান সত্তাই সে সব পাওয়ার অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্যই এর যোগ্য হতে পারে না। কেননা সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনিই এবং তাঁর সব সৃষ্টিই অতীব সুন্দর। এর অধিক সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না–মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তাঁর সৃষ্টি, লালন-পালন-সংরক্ষণ-প্রবৃদ্ধি সাধনের সৌন্দর্য তুলনাহীন। তাই এর দরুন মানব মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠা প্রশংসা ও ইচ্ছামূলক প্রশংসাকে 'হামদ' বলা হয়। এখানে এটা বিশেষভাবে জানা আবশ্যক যে, 'আল-হামদু' কথাটি 'আশ-শুক্‌র' থেকে অনেক ব্যাপক, যা আধিক্য ও পরিপূর্ণতা বুঝায়। কেউ যদি কোন নিয়ামত পায়, তা হলে সেই নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া প্রকাশ করা হয়। সে ব্যক্তি যদি কোন নিয়ামত না পায় (অথবা তার পরিবর্তে অন্য কোন লোক নিয়ামতটি পায়) স্বভাবতঃই তার বেলায় এজন্য শুকরিয়া নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ামত পায়, সে-ই শুকরিয়া আদায় করে। যে ব্যক্তি নিয়ামত পায় না, সে শুকরিয়া আদায় করে না। এ হিসেবে 'আশ-শুক্‌র লিল্লাহ' বলার অর্থ হতো এই যে, আমি আল্লাহ্‌র যে নিয়ামত পেয়েছি, সেজন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি। অপরদিকে 'আল-হামদুলিল্লাহ' অনেক ব্যাপক। এর সম্পর্ক শুধু নিয়ামত প্রাপ্তির সাথে নয়। আল্লাহ্‌র যত নেয়ামত আছে, তা পাওয়া যাক, বা না পাওয়া যাক; সে নিয়ামত কোন ব্যক্তি নিজে পেলো, বা অন্যরা পেলো, সবকিছুর জন্যই যে প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য সেটিই হচ্ছে 'হামদ'। এ প্রেক্ষিতে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে বান্দা যেন ঘোষণা করে, হে আল্লাহ্! সব নিয়ামতের উৎস আপনি, আমি তা পাই বা না পাই, সকল সৃষ্টিজগতই তা পাচ্ছে; আর সেজন্য সকল প্রশংসা একান্তভাবে আপনার, আর কারও নয়। কেউ আপনার প্রশংসা করলে আপনি প্রশংসিত হবেন আর কেউ প্রশংসা না করলে প্রশংসিত হবেন না, ব্যাপারটি এমন নয়। আপনি স্বপ্রশংসিত। প্রশংসা আপনার স্থায়ী গুণ। প্রশংসা আপনি ভালবাসেন। আপনার প্রশংসা কোন দানের বিনিময়ে হতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। [ইবন কাসীর]

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। أَحْمَدُ اللهَ 'আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি' এ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, 'আহমাদুল্লাহ' বা 'আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি' এ বাক্যটি বর্তমানকালের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি বর্তমানকালে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি। অন্যদিকে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বা 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' সর্বকালে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে) প্রযোজ্য। আর এ জন্যই হাদীসে বলা

আল্লাহ্‌র(১), যিনি

হয়েছে, أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلّهِ "সবচেয়ে উত্তম দো'আ হলো, আল-হামদুলিল্লাহ"। [তিরমিযী:৩৩৮৩] কারণ, তা সর্বকাল ব্যাপী। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وَالحَمْدُ لِلّهِ تَمْلَأُ المِيزَانَ "আর 'আল-হামদুলিল্লাহ' মীযান পূর্ণ করে"।[মুসলিম: ২২৩] এ জন্য অধিকাংশ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিন-রাত্রির যিকর ও সালাতের পরের যিকর এর মধ্যে এ "আল-হামদুলিল্লাহ" শব্দই শিখিয়েছেন। এ "আল-হামদুলিল্লাহ" পুর্ণমাত্রার প্রশংসা হওয়ার কারণেই আল্লাহ্ এতে খুশী হন। বিশেষ করে নেয়ামত পাওয়ার পর বান্দাকে কিভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে হবে তাও "আল-হামদুলিল্লাহ" শব্দের মাধ্যমে করার জন্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল শিখিয়ে দিয়েছেন। [দেখুন, ইবনে মাজাহ, ৩৮০৫] এভাবে "আল-হামদুলিল্লাহ" হলো সীমাহীন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার রূপ। আল্লাহ্‌র হামদ প্রকাশ করার ক্ষেত্র, মানুষের মন-মানষ, মুখ ও কর্মকাণ্ড। অর্থাৎ মানুষের যাবতীয় শক্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র হামদ করতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র 'হামদ' বা প্রশংসা শুধু মুখেই সীমাবদ্ধ রাখে। অনেকে মুখে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে, কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রশংসা আসেনি আর তার কর্মকাণ্ডেও সেটার প্রকাশ ঘটে না।

(১) 'সকল হামদ আল্লাহ্‌র' এ কথাটুকু দ্বারা এক বিরাট গভীর সত্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পৃথিবীর যেখানেই যে বস্তুতেই যাকিছু সৌন্দর্য ভাল প্রশংসার যোগ্য গুণ বা শ্রেষ্ঠত্ব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে, মনে করতে হবে যে, তা তার নিজস্ব সম্পদ ও স্বকীয় গৌরবের বস্তু নয়। কেননা সেই গুণ মূলতঃই তার নিজের সৃষ্টি নয়; তা সেই আল্লাহ্ তা'আলারই নিরঙ্কুশ দান, যিনি নিজের কুদরতে সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৌন্দর্য ও সমস্ত ভালোর মূল উৎস। মানুষ, ফেরেশতা, গ্রহ-নক্ষত্র, বিশ্ব-প্রকৃতি, চন্দ্র-সূর্য–যেখানেই যা কিছু সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ রয়েছে, তা তাদের কারো নিজস্ব নয়, সবই আল্লাহর দান। অতএব এসব কারণে যা কিছু প্রশংসা হতে পারে তা সবই আল্লাহর প্রাপ্য। এসব সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেহেতু আল্লাহর সাথে কেউ শরীক ছিলনা, কাজেই এসব কারণে যে প্রশংসা প্রাপ্য হতে পারে তাতেও আল্লাহর সাথে কারো এক বিন্দু অংশীদারিত্ব থাকতে পারে না। সুন্দর, অনুগ্রহকারী, সৃষ্টিকর্তা, লালন-পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও ক্রমবিকাশদাতা আল্লাহর প্রতি মানুষ যা কিছু ভক্তি-শ্রদ্ধা ইবাদত-বন্দেগী এবং আনুগত্য পেশ করতে পারে; তা সবই একমাত্র আল্লাহ্‌র সামনেই নিবেদন করতে হবে। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তিই তার এক বিন্দুরও দাবীদার হতে পারে না। বরং তাঁরই রয়েছে যাবতীয় হাম্‌দ। হাম্‌দ জাতীয় সবকিছু কেবল তাঁরই প্রাপ্য, কেবল তিনিই সেটার একমাত্র যোগ্য। তাছাড়া ভালো বা মন্দ সকল অবস্থায় কেবল এক সত্তারই 'হামদ' বা প্রশংসা করতে হয়। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন যে, কেউ যদি কোন খারাপ কিছুর সম্মুখীন হয়, তখনও যেন

সৃষ্টিকুলের(১)

বলে, الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ বা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র জন্যই যাবতীয় হামদ ।[ইবন মাজাহঃ ৩৮০৩]

কুরআন হাদীস হতে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, সাধারণভাবে কোন ব্যক্তির গুণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার এতখানি প্রশংসাও করা যায় না যাতে তার ব্যক্তিত্বকেই অসাধারণভাবে বড় করে তোলা হয় এবং সে আল্লাহর সমকক্ষতার পর্যায়ে পৌঁছে যায় । মূলতঃ এইরূপ প্রশংসাই মানুষকে তাদের পূজার কঠিন পাপে নিমজ্জিত করে । সে জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে বলেছেন; “যখন বেশী বেশী প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে, তখন তাদের মুখের উপর ধূলি নিক্ষেপ কর ।” [মুসলিম:৩০০২] নতুবা তার মনে গৌরব ও অহংকারী ভাবধারার উদ্রেক হতে পারে । হয়ত মনে করতে পারে যে, সে বহুবিধ গুণ-গরিমার অধিকারী, তার বিরাট যোগ্যতা ও ক্ষমতা আছে । আর কোন মানুষ যখন এই ধরনের খেয়াল নিজের মনে স্থান দেয় তখন তার পতন হতে শুরু হয় এবং সে পতন হতে উদ্ধার হওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না । তাছাড়া মানুষ যখন আল্লাহ ছাড়া অপর কারো গুণ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তার প্রশংসা করতে শুরু করে, তখন মানুষ তার ভক্তি–শ্রদ্ধার জালে বন্দী হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সে মানুষের দাসত্ব ও মানুষের পূজা করতে আরম্ভ করে । এই অবস্থা মানুষকে শেষ পর্যন্ত চরম পঙ্কিল শির্কের পথে পরিচালিত করতে পারে । সে জন্যই যাবতীয় ‘হামদ’ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে ।

(১) ‘আলামীন’ বহুবচন শব্দ, একবচনে ‘আলাম’ । কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ‘আলাম’ বলা হয় সেই জিনিসকে, যা অপর কোন জিনিস সম্পর্কে জানবার মাধ্যম হয়; যার দ্বারা অন্য কোন বৃহত্তর জিনিস জানতে পারা যায় । সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি অংশ স্বতঃই এমন এক মহান সত্তার অস্তিত্বের নিদর্শন, যিনি তার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পৃষ্ঠপোষক ও সুব্যবস্থাপক । এই জন্য সৃষ্টিজগতকে ‘আলাম’ এবং বহুবচনে আলামীন বলা হয় । [কাশশাফ] ‘আলামীন’ বলতে কি বুঝায়, যদিও এখানে তার ব্যাখ্যা করা হয় নি, কিন্তু অপর আয়াতে তা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে । আয়াতটি হচ্ছে, ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ﴾ “ফির‘আউন বললঃ রাব্বুল আলামীন কি? মূসা বললেনঃ যিনি আসমান-যমীন এবং এ দু’টির মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিসের রব ।” [সূরা আশ-শু‘আরা:২৩-২৪] এতে ‘আলামীন’ এর তাফসীর হয়ে গেছে যে, সৃষ্টি জগতের আর সব কিছুই এর অধীন । আসমান ও যমীনে এত অসংখ্য ‘আলাম’ বিদ্যমান যে, মানুষ আজ পর্যন্ত সেগুলোর কোন সীমা নির্ধারণ করতে সমর্থ হয় নি । মানব-জগত, পশু-জগত, উদ্ভিদ-জগত–এই জগত সমূহের কোন সীমা-সংখ্যা নাই, বরং এগুলো অসীম অতলস্পর্শ জগত-সমুদ্রের কয়েকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র । মানব-বুদ্ধি সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে একেবারেই সমর্থ নয় । [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

রব[১],

(১) ‘রব্’ শব্দের বাংলা অর্থ করা হয় প্রভু–লালন পালনকারী। কিন্তু কুরআনে প্রয়োগভেদে এ শব্দের অর্থঃ–সৃষ্টি করা, সমানভাবে সজ্জিত ও স্থাপিত করা, প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা, পথ প্রদর্শন ও আইন বিধান দেওয়া, কোন জিনিসের মালিক হওয়া, লালন-পালন করা, রিযিক্ দান করা ও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। তাছাড়া ভাঙ্গা গড়ার অধিকারী হওয়া, জীবনদান করা, মৃত্যু প্রদান করা, সন্তান দেয়া, আরোগ্য প্রদান করা ইত্যাদি যাবতীয় অর্থই এতে নিহিত আছে। আর যিনি এক সঙ্গে এই সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন তিনিই হচ্ছেন রব্। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আ‘লায় এইরূপ ব্যাপক অর্থে রব্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۞ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ “আপনার রব্ এর নামের তাসবীহ্ পাঠ করুন, যিনি মহান উচ্চ; যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযথ ভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন; এবং যিনি সঠিক রূপে প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর জীবন যাপন পন্থা প্রদর্শন করেছেন”। [সূরা আল-আ‘লা: ১-৩] এই আয়াত হতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, ‘রব্’ তাঁকেই বলতে হবে যাঁর মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করার, সৃষ্টির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমান ও সজ্জিত করার, প্রত্যেকটির পরিমাণ নির্ধারণ করার এবং হেদায়েত, দ্বীন ও শরী‘আত প্রদান করার যোগ্যতা রয়েছে। যিনি নিজ সত্তার গুণে মানুষ ও সমগ্র বিশ্ব-ভূবনকে সৃষ্টি করেছেন; শুধু সৃষ্টিই নয়–যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা দান করেছেন ও তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরস্পরের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত করে সাজিয়ে দিয়েছেন যে, তার প্রত্যেকটি অঙ্গই পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে নিজ নিজ স্থানে বসে গেছে। রব্ তিনিই–যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকেই কর্মক্ষমতা দিয়েছেন, সেই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কাজ ও দায়িত্বও দিয়েছেন। প্রত্যেকের জন্য নিজের একটি ক্ষেত্র এবং তার সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ “যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, এবং তার পরিমাণ ঠিক করেছেন।” [সূরা আল-ফুরকান:২] অতএব এক ব্যক্তি যখন আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে, তখন সে প্রকারান্তরে এ কথারই ঘোষণা করে যে, আমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দৈহিক, আধ্যাত্মিক, দ্বীনী ও বৈষয়িক–যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলাই গ্রহণ করেছেন। আমার এই সবকিছু একমাত্র তাঁরই মর্জির উপর নির্ভরশীল। আমার সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক তিনিই। আর কেউ তার কোন কিছু পূরণ করার অধিকারী নয়।

বস্তুতঃ সৃষ্টিলোকে আল্লাহ্‌র দু’ধরনের রবুবিয়্যাত কার্যকর দেখা যায়: সাধারণ রবুবিয়াত বা প্রকৃতিগত এবং বিশেষ রবুবিয়াত বা শরী‘আতগত।

১) প্রকৃতিগত বা সৃষ্টিমূলক– মানুষের জন্ম, তাহার লালন পালন ও ক্রমবিকাশ দান, তার শরীরকে ক্ষুদ্র হতে বিরাটত্বের দিকে, অসম্পূর্ণতা হতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করা এবং তার মানসিক ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষতা দান।

৩. দয়াময়, পরম দয়ালু[১], الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

২) শরীয়াত ভিত্তিক–মানুষের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রকে পথ প্রদর্শন করা, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য নির্দেশের জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ। যারা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রতিভার পূর্ণত্ব বিধান করেন। এদেরই মাধ্যমে তারা হালাল, হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হয়। নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে থাকতে এবং কল্যাণ ও মঙ্গলময় পথের সন্ধান লাভ করতে পারে।

অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য মানুষের রব্ হওয়ার ব্যাপারটি খুবই ব্যাপক। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষের রব্ হওয়া কেবল এই জন্যই নয় যে, তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তার দেহের লালন পালন করেছেন এবং তাহার দৈহিক শৃঙ্খলাকে স্থাপন করেছেন। বরং এজন্যও তিনি রব্ব্ যে, তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক জীবন যাপনের সুযোগদানের জন্য নবী প্রেরণ করেছেন এবং নবীর মাধ্যমে সেই ইলাহী বিধান দান করেছেন।

(১) 'রহমান-রাহীম' শব্দদ্বয়ের কারণে মূল আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সমস্ত এবং সকল প্রকার প্রশংসার একচ্ছত্র অধিকারী কেবল এই জন্য নয় যে তিনি রব্বুল আলামীন, বরং এই জন্যও যে, তিনি 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহীম'। বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহ তা'আলার অপার অসীম দয়া ও অনুগ্রহ প্রতিনিয়ত পরিবেশিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক জগতে এই যে নিঃসীম শান্তি শৃংখলা ও সামঞ্জস্য-সুবিন্যাস বিরাজিত রয়েছে, এর একমাত্র কারণ এই যে, আল্লাহর রহমত সাধারণভাবে সব কিছুর উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়েছে। সকল শ্রেণীর সৃষ্টিই আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছে। কাফির, মুশরিক, আল্লাহ্‌দ্রোহী, নাস্তিক, মুনাফিক, কাউকেও আল্লাহ তার রহমত হতে জীবন-জীবিকা ও সাধারণ নিয়মে বৈষয়িক উন্নতি কোন কিছু থেকেই– বঞ্চিত করেন নি। এমন কি, আল্লাহর অবাধ্যতা এবং তাঁর বিরোধিতা করতে চাইলেও আল্লাহ নিজ হতে কাউকেও বাধা প্রদান করেন নি; বরং তিনি মানুষকে একটি সীমার মধ্যে যা ইচ্ছে তা করারই সুযোগ দিয়েছেন। এই জড় দুনিয়ার ব্যাপারে এটাই আল্লাহর নিয়ম। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "আর আমার রহমত সব কিছুকেই ব্যাপ্ত করে আছে।" [সূরা আল-আরাফ:১৫৬] কিন্তু এই জড় জগত চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যাবার পর যে নূতন জগত স্থাপিত হবে, তা হবে নৈতিক নিয়মের বুনিয়াদে স্থাপিত এক আলাদা জগত। সেখানে আল্লাহর দয়া অনুকম্পা আজকের মত সর্বসাধারণের প্রাপ্য হবে না। তখন আল্লাহর রহমত পাবে কেবলমাত্র তারাই যারা দুনিয়ায় আখেরাতের রহমত পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। 'রাব্বুল আলামীন' বলার পর 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহিম' শব্দদ্বয় উল্লেখ করায় এই কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ বিশ্ব-লোকের লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষন ও ক্রমবিকাশ দানের যে সুষ্ঠু ও নিখুত ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করেছেন, তার মূল কারণ সৃষ্টির প্রতি তাঁর অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুরূপভাবে 'রাহমান' এর পর 'রাহীম' উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা এই কথাই বলতে চান

৪. বিচার দিনের মালিক(১) ।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

যে, দুনিয়াতে আল্লাহর নিরপেক্ষ ও সাধারণ রহমত লাভ করে কেউ যেন অতিরিক্ত মাত্রায় মেতে না যায় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর দেয়া দ্বীনকে ভুলে না বসে। কেননা দুনিয়ার জীবনের পর আরও একটি জগত, আরও একটি জীবন নিশ্চিতরূপে রয়েছে, যখন আল্লাহর রহমত নির্বিশেষে আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। আর প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবনই হবে সর্বোতভাবে সাফল্যমণ্ডিত।

(১) এখানে আল্লাহকে 'বিচার দিনের মালিক' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই দিনের প্রকৃত রূপটি যে কি এবং জনগণের সম্মুখে এই দিন কি অবস্থা দেখা দিবে তা এখানে প্রকাশ করে বলা হয় নি। অন্যত্র তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ﴿وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۗ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ﴾ "বিচারের দিনটি কি, তা কিসে আপনাকে জানাবে? আবার জিজ্ঞাসা করি, কিসে আপনাকে জানাবে বিচারের দিনটি কি? তাহা এমন একটি দিন, যে দিন কেউই নিজের রক্ষার জন্য কোনই সাহায্যকারী পাবে না, এবং সমগ্র ব্যাপার নিরঙ্কুশ ভাবে আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত হবে।" [সূরা আল-ইনফিতার:১৭-১৯] আর ﴿يَوْمُ الدِّيْنِ﴾ বলিতে যে বিচারের দিন, প্রতিফল– তথা শাস্তি বা পুরস্কার দানের দিন বুঝায়, তা অন্য আয়াতাংশে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, ﴿يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ﴾ "আজকের দিনে আল্লাহ লোকদের প্রকৃত কর্মফল পূর্ণ করে দিবেন" [সূরা আন-নূর: ২৫] মোটকথা: আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন, তিনি কেবল 'রব্বুল আলামীন, আর-রহমান ও আর-রহীমই নন, তিনি 'মালিকি ইয়াওমিদ্দিন'-ও। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কেবল এই জীবনের লালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই এই বিরাট জগত-কারখানা স্থাপন করেন নি, এর একটি চূড়ান্ত পরিণতিও তিনি নির্ধারিত করেছেন। অর্থাৎ তোমরা কেউ মনে করো না যে, এই জীবনের অন্তরালে কোন জীবন নেই। এই ধারণাও মনে স্থান দিও না যে, সেদিনও তোমাদের তেমনি স্বেচ্ছাচারিতা চলবে যেমন আজ চলছে বলে তোমরা ধারণা করছ বরং সে দিন নিরঙ্কুশভাবে এক আল্লাহরই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও মালিকানা পূর্ণমাত্রায় কার্যকর থাকবে। আজ যেমন তোমরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে পারছ–অন্তত: এর পথে প্রাকৃতিক দিক দিয়ে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় না, সে চূড়ান্ত বিচার দিনে কিন্তু তা কিছু মাত্র চলবে না। সেদিন কেবলমাত্র আল্লাহর মর্জি কার্যকর হবে। আজ যেমন লোকেরা সত্যের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে সুস্পষ্ট অন্যায় ও মারাত্মক যুলুম করেও সুনাম সুখ্যাতিসহ জীবন-যাপন করতে পারছে, সেদিন কিন্তু এসব ধোঁকাবাজী এক বিন্দুও চলবে না। বিচার দিবসের গুরুগম্ভীর পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্য আন্দাজ করা যায় এই কথা হতে যে, বিচারের দিন জিজ্ঞেস করা হবে, "আজকার দিনে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব কার?" তার উত্তরে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হবে, "তা সবই একমাত্র সার্বভৌম ও শক্তিমান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।" [সূরা আল-গাফির:৫৯], অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "এটা সে দিনের কথা যেদিন কোন লোকই অন্য কারও জন্য কিছু করতে সক্ষম হবে না। সে দিন

৫. আমরা শুধু আপনারই ‘ইবাদাত করি, এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

৬. আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন[১],

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

সমস্ত কর্তৃত্বই হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য।” [সূরা আল-ইনফিতার:১৯] আল্লাহর এই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কার্যকর হবে প্রথম সিংগায় ফুক দেয়ার দিন হতেই। বলা হয়েছে, “আর তাঁর নিরঙ্কুশ মালিকানা কার্যকর হবে সিংগায় ফুঁক দেয়ার দিনই।” [সূরা আল-আন‘আম: ৭৩]

(১) স্নেহ ও করুণা এবং কল্যাণ কামনাসহ কাউকে মঙ্গলময় পথ দেখিয়ে দেয়া ও মনজিলে পৌঁছিয়ে দেয়াকে আরবী পরিভাষায় ‘হেদায়াত’ বলে। ‘হেদায়াত’ শব্দটির দুইটি অর্থ। একটি পথ প্রদর্শন করা, আর দ্বিতীয়টি লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া। যেখানে এই শব্দের পর দুইটি object থাকবে إلى থাকবে না, সেখানে এর অর্থ হবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া। আর যেখানে এ শব্দের পর إلى শব্দ আসবে, সেখানে অর্থ হবে পথ-প্রদর্শন। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলেছেন, ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ “নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্যস্থলে–মনজিলে পৌঁছিয়ে দিতে পারবেন না যাকে আপনি পৌঁছাতে চাইবেন। বরং আল্লাহ্ই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন।” [সূরা আল-কাসাস: ৫৬] এ আয়াতে হেদায়েত শব্দের পর إلى ব্যবহৃত হয়নি বলে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া অর্থ হয়েছে এবং তা করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধ্যায়ত্ত নয় বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে পথ প্রদর্শন রাসূলে করীমের সাধ্যায়ত্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ “হে নবী! আর আপনি অবশ্যই সরল সঠিক দৃঢ় ঋজু পথ প্রদর্শন করেন।” [সূরা আশ-শূরা:৫২] কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়ার কাজ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। তাই তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, ﴿وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ “আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে সরল সোজা সুদৃঢ় পথে পৌঁছিয়ে দিতাম।” [সূরা আন-নিসা: ৬৮] সূরা আল-ফাতিহা’র আলোচ্য আয়াতে হেদায়েত শব্দের পর إلى শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। ফলে এর অর্থ হবে সোজা সুদৃঢ় পথে মনজিলের দিকে চালনা করা। অর্থাৎ যেখানে বান্দাহ্ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে শুধু এতটুকু বলে না যে, হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে সোজা সুদৃঢ় পথের সন্ধান দিন। বরং বলে, ‘হে আল্লাহ্, আপনি আমাদেরকে সরল সুদৃঢ় পথে চলবার তাওফীক দিয়ে মনজিলে পৌঁছিয়ে দিন। কেননা শুধু পথের সন্ধান পাইলেই যে সে পথ পাওয়া ও তাতে চলে মনজিলে পৌঁছা সম্ভবপর হবে তা নিশ্চিত নয়।

কিন্তু ‘সিরাতে মুস্তাকীম’ কি? সিরাত শব্দের অর্থ হচ্ছে, রাস্তা বা পথ। আর মুস্তাকীম

৭. তাদের পথ, যাদেরকে আপনি নিয়ামত | صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

হচ্ছে, সরল সোজা। সে হিসেবে সিরাতে মুসতাকীম হচ্ছে, এমন পথ, যা একেবারে সোজা ও ঋজু, প্রশস্ত ও সুগম; যা পথিককে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়; যে পথ দিয়ে লক্ষ্যস্থল অতি নিকটবর্তী এবং মনযিলে মাকছুদে পৌঁছার জন্য যা একমাত্র পথ, যে পথ ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছার অন্য কোন পথই হতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমারও রব তোমাদেরও রব, অতএব একমাত্র তাঁরই দাস হয়ে থাক। এটাই হচ্ছে সিরাতুম মুস্তাকীম–সঠিক ও সুদৃঢ় ঋজু পথ।” [সূরা মারইয়াম: ৩৬] অর্থাৎ আল্লাহকে রব স্বীকার করে ও কেবল তাঁরই বান্দাহ হয়ে জীবন যাপন করলেই সিরাতুম মুস্তাকীম অনুসরণ করা হবে। অন্যত্র ইসলামের জরুরী বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “আর এটাই আমার সঠিক দৃঢ় পথ, অতএব তোমরা এই পথ অনুসরণ করে চল। এছাড়া আরও যত পথ আছে, তাহার একটিতেও পা দিও না; কেননা তা করলে সে পথগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবে–ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন এ উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা ধ্বংসের পথ হতে আত্মরক্ষা করতে পার।” [সূরা আল-আন‘আম: ১৫৩] একমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে যে পথ ও বিধি-বিধান পাওয়া যাবে, তাই মানুষের জন্য সঠিক পথ। আল্লাহ্ বলেন, “প্রকৃত সত্য-সঠিক-ঋজু-সরল পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব আল্লাহর উপর, যদিও আরও অনেক বাঁকা পথও রয়েছে। আর আল্লাহ্ চাইলে তিনি সব মানুষকেই হেদায়াতের পথে পরিচালিত করতেন।” [সূরা আন-নাহল:৯]

সিরাতে মুস্তাকীমের তাফসীর কোন কোন মুফাসসির করেছেন, ইসলাম। আবার কারও কারও মতে, কুরআন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] বস্তুত: আল্লাহর প্রদত্ত বিশ্বজনীন দ্বীনের অন্তর্নিহিত প্রকৃত রূপ ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ শব্দ হতে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ্ তা‘আলার দাসত্ব কবুল করে তাঁরই বিধান অনুসারে জীবন যাপন করার পথই হচ্ছে ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ এবং একমাত্র এই পথে চলার ফলেই মানুষ আল্লাহর নিয়ামত ও সন্তোষ লাভ করতে পারে। সে একমাত্র পথই মানব জীবনের প্রকৃত ও চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য। তাই সে একমাত্র পথে চলার তওফীক প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে এই আয়াতটিতে।

কিন্তু আল্লাহর নিকট হতে এই পথ কিরূপে পাওয়া যেতে পারে? সে পথ ও পন্থা নির্দেশ করতে গিয়ে আল্লাহ এর তিনটি সুস্পষ্ট পরিচয় উল্লেখ করেছেন: ১. এই জীবন কিভাবে যাপন করতে হবে তা তাদের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে, যারা উক্ত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে আল্লাহর নিকট হতে নিয়ামত ও অসীম অনুগ্রহ লাভ করেছে। ২. এই পথের পথিকদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হয় নি, অভিশপ্তও তারা নয়। ৩. তারা পথভ্রান্ত লক্ষ্যভ্রষ্টও নয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এ কথা কয়টির বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

وَلَا الضَّآلِّيْنَ

দিয়েছেন[১], যাদের উপর আপনার ক্রোধ আপতিত হয়নি[২] এবং যারা

(১) এটা আল্লাহর নির্ধারিত সঠিক ও দৃঢ় পথের প্রথম পরিচয়। এর অর্থ এই যে, আল্লাহর নিকট হতে যে পথ নাযিল হয়েছে, তা অনুসরণ করলে আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত লাভ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ তা এমন কোন পথই নয়, যাহা আজ সম্পূর্ণ নূতনভাবে পেশ করা হচ্ছে– পূর্বে পেশ করা হয় নি। বরং তা অতিশয় আদিম ও চিরন্তন পথ। মানুষের এই কল্যাণের পথ অত্যন্ত পুরাতন, ততখানি পুরাতন যতখানি পুরাতন হচ্ছে স্বয়ং মানুষ। প্রথম মানুষ হতেই এটা মানুষের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে, অসংখ্য মানুষ এ পথ প্রচার করেছেন, কবুল করার আহ্বান জানিয়েছেন, এটা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর নিকট হতে, অপূর্ব নিয়ামত ও সম্মান লাভের অধিকারী প্রমাণিত হয়েছেন। এই নিয়ামত এই দুনিয়ার জীবনেও তারা পেয়েছেন, আর আখেরাতেও তা তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। মূলতঃ আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের চলার পথ ও অনুসৃত জীবনই হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য একমাত্র পথ ও পন্থা। এতদ্ব্যতীত মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, অনুসরণীয় ও কল্যাণকর পথ আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোক কারা এবং তাদের পথ বাস্তবিক পক্ষে কি? এর উত্তর অন্য আয়াতে এসেছে, “যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তা করলে তাদের ভাল হত এবং চিত্তস্থিরতায় তারা দৃঢ়তর হত। এবং তখন আমি আমার কাছ থেকে তাদেরকে নিশ্চয় মহাপুরস্কার প্রদান করতাম এবং তাদেরকে নিশ্চয় সরল পথে পরিচালিত করতাম। আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসুলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ (যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন) তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী! এগুলো আল্লাহ্র অনুগ্রহ। সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।” [সূরা আন-নিসা: ৬৬-৭০] এ আয়াত থেকে সঠিক ও দৃঢ় জীবন পথ যে কোনটি আর আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকগণ যে কোন পথে চলেছেন ও চলে আল্লাহর অনুগ্রহ পাবার অধিকারী হয়েছেন তা সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানা যায়। তারা হচ্ছেন আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীন। [ইবন কাসীর]

(২) এটা আল্লাহর নির্ধারিত ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ এর দ্বিতীয় পরিচয়। আল্লাহ তা‘আলা যে পথ মানুষের সম্মুখে চিরন্তন কল্যাণ লাভের জন্য উপস্থাপিত করেছেন সে পথ অভিশাপের পথ নয় এবং সে পথে যারা চলে তাদের উপর কখনই আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হতে পারে না। সে পথ তো রহমতের পথ বরং সে পথের পথিকদের প্রতি দুনিয়াতে যেমন আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য বর্ষিত হয়ে থাকে, আখেরাতেও তারা আল্লাহর চিরস্থায়ী সন্তোষ লাভের অধিকারী হবে। এই আয়াতাংশের অপর একটি অনুবাদ হচ্ছে, “তাদের পথ নয় যাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নাযিল হয়েছে।” এরূপ অনুবাদ করলে তাতে ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ ছাড়া আরও একটি পথের ইঙ্গিত মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়, যা আল্লাহর নিকট হতে অভিশপ্ত এবং সেই পথ হতে মানুষকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য মনে হয়। কিন্তু এখানে আল্লাহ্ মূলতঃ একটি পথই

পথভ্রষ্টও নয়[১) ।

উপস্থাপিত করেছেন এবং একটি পথেরই ইতিবাচক দুইটি বিশেষণ দ্বারা সেটাকে অত্যধিক সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। তাই অনেকেই পূর্বোক্ত প্রথম অনুবাদটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। [উভয় অর্থের জন্য দেখুন, যামাখশারী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] প্রথম অনুবাদ বা দ্বিতীয় অনুবাদ যাই হোক না কেন এখানে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে প্রকারান্তরে এমন পথ ও পন্থা গ্রহণ হতে বিরত থাকবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যা আল্লাহর অভিশাপের পথ, যে পথে চলে কোন কোন লোক 'অভিশপ্ত' হয়েছে।

কিন্তু সে অভিশপ্ত কারা, কারা কোন পথে চলে আল্লাহর নিকট হতে অভিশপ্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেয়া আবশ্যক। কুরআন মজীদ ঐতিহাসিক জাতিদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ "আর তাদের উপর অপমান লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের কষাঘাত হানা হয়েছে এবং তারা আল্লাহর অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছে।" [সূরা আল-বাকারাহ্: ৬১] পূর্বাপর আলোচনা করলে নিঃসন্দেহে এটা বুঝতে পারা যায় যে, এ কথাটি ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাই 'মাগদুব' বলতে যে এখানে ইয়াহূদীদের বুঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে সমস্ত মুফাসসিরই একমত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসেও অনুরূপ স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে [দেখুন, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩২,৩৩]

(১) এটি 'সিরাতুল মুস্তাকীম'-এর তৃতীয় ও সর্বশেষ পরিচয়। অর্থাৎ যারা সিরাতুল মুস্তাকীম এ চলে আল্লাহর নিয়ামত লাভ করতে পেরেছেন তারা পথভ্রষ্ট নন–কোন গোমরাহীর পথে তারা চলেন না। পূর্বোল্লেখিত আয়াতের ন্যায় এ আয়াতেরও অন্য অনুবাদ হচ্ছে, 'তাদের পথে নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, যারা গোমরাহ হয়ে আল্লাহর উপস্থাপিত পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে এ পথ-ভ্রষ্ট লোকদের পরিচয় জানতে পারা যায় যে, দুনিয়ার ইতিহাসে নাসারাগণ হচ্ছে কুরআনে উল্লেখিত এ গোমরাহ ও পথ-ভ্রষ্ট জাতি। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩২,৩৩, ৭৭]

কোন মুসলিম যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করে, তখন সে প্রকারান্তরে এ কথাই ঘোষণা করে যে, "হে আল্লাহ্ আমরা স্বীকার করি, আপনার সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যে জীবন-ধারা গড়ে উঠে তা-ই একমাত্র মুক্তির পথ। এজন্য আপনার নির্ধারিত এ পথে চলে যারা আপনার নিয়ামত পেয়েছেন সেই পথই একমাত্র সত্য ও কল্যাণের পথ, আল্লাহ্ সেই পথেই আমাদেরকে চলবার তাওফীক দিন। আর যাদের উপর আপনার অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে ও যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের যেন আমরা অনুসরণ না করি। কেননা, সে পথে প্রকৃতই কোন কল্যাণ নেই।" বস্তুতঃ পবিত্র কুরআন দুনিয়ার বর্তমান বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সর্বশেষ আল্লাহ্র দেয়া গ্রন্থ। এর উপস্থাপিত আদর্শ ও জীবন পথই হচ্ছে বিশ্বমানবতার একমাত্র স্থায়ী ও কল্যাণের পথ। এর বিপরীত সমস্ত জীবনাদর্শকে মিথ্যা প্রমাণ করে

একমাত্র এরই উপস্থাপিত আদর্শের ভিত্তিতে নিজেদেরকে গঠন করা মুসলিমদের একমাত্র দায়িত্ব। মুসলিমরা আজও সেই দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হলে সূরা আল-ফাতিহা তাদের জীবনে সার্থক হবে।

মূলত: যারা সূরা আল-ফাতিহার অর্থ বুঝে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ শেষ করার পর তাদের মন থেকে দো'আ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দো'আ কবুল করবেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ المَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّيْنَ، فَقُوْلُوْا آمِيْنَ؛ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُه قَوْلَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه "যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বল্লীন' বলে তখন তোমরা 'আমীন' বা 'হে আল্লাহ্ কবুল কর' একথাটি বল; কেননা যার কথাটি ফেরেশতাদের কথা অনুযায়ী হবে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" [বুখারী: ৭৮২, মুসলিম: ৪০৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ المَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ؛ فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ؛ يُجِبْكُمُ اللهُ "যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বল্লীন' বলে তখন তোমরা 'আমীন' বা 'হে আল্লাহ্ কবুল কর' একথাটি বল; এতে আল্লাহ্ তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবেন (দো'আ কবুল করবেন)।" [মুসলিম: ৪০৪] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, مَا حَسَدَتْكُمُ اليَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلام والتَّأْمِيْنِ "ইয়াহূদীরা তোমাদেরকে তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন' বলার চেয়ে বেশী কোন বিষয়ের উপর হিংসা করে না।" [ইবন মাজাহ: ৮৫৬]

২- সূরা আল-বাকারাহ্
২৮৬ আয়াত, মাদানী



সূরা আল-বাকারাহ্‌র গুরুত্ব ও ফযীলতঃ

১) সূরাটি সবচেয়ে বড় সূরা।

২) সূরাটি সবচেয়ে বেশী আহ্‌কাম বা বিধি-বিধান সমৃদ্ধ। [ইবনে কাসীর]

৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরা পাঠ করার বিভিন্ন ফযীলত বর্ণনা করেছেনঃ

- আবু উমামাহ্ আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর; কেননা, কেয়ামতের দিন এই কুরআন তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আসবে। তোমরা দু'টি পুষ্প তথা সূরা আল-বাকারাহ্ ও সূরা আলে-ইমরান তিলাওয়াত কর, কেননা কেয়ামতের দিন এ দু'টি সূরা এমনভাবে আসবে যেন এ দু'টি হচ্ছে দু'খণ্ড মেঘমালা, অথবা দু'টুকরো কালো ছায়া, অথবা দু'ঝাঁক উড়ন্ত পাখি। এ দু'টি সূরা যারা তিলাওয়াত করবে তাদের থেকে (জাহান্নামের আযাবকে) প্রতিরোধ করবে। তোমরা সূরা আল-বাকারাহ্ তিলাওয়াত কর। কেননা, এর নিয়মিত তিলাওয়াত হচ্ছে বারাকাহ্ বা সমৃদ্ধি এবং এর তিলাওয়াত বর্জন হচ্ছে আফসোসের কারণ। আর যাদুকররা এর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না'। [মুসলিম-৮০৪]
- অপর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ কর। কেননা, এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোন আহ্‌লে বাতিল তথা জাদুকরের জাদু কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৪৯]
- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবর বানিওনা, নিশ্চয়ই শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায় যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ করা হয়'। [মুসলিমঃ ৭৮০] অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ্ পড়া হয় সেখানে শয়তান প্রবেশ করেনা। [মুসনাদে আহমাদ: ২/২৮৪]
- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'প্রত্যেক বস্তুরই উচ্চ স্তম্ভ রয়েছে, কুরআনের সুউচ্চ শৃংগ হলো, সূরা আল-বাকারাহ্'। [তিরমিযীঃ ২৮৭৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৫৯]

৪) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের দিন সাহাবায়ে কেরামকে ডাকার সময় বলেছিলেনঃ 'হে সূরা আল-বাকারাহ্‌র বাহক (জ্ঞানসম্পন্ন) লোকেরা'। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২১৮]

৫) সূরা আল-বাকারাহ্ তিলাওয়াত করলে সেখানে ফিরিশ্‌তাগণ আলোকবর্তিকার মত অবতরণ করে। এ প্রসংগে বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে বর্ণনা এসেছে। [বুখারীঃ ৫০১৮,

মুসলিমঃ ৭৯৬]

৬) যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সূরা আল-বাকারাহ্ জানতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করতেন এবং তাদেরকে যুদ্ধে আমীর বানাতেন। [তিরমিযী: ২৮৭৬, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ:৩/৫, হাদীস নং ১৫০৯, ৪/১৪০, হাদীস নং ২৫৪০, মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৬১১, হাদীস নং ১৬২২]

৭) অনুরূপভাবে যারা সূরা আল-বাকারাহ্ এবং সূরা আলে-ইমরান জানতেন, সাহাবাদের নিকট তাদের মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১২০,১২১]

৮) সর্বোপরি এ সূরাতে আল্লাহ্র "ইসমে 'আযম" রয়েছে যার দ্বারা দো'আ করলে আল্লাহ্ সাড়া দেন। এ সূরায় এমন একটি আয়াত রয়েছে যা কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। এ আয়াতটি হচ্ছে আয়াতুল কুরসী, যাতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

।। রহমান, রহীম আল্লাহর নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ্-লাম-মীম[1],

الٓمٓ ۝١

(১) আলিফ, লাম, মীমঃ এ হরফগুলোকে কুরআনের পরিভাষায় 'হরূফে মুকাত্তা'আত' বলা হয়। ঊনত্রিশটি সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের হরূফে মুকাত্তা'আত ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোর সংখ্যা ১৪টি। একত্র করলে দাঁড়ায়: نَصٌّ حَكِيْمٌ قَاطِعٌ لَهُ سِرٌّ "প্রাজ্ঞ সত্বার পক্ষ থেকে অকাট্য বাণী যাতে তার কোন গোপন ভেদ রয়েছে"। মূলতঃ এগুলো কতগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণ দ্বারা গঠিত এক-একটা বাক্য, যথা- الٓمٓ-حم-الٓمٓص । এ অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন করে পড়া হয়ে থাকে। যথা- الف-لام-ميم (আলিফ্-লাম্-মীম্)। এ বর্ণগুলো তাদের নিকট প্রচলিত ভাষার বর্ণমালা হতে গৃহীত। যা দিয়ে তারা কথা বলে এবং শব্দ তৈরী করে। কিন্তু কি অর্থে এবং এসব আয়াত বর্ণনার কি রহস্য রয়েছে এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বমোট প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে চারটি:

১) এগুলোর কোন অর্থ নেই, কেবলমাত্র আরবী বর্ণমালার হরফ হিসেবে এগুলো পরিচিত।

২) এগুলোর অর্থ আছে কিনা তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, আমরা এগুলোর অর্থ সম্পর্কে কিছুই জানিনা। আমরা শুধুমাত্র তিলাওয়াত করবো।

৩) এগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, কারণ কুরআনের কোন বিষয় বা কোন আয়াত বা শব্দ অর্থহীনভাবে নাযিল করা হয়নি। কিন্তু এগুলোর অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। অন্য কেউ এ আয়াতসমূহের অর্থ জানেনা, যদি কেউ এর কোন অর্থ নিয়ে থাকে তবে তা সম্পূর্ণভাবে ভুল হবে। আমরা শুধু এতটুকু বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুরআনের কোন অংশ অনর্থক নাযিল করেননি।

৪) এগুলো 'মুতাশাবিহাত' বা অস্পষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। এ হিসাবে অধিকাংশ সাহাবী,

তাবেয়ী ও ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত হচ্ছে যে, হরূফে মুকাত্তা'আতগুলো এমনি রহস্যপূর্ণ যার প্রকৃত মর্ম ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কিন্তু 'মুতাশাবিহাত' আয়াতসমূহের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে থাকলেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ এগুলো থেকে হেদায়াত গ্রহণ করার জন্য এগুলোর বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক এ হরফগুলোকে সংশ্লিষ্ট সূরার নাম বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ্র নামের তত্ত্ব বিশেষ। আবার অনেকে এগুলোর স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থও করেছেন। যেমন আলেমগণ الـم এ আয়াতটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেনঃ

(৫) এখানে আলিফ দ্বারা আরবী বর্ণমালার প্রথম বর্ণ যা মুখের শেষাংশ থেকে উচ্চারিত হয়, লাম বর্ণটি মুখের মধ্য ভাগ থেকে, আর মীম বর্ণটি মুখের প্রথম থেকে উচ্চারিত হয়, এ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে এ কুরআনের শব্দগুলো তোমাদের মুখ থেকেই বের হয়, কিন্তু এগুলোর মত কোন বাক্য আনতে তোমাদের সামর্থ্য নেই।

(৬) এগুলো হলো শপথ বাক্য। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো দিয়ে শপথ করেছেন।

(৭) এগুলো কুরআনের ভূমিকা বা চাবির মত যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুরআনকে শুরু করেন।

(৮) এগুলো কুরআনের নামসমূহ হতে একটি নাম।

(৯) এগুলো আল্লাহ্র নামসমূহের একটি নাম ।

(১০) এখানে আলিফ দ্বারা أنا (আমি) আর লাম দ্বারা আল্লাহ্ এবং মীম দ্বারা أَعْلَمُ (আমি বেশী জানি), অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ এর অর্থ বেশী জানি।

(১১) আলিফ দ্বারা আল্লাহ্, লাম দ্বারা জিবরীল, আর মীম দ্বারা মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বোঝানো হয়েছে। [দেখুন, তাফসীর ইবনে কাসীর ও আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১২) এভাবে এ আয়াতের আরও অনেকগুলো অর্থ করা হয়েছে। তবে আলেমগণ এসব আয়াতের বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করলেও এর কোন একটিকেও অকাট্যভাবে এগুলোর অর্থ হিসেবে গ্রহণ করেননি। এগুলো উল্লেখের একমাত্র কারণ আরবদেরকে অনুরূপ রচনার ক্ষেত্রে অক্ষম ও অপারগ করে দেয়া। কারণ এ বর্ণগুলো তাদের ব্যবহৃত ভাষার বর্ণমালা এবং তারা যা দিয়ে কথা বলে থাকে ও শব্দ তৈরী করে থাকে, তা থেকে নেয়া হয়েছে।

(১৩) মোটকথা, এ শব্দ দ্বারা আমরা বিভিন্ন অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে হেদায়াতের আলো লাভ করতে পারি, যদিও এর মধ্যকার কোন্ অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে আমরা জানি না। তবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করা এ শব্দগুলোর অর্থ বুঝার উপর নির্ভরশীল নয়। অথবা, এ হরফগুলোর মানে না বুঝলে কোন ব্যক্তির সরল-সোজা পথ লাভের মধ্যে গলদ থেকে যাবে এমন কোন কথাও নেই। তাই এর অর্থ নিয়ে ব্যাকুল হয়ে অনুসন্ধান করার অতবেশী প্রয়োজনও নেই।

২. এটা[১] সে কিতাব; যাতে কোন সন্দেহ নেই[২], মুত্তাকীদের

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

(১) এখানে ذلك শব্দের অর্থ - ঐটা, সাধারণতঃ কোন দূরবর্তী বস্তুকে ইশারা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে ذلك দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমগণ থেকে কয়েকটি মত বর্ণিত হয়েছেঃ

১) ذلك শব্দের অর্থ তাওরাত ও ইঞ্জিল বুঝানো হয়েছে, তখন তার অর্থ হবেঃ হে মুহাম্মাদ! (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ কিতাব যা আমি তাওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখ করেছিলাম, তা-ই আপনার উপর নাযিল করেছি। অথবা, হে ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়! তোমাদেরকে যে কিতাবের ওয়াদা আমি তোমাদের কিতাবে করেছি সেটা এই কিতাব যা আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিল করেছি।

২) এখানে ذلك দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ আয়াতসমূহের পূর্বে মক্কা ও মদীনায় নাযিল কুরআনের অন্যান্য সূরা ও আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা। আর যেহেতু সেগুলো আগেই গত হয়েছে, সেহেতু ذلك দ্বারা সম্বোধন শুদ্ধ হয়েছে।

৩) কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এখানে কিতাব বলতে ঐ কিতাবকে বুঝিয়েছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন। যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত।

৪) এখানে কিতাব দ্বারা ঐ কিতাব উদ্দেশ্য, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার ভাল-মন্দ, রিয্ক, আয়ু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

৫) এখানে ঐ কিতাব বুঝানো হয়েছে যা তিনি নিজে লিখে রেখেছেন তাঁর কাছে আরশের উপর, যেখানে লেখা আছে, "আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে"। [বুখারী: ৭৫৫৩, মুসলিম: ২৭৫১]

৬) الم দ্বারা যদি পবিত্র কুরআন বুঝানো হয়ে থাকে, অর্থাৎ الم কুরআনের নাম হয়ে থাকে, তাহলে ذلك الكتاب দ্বারা الم বুঝানো হয়েছে।

৭) এখানে ذلك দ্বারা هذا বুঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ এই কিতাব যার আলোচনা হচ্ছে, বা সামনে আসছে। সুতরাং এর দ্বারা কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। আর এ শেষোক্ত মতই সবচেয়ে বেশী বিশুদ্ধ। সুতরাং الكتاب দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে।

(২) এ আয়াতে উল্লেখিত ريب শব্দের অর্থ এমন সন্দেহ যা অস্বস্তিকর। এ আয়াতের বর্ণনায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত পোষন করেছেনঃ

১) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে।

২) তোমরা এ কুরআনের মধ্যে কোন সন্দেহ করো না। [ইবনে কাসীর]

৩) কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এর অর্থ তোমরা এ কুরআনের মধ্যে কোন সন্দেহে নিপতিত হবে না। অর্থাৎ এর সবকিছু স্পষ্ট।

৪) কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ যদি কিতাব দ্বারা ঐ কিতাব উদ্দেশ্য হয়, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর ভালমন্দ হওয়া লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তাহলে لا ريب দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন নেই।

জন্য[১] হেদায়াত,

৩. যারা গায়েবের[২] প্রতি ঈমান

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

(১) 'মুত্তাকীন' শব্দটি 'মুত্তাকী'-এর বহুবচন। মুত্তাকী শব্দের মূল ধাতু 'তাকওয়া'। তাকওয়া হলো, নিরাপদ থাকা, নিরাপত্তা বিধান করা। শরী'আতের পরিভাষায় তাকওয়া হলো, বান্দা যেন আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, আর তা করতে হলে যা করতে হবে তা হলো, তাঁর নির্দেশকে পুরোপুরি মেনে নেয়া, এবং তাঁর নিষেধকৃত বস্তুকে পুরোপুরি ত্যাগ করা। আর মুত্তাকী হলেন, যিনি আল্লাহ্‌র আদেশকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে এবং তাঁর নিষেধ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থেকে তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। [ইবনে কাসীর] বর্ণিত আছে যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আপনি কি কখনো কাঁটাযুক্ত পথে চলেছেন? তিনি বললেন, অবশ্যই। উবাই বললেন, কিভাবে চলেছেন? উমর বললেন, কাপড় গুটিয়ে অত্যন্ত সাবধানে চলেছি। উবাই বললেন: এটাই হলো, তাকওয়া। [ইবনে কাসীর]

তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, মুত্তাকীগণকে কেন হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন? এ ব্যাপারে আলেমগণ বলেন, মূলতঃ মুত্তাকীরাই আল্লাহ্‌র কুরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারেন, অন্যান্য যারা মুত্তাকী নন তারা হেদায়াত লাভ করতে পারেন না। যদিও কুরআন তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন। আর পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এ অর্থের উপর প্রমাণবহ। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়াত করে সে পথের দিকে যা আকওয়াম তথা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার"। [সূরা আল-ইসরা: ৯] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ কুরআন তাদের জন্য হিদায়াত যারা হেদায়াত চেনার পর তা গ্রহণ না করার শাস্তির ভয়ে সদা কম্পমান। আর তারা তাঁর কাছ থেকে যা এসেছে তার সত্যায়নের মাধ্যমে রহমতের আশাবাদী। [তাফসীরে ইবনে কাসীর ও আত-তাফসীরুস সহীহ] তাছাড়া হিদায়াতের কোন শেষ নেই, মুত্তাকীরা সর্বদা আল্লাহ্‌র নাযিল করা হেদায়াতের মুখাপেক্ষী বিধায় হেদায়াতকে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। তবে অন্যান্য আয়াতে কুরআনকে সমস্ত মানবজাতির জন্য হেদায়াতকারী বলে উল্লেখ করেছেন, সেখানে এর অর্থ হলো, হিদায়াতের পথ তাদের দেখাতে পারে যদি তারা তা থেকে হিদায়াত নিতে চায়।

(২) غيب এর অর্থ হচ্ছে এমনসব বস্তু যা বাহ্যিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, কান দ্বারা শুনতে পায় না, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নিতে পারে না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না, ফলে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভও করতে পারে না। কুরআনে غيب শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে যেগুলোর সংবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন এবং মানুষ যে সমস্ত বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিবলে

আনে[১], সালাত কায়েম | وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম। এখানে غيب শব্দ দ্বারা ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুণাবলী এবং তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা, কেয়ামত এবং কেয়ামতে অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশ্‌তাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত যা সূরা আল-বাকারাহ্‌র ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴾ আয়াতে দেয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আর এ সূরারই শেষে ২৮৫ নং আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

(১) ঈমান এবং গায়েব। শব্দ দু'টির অর্থ যথার্থভাবে অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরোপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ‘কোন বিষয়ের স্বীকৃতি দেয়া’। ইসলামী শরী‘আতের পরিভাষায় ঈমান বলতে বুঝায়, কোন বিষয়ে মুখের স্বীকৃতির মাধ্যমে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা এবং তা কাজে পরিণত করা। এখানে ঈমানের তিনটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমতঃ অন্তরে অকপট চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। দ্বিতীয়তঃ সে বিষয়ের স্বীকৃতি মুখে দেয়া। তৃতীয়তঃ কর্মকাণ্ডে তার বাস্তাবায়ন করা। শুধু বিশ্বাসের নামই ঈমান নয়। কেননা খোদ ইব্‌লিস, ফির‘আউন এবং অনেক কাফেরও মনে মনে বিশ্বাস করত। কিন্তু না মানার কারণে তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। তদ্রূপ শুধু মুখে স্বীকৃতির নামও ঈমান নয়। কারণ মুনাফেকরা মুখে স্বীকৃতি দিত। বরং ঈমান হচ্ছে জানা ও মানার নাম। বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং কার্যে পরিণত করা -এ তিনটির সমষ্টির নাম ঈমান। তাছাড়া ঈমান বাড়ে ও কমে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ঈমান বিল-গায়েব অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হেদায়াত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, সে সবগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া। তবে শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। আহ্‌লে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ট দল ঈমানের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। [ইবনে কাসীর]

‘ঈমান বিল গায়েব’ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘গায়েবের বিষয়াদির উপর ঈমান আনার চেয়ে উত্তম ঈমান আর কারও হতে পারে না। তারপর তিনি এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন।’ [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৬০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার সাথে জ্বিহাদ করেছি, আমাদের থেকে উত্তম কি কেউ আছে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “হ্যাঁ, তারা তোমাদের পরে এমন একটি জাতি, যারা আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান আনবে’ [সুনান দারমী: ২/৩০৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৮৫] মূলত: এটি ‘ঈমান বিল গায়েব’ এর একটি উদাহরণ। সাহাবা, তাবে‘য়ীনদের

করে[১] এবং তাদেরকে আমরা যা দান

থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় ঈমান বিল গায়েবের বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, কুরআন। আবার কেউ বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম। [আত-তাফসীরুস সহীহ:৯৯] এ সবগুলোই ঈমান বিল গায়েবের উদাহরণ। ঈমানের ছয়টি রুকন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি ঈমান বিল গায়েবের মূল অংশ।

(১) 'সালাত'-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা বা দো'আ। শরী'আতের পরিভাষায় সে বিশেষ 'ইবাদাত, যা আমাদের নিকট 'নামায' হিসেবে পরিচিত। কুরআনুল কারীমে যতবার সালাতের তাকীদ দেয়া হয়েছে - সাধারণতঃ 'ইকামত' শব্দের দ্বারাই দেয়া হয়েছে। সালাত আদায়ের কথা শুধু দু'এক জায়গায় বলা হয়েছে। এ জন্য 'ইকামাতুস সালাত' (সালাত প্রতিষ্ঠা)-এর মর্ম অনুধাবন করা উচিত। 'ইকামত' এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা। সাধারণতঃ যেসব খুঁটি, দেয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাঁড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশংকা কম থাকে। এজন্য 'ইকামত' স্থায়ী ও স্থিতিশীল অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় 'ইকামাতুস সালাত' অর্থ, নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলী রক্ষা করে সালাত আদায় করা। শুধু সালাত আদায় করাকে 'ইকামাতুস সালাত' বলা হয় না। সালাতের যত গুণাবলী, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কুরআন হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই 'ইকামাতুস সালাত' (সালাত প্রতিষ্ঠা)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, কুরআনুল কারীমে আছে - 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে'। [সূরা আল-আনকাবূত:৪৫] বস্তুত: সালাতের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন সালাত উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ জন্য অনেক সালাত আদায়কারীকে অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা, তারা সালাত আদায় করেছে বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেনি। সুতরাং সালাতকে সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হবে। 'ইক্বামত' অর্থে সালাতে সকল ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বোঝায়। তাছাড়া সময়মত আদায় করা। সালাতের রুকু, সাজদাহ, তিলাওয়াত, খুশু, খুযু ঠিক রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত। [ইবনে কাসীর] ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল প্রভৃতি সকল সালাতের জন্য একই শর্ত। এক কথায় সালাতে অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরী'আতের নিয়মানুযায়ী আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই ইক্বামতে সালাত। তন্মধ্যে রয়েছে - জামা'আতের মাধ্যমে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা। আর তা বাস্তাবায়নের জন্য সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করা। প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার তদারকির ব্যবস্থা করা। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী কল্যাণ-রাষ্ট্রের যে রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন তার মধ্যে সালাত কায়েম করাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীনদের অন্যতম কর্ম বলে ঘোষণা

করেছি তা থেকে ব্যয় করে[১]।

৪. আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে[২], আর যারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী[৩]।

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

করে বলেনঃ “যাদেরকে আমরা যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে।” [সূরা আল-হাজ্জঃ ৪১]

(১) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরয যাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-সদকা প্রভৃতি যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা হয় সে সবকিছুকেই বোঝানো হয়েছে। [তাফসীর তাবারী] কুরআনে সাধারণত ‘ইনফাক’ নফল দান-সদকার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য সেসব ক্ষেত্রে ‘যাকাত’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে গায়েবের উপর ঈমান, এরপর সালাত প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) এখানে মুত্তাকীদের এমন আরও কতিপয় গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে, যাতে ঈমান বিল গায়েব এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের প্রসঙ্গটা আরও একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুমিন ও মুত্তাকী দুই শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন, এক শ্রেণী তারা যারা প্রথমে মুশরিক ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অন্য শ্রেণী হলেন যারা প্রথমে আহ্‌লে-কিতাব ইয়াহূদী-নাসারা ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাই এ আয়াতে কুরআনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার কথাও বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন না কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী ছিলেন, তারা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হবেন। [দেখুন, বুখারী: ৩০১১, মুসলিম: ১৫৪] প্রথমতঃ কুরআনের প্রতি ঈমান এবং আমলের জন্য, দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ঈমান আনার জন্য। তবে পার্থক্য এই যে, সেগুলো সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় হবে, কুরআনের পূর্বে আল্লাহ্ তা‘আলা যেসব কিতাব নাযিল করেছেন, সেগুলো সত্য ও হক এবং সে যুগে এর উপর আমল করা ওয়াজিব ছিল। আর এ যুগে কুরআন নাযিল হবার পর যেহেতু অন্যান্য আসমানী কিতাবের হুকুম-আহ্‌কাম এবং পূর্ববর্তী শরী‘আতসমূহ মনসূখ হয়ে গেছে, তাই এখন আমল একমাত্র কুরআনের আদেশানুযায়ীই করতে হবে। [ইবনে কাসীর থেকে সংক্ষেপিত]

(৩) এ আয়াতে মুত্তাকীগণের আরেকটি গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস বা দৃঢ় প্রত্যয় রাখে। যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য সেগুলোর

মধ্যে এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ঈমান অনুযায়ী আমল করার প্রকৃত প্রেরণা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়। ইসলামী বিশ্বাসগুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস, যা দুনিয়ার রূপই পাল্টে দিয়েছে। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই ওহীর অনুসারীগণ প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যান্য সকল জাতির মোকাবেলায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। পরন্তু তাওহীদ ও রিসালাতের ন্যায় এ আক্বীদাও সমস্ত নবী-রাসূলের শিক্ষা ও সর্বপ্রকার ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যেই সর্বসম্মত বিশ্বাসরূপে চলে আসছে। যেসব লোক জীবন ও এর ভোগ-বিলাসকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে তিক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে করে, আখেরাতের জীবন, সেখানকার হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের এতটুকুও আস্থা নেই, তারা যখন সত্য-মিথ্যা কিংবা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে তাদের জীবনের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে বাধারূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সকল মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করে না, এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে যে কোন দুস্কর্ম থেকে বিরত রাখার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যা কিছু অন্যায়, অসুন্দর বা অসামাজিক জীবনের শান্তি-শৃংখলার পক্ষে ক্ষতিকর, সেসব অনাচার কার্যকরভাবে উৎখাত করার কোন শক্তি কোন আইনেরও নেই, এ কথা পরীক্ষিত সত্য। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দুরাচারের চরিত্রশুদ্ধি ঘটানোও সম্ভব হয় না। অপরাধ যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আইনের শাস্তি সাধারণত তাদের দাঁত-সওয়া হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের সে ভয়ের আওতাও শুধুমাত্র ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যকটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, সেরূপ পরিবেশে এ সমস্ত লোকের পক্ষেও যে কোন গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে কোন বাধাই থাকে না। প্রকারান্তরে আখেরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গর্হিত আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকারভাবে বিরত রাখে। তার অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অম্লান শিখা অবিরাম সমুজ্জ্বল করে দেয় যে, আমি প্রকাশ্যেই থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোন বদ্ধঘরে লুকিয়েই থাকি, মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি, আমার সকল আচরণ, আমার সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিটি আকাংখা পর্যন্ত এক মহাসত্তার সামনে রয়েছে। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টির সামনে কোন কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার নেই। আমার সংগে রয়েছে এমনসব প্রহরী, যারা আমার প্রতিটি আচরণ এবং অভিব্যক্তি প্রতিমুহূর্তেই লিপিবদ্ধ করছেন।

উপরোক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহোত্তম চরিত্রের অগণিত লোক সৃষ্টি হয়েছিলেন, যাদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ দেখেই মানুষ ইসলামের

৫. তারাই তাদের রব-এর নির্দেশিত হেদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম[১]।

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٥

প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ত। এখন লক্ষণীয় আর একটি বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শেষে يُؤْمِنُونَ শব্দ ব্যবহার না করে يُوقِنُونَ ব্যবহার করা হয়েছে। ইয়াক্বীন অর্থ দৃঢ় প্রত্যয়। যার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আখেরাতের প্রতি এমন দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, যে প্রত্যয় স্বচক্ষে দেখা কোন বস্তু সম্পর্কেই হতে পারে। এ দৃঢ় প্রত্যয়ের গুরুত্ব নির্ধারণে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সবর হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক, আর ইয়াক্বীন হচ্ছে পূর্ণ ঈমান" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৬]
মুত্তাকীদের এই গুণ আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান এবং সবকিছুরই একটি পরিপূর্ণ নকশা তার সামনে দৃশ্যমান করে রাখবে। যে ব্যক্তি অন্যের হক নষ্ট করার জন্য মিথ্যা মামলা করে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীত পথে হারাম ধন-দৌলত উপার্জন করে এবং দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শরী'আত বিরোধী কাজ করে, সে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে, প্রকাশ্যে ঈমানের কথা যদি স্বীকার করে এবং শরী'আতের বিচারে তাকে মুমিনও বলা হয়, কিন্তু কুরআন যে ইয়াক্বীনের কথা ঘোষণা করেছে, এমন লোকের মধ্যে সে ইয়াক্বীন থাকতে পারে না। আর সে কুরআনী ইয়াক্বীনই মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে দিতে পারে। আর এর পরিণামেই মুত্তাকীগণকে হেদায়াত এবং সফলতার সে পুরস্কার দেয়া হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, তারাই সরল-সঠিক পথের পথিক, যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে আর তারাই সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছে।

(১) যারা মুত্তাকী তারাই সফলকাম। এখানে মুত্তাকীদের গুণাগুণ বর্ণনা করার পরে হিদায়াতের জন্য তাদেরকে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তারাই তাদের রব-এর দেয়া হিদায়াত পাবে এবং তারাই সফলকাম হবে। আল্লাহ্‌র এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে সৎলোকেরা জান্নাতে স্থান পাবে। বর্তমান জীবনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি, সাফল্য ও ব্যর্থতা আসল মানদণ্ড নয়। বরং আল্লাহ্‌র শেষ বিচারে যে ব্যক্তি উত্‌রে যাবে, সে-ই হচ্ছে সফলকাম। আর সেখানে যে উত্‌রোবে না, সে ব্যর্থ।
সূরা আল-বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কুরআনকে হিদায়াত বা পথপ্রদর্শনের গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ গ্রন্থের হিদায়াতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন এবং যাদেরকে কুরআনের পরিভাষায় মুমিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পনেরটি আয়াতে সে সমস্ত লোকের বিষয় আলোচিত হয়েছে, যারা এ হিদায়াতকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এরা দু'টি দলে বিভক্ত। একদল প্রকাশ্যে কুরআনকে অস্বীকার করে

৬. যারা কুফরী[১] করেছে আপনি | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ

বিরুদ্ধাচারণের পথ অবলম্বন করেছে। কুরআন তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর দল হচ্ছে, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশ্যে অন্তরের ভাব ও বিশ্বাসের কথাটি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, বরং প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে; মুসলিমদের নিকট বলে, আমরা মুসলিম; কুরআনের হিদায়াত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে আছি। অথচ তাদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে কুফর বা অস্বীকৃতি। আবার কাফেরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা তোমাদের দলভুক্ত, তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলিমদের ধোঁকা দেয়ার জন্য এবং তাদের গোপন কথা জানার জন্যই তাদের সাথে মেলামেশা করি। কুরআন তাদেরকে ‘মুনাফিক’ বলে আখ্যায়িত করেছে। এ পনরটি আয়াত যারা কুরআন অমান্য করে তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তন্মধ্যে ৬ ও ৭নং আয়াতে যারা প্রকাশ্যে অস্বীকার করে তাদের কথা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবর্তী তেরটি আয়াতই মুনাফেকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা‘আলা সূরা আল-বাকারার প্রথম বিশটি আয়াতে একদিকে হিদায়াতের উৎসের সন্ধান দিয়ে বলেছেন যে, এর উৎস হচ্ছে তাঁর কিতাব এই কুরআন; অপরদিকে সৃষ্টিজগতকে এ হিদায়াত গ্রহণ করা ও না করার নিরিখে দু‘টি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছেন। যারা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে মু‘মিন-মুত্তাকী বলেছেন, আর যারা অগ্রাহ্য করেছে তাদেরকে কাফের ও মুনাফেক বলেছেন। কুরআনের এ শিক্ষা থেকে একটি মৌলিক জ্ঞাতব্য বিষয় এও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ববাসীকে এমনভাবে দু‘টি ভাগ করা যায়, যা হবে আদর্শভিত্তিক। বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা ও বর্ণ এবং ভৌগলিক বিভক্তি এমন কোন ভেদরেখা নয়, যার ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) কাফের শব্দের অর্থ অস্বীকারকারী, কাফের শব্দটি মুমিন শব্দের বিপরীত। বিভিন্ন কারণে কেউ কাফের হয়, তন্মধ্যে বিশেষ করে ঈমানের ছয়টি রুকনের কোন একটির প্রতি ঈমান না থাকলে সে নিঃসন্দেহে কাফের। এ ছাড়াও ইসলামের আরকানসমূহও যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলেও সে কাফের হবে। অনুরূপভাবে কেউ দ্বীনের এমন কোন আহকামকে অস্বীকার করলেও কাফের বলে বিবেচিত হবে যা দ্বীনের বিধিবিধান বলে সাব্যস্ত হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর আয়াত ও হাদীসসমূহ বিশ্লেষণ করে আমরা কুফরীকে দু’ভাগে ভাগ করতে পারি। বড় কুফর, ছোট কুফর। **প্রথমতঃ** বড় কুফ্‌র। আর তা পাঁচ প্রকারঃ

১) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সাথে সম্পৃক্ত কুফ্‌র। আর তা হল রাসূলগণের মিথ্যাবাদী হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করা। অতএব তারা যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তাতে যে ব্যক্তি তাদেরকে প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে মিথ্যা সাব্যস্ত করল, সে কুফ্‌রী করল। এর দলীল হল আল্লাহ্‌র বাণীঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করে অথবা তার কাছে সত্যের আগমণ হলে তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার

অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামেই কি কাফিরদের আবাস নয়"? [সূরা আল-'আন্‌কাবূতঃ ৬৮]

২) অস্বীকার ও অহংকারের মাধ্যমে কুফ্‌রঃ এটা এভাবে হয় যে, রাসূলের সত্যতা এবং তিনি যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা, কিন্তু অহংকার ও হিংসাবশতঃ তাঁর হুকুম না মানা এবং তাঁর নির্দেশ না শোনা। এর দলীল আল্লাহ্‌র বাণীঃ "যখন আমরা ফেরেশ্‌তাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল"। [সূরা আল-বাকারাহ্‌ঃ ৩৪]

৩) সংশয়-সন্দেহের কুফ্‌রঃ আর তা হল রাসূলগণের সত্যতা এবং তারা যা নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে ইতস্তত করা এবং দৃঢ় বিশ্বাস না রাখা। একে ধারণা সম্পর্কিত কুফ্‌রও বলা হয়। আর ধারণা হল একীন ও দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত। এর দলীল আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ "আর নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না যে, এটি কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত হবে। আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই-ই, তবে আমি তো নিশ্চয়ই এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। তদুত্তরে তার বন্ধু বিতর্কমূলকভাবে জিজ্ঞাসা করতঃ তাকে বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তার পর পূর্ণাঙ্গ করেছেন পুরুষ আকৃতিতে? কিন্তু তিনিই আল্লাহ্‌ আমার রব এবং আমি কাউকেও আমার রবের শরীক করি না"। [সূরা আল-কাহ্‌ফঃ ৩৫-৩৮]

৪) বিমুখ থাকার মাধ্যমে কুফরঃ এদ্বারা উদ্দেশ্য হল দ্বীন থেকে পরিপূর্ণভাবে বিমুখ থাকা এমনভাবে যে, স্বীয় কর্ণ, হৃদয় ও জ্ঞান দ্বারা ঐ আদর্শ থেকে দূরে থাকা যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন। এর দলীল আল্লাহ্‌র বাণীঃ "কিন্তু যারা কুফ্‌রী করেছে তারা সে বিষয় থেকে বিমুখ যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে"। [সূরা আল-আহকাফঃ ৩]

৫) নিফাকের মাধ্যমে কুফ্‌রঃ এদ্বারা বিশ্বাসগত নিফাক বুঝানো উদ্দেশ্য, যেমন ঈমানকে প্রকাশ করে গোপনে কুফর লালন করা। এর দলীল আল্লাহ্‌র বাণীঃ "এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না"। [সূরা আল-মুনাফিকূনঃ ৩]

দ্বিতীয়তঃ ছোট কুফ্‌র,

এ ধরনের কুফরে লিপ্ত ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে না এবং চিরতরে জাহান্নামে অবস্থান করাকেও তা অপরিহার্য করে না। এ কুফরে লিপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শুধু কঠিন শাস্তির ধমক এসেছে। এ প্রকার কুফ্‌র হল নেয়ামত অস্বীকার করা। কুরআন ও সুন্নার মধ্যে বড় কুফর পর্যন্ত পৌঁছে না এ রকম যত কুফরের উল্লেখ এসেছে, তার সবই এ প্রকারের অন্তর্গত। এর উদাহরণের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ "আল্লাহ্‌ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন

তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন[1], | أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ⑥

এমন এক জনপদের যা ছিলো নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে সর্বদিক হতে তার প্রচুর জীবিকা আসত। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে তারা যা করত তজ্জন্য আল্লাহ্ সে জনপদকে আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদন"। [সূরা আন-নাহ্‌লঃ ১১২] এখানে অনুগ্রহ অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়েছে, যা ছোট কুফর। [আল-ওয়াজিবাতুল মুতাহাত্তিমাতু]

(১) আয়াতে ব্যবহৃত 'ইনযার' শব্দের অর্থ, এমন সংবাদ দেয়া যাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। এর বিপরীত শব্দ হলো, 'ইবশার' আর তা এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শুনে আনন্দ লাভ হয়। সাধারণ অর্থে 'ইনযার' বলতে ভয় প্রদর্শন করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে 'ইনযার' বলা হয় না, বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বুঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন। 'নাযীর' বা ভয়-প্রদর্শনকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা অনুগ্রহ করে মানবজাতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এ জন্যই নবী-রাসূলগণকে খাসভাবে 'নাযীর' বলা হয়। কেননা, তারা দয়া ও সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যম্ভাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। নবীগণের জন্য 'নাযীর' শব্দ ব্যবহার করে একদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, যারা দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মমতা ও সমবেদনা সহকারে কথা বলা। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত জেদী-অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে-শুনেও কুফরীর উপর দৃঢ় হয়ে আছে, অথবা অহংকারের বশবর্তী হয়ে কোন সত্য কথা শুনতে কিংবা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেখতেও প্রস্তুত নয়, তাদের পথে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিরামহীন চেষ্টা করেছেন তা ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এদের ব্যাপারে চেষ্টা করা না করা একই কথা।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি তো আখেরাতে হবেই; তবে কোন কোন পাপের আংশিক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়ে থাকে। দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্রবিশেষে নিজের অবস্থা সংশোধন করার সামর্থ্যকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। শুভবুদ্ধি লোপ পায়। মানুষ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর পথে এমন দ্রুততার সাথে এগুতে থাকে; যাতে অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত তাদের অন্তর থেকে দূরে চলে যায়। এ আয়াত থেকে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে কাফেরদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নসীহত করা না করা সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধনের চেষ্টা করার সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই সমগ্র কুরআনে কোন আয়াতেই এসব লোককে ঈমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া নিষেধ করা হয়নি। এতে বুঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজে নিয়োজিত, তা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক, সে এ কাজের সওয়াব পাবেই।

তারা ঈমান আনবে না[১] ।

৭. আল্লাহ্ তাদের হৃদয়সমূহ ও তাদের শ্রবনশক্তির উপর মোহর করে দিয়েছেন[২], এবং তাদের দৃষ্টির উপর

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۡ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۟

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত মানুষই ঈমান আনুক এবং তার অনুসরণ করে হিদায়াত প্রাপ্ত হউক । তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে এটা জানিয়ে দিলেন যে, ঈমান আনা ও হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয় । পূর্বে যার জন্য সৌভাগ্য লিখা হয়েছে সেই ঈমান আনবে । আর যার জন্য দূর্ভাগ্য লিখা হয়েছে সে পথভ্রষ্ট হবে । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এ আয়াতে 'সীলমোহর' বা আবরণ শব্দের দ্বারা এরূপ সংশয় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, যখন আল্লাহ্ই তাদের অন্তরে সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন এবং গ্রহণ-ক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরী করতে বাধ্য । কাজেই তাদের শাস্তি হবে কেন? এর জবাব হচ্ছে যে, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী । যেহেতু বান্দাদের সকল কাজের সৃষ্টি আল্লাহ্ই করেছেন, তিনি এস্থলে সীলমোহরের কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছি । কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে সীলমোহর মারার অর্থ হচ্ছে, যখন তারা উপরের বর্ণিত মৌলিক বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নিজেদের জন্য কুরআনের উপস্থাপিত পথের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নিয়েছিল, তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে ও কানে সীলমোহর মেরে দিয়েছিলেন । এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের কর্ম-কাণ্ডই তাদের হৃদয়সমূহকে সীলমোহর মারার উপযুক্ত করে দিয়েছে । আর এ অর্থই কুরআনের অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, যথাঃ "কখনো নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরিয়েছে" । [সূরা আল-মুতাফ্ফিফীনঃ ১৪] তাতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের মন্দকাজ ও অহংকারই তাদের অন্তরে মরিচা আকার ধারণ করেছে । ইমাম তাবারী বলেন, গোনাহ যখন কোন মনের উপর অনবরত আঘাত করতে থাকে তখন সেটা মনকে বন্ধ করে দেয় । আর যখন সেটা বন্ধ হয়ে যায় তখন সেটার উপর সীলমোহর ও টিকেট এঁটে দেয়া হয় । ফলে তাতে আর ঈমান ঢোকার কোন পথ পায় না । যেমনিভাবে কুফরী থেকে মুক্তিরও কোন সুযোগ থাকে না । আর এটাই হচ্ছে এ আয়াতে বর্ণিত 'خَتَمَ' আর অন্য আয়াতে বর্ণিত 'طَبَعَ' । [ত্বাবারী] হাদীসে এসেছে, 'মানুষ যখন কোন একটি গোনাহ্র কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে । সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ পড়ার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথম অবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে । এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তাওবা না করে, আরও পাপ করতে থাকে, তবে

রয়েছে আবরণ। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

৮. আর[১] মানুষের মধ্যে এমন লোকও

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ

পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতবস্থায় তার অন্তর থেকে ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। [তিরমিযি: ৩৩৩৪, ইবনে মাজাহ: ৪২৪৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফেতনা মনের ওপর বেড়াজালের কাজ করে। ফলে তা অন্তরকে ধাপে ধাপে বিন্দু বিন্দু কালো আস্তরে আবৃত করে দেয়। যে অন্তর ফেতনার প্রভাব অস্বীকার করে, তা অন্তরকে শুভ্র সমুজ্জ্বল করে দেয়। ফলে কোন দিনই ফেতনা তার ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু ফেতনা গ্রহণকারী সেই কালো অন্তরটি উপুড় করা কলসের মত ভালো মন্দ চেনার ও গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়ে।' [মুসলিম: ২৩১] কাতাদাহ বলেন, তাদের উপর শয়তান ভর করেছে ফলে তারা তার অনুসরণ থেকে পিছপা হয় না। আর একারণেই আল্লাহ্ তাদের অন্তর, শ্রবণেন্দ্রিয় ও চোখের উপর পর্দা এঁটে দিয়েছেন। সুতরাং তারা হেদায়াত দেখবে না, শুনবে না, বুঝবে না এবং উপলব্ধি করতে পারবে না। [ইবনে কাসীর] যে ব্যক্তি কখনো দাওয়াতী কাজ করেছেন, তিনি অবশ্যই এ সীলমোহর লাগার অবস্থার ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকবেন। আপনার উপস্থাপিত পথ যাচাই করার পর কোন ব্যক্তি একবার যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে তখন উল্টোপথে তার মন-মানস এমনভাবে দৌড়াতে থাকে যার ফলে আপনার কোন কথা তার আর বোধগম্য হয় না। আপনার দাওয়াতের জন্য তার কান হয়ে যায় বধির। আপনার কার্যপদ্ধতির গুণাবলী দেখার ব্যাপারে তার চোখ হয়ে যায় অন্ধ। তখন সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, সত্যিই তার হৃদয়ের দুয়ারে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

(১) এ আয়াত থেকে পরবর্তী ১৩টি আয়াত মুনাফিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এখানে নিফাক ও মুনাফিকদের সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

নিফাক অর্থঃ প্রকাশ্যে কল্যান ব্যক্ত করা আর গোপনে অকল্যান পোষণ করা। মুনাফেকী দু'প্রকারঃ ১। বিশ্বাসগত মুনাফেকী। ২। আমলগত (কার্যগত) মুনাফেকী। [তাফসীরে ইবনে কাসীর] তন্মধ্যে বিশ্বাসগত মোনাফেকী ছয় প্রকার, এর যে কোন একটা কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে জাহান্নামের সর্বশেষ স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে। ১.রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। ২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার সামান্যতম অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। ৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘৃণা বা অপছন্দ করা। ৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার সামান্যতম অংশকে ঘৃণা বা অপছন্দ করা। ৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনের অবনতিতে খুশী হওয়া। ৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনের জয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া। আর কার্যগত মুনাফেকীঃ এ ধরণের

الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٨

রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছি', অথচ তারা মুমিন নয়।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩

৯. আল্লাহ্ এবং মুমিনদেরকে তারা প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই নিজেরা প্রতারিত করছে, অথচ তারা তা বুঝে না[১]।

মুনাফেকী পাঁচ ভাবে হয়ে থাকেঃ এর প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মুনাফিকের নিদর্শন হলো তিনটিঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে। [বুখারী: ৩৩, মুসলিম: ৫৯] অপর বর্ণনায় এসেছেঃ ঝগড়া করলে অকথ্য গালি দেয়, চুক্তিতে উপনীত হলে তার বিপরীত কাজ করে। [মুসলিম: ৫৮, নাসায়ী: ৫০২০] এ জাতীয় নিফাক দ্বারা ঈমানহারা হয় না ঠিকই কিন্তু এ জাতীয় নিফাক আকীদাগত নিফাকের মাধ্যম। সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হবে এ জাতীয় নিফাক হতে নিজেকে দূরে রাখা। [আল-ওয়াজিবাতুল মুতাহাত্তিমাত]

(১) উপরোক্ত দু'টি আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক লোক আছে, যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়, বরং তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মু'মিনদের সাথে প্রতারণা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেই প্রতারিত করছে না। এতে তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তাদের এ দাবীও মূলতঃ প্রতারণামূলক। এটা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহ্‌কে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না এবং তারাও একথা হয়ত ভাবে না যে, তারা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিতে পারবে, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলিমদের সাথে ধোঁকাবাজি করার জন্যই বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে ধোঁকাবাজি করছে। এসব লোক প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ধোঁকা ও প্রতারণার ঊর্ধ্বে। অনুরূপ তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণও ওহীর বদৌলতে ছিলেন সমস্ত ধোঁকা-প্রতারণা থেকে নিরাপদ। কারও পক্ষে তাদের কোন ক্ষতি করা ছিল অস্বাভাবিক। পরন্তু তাদের এ ধোঁকার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় ক্ষেত্রে তাদেরই উপর পতিত হত। মুনাফিকরা ধারণা করত যে, তারা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। তাদের ধারণা অনুসারে আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, তারা আল্লাহ্ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও অনুরূপ আয়াত এসেছে, "যে দিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সবাইকে, তখন তারা আল্লাহ্‌র কাছে সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের কাছে করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা ভাল কিছুর উপর রয়েছে। সাবধান! তারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ১৮] সুতরাং তাদের ধারণা যে ভুল তা আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করে দিলেন।

১০. তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন[১]। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী[২]।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ রোগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। রোগ সে অবস্থাকেই বলা হয়, যে অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে চলে যায় এবং তাদের কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যার শেষ পরিণাম ধ্বংস ও মৃত্যু। এ আয়াতে তাদের অন্তর্নিহিত কুফরকে রোগ বলা হয়েছে যা আত্মিক ও দৈহিক উভয় বিবেচনায়ই বড় রোগ। রূহানী ব্যাধি তো প্রকাশ্য; কেননা, প্রথমতঃ এ থেকে স্বীয় পালনকর্তার না-শোকরি ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। যাকে কুফর বলা হয়, তা মানবাত্মার জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাধি। মানবসভ্যতার জন্যও অত্যন্ত ঘৃণ্য দোষ। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সত্যকে গোপন করা এবং স্বীয় অন্তরের কথাকে প্রকাশ করার হিম্মত না করা - এ ব্যাপারটিও অন্তরের বড় রোগ। মুনাফেকদের দৈহিক রোগ এজন্য যে, তারা সর্বদাই এ ভয়ের মধ্যে থাকে যে, না জানি কখন কোথায় তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দিনরাত এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকাও একটা মানসিক ও শারীরিক ব্যাধিই বটে। তাছাড়া এর পরিণাম অনিবার্যভাবেই ঝগড়া ও শত্রুতা। কেননা, মুসলিমদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে তারা সবসময়ই হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে, কিন্তু সে হতভাগা নিজের অন্তরের কথাটুকুও প্রকাশ করতে পারে না। ফলে সে শারিরীক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে। "আল্লাহ্ তাদের রোগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন"-এর অর্থ এই যে, তারা যেহেতু তাদের অন্তরকে ব্যাধি দিয়ে কলুষিত করেছে সেহেতু তাদের এ কলুষতা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। এখানে মূলতঃ যা বুঝানো হয়েছে তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা কারও উপর যুলুম করেন না। কেউ খারাপ পথে চলতে না চাইলে তাকে সে পথে জোর করে চলতে বাধ্য করেন না। এ কথা কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও এসেছে। যেমন, সূরা আল-মায়েদার ৪৯, সূরা আল-আন'আমের ১১০, সূরা আত-তাওবাহর ১২৫, সূরা আস্-সফ্ফ -এর ৫নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের খারাপ কর্মকাণ্ডের কারণেই তাদের পরিণতি খারাপ হয়েছে। আর হিদায়াতও নসীব হয়নি।

(২) মুনাফিকদের এমন দু'টি চরিত্র ছিল যে, তারা নিজেরা মিথ্যা বলত, অপরকেও মিথ্যাবাদী বলত। [ইবনে কাসীর] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যায়। এ বদ-অভ্যাসই তাদেরকে কুফর ও নিফাক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এ জন্যই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও নিফাকই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত করে বলেছে, "মূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে

১১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না’[১], তারা বলে, ‘আমরা তো কেবল সংশোধনকারী’[২]।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

বিরত থাক”। [সূরা আল-হাজ্জ:৩০] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা ঈমান দূর করে”। [মুসনাদে আহমাদ: ১/৫]

(১) আবুল আলীয়া বলেন, ‘ফাসাদ সৃষ্টি করো না’ অর্থাৎ যমীনে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ো না। মুনাফিকদের ফাসাদ সৃষ্টির অর্থই হচ্ছে, যমীনের বুকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও অবাধ্যতা অবলম্বন। কেননা, যে কেউ যমীনে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবে, অথবা অবাধ্যতার নির্দেশ দিবে সে অবশ্যই যমীনের বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করল। কারণ, আসমান ও যমীন একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) যেহেতু মুমিনদেরকে মুনাফিকদের মৌখিক ঈমান ধোঁকায় ফেলে, অতএব নিফাকের ফাসাদ সুস্পষ্ট। কেননা, তারা প্রতারণামূলক চটকদার কথা বলে মুমিনদেরকে ভুলিয়ে রাখে এবং মুমিনদের অভ্যন্তরীন কথা নিয়ে কাফের বন্ধুদের বন্ধুত্ব রক্ষা করে। তারা এ ফাসাদকে মীমাংসা মনে করছে। তারা মনে করছে, আমরা মুমিন ও কাফিরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছি যেন উভয় দলের মধ্যে আপোস ও শান্তি বজায় রাখতে পারি। তারা মনে করছে, তারা মুমিন ও আহলে কিতাবদের মধ্যে আপোস-রফা চালাচ্ছে। এর জবাবে আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলছেন যে, মনে রেখ তারা যেটাকে আপোস বা মীমাংসা মনে করছে সেটাই আসলে ফাসাদের মূল সূত্র। কিন্তু তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে সেটাকে ফাসাদ হিসেবেই মনে করছে না। [ইবনে কাসীর] মূলত: মুনাফিকদের স্থায়ী কোন নীতি নেই। সুযোগ বুঝে তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মুনাফিকের উদাহরণ হলো ঐ ছাগীর ন্যায় যা দু’ পাল পাঁঠা ছাগলের মাঝখানে অবস্থান করে। জৈবিক তাড়নায় সে উভয় পালের পাঁঠাদের কাছেই যাতায়াত করে। সে বুঝতে পারে না কার অনুসরণ করা দরকার।” [মুসলিম:২৭৮৪] মোটকথা: মুনাফিক ব্যক্তিত্বহীন। মহান আল্লাহ্‌ মুনাফিকদের এ চরিত্রের কথা ঘোষণা করে বলেন, “তারা দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে!” [সূরা আন-নিসা: ১৪৩] কাতাদাহ বলেন, মুনাফিকের চরিত্র সম্পর্কে অনেকে বলে থাকেন যে, তাদের সবচেয়ে খারাপ চরিত্র হচ্ছে, তারা মুখে যা বলে অন্তরে তা অস্বীকার করে। আর কর্মকাণ্ডে তার বিপরীত করে। এক অবস্থায় সকালে উপনীত হয় তো অন্য অবস্থায় তার সন্ধ্যা হয়। সন্ধ্যা যে অবস্থায় হবে, সকাল হবে তার বিপরীত অবস্থায়। নৌকার মত নড়তে থাকে, যখনই কোন বাতাস জোরে প্রবাহিত হয়, সে বাতাসের সাথে নিজেকে প্রবাহিত করে। [আত-তাফসীরুসসহীহ]

১২. সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝে না[১]।

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে'[২], তারা বলে, 'নির্বোধ লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনবো[৩]?' সাবধান!

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

(১) মুনাফিকরা ফেৎনা-ফাসাদকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে। কুরআন পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও মীমাংসা মৌখিক দাবীর উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় কোন চোর বা ডাকাতও নিজেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজি নয়। এ ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আচরণ যদি ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুফ্সিদই বলতে হবে। চাই একাজে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য হোক বা না'ই হোক।

(২) এ আয়াতে মুনাফেকদের সামনে সত্যিকারের ঈমানের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, 'অন্যান্য লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন'। এখানে 'নাস' শব্দের দ্বারা সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন নাযিলের যুগে তারাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য। যে বিষয়ে তারা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন অনুরূপ ঈমান যদি অন্যরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয়। এতে বোঝা গেল যে, সাহাবীগণের সমষ্টিগত ঈমানই ঈমানের কষ্টিপাথর। তাদের অনুসরণ করেই পরবর্তীরা ঈমানের অধিকারী হয়েছিলেন। সাহাবাদের ঈমানের মূলমন্ত্র ছিল আল্লাহ, ফেরেশ্তা, কিতাব, রাসূল, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য। সুতরাং তাদের মত ঈমানই সবার মধ্যে পাওয়া যেতে হবে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

(৩) সে যুগের মুনাফেকরা সাহাবীগণকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুতঃ এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা ভ্রষ্টকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারনতঃ বোকা, অশিক্ষিত, মূর্খ প্রভৃতি আখ্যাই জুটে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি। তাদের বোকামীর কারণেই তারা যে কঠিন মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত

নিশ্চয় এরা নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না।

১৪. আর যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'[১], আর যখন তারা একান্তে তাদের শয়তানদের[২] সাথে একত্রিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾

১৫. আল্লাহ্ তাদের সাথে উপহাস করেন[৩],

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

সেটা বুঝতেই পারছে না। নিঃসন্দেহে বোকামী ও মূর্খতা যারা বুঝতেই পারে না তারা সবচেয়ে বড় বোকা। [ইবনে কাসীর]

(১) এ আয়াতে মুনাফেকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যখন মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা মুসলিম হয়েছি; ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের মুনাফিক কিংবা কাফের-মুশরিক ও আহলে কিতাব অথবা তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, মুসলিমদের সাথে উপহাস করার উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে বোকা বানাবার জন্য মিশেছি। [ইবনে কাসীর]

(২) আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী, দাম্ভিক ও স্বৈরাচারীকে শয়তান বলা হয়। মানুষ ও জ্বিন উভয়ের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কুরআনের অধিকাংশ জায়গায় এ শব্দটি জ্বিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও কোন কোন জায়গায় আবার শয়তান প্রকৃতির মানুষদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শয়তান শব্দটিকে বহুবচনে 'শায়াতীন' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে শায়াতীন বলতে মুশরিকদের বড় বড় সর্দারদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ সর্দাররা তখন ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

(৩) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে বদলা নেয়ার জন্য তাদের সাথে উপহাস করেছেন'। কাফেরদের ঠাট্টা বা উপহাসের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাদের সাথে উপহাস বা ঠাট্টা করা দোষণীয় কিছু নয়। বরং এটা আল্লাহ্র এমন এক কর্মবাচক গুণ যা হওয়া জরুরী। কেননা, আল্লাহ্র দিকে সম্পৃক্ত করার দিক থেকে বিভিন্ন গুণাগুণ চার প্রকারঃ

১) এমন কিছু গুণ রয়েছে, যেগুলো গুণ হিসেবে পরিপূর্ণ ও উত্তম তবে কখনো কখনো এগুলো থেকে মন্দ অর্থও বুঝা যায়। এরূপ গুণসমূহ থেকে আল্লাহ্র নাম

يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

১৬. এরাই তারা, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনেছে[১]। কাজেই

গ্রহণ করা যাবে না। বরং গুণ হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। যেমন, 'কালামুল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌র কথাবার্তা), 'ইরাদা' (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা) এগুলো আল্লাহ্‌র গুণ হিসেবে ব্যবহার হবে অর্থাৎ গুণ হিসেবে তাঁকে 'মুতাকাল্লেম' ও 'মুরীদ' বলা যাবে। কিন্তু এগুলো থেকে আল্লাহ্‌র নাম গ্রহণ করে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে 'মুতাকাল্লেম' ও 'মুরীদ' নাম দেয়া যাবে না। কেননা, কথাবার্তায় ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ইনসাফ-যুলুম সবকিছুই থাকে। ইচ্ছাও তদ্রূপ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাউকে আব্দুল মুতাকাল্লেম বা আব্দুল মুরীদ বলা যাবে না এবং আল্লাহ্‌কে ডাকার জন্য 'ইয়া মুতাকাল্লেম!' 'ইয়া মুরীদ!' বলা যাবে না।

২) এমনকিছু গুণ রয়েছে যেগুলো পুরোপুরিভাবেই উত্তম গুণ। সেগুলো কোন মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এগুলো গুণ হিসেবে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনিভাবে এগুলো থেকে নামও গ্রহণ করা যাবে আর আল্লাহ্‌র অধিকাংশ নামও এ ধরণের গুণসমৃদ্ধ। যেমন, রাহমান, রাহীম, সামী', বাছীর ইত্যাদি। এগুলো থেকে তাঁর নাম সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর জন্য দয়া, করুণা, শুনা ও দেখার গুণসমূহও সাব্যস্ত হবে।

৩) এমনকিছু গুণ রয়েছে যেগুলো সাধারণতঃ উত্তম গুণ নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তা উত্তম গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এগুলো বিশেষ বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতেই শুধু আল্লাহ্‌র গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন, ধোঁকা, কারসাজি, ঠাট্টা, কৌশল ইত্যাদি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার করে বলা যাবে না যে, আল্লাহ্‌ ধোঁকা দেন, ঠাট্টা করেন ইত্যাদি। কিন্তু এভাবে বলা যাবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যারা তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করে, ধোঁকাবাজি করে তাদের সাথে ঠাট্টা করেন, ধোঁকা দেন। এর দ্বারা আল্লাহ্‌র কোন অসম্মান বুঝা যায় না।

৪) এমনকিছু গুণ রয়েছে যেগুলো কোন অবস্থাতেই উত্তমগুণ নয়। যেমন, অপারগতা, দুর্বলতা, অন্ধত্ব, বধিরতা ইত্যাদি। এ জাতীয় গুণাবলী আল্লাহ্‌র জন্য কোন অবস্থাতেই সাব্যস্ত করা যাবে না।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, যারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা আল্লাহ্‌র উত্তম গুণের অন্তর্ভুক্ত। [মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উসাইমীন: আল-কাওলুল মুফীদ]

(১) ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ বলেন, হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কেনার অর্থ, হিদায়াত ত্যাগ করে ভ্রষ্টতা গ্রহণ করা। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, তারা ঈমান

তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি । আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্তও নয় ।

১৭. তাদের উপমা[১], ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো; তারপর যখন আগুন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ্

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَاۤءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ

এনেছে তারপর কুফরী করেছে । কাতাদাহ বলেন, তারা হিদায়াতের উপর ভ্রষ্টতাকে পছন্দ করে নিয়েছে । এর সমর্থনে অন্য আয়াতে এসেছে, "আর সামূদ সম্প্রদায়, আমরা তাদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধপথে চলা পছন্দ করেছিল" । [সূরা ফুসসিলাত: ১৭] মোটকথা: তারা হিদায়াত বিমুখ হয়ে ভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করেছে । [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে মুনাফেকদের সম্পর্কে দু'টো উপমা দিয়েছেন । ইবনে কাসীর বলেন, দু'টি উপমা দু'ধরনের মুনাফিকদের জন্য দেয়া হয়েছে । প্রথম উপমার মর্মার্থ হলোঃ মুনাফেকরা হলো এমন ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি অন্ধকারে থাকার কারণে অনেক কষ্টে আগুন জ্বালিয়েছে, যার আলোতে সে ভাল-মন্দ চিনতে পেরেছে । এবং আশা করছে যে, সে এ আলো তার জন্য স্থায়ী হবে । ইত্যবসরে আল্লাহ্ তার কাছ থেকে সে আলো নিয়ে গেলেন । ফলে সে অন্ধকারে হিমশিম খেতে লাগল । যতটুকু আলো পেয়েছিল তাও চলে গেল, কিন্তু রয়ে গেল কষ্টদায়ক আগুন । এতে সে কয়েক ধরণের অন্ধকারে পতিত হলো- রাতের অন্ধকার, মেঘের অন্ধকার, বৃষ্টির অন্ধকার ও আলোর পরে হঠাৎ করে সৃষ্ট অন্ধকার । অনুরূপভাবে মুনাফেকদের অবস্থা হলো -তারা ঈমানদার থেকে ঈমানের আলো পেয়েছে । তাদের কাছে সে আলোর লেশমাত্রও ছিল না । তারপর যখন তারা সাময়িকভাবে এর দ্বারা আলোকিত ও উপকৃত হলো, পার্থিব জীবনে হত্যা থেকে নিস্কৃতি পেল, সম্পদ রক্ষা পেল ও সাময়িক নিরাপত্তা লাভ করলো । ইত্যবসরে তাদের উপর মৃত্যু এসে পড়ল । ফলে তারা সে আলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হলো । তাদের উপর আপতিত হলো যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা, চিন্তা ও শাস্তি । এতে করে সে কয়েক ধরণের অন্ধকারে পতিত হলো- কবরের অন্ধকার, কুফরীর অন্ধকার, নিফাকের অন্ধকার, গোনাহ্র অন্ধকার সর্বোপরি জাহান্নামের অন্ধকার । যে অন্ধকার থেকে তার কোন মুক্তি নেই । [তাফসীর আস-সা'দী]

'আতা বলেন, এ আয়াতাংশ মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত । তারা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে ভালো মন্দ দেখে ও চিনে বটে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা তা কবুল করতে পারে না । ইবনে যায়েদ বলেন, তারা যখন ঈমান আনল, তাদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বলল, যেভাবে আগুন জ্বালালে চারদিক আলোকিত হয় ঠিক সেভাবে । এরপর যখন তারা কাফের হয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঈমানের নূর বিলুপ্ত করে দিলেন, যেখানে আগুন নিভে গেলে আলো চলে যায় । ফলে তারা অন্ধকারে ডুবে গিয়ে কিছুই দেখতে পেল না । [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾

তখন তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, যাতে তারা কিছুই দেখতে পায়না ।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. তারা বধির, বোবা, অন্ধ, কাজেই তারা ফিরে আসবে না[১] ।

اَوْ كَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِیْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ۚ یَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِیْۤ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ

১৯. কিংবা আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায়, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি[২] ও বিদ্যুৎ চমক । বজ্রধ্বনিতে

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ, তারা হেদায়াত শুনতে পায় না, দেখতে পায় না এবং তা বোঝতেও পারে না । অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা কল্যাণ শুনতে পায় না, দেখতে পায় না এবং বোঝতেও পারে না । সুতরাং তারা হেদায়াতের দিকে ফিরে আসবে না, কল্যাণের দিকেও নয় । ফলে তারা যেটার উপর রয়েছে সেটার উপরই থাকবে । সুতরাং নাজাত বা মুক্তি তাদের নসীবে জুটবে না । কাতাদাহ বলেন, তারা তাওবাহ করবে না এবং উপদেশও গ্রহণ করবে না । [আত-তাফসীরুস সহীহ]
আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তারা বধির, বোবা ও অন্ধ । কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অন্যত্র স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের বধির, বোবা ও অন্ধ হওয়ার অর্থ তারা তাদের এ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে না । মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা তাদেরকে দিয়েছিলাম কান, চোখ ও হৃদয়; অতঃপর তাদের কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; যখন তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল । আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল" [সূরা আল-আহকাফ: ২৬] [আদওয়াউল বয়ান]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়াহূদীরা জিজ্ঞেস করলো যে رَعْدٌ কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহ্র ফেরেশতাদের মধ্য হতে এক ফেরেশতা । যাকে মেঘ-মালা সঞ্চালনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । তার হাতে আগুনের চাবুক । সে এটা দিয়ে মেঘকে যেখানে আল্লাহর নির্দেশ হয় সেখানে ধমকিয়ে ও হাঁকিয়ে নিয়ে যায় । তারা বলল, তাহলে যে আওয়াজ শুনা যায় সেটা কি? তিনি বললেন, সেটা তার গর্জন । তারা বলল: আপনি সত্য বলেছেন । [তিরমিযী: ৩১১৭, মুসনাদে আহমাদ: ১/২৭৪]
ইবনে কাসীর বলেন, আয়াতে ظُلُمَاتٌ বা 'অন্ধকার' বলে তাদের সংশয়, অবিশ্বাস, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও নিফাক বোঝানো হয়েছে । আর رَعْدٌ বা বজ্রধ্বনি বলে এমন গর্জন বোঝানো হয়েছে, যা তাদের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক করে । মুনাফিকদের জন্য তা অত্যধিক শংকাগ্রস্ত ও কম্পন সৃষ্টিকারী । যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তারা যে কোন আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে"[সূরা আল-মুনাফিকুন: ৪]

حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ ۢبِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

মৃত্যুভয়ে তারা তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। আর আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন(১)।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ۭ كُلَّمَآ اَضَاۗءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ڎ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

২০. বিদ্যুৎ চমকে তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়(২)। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তখনই তারা পথ চলে এবং যখন অন্ধকারে ঢেকে যায় তখন তারা থম্‌কে দাঁড়ায়(৩)। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে

অন্যত্র বলেন, "ওরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, ওরা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ওরা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুত ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভয় করে থাকে। ওরা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পেলে ওদিকেই দ্রুত পালিয়ে যাবে।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৫৬-৫৭]

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্ কাফেরদের উপর আযাব নাযিল করবেন। সে জন্য তারা তার বেষ্টনী থেকে বের হতে পারবে না। মুজাহিদ বলেন, বেষ্টন করার অর্থ, তিনি তাদেরকে (কিয়ামতের দিন) একত্রিত করবেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবনে কাসীর বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাফের-মুনাফিকদের সকল দিক থেকেই ঘিরে রেখেছেন। তাঁর অসীম ক্ষমতা ও ইচ্ছার বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, "আপনার কাছে কি পৌঁছেছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত--- ফির'আউন ও সামূদের? তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত; আর আল্লাহ্ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।" [সূরা আল-বুরুজ: ১৭-২০]

(২) ইবনে আব্বাস বলেন, এখানে بَرْقٌ বলে, কুরআনের অকাট্য আয়াতগুলোকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের অকাট্য আয়াতগুলো বা হকের তীব্র আলো যেন মুনাফিকদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে চায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফেকদের সম্পর্কে যে উপমা দিচ্ছেন তার মর্মার্থ হলো- এমন ব্যক্তির উদাহরণ যে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের মধ্যে পথ অতিক্রম করছে, যাতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের অন্ধকার। রাতের আঁধার, মেঘের আঁধার এবং বৃষ্টির আঁধার। আরও রয়েছে তাতে বিকট শব্দসম্পন্ন বজ্র, বিদ্যুত চমক। এ ভীষণ অন্ধাকারে যখন বিদ্যুত চমকায় তখন সে সামনে এগোয়, আবার যখন অন্ধকারে চেয়ে যায় তখন সে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। মুনাফেকদেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থা, যখন তারা কুরআনের আদেশ-নিষেধ, পুরস্কার ও শাস্তির কথা শোনে তখন তারা নিজেদের কানে আঙুল দেয়। কুরআনের আদেশ-নিষেধ, পুরস্কার–শাস্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কারণ এগুলো তাকে বিব্রত করে। তারা এগুলোকে এমনভাবে অপছন্দ করে যেমনিভাবে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে বজ্রের শব্দকে

তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান[১]।

অপছন্দ করে কানে আঙুল দিত। কিন্তু মুনাফেকরা যত বিব্রতই হোক তারা কোনভাবেই নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা ও শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন। তারা কোনভাবেই তাঁর হাত থেকে নিস্কৃতি পাবে না বা তাঁকে অপারগও করে দিতে পারবে না। বরং আল্লাহ্ তাদের কর্মকাণ্ডের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব করে সে অনুসারে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। [তাফসীর আস-সা'দী]
ইবনে কাসীর বলেন, এই দ্বিতীয় উপমা সেই মুনাফিকদের জন্য যাদের কাছে সত্য কখনো কখনো প্রকাশ হয়ে পড়ে। আবার কখনো তারা সন্দেহে পতিত হয়। সন্দেহের সময় তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বৃষ্টির মত। এই বৃষ্টি এখানে অন্ধকার অবস্থায়ই বর্ষিত হয়। সে অন্ধকার হচ্ছে, সংশয়, অবিশ্বাস ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তদুপরি তারা থাকে সীমাহীন ভীতিপ্রদ অবস্থায়। সুতরাং সত্য যখন সে চিনতে পায়, তখন সে তা নিয়ে সে কথা বলে এবং এর অনুসরণও করে, কিন্তু যখন তাদের দোদুল্য মন কুফরের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কেয়ামতের দিনেও তাদের অবস্থা হবে এই যে, যখন লোকদেরকে তাদের ঈমান অনুযায়ী নূর দেয়া হবে, কেউ পাবে বহু মাইল পর্যন্ত, আবার কেউ কেউ তার চেয়েও বেশী, কেউ তার চেয়ে কম, এমনকি শেষ পর্যন্ত কেউ এতটুকু পাবে যে, কিছুক্ষণ আলোকিত হয়ে আবার তা অন্ধকার হয়ে যাবে। কিছু লোক এমনও হবে যে, তারা একটু গিয়েই থেমে যাবে, আবার কিছু দূর পর্যন্ত আলো পাবে, আবার তা নিবে যাবে। আবার এমন কিছু লোকও হবে যাদের আলো সম্পূর্ণভাবে নিভে যাবে। এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুনাফিক, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন, "সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের নূরের কিছু গ্রহণ করতে পারি।' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও নূরের সন্ধান কর"। [সূরা আল-হাদীদঃ ১৩]

(১) উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে, পবিত্র কুরআনের প্রথম থেকে এ পযন্ত মানুষকে কয়েক শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছে। এক. খাঁটি মুমিন। সূরা আল-বাকারার প্রথম চার আয়াতে তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। দুই. খাঁটি কাফের। তাদের বর্ণনা পরবর্তী দুই আয়াতে প্রদত্ত হয়েছে। তিন. মুনাফিক, যারা আবার দুশ্রেণীর। প্রথম. খাঁটি মুনাফেক। আগুন জ্বালানোর উপমা দিয়ে তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়. সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান মুনাফিক। তারা কখনো ঈমানের আলোকে আলোকিত হয়, কখনো কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। বজ্র ও বিদ্যুতের উদাহরণ পেশ করে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম দলের অবস্থা থেকে তাদের মুনাফেকী একটু নরম। এ বর্ণনার সাথে সূরা আন-নূরের ৩৫ নং আয়াতের বর্ণনার কোন কোন দিকের মিল রয়েছে।[ইবনে কাসীর]

২১. হে মানুষ[১]! তোমরা তোমাদের সেই রব-এর[২] 'ইবাদাত কর যিনি

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

এর মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুমিনরা দু'ভাগে বিভক্ত। এক. সাবেকুন বা মুকাররাবুন, দুই. আসহাবুল ইয়ামীন, আবরার বা সাধারণ মুমিন। আর কাফেররা দু'ভাগে বিভক্ত: এক. অনুসৃত, বা কুফরির দিকে আহ্বানকারী কাফের দল, দুই. অনুসারী বা অনুসরণকারী সাধারণ কাফেররা। অনুরূপভাবে মুনাফিকদেরও শ্রেণী দু'টি। প্রথম শ্রেণীর মুনাফিক হচ্ছে সেসব কট্টর মুনাফিক যাদের অন্তরে ঈমানের লেশমাত্র নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনাফিকের অন্তরে ঈমানের কিছু থাকলেও নিফাকের সব চরিত্র তাদের মধ্যে বিদ্যমান। [ইবনে কাসীর]

(১) আয়াতে উল্লেখিত 'নাস' আরবী ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের মুমিন-কাফির ও মুনাফিক এ তিন শ্রেণীই এ আহ্বানের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, 'তোমাদের রব-এর 'ইবাদাত কর'। 'ইবাদাতের আভিধানিক অর্থ নম্র ও অনুগত হওয়া। আর শরী'আতের পরিভাষায় 'ইবাদাত হচ্ছেঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন এমন সব প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজের ব্যাপক একটি নাম'। এ সমস্ত কথা ও কাজ পরিপূর্ণ ভালবাসা ও পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে আল্লাহ্র জন্য আদায় করলেই তা আমাদের পক্ষ থেকে 'ইবাদাত বলে গণ্য হবে। সুতরাং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সেসব কাজ বা কথা ভালবাসেন তার বাইরে কোন কিছুর মাধ্যমে আমরা তাঁর 'ইবাদাত করতে পারব না। ইবাদাতের ভিত্তি তিনটি রুকনের উপর স্থাপিত। এক. আল্লাহ্ তা'আলার জন্য পরিপূর্ণ ভালবাসা পোষণ করা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্কে সর্বাধিক ভালবাসে"। [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৬৫] দুই. পরিপূর্ণ আশা পোষণ করা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "এবং তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে"। [সূরা আল-ইসরাঃ ৫৭] তিন. আল্লাহ্কে পরিপূর্ণভাবে ভয় করা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "এবং তারা তাঁর শাস্তিকে ভয় করে"। [সূরা আল-ইসরাঃ ৫৭]

(২) এ ক্ষেত্রে 'রব' শব্দের পরিবর্তে 'আল্লাহ্' বা তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্য থেকে অন্য যেকোন একটা ব্যবহার করা যেতে পারত, কিন্তু তা না করে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, এখানে দাবীর সাথে দলীলও পেশ করা হয়েছে। কেননা, 'ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুনান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকার সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন। মানুষ যত মূর্খই হোক এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পালনের সকল দায়িত্ব নেয়া আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর সাথে সাথে এ কথাও উপলব্ধি করতে পারবে যে মানুষকে অগণিত এ নেয়ামত না পাথর-নির্মিত কোন মূর্তি

তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন(১), যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও(২) ।

২২. যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে করেছেন ছাদ এবং

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ

দান করেছে, না অন্য কোন শক্তি । আর তারা করবেই বা কিরূপে? তারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বা বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার মুখাপেক্ষী । যে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে? যদি কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্রকৃতপ্রস্তাবে সে সত্তার ব্যবস্থাপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয় । এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার ‘ইবাদাতের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা আদৌ ‘ইবাদাতের যোগ্য নয় ।

(১) এ আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম নির্দেশ, আর সে নির্দেশই হচ্ছে তাওহীদের । ইসলামের মৌলিক আক্বীদা তাওহীদ বিশ্বাস । যা মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায় । এটি মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং সকল দুঃখ-দুর্বিপাকের মর্মসাথী ।

তাওহীদ শব্দটি মাসদার বা মূলধাতু । যার অর্থ- কোন কিছুকে এক বলে জানা এবং ঘোষণা করা । সে অনুসারে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ অর্থ- আল্লাহ্‌ যে এক তা ঘোষণা করা । শরী‘আতের পরিভাষায় তাওহীদ বলতে বুঝায় একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্‌ই একমাত্র মা‘বুদ । তাঁর কোন শরীক নাই । তাঁর কোন সমকক্ষ নাই । একমাত্র তাঁর দিকেই যাবতীয় ‘ইবাদাতকে সুনির্দিষ্ট করা । তাঁর যাবতীয় সুন্দর নাম ও গুণাবলী আছে বলে বিশ্বাস করা । এতে বুঝা গেল যে, তাওহীদ হলো আল্লাহ্‌কে রবুবিয়াত তথা প্রভূত্বে, তাঁর সত্তায়, নাম ও গুণে এবং ‘ইবাদাতের ক্ষেত্রে একক সত্তা বলে স্বীকৃতি দেয়া । তাই এ তাওহীদ বিশুদ্ধ হতে হলে এর মধ্যে তিনটি অংশ অবশ্যই থাকতে হবে - (১) আল্লাহ্‌র প্রভূত্বে ঈমান ও সে অনুসারে চলা । যা ‘তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ’ নামে খ্যাত । (২) আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীতে ঈমান আর সেগুলো তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা । যাকে ‘তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত’ বলা হয় । আর (৩) যাবতীয় ‘ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট করা । যাকে ‘তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ’ও বলা হয় । এ তিন অংশের কোন অংশ বাদ পড়লে তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা হবে না এবং দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি পাবে না ।

(২) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাত করলেই তাকওয়ার অধিকারী হওয়া যাবে নতুবা নয় । যাদের কর্মকাণ্ডে শির্ক রয়েছে, তারা যত পরহেযগারী বা যত আমলই করুক না কেন তারা কখনো মুত্তাকী হতে পারবে না । তাই জীবনের যাবতীয় ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য খালেসভাবে করতে হবে । এটা জানার জন্য ইবাদাত ও শির্ক সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে । যার আলোচনা সামনে আসবে ।

مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। কাজেই তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ[১]

(১) আয়াতে উল্লেখিত أنداد শব্দটি ند এর বহুবচন। যার অর্থ সমকক্ষ স্থির করা। এখানে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ সমকক্ষ স্থির করাটাই শির্ক। আর শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গোনাহ্। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ 'আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ্ কোনটি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, অথচ তিনি সৃষ্টি করেছেন...। [বুখারীঃ ৪৪৭৭]

শির্কের প্রকারভেদঃ শির্ক দু'প্রকার, যথা- বড় শির্ক ও ছোট শির্ক।

বড় শির্ক আবার দু'প্রকার। আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত তথা প্রভূত্বে শির্ক করা। আল্লাহ্‌র উলুহিয়্যাত তথা 'ইবাদাতে শির্ক করা।

আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত বা প্রভূত্বে শির্ক দু'ভাবে হয়ে থাকে -

১) জগতের রব বা পালনকর্তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার না করা যেমন কম্যুনিষ্ট, নাস্তিক, মুলহিদ ইত্যাদি সম্প্রদায়। আল্লাহ্‌র নাম, গুণ ও কর্মকাণ্ডকে স্বীকার না করা, যেমন- ঈসমা'ঈলী সম্প্রদায়, বাহাই সম্প্রদায়, বুহরা সম্প্রদায়, জাহমিয়া ও মু'তাজিলা সমপ্রদায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে পার্থক্য না করে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে এক করে দেখা যেমন ওয়াহদাতুল অজুদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, যারা মনে করে যে, আল্লাহ্ কোন কিছুর সূরত ইখতিয়ার করে তাতে নিজেকে প্রকাশ করেন যেমন, হুলুলী সম্প্রদায় এবং যারা বিশ্বাস করে যে, কারো পক্ষে আল্লাহ্‌র সাথে একাকার হয়ে যাওয়া সম্ভব।

২) জগতের রব বা পালনকর্তা আল্লাহ্‌র সত্তা, নাম, গুণাবলী ও তাঁর কর্মকাণ্ডে কাউকে সমকক্ষ নির্ধারণ করা।

ক) আল্লাহ্‌র স্বত্ত্বার সমকক্ষ কোন সত্তা নির্ধারণ করার মত কোন শির্ক বনী আদমের মধ্যে বিরল। এ ধরণের দাবী প্রথম নমরূদ করেছিল, কিন্তু ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে বিতর্কে সে তার সে দাবীর সপক্ষে যুক্তি দেখাতে ব্যর্থ হয়ে হেরে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে ফির'আউনও প্রকাশ্যে এ ধরণের দাবী করেছিল। আল্লাহ্ তাকে স্বপরিবারে দলবলসহ ধ্বংস করে তার দাবীর অসারতা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

খ) আল্লাহ্‌র নামসমূহের কোন নাম অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করার মত শির্ক বিভিন্ন জাতিতে বিদ্যমান। যারাই তাদের উপাস্যদেরকে আল্লাহ্‌র নামের মত নাম দেয় তারাই এ ধরণের শির্কে লিপ্ত। যেমন হিন্দুগণ তাদের বিভিন্ন অবতারকে আল্লাহ্‌র নামসমূহের মত নাম দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কোন কোন বাতেনী গ্রুপের লোকেরা যেমন, দ্রুজ সম্প্রদায়, নুসাইরী সম্প্রদায়, আগাখানী ঈসমাঈলী সম্প্রদায় তাদের ঈমামদেরকে আল্লাহ্‌র নামসমূহে অভিহিত করে।

গ) আল্লাহ্‌র গুণ ও কর্মকাণ্ডকে অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা। আল্লাহ্‌র গুণ ও কর্মকাণ্ডের কোন শেষ নেই। সেগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। আল্লাহ্‌র অপার শক্তির সাথে সম্পৃক্ত, তাঁর জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত এবং হুকুম ও শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত।

১. আল্লাহ্‌র অপার শক্তির সাথে যারা শির্ক করে তাদের উদাহরণ হলো, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি, মৃত্যু, জীবন, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার, উদ্দেশ্য হাসিলকারী বলে বিশ্বাস করে। যেমন, অনেক অজ্ঞ মূর্খ মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, অনেক সুফীরা তাদের পীর সাহেব সম্পর্কে বিশ্বাস করে থাকে। অনুরূপভাবে অনেকে কবরবাসী কোন লোক সম্পর্কে এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। তদ্রূপ অনেকে জাদুকর জাতীয় লোকদের সম্পর্কেও এ ধরণের বিশ্বাস করে। অনুরূপভাবে শি'য়া সম্প্রদায়ও তাদের ইমামদের ব্যাপারে এ ধরণের বিশ্বাস করে।

২. আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাথে যারা শির্ক করে থাকে তাদের উদাহরণ হলো, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করে। যেমন, অনেক অজ্ঞ মূর্খ মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, অনেক সুফীরা তাদের পীর সাহেব সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে তারা গায়েব জানে। আবার অনেকে কবরবাসী কোন কোন লোক সম্পর্কে এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। তদ্রূপ অনেকে গণক, জ্যোতিষ, জ্বিন, প্রেতাত্মা, ইত্যাদীতে বিশ্বাস করে যে, তারাও গায়েব জানে। অনুরূপভাবে শি'য়া সম্প্রদায়ও তাদের ইমামদের ব্যাপারে বিশ্বাস করে যে, তারা গায়েব জানতো।

৩. আল্লাহ্‌র শরী'আত ও হুকুমের সাথে যারা শির্ক করে থাকে তাদের উদাহরণ হলো, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহ্‌র মত শরী'আত প্রবর্তনের অধিকার তাদের আলেম ও শাসকদের দিয়ে থাকে। যেমন, ঐ সমস্ত জাতি যারা সরকার বা পার্লামেন্টকে আল্লাহ্‌র আইন বিরোধী আইন রচনার অনুমতি দিয়েছে। অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ্‌র আইন পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য আইনে বিচার করা শ্রেয় বা জায়েয বা আল্লাহ্‌র আইন ও অন্যান্য আইন সমমানের মনে করে থাকে। শির্কের এ সমস্ত প্রকার আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত তথা প্রভূত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ্‌র ইবাদাতে শির্কঃ আল্লাহ্‌র ইবাদাতে শির্ক বলতে বুঝায়, আল্লাহ্ যা কিছু ভালবাসেন সন্তুষ্ট হন বান্দার এমন সব কথা ও কাজ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা। যেমন আল্লাহ্ তাঁর কাছে দো'আ করা ভালবাসেন, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া ভালবাসেন, তাঁর কাছে উদ্ধার কামনা ভালবাসেন, তাঁর কাছে পরিপূর্ণভাবে বিনয়ী হওয়া ভালবাসেন, তাঁর জন্যই সিজ্‌দা, রুকু,

দাঁড় করিও না ।

২৩. আর আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর[১] এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষী-সাহায্যকারীকে[২] আহ্বান কর, যদি

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٣﴾

সালাত, যবেহ, মানত ইত্যাদী ভালবাসেন । এর কোন কিছু যদি কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করে তবে তা হবে আল্লাহ্র ইবাদাতে শির্ক । অনুরূপভাবে কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্র মত ভালবাসলে, অন্য কারো কাছে পরিপূর্ণ আশা করলে, অন্য কাউকে গোপন ভয় করলেও তা শির্ক হিসাবে গণ্য হবে । যেহেতু বান্দার ইবাদাতসমূহ বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে, সে হিসাবে ইবাদতের মধ্যেও এ তিন ধরণের শির্ক পাওয়া যায় । অর্থাৎ কখনো কখনো ইবাদত হয় মনের ইচ্ছার মাধ্যমে, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, আবার কখনো কখনো তা সংঘটিত হয় বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে । আবার কখনো কখনো তা সংঘটিত হয়ে থাকে কথাবার্তার মাধ্যমে ।

দ্বিতীয় প্রকার শির্ক হলোঃ ছোট শির্ক, কিন্তু তা'ও কবীরাগুনাহ হতে মারাত্মক । ছোট শির্কের উদাহরণ হলো, এ প্রকার বলা যে, কুকুর না ডাকলে চোর আসত, আপনি ও আল্লাহ্ যা চান, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা, সামান্য লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করা । ইত্যাদি । [ইবনুল কাইয়্যেম, 'আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা 'আনিদ দাওয়ায়িশ শাফী'; শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান আত-তামীমী, আল-ওয়াজিবুল মুতাহাত্তিমাতুল মা'রিফাহ'; আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস' গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত]

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছিল । আর এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে নবুওয়ত ও রিসালাতের সত্যতা সাব্যস্ত করা হচ্ছে । [ইবনে কাসীর]

(২) شُهَدَاء শব্দের ব্যাখ্যা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতে, أَعْوَانُكُمْ বা সাহায্যকারীগণ । অর্থাৎ এমন সম্প্রদায় আহ্বান কর যারা তোমাদেরকে এ ব্যপারে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে । আবু মালেক বলেন, এর অর্থ, شُرَكَاءَكُمْ তোমাদের অংশীদারদেরকে বা যাদেরকে তোমরা আমার সাথে শরীক করছ সে শরীকদেরকে আহ্বান করে দেখ তারা কি এর অনুরূপ কোন সূরা আনতে পারে কি না? মুজাহিদ বলেন, شُهَدَاء শব্দটি এখানে সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে । অর্থাৎ এমন লোকদের আহ্বান করে নিয়ে আস যারা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য হবে যে, আল্লাহ্র কালামের বিপরীতে যা নিয়ে আসবে তা আল্লাহ্র

তোমরা সত্যবাদী হও[১]।

কালামের মত হয়েছে। ভাষাবিদদের সাক্ষ্য এর সাথে যোগ করে দাও। পবিত্র কুরআনে এ চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন স্থানে এসেছে। মক্কী সূরায়ও এমন চ্যালেঞ্জ এসেছিল। বলা হয়েছে, "এ কুরআন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো রচনা হওয়া সম্ভব নয়। বরং এর আগে যা নাযিল হয়েছে এটা তার সমর্থক এবং আল কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা । এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। তারা কি বলে, 'তিনি এটা রচনা করেছেন?' বলুন, 'তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" [সূরা ইউনুস: ৩৭-৩৮] তারপর মদীনায় নাযিল হওয়া সূরাসমূহেও এ ধরনের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেমন, সূরা আল-বাকারাহ এর আলোচ্য আয়াত। [ইবনে কাসীর]

(১) কুরআন নিয়ে যারাই গবেষণা করেছেন, তারা একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এর ভাষাগত বাহ্যিক রূপ ও মর্মগত আত্মিক স্বরূপ উভয় দিক দিয়েই এটা অতুলনীয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আলিফ-লাম-রা, এ কিতাব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের কাছ থেকে; এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত"। [সূরা হূদ: ১] সুতরাং কুরআনের ভাষা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ও তার মর্ম সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক। ভাব ও ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই তা অতুলনীয় ও বিস্ময়কর। সব সৃষ্টিজগত তার সমকক্ষতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করেছে। তাতে একদিকে যেমন অতীতের ইতিহাস উপযুক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলীও সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। ন্যায় অন্যায় ও ভালো মন্দ সম্পর্কিত সব কিছুই সুনিপুণভাবে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করলেন, "সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রব-এর বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"। [সূরা আল-আন'আম: ১১৫] অর্থাৎ যে সমস্ত সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত। আর যে সমস্ত বিধান দিয়েছেন বিধানদাতা হিসেবে সেগুলোর ন্যায়পরায়ণতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এর প্রতিটি বিষয়ই সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি ও পথের দিশারী। এতে কোন ধারণাপ্রসূত কথা, রূপকথা কিংবা কাল্পনিক গালগল্প ও মিথ্যাচার যা সাধারণত কবিদের কাব্যে পাওয়া যায়, এতে এর বিন্দুমাত্র ছোঁয়াও নেই।

কুরআনের মজীদের পুরোটাই হচ্ছে উচ্চাঙ্গের কথামালা। অনন্য ভাষাশৈলীতা এবং হৃদয়স্পর্শী উপমায় ভরপুর। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীরাই কেবল কুরআনের ভাষারীতি ও ভাব সম্পদের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম। কুরআন যখন কোন খবর প্রকাশ করে, হোক তা বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত, আবার তা যদি একবারের জায়গায় বারবারও বলা হয়, তথাপি তার স্বাদ ও মাধুর্যে বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না। যতই পাঠ করবে ততই যেন অজানা এক স্বাদে মন উত্তরোত্তর উদ্বেলিত হয়েই চলবে। তার বারবার পাঠ করলে যেমন সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। তেমনি অসাধারণ পাঠকরাও অনাগ্রহ প্রকাশ করেন না। আল-কুরআনের ভীতি

২৪. অতএব যদি তোমরা তা করতে না পার আর কখনই তা করতে পারবে না[১], তাহলে তোমরা সে আগুন

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

প্রদর্শনমূলক আয়াত ও কঠোর সতর্কবাণী ভালো করে অনুধাবন করলে কঠিন মানুষ তো দূরের কথা পাহাড় পর্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে থাকে।

অনুরূপভাবে তার আশ্বাসবাণী ও পুরস্কার বিবরণ দেখলে ও হৃদয়ঙ্গম করলে অন্ধ মনের বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়, অবরুদ্ধ শ্রবণশক্তি প্রত্যাশার পদ-ধ্বনি শুনতে পায়। আর মৃত মন ইসলামের অমিত শরবত পানের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠে। এসব কিছু মিলে অজান্তে হৃদয়ে শান্তিধাম জান্নাতের প্রতি আগ্রহ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আর মহান আল্লাহ্র আরশের কাছে থাকার তীব্র আকাংখা জাগ্রত হয়। এ কুরআনের বিষয় বৈচিত্র আশ্চর্যজনক। ভাষার অলংকারের ঔজ্জ্বল্য, নসীহতের প্রাচুর্য, হাজারো যুক্তি প্রমাণ ও তত্ত্বজ্ঞানের আধিক্য কুরআনকে গ্রন্থ জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। বিধিনিষেধের বাণীসমূহকে অত্যন্ত ন্যায়ানুগ, কল্যাণকর, আকর্ষণীয় ও প্রভাবময় করা হয়েছে। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অনেক প্রাচীন মনীষী বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ শোনার সাথে সাথে মনোযোগের সাথে কান পেতে পরবর্তী বক্তব্য শোন। কারণ, তারপর হয়ত কোন কল্যাণের পথে আহ্বান থাকবে, না হয় কোন অকল্যাণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ ঘোষিত হবে। [ইবন কাসীর]

আর যদি আল-কুরআনে কিয়ামতের মাঠের ভয়াবহ চিত্র, চির সুখের জান্নাতের নেয়ামতরাজী, জাহান্নামের চিরন্তন দূর্ভোগের বিবরণ, নেককারদের লোভনীয় পুরস্কার আর গুনাহগারদের নানা রকম ভয়াবহ শাস্তি, দুনিয়ার সম্পদ ও সুখ সম্ভোগের অসারতা ও পারলৌকিক জীবনের সুখ সম্ভোগের অবিনশ্বরতা সংক্রান্ত আলোচনার দিকে দৃষ্টি দেয়া যায় তবে তা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও কল্যাণমূলক আলোচনায় সমৃদ্ধ। এসব বর্ণনা মানুষকে বার বার ন্যায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করে, মনকে ভয়ে বিগলিত করে এবং শয়তানের প্ররোচণায় জমানো অন্তরের কালি ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। আল- কুরআনের এ ধরনের অবিস্মরণীয় ও আশ্চর্যজনক মু'জিযার কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মানুষের ঈমান আনার জন্য প্রত্যেক নবীকে কিছু কিছু মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী হচ্ছে আমার মু'জিযা। আমি আশা করি কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীর তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা অধিক হবে।" [বুখারী: ৪৯৮১, মুসলিম: ১৫২] কারণ, প্রত্যেক নবীর মু'জিযা তাদের ইন্তেকালের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কুরআনুল কারীম কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় বর্তমান থাকবে। সর্বকালের মানুষের কাছে অবিসংবাদিত হিসেবে থাকবে। [ইবনে কাসীর]

(১) এটা কুরআনের বিশেষ মু'জিযা। একমাত্র কুরআনই নিঃসংকোচে সর্বকালের জন্য নিজ স্বীকৃত সত্তার এভাবে ঘোষণা দিতে পারে। যেভাবে রাসূলের যুগে কেউ এ কুরআনের মত আনতে পারে নি। তেমনি কুরআন এ ঘোষণাও নিঃশঙ্ক ও নিঃসংকোচে দিতে পেরেছে যে, যুগের পর যুগের জন্য, কালের পর কালের জন্য এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া

থেকে বাঁচার ব্যবস্থা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর[১], যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে[২] কাফেরদের জন্য ।

হচ্ছে যে, এ কুরআনের মত কোন কিতাব কেউ কোন দিন আনতে পারবে না । অনুরূপই ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে । রাসূলের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এ কুরআনের মত কিছু আনার দুঃসাহস দেখাতে পারে নি । আর কোনদিন পারবেও না । গোটা বিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর কথার সমকক্ষ কোন কথা কি কোন সৃষ্টির পক্ষে আনা সম্ভব?

(১) ইবনে কাসীর বলেন, এখানে 'পাথর' দ্বারা কালো গন্ধক পাথর বোঝানো হয়েছে । গন্ধক দিয়ে আগুন জ্বালালে তার তাপ ভীষণ ও স্থায়ী হয় । আসমান যমীন সৃষ্টির সময়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফেরদের জন্য তা সৃষ্টি করে প্রথম আসমানে রেখে দিয়েছেন । কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে ঐ সমস্ত পাথর উদ্দেশ্য, যেগুলোর ইবাদাত করা হয়েছে । [ইবনে কাসীর] আর জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ । সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ এক ভাগ দিয়ে শাস্তি দিলেই তো যথেষ্ট হতো । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জাহান্নামের আগুন তোমাদের আগুনের তুলনায় ঊনসত্তর গুণ বেশী উত্তপ্ত ।" [বুখারীঃ ৩২৬৫, মুসলিমঃ ২৪৮৩]

(২) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হচ্ছে, জাহান্নাম কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে । এখানে أُعِدَّتْ এর সর্বনামটির ইঙ্গিত সুস্পষ্টতই মানুষ ও পাথর দ্বারা প্রজ্জ্বলিত জাহান্নামের দিকে । অবশ্য এ সর্বনামটি পাথরের ক্ষেত্রেও হতে পারে । তখন অর্থ দাঁড়ায়, পাথরগুলো কাফেরদের শাস্তি প্রদানের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে । ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে উভয় অর্থের মধ্যে বড় ধরনের কোন তফাৎ নেই । একটি অপরটির পরিপূরক ও পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । আগুন বিহীন যেমন পাথর জ্বলে না, তেমনি পাথর বিহীন আগুনের দাহ্য ক্ষমতাও বাড়ে না । সুতরাং উভয় উপাদানই কাফেরদের কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ।

আয়াতের এ অংশ দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ দলীল নেন যে, জাহান্নাম বর্তমানে তৈরী করা অবস্থায় আছে । জাহান্নাম যে বাস্তবিকই বর্তমানে রয়েছে তার প্রমাণ অনেক হাদীস দ্বারা পাওয়া যায় । যেমন, জাহান্নাম ও জান্নাতের বিবাদের বর্ণনা সংক্রান্ত হাদীস [বুখারীঃ ৪৮৪৯, মুসলিমঃ ২৮৪৬] , জাহান্নামের প্রার্থনা মোতাবেক তাকে বছরে শীত ও গ্রীষ্মে দুই বার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের অনুমতি প্রদানের বর্ণনা [বুখারীঃ ৫৩৭, মুসলিমঃ ৬৩৭] ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এক হাদীসে আছে, "আমরা একটি বিকট শব্দ শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার কারণ জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, এটা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত পাথর জাহান্নামে পতিত হওয়ার আওয়ায ।" [মুসলিমঃ ২৮৪৪, মুসনাদে আহমাদ ২/৪৭১] তাছাড়া সূর্যগ্রহণের

২৫. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত[১]। যখনই তাদেরকে ফলমুল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, 'আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হত এতো তাই'। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করেই[২] এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনী[৩]। আর তারা সেখানে স্থায়ী

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

সালাত এবং মিরাজের রাত্রির ঘটনাবলীও প্রমাণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টিই তৈরী করে রাখা হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

(১) 'জান্নাতের তলদেশে নদী প্রবাহিত' বলে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, এর গাছের নীচ দিয়ে ও এর কামরাসমূহের নীচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জান্নাতের নদী-নালাসমূহ মিশকের পাহাড় থেকে নির্গত। [সহীহ ইবনে হিব্বান: ৭৪০৮] আনাস ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, 'জান্নাতের নহরসমূহ খাদ হয়ে প্রবাহিত হবে না' [সহীহুত তারগীব] অন্য বর্ণনায় এসেছে, হাউজে কাউসারের দুই তীর লালা-মোতির গড়া বিরাট গম্বুজ বিশিষ্ট হবে। [বুখারী: ৬৫৮১] আর তার মাটি হবে মিশকের সুগন্ধে ভরপুর। তার পথে বিছানো কাঁকরগুলো হলো লাল-জহরত, পান্না-চুন্নি সদৃশ। [ইবনে কাসীর]

(২) জান্নাতবাসীদেরকে একই আকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন ফলমূল পরিবেশনের উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ সঞ্চার। কোন কোন তাফসীরকারের মতে ফলমূল পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ জান্নাতের ফলাদি আকৃতিগতভাবে ইহজগতে প্রাপ্ত ফলের অনুরূপই হবে। সেগুলো যখন জান্নাতবাসীদের মধ্যে পরিবেশন করা হবে, তখন তারা বলে উঠবে, অনুরূপ ফল তো আমরা দুনিয়াতেও পেতাম। কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। অপর কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, ফলমূল পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ, জান্নাতে পরিবেশিত ফল-মূলাদি দেখে জান্নাতিগণ বলবে যে, এটা তো গতকালও আমাদের দেয়া হয়েছে, তখন জান্নাতের খাদেমগণ তাদের বলবে যে, দেখতে একই রকম হলেও এর স্বাদ ভিন্ন। ইবনে আব্বাস বলেন, দুনিয়ার ফলের সংগে আখেরাতের ফল-মূলের কোন তুলনাই চলবে না, শুধু নামের মিল থাকবে। [ইবনে কাসীর]

(৩) মূল আরবী বাক্যে 'আযওয়াজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বহুবচন। এর এক বচন হচ্ছে 'যওজ', অর্থ হচ্ছে জোড়া। এ শব্দটি স্বামী বা স্ত্রী অর্থে ব্যবহার করা হয়। স্বামীর জন্য স্ত্রী হচ্ছে 'যওজ'। আবার স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে 'যওজ'।

হবে[১]।

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ মশা কিংবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না[২]। অতঃপর যারা

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن

তবে আখেরাতে আযওয়াজ অর্থাৎ জোড়া হবে পবিত্রতার গুণাবলী সহকারে। জান্নাতে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের অর্থ, তারা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চরিত্রগত কলূষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রস্রাব-পায়খানা, রজঃস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়ের ঊর্ধ্বে। অনুরূপভাবে নীতিভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাদের গুণাগুণ সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াতে এসেছে যে, "তাদের সংগে থাকবে আয়তনয়না, ডাগর চোখ বিশিষ্টাগণ" [সূরা আস-সাফফাত: ৪৮] আরও বলা হয়েছে, "তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল" [সূরা আর-রহমান: ৫৮] আরও এসেছে, "আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা" [সূরা আল-ওয়াকি'আ:২২-২৩] অনুরূপভাবে এসেছে, "আর সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী" [সূরা আন-নাবা: ৩৩] যদি দুনিয়ার কোন সৎকর্মশীল পুরুষের স্ত্রী সৎকর্মশীলা না হয় তাহলে আখেরাতে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ সৎকর্মশীল পুরুষটিকে অন্য কোন সৎকর্মশীলা স্ত্রী দান করা হবে। আর যদি দুনিয়ায় কোন স্ত্রী হয় সৎকর্মশীলা এবং তার স্বামী হয় অসৎ, তাহলে আখেরাতে ঐ অসৎ স্বামী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে কোন সৎ পুরুষকে তার স্বামী হিসেবে দেয়া হবে। তবে যদি দুনিয়ায় কোন স্বামী-স্ত্রী দুজনই সৎকর্মশীল হয়, তাহলে আখেরাতে তাদের এই সম্পর্কটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সম্পর্কে পরিণত হবে।

(১) বলা হয়েছে যে, জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণসমূহকে যেন দুনিয়ার পতনশীল ও ক্ষীয়মান উপকরণসমূহের ন্যায় মনে না করা হয় যাতে যেকোন মূহুর্তে ধ্বংস ও বিলুপ্তির আশংকা থাকে। বরং জান্নাতবাসীগণ অনন্তকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এই অফুরন্ত উপকরণসমূহ ভোগ করে বিমল আনন্দ-স্ফূর্তি ও চরম তৃপ্তি লাভ করতে থাকবেন। [ইবনে কাসীর]

(২) কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে মাকড়সা ও মাছি উদাহরণ পেশ করার পর মুশরিকরা বলাবলি করল যে, মাকড়সা ও মাছি কি উল্লেখযোগ্য কিছু? তখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আবুল আলীয়া বলেন, মশার উদাহরণ দেয়ার মধ্যে যৌক্তিকতা হচ্ছে, 'এ সমস্ত কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকদের যখন আয়ু শেষ হয়ে যায় এবং সময় নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তারা মশার মত প্রাণীতে পরিণত হয়। কারণ, মশা পেট ভরলে মরে যায়, আর যতক্ষণ ক্ষুধা থাকে বেঁচে থাকে। অনুরূপভাবে এ সমস্ত কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকরা যাদের জন্য উদাহরণ পেশ করা হয়েছে তারাও দুনিয়ার জীবিকা শেষ

رَّبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয়ই এটা[১] তাদের রব-এর পক্ষ হতে সত্য। কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা বলে যে, আল্লাহ্ কি উদ্দেশ্যে এ উপমা পেশ করেছেন? এর দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে হেদায়াত করেন। আর তিনি ফাসিকদের ছাড়া আর কাউকে এর দ্বারা বিভ্রান্ত করেন না[২]---

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আর যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনের উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়[৩], তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا
فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. তোমরা কিভাবে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায়

করার পর আল্লাহ্ শক্ত হাতে তাদের পাকড়াও করবেন এবং তাদের ধ্বংস করবেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) অর্থাৎ ঈমানদাররা নিশ্চিত জানে যে, এ উপমা প্রদান করা হক্ব বা যথাযথ। অথবা এর অর্থ, তারা জানে যে, এটা আল্লাহ্র বাণী এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হক হিসেবে তাদের কাছে এসেছে। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ তারা ফাসেক বা অবাধ্য হওয়াতেই তাদের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছেন। কেউ খারাপ পথে চলতে চাইলে আল্লাহ্ তাকে সে পথে চলতে দেন।

(৩) আবুল আলীয়া বলেন, এটি মুনাফিকদের ছয়টি স্বভাবের অন্তর্গত। তারা কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে, সাথে সাথে আয়াতে বর্ণিত তিনটি কাজ, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং যমীনের উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

জীবিত করবেন, তারপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে ।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ

২৯. তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন । তারপর(১) তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ(২) করে

(১) এখানে যমীন সৃষ্টির পরে আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে । অথচ সূরা আন-নাযি'আতের ৩০ নং আয়াত বাহ্যতঃ এর বিপরীত মনে হয় । এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সূরা ফুসসিলাতের ১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে । এখানে শুধু এটা জানাই যথেষ্ট যে, সহীহ্‌ সনদে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্‌ তা'আলা যমীনকে আসমানের আগেই সৃষ্টি করেছিলেন এবং তার মধ্যে খাবার জাতীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন । কিন্তু সেটাকে আসমান সৃষ্টির পূর্বে প্রসারিত ও সামঞ্জস্যবিধান করেন নি । তারপর তিনি আকাশের প্রতি মনোযোগী হয়ে সেটাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করেন । তারপর তিনি যমীনকে সুন্দরভাবে প্রসারিত ও বিস্তৃত করেছেন । এটাই এ আয়াত এবং সূরা আন-নাযি'আতের ৩০ নং আয়াতের মধ্যে বাহ্যতঃ উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর । [আত-তাফসীরুস সহীহ] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আসমান সৃষ্টি করার আগেই যমীন সৃষ্টি করেন । যমীন সৃষ্টির পর তা থেকে এক ধোঁয়া বা বাষ্প উপরের দিকে উঠতে থাকে । আর সেটাই আল্লাহ্‌র বাণী: "তারপর তিনি আসমান সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করলেন এমতাবস্থায় যে, সেটা ছিল ধুম্রাকার" [সূরা ফুসসিলাত: ১১] [ইবনে কাসীর]

(২) পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে اسْتَوٰى শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, স্থান বিশেষে বিভিন্ন প্রকার অর্থে । সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় তা তিনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে:

১) اسْتَوٰى শব্দটি যেখানে পূর্ণ ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ তার পরে على বা إلى কিছুই না আসে তখন তার অর্থ হবে, সম্পূর্ণ হওয়া বা পূর্ণতা লাভ করা । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্‌ সালাম সম্পর্কে বলেনঃ ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ﴾ অর্থাৎ আর যখন মূসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পূর্ণতা লাভ করলেন । [সূরা আল-কাসাসঃ ১৪]

২) اسْتَوٰى শব্দটির সাথে যদি على আসে তখন তার অর্থ হবে - উপরে উঠা, আরোহণ করা । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেনঃ ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف:٥٤ يونس:٣ الرعد:٢ الفرقان:٥٩ السجدة:٤، الحديد:٤] অর্থাৎ তারপর তিনি আরশের উপর উঠলেন । অনুরূপভাবে সূরা طه তে এসেছেঃ [طه:٥] ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ অর্থাৎ দয়াময় (রহমান) আরশের উপর উঠলেন ।

اسْتَوٰى শব্দটির সাথে যদি إلى আসে তখন তার অর্থ হবে - ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, মনোনিবেশ করা । আর সে অর্থই এ আয়াতে ব্যবহৃত ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ -

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

সেটাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করেছেন; আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ

৩০. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশ্তাদের[১] বললেন[২], 'নিশ্চয়

এর অর্থ করা হবে - আকাশ সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন। তবে মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এখানেও উপরে উঠার অর্থ হবে।

শেষোক্ত দু'অবস্থায় اسْتَوٰى শব্দটি যখন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত হবে তখন তা তাঁর একটি সিফাত বা গুণ হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ্র জন্য সে সিফাত বা গুণ কোন প্রকার অপব্যাখ্যা, পরিবর্তন, সদৃশ নির্ধারণ ছাড়াই সাব্যস্ত করা ওয়াজিব।

(১) এখানে মূল আরবী শব্দ 'মালায়িকা' হচ্ছে বহুবচন। এক বচন 'মালাক'। মালাক-এর আসল অর্থ হচ্ছে 'বাণী বাহক'। এরই শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, 'যাকে পাঠানো হয়েছে' বা ফেরেশ্তা। ফেরেশ্তা নিছক কিছু কায়াহীন, অস্তিত্বহীন শক্তির নাম নয়। বরং এরা সুস্পষ্ট কায়া ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। আল্লাহ্র বিধান ও নির্দেশাবলী তারা প্রবর্তন করে থাকেন। মূর্খ লোকেরা ভুলক্রমে তাদেরকে আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ও কাজ-কর্মে অংশীদার মনে করে। আবার কেউ কেউ তাদেরকে মনে করে আল্লাহ্র আত্মীয়। এজন্য দেবতা বানিয়ে তাদের পূজা করে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ফেরেশতাদেরকে নূর থেকে তৈরী করা হয়েছে, জ্বিনদেরকে নির্ধুম আগুন শিখা হতে। আর আদমকে তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।" [মুসলিম: ২৯৯৬] অর্থাৎ আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে এমন এক মুষ্ঠি মাটি থেকে তৈরী করেছেন। যে মাটি তিনি সমস্ত যমীন থেকে নিয়েছেন। তাই আদম সন্তানরা যমীনের মতই বৈচিত্ররূপে এসেছে। তাদের মধ্যে লাল, সাদা, কালো এবং এর মাঝামাঝি ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায়। আর তাদের মধ্যে সহজ, পেরেশান, খারাপ ও ভাল সবরকমের সমাহার ঘটেছে।" [তিরমিযী: ২৯৫৫, আবুদাউদ: ৪৬৯৩, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৪০০, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৬১, ২৬২]

(২) অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম 'আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করার প্রাক্কালে এ সম্পর্কে ফেরেশ্তাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাঁর এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে ইংগিত ছিল যে, তারা যেন এ ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। কাজেই ফেরেশ্তাগণ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মানব জাতির মাঝে এমনও অনেক লোক হবে, যারা শুধু বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। সুতরাং এদের উপর খেলাফত ও শৃংখলা বিধানের দায়িত্ব অর্পণের কারণ তাদের পুরোপুরি বোধগম্য নয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফেরেশ্তাগণই যোগ্যতম বলে মনে হয়। কেননা,

خَلِيفَةً قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

আমি যমীনে খলীফা[১] সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে ফাসাদ ঘটাবে ও রক্তপাত করবে[২]? আর আমরা

পুণ্য ও সততা তাদের প্রকৃতিগত গুণ। তারা সদা অনুগত। এ জগতের শাসনকার্য পরিচালনা ও শৃংখলা বিধানের কাজও হয়তো তারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। তাদের এ ধারণা যে ভুল, তা আল্লাহ্‌ শাসকোচিত ভংগীতে বর্ণনা করে বলেন যে, বিশ্ব খেলাফতের প্রকৃতি ও আনুষাঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমরা মোটেও ওয়াকিফহাল নও। তা শুধুমাত্র আমিই পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত। অতঃপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ফেরেশ্‌তাদের উপর আদম 'আলাইহিস্‌ সালাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অনুপম মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় উত্তরটি দেয়া হয়েছে যে, বিশ্ব-খেলাফতের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের অন্তর্গত সৃষ্ট বস্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

(১) আয়াতে বর্ণিত 'খলীফা' শব্দের অর্থ নির্ণয়ে বিভিন্ন মত এসেছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলছেন যে, আমি তোমাদের ছাড়া এমন কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছি যারা যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। ইবনে জারীর বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, আমি যমীনে আমার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে চাই, যে আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে ইনসাফের সাথে আমার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবে। আর এ প্রতিনিধি হচ্ছে আদম এবং যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে তার বিধান প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত হবে।

(২) এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ফেরেশতারা কিভাবে জানতে পারল যে, যমীনে বিপর্যয় হবে? এর উত্তর বিভিন্নভাবে এসেছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ যমীনে পূর্বে জ্বিনরা বাস করত। তারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল। ফলে আল্লাহ্‌ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। [দেখুন, অনুরূপ বর্ণনা মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৮৭] ফেরেশতারা তাদের উপর কিয়াস করে একথা বলেছিলেন। আবার কারও কারও মতে, তারা মাটি থেকে আদমের সৃষ্টি দেখে বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের মধ্যে বিপর্যয় হবে। কাতাদাহ বলেন, 'আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে পূর্বাহ্নে জানিয়েছিলেন যে, যমীনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে যদি কোন সৃষ্টি রাখা হয় তবে তারা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, রক্ত প্রবাহিত করবে। আর এজন্যই তারা বলেছিল, 'আপনি কি সেখানে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে?' [তাবারী] তাছাড়া বিভিন্ন সাহাবা থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে কিছু কথা উহ্য আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন বললেন যে, আমি যমীনে খলীফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। ফেরেশতারা বলল যে, হে আমাদের রব! সে কেমন খলীফা? আল্লাহ্‌ বললেন, তাদের সন্তান-সন্ততি হবে এবং তারা ঝগড়া ফাসাদ ও হিংসা বিভেদে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে হত্যা করবে। তখন তারা বলল, আপনি কি

আপনার হামদসহ তাসবীহ্ পাঠ করি এবং পবিত্রতা ঘোষণা করি(১)। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি তা জানি, যা তোমরা জান না'(২)।

যমীনে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আল্লাহ্ বললেন, আমি তা জানি যা তোমরা জান না। [ইবনে কাসীর] ইবনে জুরাইজ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম সৃষ্টির ব্যাপারে সংঘটিত সব অবস্থা বর্ণনার পর তাদেরকে আলোচনা করার অনুমতি দিলে তারা এ বক্তব্য পেশ করেন। তারা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, হে আমাদের রব! আপনি তাদের সৃষ্টিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও কি করে তারা আপনার নাফরমান সাজবে? এমন নাফরমান জাতিকে আপনি কেন সৃষ্টি করবেন? আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাদেরকে এ জবাব দিয়ে আশ্বস্ত করলেন যে, তাদের ব্যাপারে তোমরা কিছু কথা জেনে থাকলেও অনেক কিছুই জান না। তাদের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে বেশী জানি। তাদের মধ্য থেকে অনেক অনুগত বান্দাও সৃষ্টি হবে। [ইবনে কাসীর] ইমাম তাবারী বলেন, ফেরেশতাগণ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন অজানা বিষয় জানার জন্যে। তারা যেন বললেন, হে আমাদের রব! আমাদেরকে একটু অবহিত করুন। সুতরাং এর উদ্দেশ্য অস্বীকৃতি নয়; বরং উদ্দেশ্য অবগত হওয়া। [তাবারী]

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে উত্তম বাক্য কোনটি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঐ বাক্য যা আল্লাহ্ তার ফেরেশতাদের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং তারা যা বলেছেন, সেটা হলো: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী"। [মুসলিম: ২৭৩১]

(২) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্‌র জ্ঞানে ছিল যে, এই খলীফার মধ্য হতে নবী-রাসূল, সৎকর্মশীল বান্দা ও জান্নাতী লোক সৃষ্টি হবে। [ইবনে কাসীর] সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন ফেরেশতাগণ বান্দার আমল নিয়ে আসমানে আল্লাহর দরবারে পৌঁছেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা -সবকিছু জানা সত্ত্বেও- প্রশ্ন করেন, আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায় রেখে এসেছ? তারা সবাই জবাবে বলেন, আমরা গিয়ে তাদেরকে সালাত আদায়রত অবস্থায় পেয়েছি এবং আসার সময় সালাত আদায়রত অবস্থায় রেখে এসেছি।' [বুখারী: ৫৫৫, মুসলিম: ৬৩২] কারণ তারা একদল ফজরে আসে এবং আসরে চলে যায় এবং আরেক দল আসরে আসে এবং ফজরে চলে যায়। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে রাতের আমল দিনের আগেই এবং দিনের আমল রাতের আগেই পৌঁছে থাকে।" [মুসলিম: ১৭৯] আল্লাহ্ তা'আলা জবাব, ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ এর এটাই যথার্থ তাফসীর। [ইবনে কাসীর] মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, আল্লাহ্ জানতেন যে, ইবলীস অবাধ্য হবে এবং তাকে শেষ পর্যন্ত অবাধ্যতার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। [তাবারী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, ফেরেশতাদের ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ এ বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা

৩১. আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন(১), তারপর সেগুলো(২) ফেরেশ্‌তাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, 'এগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ
فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২. তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ
الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾

﴿إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ বলেছেন। কেননা পুরো বক্তব্যেই বনী আদমের স্থলে তাদের পৃথিবীতে বসবাসের ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তোমরা আকাশের উপযোগী এবং আকাশে অবস্থানই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তোমরা সেটা বুঝতে পারছ না। [ইবনে কাসীর ও তাফসীরে কাবীর]

(১) অর্থাৎ আগে যে খলীফা বানানোর ঘোষণা আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং আদম। সা'ঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, আদমকে আদম এজন্যই নাম রাখা হয়েছে, কারণ তাকে যমীনের 'আদীম' বা চামড়া অর্থাৎ উপরিভাগ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [তাবাকাতু ইবনে সা'দ, তাবারী] আয়াত থেকে আরও সাব্যস্ত হয়েছে যে, আদম আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন। তার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং কথা বলেছেন। হাদীসে এসেছে, আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আদম কি নবী ছিলেন? রাসূল বললেন, 'হ্যাঁ, যার সাথে কথা বলা হয়েছে'। লোকটি আবার প্রশ্ন করল, তার মাঝে ও নূহের মাঝে ব্যবধান কেমন? রাসূল বললেন, দশ প্রজন্ম।" [ইবনে হিব্বান: ৬১৯০] প্রশ্ন হতে পারে যে, আদম আলাইহিস সালামকে কি কি নাম শিখানো হয়েছিল? কাতাদাহ বলেন, সবকিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, যেমন এটা পাহাড়, এটা সমুদ্র, এটা এই, ওটা সেই, প্রত্যেকটি বস্তুর নাম। তারপর ফেরেশতাগণের কাছে সেগুলো পেশ করে নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। [তাবারী, ইবনে কাসীর] আর তা ছিল মূলত: সমস্ত সৃষ্টিকুলের নাম এবং তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের নাম। বিখ্যাত শাফা'আতের হাদীসেও এসেছে যে, "মানুষজন কিয়ামতের মাঠে যখন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন আদম আলাইহিস সালামের কাছে এসে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করে বলবে যে, আপনি সকল মানুষের পিতা, আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশতাদের দিয়ে সাজদাহ করিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ বা সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।" [বুখারী: ৪৪৭৬]

(২) ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও মুজাহিদ বলেন, যে সমস্ত বস্তুর নাম আদমকে শিখিয়ে দিলেন সে বস্তুগুলো ফেরেশতাদের কাছে পেশ করে তাদের কাছে এগুলোর নাম জানতে চাওয়া হলো। [ইবন কাসীর]

নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়’।

قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তিনি বললেন, ‘হে আদম! তাদেরকে এসবের নাম বলে দিন’। অতঃপর তিনি (আদম) তাদেরকে সেসবের নাম বলে দিলে তিনি (আল্লাহ্) বললেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আসমান ও যমীনের গায়েব জানি। আরও জানি যা তোমরা ব্যক্ত কর এবং যা তোমরা গোপন করতে’[১]।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ফেরেশ্‌তাদের বললাম, আদমকে সিজ্‌দা কর[২], তখন

(১) কাতাদাহ ও আবুল আলীয়া বলেন, তারা যা গোপন করছিল তা হচ্ছে, আমাদের রব আল্লাহ্ তা'আলা যা-ই সৃষ্টি করুক না কেন আমরা তার থেকে বেশী জ্ঞানী ও সম্মানিত থাকব। [তাবারী, আত-তাফসীরুস সহীহ] তাছাড়া বিভিন্ন সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা যা প্রকাশ করেছিল তা হলো, “আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে ফাসাদ ঘটাবে ও রক্তপাত করবে”। আর যা গোপন করছিল তা হচ্ছে, ইবলীস তার মনের মধ্যে যে গর্ব ও অহঙ্কার গোপন করে রাখছিল তা। [ইবনে কাসীর]

(২) এ আয়াতে বাহ্যতঃ যে কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, আদম ‘আলাইহিস্ সালামকে সিজ্‌দা করার হুকুম ফেরেশ্‌তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন এ কথা বলা হলো যে, ইবলীস ব্যতীত সব ফেরেশ্‌তাই সিজ্‌দা করলেন, তখন তাতে প্রমাণিত হলো যে, সিজ্‌দার নির্দেশ ইবলিসের প্রতিও ছিল। কিন্তু নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে শুধু ফেরেশ্‌তাগণের উল্লেখ এ জন্য করা হলো যে, তারাই ছিল সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন তাদেরকে আদম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হলো, তাতে ইবলিস অতি উত্তম রূপে এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেল। অথবা সে যেহেতু ফেরেশতাদের দলের মধ্যেই অবস্থান করছিল তখন তাকে অবশ্যই নির্দেশ পালন করতে হত। সে নিজেকে নির্দেশের বাইরে মনে করার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। শুধুমাত্র তার গর্ব ও অহঙ্কারই তাকে তা করতে বাধা দিচ্ছিল। [ইবনে কাসীর]

এ আয়াতে আদম ‘আলাইহিস্ সালামকে সিজ্‌দা করতে ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা ইউসুফ-এ ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর পিতা-মাতা ও ভাইগণ মিশর পৌঁছার পর ইউসুফকে সিজ্‌দা করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

ইব্‌লিস[১] ছাড়া সকলেই সিজ্‌দা করল; সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল[২]। আর সে কাফেরদের

এটা সুস্পষ্ট যে, এ সিজ্‌দা 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যে হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরের 'ইবাদাত শির্ক ও কুফরী। কোন কালে কোন শরী'আতে এরূপ কাজের বৈধতার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। সুতরাং এর অর্থ এছাড়া অন্য কোন কিছুই হতে পারে না যে, প্রাচীনকালের সিজ্‌দা আমাদের কালের সালাম, মুসাফাহা, মু'আনাকা, হাতে চুমো খাওয়া এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়ার সমার্থক ও সমতুল্য ছিল। ইমাম জাসসাস আহ্‌কামুল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী নবীগণের শরী'আতে বড়দের প্রতি সম্মানসূচক সিজ্‌দা করা বৈধ ছিল। শরী'আতে মুহাম্মাদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি হিসেবে এখন শুধু সালাম ও মুসাফাহার অনুমতি রয়েছে। রুকূ'-সিজ্‌দা এবং সালাতের মত করে হাত বেঁধে কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস]

এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, সিজ্‌দায়ে তা'জিমী বা সম্মানসূচক সিজ্‌দার বৈধতার প্রমাণ তো কুরআনুল কারীমের উল্লেখিত আয়াতসমূহে পাওয়া যায়, কিন্তু তা রহিত হওয়ার দলীল কি? উত্তর এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক হাদীস দ্বারা সিজ্‌দায়ে তা'জিমী হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যদি আমি আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো প্রতি সিজ্‌দা করা জায়েয মনে করতাম, তবে স্বামীকে তার বৃহৎ অধিকারের কারণে সিজ্‌দা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম, কিন্তু এই শরী'আতে সিজ্‌দায়ে-তা'জিমী সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে সিজ্‌দা করা কারো পক্ষে জায়েয নয়'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১৫৮]

(১) 'ইবলিস' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'চরম হতাশ'। আর পারিভাষিক অর্থে এমন একটি জ্বিনকে ইবলিস বলা হয় যে আল্লাহ্‌র হুকুমের নাফরমানী করে আদম ও আদম-সন্তানদের অনুগত ও তাদের জন্য বিজিত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার ও কেয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে ভুল পথে চলার প্রেরণা দান করার জন্য সে আল্লাহ্‌র কাছে সময় ও সুযোগ প্রার্থনা করেছিল। আসলে শয়তান ও ইবলিস মানুষের মত একটি কায়াসম্পন্ন প্রাণীসত্তা। তাছাড়া সে ফেরেশ্‌তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ ভুল ধারণাও কারো না থাকা উচিত। কারণ পরবর্তী আলোচনাগুলোতে কুরআন নিজেই তার জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকার এবং ফেরেশ্‌তাদের থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পরিবেশন করেছে।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহঙ্কারও অবশিষ্ট থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

অন্তর্ভুক্ত হল[১]।

৩৫. আর আমরা বললাম, 'হে আদম! আপনি ও আপনার স্ত্রী[২] জান্নাতে বসবাস করুন

وَقُلْنَا يَآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا

[আবুদাউদ: ৪০৯১] আর ইবলীসের মন ছিল গর্ব ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। সুতরাং আল্লাহ্‌র সমীপ থেকে দূরিভুত হওয়াই ছিল তার জন্য যুক্তিযুক্ত শাস্তি।

(১) সুদ্দী বলেন, সে ঐ সমস্ত কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল যাদেরকে আল্লাহ্ তখনও সৃষ্টি করেননি। যারা তার পরে কাফের হবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী বলেন, আল্লাহ্ ইবলীসকে কুফরী ও পথভ্রষ্টতার উপরই সৃষ্টি করেছেন, তারপর সে ফেরেশতাদের আমল করলেও পরবর্তীতে যে কুফরির উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে তার দিকেই ফিরে গেল। [ইবনে কাসীর]

(২) কুরআনের বাকরীতি দ্বারা বোঝা যায় যে, আদম আলাইহিস সালাম এর জান্নাতে প্রবেশের আগেই হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে অভিশপ্ত করার পর আদমের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। আদম আলাইহিস সালামকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করা হল এবং তার বাম পাঁজর থেকে একখানা হাড় নেয়া হলো। আর সে স্থানে গোশ্‌ত সংযোজন করা হলো। তখনও আদম ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন হাড় থেকে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হল এবং তাকে যথাযথ রূপ দান করা হল যেন আদম তার সাহচর্যে পরিতৃপ্ত থাকেন। যখন তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটল এবং নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন, তখন হাওয়াকে তার পাশে বসা দেখলেন। সাথে সাথে তিনি বললেন, আমার গোশ্‌ত, আমার রক্ত ও আমার স্ত্রী। [ইবনে কাসীর] অন্য বর্ণনায় ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য সাহাবী থেকে এসেছে, ইবলীসকে জান্নাত থেকে বের করা হল আর আদমকে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ দেয়া হল। কিন্তু তিনি জান্নাতে একাকীত্ব অনুভব করতে থাকলেন। তারপর তার ঘুম আসল, সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলেন যে, তার মাথার পাশে একজন মহিলা বসে আছেন, যাকে তার পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? বললেন, মহিলা। আদম বললেন, তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? বললেন, যাতে তুমি আমার কাছে প্রশান্তি লাভ কর। তখন ফেরেশতাগণ তাকে প্রশ্ন করলেন: হে আদম! এর নাম কি? আদম বললেন, হাওয়া। তারা বলল, তাকে হাওয়া কেন নাম দেয়া হল? তিনি বললেন, কেননা তাকে জীবিত বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [ইবনে কাসীর] এর সমর্থনে আমরা একটি হাদীস পাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা নারীদের ব্যাপারে আমার উপদেশ গ্রহণ কর। কেননা, তাদেরকে পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের সবচেয়ে বাঁকা অংশ হচ্ছে, উপরিভাগ। তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও তবে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি ছেড়ে দাও, সব সময় বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং নারীদের ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণ কর। [বুখারী: ৩৩৩১, মুসলিম: ১৪৬৮] হাফেজ ইবনে হাজার এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে ইসহাক থেকে উপরোক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেন।

مِنۡهَا رَغَدًا حَيۡثُ شِئۡتُمَا ۖ وَلَا تَقۡرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوۡنَا مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿٣٥﴾

এবং যেখান থেকে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করুন, কিন্তু এই গাছটির কাছে যাবেন না(১); তাহলে আপনারা হবেন যালিমদের(২) অন্তর্ভুক্ত'।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيۡطٰنُ عَنۡهَا فَاَخۡرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا

৩৬. অতঃপর শয়তান সেখান থেকে

(১) কোন বিশেষ গাছের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছিল যে, এর ধারে কাছেও যেও না। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, সে গাছের ফল না খাওয়া। কিন্তু তাকীদের জন্য বলা হয়েছে, কাছেও যেও না। সেটি কি গাছ ছিল, কুরআনুল কারীমে তা উল্লেখ করা হয়নি। কোন নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাও তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে এ কথা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে বৃক্ষের ফল না খাওয়া ছিল এ নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু সাবধানতা-সূচক নির্দেশ ছিল এই যে, সে গাছের কাছেও যেও না। এর দ্বারাই ফিকাহ্‌শাস্ত্রের কারণ-উপকরণের নিষিদ্ধতার মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোন বস্তু নিজস্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশংকা থাকে যে, ঐ বস্তু গ্রহণ করলে অন্য কোন হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তখন ঐ বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া তার ফল-ফসল খাওয়ার কারণও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একে ফিকাহ্‌শাস্ত্রের পরিভাষায় উপকরণের নিষিদ্ধতা বলা হয়।

(২) যালিম শব্দটি গভীর অর্থবোধক। 'যুলুম' বলা হয় অধিকার হরণকে। যে ব্যক্তি কারো অধিকার হরণ করে সে যালিম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে না, তাঁর নাফরমানি করে সে আসলে তিনটি বড় বড় মৌলিক অধিকার হরণ করে। প্রথমতঃ সে আল্লাহ্‌র অধিকার হরণ করে। কারণ আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করতে হবে, এটা বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র অধিকার। দ্বিতীয়তঃ এ নাফরমানি করতে গিয়ে সে যে সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করে তাদের সবার অধিকার সে হরণ করে। তার দেহের অংগ-প্রত্যংগ, স্নায়ুমণ্ডলী, তার সাথে বসবাসকারী সমাজের অন্যান্য লোক, তার ইচ্ছা ও সংকল্প পূর্ণ করার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশ্‌তাগণ এবং যে জিনিষগুলো সে তার কাজে ব্যবহার করে-এদের সবার তার উপর অধিকার ছিল, এদেরকে কেবলমাত্র এদের মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যখন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তাদের উপর নিজের কর্তৃত্ব ব্যবহার করে তখন সে আসলে তাদের উপর যুলুম করে। তৃতীয়তঃ তার নিজের অধিকার হরণ করে। কারণ তার উপর তার আপন সত্তাকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবার অধিকার আছে। কিন্তু নাফরমানি করে যখন সে নিজেকে আল্লাহ্‌র শাস্তি লাভের অধিকারী করে তখন সে আসলে ব্যক্তি সত্তার উপর যুলুম করে। এসব কারণে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'গোনাহ্‌' শব্দটির জন্য যুলুম এবং 'গোনাহ্‌গার' শব্দের জন্য যালিম ব্যবহার করা হয়েছে।

فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

তাদের পদস্খলন ঘটালো[১] এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করল[২]। আর আমরা বললাম, ‘তোমরা একে অন্যের শত্রু রূপে নেমে যাও; এবং কিছু দিনের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল যমীনে’।

(১) زَلَّةٌ শব্দের অর্থ বিচ্যুতি বা পদস্খলন। অর্থাৎ শয়তান আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস্ সালামকে পদস্খলিত করেছিল বা তাদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল। কুরআনের এসব শব্দে পরিস্কার এ কথা বোঝা যায় যে, আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক আল্লাহ্‌ তা‘আলার হুকুম লংঘন সাধারণ পাপীদের মত ছিল না, বরং শয়তানের প্রতারণায় প্রতারিত হয়েই তারা এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পরিণামে যে গাছের ফল নিষিদ্ধ ছিল, তা খেয়ে বসলেন। এ বর্ণনার দ্বারা বোঝা গেল যে, আদম ‘আলাইহিস্ সালামকে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়। এরপরও আদম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, এখানে কয়েকটি ব্যাপারে আলেমদের ইজমা তথা ঐক্যমত সংঘটিত হয়েছেঃ

১) নবীগণ উম্মতের নিকট আল্লাহ্‌র নির্দেশ পৌঁছানোর ব্যাপারে যাবতীয় ভুল-ত্রুটি বা পাপ হতে মুক্ত।
২) অনুরূপভাবে মর্যাদাহানিকর নিম্নমানের কর্মকাণ্ড থেকেও মুক্ত।
৩) তাদের দ্বারা মর্যাদাহানিকর নয় এমন সগীরা গোনাহ্‌ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাদেরকে কোন প্রকার গোনাহ্‌ বা ভুলের উপর অবস্থান করতে দেননা। অর্থাৎ তাদের দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে তাদেরকে সাবধান করা হয়, যাতে তারা তাওবা করে সংশোধন করে নেন। ফলে তাদের মর্যাদা পূর্বের চেয়ে আরও বেশী বৃদ্ধি পায়।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সূর্য যে দিনগুলোতে উদিত হয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হচ্ছে জুম‘আর দিন। এতে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এতেই জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর এ দিনই তাকে জান্নাতে থেকে বের করা হয়েছে।” [মুসলিমঃ ৮৫৪] এখানে এ বিতর্ক অনাবশ্যক যে, শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আদম ‘আলাইহিস্ সালামকে প্রতারিত করার জন্য কিভাবে আবার সেখানে প্রবেশ করলো? কারণ, শয়তানের প্রবঞ্চনার জন্য জান্নাতে প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্‌ তা‘আলা শয়তান ও জ্বিন জাতিকে দূর থেকেও প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

৩৭. তারপর আদম[১] তার রবের কাছ থেকে কিছু বাণী পেলেন[২]। অতঃপর আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করলেন[৩]।

فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾

(১) আদম 'আলাইহিস্ সালাম চরমভাবে বিচলিত হলেন। মহান আল্লাহ্ অন্তর্যামী এবং অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। এ করুণ অবস্থা দেখে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ক্ষমা প্রার্থনারীতি সম্বলিত কয়েকটি বচন তাদেরকে শিখিয়ে দিলেন। তারই বর্ণনা এ আয়াতসমূহে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আদম 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় প্রভূর কাছ থেকে কয়েকটি শব্দ লাভ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি করুণা করলেন। অর্থাৎ তাদের তাওবা গ্রহণ করে নিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহা ক্ষমাশীল এবং অতি মেহেরবান। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে আগমনের মধ্যে আরও অনেক তাৎপর্য ও কল্যাণ নিহিত ছিল - যেমন, তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে ফেরেশ্তা ও জ্বিন জাতির মাঝামাঝি এক নতুন জাতি - 'মানব' জাতির আবির্ভাব ঘটা, তাদেরকে এক ধরনের কর্ম স্বাধীনতা দিয়ে তাদের প্রতি শর'য়ী বিধান প্রয়োগের যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান, শরী'আতী আইন ও নির্দেশাবলী প্রবর্তন। এই নতুন জাতি উন্নতি সাধন করে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে।

(২) যেসব বাক্য আদম 'আলাইহিস্ সালামকে তাওবার উদ্দেশ্যে বলে দেয়া হয়েছিল, তা কি ছিল? এ সম্পর্কে মুফাস্সির সাহাবাগণের কয়েক ধরনের বর্ণনা রয়েছে। ইবনে আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে, ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ٚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾ "হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ২৩] আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে তাওবার এই বাক্যগুলো শিখিয়ে দেয়া হলো, তখন আদম 'আলাইহিস্ সালাম যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে তা গ্রহণ করলেন।

(৩) (তাওবা) এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা। যখন তাওবার সম্বন্ধ মানুষের সংগে হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি:- এক. কৃত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। দুই. পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। তিন. ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। আর যদি পাপ বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তা ফেরৎ দেয়া বা তার থেকে মাফ নিয়ে নেয়া।

এ বিষয়গুলোর যেকোন একটির অভাব থাকলে তাওবা হবে না। সুতরাং মৌখিকভাবে 'আল্লাহ্ তাওবা' বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা নাজাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। আয়াতে বর্ণিত ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ এর মধ্যে তাওবার সম্বন্ধ আল্লাহ্র সাথে। এর অর্থ তাওবা গ্রহণ করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করলেন। এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলা

নিশ্চয় তিনিই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

৩৮. আমরা বললাম, 'তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোন হিদায়াত আসবে তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[১]'।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহে[২] মিথ্যারোপ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾

ছাড়া অন্য কেউ নয়। ইয়াহূদী ও নাসারাগণ এ ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলে পড়ে আছে। তারা পাদ্রী-পুরোহিতদের কাছে কিছু হাদিয়া উপঢৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তারা মাফ করে দিলেই আল্লাহ্‌র নিকটও মাফ হয়ে যায়। বর্তমানে বহু মুসলিমও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে। তারা কোন কোন পীরের কাছে তাওবা করে এবং মনে করে যে, পীর মাধ্যম হয়ে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তার পাপ মোচন করিয়ে নেবেন। অথচ কোন পীর বা আলেম কারো পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না।

(১) خَوْفٌ এর অর্থ আগত দুঃখ-কষ্টজনিত আশংকার নাম। আর حُزْنٌ বলা হয়, কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে। লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এ দু'টি শব্দে যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে কেন্দ্রিভূত করে দেয়া হয়েছে যে, স্বাচ্ছন্দ্যের একবিন্দুও এর বাইরে নেই। এ আয়াতে আসমানী হিদায়াতের অনুসারীগণের জন্য দু'ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমতঃ তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়তঃ তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

(২) আরবীতে "আয়াত" এর আসল মানে হচ্ছে নিশানী বা আলামত। এই নিশানী কোন জিনিসের পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ দেয়। কুরআনে এই শব্দটি চারটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এর অর্থ হয়েছে নিছক আলামত বা নিশানী। কোথাও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনসমূহকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র আয়াত। কারণ এ বিশ্ব জাহানের অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুই তার বাহ্যিক কাঠামোর অভ্যন্তরে নিহিত সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে। কোথাও নবী-রাসূলগণ যেসব মু'জিযা দেখিয়েছেন সেগুলোকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র আয়াত। কারণ এ নবী-রাসূলগণ যে এ বিশ্ব জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভূর প্রতিনিধি এ মু'জিযাগুলো ছিল আসলে

করেছে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে[১]।

৪০. হে ইস্‌রাঈল[২] বংশধরগণ[৩]! তোমরা আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি[৪] এবং

يٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ وَإِيَّٰيَ فَٱرۡهَبُونِ ۝٤٠

তারই প্রমাণ ও আলামত। কোথাও কুরআনের বাক্যগুলোকে আয়াত বলা হয়েছে। কারণ, এ বাক্যগুলো কেবল সত্যের দিকে পরিচালিত করেই ক্ষান্ত নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে কোন কিতাবই এসেছে, তার কেবল বিষয়বস্তুই নয়, শব্দ, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য গঠনরীতির মধ্যেও এ গ্রন্থের মহান মহিমান্বিত রচয়িতার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে। কোথায় ‘আয়াত’ শব্দটির কোন্ অর্থ গ্রহণ করতে হবে তা বাক্যের পূর্বাপর আলোচনা থেকে সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আর যারা জাহান্নামবাসী হিসেবে সেখানকার অধিবাসী হবে, তারা সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না”। [মুসলিম: ১৮৫] অর্থাৎ কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরা সেখানে স্থায়ী হবে। সুতরাং তাদের জাহান্নামও স্থায়ী।

(২) ‘ইসরাঈল’ ইয়া‘কূব ‘আলাইহিস্ সালামের অপর নাম। ইয়া‘কূব ‘আলাইহিস্ সালাম-এর দু’টি নাম রয়েছে, ইয়া‘কূব ও ইসরাঈল।

(৩) এ সূরার চল্লিশতম আয়াত থেকে আরম্ভ করে একশত তেইশতম আয়াত পর্যন্ত শুধু আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী আহলে-কিতাবদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমে তাদের বংশগত কৌলিন্য, বিশ্বের বুকে তাদের যশ-খ্যাতি, মান-মর্যাদা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা‘আলার অগণিত অনুকম্পাধারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের পদচ্যুতি ও দুস্কৃতির জন্য সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং সঠিক পথের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। প্রথম সাত আয়াতে এসব বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে প্রথম তিন আয়াতে ঈমানের দাওয়াত এবং চার আয়াতে সৎকাজের শিক্ষা ও প্রেরণা রয়েছে। এরপর অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বিস্তারিত সম্বোধনের সূচনাপর্বে গুরুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে (হে ইসরাঈলের বংশধর) শব্দসমষ্টি দ্বারা সংক্ষিপ্ত সম্বোধনের সূচনা হয়েছিল, সমাপ্তিপর্বেও সেগুলোরই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) বনী ইসরাঈলকে যে সমস্ত নে‘আমত প্রদান করা হয়েছে তা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, ফের‘আউন থেকে নাজাত, সমুদ্রে রাস্তার ব্যবস্থা করে তাদের বের করে আনা, তীহ ময়দানে মেঘ দিয়ে ছায়া প্রদান, মান্না ও সালওয়া নাযিলকরণ, সুমিষ্ট পানির ব্যবস্থা করণ ইত্যাদি। তাছাড়া তাদের

আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর[১], আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا
اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۡ
وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾

৪১. আর আমি যা নাযিল করেছি তোমরা তাতে ঈমান আন। এটা তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যতাপ্রমাণকারী। আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না[২]। আর

হিদায়াতের জন্য অগণিত অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ ও তৎকালীন বিশ্বের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানও উল্লেখযোগ্য।

(১) এ আয়াতে ইসরাঈল-বংশধরগণকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ "আর তোমরা আমার অংগীকার পূরণ কর"। অর্থাৎ তোমরা আমার সাথে যে অংগীকার করেছিলে, তা পূরণ কর। কাতাদাহ্ -এর মতে তাওরাতে বর্ণিত সে অংগীকারের কথাই কুরআনের এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইসরাঈল-বংশধর থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা তাদের মাঝে থেকে বার জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলাম"। [সূরা আল-মায়েদাহ্ঃ ১২] সমস্ত রাসূলের উপর ঈমান আনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংগীকারই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদের মধ্যে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এছাড়া সালাত, যাকাত এবং মৌলিক ইবাদতও এ অংগীকারভুক্ত। এ জন্যই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন যে, এ অংগীকারের মূল অর্থ মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণ অনুসরণ।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অংগীকার ও চুক্তির শর্তাবলী পালন করা অবশ্য কর্তব্য আর তা লংঘন করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, 'অংগীকার ভংগকারীদেরকে নির্ধারিত শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই শাস্তি দেয়া হবে যে, হাশরের ময়দানে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবজাতি সমবেত হবে, তখন অংগীকার ভংগকারীদের পিছনে নিদর্শনস্বরূপ একটি পতাকা উত্তোলন করে দেয়া হবে এবং যত বড় অংগীকার ভংগ করবে, পতাকাও তত উঁচু ও বড় হবে'। [সহীহ্ মুসলিমঃ ১৭৩৮] এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও অপমানিত করা হবে।

(২) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ

তোমরা শুধু আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।

৪২. আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না[১] এবং জেনে-বুঝে সত্য গোপন করো না[২]।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

হওয়ার অর্থ হলো, মানুষের মর্জি ও স্বার্থের বিনিময়ে আয়াতসমূহের মর্ম বিকৃত বা ভুলভাবে প্রকাশ করে তা গোপন রেখে টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা। এ কাজটি সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

(১) কাতাদাহ ও হাসান বলেন, 'হককে বাতিলের সাথে মিশ্রণ ঘটিয়ো না' এর অর্থ ইয়াহূদীবাদ ও নাসারাবাদকে ইসলামের সাথে এক করে দেখবে না। কেননা, আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে, ইসলাম। আর ইয়াহূদীবাদ ও নাসারাবাদ (খৃষ্টবাদ) হচ্ছে বিদ'আত বা নব উদ্ভাবিত বিষয়। সেটি কখনো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। সুতরাং এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন ধর্মকে একাকার করে এক ধর্মে পরিণত করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আবুল আলীয়াহ্ বলেন, এর অর্থ তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে আল্লাহর বান্দাদের কাছে নসীহত পূর্ণ কর। অর্থাৎ তোমাদের কিতাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা আল্লাহ্র বান্দাদের কাছে বর্ণনা কর। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আল্লামা শানকীতী বলেন, তারা যে হককে বাতিলের সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে তা হচ্ছে, তারা তাওরাতের কিছু অংশের উপর ঈমান এনেছে। আর যে বাতিলকে হকের সাথে মিশিয়েছে তা হচ্ছে, তারা তাওরাতের কিছু অংশের সাথে কুফরী করেছে এবং তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যেমন, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে সমস্ত গুণাগুণসহ অনুরূপ যা কিছু তারা গোপন করেছে এবং মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। এর বর্ণনায় পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছুর উপর ঈমান আন, আর কিছুর সাথে কুফরী কর" [সূরা আল-বাকারাহ: ৮৫] এ আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা এবং সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

(২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ, তোমরা আমার রাসূল মুহাম্মাদ এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা সম্পর্কে যে জ্ঞান তোমাদের নিকট আছে তা গোপন কর না। অথচ তার সম্পর্কে তোমরা তোমাদের কাছে যে গ্রন্থ আছে তাতে নিশ্চিতভাবেই অনেক কিছু পাচ্ছ। [আত-তাফসীরুস সহীহ] মুজাহিদ বলেন, আহলে কিতাবগণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোপন করে থাকে। অথচ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝٤٣

৪৩. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর[১]।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের কথা ভুলে যাও[২]!

তারা তার ব্যাপারে তাওরাত ও ইঞ্জীলে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পেয়ে থাকে। [তাবারী] এ আয়াত থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম।

(১) হাসান বলেন, 'সালাত এমন এক ফরয যা না পাওয়া গেলে অন্য কোন আমলই কবুল করা হয় না। অনুরূপভাবে যাকাতও।' [আত-তাফসীরুস সহীহ] আয়াতে বর্ণিত 'রুকূ' এর শাব্দিক অর্থ ঝুঁকা বা প্রণত হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সিজ্‌দার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা, সেটাও ঝুঁকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরী'আতের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝুঁকাকে রুকূ' বলা হয়, যা সালাতের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অর্থ এই যে, 'রুকূ'কারীগণের সাথে রুকূ' কর'। এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, সালাতের সমগ্র অংগ-প্রত্যংগের মধ্যে রুকূ'কে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো? উত্তর এই যে, এখানে সালাতের একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, কুরআনুল কারীমের এক জায়গায় ﴿وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ﴾ 'ফজর সালাতের কুরআন পাঠ' বলে সম্পূর্ণ ফজরের সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের কোন কোন রেওয়াতে 'সিজ্‌দা' শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাকা'আত বা গোটা সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, সালাত আদায়কারীগণের সাথে সালাত আদায় কর। অর্থাৎ 'রুকূ'কারীদের সাথে' শব্দদ্বয়ের দ্বারা জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(২) এ আয়াতে ইয়াহূদী আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, তারা তো নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করতে এবং ইসলামের উপর স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়। এতে বুঝা যায় ইয়াহূদী আলেমগণ দ্বীন ইসলামকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করতো। কিন্তু নিজেরা প্রবৃত্তির কামনার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করতে কখনো প্রস্তুত ছিল না। মূলত: তারাই অপরকে পুণ্য ও মংগলের প্রেরণা দেয়, অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা কার্যে পরিণত করে না, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সবাই ভর্ৎসনা ও নিন্দাবাদের অন্তর্ভুক্ত। এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে হাদীসে করুণ পরিণতি ও ভয়ংকর শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'মি'রাজের রাতে আমি এমন কিছুসংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিব্‌রাঈল 'আলাইহিস্

وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾

অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না ?

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى

৪৫. আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর[১]। আর নিশ্চয় তা

সালামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? জিব্‌রাঈল বললেন, এরা আপনার উম্মতের পার্থিব স্বার্থপূজারী উপদেশদানকারী - যারা অপরকে তো সৎকাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের খবর রাখতো না'। [মুসনাদে আহমাদ ৩/১২০, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫৩] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'কিছুসংখ্যক জান্নাতবাসী অপর কিছুসংখ্যক জাহান্নামবাসীদেরকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা কিভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করলে, অথচ আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তো সেসব সৎকাজের দৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, যা তোমাদেরই কাছে শিখেছিলাম? জাহান্নামবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম কিন্তু নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না'। [বুখারীঃ ৩২৬৭, মুসলিমঃ ২৯৮৯]

(১) মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ 'সবর' এর তাফসীর করেছেন 'সাওম"। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আল্লামা শানকীতী বলেন, ধৈর্য্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা সুস্পষ্ট বিষয়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে এক সময় তার উপর আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হবে এবং সে সফলকাম হবে। কিন্তু সালাতের মাধ্যমে কিভাবে সাহায্য প্রার্থনা করবে? এর উত্তর হচ্ছে, সালাতের মাধ্যমে অন্যায় অশ্লিল কাজ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখে।" [সূরা আল-আনকাবূত: ৪৫] এটা নিশ্চয় এক বিরাট সাহায্য। তাছাড়া সালাতের মাধ্যমে রিযকের মধ্যে প্রশস্তি আসে। আল্লাহ্ বলেন, "আর আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন ও তাতে অবিচল থাকুন, আমরা আপনার কাছে কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমরাই আপনাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াতেই নিহিত।" [সূরা ত্বা-হা: ১৩২] আর এ জন্যই "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন বিষয়ে সমস্যায় পড়তেন বা চিন্তাগ্রস্ত হতেন তখনই তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন"। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৮৮] সুতরাং যে কোন বিপদাপদে ও সমস্যায় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কটা তাজা করে নেয়ার মাধ্যমে সাহায্য লাভ করা যেতে পারে। সালফে সালেহীন তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও সত্যনিষ্ঠ ইমামগণ থেকে এ ব্যাপারে বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট তার ভাই 'কুছাম' এর মৃত্যুর খবর পৌঁছল, তিনি তখন সফর অবস্থায় ছিলেন। তিনি তার বাহন থেকে নেমে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [তাবারী] অনুরূপভাবে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ অবস্থায় পড়লে একবার এমনভাবে বেহুশ হয়ে যান যে সবাই ধারণা করে বসেছিল যে, তিনি বুঝি মারাই গেছেন। তখন তার স্ত্রী উম্মে

الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾

বিনয়ীরা ছাড়া[১] অন্যদের উপর কঠিন।

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. যারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তাদের রব-এর সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে এবং নিশ্চয় তারা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে[২]।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. হে ইস্‌রাঈল বংশধরগণ! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম। আর

কুলসুম মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৬৯]

(১) কুরআন ও সুন্নায় যেখানে خُشُوْعٌ বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা ও অপারগতাজনিত সেই মানসিক অবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। এর ফলে 'ইবাদাত সহজতর হয়ে যায়। কখনো এর লক্ষণাদি দেহেও প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সে শিষ্টাচারসম্পন্ন বিনম্র ও কোমলমন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে আল্লাহ্‌ভীতি ও নম্রতা না থাকে, মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিনম্র হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয় নয়। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'মাথা উঠাও, বিনয় হৃদয়ে অবস্থান করে'। ইব্‌রাহীম নখয়ী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, 'মোটা কাপড় পরা, মোটা খাওয়া এবং মাথা নত করে থাকাই বিনয় নয়'। خُشُوْعٌ বা বিনয় অর্থ 'অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবার সংগে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্ তা'আলা যা ফরয করে দিয়েছেন তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রিভূত করে নেয়া।' সারকথা, ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণা মাত্র। আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ক্ষমার্হ।

(২) আয়াতে বর্ণিত ظَنٌّ শব্দটির অর্থ, মনে করা বা ধারনা করা। কিন্তু মুজাহিদ বলেন, কুরআনে যেখানে ظَنٌّ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই 'নিশ্চিত জ্ঞানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [তাবারী, ইবনে কাসীর] তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ظَنٌّ শব্দটি يَقِيْنٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হলেও সবস্থানেই যে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাপারটি এমন নয়, যেমন, সূরা আল-জাসিয়াহ: ২৪, সূরা আল-বাকারাহ: ৭৮, সূরা আন-নিসা: ১৫৭, সূরা আল-আন'আম:১১৬। [আত-তাফসীরুস সহীহ] তবে এখানে সমস্ত মুফাসসিরের মতেই ظَنٌّ শব্দটি يَقِيْنٌ বা নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান]

নিশ্চয় আমি সমগ্র সৃষ্টিকুলের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম[১]।

৪৮. আর তোমরা সে দিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না[২]। আর কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না[৩]

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝٤٨

(১) কাতাদাহ ও মুজাহিদ বলেন, তাদেরকে তৎকালীন সময়ের সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। বর্তমানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। [তাফসীর আব্দুর রাজ্জাক, তাবারী] তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়াদি সম্পর্কে আবুল আলীয়াহ বলেন, তাদেরকে রাজত্ব, রাসূল, কিতাব ইত্যাদি দিয়ে ঐ সময়কার সমস্ত সৃষ্টিজগত থেকে আলাদা মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবনে কাসীর বলেন, অবশ্যই এ শ্রেষ্ঠত্ব তৎকালীন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত বলতে হবে। কারণ, এ উম্মত অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত তাদের থেকেও উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে। আহ্লে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা ছিল তাদের জন্য ভাল।" [সূরা আলে ইমরান: ১১০] তাছাড়া হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সত্তরটি উম্মত পূর্ণ করবে। তন্মধ্যে তোমরা হচ্ছ আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম এবং সম্মানিত"। [ইবনে মাজাহ: ৪২৮৭, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩]

(২) অর্থাৎ কেউ অপর কারও পক্ষ থেকে কোন কিছু আদায় করবে না। [তাবারী] যেমন মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন, "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং ভয় কর সে দিনকে, যখন কোন পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু আদায় করবে না, অনুরূপ কোন সন্তান সেও তার পিতার পক্ষ থেকে আদায়কারী হবে না" [সূরা লুকমান: ৩৩] তাছাড়া হাদীসেও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ ঐ বান্দাকে রহমত করুন, যার কাছে তার কোন ভাইয়ের কোন ইযযত আবরুর উপর হামলা জনিত যুলুম, অথবা তার সম্পদ ও সম্মানের উপর আঘাত ছিল, তারপর সে সেটা থেকে নিজেকে বিমুক্ত করতে পেরেছে, ঐ দিনের পূর্বেই যে দিন কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। বরং যদি তার কোন নেকী থাকে তবে তা থেকে তা নিয়ে যাওয়া হবে। আর যদি নেকী না থাকে তবে তার উপর মাযলুমের পাপসমূহ চাপিয়ে দেয়া হবে।" [বুখারী: ৬৫৩৪]

(৩) আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যাচ্ছে যে, আখেরাতে শাফা'আত বা সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। মূলতঃ ব্যাপারটি এরকম নয়। এ আয়াতের উদ্দেশ্য শুধু কাফের-মুশরিক, আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের জন্য কোন শাফা'আত বা সুপারিশ কাজে

এবং কারো কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না। আর তারা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না(১)।

আসবে না। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর আল্লাহ্ যার উপর সন্তুষ্ট নয় তার জন্য তারা সুপারিশ করবে না"। [সূরা আল-আম্বিয়া: ২৮] আল্লাহ্ কাদের উপর সন্তুষ্ট নয় তা আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করে বলেছেন, "আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের কুফরীতে সন্তুষ্ট নন।" [সূরা আয-যুমার:৭] সুতরাং কাফেরদের জন্য কোন সুপারিশ নয়। আর কাফেররাও হাশরের দিন স্বীকৃতি দিবে যে, তাদের জন্য কোন সুপারিশকারী নেই, তারা বলবে "আমাদের তো কোন সুপারিশকারী নেই" [সূরা আশ-শু'আরা: ১০০] তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ নিজেও বলেছেন, "সুতরাং কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোন উপকার দিবে না"। [সূরা আল-মুদ্দাসসির:৪৮] এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যারা কুফরী, শির্কী, নিফাকী অবস্থায় মারা যাবে তাদের জন্য কোন শাফা'আত বা সুপারিশ নেই।

পক্ষান্তরে মুমিনদের জন্য শাফা'আত বা সুপারিশ অবশ্যই হবে। যা কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তাদের জন্য সুপারিশের ব্যাপারেও শর্ত হচ্ছে, তন্মধ্যে প্রথম শর্ত হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঈমান অবশিষ্ট থাকতে হবে। মূলত: এ ঈমানের কারণেই শাফা'আত তথা সুপারিশের হকদার হয়েছে। যার সামান্যতম ঈমান আছে তার উপর আল্লাহ্র সামান্যতম সন্তুষ্টি অবশিষ্ট আছে। সুতরাং যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তার জন্য আল্লাহ্র সামান্যতম সন্তুষ্টি হলেও থাকতে হবে। যদিও অন্য অপরাধের কারণে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে নি। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, শাফা'আত বা সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ্র কাছ থেকে অনুমতি থাকতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, "এমন কে আছে যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করে?" [সূরা আল-বাকারাহ:২৫৫] তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, যিনি সুপারিশ করবেন তার উপরও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি থাকতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, "আর আসমানসমূহে বহু ফিরিশ্তা রয়েছে; তাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না, তবে আল্লাহ্র অনুমতির পর; যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন ও যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট" [সূরা আন-নাজম: ২৬] অর্থাৎ যিনি সুপারিশ করবেন তার কথা-বার্তা ও সুপারিশ আল্লাহ্র মনঃপুত হতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না" [সূরা ত্বা-হা: ১০৯] এ তিনটি শর্ত পাওয়া যাওয়া সাপেক্ষে নবী-রাসূল, শহীদগণ ও নেককার মুমিনগণ শাফা'আত বা সুপারিশ করবেন। যা বহু হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত।

(১) আলোচ্য আয়াতে যেদিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো কেয়ামতের দিন। সাধারণতঃ মানুষের কোন শাস্তির হুকুম হলে তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ নিম্নলিখিত চারটি উপায় অবলম্বন করেঃ

৪৯. আর স্মরণ কর, যখন আমরা ফির'আউনের বংশ হতে তোমাদেরকে নিস্কৃতি দিয়েছিলাম, তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিত। তোমাদের পুত্রদের যবেহ করে ও তোমাদের নারীদের বাঁচিয়ে রাখত[১]।

وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

১) একজনের পরিবর্তে অন্যজন স্বতঃস্ফুর্তভাবে শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে "কেউ কারো পক্ষ থেকে আদায় করে না" বলে কেয়ামতের দিন এমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা নাকচ করে দেন।

২) অথবা, একজনের জন্য অপরজন সুপারিশ করে শাস্তি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্ভাবনাও নাকচ করে বলেনঃ "কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না"।

৩) অথবা, বিনিময় আদায়ের মাধ্যমে কেউ কেউ শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়। সে বিনিময় দু'ধরনের হতে পারে, ক) অন্যের কাছ থেকে কিছু সওয়াব লাভ করে তার বিনিময়ে মুক্তির ব্যবস্থা করা। খ) টাকা-পয়সা ইত্যাদির বিনিময়ে মুক্তির ব্যবস্থা করা। আল্লাহ্ তা'আলা "কারো কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না", এ কথা বলে এমন সম্ভাবনাও নাকচ করে দিয়েছেন।

৪) অথবা, শাস্তির হুকুমের বিপরীতে অপরাধীকে সাহায্যকারী দল থাকে, যারা তাকে তা না মানতে বা তার শাস্তি লাঘব করতে সাহায্য করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা "আর তারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না" এ কথা দ্বারা এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে, তারা ঈমান আনেনি। কিন্তু যদি তাদের ঈমান থাকত তবে শর্ত সাপেক্ষে এ চারটির কোন কোনটি কাজে আসত। মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে ঈমান ব্যতীত আখেরাতে সেগুলোর কোনটাই কার্যকর হবে না।

(১) কোন ব্যক্তি ফির'আউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। এজন্য ফির'আউন নবজাত পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করলো। আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোন রকম আশংকা ছিল না, সুতরাং তাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রইলো। দ্বিতীয়তঃ এতে তার নিজস্ব একটি মতলবও ছিল যে, সে স্ত্রীলোকদেরকে দিয়ে ধাত্রী-পরিচারিকার কাজও করানো যাবে। সুতরাং এ অনুকম্পাও ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এখানে উল্লেখিত হত্যাকাণ্ড থেকে অব্যাহতি দানের কথা বুঝানো হয়েছে, যা এক অনুগ্রহ ও নেয়ামত। আর নেয়ামতের ক্ষেত্রেই শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা হয়। এত বড় নে'আমতের শুকরিয়া স্বরূপ নবীগণ কি করেছেন? হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা আগমন করলেন, তখন দেখলেন যে, ইয়াহূদীরা মহররমের দশ তারিখের সাওম পালন করছে। তিনি তাদেরকে বললেন,

আর এতে ছিল তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা(১);

৫০. আর স্মরণ কর, যখন আমরা তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম(২) এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফির‘আউনের বংশকে নিমজ্জিত করেছিলাম। আর তোমরা তা দেখছিলে।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. আর স্মরণ কর, যখন আমরা মূসার সাথে চল্লিশ রাতের অঙ্গিকার করেছিলাম(৩), তার (চলে যাওয়ার) পর তোমরা গো-বৎসকে (উপাস্যরূপে)

وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾

ব্যাপারটি কি? তারা বলল: এটি একটি ভাল দিন। এ দিনে আল্লাহ্ বনী ইসরঈলকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে নাজাত দিয়েছিলেন, ফলে মূসা আলাইহিস সালাম এ দিন সাওম পালন করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা তোমাদের চেয়ে মূসার বেশী হকদার, তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দিনের সাওম পালন করলেন এবং লোকদেরকে সেদিনের সাওম রাখার নির্দেশ দিলেন।" [বুখারী: ২০০৪, মুসলিম: ১২৮]

(১) অবশ্য ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সহীহ সনদে بلاء শব্দের অর্থ, নেয়ামত বর্ণিত হয়েছে। তখন উদ্দেশ্য হবে, তাদের নাজাত ছিল এক বড় নেয়ামত। [তাবারী]

(২) এখানে কিভাবে ফির‘আউনের হাত থেকে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন সেটার বর্ণনা দিচ্ছেন। অন্য আয়াতে এসেছে, "আর অবশ্যই আমি মূসাকে ওহী করে বলেছিলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতেই চলে যান" [ত্বাহা: ৭৭, আশ-শু‘আরা:৫২] যাওয়ার পথে তার সামনে সমুদ্র বাধা হয়ে দাঁড়াল। আল্লাহ্ তা‘আলা মূসাকে বললেন, "আপনি সমুদ্রকে লাঠি দিয়ে আঘাত করুন, ফলে তা ভাগ হল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল।" [সূরা আশ-শু‘আরা: ৬৩] আর এভাবেই আল্লাহ্ তা‘আলা সমুদ্র ভাগ করে দিলেন।

(৩) এখানে চল্লিশ রাতের ব্যাপারে এটা বলেন নি যে, এ চল্লিশ রাতের ওয়াদা প্রথমেই নিয়েছিলেন কি না? কিন্তু অন্যত্র বলে দিয়েছেন যে, তাকে প্রথমে ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছিলেন তারপর আরও দশ রাত বাড়িয়ে দিয়ে তা চল্লিশে পূর্ণ করে দিলেন। [সূরা আল-আ‘রাফ: ১৪২]

গ্রহণ করেছিলে[১]; আর তোমরা হয়ে গেলে যালিম[২] ।

৫২. এর পরও আমরা তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর ।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর স্মরণ কর, যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও ‘ফুরকান[৩]’ দান

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ

(১) এখানে গো বৎসের উৎস ও কারিগর সম্পর্কে কিছু বলেন নি । অন্যত্র সেটা বিস্তারিত এসেছে । আল্লাহ্ বলেন, “মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুর তৈরী করল, একটা দেহ, যা ‘হাম্বা’ শব্দ করত । তারা কি দেখল না যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলে না ও তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা ওটাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল যালেম ।” [সূরা আল-আ'রাফ: ১৪৮] আরও বলেন, “তারা বলল, ‘আমরা আপনাকে দেয়া অংগীকার স্বেচ্ছায় ভংগ করিনি ; তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও (সেখানে কিছু মাটি) নিক্ষেপ করে । ‘তারপর সে তাদের জন্য গড়লো এক বাছুর, এক অবয়ব, যা হাম্বা রব করত ।’ তারা বলল, ‘এ তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্, কিন্তু মূসা ভুলে গেছে ।’” [সূরা ত্বা-হা: ৮৭-৮৮]

(২) এ ঘটনা ঐ সময়ের যখন ফির'আউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর ইসরাঈল-বংশধররা কারো কারো মতে মিশরে ফিরে এসেছিল, আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও বসবাস করছিল । তখন মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর খেদমতে ইসরাঈল-বংশধররা আরয করলো যে, আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত । যদি আমাদের জন্য কোন শরী‘আত নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসেবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নেবো । মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা অংগীকার প্রদান করলেন যে, আপনি তূর পর্বতে অবস্থান করে একমাস পর্যন্ত আমার ‘ইবাদাতে নিমগ্ন থাকার পর আপনাকে এক কিতাব দান করবো । মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম তাই করলেন । এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-কে অতিরিক্ত আরও দশদিন ‘ইবাদাত করতে নির্দেশ দিলেন । এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো আর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-কে তাওরাত দিলেন । মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম তো ওদিকে তূর-পর্বতে রইলেন, এদিকে সামেরী নামক এক ব্যক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গোবৎসের একটি প্রতিমূর্তি তৈরী করলো এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত জিবরাঈল ‘আলাইহিস্ সালাম-এর ঘোড়ার খুরের তলার কিছু মাটি প্রতিমূর্তির ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়ায় সেটি শব্দ করতে থাকলো । আর ইসরাঈল-বংশধররা তারই পূজা করতে শুরু করে দিল । [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(৩) ‘ফুরকান’ দ্বারা হয়ত তাওরাতের অন্তর্ভুক্ত শরী‘আতী বিধানমালাকে বুঝানো হয়েছে ।

تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾

করেছিলাম; যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পার।

وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا أَنْفُسَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۭ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۭ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾

৫৪. আর স্মরণ কর, যখন মূসা আপন জাতির লোকদের বললেন, 'হে আমার জাতি! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, কাজেই তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করে তোমাদের স্রষ্টার কাছে তাওবা কর। তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তারপর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন। অবশ্যই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করব না,' ফলে তোমাদেরকে বজ্র পাকড়াও করলো, যা তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তারপর আমরা তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করেছি তোমাদের মৃত্যুর পর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ

৫৭. আর আমরা মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের

কেননা, শরী'আতের মাধ্যমে যাবতীয় বিশ্বাসগত ও কর্মগত মতবিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়। অথবা মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে- যা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার দাবীর ফয়সালা হয়। অথবা ফুরকানের মানে হচ্ছে দ্বীনের এমন জ্ঞান, বোধ ও উপলব্ধি, যার মাধ্যমে মানুষ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। অথবা স্বয়ং তাওরাতই এর অর্থ। কেননা, এর মধ্যেও মীমাংসাকারীর জন্য প্রয়োজনীয় উভয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ রয়েছে।

الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۖ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾

নিকট 'মান্না' ও 'সাল্ওয়া[১]' প্রেরণ করলাম। (বলেছিলাম), 'আহার কর উত্তম জীবিকা, যা আমরা তোমাদেরকে দান করেছি'। আর তারা আমাদের প্রতি যুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই যুলুম করেছিল।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর স্মরণ কর, যখন আমরা বললাম, এই জনপদে প্রবেশ করে তা হতে যা ইচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যে আহার কর এবং দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর। আর বলঃ 'ক্ষমা চাই'। আমরা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব। অচিরেই আমরা মুহসীনদেরকে বাড়িয়ে দেব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. কিন্তু যালিমরা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। কাজেই আমরা যালিমদের প্রতি তাদের অবাধ্যতার কারণে আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করলাম[২]।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ

৬০. আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার জাতির জন্য পানি চাইলেন। আমরা বললাম,

(১) ইসরাঈল-বংশধরদের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর প্রেরিত আসমানী খাবার। যা গাছের উপরে কুয়াসার ন্যায় জমা হয়ে থাকত। এ সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল-কামআ' [এক প্রকার উদ্ভিদ, যা অনেকটা মাশরুমের মত] মান্না এর অন্তর্ভুক্ত। আর এর পানি চোখের আরোগ্য'। [বুখারীঃ ৪৪৭৮] আর 'সালওয়া' হলো এক প্রকার পাখি, যা চড়ুই পাখি থেকে আকারে একটু বড়।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মহামারী এমন একটি রোগ যা বনী ইসরাঈলের উপর অথবা তোমাদের পূর্বের লোকদের উপর আকাশ থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সুতরাং যখন তোমরা কোথাও এর সংবাদ কোথাও শুনতে পাবে তখন সেখানে যাবে না। আর তোমরা যেখানে থাক সেখানে নাযিল হলে সেখান থেকে পালিয়ে যেও না।" [বুখারী: ৩৪৭৩, মুসলিম: ২২১৮]

الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ
كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾

'আপনার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করুন'। ফলে তা হতে বারোটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। (বললাম,) 'আল্লাহ্‌র দেয়া জীবিকা হতে তোমরা খাও, পান কর এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না'।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ
بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ
قَالَ أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ أَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ
خَيْرٌ ۚ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۗ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ
مِّنَ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ
ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. আর যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার রব-এর কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর---তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সব্‌জি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ উৎপাদন করেন'। মূসা বললেন, 'তোমরা কি উত্তম জিনিষের বদলে নিম্নমানের জিনিষ চাও? তবে কোন শহরে চলে যাও, তোমরা যা চাও, সেখানে তা আছে'[১]। আর তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য আপতিত হলো এবং তারা আল্লাহ্‌র গযবের শিকার হল। এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং নবীদেরকে

(১) তীহ্‌ উপত্যকায় 'মান্না' ও 'সালওয়া'র প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই তারা ওসব শব্জী ও শস্যের জন্য আবেদন করলো। এ প্রান্তরের সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি শহর ছিল। সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করে উৎপন্ন ফসলাদি ভোগের নির্দেশ দেয়া হলো। আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্‌ সালাম-এর মাধ্যমে পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি নির্দেশ অমান্য কর, তবে চিরকাল তোমরা অন্য জাতির দ্বারা শাসিত হতে থাকবে। যেমন, বলা হয়েছে- ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ﴾ 'আর সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার রব জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় তিনি ইয়াহূদীদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত এমন শাসক প্রেরণ করতে থাকবেন, যারা তাদের প্রতি কঠোর শাস্তি পৌঁছাতে থাকবে'। [সূরা আল-আ'রাফ: ১৬৭]

অন্যায়ভাবে হত্যা করত[১]। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করার জন্যই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল[২]।

৬২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে[৩] এবং নাসারা[৪] ও সাবি'ঈরা[৫] যারাই আল্লাহ্ ও শেষ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী আযাব হবে সে লোকের যাকে কোন নবী হত্যা করেছে, অথবা কোন নবীকে হত্যা করেছে। আর ভ্রষ্ট ইমাম বা নেতা এবং ভাস্কর্য নির্মাণকারী।" [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৪১৩,৪১৫]

(২) কাতাদাই এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, তোমরা আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ; কেননা পূর্বেকার লোকেরা এ দু'টির কারণেই ধ্বংস হয়েছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) তাদেরকে ইয়াহূদী নামকরণ তারা নিজেরাই করেছিল। কারও কারও মতে ইয়া'কুব আলাইহিস সালামের পুত্র 'ইয়াহূদা' এর নামানুসারে তাদের এ নাম দেয়া হয়েছিল। অপর কারও কারও মতে, 'হাওদ' শব্দের অর্থ ঝুঁকে যাওয়া। তারা তাওরাত পাঠের সময় সামনে-পিছনে ঝুঁকে যেত বলে তাদের এ নাম হয়েছে। অথবা 'হাওদ' এর অর্থ ফিরে আসা। তারা বলেছিল ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ "আমরা তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করলাম।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৬] সে অনুসারে তাদের নাম হয়েছে, ইয়াহূদ। পবিত্র কুরআনে যেখানেই তাদেরকে এ নামে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই তাদের খারাপ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইয়াহূদী নামটি কোন ভাল গুণবাচক নাম নয়।

(৪) কাতাদাহ্ বলেন, তাদেরকে নাসারা নামকরণ করা হয়েছে, কেননা তারা 'নাসেরাহ' নামক এক গ্রামের অধিবাসী ছিল যেখানে ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের কাছে এসেছিলেন। এ নামে তারা নিজেদেরকে নামকরণ করেছিল। তাদেরকে এ নাম দেয়ার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দেন নি। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৫) সাবে'ঈন কারা এ নিয়ে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ তারা ইয়াহূদী-নাসারা এবং অগ্নি-উপাসকদের মাঝামাঝি একটি জাতি। তাদের কোন সুনির্দিষ্ট দ্বীন নেই। হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ তারা ফেরেশ্তা-উপাসক জাতি। তারা কেবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করে। রাগেব ইস্পাহানী বলেনঃ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর দ্বীনের অনুসরণ করে চলত। বস্তুতঃ সাবে'ঈনরা এক বিরাট জাতি, যাদের অস্তিত্ব ইরাক থেকে শুরু করে পূর্ব দিকের দেশগুলোতে দেখা যায়। বর্তমানেও ইরাকে তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাদের কিছু 'ইবাদাত, যেমনঃ অযু, সালাত, কেবলা, সাওম ইত্যাদি প্রায় মুসলিমদের মতই। কিন্তু, আকীদাগতভাবে তারা দু'ভাগে বিভক্ত।

صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

দিনের প্রতি ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের রব-এর কাছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[১]।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. আর স্মরণ কর, যখন আমরা তোমাদের অংগীকার নিয়েছিলাম[২] এবং তোমাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম 'তুর' পর্বত; (বলেছিলাম,) 'আমরা যা দিলাম দৃঢ়তার সাথে[৩] তা

(এক) যারা একমাত্র আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করে। কিন্তু তারা কোন রাসূলের অনুসরণ করে না। (দুই) যারা তারকা-পূজারী এবং পৃথিবীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সরাসরি তারকার প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করে।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, আমার দরবারে কোন ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি ঈমান ও কর্মে পুরোপুরি আনুগত্য স্বীকার করবে, সে পূর্বে যেমনই থাকুক না কেন, আমার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, কুরআন নাযিল হওয়ার পর 'পূর্ণ আনুগত্য' মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুসলিম হওয়াতেই সীমাবদ্ধ। আয়াতে ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ বা "সৎকাজ করে" এটুকু বলার মাধ্যমে একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করার দ্বারাই তাদের নাজাত পাওয়া সীমাবদ্ধ এটা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কারণ, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ না করা হয়, তবে কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যার অর্থ এই যে, যে মুসলিম হবে, সে-ই আখেরাতে নাজাতের অধিকারী হবে। অর্থাৎ পূর্বোল্লেখিত ইয়াহূদী, নাসারা, সাবেয়ী, মাজুস এ সমস্ত লোকদের এতসব অনাচার ও গর্হিত আচরণের পরও কেউ যদি মুসলিম হয়ে যায়, তবে আমি সব মাফ করে দেব।

(২) আবুল আলীয়াহ বলেন, এ অঙ্গীকার ছিল, নিষ্ঠাসহকারে একমাত্র আল্লাহ্ ইবাদত করা। আর কারও ইবাদত না করা। [আত-তাফসীরুস সহীহ] তবে অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর সাথে সাথে অঙ্গীকারের অন্যান্য বিষয়াবলী আয়াতের শেষেই বর্ণিত হয়েছে।

(৩) আয়াতে বর্ণিত بِقُوَّةٍ এর তাফসীর কেউ করেছেন, দৃঢ়তার সাথে। কাতাদাহ করেছেন, গুরুত্বের সাথে। আবুল আলীয়াহ বলেছেন, আনুগত্যের সাথে। আর মুজাহিদ বলেছেন, এর উপর আমল করার স্বীকারোক্তির সাথে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার(১)’ ।

৬৪. এরপরও তোমরা মুখ ফিরালে! অতঃপর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা না থাকলে তোমরা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে(২) ।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫. আর তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ ﴿٦٥﴾

(১) যখন মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-কে তূর পর্বতে তাওরাত প্রদান করা হল, তখন তিনি ফিরে এসে তা ইসরাঈল-বংশধরকে দেখাতে ও শোনাতে আরম্ভ করলেন । এতে হুকুমগুলো কিছুটা কঠোর ছিল - কিন্তু তাদের অবস্থানুযায়ীই ছিল । এ সম্পর্কে প্রথম তারা এ কথাই বলেছিল যে, যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদেরকে বলে দেবেন যে, ‘এটা আমার কিতাব’ তখনই আমরা মেনে নেবো । (যে বর্ণনা উপরে চলে গেছে) মোটকথা যে সত্তরজন লোক মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে গিয়েছিল, তারাও ফিরে এসে সাক্ষী দিল । কিন্তু ইসরাঈল-বংশধররা পরিস্কারভাবে বলে দিল, আমাদের দ্বারা এ গ্রন্থের উপর আমল করা সম্ভব হবে না । ফলে আল্লাহ্ তা‘আলা ফেরেশ্‌তাদেরকে হুকুম করলেন, ‘তূর পর্বতের একটি অংশ তুলে নিয়ে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে দাও এবং বল, হয় কিতাব মেনে নাও, নইলে এক্ষুণি মাথার উপর পড়লো । অবশেষে নিরুপায় হয়ে তা মেনে নিতে হলো । এ আয়াতে বর্ণিত ‘তূর পাহাড় উঠানোর’ তাফসীর আল্লাহ্ তা‘আলা অন্য আয়াতে করে দিয়েছেন । যেখানে বলা হয়েছে, “স্মরণ করুন, আমরা পর্বতকে তাদের উপরে উঠাই, আর তা ছিল যেন এক শামিয়ানা । তারা মনে করল যে, ওটা তাদের উপর পড়ে যাবে । বললাম, ‘আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং ওটাতে যা আছে তা স্মরণ কর” [সূরা আল-আ‘রাফ: ১৭১]

(২) এ আয়াতের সম্বোধন বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে সমস্ত ইয়াহূদীদের করা হচ্ছে, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে উপস্থিত ছিল । রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান না আনাও যেহেতু উল্লেখিত প্রতিজ্ঞা ভংগেরই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তাদেরকে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভংগকারীদের আওতাভুক্ত করে উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, এরপরও আমি দুনিয়াতে তোমাদের উপর তেমন কোন আযাব নাযিল করিনি, যেমনটি পূর্বকালে প্রতিজ্ঞা ভংগকারীদের উপর নাযিল হয়ে থাকত । এটা একান্তই আল্লাহ্‌র রহমত ।

জেনেছিলে[১]। ফলে আমরা তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও'।

فَجَعَلْنَٰهَا نَكَٰلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

৬৬. অতএব আমরা এটা করেছি তাদের সমকালীন ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি[২]। আর মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ[৩]।

---

(১) আয়াতে বর্ণিত এ ঘটনাটি দাউদ 'আলাইহিস্ সালাম-এর আমলেই সংঘটিত হয়। ইসরাঈল-বংশধরদের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্ধারিত দিন। এ দিন মৎস শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। তারা প্রথম প্রথম কলা-কৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের। তারা এ অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হলো না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করতো আর অপর ভাগে সৎ ও বিজ্ঞজনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কাতাদাহ্ বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শুকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে চিনতো এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করতো। হাদীসে এসেছে, জনৈক সাহাবী একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের যুগের বানর ও শুকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত ইয়াহূদী সম্প্রদায়?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন তখন তিনি তাদের অবশিষ্ট বংশধর রাখেন না। বস্তুতঃ বানর ও শূকর পৃথিবীতে তাদের পূর্বেও ছিল'। [মুসলিমঃ ২৬৬৩] সুতরাং বর্তমান বানরদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরের কোন সম্পর্ক নেই। [দেখুন, আত-তাফসীরুস সহীহ] যেমনিভাবে এ ধারণা করারও কোন সুযোগ নেই যে, মানুষ কোন এক সময় বানরের বংশধর ছিল।

(২) এ তাফসীর আবুল আলীয়াহ থেকে বর্ণিত। পক্ষান্তরে মুজাহিদ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এর অর্থ "আমরা এটাকে তাদের এ ঘটনার পূর্বের গুনাহ এবং এ ঘটনার গোনাহের জন্য শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করে দিলাম। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে দিলেন।

(৩) এ ঘটনা মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইয়াহূদীরা যে অন্যায় করেছে তোমরা তা করতে

৬৭. আর স্মরণ কর[১], যখন মূসা তার জাতিকে বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার আদেশ দিয়েছেন', তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ?' মূসা বললেন, 'আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই'।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার রবকে আহ্বান কর তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, সেটা কিরূপ?' মূসা বললেন, 'আল্লাহ্ বলছেন, সেটা এমন গাভী যা বৃদ্ধও নয়, অল্পবয়স্কও নয়, মধ্যবয়সী। অতএব তোমাদেরকে যে আদেশ করা হয়েছে তা পালন কর'।

قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার রবকে ডাক, সেটার রং কি, তা যেন আমাদেরকে বলে দেন'। মূসা বললেন, তিনি বলেছেন, সেটা হলুদ বর্ণের গাভী, উজ্জ্বল গাঢ় রং বিশিষ্ট, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়'।

قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ ﴿٦٩﴾

যেও না। এতে তোমরা ইয়াহূদীদের মত আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা বাহানা করে হালাল করে ফেলবে।" [ইবনে বাত্তাহ: ইবতালুল হিয়াল: ৪৬, ৪৭]

(১) এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ইসরাঈল-বংশধরদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। হত্যাকারী কে? তা জানা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন, আল্লাহ্ তাদেরকে একটি গরু জবাই করতে নির্দেশ দেন। ইসরাঈল-বংশধররা কোন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হলে এতসব শর্তও আরোপিত হতো না, বরং যেকোন গরু জবাই করলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারতো। কিন্তু তারা প্রশ্ন করে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে নেয়। শেষ পর্যন্ত তারা সেটা করতে সমর্থ হয়। তারপর গরু জবাই করার পর মৃতদেহে সে গরুর গোশতের টুকরো স্পর্শ করাতেই সে জীবিত হয়ে যায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে তৎক্ষণাৎ আবার মারা যায়। [ইবনে কাসীর থেকে সংক্ষেপিত]

৭০. তারা বলল, ‘তোমার রবকে আহ্বান কর, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, সেটা কোন্‌টি? নিশ্চয় গাভীটি আমাদের জন্য সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেছে। আর আল্লাহ্‌ ইচ্ছে করলে আমরা নিশ্চয় দিশা পাব’[১]।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝٧٠

৭১. মূসা বললেন, ‘তিনি বলছেন, সেটা এমন এক গাভী যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, সুস্থ ও নিখুঁত’। তারা বলল, ‘এখন তুমি সত্য নিয়ে এসেছ’। অবশেষে তারা সেটাকে যবেহ্‌ করল, যদিও তারা তা করতে প্রস্তুত ছিল না।

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۝٧١

৭২. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে তারপর একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে, আর তোমরা যা গোপন করেছিলে আল্লাহ্‌ তা ব্যক্তকারী।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۝٧٢

৭৩. অতঃপর আমরা বললাম, ‘এর কোন অংশ দিয়ে তাকে আঘাত কর’। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন তাঁর নিদর্শন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার[২]।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝٧٣

(১) ইকরিমাহ বলেন, যদি তারা “আল্লাহ ইচ্ছে করলে” বাক্য না বলত, তবে কখনই সে ধরনের গরু খুঁজে পেত না। [তাবারী]

(২) শানকীতী বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, বনী ইসরাইলের মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে সক্ষম হওয়ার অর্থই জন্মের পরে পুনরুত্থানের প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়া। কেননা, যিনি একজনকে মৃত্যুর পরে জীবিত করতে সমর্থ, তিনি অবশ্যই সমস্ত জীবকে মৃত্যুর পর জীবিত করতে সক্ষম। অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন, “তোমাদের

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪. এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, যেন পাথর কিংবা তার চেয়েও কঠিন। অথচ কোন কোন পাথর তো এমন যা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, আর কিছু এরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা হতে পানি নির্গত হয়, আবার কিছু এমন যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ধ্বসে পড়ে[১], আর তোমরা যা কর

সবার সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।" [সূরা লুকমান: ২৮]

(১) এখানে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছেঃ (১) পাথর থেকে বেশী পানি প্রসরণ, (২) কম পানির নিঃসরণ। এ দুটি প্রভাব সবারই জানা। (৩) নীচে গড়িয়ে পড়া। মুজাহিদ বলেন, এ সবগুলিই আল্লাহ্‌র ভয়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, পাথরের উপর যে ক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয় সেগুলো বাস্তব ঘটনা। প্রাণহীন জড়বস্তুর মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলা এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেন। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "এটা উহুদ পাহাড়, সে আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি।" [মুসলিম: ১৩৬৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "আমি মক্কায় এক পাথরকে চিনি, যে পাথর আমি নবী হওয়ার পূর্ব হতেই আমাকে সালাম করত, আমি এখনও সেটাকে চিনি।" [মুসলিম: ২২৭৭] তবে পাথরের উপর সংঘটিত উপরোক্ত তিনটি অবস্থার মধ্যে তৃতীয় ক্রিয়াটি কারো কারো অজানা থাকতে পারে। অর্থাৎ কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তা দ্বারা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইয়াহূদীদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রুসজল হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম নরম হয়। কিন্তু ইয়াহূদীদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথরের চেয়েও বেশী শক্ত। কতক পাথরের মধ্যে উপরোক্তরূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, আল্লাহ্‌র ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর উপরোক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় বেশী দুর্বল। কিন্তু ইয়াহূদীদের অন্তর এ দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, তারা এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও স্বার্থান্বেষী যে, তারা অন্যের সদুপদেশে কখনো মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না। আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে তাদের 'কঠিন হৃদয়' হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়নি। তবে অন্যান্য আয়াতে সেটা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, "সুতরাং তাদের অংগীকার ভংগের জন্য আমরা তাদেরকে লা'নত করেছি ও তাদের

আল্লাহ্ সে সম্পর্কে গাফিল নন।

৭৫. তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করে, তারপর তারা তা অনুধাবন করার পর বিকৃত করে, অথচ তারা জানে[১]।

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

হৃদয় কঠিন করেছি; তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গেছে।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ১৩] "আর তারা যেন তাদের মত না হয় যাদেরকে আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল--- অতঃপর বহু কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের অন্তর সমূহ কঠিন হয়ে পড়েছিল।" [সূরা আল-হাদীদ:১৬]

(১) এখানে আল্লাহ্‌র বাণী অর্থ তাওরাত। 'শ্রবণ করা' অর্থ নবীদের মাধ্যমে শ্রবণ করা। 'পরিবর্তন করা' অর্থ কোন কোন বাক্য অথবা তার অর্থ অথবা উভয়টিকে বিকৃত করে ফেলা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে যেসব ইয়াহূদী ছিল, তাদের দ্বারা উল্লেখিত কোন কুকর্ম যদি সংঘটিত নাও হয়ে থাকে, তবুও পূর্ববর্তীদের এসব দুস্কর্মকে তারা অপছন্দ ও ঘৃণা করতো না। এ কারণে তারাও কার্যতঃ পূর্ববর্তীদেরই মত। কিন্তু কারা এবং কিভাবে তাদের কিতাবকে বিকৃত করত, তা এখানে বলা হয়নি। মুফাসসিরগণের মধ্যে মুজাহিদ বলেন, এ বিকৃত করা ও গোপন করার কাজটি তাদের আলেম সমাজই করত। আবুল আলীয়াহ্ বলেন, তারা তাদের কিতাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সমস্ত গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোকে স্থানচ্যুত করে বিকৃত করত। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদাহ বলেন, আয়াতে বর্ণিত লোকগুলো হচ্ছে, ইয়াহূদরা। তারা আল্লাহ্‌র বাণী শুনত; তারপর সেগুলো বুঝে-শুনে বিকৃত করত। তারা আল্লাহ্‌র বিধানেও পরিবর্তন সাধন করত, হাদীসে এসেছে, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল যে, তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী ব্যভিচার করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা তাওরাতে "রাজ্‌ম" বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে কি কিছু পাও? তারা বলল, আমরা তদেরকে শাস্তি হিসেবে তাদেরকে লজ্জিত করি এবং বেত্রাঘাত করা হবে। অর্থাৎ তারা 'রাজম' অস্বীকার করল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতে 'রাজম' এর কথা আছে। তখন তারা তাওরাত নিয়ে আসল এবং সেটা মেলে ধরল। তখন তাদের একজন 'রাজম' এর আয়াতের উপর হাত রেখে এর আগে এবং পরের অংশ পড়ল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন,

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর তারা যখন মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। আবার যখন তারা গোপনে একে অন্যের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, তোমরা কি তাদেরকে তা বলে দাও, যা আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন(১); যাতে তারা এর মাধ্যমে তোমাদের রব-এর নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে? তবে তোমরা কি বুঝ না(২)?'

তুমি তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠালে দেখা গেল যে, সেখানে 'রাজম' এর আয়াত রয়েছে। তখন তারা বলল, মুহাম্মদ সত্য বলেছে। এতে 'রজম' এর আয়াত রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর 'রজম' করা হলো। আব্দুল্লাহ বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে লোকটি মহিলার উপর বাঁকা হয়ে তাকে পাথরের আঘাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল। [বুখারী: ৩৬৩৫]

(১) এখানে 'যা আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন' বলে কি বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মুমিনদের সাথে ইয়াহূদীদের সাক্ষাৎ হলে তারা মুমিনদের বলত- আমরা বিশ্বাস করি যে, তোমাদের সাথী আল্লাহ্‌র রাসূল। তবে তিনি শুধু তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, আমাদের প্রতি নয়। আবার শুধু তারা নিজেরা একত্রিত হলে একদল আরেক দলকে বলত- সাবধান! আরবদের কাছে তাও প্রকাশ করো না। কারণ, এর আগে তোমরা এই মুহাম্মদের সাহায্যে তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার কথা বলতে। এখন সে-ই তো তাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

(২) অর্থাৎ তারা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় বলত, এ নবী সম্পর্কে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখিত হয়েছে অথবা আমাদের পবিত্র কিতাবসমূহে আমাদের বর্তমান মনোভাব ও কর্মনীতিকে অভিযুক্ত করার মত যে সমস্ত আয়াত ও শিক্ষা রয়েছে, সেগুলো মুসলিমদের সামনে বিবৃত করো না। অন্যথায় তারা আল্লাহ্‌র সামনে এগুলোকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। আল্লাহ্‌ সম্পর্কে অজ্ঞ-মূর্খ ইয়াহূদীদের বিশ্বাস এভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তারা যেন মনে করত, দুনিয়ায় যদি তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে বিকৃত করে ও সত্য গোপন করে তাহলে এজন্য আখেরাতে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা চলবে না। তাই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে বেখবর মনে কর? [ইবনে কাসীর]

৭৭. তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন রাখে এবং যা ব্যক্ত করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন?

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

৭৮. আর তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা মিথ্যা আশা(১) ছাড়া কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে(২) ।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝

৭৯. কাজেই দুর্ভোগ(৩) তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ

(১) أَمَانِيَّ শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, মিথ্যা আশা। এ অর্থের পক্ষে অন্যান্য আয়াতও সাক্ষ্য দেয়। যেমন বলা হয়েছে, "আর তারা বলে, 'ইয়াহূদী অথবা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। এটা তাদের মিথ্যা আশা।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ১১১] আরও এসেছে, "তোমাদের আশা-আকাংখা ও কিতাবীদের আশা-আকাংখা অনুসারে কাজ হবে না" [সূরা আন-নিসাঃ ১২৩] উপরোক্ত দুই আয়াতেও أَمَانِيَّ শব্দ মিথ্যা আশা-আকাংখা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কোন কোন তাফসীরকার এর আরও একটি অর্থ করেছেন, তা হচ্ছে, লেখাপড়া না জানা। অর্থাৎ ইয়াহূদীদের মধ্যে এক গোষ্ঠী আছে যারা কোন লেখা পড়া জানে না। তাদের কাজ হলো অন্যের অন্ধ অনুসরণ করা। কিন্তুবাক্যের প্রথমে أُمِّيُّونَ শব্দের উল্লেখ থাকায় এ অর্থটি খুব বেশী উপযুক্ত নয়। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ৭৫-৭৮ আয়াতসমূহে ইয়াহূদীদের তিন শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে, আলেম সম্প্রদায় তাদের কাজ হলো আল্লাহ্র কালাম বিকৃত করা। আরেক দল হচ্ছে মুনাফিক। তারা মুমিনদের কাছে নিজেদেরকে মুমিন হিসেবে পেশ করে। আরেক শ্রেণী হচ্ছে, জাহেল মূর্খ গোষ্ঠী। তারা পড়ালেখা জানে না। তারা কেবল অন্যদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। [ইবনে কাসীর]

(৩) وَيْلٌ শব্দটি পবিত্র কুরআনে এখানেই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। ওপরে এর অর্থ করা হয়েছে, দূর্ভোগ। এছাড়া এর এক তাফসীর 'আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এটি জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, যদি পাহাড়ও এতে নিয়ে ফেলা হয় তবে তার তাপে তাও মিইয়ে যাবে'। [ইবনুল মুবারকের আয-যুহদ, নং ৩৩২] আবু আইয়াদ আমর ইবনে আসওয়াদ আল-আনাসী বলেন, وَيْلٌ হচ্ছে, জাহান্নামের মূল অংশ থেকে যে পুঁজ বয়ে যাবে তার নাম' [তাবারী] মোটকথাঃ সব রকমের শাস্তি ও ধ্বংস তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا
قَلِيْلًا ۚ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ
لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۝٧٩

অতঃপর সামান্য মূল্য পাওয়ার জন্য বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে'। অতএব, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস[১]।

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ۗ قُلْ
اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ
عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٨٠

৮০. তারা বলে, 'সামান্য কিছুদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না'। বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এমন কোন অংগীকার নিয়েছ; যে অংগীকারের বিপরীত আল্লাহ্ কখনও করবেন না? নাকি আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না?'

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ
فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٨١

৮১. হ্যাঁ, যে পাপ উপার্জন করেছে এবং তার পাপরাশি তাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٨٢

৮২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'তোমরা কোন ব্যাপারে কিতাবীদেরকে কেন জিজ্ঞেস কর? অথচ তোমাদের কাছে রয়েছে তোমাদের রাসূলের কাছে নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র কিতাব। যা সবচেয়ে আধুনিক, (আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসার ব্যাপারে) নবীন। তোমরা সেটা পড়ছ। আর সে কিতাবে আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, কিতাবীরা তাদের কিতাবকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে। তারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে স্বহস্তে সে কিতাব লিপিবদ্ধ করে বলেছে যে এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। তোমাদের কাছে এ সমস্ত জ্ঞান আসার পরও তা তোমাদেরকে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা থেকে নিষেধ করছে না। না, আল্লাহ্‌র শপথ! তাদের একজনকেও দেখিনি যে, সে তোমাদেরকে তোমাদের কাছে কি নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। [বুখারী: ৭৩৬৩] সুতরাং আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন কিছুতেই ইয়াহূদী-নাসারাদের কোন বর্ণনার প্রয়োজন আমাদের নেই।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর স্মরণ কর, যখন আমরা ইস্‌রাঈল-সন্তানদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ‘ইবাদাত করবে না, মাতা-পিতা[১], আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রের[২] সাথে সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে[৩] । আর সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে, তারপর তোমাদের মধ্য হতে কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া[৪]

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কাছে কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, “সময়মত সালাত আদায় করা” । বললেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, “পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার” । বললেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, “আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা” । [বুখারী: ৫২৭, মুসলিম: ৮৫]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মিসকীন সে নয়, যে এক খাবার বা দুই খাবারের জন্য ঘুরে বেড়ায় বরং মিসকীন হচ্ছে, যার সামর্থ নেই অথচ সে লজ্জায় কারও কাছে চায় না । অথবা মানুষকে আগলে ধরে কোন কিছু চায় না ।” [বুখারী: ১৪৭৬, মুসলিম: ১০৩৯]

(৩) আয়াতে এমন কথাকে বুঝানো হয়েছে, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত । এর অর্থ এই যে, যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রভাবে হাসিমুখে ও খোলামনে বলবে । তবে দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা কারো মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না । কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা যখন মূসা ও হারূন ‘আলাইহিমাস্ সালাম-কে নবুয়ত দান করে ফির‘আউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, “তোমরা উভয়েই ফির‘আউনকে নরম কথা বলবে ।” [সূরা ত্বা-হা: ৪৪] আজ যারা অন্যের সাথে কথা বলে, তারা মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর চাইতে উত্তম নয় এবং যার সাথে কথা বলে, সেও ফির‘আউন অপেক্ষা বেশী মন্দ বা পাপিষ্ঠ নয় । সুতরাং সবার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা উচিত । হাদীসে এসেছে, “তোমরা সৎকাজের সামান্যতম কিছুকে খাটো করে দেখ না । যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করা ।” [মুসলিম: ২৬২৬] তাছাড়া মানুষের সাথে সদালাপের অর্থ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এক বর্ণনায় এসেছে যে, তা হচ্ছে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) ‘অল্প কয়েকজন’ অর্থ, তারাই যারা তাওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত, তাওরাত

তোমরা সকলেই অবজ্ঞা করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

৮৪. আর স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, 'তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না এবং একে অন্যকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করবে না, তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে। আর তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছ।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫. তারপর তোমরাই তারা, যারা নিজদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করছ। তোমরা একে অন্যের সহযোগিতা করছ তাদের উপর অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা। আর তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও(১); অথচ তাদেরকে

ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম প্রবর্তিত শরী'আতের অনুসারী ছিল এবং তাওরাত রহিত হওয়ার পর ইসলামী শরী'আতের অনুসারী হয়ে যায়। আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, একত্ববাদে ঈমান, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম বালক-বালিকা ও দীন-দরিদ্রের সেবাযত্ন করা, মানুষের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা, সালাত আদায় করা ও যাকাত দেয়া ইসলামী শরী'আতসহ পূর্ববর্তী শরী'আতসমূহেও ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মানুষ সেগুলো ত্যাগ করে।

(১) ইসরাঈল-বংশধরকে তিনটি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। প্রথমতঃ খুনোখুনী না করা, দ্বিতীয়তঃ বহিস্কার অর্থাৎ দেশ ত্যাগে বাধ্য না করা এবং তৃতীয়তঃ স্বগোত্রের কেউ কারো হাতে বন্দী হলে অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা। কিন্তু তারা প্রথমোক্ত দু'টি নির্দেশ অমান্য করে তৃতীয় নির্দেশ পালনে বিশেষ তৎপর ছিল। ঘটনার বিবরণ এরূপঃ মদীনাবাসীদের মধ্যে 'আউস' ও 'খাযরাজ' নামে দু'টি গোত্রের মধ্যে শত্রুতা লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে যুদ্ধও বাধত। মদীনার আশেপাশে ইয়াহূদীদের দু'টি গোত্র 'বনী-কুরাইযা' ও 'বনী-নাদীর' বসবাস করত। আউস গোত্র ছিল বনী-কুরাইযার মিত্র এবং খাযরাজ ছিল বনী-নাদীরের মিত্র। আউস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে

বহিস্কার করাই তোমাদের উপর হারাম ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরী কর? তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান এবং কেয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। আর তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে গাফিল নন।

৮৬. তারাই সে লোক, যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় করে; কাজেই তাদের শাস্তি কিছুমাত্র কমানো হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا بِالْأٰخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭. অবশ্যই আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি এবং আমরা মার্‌ইয়াম-পুত্র ‘ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি[১] এবং

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۬ وَاٰتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ

মিত্রতার ভিত্তিতে বনী-কুরাইযা সাহায্য করত এবং নাযীর খাযরাজের পক্ষ অবলম্বন করত। যুদ্ধে আউস ও খাযরাজের যেমন লোকক্ষয় ও ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হত, তাদের মিত্র বনী-নাদীরেরও তেমনি হত। বনী কুরাইযাকে হত্যা ও বহিস্কারের ব্যাপারে শত্রু পক্ষের মিত্র বনী-নাদীরেরও হাত থাকত। তেমনি নাদীরের হত্যা ও বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করার কাজে শত্রু পক্ষের মিত্র বনী-কুরাইযারও হাত থাকত। তবে তাদের একটি আচরণ ছিল অদ্ভুত। ইয়াহূদীদের দুই দলের কেউ আউস অথবা খাযরাজের হাতে বন্দী হয়ে গেলে প্রতিপক্ষীয় দলের ইয়াহূদী স্বীয় মিত্রদের অর্থে বন্দীকে মুক্ত করে দিত। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতঃ বন্দীকে মুক্ত করা আমাদের উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে তারা বলতঃ কি করব, মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে না আসা লজ্জার ব্যাপার। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাদের এ আচরনেরই নিন্দা করেছেন এবং তাদের এ অপকৌশলের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। [ইবনে কাসীর]

(১) এ আয়াতে ‘স্পষ্ট প্রমাণ’ কি তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি। তবে অন্য জায়গায় সেটা

بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۝

‘রূহুল কুদুস’[১] দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। তবে কি যখনি কোন রাসূল তোমাদের কাছে এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনি তোমরা অহংকার করেছ? অতঃপর (নবীদের) একদলের উপর মিথ্যারোপ করেছ এবং একদলকে করেছ হত্যা?

وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝

৮৮. আর তারা বলেছিল, ‘আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত’, বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে লা‘নত করেছেন। সুতরাং তাদের কম সংখ্যকই ঈমান আনে।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ

৮৯. আর যখন তাদের কাছে যা আছে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তার সত্যায়নকারী[২]

বলা হয়েছে, যেমন, “আর তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূলরূপে’ (তিনি বলবেন) ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দ্বারা একটি পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করব; তারপর তাতে আমি ফুঁ দেব; ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে সেটা পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহ্‌র হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে নিরাময় করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও এবং মজুদ কর তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।” [সূরা আলে ইমরান: ৪৯]

(১) কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় জিবরাঈল ‘আলাইহিস্ সালাম-কে ‘রূহুল কুদুস’ বলা হয়েছে। যেমন, সূরা আশ-শু‘আরা: ১৯৩, সূরা মারইয়াম: ১৭।

(২) এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে যে, তারা তাকে জানতে ও চিনতে পেরেছে। তার সপক্ষে বহু তথ্য-প্রমাণ সে যুগেই পাওয়া গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য পেশ করেছেন উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি নিজে ছিলেন একজন বড় ইয়াহূদী আলেমের মেয়ে এবং আরেকজন বড় আলেমের ভাইঝি। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনা আগমনের পর আমার বাবা ও চাচা দু’জনেই তার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ তার সাথে কথাবার্তা বলার পর তারা ঘরে ফিরে আসেন। এ সময় আমি নিজের কানে তাদেরকে এভাবে আলাপ করতে শুনিঃ চাচা বললেন, আমাদের কিতাবে যে নবীর খবর দেয়া হয়েছে, ইনি কি সত্যিই সেই নবী? পিতা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, ইনিই সেই নবী।

لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

কিতাব আসলো; অথচ পূর্বে তারা এর সাহায্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত, তারপর তারা যা চিনত যখন তা তাদের কাছে আসল, তখন তারা সেটার সাথে কুফরী করল(১)। কাজেই কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

৯০. যার বিনিময়ে তারা তাদের নিজদেরকে বিক্রি করেছে তা কতই না নিকৃষ্ট! তা হচ্ছে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তারা তার সাথে কুফরী করেছে, হটকারিতাবশতঃ শুধু এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ নাযিল করেন।

চাচা বললেন, এ ব্যাপারে তুমি কি একেবারে নিশ্চিত? পিতা বললেন, হ্যাঁ। চাচা বললেন, তাহলে এখন কি করতে চাও? বাবা বললেন, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে এর বিরোধিতা করে যাব। [দালায়েলুন নাবুওয়াহ লিল বাইহাকী, সীরাতে ইবনে হিসাম]

(১) নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমণের পূর্বে ইয়াহূদীরা তাদের পূর্ববর্তী নবীগণ যে নবীর আগমনবার্তা শুনিয়ে গিয়েছিলেন তার জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। তারা দো'আ করত তিনি যেন অবিলম্বে এসে কাফেরদের প্রাধান্য খতম করে ইয়াহূদী জাতির উন্নতি ও পুনরুত্থানের সূচনা করেন। মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে মদীনাবাসীদের প্রতিবেশী ইয়াহূদী সম্প্রদায় নবীর আগমনের আশায় জীবন ধারণ করত, মদীনাবাসীরা নিজেরাই এর সাক্ষী। যত্রতত্র যখন তখন তারা বলে বেড়াতঃ ঠিক আছে, এখন প্রাণ ভরে আমাদের উপর যুলুম করে নাও। কিন্তু যখন সেই নবী আসবেন, আমরা তখন এই যালিমদের সবাইকে দেখে নেব। মদীনাবাসীরা এসব কথা আগের থেকেই শুনে আসছিল। তাই নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলঃ দেখ, ইয়াহূদীরা যেন তোমাদের পিছিয়ে দিয়ে এ নবীর দ্বীন গ্রহণ করে বাজী জিতে না নেয়। চল, তাদের আগে আমরাই এ নবীর উপর ঈমান আনব। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখল, যে ইয়াহূদীরা নবীর আগমন প্রতীক্ষায় দিন গুনছিল, নবীর আগমনের পর তারাই তার সবচেয়ে বড় বিরোধী পক্ষে পরিণত হল। [দেখুন, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৬৭, তাফসীর ইবনে কাসীর]

কাজেই তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে[১]। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাময় শাস্তি[২]।

৯১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তাতে ঈমান আনো', তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা কেবল তাতে ঈমান আনি'। অথচ এর বাইরে যা কিছু আছে সবকিছুই তারা অস্বীকার করে, যদিও তা সত্য এবং তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়নকারী। বলুন, 'যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহ্র

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

(১) এখানে তাদের শত্রুতাকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে। এ জন্যই ক্রোধের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বুঝা যায়। তবে ইকরিমাহ বলেন, তাদের উপর এক ক্রোধ হচ্ছে, ঈসা আলাইহিস সালামের উপর কুফরী করার কারণে, আর অন্য ক্রোধ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুফরীর কারণে। তাছাড়া শাস্তির সাথে অপমানজনক পদ যোগ করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা, পাপী ঈমানদারদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা হবে তাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তির আরেক কারণ হচ্ছে, তাদের অহঙ্কার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে মানুষের সুরতে পিপড়ার মত করে জমায়েত করা হবে। ছোট সব কিছুই তাদের উপর থাকবে। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জাহান্নামের এক কয়েদখানায় প্রবিষ্ট করানো হবে যার নাম হচ্ছে, বুলস। যাবতীয় আগুন তাদের উপরে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামবাসীদের পুঁজ 'তীনাতুল খাবাল' থেকে পান করানো হবে।" [মুসনাদে আহমাদ: ২/১৭৯]

(২) আয়াতে উল্লেখিত দু'টি শাস্তির প্রথমটি হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। তা এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলেই মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভংগের অপরাধে বনী-কুরাইযা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দী হয়েছে এবং বনী-নাদীরকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে।

নবীদেরকে হত্যা করেছিলে[1]?’

৯২. অবশ্যই মূসা তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ[2] এসেছিলেন,

وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿٩٢﴾

(১) ‘আমরা শুধু তাওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না,’ ইয়াহূদীদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উক্তি ‘যা (তাওরাত) আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে’। - এ থেকে প্রতিহিংসা বুঝা যায়। এর পরিস্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ্‌ তা‘আলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন।

প্রথমতঃ অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলীলের মধ্যে কোন আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে দূর করে নিতে পারত। অহেতুক অস্বীকার করার কোন অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কুরআনুল কারীম, যা তাওরাতেরও সত্যায়ন করে। সুতরাং কুরআনুল কারীমকে অস্বীকার করলে তাওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্‌র সকল গ্রন্থের মতেই নবীদের হত্যা করা কুফর। তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন নবীকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তাওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি তোমরা তাওরাতের সাথেই কুফরী করনি? সুতরাং তাওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবী অসার প্রমাণিত হয়। মোটকথা, কোন দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পরবর্তী আয়াতে আরও কতিপয় যুক্তির দ্বারা ইয়াহূদীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। [মা‘আরিফুল কুরআন]

(২) এ আয়াতে ‘স্পষ্ট প্রমাণ’ কি তা ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি। অন্য আয়াতে সেটা এসেছে। যেমন, বলা হয়েছে, “ তারপর আমরা তাদেরকে তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তারা অহংকারীই রয়ে গেল, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়” [সূরা আল-আ'রাফ: ১৩৩] আরও বলা হয়েছে, “তারপর মূসা তাঁর হাতের লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সাথে সাথেই তা এক অজগর সাপে পরিণত হল এবং তিনি তাঁর হাত বের করলেন আর সাথে সাথেই তা দর্শকদের কাছে শুভ্র উজ্জ্বল দেখাতে লাগল” [সূরা আল-আ'রাফ: ১০৭-১০৮] আরও এসেছে, “তারপর আমরা মূসার প্রতি ওহী করলাম যে, আপনার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করুন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল” [সূরা আশ-শু‘আরা: ৬৩] অনুরূপ আরও কিছু আয়াতে।

তারপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে গো বৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে। বাস্তবিকই তোমরা যালিম[১]।

৯৩. স্মরণ কর, যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম, (বলেছিলাম,) ‘যা দিলাম দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং শোন’। তারা বলেছিল, ‘আমরা শোনলাম ও অমান্য করলাম’। আর কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে গো-বৎসপ্রীতি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। বলুন, ‘যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে তোমাদের ঈমান যার নির্দেশ দেয় তা কত নিকৃষ্ট!’

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ
قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ
الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ
إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪. বলুন, ‘যদি আল্লাহ্‌র কাছে আখেরাতের বাসস্থান অন্য লোক ছাড়া বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর---যদি সত্যবাদী হয়ে থাক’।

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ
خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ
إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫. কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা কখনো তা কামনা করবে না। আর আল্লাহ্‌ যালিমদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানী।

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

---

(১) ইয়াহূদীদের দাবীর খণ্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের দাবী কর, অন্যদিকে প্রকাশ্য শির্কে লিপ্ত হও। ফলে শুধু মূসা ‘আলাইহিস্‌ সালাম-কেই নয়, আল্লাহ্‌কেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছ। কুরআন নাযিলের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে যেসব ইয়াহূদী ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য; কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল। অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের লক্ষ্য। [তাফসীরে মা‘আরিফুল কুরআন]

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. আর আপনি অবশ্যই তাদেরকে জীবনের প্রতি অন্যসব লোকের চেয়ে বেশী লোভী দেখতে পাবেন, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও । তাদের প্রত্যেকে আশা করে যদি হাজার বছর আয়ু দেয়া হত; অথচ দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি হতে নিস্কৃতি দিতে পারবে না । তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা ।

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

৯৭. বলুন, 'যে কেউ জিব্‌রীলের[১] শত্রু হবে, এজন্যে যে, তিনি আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে আপনার হৃদয়ে কুরআন নাযিল করেছেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবেরও সত্যায়ণকারী এবং যা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ'[২] ।

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'জিবরীল' শব্দটি আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান এর মতই । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এ আয়াত নাযিল হওয়ার একটি কারণ এই বলা হয় যে, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাশেম! আমরা আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করছি, যদি সেগুলোর জবাব আপনি দিতে পারেন তবে আমরা আপনার অনুসরণ করব, আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দিব এবং আপনার উপর ঈমান আনব । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যেমন ইয়া'কুব আলাইহিস সালাম তার সন্তানদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন, তিনি বলেন, "আমরা যা বলছি তাতে আল্লাহ্ই কর্মবিধায়ক" [সূরা ইউসুফ:৬৬] তখন তারা বলল, আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলামত কি বলুন । রাসূল বললেন, "তার চক্ষু ঘুমায় কিন্তু তার অন্তর ঘুমায় না" । তারা বলল, কিভাবে একজন নারী মেয়ে সন্তানের জন্ম দেয় আর কিভাবে পুরুষ সন্তানের জন্ম দেয়? রাসূল বললেন, দুই বীর্য মিলিত হওয়ার পরে যদি মহিলার বীর্য পুরুষের বীর্যের চেয়ে বেশী প্রাধান্য বিস্তারকারী হয় তবে মেয়ে সন্তান হয় । আর যদি পুরুষের বীর্য মহিলার বীর্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তবে পুত্র সন্তান হয় । তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন । ---- তারা বলল, ইসরাঈল (ইয়াকুব) কোন

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮. 'যে কেউ আল্লাহ্‌, তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ, তাঁর রাসূলগণ এবং জিব্‌রীল ও মীকাঈলের শত্রু হবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কাফেরদের শত্রু[১]' ।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. আর অবশ্যই আমরা আপনার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। ফাসিকরা ছাড়া অন্য কেউ তা অস্বীকার করে না ।

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۭ بَلْ

১০০. এটা কি নয় যে, তারা যখনই কোন অংগীকার করেছে তখনই তাদের

বস্তুকে তার নিজের উপর হারাম করেছেন সেটা আমাদের জানান। তিনি বললেন, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বেদুইন এলাকায় বাস করতেন। তখন তার 'ইরকুন নিসা' নামক রোগ হয়। ফলে তিনি দেখলেন যে, উটের গোস্ত ও দুধ তার জন্য এ রোগের কারণ হয়েছে, তখন তিনি সেটা নিজের উপর নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন। তারা বলল, আপনার কাছে কোন ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসে তার সম্পর্কে আমাদের জানান। কেননা, প্রত্যেক নবীর কাছেই কোন না কোন ফেরেশতা তার রবের কাছ থেকে ওহী ও রিসালত নিয়ে আগমন করে থাকে। এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গীটি কে? এটি বাকী রয়েছে। যদি এটা বলেন তো আমরা আপনার অনুসরণ করব। রাসূল বললেন, তিনি তো জিবরীল। তারা বলল, এই তো সে যে যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে আসে। সে ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে আমাদের শত্রু। আপনি যদি বলতেন যে, তিনি মীকাইল, তবে আমরা আপনার অনুসরণ করতাম। কারণ তিনি বৃষ্টি ও রহমত নিয়ে আসে। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৭৪, তিরমিযী: ৩১১৭] আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কেউ জিবরীলের শত্রু হবে; সে শুধু এজন্যই শত্রু হবে যে, তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে যার উপর ইচ্ছা ওহী নিয়ে অবতরণ করে থাকেন। যারা আল্লাহ্‌র ফেরেশতা ও তার বিধানের বিরোধিতার জন্য জিবরীলের সাথে শত্রুতা করবে তার ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি তা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে।

(১) এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা ফেরেশ্‌তাদের উপর ঈমান আনবে না তারা কাফের। ফেরেশ্‌তারা হলো নূরের তৈরী। যারা কোন অপরাধ করে না। তারা আগবাড়িয়ে কিছু করে না। তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তাই শুধু তারা পালন করে। সুতরাং যারা ফেরেশ্‌তাদের সাথে শত্রুতা করে, তারা মূলতঃ আল্লাহ্‌র সাথেই শত্রুতা করল।

أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

কোন এক দল তা ছুঁড়ে ফেলেছে? বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

১০১. আর যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল আসলেন, তাদের কাছে যা রয়েছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিছনে ছুঁড়ে ফেলল, যেন তারা জানেই না।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

১০২. আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত জাদু ও (সে বিষয় শিক্ষা দিত) যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের উপর নাযিল হয়েছিল। তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, 'আমরা নিছক একটি পরীক্ষা; কাজেই তুমি কুফরী করো না'(১)।

---

(১) জাদু এমন এক বিষয়কে বলা হয়, যার উপকরণ নিতান্ত গোপন ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। জাদু এমন সব গোপনীয় কাজের মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা দৃষ্টির অগোচরে থাকে। জাদুর মধ্যে মন্ত্রপাঠ, ঝাড়ফুঁক, বাণী উচ্চারণ, ঔষধপত্র ও ধুম্রজাল - এসব কিছুর সমাহার থাকে। জাদুর বাস্তবতা রয়েছে। ফলে মানুষ কখনো এর মাধ্যমে অসুস্থ হয়ে পড়ে, কখনো নিহতও হয় এবং এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাও সৃষ্টি করা যায়। তবে এর প্রতিক্রিয়া তাকদীরের নির্ধারিত হুকুম ও আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই হয়ে থাকে। এটা পুরোপুরি শয়তানী কাজ। এ প্রকার কাজ শির্কের অন্তর্ভুক্ত। দু'টি কারণে জাদু শির্কের অন্তর্ভুক্ত। (এক) এতে শয়তানদের ব্যবহার করা হয়। তাদের

তা সত্বেও তারা ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ

সাথে সম্পর্ক রাখা হয় এবং তাদের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে তাদের নৈকট্য অর্জন করা হয়। (দুই) এতে গায়েবী ইলম ও তাতে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক হবার দাবী করা হয়। আবার কখনো কখনো জাদুকরকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। এ সবগুলোই মূলতঃ ভ্রষ্টতা ও কুফরী। তাই কুরআনুল কারীমে জাদুকে সরাসরি কুফরী-কর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাদু ও মু'জিযার পার্থক্যঃ নবীগণের মু'জিযা দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, জাদুর মাধ্যমেও তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার। মু'জিযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ আর জাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মু'জিযা ও জাদুর স্বরূপ বুঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মু'জিযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের আল্লাহ্‌ভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জিযা ও জাদুর পার্থক্য বুঝতে পারে।

নবীগণের উপর জাদু ক্রিয়া করে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হবে ইতিবাচক। কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। নবীগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। এটা নবুওয়াতের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নবীগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন। তেমনিভাবে জাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইয়াহূদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর জাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং জাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল। [দেখুন, বুখারী: ৩২৬৮, মুসলিম: ২১৮৯] তাছাড়া, মূসা 'আলাইহিস্‌ সালাম-এরও জাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ার ঘটনা কুরআনেই উল্লেখিত রয়েছে ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ এবং ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ﴾ [ত্বাহাঃ ৬৬-৬৭] জাদুর কারণেই মূসা 'আলাইহিস্‌ সালাম-এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। [মা'আরিফুল কুরআন]

ঘটাতো[১]। অথচ তারা আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারত না। আর তারা তা-ই শিখত যা তাদের ক্ষতি করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে, (অর্থাৎ জাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানত!

১০৩. আর যদি তারা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রাপ্ত সওয়াব নিশ্চিতভাবে (তাদের জন্য) অধিক কল্যাণকর হত, যদি তারা জানত!

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. হে মুমিনগণ! তোমরা ‘রা‘এনা’[২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا

(১) এ ব্যাপারে এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ইবলীস তার চেয়ারটি পানির উপর স্থাপন করে। তারপর সে তার বাহিনীকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করে। যে যত বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারবে তার কাছে তার মর্যাদা তত নৈকট্যপূর্ণ। তার বাহিনীর কেউ এসে বলে যে, আমি এই এই করেছি, সে বলে যে, তুমি কিছুই করনি। তারপর আরেক জন এসে বলে যে, আমি এক লোককে যতক্ষণ পর্যন্ত তার ও তার স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কচ্যুতি না ঘটিয়েছি ততক্ষণ তাকে ছাড়িনি। তখন শয়তান তাকে তার কাছে স্থান দেয় এবং বলে, হ্যাঁ, তুমি।” অর্থাৎ তুমি একটা বিরাট করে এসেছ। [মুসলিম: ২৮১৩]

(২) رَاعِنَا বা ‘রা‘এনা’ শব্দটি আরবী ভাষায় নির্দেশসূচক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে ‘আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন’। সাহাবাগণ এ শব্দটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করত। কিন্তু এ শব্দটি ইয়াহূদীদের ভাষায় এক প্রকার গালি ছিল, যা দ্বারা বুঝা হতো বিবেক বিকৃত লোক। তারা এ শব্দটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে উপহাসসূচক ব্যবহার করত। মুমিনরা এ ব্যাপারটি উপলব্ধি না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে ব্যবহার করা শুরু করে, ফলে আল্লাহ্‌ তা‘আলা এ ধরণের কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে আয়াত

وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١٠٤

বলো না, বরং ‘উনযুরনা’[১] বলো এবং শোন। আর কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝١٠٥

১০৫. কিতাবীদের[২] মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের রব-এর কাছ থেকে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ নাযিল হোক। অথচ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে নিজ রহমত দ্বারা বিশেষিত করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ۝١٠٦

১০৬. আমরা কোন আয়াত রহিত করলে বা ভুলিয়ে দিলে তা থেকে উত্তম অথবা তার সমান কোন আয়াত এনে

নাযিল করেন। অন্য আয়াতে এ ব্যাপারটিকে ইয়াহূদীদের কুকর্মের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, “ইয়াহূদীদের মধ্যে কিছু লোক কথাগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে এবং বলে, ‘শুনলাম ও অমান্য করলাম’ এবং শোনে না শোনার মত; আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্ল করে বলে, ‘রা‘এনা’। কিন্তু তারা যদি বলত, ‘শুনলাম ও মান্য করলাম এবং শুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর’, তবে তা তাদের জন্য ভাল ও সংগত হত। কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে লা‘নত করেছেন। তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে।” [সূরা আন-নিসা: ৪৬]

(১) এ শব্দটির অর্থ ‘আমাদের প্রতি তাকান’। এ শব্দের মাঝে ইয়াহূদীদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং এ ধরণের শব্দ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ থেকে আমরা এ শিক্ষা নিতে পারি যে, অমুসলিম তথা বাতিল পন্থীরা যে সমস্ত দ্ব্যর্থমূলক শব্দ এবং সন্দেহমূলক বাক্য ব্যবহার করে থাকে, সেগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে।

(২) আহলে-কিতাব শব্দদ্বয়ের অর্থ কিতাবওয়ালা বা গ্রন্থধারী। আল্লাহ্ তা‘আলা আহলে-কিতাব বলে তাদেরকেই বুঝিয়েছেন, যাদেরকে তিনি ইতঃপূর্বে তাঁর পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত সম্বলিত গ্রন্থ প্রদান করেছেন। ইয়াহূদী এবং নাসারারা সর্বসম্মতভাবে আহলে কিতাব। এর বাইরে আল্লাহ্ তা‘আলা অন্য কোন জাতিকে কিতাব দিয়েছেন বলে সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়নি।

দেই(১)। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

১০৭. আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র? আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবকও নেই, নেই সাহায্যকারীও।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ প্রশ্ন পূর্বে মূসাকে করা হয়েছিল(২)? আর

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُوا۟ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ

(১) এই আয়াতে কুরআনী আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকারই সন্নিবেশিত হয়েছে। অভিধানে 'নস্‌খ' শব্দের অর্থ দূর করা, লেখা, স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া। আয়াতে 'নস্‌খ' শব্দ দ্বারা বিধি-বিধান দূর করা - অর্থাৎ রহিত করাকে বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস ও কুরআনের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নস্‌খ' বলা হয়। 'অন্য বিধান' টি কোন বিধানের বিলুপ্তি ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক বিধানের পরিবর্তে অপর বিধান প্রবর্তনও হতে পারে। [ইবনে কাসীর]

(২) এ আয়াতে মূসা আলাইহিস সালামের কাছে তার সাথীরা কি চেয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি। সেটা অন্য আয়াতে বিস্তারিত এসেছে। বলা হয়েছে, "কিতাবীগণ আপনার কাছে তাদের জন্য আসমান হতে একটি কিতাব নাযিল করতে বলে; তারা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, 'আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে দেখাও।" [সূরা আন-নিসা: ১৫৩] অন্য বর্ণনায় ইবনে আব্বাস বলেন, রাফে' ইবনে হারিমলাহ এবং ওয়াহাব ইবনে যায়েদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, হে মুহাম্মদ! আমাদের জন্য একটি কিতাব আসমান থেকে নাযিল করে আন, যা আমরা পড়ে দেখব। আর আমাদের জন্য যমীন থেকে প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দাও। যদি তা কর তবে আমরা তোমার অনুসরণ করব ও তোমার সত্যয়ন করব। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অযথা প্রশ্ন করা উচিত নয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ঐ মুসলিম সবচেয়ে বড় অপরাধী, যে হারাম নয় এমন কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করার কারণে সেটি হারাম করে দেয়া হয়।" [বুখারী: ৭২৮৯, মুসলিম: ২৩৫৮] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন "যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে কিছু না বলি ততক্ষণ

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝١٠٨

যে ঈমানকে কুফরে পরিবর্তন করবে, সে অবশ্যই সরল পথ হারাল।

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٠٩

১০৯. কিতাবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ (তারা এটা করে থাকে)। অতএব, তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ তাঁর কোন নির্দেশ দেন[১]-- নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝١١٠

১১০. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত দাও এবং তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু নিজেদের জন্য পেশ করবে আল্লাহ্‌র কাছে তা পাবে। নিশ্চয় তোমরা যা করছ আল্লাহ্‌ তার সম্যক দ্রষ্টা।

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا

১১১. আর তারা বলে, 'ইয়াহূদী অথবা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ কখনো

তোমরা আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ অতিরিক্ত প্রশ্ন এবং নবীদের সাথে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছিল"। [বুখারী: ৭২৮৮, মুসলিম: ১৩৩৭]

(১) তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। পরবর্তীকালে আল্লাহ্‌ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং জিহাদের আয়াতসমূহ নাযিল করেন। অতঃপর ইয়াহূদীদের প্রতিও আইন বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্টদের হত্যা, নির্বাসন, জিযিয়া আরোপ ইত্যাদি শাস্তি দেয়া হয়। সূরা আত-তাওবাহ এর ৫ ও ২৯ নং আয়াতের মাধ্যমে এ আয়াতের এ ক্ষমার বিধান রহিত করা হয়। [তাবারী]

أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١١١﴾

জান্নাতে প্রবেশ করবে না'[১]। এটা তাদের মিথ্যা আশা। বলুন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর'।

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

১১২. হ্যাঁ, যে কেউ আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয়[২] তার প্রতিদান তার

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারাদের পারস্পরিক মতবিরোধের উল্লেখ করে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মতবিরোধের কুফল বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আসল সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। নাসারা ও ইয়াহূদী উভয় সম্প্রদায়ই দ্বীনের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে ধর্মের নাম-ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতী ও আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র বলে দাবী করত এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য জাতিকে জাহান্নামী ও পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করছেন যে, এরা জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন। জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত উপায় পরবর্তী আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে।

(২) আল্লাহ্‌র কাছে কোন বান্দার আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে দু'টি বিষয়ঃ এক. ইখলাস তথা বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পন করবে। দুই. রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ। অর্থাৎ যদি কেউ মনে-প্রাণে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু আনুগত্য ও 'ইবাদাত নিজের খেয়াল-খুশীমত মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এ ক্ষেত্রেও আনুগত্য ও 'ইবাদাতের সে পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছেন। প্রথম বিষয়টি ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ﴾ বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ বাক্যাংশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এতে জানা গেল যে, আখেরাতের মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য শুধু ইখলাসই যথেষ্ট নয়, বরং সৎকর্মও প্রয়োজন। বস্তুতঃ কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্‌র সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও পন্থাই সৎকর্ম। আল্লাহ্‌র ইখলাস ও রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে মানুষের অবস্থান চার পর্যায়েঃ

ক) কারো কারো ইখলাস নেই, রাসূলের আনুগত্যও নেই, সে ব্যক্তি মুশরিক, কাফের।

খ) কারো কারো ইখলাস আছে, কিন্তু রাসূলের আনুগত্য নেই, সে ব্যক্তি বিদ'আতকারী।

গ) কারো কারো ইখলাস নেই, কিন্তু রাসূলের আনুগত্য আছে (প্রকাশ্যে), সে ব্যক্তি মুনাফেক।

يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾

রব-এর কাছে রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. আর ইয়াহূদীরা বলে, 'নাসারাদের কোন ভিত্তি নেই' এবং নাসারারা বলে, 'ইয়াহূদীদের কোন ভিত্তি নেই'; অথচ তারা কিতাব পড়ে। এভাবে যারা কিছুই জানেনা তারাও একই কথা বলে[১]। কাজেই যে বিষয়ে তারা

ঘ) কারো কারো ইখলাসও আছে, রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণও আছে, সে ব্যক্তি হলো প্রকৃত মুমিন। [তাজরীদুত তাওহীদিল মুফীদ]

(১) ইয়াহূদী হোক অথবা নাসারা কিংবা মুসলিম - যে কেউ উপরোক্ত মৌলিক বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়, অতঃপর শুধু নামভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজেদেরকে জান্নাতের একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে নেয়, সে আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই করে না; আসল সত্যের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। এসব নামের উপর ভরসা করে কেউ আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী ও মকবুল হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম থাকে। প্রত্যেক নবীর শরী'আতেই ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন। তবে সৎকর্মের আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। তাওরাতের যুগে যেসব কাজ-কর্ম মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তাওরাতের শিক্ষার অনুরূপ ছিল, তা'ই ছিল সৎকর্ম। তদ্রূপ ইঞ্জীলের যুগে নিশ্চিতরূপে তা-ই ছিল সৎকর্ম, যা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও ইঞ্জীলের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এখন কুরআনের যুগে ঐসব কাজ-কর্মই সৎকর্মরূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যা সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী এবং তার মাধ্যমে আসা গ্রন্থ কুরআনুল কারীমের হেদায়াতের অনুরূপ।

মোটকথা, ইয়াহূদী ও নাসারাদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা এই যে, উভয় সম্প্রদায় মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা বলছে, তাদের কেউই জান্নাতের ইজারাদার নয়। ভুল বুঝাবুঝির প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, ওরা দ্বীনের আসল প্রাণ ও বিশ্বাস, সৎকর্মকে বাদ দিয়ে বংশ অথবা দেশের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়কে ইয়াহূদী আর কোন সম্প্রদায়কে নাসারা নামে অভিহিত করেছে।

কুরআনুল কারীমে আহলে-কিতাবদের মতবিরোধ ও আল্লাহ্‌র ফয়সালা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদেরকে সতর্ক করা, যাতে তারাও ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে একথা না বলে যে, আমরা পুরুষানুক্রমে মুসলিম, প্রত্যেক অফিসে ও রেজিষ্টারে আমাদের নাম মুসলিমদের কোটায় লিপিবদ্ধ এবং আমরা মুখেও নিজেদেরকে

মতভেদ করতো কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে (সে বিষয়ে) মীমাংসা করবেন।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ۚ أُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوْهَآ إِلَّا خَآئِفِيْنَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

১১৪. আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র মসজিদগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং এগুলো বিরাণ করার চেষ্টা করে? অথচ ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে তাদের জন্য সেগুলোতে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। দুনিয়াতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি[১]।

মুসলিম বলি, সুতরাং জান্নাত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মুসলিমদের সাথে ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই। এ ফয়সালা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু দাবী করলে, মুসলিমরূপে নাম লিপিবদ্ধ করালে অথবা মুসলিমের ঔরসে কিংবা মুসলিমদের আবাসভূমিতে জন্ম গ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলিম হয় না, বরং মুসলিম হওয়ার জন্য পরিপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহার্য। ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ। দ্বিতীয়তঃ সৎকর্ম অর্থাৎ সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করাও জরুরী।

(১) ইসলাম-পূর্বকালে ইয়াহূদীরা ইয়াহ্ইয়া ‘আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করলে নাসারারা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন অগ্নি-উপাসক সম্রাটের সাথে মিলিত হয়ে ইয়াহূদীদের উপর আক্রমণ চালায় - তাদের হত্যা ও লুণ্ঠন করে, তাওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল মুকাদ্দাসে আবর্জনা ও শুকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর ক্ষত-বিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জন-মানবহীন করে দেয়। এতে ইয়াহূদীদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর খেলাফত আমলে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তারই নির্দেশক্রমে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মিত হয়। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমস্ত সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাস মুসলিমদের অধিকারে ছিল। অতঃপর বায়তুল-মুকাদ্দাস মুসলিমদের হস্তচ্যুত হয় এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় নাসারাদের অধিকারে থাকে। অবশেষে হিজরী ষষ্ঠ শতকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়্যুবী বায়তুল-মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন। এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা ও বিধানও প্রমাণিত হয়।

১১৫. আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই; সুতরাং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক(১)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্বব্যাপী,

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾

প্রথমতঃ শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল-মুকাদ্দাস, মসজিদে হারাম ও মসজিদে-নব্‌বীর অবমাননা, যেমনি বড় যুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। এক সালাতের সওয়াব মসজিদে হারামে একলক্ষ সালাতের সমান এবং মসজিদে নব্‌বীতে এক হাজার সালাতের সমান। আর বায়তুল-মুকাদ্দাস মসজিদে পাঁচশত সালাতের সমান। এই তিন মসজিদে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে দূর-দুরান্ত থেকে সফর করে সেখানে পৌঁছা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোন মসজিদে সালাত আদায় করা উত্তম মনে করে দূর-দুরান্ত থেকে সফর করে আসা জায়েয নেই।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদে যিকর ও সালাতে বাধা দেয়ার যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে সালাত আদায় ও তিলাওয়াত করতে পরিস্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশে-পাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের সালাত আদায় ও যিকরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

তৃতীয়তঃ মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমনি এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে সালাত আদায় করার জন্য কেউ আসে না কিংবা সালাত আদায়কারীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

(১) وَجْهُ اللّٰهِ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র চেহারা। মুসলিমদের আকীদা বিশ্বাস হলো এই যে, আল্লাহ্‌র চেহারা রয়েছে। তবে তা সৃষ্টির কারও চেহারার মত নহে। কিন্তু এ আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো - সকল দিকই যেহেতু আল্লাহ্‌র সুতরাং মুসল্লী পূর্ব ও পশ্চিম যেদিকেই মুখ ফিরাক না কেন। সেদিকেই আল্লাহ্‌র কিব্‌লা রয়েছে। কেউ কেউ এ আয়াতটিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার সিফাত মুখমণ্ডল বা চেহারা সাব্যস্ত করার জন্য দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। মূলতঃ এ আয়াতটিতে 'ওয়াজ্‌হ' শব্দটি দিক বা কেবলা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তাই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ্‌ এ আয়াতটিকে সিফাতের আয়াতের মধ্যে গণ্য করাকে ভুল আখ্যায়িত করেছেন। [দেখুন - মাজমু' ফাতাওয়াঃ ২/৪২৯, ৩/১৯৩, ৬/১৫-১৬]

কোন কোন মুফাস্‌সির ﴿فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ আয়াতকে এই নফল সালাতেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের

সর্বজ্ঞ[১]।

১১৬. আর তারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি (তা থেকে) অতি পবিত্র[২]। বরং আসমান ও যমীনে যা

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبۡحٰنَهٗ ؕ بَلۡ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ کُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوۡنَ ﴿۱۱۶﴾

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ী, সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল সালাতেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে। তবে সালাতরত অবস্থায় রেলগাড়ী অথবা জাহাজের দিক পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ না থাকলে সে অবস্থায়ই সালাত পূর্ণ করবে। এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে সালাত আদায়কারীর জানা না থাকলে, রাতের অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেয়ার লোক না থাকলে সেখানেও সালাত আদায়কারী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এখানে কেবলামুখী হওয়ার সম্পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য (নাউযুবিল্লাহ্) বায়তুল্লাহ্ অথবা বায়তুল- মুকাদ্দাসের পূজা করা নয়। সমস্ত সৃষ্টিজগত তাঁর কাছে অতি ছোট। এরপরও বিভিন্ন তাৎপর্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ্র দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, তিনি وَاسِعٌ এ শব্দটির দু'টি অর্থ রয়েছে। এক. প্রাচুর্যময়; অর্থাৎ তাঁর দান অপরিসীম। তিনি যাকে ইচ্ছা তার কর্মকাণ্ড দেখে বিনা হিসেবে দান করবেন। পূর্ব বা পশ্চিম তাঁর কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তিনি দেখতে চাইছেন যে, কে তার কথা শুনে আর কে শুনে না। দুই. وَاسِعٌ শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, সর্বব্যাপী। অর্থাৎ তিনি যেহেতু সবদিক ও সবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন সুতরাং তাঁর জন্য কোন কাজটি করা হল সেটা তিনি ভাল করেই জানেন। সে অনুসারে তিনি তাঁর বান্দাকে পুরস্কৃত করবেন। এ অর্থের সাথে পরে উল্লেখিত দ্বিতীয় গুণবাচক নাম عَلِيْمٌ শব্দটি বেশী উপযুক্ত।

(২) নাসারারা বলে থাকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ এটা সম্পূর্ণ একটি অপবাদ। কুরআনের অন্যত্র এসেছে, 'তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের শোভন নয়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না'। [সূরা মার্ইয়ামঃ ৯১-৯৩] এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ বলেন, মানুষ আমার উপর মিথ্যারোপ করে, অথচ তাদের এটা উচিত নয়। মানুষ আমাকে গালি দেয়, অথচ তাও তাদের জন্য উচিত নয়। মিথ্যারোপ করার অর্থ হলো, তারা বলে, আমি তাদের মৃত্যুর পর জীবিত করে পূর্বের ন্যায় করতে সক্ষম নই। আর গালি

কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত।

১১৭. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের উদ্ভাবক। আর যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

১১৮. আর যারা কিছু জানে না তারা[১] বলে, 'আল্লাহ্‌ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? অথবা আমাদের কাছে কেন আসে না কোন আয়াত?' এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের মত কথা বলতো। তাদের অন্তর একই রকম[২]। অবশ্যই আমরা আয়াতসমূহকে স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি, এমন কওমের জন্য, যারা দৃঢ়বিশ্বাস রাখে।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ أَوْ تَأْتِينَآ اٰيَةٌ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

দেয়ার অর্থ হলো, তারা বলে যে, আমার পুত্র আছে। অথচ স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করা থেকে আমি পবিত্র।" [বুখারীঃ ৪৪৮২] রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "কষ্টদায়ক কথা শুনার পর আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী ধৈর্যশীল আর কেউ নেই, মানুষ তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, তারপরও তিনি তাদেরকে নিরাপদে রাখেন ও রিযিক দেন।" [বুখারীঃ ৭৩৭৮, মুসলিমঃ ২৮০৪]

(১) এদের সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে। এক. এরা হচ্ছে, ইয়াহূদী সম্প্রদায়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাফে' ইবনে হারীমলাহ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, হে মুহাম্মদ যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক তবে আল্লাহ্‌কে বল আমাদের সাথে কথা বলতে যাতে করে আমরা তার কথা শুনতে পারি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। দুই. মুজাহিদ বলেন, এরা হচ্ছে, নাসারা সম্প্রদায়। তিন. কাতাদাহ ও আবুল আলীয়াহ বলেন, এরা হচ্ছে আরবের কাফের সম্প্রদায়। ইবনে কাসীর এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ আজকের পথভ্রষ্টরা এমন কোন অভিযোগ ও দাবী উত্থাপন করেনি, যা এর আগের পথভ্রষ্টরা করেনি। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পথভ্রষ্টতার প্রকৃতি অপরিবর্তিত রয়েছে। বার বার একই ধরণের সন্দেহ-সংশয়, অভিযোগ ও প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিই সে করে চলছে।

১১৯. নিশ্চয় আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে[1]। আর জাহান্নামীদের সম্পর্কে আপনাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۖ وَلَا تُسۡـَٔلُ عَنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَحِيمِ ١١٩

১২০. আর ইয়াহূদী ও নাসারারা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। বলুন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত'। আর যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরও, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং থাকবে না কোন সাহায্যকারীও।

وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٍ ١٢٠

১২১. যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি[2],

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ

---

(১) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গুণে ভূষিত করা হয়েছে। প্রথম. 'আল-মুরসাল বিল হক্ক' বা যথাযথভাবে প্রেরিত। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তার রাসূল প্রেরণের উপর সাক্ষী হচ্ছেন যে, তিনি তাকে যথাযথভাবে হক সহ প্রেরণ করেছেন। দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, তিনি 'বাশীর' বা সুসংবাদ প্রদানকারী। তিনি নেককারদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী। তৃতীয় গুণ হচ্ছে, তিনি 'নাযীর' বা ভীতিপ্রদর্শনকারী। যারা তার অবাধ্য হবে তারা জাহান্নামবাসী হবে এ ভীতিপ্রদ সংবাদ তিনি সবাইকে প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুরূপ গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا مُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا﴾ [সূরা আল-ইসরা: ১০৫, আল-ফুরকান: ৫৬] আরও বলা হয়েছে, ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا﴾ [সূরা সাবা: ২৮] আরও এসেছে, ﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۖ﴾ [সূরা ফাতির: ২৪] অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ رَسُولٗا شَٰهِدًا عَلَيۡكُمۡ﴾ [সূরা আল-মুযযাম্মিল: ১৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ গুণটি শুধু কুরআনে নয়; পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও বর্ণিত হয়েছে। [দেখুন, বুখারী: ২১২৫, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৭৪]

(২) কাতাদাহ বলেন, এখানে ইয়াহূদী ও নাসারাদের বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের বুঝানো হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

أُولَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْخَٰسِرُونَ ﴿١٢١﴾

তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে[১], তারা তাতে ঈমান আনে। আর যারা তার সাথে কুফরী করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ اذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ الَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَٰلَمِينَ ﴿١٢٢﴾

১২২. হে ইস্‌রাঈল-বংশধররা! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (তৎকালীন) সৃষ্টিকুলের সবার উপর।

وَاتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. আর তোমরা সেদিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন কোন সত্তা অপর কোন সত্তার কোন কাজে আসবে না। কারো কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

---

(১) যথাযথভাবে তিলাওয়াতের অর্থ, তিলাওয়াতের হক আদায় করা। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এর অর্থ যখন জান্নাতের বর্ণনা আসবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জান্নাত চাওয়া। আর জাহান্নামের বর্ণনা আসলে জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি চাওয়া। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এর অর্থ, এগুলোর হালালকে হালাল হিসেবে নেয়া। আর হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করা। যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে পড়া। সেগুলোর কোন অংশকে বিকৃত না করা এবং সঠিক ব্যাখ্যার বিপরীতে কোন বাজে ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করা। মোটকথা: আল্লাহ্‌র আয়াতকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করাই এর যথাযথ তেলাওয়াত বলে বিবেচিত হবে। [ইবনে কাসীর] যথাযথ তেলাওয়াতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনা এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ নিষেধ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়া। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, ইয়াহূদী ও নাসারাদের যে কেউ আমার কথা শোনার পর আমার উপর ঈমান আনবে না, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে"। [মুসলিম: ১৫৩]

১২৪. আর স্মরণ করুন, যখন ইব্‌রাহীমকে তাঁর রব কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন[১], অতঃপর তিনি সেগুলো

وَإِذِ ابْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَـٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ

(১) যে যে বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কুরআনে শুধু كَلِمَات (বাক্যসমূহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসংগে সাহাবী ও তাবে'য়ীদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশী অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোন বিরোধ নেই, বরং সবগুলোই ছিল ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরীক্ষার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত তাফসীরকারক ইবনে-জরীর ও ইবনে কাসীরের অভিমত তাই।

এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে স্বীয় বন্ধুত্বের বিশেষ মুল্যবান পোষাক উপহার দেয়া। তাই তাকে বিভিন্ন রকমের কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। সমগ্র জাতি, এমনকি তার আপন পরিবারের সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতি-নীতির বিপরীত একটি সনাতন দ্বীন তাকে দেয়া হয়। জাতিকে এ দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানোর গুরুদায়িত্ব তার কাঁধে অর্পণ করা হয়। তিনি নবীসুলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তিপূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে তিনি মূর্তিসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ফলে সমগ্র জাতি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ্ নমরূদ ও তার পরিবারবর্গ তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ্‌র খলীল প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এসব বিপদাপদ সত্ত্বেও হাসিমুখে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপের জন্য পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আগুনকে নির্দেশ প্রদান করলেন, 'হে আগুন! ইবরাহীমের উপর সুশীতল ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও।' [সূরা আল-আম্বিয়া: ৬৯]

এ পরীক্ষা শেষ হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া হয়। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বগোত্র জন্মভূমিকেও হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন। সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এল, স্ত্রী হাজেরা ও তার দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈল 'আলাইহিস্ সালাম-কে সংগে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তরে গমন করুন। [ইবনে কাসীর] জিবরীল 'আলাইহিস্ সালাম আসলেন এবং তাদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। চলতে চলতে যখন শুস্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর এসে গেল (যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ ও মক্কা নগরী আবাদ করা লক্ষ্য ছিল), তখন সেখানেই তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হল। আল্লাহ্‌র বন্ধু তার রবের ভালবাসায় এ জনশূন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরেই তাদের

থাকতে বললেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ হলো না। অতঃপর ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম নির্দেশ পেলেন যে, স্ত্রী হাজেরা ও শিশুকে এখানে রেখে নিজে সিরিয়ায় ফিরে যান। আল্লাহ্‌র বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক আমি চলে যাচ্ছি' - স্ত্রীকে একটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরীও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হাজেরা তাকে চলে যেতে দেখে বললেন, 'আপনি কি আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ পেয়েছেন?' ইবারাহীম 'আলাইহিস্ সালাম বললেন, 'হ্যাঁ'। আল্লাহ্‌র নির্দেশের কথা জানতে পেরে হাজেরা বললেন, 'যান, যে প্রভূ আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না'। [বুখারী: ৩৩৬৪]

অতঃপর হাজেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালাতিপাত করতে থাকেন। সাথের সংরক্ষিত পানি ফুরিয়ে যাওয়ায় এক সময় দারুন পিপাসা তাকে পানির খোঁজে বের হতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে বার বার উঠা-নামা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোন মানুষও দৃষ্টিগোচর হলো না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। সাতবার ছুটোছুটি করে তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যেই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাতবার দৌড়ানো কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হজের বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হাজেরা যখন নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হল। জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম আগমন করলেন এবং শুস্ক মরুভূমিতে পানির একটি ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। [বুখারী: ৩৩৬৫] বর্তমানে এ ধারার নামই যম্‌যম্। পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জীব-জন্তু আগমন করল। জীব-জন্তু দেখে মানুষ এসে সেখানে আস্তানা গাড়ল। এভাবে মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কিছু আসবাব পত্রও সংগৃহীত হল।

ইসমাঈল 'আলাইহিস্ সালাম নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজ-কর্মের উপযুক্ত হয়ে গেল। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র ইংগিতে মাঝে মাঝে এসে স্ত্রী হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন এবং পিতার স্নেহ-বাৎসল্য থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠল, তখন ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল, তোমার কি অভিপ্রায়?' পিতৃভক্ত বালক বলল, পিতা! আপনি যে আদেশ পেয়েছেন, তা পালন করুন। আপনি আমাকেও ইনশাআল্লাহ্ এ ব্যাপারে ধৈর্যশীল পাবেন"। [সূরা আস্-সাফ্‌ফাতঃ ১০২] এর পরবর্তী ঘটনা সবার জানা আছে যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ﴿۱۲۴﴾

পূর্ণ করেছিলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'নিশ্চয় আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাবো'(১)। তিনি বললেন,

---

পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশ্যে মিনা প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্র আদেশ পালনে নিজের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা পুরোপুরিই সম্পন্ন করলেন। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত থেকে এর পরিপূরক নাযিল করে তা কুরবানী করার আদেশ দিলেন। এই রীতিটিই পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এগুলো ছিল বড়ই কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন খলীলুল্লাহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-কে করা হয়। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ এবং বিধিবিধানের বাধ্যবাধকতাও তার উপর আরোপ করা হল। তন্মধ্যে দশটি কাজ 'খাসায়েলে ফিত্রাত' বা প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান নামে অভিহিত। এগুলো হলো শারীরিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত, ভবিষ্যত উম্মতের জন্যও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর তাকিদ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'সমস্ত ইসলাম ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে দশটি সূরা আল-বারাআতে, দশটি সূরা আল-মুমিনূনে এবং দশটি সূরা আল-আহ্যাবে বর্ণিত হয়েছে।' [ইবনে কাসীর] ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু'আনহুমার উপরোদ্ধৃত উক্তির দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলিমদের জন্য যেসব জ্ঞান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কুরআনে উল্লেখিত كلمات যেসব বিষয়ে খলীলুল্লাহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে বলে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে।

(১) এ আয়াত দ্বারা একদিকে বুঝা গেল যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে সাফল্যের প্রতিদানে মাবনসমাজের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, অপরদিকে মানব সমাজের নেতা হওয়ার জন্য যে পরীক্ষা দরকার, তা পার্থিব পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। পার্থিব পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণকেই সাফল্যের মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় সূরা আল-বারাআত বা আত-তাওবার **১১২** নং আয়াত, সূরা আল-মুমিনূন এর **১-১১** এবং সূরা আল-আহযাবের ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত ত্রিশটি নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি গুনান্বিত হওয়া শর্ত। কুরআনের অন্য এক জায়গায় এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, "যখন তারা সবর করলো এবং আমার নিদর্শনাবলীতে নিশ্চিত বিশ্বাসী হল, তখন আমরা তাদেরকে

'আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও?' (আল্লাহ্) বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদেরকে পাবে না[১]।

১২৫. আর স্মরণ করুন[২], যখন আমরা কা'বাঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র[৩]

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن

নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করে"। [সূরা আস-সাজদাহ:২৪] এই আয়াতে বর্ণিত صَبر হলো শিক্ষাগত ও বিশ্বাসগত পূর্ণতা। আর يَقِين হলো কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা। কারও মধ্যে এগুলোর পূর্ণতার ভিত্তিতেই নেতৃত্বের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হন।

(১) আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নবী ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তার সাফল্য এবং পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম যখন স্নেহপরবশ হয়ে স্বীয় সন্তান-সন্ততির জন্যেও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার লাভের জন্য একটি নিয়ম-নীতিও বলে দেয়া হল। এতে খলীলুল্লাহ্‌র প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার বংশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও যালিম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাকে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো। সন্তানদের জন্য এ দো'আর মধ্যে আরও একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে যারা গণ্য-মান্য, তাদের সন্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। খলীলুল্লাহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-এর এ দো'আটিও কবুল হয়েছে। তার বংশধরদের মধ্যে কখনো সত্যদ্বীনের অনুসারী ও আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ আদর্শ পুরুষের অভাব হয়নি। জাহেলিয়াত আমলে আরবে যখন সর্বত্র মূর্তিপূজার জয়-জয়কার, তখনো ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর বংশধরের মধ্যে কিছু লোক একত্ববাদ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন, যায়েদ ইবনে আমর, ওরাকা ইবন নওফাল এবং কেস ইবন সায়েদা প্রমূখ।

(২) এই আয়াতে কা'বা গৃহের ইতিহাস, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম ও ইসমাঈল 'আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক কা'বা গৃহের নির্মাণ, কা'বা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এ বিষয়টি কুরআনের অনেক সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর কিছু বর্ণনা আসছে।

(৩) مثابةً শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। এ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা গৃহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানবজাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে থাকবে এবং মানুষ বার বার তার দিকে ফিরে যেতে আকাংখী হবে। মুফাস্‌সির মুজাহিদ বলেন, 'কোন মানুষ কা'বা গৃহের যিয়ারত করে তৃপ্ত হয় না, বরং প্রতিবারই

مَّقَامِ إِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾

ও নিরাপত্তাস্থল[১] করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর[২]। আর ইব্‌রাহীম ও

যিয়ারতের অধিক বাসনা নিয়ে ফিরে আসে’। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কোন কোন আলেমের মতে, কা‘বা গৃহ থেকে ফিরে আসার পর আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রথমবার কা‘বাগৃহ যিয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ থাকে, দ্বিতীয়বার তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং যতবারই যিয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা‘বারই বৈশিষ্ট্য। নতুন জগতের শ্রেষ্ঠতম মনোরম দৃশ্যও এক-দু’বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। পাঁচ-সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই থাকে না। অথচ এখানে না আছে কোন মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌঁছা সহজ এবং না আছে ব্যবসায়িক সুবিধা, তা সত্ত্বেও এখানে পৌঁছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌঁছার জন্য মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। [তাফসীরে মা‘আরিফুল কুরআন]

(১) أمناً শব্দের অর্থ مأمن অর্থাৎ শান্তির আবাসস্থল। আর بيت শব্দের অর্থ ঘর। তবে এখানে শুধু কা‘বাগৃহ উদ্দেশ্য নয়, বরং সম্পূর্ণ মসজিদুল হারাম। কুরআনে بيت الله ও كعبة বলে সমগ্র হারাম শরীফকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ﴾ “তারপর তাদের যবাইয়ের স্থান হচ্ছে প্রাচীন ঘরটির কাছে” [সূরা আল-হাজ্জ:৩৩] কারণ, এতে কুরবানী যবাই করার কথা আছে। কুরবানী কা‘বা গৃহের অভ্যন্তরে হয় না। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, ‘আমরা কা‘বার হারাম শরীফকে শান্তির আলয় করেছি’। শান্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তিজনিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

(২) এখানে মাকামে ইবরাহীমের অর্থ ঐ পাথর, যাতে মু‘জিযা হিসেবে ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর পদচিহ্ন অংকিত হয়ে গিয়েছিল। কা‘বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। [সহীহ্ আল-বুখারী] আনাস রাদিয়াল্লাহু‘আনহু বলেন, আমি এই পাথরে ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর পদচিহ্ন দেখেছি। যিয়ারতকারীদের উপর্যুপরি স্পর্শের দরুন চিহ্নটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু‘আনহুমা থেকে মাকামে ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত রয়েছে যে, সমগ্র হারাম শরীফই মাকামে ইবরাহীম। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, তাওয়াফের পর যে দু’রাকাআত সালাত মাকামে ইবরাহীমে আদায় করার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হারাম শরীফের যে কোন অংশে পড়লেই চলে। অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে একমত।

ইস্‌মা‘ঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম তাওয়াফকারী, ই‘তিকাফকারী, রুকূ‘ ও সিজ্‌দাকারীদের জন্য[১] আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে[২] ।

আয়াতে মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তাওয়াফের পর কা‘বা গৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মাকামে ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন, অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু’রাকাআত সালাত আদায় করলেন যে, কা‘বা ছিল তার সম্মুখে এবং কা‘বা ও তার মাঝখানে ছিল মাকামে ইবরাহীম। [দেখুন, সহীহ্‌ মুসলিমঃ ১২১৮] আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাআত সালাত ওয়াজিব।

(১) শব্দগুলো থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ কা‘বা গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য তাওয়াফ, ই‘তেকাফ ও সালাত। দ্বিতীয়তঃ তাওয়াফ আগে আর সালাত পরে। তৃতীয়তঃ ফরয হোক কিংবা নফল কা‘বা গৃহের অভ্যন্তরে যে কোন সালাত আদায় করা বৈধ।

(২) এখানে কা‘বাগৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন কুফর, শির্ক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহংকার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুষ থেকেও কা‘বা গৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র ঘরের আসল পবিত্রতা হচ্ছে এই যে, সেখানে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো নাম উচ্চারিত হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘরে বসে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকে মালিক, প্রভূ, মা‘বুদ, অভাব পূরণকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী হিসেবে ডাকে, সে আসলে তাকে নাপাক ও অপবিত্র করে দিয়েছে। এ নির্দেশে بيتى শব্দ দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, সব মসজিদই আল্লাহ্‌র ঘর। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ﴾ উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু‘আনহু মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চঃস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন - তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ, জান না? অর্থাৎ মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, এতে উচ্চঃস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কা‘বা গৃহকে যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিত্র রাখতে হবে। দেহ ও পোষাক-পরিচ্ছদকে যাবতীয় অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পাক-সাফ করে এবং অন্তরকে কুফর, শির্ক, দুশ্চরিত্রতা, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে মসজিদে প্রবেশ করা কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। [মা‘আরিফুল কুরআন]

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

১২৬. আর স্মরণ করুন, যখন ইব্‌রাহীম বলেছিলেন, ‘হে আমার রব! এটাকে নিরাপদ শহর করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে[১] তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করুন’। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, যে কুফরী করবে তাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিব, তারপর তাকে আগুনের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

১২৭. আর স্মরণ করুন, যখন ইব্‌রাহীম ও ইস্‌মা‘ঈল কা‘বাঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, (তারা বলছিলেন) ‘হে আমাদের রব[২]! আমাদের পক্ষ

---

(১) আলোচ্য আয়াতে মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দো‘আ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে এক দো‘আয় যখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম স্বীয় বংশধরের মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, মুমিনদের পক্ষে এ দো‘আ কবুল হল, যালিম ও মুশরিকদের জন্য নয়। সে দো‘আটি ছিল নেতৃত্ব লাভের দো‘আ। খলীল ‘আলাইহিস্ সালাম ছিলেন আল্লাহ্‌র বন্ধুত্বের মহান মর্যাদায় উন্নীত ও আল্লাহ্‌ভীতির প্রতীক। তাই এ ক্ষেত্রে সে কথাটি মনে পড়ে গেল এবং তিনি দো‘আর শর্ত যোগ করলেন যে, আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির এ দো‘আ শুধু মুমিনদের জন্য করেছি। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ভয় ও সাবধানতার মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে ﴿وَمَن كَفَرَ﴾ অর্থাৎ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমি সমস্ত মক্কাবাসীকেই দান করব, যদিও তারা কাফের-মুশরিক হয়। তবে মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত সর্বত্রই তা দান করব, কিন্তু কাফেররা আখেরাতে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না। [মা‘আরিফুল কুরআন]

(২) এখানে লক্ষণীয় যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম رب শব্দ দ্বারা দো‘আ আরম্ভ করেছেন। তিনি এই শব্দের মাধ্যমে দো‘আ করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ এ জাতীয় শব্দ আল্লাহ্‌র রহমত ও কৃপা আকৃষ্ট করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও সহায়ক। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, “ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈলকে বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

থেকে কবুল করুন[১]। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

১২৮. ‘হে আমাদের রব! আর আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর হতে আপনার এক অনুগত জাতি উত্থিত করুন। আর আমাদেরকে ‘ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

ইসমাঈল বললেন, আপনার রব আপনাকে যা নির্দেশ করেছেন তা বাস্তবায়িত করুন। ইবরাহীম বললেন, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? ইসমাঈল বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। ইবরাহীম পাশের একটি উঁচু জায়গা দেখিয়ে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে ‘এখানে’ একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, তারপর তারা দু’জনে ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে তা উঁচু করছিলেন। ইসমাঈল পাথর নিয়ে আসতেন আর ইবরাহীম ঘর বানাতেন। তারপর যখন ঘর উঁচু হয়ে গেল তখন ইসমাঈল এ পাথরটি এনে ইবরাহীমের পায়ের নীচে রাখলেন। তখন ইবরাহীম তাতে দাঁড়িয়ে ঘর বানাতে থাকলেন। এমতাবস্থায় তাদের মুখ থেকে এ দো‘আ বের হচ্ছিল।” [বুখারী: ৩৩৬৪]

(১) ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শন ভূ-খণ্ড ছেড়ে মক্কার বিশুষ্ক পাহাড়সমূহের মাঝখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে এনে রাখেন এবং কা‘বা গৃহের নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন আত্মত্যাগী ইবাদাতকারীর অন্তরে অহংকার দানা বাঁধতে পারত এবং সে তার ক্রিয়াকর্মকে অনেক মূল্যবান মনে করতে পারত। কিন্তু এখানে ছিলেন আল্লাহ্‌র এমন একজন বন্ধু যিনি আল্লাহ্‌র প্রতাপ এবং মহিমা সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত। তিনি জানতেন, আল্লাহ্‌র উপযুক্ত ‘ইবাদাত ও আনুগত্য কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। তাই আমল যত বড়ই হোক সেজন্য অহংকার না করে কেঁদে কেঁদে এমনি দো‘আ করা প্রয়োজন যে, হে আমার রব! আমার এ আমল কবুল হোক। কা‘বা গৃহ নির্মাণের আমল প্রসংগে ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম তাই বলেছেন, ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ - হে রব! আমাদের এ আমল কবুল করুন। কেননা, আপনি শ্রোতা, আপনি সর্বজ্ঞ। [মা‘আরিফুল কুরআন]

(২) সন্তানের প্রতি স্নেহ ও মমতা শুধু একটি স্বাভাবিক ও সহজাত বৃত্তিই নয়; বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা‘আলারও নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহ এর প্রমাণ। তিনি সন্তানদের দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করেছেন।

দিন[১] এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনিই বেশী তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

১২৯. 'হে আমাদের রব! আর আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল পাঠান[২], যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন[৩]; তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা

(১) আয়াতে বর্ণিত مَنَاسِك এর অর্থ ইবাদাতও হয়, যেমনটি উপরে করা হয়েছে। কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, হজের নিয়মাবলী। [তাবারী]

(২) হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমি আমার সূচনা বলে দিচ্ছি, আমার পিতা ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আ, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সুসংবাদ এবং আমার মা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তার থেকে একটি আলো বের হল, যে আলোতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়েছে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৬২] 'ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সুসংবাদের অর্থ তার এ উক্তি ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ "আমি এমন এক নবীর সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তার নাম আহমাদ"। [সূরা আস্-সাফঃ ৬] তার জননী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তার পেট থেকে একটি নূর বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে। কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের আলোচনা প্রসংগে দু'জায়গায়, সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪তম আয়াতে এবং সূরা জুমু'আয় ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আয় উল্লেখিত ভাষারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে ইংগিত করা হয়েছে যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম যে নবীর জন্য দো'আ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

(৩) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দো'আর কারণে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য তিনটি। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা। তিলাওয়াতের আসল অর্থ অনুসরণ করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, যে লোক এসব কালাম পাঠ করে, এর অনুসরণ করাও তার একান্ত কর্তব্য। আসমানী গ্রন্থ ঠিক যেভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়, হুবহু তেমনিভাবে পাঠ করা জরুরী। নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোন শব্দ অথবা স্বরচিহ্নটিও পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অনুমতি নেই। ইমাম রাগেব বলেন, 'আল্লাহ্‌র কালাম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ অথবা কালাম পাঠ করাকে সাধারণ পরিভাষায় তিলাওয়াত বলা যায় না'। [মুফরাদাতুল কুরআন]

দেবেন[১] এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন[২]। আপনি তো পরাক্রমশালী,

(১) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দো'আ অনুসারে নবী-রাসূলগণের বিশেষ করে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান। এখানে কিতাব বলে আল্লাহ্‌র কিতাব বুঝানো হয়েছে। 'হিকমত' শব্দটি আরবী অভিধানে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা - সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি। ইমাম রাগেব বলেন, এ শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সকল বস্তুর পূর্ণজ্ঞান ও সুদৃঢ় উদ্ভাবন। অন্যের জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয়, বিদ্যমান বস্তুসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান, সৎকর্ম, ন্যায়, সুবিচার, সত্য কথা ইত্যাদি। এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আয়াতে হিকমতের অর্থ কি? মূলত: এখানে হিকমত শব্দের অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ। ইবনে কাসীর ও ইবনে জরীর রাহিমাহুল্লাহ্ কাতাদাহ্ থেকে এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করেছেন। হিকমত অর্থ কেউ কুরআনের তাফসীর, কেউ দ্বীনের গভীর জ্ঞান, কেউ শরী'আতের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। নিঃসন্দেহে এসব উক্তির সারমর্ম হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ।

(২) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দো'আ অনুসারে নবী-রাসূলগণ বিশেষ করে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে পরিশুদ্ধি ও পবিত্রকরণ। আয়াতে উল্লেখিত يُزَكِّيْهِمْ শব্দটি زكاة শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ পবিত্রতা। বাহ্যিক ও আত্মিক সকল প্রকার পবিত্রতার অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বাহ্যিক না-পাকী সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমরাও ওয়াকিফহাল। আত্মিক না-পাকী হচ্ছে কুফর, শির্ক, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা করা, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা, দুনিয়াপ্রীতি ইত্যাদি। কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে এসব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এ আয়াত থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হেদায়াত ও সংশোধনের ধারা দু'টি, আল্লাহ্‌র রাসূল ও আল্লাহ্‌র গ্রন্থ। এ দু'টি ব্যতীত কারও হেদায়াত লাভ হতে পারে না।

এ আয়াতসমূহে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম অনেকগুলো দো'আ করেছিলেন (১) "আপনার নির্দেশে আমি এই জনমানবহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে রেখে যাচ্ছি। আপনি একে একটি শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দিন - যাতে এখানে বসবাস করা আতংকজনক না হয় এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়"। আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেছেন এবং সে ঊষর মরু প্রান্তর মক্কা নগরীতে পরিণত হয়েছে। (২) "হে রব! শহরটিকে শান্তির ভূমি করে দিন"। অর্থাৎ হত্যা, লুণ্ঠন, কাফেরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখুন। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর এই দো'আও কবূল হয়েছে। মক্কা মুকার্‌রামা শুধু একটি জনবহুল নগরীই নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবর্তনস্থলও বটে। বিশ্বের চারদিক

প্রজ্ঞাময়’।

থেকে মুসলিমগণ এ নগরীতে পৌঁছাকে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে করে। নিরাপদ ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোন শত্রুজাতি অথবা শত্রুসম্রাট এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। আল্লাহ্ তা‘আলা হারাম শরীফের চতুঃসীমানায় জীব-জন্তুকেও নিরাপত্তা দান করেছেন। এই এলাকায় শিকার করা জায়েয নয়। (৩) ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর তৃতীয় দো‘আ এই যে, এ শহরের অধিবাসীদের উপজীবিকা হিসেবে যেন ফল-মূল দান করা হয়। মক্কা-মুকার্‌রমা ও পার্শ্ববর্তী ভূমি কোনরূপ বাগ-বাগিচার উপযোগী ছিল না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল না পানির নাম -নিশানা। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা ইবরাহীমের দো‘আ কবুল করেন। মক্কার কাছেই তায়েফে যাবতীয় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যা মক্কার বাজারেই বেচা-কেনা হয়। এখনো সারা বিশ্ব থেকে ফলমূল মক্কায় নিয়ে আসা হয়। (৪) ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর চতুর্থ দো‘আ হচ্ছে, “হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর হতে আপনার এক অনুগত জাতি উত্থিত করুন। আমাদেরকে ‘ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হোন। আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। এ দো‘আটিও ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান ও আল্লাহ্‌ভীতিরই ফল, আনুগত্যের অদ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করার পরও তিনি এরূপ দো‘আ করেন যে, আমাদের উভয়কে আপনার আজ্ঞাবহ করুন। কারণ, আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান যার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে সে তত বেশী অনুভব করতে থাকে যে, যথার্থ আনুগত্য তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। এ দো‘আতে স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, যিনি আল্লাহ্‌র পথে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিসর্জন দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত নন, তিনিও সন্তানদের প্রতি কতটুকু আন্তরিকতা ও ভালবাসা রাখেন। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা শারিরিকের চাইতে আত্মিক ও জাগতিকের চাইতে পরলৌকিক আরামের জন্য চিন্তা করেন বেশী। এ কারণেই ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম দো‘আ করলেন - “আমার সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দলকে পূর্ণ আনুগত্যশীল কর”। (৫) ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম ভবিষ্যত বংশধরদের দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক মংগলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করেছেন যে, আমার বংশধরের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করুন - যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের তিলাওয়াত করে শোনাবেন, কুরআন ও সুন্নাহ্ শিক্ষা দেবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। দো‘আয় নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই নবী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ প্রথমতঃ এই যে, এটা তার সন্তানদের জন্য গৌরব-এর বিষয়। দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের কল্যাণও নিহিত রয়েছে। কারণ স্বগোত্র থেকে নবী হলে তার চাল-চলন ও অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত থাকবে। ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা থাকবে না।

১৩০. আর যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইব্‌রাহীমের মিল্লাত হতে আর কে বিমুখ হবে! দুনিয়াতে তাকে আমরা মনোনীত করেছি; আর আখেরাতেও তিনি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্যতম।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرٰهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১. স্মরণ করুন, যখন তার রব তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ করুন', তিনি বলেছিলেন, 'আমি সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম[১]'।

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۙ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾

---

(১) আল্লাহ্ তা'আলার أَسلِم - 'আনুগত্য গ্রহণ কর' সম্বোধনের উত্তরে সম্বোধনেরই ভঙ্গিতে أَسْلَمْتُ لَكَ - 'আমি আপনার আনুগত্য গ্রহণ করলাম' বলা যেত। কিন্তু খলীলুল্লাহ্ 'আলাইহিস্ সালাম এ ভঙ্গি ত্যাগ করে বলেছেন, ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ অর্থাৎ আমি সৃষ্টিকুলের রবের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। কারণ, প্রথমতঃ এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্‌র স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারও প্রতি অনুগ্রহ করিনি; বরং এমনটা করাই ছিল আমার প্রতি অপরিহার্য। কারণ, তিনি রাব্বুল আলামীন বা সৃষ্টিকুলের রব। তাঁর আনুগত্য না করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোনই গত্যন্তর নেই। যে আনুগত্য অবলম্বন করে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরও জানা যায় যে, মিল্লাতে ইবরাহিমীর মৌলনীতির যথার্থ স্বরূপও এক 'ইসলাম' শব্দের মধ্যেই নিহিত - যার অর্থ আল্লাহ্‌র আনুগত্য। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দ্বীনের সারমর্মও তাই। ঐসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ্‌র এ দোস্ত মর্যাদার উচ্চতর শিখরে পৌঁছেছেন। ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি। এরই জন্য নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করা হয়েছে। এতে আরও বোঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত নবীর অভিন্ন দ্বীন এবং ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। আদম 'আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রাসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহবান করেছেন এবং তারা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে মিল্লাতে ইবরাহিমীর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি তার দ্বীনের নাম 'ইসলাম' রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমাহ্' নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দো'আ প্রসংগে বলেছিলেনঃ 'হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে (ইবরাহীম ও ইসমাঈল 'আলাইহিমুস্ সালাম) মুসলিম

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ۭ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۭ﴿١٣٢﴾

১৩২. আর ইব্‌রাহীম ও ইয়া'কূব তাদের পুত্রদেরকে এরই নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা মারা যেও

(অর্থাৎ আনুগত্যশীল) করুন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও একদলকে আনুগত্যকারী করুন'। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তার সন্তানদের প্রতি অসীয়ত প্রসংগে বলেছিলেনঃ 'তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের উপর মৃত্যু বরণ করো না'। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পর তারই প্রস্তাবক্রমে মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলিম'। এ উম্মতের দ্বীনও 'মিল্লাতে ইসলামিয়াহ্' নামে অভিহিত। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন। তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন এবং এতেও (অর্থাৎ কুরআনেও) এ নামই রাখা হয়েছে"। [সূরা আল-হাজ্বঃ ৭৮] দ্বীনের কথা বলতে গিয়ে ইয়াহূদী, নাসারা ও আরব-এর মুশরিকরাও বলে যে, তারা ইবরাহিমী দ্বীনের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা অথবা মিথ্যা দাবী মাত্র। বাস্তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত দ্বীনই ইবরাহিমী দ্বীনের অনুরূপ।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যত রাসূল আগমন করেছেন এবং যত আসমানী গ্রন্থ ও শরী'আত নাযিল হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র আনুগত্য। এ আনুগত্যের সারমর্ম হলো রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হিদায়াতের অনুসরণ। পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলিম এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা দ্বীনের নামেও স্বীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে চায়। কুরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা শরী'আতের পরিচ্ছদকে টেনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের কামনার মূর্তিতে পরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে - যাতে বাহ্যদৃষ্টিতে শরী'আতের অনুসরণ করছে বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ। গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিকে প্রতারিত করা গেলেও স্রষ্টাকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়; তাঁর জ্ঞান প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদ পর্যন্ত দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে খাঁটি আনুগত্য ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

না[১]'।

(১) ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর মিল্লাত বা দ্বীন ইসলাম তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে বিশেষভাবে ইবরাহীম ও ইয়াকূব 'আলাইহিমুস্ সালাম কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ অসীয়তের মাধ্যমে স্বীয় সন্তানদেরকে যে ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ এই যে, সন্তানদের ভালবাসা এবং মঙ্গলচিন্তা রিসালাত এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্‌র বন্ধু যিনি এক সময় তার পালনকর্তার ইংগিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কুরবানী করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য তার পালনকর্তার দরবারে দো'আও করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে চান, যা তার দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নেয়ামত অর্থাৎ ইসলাম। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার দামী বস্তু। অথচ নবী-রাসূলগণের দৃষ্টি অনেক ঊর্ধ্বে। তাদের কাছে প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম। সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়। আজকাল একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী কামনা করে, তার সন্তান মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানী ও রপ্তানীর বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকুরীজীবী চায় তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকুরী করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে কামনা করে, তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চুড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে সন্তানকে সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কলা-কৌশল বলে দিতে চায়। কিন্তু নবীগণ ও তাদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বস্তুকে তারা সত্যিকার চিরস্থায়ী ও অক্ষয় বলে মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। আর সেটা হচ্ছে দ্বীন ইসলামের উপর অটুট থাকা ও এর একনিষ্ঠ খাদেম হওয়া। এ জন্য তারা দো'আ করেন এবং চেষ্টাও করেন। অন্তিম সময়ে এরই জন্য অসীয়ত করেন। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

নবী-রাসূলগণের এ বিশেষ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে; বরং তার চাইতেও বেশী তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকারের ভালবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আযাবের কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাঁটা বের করার জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা করবে না। নবীদের কর্মপদ্ধতি থেকে আরও একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গল চিন্তা করা এবং এরপর অন্যদিকে মনোযোগ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى ۖ قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. ইয়া'কূবের যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? তিনি যখন সন্তানদের বলেছিলেন, 'আমার পরে তোমরা কার 'ইবাদাত করবে?' তারা বলেছিল, 'আমরা

দেয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। পিতা-মাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দু'টি রহস্য নিহিত রয়েছে - প্রথমতঃ প্রাকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে পিতা-মাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতা-মাতার সাহায্যকারী হতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ এটাই সত্য প্রচারের সবচাইতে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এ পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কুরআন বলেঃ "হে মুমিনগণ, নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর"। [সূরা আত-তাহরীমঃ ৬] মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সারা বিশ্বের রাসূল তার হেদায়াত কেয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য ব্যাপক। তাকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ "নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন"। [সূরা আশ্-শু'আরাঃ ২১৪] আরও বলা হয়েছেঃ "পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিন এবং নিজেও সালাত অব্যাহত রাখুন"। [সূরা ত্বা-হাঃ ১৩২] মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন। তৃতীয়তঃ আরও একটি রহস্য এই যে, কোন মতবাদ ও কর্মসূচীতে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচারকার্যের জবাবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ পরিবার কোরায়শকে ঠিক করে নিন; এরপর আমাদের কাছে আসুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কুরআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ পেলঃ "মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকবে"। [সূরা আন্-নসরঃ ২] আজকাল দ্বীনহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, পিতা-মাতা দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী ও দ্বীনী হলেও সন্তানদের দ্বীনী হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানদের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তওফীক দিন, যাতে আমরা আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের জন্য ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হই। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

আপনার ইলাহ্[১] ও আপনার পিতৃ পুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা'ঈল ও ইসহাকের ইলাহ্ - সেই এক ইলাহ্‌রই 'ইবাদাত করবো। আর আমরা তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণকারী'[২]।

১৩৪. তারা ছিল এমন এক জাতি, যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের। আর তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না[৩]।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

---

(১) ইলাহ্ শব্দটি মাসদার। যার অর্থ উপাস্য বা যার উপাসনা করা হয়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ ইলাহ্ হলেন যাকে সবাই উপাসনা করে। [তাফসীরে তাবারীঃ ১/৫৪] ইবনে আব্বাসের এই উক্তি শুধুমাত্র হক মা'বুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ ইলাহ্ শব্দ দ্বারা এমন মা'বুদকে বুঝানো হয়, যিনি 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য। আর যিনি মা'বুদ হওয়ার যোগ্য তাঁর মধ্যে এমন গুণ থাকা আবশ্যক যার কারণে তাঁকে সর্বোচ্চ ভালবাসা এবং সবচেয়ে বেশী বিনয় প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়।

(২) এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, নবীদের সবার দ্বীনই ছিল ইসলাম। এ জন্যই এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নবীগণ হচ্ছেন বৈমাত্রেয় ভাই। তাদের মাতা বিভিন্ন কিন্তু তাদের দ্বীন এক।" [বুখারী: ৩৪৪৩, মুসলিম: ২৩৬৫] মাতা বিভিন্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাদের শরী'আত বিভিন্ন। আর দ্বীন এক হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাওহীদের মূলনীতিসমূহে তাদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। [ইবনে কাসীর]

(৩) আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আসে না - যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, যদি তারা সৎকর্মশীল হয়। কুরআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছেঃ "একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না"। [সূরা আল-আন'আমঃ ১৬৪, আল-ইস্‌রাঃ ১৫, ফাতিরঃ ১৮, আয্-যুমারঃ ৭, আন্-নাজমঃ ৩৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'হে বনী-হাশেম! এমন যেন না হয় যে, কেয়ামতের দিন অন্যান্য লোকজন নিজ নিজ সৎকর্ম নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে সৎকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব নিয়ে এবং আমি বলব যে, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. আর তারা বলে, ‘ইয়াহূদী বা নাসারা হও, সঠিক পথ পাবে’। বলুন, ‘বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইব্‌রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করব[১] এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না’।

قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَاۤ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. তোমরা বল, ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা‘ঈল, ইসহাক, ইয়া‘কুব ও তার বংশধরদের প্রতি[২] নাযিল হয়েছে, এবং যা মূসা, ‘ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব-এর নিকট হতে দেয়া হয়েছে[৩]।

আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না’। [মুসলিমঃ ২৫৪৩] অন্য এক হাদীসে আছে, ‘আমল যাকে পিছনে ফেলে দেয়, বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না’। [মুসলিম: ২৬৯৯, আবু দাউদ: ১৪৫৫]

(১) আয়াতের আরেকটি অনুবাদ হচ্ছে, বরং আমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ করব, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং যিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। দুটো অর্থই এখানে গ্রহণযোগ্য। [তাফসীরে ফাতহুলকাদীর]

(২) কুরআন ইয়াকূব ‘আলাইহিস্‌ সালাম-এর বংশধরকে أَسْبَاط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এটা سبط এর বহুবচন। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের سِبْط বলার কারণ এই যে, ইয়াকূব ‘আলাইহিস্‌ সালাম-এর ঔরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল বারজন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ্‌ তা‘আলা তার বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন ইউসুফ ‘আলাইহিস্‌ সালাম-এর কাছে মিশরে যান, তখন সন্তান ছিল বার জন। পরে ফির‘আউনের সাথে মোকাবেলার পর মূসা ‘আলাইহিস্‌ সালাম যখন মিশর থেকে ইসরাঈল-বংশধরকে নিয়ে বের হলেন, তখন তার সাথে ইয়াকূব ‘আলাইহিস্‌ সালাম-এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হাজার হাজার সদস্যের একটি গোত্র ছিল। তার বংশে আল্লাহ্‌ তা‘আলা আরও একটি বরকত দান করেছেন এই যে, অনেক নবী ও রাসূল ইয়াকূব ‘আলাইহিস্‌ সালাম-এর বংশেই জন্মেছে। [তাফসীরে মা‘আরিফুল কুরআন]

(৩) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আহলে কিতাবগণ হিব্রু ভাষায় তাওরাত পড়ত এবং মুসলিমদের জন্য আরবীতে অনুবাদ করে দিত। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তোমরা তাদেরকে সত্যায়নও করবে না, মিথ্যারোপ

আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না[১]। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী’।

১৩৭. অতঃপর তোমরা যেরূপ ঈমান এনেছ তারাও যদি সেরূপ ঈমান আনে, তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা বিরোধিতায় লিপ্ত সুতরাং তাদের বিপক্ষে আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾

১৩৮. আল্লাহ্‌র রং এ রঞ্জিত হও[২]। আর

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫

করবে না; বরং বলবে, ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা‘ঈল, ইসহাক, ইয়া‘কুব ও তার বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে, এবং যা মূসা, ‘ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব-এর নিকট হতে দেয়া হয়েছে।” [বুখারী: ৪৪৮৫]

(১) নবীদের মধ্যে পার্থক্য না করার অর্থ হচ্ছে, কেউ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং কেউ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না অথবা কাউকে মানি এবং কাউকে মানি না - আমরা তাদের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করি না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত সকল নবীই একই চিরন্তন সত্য ও একই সরল-সোজা পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। কাজেই যথার্থ সত্যপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সকল নবীকে সত্যপন্থী ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে ব্যক্তি এক নবীকে মানে এবং অন্য নবীকে অস্বীকার করে, সে আসলে যে নবীকে মানে তারও অনুগামী নয়। তার আসল দ্বীন হচ্ছে বর্ণবাদ, বংশবাদ ও বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ। কোন নবীর অনুসরণ তার দ্বীন নয়।

(২) আল্লাহ্‌র রং বলতে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনের নিকট উদ্দেশ্য হলোঃ আল্লাহ্‌র দ্বীন বা ইসলাম। সারমর্ম হলো - যা কিছু বর্ণিত হলো, তা হলো আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁর নবী ইবরাহীমের মিল্লাত, এটা হলো সর্বোত্তম রং। আয়াতটির দু’টি অনুবাদ হতে পারে। (এক) আমরা আল্লাহ্‌র রং ধারণ করেছি। (দুই) আল্লাহ্‌র রং ধারণ কর। নাসারাদের দ্বীনের আত্মপ্রকাশের পূর্বে ইয়াহূদীদের মধ্যে একটি বিশেষ রীতির প্রচলন ছিল। কেউ তাদের দ্বীন গ্রহণ করলে তাকে গোসল করানো হত। আর তাদের ওখানে গোসলের অর্থ ছিল, তার সমস্ত গোনাহ্ যেন ধুয়ে গেল এবং তার জীবন যেন রং ধারণ করল। পরবর্তী কালে নাসারাদের মধ্যেও এ রীতির প্রচলন হয়। তাদের ওখানে

وَّنَحۡنُ لَهٗ عٰبِدُوۡنَ ﴿۱۳۸﴾

রং এর দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র চেয়ে কে বেশী সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ‘ইবাদাতকারী।

قُلۡ اَتُحَآجُّوۡنَنَا فِی اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّکُمۡ ۚ وَلَنَاۤ اَعۡمَالُنَا وَلَکُمۡ اَعۡمَالُکُمۡ ۚ وَنَحۡنُ لَهٗ مُخۡلِصُوۡنَ ﴿۱۳۹﴾

১৩৯. বলুন, ‘আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? অথচ তিনি আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব! আমাদের জন্য আমাদের আমল। আর তোমাদের জন্য তোমাদের আমল(১); এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ(২)’।

اَمۡ تَقُوۡلُوۡنَ اِنَّ اِبۡرٰهٖمَ وَاِسۡمٰعِیۡلَ وَاِسۡحٰقَ وَیَعۡقُوۡبَ وَالۡاَسۡبَاطَ کَانُوۡا هُوۡدًا اَوۡ نَصٰرٰی ؕ قُلۡ ءَاَنۡتُمۡ اَعۡلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنۡ کَتَمَ

১৪০. তোমরা কি বল যে, ‘অবশ্যই ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা‘ঈল, ইসহাক, ইয়া‘কুব ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহূদী বা নাসারা ছিল?’ বলুন, ‘তোমরা কি বেশী জান, না

এর পরিভাষিক নাম হচ্ছে -‘ইস্‌তিবাগ’ বা রঙ্গিন করা (ব্যাপ্টিজম)। তাদের দ্বীনে যারা প্রবেশ করে কেবল তাদেরকেই ব্যাপ্টাইজড করা হয় না, বরং নাসারা শিশুদেরকেও ব্যাপ্টাইজড করা হয়। এ ব্যাপারেই বলা হচ্ছে যে, এ লোকাচারমূলক রঞ্জিত হবার যৌক্তিকতা কোথায়? বরং আল্লাহ্‌র রঙে রঞ্জিত হও। যা কোন পানির দ্বারা হওয়া যায় না। বরং তাঁর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে এ রঙে রঞ্জিত হওয়া যায়।

(১) তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী আর আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী। তোমরা যদি তোমাদের ‘ইবাদাতকে বিভক্ত করে থাক এবং অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে তার ‘ইবাদাত ও আনুগত্য কর, তাহলে তোমাদেরকে তা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর পরিণাম তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। আমরা বলপূর্বক তোমাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চাই না। কিন্তু আমরা নিজেদের যাবতীয় ‘ইবাদাত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। যদি তোমরা এ কথা স্বীকার করে নাও যে, আমাদেরও এ কাজ করার ক্ষমতা ও অধিকার আছে, তাহলে তো ঝগড়াই মিটে যায়।

(২) এখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠা বা ইখলাসের অর্থ, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার না করা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য সৎকর্ম করা; মানুষকে দেখানোর জন্য অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্য নয়।

شَهَادَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

আল্লাহ্‌?' তার চেয়ে বেশী যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তার কাছে যে সাক্ষ্য আছে তা গোপন করে? আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ গাফেল নন।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

১৪১. তারা এমন এক উম্মাত, যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। আর তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

১৪২. মানুষের মধ্য হতে নির্বোধরা অচিরেই বলবে যে, এ যাবত তারা যে কেবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরালো? বলুন, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথের হিদায়াত করেন'।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ

১৪৩. আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী(১) জাতিতে পরিণত করেছি,

---

(১) وسطاً শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়। আবু সা'য়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম عدل শব্দ দ্বারা وسط এর ব্যাখ্যা করেছেন। [বুখারী: ৭৩৪৯] এর অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট। আবার وسط অর্থ হয় মধ্যবর্তী, মধ্যপন্থী। সে হিসাবে এ আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করা হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং নবী ও আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ। কুরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। বলা হয়েছে, 'আর আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার

করে’। [সূরা আল-আ‘রাফঃ ১৮১] এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য আলোচিত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানী গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোন ব্যাপারে কলহ-বিবাধ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোন আশংকা নেই। অন্য সূরায় মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ ‘তোমরাই সে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখবে। [সূরা আলে-ইমরান:১১০] অর্থাৎ মুসলিমরা যেমন সব নবীর শ্রেষ্ঠতম নবীপ্রাপ্ত হয়েছে, সব গ্রন্থের সর্বাধিক পরিব্যপ্ত ও পূর্ণতর গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ মেজাজ এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারাই সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্ব-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। ঈমান, আমল ও আল্লাহ্ ভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা ত্যাগের বদৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোন বিশেষ দেশ ও ভৌগলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যপ্ত। তাদের অস্তিত্বই অন্যের হিতাকাংখা ও তাদেরকে জান্নাতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত। এ সম্প্রদায়টি গণমানুষের হিতাকাংখা ও উপকারের নিমিত্তই সৃষ্ট। তাদের অভীষ্ট কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে সৎকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেও মুসলিম জাতি এক ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায়।

তাদের মধ্যে রয়েছে, ঈমানের ভারসাম্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা নবীগণকে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছেঃ ‘ইয়াহূদীরা বলেছে, ওযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র এবং নাসারারা বলেছে, মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র’। [সূরা আত-তাওবাহ: ৩০] অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে নবীর উপর্যুপরি মু‘জিযা দেখা সত্ত্বেও তাদের নবী যখন তাদেরকে কোন ন্যায়যুদ্ধে আহবান করেছেন, তখন তারা পরিস্কার বলে দিয়েছে, ‘আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব’। [সূরা আল-মায়েদাহ:২৪] আবার কোথাও নবীগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদেরই হাতে নির্যাতিত হতে দেখা গেছে। পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এমন আনুগত্য ও ভালবাসা পোষণ করে যে, এর সামনে জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-আব্রু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে রাসূলকে রাসূল এবং আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্ই মনে করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা আল্লাহ্‌র দাস ও রাসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে। তার প্রশংসা এবং গুণগান করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভেতর থাকে।

তাছাড়া মুসলিমদের মধ্যে রয়েছে, কর্ম ও 'ইবাদাতের ভারসাম্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা শরী'আতের বিধি-বিধানগুলোকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ-উৎকোচ নিয়ে আসমানী গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং 'ইবাদাত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, যারা সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত হালাল নেয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই সওয়াব ও 'ইবাদাত বলে মনে করে। পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি যুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধি-বিধানের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে রয়েছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরোয়াও করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোন কথাই নেই। মহিলাদের অধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেয়া হত না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়াদ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকামাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হত। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরী'আত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, যুদ্ধ ক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লংঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে।

তদ্রূপভাবে তাদের মধ্যে রয়েছে, অর্থনৈতিক ভারসাম্য। অর্থনীতিতে অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরাবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি মালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরী'আত এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামী শরী'আত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি; অপরদিকে সম্পদ বন্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোন মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

যাতে তোমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও[১] এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন[২]। আর আপনি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করছিলেন সেটাকে আমরা এ উদ্দেশ্যে কেবলায় পরিণত করেছিলাম যাতে

ও সাধারণ ওয়াক্‌ফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

(১) এ আয়াত থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল, ১. মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা হয়েছে যাতে তারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়ানুগ নয়, সে সাক্ষ্যদানেরও যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণতঃ 'নির্ভরযোগ্য' করা হয়। ২. ইজমা শরী'আতের দলীল। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ ইজমা (মুসলিম আলেমদের ঐক্যমত) যে শরী'আতের একটি দলীল, আলোচ্য আয়াতটি তার প্রমাণ। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্প্রদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে অপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলীল করে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের ইজমা বা ঐকমত্যও একটি দলীল এবং তা পালন করা ওয়াজিব।

(২) এ উম্মাত হাশরের ময়দানে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। সকল নবীর উম্মতরা তাদের হিদায়াত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলতে থাকবে, দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ পৌঁছেনি এবং কোন নবীও আমাদের হেদায়াত করেননি। তখন মুসলিম সম্প্রদায় নবীগণের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দেবে যে, নবীগণ সবযুগেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আনীত হিদায়াত তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। একাধিক হাদীসে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-কে ডেকে বলবেন, হে নূহ! আপনি কি আমার বাণী লোকদের কাছে পৌঁছিয়েছেন? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। তখন তার উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমাদের কাছে কি তিনি কিছু পৌঁছিয়েছেন? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোন সাবধানকারী আসেনি। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ হে নূহ! আপনার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ ও তার উম্মত। তখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, নূহ 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র বাণী লোকদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। আর রাসূল তখন তোমাদের সত্যতার উপর সাক্ষ্য দেবেন। এটাই হলো আল্লাহ্‌র বাণীঃ "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন"। [বুখারীঃ ৪৪৮৭]

প্রকাশ করে দিতে পারি[১] কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পিছনে ফিরে যায়? আল্লাহ্ যাদেরকে হিদায়াত করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের উপর এটা নিশ্চিত কঠিন। আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করে দিবেন[২]। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের

(১) আয়াতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে, لِنَعْلَمَ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, 'যাতে আমরা জানতে পারি'। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে কেউ কেউ এটা মনে করতে পারে যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ বুঝি আগে জানতেন না, ঘটনা ঘটার পরে জানেন। মূলত: এ ধরনের বোঝার কোন অবকাশই ইসলামী শরী'আতে নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আগে থেকেই সবকিছু জানেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর জানা বিষয়টি অনুসারে বান্দার কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে দিয়ে বান্দার উপর তাঁর প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করেন। যাতে করে তার জানার উপর ন্যায় বরং বাস্তব ভিত্তিতে তিনি বান্দাকে সওয়াব বা শাস্তি দিতে পারেন। মূলত: এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের মনে যা আছে তা পরিশোধন করেন। আর অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবহিত।" [সূরা আলে ইমরান: ১৫৪] এ আয়াতে 'পরীক্ষা' করার কথা বলার মাধ্যমে এ কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা। এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় আয়াতের শেষে 'আর অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবহিত' এ কথা বলার মাধ্যমে। এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র যেমন, সূরা আল-কাহাফ:১২, সাবা: ২১ এ ব্যবহৃত لِنَعْلَمَ শব্দটির অর্থ স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং কোন সন্দেহের উদ্রেক হবে না। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) এখানে ঈমান শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা দ্বীন ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না। কোন কোন মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে সালাত। মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল-মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যেসব সালাত আদায় করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কা'বাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যে সব মুসলিম ইতিমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন, তারা

প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু।

১৪৪. অবশ্যই আমরা আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো লক্ষ্য করি(১)। সুতরাং অবশ্যই আমরা আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন(২)। অতএব আপনি মসজিদুল

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾

বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে গেছেন - কা'বার দিকে সালাত আদায় করার সুযোগ পাননি, তাদের কি হবে? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৪৮৬] এতে সালাতকে ঈমান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, ১. তাদের সব সালাতই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। ২. আমল ঈমানের অংগ। ৩. সালাত ঈমানের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে, সালাতকে বোঝানোর জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান শব্দ ব্যবহার করেছেন।

(১) কেবলা পরিবর্তনের আদেশ আসার আগে থেকেই নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি নিজেই অনুভব করছিলেন ইসরাঈল-বংশীয়দের নেতৃত্বের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে বায়তুল-মুকাদ্দাসের কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভেরও অবসান ঘটেছে। এখন আসল ইবরাহিমী কেবলার দিকে মুখ ফিরানোর সময় হয়ে গেছে। কা'বা মুসলিমদের কেবলা সাব্যস্ত হোক - এটাই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আন্তরিক বাসনা। তিনি এর জন্য দো'আও করছিলেন। এ কারণেই তিনি বার বার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশ্‌তা নির্দেশ নিয়ে আসছেন কি না।

(২) এ আয়াতাংশটি হচ্ছে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কিত মূল নির্দেশ। এ নির্দেশটি তৃতীয় হিজরীর রজব বা শাবান মাসে নাযিল হয়। ইবনে সা'আদ বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দাওয়াত উপলক্ষে উম্মে বিশ্‌র ইবনে বারা' ইবনে মা'রুর-এর ঘরে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের সময় গিয়েছিল। তিনি সেখানে সালাতে লোকদের ইমামতি করতে দাঁড়িয়েছিলেন। দু'রাকা'আত সালাত আদায় হয়ে গিয়েছিল। এমনি সময় তৃতীয় রাকা'আতে ওহীর মাধ্যমে এ আয়াতটি নাযিল হল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ও তার সঙ্গে জামা'আতে শামিল সমস্ত লোক বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কা'বার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ১/২৪২] এরপর মদীনা ও মদীনার আশেপাশে এ নির্দেশটি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়া হল। বারা ইবনে 'আযেব বলেন, এক জায়গায় ঘোষকের কথা এমন অবস্থায় পৌঁছল, যখন তারা রুকূ' করছিল। নির্দেশ শোনার সাথে সাথেই সবাই সে অবস্থাতেই কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। আনাস ইবনে মালেক বলেন, এ খবরটি

হারামের দিকে[১] চেহারা ফিরান[২]। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের চেহারাসমূহকে এর দিকে ফিরাও এবং নিশ্চয় যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে, এটা তাদের রব-এর পক্ষ হতে হক। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ গাফেল নন।

১৪৫. আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে আপনি যদি তাদের কাছে সমস্ত দলীল নিয়ে আসেন, তবু তারা আপনার

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ

কুবায় পৌঁছল পরের দিন ফজরের সালাতের সময়। লোকেরা এক রাকা'আত সালাত শেষ করেছিল, এমন সময় তাদের কানে আওয়াজ পৌঁছলঃ 'সাবধান! কেবলা বদলে গেছে। এখন কা'বার দিকে কেবলা নির্দিষ্ট হয়েছে।' এ কথা শোনার সাথে সাথেই সমগ্র জামা'আত কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। [অনুরূপ বর্ণনা, বুখারী: ৪৪৮৬]

(১) 'মসজিদুল হারাম' অর্থ সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। এর অর্থ হচ্ছে এমন 'ইবাদতগৃহ, যার মধ্যস্থলে কা'বাগৃহ অবস্থিত।

(২) হিজরতের পূর্বে মক্কা-মুকার্‌রামায় যখন সালাত ফরয হয়, তখন কা'বাগৃহই সালাতের জন্য কেবলা ছিল, না বায়তুল-মুকাদ্দাস ছিল - এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেনঃ ইসলামের শুরু থেকেই কিবলা ছিল বায়তুল-মুকাদ্দাস। হিজরতের পরও ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মুকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কা'বাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন যাতে কা'বা ও বায়তুল-মুকাদ্দাস উভয়টিই সামনে থাকে। মদীনায় পৌঁছার পর এরূপ করা সম্ভব ছিল না। তাই তার মনে কেবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেনঃ মক্কায় সালাত ফরয হওয়ার সময় কা'বা গৃহই ছিল মুসলিমদের প্রাথমিক কেবলা। কেননা ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল 'আলাইহিমুস্ সালাম-এরও কেবলা তাই ছিল। মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করতেন। মদীনায় হিজরতের পর তার কেবলা বায়তুল-মুকাদ্দাস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদীনায় ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ কা'বাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ নাযিল হয়।

قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

কিবলার অনুসরণ করবে না; এবং আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন[১]। আর তারাও পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। আপনার নিকট সত্য-জ্ঞান আসার পরও যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন, তাহলে নিশ্চয় আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ জানে যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চিনে। আর নিশ্চয় তাদের একদল জেনে-বুঝে সত্য গোপন করে থাকে।

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. সত্য আপনার রব-এর কাছ থেকে পাঠানো। কাজেই আপনি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا

১৪৮. আর প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যে দিকে সে চেহারা ফিরায়[২]। অতএব

(১) আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কা'বা কেয়ামত পর্যন্ত আপনার কেবলা থাকবে। এতে ইয়াহূদী-নাসারাদের সে মতবাদ খণ্ডন করাই ছিল উদ্দেশ্য যে, মুসলিমদের কেবলার কোন স্থিতি নেই; ইতঃপূর্বে তাদের কেবলা ছিল কা'বা, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল-মুকাদ্দাস হল, আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় কা'বা হল। আবারো হয়ত বায়তুল-মুকাদ্দাসকেই কেবলা বানিয়ে নেবে। [তাফসীরে বাহরে মুহীত]

(২) وجهة শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু, যার দিকে মুখ করা হয়। আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এর অর্থ কেবলা। এ ক্ষেত্রে উবাই ইবনে কা'ব وجهة এর স্থলে قبلة ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে। তাফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই, প্রত্যেক জাতিরই 'ইবাদাতের সময় মুখ করার জন্য একটি নির্ধারিত কেবলা চলে আসছে। সে কেবলা আল্লাহ্‌র তরফ হতে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, অথবা তারা নিজেরাই তা নির্ধারণ করে নিয়েছে। মোটকথা, 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোন না কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উম্মতগণের জন্য যদি কোন একটা বিশেষ দিককে কেবলা

تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١٤٨

তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝١٤٩

১৪৯. আর যেখান থেকেই আপনি বের হন না কেন মসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান। নিশ্চয় এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে পাঠানো সত্য। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ গাফেল নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۤ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۤ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۤ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝١٥٠

১৫০. আর আপনি যেখান থেকেই বের হন না কেন মসজিদুল হারামের দিকে আপনার চেহারা ফিরান এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন এর দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও(১), যাতে তাদের মধ্যে যালিম ছাড়া অন্যদের তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না থাকে। কাজেই তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর। আর

নির্ধারণ করে দেয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ বাক্যটি তিনবার এবং ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ﴾ বাক্যটি দু'বার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর একটা সাধারণ কারণ এই যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য তো এক হৈ-চৈএর ব্যাপার ছিলই, স্বয়ং মুসলিমদের জন্যও তাদের 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কাজেই এ নির্দেশটি যদি যথার্থ তাকীদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা না হত, তাহলে মনের প্রশান্তি অর্জন হয়ত যথেষ্ট সহজ হত না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তদুপরি এতে এরূপ ইংগিতও রয়েছে যে, কেবলার এই যে পরিবর্তন, এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এরপর পুনঃপরিবর্তনের আর কোন সম্ভাবনা নেই।

যাতে আমি তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করি এবং যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।

১৫১. যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি[১], যিনি তোমাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন। আর তা শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।

كَمَآ اَرۡسَلۡنَا فِيۡكُمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡكُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡكُمۡ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيۡكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُمۡ مَّا لَمۡ تَكُوۡنُوۡا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿١٥١﴾

১৫২. কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর[২],

فَاذۡكُرُوۡنِىۡٓ اَذۡكُرۡكُمۡ وَاشۡكُرُوۡا لِىۡ وَلَا تَكۡفُرُوۡنِ ﴿١٥٢﴾

(১) এ পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আর বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইংগিত করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দো'আরও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তার কেবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছু নেই।

كَمَا أَرْسَلْنَاكَ বাক্যে উদাহরণসূচক যে 'কাফ' (ك) বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা তো উল্লেখিত তাফসীরের মাধ্যমেই বুঝা গেছে। এছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেছেন। তা হলো এই যে, 'কাফ' এর সম্পর্ক হলো পরবর্তী আয়াত ﴿ فَاذْكُرُوْنِيْٓ ﴾ এর সাথে। অর্থাৎ আমি যেমন তোমাদের প্রতি কেবলাকে একটি নেয়ামত হিসাবে দান করেছি অতঃপর দ্বিতীয় নেয়ামত দিয়েছি রাসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহ্র যিক্রও আরেকটি নেয়ামত। সুতরাং এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নেয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(২) যিক্র আরবী শব্দ। এর বেশ কয়েকটি অর্থ হতে পারে - (১) মুখ থেকে যা উচ্চারণ করা হয়। (২) অন্তরে কোন কিছু স্মরণ করা। (৩) কোন জিনিস সম্পর্কে সতর্ক করা। শর'য়ী পরিভাষায় যিক্র হচ্ছে, বান্দা তার রবকে স্মরণ করা। হোক তা তাঁর নাম নিয়ে, গুণ নিয়ে, তাঁর কাজ নিয়ে, প্রশংসা করে, তাঁর কিতাব তিলাওয়াত করে,

তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করে, তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে অথবা তাঁর কাছে কিছু চেয়ে।

যিক্‌র দুই প্রকার। যথা - কওলী বা কথার মাধ্যমে যিক্‌র ও আমলী বা কাজের মাধ্যমে যিক্‌র। প্রথম প্রকার যিক্‌রের মধ্যে রয়েছে - কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহ্‌র সুন্দর সুন্দর নাম ও সিফাতসমূহের আলোচনা ও স্মরণ, তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকারে রয়েছে - ইলম অর্জন করা ও শিক্ষা দেয়া, আল্লাহ্‌র হুকুম-আহ্‌কাম ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা ইত্যাদি। প্রথম প্রকার যিক্‌রের মধ্যে কিছু যিক্‌র আছে যা সময়, অবস্থা এবং সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, সকাল ও সন্ধ্যার যিক্‌র, সালাতের পরের যিক্‌র, খাওয়ার শুরু-শেষ, কাপড় পরিধান, মসজিদে প্রবেশ-বাহির ইত্যাদি সহ দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ-কর্মের দো'আ বা যিক্‌রসমূহ। যে সকল যিক্‌র অবস্থা, সময় ও সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোর সংখ্যা, সময় অথবা অবস্থা কোনটিরই পরিবর্তন করা জায়েয নেই। যে সকল যিক্‌র এ তিনটির সাথে সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ সাধারণ যিক্‌র, সেগুলো সময়, সংখ্যা অথবা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করাও জায়েয নেই। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ 'মৌখিক যিক্‌রের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হওয়া এবং নির্দিষ্ট শব্দ নির্ধারণ করা বিদ'আত'। [ইবনুল হুমাম, শরহে ফাত্‌হুল কাদীরঃ ২/৭২]

যিক্‌র এর ফযীলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও কম ফযীলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ্‌ও তাকে স্মরণ করেন। আবু উসমান নাহ্‌দী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে স্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কেমন করে জানতে পারেন? বললেন, তা এজন্য যে, কুরআনুল কারীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোন মুমিন বান্দা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহ্‌র স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ্ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন। সায়ীদ ইবনে যুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ্ 'যিক্‌রুল্লাহ্'র তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিক্‌রের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তার বক্তব্য হচ্ছেঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহ্‌র যিকরই করে না; প্রকাশ্যে যতবেশী সালাত এবং তাসবীহ্‌ই সে পাঠ করুক না কেন'। মূলতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে, সেই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, যদি তার নফল সালাত ও সিয়াম কিছু কমও হয়। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে সে সালাত-সিয়াম, তাসবীহ্-তাহ্‌লীল প্রভৃতি বেশী করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ 'যে ব্যক্তি যিক্‌র করে এবং যে ব্যক্তি যিক্‌র করেনা তাদের উপমা হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়'। [বুখারীঃ ২০৮] অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদেরকে কি এমন একটি উত্তম

আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

১৫৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য চাও সবর[১] ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন[২]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۳﴾

আমলের সংবাদ দেব যা তোমাদের মালিকের নিকট অধিকতর পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক, স্বর্ন ও রৌপ্য ব্যয় করা থেকেও তোমাদের জন্য উত্তম, শত্রুর সাথে মোকাবেলা করে গর্দান দেয়া-নেয়া থেকে উত্তম? তারা বলল, হ্যাঁ অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন, যিকরুল্লাহ্'। [তিরমিযীঃ ৫/৪৫৯] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত এক হাদীসে-কুদ্সীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি'। [বুখারীঃ ৭৪০৫] মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোন আমলই যিক্রুল্লাহ্র সমান নয়'। যুন্নূন মিসরী বলেনঃ 'যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহ্কে স্মরণ করে সে অন্যান্য সবকিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাজত করেন এবং সবকিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন'।

(১) 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও নফস্ এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর'-এর তিনটি শাখা রয়েছে। (এক) নফসকে হারাম এবং না-জায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা (দুই) 'ইবাদাত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (তিন) যেকোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ যেসব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয়, সেগুলোকে আল্লাহ্র বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। [ইবনে কাসীর]। 'সবর'-এর উপরোক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণা সাধারণতঃ তৃতীয় শাখাকেই 'সবর' হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম দু'টি শাখা এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দু'টি বিষয়ও যে 'সবর'-এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কুরআন হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে।

(২) সালাত এবং 'সবর'-এর মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ এই যে, এ দু'পন্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়। 'আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন' বাক্যের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সালাত আদায়কারী এবং সবরকারীগণের আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ হয়। মহান আল্লাহ্ আরশের উপর

১৫৪. আর আল্লাহ্‌র পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত[১]; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

থেকেও তাঁর বান্দাদের সাথে থাকার অর্থ দু'টি। প্রথম. সাধারন অর্থে 'সাথে থাকা'। যা সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তা হচ্ছে, সবাই মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ভিতরে থাকা। মহান আল্লাহ্‌র যত সৃষ্টি সবার যাবতীয় অবস্থা তাঁর গোচরিভূত। তিনি ভাল করেই জানেন কে কোথায় কোন অবস্থায় কোন কাজে লিপ্ত। দ্বিতীয় প্রকার 'সাথে থাকা' বিশেষ অর্থে। যা কেবলমাত্র তাঁর নেককার, সবরকারী, ইহসানকারী, মুত্তাকীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর সেটি হচ্ছে, সাহায্য-সহযোগিতা করা। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষে কারও সাথে থাকার অর্থ কখনো এটা হতে পারে না যে, তিনি তার সাথে চলাফেরা করছেন বা কোন কিছুর ভিতরে প্রবেশ করে আছেন। অথবা তার সাথে লেগে আছেন। কারণ; মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপর রয়েছেন। তিনি স্রষ্টা হিসেবে সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

(১) প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি আলমে-বরযখে বা কবরে বিশেষ ধরণের এক প্রকার হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আযাব বা সওয়াব ভোগ করে থাকে। তবে সে জীবনের হাকীকত আমরা জানি না। যেসব লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হন, তাদেরকে শহীদ বলা হয়। তাদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনের অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "শহীদগণের রূহ সবুজ পাখীর প্রতিস্থাপন করা হয়, ফলে তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। তারপর তারা আরশের নীচে অবস্থিত কিছু ঝাড়বাতির মধ্যে ঢুকে পড়ে। তখন তাদের রব তাদের প্রতি এক দৃষ্টি দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি চাও? তারা বলে হে রব! আমরা কি চাইতে পারি? আমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তো আপনি আপনার কোন সৃষ্টিকে দেন নি? তারপরও তাদের রব আবার তাদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে অনুরূপ প্রশ্ন করেন। যখন তারা বুঝল যে, তারা কিছু চাইতেই হবে, তখন তারা বলে, আমরা চাই আপনি আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ফেরৎ পাঠান, যাতে আমরা পুনরায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হতে পারি। শহীদগণের সাওয়াবের আধিক্য দেখেই তারা এ কথা বলবে- তখন তাদের মহান রব তাদের বলবেন, আমি এটা পূর্বে নির্ধারিত করে নিয়েছি যে, এখান থেকে আর ফেরার কোন সুযোগ নেই।" [মুসলিম: ১৮৮৭] তবে সাধারণ নিয়মে শহীদদেরকে মৃতই ধরা হয় এবং তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টিত হয়, তাদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে। যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা

করতে পার না।

১৫৫. আর আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব[১] কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে--

وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥

যায় না, সেহেতু কুরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে ﴿لَّا تَشۡعُرُونَ﴾ (তোমরা বুঝতে পার না) বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মত অনুভূতি তোমাদের দেয়া হয়নি। এ আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, শহীদেরা পার্থিব জীবনের মত জীবিত নন। তাদেরকে জীবিত বলা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে বিশেষ এক জীবন বরযখে দিয়েছেন, যার হাকীকত বা বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

(১) কোন বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা, হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশী হয়। যেহেতু আল্লাহ্‌ তা'আলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। পরীক্ষায় সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে পরে সমষ্টিগতভাবেই পুরস্কার দেয়া হবে; এছাড়াও সবর-এর পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে। মূলতঃ মানুষের ঈমান অনুসারেই আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা, বিপদাপদ-বালা মুসিবত নবীদেরকে প্রদান করেন। তারপর যারা তাদের পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক।" [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩৬৯] অর্থাৎ প্রত্যেকের ঈমান অনুসারেই তাদের পরীক্ষা হয়ে থাকে। তবে পরীক্ষা যেন কেউ আল্লাহ্‌র কাছে কামনা না করে। বরং সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা কামনা করাই মুমিনের কাজ। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে বলতে শুনেছেন যে, "হে আল্লাহ্‌! আমাকে সবরের শক্তি দান কর। তখন তিনি বললেন, তুমি বিপদ কামনা করেছ, সুতরাং তুমি নিরাপত্তা চাও।" [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩১,২৩৫] রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, মুমিনের উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, কিভাবে নিজেকে অপমানিত করে? রাসূল বললেন, এমন কোন বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হয় যা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই"। [তিরমিযী: ২২৫৪]

১৫৬. যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্‌রই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী[১]'।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের[২] অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ (কা'বা)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن

(১) সবরকারীগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে - 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দো'আটি পাঠ করে। কেননা, এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি এ বাক্যের অর্থের প্রতি যথার্থ লক্ষ্য রেখে তা পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তি লাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়। দো'আটির অর্থ হচ্ছে, "নিশ্চয় আমরা তো আল্লাহ্‌রই। আর আমরা তার দিকেই প্রর্তাবর্তন করব।" সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদের কোন কষ্ট দেন তবে তাতে কোন না কোন মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। তার উদ্দেশ্যকে সম্মান করতে পারা একটি মহৎ কাজ। আর এটাই হচ্ছে, সবর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমিনের কর্মকাণ্ড আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই ভাল। মুমিন ছাড়া আর কারও জন্য এমনটি হয় না। যদি তার কোন খুশীর বিষয় সংঘটিত হয় তবে সে শুকরিয়া আদায় করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণের হয়। আর যদি তার কোন ক্ষতিকর কিছু ঘটে যায় তবে সে সবর করে, ফলে তাও তার জন্য কলাণকর হয়।" [মুসলিম: ২৯৯৯] অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ বিপদ-মুসিবতে পড়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' বলবে, এবং বলবে, হে আল্লাহ্ আমাকে এ মুসিবত থেকে উদ্ধার করুন এবং এর থেকে উত্তম বস্তু ফিরিয়ে দিন" অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে উত্তম কিছু ফিরিয়ে দিবেন" [মুসলিম: ৯১৮]

(২) ﴿شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ এখানে شعائر শব্দটি شعيرة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন বা নিদর্শন। ﴿شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ বলতে সেসব আমলকে বুঝায়, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾

ঘরের হজ[১] বা ‘উমরা[২] সম্পন্ন করে, এ দু’টির মধ্যে সা‘ঈ করলে তার কোন পাপ নেই[৩]। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন সৎকাজ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۙ أُولٰٓئِكَ

১৫৯. নিশ্চয় যারা[৪] গোপন করে আমরা যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়াত

---

(১) حج এর শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা পোষণ করা, সংকল্প করা। কুরআন-সুন্নাহ্র পরিভাষায় বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ শরীফে আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে গমন করে বিশেষ ধরনের কিছু কর্ম সম্পাদন করাকে হজ্ব বলা হয়ে থাকে।

(২) عمرة শব্দের আভিধানিক অর্থ দর্শন করা। শরী‘আতের পরিভাষায়, ইহরামসহ আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্ শরীফে হাযির হয়ে তাওয়াফ-সা‘য়ী প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি ‘ইবাদাত সম্পাদনের নামই উমরাহ্।

(৩) ‘সাফা’ এবং ‘মারওয়া’ বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী দু’টি পাহাড়ের নাম। হজ কিংবা উমরার সময় কা‘বা ঘরের তওয়াফ করার পর এ দু’টি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াতে হয়। শরী‘আতের পরিভাষায় একে বলা হয় ‘সা‘য়ী’। জাহেলী যুগেও যেহেতু এ সায়ীর রীতি প্রচলিত ছিল এবং তখন এ দু’টি পাহাড়ের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, এ জন্য মুসলিমদের কারো কারো মনে একটা দ্বিধার ভাব জাগ্রত হয়েছিল যে, বোধহয় এ সা‘য়ী জাহেলী যুগের কোন অনুষ্ঠান এবং ইসলাম যুগে এর অনুসরণ করা হয়ত গোনাহ্র কাজ। কোন কোন লোক যেহেতু জাহেলী যুগে একে একটা অর্থহীন কুসংস্কার বলে মনে করতেন, সেজন্য ইসলাম গ্রহণের পরও তারা একে জাহেলিয়াত যুগের কুসংস্কার হিসেবেই গণ্য করতে থাকেন। এরূপ সন্দেহের নিরসনকল্পে আল্লাহ্ তা‘আলা যেভাবে বায়তুল্লাহ্ শরীফের কেবলা হওয়া সম্পর্কিত সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন, তেমনিভাবে এ আয়াতে বায়তুল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট আরও একটি সংশয়ের অপনোদন করে দিয়েছেন। তাছাড়া রাসূলের বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও সাফা-মারওয়ার মাঝখানের সা‘য়ী প্রমাণিত। [দেখুন, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৪২১, ৪২২]

(৪) যারা আল্লাহ্র কিতাবের জ্ঞান গোপন করত, তারা ছিল ইয়াহূদী আলেম সম্প্রদায়। তারা সর্বসাধারণ্যে প্রচার করার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনকে একটি সীমিত ধর্মীয় পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। সাধারণ জনগণকে এ জ্ঞান থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। এমনকি এ গোষ্ঠীর লোকগুলো নিজেদের জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখার জন্য ভ্রষ্টতা ও শরী‘আত বিরোধী কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়তে নিজেদের কথা ও কাজের সাহায্যে অথবা নীরব সমর্থনের মাধ্যমে বৈধতার ছাড়পত্র দান করত। এ আয়াতে এ ধরণের প্রবণতা থেকে মুসলিমদেরকে দূরে থাকার তাকীদ দেয়া হয়েছে।

يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿١٥٩﴾

নাযিল করেছি, মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পর(১), তাদেরকে আল্লাহ্‌ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও(২) তাদেরকে লা'নত

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যে সমস্ত প্রকৃষ্ট হিদায়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেও লা'নত বা অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায়ঃ এক. যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরী, তা গোপন করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের বিষয় জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন'। [আবু দাউদঃ ৩৬৫৮, ইবনে মাজাহ্‌ঃ ২৬৬, আহমাদঃ ২/২৬৩] দুই. 'জ্ঞানকে গোপন করার' অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যদ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লেখিত আয়াতে ﴿مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى﴾ বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, 'তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমনসব হাদীস শোনাও, যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেত্‌না-ফাসাদেরই সম্মুখীন করবে। [বুখারী, কিতাবুল ইলম, ইমাম মুসলিম, মুকাদ্দিমা] আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে উদ্ধৃত রয়েছে, তিনি বলেছেন, 'সাধারণ মানুষের সামনে 'ইলমের শুধু ততটুকু প্রকাশ করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ধারণ করতে পারে। মানুষ আল্লাহ্‌ ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক; তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যে কথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানা রকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ্‌ ও রাসূলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে। [বুখারী, কিতাবুল ইলমঃ ৪৯ নং অধ্যায়]

(২) যে কাফের কুফর অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারো শেষ পরিণতির (মৃত্যুর) নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু কোন কাফেরের নাম নিয়ে তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েয নয়। বস্তুতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত কাফেরের নাম উল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাফের ও যালেমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা

করেন[১]।

১৬০. তবে যারা তাওবা করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। অতএব, এদের তাওবা আমি কবুল করব। আর আমি অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

১৬১. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের উপর আল্লাহ্‌, ফেরেশ্‌তাগণ ও সকল মানুষের লা'নত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

১৬২. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি শিথিল করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

জায়েয। এতে এ কথাও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন কাফেরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোন মুসলিম কিংবা কোন জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে আমাদের নারী সম্প্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে। তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও অভিসম্পাত বা লা'নত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসুর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হল, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। কাজেই কাউকে 'মরদূদ', 'আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত' প্রভৃতি শব্দে গালি দেয়াও লা'নতেরই সমপর্যায়ভুক্ত। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এ আয়াতে কুরআনুল কারীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি। মুফাসসিরগণ বলেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। মুজাহিদ ও আতা রাহিমাহুমাল্লাহ বলেন, এমনকি জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। [সুনান সাঈদ ইবনে মানসূর: ২/৬৩৮, ৬৩৯, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান: ৫/২৪] কারণ, তাদের অপকর্মের দরুন সেসব সৃষ্টিরও ক্ষতি সাধিত হয়।

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, দয়াময়, অতি দয়ালু তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই[১]।

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ

১৬৪. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে[২], রাত ও দিনের পরিবর্তনে[৩],

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্‌র 'ইসমে আ'যাম' এ দু'টি আয়াতের মধ্যে রয়েছে"। তারপর তিনি এ আয়াত ও সূরা আলে ইমরানের প্রথম আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। [তিরমিযী: ৩৪৭৮, আবু দাউদ: ১৪৯৬, ইবনে মাজাহ: ৩৮৫৫]

(২) আসমান ও যমীনের সৃষ্টি কিভাবে নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত, তা এ আয়াতে ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি। অন্যত্র তা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যেমন "তারা কি তাদের উপরে অবস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমরা কিভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোন ফাটলও নেই ? আর আমরা বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদ্‌গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ্, আল্লাহ্‌র অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।" [সূরা কাফ: ৬-৮] আর আসমান সম্পর্কে বলেছেন "যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আসমান। রহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত দেখতে পাবেন না ; আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন , কোন ত্রুটি দেখতে পান কি ? তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে। আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।" [সূরা আল-মুলক: ৩-৫] তারপর যমীন সম্পর্কে বলেছেন, "তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিয্ক থেকে তোমরা আহার কর; আর পুনরুত্থান তো তাঁরই কাছে।" [সূরা আল-মুলক: ১৫]

(৩) রাত দিনের পরিবর্তন কিভাবে নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত, তা এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয় নি। অন্য আয়াতে তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। যেমন, "বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?' বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদের জন্য রাতের আবির্ভাব ঘটাবে যাতে বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না ?" [সূরা আল-কাসাস: ৭১,৭২]

وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

মানুষের উপকারী[১] দ্রব্যবাহী চলমান সামুদ্রিক জাহাজে এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন, তার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার বিচরণশীল প্রাণী এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে বিবেকবান কওমের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে[২] ।

---

(১) এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানী-রফতানী করার মাঝেও মানুষের এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা গণনাও করা যায় না । আর এ উপকারিতার ভিত্তিতেই যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে । এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোন কিছুর ক্ষতিসাধিত না হয় । যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোন মানুষ, জীব-জন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না । অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যের আওতায় ছিল না । যদি তাদেরকে বলা হত, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ছ'মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর কোনক্রমে রেখে দিলেও সেগুলো পচন অথবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । কুরআনে বলা হয়েছেঃ "আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেয়ার ক্ষমতা আমার ছিল" । [সূরা আল-মুমিনূন: ১৮] কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত খাদ-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন । তারপর এমন এক ফল্গুধারা সমগ্র জমীনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যেকোন জায়গায় খনন করে পানি বের করে নিতে পারে । আবার এ পানিরই একটা অংশকে জমাট বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত; অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারার মাধ্যমে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে । সারকথা, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তাওহীদ বা একত্ববাদই প্রমাণ করা হয়েছে ।

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত একত্ববাদ সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে । আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তারই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে ভালবাসে আল্লাহ্র ভালবাসার মতই[১]; পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্কে সর্বাধিক ভালবাসে[২]। আর যারা যুলুম করেছে যদি তারা আযাব দেখতে পেত[৩], (তবে তারা নিশ্চিত

ও একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ। অনুরূপভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, একান্ত তরল ও প্রবাহমান হওয়া সত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালাকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পিছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি সম্ভব হত না, তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারত না; এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হত না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তিনি ইচ্ছে করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক চরম ধৈর্যশীল ও একান্ত কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।" [সূরা আশ-শুরা: ৩৩]

(১) অর্থাৎ তারা আল্লাহ্কে যেমন ভালবাসে তাদের মা'বুদদেরও তেমন ভালবাসে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা কাফেরদের মনেও ছিল, কিন্তু তা ছিল শির্কযুক্ত। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র জন্য নয়।

(২) আয়াতের এ অংশের অর্থ, কাফেরগণ তাদের মা'বুদদের যতবেশীই ভালবাসুক না কেন, ঈমানদারগণ আল্লাহ্কে তাদের থেকে অনেক বেশী ভালবাসে। কেননা, ঈমানদারগণ তাদের সম্পূর্ণ ভালবাসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট করেছে। অপরপক্ষে, কাফেরগণ তাদের ভালবাসা তাদের মা'বুদদের মধ্যে বন্টন করেছে।

(৩) মুফাস্সিরগণ আয়াতের এ অংশের বিভিন্ন অর্থ করেছেনঃ

১) যারা দুনিয়াতে শির্কের মাধ্যমে যুলুম করছে তারা যদি আখেরাতের শাস্তি দেখতে পেত এবং এও দেখতে পেত যে, যাবতীয় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র, এবং আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা আর তাদের মা'বুদদের কোন শক্তিই নেই, তাহলে তারা যাদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে 'ইবাদাত করছে, কখনোই তাদের

হত যে,) সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

১৬৬. যখন যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা, যারা অনুসরণ করেছে তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবে এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে। আর তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে,

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

১৬৭. আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, ‘হায়! যদি একবার আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো তবে আমরাও তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে’(১)।

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

‘ইবাদাত করতো না।

২) যারা দুনিয়াতে শির্কের মাধ্যমে যুলুম করেছে তারা যদি আল্লাহ্‌র শক্তি ও কঠোর আযাব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকত, তাহলে তারা তাদের মা‘বুদদের ‘ইবাদাত করার ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারত।

৩) সঠিক ‘কেরাআত’-এর মধ্যে কেউ কেউ يرى শব্দটিকে ترى পড়েছেন। তখন তার অর্থ হবে, হে নবী! আপনি যদি - যারা শির্কের মাধ্যমে যুলুম করছে - এ লোকদেরকে শাস্তি থেকে ভীত অবস্থায় দেখতে পেতেন, তাহলে আপনি জানতেন যে, সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র। অথবা, এর অর্থ হবে, হে নবী! আপনি যদি যালিমদেরকে শাস্তি প্রত্যক্ষরত অবস্থায় দেখতেন কেননা, যাবতীয় শক্তি আল্লাহ্‌রই। তাহলে আপনি বুঝতে পারতেন যে, তাদের শাস্তির পরিমাণ কত ভয়াবহ!

৪) সঠিক ‘কেরাআত’-এর মধ্যে কেউ কেউ يَرَوْنَ শব্দটিকে يُرَوْنَ পড়েছেন। তখন তার অর্থ হবে, যারা যুলুম করেছে, যখন তাদেরকে শাস্তি দেখানো হবে তখন তারা দেখতে পাবে যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌র আর আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

(১) এ আয়াতে জাহান্নামবাসীদের মধ্যে নেতারা ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে যে সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ হবে সেটার কিছু কথোপকথন ও তাদের অনুতাপের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টি আরও বেশী করে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, “আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, ‘আমরা এ কুরআনে কখনো বিশ্বাস করব না, এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও নয়।’ হায়! আপনি যদি দেখতেন যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে তখন

এভাবে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী তাদেরকে দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ(১)। আর তারা কখনো আগুন থেকে বহির্গমণকারী নয়।

১৬৮. হে মানুষ! তোমরা খাও যমীনে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র(২) খাদ্যবস্তু রয়েছে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا

তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।' যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে সৎপথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, 'প্রকৃত পক্ষে তোমরাই তো দিনরাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, যখন তোমরা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করি এবং তাঁর জন্য সমকক্ষ (শির্ক) স্থাপন করি।' আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং যারা কুফরী করেছে আমরা তাদের গলায় শৃংখল পরাব। তাদেরকে তারা যা করত তারই প্রতিফল দেয়া হবে।" [সূরা সাবা: ৩১-৩৩]

(১) আবুল আলীয়াহ বলেন, তাদের খারাপ আমলসমূহ কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আফসোস ও পরিতাপের কারণ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "সেদিন প্রত্যেকেই জান্নাতে তাদের ঘর এবং জাহান্নামে তাদের ঘরের দিকে তাকাবে। সেদিন হচ্ছে আফসোসের দিন। তিনি বলেন, জাহান্নামীরা জান্নাতে তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দিকে তাকাবে তারপর তাদেরকে বলা হবে, হায় যদি তোমরা এর জন্য আমল করতে! তখন তাদেরকে আফসোস পেয়ে বসবে। আর জান্নাতীরা জাহান্নামে তাদের জন্য নির্দিষ্ট তাদের ঘরের দিকে তাকাবে, তখন তাদের বলা হবে, যদি আল্লাহ্ তোমাদের উপর তার দয়া না করতেন তবে তো তোমরা সেখানকার অধিবাসীই হতে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৪৯৬-৪৯৭]

(২) حلّ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো গিট খোলা। যেসব বস্তু সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেয়া হয়েছে, তাতে যেন একটা গিঠই খুলে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা তুলে নেয়া হয়েছে। সাহ্ল ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল- (১) হালাল খাওয়া, (২) ফরয আদায় করা এবং (৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। طيب শব্দের অর্থ পবিত্র। শরী'আতের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তু-সামগ্রীও এরই অন্তর্ভুক্ত।

تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝١٦٨

তা থেকে। আর তোমরা শয়তানের পদাংক[১] অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْۗءِ وَالْفَحْشَاۗءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝١٦٩

১৬৯. সে তো শুধু তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়[২] মন্দ ও অশ্লীল[৩] কাজের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন সব বিষয় বলার যা তোমরা জান না[৪]।

---

(১) خُطُوَاتٌ শব্দটি خُطْوَةٌ এর বহুবচন। خُطْوَةٌ বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সে অনুসারে ﴿خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ﴾ এর অর্থ হচ্ছে শয়তানী পদক্ষেপসমূহ বা শয়তানী কর্মকাণ্ড। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, "আমি আমার বান্দাকে যে সম্পদ দিয়েছি তা বৈধ। আর আমি আমার সকল বান্দাকেই একনিষ্ঠ দ্বীনের উপর সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের কাছে শয়তানরা এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের উপর তা হারাম করে দেয় যা আমি তাদের জন্য হালাল করেছিলাম।" [মুসলিম: ২৮৫৬] (অর্থাৎ তারা সেগুলোকে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করে সেগুলোকে হারাম বানিয়ে ফেলে)

(২) এখানে শয়তানের নির্দেশদান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওয়াস্‌ওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আদম সন্তানের অন্তরে একাধারে শয়তানী প্রভাব এবং ফেরেশ্‌তার প্রভাব বিদ্যমান থাকে' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩/৫৪৩] শয়তানী ওয়াস্‌ওয়াসার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশ্‌তাদের ইলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয়। [দেখুন, সহীহ ইবন হিব্বান: ৯৯৭]

(৩) سُوْءٌ বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন বুদ্ধিমান লোক দুঃখবোধ করে। فَحْشَاءٌ অর্থ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে سُوْءٌ এবং فَحْشَاءٌ - এর মর্ম যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ। অর্থাৎ সাধারণ গোনাহ্ এবং কবীরা গোনাহ্।

(৪) না জেনে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে কথা বলা বড় গোনাহ। এ আয়াতে এবং পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে না জেনে কথা বলাকে বড় অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। [যেমন, সূরা আল-বাকারাহ: ৮০, সূরা আল-আ'রাফ: ২৮, ৩৩, সূরা ইউনুস: ৬৮] তবে এ আয়াতে 'না জেনে' কোন কথা বলতে

১৭০. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর', তারা বলে, 'না, বরং আমরা অনুসরণ করবো তার, যার উপর আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছি'। যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছু বুঝতো না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

শয়তান মানুষকে নির্দেশ দেয় সেটা ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র সেটার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য জন্তু-জানোয়ারকে ছেড়ে দেয়া, হালালকে হারাম করা ও হারামকে হালাল করা, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, আল্লাহ্র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা, আল্লাহ্র জন্য এমন গুণাবলী সাব্যস্ত করা যা থেকে তিনি পবিত্র। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "বাহীরাহ্, সায়েবাহ্, ওছীলাহ্ ও হামী আল্লাহ্ প্রবর্তণ করেননি; কিন্তু কাফেররা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না" [সূরা আল-মায়েদাহঃ ১০৩] "তারা জিনকে আল্লাহ্র শরীক করে, অথচ তিনিই এদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র---মহিমান্বিত! এবং ওরা যা বলে তিনি তার ঊর্ধ্বে।" [সূরা আল-আন'আমঃ ১০০] "যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" [সূরা আল-আন'আমঃ ১৪০] "বলুন, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ্ তোমাদের যে রিয্ক দিয়েছেন তারপর তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ?' বলুন, 'আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রটনা করছ" [সূরা ইউনুসঃ ৫৯] "তারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি মহান পবিত্র! তিনি অভাবমুক্ত! যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যা কিছু আছে পৃথিবীতে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোন সনদ নেই। তোমরা কি আল্লাহ্র উপর এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না ?" [সূরা ইউনুসঃ৬৮] "তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, 'এটা হালাল এবং ওটা হারাম'। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না"[সূরা আন-নাহলঃ ১১৬] "আর তারা আল্লাহ্কে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে" [সূরা আয-যুমারঃ ৬৭]

না, তবুও কি?[১]

১৭১. আর যারা কুফরী করেছে তাদের উদাহরণ তার মত যে, এমন কিছুকে ডাকছে যে হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শুনে না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ, কাজেই তারা বুঝে না[২]।

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

১৭২. হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমরা যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

(১) এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্য কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন, দু'টি শব্দে বলা হয়েছে ﴿لَا يَعْقِلُونَ﴾ এবং ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোন আল্লাহ্‌ প্রদত্ত হিদায়াত। হিদায়াত বলতে সে সমস্ত বিধি-বিধানকে বোঝায়, যা পরিস্কারভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, যা শরী'আতের প্রকৃষ্ট 'নস' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়। অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হলো এই যে, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোন বিধি-বিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীর পর্যালোচনা-গবেষণা করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করে নেয়ার মত কোন যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন আলেমের ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞানের সাথে সাথে তার মধ্যে ইজতিহাদ (উদ্ভাবন)-এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন মুজতাহিদ আলেমের আনুগত্য-অনুসরণ করা জায়েয। অবশ্য এ আনুগত্য তার ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্য নয়, বরং আল্লাহ্‌র এবং তাঁর হুকুম-আহ্‌কাম মানার জন্যই হতে হবে। [মা'আরিফুল কুরআন, পরিমার্জিত]

(২) এ উপমাটির দু'টি দিক রয়েছে। (এক) তাদের অবস্থা সেই নির্বোধ প্রাণীদের মত, যারা এক-একটি পালে বিভক্ত হয়ে নিজেদের রাখালদের পিছনে চলতে থাকে এবং না জেনে-বুঝেই তাদের হাঁক-ডাকের উপর চলতে-ফিরতে থাকে। (দুই) এর দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, কাফের-মুশরিকদেরকে আহ্বান করার ও তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের সময় মনে হতে থাকে যেন নির্বোধ জন্তু-জানোয়ারদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তারা কেবল আওয়াজ শুনতে পারে কিন্তু কি বলা হচ্ছে, তা কিছুই বুঝতে পারে না। [মুয়াসসার]

খাও[১] এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা শুধু তাঁরই 'ইবাদাত কর।

১৭৩. তিনি আল্লাহ্ তো কেবল তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু[২],

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَآ

(১) আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি হিদায়াত করেছেন যে- ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ﴾ অর্থাৎ "হে রাসূলগণ! পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করুন এবং নেক আমল করুন"। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দো'আ কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশংকাই থাকে বেশী। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কোন কিছু কবুল করেন না। তিনি মুমিনগণকে সেটার নির্দেশ দিয়েছেন যেটার নির্দেশ রাসূলগণকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র থেকে খাও এবং সৎকাজ কর, নিশ্চয় আমি তোমরা যা কর সে ব্যাপারে সবিশেষ অবগত। [সূরা আল-মুমিনূন: ৫১] আরও বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের আমরা যে রিযিক দিয়েছি তা হতে পবিত্র বস্তু খাও" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭২] তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করেছে, ধুলি-মলিন অবস্থায় দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে বলতে থাকে হে রব! হে রব! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে খেয়েছেও হারাম। সুতরাং তার দো'আ কিভাবে কবুল হতে পারে?" [মুসলিম: ১০১৫]

(২) অর্থাৎ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরী'আতের বিধান অনুযায়ী যবেহ্ করা জরুরী, সেসব প্রাণী যদি যবেহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যেমন, আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে কিংবা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশ্‌ত খাওয়া হারাম হবে। তবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হল'। [সূরা আল-মায়িদাহ: ৯৬] এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তুর বেলায় যবেহ করার শর্ত আরোপিত হয়নি। ফলে এগুলো যবেহ্ ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদীসে মাছ এবং টিডিড নামক পতঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ দু'টির মৃতকেও হালাল করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমাদের জন্য দু'টি মৃত হালাল - মাছ এবং টিডিড (এক জাতীয় ফড়িং)'। [বাগভীঃ শরহুস্-সুন্নাহ্ঃ ২৮০৩, সুনানে ইবনে মাজাহ্ঃ ৩২১৮] সুতরাং বোঝা গেল যে, জীব-জন্তুর মধ্যে

মাছ এবং ফড়িং মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, এ দু'টি যবেহ্ না করেও খাওয়া যাবে। অনুরূপ যেসব জীব-জন্তু ধরে যবেহ্ করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ্ বলে তীর কিংবা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে, এমতাবস্থায়ও শুধু আঘাত দিয়ে মারলে চলবে না, কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত। আজকাল একরকম চোখা গুলী ব্যবহার হয়, এ ধরণের গুলী সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, এসব ধারালো গুলীর আঘাতে মৃত জন্তুর হুকুম তীরের আঘাতে মৃতের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত অনুযায়ী বন্দুকের গুলী চোখা এবং ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা, তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরদিকে বন্দুকের গুলী চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ হয়ে গায়ে বিস্ফোরণ ও দাহিকা শক্তির প্রভাবে জন্তুর মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং এরূপ গুলী দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ার যবেহ্ করার আগে মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না। এক্ষেত্রে গুলী দ্বারা শিকার করা হলে তা আবার যবেহ্ করতে হবে।

এখানে আরও জানা আবশ্যক যে, আয়াতে 'তোমাদের জন্য মৃত হারাম' বলতে মৃত জানোয়ারের গোশ্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে। যাবতীয় অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে সেই একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ মৃত জানোয়ারের গোশ্ত ব্যবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় কিংবা অন্য কোন উপায়ে এগুলো থেকে যেকোনভাবে লাভবান হওয়াও হারাম। এমনকি মৃত জীব-জন্তুর গোশ্ত নিজ হাতে কোন গৃহপালিত জন্তুকে খাওয়ানোও জায়েয নয়।

তাছাড়া আয়াতে 'মৃত' শব্দটির অন্য কোন বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করাতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই শামিল। কিন্তু অন্য এক আয়াতে ﴿عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [সূরা আল-আন'আম: ১৪৫] শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার যোগ্য। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যেসব অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলোর ব্যবহার করা হারাম নয়; সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, কুরআনের অন্য এক আয়াতে আছে, ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [সূরা আন-নাহল:৮০] এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যবেহ্ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি। চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য মৃত জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাকা না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম। কিন্তু পাকা করে নেয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয। সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। অনুরূপভাবে মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তদ্বারা তৈরী যাবতীয় সামগ্রীই হারাম। এসবের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম। [মা'আরিফুল কুরআন]

أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

রক্ত[১], শূকরের গোশ্‌ত[২] এবং যার উপর আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে[৩], কিন্তু যে নিরূপায়

(১) আয়াতে যেসব বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লেখিত হলেও অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [সূরা আল-আন'আম: ১৪৫] অর্থাৎ 'প্রবাহমান রক্ত' উল্লেখিত রয়েছে। রক্তের সাথে 'প্রবাহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ্ করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই কলিজা এবং এরূপ জমাট বাঁধা রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফেকাহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পাক ও হালাল। আর যেহেতু শুধুমাত্র প্রবাহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, কাজেই যবেহ্ করা জন্তুর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে থেকে যায়, সেটুকু হালাল ও পাক। ফেকাহ্‌বিদ সাহাবী ও তাবেয়ীসহ সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। এখানে আরও একটি বিষয় জানা আবশ্যক যে, রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তা দ্বারা অর্জিত লাভালাভও হারাম।

(২) আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা হয়েছে, সেটি হলো শূকরের গোশ্‌ত। এখানে শূকরের সাথে 'লাহ্‌ম' বা গোশ্‌ত শব্দ সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এর দ্বারা শুধু গোশ্‌ত হারাম এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং শূকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ হাড়, গোশ্‌ত, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি সর্বসম্মতিক্রমেই হারাম। তবে লাহ্‌ম তথা গোশ্‌ত যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায় নয়, তাই এটি যবেহ্ করলেও পাক হয় না। কেননা, গোশ্‌ত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের যবেহ্ করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক হতে পারে। কিন্তু যবেহ্ করার পরও শূকরের গোশ্‌ত হারাম তো বটেই, নাপাকও থেকে যায়। কেননা, এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 'নাজাসে-আইন' বা অপবিত্র বস্তু। [মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষেপিত]

(৩) আয়াতে উল্লেখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ্ বা উৎসর্গ করা হয়। সাধারণত এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয় এবং যবেহ্ করার সময়ও সে নাম নিয়েই যবেহ্ করা হয়, যে নামে তা উৎসর্গিত হয়। এমতাবস্থায় যবেহ্‌কৃত জন্তু সমস্ত মত-পথের আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এর কোন অংশের দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ জায়েয হবে না। ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ﴾ আয়াতে যে অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে এ অবস্থা এর সরাসরি নমুনা, যে ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই। দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা যবেহ্ করা হয়, তবে যবেহ্ করার সময় তা আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই যবেহ্ করা হয়। যেমন অনেক

অথচ নাফরমান এবং সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না[১]।

অজ্ঞ মুসলিম পীর, কবরবাসী বা জীনের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মানত করে তা যবেহ্ করে থাকে। কিন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই তা যবেহ্ করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহ্‌গণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং যবেহ্‌কৃত জন্তু মৃতের শামিল। দুররে মুখতার কিতাবুয্-যাবায়েহ্ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ 'যদি কোন আমীরের আগমন উপলক্ষে তারই সম্মানার্থে কোন পশু যবেহ্ করা হয়, তবে যবেহ্‌কৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা, এটাও তেমনি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ্ করা হয়' - এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত; যদিও যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই তা যবেহ্ করা হয়। আল্লামা শামীও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। তৃতীয় সুরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোন চিহ্ন অঙ্কিত করে কোন দেব-দেবী বা পীর-ফকীরের নামে ছেড়ে দেয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোন কাজ নেয়া হয় না , যবেহ্ করাও উদ্দেশ্য থাকে না। বরং যবেহ্ করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণীর পশু আলোচ্য দু'আয়াতের কোনটিরই আওতায় পড়ে না। এ শ্রেণীর পশুকে কুরআনের ভাষায় 'বহীরা' বা 'সায়েবা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ কারো নামে কোন পশু প্রভৃতি জীবন্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়া কুরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম। যেমন বলা হয়েছেঃ ﴿مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ﴾ "আল্লাহ্ তা'আলা 'বহীরা' ও 'সায়েবা' সম্পর্কে কোন বিধান দেননি"। [সূরা আল-মায়িদাহঃ ১০৩] তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না। বরং হারাম মনে করাতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয়। তাই এরূপ উৎসর্গকৃত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতই হালাল। শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তারই মালিকানায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরী'আতের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসর্গীকরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর উপর তারই পূর্ণ মালিকানা কায়েম থাকে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এ ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল ও বৈধ বলেনি; বলেছে, "তাতে তার কোন পাপ নেই"। এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনো যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার অনোন্যপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে অনোন্যপায় হওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আল্লাহ্ নিশ্চয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-মায়েদাহ:৩] অর্থাৎ ক্ষুধার কারণেই শুধু হারাম বস্তু গ্রহণ করা যেতে পারে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৭৪. নিশ্চয় যারা গোপন করে আল্লাহ্ কিতাব হতে যা নাযিল করেছেন তা এবং এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া[১] আর কিছুই খায় না। আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে; সুতরাং আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল!

أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿١٧٥﴾

১৭৬. সেটা এ জন্যই যে, আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন আর যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে অবশ্যই তারা সুদূর বিবাদে লিপ্ত।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِى ٱلْكِتَـٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

১৭৭. পূর্ব ও পশ্চিম দিকে[২] তোমাদের মুখ ফিরানোই সৎকর্ম নয়, কিন্তু

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ

(১) এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে শরী'আতের হুকুম-আহ্কাম পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে হারাম ধন-সম্পদ গ্রহণ করে, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে। কারণ, এ কাজের পরিণতি তাই।

(২) কাতাদাহ ও আবুল আলীয়াহ বলেন, ইয়াহূদীরা ইবাদতের সময় পশ্চিম দিকে আর নাসারারা পূর্ব দিকে মুখ করে থাকে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনায় বলেন, সালাতে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে কি পশ্চিমদিকে, এ বিষয় নির্ধারণকেই যেন তোমরা দ্বীনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের যাবতীয় আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে। মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরী'আতের অন্য কোন হুকুম-আহ্কামই যেন আর নেই।

وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ

সৎকর্ম হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ্, শেষ দিবস, ফেরেশ্‌তাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান(১) আনবে। আর সম্পদ দান করবে তার(২) ভালবাসায়(৩) আত্মীয়-

---

(১) অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলিম, ইয়াহূদী, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃত পুণ্য বা সওয়াব আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের ভেতরই নিহিত। যেদিকে মুখ করে তিনি সালাতে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায়, দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনই বৈশিষ্ট্য নেই। দিকবিশেষের সাথে কোন পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। পুণ্য একান্তভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সাথেই সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যতদিন বায়তুল-মুকাদ্দাসের প্রতি মুখ করে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে মুখ করাই ছিল পুণ্য। আবার যখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে, এখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এখানে দু'টি অর্থ হতে পারে, এক. আল্লাহ্‌র ভালবাসায় উপরোক্ত খাতে সম্পদ ব্যয় করা। দুই. সম্পদের প্রতি নিজের অতিশয় আসক্তি ও ভালাবাসা থাকা সত্ত্বেও সে উপরোক্ত খাতসমূহে সম্পদ ব্যয় করা। উভয় অর্থই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে শেষোক্ত মতটিকেই অনেকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [তাফসীরে বাগভী] এ মতের সপক্ষে বিভিন্ন হাদীসে সম্পদের আসক্তি সত্ত্বেও তা ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব চেয়ে বেশী সওয়াবের সাদাকাহ কোনটি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি সুস্থ ও আসক্তিপূর্ণ অবস্থায়, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়, ধনী হওয়ার আকাংখা থাকা সত্ত্বেও সাদাকাহ করা"। [বুখারী: ১৪১৯, মুসলিম: ১০৩২]

(৩) এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারাই এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরয শুধুমাত্র যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, যাকাত ছাড়া আরও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন, রুযী-রোযগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে যাকাত প্রদান করার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরয হয়ে পড়ে। অনুরূপ যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরী করা এবং দ্বীনীশিক্ষার জন্য মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরযের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোন অবস্থায় যাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের ফরয হওয়ার বেলায় প্রয়োজন দেখা দেয়া শর্ত। [মা'আরিফুল কুরআন]

وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

স্বজন[১], ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করবে[২], অর্থ-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে[৩]। তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى

১৭৮. হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাসের[৪] বিধান

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সবচেয়ে উত্তম সদকাহ হচ্ছে সেটি যা এমন আত্মীয় স্বজনের জন্য করা হয় যারা তোমার থেকে বিমুখ হয়ে আছে”। [মুসনাদে আহমাদ:৩/৪০২, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ: ৪/৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মিসকীনের উপর সদকাহ করলে সেটি সদকাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যদি আত্মীয়-স্বজনের উপর সদকাহ করা হয় তবে তা হবে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সদকাহ। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৮]

(২) অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না। কেননা, এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফের-গোনাহ্গাররাও ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না। তেমনিভাবে মু‘আমালাতের বর্ণনায় শুধুমাত্র অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব, ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকসমূহের সুষ্ঠতা ও পবিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল।

(৩) আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র ‘সবর’-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, ‘সবর’-এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বোতভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়বৃত্তিসহ আভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবরই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

(৪) ‘কিসাস’-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যতটুকু যুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশী কিছু করা জায়েয নয়। এ সূরারই ১৯৪ নং আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা

হয়েছে, 'অত:পর যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে'। অনুরূপ সূরা আন-নাহলের ১২৬ নং আয়াতে রয়েছে, 'আর যদি তোমরা শাস্তি দাও তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে', এতে আলোচ্য বিষয়ই আরও বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সে মতে শরী'আতের পরিভাষায় 'কিসাস' বলা হয় হত্যা ও আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়। এখানে কয়েকটি বিষয় জানা বিশেষভাবে জরূরী: এক. কিসাস কেবল ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায়ই প্রযোজ্য। আর ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছুর দ্বারা হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করা, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয় সুতরাং 'কিসাস' অর্থাৎ 'জানের বদলে জান' এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দুই. এ ধরনের হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোককেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আয়াতে স্ত্রীলোকের বদলায় স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার যে উল্লেখ রয়েছে, তা একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়। তিন. ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়া হয়, - যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মাত্র দুই পুত্র, সে দুজনই যদি মাফ করে দেয়, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পূর্ণ মাফ না হয়, অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্রে এক পুত্র মাফ করে এবং অপর পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কেসাসের দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়াত প্রদান করতে হবে। শরী'আতের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়াত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ' উট। চার. কেসাসের আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়াত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয় পক্ষ যদি কোন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপোষ-নিষ্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও 'কিসাস' মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফেকাহ্র কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত রয়েছে। পাঁচ. নিহত ব্যক্তির যে ক'জন ওয়ারিস থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই 'মীরাস'-এর অংশ অনুপাতে 'কিসাস' ও 'দিয়াত'-এর মালিক হবে এবং দিয়াত হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ 'মীরাস'-এর অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে। তবে কিসাস যেহেতু বন্টনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনও যদি কেসাসের দাবী ত্যাগ করে, তবে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই অংশ অনুযায়ী দিয়াতের ভাগ পাবে। ছয়. 'কিসাস' গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য আইনী কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন্ অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন্ অবস্থায় হয় না, এ সম্পর্কিত অনেক

الْقَتْلَىٰ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস, নারীর বদলে নারী। তবে তার ভাইয়ের[১] পক্ষ থেকে কোন ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির[২] অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার রক্ত-বিনিময় আদায় করা কর্তব্য। এটা তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে শিথিলতা ও অনুগ্রহ। সুতরাং এর পরও যে সীমালংঘন করে[৩] তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. আর হে বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্নগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে, যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এ জন্য আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 'কিসাস'-এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) 'ভাই' শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কোমল ব্যবহার করার সুপারিশও করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের ও তার মাঝে চরম শত্রুতার সম্পর্ক থাকলেও আসলে সে তোমাদের মানবিক ভ্রাতৃ-সমাজেরই একজন সদস্য। তাছাড়া এখানে যে ক্ষমা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কিসাস না গ্রহণ করে দিয়াত গ্রহণ করা। [বুখারী: ৪৪৯৮]

(২) এখানে কুরআনে 'মা'রূফ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি যার সাথে সাধারণত সবাই সুপরিচিত। প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ ব্যক্তি যার কোন স্বার্থ এর সাথে জড়িত নেই, সে প্রথম দৃষ্টিতেই যেন এর সম্পর্কে বলে উঠেঃ হ্যাঁ, এটিই ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযোগী কর্মপদ্ধতি। প্রচলিত রীতিকেও ইসলামী পরিভাষায় 'উর্‌ফ' ও 'মা'রূফ' বলা হয়। যেসব ব্যাপারে শরী'আত কোন বিশেষ নিয়ম নির্ধারণ করেনি, এমনসব ব্যাপারেই একে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

(৩) ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণ করার পর হত্যা করতে উদ্যত হয়। [বুখারী: ১১১, মুসলিম: ১৩৭০]

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়াত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হল। এটা মুত্তাকীদের উপর কর্তব্য(১)।

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

১৮১. এটা শুনার পরও যদি কেউ তাতে পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করবে অপরাধ তাদেরই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

১৮২. তবে যদি কেউ অসিয়াতকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা পাপের আশংকা করে, অতঃপর তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোন অপরাধ

---

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর মতে অসিয়াত সম্পর্কিত এ নির্দেশটি 'মীরাস'-এর আয়াত দ্বারা রহিত করে দেয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মীরাসের আয়াত সে সমস্ত আত্মীয়দের জন্য অসিয়াত করা রহিত করে দেয়া হয়েছে, যাদের মীরাস নির্ধারিত ছিল। এ ছাড়া অন্যান্য যেসব আত্মীয়ের অংশ মীরাসের আয়াতে নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য অসিয়াত করার হুকুম এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। তবে আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের জন্য মীরাসের আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য অসিয়াত করা মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে ফরয বা জরুরী নয়। সে ফরয রহিত হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজনবিশেষে এটা মুস্তাহাবে পরিণত হয়েছে। অসিয়াত সম্পর্কিত এ আয়াতের নির্দেশ একাধারে যেমন কুরআনের মীরাস সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে, তেমনি বিদায় হজের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশের মাধ্যমেও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর বর্ণিত হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। বিদায় হজের বিখ্যাত খোত্বায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে কোন ওয়ারিসের জন্য অসিয়াত নেই'। [তিরমিযী: ২১২০, আবু দাউদ: ৩৫৬৫, ইবনে মাজাহ্: ২৭১৩]। তবে আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তাদের মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়াত করা জায়েয।

নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

১৮৩. হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের[১] বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল[২], যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার[৩]।

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ ۙ﴿۱۸۳﴾

---

(১) صوم এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম 'সাওম'। তবে সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়ামের নিয়্যতে একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা সিয়াম বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও যদি কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে কিংবা সহবাস করে, তবে সিয়াম হবে না। অনুরূপ উপায়ে সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি সিয়ামের নিয়্যত না থাকে, তবে তাও সিয়াম পালন হবে না। সিয়াম ইসলামের মূল ভিত্তি বা আরকানের অন্যতম। সিয়ামের অপরিসীম ফযীলত রয়েছে।

(২) মুসলিমদের প্রতি সিয়াম ফরয হওয়ার নির্দেশটি একটি বিশেষ নযীর উল্লেখসহ দেয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিয়াম শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল। এর দ্বারা যেমন সিয়ামের বিশেষ গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে, তেমনি মুসলিমদের এ মর্মে একটি সান্ত্বনাও দেয়া হয়েছে যে, সিয়াম একটা কষ্টকর 'ইবাদাত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরয করা হয়েছিল। কেননা, সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন একটা কষ্টকর কাজে অনেক লোক একই সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে মনে হয়। আয়াতের মধ্যে শুধু বলা হয়েছে যে, "সিয়াম যেমন মুসলিমদের উপর ফরয করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল'; এ কথা দ্বারা এ তথ্য বুঝায় না যে, আগেকার উম্মতগণের সিয়াম সমগ্র শর্ত ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মুসলিমদের উপর ফরযকৃত সিয়ামেরই অনুরূপ ছিল। যেমন, সিয়ামের সময়সীমা, সংখ্যা এবং কখন তা রাখা হবে, এসব ব্যাপারে আগেকার উম্মতদের সিয়ামের সাথে মুসলিমদের সিয়ামের পার্থক্য হতে পারে, বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। বিভিন্ন সময়ে সিয়ামের সময়সীমা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(৩) এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাকওয়া শক্তি অর্জন করার ব্যাপারে সিয়ামের একটা বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা, সিয়ামের মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই 'তাকওয়া'র ভিত্তি।

اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدٰتٍ ؕ فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ عَلٰى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيۡنَ
يُطِيۡقُوۡنَهٗ فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِيۡنٍ ؕ فَمَنۡ تَطَوَّعَ
خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنۡ تَصُوۡمُوۡا خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ
كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۸۴﴾

১৮৪. এগুলো গোনা কয়েক দিন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে[১] বা সফরে থাকলে[২] অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে[৩]। আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্ইয়া- একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা[৪]। যদি

(১) বাক্যে উল্লেখিত 'রুগ্ন' সে ব্যক্তিকে বুঝায়, সাওম রাখতে যার কঠিন কষ্ট হয় অথবা রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

(২) সফররত অবস্থায় সাওম না রাখা ব্যক্তির ইচ্ছা ও পছন্দের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সাহাবাগণ নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে যেতেন। তাদের কেউ সাওম রাখতেন আবার কেউ রাখতেন না। উভয় দলের কেউ পরস্পরের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠাতেন না।' [বুখারী: ১৯৪৭; মুসলিম: ১১১৬]

(৩) রুগ্ন বা মুসাফির ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় বা সফরে যে কয়টি সাওম রাখতে পারবে না, সেগুলো অন্য সময় হিসাব করে কাযা করা ওয়াজিব। এতে বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, রোগজনিত কারণে বা সফরের অসুবিধায় পতিত হয়ে যে কয়টি সাওম ছাড়তে হয়েছে, সে কয়টি সাওম অন্য সময়ে পূরণ করে নেয়া তাদের উপর ফরয।

(৪) আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ দাঁড়ায়, যেসব লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়; বরং সাওম রাখার পূর্ণ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সাওম রাখতে চায় না, তাদের জন্যও সাওম না রেখে সাওমের বদলায় 'ফিদ্ইয়া' দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেয়া হয়েছে যে, 'সাওম রাখাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর'। উপরোক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে সাওমে অভ্যস্ত করে তোলা। এরপর নাযিলকৃত আয়াত ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ এর দ্বারা প্রাথমিক এ নির্দেশ সুস্থ-সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তবে যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্য জনিত কারণে সাওম রাখতে অপরাগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুন দূর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের বেলায় উপরোক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই। সাহাবী সালামাহ ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু- বলেন, যখন ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ﴾ শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে সাওম রাখতে পারে এবং যে সাওম রাখতে চায় না, সে 'ফিদ্ইয়া' দিয়ে দেবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ নাযিল হল, তখন ফিদ্ইয়া দেয়ার

কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার জন্য কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণের যদি তোমরা জানতে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. রমাদান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে[১]। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে[২]। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ চান

ইখ্তিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ-সমর্থ লোকদের উপর শুধুমাত্র সাওম রাখাই জরুরী সাব্যস্ত হয়ে গেল। [বুখারী: ৪৫০৭, মুসলিম: ১১৪৫, আবু দাউদ:২৩১৫, ২৩১৬ ও তিরমিযী: ৭৯৮]

(১) এই একটি মাত্র বাক্যে সাওম সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহ্কাম ও মাসআলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। شَهِدَ শব্দটি شُهُوْدٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ উপস্থিত ও বর্তমান থাকা। আরবী অভিধানে الشّهر অর্থ মাস। এখানে অর্থ হলো রমাদান মাস। কাজেই বাক্যটির অর্থ দাঁড়াল এই যে, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমাদান মাসে উপস্থিত থাকবে, অর্থাৎ বর্তমান থাকবে, তার উপর রমাদান মাসের সাওম রাখা কর্তব্য"। ইতঃপূর্বে সাওমের পরিবর্তে ফিদ্ইয়া দেয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল এ বাক্যের দ্বারা তা মনসূখ বা রহিত করে দিয়ে সাওম রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে। রমাদান মাসে উপস্থিত বা বর্তমান থাকার মর্ম হলো রমাদান মাসটিকে এমন অবস্থায় পাওয়া, যাতে সাওম রাখার সামর্থ্য থাকে।

(২) আয়াতে রুগ্ন কিংবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যে, সে তখন সাওম না রেখে বরং সুস্থ হওয়ার পর অথবা সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের সাওম কাযা করে নেবে, এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু সাওমের পরিবর্তে ফিদ্ইয়া দেয়ার ঐচ্ছিকতাকে রহিত করে দেয়া হয়েছে, কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয়ত রুগ্ন কিংবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার পুনরোল্লেখ করা হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৮৬. আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে(১)।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

(১) পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে রামাদানের হুকুম-আহ্‌কাম বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে সাওম ও ই'তিকাফের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে মাঝখানে বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়াতটিকে বান্দাদের অবস্থার প্রতি মহান রব-এর অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও কবুল করার বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ, সাওম সংক্রান্ত 'ইবাদাতে অবস্থাবিশেষে অব্যাহতি দান এবং বিভিন্ন সহজতা সত্ত্বেও কিছু কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। এ কষ্টকে সহজ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, যখনই তারা আমার কাছে কোন বিষয়ে দো'আ করে, আমি তাদের সে দো'আ কবুল করে নেই এবং তাদের বাসনা পূরণ করে দেই। এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহ্‌কাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত কর্তব্য। তাতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা সহ্য করা উচিত। ইমাম ইবনে কাসীর দো'আর প্রতি উৎসাহ দান সংক্রান্ত এই মধ্যবর্তী বাক্যটির তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতের দ্বারা সাওম রাখার পর দো'আ কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্যই সাওমের ইফতারের পর দো'আর ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'সিয়াম পালনকারীর দো'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না অর্থাৎ কবূল হয়ে থাকে'। [ইবনে মাজাহ্: ১৭৫৩] সে জন্যই আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা ইফতারের সময় পরিবার পরিজনকে ডাকতেন এবং দো'আ করতেন। [ইবনে কাসীর]

১৮৭. সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে[১]। তারা তোমাদের পোষাকস্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোষাকস্বরূপ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মার্জনা করেছেন। কাজেই এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কালোরেখা থেকে ঊষার সাদা রেখা

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ
نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ
لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ
وَابْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَاشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ۚ
وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى الْمَسَـٰجِدِ ۗ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

(১) যে বিষয়টিকে এ আয়াত দ্বারা হালাল করা হয়েছে, তা ইতঃপূর্বে হারাম ছিল। বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রথম যখন রমাদানের সাওম ফরয করা হয়েছিল, তখন ইফতারের পর থেকে শয্যাগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাসের অনুমতি ছিল। একবার শয্যাগ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথেই এ সবকিছু হারাম হয়ে যেত। কোন কোন সাহাবী এ ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েন। কায়েস ইবনে সিরমাহ্ আনসারী নামক জনৈক সাহাবী একবার সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের সময় ঘরে এসে দেখেন, ঘরে খাওয়ার মত কোন কিছুই নেই। স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি কোথাও থেকে কিছু সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলেন তখন সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার দরুন খানা-পিনা তার জন্য হারাম হয়ে যায়। ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাতেই সাওম পালন করেন। কিন্তু দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। [বুখারী: ১৯১৫] অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে মানসিক কষ্টে পতিত হন। এসব ঘটনার পর এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করে সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহে-সাদিক উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র রাতেই খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। ঘুমাবার আগে কিংবা ঘুম থেকে উঠার পর সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতাই এতে আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি। এমনকি হাদীস অনুযায়ী শেষরাতে সেহ্রী খাওয়া সুন্নাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কিত নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে।

স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না হয়[১]। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত[২] অবস্থায় তাদের সাথে সংগত হয়ো না। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না[৩]।

---

(১) আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে সাওমের শুরু এবং খানা-পিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়-সীমার মধ্যে কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সে জন্য ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ﴾ শব্দটিও যোগ করে দেয়া হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুবহে-সাদিক দেখা দেয়ার আগেই খানা-পিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুবহে-সাদিকের আলো ফোটার পরও খানা-পিনা করতে থাকবে। বরং খানা-পিনা এবং সাওমের মধ্যে সুবহে-সাদিকের উদয় সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা বন্ধ করা জরুরী মনে করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি সুবহে-সাদিক উদয় হওয়ার ব্যাপারে ইয়াকীন হয়ে যাওয়ার পর খানা-পিনা করাও হারাম এবং সাওম নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুবহে-সাদিক উদয় হওয়া সম্পর্কে ইয়াকীন হওয়া পর্যন্তই সেহ্‌রীর শেষ সময়। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) ই'তিকাফ-এর শাব্দিক অর্থ কোন এক স্থানে অবস্থান করা। কুরআন-সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় কতগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়। জামা'আত হয় এমন যে কোন মসজিদেই ই'তেকাফ হতে পারে। ই'তিকাফের অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণত সাওম পালনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নির্দেশেরই অনুরূপ। তবে স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, ই'তিকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েয নয়।

(৩) অর্থাৎ সাওমের মধ্যে খানা-পিনা এবং স্ত্রী সহবাস সম্পর্কিত যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এগুলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে-কাছেও যেও না। কেননা, কাছে গেলেই সীমালংঘনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। একই কারণে সাওম অবস্থায় কুলি করতে বাড়াবাড়ি করা, যদ্দরুন গলার ভেতর পানি প্রবেশ করতে পারে; মুখের ভেতর কোন ঔষধ ব্যবহার করা, এসব ব্যাপার অসাবধানতা এবং শৈথিল্য প্রদর্শন আল্লাহ্‌র এ নির্দেশের পরিপন্থী। তাই সীমান্ত থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ ব্যবস্থা। কারণ, ঐ সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমান্ত রেখার মধ্যে পার্থক্য করা এবং তাদের কিনারে পৌঁছে

এভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারে।

১৮৮. আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না[১]।

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٨٨

১৮৯. লোকেরা আপনার কাছে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে[২]। বলুন, 'এটা

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ কথা নয়। এ ব্যাপারে সাবধান করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'প্রত্যেক বাদশারই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আল্লাহ্র সে সংরক্ষিত এলাকা হল, তাঁর নির্ধারিত হারাম বিষয়সমূহ। যে ব্যক্তি এর চারদিকে ঘুরে বেড়ায় সে উক্ত সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে'। [মুসলিমঃ ২৬৮১]

(১) এ আয়াতটির এক অর্থ হচ্ছে, শাসকদেরকে উৎকোচ দিয়ে অবৈধভাবে লাভবান হবার চেষ্টা করো না। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেরাই যখন জানো এগুলো অন্যের সম্পদ, তখন শুধুমাত্র তার কাছে তার সম্পদের মালিকানার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে অথবা একটু এদিক-সেদিক করে কোন প্রকারে প্যাঁচে ফেলে তার সম্পদ তোমরা গ্রাস করতে পার বলে তার মামলা আদালতে নিয়ে যেয়ো না। কেননা, আদালত থেকে ঐ সম্পদের মালিকানা অধিকার লাভ করার পরও প্রকৃতপক্ষে তুমি তার বৈধ মালিক হতে পারবে না। আল্লাহ্র কাছে তো তা তোমার জন্য হারামই থাকবে।

(২) সমগ্র কুরআনে এমনিভাবে প্রশ্নোত্তরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি জায়গায় রয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি সূরা আল-বাকারায়, একটি সূরা আল-মায়েদায়, একটি সূরা আনফালে। এ নয়টি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে। এছাড়া সূরা আল-আ'রাফে দু'টি এবং সূরা আল-ইসরা, সূরা আল-কাহাফ, সূরা ত্বা-হা ও সূরা আন্-নাযি'আতে একটি করে ছয়টি স্থানে কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল - যার উত্তর কুরআনুল কারীমে উত্তরের আকারেই দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সূরা আল-আহযাব ও সূরা আয-যারিয়াতে একটি করে দু'টি প্রশ্ন ছিল।

لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময়-নির্দেশক'। আর পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই[১]; বরং পুণ্য আছে কেউ তাক্ওয়া অবলম্বন করলে। কাজেই তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

১৯০. আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে[২] তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, "মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের চাইতে কোন উত্তম দল আমি দেখিনি; দ্বীনের প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের এহেন ভালবাসা ও সম্পর্ক সত্ত্বেও তারা মাত্র তেরটি প্রশ্ন করেছিলেন"। [সুনান দারমী:১২৫]

(১) এই আয়াত দ্বারা এই মাসআলা জানা গেল যে, যে বিষয়কে ইসলামী শরী'আত প্রয়োজনীয় বা 'ইবাদাত বলে মনে করে না, তাকে নিজের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় বা 'ইবাদাত মনে করা জায়েয নয়। এমনিভাবে যে বিষয় শরী'আতে জায়েয রয়েছে, তাকে পাপ মনে করাও গোনাহ্। মক্কার কাফেররা তাই করছিল। তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা শরী'আতসম্মতভাবে জায়েয থাকা সত্ত্বেও না জায়েয মনে করত এবং পাপ বলে গণ্য করত, ঘরের পিছন দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে বা বেড়া কেটে বা সিঁধ কেটে ঘরে প্রবেশ করাকে (শরী'আতে যার কোন আবশ্যকতা ছিল না) নিজেদের জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করছিল। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। মূলত: 'বিদ'আত'-এর নাজায়েয হওয়ার বড় কারণই এই যে, এতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে ফরয-ওয়াজিবের মতই অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় অথবা কোন কোন জায়েয বস্তুকে নাজায়েয ও হারাম বলে গণ্য করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ শরী'আত-বহির্ভূত নিয়মে জায়েযকে নাজায়েয মনে করা অথবা হারামকে হালাল মনে করা বা 'বিদ'আত'-এর প্রচলন করার নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) মুসলিমগণ শুধুমাত্র সেসব কাফেরদের সাথেই যুদ্ধ করবে, যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসার ত্যাগী, উপাসনারত সন্নাসী-পাদ্রী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজুরী করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক

يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর[১]; কিন্তু সীমালংঘন করো না[২]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَأَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ

১৯১. আর তাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে[৩] এবং যে স্থান থেকে তারা

হয় না - সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে শুধুমাত্র তাদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লেখিত শ্রেণীর কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এ জন্য ফেকাহ্শাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্ম প্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোন প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েয। কারণ, তারা ﴿الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ﴾ 'যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' - এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরফ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ দেয়া হত, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

(১) আলেমগণ বলেন, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও 'কিতাল' তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে নাযিলকৃত কুরআনুল কারীমের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়। মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। [ইবন কাসীর]

(২) বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না। হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমসহ সে উমরার কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়্যত করেন, আগের বছর মক্কার কাফেররা যে উমরা উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফেররা হয়ত তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাদেরকে বাধা দেয়, তবে তারা কি করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লেখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত জবাব দেয়ার অনুমতি থাকল।

(৩) কেউ কেউ আল্লাহ্র বাণীঃ "তাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে"-এ বাণীর ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামকে জংগীবাদের প্রেরণাদায়ক বলে অপবাদ দেয়, তারা মূলতঃ এ আয়াতের অর্থই বোঝেনি। কারণ, এই আয়াতে "তাদেরকে" বলে ঐ সমস্ত কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের বর্ণনা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে এসেছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের হত্যা করার জন্য শর্ত দেয়া হয়েছে

حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে তোমরাও সে স্থান থেকে তাদেরকে বহিস্কার করবে। আর ফেত্‌না হত্যার চেয়েও গুরুতর[১]। আর মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না[২] যে পর্যন্ত না তারা

দু'টি - (১) তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধকারী সম্প্রদায় হবে। (২) তোমরা যদি এসব যুদ্ধবাজ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর, তবুও তোমরা যেহেতু মানবতার জন্য রহমতস্বরূপ সেহেতু হত্যা করতে সীমালংঘন করোনা। যুদ্ধরত কাফেরদের ছাড়া অন্যান্য সাধারণ কাফেরদের হত্যা করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন করোনা। যেমন, শিশু, অসুস্থ আঘাতপ্রাপ্ত, নারী এজাতীয়দের হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে আরও কিছু শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, (৩) যদি যুদ্ধবাজ কাফেররা যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয় তবে তোমরা তৎক্ষণাত যুদ্ধ ত্যাগ কর। (৪) তোমাদের উপর যতটুকু আক্রমণ হবে তোমরা ততটুকুই শুধু আক্রমণ করবে। (৫) তোমাদের যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হলোঃ ক) ফিতনা তথা যাবতীয় বিপর্যয়, শান্তিভংগ, ঘর-বাড়ি থেকে বহিস্কার, যুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন, শির্ক, অসৎপথ ইত্যাদি থেকে মানুষকে উদ্ধার করা। খ) তোমাদের 'ইবাদাত তথা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলতে যেন তারা বাধা না হয়। গ) তারা যেন তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করতে পারে। ঘ) তোমরা যে হক বা সত্যের অনুসারী, তার প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করা। এ পথের বাধা দূর করা।

(১) অর্থাৎ এ কথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরী ও শির্কের উপর অটল থাকা এবং মুসলিমদেরকে উমরাহ্ ও হজের মত 'ইবাদাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হল। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত فتنة (ফেত্‌নাহ্) শব্দটির দ্বারা কুফর, শির্ক এবং মুসলিমদের 'ইবাদাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বোঝানো হয়েছে। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস ও তাফসীরে কুরতুবী]

(২) পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরী'আতসিদ্ধ। আয়াতের এই ব্যাপকতাকে এই বলে সীমিত করা হয়েছে, "মসজিদুল হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকা তথা পুরো হারামে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়"। সাধারণতঃ মক্কার সম্মানিত এলাকা তথা হারাম এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোন পশু হত্যা করাও জায়েয নয়। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তার প্রতিরোধকল্পে

সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এটাই কাফেরদের পরিণাম।

১৯২. অতএব, যদি তারা বিরত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

১৯৩. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেত্‌না[১] চূড়ান্ত ভাবে দূরীভূত না হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমরা[২] ছাড়া আর কারও উপর আক্রমণ নেই।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

১৯৪. পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে[৩]।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ

যুদ্ধ করা জায়েয। এ মর্মে সমস্ত ফেকাহ্‌বিদগণ একমত। এ আয়াত দ্বারা আরও জানা গেল যে, প্রথম অভিযান, আক্রমণ বা আগ্রাসন শুধুমাত্র মসজিদুল-হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকা বা মক্কার হারামেই নিষিদ্ধ। অপরাপর এলাকায় প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ যেমন অপরিহার্য, তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েয।

(১) অর্থাৎ যখন 'দ্বীন' আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন সত্তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় ফেত্‌নাকে নির্মূল করে দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। এ জন্যই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা 'ফিতনা' এর তাফসীর করেছেন 'শির্ক'। [তাবারী]

(২) আবুল আলীয়াহ বলেন, যালিম তারাই, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে ও মানতে অস্বীকার করবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) সাহাবীগণের মনে সন্দেহ এই ছিল যে, আশহুরে-হারাম বা সম্মানিত মাসসমূহে কোথাও কারো সাথে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা যুদ্ধ শুরু করে তবে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করব? তাদের এ দ্বিধা দূর করার জন্যই আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার হারাম শরীফের সম্মানার্থে শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরী'আতসিদ্ধ, তেমনি হারাম মাসে (সম্মানিত মাসেও) যদি কাফেররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েয।

قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾

যার পবিত্রতা অলংঘনীয় তার অবমাননা কিসাসের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর(১) এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না(২)। আর

(১) এই আয়াত থেকে ফোকাহ্‌শাস্ত্রবিদ আলেমগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলিমদের উপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমনকিছু দায়-দায়িত্ব ও ব্যয় খাত রয়েছে, যেগুলো ফরয। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় কিংবা সেগুলোর জন্য কোন নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই। বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। আর যদি প্রয়োজন না হয়, তবে কিছুই ফরয নয়। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এ আয়াতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো যে, 'ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা' বলতে এক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ১.আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদ কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এ আয়াতটি নাযিল হল। [আবু দাউদ: ২৫১২, তিরমিযী: ২৯৭২] এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, 'ধ্বংসে'র দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলিমদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সে জন্যই আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, কাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং মুজাহিদ ও যাহ্হাক রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমূখ তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। ২.বারা' ইবনে 'আযেব ও নুমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, পাপের কারণে আল্লাহ্‌র রহমত

তোমরা ইহ্সান কর[১], নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহ্সীনদের ভালবাসেন।

১৯৬. আর তোমরা হজ ও 'উমরা পূর্ণ কর[২] আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। অতঃপর যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদঈ[৩] প্রদান করো। আর তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না[৪],

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ

ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। [মাজমাউয যাওয়ায়িদঃ ৬/৩১৭] এ জন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম। ইমাম জাস্সাস রাহিমাহুল্লাহ্-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরোক্ত দু'টি অর্থই এ আয়াত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) এ বাক্যে প্রত্যেক কাজই সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কুরআন 'ইহ্সান' শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। ইহ্সান দু'রকমঃ (১) 'ইবাদাতে ইহসান ও (২) দৈনন্দিন কাজকর্ম, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহ্সান। 'ইবাদাতের ইহ্সান সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাদীসে জিবরাঈল'-এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এমনভাবে 'ইবাদাত কর, যেন তুমি আল্লাহ্কে দেখছ। আর যদি সে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন। [মুসলিমঃ ৮] এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে ইহ্সানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু'আনহু বর্ণিত মুসনাদে আহমাদের এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু পছন্দ কর, অন্যান্য লোকদের জন্যেও তা পছন্দ করো। আর যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ কর না, অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করবে না'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৪৭]

(২) হজ সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুকন এবং ইসলামের ফরযসমূহ বা অবশ্যকরণীয় বিষয়সমূহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কুরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকিদ ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(৩) হাদঈ বলতে এমন জানোয়ার বুঝায় যা মীকাতের বাইরের লোকদের মধ্য থেকে যারা হজ ও উমরা একই সফরে আদায় করবে, তাদের উপর আল্লাহ্র জন্য যবেহ্ করা ওয়াজিব হয়। যার রক্ত হারাম এলাকায় পড়তে হয়। মনে রাখাতে হবে যে, তা সাধারণ কুরবানী নয়।

(৪) আয়াতে মাথা মুণ্ডনকে ইহ্রাম ভঙ্গ করার নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহ্রাম অবস্থায় চুল ছাঁটা বা কাটা অথবা মাথা মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ।

أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ ۚ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

যে পর্যন্ত হাদঈ তার স্থানে না পৌঁছে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা পশু যবেহ দ্বারা তার ফিদ্ইয়া দিবে(১)। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উমরাকে হজের সঙ্গে মিলিয়ে লাভবান হতে চায়(২) সে সহজলভ্য হাদঈ যবাই করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে হজের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফিরার পর সাত দিন এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য,

(১) যদি কোন অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোন স্থানের চুল কাটতে হয় অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোন স্থানের লোম কাটা জায়েয। কিন্তু এর ফিদ্ইয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে সাওম পালন করা বা সদকা দেয়া বা যবেহ্ করা। ফিদইয়া যবেহ্ করার জন্য হারামের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু সাওম পালন বা সদকা দেয়ার জন্য কোন বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোন স্থানে আদায় করা চলে। কুরআনের শব্দের মধ্যে সাওমের কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোন পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী কা'ব ইবনে উজরার এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে এরশাদ করেছেনঃ 'তিন দিন সাওম অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাবার দাও, প্রত্যেক মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধ সা' খাবার দাও এবং তোমার মাথা মুণ্ডন করে ফেল'। [বুখারীঃ ৪৫১৭]

(২) হজের মাসে হজের সাথে 'উমরাকে একত্রিকরণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, মীকাত হতে হজ ও উমরাহ্র জন্য একত্রে এহ্রাম করা। শরী'আতের পরিভাষায় একে 'হজে-কেরান' বলা হয়। এর এহ্রাম হজের এহ্রামের সাথেই ছাড়তে হবে, হজের শেষদিন পর্যন্ত তাকে এহ্রাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু উমরার এহ্রাম করবে। মক্কায় আগমনের পর উমরার কাজ-কর্ম শেষ করে এহ্রাম খুলবে এবং ৮ই জিলহজ তারিখে মীনা যাওয়ার প্রাক্কালে স্ব স্ব স্থান থেকে এহ্রাম বেঁধে নেবে। শরী'আতের পরিভাষায় একে 'হজে-তামাত্তু' বলা হয়।

যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর[১]।

১৯৭. হজ্ব হয় সুবিদিত মাসগুলোতে[২]। তারপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্ব করা স্থির করে সে হজ্বের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ[৩], অন্যায় আচরণ[৪] ও

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

(১) আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়েছে; যার অর্থ এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত, সতর্ক ও ভীত থাকা বুঝায়। যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজকাল হজ্ব ও উমরাকারীগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা প্রথমতঃ হজ্ব ও উমরার নিয়মাবলী জানতেই চেষ্টা করে না। আর যদিওবা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকে ওয়াজিবও পরিত্যাগ করে। আর সুন্নাত ও মুস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ্ সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।

(২) যারা হজ্ব অথবা উমরা করার নিয়্যতে এহ্‌রাম বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দু'টির মধ্যে উমরার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজ্বের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে যে, হজ্বের ব্যাপারটি উমরার মত নয়। এর জন্য কয়েকটি মাস রয়েছে, সেগুলো প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, যিল্‌ক্বদ ও জিল্‌হজ্ব। হজ্বের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজ্বের এহ্‌রাম বাঁধা জায়েয নয়।

(৩) رفث 'রাফাস' একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ত্রী সহবাস ও তার আনুষাঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত। এহ্‌রাম অবস্থায় এ সবই হারাম। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ এমনভাবে হজ্জ করবে যে, তাতে 'রাফাস, 'ফুসূক' ও 'জিদাল' তথা অশ্লীলতা, পাপ ও ঝগড়া ছিল না, সে তার হজ্জ থেকে সে দিনের ন্যায় ফিরে আসল যে দিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল।" [বুখারী: ১৫২১, মুসলিম: ১৩৫০]

(৪) فسوق 'ফুসুক' এর শাব্দিক অর্থ বের হওয়া। কুরআনের ভাষায় নির্দেশ লংঘন বা

التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

কলহ-বিবাদ[১] করবে না। আর তোমরা উত্তম কাজ থেকে যা-ই কর আল্লাহ্ তা জানেন[২] আর তোমরা

নাফরমানী করাকে 'ফুসুক' বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই ফুসুক বলে। তাই অনেকে এস্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু 'ফুসুক' শব্দের অর্থ করেছেন - সে সকল কাজ-কর্ম যা এহ্রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। স্থান অনুসারে এ ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সাধারণ পাপ এহ্রামের অবস্থাতেই শুধু নয়; বরং সবসময়ই নিষিদ্ধ। যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু এহ্রামের জন্য নিষেধ ও নাজায়েয, তা হচ্ছে ছয়টিঃ (১) স্ত্রী সহবাস ও এর আনুষাঙ্গিক যাবতীয় আচরণ; এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা। (২) স্থলভাগের জীব-জন্তু শিকার করা বা শিকারীকে বলে দেয়া। (৩) নখ বা চুল কাটা। (৪) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার। এ চারটি বিষয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই এহ্রাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট দু'টি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। (৫) সেলাই করা কাপড় পোষাকের মত করে পরিধান করা। (৬) মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। আলোচ্য ছয়টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী সহবাস যদিও 'ফুসুক' শব্দের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি একে 'রাফাস' শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে এজন্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এহ্রাম অবস্থায় এ কাজ থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর কোন ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেয়ার ব্যবস্থা নেই। কোন কোন অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হজই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য অন্যান্য কাজগুলোর কাফ্ফারা বা ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে হজ্ব ফাসেদ হয়ে যাবে। গাভী বা উট দ্বারা এর কাফ্ফারা দিয়েও পরের বছর পুনরায় হজ্ব করতেই হবে। এজন্যেই ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ শব্দ ব্যবহার করে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) جدال শব্দের অর্থ একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা। এ জন্যেই বড় রকমের বিবাদকে جدال বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক। কেউ কেউ এস্থলে 'ফুসুক' ও 'জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, 'ফুসুক' ও 'জিদাল' সর্বক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু এহ্রামের অবস্থায় এর পাপ গুরুতর। পবিত্র দিনসমূহে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে শুধুমাত্র আল্লাহ্র 'ইবাদাতের জন্য আগমন করা হয়েছে এবং 'লাব্বাইকা লাব্বাইকা' বলা হচ্ছে, এহ্রামের পোষাক তাদেরকে সবসময় এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা এখন 'ইবাদাতে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায় ও চরমতম নাফরমানীর কাজ। [মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষেপিত]

(২) ইহ্রামকালে নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্ণনা করার পর উল্লেখিত বাক্যে হিদায়াত করা হচ্ছে যে, হজের পবিত্র সময় ও স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ থেকেই বিরত থাকা যথেষ্ট

পাথেয় সংগ্রহ কর[১]। নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর[২]।

১৯৮. তোমাদের রব-এর অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই[৩]। সুতরাং যখন তোমরা 'আরাফাত[৪] হতে ফিরে

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا

নয়, বরং সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও 'ইবাদাত এবং সৎকাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। তুমি যে কাজই কর না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। আর এতে তোমাদেরকে অতি উত্তম প্রতিদানও দেয়া হবে।

(১) এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যক্তির সংশোধনী পেশ করা হয়েছে যারা হজ ও উমরাহ্ করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। অথচ দাবী করে যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি। পক্ষান্তরে পথে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে এবং অন্যকেও পেরেশান করে। তাদেরই উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হজের উদ্দেশ্যে সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নেয়া বাঞ্ছনীয়, এটা তাওয়াক্কুলের অন্তরায় নয়। বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত আসবাব পত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা করে নিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্থাৎ আমার শাস্তি, আমার পাকড়াও, আমার লাঞ্ছনা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে চলে না, আমার নিষেধ থেকে দূরে থাকে না তাদের উপর আমার আযাব অবধারিত।

(৩) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, জাহেলিয়াতের যুগে ওকায, মাজান্নাহ ও যুল মাজায নামে তিনটি বাজার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর হজের সময় সাহাবীরা সেই বাজারগুলোতে ব্যবসা করা গুনাহ বলে মনে করতে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। অর্থাৎ হজের মৌসুমে সেসব স্থানগুলোতে ব্যবসা করা কোনো দোষের কাজ নয়। [বুখারী: ১৭৭০, ২০৯৮]

(৪) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা জিবরীলকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে প্রেরণ করে তাকে হজ করান। তারা আরাফাতে পৌঁছলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, عَرَفْتُ বা আমি চিনতে পেরেছি। কারণ, জিবরীল আলাইহিস সালাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এর পূর্বেই সেখানে একবার নিয়ে এসেছিলেন। আর সে জন্যই সেটার নাম হয় 'আরাফাত'। [ইবনে কাসীর]

هَدٰىكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾

আসবে[১] তখন মাশ‘আরুল হারামের[২] কাছে পৌঁছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। যদিও এর আগে[৩] তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. তারপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে ফিরে আসে তোমরাও সে স্থান থেকে ফিরে আসবে[৪]। আর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(১) আব্দুর রহমান ইবনে ইয়া‘মুর আদ-দীলী বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘হজ হচ্ছে আরাফাত। তিনি এ কথা তিনবার বললেন। তারপর বললেন, যে ব্যক্তি সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পূর্বেই আরাফায় আসতে সক্ষম হবে সে হজ পেল। আর মিনা হচ্ছে তিন দিন। সুতরাং যদি কেউ দুইদিনে তাড়াতাড়ি করলো তার কোন পাপ নেই এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করলো তারও কোনো পাপ নেই।’ [আবু দাউদ: ১৯৪৯, তিরমিযী: ৮৮৯, ইবনে মাজাহ: ৩০১৫, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩০৯,৩১০]

(২) এখানে ‘মাশ‘আরুল হারাম’ বলে মুযদালিফা বোঝানো হয়েছে। কারণ, এ অংশ হারাম এলাকার ভিতরে। [ইবনে কাসীর]

(৩) এখানে ‘এর আগে’ বলে ‘হেদায়াত আসার পূর্বে’ বা ‘কুরআনের পূর্বে’ অথবা ‘রাসূল আসার পূর্বে’ এ তিনটি অর্থই হতে পারে। অর্থগুলো পরস্পর কাছাকাছি। [ইবনে কাসীর]

(৪) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সমস্ত আরাফাই অবস্থানের স্থান এবং উরনা উপত্যকা থেকে বের হয়ে যাও। আর মুযদালিফার সমস্ত জায়গাই অবস্থানস্থল এবং আর তোমরা ওয়াদী মুহাস্সার থেকে প্রস্থান করো। আর মক্কার প্রতিটি অলিগলিই যবেহ করার জায়গা এবং আইয়ামে তাশরীকের প্রতিদিনই যবেহ করা যাবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/৮২] অন্য হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘কুরাইশ ও তাদের মতানুসারীরা মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং নিজেদেরকে ‘হুমুস’ নামে অভিহিত করতো। আর বাকী সব আরবরা আরাফায় অবস্থান করতো। অতঃপর যখন ইসলাম আসলো তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আরাফাতে যেতে, সেখানে অবস্থান করতে এবং সেখান থেকেই প্রস্থান করতে নির্দেশ দান করেন। এ জন্যই এ আয়াতে মানুষের সাথে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [বুখারী: ৪৫২০, মুসলিম: ১২১৯]

২০০. অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহ্‌কে এভাবে স্মরণ করবে যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃ পুরুষদের স্মরণ করে থাক, অথবা তার চেয়েও অধিক[১]। মানুষের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেই দিন'। আখেরাতে তার জন্য কোনও অংশ নেই।

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾

২০১. আর তাদের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন[২]।'

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

২০২. তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। আর আল্লাহ্ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

২০৩. আর তোমরা গোনা দিনগুলোতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। অতঃপর

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن

(১) আতা বলেন, এর অর্থ হলো, শিশুরা যেমন পিতা মাতাকে সব সময় স্মরণ করে, তোমরাও হজ শেষ করার পর আল্লাহ্ তা'আলাকে তেমনি স্মরণ কর। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, জাহেলিয়াতে হজের সময় একত্রে বসে পরস্পরে বলাবলি করত যে, আমার পিতা একজন অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণের ভালো কাজ করে দিতেন। তিনি মানুষের দিয়াত বা রক্তপণ আদায় করে দিতেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে আল্লাহ্‌র যিকরকে তাদের পিতৃপুরুষের স্মরণের সাথে তুলনা করে বেশী বেশী করে যিকর করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। [ইবনে কাসীর]

(২) আবদুল্লাহ্ ইবনে সায়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কা'বার দুই রুকনের মাঝখানে এ দো'আ বলতে শুনেছি'। [আবুদাউদ: ১৮৯২] আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই এ দো'আ করতেন।' [বুখারী: ৪৫২২, মুসলিম: ২৬৯০]

تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করে আসে তারও কোন পাপ নেই। এটা তার জন্য যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁর নিকট সমবেত করা হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

২০৪. আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবনে[১] যার কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

২০৫. আর যখন সে প্রস্থান করে তখন সে যমীনে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণী ধ্বংসের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ্ ফাসাদ ভালবাসেন না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۗ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

২০৬. আর যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর', তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপাচারে লিপ্ত করে, কাজেই জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

২০৭. আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে বিকিয়ে

(১) আয়াতের এ অংশের তিনটি অর্থ হতে পারেঃ (১) পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে। (২) পার্থিব জীবনে যাদের কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে। এবং (৩) পার্থিব জীবনে আপনি চমৎকৃত হন তাদের কথাবার্তায়।

দেয়[১]। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল।

২০৮. হে মুমিনগণ! তোমরা পুর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۗفَّةً ۠ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٢٠٨

২০৯. অতঃপর তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٢٠٩

২১০. তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও ফেরেশ্‌তাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন[২]? এবং সবকিছুর মীমাংসা

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٢١٠

(১) বিভিন্ন গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতটি সোহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কোরাইশ তাকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তার তুনীরে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কোরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, - হে কোরাইশগণ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পারবে। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদেরকে মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কোরাইশদল রাযী হয়ে গেল এবং সোহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু‘আনহু নিরাপদে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’বার বললেন, সুহাইব লাভবান হয়েছে! সুহাইব লাভবান হয়েছে! [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩/৩৯৮]

(২) আল্লাহ্ ও ফেরেশ্‌তা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন

হয়ে যাবে। আর সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

২১১. ইস্‌রাঈল-বংশধরগণকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি! আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আসার পর কেউ তা পরিবর্তন করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

سَلْ بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

২১২. যারা কুফরী করে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবন সুশোভিত করা হয়েছে এবং তারা মুমিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কেয়ামতের দিন তারা তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিযিক্ দান করেন।

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

২১৩. সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত[১]।

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ

ঘটনা কেয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র আগমন সত্য ও সঠিক। এ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ী এবং বুযুর্গানে দ্বীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে, তা আমরা জানি না।

(১) এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা নিঃসন্দেহে তাওহীদের উপর ছিল। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'আদম ও নূহ 'আলাইহিমুস্ সালাম-এর মাঝে দশটি প্রজন্ম গত হয়েছেন, যারা সবাই তাওহীদের উপর ছিলেন। অন্য বর্ণনায় কাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আদম ও নূহ 'আলাইহিমুস্ সালাম-এর মাঝে দশটি প্রজন্ম হিদায়াতের উপর ছিল। [তাফসীরে তাবারী] অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও সঠিক মতকে প্রকাশ করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেন, তাদের প্রতি আসমানী কিতাব নাযিল করেন। নবীগণের চেষ্টা পরিশ্রমের ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল এবং তাদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক

النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۠ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۱۳﴾

অতঃপর আল্লাহ্‌ নবীগণকে প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেন[১] যাতে মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করত সেসবের মীমাংসা করতে পারেন। আর যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাদের কাছে আসার পরে শুধু

পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়। আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে নবীগণকে মিথ্যা বলে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী এবং মুমিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফের বলে পরিচিত।

এ আয়াত দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, দ্বীনের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয়। মুসলিম ও অমুসলিম দু'টি জাতি হিসেবে চিহ্নিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে ﴿فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ [সূরা আত-তাগাবুনঃ ২] আয়াতটিও একটি প্রমাণ। এতদসঙ্গে এ কথাও পরিস্কারভাবে বোঝা গেল যে, ইসলামের মধ্যে এ দু'টি জাতীয়তা সৃষ্টির ব্যবস্থাও একটি একক জাতীয়তা সৃষ্টি করার জন্যই, যা সৃষ্টির আদিতে ছিল। যার বুনিয়াদ দেশ ও ভৌগলিক সীমার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। বরং একক বিশ্বাস ও একক দ্বীনের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরশাদ হয়েছে যে, ﴿كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً﴾ সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্য দ্বীনের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহ্বান করেছেন। যারা তাদের এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তারা একক জাতীয়তা থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে এবং বিচ্ছিন্ন জাতীয়তা গঠন করেছে।

(১) আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে সেসব নবী-রাসূলের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেয়া হয়েছিল বলেই আরও নবী-রাসূল এবং কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেহেতু কুরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাযত রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কুরআনের শিক্ষাকে কেয়ামত পর্যন্ত এর প্রকৃত রূপে বহাল রাখার জন্য উম্মতে-মুহাম্মাদীর মধ্য থেকে এমন এক দলকে সঠিক পথে কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন, যে দল সব সময় সত্য দ্বীনে অটল থেকে মুসলিমদের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সঠিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করতে থাকবে। কারো শত্রুতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এ জন্যেই তার পরে নবুওয়াত ও ওহীর দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই সর্বোপরি খতমে-নবুওয়াত ঘোষণা করা হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

পরস্পর বিদ্বেষবশত সে বিষয়ে তারা বিরোধিতা করত। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছাক্রমে ঈমানদারদেরকে হেদায়াত করেছেন সে সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল[১]। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে সরল পথের দিকে হেদায়াত করেন।

২১৪. নাকি তোমরা মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে[২] অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সংগী-সাথী ঈমানদারগণ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

(১) অর্থাৎ মন্দ লোকেরা প্রেরিত নবীগণ এবং আল্লাহ্র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোকষ্ট নেয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফেররা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ অবলম্বন করে নবীগণের বিরুদ্ধাচারণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মুমিন ও সালেহ্গণের উচিত নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা, তাদের অনুসরণে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর ওয়াজ এবং নম্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করতে থাকা। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই জান্নাত লাভ করতে পারবে না। তবে কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্নস্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুমিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চস্তরের বর্ণনা - যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সবচাইতে অধিক বালা-মুসীবতে পতিত হয়েছেন নবী-রাসূলগণ। তারপর (মর্যাদার দিক থেকে) তাদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ'। [ইবনে মাজাহঃ ৪০২৩]

বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে[১]?' জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটে।

২১৫. তারা কি ব্যয় করবে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করে[২]। বলুন, 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যা কিছুই তোমরা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

২১৬. তোমাদের উপর লড়াই করাকে লিখে দেয়া হয়েছে যদিও তোমাদের নিকট এটা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾

(১) নবীগণ ও তাদের সাথীদের প্রার্থনা যে, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে' তা কোন সন্দেহের কারণে নয়। বরং এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেননি। অতএব, এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি আসুক। এমন প্রার্থনা আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা ও শানে নবুওয়াতের খেলাফ নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুত নবী এবং সালেহীনগণই এরূপ প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত।

(২) অর্থাৎ আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? এ প্রশ্নে দু'টি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে? দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই দানের পাত্র কারা? প্রথম অংশে অর্থাৎ কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছেঃ 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমরা যাই ব্যয় কর তার হকদার হচ্ছে, 'তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরগণ'। আর দ্বিতীয় অংশের জবাব অর্থাৎ কি ব্যয় করবে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এরশাদ করা হয়েছে, 'তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন'। বাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই তোমাদেরকে ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ্‌র নিকট এর প্রতিদান পাবে।

হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না[১]।

২১৭. পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে[২]; বলুন, ‘এতে যুদ্ধ করা কঠিন অপরাধ। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেয়া ও এর বাসিন্দাকে এ থেকে বহিস্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তারচেয়েও বেশী অপরাধ।আর ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। আর তারা সবসময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

يَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ الشَّهۡرِ الۡحَرَامِ قِتَالٍ فِيۡهِ ؕ قُلۡ
قِتَالٌ فِيۡهِ كَبِيۡرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَكُفۡرٌۢ بِهٖ
وَالۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ۚ وَاِخۡرَاجُ اَهۡلِهٖ مِنۡهُ اَكۡبَرُ عِنۡدَ
اللّٰهِ ۚ وَالۡفِتۡنَةُ اَكۡبَرُ مِنَ الۡقَتۡلِ ؕ وَلَا يَزَالُوۡنَ
يُقَاتِلُوۡنَكُمۡ حَتّٰى يَرُدُّوۡكُمۡ عَنۡ دِيۡنِكُمۡ اِنِ
اسۡتَطَاعُوۡا ؕ وَمَنۡ يَّرۡتَدِدۡ مِنۡكُمۡ عَنۡ دِيۡنِهٖ
فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓـئِكَ حَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ
فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓـئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ
هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۲۱۷﴾

(১) আয়াতের মর্ম হলো, “যদিও জিহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা বলে মনে হয়, কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরে ছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। তাই বলা হয়েছেঃ জিহাদ যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি ছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ, উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল। [মা‘আরিফুল কুরআন]

(২) আলোচ্য আয়াতে প্রমাণিত হলো যে, নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ রজব, যিল্‌ক্বদ, যিল্‌হজ এবং মুহার্‌রাম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম। প্রখ্যাত মুফাসসির ‘আতা ইবনে আবী রাবাহ্’ শপথ করে বলেছেন যে, এ আদেশ সর্বযুগের জন্য। তাবেয়ীগণের অনেকেও এ আদেশকে স্থায়ী আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ্ এবং ইমাম জাস্‌সাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। ফলে এখন কোন মাসেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়। কুরতুবী বলেন, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা সর্বকালের জন্যই নিষিদ্ধ। তবে কাফেররা যদি এসব মাসে আক্রমন করে, তবে প্রতিরক্ষামূলক পাল্টা আক্রমণ করা মুসলিমদের জন্যও জায়েয। [তাফসীরে কুরতুবী: ৩/৪২৩]

করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে[১] এবং কাফের হয়ে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমলসমূহ নিস্ফল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে'।

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে[২], তারাই আল্লাহ্‌র

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

(১) মুরতাদ সে ব্যক্তি, যে ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে ফিরে গেছে, চাই তা কথায় হোক, বিশ্বাসে হোক বা কাজে হোক। এ আয়াতের শেষে মুসলিম হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম বলা হয়েছে। "তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে বরবাদ হয়ে গেছে"। এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তার কোন নিকটআত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তাহলে সে ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা মীরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন সালাত-সাওম যত কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না এবং মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না। আর আখেরাতে বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে 'ইবাদাতের সওয়াব না পাওয়া এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া। মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাফেরদের অবস্থা অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। এজন্য কাফেরদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কেননা, মুরতাদের কার্যকলাপের দরুন সরাসরিভাবে ইসলামের অবমাননা করা হবে। কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

(২) জিহাদের শাব্দিক অর্থ হলো: চেষ্টা করা, সাধনা করা, তা কাজ অথবা কথা যেকোন মাধ্যমে হতে পারে। শর'য়ী পরিভাষায় - কাফের, সীমালংঘনকারী অথবা মুরতাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলে। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনায় জিহাদের অসাধারণ ফযীলতের কথা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জিহাদকে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে

নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, মারে ও মরে। তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্র চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং ওটাই তো মহাসাফল্য"। [সূরা আত্-তাওবাঃ ১১১] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদকে ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেনঃ 'সকল কিছুর মূল হলো ইসলাম। যার খুঁটি হলো সালাত এবং সর্বোচ্চ শিখর জিহাদ'। [তিরমিযীঃ ২৬১৬] জিহাদের তুলনা অন্য কিছু দ্বারা হয় না। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা জিহাদের পরিপূরক হতে পারে'। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেনঃ 'আমি পাইনি'। [বুখারীঃ ২৮১৮] এছাড়া আল্লাহ্র পথে যারা জিহাদ করবে, তাদেরও অসংখ্য মর্যাদার কথা ঘোষিত রয়েছে কুরআন ও হাদীসে। যেমন, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ "আর আল্লাহ্র পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না"। [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৫৪] অপর হাদীসে এসেছে, জিহাদের ময়দানে শাহাদাতবরণকারীরা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর সম্মানীত মেহমান। মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 'শহীদদের ছয়টি মর্যাদা রয়েছে - (১) রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই তাকে মাফ করে দেয়া হয়। (২) জান্নাতে তার অবস্থানস্থল দেখিয়ে দেয়া হয়। (৩) কবরের আযাব থেকে মুক্ত থাকবে এবং মহা শংকার দিনে শংকামুক্ত থাকবে। (৪) তাকে ঈমানের অলংকার পরানো হবে। (৫) জান্নাতের হূর তাকে বিয়ে করানো হবে। (৬) তার নিকটাত্মীয়দের থেকে সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করার সুযোগ দেয়া হবে'। [বুখারীঃ ২৭৯০]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলিমের উপর সব সময়ই জিহাদ ফরয। তবে কুরআনের কোন কোন আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের বর্ণনাতে বোঝা যায় যে, জিহাদের এ ফরয, ফরযে-'আইনরূপে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয সাব্যস্ত হয় না, বরং এটা ফরযে কেফায়া। যদি মুসলিমদের কোন দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলিমই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জিহাদের ফরয আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলিমই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আমাকে প্রেরণের পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে, আমার উম্মতের সর্বশেষ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে' [আবু দাউদঃ ২৫৩২] কুরআনের অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ "আল্লাহ্ তা'আলা জান

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আর আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

ও মালের দ্বারা জিহাদকারীগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন”। [সূরা আন্-নিসাঃ ৯৫] সুতরাং যেসব ব্যক্তি কোন অসুবিধার জন্যে বা অন্য কোন দ্বীনী খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারে নি, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ যদি ফরযে-আইন হতো, তবে তা বর্জনকারীদের সুফল দানের কথা বলা হত না। তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতা-মাতা কি বেঁচে আছেন? উত্তরে সে বলল, জি, বেঁচে আছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উপদেশ দিলেনঃ 'তুমি পিতা-মাতার খেদমত করেই জিহাদের সওয়াব হাসিল কর'। [মুসলিমঃ ২৫৪৯] এতেও বোঝা যায় যে, জিহাদ ফরযে-কেফায়া। যখন মুসলিমদের একটি দল ফরয আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলিম অন্য খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলিমদের নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান করেন, তখন জিহাদ ফরযে-আইনে পরিণত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমের এরশাদ হয়েছেঃ “হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনে ঝুঁকে পড়” । [সূরা আত্-তাওবাঃ ৩৮] এ আয়াতে আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে পড়ার সার্বজনীন নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ্ না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ অমুসলিম দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরও সে ফরয আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের উপর এ ফরয পরিব্যপ্ত হয় এবং ফরযে-আইন হয়ে যায়। কুরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরযে-কেফায়া। আর যতক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরযে-কেফায়া পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশ গ্রহণ করা জায়েয নয়। কিংবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরযে কেফায়াতে অংশ গ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যখন এ জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে-আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী ঋণদাতা কারোরই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

২১৯. লোকেরা আপনাকে মদ[১] | يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ

(১) ইসলামের প্রথম যুগের জাহেলিয়াত আমলের সাধারণ রীতি-নীতির মধ্যে মদ্যপান স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের পরও মদীনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল। কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহ্‌র নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের ঊর্ধ্বে স্থান দেন। যদি কোন অভ্যাস বুদ্ধি বা যুক্তির পরিপন্থী হয়, তবে সে অভ্যাসের ধারে-কাছেও তারা যান না। এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থান ছিল সবচেয়ে ঊর্ধ্বে। কেননা, যেসব বস্তু কোন কালে হারাম হবে, এমন সব বস্তুর প্রতিও তার অন্তরে একটা সহজাত ঘৃণাবোধ ছিল। সাহাবীগণের মধ্যেও এমন কিছুসংখ্যক লোক ছিলেন, যারা হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বেও মদ্যপান তো দূরের কথা, তা স্পর্শও করেননি। মদীনায় পৌঁছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে উমর, মু'আয ইবনে জাবাল এবং কিছুসংখ্যক আনসার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ 'মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?' এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। [আবু দাউদঃ ৩৬৭০, তিরমিযীঃ ৩০৪৯, মুসনাদে আহমাদঃ ১/৫৩] এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলিমদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে রাখার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নাযিল হয়েছে। আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দু'টির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়; যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সেসব বিষয়ও বোঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ, বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, বুদ্ধি এমন একটি গুণ যা মানুষকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়। [মা'আরিফুল কুরআন]

এ আয়াতে পরিস্কারভাবে মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্য পানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য এক প্রকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি, বরং এটা দ্বীনের পক্ষে ক্ষতির কাজে ধাবিত করে বিধায় একে পাপের কারণ বলে

ও জুয়া[১] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। | اِثۡمٌ كَبِيۡرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثۡمُهُمَآ اَكۡبَرُ

স্থির করা হয়েছে, যাতে ফেত্‌নায় পড়তে না হয়, সে জন্য পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। পরবর্তী সূরার আন-নিসা এর ৪৩ নং আয়াতে মদপানের সময় সীমিত করা হয়। সবশেষে সূরা আল-মায়িদাহ্ এর ৯০ নং আয়াতের মাধ্যমে মদকে চিরতরে হারাম করা হয়। এ বিষয়ে আরও আলোচনা সূরা আল-মায়িদাহ্ এর ৯০ নং আয়াতে করা হবে।

(১) আয়াতে উল্লেখিত ميسر শব্দটির অর্থ বন্টন করা, ياسر বলা হয় বন্টনকারীকে। জাহেলিয়াত আমলে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বন্টন করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেয়া হত। কেউ একাধিক অংশ পেত আবার কেউ বঞ্চিত হত। বঞ্চিত ব্যক্তিকে উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হত, আর গোশ্‌ত দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হত; নিজেরা ব্যবহার করত না। এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেত, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ করা হত। আর যারা এ খেলায় অংশগ্রহণ না করত, তাদেরকে কৃপণ ও হতভাগ্য বলে মনে করা হত। বন্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এরূপ জুয়াকে 'মাইসির' বলা হত। [তাফসীরে কুরতুবী: ৩/৪৪২-৪৪৩] সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। ইবনে কাসীর তার তাফসীরে এবং জাস্‌সাস 'আহকামুল-কুরআনে' লিখেছেন যে, মুফাস্‌সিরে কুরআন ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, কাতাদাহ্, মু'আবিয়া ইবনে সালেহ্, আতা ও তাউস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেছেনঃ সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও। ইবনে আব্বাস বলেছেনঃ লটারীও জুয়ারই অন্তর্ভুক্ত। জাস্‌সাস ও ইবনে সিরীন বলেছেনঃ 'যে কাজে লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাও 'মাইসির' এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, লটারীর মাধ্যমে কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় অপরদিকে অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। এসবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ও হারাম। মোটকথা, 'মাইসির' ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে ব্যাপারে কোন মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত আরোপিত হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। আর এরই ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে। [ইবনে কাসীর] এ জন্য সহীহ্ হাদীসে দাবা ও ছক্কা-পাঞ্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম বলা হয়েছে। কেননা, এসবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজী ধরা হয়ে থাকে। তাস খেলায় যদি টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, তবে তাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বারীদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি ছক্কা-পাঞ্জা খেলে সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে স্বীয় হাত রঞ্জিত করে'। [মুসলিমঃ ২২৬০]

مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾

বলুন, 'দু'টোর মধ্যেই আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; আর এ দু'টোর পাপ উপকারের চাইতে অনেক বড়'। আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কি তারা ব্যয় করবে? বলুন, যা উদ্বৃত্ত[১]। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

২২০. দুনিয়া এবং আখেরাতের ব্যাপারে। আর লোকেরা আপনাকে ইয়াতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; বলুন, 'তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম'। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী[২]। আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

---

(১) অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর। এতে বোঝা গেল যে, নফল সদকার বেলায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানাদিকে কষ্টে ফেলে, তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত করে সদকা করার কোন বিধান নেই। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে নফল সদকা করাও আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়।

(২) ইবনে আব্বাস বলেন, যখন "তোমরা উত্তম পদ্ধতি ব্যতীত ইয়াতিমের সম্পদের কাছেও যেও না" [সূরা আল-আন'আম: ১৫২, আল-ইসরা: ৩৪] নাযিল হল তখন অনেকেই ইয়াতিমদের থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে ইয়াতিমরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতিমদের সাথে কিভাবে চলতে হবে তা জানিয়ে দেন।" [আবুদাউদ: ২৮৭১]

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا

২২১. আর মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করো না[১]।

(১) আয়াতে মুশরিক শব্দ দ্বারা সাধারণ অমুসলিমকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। বলা হয়েছে, “তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো” [সূরা আল-মায়েদাহ্ঃ ৫]। তাই এখানে মুশরিক বলতে ঐ সব বিশেষ অমুসলিমকেই বোঝানো হয়েছে, যারা কোন নবী কিংবা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না। আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলিম পুরুষদের সম্পর্কের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ ঠিক হবে এবং স্বামীর পরিচয়েই সন্তানদের বংশ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে এ বিবাহও পছন্দনীয় নয়। মুসলিম বিবাহের জন্য দ্বীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনুসন্ধান করবে, যাতে করে সে তার দ্বীনী ব্যাপারে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে তাদের সন্তানদেরও দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ মিলবে। যখন কোন দ্বীনহীন মুসলিম মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সে ক্ষেত্রে অমুসলিম মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ কারণেই উমর রাদিয়াল্লাহু'আনহু যখন খবর পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের মুসলিমদের এমন কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তখন তিনি ফরমান জারি করলেন যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক জীবন তথা দ্বীনী জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও ক্ষতির কারণ। [তাফসীরে কুরতুবী: ৩/৪৫৬]

বর্তমান যুগের অমুসলিম আহলে কিতাব, ইয়াহূদী ও নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক ধোঁকা-প্রতারণা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবাহ এবং মুসলিম সংসারে প্রবেশ করে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মুসলিমদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। ইসলামের খলীফা উমর রাদিয়াল্লাহু'আনহু-এর সুদূর প্রসারী দৃষ্টিশক্তি বৈবাহিক ব্যাপার সংক্রান্ত এ বিষয়টির সর্বনাশা দিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশেষতঃ বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যারা ইয়াহূদী ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদম-শুমারীর খাতায় যাদেরকে দ্বীনী দিক থেকে ইয়াহূদী কিংবা নাসারা বলে লেখা হয়, যদি তাদের প্রকৃত দ্বীনের অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, নাসারা ও ইয়াহূদী মতের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণভাবেই দ্বীন বর্জনকারী। তারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকেও মানে না, তাওরাতকেও মানে না, এমনকি আল্লাহ্র অস্তিত্বও মানে না, আখেরাতও মানে না। বলাবাহুল্য, বিবাহ হালাল হওয়ার কুরআনী আদেশ এমন সব ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণই হারাম। সূরা আল-মায়েদাহ এর আয়াতে যাদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, আজকালকার

الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۭ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى
النَّارِ ښ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও, অবশ্যই মুমিন কৃতদাসী তার চেয়ে উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষদের সাথে তোমরা বিয়ে দিও না[১], মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও অবশ্যই মুমিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম। তারা আগুনের দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন[২]। আর

ইয়াহূদী-নাসারারা তার আওতায় পড়ে না। সে হিসেবে সাধারণ অমুসলিমদের মত তাদের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম। মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোঁজ-খবর না নিয়েই পাশ্চাত্যের মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসে। এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলিম মনে করা হয়, কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, তার সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে জায়েয নয়। আর যদি বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে তবে তাদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যাবে। আজকাল অনেকেই নিজের দ্বীন সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ এবং সামান্য কিছুটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই স্বীয় দ্বীনের আকীদা নষ্ট করে বসে। কাজেই প্রথমে ছেলের আকীদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা দেয়া মেয়েদের অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

(১) উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোন মুসলিম অমুসলিম মহিলাকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু কোন অমুসলিমের সাথে কোন মুসলিম মহিলাকে বিয়ে দেয়া যাবে না। [তাবারী] যুহরী, কাতাদাহ বলেন, কোন অমুসলিম চাই সে ইয়াহূদী হোক বা নাসারা বা মুশরিক তার কাছে কোন মুসলিম মহিলাকে বিয়ে দেয়া যাবে না। [তাফসীরে আবদুর রাজ্জাক] এ ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে।

(২) আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলিম পুরুষের বিয়ে কাফের নারীর সাথে এবং কাফের পুরুষের বিয়ে মুসলিম নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ, কাফের স্ত্রী-পুরুষ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। সাধারণত বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের ভালবাসা, নির্ভরশীলতা এবং একাত্মতায় পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তা ব্যতীত এ সম্পর্কে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর মুশরিকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালবাসা ও নির্ভরশীলতার অপরিহার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শির্কের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি

তিনি মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা শিক্ষা নিতে পারে।

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

২২২. আর তারা আপনাকে রজঃস্রাব (হায়েয) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, 'তা অশুচি'(১)। কাজেই তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সংগম থেকে বিরত থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত(২) (সংগমের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হবে না(৩)। তারপর তারা

হয় অথবা কুফর ও শির্কের প্রতি ঘৃণা তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত সেও কুফর ও শির্কে জড়িয়ে পড়ে; যার পরিণতি জাহান্নাম। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে আহ্বান করেন এবং পরিস্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ উপদেশ মত চলে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) আয়াতে বর্ণিত مَحِيضٌ অর্থ দু'টি। ১. হায়েযের স্থান ২. হায়েযের সময়। অর্থাৎ তারা আপনাকে হায়েয এর ব্যাপারে অথবা হায়েযের স্থান অথবা হায়েযের সময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। তারা হায়েযের সময়ে সে স্থানে কি করতে পারে, আর কি করতে পারবে না এ প্রশ্ন করছে। বলুন যে, সেটা أذى - এর এক অর্থ, কষ্ট। আরেক অর্থ, অপবিত্রতা, অশুচি। দু'টি অর্থই শুদ্ধ। [তাফসীরে কুরতুবী] হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কতটুকু মেলামেশা করা যাবে, তা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হায়েযের স্থানে সঙ্গম ব্যতীত আর সবই করতে পার"। [মুসলিম: ৩০২] উম্মুল মুমিনীন মায়মূনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হায়েয অবস্থায় কোন স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চাইতেন তখন তাকে হায়েযের স্থানে কাপড় পরিধান করে নিতে বলতেন।" [বুখারী: ৩০৩, মুসলিম: ২৯৪]

(২) চরম যৌন উত্তেজনা বশতঃ ঋতুকালীন অবস্থায় সহবাস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভাল করে তাওবা করে নেয়া ওয়াজিব। তার সাথে সাথে কিছু দান-সদকা করে দিলে তা উত্তম। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/১৭১, ১৭২, তিরমিযী: ১৩৭] তবে মনে রাখতে হবে যে, পশ্চাদ পথে (অর্থাৎ যোনিপথ ছাড়া গুহ্যদ্বার দিয়ে) নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হারাম।

(৩) স্ত্রীদের হায়েয অবস্থায় সংগম ক্রিয়া ব্যতীত তাদের সাথে সর্বপ্রকার মেলামেশাই জায়েয। স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অংশে মেলামেশা জায়েয।

যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং তাদেরকেও ভালবাসেন যারা পবিত্র থাকে।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে[১] গমন করতে পার। আর তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করো[২] এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। এবং জেনে রেখো, তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হবে। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

২২৪. আর তোমরা সৎকাজ এবং তাকওয়া ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্‌র নামের শপথকে অজুহাত করো না। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ[৩]।

---

(১) আল্লাহ্ এখানে স্ত্রীদের সাথে সংগমের কোন নিয়মনীতি বেঁধে দেননি। শুইয়ে, বসিয়ে, কাত করে সব রকমই জায়েয। তবে যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ যেমন, পায়ূপথ, মুখ ইত্যাদিতে সংগম করা জায়েয নেই। কেননা, তা বিকৃত মানসিকতার ফল। এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে নিষেধ এসেছে।

(২) এখানে 'ভবিষ্যতের জন্য কিছু কর' বলতে অনেকের মতেই সন্তান-সন্ততির জন্য প্রচেষ্টা চালানো বুঝানো হয়েছে।

(৩) মুমিনদের জন্য কখনো ভাল কাজ না করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করা উচিত হবে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমি যখনই কোন কাজের শপথ করি, তারপর তারচেয়ে ভাল কাজ শপথের বিপরীতে দেখতে পাই, তখনি আমি সে শপথ ভেঙ্গে যা ভাল সেটা করি এবং পূর্বকৃত শপথের কাফ্‌ফারা দেই'। [বুখারীঃ ৩১৩৩, মুসলিমঃ ১৬৪৯]

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

২২৫. তোমাদের অনর্থক শপথের[১] জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না; কিন্তু তিনি সেসব কসমের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন, তোমাদের অন্তর যা সংকল্প করে অর্জন করেছে। আর আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহিষ্ণু।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾

২২৬. যারা নিজ স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করে[২] তারা চার মাস অপেক্ষা

---

(১) ‘ইয়ামীনে লাগও’ বা ‘অনর্থক-কসম’- এর এক অর্থ হচ্ছে, কোন বিষয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে শপথ শব্দ বেরিয়ে পড়া। [বুখারী:৪৬১৩] কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মত সঠিক বলে মনে করেই শপথ করা। উদাহরণতঃ - নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে, ‘যায়েদ এসেছে’। কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। [কুরতুবী:৪/১৭] এ ধরনের শপথে কোন পাপ হবে না। আর সেজন্যই একে অহেতুক বলা হয়েছে। আখেরাতে এজন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না এবং এ ধরণের কসমের কোন কাফ্ফারাও নেই। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সে সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় ‘গামুস’। এতে পাপ হয়। এ আয়াতে দু’রকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরও এক প্রকারের কসম আছে, যাকে বলা হয় ‘মুন‘আকেদাহ’। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি ‘আমি অমুক কাজটি করব’ কিংবা ‘অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব’ বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে এক্ষেত্রে তাকে কাফ্ফারা দিতেই হবে। [কুরতুবী: ৪/১৯] সূরা আল-মায়িদাহ্ এর ৮৯ নং আয়াতে এর বিস্তারিত বর্ণনা ও বিধান বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্থাৎ যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে, প্রথমতঃ কোন সময় নির্ধারণ করল না। দ্বিতীয়তঃ চার মাস সময়ের শর্ত রাখল। তৃতীয়তঃ চার মাসের বেশী সময়ের শর্ত আরোপ করল। চতুর্থতঃ চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখল। বস্তুতঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিকগুলোকে শরী‘আতে ‘ঈলা’ বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও কসম না ভাঙ্গে, তাহলে সে স্ত্রীর উপর ‘তালাকে-কাত‘য়ী’ বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ পুনঃর্বার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া জায়েয থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েয হয়ে যাবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব

করবে। অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২২৭. আর যদি তারা তালাক[১] দেয়ার সংকল্প করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৮. আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ[২] তিন

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথ অটুট থাকবে। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

(১) ইসলামী শরী'আতে বিয়ে হচ্ছে, পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তিস্বরূপ। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি 'ইবাদাত। সমগ্র উম্মত এতে একমত যে, বিয়ে সাধারণ লেন-দেন ও চুক্তির ঊর্ধ্বে একটা পবিত্র বন্ধনও বটে। যেহেতু এতে 'ইবাদাতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাখা হয় না। আর তালাক; তা বিয়ের চুক্তি ও লেন-দেন বাতিল করাকে বোঝায়। ইসলামী শরী'আত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে 'ইবাদাতের গুরুত্ব বেশী দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশী, যেভাবে খুশী তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না, বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে। এ আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(২) ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মত কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বুঝবার চেষ্টা, অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিশ সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কাংখিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত আযাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এজন্যই ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা

রাখা হয়েছে। ইসলামী শরী'আত অন্যান্য দ্বীনের মত বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেয়া হয়েছে; এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশী তালাকের কারণ হতে না পারে। তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর যুলুম অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যেও রয়েছে। তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু কিছু আদাব ও শর্ত রয়েছে। যেমন, এক. এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারগ অবস্থাতেই এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। দুই. রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে না। তিন. ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, ঋতু অবস্থায় তালাক দিলে চল্তি ঋতু ইদ্দতে গণ্য হবে না। চল্তি ঋতুর শেষে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। চার. পবিত্র অবস্থায়ও যে তুহুর বা সুচিতায় সহবাস হয়েছে তাতে তালাক না দেয়ার কথা বলা হয়েছে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং তাতে তার কষ্ট হবে। কারণ, যে তহুর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তহুরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরও দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহুর ঠিক করার আরও একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে। পাঁচ. বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মত নয়। বৈষয়িক চুক্তির মত বিয়ের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয়পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদ্দতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের অনেক সম্পর্কই বাকী থাকে। যেমন, স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না। ছয়. যদি পরিস্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেয়া হয়, তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিয়েই অক্ষুণ্ন থাকে। সাত. প্রত্যাহারের এ অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে কোন অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক বা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। আট. যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। [কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত]

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيْٓ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। আর তারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে হালাল নয়। আর যদি তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চায় তবে এতে তাদের পুনঃ গ্রহণে তাদের স্বামীরা বেশী হকদার। আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; আর নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে(১)। আর

(১) আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরী'আতী মূলনীতি হিসেবে গণ্য। বলা হয়েছে, নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশী। প্রায় একই রকম বক্তব্য অন্যত্র উপস্থাপিত হয়েছেঃ "যেহেতু আল্লাহ্ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল"। [সূরা আন্-নিসাঃ ৩৪] ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। তখন চতুস্পদ জীব-জন্তুর মত তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হত। মীরাসের অধিকারিনী হত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার প্রবর্তিত দ্বীন ইসলামই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি পিতা হলেও কোন প্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকট আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। স্বামী

আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২২৯. তালাক দু'বার। অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিধিমত রেখে দেওয়া, নতুবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেওয়া। আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা প্রদান করেছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে হালাল নয়[১]। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ اَنۡ تَاۡخُذُوۡا مِمَّاۤ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ شَيۡـًٔا اِلَّاۤ اَنۡ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيۡمَا افۡتَدَتۡ بِهٖ ؕ تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ فَلَا تَعۡتَدُوۡهَا ۚ وَمَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۲۲۹﴾

তার নায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে। আবার ইসলাম নারীদেরকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেও দেয়নি; কারণ তা নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততি লালন-পালন ও ঘরের কাজ-কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ জন্য কুরআনে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, "পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে।" অন্য কথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। এ আয়াতে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা মানব চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই দেয়া হয়নি বরং তা পালন করাও ফরয করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা, আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপরই হয়ে থাকে। তাই আখেরাতের ব্যাপারে দুনিয়ার মত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এ ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদার যোগ্য। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

(১) অর্থাৎ 'তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মাহ্‌র ফেরত নেয়া হালাল নয়'। কোন কোন অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না, আবার তার অধিকার আদায় করারও কোন চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ট হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মাহ্‌র মাফ করিয়ে নেয়ার বা ফেরত নেয়ার দাবী করে বসে। কুরআনুল কারীম এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে।

সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তারপর যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই[১]। এ সব আল্লাহ্‌র সীমারেখা সুতরাং তোমরা এর লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা লংঘন করে তারাই যালিম।

২৩০. অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সংগত না হবে[২]। অতঃপর সে

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

(১) অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মাহ্‌র ফেরত নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি এবং স্বামী যদি তাই বুঝে, তবে এমতাবস্থায় মাহ্‌র ফেরত নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেয়া জায়েয হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণিত যে, সাবেত ইবনে কাইসের স্ত্রী নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাবেত ইবনে কাইসের দ্বীনদারী এবং চরিত্রের উপর আমার কোন অভিযোগ নেই; কিন্তু আমি মুসলিম হয়ে কুফরী করাটা মোটেও পছন্দ করি না। (তাদের উভয়ের সম্পর্কে অমিল ছিল) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি কি তাকে (স্বামীকে)-মাহ্‌র হিসেবে তোমাকে যে বাগান দিয়েছিল-তা ফিরিয়ে দেবে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে বললেন, বাগানটি ফেরত নিয়ে তাকে এক তালাক দিয়ে দাও'। [বুখারীঃ ৫২৭৩]

(২) অর্থাৎ এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার থাকবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সবদিক বুঝে শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে যে, স্ত্রী ইদ্দতের পর অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোন কারণে যদি

(দ্বিতীয় স্বামী) যদি তালাক দেয় আর | حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا

এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, অথবা মৃত্যু বরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

তালাক দেয়ার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিঃ কুরআন ও হাদীসের এরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় যে, যখন তালাক দেয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন তালাক দেয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক তহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহসম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহ্গণ একে আহ্সান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহাবীগণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন। [ইবনে আবী শাইবাহ্ঃ ১৭/৭৪৩] ইবনে আবি-শাইবা তার গ্রন্থে ইবরাহীম নাখ'য়ী রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে আরও উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ বন্ধন স্বাভাবিকভাবেই ছিন্ন হয়ে যাবে। মোটকথা: ইসলামী শরী'আত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে। বরং শরী'আতের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারগতাবশতঃ যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়। এতে আরও সুবিধা হচ্ছে এই যে, এক তালাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদ্দতের মধ্যে ভাল-মন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা ভাল মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী বিবাহমুক্ত হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভাল মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পন্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরও এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরী'আতও পছন্দ করে না। তবে এ দু'টি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতই রয়ে যায়। অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে উভয়পক্ষের ঐকমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাতছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে নবায়নের এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

তারা উভয়ে (স্ত্রী ও প্রথম স্বামী) মনে করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না[১]। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা, যা তিনি স্পষ্টভাবে এমন কওমের জন্য বর্ণনা করেন, যারা জানে।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ

২৩১. আর যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও অতঃপর তারা 'ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয়, তখন তোমরা হয় বিধি অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দেবে, অথবা বিধিমত মুক্ত করে দেবে[২]।

---

(১) এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। তা হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিছক নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে চক্রান্তমূলকভাবে কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং প্রথম থেকে তার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, বিয়ে করার পর সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এটা হবে একটি সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। এ ধরণের বিয়ে মোটেই হালাল বিয়ে বলে গণ্য হবে না। বরং এটি হবে নিছক একটি ব্যভিচার। আর এ ধরণের বিয়ে ও তালাকের মাধ্যমে কোন ক্রমেই তার সাবেক স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে না। আলী, ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, উকবা ইবনে 'আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমূখ সাহাবাগণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক যোগে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এভাবে তালাক দেয়া স্ত্রীদের যারা হালাল করে এবং যাদের মাধ্যমে হালাল করে তাদের উভয়ের উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৪৪৮, আবু দাউদঃ ২০৬২, তিরমিযীঃ ১১১৯, ১১২০]

(২) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তালাকের দু'টি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য এ আয়াতে দু'টি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন নেই, বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেয়াই যথেষ্ট। এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিল-মহব্বতের সাথে সংসার যাপন করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথায় স্ত্রীকে ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেবে, যাতে বিবাহ বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে যেন তালাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই বলা হয়েছে ﴿تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ﴾ এখানে تَسْرِيْحٌ -অর্থ

نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۫ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۳۱﴾

তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। যে তা করে, সে নিজের প্রতি যুলুম করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু করো না[১] এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও কিতাব এবং হেকমত যা তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তা স্মরণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

খুলে দেয়া বা ছেড়ে দেয়া। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেয়া বা অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। تَسْرِيْحٌ এর সাথে إِحْسَانٍ শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎ লোকের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কোন কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকেন। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

(১) এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আয়াতকে খেলা ও তামাশায় পরিণত করো না। অর্থাৎ বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় তাফসীর আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াত যুগে কোন কোন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাঁদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলত যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দিয়ে দেয়া বা মুক্তি দিয়ে দেয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। এতে ফয়সালা দেয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে, তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে নিয়্যতের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, হাসি তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে বিয়ে, দ্বিতীয়টি তালাক এবং তৃতীয়টি রাজ'আত বা তালাকের পর স্ত্রী ফিরিয়ে নেয়ার ঘোষণা'। [আবু দাউদঃ ২১৯৪, তিরমিযীঃ ১১৮৪, ইবনে মাজাহঃ ২০৩৯]

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

২৩২. আর তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের 'ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, এরপর তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়[১], তবে স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। এ দ্বারা তাকে উপদেশ দেয়া হয়[২] তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে, এটাই তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও

(১) এখানে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণতঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের সাথে করা হয়। তাদেরকে অন্য লোকের সাথে বিয়ে করতে বাধা দেয়া হয়। প্রথম স্বামীও তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। আবার কোন কোন পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশ্যে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্ত্রীর অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশতঃ উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধা সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমত শরী'আত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেয়া একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক, অথবা তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকেই হোক। কিন্তু শর্ত হচ্ছে "উভয়ে শরী'আতের নিয়মানুযায়ী রাযী হবে"। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে রাযী না হয়, তবে কোন এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। যদি উভয়ে রাযীও হয় আর তা শরী'আতের আইন মোতাবেক না হয়, যথা, বিয়ে না করেই উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে আরম্ভ করে, অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই পুনর্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই কোন নারী অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলিম তথা বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকের যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত তারা সবাই এমন কর্মকাণ্ডে বাধা দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য এসব আহ্কাম যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা এ আদেশ পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে।

পবিত্রতম[১]। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

২৩৩. আর জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্য পান করাবে[২], এটা সে ব্যক্তির জন্য, যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায়। পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের (মাতাদের) ভরণ-পোষণ করা[৩]। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কাজের

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ
بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا

(১) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা পাপ-মগ্নতা এবং ফেৎনা-ফাসাদের কারণ। কেননা, বয়ঃপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতী যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অপরদিকে তার পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশংকায় ফেলারই নামান্তর। তৃতীয়তঃ সে যদি এ বাধার ফলে কোন পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার সে পাপের অংশীদার তারাও হবে যারা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে।

(২) এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে তালাক সংক্রান্ত আদেশাবলীর আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদানসংক্রান্ত আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, সাধারণতঃ তালাকের পরে শিশুর লালন-পালন ও স্তন্যদান নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ আয়াতে এমন ন্যায় সঙ্গত নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে যা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। বিয়ে বহাল থাকাকালে স্তন্যদান ও দুধ ছাড়ানোর বিষয় উপস্থিত হোক অথবা তালাক দেয়ার পর, উভয় অবস্থাতেই এমন এক ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে, যাতে কোন ঝগড়া-বিবাদ বা কোন পক্ষের উপরই অন্যায় ও যুলুম হওয়ার পথ না থাকে। আয়াতের প্রথম বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ "মাতাগণ নিজেদের বাচ্চাদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যদান করাবে"। এখানে এটা স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু'বছর। যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা বাচ্চার অধিকার। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, এ দু'বছরের পর শিশুকে আর মাতৃস্তন্যের দুধ পান করানো চলবে না।

(৩) এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসেবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। [কুরতুবী]

فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

ভার দেয়া হয় না। কোন মাতাকে তার সন্তানের জন্য[১] এবং যার সন্তান (পিতা) তাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর উত্তরাধিকারীরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায়, তবে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই। আর যদি তোমরা (কোন ধাত্রী দ্বারা) তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য পান করাতে চাও, তাহলে যদি তোমরা প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিনিময় দিয়ে দাও তবে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষকারী।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

২৩৪. আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা (স্ত্রীগণ) নিজেরা চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে। অতঃপর যখন তারা তাদের 'ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক খবর রাখেন।

(১) এতে বোঝা যায় যে, মা যদি কোন অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের বা কোন জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

২৩৫. আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে (সে) নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দাও বা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ তবে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করবে; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের সাথে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না; এবং নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

২৩৬. যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা মোহর নির্ধারণ না করেই তালাক দাও তবে তোমাদের কোন অপরাধ নেই(১)। আর তোমরা তাদের কিছু সংস্থান করে দেবে, সচ্ছল তার সাধ্যমত এবং অসচ্ছল তার সামর্থ্যানুযায়ী, বিধিমত সংস্থান করবে, এটা মুহসিন লোকদের উপর কর্তব্য।

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ

২৩৭. আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দাও, অথচ

(১) অর্থাৎ এ অবস্থায় তালাক দেয়াতে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। যদিও এতে স্ত্রীদের মন ভাঙ্গা হয়ে যায়। এতে তাদের কিছুটা কষ্ট হয় এবং পরবর্তী জীবনের জন্য তাদের কিছুই থাকে না। এমতাবস্থায় তোমরা তাদেরকে কিছু উপভোগ্য জিনিস প্রদান করে সেটার সমাধান করতে পার। আয়াতের আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, এমতাবস্থায় তোমাদের উপর (মোহরের) কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَنْ يَّعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوْٓا أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٧﴾

তাদের জন্য মাহ্র ধার্য করে থাক, তাহলে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক[১], তবে যা স্ত্রীগণ অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে দেয়[২] এবং মাফ করে দেয়াই

(১) মাহ্র ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের চারটি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৩৬ ও ২৩৭ নং আয়াতে দু'টি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে, যদি মাহ্র ধার্য করা না হয়। দ্বিতীয়টি, মাহ্র ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা সহবাস হয়নি। তৃতীয়তঃ মাহ্র ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে। কুরআনুল কারীমের অন্য জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। চতুর্থতঃ মাহ্র ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মাহ্র পরিশোধ করতে হবে। এর বর্ণনাও অন্য এক আয়াতে এসেছে।

২৩৬ ও ২৩৭ নং আয়াতদ্বয়ে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে ২৩৬ নং আয়াতে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে,মাহ্র কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। অন্ততপক্ষে তাকে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেবে। কুরআনুল কারীম প্রকৃতপক্ষে এর কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য এ কথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী দেয়া উচিত, যাতে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান লোক এহেন ব্যাপারে কার্পণ্য করে না। হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এমনি এক ব্যাপারে দশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর কাজী শোরাইহ্ পাঁচশ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। দ্বিতীয় অবস্থায় হুকুম হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রীর মাহ্র বিয়ের সময় ধার্য করা হয়ে থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়, তবে ধার্যকৃত মাহ্রের অর্ধেক দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী তা ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মাহ্রই দিয়ে দেয়, তবে তা হচ্ছে তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার।

(২) "যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে"-এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলেমগণ দু'টি মতে বিভক্ত - (১) একদল আলেম বলেনঃ এখানে "যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে" বলতে স্ত্রীর অভিভাবককে বোঝানো হয়েছে। তাদের মতের সমর্থনে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এ তাফসীর বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এ মত একদিকে শক্তিশালী, অপরদিকে দূর্বল, শক্তিশালী হলো এদিক থেকে যে, ক্ষমা করাটা মূলতঃ স্ত্রীর অভিভাবকের পক্ষেই মানানসই। অপরদিকে দূর্বল হলো এ দিক থেকে যে, সত্যিকারভাবে বিয়ের বন্ধন স্বামীর হাতেই। স্ত্রীর অভিভাবকের এখানে কোন হাত নেই। (২) আরেক দল আলেম বলেনঃ এখানে যার হাতে বিয়ের বন্ধন বলতে স্বামীকে বোঝানো হয়েছে। তাদের মতের সমর্থনেও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ

তাকওয়ার নিকটতর। আর তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা সবিশেষ প্রত্যক্ষকারী।

২৩৮. তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে(১), বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের(২) এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা দাঁড়াবে বিনীতভাবে;

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطَىٰ ق وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

সনদে বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমসহ অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীনদের থেকে বর্ণনা এসেছে। [দারা কুতনী: ৩/২৭৯] এ মতও একদিক থেকে শক্তিশালী, অপরদিক থেকে দূর্বল। শক্তিশালী হলো এদিক থেকে যে, মূলতঃ যার হাতে বিয়ের বন্ধন, সে হলো স্বামী। আর দূর্বল হলো এদিক থেকে যে, যদি স্বামী উদ্দেশ্য হয় তবে ক্ষমা কিভাবে করা হবে? মাহ্‌র দেয়া তো তার উপর ওয়াজিব। সে কিভাবে ক্ষমা করতে পারে? তবে ইবন জারীর রাহিমাহুল্লাহ্ এ মতের সমর্থন করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে - ক) স্বামীর হাতেই মূলতঃ বিয়ের বন্ধন। স্ত্রীর অভিভাবকের হাতে নেই। খ) স্বামীর পক্ষ থেকে ক্ষমার অর্থ হলো এই যে, তারা পূর্বকালে পূর্ণ মাহ্‌র আদায় করেই বিয়ে করত, তারপর বিয়ে ভঙ্গ হলে স্বামী বাকী অর্ধেক মাহ্‌র ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখাতো।

(১) সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিষয় বর্ণনা করার পর সালাতের তাকীদ দিয়ে আল্লাহ্ এ ভাষণটির সমাপ্তি টানছেন। কারণ, সালাত এমন একটি জিনিষ যা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয়, সততা, সৎকর্মশীলতা ও পবিত্রতার আবেগ এবং আল্লাহ্‌র বিধানের আনুগত্যের ভাবধারা সৃষ্টি করে আর এ সঙ্গে তাকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। মানুষের মধ্যে এ বস্তুগুলো না থাকলে সে কখনো আল্লাহ্‌র বিধানের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারত না।

(২) কতিপয় হাদীসের প্রমাণ অনুসারে অধিকাংশ আলেমের মতে মধ্যবর্তী সালাতের অর্থ হচ্ছে আসরের সালাত। কেননা, এর একদিকে দিনের দু'টি সালাত - ফজর ও যোহর এবং অপরদিকে রাতের দু'টি সালাত - মাগরিব ও এশা রয়েছে। এ সালাতের জন্য তাকীদ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, অনেক লোকেরই এ সময় কাজকর্মের ব্যস্ততা থাকে। আসরের সালাতের গুরুত্ব বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যার আসরের সালাত ছুটে গেল তার যেন পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ সবই ধ্বংস হয়ে গেল'। [বুখারীঃ ৫৫২] আর হাদীসে 'কানেতীন' বা 'বিনীতভাবে' বাক্যটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে নীরবতার সাথে। [বুখারীঃ ১২০০]

২৩৯. অতঃপর যদি তোমরা বিপদাশংকা কর, তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে[১]। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

২৪০. আর তোমাদের মধ্যে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রী রেখে যাবে, তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে ঘর থেকে বের না করে তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণের অসিয়াত করে[২]। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

(১) সালেহ্ বিন খাওয়াত ঐ ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে 'যাতুর রিকা'র যুদ্ধে সালাতুল খাওফ বা ভীতির সালাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ (সাহাবাগণের) একদল সালাত আদায়ের জন্য তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সাথে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং আরেক দল শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকলেন। তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমোক্ত দলের সাথে এক রাকা'আত সালাত আদায় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মোক্তাদীগণ একা একা দ্বিতীয় রাকা'আত পড়ে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। এবার অপর দলটি এসে দাঁড়ালে তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে সাথে নিয়ে অবশিষ্ট (এক) রাকা'আত আদায় করে বসে থাকলেন। (দ্বিতীয় দলের) মুক্তাদীগণ নিজে নিজে দ্বিতীয় রাকা'আত শেষ করে বসলে তিনি তাদেরকে সংগে নিয়ে সালাম ফিরালেন। [বুখারীঃ ৪১২৯]

(২) স্বামীর মৃত্যুর দরুন স্ত্রীর ইদ্দতকাল ছিল এক বছর। কিন্তু পরবর্তীতে এ সূরার ২৩৪ নং আয়াতের মাধ্যমে বছরের স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় জানা আবশ্যক যে, এ আয়াতটি এ সূরার ২৩৪ নং আয়াতের পূর্বে নাযিল হয়েছিল।

২৪১. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের প্রথামত ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য[১] ।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

২৪২. এভাবে আল্লাহ্‌ তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার ।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾

২৪৩. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল[২]?

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۪ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ۟ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ؕ اِنَّ

(১) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জন্য 'মাতা'' বা সংস্থান করে দেয়ার কথা এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এসেছে। তবে তা ছিল শুধু দু'রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য। সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেয়া হয়েছে। বাকী রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যাদের সাথে স্বামী নির্জনবাস কিংবা সহবাস করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মাহ্‌র ধার্য করা হয়েছে, তাদের 'মাতা'' বা সংস্থান করে দেয়ার এক অর্থ, তার ধার্যকৃত পূর্ণ মাহ্‌র দিয়ে দেয়া। আর যার মাহ্‌র ধার্য করা হয়নি, তার জন্য মাহরে-মিসাল দেয়া। আর যদি 'মাতা' শব্দের দ্বারা 'বিশেষ ফায়দা' বলতে কিছু কাপড় বা আর্থিক দান বোঝানো হয়, তবে একজনকে তা দেয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ প্রথমোক্ত মহিলা যার সাথে স্বামীর সহবাসও হয়নি আর তার মাহ্‌রও নির্ধারিত হয়নি। আর অন্যান্যদের বেলায় তা মুস্তাহাব। আর যদি 'মাতা'' শব্দের দ্বারা খোর-পোষ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত করতে হয়, তাতে ইদ্দত পর্যন্ত তা দেয়া ওয়াজিব। তালাকে-রাজ'য়ীই হোক আর তালাকে বায়েনই হোক, ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, কোন এক শহরে ইসরাঈল-বংশধরের কিছু লোক বাস করত। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের কাছে দু'জন ফেরেশ্‌তা পাঠালেন তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করানোর জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না। ফেরেশ্‌তা দু'জন ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে মরে গেল। দীর্ঘকাল পর ইসরাঈল-বংশধরদের একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বন্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাকে মৃত লোকদের সমস্ত ঘটনা

اللهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾

অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা মরে যাও'। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না[১]।

অবগত করানো হল। তখন তিনি দো'আ করলেন এবং আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। [ইবনে কাসীর]

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীকে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কেয়ামত অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা তা জিহাদ হোক বা প্লেগ মহামারীই হোক, আল্লাহ্ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তি বা তাকদীরের প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মূহুর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ।

(১) এ আয়াত কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্র নির্ধারিত তাকদীরের উপর কোন তদবীর কার্যকর হতে পারে না। জিহাদ বা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার কোন ব্যতিক্রম হওয়ার নয়। দ্বিতীয়তঃ কোনখানে কোন মহামারী কিংবা কোন মারাত্মক রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়া বৈধও নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ মোতাবেক অন্য এলাকার লোকের পক্ষেও মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া বৈধ নয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'সে রোগের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের উপর আযাব নাযিল করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোন শহরে প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি কোন এলাকাতে এ রোগ দেখা দেয় এবং তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না'। [বুখারীঃ ৩৪৭৩, মুসলিমঃ ২২১৮] ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, 'কোথাও যাওয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে না, আবার কোনখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নয়'। এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূণ।

প্রথমতঃ মহামারীগ্রস্ত এলাকার বাইরের লোককে আসতে নিষেধ করার একটি

তাৎপর্য এই যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার পর তার হায়াত শেষ হওয়ার দরুনই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করল; এতদসত্ত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, সেখানে না গেলে হয়ত সে মারা যেত না। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও হয়ত এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হত না। অথচ যা ঘটেছে তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। যেখানেই থাকত, তার মৃত্যু এ সময়েই হত। এ আদেশের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে। যাতে করে তারা কোন ভুল বোঝাবুঝির শিকার না হয়।

দ্বিতীয়তঃ এতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে কষ্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশংকা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়; বরং সাধ্যমত ঐসব বস্তু থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া নিজের জানের হেফাযত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়মের চাহিদাও তাই যে, আল্লাহ্র দেয়া তাকদীরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেসব স্থানে প্রাণ নাশের আশংকা থাকে, সেসব স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার সতর্কতামূলক তদবীর। এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করার মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিতঃ একটি হচ্ছে এই যে, যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে থাকে, তবে সাধারণভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল তারা তো সহজেই পালাতে পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের কি অবস্থা হবে? আর যারা রোগাক্রান্ত, তাদের সেবা-শুশ্রূষা কিংবা মরে গেলে দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে? দ্বিতীয়তঃ যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়ত রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়ী-ঘর থেকে বের হয়ে থাকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরও বেড়ে যাবে। কারণ প্রবাস জীবনে রোগাক্রান্ত হলে যে কি অবস্থা তা সবারই জানা। তৃতীয়তঃ যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া করে থাকে, তবে তা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করে পড়ে থাকে, তবে হয়ত নাজাত পেতে পারে। আর যদি এ রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্যে থাকে, তবে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বনের বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্লেগ মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, 'এ রোগটি আসলে শাস্তিরূপে নাযিল হয়েছিল এবং যে জাতিকে শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য হত তাদের ভেতর পাঠানো হত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র যেসব বান্দা এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়া সত্বেও নিজ এলাকায়ই ধৈর্য সহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ্

২৪৪. আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

২৪৫. কে সে, যে আল্লাহ্‌কে কর্‌যে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন[১]। আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

২৪৬. আপনি কি মূসার পরবর্তী ইস্‌রাঈল-বংশীয় নেতাদের দেখেননি? তারা যখন তাদের নবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি', তিনি বললেন, 'এমন

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ
مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ

তা'আলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মত সওয়াব পাবে'। [বুখারীঃ ৫৭৩৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীঃ 'প্লেগ শাহাদাত এবং প্লেগ আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ'। [বুখারীঃ ৫৭৩২] এর ব্যাখ্যাও তাই। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

(১) কর্জ বা ঋণ দান করলে তার বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, 'যে ব্যক্তি তার উত্তম সম্পদ থেকে খেজুর সমপরিমাণ সদকা করবে, আল্লাহ্ উত্তম সম্পদ ছাড়া কবূল করেন না, আল্লাহ্ সে সম্পদ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর সদকাকারীর জন্য তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন, যেমনি তোমাদের কেউ তার ঘোড়া শাবককে লালন-পালন করে পাহাড়সম বড় হওয়া পর্যন্ত। [বুখারীঃ ১৪১০] আল্লাহ্‌কে ঋণ দেয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেয়ারও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'কোন একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে দু'বার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহ্‌র পথে সে পরিমাণ সম্পদ একবার সদ্‌কা করার সমতুল্য'। [ইবনে মাজাহ্ঃ ২৪৩০] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার (ঋণের) হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে'। তবে, যদি অতিরিক্ত দেয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে'। [বুখারীঃ ২৬০৬]

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলে তখন আর তোমরা যুদ্ধ করবে না'? তারা বলল, 'আমরা যখন নিজেদের আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি হতে বহিস্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহ্‌র পথে কেন যুদ্ধ করবো না'? অতঃপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো তখন তাদের কিছু সংখ্যক ছাড়া সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল । আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞানী ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

২৪৭. আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের রাজা করে পাঠিয়েছেন' । তারা বলল, 'আমাদের উপর তার রাজত্ব কিভাবে হবে, অথচ আমরা তার চেয়ে রাজত্বের বেশী হকদার এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্যও দেয়া হয়নি!' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন' । আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে স্বীয় রাজত্ব দান করেন । আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী-প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

২৪৮. আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত[১] আসবে

(১) বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল, তা বংশানুক্রমে চলে আসছিল । তাতে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ও অন্যান্য নবীগণের পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ বস্তুসামগ্রী রক্ষিত ছিল । বনী ইসরাঈলরা যুদ্ধের সময় এ সিন্দুকটিকে সামনে রাখত, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করতেন । জালূত ইসরাঈল-বংশধরদেরকে

اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۭ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٤٨﴾

যাতে তোমাদের রব-এর নিকট হতে প্রশান্তি এবং মুসা ও হারূন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে নিশ্চয় তোমাদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে'।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ
مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ
وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢ بِيَدِهٖ ۚ
فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۭ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ
وَجُنُوْدِهٖ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ
مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِاِذْنِ
اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾

২৪৯. তারপর তালূত যখন সেনাবাহিনীসহ বের হলো তখন সে বলল, 'আল্লাহ্ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে তা থেকে পানি পান করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়; আর যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত; এছাড়া যে তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও'। অতঃপর অল্প সংখ্যক ছাড়া তারা তা থেকে পানি পান করল(১)। সে এবং তার সংগী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করল তখন তারা

পরাজিত করে এ সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, কাফেররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে দু'টি গরুর উপর সেটি উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। ফেরেশ্তাগণ গরুগুলোকে তাড়া করে এনে তালুতের দরজায় পৌঁছে দিলেন। ইসরাঈল-বংশধররা এ নিদর্শন দেখে তালুতের রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করল এবং তালুত জালুতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। [তাফসীরে বাগভী: ১/২৩০, আল-মুহাররারুল ওয়াজীয: ১/৩৩৩]

(১) কোন কোন তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে তিন ধরণের লোক ছিল। একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা করেছে এবং তৃতীয় দল ছিল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যালঘিষ্ঠতার কথাও চিন্তা করেননি। [মা'আরিফুল কুরআন]

বলল, ‘জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত হবে তারা বলল, ‘আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে’! আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾

২৫০. আর তারা যখন যুদ্ধার্থে জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হলো তখন তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন, আমাদের পা অবিচলিত রাখুন এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন’।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ۫ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ
اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ
اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾

২৫১. অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে (কাফেরদেরকে) পরাভূত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলেন। আর আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও হেকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছে করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আর আল্লাহ্ যদি মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহশীল।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ
وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

২৫২. এ সব আল্লাহর আয়াত, আমরা আপনার নিকট তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করছি। আর নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ۗ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢٥٣﴾

২৫৩. সে রাসূলগণ, আমরা তাদের কাউকে অপর কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন[১], আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আর মার্‌ইয়াম-পুত্র ‘ঈসাকে আমরা স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রদান করেছি ও রুহুল কুদুস দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদের পরবর্তীরা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি সমাগত হওয়ার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না; কিন্তু তারা মতভেদ করলো। ফলে তাদের কেউ কেউ ঈমান আনলো এবং কেউ কেউ কুফরী করল। আর

(১) ‘কথা বলা’ আল্লাহ্ তা‘আলার একটি গুণ। তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা শ্রুত বাক্য দ্বারা কথা বলেন। কথা বলার এ গুণটির উপর কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বহু দলীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ “এবং মূসার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছিলেন”। [সূরা আন্-নিসাঃ ১৬৪] আল্লাহ্ আরও বলেনঃ “আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন, তখন মূসা বললেনঃ হে আমার রব! আমাকে দর্শন দান করুন, আমি আপনাকে দেখব”। [সূরা আল-আ‘রাফঃ ১৪৩] আর সুন্নাহ্ হতে দলীল হলো, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘আদম ও মূসা বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন। মূসা আদমকে বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আমাদেরকে নিরাশ করে আপনি আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন। আদম তাকে বললেন, হে মূসা! আল্লাহ্ আপনাকে কথপোকথন দ্বারা নির্বাচিত করেছেন এবং নিজ হস্তে আপনাকে তাওরাত লিখে দিয়েছেন......। [বুখারীঃ ৬৬১৪, মুসলিমঃ ২৬৫২] তবে মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে আল্লাহ্ তা‘আলা ফেরেশ্‌তাদের মাধ্যম ব্যতীত কথা বললেও তা অন্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা, সূরা শুরার ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ﴾ (কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়) আয়াতে অন্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে কথা বলার বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর পর কোন রকম অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হবে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই সূরা আশ্-শুরার সে আয়াতটি দুনিয়ার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না; কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা করেন ।

২৫৪. হে মুমিনগণ! আমরা যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না, আর কাফেররাই যালিম ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

২৫৫. আল্লাহ্[১], তিনি ছাড়া কোন সত্য

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ

(১) এ আয়াতটিকে আয়াতুল কুরসী বলা হয়। এটি মর্যাদার দিক থেকে কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা‘বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা‘ব আরয করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সমর্থন করে বললেন, হে আবুল মুনযির! জ্ঞান তোমার জন্য সহজ হোক’। [মুসলিমঃ ৮১০] রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ‘যে লোক প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল-কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না’। [নাসায়ী, দিন-রাতের আমলঃ ১০০] অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতের ফলাফল এবং আরাম আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে। অনেকেই এ সূরার আয়াতুল কুর্সীতে “ইসমে ‘আযম” আছে বলে মত দিয়েছেন।

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ তাৎপর্যঃ এ আয়াতে মহান রব আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর একক অস্তিত্ব, তাওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাক্শক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম-অনন্ত কাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃংখলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যাতে কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে না পারে। এই হচ্ছে

وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

ইলাহ্‌ নেই[১]। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক[২]। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়[৩]।

আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেনঃ এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে। প্রতিটি বাক্যের সাথেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা রয়েছে।

(১) প্রথম বাক্য ﴿اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ এতে 'আল্লাহ্‌' শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। ﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা 'ইবাদাতের যোগ্য। মহান আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন সত্তা-ই ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নয়। তিনিই একমাত্র হক মা'বুদ। আর সবই বাতিল উপাস্য।

(২) দ্বিতীয় বাক্য ﴿اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ আরবী ভাষায় حَيٌّ অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহ্‌র নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছে যে, তিনি সর্বদা জীবিত; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। قَيُّوْم শব্দ কেয়াম থেকে উৎপন্ন, এটা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকেও বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। 'কাইয়্যূম' আল্লাহ্‌র এমন এক বিশেষ গুণবাচক নাম যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়ীত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়ীত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোন মানুষকে 'কাইয়্যূম' বলা জায়েয নয়। যারা 'আব্‌দুল কাইয়্যূম' নামকে বিকৃত করে শুধু 'কাইয়্যূম' বলে, তারা গোনাহ্‌গার হবে। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র এমন আরও কিছু নাম আছে, যেগুলো কোন বান্দাহ্‌র বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন, রাহ্‌মান, মান্নান, দাইয়্যান, ওয়াহ্‌হাব এ জাতীয় নামের ব্যাপারেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য। আল্লাহ্‌র নামের মধ্যে ﴿اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ অনেকের মতে 'ইসমে-আযম'।

(৩) তৃতীয় বাক্য ﴿لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ﴾ আরবীতে سِنَةٌ শব্দের সীন-এর كسرة দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। نوم পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে 'কাইয়্যূম' শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা। সমস্ত সৃষ্টিরাজি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়ত ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করেছেন, তাঁর কোন সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌কে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মত মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিরও কোন কারণ নেই।

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ
وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর(১)। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে(২)? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন(৩)। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুকেই তারা

আর তাঁর সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

(১) চতুর্থ বাক্য ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত لام অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

(২) পঞ্চম বাক্য ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ অর্থ হচ্ছে, এমন কে আছে যে, তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত? এতে বুঝা যায় যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তাঁর চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারত যে, কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে, তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহ্‌র কিছু খাস বান্দা আছেন, যারা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সুপারিশ করব'। [মুসলিমঃ ১৯৩] একে 'মাকামে-মাহ্‌মুদ' বলা হয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাস। অন্য কারো জন্য নয়।

(৩) ষষ্ঠ বাক্য ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ - অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অগ্র-পশ্চাত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্র-পশ্চাত বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বের ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাত বলতে বোঝানো হয়েছে যা অপ্রকাশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের উপরই পরিব্যপ্ত। সুতরাং এ দু'টিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয়দিকই বোঝানো হয়।

পরিবেষ্টন করতে পারে না[১]। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে[২]; আর এ দু'টোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না[৩]। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান[৪]।

২৫৬. দ্বীনগ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই[৫]; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ

---

(১) সপ্তম বাক্য ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ অর্থাৎ মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতাভুক্ত, এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

(২) অষ্টম বাক্য ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ অর্থাৎ তাঁর কুরসী এত বড় যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমীন পরিবেষ্টিত রয়েছে। হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ইবনে কাসীর আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, 'তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কছম, কুরসীর সাথে সাত আসমানের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। আর কুরসীর উপর আরশের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন আংটির বিপরীতে বিরাট ময়দানের শ্রেষ্ঠত্ব'। [ইবন হিব্বান: ৩৬১; বায়হাকী: ৪০৫]

(৩) নবম বাক্য ﴿وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে এ দু'টি বৃহৎ সৃষ্টি, আসমান ও যমীনের হেফাজত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

(৪) দশম বাক্য ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ﴾ অর্থাৎ তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্বের নয়টি বাক্যে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত, বড়ত্ব ও মহত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(৫) কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, দ্বীন গ্রহণে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ দ্বীন ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেয়া হয়েছে? একটু গভীরভাবে

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ

থেকে। অতএব, যে তাগূতকে[১] অস্বীকার

লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ, ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেয়া হয়নি। যদি তাই হত, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফেরদেরকে নিজ দায়িত্বে আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধ ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফেররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ "তারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ফাসাদকারীদেরকে পছন্দ করেন না"। [সূরা আল-মায়িদাহঃ ৬৪] এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে মতে জিহাদের মাধ্যমে অনাচারী যালেমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করারই সমতুল্য। ইসলাম জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনিভাবে সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিযিয়া কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে। ইসলামের এ কার্যপদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জিহাদ ও যুদ্ধের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায় অনাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ-যুদ্ধের নির্দেশ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ আয়াতের পরিপন্থী নয়। আবার কোন কোন নামধারী মুসলিম ইসলামের হুকুম-আহ্‌কাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাদেরকে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা - "দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই" -এ অংশটুকু বলে। তারা জানে না যে, এ আয়াত দ্বারা যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি শুধু তাদেরকে জোর করে ইসলামে আনা যাবে না বলা হয়েছে। কিন্তু যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবী করে, তারা ইসলামের প্রতিটি আইন ও যাবতীয় হুকুম-আহ্‌কাম মানতে বাধ্য। সেখানে শুধু জোর-যবরদস্তি নয়, উপরন্তু শরী'আত না মানার শাস্তিও ইসলামে নির্ধারিত। এমনকি তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে দ্বীনের যাবতীয় আইন মানতে বাধ্য করানো অন্যান্য মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। যেমনটি সিদ্দীকে আকবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

(১) 'তাগূত' শব্দটি আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী বা নির্ধারিত সীমা অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় তাগূত বলা হয়ে থাকে এমন প্রত্যেক 'ইবাদাতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তাকে, যার ব্যাপারে 'ইবাদাতকারী বা অনুসরণকারী অথবা আনুগত্যকারী তার বৈধ সীমা অতিক্রম করেছে আর 'ইবাদাতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তা তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছে বা সেদিকে আহ্বান করেছে। [ইবনুল কাইয়্যেমঃ ই'লামুল মু'আক্কে'য়ীন] সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, তাগূত এমন বান্দাকে

বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভূ ও ইলাহ্ হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে।

আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় বান্দার প্রভূত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বান্দা নীতিগতভাবে তাঁর শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু কার্যত তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় 'ফাসেকী'। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে আল্লাহ্‌র শাসন-কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় 'কুফরী ও শির্ক'। তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভূর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এ শেষ পর্যায়ে যে বান্দা পৌঁছে যায়, তাকেই বলা হয় তাগূত।

এ ধরণের তাগূত অনেক রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ তাগূত ওলামায়ে কেরাম পাঁচ প্রকার উল্লেখ করেছেন। (এক) শয়তান, সে হচ্ছে সকল প্রকার তাগূতের সর্দার। যেহেতু সে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত থেকে বিরত রেখে তার 'ইবাদাতের দিকে আহ্বান করতে থাকে, সেহেতু সে বড় তাগূত। (দুই) যে গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে বলে দাবী করে বা অদৃশ্যের সংবাদ মানুষের সামনে পেশ করে থাকে। যেমন, গণক, জ্যোতিষী প্রমূখ। (তিন) যে আল্লাহ্‌র বিধানে বিচার ফয়সালা না করে মানব রচিত বিধানে বিচার-ফয়সালা করাকে আল্লাহ্‌র বিধানের সমপর্যায়ের অথবা আল্লাহ্‌র বিধানের চেয়ে উত্তম মনে করে থাকে। অথবা আল্লাহ্‌র বিধানকে পরিবর্তন করে বা মানুষের জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করাকে নিজের জন্য বৈধ মনে করে। (চার) যার 'ইবাদাত করা হয় আর সে তাতে সন্তুষ্ট। (পাঁচ) যে মানুষদেরকে নিজের 'ইবাদাতের দিকে আহ্বান করে থাকে। উপরোক্ত আলোচনায় পাঁচ প্রকার তাগূতের পরিচয় তুলে ধরা হলেও তাগূত আরও অনেক রয়েছে। [কিতাবুত তাওহীদ]

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত নীতিমালার আলোকে আমরা সকল প্রকার তাগূতের পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হব। (১) আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যত তথা প্রভূত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যের দাবী করা। (২) আল্লাহ্‌র উলুহিয়্যাত বা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করা। এ হিসেবে আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য যেমন, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, জীবিতকরণঃ, মৃত্যুদান, বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকরণঃ, হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন ইত্যাদিকে যে ব্যক্তি নিজের জন্য দাবী করবে সে তাগূত। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌কে 'ইবাদাত করার যত পদ্ধতি আছে যে ব্যক্তি সেগুলো তার নিজের জন্য চাইবে সেও তাগূত। এর আওতায় পড়বে ঐ সমস্ত লোকগুলো যারা নিজেদেরকে সিজদা করার জন্য মানুষকে আহ্বান করে। নিজেদের জন্য মানত, যবেহ্, সালাত, সাওম, হজ ইত্যাদির আহ্বান জানায়।

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

করবে[১] ও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাঙ্গবে না[২]। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ
يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

২৫৭. আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা ঈমান আনে, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে তাগূত তাদের অভিভাবক, এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়[৩]। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ
آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي

২৫৮. আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেননি, যে ইব্‌রাহীমের সাথে তাঁর রব সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্

(১) তাগূতকে অস্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, তাগূত নেই বলে বিশ্বাস পোষণ করা। বরং তাগূতকে অস্বীকার করা বলতে বুঝায় আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত ছাড়া অন্য কারো জন্য 'ইবাদাত সাব্যস্ত না করা এবং এ বিশ্বাস করা যে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত ছাড়া সকল প্রকার 'ইবাদাতই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। আর যারা আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যে কোন কিছু তাদের জন্য দাবী করে থাকে তাদেরকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং এ বিশ্বাস করা যে তাদের এ ধরণের কোন ক্ষমতা নেই।

(২) ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সে জন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে কোন শক্ত দড়ির বেষ্টনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এমন দড়ি ছিঁড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিঁড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার।

(৩) এখানে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত এবং কুফর সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য। এতদসঙ্গে কাফের বা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এরা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নেয়।

يُحْيِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِ وَأُمِيتُ قَالَ
إِبْرٰهِمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ۝٢٥٨

তাকে রাজত্ব[১] দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বললেন, ‘ আমার রব তিনিই যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান’, সে বলল, ‘আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই’। ইব্রাহীম বললেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো[২]। তারপর যে কুফরী করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى
عُرُوشِهَا قَالَ أَنّٰى يُحْيِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ
كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلٰى

২৫৯. অথবা সে ব্যক্তির মত, যে এমন এক জনপদ অতিক্রম করছিল যা তার ছাদের উপর থেকে বিধ্বস্ত ছিল। সে বলল, ‘মৃত্যুর পর কিভাবে আল্লাহ্ একে জীবিত করবেন?’ তারপর আল্লাহ্ তাকে এক শত বছর মৃত

(১) এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, যখন আল্লাহ্ তা‘আলা কোন কাফের ব্যক্তিকে দুনিয়াতে মান-সম্মান এবং রাজত্ব দান করেন, তখন তাকে সে নামে অভিহিত করা জায়েয। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজন বোধে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করাও জায়েয, যাতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

(২) কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, সে হয়ত বলতে পারত যে, যদি আল্লাহ্ বলে কেউ থাকেন, তবে তিনিই পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত করুন! এর উত্তর হচ্ছে এই যে, তার অন্তরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একথা জেগে উঠল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আছেন এবং পূর্বদিক হতে সূর্য উদয় করা তাঁর কাজ এবং তিনি পশ্চিম দিক হতেও উদয় করতে পারেন। আর এ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে অবশ্যই এমন হবে। আর এমন হলে বিশ্বময় এক বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাতে না আবার লাভের পরিবর্তে ক্ষতি বেড়ে যায়। যেমন, মানুষ এ মু‘জিযা দেখে যদি আমার দিক থেকে ফিরে তার দিকে ঝুঁকে যায়। সামান্য বাড়াবাড়িতে না আবার রাজত্বই চলে যায়। কাজেই সে উত্তরই দেয় নি। অথবা তার কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তরই ছিল না। এ জন্য সে হতভম্ব হয়ে পড়ে। [বয়ানুল কুরআন]

طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ إِلَىٰ
حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ
إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۙ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

রাখলেন। পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি কতকাল অবস্থান করলে?' সে বলল, 'একদিন বা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি'। তিনি বললেন, বরং তুমি এক শত বছর অবস্থান করেছ। সুতরাং তুমি তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য কর, সেগুলো অবিকৃত রয়েছে এবং লক্ষ্য কর তোমার গাধাটির দিকে। আর যাতে আমরা তোমাকে বানাবো মানুষের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। আর অস্থিগুলোর দিকে লক্ষ্য কর; কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই'। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হলো তখন সে বলল, 'আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান'।

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَىٰ ۖ
قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ
قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ
اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ
يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

২৬০. আর যখন ইব্রাহীম বলল, 'হে আমার রব! কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন আমাকে দেখান', তিনি বললেন, 'তবে কি আপনি ঈমান আনেন নি?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই হ্যাঁ, কিন্তু আমার মন যাতে প্রশান্ত হয়[১]!'

---

(১) আয়াতে বর্ণিত কাহিনীর সার-সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আরয করলেনঃ আপনি কিভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করলেনঃ 'এরূপ আকাংখা ব্যক্ত করার কারণ কি? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি আপনার আস্থা নেই?' ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম নিজের আস্থা বিবৃত করে নিবেদন করলেনঃ আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা, আপনার সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে

আল্লাহ্ বললেন, 'তবে চারটি পাখি নিন এবং তাদেরকে আপনার বশীভূত করুন। তারপর সেগুলোর টুকরো অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন করুন। তারপর সেগুলোকে ডাকুন, সেগুলো আপনার নিকট দৌড়ে আসবে। আর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[১]।

এ বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানব প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে; এটা কি করে হবে, না জানি এর প্রক্রিয়াটা কেমন? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম এরূপ নিবেদন করেছিলেন, যাতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিতকরণঃ সংক্রান্ত চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অধিকন্তু মনে যাতে স্থিরতা আসে; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রার্থনা কবূল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্য একটি অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালামকে চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেয়া হল, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্রই হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনি যেন সেগুলোকে ভালভাবে চিনতেও পারেন। পরে নির্দেশ হল, পাখীগুলোকে জবাই করে এগুলোর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদির সবগুলোকেই কিমায় পরিণত করুন, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজের পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক-একটি ভাগ রেখে দিন। তারপর এদেরকে ডাকুন। তখন এগুলো আল্লাহ্‌র কুদরতে জীবিত হয়ে উড়ে আপনার কাছে চলে আসবে। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তা-ই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশ্ত, রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তার কাছে উড়ে এসে উপস্থিত হল। [তাফসীরে কুরতুবী: ৪/৩১৪]

(১) পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে; আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ্ তা'আলার

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা। আর আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ্‌ সর্বব্যাপী-প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ(১)।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

২৬২. যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে(২) তারপর যা ব্যয় করে তা বলে

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ

পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ না করানোর মধ্যে ‘ঈমান বিল-গায়েব’ বা গায়েবের উপর ঈমান স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

(১) ২৬২ থেকে ২৮৩ পর্যন্ত মোট ২১টি আয়াত। এগুলোতে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ ও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এসব নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্ব যেসব অর্থনৈতিক সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেগুলোর সমাধান আপনা-আপনিই বের হয়ে আসবে। আজ কোথাও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কোথাও এর জবাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত রয়েছে। এসব নীতির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে গোটা বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তপ্ত লাভায় পরিপূর্ণ হয়ে অগ্নিগিরির রূপ ধারণ করেছে। এসব আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণিত হয়েছে। এটি দু'ভাগে বিভক্ত, এক. প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অভাবগ্রস্ত, দীন-দুঃখীদের জন্য ব্যয় করার শিক্ষা, যাকে সাদাকাহ বলা হয়। দুই. সুদের লেন-দেনকে হারাম করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ। প্রথমে দান-সাদাকাহ্‌র ফযীলত, সেদিকে উৎসাহ দান এবং সে সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে সবশেষে সুদভিত্তিক কারবারের অবৈধতা, নিষেধাজ্ঞা এবং ঋণদানের বৈধ পন্থার বর্ণনা রয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষেপিত]

(২) আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করাকে কুরআনুল কারীম কোথাও إِنْفَاق শব্দে, কোথাও إِطْعَام শব্দে, কোথাও صَدَقَة শব্দে এবং কোথাও إِيْتَاءُ الزَّكَاة শব্দে ব্যক্ত করেছে। কুরআনের এসব শব্দ এবং বিভিন্ন স্থানে এগুলোর ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, إِطْعَام – إِنْفَاق – صَدَقَة প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার দান-সদকা ও ব্যয়কেই বোঝায়; তা ফরয, ওয়াজিব কিংবা নফল, মুস্তাহাব যাই হোক। ফরয যাকাত বোঝাবার জন্য কুরআন একটি স্বতন্ত্র শব্দ إيتاء الزكوة ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিশেষ সদকাটি আদায় করা ও ব্যয় করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে বেশীর ভাগ إِنْفَاق শব্দ এবং কোথাও صَدَقَة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর

لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

বেড়ায় না এবং কোন প্রকার কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রব-এর নিকট। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

২৬৩. যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম। আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى ۙ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۖ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

২৬৪. হে মুমিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না[১] যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না। ফলে তার উপমা হলো এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর কিছু মাটি থাকে, তারপর প্রবল বৃষ্টিপাত সেটাকে পরিস্কার করে রেখে দেয়[২]। যা তারা

অর্থ এই যে, এখানে সাধারণ দান-সদকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এ আয়াতে সদকা কবূল হওয়ার দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং (২) গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

(২) এ উপমায় প্রবল বর্ষণ বলতে দান-সদকাকে এবং পাথরখণ্ড বলতে যে নিয়্যত ও প্রেরণার গলদসহ দান-সদকা করা হয়েছে, তাকে বুঝানো হয়েছে। মাটির আস্তর বলতে সৎকর্মের বাইরের কাঠামোটি বুঝানো হয়েছে, যার নীচে লুকিয়ে আছে নিয়্যতের গলদ। এ বিশ্লেষণের পর দৃষ্টান্তটি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি স্বাভাবিকভাবেই সরস ও সতেজ হয় এবং তাতে চারা জন্মায়। কিন্তু যে মাটিতে সরসতা সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ যদি হয় নামমাত্র এবং তা কেবল উপরিভাগেই লেপ্টে থাকে আর তার তলায় থাকে মসৃণ পাথর, তাহলে বৃষ্টির পানি এক্ষেত্রে তার জন্য লাভবান হওয়ার পরিবর্তে বরং ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে দান-সদকা

উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগানোর ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ্‌ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না[১]।

২৬৫. আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে সেথায় ফলমূল জন্মে দ্বিগুন। আর যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তা যথার্থ প্রত্যক্ষকারী[২]।

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

যদিও সৎকর্মকে বিকশিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু তা লাভজনক হবার জন্য সদুদ্দেশ্য, সৎসংকল্প ও সৎনিয়্যতের শর্ত আরোপিত হয়েছে। নিয়্যত সৎ না হলে যত অধিক পরিমাণেই দান করা হোক না কেন তা নিছক অর্থ ও সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

(১) এখানে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা কৃতঘ্ন-কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার হিদায়াত ও আয়াত সব মানুষের জন্যই প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে তাওফীক তথা সৎকাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোন হেদায়াত কবূল করতে পারে না।

(২) এ আয়াতে গ্রহণযোগ্য দান-সদকার একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। যারা স্বীয় ধন-সম্পদকে মনের দৃঢ়তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ কোন টিলায় অবস্থিত বাগানের মত। প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও হালকা বারিবর্ষণই যার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খুবই পরিজ্ঞাত। এ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়্যত ও উপরোক্ত শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলত অনেক। সৎনিয়্যত ও আন্তরিকতার সাথে অল্প ব্যয় করলেও তা যথেষ্ট এবং আখেরাতের সাফল্যের কারণ।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

২৬৬. তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকবে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত থাকবে এবং যেটাতে তার জন্য সবরকমের ফলমূল থাকবে। আর সে ব্যক্তিকে বার্ধক্য অবস্থা পেয়ে বসবে এবং তার কিছু দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকবে, তারপর তার (এ বাগানের) উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয়ে তা জ্বলে যাবে? এভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার(১)।

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি যে, তার একটি আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হবে, বাগানের নীচ দিয়ে পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব রকম ফল থাকবে, সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলে-সন্তানও বর্তমান থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে দাবানল আঘাত হানবে এবং বাগানটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে তোমাদের জন্য নযীর বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

এ উদাহরণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যোগ করা হয়েছে; অর্থাৎ সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তার সন্তান-সন্ততিও আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক; ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কারো বাগান ও শষ্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশা করতে পারে, কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমাত্র লোকের ভরণ-পোষণ, কষ্টে-সৃষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মত বলিষ্ঠ যুবক ও সৎসন্তান-সন্ততি থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার দরুন তেমন বেশী চিন্তা ও ব্যথার কারণ নেই। কেননা, সে সন্তান-সন্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত। বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম। মোটকথা এ তিনটি শর্তেই মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্য যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করল, বাগান তৈরী হয়ে ফলও দিতে লাগল, এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। তার সন্তান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক ও দুর্বল। এহেন মুহূর্তে যদি তৈরী-বাগান জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই

২৬৭. হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর[১] এবং আমরা যা যমীন থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি[২] তা

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ

কথা। একদিন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা কি জান এই আয়াতটি কি বিষয়ে নাযিল হয়েছে -"তোমাদের কেউ কি পছন্দ কর যে, তার একটি বাগান হবে"। [সূরা আল-বাকারাঃ ২৬৬] এ কথা শুনে তারা বললেনঃ আল্লাহ্ই সবচাইতে ভাল জানেন। এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রেগে গিয়ে বললেনঃ বরং (পরিস্কার করে) জানি অথবা জানিনা বলুন। তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বললেনঃ হে আমীরুল মুমিনীন! এ ব্যাপারে আমার মনে একটি কথা জাগতেছে। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ হে আমার ভাতিজা, বল, এবং তুমি তোমাকে ছোট মনে করো না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বললেনঃ এখানে আল্লাহ্ আমলের একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ কোন উদাহরণ? ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বললেনঃ শুধুমাত্র আমলের উদাহরণ (হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে)। এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ মেনে আমল করছে; অতঃপর আল্লাহ্ তার নিকট শয়তানকে প্রেরণ করলেন। তখন শয়তানের নির্দেশে নাফরমানী করতে লাগল। এমনকি তার সমস্ত নেক আমলকে সে বরবাদ করে ফেলল। [বুখারী ঃ ৪৫৩৮]

সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ও দান-সদকা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে।

প্রথমতঃ যে ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সুন্নাহ্ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তৃতীয়তঃ বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে। চতুর্থতঃ খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। পঞ্চমতঃ যাকে দান করা হবে,তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। ষষ্ঠতঃ যা কিছু ব্যয় করা হবে, খাঁটি নিয়্যতের সাথে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সাথেই করতে হবে - নাম-যশের জন্য নয়। অর্থাৎ ব্যয় করতে হবে ইখলাসের সাথে।

(১) এ থেকে কোন কোন আলেম মাসআলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয। কেননা, মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জনের একটি অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর'। [আবু দাউদঃ ৩৫২৮, ৩৫২৯, ইবনে মাজাহ্ঃ ২১৩৮]

(২) أَخْرَجْنَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী জমিতে (যে জমিনের উৎপন্ন শষ্যের এক-দশমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সরকারী তহবিলে জমা দিতে হয়) যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ দান করা ওয়াজিব। 'ওশর' ও 'খারাজ' ইসলামী

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের প্রতিশ্রুতি দেয়[১] এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী-প্রাচুর্যময়,

---

শরী'আতের দু'টি পারিভাষিক শব্দ। এ দু'য়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে আর্থিক 'ইবাদাতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; যেমন - যাকাত। এ কারণেই ওশরকে 'যাকাতুল-'আরদ' বা 'ভূমির যাকাত'ও বলা হয়। পক্ষান্তরে 'খারাজ' শুধু করকে বোঝায়। এতে 'ইবাদাতের কোন দিক নেই। মুসলিমরা 'ইবাদাতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেয়া হয়,তাকে 'ওশর' বলা হয়। অমুসলিমরা 'ইবাদাতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য্য করা হয়, তাকে 'খারাজ' বলা হয়। যাকাত ও ওশরের মধ্যে আরও পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্য সামগ্রীর উপর বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হয়, কিন্তু ওশরী জমিতে উৎপাদনের সাথে সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্য দ্রব্যে ও স্বর্ণ-রৌপ্যে মুনাফা না হলেও বছরান্তে যাকাত ফরয হবে।

(১) যখন কারো মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-সদকা করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষতঃ আল্লাহ্ তা'আলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং আল্লাহ্র ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, দান-সদকা করলে গোনাহ্ মাফ হবে এবং ধন-সম্পত্তিও বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়্যত ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

সর্বজ্ঞ(১) ।

২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছে হেকমত দান করেন। আর যাকে হেকমত(২) প্রদান

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ

(১) প্রথম আয়াতে বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, - অর্থাৎ হজ, জিহাদ কিংবা ফকীর, মিসকীন, বিধবা ও ইয়াতীমদের জন্য কিংবা সাহায্যের নিয়্যতে আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত হল যেমন, কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হল, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাঁড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ' দানা অর্জিত হয়ে গেল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ' পয়সার সওয়াব অর্জিত হতে পারে। সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সৎকর্মের সওয়াব দশগুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ' গুণে পৌঁছে। [দেখুন, বুখারীঃ ৪১, মুসলিমঃ ১২৮]
আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত ও পরিস্কার ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের দৃষ্টান্ত আকারে বর্ণনা করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ' দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি হবে উৎকৃষ্ট। কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হবে এবং জমিও হবে সরস। কেননা, এ তিনটি বিষয়ের যেকোন একটি বিষয়ে অভাব হলেও হয় দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি দানাও উৎপন্ন হবে না, কিংবা এক দানা থেকে সাতশ' দানার মত ফলনশীল হবে না। এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহ্‌র পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। (১) পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা। হাদীসে আছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না'। [মুসলিমঃ ১০১৫] (২) যে ব্যয় করবে তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। কোন খারাপ নিয়্যতে কিংবা নাম-জশ অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যয় করে, সে ঐ অজ্ঞ কৃষকের মত, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়। (৩) যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সদকার যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করলে সদকা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয় করার রীতিও সুন্নাত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফযীলত অর্জিত হবে না।

(২) 'হেকমত' শব্দটি কুরআনুল কারীমে বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো প্রায় কাছাকাছি উক্তি।

الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

করা হয় তাকে তো প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়; এবং বিবেকসম্পন্নগণই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن

২৭০.আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর[১] অথবা যা কিছু তোমরা মানত[২] কর

হেকমতের আসল অর্থ প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা। এর পূর্ণত্ব শুধুমাত্র নবুওয়াতের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে। তাই এখানে হেকমত বলতে নবুওয়াতকে বোঝানো হয়েছে। রাগেব ইস্পাহানী বলেনঃ হেকমত শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হবে সমগ্র বিষয়াদির পূর্ণ জ্ঞান এবং নিখুঁত আবিস্কার। অন্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হয় সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তদানুযায়ী কর্ম। এ অর্থটিই বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ নেয়া হয়েছে কুরআন, কোথাও হাদীস, কোথাও বিশুদ্ধ জ্ঞান, কোথাও সৎকর্ম, কোথাও সত্যকথা, কোথাও সুস্থ বুদ্ধি, কোথাও দ্বীনের বোধ, কোথাও মতামতের নির্ভুলতা এবং কোথাও আল্লাহ্‌র ভয়। কেননা, আল্লাহ্‌র ভয়ই প্রকৃত হেকমত। আয়াতে হেকমতের ব্যাখ্যা সাহাবী ও তাবে-তাবেয়ীগণ কর্তৃক হাদীস ও সুন্নাহ্ বলে বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে উপরোল্লেখিত সবগুলো অর্থই বোঝানো হয়েছে। [বাহরে মুহীত]

(১) 'যা কিছু তোমরা ব্যয় কর' বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; যে ব্যয়ে সব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। উদাহরণতঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়নি বরং গোনাহ্‌র কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কিংবা লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করা হয়েছে, অথবা ব্যয় করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

(২) 'মানত' শব্দের ব্যাপকতায় সর্বপ্রকার মানতই এসে গেছে। মানত বলতে বুঝায় - কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কোন কাজ করার শর্ত করা। যেমন, 'যদি আমার সন্তান হয় তাহলে আমি হজ করব' বা 'যদি আমার ব্যবসায় সাফল্য আসে তবে আমি এত টাকা দান করব' ইত্যাদি। মূলতঃ মানত পূরণ করা 'ইবাদাত। কিন্তু মানত করা 'ইবাদাত নয়। মানত করার ব্যাপারে শরী'আত কাউকে উৎসাহ দেয়নি। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মানত কারো জন্য ভাল কিছু নিয়ে আসে না বরং মানত কৃপণের সম্পদ থেকে কিছু বের করে'। [বুখারীঃ ৬৬০৮, ৬৬৯২, ৬৬৯৩] তাই মানত করার চেয়ে যে 'ইবাদাতের মানত করার ইচ্ছা করেছে, মানত না করে সে 'ইবাদাত পালন করে তার অসীলায় দো'আ করাই শরী'আত নির্দেশিত সঠিক পন্থা। এজন্য শরী'আতে মানত করা থেকে নিষেধ এসেছে। কিন্তু যদি কেউ মানত করে, তারপর যদি কাজটা সৎকাজ হয় তবে তা পূরণ করা ওয়াজিব।

تٰنْ رٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝٢٧٠

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা জানেন। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٢٧١

২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল; আর যদি গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দাও তা তোমাদের জন্য আরো ভাল; এবং এতে তিনি তোমাদের জন্য কিছু পাপ মোচন করবেন(১)। আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত(২)।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ

২৭২. তাদের হিদায়াত দানের দায়িত্ব আপনার নয়; বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে হিদায়াত দেন। আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য আর তোমরা তো

আর যদি অসৎকাজ হয় তাহলে তা পূরণ করা যাবে না। যেমন, কেউ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হজ করার মানত করলে তাকে হজ করে মানত পূরণ করতে হবে। কিন্তু যদি কেউ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মাযারে বা পীরকে কিছু দেয়ার মানত করলে তা পূরণ করা জায়েয হবে না। কেননা, তা শির্ক।

(১) অর্থাৎ গোপন দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষণ্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরাট উপকার।

(২) বাহ্যতঃ এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকমের দান-সদকাকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্ব প্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে দ্বীনী ও বৈষয়িক উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান। দ্বীনী উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। বৈষয়িক উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝

শুধু আল্লাহ্‌কে[১] চেয়েই (তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই) ব্যয় করে থাক। আর তোমরা উত্তম কোন কিছু ব্যয় করলে তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবেই দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

২৭৩. এগুলো অভাবগ্রস্থ লোকদের প্রাপ্য; যারা আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারে না[২]; আত্মসম্মানবোধে না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে[৩]; আপনি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবেন[৪]। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না[৫]। আর যে

(১) এ আয়াতে ব্যবহৃত ﴿وَجْهُ اللّٰهِ﴾ অর্থ আল্লাহ্‌র চেহারা। কিন্তু এখানে এ শব্দ দ্বারা তাঁর পূর্ণ সত্তাকেই বোঝানো হয়েছে। এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি যাতী গুণ। সুতরাং এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌র মুখমণ্ডল ও সত্তা দু'টোই সাব্যস্ত হবে।

(২) এখানে অভাবগ্রস্ত লোক বলতে ঐ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা দ্বীনী কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করতে পারে না।

(৩) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন ফকীরকে যদি মূল্যবান পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, তবে এ কারণে তাকে ধনী মনে করা হবে না; বরং ফকীরই বলা হবে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত দান করাও জায়েয হবে। [তাফসীরে কুরতুবী]

(৪) এতে বোঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার দেহে পৈতা আছে এবং সে খত্‌নাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলিমদের গোরস্তানে দাফন করা যাবে না। [তাফসীরে কুরতুবী]

(৫) এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, তারা পথ আগলিয়ে সওয়াল করে না। কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়াল করে না - এরূপ বোঝা যায় না। কোন কোন তাফসীরকারক তাই বলেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ট তাফসীরকারদের মতে এর অর্থ এই যে, তারা মোটেই সওয়াল করে না। বরং সওয়াল করা থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিরাপদ দূরত্বে রাখে। [তাফসীরে কুরতুবী]

ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে ব্যাপারে সবিশেষ জ্ঞানী ।

২৭৪. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে[১], গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের প্রতিদান তাদের রব-এর নিকট রয়েছে । আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[২] ।

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

২৭৫. যারা সুদ[৩] খায়[৪] তারা তার ন্যায়

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا

(১) এ আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে । তারা রাত্রে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকে । এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-সদকার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিনরাতেরও কোন প্রভেদ নেই । এমনিভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায় । তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়্যতে দান করতে হবে । নাম-যশের নিয়্যত থাকলে চলবে না । প্রকাশ্যে দান করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ । যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয় । [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এখানে দান-সদকা নির্ভুল ও সুন্নাত পদ্ধতি বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে । ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোন বিপদাশংকা নেই এবং অতীতের ব্যাপারেও তাদের কোন চিন্তা নেই ।

(৩) রিবা শব্দের অর্থ সুদ । 'রিবা' আরবী ভাষায় একটি বহুল প্রচলিত শব্দ । রিবা দু'প্রকারঃ একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে । আর অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া । প্রথম প্রকার রিবা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা রিবার অন্তর্ভুক্ত । এ প্রকার 'রিবা'কে 'রিবাল ফাদল' বলা হয় । আর দ্বিতীয় প্রকার রিবাকে বলা হয়, 'রিবা-আন্-নাসিয়্যাহ ।' এটি জাহেলিয়াত যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল । সে যুগের লোকেরা এরূপ লেন-দেন করত । এর সংজ্ঞা হচ্ছে, ঋণে মেয়াদের হিসাবে কোন মুনাফা নেয়া । যাবতীয় 'রিবা'ই হারাম ।

(৪) এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে । অথচ এর অর্থ হচ্ছে সুদ গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা, খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক, কিংবা পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক । কিন্তু বিষয়টি 'খাওয়া' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই যে, যে

يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে[১]। এটা এ জন্য যে, তারা বলে[২], 'ক্রয়-বিক্রয় তো সূদেরই মত'। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন[৩]। অতএব, যার নিকট তার রব-এর পক্ষ হতে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, তাহলে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং

বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরত দেয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরত দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে 'খেয়ে ফেলা' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়। শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তাই। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, জিন ও শয়তানের আসরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর্যুপরি অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ্ লিখেছেনঃ 'চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকগণও স্বীকার করেন যে, মৃগীরোগ, মূর্ছারোগ, কিংবা পাগলামী বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মাঝে মাঝে জিন ও শয়তানের আসরও এর কারণ হয়ে থাকে। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তাদের কাছে বাহ্যিক অসম্ভাব্যতা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ বর্তমান নেই।

(২) এ বাক্যে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে, তারা দু'টি অপরাধ করেছেঃ (এক) সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। (দুই) সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছেঃ 'ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত'। অথচ কেউ বলে না যে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এক্ষেত্রে বাহ্যতঃ তাদের বলা উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল তখন সুদও হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি পাল্টিয়ে যারা সুদকে হারাম বলত, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে, তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম বল। [মা'আরিফুল কুরআন]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ উক্তির জবাবে বলেছেন যে, এরা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ আল্লাহ্র নির্দেশের ফলে এতদুভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা একটিকে হালাল এবং অপরটিকে হারাম করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে? হালাল ও হারাম কি কখনো এক?

তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

২৭৬. আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন[১]। আর আল্লাহ্ কোন অধিক কুফরকারী, পাপীকে ভালবাসেন না[২]।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾

(১) আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সদকাকে বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে সদকা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুদ ও দান-সদকা উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পর বিরোধী, উভয়ের পরিণামও তেমনি পরস্পর বিরোধী। আর সাধারণতঃ যারা এসব কাজ করে, তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়্যতও পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে মেটানো আর দান-সদকাকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন তাফসীরকার বলেনঃ এ মেটানো ও বাড়ানো আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরের ধন-সম্পদ আখেরাতে তার কোনই কাজে আসবে না; বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দান-সদকাকারীদের ধন-সম্পদ আখেরাতে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শান্তি লাভের উপায় হবে। এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সাধারণ তাফসীরকারগণ বলেনঃ সুদকে মেটানো এবং দান-সদকাকে বাড়ানো আখেরাতে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস হয়ই, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকীরে পরিণত হয়। মোটকথা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-সদকাকে বর্ধিত করেন। এ উক্তি আখেরাতের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিস্কার; সত্য উপলব্ধির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তিঃ "সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা"। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৯৫] এর উদ্দেশ্যও তাই।

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে "আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাফের গোনাহ্গারকে পছন্দ করেন না"। এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যতঃ সুদ খায়, তারা গোনাহ্গার ও পাপাচারী। [মা'আরিফুল কুরআন]

২৭৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রব-এর নিকট। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

২৭৮. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

২৭৯. অতঃপর যদি তোমরা না কর তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও[১]। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই[২]। তোমরা যুলুম

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

(১) আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ পরিহার না কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহ্‌র কারণে কুরআনুল কারীমে এত বড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) বলা হয়েছে 'যদি তোমরা তাওবা করে ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হও, তবে তোমরা আসল মুলধন ফেরত পেয়ে যাবে'। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারো উপর যুলুম করতে পার না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও যুলুম করতে পারবে না। আয়াতে মূলধন দেয়াকে তাওবার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা তাওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হও, তবেই তোমরা মূলধন ফেরত পাবে। এ থেকে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেয়ার সংকল্প করে তাওবা না করলে মূলধনও ফেরত পাবে না। সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি ভবিষ্যতের জন্য তাওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে পূর্বেকার সঞ্চিত অর্থ শরী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভুক্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বান্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে তাওবা করেছে - তার এ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল থাকবে।

করবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না[১] ।

২৮০.আর যদি সে অভাবগ্রস্থ হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তার অবকাশ । আর যদি তোমরা সদকা কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর[২], যদি

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

(১) এ প্রসঙ্গে প্রথমে বোঝা দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্টবস্তু ও তার কাজ-কারবারই এমন নেই যাতে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই । সাপ-বিচ্ছু, বাঘ-সিংহ এমনকি সংখিয়ার মত মারাত্মক বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা নিহিত রয়েছে । চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন না কোন উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয় । কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যেই দেখা যায়, যে জিনিষের মধ্যে উপকার বেশী এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয় । পক্ষান্তরে যেসব জিনিষের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশী এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয় । 'রিবা' অর্থাৎ সুদের অবস্থাও তদ্রূপ । এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা যায় । কিন্তু এর দুনিয়া ও আখেরাতের মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য । প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের তালিকায় গণ্য করতে পারে না । এমনিভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ উপকারী বলতে পারে না । চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য । কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্য ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী । তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিকে ভাল বলে না । সুতরাং সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গণ্ডির ভেতরেই থাকতে পারে না । তার সাময়িক উপকারটিও শুধুমাত্র তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার । কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিকে বিরাট ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার স্বীকার হতে হয় ।

(২) এ আয়াতে সুদখুরীর মানবতা বিরোধী কাণ্ডকীর্তির বিপরীতে পবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমার খাতক যদি রিক্ত হস্ত হয় - ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে শরী'আতের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া বিধেয় । যদি তাকে ঋণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য আরও উত্তম ।

তোমরা জানতে(১) ।

সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হলে সুদের অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয় । এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহ্ তা'আলা আইন প্রনয়ণ করে দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত । সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম । এখানে ক্ষমা করাকে কুরআনুল কারীম সদকা শব্দে ব্যক্ত করেছে । এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ক্ষমা তোমার জন্য সদকা হয়ে যাবে এবং বিরাট সওয়াবের কারণ হবে । এছাড়াও আরও বলেছেনঃ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম । হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্বের যামানায় এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত আর তার সন্তানদেরকে বলত যে, যখন কোন বিপদগ্রস্ত লোক আসে তখন তার কর্জ ক্ষমা করে দিও । হয়তো আল্লাহ্ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন । তিনি বলেনঃ অতঃপর (লোকটি মৃত্যুর পর) আল্লাহ্র সাক্ষাত পেল, তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন । [বুখারীঃ ৩৪৮০] অন্য এক হাদীসে এসেছেঃ 'যে কেউ অভাবীকে অবকাশ দিবে তার জন্য কর্জ পরিশোধের সময় পর্যন্ত প্রতিদিন সদকার সওয়াব লেখা হবে । তারপর যদি আবার তাকে নতুন করে কর্জ পরিশোধের অবকাশ দেয় তবে কর্জ আদায় করার সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তার সদকার সওয়াব লেখা হবে । [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৯, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৬০]

এ আয়াত থেকে শরী'আতের এ বিধান গৃহীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, ইসলামী আদালাত তার ঋণদাতাদের বাধ্য করবে যাতে তারা তাকে সময় দেয় এবং কোন কোন অবস্থায় আদালত তার সমস্ত দেনা বা তার আংশিক মাফ করে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে । এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন হাদীস এসেছে ।

(১) সূরা আল-বাকারার ২৭৫ থেকে ২৮০ এ ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে । প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে । বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় না; কিন্তু সে ব্যক্তির মত, যাকে কোন শয়তান জিন আসর করে দিশেহারা করে দেয় । হাদীসে বলা হয়েছেঃ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা । সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান জিন দিশেহারা করে দেয় । [ইমাম ত্বাবারী সহীহ সনদে তার তাফসীরে বর্ণনা করেন] তাছাড়া সুদখোরের শাস্তি ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস এসেছে,

২৮১. আর তোমরা সেই দিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর প্রত্যেককে সে যা অর্জন করেছে তা পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের যুলুম করা হবে না[১]।

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

যেমন: (১) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোরকে লা‘নত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ ‘যে সুদ খায়, আর যে খাওয়ায়, আর যে লিখে এবং সুদের কর্মকাণ্ডের দুই সাক্ষী, তাদের প্রত্যেকের উপর আল্লাহ্‌র লা‘নত হোক। [ইবনে মাজাহ্‌ঃ ২২৭৭] (২) আবু যুহাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, যিনার ব্যবসা থেকে নিষেধ করেছেন এবং সুদ দাতা, গ্রহীতা, শরীর খোদাই করে নকশা করা, যে করায়, যে ছবি অংকন করে, এদের সবার উপর লা‘নত করেছেন’। [বুখারীঃ ৫৯৬২] (৩) সামূরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ই তাঁর সাথীদের জিজ্ঞেস করতেনঃ তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে, সে তার নিকট বলত যা আল্লাহ্‌ চাইতেন। একদিন সকালে তিনি বললেনঃ রাতে (স্বপ্নে) আমার নিকট দু’জন আগন্তুক (ফেরেশ্‌তা) আসল। আমাকে তারা উঠাল। তারপর আমাকে বললঃ চলুন! আমি তাদের দু’জনের সাথে চললাম। ... সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি নদীর নিকট পৌঁছলাম। ... সে নদীতে একজনকে সাঁতরাতে দেখলাম। নদীর পাড়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। যার নিকট ছিল অসংখ্য পাথরের এক স্তূপ। সাঁতারকারী লোকটি সাঁতরানো শেষ করে যার নিকট পাথরের স্তূপ ছিল তার নিকট এসে মুখ খুলে দিত। আর সে তার মুখে একটি করে পাথর নিক্ষেপ করত। তারপর সে সাঁতরাতে চলে যেত। সাঁতরিয়ে ফিরে এসে আবার অনুরূপ মুখ খুলে দিত। আর ঐ লোকটি তার মুখে একটি করে পাথর নিক্ষেপ করত। ....শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরাঈল বললেনঃ আর যে লোক ঝর্ণায় সাঁতরাচ্ছিল, যার নিকট দিয়ে আপনি গিয়েছিলেন, যে পাথরের লোকমা খাচ্ছিল, সে ছিল সুদখোর। [বুখারীঃ ৩৪৮০]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা‘আলা বান্দাকে নসীহত করে বলছেন যে, দুনিয়ার আবাস ক্ষণস্থায়ী। এখান থেকে খুব কম সময়ের পরই তোমাদেরকে চলে যেতে হবে। এখানকার যাবতীয় সম্পদ রেখেই সবাইকে খালি হাতে আমার সামনে আসতে হবে। সুতরাং সে দিনের ব্যাপারে সদা সতর্ক ও সাবধান থাকা জরূরী যখন তোমরা আমার সামনে নীত হবে। সেদিন তোমাদের কৃতকর্ম অনুসারে তোমাদেরকে শাস্তি বা পুরস্কার

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ
مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا
يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ
سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ
فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ

২৮২. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তা লিখে রেখো[১]; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়ভাবে তা লিখে দেয়; কোন লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না, যেমন আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন লিখে[২];

দেয়া হবে। সা'য়ীদ ইবনে জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াত সবশেষে নাযিল হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৯ দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতে এর পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র ৩১ দিন জীবিত ছিলেন। [ইবনে কাসীর]

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে লেন-দেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। যাকে চুক্তিনামাও বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লেখিত হয়েছে। আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দ শ' বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলত। লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কুরআনুল কারীম এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে "তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার-কর্জের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও"। এতে প্রথম নীতি এই যে, ধার-কর্জের লেন-দেনে দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত - যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।
দ্বিতীয়তঃ ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেন-দেন জায়েয নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ কারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেনঃ মেয়াদও এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন 'ধান কাটার সময়'- এরূপ নির্ধাতির করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধান কাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) অর্থাৎ এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে। এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, লেখক কোন এক পক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে - যাতে কারো মনে সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার

مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ
تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىؕ وَلَا
يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْاؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ
تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ
عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا
اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا
تَكْتُبُوْهَاؕ وَاَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْ۪ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ۬ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ
فُسُوْقٌۢ بِكُمْؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُؕ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

এবং যে ব্যক্তির উপর হক্ক রয়েছে (ঋণগ্রহীতা) সে যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়[১] এবং সে যেন তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তা থেকে কিছু যেন না কমায় (ব্যতিক্রম না করে)। অতঃপর যার উপর হক্ক রয়েছে (ঋণগ্রহীতা) যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু সে বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়[২]। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ, অতঃপর যদি দুজন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর, যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুলে গেলে

করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এরপর দলীল কোন পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ যার দায়িত্বে দেনা, সে লেখাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকী রাখল। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে, সে দলীলের বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা, এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকারপত্র।

(২) লেন-দেনের ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনো নির্বোধ বা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, মুক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলীলের বিষয়বস্তু বলে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তার কোন অভিভাবক লেখাবে। পাগল ও নাবালেগের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মুক ও অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। যদি তারা কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এখানে কুরআনুল কারীমের 'ওলী' শব্দটি উভয় অর্থই বোঝায়।

তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়[১]। আর সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে[২]। আর তা (লেন-দেন) ছোট-বড় যাই হোক, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হয়ো না। এটাই আল্লাহর নিকট ন্যায্যতর

(১) এখানে বলা হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না; বরং এতে সাক্ষ্যও রাখবে -যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন যে, লেখা শরী'আতসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরী'আতসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ফয়সালা করা হয় না। আয়াতে এরপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণতঃ (১) সাক্ষী দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলা সাধারণ লেন-দেনের সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট নয়। অনুরূপভাবে (২) সাক্ষী মুসলিম হতে হবে। ﴿مِن رِّجَالِكُمْ﴾ শব্দে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। (৩) সাক্ষী নির্ভরযোগ্য 'আদিল' (বিশ্বস্ত) হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ও ফাজের (অর্থাৎ পাপাচারী) হলে চলবে না। ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে।

(২) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্য ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা, সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মেটানোর উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে। এরপর আবার লেন-দেনের দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছেঃ লেন-দেন ছোট কিংবা বড় হোক - সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার। এ ব্যাপার বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা, লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে চমৎকাররূপে সহযোগীতা করে। যদি নগদ লেন-দেন হয় - বাকী না হয়, তবে তা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই। তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সময় মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণতঃ বিক্রেতা মূল্যপ্রাপ্তি অস্বীকার করতে পারে কিংবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্তু বুঝে পায়নি। এ মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

ও সাক্ষ্যদানের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ার জন্য অধিকতর উপযুক্ত। তবে তোমরা পরস্পর যে নগদ ব্যবসা পরিচালনা কর তা তোমরা না লিখলে কোন দোষ নেই। আর তোমরা যখন পরস্পর বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখো। আর কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর, তবে তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার[১]। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন। আর আল্লাহ্‌ সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞানী।

২৮৩. আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখবে[২]। অতঃপর

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى

(১) আয়াতের শুরুতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও সাক্ষী দিতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়ত মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারত। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে, ﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ অর্থাৎ কোন লেখক বা সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। নিজের উপকারের জন্য যেন তাদের বিব্রত না করা হয়। এরপর বলা হয়েছে, ﴿وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ﴾ অর্থাৎ তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গোনাহ্‌ হবে। এতে বোঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম। এ কারণেই ফকীহ্‌গণ বলেনঃ যদি লেখক লেখার পারিশ্রমিক দাবী করে কিংবা সাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়, তবে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। তা না দেয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করার শামিল এবং অবৈধ। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ সাক্ষ্য দেয়া থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য না হয়।

(২) এ আয়াত দ্বারা সফর অবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েয প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে মুকীম বা অবস্থানকালেও বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করা জায়েয। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

أُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

তোমাদের একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে করলে, যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে সে যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে এবং তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না[১]। আর যে কেউ তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী[২]। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবগত।

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

২৮৪. আল্লাহর জন্যই যা আছে আসমানসমূহে ও যা আছে যমীনে। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ্ সেগুলোর হিসেব তোমাদের কাছ থেকে নিবেন[৩]। অতঃপর যাকে

ওয়াসাল্লাম নিজেও মুকীম অবস্থায় বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহূদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে (বাকী) কিছু খাদ্য সামগ্রী খরিদ করেন এবং ঐ সময়ের জন্য তিনি ইয়াহূদীর নিকট তার বর্ম বন্ধক রাখেন। [বুখারীঃ ২৫০৯]

(১) সাক্ষ্য দিতে না চাওয়া এবং সাক্ষ্যে সত্য ঘটনা প্রকাশে বিরত থাকা উভয়টিই সত্য গোপন করার আওতায় পড়ে।

(২) এ আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ বাকীর ব্যাপারে কেউ যদি বিশ্বস্ততার জন্য কোন বস্তু বন্ধক নিতে চায়, তাও করতে পারে। কিন্তু এতে مَقْبُوضَةٌ শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বন্ধকী বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য জায়েয নয়। সে শুধু ঋণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত একে নিজের অধিকারে রাখবে। এর যাবতীয় মুনাফা আসল মালিকের প্রাপ্য। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি কোন বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখে, সে সাক্ষ্য গোপন করতে পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর গোনাহ্গার হবে। 'অন্তর গোনাহ্গার' বলার কারণ এই যে, কেউ যেন একে শুধু মুখের গোনাহ্ মনে না করে। কেননা, অন্তর থেকেই প্রথমে ইচ্ছার সৃষ্টি হয়। তাই অন্তরের গোনাহ্ প্রথম। [মা'আরিফুল কুরআন]

(৩) আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্মের

ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন[১]। আর আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

২৮৫. রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে নাযিল করা হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলেঃ আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾

২৮৬. আল্লাহ্‌ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত[২]। সে ভাল যা উপার্জন

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ

হিসাব গ্রহণ করবেন। যে কাজ করা হয়েছে এবং যে কাজের শুধু মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, সে সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘কেয়ামতের দিন মুমিনকে আল্লাহ্‌ তা‘আলার নিকটবর্তী করা হবে এবং আল্লাহ্‌ তাকে এক এক করে সব গোনাহ্‌ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেনঃ এ গোনাহ্‌টি কি তোমার জানা আছে? মুমিন স্বীকার করবে। আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলবেনঃ আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ্‌ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফেকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে। [বুখারীঃ ২৪৪১, মুসলিমঃ ২৭৬৮]

(১) এটি আল্লাহ্‌র অবাধ ক্ষমতারই একটি বর্ণনা। তাঁর উপর কোন আইনের বাঁধন নেই। কোন বিশেষ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি বাধ্য নন। বরং তিনি সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। শাস্তি দেয়ার ও মাফ করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে।

(২) পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা

نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا
تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟
وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

করে তার প্রতিফল তারই, আর মন্দ যা কামাই করে তার প্রতিফল তার উপরই বর্তায়। 'হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর

গোপন রাখ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কু-চিন্তা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ ব্যাপক ছিল। এতে বোঝা যেত যে, অনিচ্ছকৃত ধারণারও হিসাব নেয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে আপাততঃ আদেশ দিলেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন - মুমিনের কাজ হলো তা মেনে নেয়া। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশমত কাজ করলেন; যদিও তাদের মনে এ সংশয় ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কু-চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রথমে মুসলিমদের আনুগত্যের প্রশংসা করেন এবং বিশেষ ভঙ্গিতে ঐ সন্দেহের নিরসন করে বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বহির্ভূত কোন কাজের নির্দেশ দেন না। কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কল্পনা ও কু-চিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, এরপর সেগুলো কার্যে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে মাফযোগ্য। যেসব কাজ ইচ্ছে করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে। কুরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে কেরামের মানসিক উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। [মুসনাদে আহমাদ: ২/৪১২, ১/৩৩২; মুসলিম: ১২৫]
তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলিমদেরকে একটি বিশেষ দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে যাওয়ার পর ক্ষমা প্রার্থনার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের মত শাস্তিও যেন এ উম্মতের উপর না আসে, তার জন্য বিশেষভাবে দো'আ করতে বলা হয়েছে।

যেমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না যার সামর্থ আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন[১]।

---

(১) আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরা বাকারার শেষ আয়াত। সহীহ্ হাদীসসমূহে এ আয়াত দু'টির বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট'। [বুখারীঃ ৪০০৮, ৫০০৮, মুসলিমঃ ৮০৮] অর্থাৎ বিপদাপদ ও বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য যথেষ্ট।

৩- সূরা আলে-ইমরান



সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

সূরার আয়াত সংখ্যাঃ ২০০ আয়াত।

সূরার নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরাটি সর্বসম্মতভাবে মাদানী সূরা।

সূরার নামকরণঃ এ সূরার ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতদ্বয়ে আলে-ইমরানের কথা বলা হয়েছে। একেই আলামত হিসেবে এর নাম গণ্য করা হয়েছে। এ সূরার আরেক নাম আয্-যাহ্রাহ্ বা আলোকচ্ছটা। [মুসলিমঃ ৮০৪] এছাড়াও এ সূরাকে সূরা তাইবাহ্, আল-কান্য, আল-আমান, আল-মুজাদালাহ্, আল-ইস্তেগফার, আল-মা'নিয়্যাহ্ ইত্যাদি নাম দেয়া হয়েছে।

সূরার ফযীলতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ, তা পাঠকারীর জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দু'টি আলোকচ্ছটাময় সূরা আল-বাকারাহ্ ও সূরা আলে-ইমরান পড়; কেননা, এ দু'টি সূরা কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যেন দু'টি মেঘখণ্ড অথবা দু'টি ছায়া অথবা দু'ঝাঁক পাখির মত। তারা এসে এ দু'সূরা পাঠকারীদের পক্ষ নেবে।' [মুসলিমঃ ৮০৪] অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'কেয়ামতের দিন কুরআন আসবে যারা কুরআনের উপর আমল করেছে, তাদের পক্ষ হয়ে। তখন সূরা আল-বাকারাহ্ ও সূরা আলে-ইমরান থাকবে সবার অগ্রে।' [মুসলিমঃ ৮০৫]

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

১. আলিফ্-লাম-মীম(১),

২. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ্ নেই(২), তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝١

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝٢

(১) এগুলোকে হুরূফে মুকাত্তা'আত বলে। যার আলোচনা সূরা বাকারার প্রথমে চলে গেছে।

(২) এ আয়াতে তাওহীদের ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যেমন, মনে করুন, কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ও বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একমত। পূর্বাপর এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত শত, এমন কি হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। একজনের উক্তি অন্য জনের কাছে পৌঁছারও কোন উপায় নেই। তা সত্ত্বেও যিনিই আসেন তিনিই যদি পূর্ববর্তীদের মত একই কথা বলেন, একই কর্ম ও একই বিশ্বাসের অনুসারী হন, তবে এমন বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে নিতে মানব-স্বভাব বাধ্য। উদাহরনতঃ আল্লাহ্ তা'আলার

তাওহীদের পরিচয় সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ সর্বপ্রথম আদম আলাইহিস্ সালাম দুনিয়াতে পদার্পণ করেন। তার ওফাতের পর তার বংশধরদের মধ্যে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সম্পর্কিত এই তথ্যের চর্চা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আদম সন্তানদের প্রাথমিক কালের আচার-অভ্যাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সূচীত হওয়ার পর নূহ 'আলাইহিস্ সালাম আগমন করেন। তিনিও মানুষকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সম্পর্কিত ঐসব বিষয়ের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন, যেসব বিষয়ের দিকে আদম 'আলাইহিস্ সালাম দাওয়াত দিতেন। অতঃপর সুদীর্ঘকাল অতীতের গর্ভে বিলীন হওয়ার পর ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস্ সালাম ইরাক ও সিরিয়ায় জন্মগ্রহন করেন। তাঁরাও হুবহু একই দাওয়াত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরন করেন। এরপর মুসা ও হারুন 'আলাইহিমাস্ সালাম এবং তাদের বংশের রাসূলগণ আগমন করেন। তারা সবাই সে একই কালেমায়ে তাওহীদের বাণী প্রচার করেন এবং এ কালেমার প্রতি মানুষজনকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এরপরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সেই একই আহ্বান নিয়ে আগমন করেন। সবার শেষে খাতামুল-আম্বিয়া মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে আবির্ভূত হন।

মোটকথা, আদম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী ও রাসূল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সবাই একই বাণী উচ্চারণ করেন। তাদের অধিকাংশেরই পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি। তাদের আবির্ভাবকালে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আমলও ছিল না যে, এক রাসূল অন্য রাসূলের গ্রন্থাদি ও রচনাবলী পাঠ করে তার দাওয়াতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবেন; বরং তাদের একজন অন্যজন থেকে বহুদিন পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। জাগতিক উপকরণাদির মাধ্যমে পূর্ববর্তী রাসূলগণের কোন অবস্থা তাদের জানা থাকারও কথা নয়। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেই তারা পূর্বসুরীদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই তাদেরকে এ দাওয়াত প্রচার করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। এখন যে ব্যক্তি ইসলাম ও তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি মনে মনে কোনরূপ বৈরীভাব পোষণ করে না, সে যদি খোলা মনে সরলভাবে চিন্তা করে, তবে এত বিপুল সংখ্যক নবী-রাসূল বিভিন্ন সময় এক বিষয়ে একমত হওয়াই বিষয়টির সত্যতা নিরূপণের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু রাসূলগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তাদের সততা ও সাধুতার উচ্চতম মাপকাঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কারো পক্ষে এরূপ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, তাদের বাণী ষোল আনাই সত্য এবং তাদের দাওয়াতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেরই মঙ্গল নিহিত। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

ধারক[১]।

৩. তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, পূর্বে যা এসেছে[২] তার সত্যতা প্রতিপন্নকারীরূপে। আর তিনি নাযিল করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জীল।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٣﴾

৪. ইতোপূর্বে মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ[৩]; আর তিনি ফুরকান নাযিল করেছেন[৪]। নিশ্চয় যারা

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘দু’টি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা‘আলার ইসমে আ‘যম রয়েছে, এক, ﴿وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴾ দুই, সূরা আলে ইমরানের প্রথম দু’ আয়াত’। [তিরমিযীঃ ৩৪৭৮]

(২) কাতাদা বলেন এখানে পূর্বে যা এসেছে তা বলা দ্বারা কুরআনের পূর্বে যে সমস্ত কিতাবাদি নাযিল হয়েছে সেগুলোকে বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে মুজাহিদ বলেন, এখানে পূর্বে যা এসেছে বলে, পূর্বেকার যাবতীয় কিতাব ও রাসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই কুরআন পূর্বতন সকল নবী-রাসূল ও যাবতীয় কিতাবের সত্যয়নকারী। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) কাতাদা বলেন, এ দু’টি আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব। এতে রয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বর্ণনা। যে এ দু’টি থেকে হিদায়াত গ্রহণ করেছে, সত্য বলে বিশ্বাস করেছে এবং সেটা অনুসারে আমল করেছে সে নিরাপত্তা পেয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] সে হিসেবে এটাকে মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছে বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ারপর এ দু’টি গ্রন্থ রহিত হয়ে গেছে, তা থেকে হিদায়াত লাভের আর কোন উপায় নেই।

(৪) ওয়াসিলা ইবন আসকা‘ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহীফাসমূহ রামাদান মাসের প্রথম রাত্রিতে নাযিল হয়েছিল, তাওরাত নাযিল হয়েছিল রামাদান মাসের ছয়দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, ইঞ্জীল নাযিল হয়েছিল রামাদান মাসের তের রাত্রি পার হওয়ার পর। আর ফুরকান নাযিল হয়েছিল রামাদান মাসের চব্বিশ রাত্রি পার হওয়ার পর।” [মুসনাদে আহমাদ ৪/১০৭] কাতাদাহ বলেন, আয়াতে ফুরকান বলে পবিত্র কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তা নাযিল করে এর মাধ্যমে হক ও বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর হালালকৃত বস্তুকে হালাল এবং হারামকৃত বস্তুকে এর মাধ্যমে হারাম ঘোষণা করেছেন। তাঁর শরী‘আতকে প্রবর্তন করেছেন। অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর আল্লাহ্ মহা-পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী[১]।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

৫. নিশ্চয় আল্লাহ্, আসমান ও যমীনের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না[২]।

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬. তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন[৩]। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই; (তিনি) প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

দিয়েছেন। কি কি জিনিস ফরয করেছেন তা বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অবাধ্যতা হতে নিষেধ করেছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সর্ববিষয়ে সার্বিক সামর্থ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে জননীর উদরে তিনটি অন্ধকার স্তরের মাঝে কিরূপ নিপুণভাবে গঠন করেছেন। তাদের আকার-আকৃতি ও বর্ণ বিন্যাসে এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আকৃতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের অনুরূপ নয় বিধায়, স্বতন্ত্র পরিচয় দুরূহ হয়ে পড়ে। এহেন সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের যুক্তিসঙ্গত দাবী এই যে, ইবাদাত একমাত্র তাঁরই করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কারো জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য এরূপ নয়। কাজেই অন্য কেউ ইবাদাতের যোগ্যও নয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন। সূরা আল-আন'আমে এ বিষয়টি বিস্তারিত এসেছে, সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, এসব কিছু তিনি যে শুধু জানেন তা-ই নয় বরং তিনি তা এক গ্রন্থে লিখেও রেখেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আর অদৃশ্যের চাবি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত, তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুস্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" [সূরা আল-আন'আম: ৫৯]

(৩) কাতাদা বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমাদের রব তাঁর বান্দাদেরকে মায়ের গর্ভে যেভাবে ইচ্ছা গঠন করতে পারেন। ছেলে বা মেয়ে, কালো বা গৌরবর্ণ, পূর্ণসৃষ্টি অথবা অপূর্ণসৃষ্টি। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ
مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۭ فَاَمَّا
الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ
مِنْهُ ابْتِغَاۗءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاۗءَ تَاْوِيْلِهٖ ڤ وَمَا
يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ڤ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ

৭. তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কিছু আয়াত ‘মুহ্কাম’, এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো ‘মুতাশাবিহ্’(১), সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে শুধু তারাই ফেৎনা এবং ভুল ব্যাখ্যার

(১) আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট আয়াতের কথা উল্লেখ করে একটি সাধারণ মুলনীতি ও নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যার দ্বারা অনেক আপত্তি ও বাদানুবাদের অবসান ঘটে। এর ব্যাখ্যা এরূপ, কুরআনুল কারীমে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে। এক প্রকারকে ‘মুহ্কামাত’ তথা সুস্পষ্ট আয়াত এবং অপর প্রকারকে ‘মুতাশাবিহাত’ তথা অস্পষ্ট আয়াত বলা হয়।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মুহকাম হচ্ছে, ঐ সব আয়াতগুলো, যা নাসেখ বা রহিতকারী, যাতে আছে হালাল-হারামের বর্ণনা, শরী‘আতের সীমারেখা, ফরয-ওয়াজিব, ঈমান ও আমলের বিষয়াদির বর্ণনা। পক্ষান্তরে মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ হচ্ছে, যা মানসূখ বা রহিত, যাতে উদাহরণ ও এ জাতীয় বিষয়াদি পেশ করা হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

প্রথম প্রকার আয়াতকে আল্লাহ্ তা‘আলা ‘উম্মুল কিতাব’ আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, এসব আয়াতই সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের অর্থ যাবতীয় অস্পষ্টতা ও জটিলতামুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার আয়াতে বক্তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এগুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধ পন্থা হল, এসব আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের আলোকে দেখা। যে আয়াতের অর্থ প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে যায়, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বক্তার এমন উদ্দেশ্য বুঝতে হবে, যা প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে নয়। উদাহরণতঃ ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তি এরূপ ﴿اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ অর্থাৎ “সে আমার নেয়ামত প্রাপ্ত বান্দা ছাড়া অন্য কেউ নয়।” [সূরা আয্-যুখরুফঃ ৫৯] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ ﴿اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۭ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ﴾ অর্থাৎ “আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে আদমের অনুরূপ আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে।” [সূরা আলে-ইমরানঃ ৫৯] এসব আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াত থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্ তা‘আলার মনোনীত এবং তাঁর সৃষ্ট। অতএব ‘তিনি উপাস্য, তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র’- নাসারাদের এসব দাবী সম্পূর্ণ বানোয়াট। তারা যদি كَلِمَةُ اللّٰهِ ‘আল্লাহ্‌র কালেমা’ বা رُوْحٌ مِّنْهُ ‘তাঁর পক্ষ থেকে রূহ’ শব্দদ্বয় দ্বারা দলীল নেয়ার চেষ্টা করে তখন তাদের বলতে হবে যে, পূর্বে বর্ণিত আয়াতসমূহের আলোকেই এশব্দদ্বয়কে বুঝতে হবে। সে আলোকে উপরোক্ত كَلِمَةُ اللّٰهِ ও رُوْحٌ مِّنْهُ শব্দদ্বয় সম্পর্কে এটাই বলতে হয় যে, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে সৃষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে পাঠানো একটি রূহ মাত্র।

يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে[১]। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর[২] তারা বলে, 'আমরা

(১) বলা হয়েছে, 'যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে'। ইবনে আব্বাস বলেন, যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে এ কথা বলে যাদের অন্তরে সন্দেহ রয়েছে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা মুহকাম আয়াতকে মুতাশাবিহ আয়াতের উপর এবং মুতাশাবিহ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের উপর ইচ্ছাকৃত সন্দেহ লাগানোর জন্য নির্ধারণ করে, ফলে তারা নিজেরা সন্দেহে পতিত হয় এবং পথভ্রষ্ট হয়। তারা সঠিক পথ গ্রহণ করতে সচেষ্ট থাকে না। [আত-তাফসীরুস সহীহ] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল লোককে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে পরস্পর বাদানুবাদে লিপ্ত দেখে বললেন, "তোমাদের পূর্বের লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের একাংশকে অপর অংশের বিপরীতে ব্যবহার করত। আল্লাহর কুরআন তো এ জন্যই নাযিল হয়েছিল যে, এর একাংশ অপর অংশের সত্যয়ণ করবে। সুতরাং তোমরা এর একাংশকে অপর অংশের কারণে মিথ্যারোপ করো না। এর যে অংশের অর্থ তোমরা জানবে সেটা বলবে, আর যে অংশের অর্থ জানবে না সেটা আলেম বা যারা জানে তাদের কাছে সোপর্দ করো।" [মুসনাদে আহমাদ ২/১৮৫, নং ৬৭৪১; মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ ১১/২১৬-২১৭, হাদীস নং ২৩৭০]

(২) এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গভীর জ্ঞানের অধিকারীগণ কি এ সমস্ত মুতাশাবিহাতের অর্থ জানে কি না? কোন কোন মুফাসসির এখানে تأويل শব্দের অর্থভেদে এর উত্তর দিয়েছেন। কারণ, تأويل শব্দটির এক অর্থ, তাফসীর বা ব্যাখ্যা। অপর অর্থ, সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য, যার জন্য আয়াতটি নিয়ে আসা হয়েছে। যদি প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে এর কোন কোন অর্থ মুফাসসিরগণ করেছেন। যা ব্যাখ্যার পর্যায়ে পড়ে। সে হিসেবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছিলেন, 'আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা এগুলোর تأويلতথা ব্যাখ্যা জানে।' [তাবারী] আর যদি দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তখন এর অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। অধিকাংশ সাহাবী, তাবে'য়ী এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন যে, মুতাশাবিহাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। যেমন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমদের জ্ঞানের দৃঢ়তার পরিচয় এই যে, তারা মুহকাম ও মুতাশাবিহ সব ধরনের আয়াতের উপরই ঈমান এনেছে, অথচ তারা মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের تأويل তথা প্রকৃত ব্যাখ্যা জানে না।' অনুরূপভাবে উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ এগুলোর تأويل তথা প্রকৃত ব্যাখ্যা জানে না, বরং তারা বলে, 'আমরা এগুলোতে ঈমান আনি, সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে'। [তাবারী]

এগুলোতে ঈমান রাখি, সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে'[১]; এবং জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

৮. 'হে আমাদের রব! সরল পথ দেয়ার পর আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে সত্য লঙ্ঘনপ্রবণ করবেন না। আর আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে করুণা দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।'

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ⑧

৯. 'হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি সমস্ত মানুষকে একদিন একত্রে সমবেত করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই[২]; নিশ্চয় আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফ করেন না।'

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ⑨

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, যারা সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে বেশী তথ্যানুসন্ধান ও ঘাটাঘাটি করে না; বরং তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস করে যে, এ আয়াতটিও আল্লাহ্র সত্য কালাম। তবে তিনি কোন বিশেষ হেকমতের কারণে এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেননি। প্রকৃতপক্ষে এ পন্থাই বিপদমুক্ত ও সতর্কতাযুক্ত। এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাদের অন্তর বক্র। তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাটাঘাটিতে লিপ্ত থাকে এবং তা থেকে নিজ মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। এরূপ লোকদের সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করে বললেন, "যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে যারা এ সমস্ত (মুতাশাবিহ) আয়াতের পিছনে দৌড়াচ্ছে, তখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ্ এ সমস্ত লোকের কথাই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তখন তাদের থেকে সাবধান থাকবে।" [বুখারী: ৪৫৪৭; মুসলিম: ২৬৬৫]

(২) শাফা'আতের বিখ্যাত হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বাপর সকল মানুষকে কিয়ামতের দিন এক মাঠে একত্রিত করবেন। অতঃপর তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তাদের চক্ষু পরস্পরকে বেষ্টন করবে এবং তারা যে কোন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনতে পাবে। আর সূর্য তাদের নিকটবর্তী করা হবে।" [বুখারী: ৩৩৬১]

দ্বিতীয় রুকূ‘

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ
أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْـًٔا ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ
النَّارِ ۝١٠

১০. নিশ্চয় যারা কুফরী করে আল্লাহ্‌র নিকট তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না এবং এরাই আগুনের ইন্ধন(১)।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا
بِـَٔايَٰتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۝١١

১১. তাদের অভ্যাস ফির‘আউনী সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায়, তারা আমার আয়াতগুলোতে মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন(২)। আর আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

---

(১) মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে কাফেরদের সম্পর্কে এটা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। “যেদিন যালেমদের কোন ওজর-আপত্তি কাজে আসবে না, আর তাদের জন্য থাকবে লা‘নত এবং তাদের জন্য থাকবে খারাপ আবাস” [গাফের: ৫২] দুনিয়াতে তাদেরকে যে সমস্ত সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হয়েছিল তাও তাদের কোন উপকার দিবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তি ও কঠিন পাকড়াও থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হবে না। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা‘আলা এ বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন, “কাজেই ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো এসবের দ্বারাই ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওরা কাফের থাকা অবস্থায় ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে” [আত-তাওবাহ: ৫৫] আরও বলেন, “যারা কুফরী করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই আপনাকে বিভ্রান্ত না করে। এ তো স্বল্পকালীন ভোগ মাত্র; তারপর জাহান্নাম তাদের আবাস; আর ওটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!”[সূরা আলে ইমরান: ১৯৬-১৯৭]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে ফির‘আউনের পূর্বেকার যে সমস্ত সম্প্রদায়কে তাদের অপরাধের কারণে পাকড়াও করা হয়েছিল তাদের পরিচয় ও অপরাধের বিবরণ দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র তাদেরকে নূহ, হূদ, সালেহ, লূত ও শু‘আইবের সম্প্রদায় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সমস্ত স্থানে তাদের অপরাধ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করেছিল এবং রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করেছিল। যেমন, সামূদ সম্প্রদায় কর্তৃক উষ্ট্রী হত্যা, লূত সম্প্রদায়ের সমকামিতা, শু‘আইব এর সম্প্রদায় কর্তৃক মাপ ও ওজনে কম দেয়া ইত্যাদি। [আদওয়াউল বায়ান]

১২. যারা কুফরী করে তাদেরকে বলুন, ‘তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল!’

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۲﴾

১৩. দু’টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। একদল যুদ্ধ করছিল আল্লাহ্‌র পথে, অন্য দল ছিল কাফের; তারা তাদেরকে চোখের দেখায় দেখছিল তাদের দ্বিগুণ। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা আপন সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন(১)। নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে(২)।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿۱۳﴾

---

(১) আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে কাফেরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের কাছে সাতশ’ উট ও একশ’ অশ্ব ছিল। অপরপক্ষে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিনশ’র কিছু বেশী। তাদের কাছে সর্বমোট সত্তরটি উট, দু’টি অশ্ব, ছ’টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারী ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ প্রতিভাত হচ্ছিল। এর ফলে মুসলিমদের আধিক্য কল্পনা করে কাফেরদের অন্তর উপর্যুপরি শঙ্কিত হচ্ছিল এবং মুসলিমগণও নিজেদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আল্লাহ্ তা‘আলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করছিলেন। তারা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র ওয়াদা- “যদি তোমাদের মধ্যে একশ’ ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশ’র বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে।” [সূরা আল-আনফালঃ ৬৬] -এর ওপর আস্থা রেখে আল্লাহ্‌র সাহায্যের আশা করছিলেন। কাফেরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ। তা যদি মুসলিমদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে যেত, তবে তাদের মনে ভয়-ভীতি সঞ্চার হওয়াটা ছিল সাধারণ। আবার কোন কোন অবস্থায় উভয় দলই প্রতিপক্ষকে কম দেখেছিল। [সীরাতে ইবন হিশাম]

(২) বদর যুদ্ধের কয়েকটি বিষয় ছিল অত্যন্ত শিক্ষণীয়ঃ এক) মুসলিম ও কাফেররা যেভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল, তাতে উভয় দলের নৈতিক ও চারিত্রিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাদের একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছিল, অপরদল

১৪. নারী, সন্তান, সোনারূপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু(১)। আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

তাগুত, শির্ক ও শয়তানের পথে যুদ্ধ করছিল। আল্লাহ্ তাঁর পথে যুদ্ধকারীদের অন্যদের উপর বিজয় দিয়েছিলেন। এ থেকে ইয়াহূদীরা শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল। [আইসারুত তাফাসীর] দুই) মুসলিমরা সংখ্যায় নগণ্য ও অস্ত্রে অপ্রতুল হওয়া সত্বেও যেভাবে কাফেরদের বিশাল সংখ্যা ও উন্নত অস্ত্র-সস্ত্রের মোকাবেলা করেছে, তাতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট। [সা'দী] তিন) আল্লাহর প্রবল প্রতাপ ও অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে গাফেল হয়ে যারা সংখ্যাধিক্য ও সমরাস্ত্রের শক্তিতে আত্মম্ভরিতায় মেতে উঠেছিল, আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। [মানার]

(১) আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে যে, কে এগুলোর আকর্ষণে মত্ত হয়ে আখেরাতকে ভুলে যায় এবং কে এসবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও আখেরাতের কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সুচারু ব্যবহার করে। আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছেন, শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঞ্চয় করলে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী হাসিল হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করলে অথবা বৈধ পন্থায় হলেও এগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে আখেরাত বিস্মৃত হয়ে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। [সা'দী] অর্থাৎ এসব হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্য; মন বসাবার জন্য নয়। আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা। সেখানে চিরকাল থাকতে হবে এবং যার নেয়ামত ধ্বংস হবে না, হ্রাসও পাবে না। আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনের জন্য যে নেয়ামত রেখেছেন, তার তুলনা দুনিয়ার জীবনের সামগ্রীসমূহের কোন কিছু দিয়েই দেয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তা অভিশপ্ত। তবে যা আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণে করা হয় ও তার সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং দ্বীনী জ্ঞানে আলেম ও দ্বীনী জ্ঞান অর্জনকারী। [তিরমিযী: ২৩২২; ইবন মাজাহ: ৪১১২]

১৫. বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু থেকে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সন্তুষ্টি[১]। আর আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

১৬. যারা বলে, হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদের গোনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।'

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

১৭. তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থী[২]।

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

---

(১) আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তখন তারা বলবে, আমরা হাজির, তখন তিনি বলবেন: তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না অথচ আপনি আমাদেরকে এমন কিছু দান করেছেন যা আর কোন সৃষ্টিকে দান করেননি। তখন তিনি বলবেন: আমি তোমাদেরকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু দান করব। তারা বলবে, হে রব! এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে? তিনি বলবেন: আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অবতরণ করাব, এর পর আমি আর কখনও তোমাদের উপর ক্রোধান্বিত হব না।" [বুখারী: ৬৫৪৯, মুসলিম: ২৮২৯]

(২) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাদের রব আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাত্রে যখন রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন প্রথম আসমানে নেমে এসে বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকবে যে আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আমার কাছে চাইবে যে আমি তাকে দিব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে যে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব? [বুখারী: ১১৪৫; মুসলিম: ৭৫৮] এর দ্বারা শেষ রাত্রির ইবাদতের গুরুত্ব বোঝা যায়। এ সময়কার দো'আ কবুল হয়। এটা মূলত: তাহাজ্জুদের সময়।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন[১] যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। আর ফেরেশ্‌তাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ্ ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, (তিনি) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

১৯. নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন[২]। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা কেবলমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে কুফরী করে,

(১) অর্থাৎ যে আল্লাহ্ বিশ্ব জাহানের সমস্ত তত্ত্ব, সত্য ও রহস্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আবরণহীন অবস্থায় দেখছেন এবং যার দৃষ্টি থেকে পৃথিবী ও আকাশের কোন একটি বস্তুও গোপন নেই এটি তার সাক্ষ্য। আর তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে? কারণ পৃথিবীতে ইলাহের স্বত্ব দাবী করার অধিকার ও যোগ্যতা কারও নেই। তিনি নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন হক্ক ইলাহ নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করা যুলুম ও অন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলার এ সাক্ষ্যের সাথে তিনি আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদেরকেও শরীক করেছেন। তারাও এ মহৎ সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আলেম তথা দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানীদেরকেও এ সাক্ষ্য প্রদানের জন্য গ্রহণ করে সম্মানিত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি মূলত: আলেম তথা দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানীদের সম্মান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। [ইবনুল কাইয়্যেম: মিফতাহু দারিস সা'আদাহ; তাফসীরে সা'দী]

(২) সুদ্দী বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম'। এটা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা এবং জ্ঞানীদের সাক্ষ্যের বিষয়। অর্থাৎ তারা এ সাক্ষ্যও দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। [তাবারী] কাতাদা বলেন, ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত হক্ক কোন মা'বুদ নেই এ সাক্ষ্য দেয়া, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার স্বীকৃতি প্রদান। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন যা তিনি প্রবর্তন করেছেন, রাসূলদেরকে যা নিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর বন্ধুদেরকে যার দিশা দিয়েছেন। এটা ব্যতীত তিনি আর কিছু গ্রহণ করবেন না। এটা অনুপাতে না হলে তিনি কাউকে পুরস্কৃত করবেন না। [তাবারী]

তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০. সুতরাং যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে আপনি বলুন, 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারিগণও।' আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বলুন, 'তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ?' যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আর আল্লাহ্‌ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা[১]।

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْأُمِّيّٖنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

তৃতীয় রুকূ'

২১. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে কুফরী করে, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُونَ الَّذِينَ

(১) আয়াতে বর্ণিত أَسْلَمْتُمْ শব্দটির মূল অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'আত্মসমর্পণ করা' অনুবাদ করা হয়েছে। এর আরেক অনুবাদ এভাবেও করা যায় যে, যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে আপনি বলুন, 'আমি ইসলামকে কবুল করেছি এবং আমার অনুসারিগণও।' এর মাধ্যমে অপরাপর ধর্মের অনুসারীরা মুসলিমদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাবে যে, তাদেরকে আবার বিভ্রান্ত করার সুযোগ নেই। [সা'দী] আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে ও নিরক্ষর অর্থাৎ মক্কার কুরাইশ ও তাদের অনুসারীদেরকে বলুন, 'তোমরাও কি ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছ?' যদি তারা তোমরা যেভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছ সেভাবে ইসলামকে কবুল করে তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে এবং তারা তোমাদের ভাই-বন্ধুতে পরিণত হবে। আর যদি তারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাদের পূর্ববর্তী ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। প্রচারের সওয়াব আপনি অবশ্যই পাবেন। তাদের উপরও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দলীল প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যাতে করে তাদের শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হয়। [সা'দী]

يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢١﴾

ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, আপনি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۡ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২. এসব লোক, এদের কার্যাবলী দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের অংশ প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; তারপর তাদের একদল ফিরে যায় বিমুখ হয়ে[১]।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۪ وَّغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. এটা এজন্যে যে তারা বলে থাকে, ‘মাত্র কয়েকদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনই স্পর্শ করবে না।’ আর তাদের নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে[২]।

---

(১) কাতাদা বলেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র দুশমন ইয়াহূদীরা। তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা হয়, তাদেরকে আল্লাহ্‌র নবীর প্রতিও আহ্বান জানানো হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্যজনিত বিষয়ে তিনি ফয়সালা করে দেন। যে নবীর বর্ণনা তারা তাদের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে। তারপরও তারা সে কিতাব ও নবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। [তাবারী]

(২) কাতাদা বলেন, তারা মনে করে থাকে যে, যে সময়টুকুতে তারা অর্থাৎ পূর্বপুরুষরা গো-বৎসের পুজা করেছিল, সে সময়টুকুতেই শুধু তাদের শাস্তি হবে। তারপর তাদের আর শাস্তি হবে না। এই যে বিশ্বাস তা কোন শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের ভিত্তি হচ্ছে দ্বীনের উপর মিথ্যা দাবী করা। কারণ তারা দাবী করে বলে থাকে যে, ‘আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি ও প্রিয় মানুষ’ [সূরা আল-মায়িদাহ:১৮] এটা অবশ্যই তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন। [তাবারী]

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٥

২৫. সুতরাং (সেদিন) কি অবস্থা হবে? যেদিন আমি তাদেরকে একত্র করব যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং প্রত্যেককে তাদের অর্জিত কাজের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ
وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ
مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ٢٦

২৬. বলুন, ‘হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। কল্যাণ আপনারই হাতে(১)। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ
وَتُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ
وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٢٧

২৭. ‘আপনি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করান; আপনি মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান। আর আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্‌ক দান করেন।’

---

(১) আয়াতে আল্লাহ্কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছেঃ “আপনার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ”। আয়াতের প্রথমাংশে রাজত্ব দান করা ও ছিনিয়ে নেয়া এবং সম্মান ও অপমান উভয়দিক উল্লেখ করা হয়েছিল। এতে রয়েছে কল্যাণ ও অকল্যাণ। কিন্তু আয়াতে শুধু আল্লাহ্র হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ একথা বলা হয়েছে। অকল্যাণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয় এধরণের শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। তার কারণ হল, সহীহ্ আকীদা অনুসারে আল্লাহ্র প্রতি অকল্যাণের সম্পর্ক দেখানো জায়েয নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেনঃ ‘অকল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে নয়।’ [মুসলিমঃ ৭৭১] কেননা, আল্লাহ্ তা‘আলা বান্দার জন্য অকল্যাণ চান না। মানুষের যাবতীয় অকল্যাণ মানুষের হাতের কামাই করা।

২৮. মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর[১]। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন[২] এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾

২৯. বলুন, ‘তোমাদের অন্তরে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন কর বা ব্যক্ত কর,

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ

(১) কোন কাফেরের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এ আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, মুসলিমদের কোন ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতার চুক্তি করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, যে কেউ সেটা করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র দ্বীনে তার কোন অংশ থাকবে না। কেননা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ঈমানের সাথে একত্রিতভাবে থাকতে পারে না। ঈমান তো শুধু আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র বন্ধু মুমিনদের সাথে সম্পর্ক রাখতে বলে যারা আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে জিহাদ করে। আল্লাহ্ বলেন, “আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীরা তারা পরস্পর পরস্পরের ওলী” [সূরা আত-তাওবাহ: ৭১] সুতরাং কেউ যদি ঈমানদারদের ব্যতীত এমন কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় যারা আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায় এবং তাঁর বন্ধুদেরকে বিপদে ফেলতে চায়, তাহলে সে মুমিনদের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কাফেরদের গণ্ডিভুক্ত হবে। এজন্যই আল্লাহ্ বলেছেন, কেউ যদি তাদেরকে বন্ধু বানায় তবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, কাফেরদের থেকে দুরে থাকতে হবে, তাদেরকে বন্ধু বানানো যাবে না, তাদের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক থাকতে পারবে না। অনুরূপভাবে তাদের প্রতি অনুরাগী হওয়া যাবে না। কোন কাফেরকে মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব দেয়া যাবে না। [সা’দী]

(২) আল্লাহ্‌র ভয়ের পরিবর্তে মানুষের ভয় যেন তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে না রাখে; কেননা মানুষের ভয় ও ক্ষতির সম্ভাবনা দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি ও ক্ষতির সম্ভাবনা দুনিয়া ছাড়িয়ে আখেরাতেও ব্যাপৃত। সুতরাং আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে ভীত থাক। যে কাজে তার শাস্তি অবধারিত সে কাজ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। যদি তোমরা তাঁর অবাধ্য হও তবে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। [সা’দী]

يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾

আল্লাহ্ তা অবগত আছেন[১]। আর আসমানসমূহে যা আছে এবং যমীনে যা আছে তাও তিনি জানেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ۖ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۖ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

৩০. যেদিন প্রত্যেকে সে যা ভাল আমল করেছে এবং সে যা মন্দ কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে, সেদিন সে কামনা করবে- যদি তার এবং এর মধ্যে বিশাল ব্যবধান থাকত[২]! আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।

চতুর্থ রুকূ‘

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ

৩১. বলুন, ‘তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর[৩], আল্লাহ্

(১) আল্লাহ্ তা‘আলা প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু সম্যকরূপে জানেন। মানুষের অন্তরে কি আছে, এমনকি কি উদিত হবে তাও আল্লাহ্ জানেন। কারণ, হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ্ তা‘আলা যখন প্রথম কলম সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে বললেন, লিখ। তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা সবই লিখা হতে লাগল।” [মুসনাদে আহমাদ ৫/৩১৭] সুতরাং মানুষের মনে কি উদিত হবে সেটাও কলম লিখে রেখেছে।

(২) অর্থাৎ তার মধ্যে এবং তার আমলের মধ্যে বিশাল ব্যবধান কামনা করবে। তারা চাইবে যেন তাদের আমলনামা তাদেরকে দেয়া না হয়।

(৩) ভালবাসা একটি গোপন বিষয়। কারো প্রতি কারো ভালবাসা আছে কি না, অল্প আছে কি বেশী আছে, তা জানার একমাত্র মাপকাঠি হল, অবস্থা ও পারস্পরিক ব্যবহার দেখে অনুমান করা অথবা ভালবাসার চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখে জেনে নেয়া। যারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসার দাবীদার এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্খী, আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় ভালবাসার মাপকাঠি তাদের বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ জগতে যদি কেউ আল্লাহ্‌র ভালবাসার দাবী করে, তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণের কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে দেখা অত্যাবশ্যকীয়। এতে আসল ও মেকী ধরা পড়বে। যার দাবী যতটুকু সত্য হবে, সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে ততটুকু যত্নবান হবে

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর।' তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না[১]।

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ আদম, নূহ্ ও ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের[২]

এবং তার শিক্ষার আলোকে পথের মশালরূপে গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে যার দাবী দুর্বল হবে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে তার দুর্বলতা সেই পরিমানে পরিলক্ষিত হবে। ভালবাসা অনুসারে মানুষের হাশরও হবে। হাদীসে এসেছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এর জন্য কি তৈরী করেছ? লোকটি বলল, আমি এর জন্য তেমন সালাত, সাওম ও সাদকা করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস"। [বুখারী: ৬১৭১]

(১) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না"। এ থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ফরয। আল্লাহ্র আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্যের মধ্যে তারতম্য করা যাবে না। আল্লাহ্র নির্দেশ যেমন মানতে হবে, তেমনি রাসূলের নির্দেশও মানতে হবে। কেউ আল্লাহ্র আনুগত্য করল কিন্তু রাসূলের আনুগত্য করল না, সে কুফরীর গণ্ডি থেকে বের হতে পারল না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি যেন কাউকে এ রকম না দেখতে পাই যে, সে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে, তখন তার কাছে আমি যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ দিয়েছি সে সমস্ত আদেশ-নিষেধের কোন কিছু এসে পড়ল, তখন সে বলল: আমরা জানি না, আমরা আল্লাহ্র কিতাবে যা পেয়েছি তার অনুসরণ করেছি"। [আবু দাউদ ৪৬০৫; তিরমিযী: ২৬৬৩; ইবনে মাজাহ: ১৩] সুতরাং কোন ঈমানদারের পক্ষে রাসূলের আদেশ-নিষেধ পাওয়ার পর সেটা কুরআনে নেই বলে বাহানা করার কোন সুযোগ নেই। যদি তা করা হয় তবে তা হবে সুস্পষ্ট কুফরী।

(২) এখানে ইমরান বলতে মার্ইয়াম 'আলাইহাস্ সালামের পিতাকে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মূসা আলাইহিস সালাম এর পিতার নামও ইমরান ছিল। [মুসলিম: ১৬৫]

বংশধরকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর মনোনীত করেছেন[১]।

وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝٣٣

৩৪. তারা একে অপরের বংশধর। আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ذُرِّيَّةً ۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٣٤

৩৫. স্মরণ করুন, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার রব! আমার গর্ভে যা আছে নিশ্চয় আমি তা একান্ত আপনার জন্য মানত করলাম[২]। কাজেই আপনি আমার নিকট থেকে তা কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٣٥

৩৬. তারপর যখন সে তা প্রসব করল তখন সে বলল, 'হে আমার রব! নিশ্চয় আমি তা প্রসব করেছি কন্যারূপে।' সে যা প্রসব করেছে তা সম্পর্কে আল্লাহ্‌

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰى ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْۤ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ

তা এখানে উদ্দেশ্য নয়। পরবর্তী আয়াত থেকেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে ইবরাহীম, ইমরান, ইয়াসীন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের মধ্যে যারা ঈমানদার কেবল তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদেরকেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বাণী ও রহমত বহনের জন্য মনোনীত করেছেন। এদের বংশধরদের মধ্যে যারা কাফের বা মুশরিক তাদের বোঝানো হয়নি। [তাবারী]

(২) কাতাদা বলেন, ইমরানের স্ত্রী তার গর্ভে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দিয়ে দেয়ার মনস্থ করেছিলেন। তারা সাধারণতঃ পুরুষ সন্তানদেরকে উপাসনালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। যদি কাউকে উপসনালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হত, সে কখনো উপাসনালয় ত্যাগ করত না। তার কাজই হতো উপাসনালয়ের দেখাশোনা করা। কোন মহিলাকে এ কাজের জন্য দেয়া হতো না। কারণ, মহিলাকে এ কাজের উপযুক্ত বিবেচনা করা হতো না। কারণ, তার সৃষ্টিগত কিছু সমস্যা রয়েছে, যেমন, হায়েয ও নিফাস। যা উপাসনালয়ে অবস্থানের জন্য উপযুক্ত ছিল না। এ জন্যই ইমরান স্ত্রী যখন সন্তান প্রসব করে দেখলেন যে, তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন, তখন কি করবেন স্থির করতে না পেরে বলেছিলেন, 'রব! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি'। পরবর্তীতে মানত অনুসারে সে কন্যা সন্তানকেই উপাসনালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। [তাবারী]

الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝

সম্যক অবগত। আর পুত্রসন্তান কন্যা সন্তানের মত নয়। আর আমি তার নাম মার্‌ইয়াম রেখেছি(১) এবং অভিশপ্ত শয়তান হতে তার ও তার সন্তানকে আপনার আশ্রয়ে দিচ্ছি(২)।’

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ

৩৭. তারপর তার রব তাকে ভালভাবে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন(৩) এবং তিনি তাকে যাকারিয়্যার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন(৪)। যখনই যাকারিয়্যা

(১) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জন্মের দিনই নাম রাখা জায়েয। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘গত রাতে আমার এক সন্তান জন্ম হয়েছে, আমি তার নাম আমার পিতার নামানুসারে ইব্‌রাহীম রাখলাম।’ [মুসলিমঃ ২৩১৫] অন্য এক হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল, গত রাতে আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, আমি তার কি নাম রাখব? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তার নাম রাখ আব্দুর রহমান।’ [বুখারীঃ ৬১৮৬, মুসলিমঃ ২১৩৩]

(২) এ দো‘আর বরকতে আল্লাহ্ তা‘আলা মার্‌ইয়াম ও ঈসা ‘আলাইহিমাস্ সালামকে শয়তান থেকে হেফাযত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘সন্তান জন্মগ্রহণের সাথে সাথে শয়তান তাকে স্পর্শ করে, ফলে সে চিৎকার করে। কেবলমাত্র মার্‌ইয়াম ও তার সন্তান এর ব্যতিক্রম।’ [বুখারীঃ ৩৪৩১, ৪৫৪৮, মুসলিমঃ ২৩৬৬]

(৩) এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তিনি তাকে দেহসৌষ্ঠবে মনোমুগ্ধকর বানিয়েছিলেন, ফলে যে কেউ তাকে দেখত তার ভক্ত হয়ে যেত। কাতাদা বলেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, মারইয়াম ও ঈসা দুনিয়ার অন্যান্য আদম সন্তানের মত গোনাহের কাজে জড়াত না। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) কিভাবে মারইয়াম আলাইহাস সালাম যাকারিয়্যা আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে আসলেন এখানে বর্ণনা করা হয় নি। পরবর্তী ৪৪ নং আয়াত থেকে সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। যাদেরকে উপাসনালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হতো তারা সাধারণত উপাসনালয়েই থাকত। তাদের আর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু যেহেতু মারইয়াম আলাইহাস সালাম কন্যা সন্তান ছিলেন, সেহেতু তৎকালীন সবাই চিন্তা করলেন যে, তার তত্ত্বাবধান করার মত লোকের প্রয়োজন। সবাই তার তত্ত্বাবধান চাচ্ছিল। এমতাবস্থায় তাদের কলম দিয়ে তারা লটারী করেছিল। সে লটারীতে যাকারিয়্যা আলাইহিস সালামের নাম উঠে এসেছিল।

بِغَيۡرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

তার কক্ষে প্রবেশ করত তখনই তার নিকট খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত। তিনি বলতেন, 'হে মার্‌ইয়াম! এ সব তুমি কোথায় পেলে?' (মার্‌ইয়াম) বলতেন, 'তা আল্লাহ্‌র নিকট হতে।' নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিয্‌ক দান করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبۡ لِيۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيۡعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

৩৮. সেখানেই যাকারিয়্যা তার রবের নিকট প্রার্থনা করে বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে আপনি আপনার নিকট থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী[১]।'

---

(১) যাকারিয়্যা 'আলাইহিস্ সালাম তখনো পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। সময়ও ছিল বার্ধক্যের- যে বয়সে স্বাভাবিকভাবে সন্তান হয় না। তবে আল্লাহ্‌র শক্তি-সামর্থের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, অলৌকিকভাবে এহেন বার্ধক্যের মধ্যেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। তবে অসময়ে ও অস্থানে দান করার আল্লাহ্‌র মহিমা ইতিপূর্বে তিনি কখনো প্রত্যক্ষ করেননি। কিন্তু এসময় যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফলের মওসুম ছাড়াই মার্‌ইয়ামকে ফল দান করেছেন, তখনই তার মনের সুপ্ত আকাঙ্খা জেগে উঠল এবং তার মনে হলো যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মওসুম ছাড়াই যদি ফল দিতে পারেন, তবে বৃদ্ধ দম্পতিকে হয়ত সন্তানও দেবেন। বললেনঃ 'হে আমার রব! আমাকে আপনি আপনার নিকট থেকে সৎ সন্তান দান করুন', এতে বুঝা যায় যে, সন্তান হওয়ার জন্য দো'আ করা রাসূলগণের ও নেককারদের সুন্নাত। অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'আপনার আগে তো আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাঁদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম' অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেরূপ স্ত্রী ও সন্তান দান করা হয়েছে, তদ্রূপ এই নেয়ামত পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও দেয়া হয়েছিল। এখন কেউ যদি কোন পন্থায় সন্তান জন্মগ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে সে শুধু স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে না; বরং রাসূলদের একটি সার্বজনীন ও সর্বসম্মত সুন্নাহ্ থেকেও বঞ্চিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ ও সন্তানের প্রশ্নটিকে অত্যাধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাই যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বিবাহ কিংবা সন্তান গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে, তাকে তিনি স্বীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি দেননি। তিনি বলেনঃ 'বিবাহ আমার সুন্নাহ্। যে ব্যক্তি এ সুন্নাহ্ থেকে বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ কর। কেননা, তোমাদের আধিক্যের কারণে আমি অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব'। [ইবনে মাজাহ্ঃ ১৮৪৬]

৩৯. অতঃপর যখন যাকারিয়্যা ইবাদত কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ফেরেশ্‌তারা তাকে আহ্বান করে বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আপনাকে ইয়াহ্‌ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগমনকৃত এক কালেমাকে সত্যায়নকারী(১), নেতা(২), ভোগ আসক্তিমুক্ত(৩) এবং পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী ।'

فَنَادَتْهُ الْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝٣٩

৪০. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমার পুত্র হবে কিভাবে? অথচ আমার

قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ

(১) এখানে কালেমা বলতে 'ঈসা আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ঈসা আলাইহিস সালামকে 'কালেমাতুল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র বাণী বলা হয়েছে, কারণ, তিনি শুধু আল্লাহ্‌র কালেমা বা নির্দেশে চিরাচরিত প্রথার বিপরীতে পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখানে তাকে 'আল্লাহ্‌র কালাম' বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করে সম্মানিত করাই উদ্দেশ্য। নতুবা সবকিছুই আল্লাহ্‌র কালেমার মাধ্যমেই হয়। তাঁর কালেমা ব্যতীত কিছুই হয় না।

(২) কাতাদা বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ তিনি ইবাদাত, সহিষ্ণুতা, জ্ঞান ও পরহেযগারীতে সবার শীর্ষ নেতা হিসেবে ছিলেন। পক্ষান্তরে মুজাহিদ বলেন, সাইয়্যেদ অর্থ হচ্ছে, তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত ছিলেন। [তাবারী]

(৩) এটা ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস্‌ সালামের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এর অর্থ, যিনি যাবতীয় কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। উদাহরণতঃ উত্তম পানাহার, উত্তম পোষাক পরিধান এবং বিবাহ ইত্যাদি। এ গুণটি প্রশংসার ক্ষেত্রে উল্লেখ করায় বাহ্যতঃ মনে হয় যে, এটাই উত্তম পন্থা। অথচ বিভিন্ন হাদীসে বিবাহিত জীবন-যাপন করাই যে উত্তম একথা প্রমাণিত আছে। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কারো অবস্থা ইয়াহ্‌ইয়া 'আলাইহিস্‌ সালামের মত হয়- অর্থাৎ অন্তরে আখেরাতের চিন্তা প্রবল হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভূত না হয় এবং স্ত্রী ও সন্তানদের হক আদায় করার মত অবকাশ না থাকে, তবে তার পক্ষে বিবাহ না করাই উত্তম। এ কারণেই যে সব হাদীসে বিবাহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ কথাও বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ রাখে এবং স্ত্রীর হক আদায় করতে পারে, তার পক্ষেই বিবাহ করা উত্তম।' [বুখারীঃ ১৮০৬, মুসলিমঃ ১৪০০] এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এর ব্যতিক্রম হলে বিবাহ ওয়াজিব নয়।

وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝

বার্ধক্য এসে গিয়েছে[১] এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা।' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'এভাবেই।' আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন[২]।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۚ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝

৪১. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন দিন[৩]।' তিনি বললেন, 'আপনার নিদর্শন এই যে, তিন দিন আপনি ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলবেন না[৪] আর আপনার রবকে অধিক স্মরণ

(১) এ আয়াতে বার্ধক্যের পরিমাণ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। পক্ষান্তরে সূরা মারইয়ামে বার্ধক্যের পরিমাণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, 'আমি বার্ধক্যে এমনভাবে উপনীত হয়েছি যে আমার জোড়া ও হাড়ের মজ্জাও শুকিয়ে গেছে'। [সূরা মারইয়াম: ৮]

(২) যাকারিয়্যা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। সন্তানের জন্য নিজে দো'আও করেছিলেন। দো'আ কবুল হওয়ার বিষয়ও তিনি অবগত ছিলেন। এতসবের পরেও 'কিভাবে আমার পুত্র হবে' বলার অর্থ, খুশী হওয়া এবং আশ্চার্যান্বিত হওয়া। [মুয়াসসার, সা'দী] তিনি পুত্র হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমানে বার্ধক্যের যে পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি, তা বহাল রেখেই পুত্র দান করা হবে, না এতে কোনরূপ পরিবর্তন করা হবে? [বাগভী] আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরে বলেছিলেন যে, না তোমরা বার্ধক্যাবস্থায়ই থাকবে এবং এ অবস্থাতেই তোমাদের সন্তান হবে। [কাশশাফ]

(৩) প্রতিশ্রুত সেই সুসংবাদটি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতি এবং পুত্র জন্মগ্রহণের পূর্বেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মশগুল হওয়ার উদ্দেশ্যে যাকারিয়্যা 'আলাইহিস্ সালাম নিদর্শন জানতে চেয়েছিলেন। [কাশশাফ; ফাতহুল কাদীর] আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ নিদর্শন দিলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত তুমি মানুষের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলতে সমর্থ হবে না। এ নিদর্শনের মধ্যে সূক্ষ্মতা এই যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিদর্শন চাওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এমন নিদর্শন দিলেন যে, তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম অন্য কোন কাজের যোগ্যই থাকবেন না। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কথা বলতে অক্ষম হলে ইশারা-ইঙ্গিত কথার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দাসীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আল্লাহ্ কোথায়? উত্তরে সে আকাশের দিকে ইশারা করলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ দাসী মুসলিম। তাকে আযাদ করে দাও।' [মুসলিমঃ ৫৩৭]

করুন এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন।’

পঞ্চম রুকূ‘

৪২. আর স্মরণ করুন, যখন ফেরেশ্‌তাগণ বলেছিল, ‘হে মার্‌ইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে মনোনীত করেছেন এবং পবিত্র করেছেন আর বিশ্বজগতের নারীগণের উপর আপনাকে মনোনীত করেছেন[১]।’

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَٰلَمِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩. ‘হে মার্‌ইয়াম! আপনার রবের অনুগত হন এবং সিজ্‌দা করুন আর রুকূ‘কারীদের সাথে রুকূ‘ করুন।’

يَٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪. এটা গায়েবের সংবাদের অন্তর্ভুক্ত, যা আমরা আপনাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি। আর মার্‌ইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল[২] আপনি তখন

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘সবচেয়ে উত্তম মহিলা হলেন মার্‌ইয়াম বিনতে ইমরান। অনুরূপভাবে সবচেয়ে উত্তম মহিলা হলেন খাদীজা বিনতে খুয়াইলেদ।’ [বুখারীঃ ৩৪৩২, মুসলিমঃ ২৪৩০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা লাভ করেছে। মেয়েদের মধ্যে কেবলমাত্র ফির‘আউনের স্ত্রী আছিয়া এবং ইমরানের কন্যা মার্‌ইয়াম পূর্ণতা লাভ করেছে আর সমস্ত নারীদের উপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব যেমন সমস্ত খাবারের উপর ‘ছারীদ’-এর শ্রেষ্ঠত্ব।’ [বুখারী: ৩৪৩৩; মুসলিম: ২৪৩১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সৃষ্টিকুলের মহিলাদের মধ্যে শুধু উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ও ফির‘আউনের স্ত্রী আসিয়া।” [তিরমিযী: ৩৮৭৮; মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩৫; মুসান্নাফে আবদির রায্‌যাক: ১১/৪৩০]

(২) অর্থাৎ তারা কলম ফেলে লটারী করে মারইয়াম আলাইহাস সালাম কার তত্ত্বাবধানে

তাদের নিকট ছিলেন না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনো আপনি তাদের নিকট ছিলেন না।

৪৫. স্মরণ করুন, যখন ফেরেশ্‌তাগণ বললেন, 'হে মার্‌ইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন(১)। তার নাম মসীহ্, মার্‌ইয়াম তনয় 'ঈসা, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের

إِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

থাকবেন সেটা নির্ধারণ করছিলেন। ইসলামী শরীয়তে লটারী সম্পর্কিত বিধান এই যে, যেসব হকের কারণ শরীয়তানুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে, সেসব হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা নাজায়েয এবং তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণতঃ শরীকানাধীন বস্তুর মীমাংসা লটারীযোগে করা এবং লটারীতে যার নাম বের হয় তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটি দিয়ে দেয়া অথবা কোন শিশুর পিতৃত্বে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারীযোগে একজনকে পিতা মনে করে নেয়া। পক্ষান্তরে যেসব হকের কারণ জনগণের রায়ের ওপর ন্যস্ত, সেসব হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা জায়েয। যথা- কোন্ শরীককে কোন্ অংশ দেয়া হবে, সেটা লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করা। এক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে একজনকে পূর্বের অংশ অন্যজনকে পশ্চিমের অংশ দেয়া জায়েয। এর কারণ এই যে, লটারী ছাড়াই উভয়পক্ষ একমত হয়ে যদি এভাবে অংশ নিত অথবা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এভাবে নিত, তবুও তা জায়েয হত। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে সব শরীকের অংশ সমান হয়, সেখানে কোন এক দিককে এক শরীকের জন্যে নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে লটারী জায়েয। [দেখুন, কুরতুবী]

(১) কালেমা দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে? কাতাদা বলেন, কালেমা দ্বারা كُنْ বা 'হও' শব্দ বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] ঈসা আলাইহিস সালামকে 'কালেমাতুল্লাহ' বলার কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি আল্লাহ্‌র কালেমা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন। কেননা, ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারটি জাগতিক কোন মাধ্যম বাদেই সংঘটিত হয়েছে। আর আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিদর্শন ও আশ্চর্যতম সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে মারইয়ামের নিকট পাঠালেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার জামার ফাঁকে ফু দিলেন। এ পবিত্র ফেরেশতার পবিত্র ফুঁ মারইয়ামের গর্ভে প্রবেশ করলে আল্লাহ্ তা'আলা সে ফুঁকটিকে পবিত্র রুহ হিসেবে পরিণত করলেন। আর এ জন্যই তাঁকে সম্মানিত করে 'রুহুল্লাহ' বলা হয়ে থাকে। [তাফসীরে সা'দী]

অন্যতম হবেন[১]।

৪৬. আর তিনি দোলনায়[২] ও বয়োঃপ্রাপ্ত অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলবেন[৩]

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾

(১) অর্থাৎ দুনিয়াতে তার সম্মান হবে অনেক বড়। কারণ, আল্লাহ্ তাকে দৃঢ়সংকল্প রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বড় শরী'আত ও তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তার স্মরণকে এমনভাবে সারা দুনিয়াব্যাপী করেছেন যে, প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্য তার সুনামে ভরপূর করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আখেরাতেও তার মর্যাদা হবে অনেক বেশী। অন্যান্য নবী-রাসূলদের সাথে তিনিও আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করবেন। তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে যারা তার সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তার মুখ থেকে সত্য বের করে বিশেষভাবে সম্মানিত করবেন। [তাফসীরে সা'দী]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'দোলনায় মাত্র তিন জন কথা বলেছেন। ঈসা, জুরাইজের সময়ের এক ছোট বাচ্ছা আর একটি বাচ্ছা।' [বুখারীঃ ২৪৮২, অনুরূপ ৩৪৩৬; মুসলিমঃ ২৫৫০] দোলনায় তিনি কি কথা কাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন তা এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, তিনি তার কাওমের লোকদেরকে তার নিজের পরিচয় দিয়ে তার মাকে বিব্রত অবস্থা থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন, 'যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে। 'আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য; 'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হব।' [সূরা মারইয়াম: ৩০-৩৩]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম শৈশব ও পৌঢ় বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবেন। নিঃসন্দেহে শৈশবে পূর্ণ বয়স্কদের মত জ্ঞানীসুলভ, মেধাসম্পন্ন প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাবে কথা বলা একটি মু'জিযা। কিন্তু তার সাথে 'পৌঢ় বয়সে কথা বলা'র ব্যাপারটির কি সম্পর্ক থাকতে পারে? অধিকাংশ আলেমদের নিকট এর উত্তর এই যে, মূলত: শৈশব অবস্থায় কথা বলার মু'জিযা বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। তার সাথে পৌঢ় বয়সেও কথা বলবেন বলা দ্বারা উভয় অবস্থায়ই তার কথা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানীসুলভ হবে এমনটি বোঝানো হয়েছে। কোন কোন আলেম বলেন, তিনি যেহেতু যুবক বয়সে পৌঢ় হবার পূর্বেই আসমানে উত্থিত হয়েছেন, সেহেতু এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি পৌঢ় অবস্থায় আবার ফিরে এসে মানুষের সাথে কথা বলবেন। সুতরাং আবার ফিরে আসার ব্যাপারটি এ আয়াতের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়ে গেল। যা আরেকটি অলৌকিক ব্যাপার।

এবং তিনি হবেন পূণ্যবানদের একজন।'

৪৭. সে বলল, 'হে আমার রব! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, এমতাবস্থায় আমার সন্তান হবে কিভাবে?' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'এভাবেই', আল্লাহ্ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়[১]।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল।'

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾

(১) এ আয়াতে মারইয়াম আলাইহাস সালাম কর্তৃক ঈসা আলাইহিস সালামকে গর্ভে ধারনের বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা সূরা মারইয়ামে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, "বর্ণনা করুন এ কিতাবে মার্‌ইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল, তারপর তাদের থেকে সে পর্দা করল। এরপর আমরা তার কাছে আমাদের রূহকে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মার্‌ইয়াম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) যদি তুমি 'মুত্তাকী হও', সে বলল, 'আমি তো তোমার রব-এর দূত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য। মার্‌ইয়াম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?' সে বলল, 'এ রূপই হবে।' তোমার রব বলেছেন, 'এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমরা তাকে এজন্যে সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমাদের কাছ থেকে এক অনুগ্রহ; এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।' তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল; [১৬-২২] এখানেও গর্ভে ধারনের প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেটা বলা হয়নি। সূরা আল-আম্বিয়ায় বলা হয়েছে যে, "অতঃপর আমরা তার (মারইয়ামের) মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম" [৯১]। আর যিনি রূহ ফুঁকে দেয়ার কাজটি করেছিলেন, তিনি ছিলেন জিবরীল আলাইহিস সালাম। কারণ, সূরা আলে ইমরান ও সূরা মারইয়ামের আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মারইয়ামের কাছে যিনি এসেছিলেন, তিনি স্বয়ং জিবরাইল আলাইহিস সালাম। এ সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করলে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মকাহিনী স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ
مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ
الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ
الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ
اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۴۹﴾ۚ

৪৯. আর তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূলরূপে' (প্রেরণ করবেন, তিনি বলবেন) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দ্বারা একটি পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করব; তারপর তাতে আমি ফুঁ দেব; ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে সেটা পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহ্‌র হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে নিরাময় করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও এবং মজুদ কর তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা মুমিন হও।'

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ
مِّنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۵۰﴾

৫০. 'আর আমার সামনে তাওরাতের যা রয়েছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমাদের জন্য যা হারাম ছিল তার কিছু হালাল করে দিতে। এবং আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ
مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۵۱﴾

৫১. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদেরও রব, কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর। এটাই সরল পথ[১]।'

(১) এখানেও 'সিরাতে মুস্তাকীম' বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। যেমন পূর্বে সূরা আল-ফাতিহার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

৫২. যখন 'ঈসা তাদের থেকে কুফরী উপলব্ধি করলেন তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র পথে কারা আমার সাহায্যকারী[১]?' হাওয়ারীগণ[২] বলল, 'আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. 'হে আমাদের রব! আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুসরণ করেছি। কাজেই আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।'

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আর তারা কুটকৌশল করেছিল আল্লাহ্‌ও কৌশল করেছিলেন; আর

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾

(১) এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। মুজাহিদ বলেনঃ এর অর্থ হল কে আমার অনুসরণ করবে আল্লাহ্‌র পথে? সুফিয়ান সাওরী বলেনঃ এর অর্থ কে আল্লাহ্‌র সাথে আমাকে সহযোগিতা করবে? মুজাহিদের কথা এখানে সবচেয়ে বেশী প্রণিধানযোগ্য। তবে সবচেয়ে স্পষ্ট মত হল, এর অর্থ কে আমাকে সাহায্য করবে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানের ক্ষেত্রে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের মৌসুমে ডেকে ডেকে বলতেনঃ 'এমন কে আছে যে আমাকে আশ্রয় দেবে, যাতে করে আমি আমার প্রভূর বাণী প্রচার করতে পারি। কেননা, কুরাইশরা আমাকে আমার রবের বাণী প্রচারে বাধা দিচ্ছে।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৩৩৯-৩৪০]

(২) ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের খাঁটি ভক্তদের উপাধি ছিল হাওয়ারী- তাদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে অথবা যেহেতু তারা সাদা পোষাক পরিধান করতেন এ জন্য তাদেরকে হাওয়ারী নামে অভিহিত করা হত। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের উপাধি ছিল সাহাবী। কোন কোন তাফসীরবিদ হাওয়ারীদের সংখ্যা দ্বাদশ উল্লেখ করেছেন। 'হাওয়ারী' শব্দটি কোন সময় শুধু সাহায্যকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'প্রত্যেক রাসূলের একজন হাওয়ারী অর্থাৎ খাঁটি সহচর থাকে আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়ের' [বুখারীঃ ২৬৯১, মুসলিমঃ ২৪১৫]

আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী[১]।

ষষ্ঠ রুকূ'

৫৫. স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ বললেন, 'হে 'ঈসা! নিশ্চয় আমি আপনাকে পরিগ্রহণ করব[২], আমার নিকট আপনাকে

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ

(১) আরবী ভাষায় 'মাকর' শব্দের অর্থ সুরক্ষা ও গোপন কৌশল। উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য মকর ভাল এবং মন্দ লক্ষ্য অর্জনের জন্য হলে তা মন্দও হতে পারে। এ আয়াতে কাফেরদের 'মাকার'-এর বিপরীতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও 'মাকার' করার কথা এ কারণেই যোগ করা সঠিক হয়েছে। বাংলা ভাষার বাচনভঙ্গিতে 'মাকার' শব্দটি শুধু ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ নিয়ে আরবী বাচনভঙ্গিতে সন্দেহ করা উচিত নয়। আরবী অর্থের দিক দিয়েই এখানে আল্লাহ্কে 'শ্রেষ্ঠতম কুশলী' বলা হয়েছে। তাছাড়া مَكْر ও خِدَاع এবং এ জাতীয় শব্দসমূহের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো, এগুলো যদি কাফেরদের مَكْر ও خِدَاع এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয় তখন সেটি খারাপ গুণ হিসেবে বিবেচিত হয় না। বরং কাফেরদের مَكْر ও خِدَاع এর বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে مَكْر ও خِدَاع করা একটি ইতিবাচক গুণ। [সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, আস-সাক্কাফ] উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াহূদীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল অবলম্বন করতে আরম্ভ করে। তারা অনবরত বাদশাহ্র কাছে বলতে থাকে যে, লোকটি আল্লাদ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে বাদশাহ্ তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। ইয়াহূদীদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশলও স্বীয় পথে অগ্রসর হচ্ছিল। পরবর্তী আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে।

(২) مُتَوَفِّيكَ শব্দের ধাতু توفي এবং মূলধাতু وفي অভিধানে এর অর্থ পুরোপুরি লওয়া। আরবী ভাষার সব অভিধান গ্রন্থেই এ অর্থ রয়েছে। মৃত্যুর সময় মানুষ নির্ধারিত আয়ূপূর্ণ করে ফেলে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত আত্মা পুরোপুরি নিয়ে নেয়া হয়। এ কারণে শব্দটি মৃত্যু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৈনন্দিন নিদ্রা মৃত্যুর একটি হাল্কা নমুনা। কুরআনে এ অর্থেও توفي শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্ মৃত্যুর সময় প্রাণ নিয়ে নেন। আর যাদের মৃত্যু আসে না, তাদের প্রাণও নিদ্রার সময় নিয়ে নেন।" [সূরা আয্-যুমারঃ ৪২] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ مُتَوَفِّيكَ এর অর্থ, 'আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যামানায় স্বাভাবিক মৃত্যুদান করব। এ তাফসীরের সারমর্ম এই যে, مُتَوَفِّيكَ শব্দের অর্থ মৃত্যু; কিন্তু আয়াতের শব্দে رَافِعُكَ إِلَيَّ প্রথমে ও مُتَوَفِّيكَ পরে হবে। এখানে مُتَوَفِّيكَ কে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নিজের কাছে

اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

উঠিয়ে নিব(১) এবং যারা কুফরী করে তাদের মধ্য থেকে আপনাকে পবিত্র করব। আর আপনার অনুসারিগণকে কেয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উপর প্রাধান্য দিব, তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।’ অতঃপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটেছে আমি তোমাদের মধ্যে তার মীমাংসা করে দেব(২)।

উঠিয়ে নেয়া চিরতরে নয়; বরং এ ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্য হবে। এরপর তিনি আবার দুনিয়াতে আসবেন, শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এভাবে আকাশ থেকে পুনর্বার অবতরণ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের পর মৃত্যুবরণের ঘটনাটি একাধারে একটি মু‘জিযা। এতদসঙ্গে ঈসা ‘আলাইহিস্ সালামের সম্মান ও মর্যাদার পূর্ণত্বলাভ এবং নাসারাদের এ বিশ্বাসের খণ্ডন যে, ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম অন্যতম উপাস্য। নতুবা জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরও জোরদার হয়ে যেত যে, তিনিও আল্লাহ্ তা‘আলার মতই চিরঞ্জীব এবং ভালমন্দের নিয়ামক। এ কারণে প্রথমে مُتَوَفِّيكَ বলে এসব ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এরপর নিজের দিকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) এতে বাহ্যতঃ ঈসা ‘আলাইহিস্ সালামকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনাকে উপরে উঠিয়ে নেব। সবাই জানেন যে, ঈসা শুধু আত্মার নাম নয়; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের নাম। কাজেই আয়াতে দৈহিক উত্তোলন বাদ দিয়ে শুধু আত্মিক উত্তোলন বুঝা সম্পূর্ন ভুল। কুরআনের অন্যত্রও ইয়াহূদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ﴿بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ অর্থাৎ ইয়াহূদীরা নিশ্চিতই ঈসাকে হত্যা করেনি, বরং “আল্লাহ্ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।” [সূরা আন্-নিসাঃ ১৫৮] “নিজের কাছে তুলে নেয়া” সশরীরে তুলে নেয়াকেই বলা হয়।

(২) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা ইয়াহূদীদের বিপক্ষে ঈসা আলাইহিস্ সালামের সাথে পাঁচটি অঙ্গীকার করেছেনঃ
সর্বপ্রথম অঙ্গীকার এই যে, তার মৃত্যু ইয়াহূদীদের হাতে হত্যার মাধ্যমে হবে না; বরং প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায় হবে। প্রতিশ্রুত সময়টি কেয়ামতের নিকটতম যামানায় আসবে। তখন ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিভিন্ন সহীহ্ ও মুতাওয়াতির হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল যে, ঈসা ‘আলাইহিস্ সালামকে আপাততঃ ঊর্ধ্ব জগতে তুলে নেয়া হবে। সাথে সাথে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়। তৃতীয় অঙ্গীকার ছিল

৫৬. তারপর যারা কুফরী করেছে আমি তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই[১]।

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾

শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করা। এ অঙ্গীকার এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করে ইয়াহূদীদের যাবতীয় অপবাদ দূর করে দেন। উদাহরণতঃ পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করার কারণে ইয়াহূদীরা ঈসা আলাইহিস্ সালামের জন্ম বিষয়ে অপবাদ আরোপ করত। কুরআন এ অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র কুদরত ও নির্দেশে পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। আদমের জন্মগ্রহণ ছিল আরো বেশী বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ, তিনি পিতা ও মাতা উভয় ব্যতিরেকেই জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াহূদীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের বিরুদ্ধে ইলাহ্ হওয়ার দাবী করার অভিযোগও এনেছিল। কুরআনের অনেক আয়াতে এর বিপরীতে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের বন্দেগী ও মানবত্বের স্বীকারোক্তি বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অঙ্গীকারে বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীর বিপক্ষে আপনার অনুসারীদের কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা হবে। আয়াতে অনুসরণের অর্থ ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের নবুওয়াতে বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি করা। এর জন্য যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করা শর্ত নয়। এভাবে নাসারা ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় তার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মুসলিমরাও ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের নবুওয়াতে বিশ্বাসী। এটা ভিন্ন কথা যে, এতটুকু বিশ্বাসই আখেরাতের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করার উপর আখেরাতের মুক্তি নির্ভরশীল। ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের অকাট্য বিধানাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই যে, পরবর্তীকালে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও ঈমান আনতে হবে। নাসারারা এটি পালন করেনি। ফলে তারা আখেরাতের মুক্তি থেকে বঞ্চিত। মুসলিমরা এটিও পালন করেছে। ফলে তারা আখেরাতে মুক্তির অধিকারী হয়েছে। পঞ্চম অঙ্গীকার এই যে, কেয়ামতের দিন সব ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসা করা হবে। সময় এলে এ অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে।

(১) ইয়াহূদীরা একথা বলে যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়ে সমাহিত হয়ে গেছেন এবং পরে জীবিত হননি। বর্তমানে নাসারাগণও ইয়াহূদীদের আকীদা-বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে বলে থাকে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম শূলে বিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। অবশ্য তারা এটাও বলে থাকে যে, তিনি পরে জীবিত হয়ে আবার আকাশে চলে গিয়েছেন। প্রকৃত কথা হলো, ঈসা আলাইহিস সালামকে তারা হত্যা করতে সক্ষম হয়নি। বরং আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের শত্রুদের চক্রান্ত স্বয়ং তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ যেসব ইয়াহূদী তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। আর আল্লাহ্ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. এটা আমরা আপনার নিকট তেলাওয়াত করছি আয়াতসমূহ ও হেকমতপূর্ণ বাণী থেকে।

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

৫৯. নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ‘ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন; তারপর তাকে বলেছিলেন, ‘হও’, ফলে তিনি হয়ে যান।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

৬০. (এটা) আপনার রবের নিকট থেকে সত্য, কাজেই আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না[১]।

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে হুবহু ঈসা ‘আলাইহিস্ সালামের ন্যায় করে দেন। অতঃপর ঈসা ‘আলাইহিস্ সালামকে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেন। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾ “তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলীতেও চড়ায়নি। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৌশলে তারা সাদৃশ্যের ধাঁধায় পতিত হয়” [সূরা আন্-নিসাঃ ১৫৭] এভাবে তারা নিজেদের লোককে হত্যা করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এ দুই দলের বিপরীতে ইসলামের বিশ্বাস আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য কতিপয় আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে ইয়াহূদীদের কবল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নিয়েছেন। তাকে হত্যা করা হয়নি এবং শূলিতেও চড়ানো হয়নি। তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে বিদ্যমান রয়েছেন এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আকাশ থেকে অবতরণ করে ইয়াহূদীদের বিপক্ষে জয়লাভ করবেন, অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এ বিশ্বাসের উপর সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

(১) এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সূরা আলে-ইমরানে আল্লাহ্ তা‘আলা পূর্ববর্তী রাসূলগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে আদম, নূহ্, ইব্রাহীম ও ইমরানের বংশধরের কথা একটি মাত্র আয়াতে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। এরপর প্রায় বাইশটি আয়াতে ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম ও তার পরিবারের উল্লেখ এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে,

৬১. অতঃপর আপনার নিকট জ্ঞান আসার | فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ

কুরআন যার প্রতি নাযিল হয়েছে তার উল্লেখও এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের মাতামহীর উল্লেখ, তার মানতের বর্ণনা, জননীর জন্ম, তার নাম, তার লালন-পালনের বিস্তারিত বিবরণ, ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের জননীর গর্ভে আগমন, অতঃপর জন্মের বিস্তারিত অবস্থা, জন্মের পর জননী কি পানাহার করলেন, শিশু সন্তানকে নিয়ে গৃহে আগমন, পরিবারের লোকদের ভর্ৎসনা, জন্মের পরপরই ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের বাকশক্তি প্রাপ্তি, যৌবনে পদার্পণ, স্বজাতিকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান, তাদের বিরোধিতা, সহচরদের সাহায্য, ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র, জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়া প্রভৃতি। এরপর মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে তার আরো গুণাবলী, আকার আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণও এমনিভাবে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র কুরআন ও হাদীসে কোন রাসূলের জীবনালেখ্য এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। সামান্য চিন্তা করলেই এ বিষয়টির কারণ পরিস্কার হয়ে যায় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী, তার পর আর কোন নবী আসবেন না। এ কারণে, তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে কেয়ামত পর্যন্ত সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই একদিকে তিনি পরবর্তীকালে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সাধারণ গুণাবলীর মাধ্যমে ও অনেকের বেলায় নাম উল্লেখ করে তাদের অনুসরণ করতে জোর তাকিদ করেছেন। অপরদিকে উম্মতের ক্ষতিসাধনকারী পথভ্রষ্ট লোকদের পরিচয়ও বলেছেন। পরবর্তীকালে আগমনকারী পথভ্রষ্টদের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হবে দাজ্জাল। তার ফেৎনাই হবে সর্বাধিক বিভ্রান্তিকর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এত বেশী হাল-হাকীকত বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার আগমনের সময় সে যে পথভ্রষ্ট, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকবে না। এমনিভাবে পরবর্তীকালে আগমনকারী সংস্কারক ও অনুসরণযোগ্য মনীষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নবুওয়াত ও রিসালতের সম্মানে ভূষিত করেছেন; দাজ্জালের ফেৎনার সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্য আকাশে জীবিত রেখেছেন এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জাল হত্যার জন্য নিয়োজিত হবেন। এ কারণে তার জীবনালেখ্য ও গুণাবলী মুসলিম সম্প্রাদয়ের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে তার অবতরণের সময় তাকে চেনার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ ও বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। এর রহস্য ও উপযোগিতা অনেক। প্রথম, তার পরিচয়ে জটিলতা থাকলে তার অবতরণের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। মুসলিম সম্প্রদায় তার সাথে সহযোগিতা করবে না। ফলে তিনি কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন? দ্বিতীয়, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সে সময় নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট হয়ে জগতে আসবেন না; বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানের উদ্দেশ্যে আগমন করবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি স্বীয় নবুওয়াতের পদ থেকে অপসারিতও হবেন না। তৃতীয়, ঈসা 'আলাইহিস্

تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٦١﴾

পর যে কেউ এ বিষয়ে আপনার সাথে তর্ক করে তাকে বলুন, 'এস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, তারপর আমরা মুবাহালা (বিনীত প্রার্থনা) করি, অতঃপর মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্‌র লা'নত[১]।'

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

৬২. নিশ্চয় এগুলো সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন হক ইলাহ্ নেই। আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো পরম পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সালামের অবতরণের ঘটনা দুনিয়ার অন্তিম পর্যায়ে সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় তার অবস্থা ও লক্ষণাদি অস্পষ্ট হলে অন্য কোন প্রতারকের পক্ষ থেকে এরূপও দাবী করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, আমিই মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম। এখন কেউ এরূপ করলে লক্ষণাদির সাহায্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে। উদাহরণতঃ হিন্দুস্থানে এক সময় মির্যা কাদিয়ানী দাবী করে বসে যে, সে-ই প্রতিশ্রুত মসীহ্। মুসলিম ওলামাগণ এসব লক্ষণের সাহায্যেই তার ভ্রান্ত দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুবাহালা হলো, যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহ্‌র লা'নতের অধিকারী হয়। মূলত: 'লা'নত' অর্থ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া। আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া মানেই আল্লাহ্‌র ক্রোধে পড়া। এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হোক। এরূপ করার পর যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিফল ভোগ করবে। সে সময় সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিচয় অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এভাবে প্রার্থনা করাকে 'মুবাহালা' বলা হয়। এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একত্রিত করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

৬৩. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত(১) ।

সপ্তম রুকূ'

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আপনি বলুন, হে আহ্লে কিতাবগণ! এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি, তাঁর সাথে কোন কিছুকে

(১) এ 'মুবাহালা'র পটভুমি সম্পর্কে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাজরানের নাসারাদের মধ্য হতে 'আকেব ও আস-সাইয়্যেদ নামীয় দুই নেতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে [তাদের ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক তা নির্ধারণের ব্যাপারে] মুলা'আনাহ করার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করল । তারপর তাদের একজন অপরজনকে বলল, এটা করতে যেয়ো না; কারণ, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি তিনি নবী-ই হয়ে থাকেন এবং আমাদেরকে বদ-দো'আ করেন, তাহলে আমরা ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কখনো সফলকাম হতে পারবো না । তারপর তারা দু'জন [পূর্ববর্তী মুবাহালা করার মত থেকে সরে এসে] এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আপনি আমাদের কাছে যা চাইবেন তা-ই আমরা দিব, তবে আপনি আমাদের কাছে একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠান । আমানতদার ব্যক্তি ব্যতীত কাউকে পাঠাবেন না । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের সাথে বাস্তবিকই একজন আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাব । এ কথা বলার পর সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই সেই আমানতদার ব্যক্তিটি হবার ব্যাপারে উৎসাহী হলেন । কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ! তুমি উঠ ।" যখন তিনি দাঁড়ালেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এই হচ্ছে এ উম্মতের আমানতদার ব্যক্তি ।" [বুখারী: ৪৩৮০, মুসলিম: ২৪২০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবন আব্বাস বলেন, "যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুবাহালাহ করতে চেয়েছিল তারা যদি তা করত তবে তারা ফিরে গিয়ে কোন সম্পদ-পরিবার খুজে পেত না ।" [তিরমিযী: ৩৩৪৫, মুসনাদে আহমাদ ১/২৪৮]

ইবন কাসীর বলেন, এ ঘটনা হিজরী ৯ম সনে সংঘটিত হয়েছিল । তার পূর্বেই জিযিয়া করের বিধান সম্বলিত সূরা আত-তাওবাহ্ এর আয়াত নাযিল হয়েছিল । [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

শরীক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ছাড়া একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি।' তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম(১)।'

৬৫. হে আহ্লে কিতাবগণ! ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীল তো তার পরেই নাযিল হয়েছিল? সুতরাং তোমরা কি বুঝ না(২)?

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٦٥

(১) এ আয়াত থেকে দ্বীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর একটি মূলনীতি জানা যায়। তা এই যে, ভিন্ন মতাবলম্বী কোন দলকে দ্বীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে হলে প্রথমে তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতিই আহ্বান জানানো উচিত, যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোম সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন এমন বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে উভয়েই একমত ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ। আমন্ত্রণ লিপিতে লিখা হয়েছিলঃ 'আমি আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি- যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। এ পত্র আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যে হেদায়াতের পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। মুসলিম হয়ে যান; শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি বিমুখ হন, তবে আপনার প্রজা সাধারণের গোনাহ্ আপনার উপর পতিত হবে। "হে আহলে কিতাবগণ! এমন এক বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। তা এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত করব না। তাঁর সাথে অংশীদার করব না এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করব না।" [বুখারীঃ ৭]

(২) এ আয়াতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আহলে কিতাবদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিষয়টি বর্ণিত হয় নি। তবে অন্য স্থানে সেটি এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাদের ঝগড়ার কারণ হচ্ছে, প্রত্যেকেই তাকে তাদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করছে। ইয়াহূদীরা বলে যে, ইবরাহীম ইয়াহূদী ছিলেন। আর নাসারারা বলে যে, তিনি নাসরানী ছিলেন। এর প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণী: "তোমরা কি বল যে, 'অবশ্যই ইব্রাহীম, ইস্মা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহূদী বা নাসারা ছিল?' বলুন, 'তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্?" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৪০] তবে পরবর্তী ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবদের

৬৬. সাবধান, তোমরা তো সে সব লোক, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমরা তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. ইব্রাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তারাই ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এ নবী ও যারা ঈমান এনেছে; আর আল্লাহ্ মুমিনদের অভিভাবক[১]।

إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

বিবাদের বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। কারণ সেখানে বলা হয়েছে, "ইব্রাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না"।

হাদীসে এসেছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতে, নাজরানের নাসারা ও মদীনার ইয়াহূদী সর্দাররা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে একত্রিত হয়ে বিবাদে লিপ্ত হলো। ইয়াহূদীরা বলতে লাগল যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইয়াহূদী ছিলেন, আর নাসারারা বলতে লাগল যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নাসরানী ছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন যে, তোমাদের কি হলো যে, একটি প্রকাশ্য বিষয়কে ভিন্ন রূপ দিচ্ছ? তাওরাত ও ইঞ্জীল তো ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরে নাযিল হয়েছে। আর সে কিতাবদ্বয়ের নাযিলের পরে ইয়াহূদীবাদ ও খ্রীস্টানবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কিভাবে ইয়াহূদী বা নাসারা হতে পারে? [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) অর্থাৎ ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতম হলেন যারা তার আনীত দ্বীনের উপর আছেন ও এই নবী অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং এই নবীর উম্মাতদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে অর্থাৎ মুহাজির-আনসার ও অন্যান্য পরবর্তী উম্মাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'প্রত্যেক নবীরই নবীদের মধ্য থেকে কিছু অভিভাবক থাকেন। আমার অভিভাবক হলেন আমার পিতা, আমার রবের খলীল (অর্থাৎ ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম)।' [তিরমিযীঃ ২৯৯৮, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/২৯২, ৫৫৩]

৬৯. কিতাবীদের একদল চায় যেন তোমাদেরকে বিপথগামী করতে পারে, অথচ তারা নিজেদেরকেই বিপথগামী করে। আর তারা উপলব্ধি করে না।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ۚ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. হে কিতাবীরা! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী কর, যখন তোমরাই সাক্ষ্য বহন কর[১]?

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১. হে কিতাবীরা! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর[২] এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমরা জান[৩]?

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾

(১) কাতাদা বলেন, এর অর্থ, হে কিতাবী সম্প্রদায়! কিভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করতে পার, অথচ তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাগুণ তোমাদের কিতাবে রয়েছে। তারপর তোমরা তার সাথে কুফরী কর, তা অগ্রাহ্য কর এবং তার উপর ঈমান আনয়ন কর না। তোমরা তোমাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে তাকে উম্মী নবী হিসেবে দেখতে পাও, যিনি আল্লাহ্‌র উপর এবং তার কালেমার উপর ঈমান রাখেন। [তাবারী]

(২) ইবনে আব্বাস বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুছ ছাইফ, আদী ইবন যায়দ ও হারেস ইবন আওফ পরস্পর পরস্পরকে বলল: আস, যা মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের উপর নাযিল হয়েছে আমরা সেটার উপর সকালবেলায় ঈমান আনয়ন করি এবং সন্ধ্যা বেলা সেটার সাথে কুফরী করি। যাতে করে মুসলিমরা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহে ঘুরপাক খেতে থাকে। ফলে আমরা যে রকম করেছি তারাও সে রকম করবে। আর এতে করেই তারা তাদের দ্বীন থেকে সরে আসবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। [তাবারী]

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে 'তোমরা কেন হককে বাতিলের বা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর' এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা কেন ইসলামের সাথে ইয়াহূদী মতবাদ ও খ্রীস্টানদের মতবাদকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেখছ? অথচ তোমরা ভাল করেই জান যে, যে দ্বীন ব্যতীত আর কোন কিছু আল্লাহ্ কবুল করবেন না, আর কোন প্রতিফল কেউ পাবে না, সেটি হচ্ছে ইসলাম। [তাবারী]

(৩) কাতাদা বলেন, জেনে-বুঝে সত্য গোপন করার অর্থ হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিষয়টি তারা গোপন করছে। অথচ তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের তাওরাত ও ইঞ্জীলে আলোচনা ও গুণাগুণ দেখতে পায়। যিনি সৎকাজের আদেশ করবেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবেন। [তাবারী]

অষ্টম রুকূ‘

৭২. আর কিতাবীদের একদল বলল, ‘যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তোমরা দিনের শুরুতে তাতে ঈমান আন এবং দিনের শেষে কুফরী কর; যাতে তারা ফিরে আসে[১]।

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩. আর যে তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করে তাদেরকে ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস করো না[২]।’ বলুন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ। এটা এ জন্যে যে তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে অনুরূপ আর কাউকেও দেয়া হবে অথবা তোমাদের রবের সামনে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে[৩]।’ বলুন, ‘নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছে তা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।’

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ أَنْ يُّؤْتٰٓى أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

---

(১) কাতাদা বলেন, ইয়াহূদীরা একে অপরকে বলত: তাদের দ্বীনের ব্যাপারে দিনের শুরুতে সন্তোষ প্রকাশ কর। আর দিনের শেষে অস্বীকার কর। এতে করে মুসলিমরা তোমাদেরকে সত্যয়ন করবে এবং বুঝে নিবে যে, নিশ্চয় তোমরা মুসলিমদের মাঝে এমন কিছু দেখেছ যা অপছন্দনীয়। আর এভাবেই সহজে মুসলিমরা তাদের দ্বীন ছেড়ে দিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। [তাবারী]

(২) এটাও কিতাবীরা পরস্পরকে বলে। তারা এর মাধ্যমে শিখিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা কখনও কোন মুসলিমকে বিশ্বাস করে তোমাদের গোপন মনের কথা বলে দিও না। এতে তারা সাবধান হয়ে যাবে। [তাফসীরে ইবন কাসীর]

(৩) মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ তাদের এসব কর্মকাণ্ডের মূল কারণ হচ্ছে, ইয়াহূদীরা তাদের ছাড়া অন্যদের মাঝে নবুওয়ত আসবে বা অন্যদের মত তারাও একইভাবে কোন দ্বীনের অনুসারী হবে, এটা সহ্য করতে পারছে না। ফলে হিংসা তাদেরকে ঈমান আনতে বাধা দিচ্ছে। কাতাদা বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা ইয়াহূদীদের সম্বোধন করে বলছেন, যখন আল্লাহ্ অন্যদের প্রতি তোমাদের কিতাবের মত কিতাব নাযিল করল এবং তোমাদের নবীর মত নবী অন্যদেরকেও প্রদান করল তখনি তোমরা হিংসা আরম্ভ করলে। [তাবারী]

৭৪. তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাকে ইচ্ছে একান্ত করে বেছে নেন[১]। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾

৭৫. আর কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দেবে[২]; আবার এমন লোকও আছে যার কাছে একটি দিনার আমানত রাখলেও তার উপর সর্বোচ্চ তাগাদা না দিলে সে তা ফেরত দেবে না। এটা এ কারণে যে, তারা বলে, 'উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই'[৩] আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বলে।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

(১) অনুগ্রহ বলতে যাবতীয় অনুগ্রহই উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে তাফসীরবিদ মুজাহিদের মতে, এখানে অনুগ্রহ বলে নবুওয়াত বোঝানো হয়েছে। কারণ, পূর্বের আয়াতে এ কারণেই ইয়াহূদীরা হিংসা করে ঈমান আনতে বিরত থাকছে বলে জানানো হয়েছে। [তাবারী]

(২) এ আয়াতে আমানতে বিশ্বস্তদের প্রশংসা করা হয়েছে। আয়াতে 'কিছু সংখ্যক লোক' বলে যদি ঐসব আহলে-কিতাবকে বুঝানো হয়ে থাকে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে এ প্রশংসায় কোনরূপ জটিলতা নেই। কিন্তু যদি সাধারণ আহলে-কিতাব বুঝানো হয়ে থাকে, যারা অমুসলিম, তবে প্রশ্ন হয় যে, কাফেরের কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়; এমতাবস্থায় তার প্রশংসার অর্থ কি? উত্তর এই যে, প্রশংসা করলেই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া বুঝায় না। এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, ভাল কাজ কাফেরের হলেও তা এক পর্যায়ে ভালই। সে এর উপকার দুনিয়াতে সুখ্যাতির আকারে পাবে। এ বর্ণনায় একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা নেই, বরং সে খোলা মনে প্রতিপক্ষের সদগুণাবলীরও প্রশংসা করে।

(৩) কাতাদা বলেন, ইয়াহূদীরা বলত: আরবদের যে সমস্ত সম্পদ আমাদের হস্তগত হবে সেটা ফেরত দেয়ার কোন সুযোগ নেই। [তাবারী] বস্তুত ইয়াহূদীরা তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য সকল মানুষকে 'উমামী' বা 'জুয়ায়ী' ইত্যাদি নাম দিয়ে থাকে। তারা মনে করে যে, তারাই আল্লাহ্‌র একমাত্র পছন্দনীয় জাতি। তারা ব্যতীত আর কারও জান বা মালের কোন সম্মান থাকতে পারে না।

৭৬. হ্যাঁ অবশ্যই, কেউ যদি তার অংগীকার পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন[১]।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝٧٦

৭৭. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র সাথে করা প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য খরিদ করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই[২]। আর আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٧٧

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এখানে তাকওয়া বলে শির্ক থেকে বেঁচে থাকা বোঝানো হয়েছে। যারা শির্ক থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন। [তাবারী]

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এক ব্যক্তি তার পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে দাঁড়িয়ে শপথ করে বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমাকে এর চেয়ে বেশী মূল্য দিতে চেয়েছিল' অথচ তা সত্য ছিল না, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন মুসলিমকে বিভ্রান্ত করে তার পণ্য গ্রহণ করতে উদ্ধুদ্ধ করা। তখন এ আয়াত নাযিল হল। [বুখারীঃ ২০৮৮] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা বলেন, দালালমাত্রই সুদখোর ও খেয়ানতকারী। [বুখারী] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। এক. কোন লোকের অতিরিক্ত পানি থাকা সত্বেও কোন মুসাফিরকে দিতে নিষেধ করেছে। দুই. কোন লোক রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে কেবলমাত্র দুনিয়ালাভের জন্যই আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে। ফলে তাকে দুনিয়ার কোন সম্পদ দেয়া হলে সে সন্তুষ্ট থাকে, না দেয়া হলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তিন. ঐ ব্যক্তি যে আসরের পরে তার পণ্য বিক্রির জন্য বিছিয়ে নিয়েছে, তারপর বলতে থাকে যে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাকে (পূর্বে) এ পণ্যের জন্য এত এত দেয়ার কথা বলেছে (অর্থাৎ লোকেরা এর দাম এত এত বলেছে)। আর এটা শুনে কোন লোক তাকে সত্যবাদী মনে করে নিয়েছে (এবং তা ক্রয় করে নিয়েছে)। তারপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [বুখারী: ২৩৫৮; মুসলিম: ১০৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কেউ যদি জেনে-বুঝে কোন মুসলিমের সম্পদ কুক্ষিগত করার মানসে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহ্‌র সাথে ক্রোধান্বিত অবস্থায় সাক্ষাত করবে।" তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীর সত্যায়নের জন্য উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। [বুখারী: ৪৫৪৯, ৪৫৫০; মুসলিম: ১৩৩৮]

তাকাবেন না কেয়ামতের দিন। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না; এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি[১]।

৭৮. আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একদল আছে যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাতে তোমরা সেটাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের অংশ মনে কর; অথচ সেটা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, 'সেটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে'; অথচ সেটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বলে[২]।

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯. কোন ব্যক্তির জন্য সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করার পর তিনি মানুষকে বলবেন, 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও'[৩], বরং তিনি

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّٰنِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

(১) আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দু পক্ষের মধ্যে যা সাব্যস্ত হয় এবং যা পূর্ণ করা উভয় পক্ষের জন্য জরুরী, এমন বিষয়কে অঙ্গীকার বলা হয়। ওয়াদা শুধু এক পক্ষ থেকে হয়। অতএব, অঙ্গীকার ব্যাপক এবং ওয়াদা সীমিত। কুরআন ও সুন্নায় অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরোল্লেখিত আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে পাঁচটি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছেঃ (এক) জান্নাতের নেয়ামতসমূহে তার কোন অংশ নেই। (দুই) আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে অনুকম্পাসূচক কথা বলবেন না। (তিন) কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহ্মতের দৃষ্টিতে দেখবেন না। (চার) আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপ মার্জনা করবেন না। কেননা, অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে বান্দার হক নষ্ট হয়েছে। বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ্ মার্জনা করেন না। (পাঁচ) তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

(২) কাতাদা ও মুজাহিদ বলেন, যারা এ গর্হিত কাজটি করে তারা হচ্ছে, ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে বিকৃত করে সেখানে মনগড়া কথা ঢুকিয়ে নিয়েছে, তারপর তারা সেটাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলে দাবী করছে। [তাবারী]

(৩) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যখন নাজরানের নাসারারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হলো, সেখানে ইয়াহূদী

বলবেন, 'তোমরা রব্বানী[১] হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর ।'

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ أَرْبَابًا ؕ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. অনুরূপভাবে ফেরেশ্‌তাগণ ও নবীগণকে রবরূপে গ্রহণ করতে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দেন না । তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবেন?

নবম রুকূ'

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ

৮১. আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন[২] যে,

ও নাসারা সবাই একত্রিত হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন, তখন আবু রাফে' আল-কুরাযী বলে বসল: হে মুহাম্মাদ! আপনি কি চান যে, নাসারারা যেভাবে ঈসা ইবন মারইয়ামের ইবাদাত করে থাকে, সেভাবে আমরাও আপনার ইবাদাত করি? তখন নাসারাদের একজন যাকে 'আর-রায়িস' বলা হয় সে দাঁড়িয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি কি তা-ই চান? আর এটাই আপনার দাওয়াত? অথবা এরকম কোন কথা বলল । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত করা বা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারও ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানাবো এমন কাজ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই । আল্লাহ্ আমাকে এ জন্য পাঠান নি । অথবা এরকম কোন কথা তিনি বললেন । তখন আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন । [তাবারী]

(১) 'রব্বানী' শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত এসেছে । ইবনে আব্বাস থেকে এক বর্ণনায় এর অর্থ এসেছে, حُكَمَاءَ عُلَمَاءَ حُلَمَاءَ অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী ও সহিষ্ণু হওয়া । হাসান বসরী বলেন, ফকীহ হওয়া । অন্য বর্ণনায় ইবন আব্বাস, সা'য়ীদ ইবন জুবাইর, কাতাদাহ, আতা সহ অনেকের মতে এর অর্থ ইবাদত ও তাকওয়ার অধিকারী হওয়া । [ইবন কাছীর] এগুলোতে কোন বিরোধ নেই । শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ্ বলেন: এ শব্দটি رُبَّانُ السَّفِيْنَةِ (জাহাজের নাবিক) শব্দ থেকে এসেছে । এর অর্থ কর্ণধার, পরিচালক, বিপদে নেতৃত্বপ্রদানকারী । [মাজমূ' ফাতাওয়া]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কাছ থেকে তিনটি অঙ্গীকার নিয়েছেন । একটি সূরা আল-আ'রাফের ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে । সে অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র মানবজাতি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও রবুবিয়াতে বিশ্বাসী হবে । দ্বিতীয় অঙ্গীকার শুধু আহলে-কিতাব পণ্ডিতদের কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে, যাতে তারা সত্য গোপন না

مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾

আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি; তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসবে- তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এর উপর আমার অংগীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম[১]।'

করে। যার আলোচনা ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ﴾ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। [সূরা আলে ইমরানঃ ১৮৭] অনুরূপভাবে এ অঙ্গীকারের কথা সূরা আল-বাকারাহ্‌র ৮৩ এবং সূরা আল-মায়েদার ১২ ও ৭০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় অঙ্গীকার আলোচ্য ৮১ নং আয়াতে ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ﴾ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ ميثاق বা অঙ্গীকার কি? এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আলী ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা সব রাসূলগণের কাছ থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অঙ্গীকার নেন যে, তারা স্বয়ং যদি তার আমলে জীবিত থাকেন, তবে যেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাকে সাহায্য করেন। স্বীয় উম্মতকেও যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান। [তাবারী] পক্ষান্তরে তাউস, হাসান বসরী, কাতাদাহ্‌ প্রমুখ তফসীরবিদগণ বলেনঃ রাসূলগণের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল- যাতে তারা পরস্পরকে সাহায্য ও সমর্থন দান করেন। [তাবারী] বস্তুত উভয় তাফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ কারণে আয়াতের অর্থ উভয়টিই হতে পারে।

(১) আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সব রাসূলের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেন যে, আপনাদের মধ্য থেকে কোন রাসূলের পর যখন অন্য রাসূল আগমন করেন- যিনি অবশ্যই পূর্ববর্তী রাসূল ও আল্লাহ্‌র গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী হবেন, তখন পূর্ববর্তী নবীর জন্যে জরুরী হবে নতুন নবীর সত্যতা ও নবুওয়তের প্রতি নিজে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অন্যকেও বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দিয়ে যাওয়া। কুরআনের এ সামগ্রিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেও এমনি ধরনের অঙ্গীকার পূর্ববর্তী রাসূলগণের কাছ থেকে নিয়ে থাকবেন। তাই যখন ঈসা 'আলাইহিস্‌ সালাম

৮২. সুতরাং এরপর যারা মুখ ফিরাবে তারাই তো ফাসেক।

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩. তারা কি চায় আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে(১)! আর তাঁর দিকেই তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

পৃথিবীতে পুনরায় নেমে আসবেন, তখন তিনিও কুরআন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধি-বিধানই পালন করবেন। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত বিশ্বজনীন। তার শরীয়তের মধ্যে পূর্ববর্তী সব শরীয়ত পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন, ‘আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি’ [বুখারী: ৪৩৮; অনুরূপ মুসলিম: ৫২১]

(১) ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পন সমস্ত সৃষ্টিকেই করতে হয়। প্রতিটি সৃষ্টি জীবই আল্লাহ্‌র নিয়মের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। তাকে অবশ্যই মরতে হবে। তাকে অবশ্যই কষ্ট স্বীকার করতে হবে। তাকে অবশ্যই রোগ-বালাই এর সম্মুখীন হতে হবে, ইত্যাদি। কিন্তু তারা সবাই তা মন বা মুখে স্বীকার করতে চায় না। বা স্বীকার করে আল্লাহ্‌র কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতি স্বীকার করে না। সকল সৃষ্টজীবই এ প্রকার আত্মসমর্পনের অধীন। এ ধরনের আত্মসমর্পনের মধ্যে কোন সওয়াব নেই। তবে এদের মধ্যে একদল আছে যারা আল্লাহ্‌র এ নিয়ম-নীতি প্রত্যক্ষ করে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে এবং স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তাঁর আনুগত্য করেছে। এ প্রকার আত্মসমর্পনই আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর বান্দার কাছে আশা করেন। এর মধ্যেই রয়েছে সওয়াব ও মুক্তি। [তাবারী] এ আয়াতে যে বক্তব্যটি বলা হচ্ছে পবিত্র কুরআনে এ ধরনের বক্তব্য আরও এসেছে, যেমন বলা হয়েছে, “আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয় আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল ও সন্ধ্যায়” [সূরা আর-রা‘দ: ১৫] আরও এসেছে,“তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়? আল্লাহ্‌কেই সিজ্‌দা করে যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যমীনে, যত জীবজন্তু আছে সেসব এবং ফিরিশ্‌তাগণও, তারা অহংকার করে না। আর তারা ভয় করে তাদের উপর তাদের রবকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা করে।” [আন-নাহল:৪৮-৫০]

৮৪. বলুন, 'আমরা আল্লাহ্‌তে ও আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং ইব্‌রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা নাযিল হয়েছিল এবং যা মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছিল তাতে ঈমান এনেছি; আমরা তাঁদের কারও মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।'

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫. আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬. আল্লাহ্‌ কিভাবে হেদায়াত করবেন সে সম্প্রদায়কে, যারা ঈমান আনার পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর কুফরী করে? আর আল্লাহ্‌ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না[১]।

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾

(১) আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আনসারদের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুশরিকদের সাথে মিশে যায়। পরে সে লজ্জিত হয় ও তার স্বজাতির কাছে বলে পাঠায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা কর আমার কি কোন তাওবাহ্‌ আছে? তার স্বজাতির লোকেরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে, অমুক লজ্জিত হয়েছে এবং জানতে চেয়েছে যে, তার জন্য তাওবাহ্‌ আছে কি না? তখন এ আয়াতসহ পরবর্তী চারটি আয়াত নাযিল হয়। পরে সে ফিরে আসে এবং পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করে। [নাসায়ী: ৭/১০৭; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৪৪৭৭; মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৪৮] হাসান বলেন, এ আয়াত দ্বারা আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের গ্রন্থে

৮৭. এরাই তারা যাদের প্রতিদান হলো, তাদের উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশ্‌তাগণের এবং সকল মানুষের লা'নত।

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. তারা তাতে স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি শিথিল করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না;

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা এর পরে তাওবাহ্ করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে। তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

৯০. নিশ্চয় যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে তারপর তারা কুফরীতে বেড়ে গিয়েছে তাদের তওবা কখনো কবুল করা হবে না। আর তারাই পথ ভ্রষ্ট(১)।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾

৯১. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কাফেররূপে মৃত্যু ঘটেছে তাদের কারো কাছ থেকে যমীনভরা সোনা

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا

স্পষ্ট দেখতে পেত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে তিনি তাদের কাছে আগমন করলে তাকে সাথে নিয়ে কাফেরদের উপর জয়ী হবে ঘোষণা করত। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে আসলেন, তখন তারা কুফরী করল। [তাবারী] তবে আয়াত দৃষ্টে মনে হয়; বক্তব্যটি ব্যাপক। যারাই এরকম কাজ করবে তারাই এ খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

(১) কাতাদা বলেন, তারা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দুশমন ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তারা ইঞ্জীল ও ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে কুফরী করেছে। তারপর তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের সাথে কুফরী করছে। [তাবারী] সুতরাং তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে ভয়াবহ পরিণতি। তাদের তাওবাহ কবুল হওয়ার নয়। আবুল আলীয়া বলেন, তাদের তাওবাহ কবুল না হওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা কোন কোন গোনাহ হতে তাওবাহ করলেও মূল গোনাহ (কুফরী) থেকে তাওবাহ করে না। সুতরাং তাদের তাওবাহ কিভাবে কবুল হবে? [ইবন আবী হাতেম]

وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۹۱﴾

বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনো কবুল করা হবে না[১]। এরাই তারা, যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে; আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

দশম রুকূ‘

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۹۲﴾

৯২. তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত[২]।

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে উপস্থিত করে বলা হবেঃ যদি তোমার নিকট পৃথিবীর সমান পরিমান স্বর্ণ থাকে, তাহলে কি তুমি এর বিনিময়ে এ শাস্তি থেকে মুক্তি কামনা করবে? তখন তারা বলবেঃ হ্যাঁ, তাকে বলা হবে যে, তোমার নিকট এর চেয়েও সহজ জিনিস চাওয়া হয়েছিল... আমার সাথে আর কাউকে শরীক না করতে কিন্তু তুমি তা মানতে রাজি হওনি। [বুখারীঃ ৬৫৩৮]

(২) সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কুরআনী নির্দেশের প্রথম সম্বোধিত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ সঙ্গী। কুরআনী নির্দেশ পালনের জন্য তারা ছিলেন উম্মুখ। আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সহায় সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, কোনটি তাদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এরপর আল্লাহ্র পথে তা ব্যয় করার জন্যে তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করতে লাগলেন। মদীনার আনসারগণের মধ্যে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বেশ ধনী ছিলেন। মসজিদে নববী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তার একটি বাগান ছিল, যাতে ‘বীরাহা’ নামে একটি কুপ ছিল। বর্তমানে মাসজিদের নববীর বাব আল-মাজীদীর বাদশাহ ফাহদ গেট দিয়ে ভিতরে মাসজিদে ঢুকার পর পরই সামান্য বাম পার্শ্বে এ স্থানটি পড়ে। পরিচিতির সুবিধার্থে দুই থামের মাঝখানের তিনটি গোল চক্কর দিয়ে তার স্থান নির্দেশ করা আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পণ করতেন এবং বীরহা কূপের পানি পান করতেন। এ কুপের পানি তিনি পছন্দও করতেন। আবু তালহার এ বাগান অত্যন্ত মূল্যবান, উর্বর এবং তার বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললেনঃ আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে বীরহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি এটি

৯৩. তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে ইস্‌রাঈল তার নিজের উপর যা হারাম করেছিল[১] তা ছাড়া বনী ইস্‌রাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল[২]। বলুন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং তা পাঠ কর।'

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُۚ قُلۡ فَأۡتُواْ بِٱلتَّوۡرَىٰةِ فَٱتۡلُوهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪. এরপরও যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করে তারাই যালেম।

فَمَنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫. বলুন, 'আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। কাজেই তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ কর, আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'

قُلۡ صَدَقَ ٱللَّهُۗ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿٩٥﴾

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে চাই। আপনি যে কাজে পছন্দ করেন, এটি তাতেই খরচ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে তুমি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা এ পরামর্শ গ্রহণ করেন। [বুখারীঃ ১৪৬১, মুসলিমঃ ৯৯৮] এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, শুধু ফকীর-মিসকীনকে দিলেই পুণ্য হয় না- পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করাও বিরাট পুণ্য ও সওয়াবের কাজ।

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালামের 'ইরকুন্ নাসা' নামক রোগ ছিল। এজন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, যদি তিনি এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন তাহলে তিনি উটের গোশ্‌ত ভক্ষণ ত্যাগ করবেন। আয়াতে এ ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/২৯২]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিতর্কের বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এসেছে- ইয়াহূদীরা আপত্তি করল যে, আপনারা উটের গোশত খান, দুধ পান করেন। অথচ এগুলো ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি হারাম ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেনঃ ভুল কথা, এগুলো তার প্রতি হালাল ছিল। ইয়াহূদীরা বললঃ আমরা যেসব বস্তু হারাম মনে করি, সবই নূহ্ ও ইব্‌রাহীমের আমল থেকেই হারাম হিসাবে চলে এসেছে এবং আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ কথোপকথনের পর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে ইয়াহূদীদের মিথ্যাবাদিতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বলা হচ্ছেঃ তাওরাত নাযিলের পূর্বে উটের গোশত ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং বনী-ইস্‌রাঈলের জন্যও হালাল ছিল। তবে উটের গোশত বিশেষ কারণবশতঃ ইয়াকূব আলাইহিস্ সালাম নিজেই নিজের জন্য নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন। [দেখুন, তাফসীরে ইবন কাসীর]

৯৬. নিশ্চয় মানব জাতির[১] জন্য সর্বপ্রথম[২] যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, বরকতময় ও সৃষ্টিজগতের দিশারী হিসাবে।[৩]

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝٩٦

(১) প্রাচীনকাল থেকেই কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। আয়াতে ﴿وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠী এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রকৃতিতে এমন মাহাত্ম্য নিহিত রেখেছেন যে, মানুষের অন্তর আপনা-আপনিই এর দিকে আকৃষ্ট হয়।

(২) আলোচ্য আয়াতে কাবাগৃহের শ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটি বিশেষ দিক বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ এটি সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম ইবাদাতের স্থান। দ্বিতীয়তঃ এ গৃহ বরকতময় ও কল্যাণের আধার। তৃতীয়তঃ এ গৃহ সারা সৃষ্টির জন্য পথপ্রদর্শক। আয়াতে বর্ণিত প্রথম শ্রেষ্ঠত্বের সারমর্ম এই যে, মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা হয়, তা ঐ গৃহ, যা 'বাক্কা'য় অবস্থিত। 'বাক্কা' শব্দের অর্থ মক্কা। এখানে 'মীম' অক্ষরকে 'বা' অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথবা উচ্চারণ ভেদে অপর নাম 'বাক্কা'। অতএব কা'বা গৃহই বিশ্বের সর্বপ্রথম ইবাদাতঘর। তখন অর্থ হবে, মানুষের বসবাসের গৃহ পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু ইবাদাতের জন্য কা'বা গৃহই সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল। এ মতটি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকেও বর্ণিত রয়েছে। [দিয়া আল-মাকদেসী, আল-মুখতারাহ: ২/৬০ নং ৪৩৮] তাছাড়া আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ ইবাদাতের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে কোন উপাসনালয়ও ছিল না এবং বাস গৃহও ছিল না। এ কারণে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে কা'বাই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ। তবে প্রথম অর্থটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মত।

(৩) আলোচ্য আয়াত দ্বারা কা'বা গৃহের একটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো যে, এ হচ্ছে জগতের সর্বপ্রথম গৃহ। হাদীসে আছে, আবু যর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করেন যে, জগতের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? উত্তর হলোঃ মসজিদুল হারাম। আবারো প্রশ্ন করা হলোঃ এরপর কোন্টি? উত্তর হলোঃ মসজিদে বায়তুল-মুকাদ্দাস। আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই দু'টি মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল? উত্তর হলোঃ চল্লিশ বৎসর। [বুখারীঃ ৩৩৬৬, মুসলিমঃ ৫২০] এ হাদীসে ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের হাতেই কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল বলে বুঝা যায়। তাই সবচেয়ে প্রামাণ্য সঠিক মত হলো যে, ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামই সর্ব প্রথম কাবা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। কারণ এ হাদীসে বায়তুল-মুকাদ্দাস নির্মাণের ব্যবধান বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, বায়তুল-মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাণও ইব্রাহীম

'আলাইহিস্ সালামের হাতে কা'বা গৃহ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর সম্পন্ন হয়। এরপর সুলাইমান 'আলাইহিস্ সালাম বায়তুল-মুকাদ্দাসের পুণঃনির্মাণ করেন। এভাবে বিভিন্ন হাদীসের পরস্পর বিরোধিতা দূর হয়ে যায়। এ ছাড়া কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, কা'বা গৃহ সর্বপ্রথম আদম আলাইহিস্ সালাম নির্মাণ করেছেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, 'আদম আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক নির্মিত এ কা'বা গৃহ নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের মহাপ্লাবন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অতঃপর ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। উপরোক্ত দু'টি বর্ণনার কোনটিই সঠিক সনদে প্রমাণিত হয়নি। তাই আমরা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামকেই কা'বা গৃহের প্রথম নির্মাণকারী বলতে পারি। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধ্বসে গেলে জুরহাম গোত্রের লোকেরা একে পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে কয়েক বার বিধ্বস্ত হওয়ার পর একবার আমালেকা সম্প্রদায় ও একবার কুরাইশরা এ গৃহ নির্মাণ করে। সর্বশেষ এ নির্মাণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও শরীক ছিলেন এবং তিনিই 'হাজরে-আসওয়াদ' স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশদের এ নির্মাণের ফলে ইব্রাহীমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমতঃ কা'বার একটি অংশ 'হাতীম' কা'বা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামের নির্মাণে কা'বা গৃহের দরজা ছিল দু'টি- একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি বের হওয়ার জন্য। কিন্তু কুরাইশরা শুধু পূর্বদিকে একটি দরজা রাখে। তৃতীয়তঃ তারা সমতল ভুমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে- যাতে সবাই সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে; বরং তারা যাকে অনুমতি দেবে সেই যেন প্রবেশ করতে পারে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বলেছিলেনঃ 'আমার ইচ্ছা হয়, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে ইব্রাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বা গৃহ ভেঙ্গে দিলে নও-মুসলিম অজ্ঞ লোকদের মনে ভুল বুঝাবুঝি দেখা দেয়ার আশংকার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি।' [বুখারীঃ ৪৪৮৪, ১৫৮৩, মুসলিমঃ ১৩৩৩] এ কথাবার্তার কিছুদিন পরেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ভাগ্নে আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি উপরোক্ত ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণ ইব্রাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। কিন্তু মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব বেশী দিন টেকেনি। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মক্কায় সৈন্যাভিযান করে তাকে শহীদ করে দেয়। সে কা'বা গৃহকে আবার ভেঙ্গে জাহেলিয়াত আমলে কুরাইশরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই নির্মাণ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর কোন কোন বাদশাহ্ উল্লেখিত হাদীস দৃষ্টে কা'বা গৃহকে ভেঙ্গে হাদীস অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করে ইমাম মালেক

৯৭. তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে[১], যেমন মাকামে ইব্‌রাহীম[২]। আর

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ

ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে ফতোয়া চান। তিনি তখন ফতোয়া দেন যে, এভাবে কা'বা গৃহের ভাঙ্গা-গড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহ্‌দের জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বা গৃহ তাদের হাতে একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে, সে অবস্থায়ই থাকতে দেয়া উচিৎ। সমগ্র মুসলিম সমাজ তার এ ফতোয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাটো কাজ সব সময়ই অব্যাহত থাকে। বর্তমান আমলে বেশ কয়েক বছর পূর্বে সাবেক খাদেমুল হারামাইন আশ্‌-শরীফাইন বাদশাহ্ ফাহদ ইবনে আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ্ সবচেয়ে ব্যয়বহুল এক সংস্কার কাজ করে কা'বা গৃহের সৌন্দর্য বহুগুণ বর্ধিত করেন।

(১) এ আয়াতে কা'বা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ এতে আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিদর্শন রয়েছে, আর তা হচ্ছে মাকামে ইব্‌রাহীম। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়; তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তৃতীয়তঃ সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য এতে হজ্জ পালন করা ফরয; যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি ও সামর্থ্য থাকে। কা'বা গৃহ নির্মিত হওয়ার দিন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ্ তা'আলা এর বরকতে শত্রুর আক্রমণ থেকে মক্কাবাসীদের নিরাপদে রেখেছেন। বাদশাহ্ আবরাহা বিরাট হস্তীবাহিনীসহ কা'বা গৃহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতে পক্ষীকূলের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। মক্কার হারামে প্রবেশকারী মানুষ, এমনকি জীবজন্তু পর্যন্ত বিপদমুক্ত হয়ে যায়।

(২) কা'বাগৃহের বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, মাকামে ইব্‌রাহীম। যা একটি বড় নিদর্শন হওয়ার কারণেই কুরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মাকামে ইব্‌রাহীম একটি পাথরের নাম। এর উপরে দাঁড়িয়েই ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম কা'বা গৃহ নির্মাণ করতেন। এ পাথরের গায়ে ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামের গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। একটি পাথরের উপর পদচিহ্ন পড়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র অপার কুদরতের নিদর্শন এবং এতে কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। এ পাথরটি কা'বা গৃহের নীচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল। যখন কুরআনে মাকামে-ইবরাহীমে সালাত আদায় করার আদেশ নাযিল হয় তখন তওয়াফকারীদের সুবিধার্থে পাথরটি সেখান থেকে সরিয়ে কা'বা গৃহের সামনে সামান্য দূরে যমযম কুপের নিকট স্থাপন করা হয়। বর্তমানে মাকামে- ইব্‌রাহীমকে সরিয়ে নিয়ে একটি কাঁচ-পাত্রে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে। তাওয়াফ-পরবর্তী নামায এর আশে পাশে পড়া উত্তম। কিন্তু শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মাকামে ইব্‌রাহীম সমগ্র মসজিদে হারামকেও বুঝায়। এ কারণেই ফিক্‌হবিদগণ বলেনঃ মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে তওয়াফ পরবর্তী সালাত পড়ে নিলেই তা আদায় হয়ে যাবে।

اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ[১]। আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ[২] করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য[৩]। আর যে

(১) কা'বা গৃহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। এ নিরাপত্তা মুলতঃ সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরে কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন। জাহেলিয়াত যুগের আরব ও তাদের বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্বেও কা'বা গৃহের সম্মান রক্ষার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত ছিল না। হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা পিতার হত্যাকারীকে দেখেও কিছুই বলত না। মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হারামের অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বা গৃহকে পবিত্র করা। বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন যে, এ অনুমতি কা'বা গৃহকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে কয়েক ঘন্টার জন্যেই ছিল। এরপর পূর্বের ন্যায় চিরকালের জন্যে কা'বার হারামে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেনঃ আমার পূর্বে কারো জন্যে হারামের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা হালাল ছিল না, আমার পরেও কারো জন্যে হালাল নয়। আমাকেও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, পরে আবার হারাম করে দেয়া হয়েছে। [বুখারী: ১৩৪৯; মুসলিম: ১৩৫৫]

তবে কাতাদা বলেন, হাসান বসরী বলেছেন, হারাম শরীফ কাউকে আল্লাহ্‌র সুনির্দিষ্ট হদ বা শাস্তি বাস্তবায়নে বাধা দেয় না। যদি কেউ হারামের বাইরে অন্যায় করে হারামে প্রবেশ করে তবে তার উপর হদ বা শাস্তি কায়েম করতে কোন বাধা নেই। যদি কেউ হারামে চুরি করে কিংবা ব্যভিচার করে বা হত্যা করে তার উপর শরী'আতের আইন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে [তাবারী]।

(২) হজ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফাত ও মুযদালেফায় অবস্থান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে হজ বলা হয়। হজের বিস্তারিত নিয়ম-পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

(৩) আয়াতে কা'বা গৃহের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির জন্য শর্তসাপেক্ষে কা'বা গৃহের হজ ফরয করেছেন। শর্ত এই যে, সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে, যা দ্বারা সে কা'বা গৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়।

কেউ কুফরী করল সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন(১)।

৯৮. বলুন, 'হে আহ্‌লে কিতাবগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের সাথে কেন কুফরী কর? আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সাক্ষী।'

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۝٩٨

এছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। দৈহিক দিক দিয়ে হাত পা ও চক্ষু কর্মক্ষম হতে হবে। কারণ, যাদের এসব অঙ্গ বিকল, তাদের পক্ষে স্বীয় বাড়ী ঘরে চলাফেরাই দুস্কর। এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও হজের অনুষ্ঠানাদি পালন করা তার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হবে? মহিলাদের পক্ষে মাহ্‌রাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরীয়ত মতে নাজায়েয। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ হজে থাকবে; নিজ খরচে করুক অথবা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। এমনিভাবে কা'বা গৃহে পৌঁছার জন্যে রাস্তা নিরাপদ হওয়াও সামর্থ্যের একটি অংশ। যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এবং জান-মালের ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে হজের সামর্থ্য নাই বলে মনে করা হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আয়াতে সামর্থ বলতে, বান্দার শারীরিক সুস্থতা এবং নিজের উপর কোন প্রকার কমতি না করে পাথেয় ও বাহনের খরচ থাকা বুঝায়। [তাবারী]

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, আয়াতে কুফরী বলতে বোঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তির কাজকে, যে হজ করাকে নেককাজ হিসেবে নিল না আর হজ ত্যাগ করাকে গোনাহের কাজ মনে করল না। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, কুফরী করার অর্থ, আল্লাহ্ ও আখেরাতকে অস্বীকার করল। [তাবারী] মোটকথা: বান্দা বড়-ছোট যে ধরনের কুফরীই করুক না কেন তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ তার মুখাপেক্ষী নয়। এ আয়াতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সৃষ্টির কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। যদি সমস্ত লোকই কাফের হয়ে যায় তবুও এতে তার রাজত্বে সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন, "তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই যদি অকৃতজ্ঞ হও তারপরও আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার যোগ্য।" [সূরা ইবরাহীম:৮] আরও বলেন, "অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল। আল্লাহ্‌ও (তাদের ঈমানের ব্যাপারে) ভ্রুক্ষেপহীন হলেন; আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।" [সূরা আত-তাগাবুন:৬] সুতরাং তাঁর বান্দাদেরকে আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ বান্দাদের উপকারার্থেই দিয়ে থাকেন। এ জন্যে দেন না যে, বান্দার আনুগত্য বা অবাধ্যতা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি বা উপকার করবে। [আদওয়াউল বায়ান]

৯৯. বলুন, 'হে আহ্‌লে কিতাবগণ! যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে তাকে কেন আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিচ্ছ, তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে? অথচ তোমরা সাক্ষী[১]। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।'

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. হে মুমিনগণ! যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফের বানিয়ে ছাড়বে[২]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾

(১) কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ, হে আহলে কিতাব সম্প্রদায়! তোমরা কেন যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে, তাদেরকে ইসলাম ও আল্লাহ্‌র নবী থেকে বাধা দিচ্ছ? অথচ তোমরা তোমাদের কাছে সংরক্ষিত আল্লাহ্‌র কিতাবে যা পড় তার কারণে একথার সাক্ষ্য দিতে বাধ্য যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল এবং ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন, যা ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। তোমাদের কাছে সংরক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে তোমরা সেটা দেখতে পাও। [তাবারী]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে সাবধান করছেন যে, তারা যেন আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদের আনুগত্য না করে। কেননা তারা মুমিনদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে নবী ও কিতাবের নেয়ামত প্রদান করেছেন সেটার হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে। কারণ তাদের অনুসরণ করলে তারা মুমিনদেরকে কাফের বানিয়ে ছাড়বে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা সেটা ঘোষণা করেছেন। যেমন, "কিতাবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ (তারা এটা করে থাকে)।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১০৯]। কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ইয়াহূদী-নাসারাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন যেমনটি তোমরা শুনলে, তোমাদেরকে তাদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কেও সাবধান করেছেন, সুতরাং তোমরা কোনভাবেই তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপদ ভেবো না। আর তোমাদের জানের ব্যাপারেও কল্যাণকামী মনে করো না। প্রকৃতপক্ষেই তারা পথ ভ্রষ্ট হিংসুটে শত্রু। কিভাবে তোমরা এমন এক সম্প্রদায়কে নিরাপদ মনে করতে পার যারা তাদের কিতাবের সাথে কুফরী করেছে, রাসূলদের হত্যা করেছে, দ্বীনের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে এবং নিজেরা অপারগ হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র শপথ, এরা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাস্য ও শত্রু। [তাবারী]

১০১. আর কিভাবে তোমরা কুফরী করবে অথচ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করা হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল রয়েছেন[১]? আর কেউ আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে অবশ্যই সরল পথের হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۟

এগারতম রুকূ‘

১০২. হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর[২]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۟

(১) অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা কুফরী হওয়া এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? তোমাদের কাছে তো আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ দিন-রাত্রি নাযিল হচ্ছেই। তাছাড়া তোমাদের সাথে আছেন আল্লাহ্‌র নবী যিনি সেটা তোমাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছেন এবং তোমাদের কাছে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। এমতাবস্থায় তোমাদের পক্ষ থেকে কুফরী হওয়া আশ্চর্যজনক নয় কি? অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা‘আলা এ কথাটি বলেছেন, “আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য ডাকছেন এবং আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছেন” [সূরা আল-হাদীদ:৮] কাতাদা বলেন, কুফরী না করার পক্ষে দু’টি বড় নিদর্শন রয়েছে। একটি আল্লাহ্‌র নবী অপরটি আল্লাহ্‌র কিতাব। তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র নবী চলে গেছেন কিন্তু তাঁর কিতাব অবশিষ্ট রয়েছে। যাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ হিসেবে হালাল-হারাম, আনুগত্য ও অবাধ্যতার বিষয়ে যাবতীয় বিধি-বিধান। [ইবনে আবী হাতেম] কোন কোন বর্ণনায় এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আউস ও খাযরাজ গোত্রে অন্ধকার যুগে যে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল কোন এক মজলিসে তারা সেটা স্মরণ করে পরস্পর মারমুখী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অর্জনের হক্ক আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাকওয়ার ঐ স্তর অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক। কিন্তু তাকওয়ার হক বা যথার্থ তাকওয়া কি? আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘উদ, রবী, কাতাদাহ্ ও হাসান রাহিমাহুমুল্লাহ্ বলেন, তাকওয়ার হক হল, প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহ্‌কে সর্বদা স্মরণে রাখা- কখনো বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা- অকৃতজ্ঞ না হওয়া। [ইবন কাসীর]

এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না[১]।

১০৩. আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিগর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা হেদায়াত পেতে পার।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

(১) এতে বুঝা যায় যে, পূর্ণ ইসলামই প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার নামই হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বন। আয়াতের শেষে মুসলিম না হয়ে যেন কারও মৃত্যু না হয় সেটার উপর জোর দেয়া হয়েছে। দুনিয়াতে ঈমানদারের অবস্থান হবে আশা-নিরাশার মধ্যে। সে একদিকে আল্লাহ্‌র রহমতের কথা স্মরণ করে নাজাতের আশা করবে, অপরদিকে আল্লাহ্‌র শাস্তির কথা স্মরণ করে জাহান্নামে যাওয়ার ভয় করবে। কিন্তু মৃত্যুর সময় তাকে আল্লাহ্ সম্পর্কে সুধারণা নিয়েই মরতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ্ সম্পর্কে সু ধারণা না নিয়ে মারা না যায়।" [মুসলিম: ২৮৭৭] অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তার আশা থাকবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করবেন।

করবে[১]; আর তারাই সফলকাম।

১০৫. তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে[২] ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

(১) ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পূণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যে সব সৎকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতের উল্লেখিত 'মারূফ' তথা সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। 'মারূফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচিত। এসব সৎকর্ম সাধারণ্যে পরিচিত। তাই এগুলোকে 'মারূফ' বলা হয়। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব অসৎকর্মরূপী কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন বলে খ্যাত, তা সবই আয়াতে উল্লেখিত 'মুনকার' এর অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে 'ওয়াজিবাত' অর্থাৎ 'জরুরী করণীয় কাজ' ও 'মা'আসী' অর্থাৎ 'গোনাহর কাজ' -এর পরিবর্তে 'মারূফ' ও 'মুনকার' বলার রহস্য সম্ভবত এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত ও সর্বসম্মত মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন খারাপ কাজ দেখবে, সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। এটাই ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'এর পরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও বাকী নেই।' [মুসলিমঃ ৪৯, আবু দাউদঃ ১১৪০] অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। নতুবা অচিরেই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযিল করবেন। তারপর তোমরা অবশ্যই তাঁর কাছে দো'আ করবে, কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে না।' [তিরমিযীঃ ২১৬৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৯১] অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক লোক জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, কোন লোক সবচেয়ে বেশী ভাল? তিনি বললেনঃ সবচেয়ে ভাল লোক হল যে আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করে, সৎকাজে আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৩১]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'দুই কিতাবী সম্প্রদায় তাদের দ্বীনের মধ্যে বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এ উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক দলই জাহান্নামে যাবে কেবলমাত্র একটি দল ব্যতীত। আর তারা হল আল-জামা'আতের অনুসারী। আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু দল বেরুবে যাদেরকে কুপ্রবৃত্তি এমনভাবে তাড়িয়ে বেড়াবে, যেমন পাগলা কুকুরে কামড়ানো ব্যক্তিকে সর্বদা কুকুর তাড়িয়ে বেড়ায়।' [আবু দাউদঃ ৪৫৯৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১০২]

১০৬. সেদিন কিছু মুখ উজ্জল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে(১); যাদের মুখ কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে), 'তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে(২)? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে ।'

يَّوۡمَ تَبۡيَضُّ وُجُوۡهٌ وَّتَسۡوَدُّ وُجُوۡهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيۡنَ اسۡوَدَّتۡ وُجُوۡهُهُمۡ ۟ اَكَفَرۡتُمۡ بَعۡدَ اِيۡمَانِكُمۡ فَذُوۡقُوا الۡعَذَابَ بِمَا كُنۡتُمۡ تَكۡفُرُوۡنَ ۝١٠٦

(১) উজ্জ্বল মুখ ও কালো মুখ কারা, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে । ইবনে-আব্বাস বলেনঃ আহলে সুন্নাত সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং বিদ'আতীদের মুখমণ্ডল কালো হবে । আতা বলেনঃ মুহাজির ও আনসারগণের মুখমণ্ডল সাদা হবে এবং বণী-নদ্বীরের মুখমণ্ডল কালো হবে । ইকরিমাহ বলেনঃ আহলে কিতাবগণের এক অংশের মুখমণ্ডল কালো হবে অর্থাৎ যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত লাভের পূর্বে তিনি নবী হবেন বলে বিশ্বাস করতো কিন্তু নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার পরিবর্তে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে । আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'খারেজী সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল কালো হবে । আর যারা তাদের হত্যা করবে, তাদের মুখমণ্ডল সাদা হবে ।' তিনি আরও বলেন, 'এটি যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাতবার না শুনতাম, তবে বর্ণনাই করতাম না' [তিরমিযী: ৩০০০]

(২) তাদের চেহারা কেন কালো হবে, তার কারণ বর্ণনায় এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের চেহারা কালো হবার কারণ হচ্ছে, "তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে" । অন্য আয়াতে আল্লাহ্র উপর মিথ্যাচার করাকেই চেহারা কালো হওয়ার কারণ বলা হয়েছে, "আর যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, আপনি কিয়ামতের দিন তাদের চেহারাসমূহ কালো দেখবেন । অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?" [সূরা আয-যুমার: ৬০] আবার কোন কোন আয়াতে গোনাহ অর্জন করার কারণে তাদের চেহারা কালো হবে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে । "আর যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে ; আল্লাহ্ থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ নেই ; তাদের মুখমন্ডল যেন রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত । তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ।"[সূরা ইউনুস:২৭] কোন কোন আয়াতে কুফরী ও অপরাধী হওয়াকেই চেহারা কালো হবার কারণ হিসেবে ধরা হয়েছে, "আর অনেক চেহারা সেদিন হবে ধূলিধূসর, সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা । এরাই কাফির ও পাপাচারী ।" [সূরা আবাসা: ৪০-৪১] । বস্তুত: এগুলোতে কোন বিরোধ নেই । কারণ, এ সব কারণেই চেহারা কালো হবে । কাফেরদের চেহারা কালো হবেই ।

১০৭. আর যাদের মুখ উজ্জল হবে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে থাকবে[১], সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৮. এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমরা আপনার কাছে যথাযথভাবে তেলাওয়াত করছি। আর আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের প্রতি যুলুম করতে চান না।

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৯. আর আসমানে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌র কাছেই সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

বারতম রুকূ'

১১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত[২], মানব জাতির

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

(১) শুভ্র মুখমণ্ডলবিশিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র অনুকম্পার মধ্যে অবস্থান করবে। ইবনে-আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ এখানে আল্লাহ্‌র অনুকম্পা বলে জান্নাত বুঝানো হয়েছে। তবে জান্নাতকে অনুকম্পা বলার রহস্য এই যে, মানুষ যত ইবাদাতই করুক না কেন, আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ, ইবাদাত করা মানুষের নিজস্ব পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ্‌র প্রদত্ত সামর্থের বলেই মানুষ ইবাদাত করতে পারে। সুতরাং ইবাদাত করলেই জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যায় না। বরং আল্লাহ্‌র অনুকম্পার দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা সত্তরটি জাতিকে পূর্ণ করবে, তন্মধ্যে তোমরাই হলে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। [তিরমিযীঃ ৩০০১, ৪২৮৭] (অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, যাদের সংখ্যা সত্তরটি। এর দ্বারা সংখ্যা বা আধিক্য বোঝানো উদ্দেশ্য। মানাওয়ী, ফায়দুল কাদীর) অপর হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'জান্নাতীদের কাতার হবে একশ' বিশটি। তন্মধ্যে আশিটি কাতার হবে এই উম্মতের।' [তিরমিযীঃ ২৫৪৬, ইবনে মাজাহ্ঃ ৪২৮৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৫৫] অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, এ উম্মত হবে জান্নাতীদের অর্ধেক। [বুখারীঃ ৬৫২৮, মুসলিমঃ ২২১] আরেক হাদীসে এসেছে, এ উম্মত সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' [মুসলিমঃ ৮৫৫, ইবনে মাজাহ্ঃ ১০৮৩]

بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾

জন্য যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে[১] এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে[২]। আর আহ্‌লে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা ছিল তাদের জন্য ভাল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসেক।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ۗ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۗ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে

---

(১) মুসলিম উম্মতকে 'শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়' বলে ঘোষনা করার কারণসমূহ কুরআনুল কারীম একাধিক আয়াতে বর্ণনা করেছে। আলোচ্য ১১০ নং আয়াতে মুসলিম উম্মতের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা মানব জাতির উপকারার্থে সমুত্থিত হয়েছে। আর তাদের প্রধান উপকার এই যে, মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে 'সৎকাজে আদেশ দান এবং অসৎকাজে নিষেধ' করার দায়িত্ব অধিকতর পুর্ণত্বলাভ করেছে। পুর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যাপক ঔদাসীন্যের দরুন দ্বীনের অন্যান্য বিশেষ কার্যাবলীর ন্যায় সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করার কর্তব্যটিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ উম্মতের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে- যারা 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ'- এর কর্তব্য পুরোপুরি পালন করে যাবে। আবুল আলিয়া বলেন, এ উম্মতের চেয়ে বেশী কোন উম্মত ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেয়নি, ফলে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। [ইবন আবী হাতেম] আয়াতে এ উম্মতকে শ্রেষ্ঠ বলার সাথে সাথে তাদের কর্ম কেমন হওয়া উচিত তা বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মা'রূফ বা সৎকাজ হচ্ছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষী দেয়া, আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন সেগুলোর স্বীকৃতি দেয়া এবং তার উপর কাফের মুশরিকদের সাথে জিহাদে থাকা। আর সবচেয়ে বড় মা'রূফ বা সৎকাজ হচ্ছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র স্বীকৃতি আদায় করা। পক্ষান্তরে সবচেয়ে বড় মুনকার বা অসৎকাজ হচ্ছে, মিথ্যারোপ করা। [তাবারী]

(২) এ বাক্যাংশে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তাদের ঈমানের বিশেষ স্বাতন্ত্র থাকার কারণে বিশেষকরে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

যুদ্ধ করে তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে; তারপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

১১২. আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদেরকে পাওয়া গেছে সেখানেই তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। আর তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং তাদের উপর দারিদ্র নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করত এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করত; তা এ জন্যে যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করত।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

১১৩. তারা সবাই একরকম নয়। কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত এক দল আছে; তারা রাতে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং তারা সিজ্‌দা করে[১]।

لَيْسُوا سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُونَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

---

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সালাত অনেক দেরী করে আদায় করলেন, তারপর মসজিদের দিকে বের হয়ে দেখতে পেলেন যে, লোকেরা সালাতের অপেক্ষা করছে। তখন তিনি বললেনঃ কোন দ্বীনের কেউই তোমাদের মত এ সময়ে সালাত আদায় করে না। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হল। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৯৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম, সা‘লাবাহ ইবন সা‘ইয়াহ, উসাইদ ইবন সা‘ইয়াহ ও আসাদ ইবন উবাইদ সহ একদল ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনল, তখন ইয়াহূদী নেতারা বলতে লাগল, মুহাম্মাদের উপর যারা ঈমান এনেছে তারা হচ্ছে আমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ ইয়াহূদী-নাসারা সবাই যে ক্ষতিগ্রস্ত তা কিন্তু নয়। তাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্তি পাবে।

১১৪. তারা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে ঈমান আনে, সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজে নিষেধ করে এবং তারা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে[১]। আর তারাই পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ وَاُولٰۤىِٕكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৫. আর উত্তম কাজের যা কিছু তারা করে তা থেকে তাদেরকে কখনো বঞ্চিত করা হবে না। আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র কাছে কখনো কোন কাজে আসবে না। আর তারাই অগ্নিবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُھُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَـيْـــًٔا ۭ وَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ ھُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١٦﴾

(১) এ আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমত: তারা হক্কের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, কোন কিছুই তাদেরকে হক্ক পথ থেকে টলাতে পারে না। দ্বিতীয়ত: তারা রাতের বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে। তৃতীয়ত: তারা সালাত আদায় করে। চতুর্থত: তারা আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ঈমান রাখে, পঞ্চমত: তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, ষষ্টত: তারা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কদৃষ্টে মনে হয়, যখন আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মাতে মুহাম্মদীকে সবচেয়ে উত্তম উম্মত হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তার কারণ হিসেবে ঈমান ও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার গুণ তাদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, তখন এ গুণগুলো অন্যান্য উম্মত বিশেষ করে আহলে কিতাবদের যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে, তাদেরকেও উত্তম উম্মতের অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ ঈমানদার আহলে কিতাবদের আরও কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে, "আর যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে, তারা তাতে ঈমান আনে।" [সূরা আল-বাকারাহ:১২১] আবার কোথাও বলা হয়েছে, "আর কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তাঁর প্রতি এবং তিনি যা তোমাদের ও তাদের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে অবশ্যই ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না।" [সূরা আলে-ইমরান: ১৯৯]

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوٓا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

১১৭. এ পার্থিব জীবনে যা তারা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, যা আঘাত করে ঐ জাতির শস্যক্ষেতে, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে; অতঃপর তা ধ্বংস করে দেয়। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেননি, তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۖ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না[১]। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ক্রটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তা-ই তারা

---

(১) অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। بطانة শব্দের অর্থ অভিভাবক, বন্ধু, বিশ্বস্ত, রহস্যবিদ। কাপড়ের অভ্যন্তর ভাগকেও بطانة বলা হয়, যা শরীরের সাথে মিশে থাকে। 'কোন ব্যক্তির অভিভাবক, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা হয়, এরূপ ব্যক্তিকে তার بطانة বলা হয়।' এখানে بطانة বলে বন্ধু, বিশ্বস্ত, গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য লোককে বোঝানো হয়েছে। অতএব আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নিজেদের দ্বীনের লোকদের ছাড়া অন্য কাউকে মুরুব্বী ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করে তাদের কাছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করতে যেও না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যখনই কোন নবী পাঠিয়েছেন বা কোন খলীফা বা রাষ্ট্রনায়ককে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তখনই তার দু'ধরনের মিত্রের সমাহার ঘটে। এক ধরনের মিত্র তাকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং সেটার উপর উৎসাহ যোগায়। অপর ধরনের মিত্র তাকে খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সেটার উপর উদ্দীপনা দিতে থাকে। আল্লাহ্ যাকে হেফাযত করতে ইচ্ছা করেন তিনি ব্যতীত সে মিত্রের অকল্যাণ থেকে বাঁচার কোন পথ থাকে না।" [বুখারী: ৭১৯৮] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, অন্ধকার যুগে কোন কোন মুসলিমের সাথে কোন কোন ইয়াহূদীর সন্ধিচুক্তি ছিল। সে চুক্তির কারণে ইসলাম গ্রহণের পরও মুসলিমরা তাদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় রাখত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে ইয়াহূদী-নাসারা তথা অমুসলিমদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার জন্য নির্দেশ দেন। [ইবন আবী হাতেম, আত-তাফসীরুস সহীহ]

কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর[১]। তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর[২]।

(১) অর্থাৎ তারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে কসুর করবে না। তারা তোমাদের বিপদ কামনা করে। এ ধরনের কিছু বিষয় স্বয়ং তাদের মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যে শক্রতা গোপন রাখে, তা আরও মারাত্মক। আমি তোমাদেরকে সামনে সব আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি; এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পার তবে তা থেকে উপকার পেতে পার।

উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াহূদী হোক কিংবা নাসারা, কপট বিশ্বাসী মুনাফেক হোক কিংবা মুশরেক- কেউ তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্খী নয়। তারা সর্বদাই তোমাদের বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক এবং কোন না কোন উপায়ে তোমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি হোক, এটাই হলো তাদের কাম্য। তাদের অন্তরে যে শক্রতা লুক্কায়িত রয়েছে, তা খুবই মারাত্মক। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমন সব কথাবার্তা বলে ফেলে, যা তাদের গভীর শক্রতার পরিচায়ক। শক্রতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এহেন শক্রদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা শক্র-মিত্রের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন, সুতরাং মুসলিমদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খুবই সমীচীন।

(২) ইসলাম বিশ্বব্যাপী করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহানুভুতি, শুভেচ্ছা, মানবতা ও উদারতার অসাধারণ নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয়; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মুসলিমদের নিজস্ব রাষ্ট্র ও তার বৈশিষ্ট্যপুর্ণ কার্যাবলী সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামী আইনে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার বাইরে এগিয়ে নেয়ার অনুমতি মুসলিমদের দেয়া যায় না। কারণ, এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুক্তিপুর্ণ, সঙ্গত ও জরুরী ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই হেফাজত হয়। যে সব অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা কিংবা মুসলিমদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষনের জন্যে জোরদার নির্দেশাবলী ইসলামী আইনের গুরুত্বপুর্ণ অংশ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

১১৯. দেখ, তোমরাই তাদেরকে ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না অথচ তোমরা সব কিতাবে ঈমান রাখ। আর তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি; কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দাঁত দিয়ে কাটতে থাকে।' বলুন, 'তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর।' নিশ্চয় অন্তরে যা রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত।

هَٰٓأَنتُمْ أُو۟لَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অত্যাচার করে কিংবা তার প্রাপ্য হ্রাস করে কিংবা তার উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করে, তবে কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে উকিল হবো।' [আবু দাউদঃ ৩০৫২]

কিন্তু এসব উদারতার সাথে সাথে মুসলিমদের নিজস্ব সত্তার হেফাযতের স্বার্থে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বিশ্বস্ত মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করো না। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুনশী হিসাবে গ্রহণ করে নিলে ভালই হবে। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উত্তরে বলেনঃ এরূপ করলে মুসলিমদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করা হবে, যা কুরআনে নির্দেশের পরিপন্থী।' [ইবন আবী হাতেম; আত-তাফসীরুস সহীহ] ইমাম কুরতুবী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও তফসীরবিদ। তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে মুসলিমদের মধ্যে এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরন ও তার অশুভ পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেনঃ "আজকাল অবস্থা এমন পাল্টে গেছে যে, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে ওরা মুর্খ বিত্তশালী ও শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে।" আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশেষ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়- এমন কোন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা ও মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করা হয় না। তাই মুসলিম শাসকগণেরও এ ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত।

১২০. তোমাদের মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা তাতে আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না[১]। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

তেরতম রুকূ‘

১২১. আর স্মরণ করুন, যখন আপনি আপনার পরিজনদের নিকট থেকে প্রত্যূষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মুমিনগণকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করছিলেন; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

১২২. যখন তোমাদের মধ্যে দু’দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল অথচ আল্লাহ্ উভয়ের অভিভাবক

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

---

(১) অর্থাৎ তাদের কাফেরসুলভ মনোভাবের আরো প্রমাণ হলো, তাদের অবস্থা এই যে, তোমরা কোন সুখকর অবস্থার সম্মুখীন হলে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমরা কোন বিপদে পতিত হলে তারা আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে। অতঃপর আয়াতে এ ধরনের লোকদের চক্রান্ত এবং শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে একটি সহজ সুন্দর ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হচ্ছেঃ “তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে ওদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করতে পারবে না”। কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যখন তারা মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব ও ঐক্যবদ্ধতা দেখে এবং শত্রুদের উপর মুসলিমদের বিজয় প্রত্যক্ষ করে, তখন তারা কষ্ট পায়। আর যখন মুসলিমদের মধ্যে দলাদলি ও মতবিরোধ হয়েছে দেখতে পায়, অথবা মুসলিমদের কোন পরাজয় লক্ষ্য করে, তখনি তারা খুশীতে আত্মহারা হয়ে পড়ে। যখনি তাদের এ ধরনের লোকের আবির্ভাব হবে, তখনি আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দিবেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা চলতে থাকবে। [তাবারী]

ছিলেন[১], আর আল্লাহ্‌র উপরই যেন মুমিনগণ নির্ভর করে[২]।

(১) অর্থাৎ তোমাদের দুটি দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করেছিল, অথচ আল্লাহ্ তাদের সহায় ছিলেন। এ দুই দল হলো আউস গোত্রের বনী হারেসা এবং খাযরাজ গোত্রের বনী সালমা। এরা উভয়ই আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের দেখাদেখি দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা ছিল না, বরং স্বদলের সংখ্যাল্পতা ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। তবে আয়াতের منكم বাক্যটি তাদের ঈমানের পূর্ণাঙ্গতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ গোত্রদ্বয়ের মধ্য থেকে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলতেন, 'এ আয়াত যদিও আমাদের বনু হারেসা ও বনু সালামাকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছিল এবং আয়াতে আমাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ ব্যাক্যাংশের সুসংবাদও আমাদের লক্ষ্য করেই উক্ত হয়েছে। এ কারণে এ আয়াত নাযিল না হওয়া আমাদের জন্য সুখকর ছিল না।' [বুখারীঃ ৪০৫১, ৪৫৫৮, মুসলিমঃ ২৫০৫]

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাই মুসলিমদের কর্তব্য। এতে পরিস্কার বলা হয়েছে যে, সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার পর ভরসা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের উপরই করা দরকার। সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই বনী-হারেসা ও বনী সালমার মনে দুর্বলতা ও ভীরুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা দ্বারা এর প্রতিকার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি যথার্থ ভরসা ও আস্থাই এ জাতীয় কুমন্ত্রণার অমোঘ প্রতিকার। মূলতঃ 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ভরসা) মানুষের প্রতি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। ইয়াদ ইবন গানম আল-আশ'আরী বলেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরপর পাঁচজনকে আমীর বানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যুদ্ধ শুরু হলে একমাত্র আমীর হবে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ। যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধের ময়দান থেকে আমরা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখলামঃ মৃত্যু আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। আমাদের জন্য সাহায্য পাঠান। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটার উত্তরে লিখলেন, সাহায্য চেয়ে পাঠানো পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। আমি তোমাদেরকে এমন একজনের সন্ধান দেব যিনি সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারেন, যাঁর সেনাবাহিনী সদা প্রস্তুত, তিনি হচ্ছেন, আল্লাহ্ তা'আলা। সুতরাং তোমরা তার কাছেই সাহায্য চাও। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দিনে তোমাদের চেয়ে কম সংখ্যা ও অস্ত্র-সস্ত্র নিয়েও কাফেরদের উপর জয়লাভ করেছিলেন। অতএব, যখন আমার এ চিঠি আসবে তখন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, এ ব্যাপারে আর আমার সাথে যোগাযোগ করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা যুদ্ধ করলাম এবং যুদ্ধে জয়লাভ করলাম। [মুসনাদে আহমাদ ১/৪৯; সহীহ ইবন হিব্বানঃ ১১/৮৩-৮৪]

১২৩. আর[১] বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন অথচ তোমরা হীনবল ছিলে। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝١٢٣

১২৪. স্মরণ করুন, যখন আপনি মুমিনগণকে বলছিলেন, 'এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তিন হাজার ফিরিশ্‌তা নাযিল করে তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন?[২]'

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ۝١٢٤

(১) এখানে ঐ যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হচ্ছে- যাতে মুসলিমরা পুরোপুরি তাওয়াক্কুলের পরিচয় দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাফল্য দান করেছিলেন। অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা বদরে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন; অথচ তোমরা সংখ্যায় ছিলে অতি নগণ্য। আর সে যুদ্ধটি ছিল বদরের যুদ্ধ।

(২) এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের প্রভূত শক্তি দান করেছেন। একজন ফেরেশতা একাই গোটা জনপদ উল্টে দিতে পারেন। উদাহারণতঃ কওমে-লুতের বস্তি একা জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালামই উল্টে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় এখানে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন ছিল? এছাড়া ফেরেশতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণই করেছিল, তখন একটি কাফেরেরও প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল না। এ সব প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। অর্থাৎ ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য তাদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করানো ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে সান্ত্বনা প্রদান করা, তাদের মনোবল দৃঢ় করা এবং বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া। এ ঘটনা সম্পর্কেই সূরা আল-আনফালের ১২ নং আয়াতে আরও স্পষ্ট করে ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, 'তোমরা মুসলিমদের অন্তর স্থির রাখ- অস্থির হতে দিয়ো না।' অন্তর স্থির রাখার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, কোন না কোন উপায়ে মুসলিমদের সামনে একথা ফুটিয়ে তোলা যে, আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে দাড়িয়ে রয়েছেন। যেমন কখনো দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে, কখনো আওয়াজ দিয়ে এবং কখনো অন্য কোন উপায়ে। বদরের রণক্ষেত্রে এসব উপায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন সাহাবী জিবরাঈলের আওয়াজ শুনেছেন যে, তিনি কাউকে ডাকছেন। কেউ কেউ কতক ফেরেশতাকে দেখেছেনও। কোন কোন সাহাবী কোন কোন কাফেরকে ফেরেশতাদের

بَلَىٰٓ إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. হ্যাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তারা দ্রুত গতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তবে আল্লাহ্ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিশ্‌তা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন(১)।

হাতে মরতেও দেখেছেন [দেখুন, মুসলিম: ১৭৬৩]

উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলিমদের আশ্বস্ত করছিলেন যে, তারাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাজ ছিল মুসলিমদের মনোবল অটুট রাখা এবং সান্ত্বনা দেয়া। পুরো যুদ্ধটাই ফেরেশতাদের দ্বারা করানো উদ্দেশ্য ছিল না। এর আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, এ জগতে জিহাদের দায়িত্ব মানুষের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। সে কারণেই তারা সওয়াব, ফযীলত ও উচ্চমর্যাদা লাভ করে। ফেরেশতা-বাহিনী দ্বারা দেশ জয় করা যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তাহলে পৃথিবীতে কাফেরদের রাষ্ট্র দুরের কথা, তাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না। এ বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা তা নয়। এখানে কুফর, ঈমান, ইবাদাত ও গোনাহ মিশ্রিতভাবেই চলতে থাকবে। এদের পরিস্কার পৃথকীকরনের জন্যে হাশরের দিন নির্ধারিত রয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সংখ্যা বিভিন্ন সূরায় বিভিন্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল-আনফালের আয়াতে এক হাজার, সূরা আলে-ইমরানের আয়াতে প্রথমে তিন হাজার এবং পরে পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়েছে। এর রহস্য কি? উত্তর এই যে, সূরা আল-আনফালে বলা হয়েছে, বদর যুদ্ধে মুসলিমগণ- যাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের জন আর শত্রু সংখ্যা এক হাজার- আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়। অর্থাৎ শত্রু সংখ্যা যত, তত সংখ্যক ফেরেশতা প্রেরণ করা হবে। আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা স্বীয় রব এর সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের জবাব দেন যে, আমি এক হাজার অনুসরণকারী ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবো'। এ আয়াতের পরও ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে মুসলিমদের মনোবল অটুট রাখা এবং বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা। পরবর্তীতে সূরা আলে ইমরানের আলোচ্য আয়াতে তিন হাজার ফেরেশতার ওয়াদা করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বদরের মুসলিমদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, কুরয ইবনে জাবের মুহারেবী স্বীয় গোত্রের বাহিনী নিয়ে কুরাইশদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসছে। পূর্বেই শত্রুদের সংখ্যা মুসলিমদের তিনগুণ বেশী ছিল। এ সংবাদে মুসলিমদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিলে তিন

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۗ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾

১২৬. আর এটা তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য শুধু সুসংবাদ ও তোমাদের আত্মিক প্রশান্তির জন্য করেছেন। আর সাহায্য তো শুধু পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র কাছ থেকেই হয়।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. যাতে তিনি কাফেরদের এক অংশকে ধ্বংস করেন বা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন[১]; ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. তিনি তাদের তাওবা কবুল করবেন বা তাদেরকে শাস্তি দেবেন- এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই; কারণ

হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়- যাতে শত্রুদের চাইতে মুসলিমদের সংখ্যা তিনগুন বেশী হয়ে যায়। অতঃপর এ আয়াতের শেষ ভাগে কয়েকটি শর্ত যোগ করে এ সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার করে দেয়া হয়েছে। শর্ত ছিল দু'টিঃ (এক) মুসলিমগণ ধৈর্য ও আল্লাহ্ভীতির উচ্চস্তরে পৌছলে, (দুই) শত্রুরা আকস্মিক আক্রমন চালালে। দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ আকস্মিক আক্রমণ বাস্তবে ঘটেনি, তাই পাঁচ হাজারের ওয়াদা পূরণেরও প্রয়োজন হয়নি। আকস্মিক আক্রমন না হওয়া সত্বেও আল্লাহ্র ওয়াদা পাঁচ হাজারের আকারে পূর্ণ করা হয়েছে, না তিন হাজারের আকারে সে সম্পর্কে তাফসীর ও ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। [তাফসীরে ফাতহুল কাদীর]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে বলেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সাহায্য করবেন দু'টি কারণের কোন একটি কারণে। এক. তিনি হত্যা, বন্দী, গণীমত, শহর বিজয় ইত্যাদির মাধ্যমে কাফেরদের এক শক্তি ও ভিত্তি ভেঙে দেবেন; ফলে মুমিনরা শক্তিশালী হবে ও কাফেররা দুর্বল হবে। কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের মূল শক্তি হল সৈন্য, ধন-সম্পদ, অস্ত্র ও ভূ-সম্পত্তি। এসব কিছুর মধ্যে কোন কিছু যদি দুর্বল করে দেয়া যায়, তবে তাদের শক্তি কমে যাবে। দুই. কাফেররা মুসলিমদের উপর জয়ী হওয়ার জন্য আশা করবে এবং প্রচেষ্টা চালাবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদেরকে বিজয়ী করবেন ফলে তারা লাঞ্ছিত ও নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। মূলত আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য দু'টির কোন একটি হয়ে থাকে; হয় তিনি মুসলিমদেরকে কাফেরদের উপর বিজয়ী করবেন, নতুবা কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। আয়াতে এ দু'টি দিকই উল্লেখ করা হয়েছে। [তাফসীর সা'দী]

তারা তো যালেম[১]।

১২৯. আর আসমানে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

চৌদ্দতম রুকূ‘

১৩০. হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ[২]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰۤوا

(১) এখান থেকে আবারো ওহুদের ঘটনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। মাঝখানে সংক্ষেপে বদর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ আয়াত অবতরনের কারণ এই যে, ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখস্থ উপর ও নীচের চারটি দাঁতের মধ্যে থেকে নীচের পাটির ডান দিকের একটি দাত পড়ে গিয়েছিল এবং মুখমণ্ডল আহত হয়ে পড়েছিল। এতে দুঃখিত হয়ে তিনি এ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেনঃ “যারা নিজেদের নবীর সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তারা কেমন করে সাফল্য অর্জন করবে? অথচ নবী তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন।” এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। [বুখারী, মুসলিমঃ ১৭৯১] এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে উঠার পর কাফেরদের উপর বদ দো‘আ করতেন, কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তা ত্যাগ করেন। [বুখারীঃ ৪৫৬০, ৪০৬৯, ৪০৭০ মুসলিমঃ ৬৭৫]

(২) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমর ইবনে আকইয়াশের জাহেলী যুগের কিছু সুদের কারবার ছিল সে তা উসুল করা জন্য ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। তারপর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন আসল, সে জিজ্ঞাসা করল, আমার চাচাত ভাই অমুক কোথায়? লোকেরা বলতঃ উহুদের প্রান্তরে, আবার জিজ্ঞাসা করতঃ অমুক কোথায়? তারা বলতঃ উহুদের প্রান্তরে, আবার জিজ্ঞাসা করলঃ অমুক কোথায়? লোকেরা বলতঃ সেও উহুদের প্রান্তরে। এতে সে তার যুদ্ধাস্ত্র পরে নিয়ে উহুদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে। মুসলিমগণ যখন তাকে দেখল তখন তারা বললঃ আমর! তুমি আমাদের থেকে দূরে থাক। কিন্তু সে জবাব দিল ‘আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি’। তারপর সে যুদ্ধ করে আহত হলো, তাকে তার পরিবারের কাছে আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হল। সা‘দ ইবনে মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এসে তার বোনকে বললেন তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কর সে কি জাতিকে বাঁচানোর জন্য, নাকি তাদের ক্রোধে শরীক হওয়ার জন্য, নাকি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করেছে? তখন আমর জবাবে বললঃ বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছি। তারপর তিনি মারা

أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

খেয়ো না[১] এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

১৩১. আর তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে[২]।

গেলেন। ফলে জান্নাতে প্রবেশ করলেন, অথচ আল্লাহ্‌র জন্য এক ওয়াক্ত সালাত পড়ারও সুযোগ তার হয়নি। [আবু দাউদঃ ২৫৩৭, ইসাবাঃ ২/৫২৬] হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ আমি সর্বদা খুঁজে বেড়াতাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা উহুদের ঘটনার মাঝখানের সুদের কথা কেন নিয়ে আসলেন, তারপর যখন এ ঘটনা পড়লাম তখন আমার কাছে এ আয়াতকে এখানে আনার যোক্তিকতা স্পষ্ট হলো। [আল উজাবঃ ২/৭৫৩]

(১) আলোচ্য আয়াতে কয়েকগুণ বেশী অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি হারকে সুদ হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে অত্যন্ত কঠোরভাবে সর্বাবস্থায় সুদ হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। "আয়াতে চক্রবৃদ্ধি হারে" সুদ খাওয়া নিষেধ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে বেঁচেও থাকে, তবে সুদের উপার্জনকে যখন পুনরায় সুদে খাটাবে, তখন অবশ্যই দ্বিগুণের দ্বিগুণ হতে থাকবে- যদিও সুদখোরদের পরিভাষায় একে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হবে না। সারকথা, সব সুদই পরিণামে দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুন সুদ হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতে সবরকম সুদকেই নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা ধ্বংসকারী সাতটি বিষয় হতে বেঁচে থাকবে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে বিষয়গুলো কি কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা, জাদু করা, যথার্থ কারণ ছাড়া আল্লাহ্ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল ভক্ষন করা, যুদ্ধ অবস্থায় জেহাদের ময়দান হতে পলায়ণ করা, পবিত্রা মুসলিম নারীর উপর ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া।' [বুখারীঃ ২৭৬৬]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের সবার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা এমনভাবে কথা বলবেন যে, তার ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন অনুবাদকারী থাকবে না। তারপর প্রত্যেকে তার সামনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সামনে তাকিয়ে দেখবে যে, জাহান্নাম তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসছে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন একটি খেজুরের অংশ বিশেষ দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচায়।" [বুখারী: ৬৫৩৯]

১৩২. আর তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার[১]।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝١٣٢

১৩৩. আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে[২] যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝١٣٣

---

(১) আলোচ্য আয়াতে দু'টি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ (এক) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সাথে রাসূলের আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা জানা কথা যে, রাসূলের আনুগত্য হুবহু আল্লাহ্র আনুগত্য বোঝায়। তারপরও এখানে রাসূলের আনুগত্যকে পৃথক করে বর্ণনা করার তাৎপর্য স্বয়ং আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়। এতে আল্লাহ্র করুণালাভের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকে যেমন অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য করা হয়েছে, তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকেও জরুরী ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এ আয়াতেই নয়, বরং সমগ্র কুরআনে বার বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং যেখানেই আল্লাহ্র আনুগত্যের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই রাসূলের আনুগত্যকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন পাকের এই উপর্যুপরি ও অব্যাহত বাণী ইসলাম ও ঈমানের এ মূলনীতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, ঈমানের প্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ তথা অস্তিত্ব, প্রভুত্ব, নাম ও গুণ এবং ইবাদাত তথা দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য করা। (দুই) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মকবুল ও নিষ্ঠাবান পরহেযগার বান্দার গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য শুধু মৌখিক দাবীকে বলা হয় না, বরং গুণাবলী ও লক্ষণাদির দ্বারাই আনুগত্যকারীর পরিচয় হয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর বর্ণনা আসছে।

(২) এ আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামুলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের পর এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ আল্লাহ্র কাছে সরাসরি ক্ষমা চাওয়া হতে পারে। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে এমন সব সৎকর্ম এর উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। এটাই মত। সাহাবী ও তাবে'য়ীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, 'কর্তব্য পালন'। ইবনে-আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, 'ইসলাম'। আবুল 'আলিয়া বলেছেন 'হিজরত'। আনাস ইবনে-মালেক বলেছেন 'সালাতের প্রথম তাকবীর। সায়ীদ ইবনে-জুবায়ের বলেছেন 'ইবাদাত পালন'। দাহ্হাক বলেন 'জিহাদ'। আর ইকরিমা বলেছেন 'তওবা'। এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বুঝানো

যমীনের সমান[1], যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে

হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।
এখানে দু'টি বিষয় জানা আবশ্যক। এক. শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকারঃ এক, ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। উদাহরণতঃ শ্বেতাঙ্গ হওয়া, সুশ্রী হওয়া ইত্যাদি। দুই, ঐ শ্রেষ্ঠত্ব , যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। এ গুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। [যেমন, সূরা আন-নিসাঃ ৩২] কারণ, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ স্বীয় হেকমত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বন্টন করেছেন। এতে কারও চেষ্টার কোন দখল নাই। সুতরাং যত চেষ্টা ও বাসনাই করা হোক না কেন এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। চেষ্টাকারীর মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জ্বলা ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। তবে যে সব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে মানুষের ইচ্ছা শক্তি কাজ করে থাকে সেগুলোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ বহু আয়াতে দেয়া হয়েছে। ঠিক এ আয়াতেও আল্লাহ্‌র ক্ষমার কারণ হয় এমন যাবতীয় কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেননা এটা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়।
দুই. আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহ্‌র ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মুল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের পন্থা মাত্র একটি। তা' হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ। রাসূলুল্লা্হ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'সততা ও সত্য অবলম্বন কর, মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর। কারও কর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। শ্রোতারা বললোঃ আপনাকেও নয়কি- ইয়া রাসূলাল্লাহ। উত্তর হলোঃ আমার কর্ম আমাকেও জান্নাতে নেবে না। তবে আল্লাহ্ যদি স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।' [বুখারীঃ ৫৩৪৯, মুসলিমঃ ২৮১৬] মোটকথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ্ তাআয়ালার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ঐবান্দাকেই দান করেন, যে সৎকর্ম করে। বরং সৎকর্মের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষণ। অতএব সৎকর্ম সম্পাদনে ত্রুটি করা উচিৎ নয়।

(১) আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের সমান। নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের চাইতে বিস্তৃত কোন বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে জান্নাতের প্রস্থতাকে এ দু'টির সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত। প্রশস্ততায় তা নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অবশ্য কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ জান্নাত দৈর্ঘ ও প্রস্থে

মুত্তাকীদের জন্য[১]।

১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয়[২]

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ

সমান। কেননা তা আরশের নীচে গম্বুজের মত। গম্বুজের মত গোলাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হয়ে থাকে। এ বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, তিনি বলেছেনঃ 'তোমরা যখন আল্লাহ্র কাছে জান্নাত চাইবে তখন ফেরদাউস চাইবে; কেননা তা সর্বোচ্চ জান্নাত, সবচেয়ে উত্তম ও মধ্যম স্থানে অবস্থিত জান্নাত, সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত। আর তার ছাদ হলো দয়াময় আল্লাহ্র আরশ। [বুখারীঃ ২৭৯০, ৭৪২৩]
তবে আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন عرض শব্দের অর্থ طول তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীতে নেয়া হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় 'মূল্য' তবে আয়াতের অর্থ হবে যে, জান্নাত কোন সাধারণ বস্তু নয়- এর মূল্য সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও। কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ আয়াতে উল্লেখিত عرض শব্দের অর্থ ঐ বস্তু যা বিক্রিত বস্তুর মোকাবেলায় মূল্য হিসেবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য। এতে করে জান্নাত যে অমূল্য বিষয় তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। [তাফসীরে কাবীর]

(১) জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছেঃ জান্নাত মুত্তাকীগণের জন্যে নির্মিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, জান্নাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাত তৈরী হয়ে আছে। আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাস। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসে জান্নাতের যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে সেগুলোতে কোথাও কোথাও স্পষ্ট করে বলা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন। যেমন জান্নাতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতের এক ইট রৌপ্যের ও এক ইট স্বর্ণের, তার নীচের আস্তর সুগন্ধি মিশকের, তার পাথরকুচিগুলো হীরে-মুতি-পান্নার সমষ্টি, মিশ্রণ হচ্ছে, ওয়ারস ও যা'ফরান। যে তাতে প্রবেশ করবে সে তাতে স্থায়ী হবে, মরবে না, নিয়ামত প্রাপ্ত হবে, হতভাগা হবে না, যৌবন কখনও ফুরিয়ে যাবে না, কাপড়ও কখনও ছিড়ে যাবে না।" [মুসনাদে আহমাদ ২/৩০৪, ৩০৫, সহীহ ইবন হিব্বান: ১৬/৩৯৬]

(২) অর্থাৎ মোত্তাকী তারাই, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত। স্বচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয় কার্য অব্যাহত রাখে। বেশী হলে বেশী এবং কম হলে কমই ব্যয় করে। এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না। অপর দিকে আয়াতে এ নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য

الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী[১] এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ্ মুহ্সিনদেরকে ভালবাসেন;

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْٓا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى

১৩৫. আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

অব্যাহত রাখলে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবতঃ এর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন। স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরও একটি রহস্য সম্ভবতঃ এই যে, এ দু'অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম-আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায়। অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তামগ্ন হয়ে আল্লাহ্র প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহ্কে ভুলে না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহ্র প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না।

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'ঘায়েল বা পরাভূত করতে পারাটাই বীর হওয়ার লক্ষণ নয়, বীর হল ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে ক্রোধের সময় সম্বরণ করতে পেরেছে'। [বুখারীঃ ৬১১৪, মুসলিমঃ ২৬০৯] অনুরূপভাবে এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেনঃ আমাকে এমন একটি কথা বলুন যা আমার কাজে আসবে, আর তা সংক্ষেপে বলুন যাতে আমি তা আয়ত্ব করতে পারি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ রাগ করো না । সাহাবী বার বার একই প্রশ্ন করলেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উত্তর দিলেন। [বুখারী: ৬১১৬; মুসনাদের আহমাদঃ ৫/৩৪] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে ক্ষমার বিনিময়ে কেবল সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন'। [তিরমিযীঃ ২৩২৫, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪৩১] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ক্রোধকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দমন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে ডেকে যে কোন হূর পছন্দ করে নেয়ার অধিকার দিবেন"। [ইবন মাজাহ: ৪১৮৬] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্র কাছে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্রোধ সম্বরণ করার চেয়ে বড় কোন সম্বরণ বেশী সওয়াবের নেই।" [ইবন মাজাহ: ৪১৮৯]

مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে[১]? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা পুনরায় করতে থাকে না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. তারাই, যাদের পুরস্কার হলো তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতইনা উত্তম!

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কোন এক ব্যক্তি গোনাহ করার পর বললঃ হে আল্লাহ! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আবার আরেকটি গোনাহ করে আবারও বললঃ হে রব! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আবার আরেকটি গোনাহ করে আবারও বললঃ হে রব! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম, সে যাই করুক না কেন। [বুখারীঃ ৭৫০৭, মুসলিমঃ ২৭৫৮] আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে আবু বকর হাদীস শুনিয়েছে। আর আবু বকর সত্য বলেছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "কোন লোক যদি গুনাহ করে, তারপর পাক-পবিত্র হয় এবং সালাত আদায় করে, তারপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন।" [তিরমিযী: ৪০৬; ইবন মাজাহ: ১৩৯৫; আবু দাউদ: ১৫২১] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "তোমরা দয়া কর, তোমাদেরকেও রহমত করা হবে, তোমরা ক্ষমা করে দাও আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, যারা কোন কথা না শোনার জন্য নিজেদেরকে বন্ধ করে নিয়েছে তাদের জন্য ধ্বংস, যারা অন্যায় করার পর জেনে-বুঝে বারবার করে তাদের জন্যও ধ্বংস"। [মুসনাদে আহমাদ: ২/১৬৫]

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু (জাতির) চরিত গত হয়েছে[১], কাজেই তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কি পরিণাম[২]!

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮. এগুলো মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ ।

هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯. তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত ও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও[৩] ।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে ‘সুনান’ বলে কাফের, মুমিন, ভাল-মন্দ যে সমস্ত চরিত চলে গেছে তা বোঝানো হয়েছে । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) কাতাদা বলেন, এর অর্থ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে অল্প কিছুদিন উপভোগ দিয়েছি, তারপর তাদেরকে জাহান্নামে দিয়ে দিয়েছি । [তাবারী]

(৩) আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদের হতাশ না হতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে । কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে ওহুদের যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর কিছুক্ষণের জন্য মুসলিমরা পরাজয় বরণ করে । সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন । স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হন । কিন্তু এ সবের পর আল্লাহ্ তা‘আলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায় । এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি । (এক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি । (দুই) খোদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলিমদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয় । ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে । (তিন) মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । মুসলিমদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন । এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন । মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিলো । সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল । মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যেও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন । সার্বিক পরিস্থিতিতে দু’টি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল । (এক) অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ ও বিষাদ । (দুই) আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্য মুসলিমগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত

১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত তো ওদেরও লেগেছে। মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আমরা এ দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ্ মুমিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন। আর আল্লাহ্ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪১. আর যাতে আল্লাহ্ মুমিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি[১]?

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

এ জাতি অঙ্কুরেই মনোবল হারিয়ে না ফেলে। এ দুইটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্যে কুরআনের এ বাণীতে বলা হয় যে, 'ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিয়ো না এবং অতীতের জন্যেও বিমর্ষ হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র পথে জেহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।' উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যতে সংশোধনের চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রাসূলের আনুগত্য উজ্জল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিয়ো না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

(১) এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে যে, তিনি কাউকে পরীক্ষা না করে জান্নাতে দিবেন না। তিনি তাদেরকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে তারপর সে পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। পবিত্র কুরআনে এ কথাটি বারবার ঘোষিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা

১৪৩. মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার আগে তোমরা তো তা কামনা করতে(১), এখনতো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝١٤٣

পনরতম রুকূ‘

১৪৪. আর মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র; তার আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন। কাজেই যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? আর কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্‌র ক্ষতি করবে না; আর আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন(২)।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝١٤٤

কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সংগী-সাথী ঈমানদারগণ বলে উঠেছিল, ‘আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে?” [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৪] আরও বলেন, “তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ্ না প্রকাশ করেন তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ এবং কারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি?” [আত-তাওবাহ: ১৬] আরও এসেছে “মানুষ কি মনে করেছে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে ?” [সূরা আল-আনকাবূত:২]

(১) মৃত্যু বা বিপদ কামনা করা জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাত কামনা করো না; আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা চাও, তবে যদি তারপরও সাক্ষাত হয়ে যায় তা হলে ধৈর্য ধারন কর এবং জেনে রাখ যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে’। [বুখারীঃ ২৯৬৬, মুসলিমঃ ১৭৪২]

(২) এ আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিওয়া সাল্লাম একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। তার পরও মুসলিমদের দ্বীনের উপর অটল থাকতে হবে। এতে আরো বুঝা যায় যে, সাময়িক বিপর্যয়ের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহত হওয়া এবং তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার পেছনে যে রহস্য ছিল, তা হলো তাঁর জীবদ্দশাতেই তার মৃত্যু-পরবর্তী সাহাবায়ে-কেরামের সম্ভাব্য অবস্থার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা- যাতে তাদের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তা

১৪৫.আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু সেটার মেয়াদ সুনির্ধারিত[১]। কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমরা তাকে তার কিছু দিয়ে থাকি[২] এবং কেউ আখেরাতের পুরস্কার চাইলে আমরা তাকে তার কিছু দিয়ে থাকি এবং শীঘ্রই আমরা কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবো।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِۦ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى الشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬.আর বহু নবী ছিলেন, তাদের সাথে বিরাট সংখ্যক (ঈমান ও আমলে সালেহ্‌র উপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) লোক যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্‌র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِىٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا۟ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا۟ وَمَا اسْتَكَانُوا۟ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّٰبِرِينَ ﴿١٤٦﴾

সংশোধন করে দেন এবং পরে সত্যসত্যই যখন তার মৃত্যু হবে, তখন যেন সম্বিত হারিয়ে না ফেলেন। বাস্তবে তাই হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় যখন প্রধান প্রধান সাহাবীগণও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ আয়াত তেলাওয়াত করেই তাদের সান্ত্বনা দেন। [দেখুন, বুখারীঃ ১২৪১, ১২৪২, ৪৪৫৩, ৪৪৫৪]

(১) এ আয়াতেও বিপদাপদের সময় অটল থাকার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৃত্যুর দিন, তারিখ, সময় সবই নির্ধারিত, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কারো মৃত্যু হবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরও কেউ জীবিত থাকবে না। এমতাবস্থায় কারো মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই।

(২) এ আয়াত থেকে এটা বুঝার সুযোগ নেই যে, দুনিয়া চাইলেই তাকে তা দেয়া হবে। কারণ, অন্য আয়াতে এটা শর্তসাপেক্ষে দেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সে শর্ত হচ্ছে, সেটা দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকতে হবে। যেমন বলা হয়েছে, “কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছে এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি” [সূরা আল-ইসরা: ১৮]

১৪৭. এ কথা ছাড়া তাদের আর কোন কথা ছিল না, 'হে আমাদের রব! আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজের সীমালংঘন আপনি ক্ষমা করুন, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখুন এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।'

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ
لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَٰفِرِينَ ١٤٧

১৪৮. তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার এবং আখেরাতের উত্তম পুরস্কার দান করেন। আর আল্লাহ্ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন।

فَآتَىٰهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ
الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٤٨

ষোলতম রুকূ'

১৪৯. হে মুমিনগণ! যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ
كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُوا
خَٰسِرِينَ ١٤٩

১৫০. বরং আল্লাহ্ই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

بَلِ اللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّٰصِرِينَ ١٥٠

১৫১. অচিরেই আমরা কাফেরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব[১], যেহেতু তারা আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছে, যার সপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠাননি। আর জাহান্নাম তাদের আবাস এবং কত নিকৃষ্ট আবাস যালেমদের।

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ
أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا ۖ
وَمَأْوَىٰهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّٰلِمِينَ ١٥١

১৫২. অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم
بِإِذْنِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِي

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমাকে একমাসে অতিক্রম করার মত রাস্তার দূরত্ব থেকে কাফেরদের মনে ভয় ঢুকিয়ে সাহায্য করা হয়েছে'। [বুখারীঃ ৩৩৫, মুসলিমঃ ৫২১, ৫২৩]

الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কিছু সংখ্যক দুনিয়া চাচ্ছিল[১] এবং কিছু সংখ্যক চাচ্ছিল আখেরাত। তারপর তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তাদের (তোমাদের শত্রুদের) থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন[২]। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে

---

(১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আয়াতের এ অংশ নাযিল হবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে কেউ দুনিয়া চায়, এটি আমার ধারনাও আসে নি। [মুসনাদে আহমাদ ১/৪৬৩]

(২) বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে পঞ্চাশ জনের এক দল সাহাবীকে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বে দিয়ে বললেনঃ যদি তোমরা দেখ যে, পাখি আমাদেরকে ছুঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে তাতেও তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করে যাবে না। যতক্ষন না আমি তোমাদেরকে ডেকে পাঠাই। অনুরূপভাবে যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রুদের পর্যুদস্ত করে দিয়েছি তাতেও তোমরা স্থান ত্যাগ করবে না যতক্ষণ আমি তোমাদের ডেকে না পাঠাই। তারপর মুসলিমগণ কাফেরদের পরাজিত করল। বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমি মহিলাদের চুড়ি, পায়ের গোড়ালি ইত্যাদিও দেখছিলাম, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের সাথীগণ বলতে আরম্ভ করলঃ গনীমতের মাল এসে পড়েছে, তোমাদের সাথীরা কাফেরদের উপর জয়লাভ করেছে, সুতরাং তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কি রাসূলের নির্দেশ ভূলে গেছ? তারা বললঃ আমরা মানুষের কাছে গিয়ে গনীমতের মাল জমা করব। একথা বলে তারা স্থান ত্যাগ করতে আরম্ভ করল। আর এতেই যুদ্ধের পট পরিবর্তিত হয়ে জয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সবাই পালাতে আরম্ভ করল। রাসূলের সাথে মাত্র বার জন লোক ছিল। রাসূল তাদেরকে ডাকতে থাকলেন। এভাবে মুসলিমদের সত্তর জন লোক শহীদ হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীরা বদরের দিন একশত চল্লিশ জন কাফেরকে পর্যুদস্ত করতে পেরেছিলেন, তাদের সত্তর জন মারা যায় আর বাকী সত্তর জন আহত হয়ে বন্দী হয়। তখন আবু সুফিয়ান তিন বার বললঃ এখানে কি মুহাম্মাদ আছে? সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে উত্তর দিতে নিষেধ করলেন। তারপর আবু সুফিয়ান

ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

১৫৩. স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের (পাহাড়ের) দিকে ছুটছিলে এবং পিছন ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না, আর রাসূল তোমাদেরকে পিছন দিক থেকে ডাকছিলেন। ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন[১], যাতে তোমরা যা হারিয়েছ এবং যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

তিন বার বললঃ এখানে কি ইবনে আবি কুহাফা আছে? তারপর আবু সুফিয়ান তিনবার বললঃ এখানে কি ইবনুল খাত্তাব আছে? তারপর সে তার সাথীদের কাছে ফিরে গিয়ে বললঃ এরা সবাই মারা পড়েছে। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। তিনি বলে বসলেনঃ হে আল্লাহ্‌র দুশমন! তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি যাদের কথা বলেছ তারা সবাই জীবিত। আর তোমার যাতে খারাপ লাগে তা অবশ্যই বাকী আছে। তখন আবু সুফিয়ান বলে বসলঃ বদরের দিনের বদলে একটি দিন হলো আজ। আর যুদ্ধে জয়- পরাজয় আছেই। তুমি তোমাদের মৃতদের মাঝে কিছু বিকৃত লাশ দেখতে পাবে। আমি বিকৃত করার নির্দেশ দেইনি। কিন্তু আমার খারাপও লাগেনি। তারপর সে আবৃতি করতে লাগলঃ হুবলের জয় হোক, হুবলের জয় হোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি তার জবাব দিবে না? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আমরা কি বলব? তিনি বললেনঃ ‘তোমরা বলঃ আল্লাহ্ মহান ও সর্বোচ্চ। তখন আবু সুফিয়ান বললঃ আমাদের ‘উয্যা আছে তোমাদের উয্যা নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা জবাব দিবে না? সাহাবগণ বললেনঃ কি জবাব দেব? তিনি বললেনঃ বল যে, আল্লাহ্ আমাদের অভিভাবক-সাহায্যকারী, তোমাদের কোন অভিভাবক-সাহায্যকারী নেই। [বুখারীঃ ৩০৩৯, ৩৯৮৬, ৪০৪৩, ৪০৬৭, ৪৫৬১]

(১) কাতাদা বলেন, প্রথম বিপদ হচ্ছে, আহত-নিহত হওয়া। আর দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে, যখন তাদের কাছে খবর পৌঁছল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। তখন তারা নিজেদের আহত-নিহত হওয়ার চেয়েও বেশী চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ
طَائِفَةً مِّنكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ
يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ
هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ
يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ
كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي
بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ
مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. তারপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন তন্দ্রারূপে প্রশান্তি, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল[১] এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এ বলে যে, 'আমাদের কি কোন কিছু করার আছে'? বলুন, 'সব বিষয় আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে'। যা তারা আপনার কাছে প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে সেগুলো গোপন রাখে। তারা বলে, 'এ ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু করার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না[২]।' বলুন, 'যদি তোমরা

(১) অর্থাৎ এ কঠিন বিপদের সময় তাদের উপর তন্দ্রা নেমে এসে তাদেরকে প্রশান্ত করে দিচ্ছিল। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা ওহুদের দিন কাতারবন্দী অবস্থাতেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। এমনকি আমাদের হাত থেকে তরবারী পড়ে যাচ্ছিল আর আমি বারবার তা উঠিয়ে নিচ্ছিলাম।' [বুখারী: ৪৫৬২] আর এটাই আল্লাহ্‌র বাণী "তারপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন তন্দ্রারূপে প্রশান্তি, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল, এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল" এর তাৎপর্য। আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যুদ্ধের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর সালাতের মধ্যে শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। [ইবন আবী হাতেম; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এখানে আরেক দল বলে মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তারা সবচেয়ে ভীতু ও কাপুরুষ ও হক্কের বিপরীতে অবস্থানকারী সম্প্রদায় ছিল। [তাবারী] আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেনঃ উহুদের যুদ্ধের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, আল্লাহ্ আমাদের উপর ঘুম পাঠালেন, আমাদের প্রত্যেকের থুতনি বুকে লেগে যাচ্ছিল। আল্লাহ্‌র শপথ আমি যেন মু'আত্তাব ইবনে কুসাইরের কথা স্বপ্নের মাঝে শুনছিলাম। সে বলছিলঃ 'এ ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু করার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না' এ ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র উপরোক্ত বাণী নাযিল হয়। [আল-আহাদিসুল মুখতারাহঃ ৩/৬০, ৮৬৪]

তোমাদের ঘরে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের মনে যা আছে তা পরিশোধন করেন। আর অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবগত।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের ফলে শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন[১]।

(১) সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ও বিশ্বাস এই যে, যদিও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম নিস্পাপ নন, তাদের দ্বারা বড় কোন পাপ সংঘটিত হয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু তা সত্বেও উম্মতের জন্য তাদের কোন দোষচর্চা কিংবা দোষ আরোপ করা জায়েয নয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের এত বড় পদস্খলন ও অপরাধ মার্জনা করে তাদের প্রতি দয়া ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তাদের ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ অর্থাৎ "তাদের উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট" [সূরা আত্-তাওবাহ্ঃ ১০০, সূরা আল-মুজাদালাহঃ ২২] -এ মহাসম্মানজনক মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তখন তাদেরকে কোন প্রকার অশালীন উক্তিতে স্মরণ করার কোন অধিকার অপর কারো পক্ষে কেমন করে থাকতে পারে? সে জন্যই এক সময় কোন এক সাহাবী যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কে ওহুদ যুদ্ধের এই ঘটনার আলোচনায় বলেছেন যে, এরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর বললেনঃ আল্লাহ্ নিজে যে বিষয়ের ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে সমালোচনা করার কোন অধিকার কারো নেই। [দেখুন, বুখারী: ৪০৬৬]
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ 'আহলে-সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেসব মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে, সে সম্পর্কে কারো প্রতি কোন আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা। কারণ, ইতিহাসে যেসব বর্ণনায় তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ

নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।

সতেরতম রুকূ'

১৫৬. হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কুফরী করে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন দেশে দেশে সফর করে[১] বা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا لِيَجْعَلَ

তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যা ও ভ্রান্ত; যা শত্রুরা রটিয়েছে। আর কোন কোন ব্যাপার রয়েছে যে গুলোতে কম-বেশী করা হয়েছে এবং যেগুলো প্রকৃতই শুদ্ধ সেগুলোও একান্তই সাহাবীগণের স্ব স্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। বস্তুতঃ ঘটনা বিশেষের মধ্যে যদি তারা সীমালঙ্ঘন করেও থাকেন, তবুও আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হলো ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ সৎকাজের মাধ্যমে অসৎ কর্মের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। বলাবাহুল্য সাহাবায়ে কেরামের সৎকর্মের সমান অন্য কারো কর্মই হতে পারে না। কাজেই তারা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমার যতটুকু যোগ্য, তেমন অন্য কেউ নয়। সে জন্যই তাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার অন্য কারো নেই। তাদের ব্যাপারে কটুক্তি বা অশালীন মন্তব্য করার অধিকারও অন্য কারো নেই।' [আল-আকিদাতুল ওয়াসেতিয়্যা]

(১) সুদ্দী বলেন, এখানে দেশে দেশে সফর করা বলে, ব্যবসা করা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন আবী হাতেম] অর্থাৎ মুনাফিকদের যখন কোন লোক মারা যেত, তখন তারা বলত: যদি আমাদের কথা শুনতো এবং যুদ্ধে বের না হতো তবে তারা মারা যেতো না। বস্তুত মুনাফিকরা যুদ্ধের আগেই তাদের ভাইদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিত। অন্য আয়াতে এসেছে, "যারা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদেরকে বলল যে, তারা তাদের কথামত চললে নিহত হত না" [সূরা আলে ইমরান: ১৬৮] আরও এসেছে, "যারা পিছনে রয়ে গেল তারা আল্লাহ্র রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতেই আনন্দ বোধ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।"[সূরা আত-তাওবাহ: ৮১] আরও এসেছে, " আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা বাধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, 'আমাদের দিকে চলে এসো।' তারা অল্পই যুদ্ধে যোগদান করে" [সূরা আল-আহযাব: ১৮] আরও এসেছে, "তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই। তোমাদের কোন মুসীবত হলে সে বলবে, 'তাদের সংগে না থাকায় আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।" [সূরা আন-নিসা:৭২]

اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾

তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তবে তারা মরতো না এবং নিহত হত না।' ফলে আল্লাহ্ এটাকেই তাদের মনে দুঃখ ও চিন্তা সৃষ্টির কারণে পরিণত করেন; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সেসবের সম্যক দ্রষ্টা।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হলে অথবা তোমাদের মৃত্যু হলে, যা তারা জমা করে, আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং দয়া অবশ্যই তার চেয়ে উত্তম।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. আর তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে আল্লাহ্‌রই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. আল্লাহ্‌র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন[১]; যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন[২], তারপর আপনি

---

(১) আবু উমামা আল বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেনঃ 'হে আবু উমামা! মুমিনদের মাঝে কারো কারো জন্য আমার অন্তর নরম হয়ে যায়'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২১৭]

(২) অর্থাৎ ইতোপূর্বে যেমন কাজে-কর্মে এবং কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তেমনিভাবে এখনও তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তাদের মনে প্রশান্তি আসতে পারে। এতে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, কল্যাণ কামনার যে অনুরাগ তাদের অন্তরে বিদ্যমান, তা তাদেরকে পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন, "যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়,

কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবেন[১]; নিশ্চয় আল্লাহ্ (তার

সে আমানতদার"। [ইবন মাজাহ: ৩৭৪৫] অর্থাৎ সে আমানতের সাথে পরামর্শ দিবে, ভুল পথে চালাবে না এবং আমানত হিসেবেই সেটা তার কাছে রাখবে।

এই আয়াতে সমাজ সংস্কারক ও দ্বীন-প্রচারকদের জন্য কয়েকটি বিষয়কে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্তায় রূঢ়তা পরিহার করা। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকদের দ্বারা কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে কিংবা কষ্টদায়ক কোন বিষয় সংঘটিত হলে সে জন্য প্রতিশোধমুলক ব্যবস্থা না নিয়ে বরং ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং সদয় ব্যবহার করা। তৃতীয়তঃ তাদের পদস্খলন ও ভুলভ্রান্তির কারণে তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত না থাকা। তাদের জন্য দো'আ-প্রার্থনা করতে থাকা এবং বাহ্যিক আচার আচরণে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার পরিহার না করা। উল্লেখিত আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথমে তো সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারপর আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের দু'জায়গায় সরাসরি নির্দেশ দান করেছেন। একটি হলো এই আয়াতে এবং দ্বিতীয়টি হলো সূরা আশ্-শূরার সে আয়াতে যাতে সত্যিকার মুসলিমদের গুণবৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গুণ এই বলা হয়েছে যে, "(যারা সত্যিকার মুসলিম) তাদের প্রতিটি কাজ হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে"। এতদুভয় আয়াতে যেভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শের অপরিহার্যতা প্রতীয়মান হয়, তেমনিভাবে এতে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিধান সংক্রান্ত কয়েকটি মূলনীতিও সামনে এসে যায়। তা হলো এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র হলো পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র যাতে পরামর্শের ভিত্তিতে নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে। এমনকি আলোচনা ও পরামর্শ করাকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি মৌলিক বিষয় হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

(১) উল্লেখিত আয়াতে লক্ষণীয় যে, এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়ার পর বলা হয়েছে "পরামর্শ করার পর আপনি যখন কোন একটি দিক সাব্যস্ত করে নিয়ে সেমতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন"। এতে নির্দেশ বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্প হওয়াকে শুধুমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিই সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ 'আযামতুম' বলা হয়নি, যাতে সংকল্প ও তা বাস্তবায়নে সাহাবায়ে কেরামের সংযুক্ততাও বুঝা যেতে পারত। এই ইঙ্গিতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরামর্শ করে নেয়ার পর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমীর যা করবেন তাই হবে গ্রহণযোগ্য। কোন কোন সময় উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে যদি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের অভিমত বেশী শক্তিশালী হত, তখন সেমতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন। অথচ পরামর্শ সভায় অধিকাংশ সময় এমনসব মনীষী উপস্থিত

উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন ।

১৬০. আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হবার কেউ থাকবে না । আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? সুতরাং মুমিনগণ আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করুক ।

إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

১৬১. আর কোন নবী 'গলুল'[১] (অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন) করবে, এটা অসম্ভব । এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কেয়ামতের দিন সে তা সাথে নিয়ে আসবে[২] । তারপর

وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

থাকতেন, যারা ইবন আব্বাসের তুলনায় বয়স, জ্ঞান ও সংখ্যার দিক দিয়ে ছিলেন গরিষ্ঠ । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামও অনেক সময় 'শায়খাইন' অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীদের মতের উপর প্রধান্য দান করেছেন । এমন কি এমন ধারণাও করা হতে লাগল যে, উল্লেখিত আয়াতটি এতদুভয়ের সাথে পরামর্শ করার জন্যই নাযিল হয়ে থাকবে । মোটকথা: সর্বাবস্থায় সংখ্যাগরিষ্টের মতই গ্রহণ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই । বরং এখানে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার কাছাকাছি যা হবে তা-ই হবে গ্রহণযোগ্য ।

(১) গলুলের এক অর্থ হয় খেয়ানত করা, জোর করে দখল করে নেয়া । সে হিসেবেই এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্‌র নিকট বড় গলুল তথা খেয়ানত হল এক বিঘত যমীন নেয়া । তোমরা দু'জন লোককে কোন যমীনের বা ঘরের প্রতিবেশী দেখতে পাবে । তারপর তাদের একজন তার সাথীর অংশের এক বিঘত যমীন কেটে নেয় । যদি কেউ এভাবে যমীন কেটে নেয় সে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সাত যমীন গলায় পেঁচিয়ে থাকবে । [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৪১]

(২) 'গলুল' এর অন্য অর্থ সরকারী সম্পত্তি থেকে কোন কিছু গোপন করা । গনীমতের মালও সরকারী সম্পদ । সুতরাং তা থেকে চুরি করা মহাপাপ । কোন নবীর পক্ষে এমন পাপের সম্ভাব্যতা নেই । আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল

প্রত্যেককে, যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না[১]।

হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গনীমতের মাল চুরি করার বিষয়টিও এসে গেছে। ঘটনাটি ছিল এই যে, বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালের মধ্যে থেকে একটি চাদর খোয়া যায়। কোন কোন লোক বলল, হয়ত সেটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে থাকবেন। [তিরমিযীঃ ৩০০৯, আবুদাউদঃ ৩৯৭১] এসব কথা যারা বলত তারা যদি মুনাফেক হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই। আর তা কোন অবুঝ মুসলমানের পক্ষে বলাও অসম্ভব নয়। তবে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, সে হয়ত মনে করে থাকবে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে غلول বা গনীমতের মালের ব্যাপারে অনধিকার চর্চার ভয়াবহতা এবং কেয়ামতের দিন সে জন্য কঠিন শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, কোন নবী সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তিনিই এহেন পাপ কাজ করে থাকবেন, একান্তই অনর্থক ধৃষ্টতা। কারণ, নবীগণ যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত।

(১) এখানে একটা বিষয় জানা আবশ্যক যে, গনীমতের মাল চুরি করা কিংবা তাতে খেয়ানত করা বা সরকারী সম্পদ থেকে কোন কিছু আত্মসাৎ করা, সাধারণ চুরি অথবা খেয়ানত অপেক্ষা বেশী পাপের কাজ। কারণ, এ সম্পদের সাথে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক এতে চুরি করবে, সে চুরি করবে শত-সহস্র লোকের সম্পদ। যদি কখনো কোন সময় তার মনে তা সংশোধন করার খেয়াল হয়, তখন সবাইকে তাদের অধিকার প্রত্যার্পন করা কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়া একান্তই দুরূহ ব্যাপার। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরি মালের মালিক সাধারণতঃ পরিচিত ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কখনও কোন সময় আল্লাহ্ যদি তওবাহ্ করার তাওফীক দান করেন, তবে তার হক আদায় করে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিয়ে মুক্ত হতে পারে। সে কারণেই কোন এক যুদ্ধে এক লোক যখন কিছু পশম নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, গনীমতের মাল বন্টন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন তার মনে হল, 'তখন সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হল। তিনি রহমাতুললিল আলামীন এবং উম্মতের জন্য পিতা-মাতা অপেক্ষা সদয় হওয়া সত্বেও তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এখন এগুলো কেমন করে আমি সমস্ত সেনাবাহিনীর মাঝে বন্টন করব? কাজেই কেয়ামতের দিনই তুমি এগুলো নিয়ে উপস্থিত হয়ো। [সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ৪৮৫৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/২১৩, ৬/৪২৮] তাছাড়া গনীমতের মাল বা সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করার ব্যাপারটি অন্যান্য চুরি অপেক্ষা কঠিন পাপ হওয়ার আরও একটি কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে যেখানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হবে, সবার

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

১৬২. আল্লাহ্ যেটাতে সন্তুষ্ট, যে তারই অনুসরণ করে, সে কি ওর মত যে আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই যার আবাস? আর সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

সামনে তাকে সেখানে এমনভাবে লাঞ্ছিত করা হবে যে, চুরি করা বস্তু-সামগ্রী তার কাঁধে চাপানো থাকবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "দেখ, কেয়ামতের দিন কারো কাঁধে একটি উট চাপানো অবস্থায় থাকবে এবং ঘোষণা করা হবে যে, এ লোক গনীমতের মালের উট চুরি করেছিল, এমন যেন না হয়। যদি সে লোক আমার শাফা'আত কামনা করে, তবে আমি তাকে পরিস্কার ভাষায় জবাব দিয়ে দেব যে, আমি আল্লাহ্‌র যা কিছু নির্দেশ পেয়েছিলাম, তা সবই পৌঁছে দিয়েছিলাম, এখন আমি কিছুই করতে পারব না"। [বুখারীঃ ৩০৭৩] মনে রাখা আবশ্যক যে, মসজিদ, মাদ্রাসা এবং ওয়াকফের মালের অবস্থাও একই রকম, যাতে হাজার-হাজার মুসলিমের চাঁদা বা দান অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমাও যদি করাতে হয়, তবে কার কাছ থেকে ক্ষমা করাবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত হাদীয়া বা উপঢৌকণ গলুলের শামিল'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪২৪] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইবনুল্লতুবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ দেন। সে ফিরে এসে বললঃ এগুলো তোমাদের আর এগুলো আমাকে হাদীয়া দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ 'কি হলো কর্মচারীর তাকে আমরা কোন কাজে পাঠাই পরে সে এসে বলে, এগুলো তোমাদের আর ওগুলো আমাকে হাদীয়া দেয়া হয়েছে। সে কেন তার পিতা-মাতার ঘরে বসে দেখে না তার জন্য হাদীয়া আসে কি না? যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার শপথ করে বলছি, যে কেউ এর থেকে কিছু নিবে কিয়ামতের দিন সেটাই সে তার কাঁধে নিয়ে আসবে'। [বুখারীঃ ৬৯৭৯, মুসলিমঃ ১৮৩২] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ 'হে মানুষ সকল! তোমাদের কাউকে কোন কাজে লাগালে যদি সে আমাদের থেকে কিছু লুকায় তবে সে তা কেয়ামতের দিন সাথে নিয়ে আসবে' [মুসলিমঃ ১৮৩৩] আবদুল্লাহ ইবন আমর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিনিসপত্রের দায়িত্বে এক লোক ছিল, তাকে 'কারকারাহ' বলা হতো, হঠাৎ করে সে মারা গেল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে তো জাহান্নামে গেছে। লোকেরা তার জিনিসপত্র তল্লাশী করে দেখতে পেল যে, সে একটি জামা চুরি করেছে।" [বুখারী: ৩০৭৪]

১৬৩. আল্লাহ্‌র কাছে তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে আল্লাহ্ সেসব ভালভাবে দেখেন।

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৪. আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল[১]।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾

১৬৫. কি ব্যাপার! যখন তোমাদের উপর মুসীবত আসলো (ওহুদের যুদ্ধে) তখন তোমরা বললে, 'এটা কোত্থেকে আসলো?' অথচ তোমরাতো দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে (বদরের যুদ্ধে)। বলুন,

اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾

(১) এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয় সূরা আল-বাক্বারার ১২৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ আয়াতে একটি শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো, ﴿لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ এ প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআনুল কারীমের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য সবচাইতে বড় নেয়ামত ও মহাঅনুগ্রহ। কিন্তু এখানে এই আয়াতে শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট করাটা কুরআনের অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে কুরআন সমগ্র বিশ্বের জন্য হেদায়াত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ﴾ বা 'মুত্তাকীনদের জন্য হেদায়াত" বলারই অনুরূপ যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে মুত্তাকীনদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই এক। তা হল এই যে, যদিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্তিত্ব মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের জন্যই মহা নেয়ামত এবং বিরাট অনুগ্রহ, তেমনিভাবে কুরআনুল কারীমও সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য হেদায়াত, কিন্তু যেহেতু এই হেদায়াত ও নেয়ামতের ফল শুধু মুমিন-মুত্তাকীরাই উপভোগ করছে, সেহেতু কোন কোন স্থানে একে তাদেরই সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

'এটা তোমাদের নিজেদেরই[১] কাছ থেকে'[২]; নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৬৬. আর যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আল্লাহ্রই হুকুমে[৩]; আর যাতে তিনি প্রকাশ করেন, কে তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুমিন।

وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭. আর মুনাফেকদের প্রকাশ করার জন্য। আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'এস, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর।' তারা বলেছিল, 'যদি যুদ্ধ জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম।' সেদিন

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ۗ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَّبَعْنٰكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾

(১) এক হাদীসে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বদরের ঘটনা বর্ণনার পর উহুদের যুদ্ধের বিপর্যয়ের কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এটার কারণ হলোঃ বদরের যুদ্ধের বন্দীদের থেকে ফিদিয়া নেয়া। [দেখুনঃ মুসনাদে আহমাদঃ ১/২০৭]

(২) সহীহ আকীদা বিশ্বাস হলো, কোন খারাপের সম্পর্ক আল্লাহ্র দিকে করা জায়েয নেই। আল্লাহ্ তা'আলার দিকে সব সময় ভাল ফলাফলের সম্পর্ক করতে হয়। খারাপ ফলের ব্যহ্যিক কারণ সৃষ্ট জীব। খারাপ তাদেরই অর্জন করা। আর এজন্যই সূরা আল-জ্বিনে আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিনদের কথা উল্লেখ করে বলছেন যে, তারা বলেছিল "আর আমরা জানিনা যমীনের অধিবাসীদের জন্য খারাপ কিছুর ইচ্ছা করা হয়েছে নাকি তাদের প্রভূ তাদের জন্য সঠিক পথ দেয়ার ইচ্ছা করেছেন"। [সূরা জ্বিনঃ ১০] অন্য হাদীসে এসেছে, 'আর খারাপ কিছু আপনার থেকে হয় না' [মুসলিমঃ ৭৭১]

(৩) এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব যা কিছু হয়েছে, সবই আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সমর্থনে হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা বা অনুমতি দু'প্রকার। এক. 'ইযনে শার'য়ী' বা শরী'আতগত অনুমোদন বা ইচ্ছা। এ অনুমোদনের সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সম্পর্ক রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক কাউকে সালাত আদায় করতে দেয়ার ইচ্ছা, কাউকে হক পথে চলতে দেয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি। এ ধরনের অনুমোদন বা ইচ্ছা সংঘটিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। দুই. 'ইযনে কাওনী' বা প্রকৃতিগত অনুমোদন বা ইচ্ছা। এ অনুমোদনের সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নেই। তবে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। যেমন এ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্র অনুমোদন বা ইচ্ছা। [তাফসীরে সা'দী]

তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা তা মুখে বলে এবং তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা অধিক অবগত।

১৬৮. যারা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদের প্রতি বলল যে, তারা তাদের কথামত চললে নিহত হত না। তাদেরকে বলুন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর।'

ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَعَدُوا۟ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۟ ۗ قُلْ فَٱدْرَءُوا۟ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৯. আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত[১]।

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

(১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ আমরা এ আয়াত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ 'শহীদদের আত্মাকে সবুজ পাখির পেটে রাখা হয়। আরশের সাথে লটকানো ঝাড়বাতির সাথে যেগুলো অবস্থিত। জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা তারা সেখানে বিচরণ করতে পারে। তাদের প্রভু তাদের দিকে একবার তাকিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা কি কিছু চাও? তারা বললঃ আমাদের আর কি চাহিদা থাকতে পারে? আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারি? এভাবে তিনবার তিনি তাদের তা জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর যখন শহীদগণ বুঝতে পারল যে, তাদেরকে চাইতেই হবে, তখন তারা বললঃ হে রব! আমরা চাই আমাদের আত্মাকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হোক যাতে আমরা আবার আপনার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। তারপর আল্লাহ্ যখন দেখলেন যে, তাদের এর দরকার নেই তখন তাদের এভাবেই ছেড়ে দিলেন। [মুসলিমঃ ১৮৮৭]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত হলে বললেনঃ 'জাবের, তোমার কি হল, তোমার মন খারাপ দেখছি? আমি বললামঃ ওহুদের যুদ্ধে আমার বাবা শহীদ হয়ে গেলেন। তার পরিবার এবং অনেক ঋণ রেখে গেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাকে কি আমি তোমার বাবার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সাক্ষাত করেছেন সে সুসংবাদ দেব? আমি বললামঃ অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা

১৭০. আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭১. তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য এবং এজন্য যে আল্লাহ্ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না[১]।

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

আঠারতম রুকূ‘

১৭২. যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে[২]। তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের

ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

সবার সাথে কথা বলেন পর্দার আড়াল থেকে। কিন্তু তোমার বাবাকে আল্লাহ্ জীবিত করে সরাসরি কথা বলেছেন এবং বলেছেন, "হে আমার বান্দা, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব।" তিনি বললেনঃ হে আমার রব, আমাকে জীবিত করে দিন যাতে আমি আবার আপনার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। মহান আল্লাহ্ বললেনঃ "আমার পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত এই যে, এরা দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে যাবে না।" জাবের বলেনঃ তখন এই আয়াত নাযিল হয়।' [তিরমিযীঃ ৩০১০, ইবনে মাজাহ্ঃ ১৯০, ২৮০০] ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, শহীদদের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। কাজেই বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা এসেছে।

(১) আয়াতটির অন্য অনুবাদ হচ্ছে, "তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না"। উভয় অনুবাদই শুদ্ধ। তবে তাবারী উপরোক্ত অনুবাদটি প্রাধান্য দিয়েছেন।

(২) উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেনঃ আমাকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন, তোমার পিতা ও আমার পিতা ঐ সমস্ত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা যখমী হওয়ার পরে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। [বুখারীঃ ৪০৭৭] অর্থাৎ যুবাইর ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে[১]।

১৭৩. এদেরকে লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জড়ো হয়েছে, কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক'[২]!

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖۗ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

(১) এ যুদ্ধের ঘটনাটি এই যে, মক্কার কাফেররা যখন ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে এল, তখন পথে এসে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটা কঠিন আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত মুসলিমকে খতম করে দেয়াই উচিৎ ছিল। আর এই কল্পনা তাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে, পুনরায় মদীনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তারা সোজা মক্কার পথ ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদীনাযাত্রী কোন পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল যে, তোমরা সেখানে গিয়ে কোন প্রকারে মুসলিমদের মনে আমাদের ভয় বিস্তার করবে যে, তারা এদিকে ফিরে আসছে। এ ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন। কাজেই তিনি 'হামরাউল-আসাদ' পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, কে আছে, যারা মুশরেকদের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন সত্তর জন সাহাবী প্রস্তুত হলেন যাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা গত কালকের যুদ্ধে কঠিন ভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করছিলেন। এরাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। [বুখারী: ৪০৭৭]

(২) যখন সাহাবায়ে কিরাম 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন, তখন সেখানে নু'আইম ইবনে মাস'উদের সাথে সাক্ষাত হল। সে সংবাদ দিল যে, আবু সুফিয়ান নিজের সাথে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মদীনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত-দুর্বল সাহাবায়ে কেরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা তা জানি না 'আল্লাহ্‌ আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী'। আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই আমাদের জন্য উত্তম যিম্মাদার'। এ কথাটি ইবরাহীম 'আলাইহিস্‌ সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি

১৭৪. তারপর তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল[১]।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۝

১৭৫. সে[২] তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; কাজেই যদি তোমরা মুমিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاۗءَهٗ ۠ فَلَا تَخَافُوْھُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৭৬. যারা কুফরীতে দ্রুতগামী, তাদের আচরণ যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। তারা কখনো আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّھُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـــًٔا ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَھُمْ حَظًّا فِي

বলেছিলেন। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাই বলেছিলেন, যখন লোকজন তাকে এসে খবর দিলো যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদেরকে ভয় করো। এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো মজবূত হলো, তারা বললঃ আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমাদের পক্ষ থেকে কাজের জন্য তিনিই উত্তম যিম্মাদার। [বুখারীঃ ৪৫৬৩]

(১) এ আয়াতে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জেহাদের জন্য রওয়ানা হওয়া এবং ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি‘মাল ওয়াকীল’ বলার উপকারিতা, ফলশ্রুতি ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে- “এরা আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল। তাতে তাদের কোন রকম অনিষ্ট হলো না আর তারা হল আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগত।” আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে তিনটি নেয়ামত প্রদান করলেন। প্রথম নেয়ামত হলো এই যে, কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, এতে তারা পালিয়ে গেল। ফলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিরাপদ রইলেন। এ নেয়ামতকে আল্লাহ্ তা‘আলা ‘নেয়ামত’ শব্দেই উল্লেখ করলেন। দ্বিতীয় নেয়ামত এই যে, হামরাউল আসাদের বাজারে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সুযোগ হয়েছিল এবং তাতে তারা যে লাভবান হয়েছিলেন এবং কাফেরদের ফেলে যাওয়া গণীমতের মাল থেকে তারা যে লাভবান হয়েছিলেন তাকেই বলা হয়েছে ‘ফযল’। তৃতীয় নেয়ামতটি হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ যা সমস্ত নেয়ামতের ঊর্ধ্বে এবং যা এই জেহাদে তাদেরকে বিশেষ ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে।

(২) এখানে ‘সে’ বলতে তাকে বোঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি মুমিনদের কাছে এসে বলেছিল যে, ‘তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষ জড়ো হয়েছে কাজেই তোমরা তাদের ভয় করো’। তারা ছিল বনী আব্দুল কায়েসের কিছু লোক। [তাবারী]

الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

করতে পারবে না। আল্লাহ্ আখেরাতে তাদেরকে কোন অংশ দেবার ইচ্ছা করেন না। আর তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে[১]।

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করেছে তারা কখনো আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۗ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. কাফেরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমরা অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য; আমরা অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়[২]।

(১) এক্ষেত্রে কেউ যেন এমন কোন সন্দেহ না করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদিগকে অবকাশ, দীর্ঘায়ূ, স্বাস্থ্য-সামর্থ্য ও আরাম-আয়েশের উপকরণ এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের অপরাধ প্রবণতায় অধিকতর এগিয়ে যায়, তাহলে তো কাফেররা নির্দোষ। কারণ, আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই যে, কাফেরদের সামান্য কয়েক দিনের এ অবকাশ ও ভোগ -বিলাসে যেন মুসলিমরা পেরেশান না হয়। কেননা, কুফর ও পাপ সত্ত্বেও তাদেরকে পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য ও বৈভব দান করাটাও তাদের শাস্তিরই একটি পন্থা, যার অনুভূতি আজকে নয় এই পৃথিবী থেকে যাবার পরই হবে যে, তাদেরকে দেয়া পার্থিব ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তারা পাপকর্মে ব্যয় করেছে প্রকৃতপক্ষে সেসবই ছিল জাহান্নামের অঙ্গার। এ বিষয়টিই কতিপয় আয়াতে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন। বলা হয়েছে, "কাফেরদের ধন-সম্পদ এবং ভোগ-বিলাস তাদের জন্য গৌরবের বস্তু নয়; এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাবেরই একটি কিস্তি যা আখেরাতে তাদের আযাব বৃদ্ধির কারণ হবে"। [সূরা আত-তাওবাহ: ৫৫]

(২) এ আয়াতে কাফেরদেরকে কেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাপের কারণে শাস্তি না দিয়ে অবকাশ দিয়ে থাকেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তাদের এ অবকাশ তাদের জন্য মঙ্গল বা সুখকর নয়। এটা তাদের গোনাহ আরও বর্ধিত করে তাদেরকে ভালভাবে পাকড়াও করার জন্য। অন্য আয়াতে অবশ্য বলা হয়েছে যে, তাদেরকে এ অবকাশ প্রদানের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা দুঃখ-কষ্ট দিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরানোর সুযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারপরও যারা অবাধ্যতা অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি শক্তহাতে পাকড়াও করেন। আল্লাহ্ বলেন, "আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে সেখানকার অধিবাসীদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করি,

আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ মুমিনগণকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। অনুরূপভাবে গায়েব সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা আল্লাহ্‌র নিয়ম নয়; তবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন[১]। কাজেই তোমরা

যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে। তারপর আমরা অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি। অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করেছে।' তারপর হঠাৎ তাদেরকে আমরা পাকড়াও করি, কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পারে না" [সূরা আল-আ'রাফ: ৯৪-৯৫] আরও বলেন, "আপনার আগেও আমরা বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি; তারপর তাদেরকে অর্থসংকট ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়। আমাদের শাস্তি তাদের উপর যখন আপতিত হল তখন তারা কেন বিনীত হল না? কিন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল। তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমরা তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লাসিত হল তখন হঠাৎ তাদেরকে ধরলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হল" [সূরা আল-আন'আম: ৪২-৪৪] অন্য আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, এ অবকাশ প্রদান তাঁর মজবুত কৌশলের অন্তর্গত। আল্লাহ্ বলেন: "আর যারা আমাদের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমরা তাদেরকে এমনভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে, তারা জানতেও পারবে না। আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি; আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮২-১৮৩] আরও বলেন, "অতএব ছেড়ে দিন আমাকে এবং যারা এ বাণীতে মিথ্যারোপ করে তাদেরকে, আমরা তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরব এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না। আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।" [সূরা আল-কালাম: ৪৪-৪৫]

(১) অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করেন না। কিন্তু নবী-রাসূলদের যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে কিছু কিছু গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান দান করেন। যাতে তারা এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রচার করতে সমর্থ হন। যেমন, মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তার রাসূলকে কিছু কিছু

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আন। তোমরা ঈমান আনলে ও তাক্ওয়া অবলম্বন করে চললে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে।

১৮০. আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এমনটি যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল। যেটাতে তারা কৃপণতা করবে কেয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলায় বেড়ী হবে[১]। আসমান ও যমীনের সত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾

ঊনিষতম রুকূ‘

১৮১. আল্লাহ্ শুনেছেন তাদের কথা যারা বলে, ‘আল্লাহ্ অবশ্যই অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত’[২]। তারা

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ

গায়েবী জ্ঞান দান করেছিলেন এবং তাদের ব্যাপারে সাবধান করেছিলেন। [আল-মুইয়াসসার] সুতরাং তোমাদের কাজ হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা। গায়েবী সংবাদ জানার জন্য বসে থাকা তোমাদের কাজ নয়। যদি প্রকৃত ঈমান ও তাকওয়া তোমাদের অর্জিত হয়, তবে এতেই তোমাদের সাফল্য রয়েছে।

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি, তার সে ধন-সম্পদকে কেয়ামতের দিন একটি সাপের রূপ দেয়া হবে। যার মাথায় চুল থাকবে এবং চোখের উপর দু’টি কালো দাগ থাকবে। সাপটিকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে, সেটি তার মুখে দংশন করতে থাকবে এবং বলবেঃ আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত অর্থসম্পদ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। [বুখারীঃ ৪৫৬৫]

(২) এ আয়াতে ইয়াহূদীদের একটি কঠিন ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে সতর্কীকরণ ও শাস্তির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা এরূপ যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন

الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾

যা বলেছে তা এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমরা লিখে রাখব এবং বলব, 'তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর(১)।'

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾

১৮২. এ হচ্ছে তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি মোটেই যালেম নন।

কুরআনে হাকীম থেকে যাকাত ও সদকার বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন উদ্ধত ইয়াহূদীরা বলতে আরম্ভ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফকীর ও গরীব হয়ে গেছেন, আর আমরা হচ্ছি ধনী ও আমীর। সে জন্যেই তো তিনি আমাদের কাছে চাইছেন। [তাবরী] মূলতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক বলে জানে, তার মনে সাদকা ও কর্জ শব্দ ব্যবহারে কস্মিনকালেও এমন কোন সন্দেহ উদয় হতে পারে না, যেমনটি উদ্ধত ইয়াহূদীদের উক্তিতে বিদ্যমান। কাজেই কুরআনুল কারীম এই সন্দেহের উত্তর দান করেছে। শুধুমাত্র তাদের ঔদ্ধত্য ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ এবং তার প্রতি উপহাস করার একাধিক অপরাধের শাস্তি হিসাবে বলা হয়েছে, আমি তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিসমূহ লিখে রাখব যাতে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করে আযাবের ব্যবস্থা করা যায়। অন্যথায় আল্লাহ্র জন্য লেখার কোনই প্রয়োজন নেই। অতঃপর ইয়াহূদীদের এ সমস্ত ঔদ্ধত্যের আলোচনার সাথে সাথে তাদের আরও একটি অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা হলো এমন লোক, যারা নবী-রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিংবা তাদের উপহাস করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এরা তাদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। কাজেই এমন লোকদের দ্বারা কোন নবীর প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাস করা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআনের লক্ষ্য হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মদীনাবাসী ইয়াহূদীবর্গ। আর নবীদের হত্যার ঘটনাটি হল ইয়াহইয়া ও যাকারিয়্যা আলাইহিমাস্ সালামের সময়ের। সুতরাং এ আয়াতে নবী হত্যার অপরাধ এ সময়ের ইয়াহূদীদের উপর আরোপ করা হল কেমন করে? তার কারণ এই যে, মদীনার ইয়াহূদীরাও তাদের পূর্ববর্তী ইয়াহূদীদের সে কাজের ব্যাপারে সম্মত এবং আনন্দিত ছিল বলে তারাও সেই হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। মূলতঃ এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কুফরের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনও কুফরী ও মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের শেষাংশে এবং পরবর্তী আয়াতে সে উদ্ধতদের শাস্তিস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করে বলা হবে, 'এবার আগুনে জ্বলার স্বাদ আস্বাদন কর, যা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল; আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এটা কোন অন্যায় আচরণ নয়'।

১৮৩. যারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি ঈমান না আনি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের কাছে এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে যা আগুন খেয়ে ফেলবে। তাদেরকে বলুন, 'আমার আগে অনেক রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যা বলছ তা সহ তোমাদের কাছে এসেছিলেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে?'

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

১৮৪. তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, আপনার আগে যে সব রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন, আসমানী সহীফা এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিলেন তাদের প্রতিও তো মিথ্যারোপ করা হয়েছিল।

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾

১৮৫. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেবলমাত্র কেয়ামতের দিনই তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। অতঃপর যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলকাম[১]। আর পার্থিব

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

(১) পৃথিবীর এমন কোন মানুষ নেই যে সফলতা চায় না। এ সফলতা একেকজন একেক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ধারণ করে। কেউ দুনিয়ার প্রচুর সম্পদ, নারী, গাড়ী-বাড়ী, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নির্ধারণ করে। কেউ আবার সুস্বাস্থ্যকে নির্ধারণ করে। কেউ আবার অন্যকিছু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের সফলতা কিসে তা আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে বলে দিয়েছেন। তিনি বলছেন যে, যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে সেই সফলকাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে এক বেত পরিমান জায়গা দুনিয়া ও তাতে যা আছে তার থেকে উত্তম"। তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [তিরমিযী: ৩০১৩]

জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়[১]।

লَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۭ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝١٨٦

১৮৬. তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবনে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ[২]।

(১) এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আখেরাতে নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে, যা কঠিনও হবে আবার দীর্ঘও হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে সে চিন্তা করাই উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে লোকই সত্যিকার কৃতকার্য, যে জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। তা প্রাথমিক পর্যায় হোক- যেমন, সৎকর্মশীল আবেদগণের সাথে যেরূপ আচরণ করা হবে- অথবা কিছু শাস্তি ভোগের পরেই হোক- যেমন, পাপী মুসলিমদের অবস্থা। কিন্তু সমস্ত মুসলিমই শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লাভ করে অনন্ত কালের জন্য জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কাজেই তারা যদি সামান্য কয়েকদিনের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে গর্বিত হয়ে ওঠে, তবে সেটা একান্তই ধোঁকা। সেজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে "দুনিয়ার জীবন তো হলো ধোঁকার উপকরণ।" তার কারণ এই যে, সাধারণতঃ এখানকার ভোগ-বিলাসই হবে আখেরাতের কঠিন যন্ত্রণার কারণ। পক্ষান্তরে এখানকার দুঃখ-কষ্ট হবে আখেরাতের সঞ্চয়।

(২) এ আয়াতে মুসলিমদেরকে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের জন্য জান-মালের কুরবানী দিতে হবে এবং কাফের, মুশরিক ও আহলে কিতাবদের কটুক্তি এবং কষ্ট দানের কারণে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্তই হলো তাদের জন্য পরীক্ষা। এতে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাকওয়ার পরাকাষ্ঠা সাধনে নিয়োজিত থাকাই হল তাদের কর্তব্য। উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাধায় চড়ে আমাকে পেছনে বসিয়ে সা'দ ইবনে উবাদাকে দেখতে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের বৈঠকখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনো সে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়নি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

১৮৭. স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন: 'অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না ।' এরপরও তারা তা তাদের পেছনে ফেলে রাখে (অগ্রাহ্য করে) ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে; কাজেই তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট!

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৮. যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিজেরা যা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে[১], তারা শাস্তি থেকে মুক্তি

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন । এমতাবস্থায় সে তার নাকে কাপড় দিয়ে বলল, আমাদেরকে আমাদের বৈঠকখানায় কষ্ট দিও না । যে তোমার কাছে যায় তাকে তোমার কথা শোনাও । এতে মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহূদীদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে যায় । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কষ্টে তাদের ঝগড়া থামিয়ে সা'দ ইবনে উবাদার কাছে গিয়ে ঘটনাটা জানালেন । সা'দ ইবনে উবাদা বললেন, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন । আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ আপনাকে সত্যদ্বীনসহ পাঠিয়েছেন । কিন্তু এ লোকগুলো আপনার আসার পূর্বেই ঐ লোকটাকে নেতা বানাতে চেয়েছিল । আপনার আগমনের পর সে কিছু না পাওয়াতে তার মানসিক অবস্থা খারাপ হওয়াতে সে এসব কথা বলছে । রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীরা কাফেরদেরকে এমনিতেও ক্ষমা করে দিতেন । এভাবে তাদের কষ্ট সহ্য করে তিনি বদর যুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে । [বুখারীঃ ৪৫৬৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, কা'ব ইবনে আশরাফ ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদনামী করে বেড়াত এবং কবিতার মাধ্যমে কাফেরদেরকে রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী করে তুলত । রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসলেন সেখানে বিভিন্ন ধরনের লোক পেলেন । তাদের সাথে তিনি একটি সন্ধিতে আসার চেষ্টা করলেন । কিন্তু মুশরিক ও ইয়াহূদীরা তাঁকে এবং সাহাবাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল । তখন এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধৈর্য ধারনের নির্দেশ দিলেন । [আবু দাউদঃ ৩০০০]

(১) আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

পাবে- এরূপ আপনি কখনো মনে করবেন না। আর তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

১৮৯. আর আসমান ও যমীনের সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌রই; আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾

বিশতম রুকূ‘

১৯০. আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে(১), রাত ও দিনের পরিবর্তনে(২) নিদর্শনাবলী

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

ওয়াসাল্লামের যুগে কিছু মুনাফেক তাঁর সাথে যুদ্ধে যাওয়া থেকে পিছপা হত। এতে তারা নিজেদের মধ্যে আনন্দবোধ করত। তারপর যখন রাসূল ফিরে আসতেন, তখন তাঁর কাছে ওযর পেশ করত এবং অন্যান্যভাবে নিজেদের প্রশংসা শুনতে চাইত। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [বুখারীঃ ৪৫৬৭; মুসলিমঃ ২৭৭৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, মারওয়ান ইবনে হাকাম তার দারওয়ানকে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কাছে পাঠিয়ে বললেনঃ যদি কোন লোক কোন কাজ না করেও প্রশংসা পেতে ভালবাসার কারণে শাস্তিযোগ্য হয়, তাহলে আমরা সবাইতো শাস্তি পাব। তখন ইবনে আব্বাস বললেনঃ তোমার আর এ আয়াতের মধ্যে কি সম্পর্ক? এ আয়াতের ঘটনা হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদী আলেমদেরকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার কারণে তারা সঠিক জবাব গোপন করে ভিন্ন জবাব দিয়ে রাসূলের প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা করল। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৫৬৮; মুসলিমঃ ২৭৭৮]

(১) অর্থাৎ আসমান এবং যমীন সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তা‘আলার এক বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান। এ দুয়ের মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ্ তা‘আলার অসংখ্য সৃষ্টিরাজিকেও এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এ বিরাট সৃষ্টজগতের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই স্ব স্ব সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

(২) চিন্তা-ভাবনার দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, দিন-রাত্রির আবর্তন। আয়াতে উল্লেখিত اختلاف শব্দটি আরবী পরিভাষায়, ‘পরে আসা’ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেমতে বাক্যের অর্থ হবে, রাত্রির গমন এবং দিবসের আগমন। আবার اختلاف শব্দ দ্বারা কম-বেশীও বুঝায়। যেমন, শীতকালে রাত্রি হয় দীর্ঘ এবং দিন হয় খাটো, গরমকালে দিন বড় এবং রাত্রি হয় ছোট। অনুরূপভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিবস এবং রাত্রির দৈর্ঘ্যেও তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন, উত্তর মেরুর সন্নিকটবর্তী দেশগুলোতে দিবাভাগ উত্তর মেরু থেকে দুরবর্তী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘ হয়। এসব বিষয়ই আল্লাহ্ তা‘আলার অপার কুদরাতের অতি উজ্জ্বল নিদর্শন।

রয়েছে[১] বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য ।

১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে, আর বলে, 'হে আমাদের রব! আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি[২],

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝١٩١

(১) آية এর বহুবচন হল آيات । শব্দটি কয়েকটি অর্থেই ব্যবহৃত হয় । যথা- মু'জিযাকে 'আয়াত' বলা হয় । অনুরূপভাবে, কুরআনের বাক্যকেও 'আয়াত' বলা হয় । তৃতীয় অর্থে দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীকে বুঝানো হয়ে থাকে । এখানে তৃতীয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । অর্থাৎ এসব বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে ।

(২) সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও সৃষ্টজগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তাঁর মাহাত্ম্য ও কুদরাত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ও উচ্চ পর্যায়ের ইবাদাত । সেগুলোর মধ্যে গভীর মনোনিবেশ করে তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ না করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা । উল্লেখিত আয়াতের শেষ বাক্যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহে চিন্তা গবেষণা করার ফলাফল বাতলে দেয়া হয়েছে । বলা হয়েছে ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন সৃষ্টির উপর যে লোক চিন্তা-ভাবনা করে সে লোক সহজেই বুঝে যে, এসব বস্তু-সামগ্রীকে আল্লাহ্ নিরর্থক সৃষ্টি করেননি; বরং এসবের সৃষ্টির পেছনে হাজারো তাৎপর্য নিহিত রয়েছে । সে সমস্তকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়ে মানুষকে এ চিন্তা-ভাবনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবী তাদের কল্যাণের জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতের উদ্দেশ্যে । এটাই হল তাদের জীবনের লক্ষ্য । সুতরাং গোটা বিশ্ব-সৃষ্টি নিরর্থক নয় বরং এগুলো সবই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের অসীম কুদরাত ও হেকমতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ । উবাইদ ইবনে উমাইর বলেনঃ আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বললাম, রাসূলের সবচেয়ে আশ্চর্য কি কাজ আপনি দেখেছেন, তা আমাদেরকে জানান । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'হে আয়েশা, আমাকে আমার রবের ইবাদাত করতে দাও ।' আমি বললাম, 'হে রাসূল, আমি আপনার পাশে থাকতে ভালবাসি এবং যা আপনাকে খুশি করে তা করতে ভালবাসি ।' তারপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করলেন এবং সালাত আদায়ে নিবিষ্ট হলেন ও কাঁদতে থাকলেন । আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কাঁদছেন অথচ আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? এ রাতে

আপনি অত্যন্ত পবিত্র, অতএব আপনি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন ।'

১৯২. 'হে আমাদের রব! আপনি কাউকেও আগুনে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয়ই হেয় করলেন এবং যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই ।'

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾

১৯৩. 'হে আমাদের রব, আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের রবের উপর ঈমান আন ।' কাজেই আমরা ঈমান এনেছি । হে আমাদের রব! আপনি আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করুন, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিন[১] ।

رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

১৯৪. 'হে আমাদের রব! আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদেরকে দান করুন

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

আমার উপর একটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যে ব্যক্তি তা তেলাওয়াত করল এবং চিন্তা-গবেষণা করল না, তার ধ্বংস অনিবার্য । তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন । [সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ৬২০]

(১) কাতাদা বলেন, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে আহ্বান শুনতে পেয়েছে তাতে তারা সুন্দরভাবে সাড়া দিয়েছে এবং এর উপর ধৈর্য ধারণ করেছে । আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ঈমানদার মানুষরা যখন আল্লাহ্‌র আহ্বান শুনে তাতে সাড়া দিয়েছে তখন তাদের কথা কি ছিল তা বর্ণনা করেছেন । পক্ষান্তরে ঈমানদার জিনরা আল্লাহ্‌র আহ্বান শুনে সে আহ্বানে যে কথা দিয়ে সাড়া দিয়েছে তা সূরা আল-জিন এ বর্ণনা করেছেন । সেখানে এসেছে, "আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি যে সঠিক পথের দিশা দেয়, ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি । আর আমরা আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না ।" [সূরা জিন: ১-২] সাড়ার ব্যাপারে তাদের কোন পার্থক্য না থাকলেও কথার মধ্যে পার্থক্য ছিল । [তাবারী]

এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করবেন না। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।'

১৯৫. তারপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে আমলকারী কোন নর বা নারীর আমল বিফল করি না(১); তোমরা একে অপরের অংশ। কাজেই যারা হিজরত করেছে, নিজ ঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের পাপ কাজগুলো অবশ্যই দূর করব(২) এবং অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কার; আর উত্তম পুরস্কার আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

১৯৬. যারা কুফরী করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই আপনাকে বিভ্রান্ত না করে।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

---

(১) উম্মে সালামাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদের হিজরত সম্পর্কে কোন কিছু বলেন না কেন? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩০০]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হকের বেলায় যে সমস্ত ত্রুটি গাফলতী ও পাপ হয়ে থাকবে তা হিজরত ও শাহাদাতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ঋণ বা ধারকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। বান্দার হক থেকে ক্ষমা পাওয়ার নিয়ম হল স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তার উত্তরাধিকারীকে প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাযী করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা।

১৯৭. এ তো স্বল্পকালীন ভোগ মাত্র; তারপর জাহান্নাম তাদের আবাস; আর ওটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

১৯৮. কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আতিথেয়তা; আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য উত্তম।

لٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

১৯৯. আর নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তাঁর প্রতি এবং তিনি যা তোমাদের ও তাদের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে ঈমান আনে। তারা আল্লাহ্‌র আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না। তারাই, যাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী[১]।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خٰشِعِينَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

২০০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর[২], ধৈর্যে প্রতিযোগিতা

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

(১) আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নাজ্জাসীর মৃত্যুর খবর ঘোষিত হল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তার উপর সালাত আদায় কর। তারা বললঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা কি এ লোকটির উপর সালাত আদায় করব? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। [আল-আহাদীসুল মুখতারাহ্ঃ ২০৩৮]

(২) এ আয়াতটিতে মুসলিমগণকে চারটি বিষয়ে নসীহত করা হয়েছে- (১) সবর, (২) মুসাবারাহ্ (৩) মুরাবাতা ও (৪) তাকওয়া, -যা এ তিনের সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত। তন্মধ্যে 'সবর' এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাধা দেয়া। আর কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় এর অর্থ নফ্‌সকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে- (এক) 'সবর আলাত্ত্বা'আত'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা

কর[১] এবং সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক[২], আর আল্লাহ্‌র

ও তাঁর রাসূল যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা। (দুই) 'সবর 'আনিল মা'আসী' অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, যত স্বাদেরই হোক না কেন, তা থেকে মনকে বিরত রাখা। (তিন) 'সবর 'আলাল-মাসায়েব' অর্থাৎ বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মস্তিস্ককে সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা। [ইবনুল কাইয়্যেম, আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দাওয়ায়িশ শাফী; মাদারিজুস সালেকীন]

(১) 'মুসাবারাহ' শব্দটি সবর থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ, শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। অথবা পরস্পর ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করা।

(২) 'মুরাবাতাহ' অর্থ হলো, ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়-

১) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাযতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, যাতে ইসলামী সীমান্তের প্রতি শত্রুরা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়। এটিই 'রিবাত' ও 'মুরাবাতাহ' এর বিখ্যাত অর্থ। এর দু'টি রূপ হতে পারেঃ প্রথমতঃ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত, এমতাবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রিম হেফাযত হিসাবে তার দেখা-শোনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সেখানে (সীমান্তে) বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষাবাদ করে রুযী-রোজগার করাও জায়েয। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুযী-রোজগার করা যদি তারই আনুষঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন ব্যক্তিরও 'রিবাত ফী সাবীলিল্লাহ্'র সওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনও যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের হেফাযত না হয়, বরং রুযী-রোজগারই হয় মুখ্য, তবে দৃশ্যতঃ সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন ব্যক্তি 'মুরাবিত ফী-সাবিলিল্লাহ্' হবে না। অর্থাৎ সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না। দ্বিতীয়তঃ সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশংকা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদিগকে সেখানে রাখা জায়েয নয়। তখন সেখানে তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। এতদুভয় অবস্থায় 'রিবাত' বা সীমান্তরক্ষার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। এক হাদীসে সাহ্‌ল ইবনে সা'দ আস্-সায়েদী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'আল্লাহ্‌র পথে এক দিনের 'রিবাত' (সীমান্ত প্রহরা) সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সে সমুদয় থেকেও উত্তম। [বুখারীঃ ২৭৯৪, মুসলিমঃ ১৮৮১] অপর এক হাদীসে রয়েছে যে,

তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘একদিন ও একরাতের ‘রেবাত’ (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত এক মাসের সিয়াম এবং সমগ্র রাত ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়া অপেক্ষা উত্তম । যদি এমতাবস্থায় কারো মৃত্যু হয়, তাহলে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে । আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার রিয্ক জারী থাকবে এবং সে কবরের ফেতনা বা পরীক্ষা (প্রশ্নোত্তর) থেকে নিরাপত্তা পাবে । [মুসলিমঃ ১৯১৩]

ফুদালাহ্ ইবনে উবায়েদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় শুধুমাত্র মুরাবিত (ইসলামী সীমান্তরক্ষী) ছাড়া । অর্থাৎ তার কাজ কেয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরের হিসাব-নিকাশ থেকে নিরাপদ থাকবে । [আবু দাউদঃ ২৫০০]

এসব বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ‘রিবাত’ বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষাও উত্তম । কারণ, সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সদকাকৃত বাড়ী-ঘর, জমি-জমা, রচিত গ্রন্থরাজি কিংবা ওয়াক্ফকৃত জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে । যখন উপকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সওয়াবও বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে সীমান্ত প্রহরার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না । কারণ, সমস্ত মুসলিম সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে । ফলে একজন সীমান্তরক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলিমদের সৎকাজের কারণ হয় । সে কারণেই কেয়ামত পর্যন্ত তার ‘রিবাত’ কর্মের সওয়াব অব্যাহত থাকবে । তাছাড়াও সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করত, সেগুলোর সওয়াবও আমল করা ছাড়াই সর্বদা জারী থাকবে ।

২) কুরআন ও হাদীসে ‘রিবাত’ দ্বিতীয় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে, জামা‘আতের সাথে সালাত আদায়ে খুবই যত্নবান হওয়া এবং এক সালাতের পরই দ্বিতীয় সালাতের জন্য অপেক্ষামান থাকা । এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের সংবাদ দিব না, যা করলে তোমাদের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং তোমাদের মর্যাদা বুলন্দ হবে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, অবশ্যই । তিনি বললেন, তা হচ্ছে, কষ্টকর স্থান বা সময়ে অযুর পানি সঠিকভাবে পৌঁছানো, মসজিদের প্রতি বেশী বেশী পদক্ষেপ এবং এক সালাতের পরে অপর সালাতের অপেক্ষায় থাকা । আর এটিই হচ্ছে, রিবাত ।” [মুসলিম: ২৫১]

বাস্তবে উভয় অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নেই ।প্রথম অর্থটি মানব শয়তানদের বিরুদ্ধে জিহাদের অংশ । আর দ্বিতীয় অর্থটি জিন শয়তানদের বিরুদ্ধে এক অমোঘ অস্ত্র । সুতরাং আয়াতে উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে ।

৪- সূরা আন-নিসা



সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ১৭৬ ।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরাটি সর্বসম্মত মতে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে ।

সূরাটির ফযিলতঃ সূরার ফযিলত সম্পর্কে এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ প্রথম সাতটি সূরা গ্রহণ করবে সে আলেম হিসেবে গণ্য হবে" । [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৮৫, ৬/৯৬] তাছাড়া আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যে সূরা আলে ইমরান পড়বে সে অমুখাপেক্ষী হবে, আর সূরা আন-নিসা হচ্ছে সৌন্দর্যপূর্ণ ।" [সুনান দারেমীঃ ৩৩৯৫]

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর(১) যিনি

يَآيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ

(১) সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে । যেমন- অনাথ ইয়াতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে । উল্লেখ্য যে, হক্কুল-'ইবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণতঃ দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে । সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরী প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার যা মূলতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে । এসব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ হয় অথবা সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে । কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পারিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর । এসব অধিকার তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না । কোন চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দুষ্কর । সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ্-ভীতি এবং আখেরাতের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই । আর একেই বলা হয়েছে 'তাকওয়া' । বস্তুতঃ এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড় । তাই আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে । সম্ভবতঃ এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের খোত্বায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন । বিয়ের খোতবায় এ আয়াতটি পাঠ করা সুন্নাত । তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহ্‌র অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে 'রব' শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । অর্থাৎ এমন এক সত্তার

مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ①

তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন[১] এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ দাবী কর[২] এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও[৩]। নিশ্চয় আল্লাহ্

বিরুদ্ধাচারণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের লালন-পালনের যিম্মাদার এবং যাঁর রুবুবিয়্যাত বা পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

(১) এখানে দু'টি মত রয়েছে, (এক) তার থেকে অর্থাৎ তারই সমপর্যায়ের করে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। (দুই) তার শরীর থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। এ মতের সপক্ষে হাদীসের কিছু উক্তি পাওয়া যায়, যাতে বুঝা যায় যে, মহিলাদেরকে বাঁকা হাঁড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [দেখুন- বুখারীঃ ৩৩৩১, মুসলিমঃ ১৪৬৮]

(২) বলা হয়েছে যে, যাঁর নাম উচ্চারণ করে তোমরা অন্যের থেকে অধিকার দাবী কর এবং যাঁর নামে শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাক সে মহান সত্ত্বার তাকওয়া অবলম্বন কর। আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্কে - তা পিতার দিক থেকেই হোক, অথবা মায়ের দিক থেকেই হোক - তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাক এবং তা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর।

(৩) আলোচ্য আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। সুতরাং তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখ। এ অর্থটি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। [তাবারী] আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা যে আল্লাহ্ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে পরস্পর কোন কিছু চেয়ে থাক। অর্থাৎ তোমরা সাধারণত বলে থাক যে, আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে কোন কিছু তোমার কাছে চাই। সুতরাং দু' কারণেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। এ অর্থটি মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] পবিত্র কুরআনের আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝানোর জন্য 'আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলতঃ একটি বহুবচনবোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে 'রাহেম'। যার অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয়। অর্থাৎ জন্মের প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলতঃ মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামী পরিভাষায় 'সেলায়ে-রাহ্‌মী' বলা

তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক[১]।

২. আর ইয়াতীমদেরকে তোমরা তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করো[২] এবং

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ

হয়। আর এতে কোন রকম বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় 'কেত্ব'য়ে-রাহ্‌মী'। হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। [বুখারীঃ ২০৬৭; মুসলিমঃ ২৫৫৭] অন্য হাদীসে 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের প্রায় সাথে সাথেই আমিও তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তাঁর যে কথাটি প্রবেশ করল, তা'হল এইঃ হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশী বেশী সালাম দাও। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল এবং রাতের বেলায় সালাতে মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। স্মরণ রেখো, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'। [মুসনাদে আহমাদ: ৫৪৫১; ইবন মাজাহ্: ৩২৫১] অন্য হাদীসে এসেছে, 'উম্মুল-মুমিনীন মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর এক বাঁদিকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন এ খবর পৌঁছালেন, তখন তিনি বললেন, তুমি যদি বাঁদিটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে অধিক পূণ্য লাভ করতে পারতে'। [বুখারীঃ ২৫৯৪] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেনঃ 'কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদকার সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু কোন নিকট আত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সঙ্গে সদ্‌কা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পূণ্য লাভ করা যায়'। [বুখারীঃ ১৪৬৬, মুসলিমঃ ১০০০]

(১) এখানে মানুষের অন্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ বলেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী।' আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের ইচ্ছার কথাও ভালভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোক লজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সুব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে এর কোন মূল্য নেই।

(২) আয়াতে বলা হয়েছে, ইয়াতীমের সম্পদ তাদেরকে যথার্থভাবে বুঝিয়ে দাও। আরবী 'ইয়াতীম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে- নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটিমাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 'দুররাতুন-ইয়াতীমাতুন' বা 'নিঃসঙ্গ মুক্তা' বলা হয়ে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয়। ছেলে-মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝٢

ভালোর সাথে মন্দ বদল করো না[১]। আর তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না; নিশ্চয় এটা মহাপাপ[২]।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَٰمَىٰ

৩. আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি[৩] সুবিচার

'বালেগ হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে না।' [আবু দাউদঃ ২৮৭৩] ইয়াতীম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসেবে কিছু সম্পদপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ইয়াতীমের অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সেসব মালেরও হেফাজত করা। ইয়াতীমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত অভিভাবককে মনোনীত করুক না কেন; তার উপরই ইয়াতীমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। উক্ত অভিভাবকের উচিত, ইয়াতীমের যাবতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধন-সম্পদ থেকে নির্বাহ করা। এ আয়াতে ইয়াতিমের সম্পদ তার হাতে বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন শর্তারোপ করা হয়নি। পক্ষান্তরে পরবর্তী ৬ নং আয়াতে এ সম্পদ তাদের কাছে প্রত্যার্পণ করার জন্য দু'টি শর্ত দিয়েছে। এক. ইয়াতীম বালেগ হতে হবে, দুই. ভাল-মন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। কারণ, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মত না হওয়াই স্বাভাবিক। দুটো বিষয় তাদের মধ্যে পাওয়া গেলে তাদের সম্পদ তাদের কাছে ফেরৎ দেয়া উচিত। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ তোমরা হালালকে হারামের সাথে মিশিয়ে ফেলো না। [তাবারী]

(২) এ আয়াতে ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করাকে বড় গুনাহ্ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু গোনাহের পরিণাম সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। এ সূরারই ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেটা ঘোষণা করে বলেছেন, "যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।" [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) এ আয়াতে ইয়াতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানুনের মত তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ্-ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তাহলে ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েদেরকেই বিয়ে করে নেবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

করতে পারবে না[১], তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন বা চার[২]; আর যদি

(১) জাহেলিয়াত যুগে ইয়াতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হত। যদি কোন অভিভাবকের অধিনে কোন ইয়াতীম মেয়ে থাকত আর তারা যদি সুন্দরী হত এবং তাদের কিছু সম্পদ-সম্পত্তিও থাকত, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মাহ্‌র দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিত অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চক্রান্ত করত। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করত না। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঠিক এ ধরণের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। 'জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত ইয়াতীম বালিকাটিরও অংশ ছিল। সে ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিল এবং নিজের পক্ষ থেকে 'দেন-মাহ্‌র' আদায় তো করলই না, বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়'। [বুখারীঃ ৪৫৭৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তখনকার দিনে কারও কাছে কোন ইয়াতীম থাকলে এবং তার সম্পদ ও সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করলে সে তাকে বিয়ে করতে চাইত। তবে তাকে অন্যদের সমান মাহ্‌র দিতে চাইত না। তাই তাদের মাহ্‌র পূর্ণ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের না দিয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি করার ইচ্ছা থাকলে তাদের বাদ দিয়ে অন্যান্য মহিলাদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [বুখারীঃ ৪৫৭৪] তবে এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য নারীদের বেলায় ইনসাফ বিধান করা লাগবে না। বরং অন্যান্য নারীদের বেলায়ও তা করতে হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) বহু-বিবাহ প্রথাটি ইসলামপূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মমতেই বৈধ বলে বিবেচিত হত। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত। বর্তমান যুগে ইউরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু-বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোন সুফল হয়নি। বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বহু-বিবাহ পুনঃপ্রচলন করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন। ইসলাম একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে যুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ অবশ্য দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই চার পর্যন্ত কথাটি

فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى

আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না[১] তবে একজনকেই বা তোমাদের

আরোপ করে তার উর্ধ্ব সংখ্যক কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না বরং তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ- তাও ব্যক্ত করে দিয়েছে। ইসলাম পূর্ব যুগে কারও কারও দশটি পর্যন্ত স্ত্রী থাকত। ইসলাম এটাকে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। কায়েস ইবন হারেস বলেন, 'আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার স্ত্রী সংখ্যা ছিল আট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলে তিনি আমাকে বললেন, 'এর মধ্য থেকে চারটি গ্রহণ করে নাও'। [ইবন মাজাহ: ১৯৫২, ১৯৫৩]

(১) পবিত্র কুরআনে চারজন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায় বিচার করতে না পার, তাহলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরী'আত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে; তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা হবে। এ ব্যাপারে অপারগ হলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন এবং যারা এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ আদর্শ স্থাপন করেছেন যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল না। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে'। [আবু দাউদঃ ২১৩৩, তিরমিযীঃ ১১৪১, ইবন মাজাহ্ঃ ১৯৬৯, আহ্মাদঃ ২/৪৭১]

এ সূরার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কোন এক স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ বেশী হয়ে যায়, তবে সেটা তোমার সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্যজনের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েয হবে না। সূরা আন-নিসার এ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে না পারার আশংকার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই তৃপ্ত থাকার নির্দেশ এবং পরবর্তী আয়াতে "তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না" এ দু'আয়াতের মধ্যে সমন্বয় হচ্ছে, এখানে মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দু'টি আয়াতের মর্মে যেমন কোন বৈপরীত্ব নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের অবৈধতাও প্রমাণিত হয় না। যদি আমরা এ

অধিকারভুক্ত দাসীকেই গ্রহণ কর। এতে পক্ষপাতিত্ব[১] না করার সম্ভাবনা বেশী। | اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝

৪. আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহ্‌র[২] মনের সন্তোষের সাথে[৩] | وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ

আয়াতের শানে-নুযূলের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলছেন, একটি ইয়াতীম মেয়ে এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ছিল। লোকটি সে ইয়াতীম মেয়েটির সাথে সম্পদে অংশীদারও ছিল। সে তাকে তার সৌন্দর্য ও সম্পদের জন্য ভালবাসত। কিন্তু সে তাকে ইনসাফপূর্ণ মাহ্‌র দিতে রাযী হচ্ছিল না। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে মাহ্‌র দানের ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দেন। ইয়াতীম হলেই তার মাহ্‌র কম হয়ে যাবে, এমনটি যেন না হয় সেদিকে গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দান করা হয়। [বুখারীঃ ২৪৯৪, ৪৫৭৪, ৫০৯২, মুসলিমঃ ৩০১৮]

(১) এতে দু'টি শব্দ রয়েছে। একটি أَدْنٰى এটি دُنُوٌّ ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হয় নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছেঃ ﴿اَلَّا تَعُوْلُوْا﴾ যা عال শব্দ হতে উৎপন্ন, অর্থ ঝুঁকে পড়া। এখানে শব্দটি অসংগতভাবে ঝুঁকে পড়া এবং দাম্পত্য জীবনে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহৃত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এ আয়াতে তোমাদের যা বলা হল যে, সমতা বজায় রাখতে না পারার আশংকা থাকলে এক স্ত্রী নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর কিংবা শরী'আতসম্মত ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার কর; -এটা এমন এক পথ যা অবলম্বন করলে তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের সম্ভাবনাও দূর হবে। تَعُوْلُوْا শব্দের দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হতে পারে মিসকীন হয়ে যাওয়া। এর সপক্ষে সূরা আত-তাওবার ২৮ নং আয়াতে ﴿عَيْلَةً﴾ শব্দটি এসেছে। সেখানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে দারিদ্রতা। ইমাম শাফে'য়ী বলেন, এর অর্থ, যাতে তোমাদের পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। [ফাতহুল কাদীর]

(২) ইসলামপূর্ব যুগে স্ত্রীর প্রাপ্য মাহ্‌র তার হাতে পৌঁছতো না; মেয়ের অভিভাবকগণই তা আদায় করে আত্মসাৎ করত। যা ছিল নিতান্তই একটা নির্যাতনমূলক রেওয়াজ। এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কুরআন নির্দেশ দিয়েছেঃ ﴿وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ﴾ এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মাহ্‌র তাকেই পরিশোধ কর; অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মাহ্‌র আদায় হলে যার প্রাপ্য তার হাতেই যেন অর্পণ করে। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

(৩) স্ত্রীর মাহ্‌র পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি হত। প্রথমতঃ মাহ্‌র পরিশোধ করতে হলে মনে করা হত যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যেই ﴿نِحْلَةً﴾ শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হৃষ্টমনে তা পরিশোধ

لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ۝٤

প্রদান কর; অতঃপর সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মাহ্‌রের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে[১] ভোগ কর।

করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, অভিধানে ﴿نِحْلَةً﴾ বলা হয় সে দানকে, যা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়। মোটকথা, আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মাহ্‌র অবশ্য পরিশোধ্য একটা ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। পরন্তু অন্যান্য ওয়াজিব ঋণ যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মাহ্‌রের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আব্দুর রহমান ইবন আউফ কোন এক মহিলাকে এক ‘নাওয়া’ (পাঁচ দিরহাম পরিমাণ) মাহ্‌র দিয়ে বিয়ে করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খুশী দেখতে পেয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এক মহিলাকে এক নাওয়া পরিমাণ মাহ্‌র দিয়ে বিয়ে করেছি। [বুখারী: ৫১৪৮]

(১) অনেক স্বামীই তার বিবাহিত স্ত্রীকে অসহায় মনে করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মাহ্‌র মাফ করিয়ে নিত। এভাবে মাফ করিয়ে নিলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হয় না। অথচ স্বামী মনে করত যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেয়া গেছে, সুতরাং মাহ্‌রের ঋণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরণের যুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, “যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাহ্‌রের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পার।” অর্থ হচ্ছে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায়, খুশী মনে মাহ্‌রের অংশবিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোন অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই কেবল তোমাদের পক্ষে তা ভোগ করা জায়েয হবে। এ ধরণের বহু নির্যাতনমূলক পন্থা জাহেলিয়াত যুগে প্রচলিত ছিল। কুরআন এসব যুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজো মুসলিম সমাজে মাহ্‌র সম্পর্কিত এ ধরণের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। আয়াতে ‘হৃষ্টচিত্তে’ প্রদানের শর্ত আরোপ করার পেছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা, মাহ্‌র স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ। হৃষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবী ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোন অবস্থাতেই হালাল হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে শরী‘য়তের মূলনীতিরূপে এরশাদ করেছেনঃ ‘কারো পক্ষে অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না’। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৪২৩] এ হাদীসটি এমন একটা মূলনীতির নির্দেশ দেয়, যা সর্বপ্রকার প্রাপ্য ও লেন-দেনের ব্যাপারে হালাল এবং হারামের সীমারেখা নির্দেশ করে।

৫. আর তোমরা অল্প বুদ্ধিমানদেরকে তাদের ধন-সম্পদ অর্পণ করো না[১]; যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের জীবন চালানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং তা থেকে তাদের আহার-বিহার ও ভরণ-পোষনের ব্যবস্থা কর। আর তোমরা তাদের সাথে সদালাপ কর।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑤

৬. আর ইয়াতিমদেরকে যাচাই করবে[২]

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ

(১) এ আয়াতে ধন-সম্পদের গুরুত্ব এবং মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সম্পদের হেফাযতের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ত্রুটির সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকেই স্নেহান্ধ হয়ে অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং যা দারিদ্র ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন যে, কুরআনুল কারীমের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু তোমাকে অভিভাবক এবং দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেজন্য তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে তাদের খাওয়া-পরার দায়-দায়িত্ব পালন করতে থাক। যদি তারা অর্থ-সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেয়ার আব্দার করে, তবে তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা না দেয়। [তাবারী] উপরোক্ত ব্যাখ্যা মতে, এমন সবার হাতেই সম্পদ অর্পন করা যাবে না যাদের হাতে পড়ে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এতে ইয়াতীম শিশু বা নিজের সন্তানের কোন পার্থক্য নেই। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও এ আয়াতের এরূপ তাফসীরই বর্ণনা করেছেন। [তাবারী] মোটকথা, মালের হেফাজত অত্যন্ত জরুরী এবং অপচয় করা গোনাহের কাজ। নিজের সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'নিজের মালের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদ'। [বুখারীঃ ২৪৮০, মুসলিমঃ ১৪১] অর্থাৎ সওয়াবের দিক দিয়ে শহীদের মর্যাদা পাবে।

(২) আয়াতে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের পর্যায়ে পোঁছে অর্থাৎ বালেগ হয়। মোটকথা, বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা

آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ⑥

যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয়; অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে(১) তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও(২)। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংযত পরিমাণে ভোগ করে(৩)। অতঃপর তোমরা যখন

দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছে, শিশুরা বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (এক) বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়, (দুই) বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়, (তিন) বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ। ইয়াতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তাঁরা শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ কারবার ও লেন-দেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন।

(১) এ বাক্য দ্বারা কুরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, ইয়াতীম শিশুর মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ 'বুদ্ধি-বিবেচনা'র সময়সীমা কি? কুরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ জন্য কোন কোন ফিক্‌হবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন ইয়াতীমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি-বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয়-সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখতে হলেও না।

(২) অর্থাৎ শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়-বুদ্ধি পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা যায়, সে তার ভালমন্দ বুঝবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও।

(৩) আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবন 'আস বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার কোন সম্পদ নেই। আমার তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম আছে, তার সম্পদ রয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তোমার ইয়াতীমের মাল থেকে তুমি খেতে পার, অপব্যয় ও অপচয় না করে, তার সম্পদকে তোমার সাথে না মিশিয়ে এবং তার সম্পদের বিনিময়ে তোমার সম্পদের হেফাজত না করে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৮৬, ২১৫,

তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসেব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৭. পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা অল্পই হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ[১]।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ⑦

৮. আর সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা থেকে কিছু দিবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে[২]।

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ⑧

২১৬, আবু দাউদঃ ২৮৭২] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ আয়াত ইয়াতীমের সম্পদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যদি কেউ ফকীর হয়, সে ইয়াতীমের সঠিক তত্ত্বাবধানের কারণে তা থেকে খেতে পারবে। [বুখারী: ৪৫৭৫; মুসলিম: ৩০১৯]

(১) এ আয়াতে কি পরিমাণ অংশ তারা পাবে তা বর্ণনা করা হয়নি। পক্ষান্তরে পরবর্তী ১১ নং আয়াত থেকে কয়েকটি আয়াত এবং এ সূরারই সর্বশেষ আয়াতে তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ আয়াত মুহকাম, এ আয়াত রহিত হয় নি। অর্থাৎ এর উপর আমল করতে হবে। [বুখারী: ৪৫৭৬] অন্য বর্ণনায় ইবন আব্বাস বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনগণকে তাদের মীরাস বন্টনের সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধান এবং মিসকীনদের জন্য যদি মৃত ব্যক্তির কোন অসীয়ত থেকে থাকে, তবে সে অসীয়ত থেকে প্রদান করতে হবে। আর যদি অসীয়ত না থাকে, তবে তাদেরকে মীরাস থেকে কিছু পৌঁছাতে হবে। [তাবারী] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আবদুর রহমান ইবন আবী বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মীরাস বন্টনের সময় -আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখনও জীবিত- আব্দুর রহমানের সন্তান আবদুল্লাহ ঘরে ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয়স্বজন সবাইকে তার পিতার মীরাস থেকে কিছু কিছু প্রদান করেন, এ হিসেবে যে, এখানে ﴿الْقِسْمَةَ﴾ শব্দের অর্থ, বন্টন। তারপর সেটা ইবন আব্বাসকে

৯. আর তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। কাজেই তারা যেন আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সঙ্গত কথা বলে।

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

১০. নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে(১)।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

দ্বিতীয় রুকূ’

১১. আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন(২)ঃ এক

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, ঠিক করে নি। কারণ এটা অসীয়ত করার প্রতি নির্দেশ। এ আয়াতটিতে অসীয়তের কথাই বলা হয়েছে। যখন মাইয়্যেত তার সম্পদের ব্যাপারে অসীয়ত করতে চাইবে সে যেন নিঃস্ব, ইয়াতীম স্বজনদের না ভুলে সে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।’ [আত-তাফসীরুস সহীহ] সে হিসেবে এটি মৃত্যুর আগেই সম্পদের মালিকের করণীয় নির্দেশ করছে।

(১) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ পরিহার কর। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেগুলো কি? রাসূল বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, জাদু, অন্যায়ভাবে কোন প্রাণ সংহার করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা এবং মুমিনা পবিত্রা নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া।’ [বুখারীঃ ২৭৬৬] সুতরাং ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করার শাস্তি কুরআন ও হাদীস উভয়ের দ্বারাই প্রমাণিত।

(২) ইসলাম-পূর্বকালে আরব ও অনারব জাতিসমূহের মধ্যে দুর্বল শ্রেণী, ইয়াতীম বালক-বালিকা ও অবলা নারী চিরকালই যুলুম-নির্যাতনের স্বীকার ছিল। প্রথমতঃ তাদের কোন অধিকারই স্বীকার করা হত না। কোন অধিকার স্বীকার করা হলেও পুরুষের কাছ থেকে তা আদায় করে নেয়ার সাধ্য কারো ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে। এরপর সব অধিকার সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উত্তরাধিকার আইনেও জগতের সাধারণ জাতিসমূহ সমাজের উভয় প্রকার অঙ্গকে তাদের স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। আরবদের নিয়মই ছিল এই যে, যারা অশ্বারোহন করে এবং শত্রুদের মোকাবিলা করে তাদের

পুত্রের[১] অংশ দুই কন্যার অংশের | الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

অর্থ-সম্পদ লুট করার যোগ্যতা রাখে, তারাই শুধু মাত্র উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে পারে। [রুহুল মা'আনী] বলাবাহুল্য, বালক-বালিকা ও নারী উভয় প্রকার দুর্বল শ্রেণী এ নিয়মের আওতায় পড়ে না। তাই তাদের নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র যুবক ও বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রই ওয়ারিশ হতে পারত। কন্যা কোন অবস্থাতেই ওয়ারিশ বলে গণ্য হত না, প্রাপ্ত বয়স্কা হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা। পুত্র সন্তানও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে উত্তরাধিকারের যোগ্য বলে বিবেচিত হত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে একটি ঘটনা সংঘটিত হল, সা'দ ইবন রবী' রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ দু'টি সা'দ ইবন রবী'র কন্যা। তাদের বাবা আপনার সাথে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেল। আর তাদের চাচা তাদের সমস্ত সম্পদ নিয়ে গেল। তাদের জন্য কোন সম্পদই বাকী রাখল না, অথচ সম্পদ না হলে তাদের বিয়েও হয় না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ্ এর ফয়সালা করবেন। ফলে মীরাসের আয়াত নাযিল হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চাচার কাছে লোক পাঠান এবং বলেনঃ তুমি সা'দ-এর কন্যাদ্বয়কে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ এবং তাদের মা-কে এক-অষ্টমাংশ দিয়ে দাও। আর যা বাকী থাকবে তা তোমার। [আবু দাউদঃ ২৮৯১, ২৮৯২, তিরমিযীঃ ২০৯২. ইবন মাজাহ্ঃ ২৭২০, মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৩৫২]
জাবের ইবন আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ আমি অসুস্থ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলাম, তিনি আমার উপর তার ওযুর পানি ছিটিয়ে দিলে আমি চেতনা ফিরে পেয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, মীরাস কার জন্য? আমার তো কেবল 'কালালা'ই ওয়ারিশ হবে। অর্থাৎ আমার পিতৃকুলের কেউ বা সন্তান-সন্ততি নেই। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ১৯৪, ৪৫৭৭, মুসলিমঃ ১৬১৬] অন্য এক বর্ণনায় ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ তখনকার সময়ে সম্পদ শুধু ছেলেকেই দেয়া হত আর পিতা-মাতার জন্য ছিল অসীয়ত করার নিয়ম। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তা পরিবর্তন করে যা তিনি পছন্দ করেন তা নাযিল করেন এবং ছেলেকে দুই মেয়ের অংশ দেন আর পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ও তিন ভাগের এক নির্ধারণ করেন। স্ত্রীর জন্য আট ভাগের এক ও চার ভাগের এক নির্দিষ্ট করেন। স্বামীকে অর্ধেক অথবা চার ভাগের এক অংশ দেন। [বুখারীঃ ৪৫৭৮]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা নির্ধারিত ফরয অংশসমূহ দেয়ার পর সবচেয়ে কাছের পুরুষ লোককে প্রদান করবে' [মুসলিম: ১৬১৫] তাই পুত্রের তুলনায় পৌত্র অধিক অভাবগ্রস্ত হলেও أَقْرَبُوْنَ এর আইনের দৃষ্টিতে সে ওয়ারিশ হতে পারে না। কেননা, পুত্রের উপস্থিতিতে সে নিকটতম আত্মীয় নয়। কুরআনে উল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে ইয়াতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নটির

مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ

সমান; কিন্তু শুধু কন্যা দুইয়ের বেশী থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধেক[১]। তার সন্তান

অকাট্য সমাধান আপনা-আপনি বের হয়ে আসে। তার অভাব দূর করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনি এক ব্যবস্থা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এ প্রশ্নে প্রাশ্চাত্যভক্ত নবশিক্ষিতদের ছাড়া কেউ দ্বিমত করেনি। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এ কথাই বুঝে এসেছে যে, পুত্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পৌত্র উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না, তার পিতা বিদ্যমান থাকুক অথবা মারা যাক। এখন কুরআনী ব্যবস্থার সৌন্দর্য লক্ষ্য করুন। একদিকে স্বয়ং কুরআনেরই বর্ণিত সুবিচারভিত্তিক বিধান এই যে, নিকটবর্তী আত্মীয় বর্তমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হবে, অপরদিকে বঞ্চিত দূরবর্তী আত্মীয়ের মনোবেদনা ও নৈরাশ্যকেও উপেক্ষা করা হয়নি। এর জন্য একটি স্বতন্ত্র আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ "যেসব দূরবর্তী, ইয়াতীম, মিসকীন পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যদি তারা বন্টনের সময় উপস্থিত থাকে, তবে অংশীদারদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এ মাল থেকে স্বেচ্ছায় তাদেরকে কিছু দিয়ে দেয়া। এটা তাদের জন্য এক প্রকার সদকা ও সওয়াবের কাজ"। [সূরা আন-নিসাাঃ ৮] তাছাড়া ইসলাম অসীয়ত করার একটি দায়িত্ব মানুষকে দিয়েছে। দাদা যখনই তার নাতিকে বঞ্চিত দেখবে, তখন তার উচিত হবে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে তার জন্য অসিয়ত করা। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কারণ, ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত নেই্ সুতরাং অসিয়তের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে, নিকটাত্মীয় অথচ কোন কারণে ওয়ারিশ হচ্ছে না, এমন লোকদের জন্য তা গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করা। এ রকম অবস্থায় অসিয়ত করা কোন কোন আলেমের নিকট ওয়াজিব।

(১) কুরআনুল কারীম কন্যাদেরকে অংশ দেয়ার প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, কন্যাদের অংশকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্রদের অংশ ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ 'দুই কন্যার অংশ এক পুত্রের অংশের সমপরিমাণ' বলার পরিবর্তে 'এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেকেই বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনেরা এ কথা চিন্তা করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে দেয় যে, পাওয়া যখন যাবেই না, তখন ভাইদের সাথে মন কষাকষির দরকার কি। এরূপ ক্ষমা শরী'য়তের আইনে ক্ষমাই নয়; ভাইদের জিম্মায় তাদের হক পাওনা থেকে যায়। যারা এভাবে ওয়ারিশী স্বত্ব আত্মসাৎ করে, তারা কঠোর গোনাহ্গার। তাদের মধ্যে আবার নাবালেগা কন্যাও থাকে। তাদেরকে অংশ না দেয়া দ্বিগুণ গোনাহ্। এক গোনাহ্ শরী'য়তসম্মত ওয়ারিশের অংশ আত্মসাৎ করার এবং দ্বিতীয় গোনাহ্ ইয়াতীমের সম্পত্তি হজম করে ফেলার। এরপর আরো ব্যাখ্যা সহকারে কন্যাদের অংশ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যদি পুত্র সন্তান না থাকে, শুধু

الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑪

থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ; সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ; তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ(১); এ সবই সে যা ওসিয়াত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর(২)। তোমাদের

একাধিক কন্যাই থাকে, তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। এতে সব কন্যাই সমান অংশীদার হবে। অবশিষ্ট তিন ভাগের এক অন্যান্য ওয়ারিশ যেমন মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা, স্ত্রী অথবা স্বামী প্রমূখ পাবে। কন্যাদের সংখ্যা দুই বা তার বেশী হলে দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে তারা সমান অংশীদার হবে।

(১) কাতাদা বলেন, সন্তানরা মাকে এক তৃতীয়াংশ থেকে কমিয়ে এক ষষ্টাংশে নিয়ে এসেছে, অথচ তারা নিজেরা ওয়ারিশ হয় নি। যদি একজন মাত্র সন্তান থাকে তবে সে তার মায়ের অংশ কমাবে না। কেবল একের অধিক হলেই কমাবে। আলেমগণ বলেন, মায়ের অংশ কমানোর কারণ হচ্ছে, মায়ের উপর তাদের বিয়ে বা খরচের দায়িত্ব পড়ে না। তাদের বিয়ে ও খরচ-পাতির দায়িত্ব তাদের বাপের উপর। তাই তাদের মায়ের অংশ কমানো যথার্থ হয়েছে। [তাবারী; ইবনে কাসীর; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এখানে শরী'আতের নীতি হচ্ছে এই যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরী'আত অনুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়টি নিষিদ্ধ। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি ঋণ সম্পত্তির সমপরিমাণ কিংবা তারও বেশী হয়, তবে কেউ ওয়ারিশী স্বত্ব পাবে না এবং কোন ওসিয়ত কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা ঋণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোন ওসিয়ত করে থাকলে এবং তা গোনাহ্‌র ওসিয়ত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা কার্যকর হবে। যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তি ওসিয়ত করে যায় তবুও এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়ত কার্যকর হবে না। মোটকথা ঋণ পরিশোধের পর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসিয়ত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরী'আতসম্মত ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। ওসিয়ত না থাকলে ঋণ পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] বন্টনের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, মিকদাম ইবন মা'দীকারব বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সবচেয়ে নিকটতমের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন, তারপর পরের নিকটতম ব্যক্তি। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৩১]

পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা জান না[১]। এ বিধান আল্লাহ্‌র; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১২. তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ; ওসিয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ; তোমরা যা ওসিয়াত করবে তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর[২]।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

(১) অর্থাৎ তোমাদের পিতা ও সন্তানের মধ্যে কার দ্বারা তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে, তা বলতে পার না। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস বলেন, তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌র বেশী অনুগত, সে কিয়ামতের দিন বেশী উঁচু স্তরে অবস্থান করবে; কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের পরস্পরের জন্য পরস্পরের সুপারিশ গ্রহণ করবেন। [তাবারী]

(২) উপরোক্ত বর্ণনায় স্ত্রীর অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে স্বামীর অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। মৃতা স্ত্রীর যদি কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে অন্যান্য ওয়ারিশ যেমন মৃতার পিতা-মাতা, ভাই-বোন যথারীতি অংশ পাবে। মৃতার যদি সন্তান থাকে, এক বা একাধিক - পুত্র বা কন্যা, এ স্বামীর ঔরসজাত হোক বা পূর্ববর্তী কোন স্বামীর ঔরসজাত, তবে বর্তমান স্বামী ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর মৃতার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অন্যান্য ওয়ারিশরা পাবে। পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী মোট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে, এ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর, তবে ঋণ পরিশোধ ও

আর যদি কোন পুরুষ অথবা নারীর 'কালালাহ্[১]' বা পিতা-মাতা ও সন্তানহীন উত্তরাধিকারী হয়, আর থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। তারা এর বেশী হলে সবাই সমান অংশীদার হবে তিন ভাগের এক ভাগে; এটা যা ওসিয়াত করা হয় তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, কারো ক্ষতি না করে[২]। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী এক অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীই এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ পাবে না, বরং সবাই মিলে এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশে অংশীদার হবে। উভয় অবস্থাতে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তাদের অন্যান্য ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তবে প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর মাহ্‌র পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতই প্রথমে মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মাহ্‌র পরিশোধ করার পর ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা হবে। মোহারানা দেয়ার পর স্ত্রী ওয়ারিশী স্বত্বে অংশীদার হবার দরুন এ অংশও নেবে। মাহ্‌র পরিশোধ করার পর যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি মাহ্‌র বাবদ স্ত্রীকে সমর্পণ করা হবে এবং কোন ওয়ারিশই অংশ পাবে না।

(১) আলোচ্য আয়াতে 'কালালাহ্'র পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। 'কালালাহ্'র অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে মৃত ব্যক্তির উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কেউ নেই, সে-ই 'কালালাহ্'। [তাবারী]

(২) 'কারো ক্ষতি না করে' এ কথার দু'টি দিক আছে। প্রথমত, মৃত ব্যক্তি যেন ওসিয়ত বা ঋণের মাধ্যমে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। ওসিয়ত করা কিংবা নিজের যিম্মায় ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকার করার মাধ্যমে ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুকায়িত না রাখে। এ রকমের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবিরা গোনাহ। দ্বিতীয়ত, যারা কালালাহ জনিত ওয়ারিশ তারাও যেন মৃত ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত অসিয়ত কার্যকরণে কোন প্রকার বাধা না দেয়। ইবন আব্বাস বলেন, ওসিয়্যতে ক্ষতিগ্রস্ত করা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। [তাবারী]

১৩. এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটাই হলো মহাসাফল্য।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٣

১৪. আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে[১]।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۠ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝١٤

তৃতীয় রুকূ'

১৫. আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করবে[২]। যদি তারা সাক্ষ্য

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَاۗىِٕكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْھُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা তথা ওয়ারিশী নীতির ব্যাপারে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা লজ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কেননা সে আল্লাহ্‌র হুকুমকে পরিবর্তন করেছে, আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধিতা করেছে। তখনই কেউ এরূপ করতে পারে যখন সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের উপর অসন্তুষ্ট থাকে। এজন্য আল্লাহ্ তাকে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা দ্বারা শাস্তি দিবেন।

(২) এখানে এমন পুরুষ ও নারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা নির্লজ্জ কাজ অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। বলা হয়েছে, যেসব নারী দ্বারা এমন কুকর্ম সংঘটিত হয়, তাদের এ কাজ প্রমাণ করার জন্য চার জন পুরুষ সাক্ষী তলব করতে হবে। অর্থাৎ যেসব বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্য চার জন যোগ্য সাক্ষী তলব করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুষ শ্রেণী থেকে হওয়াও জরুরী। এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যভিচারের সাক্ষীদের ব্যাপারে শরী'আত দু'রকম কঠোরতা করেছে যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এতে ইজ্জত ও আবরু আহত হয় এবং পারিবারিক মানসম্ভ্রমের প্রশ্ন দেখা দেয়, তাই প্রথমে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এমন ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই সাক্ষী হতে হবে - নারীদের সাক্ষ্য ধর্তব্য

يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾

দেয় তবে তাদেরকে ঘরে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন(১)।

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন এতে লিপ্ত হবে তাদেরকে শাস্তি দেবে। যদি তারা তাওবাহ্ করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তবে তাদের থেকে বিরত থাকবে(২)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম তাওবাহ্ কবুলকারী, পরম দয়ালু।

নয়। দ্বিতীয়তঃ চার জন পুরুষ হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ শর্তটি খুবই কঠোর। দৈবাৎ ও কদাচিৎ তা পাওয়া যেতে পারে। এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অথবা অন্য স্ত্রী অথবা ভাই-বোন ব্যক্তিগত জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকামী লোকেরা শত্রুতাবশতঃ অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়। কেননা, চার জনের কম পুরুষ ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষী গ্রহণীয় নয়। এমতাবস্থায় বাদী ও সাক্ষীরা সবাই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং একজন মুসলিমের চরিত্রে কলংক আরোপ করার দায়ে তাদেরকে ‘হদ্দে-কযফ’ বা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তখনকার দিনে কোন মহিলা ব্যভিচার করলে, সে আমৃত্যু ঘরে বন্দী জীবন যাপন করত। [তাবারী] তিনি আরও বলেন, এখানে যে ব্যবস্থার ওয়াদা করেছেন সূরা আন-নূরে আল্লাহ্ তা‘আলা সে ব্যবস্থা করেছেন। তিনি অবিবাহিতদের জন্য বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতদের জন্য পাথরের আঘাতে নিহত করা দ্বারা এ আয়াতকে রহিত করেছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসে সুস্পষ্টভাবে তার নির্দেশ এসেছে। [দেখুন- মুসলিমঃ ১৬৯০, আবু দাউদঃ ৪৪১৫, তিরমিযীঃ ১৪৩৪, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩১৮]

(২) ইবন আব্বাস বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কেউ ব্যভিচার করলে, তাকে তা‘যীর বা অনির্ধারিত শাস্তি দেয়া হত। তাকে জুতো মারা হতো। পরবর্তীতে নাযিল হলো, ‘ব্যভিচারিনী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের উভয়কে একশত বেত্রাঘাত কর’ [সূরা আন-নূর:২] কিন্তু যদি তারা বিবাহিত হয়, তবে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত অনুসারে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। আর এটাই হচ্ছে এ আয়াতে বর্ণিত ব্যবস্থা। [তাবারী]

১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই সেসব লোকের তাওবাহ্ কবুল করবেন যারা অজ্ঞতাবশতঃ[১] মন্দ কাজ করে এবং তাড়াতাড়ি তাওবাহ্ করে, এরাই তারা, যাদের তাওবাহ্ আল্লাহ্ কবুল করেন[২]। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١٧

(১) এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুরআনুল কারীমে ﴿بِجَهَٰلَةٖ﴾ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায়, অজ্ঞাতসারে এবং না জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তাওবা কবুল হবে এবং জ্ঞাতসারে জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তাওবা কবুল হবে না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন তা এই যে, এখানে আয়াতের ﴿بِجَهَٰلَةٖ﴾ অর্থ এই নয় যে, সে গোনাহ্‌র কাজটি যে গোনাহ্, তা জানে না কিংবা গোনাহ্‌র ইচ্ছা নেই; বরং অর্থ এই যে, গোনাহ্‌র অশুভ পরিণাম ও আখেরাতের আযাবের ব্যাপারে গাফেল বা অসতর্কতাই তার গোনাহ্‌র কাজ করার কারণ; যদিও গোনাহ্‌টি যে গোনাহ্, তা সে জানে এবং তার ইচ্ছাও করে। তাই جهالة শব্দটি এখানে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবুল আলিয়া ও কাতাদাহ্‌র বর্ণনা মতে সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, 'বান্দা যে গোনাহ্ করে- অনিচ্ছাকৃত করুক কিংবা ইচ্ছাকৃত, সর্বাবস্থায়ই তা মূর্খতা'। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কাজে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করছে, সে দৃশ্যতঃ বড় আলেম ও বিশেষ জানা-শোনা বিচক্ষণ হলেও সে কাজ করার সময় মূর্খই হয়ে যায়'। ইকরিমা বলেন, দুনিয়ার যেসব কাজ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বাইরে, সেগুলো সবই মূর্খতা। কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে, সে ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। যে ব্যক্তি এই ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে চিরস্থায়ী কঠোর আযাব ক্রয় করে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। তাকে সবাই মূর্খ বলবে, যদিও সে ভালভাবে জানা ও বোঝার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সে কুকর্ম সম্পাদন করে। মোটকথা, গোনাহ্‌র কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা ভুলক্রমে, উভয় অবস্থাতেই তা মূর্খতাবশতঃ সম্পন্ন হয়। এ কারণেই সাহাবা, তাবেয়ীন ও সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গোনাহ্ করে, শর্তসাপেক্ষে তার তাওবাও কবুল হতে পারে। তাছাড়া আয়াতের আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, তারা গোনাহ করার সময় এর পরিণাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না। অথবা সে অপরাধ করার সময় আল্লাহ্ যে তাকে দেখছেন সে ব্যাপারে বেখবর হয়ে পড়ে। অথবা সে যখন অপরাধ করে তখন যে তার ঈমানের মধ্যে দূর্বলতা আসবে সে সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়ে। [তাফসীরে সা'দী]

(২) এখানে তাড়াতাড়ি তাওবাহ্ করা শর্তের অর্থ হলো দু'টি- (এক) মৃত্যুর বড় শ্বাস বের না হওয়ার আগ পর্যন্ত করা। [তিরমিযীঃ ৩৫৩৭, ইবন মাজাহ্ঃ ৪২৫৩] (দুই) সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত করা। [দেখুন, সূরা আল-আন'আম: ১৫৮]

১৮. তাওবাহ্ তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবাহ্ করছি' এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য আমরা কষ্টদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি[১]।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

১৯. হে ঈমানদারগণ! যবরদস্তি করে[২]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ

(১) ইবন আব্বাস বলেন, এ আয়াত এবং ৪৮ নং আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফের অবস্থায় যারা মারা যাবে তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। পক্ষান্তরে যাদের তাওহীদ ঠিক আছে তাদেরকে তিনি তাঁর ইচ্ছার উপর রেখেছেন। তাদেরকে তিনি ক্ষমা থেকে নিরাশ করেন নি। [তাবারী]

(২) ইসলামপূর্ব যুগে পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করতো। স্ত্রী যার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ ও মালিক হতো, তেমনি তার স্ত্রীরও ওয়ারিশ ও মালিক বলে গণ্য হতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করতো কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতো। স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নিজেও পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারতো। স্ত্রীর প্রাণেরই এই অবস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো বলাই বাহুল্য। যেসব অর্থ-সম্পদ স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসেবে লাভ করতো, তারা সেগুলো হজম করে ফেলতো। যদি কোন নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিত, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিত; যাতে সে এখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভুক্ত থেকে যায়। কোন কোন সময় স্ত্রীর কোন দোষ না থাকলেও তাকে তার প্রাপ্য প্রদান করতো না। আবার তালাক দিয়েও তাকে মুক্ত করত না। তালাক দিলেও অন্যত্র বিয়ে দিত না। যাতে তার মাহ্‌রের টাকা বাইরে না যায়। ইসলাম এসব কিছুর মুলোৎপাটন করে দিয়েছে। এ আয়াত সংক্রান্ত বেশ কিছু বর্ণনায় তা স্পষ্ট। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ইসলামপূর্বযুগে কোন লোক মারা গেলে তার অভিভাবকরা তার স্ত্রীর অধিকারী হয়ে যেত। সে ইচ্ছে করলে তাকে বিয়ে করত অথবা অন্যের নিকট বিয়ে দিয়ে দিত। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। [বুখারী: ৪৫৭৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, কায়েস ইবন সালত এর পিতা মারা গেলে তার ছেলে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাইল। জাহেলিয়াতে যা তাদের অভ্যাস ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [নাসায়ী: ১১৫]

كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ
اٰتَيْتُمُوهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسٰٓى
اَنْ تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

নারীদের উত্তরাধিকার হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্ট খারাপ আচরণ করে(১)। আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে(২); তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ(৩)।

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে স্পষ্ট খারাপ আচরণ বলতে, স্বামীর অবাধ্যতা ও স্বামীর সাথে শত্রুতা বোঝানো হয়েছে। যে মহিলা স্বামীর অবাধ্য সে মহিলা থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য পুরুষটি তাকে দেয়া সম্পদ ফেরৎ নিতে পারবে। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তম কথা বলবে। কথায়, কাজে, চলাফেরায় যতটুকু সম্ভব সৌন্দর্য রক্ষা করবে। যেমনটি তুমি তাদের কাছ থেকে আশা কর, তেমন ব্যবহারই করো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম। [তিরমিযীঃ ৩৮৯৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক সৌন্দর্যের মধ্যে এটা ছিল যে, তিনি সদাহাস্য সুন্দর ব্যবহার করতেন। পরিবারের সাথে হাস্যরস, নরম ব্যবহার ইত্যাদি করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার সাথে কখনো কখনো দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। [দেখুন- আবু দাউদঃ ২৫৭৮, ইবন মাজাহ্ঃ ১৯৭৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৬/১২৯]

(৩) অর্থাৎ এমনও হতে পারে যে, ধৈর্যধারণ করে তাদের সাথে জীবনযাপন করলে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক ভাল কিছু এর বিনিময়ে রেখেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ এর অর্থ হল স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসবে, তারপর তাদের মধ্যে আল্লাহ্ সন্তান দান করবেন যে সন্তান তাদের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিয়ে আসবেন বা স্বামীর মনে স্ত্রীর জন্য ভালবাসা তৈরী করে দিবেন। [তাবারী] এছাড়া হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীকে ঘৃণা করবে না। যদি তার কোন চরিত্রের কোন একটি দিক তাকে অসন্তুষ্ট করে, তবে অন্য দিক তাকে সন্তুষ্ট করবে। [মুসলিমঃ ১৪৬৯]

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ⑳

২০. আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে অনেক অর্থও(১) দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে?

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ㉑

২১. আর কিভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে সংগত হয়েছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি(২) নিয়েছে?

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ㉒

২২. নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃ পুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না(৩); তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে

---

(১) এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মাহ্‌র হিসাবে অনেক সম্পদ দেয়াও জায়েয। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বেশী পরিমাণে মাহ্‌র দিতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেনঃ তোমরা মহিলাদের মাহ্‌র নির্ধারণে সীমালংঘন করো না। কেননা, এটা যদি দুনিয়াতে সম্মানের ব্যাপার হত অথবা আল্লাহ্‌র নিকট তাকওয়ার বিষয় হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই এ কাজের সবেচেয়ে বেশী উপযুক্ত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার উকিয়ার বেশী তার কোন স্ত্রীকেও দেননি এবং কন্যাদের জন্যও গ্রহণ করেন নি। এমনকি কখনো কখনো মানুষ স্ত্রীর মাহ্‌র দিতে গিয়ে নিজেই নিজের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। [আবু দাউদঃ ২১০৬, তিরমিযীঃ ১১১৪]

(২) কাতাদা বলেন, দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার বলে বিয়ে বুঝানো হয়েছে। কারণ বিয়ের সময় মাহ্‌র দেয়া এবং স্ত্রীকে সঠিকভাবে পরিচালনা কিংবা সুন্দরভাবে বিদায় করার অঙ্গীকার করার মত চুক্তি সংঘটিত হয়ে থাকে। [তাফসীর আবদির রাযযাক] সুতরাং একে অপরের সাথে মেলামেশা ও চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এ জাতীয় আচরণ অমানবিক ও অগ্রহণযোগ্য।

(৩) জাহেলিয়াত যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্ররা বিনাদ্বিধায় বিয়ে করে নিত। [দেখুন- বুখারীঃ ৪৫৭৯] এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং একে 'আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ' বলে অভিহিত করেছেন। বলাবাহুল্য, যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা

(সেটা ক্ষমা করা হলো) নিশ্চয় তা ছিল অশ্লীল, মারাত্মক ঘৃণ্য(১) ও নিকৃষ্ট পন্থা।

চতুর্থ রুকূ’

২৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে(২) তোমাদের মা(৩), মেয়ে(৪),

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ

মানব-চরিত্রের জন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আলেমগণ বলেন, পিতা কোন নারীকে বিয়ে করার সাথে সাথেই সন্তানদের জন্য সে নারী হারাম হয়ে যাবে। চাই তার সাথে পিতার সহবাস হোক বা না হোক। অনুরূপভাবে যে নারীকে পুত্র বিয়ে করেছে সেও পিতার জন্য হারাম হয়ে যাবে, তার সাথে পুত্রের সহবাস হোক বা না হোক [তাবারী]

(১) আবু বুরদাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মতান্তরে হারেস ইবন ‘আমের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাঠিয়েছেন এমন লোকের কাছে যে তার পিতার মৃত্যুর পরে পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে- যেন তাকে হত্যা করা হয় এবং তার যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। [আবু দাউদঃ ৪৪৫৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৯৭, তিরমিযীঃ ১৩৬২, ইবন মাজাহ্ঃ ২৬০৭]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের বিবরণ দেয়া হয়েছে। তারা তিনভাগে বিভক্তঃ এক. ঐ সমস্ত হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না, তাদেরকে ‘মুহার্‌রামাতে আবাদীয়্যা’ বা ‘চিরতরে হারাম মহিলা’ বলা হয়। এ জাতীয় মহিলা তিন শ্রেণীরঃ (১) বংশগত হারাম নারী, (২) দুধের কারণে হারাম নারী এবং (৩) শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী চিরতরে হারাম। দুই. কোন কোন নারী চিরতরে হারাম নয়, কোন কোন অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়। তাদেরকে ‘মুহাররামাতে মুআক্কাতাহ’ বা সাময়িক কারণে হারাম বলা হয়। এরা আবার দু’ শ্রেণীতে বিভক্তঃ (১) পরস্ত্রী সে যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম। কিন্তু যখনই অপরের স্ত্রী হওয়া থেকে মুক্ত হবে তখনই সে হালাল হয়ে যাবে। (২) কোন কোন মহিলা শুধুমাত্র অন্যের সাথে একসাথে বিবাহ করা হারাম। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবাহ করা হারাম নয়। যেমন, দুই বোনকে একসাথে স্ত্রী হিসেবে রাখা। খালা ও বোনঝিকে একসাথে স্ত্রী হিসেবে রাখা।

(৩) অর্থাৎ আপন জননীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। অর্থের ব্যাপকতায় দাদী, নানী সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(৪) স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম। মোটকথা, কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী এদের সবাইকে বিয়ে করা হারাম।

وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ

বোন[১], ফুফু[২], খালা[৩], ভাইয়ের মেয়ে[৪], বোনের মেয়ে[৫], দুধমা[৬], দুধবোন[৭], শাশুড়ী ও তোমাদের

---

(১) সহদোরা বোনকে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনকেও বিয়ে করা হারাম।

(২) পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনকে বিয়ে করা হারাম। তিন প্রকার ফুফুকেই বিয়ে করা যায় না।

(৩) আপন জননীর তিন প্রকার বোন, প্রত্যেকের সাথেই বিয়ে করা হারাম।

(৪) ভ্রাতুষ্পুত্রীর সাথেও বিয়ে হারাম; আপন হোক বৈমাত্রেয় হোক - বিয়ে হালাল নয়।

(৫) বোনের কন্যা অর্থাৎ ভাগ্নেয়ীর সাথেও বিয়ে হারাম। এখানেও বোনকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে।

(৬) যেসব নারীর স্তন্য পান করা হয়, তারা জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিবাহ হারাম। ফেকাহ্‌বিদগণের পরিভাষায় একে 'হুরমাতে রেযাআত' বলা হয়। তবে কেবলমাত্র শিশু অবস্থায় দুধ পান করলেই এই 'হুরমাত' কার্যকরী হয়।

(৭) অর্থাৎ দুধ পানের সাথে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ এই যে, দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোন বালক অথবা বালিকা কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে তাদের মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদেরই ভাই-বোন হয়ে যায়। অনুরূপ সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয় এবং সে স্ত্রীলোকের দেবর-ভাসুররা তাদের চাচা হয়ে যায়। তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পরস্পরের বৈবাহিক অবৈধতা স্থাপিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পর যেসব বিয়ে হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণে সেসব সম্পর্কীদের সাথে বিয়ে করা হারাম হয়ে যায়। তাই একটি বালক ও একটি বালিকা কোন মহিলার দুধ পান করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনিভাবে দুধভাই ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না। উকবা ইবন হারেস বলেন, তিনি আবি ইহাব ইবন আযীযের এক মেয়েকে বিয়ে করেন। এক মহিলা এসে বলল, আমি উকবাকে এবং যাকে সে বিয়ে করেছে উভয়কে দুধ পান করিয়েছি। উকবা বললেন, আমি জানি না যে, আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। এর পূর্বে আপনি আমাকে কখনো বলেননি। তারপর তিনি মদীনায় আসলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কিভাবে এটা সম্ভব অথচ বলা হয়েছে। তখন উকবা তার স্ত্রীকে পৃথক করে দিলেন এবং অন্য একজনকে বিয়ে করেন। [বুখারীঃ ৮৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٣﴾

স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়ে, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে[১], তবে যদি তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ

সাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে ছিলেন। এমতাবস্থায় আয়েশা শুনতে পেলেন যে, হাফসার ঘরে যাওয়ার জন্য একজন পুরুষ লোক অনুমতি চাচ্ছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একলোক আপনার পরিবারভুক্ত ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার তো মনে হয় এটা অমুক ব্যক্তি। হাফসার কোন এক দুধ চাচা। তখন আয়েশা বললেন, অমুক যদি জীবিত থাকত- আয়েশার কোন এক দুধ চাচা- তাহলে কি সে আমার কাছে প্রবেশ করতে পারত? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, জন্মগত কারণে যা হারাম হয়, দুধগত কারণেও তা হারাম হয়। [বুখারী: ৫০৯৯; মুসলিম: ১৪৪৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন, জন্মের কারণে যাদেরকে হারাম গণ্য করো দুধ পানের কারণেও তাদেরকে হারাম গণ্য করবে। [মুসলিম: ১৪৪৫] তবে এ দুধপান দু বছরের মধ্যে হয়েছে কি না সে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন জরুরী; কারণ, হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দুধ পানের সময়টুকু যেন ঐ সময়েই সংঘটিত হয় যখন সন্তানের দুধ ছাড়া আর কোন খাবার দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ হতো না।' [বুখারী: ৫১০২; মুসলিম: ১৪৫৫]

(১) এখানে অভিভাবকত্ব থাকার কথাটা শর্ত হিসাবে নয়; বরং সাধারণতঃ এ ধরনের মেয়েরা মায়ের সাথেই থাকে আর মা দ্বিতীয় বিবাহের কারণে তার স্বামীর কাছেই থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এ ধরনের মেয়েদের অভিভাবকত্ব থাকা না থাকা উভয় অবস্থাতেই তাদের বিয়ে করা হারাম। উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি আবু সুফিয়ানের মেয়েকে বিয়ে করবেন? রাসূল বললেন যে, তাকে বিয়ে করা আমার জন্য জায়েয হবে না। আমি বললাম, আমি শুনেছি আপনি নাকি বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। রাসূল বললেন, তুমি কি উম্মে সালামার মেয়ের কথা বলছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি সে আমার রাবীবা নাও হত তারপরও আমার জন্য জায়েয হত না। কেননা, আমাকে এবং তার পিতাকে সুআইবাহ্ দুধ পান করিয়েছেন। তোমরা তোমাদের কন্যাদের এবং তোমাদের বোনদের আমার কাছে বিয়ের জন্য পেশ করো না। [বুখারীঃ ৫১০৬]

তোমাদের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী[১] ও দুই বোনকে একত্র করা, আগে যা হয়েছে, হয়েছে[২]। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৪. আর নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী[৩] ছাড়া সব

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ

(১) অর্থাৎ আপন পুত্রের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম। যদিও পুত্র শুধু বিবাহই করে-সহবাস না করে।

(২) এখানে বুঝানো হয়েছে যে, পূর্বে এ ধরনের যা কিছু ঘটেছে তা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু যদি কেউ এরূপ অবস্থায় ইসলামে প্রবেশ করে তবে তাদের মধ্য থেকে দু'জনের একজনকে তালাক দিতে হবে। হাদীসে এসেছে, ফাইরোয আদ্-দাইলামী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললামঃ আমি ঈমান এনেছি অথচ দুই বোন আমার স্ত্রী হিসেবে আছে। রাসূল বললেনঃ তুমি তাদের যে কোন একজনকে তালাক দিয়ে দাও। [ইবন মাজাহ্ঃ ১৯৫১, তিরমিযীঃ ১১২৯] অনুরূপভাবে এ একত্রিতকরণের মাসআলার মধ্যে এমন দু'জনকেও একত্রে বিয়ে করা জায়েয নাই, যাদের একজন পুরুষ সাব্যস্ত হলে অন্যজনের জন্য তাকে বিয়ে করা জায়েয হত না। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মহিলা এবং তার ফুফু অনুরূপভাবে কোন মহিলা ও তার খালাকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। [বুখারীঃ ৫১০৯]

(৩) অধিকারভুক্ত দাসী বলতে ঐ সমস্ত নারীদেরকে বুঝায়, যারা কাফের ছিল। মুসলিমগণ যুদ্ধে তাদের পুরুষদের পরাজিত করে তাদেরকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসে, তখন তাদেরকে মুসলিমদের জন্য বিয়ে ছাড়াই হালাল করা হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল যোদ্ধাকে 'আওতাস'-এর দিকে পাঠান। তারা কাফেরদের উপর জয়ী হয়ে তাদের নারীদেরকে নিয়ে আসে। কিন্তু এরা কাফের নারী হওয়ার কারণে মুসলিমগণ তাদেরকে হালাল মনে করছিল না। তখন এই আয়াত নাযিল হয়ে জানিয়ে দেয়া হয় যে, এরা তাদের জন্য হালাল, তবে শর্ত হলো এদের ইদ্দত শেষ হতে হবে। [মুসলিমঃ ১৪৫৬]
যুদ্ধ-বন্দিনী দাসীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারে কিছু নিয়মনীতি রয়েছে-
(এক) অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, এটা শুধুমাত্র মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ হলেই হতে পারে। কোন কারণে যদি মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ হয়, কিংবা মুসলিম দু'টি রাষ্ট্রে যুদ্ধের সূচনা হয়, অথবা মুসলিমদের কোন জাতিগত বা ভাষাগত বা রাজনৈতিক দাঙ্গা হয় সেখানে যে যুদ্ধ হবে সে যুদ্ধের কারণে

اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ
ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ
مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ
بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾

সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এগুলো আল্লাহ্‌র বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করেছ তাদের নির্ধারিত মাহ্‌র অর্পণ করবে[১]। মাহ্‌র নির্ধারণের

কাউকে অধিকারভুক্ত দাস-দাসী বানানোর অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। যদি কেউ এটা করতে চায় তবে সেটা হবে সম্পূর্ণ অবৈধ ও ব্যভিচার। এ ধরনের লোকদেরকে ব্যভিচারের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

(দুই) যে সমস্ত মেয়ে বন্দী হয় তাদেরকে ইসলামী আইন অনুযায়ী সরকারের হাতে সোপর্দ করে দিতে হবে। সরকার চাইলে তাদেরকে বিনা শর্তে মুক্ত করে দিতে পারে, মুক্তিপণ গ্রহণ করতে পারে, শত্রুর হাতে যে সমস্ত মুসলিম বন্দী রয়েছে তাদের সাথে এদের বিনিময়ও করতে পারে এবং চাইলে তাদেরকে সৈন্যদের মাঝে বন্টনও করে দিতে পারে। তাই বন্দী করার সাথে সাথেই কোন সৈনিক তাদের সাথে সংগম করার অধিকার লাভ করে না। তাছাড়া কোন ক্রমেই যুদ্ধাবস্থায় এ অধিকার কারও থাকবে না। যদি কেউ যুদ্ধাবস্থায় এ কাজ করে তবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

(তিন) মেয়েটি গর্ভবতী নয় এতটুকু নিশ্চিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে এক মাসিক ঋতুশ্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে সংগম করা যাবে না।

(চার) যে মেয়েকে যার ভাগে দেয়া হবে সে-ই শুধু তাকে ভোগ করতে পারবে; অন্য কেউ নয়।

(পাঁচ) সন্তানের জননী হওয়ার পর এ মেয়েকে আর বিক্রয় করা যাবে না। মালিকের মৃত্যুর পরপরই সে স্বাধীন হয়ে যাবে।

(ছয়) মালিক ইচ্ছে করলে তাকে অন্য কারো কাছে বিয়ে দিতে পারবে। তখন তার খেদমত মালিকের হবে কিন্তু মালিক তার সাথে যৌন সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

(সাত) কোন সেনাপতি যদি নিছক সাময়িকভাবে তার সৈন্যদেরকে বন্দিনী মেয়েদের মাধ্যমে নিজেদের যৌন তৃষ্ণা মেটানোর অনুমতি দেয়, তবে তা হবে সম্পূর্ণ অবৈধ। কেননা, এ কাজ ও ব্যভিচারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

(১) অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ আয়াতে মহিলাদের মধ্যে যাদের সাথে সম্ভোগ

পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই[১]। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২৫. আর তোমাদের মধ্যে কারো মুক্ত ঈমানদার নারী বিয়ের সামর্থ্য[২] না থাকলে তোমরা তোমাদের

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ

হয়েছে তাদেরকে মাহ্‌র পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হিসেবে এ আয়াত পূর্বোক্ত ২১ নং আয়াতের মতই। [আদওয়াউল বায়ান] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে মুত'আ বিবাহের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুত'আ ও সাময়িক বিয়ের অনুমতি ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অসংখ্য সহীহ্ হাদীসে এটাকে হারাম ঘোষণা করা হয়। যেমন এক হাদীসে এসেছে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার যুদ্ধের কালে মুত'আ বিয়ে ও গৃহপালিত গাধার গোস্ত হারাম করেছেন। [বুখারী: ৫১১৫, ৫৫২৩; আরও দেখুন- বুখারীঃ ৪২১৬, মুসলিমঃ ১৪০৬, ১৪০৭] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর মক্কা বিজয়ের বছর সেটাকে আবার বৈধ করা হয়েছিল। কিন্তু সহীহ হাদীসে এসেছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, এ জাতীয় বিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হয়েছে। [মুসলিম: ১৪০৬] এ হিসেবে মুত'আ বিবাহ প্রথমে খায়বারের যুদ্ধে হারাম করা হয়। এরপর মক্কা বিজয়ের সময় হালাল করা হয়, অথবা কোন কোন সাহাবী রাসূলের অগোচরেই না জানা অবস্থায় সেটা করেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের বছর আওতাসের যুদ্ধের সময় তিনদিন কোন কোন সাহাবী সেটা করার পর সেটা চিরতরে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হয়। [যাদুল মা'আদ]

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মাহ্‌র নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হওয়ার অর্থ হচ্ছে, ধার্যকৃত পূর্ণ মাহ্‌র প্রদান করে স্ত্রীকে তার মাহরের ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার প্রদান করা। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আয়াতের অর্থ এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ্য নেই কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই, সে ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, যতটা সম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করা উচিত - দাসীকে বিয়ে না করাই বাঞ্ছনীয়। অগত্যা যদি দাসীকে বিয়ে করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে। স্বাধীন ইয়াহূদী-নাসারা নারীদেরকে বিয়ে করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যাধিক। কেননা, ইয়াহূদী ও নাসারা নারীরা আজকাল সাধারণতঃ স্বয়ং স্বামীকে ও স্বামীর সন্তানদেরকে স্বধর্মে আনার উদ্দেশ্যেই মুসলিমদেরকে বিয়ে করে।

الْمُؤْمِنٰتِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾

অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিয়ে করবে[১]; আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান; কাজেই তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে[২] এবং তাদেরকে তাদের মাহ্র ন্যায়সংগতভাবে দেবে। তারা হবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়। অতঃপর বিবাহিতা হওয়ার পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি মুক্ত নারীর অর্ধেক[৩]; তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে

(১) এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ঈমানদার নয় এমন দাসী বিয়ে করা জায়েয নেই। অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, “আর কিতাবী মহিলাদের মধ্যে যারা মুহসিনা” [সূরা আল-মায়িদাহ: ৫] অর্থাৎ তাদেরকে বিয়ে করা হালাল করা হয়েছে। এখানে মুহসিনা বলে কোন কোন মুফাসসিরের মতে স্বাধীনা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই কাফের দাসীদেরকে বিয়ে করা জায়েয নেই। যদিও তারা কিতাবী হয়। [তাবারী; আদওয়াউল বায়ান]

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মহিলা অপর মহিলাকে বিয়ে দেবে না। অনুরূপভাবে কোন মহিলা নিজেকেও বিয়ে দেবে না। যে মহিলা নিজেকে নিজে বিয়ে দেয়, সে ব্যভিচারে লিপ্ত। [ইবন মাজাহ্ঃ ১৮৮২] অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে অবশ্যই অভিভাবকদের অনুমতি নিতে হবে।

(৩) মুক্ত নারীর শাস্তির কথা এখানে বলা হয় নি। অন্যত্র বলে দেয়া হয়েছে যে, ‘ব্যভিচারিনী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর’ [সূরা আন-নূর: ২] সে হিসেবে এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, ব্যভিচারিনী দাসীর শাস্তি হবে পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। কিন্তু ব্যভিচারী দাসের ব্যাপারটি ভিন্ন কোন আয়াতে আসে নি। তাই ব্যাভিচারিনী দাসীর শাস্তি যেভাবে অর্ধেক হয়েছে সেভাবে ব্যভিচারী দাসের ক্ষেত্রেও তেমনি অর্ধেক শাস্তি হবে; কারণ দাসত্বের দিক থেকে উভয়েই সমান। এটাও এক প্রকার কিয়াস। [আদওয়াউল বায়ান] তবে এটা জানা আবশ্যক যে, দাস-দাসীরা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক তাদের কোন ‘রজম’ তথা প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ড বা দেশান্তর নেই। [তাবারী]

ভয় করে এগুলো তাদের জন্য; আর ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য মঙ্গল[১]। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

পঞ্চম রুকূ'

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন তোমাদের কাছে বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে[২]। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

২৭. আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও[৩]।

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ

২৮. আল্লাহ্ তোমাদের ভার কমাতে চান[৪]; আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে

(১) অর্থাৎ দাসী বিয়ে করার চেয়ে ধৈর্যধারণ করা উত্তম। যাতে করে আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাকে সামর্থ দিবে, তখন যেন স্বাধীনা নারী বিয়ে করতে পারে। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মা ও কন্যাদের হারাম হওয়ার ব্যাপারটি বিস্তারিত বর্ণনা করতে চান। আর এটাও জানিয়ে দিতে চান যে, এটা পূর্বে কখনও হালাল ছিল না। সব শরী'আতেই মা ও মেয়ে হারাম ছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অনুরূপভাবে তিনি চান তোমাদেরকে হিদায়াত দিতে বা মিল্লাতে ইবরাহীমীর প্রতি দিকনির্দেশ করতে এবং বর্ণনা আসার পূর্বে তোমাদের কৃত এ জাতীয় গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিতে। [বাগভী]

(৩) আয়াতের অর্থে কাতাদা ও সুদ্দী বলেন, অর্থাৎ যারা ব্যভিচারী বা যারা অন্য মতাদর্শে বিশ্বাসী যেমন, ইয়াহূদী অথবা নাসারা, তারা চায় তোমাদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত করতে, প্রবৃত্তি-পুজারী বানাতে। [তাবারী]

(৪) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে হাল্কা ও সহজ বিধান দিতে চান। তোমাদের অসুবিধা দূর করার জন্য বিয়ের ব্যাপারে এমন সরল বিধান তিনি দিয়েছেন, যা

ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

দুর্বলরূপে[১]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ

২৯. হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি[২] অন্যায়ভাবে[৩] গ্রাস করো না; কিন্তু তোমরা পরস্পর রাযী হয়ে[৪] ব্যবসা করা বৈধ[৫]; এবং নিজেদেরকে

সবাই পালন করতে পার। স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে বাঁদীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন। [তাবারী] অনুরূপভাবে উভয়পক্ষকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মাহ্‌র নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন। এসব কিছুই হাল্কা ও সহজ করার স্বার্থেই করা হয়েছে।

(১) অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মাঝে কাম-বাসনার উপাদানও নিহিত রয়েছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেয়া হত, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ত। তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদেরকে বিয়ে করার শুধু অনুমতি দেয়া হয়নি; বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে আরও বুঝা যায় যে, নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ।

(৩) আয়াতে উল্লেখিত ‘বাতিল’ শব্দটির তরজমা করা হয়েছে ‘অন্যায়ভাবে’। আব্দুল্লাহ্‌ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে শরী‘আতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয সবগুলো পন্থাকেই বাতিল বলা হয়। যেমন, চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাসভঙ্গ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। [বাহরে মুহীত]

(৪) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিক্রির জন্য সন্তুষ্টি অপরিহার্য। [ইবন মাজাহ্‌ঃ ২১৮৫] এ সন্তুষ্টি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেচাকেনার ক্ষেত্রে আরও কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যেমন, “বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে সওদা করার স্থান ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত (সওদা বাতিল করার) সুযোগের অধিকারী থাকবে। তবে– পৃথক হওয়ার পরও এ সুযোগ তাদের জন্য থাকবে–যারা খেয়ার বা সুযোগের অধিকার দেয়ার শর্তে সওদা করবে।” [বুখারী: ২১০৭]

(৫) এর দ্বারা বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ পন্থার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

হত্যা করো না[১]; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

৩০. আর যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, অবশ্যই আমরা তাকে আগুনে পোড়াবো; এসব আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

৩১. তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবীরা গোনাহ্[২] তা থেকে বিরত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো[৩] ক্ষমা করব এবং

স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল ও হারাম। কাতাদা বলেন, ব্যবসা আল্লাহ্র রিযক ও আল্লাহ্র হালালকৃত বিষয়, তবে শর্ত হচ্ছে, এটাকে সত্যবাদিতা ও সততার সাথে পরিচালনা করতে হবে। [তাবারী]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে বলে যে, আমি অন্য কোন ধর্মের উপর। তাহলে সে ঐ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। বনী আদম যার মালিক নয় এমন মানত গ্রহণযোগ্য নয়। যে কেউ দুনিয়াতে নিজেকে কোন কিছু দিয়ে হত্যা করবে, এটা দিয়েই তাকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। যে কোন মুমিনকে লা'নত করল সে যেন তাকে হত্যা করল। অনুরূপভাবে যে কেউ কোন মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দিল, সেও যেন তাকে হত্যা করল। [বুখারীঃ ৬০৪৭, মুসলিমঃ ১৭৬] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে পাহাড় থেকে পড়ার অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে বিষ পানের আযাব ভোগ করতে থাকবে। আর যে কেউ কোন ধারাল কিছু দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে তা দ্বারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। [বুখারীঃ ৫৭৭৮, মুসলিমঃ ১৭৫]

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ এমন প্রত্যেক গোনাহ্ যার পরিণতিতে কুরআন ও হাদীসে জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে অথবা আল্লাহ্র গযবের কথা এসেছে, অথবা লা'নতের কথা অথবা আযাবের কথা এসেছে, তাই কবীরা গোনাহ্। কবীরা গোনাহ্র সংখ্যা অনেক। কেউ কেউ তা সাতশ' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। [তাবারী, ইবন আবী হাতেম]

(৩) উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, পাপ বা গোনাহ দু'রকম। কিছু কবীরা

তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।

৩২. আর যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ﴿۳۲﴾

অর্থাৎ কঠিন ও বড় রকমের পাপ, আর কিছু সগীরা অর্থাৎ হাল্কা ও ছোট পাপ। এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি কেউ সাহস করে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তার সগীরা গোনাহ্গুলো নিজেই ক্ষমা করে দেবেন। যাবতীয় ফরয-ওয়াজিবগুলো সম্পাদন করাও কবীরা গোনাহ্ থেকে বাঁচার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফরয-ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবীরা গোনাহ্। বস্তুতঃ যে লোক ফরয-ওয়াজিবসমূহ পালনের ব্যাপারে যথাযথ অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং যাবতীয় কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ্ স্বয়ং তার সগীরা গোনাহ্সমূহের কাফ্ফারা করে দেবেন। এখানে গোনাহের কাফ্ফারা হওয়ার অর্থ এই যে, কর্তার সৎকর্মসমূহকে সগীরা গোনাহের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেখিয়ে তার হিসাব সমান সমান করে দেয়া হবে। জাহান্নামের পরিবর্তে সে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, 'কোন লোক যখন সালাত আদায়ের জন্য অযু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত হওয়ার সাথে সাথে তার গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলে চোখ, কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। কুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায়; আর পা ধোয়ার সাথে সাথে ধুয়ে যায় পায়ের পাপসমূহ। তারপর যখন সে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফ্ফারা হতে থাকে।' [নাসায়ীঃ ১/১০৩, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৪৯] আলোচ্য আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, অযু, সালাত প্রভৃতি সৎকর্মের মাধ্যমে গোনাহ্র কাফ্ফারা হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ হল সগীরা গোনাহ্। কবীরা গোনাহ্ একমাত্র তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। বস্তুতঃ সগীরা গোনাহ্ মাফের শর্ত হল, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে কেউ আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। সাহাবীগণ কবীরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, মুসলিম কোন আত্মাকে হত্যা করা এবং যুদ্ধের দিনে ময়দান থেকে পলায়ন করা।' [মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১৩]

প্রাপ্য অংশ[১]। আর আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

৩৩. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমরা উত্তরাধিকারী করেছি[২] এবং

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

(১) কুরআনের কোন কোন আয়াত এবং একাধিক হাদীসের বর্ণনায় সৎকর্মে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ অন্যের মধ্যে যে গুণ-গরিমা রয়েছে, তা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ঐ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্টের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে প্রতিযেগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত, যেগুলো চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। যেমন, কারো গভীর জ্ঞান বা চারিত্রিক মহত্ত্ব দেখে তার কাছ থেকে তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। তাই আয়াতের শেষাংশে সেরূপ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষরা যাকিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে এবং নারীরা যাকিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং কর্মে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই পাবে। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি অভিযোগের সুরে বলেছিলেনঃ পুরুষরা যুদ্ধ করে, আমরা মহিলারা যুদ্ধ করতে পারি না তদুপরি আমাদের জন্য মীরাসের অর্ধেক। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৩২২, তিরমিযীঃ ৩০২২] অন্য এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহ্ রাসূল, একজন পুরুষ দুই মহিলার সমান মীরাস পায়, একজন পুরুষের সাক্ষী দুইজন মহিলার সাক্ষীর সমান। আমরা যখন কোন নেক কাজ করব, তখনও কি অর্ধেক সওয়াব হবে? তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন। যাতে বলা হয়েছে যে, এটা আমার ইনসাফ এবং এটা আমিই করেছি। [আল-আহাদীসুল মুখতারাহ্ঃ ১০/১১৬-১১৭, নং- ১১৫]

(২) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ মুহাজেররা যখন মদীনায় হিজরত করে আসত, তখন আনসারদের নিকটাত্মীয়দের বাদ দিয়ে যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন মুহাজেররা তাদের ওয়ারিস হত। তারপর যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়, তখন তা রহিত হয়ে যায়। [বুখারীঃ ২২৯২, ৪৫৮০, ৬৭৪৭]

كَانَ عَلٰى كُلِّ شَیۡءٍ شَهِیۡدًا ﴿۳۳﴾

যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে[১]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।

ষষ্ঠ রুকূ'

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوۡنَ عَلَی النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعۡضَهُمۡ عَلٰی بَعۡضٍ وَّ بِمَاۤ اَنۡفَقُوۡا مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلۡغَیۡبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِیۡ تَخَافُوۡنَ نُشُوۡزَهُنَّ فَعِظُوۡهُنَّ وَ اهۡجُرُوۡهُنَّ

৩৪. পুরুষরা নারীদের কর্তা[২], কারণ আল্লাহ্ তাদের একেকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এজন্যে যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে[৩]। কাজেই পূণ্যশীলা স্ত্রীরা

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যখন 'আর যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে' এ আয়াত নাযিল হয়, তখন কেউ কেউ অপর কারও সাথে বংশীয় কোন সম্পর্ক না থাকা সত্বেও চুক্তিবদ্ধ হতো, এর ফলে একে অপরের ওয়ারিশ হতো। তারপর যখন আল্লাহ্‌র বাণী 'আর আত্মীয়রা আল্লাহ্‌র বিধানে একে অন্যের চেয়ে বেশী হকদার।' [সূরা আল-আনফাল:৭৫; আল-আহযাব:৬] এ আয়াত নাযিল হয়, তখন তাও রহিত হয়ে যায়। [মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৩৪৬; তাবারী]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ ব্যতীত যদি অন্য কাউকে আমি সিজ্‌দা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজ্‌দা করার অনুমতি দিতাম। [তিরমিযীঃ ১১৫৯]

(৩) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বক্তব্য অনুসারে পুরুষ ও নারীদের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, বরং পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ নারীরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই সমতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদার কোন পার্থক্য থাকবে না; বরং দু'টি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে। **প্রথমতঃ** পুরুষকে তার জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারী জাতির উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। দৈবাৎ কিংবা ব্যক্তিবিশেষের কথা স্বতন্ত্র। **দ্বিতীয়তঃ** নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে। মোটকথা: ইসলাম পুরুষকে নারীর নেতা বানিয়েছে। নারীর উপর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তাকে তার স্বামীর যা আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা। আর সে আনুগত্য হচ্ছে, সে স্বামীর পরিবারের প্রতি দয়াবান থাকবে, স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। স্বামীর পক্ষ থেকে খরচ ও কষ্ট করার কারণে আল্লাহ্ স্বামীকে স্ত্রীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। [তাবারী]

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۝٣٤

অনুগতা[১] এবং লোকচক্ষুর আড়ালে আল্লাহ্‌র হেফাযতে তারা হেফাযত করে[২]। আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর[৩]। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না[৪]। নিশ্চয় আল্লাহ্

(১) আরবী ﴿قَٰنِتَٰتٌ﴾ শব্দটির মূল হল قَانِتٌ। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, কুরআনের যেখানেই এ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, সেখানেই অনুগত থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [তাবারী]

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সবচেয়ে উত্তম নারী হল ঐ স্ত্রী যার দিকে তুমি তাকালে তোমাকে সে খুশী করে। তাকে নির্দেশ দিলে আনুগত্য করে। তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাকলে সে তার নিজেকে এবং তোমার সম্পদকে হেফাযত করে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/২৫১, ৪৩২, ৪৩৮, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/১৬১]

(৩) সেসব স্ত্রীলোক, যারা স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। আল্লাহ্ তা'আলা সংশোধনের জন্য পুরুষদেরকে যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছেন। অর্থাৎ স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশংকা দেখা দেয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হল যে, নরমভাবে তাদের বোঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দেবে। যাতে এই পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। তারপর যদি তাতেও সংশোধন না হয়, তবে মৃদুভাবে মারবে, তিরস্কার করবে। আর তার সীমা হল এই যে, শরীরে যেন সে মারধরের প্রতিক্রিয়া কিংবা যখম না হয়। কিন্তু এই পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেননি, বরং তিনি বলেছেনঃ 'ভাল লোক এমন করে না'। [ইবন হিব্বানঃ ৯/৪৯৯, নং- ৪১৮৯, আবু দাউদঃ ২১৪৬, ইবন মাজাহ্ঃ ১৯৮৫] যাইহোক, এ সাধারণ মারধরের মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল।

(৪) পূর্বের আয়াতাংশে যেমন স্ত্রীদের সংশোধনকল্পে পুরুষদেরকে তিনটি অধিকার দান করা হয়েছে, তেমনিভাবে আয়াতের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে যে, যদি এ তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরম্ভ করে, তবে তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষ খোঁজাখুঁজি করো না, বরং কিছু সহনশীলতা অবলম্বন

শ্রেষ্ঠ, মহান ।

৩৫. আর তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর; তারা উভয়ে নিস্পত্তি চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত[১]।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

কর। আর একথা খুব ভাল করে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নারীদের উপর তেমন কোন উচ্চ মর্যাদা দান করেননি। আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব তোমাদের উপরও বিদ্যমান রয়েছে, তোমরা কোন রকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ তোমরাও সহনশীলতার আশ্রয় নাও; সাধারণ কথায় কথায় দোষারোপের পন্থা খুঁজে বেড়িয়ো না। আর জেনে রেখো আল্লাহ্র কুদরত ও ক্ষমতা সবার উপরেই পরিব্যাপ্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে চাকর-বাকরদের মত না মারে, পরে সে দিনের শেষে তার সাথে আবার সহবাস করল। [বুখারীঃ ৫২০৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক আছে? রাসূল বললেনঃ তুমি খেতে পেলে তাকেও খেতে দেবে, তুমি পরিধান করলে তাকেও পরিধেয় বস্ত্র দেবে, তার চেহারায় মারবে না এবং তাকে কুৎসিৎও বানাবে না, তাকে পরিত্যাগ করলেও ঘরের মধ্যেই রাখবে। [আবু দাউদঃ ২১৪২]

(১) উল্লেখিত ব্যবস্থাটি ছিল এ কারণে, যাতে ঘরের ব্যাপার ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িতও হয়ে যায়। তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা কিংবা পুরুষের পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি প্রভৃতি যে কোন কারণেই হোক এমতাবস্থায় ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না; বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সমসাময়িক শাসকবর্গ, উভয় পক্ষের সমর্থক ও পক্ষাবলম্বীদের এবং মুসলিম সংস্থাকে সম্বোধন করে এমন এক পবিত্র পন্থা বাতলে দিয়েছেন, তা হল এই যে, সরকার, উভয় পক্ষের মুরুব্বী-অভিভাবক অথবা মুসলিমদের কোন শক্তিশালী সংস্থা তাদের (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয়ার জন্য দু'জন সালিস নির্ধারণ করে দেবেন। একজন স্বামীর পরিবার থেকে এবং একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। এতদুভয় ক্ষেত্রে সালিস অর্থে حكم (হাকাম) শব্দ প্রয়োগ করে কুরআন নির্বাচিত সালিসদ্বয়ের প্রয়োজনীয় গুণ-বৈশিষ্টের বিষয়টিও

৩৬. আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করো না[১]; এবং পিতা-মাতা[২], আত্মীয়-

وَاعۡبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَيۡـًٔا وَّبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّبِذِى الۡقُرۡبٰى وَالۡيَتٰمٰى

নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এতদুভয়ের মধ্যেই বিবাদ মীমাংসা করার গুণ থাকতে হবে। বলাবাহুল্য, এ গুণটি সে ব্যক্তির মধ্যেই থাকতে পারে, যিনি বিজ্ঞও হবেন এবং তৎসঙ্গে বিশ্বস্ত ও দ্বীনদারও হবেন।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর এবং 'ইবাদাতের বেলায় তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না। মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে তার বাহনে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কি হক? আমি বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক হল, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা। তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো অনেক পথ চলার পর আবার বললেনঃ হে মু'আয ইবন জাবাল! তুমি কি জান, বান্দা যদি এ কাজটি করে তাহলে আল্লাহ্‌র উপর বান্দার কি হক রয়েছে? আমি বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক হল, তাদেরকে শাস্তি না দেয়া। [বুখারীঃ ৬৫০০]

(২) আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাওহীদের পর সমস্ত আপনজন-আত্মীয় ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পিতা-মাতার অধিকার সর্বাগ্রে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় 'ইবাদাত বন্দেগী ও হকসমূহের পর পরই পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত বিবরণ দানের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহ একান্তই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণের দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ্‌র পরে মানুষের প্রতি সর্বাধিক ইহ্‌সান বা অনুগ্রহ থাকে পিতা-মাতার। সাধারণ উপকরণসমূহের মাঝে মানুষের অস্তিত্বের পিছনে পিতা-মাতাই বাহ্যিক কারণ। তাছাড়া জন্ম থেকে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্ত কঠিন ও বন্ধুর পথ ও স্তর রয়েছে, পিতা-মাতাই তাকে সেগুলোতে সাহায্য করেন এবং তার প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের জামানতদার হয়ে থাকেন। সে জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য জায়গায়ও পিতা-মাতার হকসমূহকে তাঁর 'ইবাদাত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ "আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর"। [সূরা লুকমান: ১৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহে যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার সীমাহীন ফযীলত, মর্তবা ও সওয়াবের কথাও উল্লেখ রয়েছে। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।" [তিরমিযী: ১৮৯৯]

وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ

স্বজন[১], ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত[২], নিকট প্রতিবেশী[৩], দুর-প্রতিবেশী[৪],

(১) এখানে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকিদ দেয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমের প্রসিদ্ধ এক আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়শঃই বিভিন্ন ভাষণের পর তেলাওয়াত করতেন। তা হলো, "আল্লাহ্ সবার সাথে ন্যায় ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার জন্য"। [সূরা আন-নাহল:৯০] এতে সামর্থ্যানুযায়ী আত্মীয়-আপনজনদের কায়িক ও আর্থিক সেবা-যত্ন করা, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাদের খবরা-খবর নেয়াও অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সদকার মাল সাধারণ গরীব-মিসকীনকে দান করলে তাতে তো শুধু সদকার সওয়াবই পাওয়া যায়, অথচ তা যদি নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-আপনজনকে দান করা হয়, তাহলে তাতে দু'টি সওয়াব পাওয়া যায়। একটি হল সদকার সওয়াব এবং আরেকটি হল সেলায়ে-রেহ্মীর সওয়াব। [মুসনাদে আহমাদ ৪/২১৪, নাসায়ী: ২৫৮২] অর্থাৎ আত্মীয়তার হক আদায় করার সওয়াব।

(২) অর্থাৎ লাওয়ারিশ তথা অনাথ শিশু এবং অসহায় মানুষের সাহায্য-সহযোগিতাও এমনি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিবেচনা করবে, যেমন আত্মীয়-আপনজনদের বেলায় করে থাক।

(৩) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবু যর, যখন তরকারী রান্না করবে তখন তাতে বেশী পরিমাণে পানি দিও এবং এর দ্বারা তোমার পড়শীর খোঁজ-খবর নিও। [মুসলিমঃ ২৬২৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার পড়শীর সম্মান করে, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে সে যেন তার মেহমানের পুরস্কার দিয়ে তাকে সম্মানিত করে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, মেহমানের পুরস্কার কি? তিনি বললেন, একদিন ও রাত্রি। আর মেহমান তিন দিন এর পরের যা সময় তাতে ব্যয় করা সদকাস্বরূপ। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও শেষ দিনে উপর ঈমান আনে সে যেন ভাল বলে অথবা চুপ থাকে। [বুখারী: ৬০১৯] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম সংগী হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংগীগণ। আর আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম পড়শী হচ্ছেন ঐ পড়শী, যে তার পড়শীর জন্য উত্তম। [তিরমিযী: ১৯৪৪]

(৪) এ আয়াতে দু'রকমের প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। এ উভয় প্রকার প্রতিবেশীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, جَارِ ذِي الْقُرْبٰى বলতে সেসব প্রতিবেশীকে বোঝায়, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়ও বটে। এভাবে এতে দু'টি হক সমন্বিত হয়ে যায়। আর ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ বলতে শুধু সে প্রতিবেশীকে বোঝায় যার সাথে আত্মীয়তার

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ

সঙ্গী-সাথী(১), মুসাফির(২) ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের(৩) প্রতি

সম্পর্ক নেই। আর সে জন্যই তার উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে। [তাবারী] কোন কোন মনীষী বলেছেন, 'জারে-যিলকোরবা' এমন প্রতিবেশীকে বলা হয়, যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলিম। আর 'জারে-জুনুব' বলা হয় অমুসলিম প্রতিবেশীকে। কুরআনে ব্যবহৃত শব্দে অবশ্য এ সমুদয় সম্ভাব্যতাই বিদ্যমান। অবশ্য প্রতিবেশী হওয়া ছাড়াও যার অন্যান্য হক রয়েছে, অন্যান্য প্রতিবেশীদের তুলনায় তাকে মর্যাদাগত অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(১) যদিও এর শাব্দিক অর্থ হল সহকর্মী। এতে সেসব সফর সঙ্গীরাও অন্তর্ভুক্ত যারা রেল, জাহাজ, বাস, মোটর প্রভৃতিতে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করে এবং সে সমস্ত লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা কোন সাধারণ বা বিশেষ বৈঠক বা অধিবেশনে আপনার সাথে উপবেশন করে থাকে। ইসলামী শরী'আত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থায়ী প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষণকে যেমন ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনিভাবে সে ব্যক্তির সাহচর্যের অধিকার বা হককেও অপরিহার্য করে দিয়েছে, যে সামান্য সময়ের জন্য হলেও কোন মজলিস, বৈঠক অথবা সফরের সময় আপনার সমপর্যায়ে উপবেশন করে। তাদের মধ্যে মুসলিম, অমুসলিম, আত্মীয়, অনাত্মীয় সবাই সমান - সবার সাথেই সদ্ব্যবহার করার হেদায়াত করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে এই যে, আপনার কোন কথায় বা কাজে যেন সে কোন রকম কষ্ট না পায়। এমন কোন কথা বলবেন না, যাতে সে মর্মাহত হতে পারে। এমন কোন আচরণ করবেন না, যাতে তার কষ্ট হতে পারে। যেমন, ধুমপান করে তার দিকে ধোঁয়া ছাড়া, পান খেয়ে তার দিকে পিক ফেলা এবং এমনভাবে বসা যাতে তার বসার জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় প্রভৃতি। যানবাহনে অন্য কোন যাত্রী পাশে বসতে গেলে এ কথা ভাবা উচিত যে, এখানে তার ততটুকুই অধিকার রয়েছে যতটা রয়েছে আমার। কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, এমন প্রতিটি লোকই 'সাহেবে-বিল-জাম্ব'-এর অন্তর্ভুক্ত যে কোন কাজে, কোন পেশায় বা কোন বিষয়ে আপনার সাথে জড়িত বা আপনার অংশীদার; তা শিল্প-শ্রমেই হোক অথবা অফিস-আদালতের চাকরিতেই হোক অথবা কোন সফরে বা স্থায়ী বসবাসেই হোক। [রুহুল মা'আনী]

(২) আয়াতে এমন লোককে বোঝানো হয়েছে যে সফরের অবস্থায় আপনার নিকট এসে উপস্থিত হয় কিংবা আপনার মেহমান হয়ে যায়। যেহেতু এই অজানা-অচেনা লোকটির কোন আত্মীয় বা সম্পর্কীয় লোক এখানে উপস্থিত থাকে না, সেহেতু কুরআন ইসলামী তথা মানবীয় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার হকও আপনার উপর অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে। তা হল, সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী তার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

(৩) এতে অধিকারভুক্ত দাস-দাসীকে বোঝানো হয়েছে। তাদের ব্যাপারেও এ হক সাব্যস্ত ও অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী তাদের খাওয়া পরার ব্যাপারে কার্পণ্য করবে না। তাছাড়া তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত

أَيۡمَـٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ۝٣٦

সদ্ব্যবহার করো । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে(১) ।

কোন কাজ তাদের দ্বারা করাবে না । এখানে আয়াতের বাক্যগুলো যদিও সরাসরিভাবে অধিকারভুক্ত দাস-দাসীকেই বোঝাচ্ছে, কিন্তু কারণ-উপকরণের সামঞ্জস্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন বক্তব্যের ভিত্তিতে আলোচ্য নির্দেশ ও বিধি-বিধান দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী ও অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য । তাদের হকও একই রকম । নির্ধারিত বেতন-ভাতা, খানাপিনা প্রভৃতির ব্যাপারে কার্পণ্য বা বিলম্ব করা যাবে না এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজও চাপানো যাবে না । যদি শরী‘আত মত তাদেরকে পরিচালনা করা হয় তবে তাদের যাবতীয় খরচও সদকার অন্তর্ভুক্ত । এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তুমি নিজে যা খাও তা তোমার জন্য সদকা এবং যা তোমার ছেলেকে খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদকা, যা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদকা । অনুরূপভাবে যা তোমার খাদেমকে খাওয়াও সেটাও তোমার জন্য সদকা হিসাবে গণ্য হবে । [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৩১] অপর বর্ণনায় এসেছে, মা‘রূর ইবন সা‘য়ীদ বলেন, আমি আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গায়ে একটি চাদর দেখলাম, অনুরূপ আরেকটি চাদর তার দাসের গায়ে দেখলাম । এ ব্যাপারে আমরা আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একদিন এক লোককে গালি দিয়েছিলাম । সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে গালি দিলে রাসূল আমাকে বললেন, তুমি কি তাকে তার মায়ের ব্যাপার উল্লেখ করে অপমান করলে? তারপর তিনি বললেন, “এরা তোমাদের ভাই, তোমাদের অনুগামী । আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে তোমাদের কর্তৃত্বাধীন করেছেন । অতএব যার কোন ভাই তার কর্তৃত্বাধীন থাকে, তবে সে যা খায় তা থেকে যেন তাকে খাওয়ায়, যা পরিধান করে তা থেকে যেন তাকে পরিধান করায় । তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব তাদেরকে দিবে না, যদি সাধ্যের অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব দাও তবে তাদেরকে সাহায্য কর ।” [বুখারী: ২৫৪৫; মুসলিম: ১৬৬২]

(১) আল্লাহ্ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে দাম্ভিক এবং নিজেকে অন্যের চাইতে বড় প্রতিপন্ন করে । আয়াতের এই শেষ বাক্যটি পূর্ববর্তী সমস্ত বক্তব্যের উপসংহার । কারণ, পূর্ববর্তী আটটি পর্যায়ে যে সমস্ত লোকের হক সম্পর্কে তাকীদ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সে সমস্ত লোকই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মন-মানসিকতায় আত্মগর্ব, অহমিকা, তাকাব্বুর ও দাম্ভিকতা বিদ্যমান । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে ওসীয়ত করে বলেছেনঃ ‘কাউকে গালি দিও না । সাহাবী বললেনঃ এরপর আমি কোন স্বাধীন, দাস, উট বা ছাগল কাউকেই গালি দেইনি । তিনি আরো বললেনঃ সামান্য কোন নেক কাজকেও হেয় করে দেখবে না যদিও তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলা হোক । আর তোমার কাপড়কে টাখনুর অর্ধেক পর্যন্ত উঠাবে, যদি তা করতে না চাও তবে দুই গিরা পর্যন্ত নামাতে পার ।

৩৭. যারা কৃপণতা করে[১] এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে। আর আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি[২]।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٣٧﴾

কাপড়কে ‘ইসবাল’ বা গিরার নীচে পরা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ কর। কেননা, এটাই অহংকারের চিহ্ন। আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারীকে পছন্দ করেন না। যদি কোন লোক তোমাকে গালি দেয় অথবা তোমার কোন ত্রুটি জানতে পেরে তা নিয়ে উপহাস করে, তুমি তার সেরকম কিছু জেনেও তাকে উপহাস করো না। কারণ, এর প্রতিফল তাকেই ভোগ করতে হবে। [আবু দাউদঃ ৪০৮৪, তিরমিযীঃ ২৭২২]

(১) এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত লোক দাম্ভিক তারা ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য করে। নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে না এবং অন্যান্য লোককেও নিজের অশোভন কথা এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে এ ধরনের মন্দ অভ্যাস অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করে। আয়াতে যে بخل শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, প্রচলিত অর্থে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে সাধারণতঃ অর্থ সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার বা হক আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে। কিন্তু আয়াতের শানে-নুযুল পর্যালোচনা করতে গেলে বোঝা যায়, এখানে بخل বা কার্পণ্য শব্দটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান ও অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্পণ্যই অন্তর্ভুক্ত। দান-খয়রাতের ফযীলত এবং কার্পণ্যে ক্ষতি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘প্রতিদিন ভোর বেলায় দু’জন ফিরিশ্‌তা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্! সৎপথে ব্যয়কারীদেরকে শুভ প্রতিদান দান করুন। আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ্! কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দিন।’ [বুখারীঃ ১৪৪২] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক, কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এ কৃপণতাই ধ্বংস করেছে। তাদেরকে তাদের কার্পণ্য নির্দেশ দিয়েছে কৃপণতা করার, ফলে তারা কৃপণতা করেছে, অনুরূপভাবে তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে ফলে তারা তা ছিন্ন করেছে এবং তাদেরকে অশ্লীলতার নির্দেশ দিয়েছে ফলে তারা অশ্লীল কাজ করেছে। [আবু দাউদঃ ১৬৯৮]

(২) অর্থাৎ তারা কাফির। আর আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাদের শাস্তি অবধারিত। মুজাহিদ বলেন, এ আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতগুলোয় ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কারণ তারা এ কাজগুলো করত। [তাবারী] এরপর যাদের মধ্যেই উপর্যুক্ত খারাপ গুণাগুণ পাওয়া যাবে, তারাও আল্লাহ্‌র কাছে মন্দ বলে বিবেচিত হবে।

৩৮. আর যারা মানুষকে দেখাবার জন্য[১] তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না। আর শয়তান কারো সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ[২]!

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾

৩৯. তারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করলে তাদের কি ক্ষতি হত? আর আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾

৪০. নিশ্চয় আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না[৩]। আর কোন পূণ্য কাজ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً

(১) এর দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শির্ক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করল সে শির্ক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করল সে শির্ক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-সদকা করল সে শির্ক করল'। [মুসনাদে ত্বায়ালেসীঃ ১১২০, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪/৩৬৫]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভালবাসেন না। অথবা যারা উপর্যুক্ত কাজগুলো করবে, শয়তান তাদের সাথী হবে। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা পায় না তারা শয়তানের সঙ্গী হবে এটাই স্বাভাবিক। যারা শয়তানের সঙ্গী হবে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সংগীই পেল।

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কারও সৎকর্মের সওয়াব এবং অশুভ প্রতিদানের বেলায় বিন্দু-বিসর্গও অন্যায় ও যুলুম করেন না। বরং নিজের পক্ষ থেকে এতে অধিকতর বৃদ্ধি করে দেন এবং আখেরাতে এগুলোকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তার সওয়াব দান করবেন এবং নিজের পক্ষ থেকেও দেবেন মহান দান। আল্লাহ্ তা'আলা হলেন মহাদাতা। তিনি তাঁর অসীম রহমতে (সৎ কাজের বিনিময়) এমনভাবে বাড়িয়ে দেন, যা কোন হিসাব বা সীমা-পরিসীমায় আসে না। প্রতিটি ভাল কাজ মীযানে পরিমাপ হবে। আল্লাহ্ বলেন, "আর কেয়ামতের দিনে আমরা ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন

يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝٤٠

হলে আল্লাহ্ সেটাকে বহুগুণ বর্ধিত করেন[১] এবং আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন[২]।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ

৪১. অতঃপর যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব[৩]

করব, সুতরাং কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না” [সূরা আল-আম্বিয়া: ৪৭] অনুরূপভাবে লুকমানের ওসিয়ত বর্ণনায় আল্লাহ্ বলেন, “হে প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে শিলাগর্ভে অথবা আসমানসমূহে কিংবা যমীনে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন” [সূরা লুকমান: ১৬] অন্য সূরায় আল্লাহ্ বলেন, “সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান যায়, কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবে” [সূরা আয-যালযালাহ:৬-৮]

(১) এ আয়াতে কতগুণ বর্ধিত হবে, তার সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করে বলা হয় নি। পক্ষান্তরে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সর্বনিম্ন বর্ধিতের পরিমাণ হচ্ছে, দশগুণ। আল্লাহ্ বলেন, ‘যে কেউ কোন সৎকাজ করল, তার জন্য রইল সেটার অনুরূপ দশগুণ’ [সূরা আল-আন‘আম: ১৬০] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বহুগুণ বর্ধিত হওয়ার ব্যাপারে আরও বলেছেন যে, তা কখনও কখনও সত্তর গুণেরও বেশী হয়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন, ‘যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন।’ [সূরা আল-বাকারাহ: ২৬১] এর অর্থ হচ্ছে, সাতশ গুণ হওয়াতেই এ বর্ধিতকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ নয়, বরং কখনও কখনও আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার থেকে বেশী বৃদ্ধি করে থাকেন। [আদওয়াউল বায়ান] মোটকথা: আল্লাহ্ তা‘আলার দরবার থেকে যে কি মহাদান হতে পারে, তা কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে চলে যতটুকু সম্ভব সৎ কর্মের মাধ্যমে তাঁর রহমতের অধিকারী হওয়ার প্রচেষ্টা চালানোই হবে মুমিন জীবনের প্রধান কাজ।

(২) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা‘আলা কারও কারও জন্য সামান্য আমলকেও নিজের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে তার নাজাতের অসীলা বানিয়ে দিবেন। শাফা‘আতের বিখ্যাত হাদীসে এসেছে, “অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলবেন, তোমরা যাও এবং যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান আছে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে নাও। তখন তারা যাদের সম্পর্কে জানতে পারবে তাদেরকে বের করে আনবেন।” বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু উপরোক্ত আয়াতটি পড়ার জন্য বললেন। [বুখারী: ৭৪৩৯]

(৩) এখানে আখেরাতের ময়দানের দৃশ্যকে সামনে উপস্থিত করার প্রতি লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে। এতে মক্কাবাসী কাফেরদের ভীতি প্রদর্শনও উদ্দেশ্য বটে। তাদের

عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾

এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কি অবস্থা হবে[১]?

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

৪২. যারা কুফরী করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন কামনা করবে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত[২]! আর তারা আল্লাহ্ হতে কোন

কি অবস্থা হবে, যখন হাশরের ময়দানে প্রত্যেক উম্মতের নবীগণকে নিজ নিজ উম্মতের পাপ-পুণ্য ও সৎ-অসৎ আমলের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করা হবে এবং যখন আপনিও নিজের উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আর বিশেষ করে সেই কাফের-মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র আদালতে সাক্ষ্য দান করবেন যে, তারা প্রকাশ্য সব মু'জিযা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও মিথ্যারোপ করেছে এবং আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও আমার রেসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করে নি। হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমাকে কুরআন শোনাও। আব্দুল্লাহ্ বললেন, আপনি কি আমার কাছ থেকে শুনতে চান, অথচ কুরআন আপনার উপরই নাযিল হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ পড়। আব্দুল্লাহ্ বললেন, অতঃপর আমি সূরা আন্-নিসা পড়তে আরম্ভ করলাম। তারপর এ আয়াত অর্থাৎ ﴿فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ﴾ পর্যন্ত পৌঁছার পর তিনি বললেন, এবার থাম। তারপর যখন আমি তার দিকে চোখ তুলে তাকালাম, দেখলাম, তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। [মুসলিমঃ ৮০০]

(১) কোন কোন মনীষী বলেছেন, هٰؤُلَاءِ এর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে উপস্থিত কাফের মুনাফেকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার অনেকের মতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা উম্মতের প্রতিই এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাই হোক, এতে বোঝা গেল যে, বিগত উম্মতসমূহের নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবেন এবং স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও স্বীয় উম্মতের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দান করবেন। কুরআনুল কারীমের এই বর্ণনারীতির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না, যিনি স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষ্য দান করতে পারেন। অন্যথায় কুরআনুল কারীমে তাঁর (অর্থাৎ সে নবীর এবং তাঁর সাক্ষ্যদানের) বিষয়ও উল্লেখ থাকত। এ হিসেবে উক্ত আয়াতটি খতমে নবুওয়াতেরও একটি প্রমাণ।

(২) এ আয়াতে হাশরের মাঠে কাফেরদের দূরাবস্থার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এরা কিয়ামতের দিন কামনা করবে যে, হায়! আমরা যদি ভূমির সাথে মিশে যেতাম, ভূমি যদি দ্বিধা হয়ে যেত আর আমরা তাতে ঢুকে গিয়ে মাটি হয়ে যেতাম এবং এখানকার জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাব-নিকাশ থেকে যদি অব্যাহতি লাভ করতে পারতাম। হাশরের

কথাই গোপন করতে পারবে না[১]।

৪৩. হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায়[২] | يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ

ময়দানে কাফেররা যখন দেখবে, সমস্ত জীব-জন্তু একে অপরের কাছ থেকে কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার পর মাটিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের আক্ষেপ হবে এবং কামনা করবে - হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম! যেমন অন্য সূরায় বলা হয়েছে "আর কাফেররা বলবে, কতই না উত্তম হত যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম।" [সূরা আন-নাবা: ৪০]

(১) অর্থাৎ এই কাফেররা নিজেদের বিশ্বাস ও কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুই গোপন রাখতে পারবে না। তাদের হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে, নবী-রাসূলগণ সাক্ষ্য দান করবেন এবং আমলনামাসমূহেও সবকিছু বিধৃত থাকবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'কাফেররা কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তারা কছম খেয়ে খেয়ে বলবে ﴿وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشۡرِكِينَ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র কছম আমরা শির্ক করিনি।" [সূরা আল-আন'আমঃ ২৩] বাহ্যতঃ এ দু'টি আয়াতের মধ্যে যে বৈপরীত্য দেখা যায় তার কারণ কি? তখন ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা উত্তরে বললেন, ব্যাপারটি এমন হবে যে, যখন প্রথমে কাফেররা লক্ষ্য করবে শুধুমাত্র মুসলিম ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে না, তখন তারা একথা স্থির করে নেবে যে, আমাদেরকেও নিজেদের শির্ক ও অসৎকর্মের বিষয় অস্বীকার করা উচিত। হয়ত আমরা এভাবে মুক্তি পেয়েও যেতে পারি। কিন্তু এ অস্বীকৃতির পর স্বয়ং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করবে এবং গোপন করার যে মতলব তারা স্থির করেছিল, তাতে সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য হয়ে পড়বে এবং তখন সবই স্বীকার করে নেবে। এজন্যই বলা হয়েছে ﴿وَلَا يَكۡتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثٗا﴾ 'কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না'। যদি কেউ ভাল কাজ করে তাও সে বলবে, এক হাদীসে এসেছে হাশরের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করবেন যাকে তিনি সম্পদ দিয়েছিলেনঃ 'দুনিয়াতে তুমি কি কাজ করেছ? তখন সে কোন কথাই গোপন করবে না। সে বলবেঃ হে আমার রব, আপনি আমাকে সম্পদ দিয়েছেন, আমি মানুষের সাথে বেচা-কেনা করতাম। আমার স্বভাব ছিল মানুষকে ছাড় দেয়ার। আমি ধনীদের সাথে সহজ ব্যবহার করতাম আর দরিদ্রদেরকে সময় দিতাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ 'আমি এটা করার জন্য তোমার চেয়েও বেশী উপযুক্ত। আমার বান্দাকে তোমরা ছাড় দাও।' [মুসলিমঃ ১৫৬০]

(২) আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন ইসলামী শরী'আতকে একটি বৈশিষ্ট্য এই দান করেছেন যে, এর প্রতিটি বিধি-বিধানকে তিনি সরল ও সহজ করেছেন। তারই এক বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন যাদের মন-মানসকে একান্ত নিষ্পাপ করে তৈরী করেছিলেন এমন বিশেষ বিশেষ কিছু লোক ছাড়া মদ্যপান ছিল সমগ্র

سُكْرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا
اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ
مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً

তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার[১] এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা গোসল

আরববাসীর পুরাতন অভ্যাস। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকেরা কখনো এই দুষ্ট বস্তুর ধারে কাছেও যেতেন না। যেমন, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও কখনো মদ স্পর্শ করেননি। এছাড়া বলতে গেলে সমগ্র জাতিই ছিল এ বদ অভ্যাসে লিপ্ত। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কোন বস্তু একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মদ্যপান কিংবা অন্যান্য নেশাজনিত অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে কাবু করে বসে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসাকে সে মৃত্যুর শামিল মনে করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মদ্যপান ও নেশা করা ছিল হারাম। বিশেষতঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলিমদেরকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা করা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায়। কিন্তু সহসা একে হারাম করে দেয়া হলে, মানুষের পক্ষে এ নির্দেশ পালন করা একান্তই কঠিন হত। কাজেই প্রথমে এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল এবং এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কীকরণের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিস্ককে একে পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হল। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শুধুমাত্র এ হুকুমই দেয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের ধারে কাছেও যেও না। যার মর্ম ছিল এই যে, সালাতের সময় সালাতের প্রতি মনোনিবেশ করা ফরয। এ সময় মদ্যপান করা যাবে না। এতে মুসলিমগণ উপলব্ধি করলেন যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা মানুষকে সালাতে বাধা দান করে। কাজেই দেখা গেল অনেকে এ নির্দেশ আসার সাথে সাথেই মদ্যপান পরিহার করলেন এবং অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত সূরা আল-মায়েদার আয়াতে মদের অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ নাযিল হল এবং যে কোন অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল।

(১) আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মদ হারাম হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে এক আনসার দাওয়াত দিল। দাওয়াত শেষে আব্দুর রহমান ইবন আউফ এগিয়ে গিয়ে মাগরিবের সালাতের ইমামতি করলেন। তিনি সূরা আল-কাফেরূন তেলাওয়াত করতে গিয়ে এলোমেলো করে ফেললেন। ফলে এ আয়াত নাযিল হয় যাতে মদ খাওয়ার পর বিবেকের সুস্থতা না ফেরা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। [আল-আহাদীসুল মুখতারাহ্ঃ ২/১৮৮ নং- ৫৬৭, অনুরূপ ২/১৮৭ নং-৫৬৬; আবু দাউদঃ ৩৬৭১; তিরমিযী: ৩০২৬]

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

কর[১]। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা নারী সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম কর[২] সুতরাং মাসেহ কর তোমরা তোমাদের চেহারা ও হাত, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

(১) অপবিত্র অবস্থা থেকে গোসল করার নিয়ম বর্ণনায় হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে দু হাত ধুয়ে নিতেন। তারপর সালাতের অজুর মত অজু করতেন। তারপর পানিতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে তা দিয়ে মাথার চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতেন। তারপর তার মাথায় তিন ক্রোশ পানি দিতেন এবং সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন। [বুখারীঃ ২৪৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পা ধোয়া ব্যতীত সালাতের অজুর মত অজু করলেন, তার লজ্জাস্থান ধৌত করলেন, যে সমস্ত ময়লা লেগেছিল তাও ধৌত করলেন, তারপর তার নিজের শরীরে পানি প্রবাহিত করলেন। তারপর দু' পা সরিয়ে নিয়ে ধৌত করলেন। এটাই ছিল তার অপবিত্রতা থেকে গোসল করার পদ্ধতি। [বুখারীঃ ২৪৯]

(২) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, এক সফরে তিনি তার বোন আসমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে একটি হার ধার করে নিয়েছিলেন। তিনি সেটা হারিয়ে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা খুঁজতে এক ব্যক্তিকে পাঠান এবং তিনি তা খুঁজে পান। ইত্যবসরে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়, কিন্তু তাদের নিকট পানি ছিল না। লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করল। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। উসাইদ ইবনে হোদাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বলেন, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। যখনি কোন অপছন্দনীয় ব্যাপার আপনার উপর ঘটে গেছে, তখনি তা আপনার এবং উম্মতে মুসলিমার জন্য কল্যাণের কারণ হয়েছে। [বুখারীঃ ৩৩৬, মুসলিমঃ ৩৬৭]

মূলতঃ তায়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার- যা এ উম্মতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'আলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি অযু-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ। বলাবাহুল্য, ভূমি ও মাটি সর্বত্রই বিদ্যমান। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীকেই দান করা হয়েছে।

৪৪. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল? তারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করে এবং তোমরাও পথভ্রষ্ট হও- এটাই তারা চায়(১)।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾

৪৫. আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবে জানেন। আর অভিভাবকত্বে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যেও আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৬. ইয়াহূদীদের মধ্যে কিছু লোক কথাগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে(২) এবং বলে, 'শুনলাম ও অমান্য করলাম' এবং শোনে না শোনার মত; আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্ল করে বলে,

مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইয়াহূদী নাসরারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ঈমানদারদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে চায়। অন্য আয়াতে তাদের সংখ্যা অনেক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, তারা মুসলিমদের মুর্তাদ হয়ে যাওয়া কামনা করে। আরও বলা হয়েছে যে, তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও কেবলমাত্র হিংসার বশবর্তী হয়েই তারা এটা করে থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "কিতাবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ (তারা এটা করে থাকে)।"[সূরা আল-বাকারাহ: ১০৯] আরও বলেন, "কিতাবীদের একদল চায় যেন তোমাদেরকে বিপথগামী করতে পারে, অথচ তারা নিজেদেরকেই বিপথগামী করে। আর তারা উপলব্ধি করে না।" [সূরা আলে-ইমরান: ৬৯] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ইয়াহূদীদের নেতাদের মধ্যে রিফা'আ ইবন যায়েদ যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কথা বলত, তখন সে তার জিহ্বা ঘুরিয়ে বলত: হে মুহাম্মাদ! তুমি ভাল করে আমাদেরকে শোনাও যাতে আমরা বুঝতে পারি। তারপর সে ইসলামের দোষ-ত্রুটি খুজে বেড়াত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ ইয়াহূদীরা তাওরাতে বর্ণিত আল্লাহ্র হুদুদসমূহ বিকৃত করত। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

'রাইনা'(১)। কিন্তু তারা যদি বলত, 'শুনলাম ও মান্য করলাম এবং শুনুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন', তবে তা তাদের জন্য ভাল ও সঙ্গত হত। কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন। ফলে তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

৪৭. হে কিতাবপ্রাপ্তগণ, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে আমরা যা নাযিল করেছি তাতে তোমরা ঈমান আন(২), আমরা মুখমণ্ডলগুলোকে বিকৃত করে তারপর সেগুলোকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার আগে(৩) অথবা আস্হাবুস্ সাব্তকে যেরূপ লা'নত করেছিলাম(৪) সেরূপ তাদেরকে

(১) সূরা আল-বাকারাহ এর ১০৪ নং আয়াতে এ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মূলতঃ বাক্যটি দ্ব্যর্থবোধক। তারা এটাকে খারাপ অর্থে ব্যবহার করত।

(২) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একদল ইয়াহূদী সর্দার যেমন আব্দুল্লাহ ইবন সুওরিয়া, কা'ব ইবন আসওয়াদ প্রমুখদের সাথে কথোপকথন চলার সময় বলেছিলেন, হে ইয়াহূদীরা তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং ঈমান আন। আল্লাহ্র শপথ, তোমরা জান যে, আমি যা নিয়ে এসেছি তা বাস্তবিকই হক। তখন তারা বলল, মুহাম্মাদ! আমরা তা জানি না। তারা যা জানত তা অস্বীকার করল এবং কুফরীতে বহাল রইলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [তাবারী]

(৩) ঘুরিয়ে দেয়া বা উল্টে দেয়ার মধ্যে দু'টি সম্ভাবনাই থাকতে পারে। মুখমণ্ডলের আকার অবয়ব মুছে দিয়ে গোটা চেহারাকে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়ে দেয়াও হতে পারে, আবার মুখমণ্ডলকে গর্দানের মত সমান্তরাল করে দেয়াও হতে পারে। অর্থাৎ মুখমণ্ডলকে গর্দানের দিকে উল্টে না দিয়ে বরং গর্দানের মত পরিস্কার ও সমান্তরাল করে দেয়া। [রুহুল মা'আনী] তবে মুজাহিদ বলেন, এখানে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ, হক পথ থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করে দেয়া যাতে তারা পশ্চাতে ফেলে আসা ভ্রষ্ট পথেই ফিরে যায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) 'আসহাবুস সাবত' অর্থ শনিবারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ। আল্লাহ্ তা'আলা

লা'নত করার আগে। আর আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

৪৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক[১] করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন[২]। আর যে-ই আল্লাহ্‌র সাথে

ইয়াহূদীদেরকে শনিবারে মাছ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা সে নির্দেশকে হীলা-বাহানা করে অমান্য করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বানরে রূপান্তরিত করেছিলেন।[দেখুন, সূরা আল-বাকারাহ: ৬৫] তা ছিল নিঃসন্দেহে অভিশাপ। এ আয়াতে সে ধরনের অভিশাপের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে।[তাবারী]

(১) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যেসব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, যে কোন সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে তেমন কোন বিশ্বাস পোষণ করাই হল শির্ক। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সৃষ্ট বস্তুকে 'ইবাদাত কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ্‌র সমতুল্য মনে করাই শির্ক। জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা যে উক্তি করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তা উল্লেখ করেছেন যে, "আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম।" [সূরা আশ-শু'আরাঃ ৯৭-৯৮] শির্কের প্রকারভেদ সম্পর্কে সূরা আল-বাকারাহ এর ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, যুলুম ও অবিচার তিন প্রকার। এক প্রকার যুলুম যা আল্লাহ্ তা'আলা কখনো ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার যুলুম যা মাফ হতে পারে। আর তৃতীয় প্রকার যুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ্ তা'আলা না নিয়ে ছাড়বেন না। প্রথম প্রকার যুলুম হচ্ছে শির্ক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহ্‌র হকে ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা।[ইবন কাসীর] এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর বাইরে যত গোনাহ আছে সবই তিনি যার জন্যে ইচ্ছে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে সে অবশ্যই এক বড় মিথ্যা অপবাদ রটনা করল। অন্য আয়াতে অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা শির্ককারীদের মধ্যে যারা তাওবা করবে তাদেরকে ক্ষমা করার কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না, ...তবে যদি তারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে"[সূরা আল-ফুরকান:৭০] সুতরাং তাওবাহ করলে শির্কও মাফ হয়ে যায়।

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ আমরা কবীরা গোনাহ্‌কারীর জন্য ইস্তেগফার করা থেকে বিরত থাকতাম। শেষ পর্যন্ত যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ আয়াত শুনলাম এবং আরো শুনলাম যে, তিনি বলছেনঃ 'আমি আমার দো'আকে গচ্ছিত রেখেছি আমার উম্মতের কবীরা গোনাহ্‌গারদের

শরীক করে, সে এক মহাপাপ রটনা করে।

৪৯. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে পবিত্র করেন[১]।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾

সুপারিশ করার জন্য। ইবন উমর বলেনঃ এরপর আমাদের অন্তরে যা ছিল, তা অনেকটা কেটে গেল ফলে আমরা ইস্তেগফার করতে থাকলাম ও আশা করতে থাকলাম। [মুসনাদে আবি ইয়া'লাঃ ৫৮১৩]

(১) আয়াতের ভাষ্য হচ্ছে, নিজেকে কেউ যেন দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে মনে না করে। মূলতঃ আত্মপ্রশংসা এবং নিজেকে ত্রুটিমুক্ত মনে করা বৈধ নয়। ইয়াহূদীরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে বর্ণনা করত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলেছেন, তাদের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখুন, যারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে; তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হওয়াই উচিত। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কারো পক্ষে নিজের কিংবা অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করা জায়েয নয়। এই নিষিদ্ধতার কয়েকটি কারণ রয়েছে-

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে অহমিকা বা আত্মগর্ব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর প্রশংসা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তা হচ্ছে জবাই করা।' [ইবন মাজাহ্ঃ ৩৭৪৩] কাতাদা বলেন, এখানে ইয়াহূদীদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের প্রশংসায় কোন প্রকার কসুর করত না। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র সন্তান-সন্ততি ও তাঁর প্রিয়পাত্র বলে দাবী করত। [তাবারী]

দ্বিতীয়তঃ শেষ পরিণতি সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত যে, তা পবিত্রতা কিংবা পরহেযগারীর মধ্যেই হবে কিনা। কাজেই নিজে নিজেকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা তাকওয়ার পরিপন্থি। এক বর্ণনায় এসেছে, সালমা বিনতে যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা তার মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তখন যেহেতু আমার নাম ছিল بَرَّة (বার্‌রাহ্ বা পাপমুক্ত), কাজেই আমি তাই বললাম। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে পাপমুক্ত বলে বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র। অতঃপর বার্‌রাহ্ নামটি পাল্টিয়ে তিনি যয়নব রেখে দিলেন।' [বুখারীঃ ৫৮৩৯, মুসলিমঃ ২১৪১]

নিষিদ্ধতার আরো এক কারণ এই যে, অধিকাংশ সময় এ ধরনের দাবী করতে গিয়ে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে, সে লোক আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এজন্য প্রিয় যে, সে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। অথচ কথাটি সর্বৈব

আর তাদের উপর সূতা পরিমাণও যুলুম করা হবে না ।

৫০. দেখুন! তারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা উদ্ভাবন করে; আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটাই যথেষ্ট ।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۗ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝٥٠

অষ্টম রুকূ’

৫১. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল, তারা জিব্‌ত ও তাগূতে বিশ্বাস করে(১)? তারা কাফেরদের

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ

মিথ্যা । কারণ, মানুষের মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে ।

নিষিদ্ধতার আরেক কারণ হল, মানুষ জানে না তার কৃত আমল আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হচ্ছে কিনা । কেননা, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘যখন ﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ﴾ ‘আর যারা তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা দেয় এমতাবস্থায় যে, তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত এজন্যে যে তারা তাদের রব এর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে ।’[সূরা আল-মু’মিনূনঃ ৬০] এ আয়াত নাযিল হল, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম তারা কি ঐ সম্প্রদায় যারা মদ খায় এবং চুরি করে? তিনি বললেন, না, হে সিদ্দিকের মেয়ে! তারা হল ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা সালাত-সাওম আদায় করে এবং ভয় করে যে তাদের থেকে কবুল করা হবে না ।’ [তিরমিযীঃ ৩১৭৫, ইবন মাজাহ্‌ঃ ৪১৯৮, মুসনাদে আহমাদঃ ৬/১৫৯]

(১) আয়াতে ‘জ্বিবত’ ও ‘তাগূত’ শীর্ষক দু’টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে । শব্দ দু’টির মর্ম সম্পর্কে তাফসীরকার মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে । ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় ‘জ্বিবত’ বলা হয় জাদুকরকে । আর ‘তাগূত’ বলা হয় গণক বা জ্যোতিষীকে । উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, ‘জ্বিবত’ অর্থ জাদু এবং ‘তাগূত’ অর্থ শয়তান । মালেক ইবন আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয়, সে সবই তাগূত বলে অভিহিত হয় । ইমাম কুরতুবী বলেন যে, মালেক ইবন আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর উক্তিটিই অধিক পছন্দনীয় । তার কারণ, কুরআন থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় । আল্লাহ্‌ বলেনঃ “আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত কর এবং তাগূত থেকে বেঁচে থাক ।” [সূরা আন-নাহল: ৩৬] কিন্তু উল্লেখিত বিভিন্ন মতের মাঝে কোন বিরোধ নেই । কাজেই এর যে কোনটিই গ্রহণ করা যায় । প্রকৃতপক্ষে ‘জ্বিবত’ প্রতিমাকেই বোঝাত, পরে

آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾

সম্বন্ধে বলে, ‘এদের পথই মুমিনদের চেয়ে প্রকৃষ্টতর[১] ।’

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ

৫২. এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ লা‘নত

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য পূজ্য বস্তুতে এর প্রয়োগ হতে আরম্ভ করে। [রুহুল মা‘আনী] তাগূতের অর্থ ও প্রকারভেদ এবং প্রধান প্রধান তাগূত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আল-বাকারাহ্‌র ২৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে।

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইয়াহূদীদের সর্দার হুইয়াই ইবন আখতাব ও কা‘ব ইবন আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর নিজেদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশদের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। ইয়াহূদী সর্দার কা‘ব ইবন আশরাফ আবু সুফিয়ানের কাছে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন মক্কাবাসীরা কা‘ব ইবন আশরাফকে বলল, তোমরা হলে একটি প্রতারক সম্প্রদায়। সত্য সত্যই যদি তোমরা তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে আমাদের এ দু’টি মূর্তির (জ্বিবত ও তাগূতের) সামনে সিজ্‌দা কর। সুতরাং সে কুরাইশদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাই করল। তারপর কা‘ব কুরাইশদেরকে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন এবং আমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন লোক এগিয়ে আস, যাতে আমরা সবাই মিলে কা‘বার প্রভূর সামনে দাঁড়িয়ে এ ওয়াদা করে নিতে পারি যে, আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কা‘বের এ প্রস্তাব কুরাইশরাও পছন্দ করল এবং সেভাবে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যজোট গঠন করল। অতঃপর আবু সুফিয়ান কা‘বকে বলল, তোমরা হলে শিক্ষিত লোক; তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ। সুতরাং তুমিই আমাদেরকে বল, প্রকৃতপক্ষে আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, নাকি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ন্যায়ের উপর রয়েছেন? তখন কা‘ব জিজ্ঞেস করল, তোমাদের দ্বীন কি? আবু সুফিয়ান উত্তরে বলল, আমরা হজের জন্য নিজেদের উট জবাই করি এবং সেগুলোর দুধ খাওয়াই, মেহমানদিগকে দাওয়াত করি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখি এবং বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ঘর)-এর তাওয়াফ করি, পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পৈত্রিক দ্বীন পরিহার করেছেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে গেছেন এবং সর্বোপরি তিনি আমাদের সনাতন দ্বীনের বিরুদ্ধে নিজের এক নতুন দ্বীন উপস্থাপন করেছেন। এসব কথা শোনার পর কা‘ব ইবন আশরাফ বলল, তোমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোমরাহ্ হয়ে গেছেন। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করে ওদের মিথ্যা ও প্রতারণার নিন্দা করেন। [দেখুন- সহীহ্ ইবন হিব্বানঃ ৬৫৭২]

فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾

করেছেন[১] এবং আল্লাহ্ যাকে লা'নত করেন আপনি কখনো তার কোন সাহায্যকারী পাবেন না[২]।

أَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٣﴾

৫৩. তবে কি রাজশক্তিতে তাদের কোন অংশ আছে? সে ক্ষেত্রেও তো তারা কাউকে এক কপর্দকও দেবে না[৩]।

---

(১) আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত দুনিয়া ও আখেরাতের অপমানের কারণ। লা'নত ও অভিসম্পাত এর অর্থ হল, আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা থেকে দূরে সরে পড়া- চরম অপমান, অপদস্থতা। যার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত পতিত হয় সে কখনো আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে অতি কঠিন ভর্ৎসনার কথা বলা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে, "যাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হয়েছে, তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই নিহত অথবা ধৃত হবে।" [সূরা আল-আহযাব: ৬১] এটা তাদের পার্থিব অপমান। আখেরাতে তাদের অপমান এর চেয়েও কঠিন হবে।

(২) এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, যার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হয়, তার কোন সাহায্যকারী থাকে না। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, আল্লাহ্‌র লা'নতের যোগ্য কারা? এক হাদীসে আছে যে, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহীতা এবং সুদ দাতা, সুদ সংক্রান্ত দলীল সম্পাদনকারী এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষী সবার প্রতিই অভিসম্পাত করেছেন। এদের সবাই পাপের ক্ষেত্রে সমান।' [মুসলিমঃ ১৫৯৮] অন্য এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যে লোক লূত 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের অনুরূপ কর্মে লিপ্ত হবে সে অভিশপ্ত হবে।' [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪/৩৯৬] অতঃপর তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা চোরদের প্রতিও অভিসম্পাত করেন। যে ডিম কিংবা রশির মত সাধারণ বস্তুও চুরি থেকে বিরত থাকে না, তারও হাত কাটা হয়।' [বুখারীঃ ৬৪০১] আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, 'সুদ গ্রহীতা ও দাতার উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত এবং সে সমস্ত নারীর উপর যারা নিজেদের শরীর কেটে উল্কি আঁকে, যে অন্যের শরীর কেটেও উল্কি এঁকে দেয়, তেমনিভাবে চিত্রকারের উপরও আল্লাহ্‌র লা'নত।' [বুখারীঃ ১৯৮০] অপর এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন মদ্যপায়ীর প্রতি, মদ যে ব্যক্তি পান করায় তার প্রতি, তার বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রতি, যে মদের নির্যাস বের করে তার প্রতি এবং যারা মদ্য বহন করে তাদের সবার প্রতি।' [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৭]

(৩) ইবনে আব্বাস বলেন, খেজুরের দানার উপরে বিন্দুর মত যে ছিদ্র থাকে তাকেই আরবীতে نقير 'নাকীর' বলা হয়। [তাবারী] মোটকথা: সামান্যতম জিনিস বোঝানোর জন্যই এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

৫৪. অথবা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদেরকে ঈর্ষা করে(১)? তবে আমরা তো ইব্রাহীমের বংশধরকেও কিতাব ও হিকমত দিয়েছিলাম এবং আমরা তাদেরকে বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম।

فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

৫৫. অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যক তাতে ঈমান এনেছিল এবং কিছু সংখ্যক তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল(২); আর

(১) এ আয়াতে ইয়াহূদীদের হিংসার কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে জ্ঞানৈশ্বর্য ও শান-শওকত দান করেছিলেন, তা দেখে ইয়াহূদীরা হিংসার অনলে জ্বলে মরত। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাদের সে হিংসা বিদ্বেষের কঠোর নিন্দা করেছেন এবং তাদের বিদ্বেষকে একান্ত অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে পরবর্তী আয়াতগুলোতে তার কারণ বর্ণনা করেছেন। তা হল এই যে, তোমাদের এই হিংসা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণটা কি? যদি এ কারণ হয়ে থাকে যে, তোমরাই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী অথচ তা তোমাদের হাতে না এসে তিনি পেয়ে গেছেন, তাহলে তোমাদের এ ধারণা যে একান্তই ভ্রান্ত তা সুস্পষ্ট। কারণ এখন তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তোমরা যদি তা থেকে কোন অংশ প্রাপ্ত হতে, তাহলে তোমরা তো অন্য কাউকে একটি কড়িও দিতে না। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের এ বিদ্বেষ এ কারণে হয়ে থাকে যে, রাজ-ক্ষমতা না হয় আমরা নাই পেলাম, কিন্তু তাঁর হাতে যাবে কেন? রাষ্ট্রের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক? তাহলে তার উত্তর হল এই যে, ইনিও নবীগণেরই বংশধর, যাঁদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পূর্ব থেকেই ছিল। কাজেই রাষ্ট্র কোন অপাত্রে অর্পিত হয়নি। অতএব, তোমাদের ঈর্ষা একান্তভাবেই অযৌক্তিক।
এখন জানা দরকার ঈর্ষা কি? আর তার পরিণামই বা কি? আলেমগণ বলেন, হাসাদ বা ঈর্ষা হচ্ছে, 'অন্যের প্রাপ্ত নেয়ামতের অপসারণ কামনা করা।' যা হারাম ও নিন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না; বরং আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলিম ভাইয়ের পক্ষে অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তিন দিনের বেশী সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয়।' [বুখারী: ৬০৭৬; মুসলিমঃ ২৫৫৮]

(২) মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট ।

৫৬. নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে অবশ্যই তাদেরকে আমরা আগুনে পোড়াব; যখনই তাদের চামড়া পুড়ে পাকা দগ্ধ হবে তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া বদলে দেব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে(১) । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

৫৭. আর যারা ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে, অচিরেই আমরা তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার পাদদেশে নদী-নালাসমূহ প্রবাহিত; যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকবে এবং তাদেরকে আমরা চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাব(২) ।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত(৩) তার হকদারকে

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

সাল্লামের উপর ঈমান এনেছিল । আর কেউ কেউ রাসূলের পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখছিল । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন যে, তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন সেগুলো পাল্টে দেয়া হবে এবং এ কাজটি এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে । হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেন, 'আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজার বার খাবে । যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে, অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও । সাথে সাথে সেগুলো পূর্বের মত হয়ে যাবে । [ইবন কাসীরঃ ১/৫১৪]

(২) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে এর ছায়ায় যদি কোন আরোহণকারী ভ্রমণ করতে চায় তাহলে একশত বছর ভ্রমণ করতে পারবে । তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াত পড়তে পার "আর সম্প্রসারিত ছায়া" [সূরা আল ওয়াকি'য়াঃ ১৩০, বুখারীঃ ৩২৫২]

(৩) আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতটি নাযিল হওয়ার একটি বিশেষ ঘটনা

রয়েছে। তা হল এই যে, ইসলাম-পূর্বকালেও কা'বা ঘরের সেবা করাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে করা হত। কা'বার কোন বিশেষ খেদমতের জন্য যারা নির্বাচিত হত, তারা গোটা সমাজ তথা জাতির মাঝে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হত। সে জন্যই বায়তুল্লাহ্‌র বিশেষ খেদমত বিভিন্ন লোকের মাঝে ভাগ করে দেয়া হত। জাহেলিয়াত আমল থেকেই হজের মওসূমে হাজীদেরকে 'যমযম' কূপের পানি পান করানোর সেবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর উপর ন্যস্ত ছিল। একে বলা হত 'সিকায়া'। অনুরূপই কা'বা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেয়া ও বন্ধ করার ভার ছিল উসমান ইবন তালহার উপর। এ ব্যাপারে স্বয়ং উসমান ইবন তালহার ভাষ্য হল এই যে, জাহেলিয়াত আমলে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বায়তুল্লাহ্‌র দরজা খুলে দিতাম এবং মানুষ তাতে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করত। হিজরতের পূর্বে একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবীসহ বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে গেলে উসমান (যিনি তখনো পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে উসমানের কটুক্তিসমূহ সহ্য করে নিলেন। অতঃপর বললেন, হে উসমান! হয়ত তুমি এক সময় বায়তুল্লাহ্‌র এই চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে। তখন যাকে ইচ্ছা এই চাবি অর্পণ করার অধিকার আমারই থাকবে। উসমান ইবন তালহা বলল, তাই যদি হয়, তবে সেদিন কুরাইশরা অপমানিত অপদস্থ হয়ে পড়বে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তা নয়। তখন কুরাইশরা আযাদ হবে, তারা হবে যথার্থ সম্মানে সম্মানিত। এ কথা বলতে বলতে তিনি বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরে প্রবেশ করলেন। (উসমান বললেন) তারপর আমি যখন আমার মনের ভিতর অনুসন্ধান করলাম, তখন আমার যেন নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যা কিছু বললেন, তা অবশ্যই ঘটবে। সে মুহূর্তেই আমি মুসলিম হয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের মতিগতি পরিবর্তিত দেখতে পেলাম। তারা আমাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কাজেই আমি আর আমার (মুসলিম হওয়ার) সংকল্প বাস্তবায়িত করতে পারলাম না। অতঃপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বায়তুল্লাহ্‌র চাবি চাইলেন। আমি তা পেশ করে দিলাম। তখন তিনি পুনরায় আমার হাতেই সে চাবি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে হবে যালেম, অত্যাচারী। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নেবার কোন অধিকার কারোরই থাকবে না। [দেখুন- তাবরানীঃ ১১/১২০]

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, সে আমানত প্রাপককে পৌঁছে দেয়া তার একান্ত কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ফিরিয়ে দিতে[১]। তোমরা যখন | حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এমন খুব কম হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি - 'যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার দ্বীন নেই'। [মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩৫] তাছাড়া আমানতদারী না থাকা মুনাফেকীর একটি আলামত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মুনাফেকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে খেয়ানত করে। [বুখারীঃ ৩৩; মুসলিমঃ ৫৯]

(১) এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআনুল কারীম আমানতের বিষয়টিকে أمانات বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধুমাত্র 'আমানত' নয়, যাকে সাধারণতঃ আমানত বলে অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয়; বরং আমানতের আরো কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের শানে-নুযূল প্রসঙ্গে উপরে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কোন বস্তুগত আমানত ছিল না। কারণ, বায়তুল্লাহ্‌র চাবি বিশেষ কোন বস্তু নয়, বরং তা ছিল বায়তুল্লাহ্‌র খেদমতের একটা পদের নিদর্শন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্ তা'আলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সে সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েয নয়, যে লোক তার যোগ্য নয়, বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমানতের গুরুত্ব লক্ষ্য করে এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ সমস্ত গোনাহের কাফফারা হলেও আমানতের কাফফারা হয় না। জিহাদে শহীদ ব্যক্তিকে সেদিন হাজির করে বলা হবে, আমানত আদায় কর, সে বলবে, কোত্থেকে তা আদায় করব? দুনিয়া তো শেষ হয়ে গেছে। তখন তাকে হাবীয়া জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। সে সেখানে গেলে আমানতকে যেদিন ত্যাগ করেছিল সেদিনের রূপে দেখতে পাবে। সে তখন তা ধরে কাধে নিয়ে আসতে চাইবে, যখনি সেখান থেকে সে বের হতে যাবে, তখন আমানত পালিয়ে যাবে, আর এভাবে সে আমানতের পিছনে সবসময় ছুটতে থাকবে। তারপর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উপরোক্ত আয়াত পাঠ করলেন। [আল-মাতালিবুল আলীয়া, হিলইয়াতুল আউলিয়া, মাকারিমুল আখলাক] এ আমানতের পরিচয় সম্পর্কে আবুল আলীয়া বলেন, যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যা নিষেধ করা হয়েছে তা সবই আমানত। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝٥٨

মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে[১]। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট[২]! নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[৩]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ

৫৯. হে ঈমাদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের

(১) এ আয়াতে ইসলামের কয়েকটি মৌলিক নীতির আলোচনাও এসে গেছে। প্রথমতঃ প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। পৃথিবীর শাসকবর্গ তাঁর আজ্ঞাবহ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই। দ্বিতীয়তঃ সরকারী পদসমূহ অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখ্যার হারে বন্টন করা যেতে পারে; বরং এগুলো হল আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত, যা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ লোককেই দেয়া যেতে পারে। তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে সে সমস্ত নীতিমালার অনুসরণে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেয়া হয়েছে। চতুর্থতঃ তাদের নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমনকি দ্বীন ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক ও ন্যায়সংগত মীমাংসা করে দেয়া শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফরয। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, শাসনকতৃপক্ষের উপর ওয়াজিব হলো, আল্লাহ্‌র আইন অনুসারে বিচার করা, আমানত আদায় করা। যদি তারা সেটা করে তবে জনগনের উপর কর্তব্য হবে তার কথা শোনা, আনুগত্য করা, তার আহ্বানে সাড়া দেয়া। [তাবারী]

(২) এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সবার ফরিয়াদই শোনেন এবং যে লোক বলার কিংবা ফরিয়াদ করার সামর্থ্য রাখে না, তিনি তার অবস্থাও উত্তমভাবে দেখেন। অতএব তাঁর রচিত নীতিমালাই সর্বদা সকল রাষ্ট্রের জন্য সর্বযুগে উপযোগী হতে পারে। পক্ষান্তরে মানব রচিত নীতিমালা শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

(৩) এ আয়াতের তাফসীর ইমাম আবু দাউদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি তার কানের উপর রাখলেন এবং পরবর্তী আঙ্গুলটি রাখলেন তার চোখের উপর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র চোখ ও কান রয়েছে। [আবু দাউদ: ৪৭২৮]

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের[১], অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।

নবম রুকূ'

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ

৬০. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল

(১) 'উলুল আমর' আভিধানিক অর্থে সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা, মুজাহিদ ও হাসান বসরী রাহিমাহুমাল্লাহ্ প্রমূখ মুফাস্সিরগণ ওলামা ও ফোকাহা সম্প্রদায়কে 'উলুল আমর' সাব্যস্ত করেছেন। তারাই হচ্ছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব বা প্রতিনিধি। তাদের হাতেই দ্বীনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত। মুফাস্সিরীনের অপর এক জামা'আত-যাদের মধ্যে আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রমূখ সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন-বলেছেন যে, 'উলুল আমর' এর অর্থ হচ্ছে সে সমস্ত লোক, যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। ইমাম সুদ্দী এ মত পোষণ করেন। এছাড়া তাফসীরে ইবন কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। কারণ, নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত। আল্লামা আবু বকর জাস্সাস এতদুভয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক ব্যাপার হলো এই যে, এতদুভয় অর্থই ঠিক। কারণ, 'উলুল আমর' শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যে, 'উলুল আমর' বলতে ফকীহ্গণকে বোঝানো যেতে পারে না। তার কারণ, أُولُوا الأَمْر (উলুল আমর) শব্দটি তার শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে সে সমস্ত লোককে বোঝায়, যাদের হুকুম বা নির্দেশ চলতে পারে। বলাবাহুল্য, এ কাজটি ফকীহ্গণের নয়। প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, হুকুম চলার দু'টি প্রেক্ষিত রয়েছে। (এক) জবরদস্তিমূলক। এটা শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠী বা সরকার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। (দুই) বিশ্বাস ও আস্থার দরুন হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহ্গণই অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং যা সর্বযুগে মুসলিমদের অবস্থার দ্বারা প্রতিভাত হয়। দ্বীনী ব্যাপারে সাধারণ মুসলিমগণ নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলেম সম্প্রদায়ের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত করে থাকে। তাছাড়া শরী'আতের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের হুকুম মান্য করা ওয়াজিবও বটে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রেও 'উলুল আমর'-এর প্রয়োগ যথার্থ হবে।

يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۗ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾

হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾

৬১. তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদেরকে আপনি আপনার কাছ থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবেন(১)।

فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾

৬২. অতঃপর কি অবস্থা হবে, যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন মুসীবত হবে? তারপর তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে আপনার কাছে এসে বলবে, 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছুই চাইনি।'

(১) অর্থাৎ তারা রাসূলের কাছে আসার ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে অনীহা ব্যক্ত করেছে। এটা তাদের অহংকারেরই ফলশ্রুতি। তাদের এ অভ্যাস সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতেও বলেছেন, "আর তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ কর।' তারা বলে, 'বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।" [সূরা লুকমান:২১] মোট কথা: এখানে বলা হয়েছে যে, পারস্পারিক বিবাদ-বিসংবাদের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃত মীমাংসাকে অমান্য করা কোন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। যে কেউ এমন কাজ করবে, সে মুনাফেক ছাড়া আর কিছু নয়। এরা এমন লোক, যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে নির্দেশের প্রতি চলে এসো, যা আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন এবং চলে এসো তাঁর রাসূলের দিকে, তখন এসব মুনাফেক আপনার দিকে আসতে অনীহা প্রকাশ করে। মুমিনরা কখনো এধরনের কাজ করতে পারে না। তাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মুমিনদের উক্তি তো এই---যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।" [সূরা আন-নূর:৫১]

৬৩. এরাই তারা, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ্ তা জানেন। কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, তাদেরকে সদুপদেশ দিন এবং তাদেরকে তাদের মর্ম স্পর্শ করে- এমন কথা বলুন।

أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

৬৪. আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে কেবলমাত্র আনুগত্য করার জন্যই আমরা রাসূলদের প্রেরণ করেছি। যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন তারা আপনার কাছে আসলে ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহ্কে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে[১]।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

৬৫. কিন্তু না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষন পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের[২] বিচার

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا

(১) ৬১ নং আয়াত থেকে এ আয়াত পর্যন্ত মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, রাসূল যদি তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায় তবে আল্লাহ্কে তারা ক্ষমাশীল পাবে। এ আয়াতটি মুনাফিকদের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং রাসূলের জীবদ্দশায়ই তাঁর পক্ষে তাদের কথা শোনা ও তাদের জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্ভব। রাসূলের মৃত্যুর পর তার কবরের কাছে এসে এ আয়াত তেলাওয়াত করে রাসূলের কাছে দো'আ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও শির্ক। অনুরূপভাবে রাসূলের মৃত্যুর পর তার কবরের কাছে এসে আল্লাহ্র কাছে তার জন্য দো'আ করা বা ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান করা বেদ'আত ও শির্কের মাধ্যম। সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীন, হেদায়াতের ইমামগণ যেমন ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ্ সহ কেউই এ ধরনের কাজ করেন নি। তারা এটাকে জায়েয মনে করতেন না। কোন কোন কবরপুজারী কিছু কাহিনী রটনা করে এর সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে চেষ্টা করে মানুষের ঈমান নষ্ট করার পাঁয়তারা করতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকা উচিত।

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের বলেন, আনসারী এক ব্যক্তির সাথে খেজুর গাছে পানি দেয়া

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝٦٥

ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে(১) এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়(২) ।

নিয়ে তার ঝগড়া হয়। আনসারী বলল, পানির পথ পরিস্কার করে দাও যাতে তা আমার জমির উপর যায়। যুবায়ের তা দিতে অস্বীকার করলে তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শালিসের জন্য আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব শুনে বললেনঃ 'যুবায়ের তুমি তোমার জমিতে পানি দেয়ার পর তোমার পড়শীর জমিতে পানি দিয়ে দিও। লোকটি তা শুনে বলল, আপনার ফুফাত ভাই তো তাই। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করল এবং তিনি বললেন, যুবায়ের তুমি তোমার জমিতে পানি দেয়ার পর তা দেয়াল পর্যন্ত আটকে রাখ। যুবায়ের বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমার মনে হয় এ আয়াতটি এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে। [বুখারীঃ ২৩৫৯, ২৩৬০, মুসলিমঃ ২৩৫৭] এ দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের আদেশ-নিষেধ নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া শুধু আচার অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয়; আকীদা এবং অপরাপর বৈষয়িক বিষয়েও ব্যাপক। অতএব, কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পারিক মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এবং তার অবর্তমানে তার প্রবর্তিত শরী'আতের আশ্রয়ে গিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয।

(১) এতে এ কথাও জানা গেল যে, যে কাজ বা বিষয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও ঈমানের দূর্বলতার লক্ষণ। উদাহারণতঃ যে ক্ষেত্রে শরী'আত তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করার অনুমতি দিয়েছে, সে ক্ষেত্রে যদি কেউ সম্মত না হয় তবে একে পরহেযগারী বলে মনে করা যাবে না, বরং এটা একান্তই মানসিক ব্যাধি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা কেউ বেশী পরহেযগার হতে পারে না। যে অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে সালাত আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন এবং নিজেও বসে সালাত আদায় করেছেন, কারো মন যদি এতে সম্মত না হয় এবং অসহনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, তার মন ব্যাধিগ্রস্ত।

(২) এ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের অসংখ্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করে বলেছেন যে, কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন কিংবা মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে ধীরস্থির

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿۶۶﴾

৬৬. আর যদি আমরা তাদেরকে আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর বা আপন গৃহ ত্যাগ কর তবে তাদের অল্প সংখ্যকই তা করত[১]। যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তা করলে তাদের ভাল হত এবং চিত্তস্থিরতায় তারা দৃঢ়তর হত।

وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۶۷﴾

৬৭. আর অবশ্যই তখন আমরা তাদেরকে আমাদের কাছ থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করতাম।

মস্তিস্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এভাবে স্বীকার করে নেবে যাতে রাসূলের কোন সিদ্ধান্তেই মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল হিসেবে গোটা উম্মতের শাসক এবং যে কোন বিবাদের মীমাংসার যিম্মাদার। তার শাসন ও সিদ্ধান্ত অপর কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি শুধুমাত্র একজন শাসকই নন, বরং তিনি একজন নিষ্পাপ রাসূল, রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীন এবং উম্মতের জন্য একান্ত দয়ালু ব্যক্তিত্ব। কাজেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যখনই কোন বিষয়ে, কোন সমস্যার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক সাব্যস্ত করে তার মীমাংসা করিয়ে নেয়া উচিত এবং অতঃপর তাঁর মীমাংসাকে স্বীকার করে নিয়ে সেমতে কাজ করা উভয় পক্ষের উপর ফরয।

মনে রাখতে হবে যে, কুরআনের বাণী ও রাসূলের হাদীসসমূহের উপর আমল করা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাথেই সীমিত নয়। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র শরী'আতের মীমাংসাই হল তাঁর মীমাংসা। কাজেই এ নির্দেশটি কিয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবেই বলবৎ থাকবে, যেমন ছিল তাঁর যুগে। তখন যেমন সরাসরি কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তকল্পে তাঁর কাছে উপস্থিত করা হত, তেমনি তাঁর পরে তাঁর প্রবর্তিত শরী'আতের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুসরণ।

(১) কাতাদা বলেন, এখানে ইয়াহূদীদেরকেই বলা হচ্ছে। যেমনিভাবে তাদের পুর্বপুরুষদের তাওবা কবুলের জন্য মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক তাদের নিজেদের হত্যা করার নির্দেশ ছিল, তেমনি নির্দেশ যদি তাদের জন্যও আসত, তবে তারা তা অবশ্যই অমান্য করত। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

৬৮. এবং অবশ্যই আমরা তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করতাম।

وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾

৬৯. আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক[১] (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ[২]- যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন- তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী[৩]!

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾

(১) সিদ্দীক বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে পরম সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদী। তার মধ্যে সততা ও সত্যপ্রিয়তা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকে। নিজের আচার আচরণ ও লেনদেনে সে হামেশা সুস্পষ্ট ও সরল-সোজা পথ অবলম্বন করে। সে সবসময় সাচ্চাদিলে হক ও ইনসাফের সহযোগী হয়। সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী যে কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে সে পর্বত সমান অটল অস্তিত্ব নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম দুর্বলতাও দেখায় না। সে এমনই পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয় যে, তার আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু-শত্রু, আপন-পর কেউই তার কাছ থেকে নির্লজ্জ ও নিখাদ সত্যপ্রীতি, সত্য-সমর্থন ও সত্য-সহযোগিতা ছাড়া আর কিছুরই আশংকা করে না। কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ ও বিরোধিতা তাদের মনে কখনও স্থান পায় না। যেমন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রমূখ।

(২) সালেহীন বা সৎকর্মশীল বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যে তার নিজের চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস, ইচ্ছা, সংকল্প, কথা ও কর্মের মাধ্যমে সত্য-সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর সাথে নিজের জীবনে সৎ ও সুনীতি অবলম্বন করে। আর যারা প্রকাশ্য ও গোপন সব ক্ষেত্রেই সৎকর্মসমূহের অনুবর্তী।

(৩) জান্নাতের পদমর্যাদাসমূহ আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। জান্নাতীদের পদমর্যাদা তাঁদেরই আমল তথা কৃতকর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণের সাথে জান্নাতের উচ্চতর স্থানে জায়গা দেবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদেরকে নবীগণের পরবর্তী মর্যাদার লোকদের সাথে স্থান দেবেন। তাদেরকেই বলা হয় সিদ্দীকীন। অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন শহীদগণের সাথে। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন সালেহীনদের সাথে। সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাগণ সে সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন, যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও মকবুল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'জান্নাতবাসীরা নিজেদের জানালা দিয়ে উপরের শ্রেণীর লোকদেরকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমন পৃথিবীতে তোমরা সুদূর দিগন্তে নক্ষত্রকে দেখ। বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরা কি শুধু নবী-রাসূলগণ? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অবশ্যই না, এমন কিছু

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۟

৭০. এগুলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

দশম রুকূ'

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ۟

৭১. হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর; তারপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও

লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং নবী-রাসূলদের সত্যায়ন করেছে।' [বুখারীঃ ৩২৫৬, মুসলিমঃ ২৮৩১] তাই যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভে ধন্য হতে চাইবে, তাদেরকে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার মাধ্যমেই লাভ করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে, যে লোক কোন গোষ্ঠীর ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এ দলের নির্ধারিত মান পর্যন্ত পৌছতে পারেনি?' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ প্রতিটি লোকই যার সাথে তার ভালবাসা, তার সাথে থাকবে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই আমি এতটা আনন্দিত হইনি যতটা এ হাদীসের কারণে আনন্দিত হয়েছি। কারণ, এ হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাঁদের গভীর ভালবাসা রয়েছে তাঁরা হাশরের মাঠেও তাঁর সাথেই থাকবেন। [বুখারীঃ ৬১৬৭, মুসলিমঃ ২৬৩৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নিশ্চয় আপনি আমার কাছে আমার নিজের আত্মার চেয়েও প্রিয়। আপনি আমার নিকট আমার পরিবার-পরিজন, সম্পদ, সন্তান-সন্ততিদের থেকেও প্রিয়। আমি আমার ঘরে অবস্থানকালে আপনার কথা স্মরণ হলে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে না দেখি ততক্ষণ স্থির থাকতে পারি না। যখন আমি আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি তখন বুঝতে পারি যে, আপনি নবীদের সাথে উঁচু স্থানে অবস্থান করবেন। আর আমি যদি জান্নাতে প্রবেশ করি তবে আপনাকে দেখতে না পাওয়ার আশংকা করছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীর কথার তাৎক্ষনিক কোন জওয়াব দিলেন না। শেষ পর্যন্ত জিবরীল আলাইহিস সালাম এ আয়াত নাযিল করলেন।' [আল-মু'জামুস সাগীর লিত তাবরানী ১/২৬; মাজমা'উদ যাওয়ায়িদ ৭/৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি শুনেছিলাম যে, নবীদেরকে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়া ও আখেরাত যে কোন একটি বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয়। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অসুস্থতার পর মারা গেলেন, সে অবস্থায় তার মুখ থেকে এ আয়াত শুনতে পেলাম। তখন আমি বুঝলাম যে, তাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আর তিনি আখেরাত বেছে নিয়েছেন।" [বুখারী: ৪৪৩৫; মুসলিম: ২৪৪৪]

অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও[১] ।

৭২. আর নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই । অতঃপর তোমাদের কোন মুসীবত হলে সে বলবে, 'তাদের সঙ্গে না থাকায় আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ।'

وَاِنَّ مِنۡكُمۡ لَمَنۡ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنۡ اَصَابَتۡكُمۡ مُّصِيۡبَةٌ قَالَ قَدۡ اَنۡعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ اِذۡ لَمۡ اَكُنۡ مَّعَهُمۡ شَهِيۡدًا ﴿۷۲﴾

৭৩. আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হলে, যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই এমনভাবে বলবেই, 'হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম[২] ।'

وَلَٮِٕنۡ اَصَابَكُمۡ فَضۡلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوۡلَنَّ كَاَنۡ لَّمۡ تَكُنۡۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيۡتَنِىۡ كُنۡتُ مَعَهُمۡ فَاَفُوۡزَ فَوۡزًا عَظِيۡمًا ﴿۷۳﴾

---

(১) আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ এবং আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জিহাদে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বেশকিছু শিক্ষা রয়েছে - (১) কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয় । (২) অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলতঃ মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে থাকে । (৩) এ আয়াতে প্রথমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ অতঃপর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সুশৃংখল নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে । বলা হয়েছে, তোমরা যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে, তখন একা একা বাহির হবেনা, বরং ছোট ছোট দলে বাহির হবে কিংবা (সম্মিলিত) বড় সৈন্যদল নিয়ে বাহির হবে । তার কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে । শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই শৈথিল্য করে না ।

(২) মুজাহিদ বলেন, এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে যাদেরকে বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে, মুনাফিক । যারা সাহাবাদের সাথে মিশে থাকত । [আত-তাফসীরুস সহীহ] যুদ্ধের ঘোষণা শোনার সথে সাথেই তাদের মধ্যে গড়িমসি শুরু হত । এরপর যদি মুসলিমদের কোন বিপদ হতো, তখন তারা বলত যে, তাদের সাথে না থাকাটা আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আশীর্বাদস্বরূপ । অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ অবস্থায় তারা খুশীও প্রকাশ করত । আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা তাতে আনন্দিত হয় ।" [সূরা আলে-ইমরান:১২০]

৭৪. কাজেই যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুক। আর কেউ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করলে সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক আমরা তো তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করব।

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

৭৫. আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী[১] এবং শিশুদের

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

"আপনার মংগল হলে তা ওদেরকে কষ্ট দেয় এবং আপনার বিপদ ঘটলে ওরা বলে, 'আমরা তো আগেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম' এবং ওরা উৎফুল্ল চিত্তে সরে পড়ে" [আত-তাওবাহ:৫০] পক্ষান্তরে যখন মুসলিমদের কোন বিজয়ের কথা শুনত, তখন তারা বোল পাল্টিয়ে ফেলত যাতে করে যুদ্ধলব্দ সম্পদে ভাগ বসাতে পারে। যদিও মুসলিমদের বিজয় তাদের মনের জ্বালা বাড়িয়ে দেয়। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) মক্কা নগরীতে এমন কিছু দুর্বল মুসলিম রয়ে গিয়েছিলেন, যারা দৈহিক দুর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে কাফেররাও তাদেরকে হিজরত করতে বাধাদান করেছিল এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করেছিল, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যেমন ইবন আব্বাস ও তাঁর মাতা, সালামা ইবন হিশাম, ওলীদ ইবন ওলীদ, আবু জান্দাল ইবন সাহ্‌ল প্রমূখ। এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুন কাফেরদের অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করেও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তাঁরা এসব অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বরাবরই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে দো'আ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেন যাতে তাঁরা জিহাদের মাধ্যমে সেই নিপীড়িতদেরকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। 'ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি ও আমার মা অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম' [বুখারী: ৪৫৮৭]

এ আয়াতে মুমিনরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'টি বিষয়ে দো'আ করেছিলেন। একটি হলো এই যে, আমাদিগকে এই(মক্কা) নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করুন এবং দ্বিতীয়টি হলো, আমাদের জন্য কোন সহায় বা সাহায্যকারী পাঠান। আল্লাহ্ তাঁদের দু'টি প্রার্থনাই কবুল করে নিয়েছিলেন। তা এভাবে যে, কিছু লোককে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁদের প্রথম প্রার্থনাটি পূরণ হয়েছিল। অবশ্য কোন কোন লোক সেখানেই

وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۞

জন্য, যারা বলে, 'হে আমাদের রব! এ জনপদ---যার অধিবাসী যালিম, তা--- থেকে আমাদেরকে বের করুন; আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কাউকে অভিভাবক করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সহায় করুন।'

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۞

৭৬. যারা মুমিন তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফের তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে[১]। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল[২]।

রয়ে যান এবং বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্তাব ইবন উসায়দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে সেসব লোকের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি এসব উৎপীড়িতদেরকে অত্যাচারীদের উৎপীড়ন-অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। আর এভাবেই পূর্ণ হয় তাঁদের দ্বিতীয় প্রার্থনাটি। আয়াতে বলা হয়েছে যে, জিহাদের নির্দেশ দানের পিছনে একটি কারণ ছিল সে সমস্ত অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষের প্রার্থনা। মুসলিমগণকে জিহাদ করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে সে প্রার্থনা মঞ্জুরীর কথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

(১) আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মুমিন বা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে। আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। সুতরাং পরিপূর্ণ কোন মুমিন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সামনেই এ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে যে, আমি আল্লাহ্‌র পথেই এ কাজ করছি। তার নির্দেশ ও নিষেধকে বাস্তবায়নই আমার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফের তাদের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈচাশিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শির্কী বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফরী ও শির্কী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেররা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে।

(২) আয়াতে বলা হয়েছে যে, শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল হয় দুর্বল। ফলে তা মুমিনের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারে না। অতএব মুসলিমগণকে শয়তানের বন্ধুবর্গ অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন রকম দ্বিধা করা উচিত নয়। তার কারণ, তাদের সাহায্যকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। পক্ষান্তরে শয়তানের কলাকৌশল কাফেরদের কিছুই মঙ্গল সাধন করবে না। এ আয়াতে শয়তানের

এগারতম রুকূ'

৭৭. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, সালাত কায়েম কর(১) এবং যাকাত দাও(২)?' অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেয়া হল তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তারচেয়েও বেশী এবং বলল, 'হে আমাদের রব! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলেন? আমাদেরকে কিছু দিনের অবকাশ কেন দিলেন না(৩)?'

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

কলাকৌশলকে যে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেজন্য আয়াতের মাধ্যমেই দু'টি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। (এক) যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে, তাকে মুসলিম হতে হবে এবং (দুই) সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে; কোন পার্থিব বস্তুর আকাঙ্খা কিংবা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হবে না। এ দু'টি শর্তের যেকোন একটির অবর্তমানে শয়তানের কলাকৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী নয়।

(১) ইমাম যুহরী বলেন, সালাত কায়েম করার অর্থ, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রত্যেকটিকে তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং তার কয়েকজন সাথী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখন আমরা সম্মানিত ছিলাম। কিন্তু যখন ঈমান আনলাম তখন আমাদেরকে অসম্মানিত হতে হচ্ছে। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'আমি ক্ষমা করতে নির্দেশিত হয়েছি, সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করো না। তারপর যখন আল্লাহ্ তাকে মদীনায় হিজরত করালেন এবং যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হল তখন তাদের কেউ কেউ যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [নাসায়ী: ৩০৮৬; মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৬৭, ৩০৬]

(৩) সুদ্দী বলেন, তারা 'কিছু দিনের অবকাশ' বলে মৃত্যু পর্যন্ত সময় চাচ্ছিল। অর্থাৎ তারা যেন বলছে যে, তাদের মৃত্যু হয়ে গেলে তারপর এ আয়াত নাযিল হওয়ার দরকার ছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

বলুন, 'পার্থিব ভোগ সামান্য[১] এবং যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখেরাতই উত্তম[২]। আর তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না।'

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ
فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا
هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ
فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও[৩]। যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।' আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এটা আপনার কাছ থেকে[৪]।' বলুন, 'সবকিছুই আল্লাহ্‌র

---

(১) হাসান বসরী এ আয়াত পাঠ করে বলেন, ঐ বান্দাকে আল্লাহ্ রহমত করুন, যে দুনিয়াকে এ আয়াত অনুযায়ী সঙ্গী বানিয়েছে। দুনিয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উদাহরণ হচ্ছে, সে ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি ঘুম দিল, ঘুমের মধ্যে সে কিছু ভাল স্বপ্ন দেখল, তারপর তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আয়াতে দুনিয়ার নেয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নেয়ামতসমূহকে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে:
দুনিয়ার নেয়ামত অল্প এবং আখেরাতের নেয়ামত অধিক।
দুনিয়ার নেয়ামত ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের নেয়ামত অনন্ত-অফুরন্ত।
দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের সাথে নানা রকম অস্থিরতাও রয়েছে, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত এ সমস্ত জঞ্জালমুক্ত।
দুনিয়ার নেয়ামত লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত প্রত্যেক মুত্তাকী ব্যক্তির জন্য একান্ত নিশ্চিত। [তাফসীরে কাবীর]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সুদৃঢ় প্রাসাদে হলেও মৃত্যু তোমাদেরকে বরণ করতেই হবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বসবাস করার জন্য কিংবা ধন-সম্পদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় ও উত্তম গৃহ নির্মাণ করা তাওয়াক্কুল বা ভরসার পরিপন্থী কিংবা শরী'আত বিরুদ্ধ নয়। [কুরতুবী]

(৪) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে কল্যাণ দ্বারা বদরের যুদ্ধে বিজয় ও গনীমত লাভ বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে অকল্যাণ দ্বারা ওহুদের যুদ্ধে যে বিপদ সংঘটিত হয়েছিল, যাতে রাসূলের চেহারা মুবারকে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর দাত ভেঙ্গে গিয়েছিল তা বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

কাছ থেকে[1] ।' এ সম্প্রদায়ের কি হল যে, এরা একেবারেই কোন কথা বুঝে না!

৭৯. যাকিছু কল্যাণ আপনার হয় তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে[2] এবং যাকিছু অকল্যাণ আপনার হয় তা আপনার নিজের কারণে[3] এবং আপনাকে

مَآ اَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَمَآ اَصَابَكَ مِنۡ سَيِّئَةٍ فَمِنۡ نَّفۡسِكَ ؕ وَاَرۡسَلۡنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوۡلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيۡدًا ۝

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সবকিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়। কিন্তু এর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাল কাজ হলে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর মন্দ কাজ হলে তা বান্দার পক্ষ থেকে। এর কারণ হলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা দু'প্রকার, (এক) সৃষ্টিগত সাধারণ ইচ্ছা, যার সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থাকা বাধ্যতামূলক নয়। (দুই) শরী'আতগত বিশেষ ইচ্ছা, যার সাথে সন্তুষ্ট থাকা অবশ্য জরুরী। আলোচ্য এ আয়াতে আল্লাহ্‌র সাধারণ ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কিছুই হয় না। কিন্তু খারাপ কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থাকে না। তিনি শুধু ভাল কাজেই সন্তুষ্ট হন। খারাপ পরিণতি বান্দার কর্মকাণ্ডের ফল। বান্দা যখন খারাপ কাজ করে তখন আল্লাহ্ তা হতে দেন যদিও তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন না। এর বিপরীতে বান্দা যখন ভাল কাজ করেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তা হতে দেয়ার পাশাপাশি তাতে সন্তুষ্টও হন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে খারাপ পরিণতির দায়-দায়ীত্ব কেবল বান্দার দিকেই সম্পর্কযুক্ত করা যাবে, আল্লাহ্‌র দিকে সম্পর্কযুক্ত করা জায়েয নেই। [মাজমু' ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়্যাহ]

(২) আয়াতে 'হাসানাহ্'-এর দ্বারা নেয়ামতকে বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যে সমস্ত নেয়ামত লাভ করে তা তাদের প্রাপ্য নয়, বরং একান্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হয়। মানুষ যত ইবাদাত-বন্দেগীই করুক না কেন, তাতে সে কোন নেয়ামত লাভের অধিকারী হতে পারে না। কারণ, 'ইবাদাত করার যে সামর্থ্য, তাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই লাভ হয়। তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নেয়ামত তো রয়েছেই। এ সমস্ত নেয়ামত সীমিত 'ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে কেমন করে সম্ভব? বিশেষ করে আমাদের 'ইবাদাত-বন্দেগী যদি আল্লাহ্ তা'আলার শান মোতাবেক না হয়? অতএব, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ব্যতীত কোন একটি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' বলা হল, 'আপনিও কি যেতে পারবেন না'? তিনি বললেন, 'না আমিও না'। [বুখারীঃ ৫৩৪৯, মুসলিমঃ ২৮১৬]

(৩) বিপদাপদ যদিও আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার কারণ হয় মানুষের কৃত অসৎকর্ম। মানুষটি যদি কাফের হয়ে থাকে, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ তার জন্য সে সমস্ত আযাবের একটা সামান্য নমুনা হয়ে থাকে যা আখেরাতে তার

আমরা মানুষের জন্য রাসূলরূপে পাঠিয়েছি[১]; আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৮০. কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করল[২], আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনাকে তো আমরা তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাই নি।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۞

জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের আযাব এর চাইতেও বহুগুণ বেশী। আর যদি লোকটি ঈমানদার হয়, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ হয় তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যা আখেরাতে তার মুক্তির কারণ। অথবা তার জন্য পদমর্যাদা বৃদ্ধির সোপান। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘কোন মুসলিমের উপর যে বিপদই আপতিত হোক না কেন, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা‘আলা তার গোনাহের কাফ্ফারা করে দেন। এমনকি যে কাঁটাটি পায়ে ফোটে তাও।’ [বুখারীঃ ৫৩২৪, মুসলিমঃ ২৫৭২]

(১) আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি শুধু আরবদের জন্যই রাসূল ছিলেন না, বরং তাঁর রেসালাত ছিল সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য ব্যাপক। তারা তখন উপস্থিত থাকুক বা না-ই থাকুক। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই এর আওতাভুক্ত।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু যে অস্বীকার করেছে (সে জান্নাতবাসী হতে পারবে না)। জিজ্ঞাসা করা হলঃ কে অস্বীকার করেছে, হে রাসূল! উত্তরে বললেনঃ যে আমার অনুসরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল না, সে অস্বীকার করল। [বুখারীঃ ৭২৮০] অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘যে আমার আনুগত্য করল সে অবশ্যই আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহ্র অবাধ্য হল। অনুরূপভাবে যে ক্ষমতাসীনের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল। আর যে ক্ষমতাসীনের অবাধ্য হলো সে আমার নাফরমানী করলো। ইমাম বা শাসক তো ঢালস্বরূপ, যার পিছনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা যায় এবং যার দ্বারা বাঁচা যায়। যদি ইমাম বা শাসক আল্লাহর তাকওয়ার নির্দেশ দেন এবং ইনসাফ করেন তা হলে সেটা তার জন্য সওয়াবের কাজ হবে। আর যদি অন্য কিছু করেন তবে সেটা তার উপরই বর্তাবে। [বুখারীঃ ২৯৫৭, মুসলিমঃ ১৮৩৫]

৮১. আর তারা বলে, 'আনুগত্য করি'; তারপর যখন তারা আপনার কাছ থেকে চলে যায় তখন রাতে তাদের একদল যা বলে তার বিপরীত পরামর্শ করে। তারা যা রাতে পরামর্শ করে আল্লাহ্ তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করুন; আর কাজ উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট[১]।

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

৮২. তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? যদি তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি পেত[২]।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

---

(১) মুনাফিকরা যখন আপনার নিকট আসে, তখন বলে যে, আমরা আপনার নির্দেশ কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা নাফরমানী করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দান করছেন যে, এসব বিষয়ে আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আপনি আপনার যাবতীয় কাজ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে চালিয়ে যেতে থাকুন। কারণ, আপনার জন্য তিনিই যথেষ্ট। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মানুষকে হেদায়াতের জন্য দাওয়াত দেবে তাদেরকে নানারকম জটিলতা অতিক্রম করতেই হবে। মানুষ তাদের প্রতি নানারকম উল্টা-সিধা অপবাদ আরোপ করবে। বন্ধুরূপী বহু শত্রুও থাকবে। এসব সত্ত্বেও সে সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত। যদি তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সঠিক হয়, তবে ইনশাআল্লাহ্ তারা কৃতকার্য হবেই।

(২) পবিত্র কুরআনে কোন একটি বিষয়েও অসংগতি নেই। অতএব, এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র কালাম। মানুষের কালামে এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য হতেই পারে না। এর কোথাও না আছে ভাষালঙ্কারের কোন ত্রুটি, না আছে তাওহীদ, কুফর, কিংবা হালাল-হারামের বিবরণে কোন স্ববিরোধিতা ও পার্থক্য। তাছাড়া গায়েবী বিষয়সমূহের মাঝেও এমন কোন সংবাদ নেই, যা প্রকৃত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি না আছে কুরআনের ধারাবাহিকতার কোন পার্থক্য যে, একটি হবে অলঙ্কারপূর্ণ আরেকটি

৮৩. যখন শান্তি বা শংকার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে(১)। যদি তারা তা রাসূল(২) এবং তাদের মধ্যে যারা নির্দেশ প্রদানের অধিকারী তাদেরকে জানাত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা সেটার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত(৩)। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

হবে অলঙ্কারহীন। প্রত্যেক মানুষের ভাষা-বিবৃতি ও রচনা-সংকলনে পরিবেশের কমবেশী প্রভাব অবশ্যই থাকে - আনন্দের সময় তা এক ধরণের হয়, আবার বিষাদে হয় অন্যরকম। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় এক রকম, আবার অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় অন্য রকম। কিন্তু কুরআন এ ধরণের যাবতীয় ত্রুটি, পার্থক্য ও স্ববিরোধিতা থেকে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে। আর এটাই হলো কালামে-ইলাহী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(১) এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোন শ্রুত কথা যাচাই, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বর্ণনা করা উচিত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'কোন লোকের পক্ষে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন রকম যাচাই না করেই সমস্ত শ্রুত কথা প্রচার করে।' [মুসলিম: ৫] অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেনঃ 'যে লোক এমন কোন কথা বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে দু'জন মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী'। [তিরমিযী: ২৬৬২; ইবন মাজাহ: ৩৮; মুসনাদে আহমাদ ৪/২৫৫]

(২) আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার কারণ, আয়াতে দু'রকম লোকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের একজন হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অপরজন হচ্ছেন, 'উলুল আমর'। অতঃপর বলা হয়েছে, 'তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদেরকে জানাত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা সেটার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত'। আর এই নির্দেশটি অত্যন্ত ব্যাপক। রাসূল ও আলেম সমাজ এর আওতাভুক্ত।

(৩) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কুরআন তার একাংশ অপরাংশ দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য নাযিল হয়নি, বরং এর একাংশ অপরাংশের সত্যতা নিরূপন করে। সুতরাং তোমরা এর মধ্যে যা বুঝতে পার তার উপর আমল কর আর যা বুঝতে পারবে না সেটা যারা বুঝে তাদের হাতে ছেড়ে দাও। [ইবন মাজাহঃ ৮৫, মুসনাদে আহমাদ ২/১৮১]

ও রহমত না থাকত তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত ।

৮৪. কাজেই আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুন; আপনি আপনার নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুর যিম্মাদার নন[১] এবং মুমিনগণকে উদ্বুদ্ধ করুন[২], হয়ত আল্লাহ্ কাফেরদের শক্তি সংযত করবেন । আর আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর ।

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

৮৫. কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে[৩] ।

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿٨٥﴾

---

(১) এ আয়াতের প্রথম বাক্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, “আপনি একাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ুন; কেউ আপনার সাথে থাক বা নাই থাক ।” কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যে এ কথাও বলা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলিমদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দানের কাজটিও পরিহার করবেন না । এভাবে উৎসাহ দানের পরেও যদি তারা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে আপনার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল; তাদের কর্মের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না । এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশংকা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে - “আশা করা যায় আল্লাহ্ কাফেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দেবেন । আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন ।” অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ্ তা‘আলার সমর্থন রয়েছে, যার সমর শক্তি কাফেরদের শক্তি অপেক্ষা অসংখ্যগুণ বেশী, তখন আপনার বিজয়ই অবশ্যম্ভাবী । তারপর এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শাস্তির কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে । এ শাস্তি কিয়ামতের দিনেই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক, যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন আমার শক্তি অপরাজেয়, তেমনি শাস্তি দানের ক্ষেত্রেও আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর ।

(২) কিসে উদ্বুদ্ধ করা হবে, তা এ আয়াতে বলা হয় নি । অন্য আয়াতে এসেছে, ‘আর আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করুন’ । [সূরা আল-আনফাল:৬৫]

(৩) এ আয়াতে ‘শাফা‘আত’ অর্থাৎ সুপারিশকে ভাল ও মন্দ দু’ভাগে বিভক্ত করার পর

আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর নজর রাখেন(১) ।

এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সুপারিশ যেমন মন্দ নয়, তেমনি প্রত্যেক সুপারিশ ভালোও নয় । আরো বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভালো সুপারিশ করবে, সে সওয়াবের অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে । সুতরাং যে ব্যক্তি কারো বৈধ অধিকার ও বৈধ কাজের জন্য বৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সেও সওয়াবের অংশ পাবে । তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন অবৈধ কাজের জন্য অথবা অবৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে । অংশ পাওয়ার অর্থ এই যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয়, সে যখন এই উৎপীড়িতের কিংবা বঞ্চিতের কার্যোদ্ধার করে দেবে তখন কার্যোদ্ধারকারী ব্যক্তি যেমন সওয়াব পাবে, তেমনি সুপারিশকারীও সওয়াব পাবে । এমনিভাবে কোন অবৈধ কাজের সুপারিশকারীও গোনাহ্গার হবে । তবে সুপারিশকারীর সওয়াব কিংবা আযাব তার সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বাবস্থায় সে নিজ অংশ পাবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন সৎকাজে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, সেও ততটুকু সওয়াব পায়, যতটুকু সৎকর্মী পায় ।' [মুসলিমঃ ১৮৯৩] এতে জানা গেল যে, সৎকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যেমন একটি সৎকাজ তেমনি অসৎ ও পাপ কাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা সহযোগিতা প্রদান করা সমান গোনাহ্ । এ সবই হচ্ছে দুনিয়ার সুপারিশের বিষয় । আখেরাতের সুপারিশের আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে ।

(১) আভিধানিক দিক দিয়ে مُقِيْتٌ শব্দের অর্থ তিনটিঃ (এক) শক্তিশালী, সংরক্ষক ও ক্ষমতাবান, (দুই) উপস্থিত ও দর্শক এবং (তিন) রুযী বন্টনকারী । উল্লেখিত বাক্যে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য । প্রথম অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের অর্থ হবে- আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান । যে কাজ করে এবং যে সুপারিশ করে তাদেরকে প্রতিদান কিংবা শাস্তিদান তাঁর পক্ষে কঠিন নয় । দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের অর্থ হবে- আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর পরিদর্শক । কে কোন নিয়তে সুপারিশ করে; আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যার্থে করে, না ঘুষ হিসেবে তার কাছ থেকে কোন মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে করে, তিনি সে সবই জানেন । তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের মর্ম হবে রিযিক ও রুযী বন্টনের কাজে আল্লাহ্ স্বয়ং যিম্মাদার । যার জন্য যতটুকু লিখে দিয়েছেন, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে । কারো সুপারিশে তিনি প্রভাবিত হবেন না; বরং যাকে যতটুকু ইচ্ছা দেবেন । তবে সুপারিশকারী ব্যক্তি মাঝখান থেকে সওয়াব পেয়ে যাবে । কেননা, এটা হচ্ছে দুর্বলের সাহায্য । হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য অব্যাহত রাখেন, যতক্ষণ সে কোন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে ব্যাপৃত থাকে । তোমরা সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে । অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় পয়গম্বরের মাধ্যমে যে ফয়সালা করেন তাতে সন্তুষ্ট থাক ।' [১৪৩২, মুসলিমঃ ২৬২৭] এ কারণেই কুরআনুল কারীমের

৮৬. আর তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তার চেয়ে উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অথবা সেটারই অনুরূপ করবে[১]; নিশ্চয়ই আল্লাহ্

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

ভাষায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, সুপারিশের সওয়াব ও আযাব সুপারিশ সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং সুপারিশ করলেই সর্বাবস্থায় সওয়াব অথবা আযাব হবে। আপনি ভাল সুপারিশ করলেই সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবেন এবং মন্দ সুপারিশ করলেই আযাবের যোগ্য হয়ে পড়বেন -আপনার সুপারিশ কার্যকরী হোক বা না হোক। তবে অন্যের কাছে সুপারিশ করেই সুপারিশকারী যেন ক্ষান্ত হয়ে যায়, তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মুক্ত করা বাঁদী বারীরা দাসী অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার পর তার স্বামী মুগীছের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান। মুগীছ বারীরার ভালবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়লে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগীছকে গ্রহণ করার জন্য বারীরার কাছে সুপারিশ করেন। বারীরা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এটি আপনার নির্দেশ হলে শিরোধার্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন তাতে সম্মত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ নির্দেশ নয়, সুপারিশই। বারীরা জানতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীতির বাইরে অসন্তুষ্ট হবেন না। তাই পরিস্কার ভাষায় বললেনঃ তাহলে আমি এ সুপারিশ গ্রহণ করবো না। [বুখারীঃ ৪৯৭৯]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা সালাম ও তার জবাবের আদব বর্ণনা করেছেন। মূলত: ‘আস-সালাম’ শব্দটি আল্লাহ্ তা‘আলার উত্তম নামসমূহের অন্যতম। যার অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তার আধার। বান্দা যখন এ কথা বলে তখন সে তার ভাইয়ের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা ও হেফাযত কামনা করে। সে হিসেবে ‘আস-সালামু আলাইকুম’ এর অর্থ, আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের সংরক্ষক। সালামের উৎপত্তি সম্পর্কে রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘আল্লাহ্ তা‘আলা যখন আদম ‘আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করেন তখন তার উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে সৃষ্টি করে বললেন, যাও, ফেরেশ্‌তাদের অবস্থানরত দলকে সালাম করো এবং মন দিয়ে শুনবে, তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয়। এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম। সুতরাং আদম ‘আলাইহিস্ সালাম গিয়ে বললেনঃ আসসালামু আলাইকুম। ফেরেশ্‌তাগণ জবাব দিলেন- ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ফেরেশ্‌তাগণ ওয়া রাহমাতুল্লাহ বৃদ্ধি করলেন। তারপর যারা জান্নাতে যাবে তারা প্রত্যেকেই আদম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তখন থেকে এখন পর্যন্ত মানুষের উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাস পেয়েই আসছে। [বুখারীঃ ৬২২৭] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক লোক এসে বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম, রাসূল তার সালামের জবাব

দিলেন। তারপর লোকটি বসল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ দশ। তারপর আরেকজন এসে বললঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ বিশ। তারপর আরও একজন এসে বললেনঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ ত্রিশ। [আবু দাউদঃ ৫১৯৫, তিরমিযীঃ ২৬৮৯]

এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, ইসলামী অভিবাদন অন্যান্য জাতির অভিবাদন থেকে উত্তম। জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পারিক দেখা-সাক্ষাতের সময় ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থে কোন কোন বাক্য আদান-প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী সালাম যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন জাতির অভিবাদন ততটুকু নয়। কেননা, এতে শুধু ভালবাসাই প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে ভালবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করা হয় যে, আল্লাহ্ আপনাকে সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। এতে এ বিষয়েরও অভিব্যক্তি রয়েছে যে, আমরা ও তোমরা - সবাই আল্লাহ্ তা‘আলার মুখাপেক্ষী। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা একে অপরের উপকার করতে পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি একাধারে একটি ‘ইবাদাত এবং মুসলিম ভাইকে আল্লাহ্‌র কথা মনে করিয়ে দেয়ার উপায়ও বটে। মোট কথা এই যে, ইসলামী সালামে বিরাট অর্থগত ব্যাপ্তি রয়েছে। যথা, (১) এটি আল্লাহ্‌র একটি নাম। তাছাড়া এতে রয়েছে আল্লাহ্ তা‘আলার যিক্‌র, (২) আল্লাহ্‌র কথা মনে করিয়ে দেয়া, (৩) মুসলিম ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না পরস্পরকে ভালবাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণ হবে না। আমি কি তোমাদেরকে একটা বিষয় শিক্ষা দিব, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে? তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।' [মুসলিমঃ ৫৪] (৪) মুসলিম ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম দো‘আ এবং (৫) মুসলিম ভাইয়ের সাথে এ চুক্তি যে, আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোন কষ্ট হবে না। সহীহ্ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ সে-ই প্রকৃত মুসলিম’। [বুখারী: ১৫; মুসলিম: ৪১] অমুসলিমরা কেউ যদি মুসলিমদেরকে সালাম দেয় তবে তার উত্তরে ‘ওয়া আলাইকুম’ পর্যন্ত বলতে হবে। কারণ, তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। যদি সে ভালো উদ্দেশ্যে বলে থাকে, তবে ভালো পাবে, আর যদি খারাপ উদ্দেশ্যে বলে, তবে এটা তার জন্য বদ দো‘আর কাজ করবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘ইয়াহূদীরা যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তোমরা প্রত্তোত্তরে ‘ওয়া আলাইকুম’ বা তোমাদের উপরও অনুরূপ

সবকিছুর হিসেব গ্রহণকারী(১) ।

৮৭. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রকৃত ইলাহ্ নেই; অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্র করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই ।(২) আর আল্লাহ্র চেয়ে বেশী সত্যবাদী কে? (৩)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ٨٧

বারতম রুকূ'

৮৮. অতঃপর তোমাদের কি হল যে, তোমরা মুনাফেকদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে? যখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন(৪) । আল্লাহ্ যাকে

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ
بِمَا كَسَبُوْا ۚ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ
اللّٰهُ ۖ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ٨٨

হোক এ কথাটি বলবে, কেননা তারা তোমাদের মৃত্যুর দো'আ করে থাকে। [বুখারীঃ ৬২৫৭; মুসলিমঃ ২১৬৪] তাছাড়া সালাম যেহেতু মুসলিমদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার, সেহেতু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য তা প্রয়োগ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে সালাম দিও না; যদি তাদের কারো সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তবে তাকে সংকীর্ণ পথে চলে যেতে বাধ্য করবে'। [মুসলিমঃ ২১৬৭]

(১) অর্থাৎ মানুষ এবং ইসলামী অধিকার; যথা সালাম ও সালামের জবাব ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোরও হিসাব নেবেন।

(২) আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তাঁকেই উপাস্য মনে কর এবং যে কাজই কর, তাঁর 'ইবাদাতের নিয়তে কর। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ দিন সবাইকে প্রতিদান দেবেন। কিয়ামতের ওয়াদা, প্রতিদান ও শাস্তির সওয়াব সব সত্য।

(৩) কেননা এ সংবাদ আল্লাহ্র দেয়া। আল্লাহ্র চাইতে কার কথা সত্য হতে পারে? তিনি নিজে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি আরও ঘোষণা করছেন যে, তিনি সবাইকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। সুতরাং এ তাওহীদ ও আখেরাতের ব্যাপারে কারও মনে কোন প্রকার সন্দেহ থাকা উচিত হবে না।

(৪) যায়েদ ইবন সাবেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? আর আল্লাহ্ কাউকেও পথভ্রষ্ট করলে আপনি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবেন না[১]।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۠ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا

৮৯. তারা এটাই কামনা করে যে, তারা যেরূপ কুফরী করেছে তোমরাও সেরূপ কুফরী কর, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। কাজেই আল্লাহ্‌র পথে হিজরত[২] না করা পর্যন্ত তাদের

ওয়াসাল্লাম যখন ওহুদের যুদ্ধে বের হলেন তখন তার সাথীদের মধ্য থেকে কিছু লোক ফিরে চলে আসলেন। তাদের ব্যাপারে সাহাবাগণ দ্বিমত পোষণ করলেন। কেউ বললেন হত্যা করব, কেউ বললেন হত্যা করব না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এই মদীনা নগরী কিছু মানুষকে দেশান্তর করে যেমনিভাবে আগুন দূর করে লোহার ময়লাকে। [বুখারীঃ ১৮৮৪, ৪০৫০, ৪৫৮৯, মুসলিমঃ ১৩৮৪, ২৭৭৬]

(১) এ আয়াতে যেভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্ট করেছেন, তাদের জন্য পথের দিশা পাওয়ার কোন উপায়ই অবশিষ্ট নেই। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তা স্পষ্ট বলেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আর আল্লাহ্ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আপনার কিছুই করার নেই। এরাই হচ্ছে তারা যাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চান না; তাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৪১] অন্য আয়াতে এসেছে, "আল্লাহ্ যাদেরকে বিপথগামী করেন তাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৬]

(২) হিজরত দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়- (১) দ্বীনের খাতিরে দেশ ত্যাগ করা, যেমন সাহাবায়ে কেরাম স্বদেশ মক্কা ছেড়ে মদীনা ও আবিসিনিয়ায় চলে যান। (২) পাপ কাজ বর্জন করা। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার হিজরত হচ্ছে নিজের দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয ছিল। এ কারণে যারা এ ফরয পরিত্যাগ করতো, তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের মত ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন। হিজরত সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'যতদিন তাওবা কবুল হওয়ার সময় থাকবে, ততদিন হিজরত বাকী থাকবে'। [আবু দাউদঃ ২৪৭৯] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, বর্তমানেও যদি কোন দেশে মুসলিমরা তাদের ঈমান টিকিয়ে রাখতে সামর্থ না হয়, তাদেরকে সেখান থেকে

وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾

মধ্য থেকে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে যেখানে পাবে গ্রেফতার করবে এবং হত্যা করবে আর তাদের মধ্য থেকে কাউকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করবে না।

إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ أَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ أَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾

৯০. কিন্তু তাদেরকে নয় যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, অথবা যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আগমন করে যখন তাদের মন তোমাদের সাথে বা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে সংকুচিত হয়। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন ফলে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন নি।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّأْمَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ۗ كُلَّمَا رُدُّوْٓا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَإِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا إِلَيْكُمُ

৯১. তোমরা আরো কিছু লোক অবশ্যই পাবে যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি চাইবে। যখনই তাদেরকে ফিত্নার দিকে

হিজরত করতে হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার হিজরত হচ্ছে, পাপকর্ম ত্যাগ করা। যেমন, এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'ঐ ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৯৯] এ হিজরত সর্বাবস্থায় একজন মুমিনের কর্তব্য। এর জন্য দেশ ত্যাগের প্রয়োজন পড়ে না।

السَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

মনোনিবেশ করানো হয় তখনই এ ব্যাপারে তারা তাদের আগের অবস্থায় ফিরে যায়। যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে চলে না যায়, তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে ও হত্যা করবে। আর আমরা তোমাদেরকে এদের বিরুদ্ধাচারণের স্পষ্ট অধিকার দিয়েছি[১]।

---

(১) উপরোক্ত ৮৮ থেকে ৯১ আয়াতসমূহে তিনটি দলের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে দু'টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এসব দলের ঘটনাবলী নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যাবে।

প্রথম বর্ণনাঃ তাফসীরকার মুজাহিদ বলেন, একবার কতিপয় মুশরিক মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করে এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলিম; হিজরত করে মদীনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা দ্বীনত্যাগী হয়ে যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কা চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। কেউ কেউ বলল এরা কাফের, আর কেউ কেউ বলল এরা মুমিন। আল্লাহ্ তা'আলা ৮৮ ও ৮৯ নং আয়াতে এদের কাফের হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান দিয়েছেন। [তাবারী] কাতাদা থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এরা ছিল তিহামার একটি গোত্র, তারা রাসূলকে বলল যে, আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করব না, আমাদের কাওমের সাথেও যুদ্ধ করব না। তারা রাসূল ও তাদের কাওমের যুগপৎ নিরাপত্তা চাচ্ছিল। তাদের অবস্থা বুঝে আল্লাহ্ তা'আলা তা মানতে অস্বীকার করেন। [ইবন আবী হাতেম; আত-তাফসীরুস সহীহ]

দ্বিতীয় বর্ণনাঃ হাসান বসরী বর্ণনা করেন যে, বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইবন মালেক মুদলাজী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানালো, আমাদের গোত্র বনী-মুদলাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করুন। তিনি খালেদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে সন্ধি সম্পন্ন করার জন্য সেখানে পাঠালেন। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল এইঃ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবো না। কুরাইশরা মুসলিম হয়ে গেলে আমরাও মুসলিম হয়ে যাবো। যেসব গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে, তারাও এ চুক্তিতে আমাদের অংশীদার। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৯০ নং আয়াত নাযিল হয়।

তেরতম রুকূ’

৯২. কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়[১], তবে ভুলবশত

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ

তৃতীয় বর্ণনাঃ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, ৯১ নং আয়াতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মদীনায় এসে বাহ্যতঃ নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করতো এবং স্বগোত্রের কাছে বলতো আমরা তো বানর ও বিচ্ছুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারাই আবার মুসলিমদের কাছে বলত, আমরা তোমাদের দ্বীনে আছি।

মোটকথা, এখানে তিন দল লোকের কথা উল্লেখিত হয়েছেঃ এক. মুসলিম হওয়ার জন্য যে সময় হিজরত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়, সে সময় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হিজরত না করে কিংবা হিজরত করার পর দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হারবে চলে যায়। দুই. যারা স্বয়ং মুসলিমদের সাথে ‘যুদ্ধ নয়’ চুক্তি করে কিংবা এরূপ চুক্তিকারীদের সাথে চুক্তি করে। তিন. যারা সাময়িকভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তিচুক্তি করে অতঃপর মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হলে তাতে অংশগ্রহণ করে এবং চুক্তিতে কায়েম না থাকে।

প্রথম দল সাধারণ কাফেরদের মত। দ্বিতীয় দল হত্যা ও ধরপাকড়ের আওতা বহির্ভুত এবং তৃতীয় দল প্রথম দলের অনুরূপ শাস্তির যোগ্য। এসব আয়াতে মোট দু’টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে; অর্থাৎ সন্ধিচুক্তি না থাকা কালে যুদ্ধ এবং সন্ধিচুক্তি থাকাকালে যুদ্ধ নয়।

(১) হত্যা সর্বমোট আট প্রকার। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয়তো মুসলিম, কিংবা যিম্মী, অথবা চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত, নতুবা দারুল হারবের কাফের হবে। এ চার অবস্থার কোন না কোন একটি হবেই। হত্যাকারী দু’প্রকারঃ হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভুলবশতঃ। অতএব, মোট প্রকার হল আটটিঃ (এক) মুসলিমকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (দুই) মুসলিমকে ভুলবশতঃ হত্যা, (তিন) যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (চার) যিম্মীকে ভুলবশতঃ হত্যা, (পাঁচ) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (ছয়) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভুলবশতঃ হত্যা (সাত) হারবী কাফেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা এবং (আট) হারবী কাফেরকে ভুলবশতঃ হত্যা। প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান হচ্ছে, কিসাস ওয়াজিব হওয়া। যা সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৮] আর আখেরাতে এর পরিণতি সূরা আন-নিসা এর ৯৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ভুলবশতঃ মুমিনকে হত্যার বর্ণনা আলোচ্য সূরা আন-নিসার ৯২ নং আয়াতে এসেছে। অর্থাৎ দিয়াত দিতে হবে। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যার হুকুম কি তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ যিম্মীকে ভুলবশতঃ হত্যার শাস্তি সূরা আন-নিসার ৯২ নং আয়াতের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেটারও দিয়াত দিতে হবে। পঞ্চম প্রকার অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ইচ্ছাকৃত

مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

করলে সেটা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় করা কর্তব্য, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় এবং মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যে সঙ্গতিহীন সে একাদিক্রমে দু মাস সিয়াম পালন করবে[১]। তাওবাহ্‌র

হত্যা। এর হুকুম সূরা আন-নিসার ৯০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ তাদের এবং যিম্মীদের হুকুম একই। কেননা, ৯০ নং আয়াতে উল্লেখিত مِيْثَاقٌ তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই হতে পারে। অতএব, যিম্মী ও অভয়প্রাপ্ত কাফের এর অন্তর্ভুক্ত। সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জিহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মাসআলা থেকে জানা গেছে। কেননা, জিহাদে দারুল হারবের কাফেরদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই হত্যা করা হয়। অতএব, ভুলবশতঃ হত্যার বৈধতা আরো সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে।

(১) কিসাস ও দিয়াতের বিধান সংশ্লিষ্টতার দিক থেকে হত্যা কয়েক প্রকারঃ প্রথম প্রকার عَمَدٌ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যা। এমন অস্ত্র দ্বারা, যা দ্বারা হত্যা করা যায়। এ ধরনের হত্যার শাস্তি হচ্ছে কিসাস। দ্বিতীয় প্রকার شِبْهُ عَمَدٍ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এইঃ ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যা দ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে। তৃতীয় প্রকার خطأ অর্থাৎ ভুলবশতঃ হত্যা। ইচ্ছা ও ধারণায় ভুল হওয়া। যেমন দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল-হারবের কাফের মনে করে লক্ষ্য স্থির করতঃ গুলী করে ফেলা কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলী ছোঁড়া; কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া। এগুলো সব ভুলবশতঃ হত্যার অন্তর্ভুক্ত। এখানে ভুল বলে 'ইচ্ছা নয়' বোঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে গোনাহ্‌ ও রক্ত-বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ' উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে পাঁচটি করে

জন্য এগুলো আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

৯৩. আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন[১]।

উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময়ও একশ' উট। কিন্তু উটগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত-বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দীনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ্ বেশী এবং তৃতীয় প্রকারের গোনাহ্ কম। অর্থাৎ শুধু অসাবধানতার গোনাহ্ হবে। কাফ্‌ফারা অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত-বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের যিম্মায় ওয়াজিব। শরী'আতের পরিভাষায় তাদেরকে 'আকেলাহ্' বলা হয়। এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ। এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরণের উচ্ছৃংখল কাজ-কর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ক্রটি করবে না। এর বাইরে অন্য এক প্রকার হত্যা রয়েছে। যাকে কোন কোন ফকীহ্ ভুলের পর্যায়ভুক্ত বলেছেন। যেমন, কেউ কূপ এমন স্থানে খনন করলো যে, একজন তাতে পড়ে মারা গেল। এর বিধান অবস্থাভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ যখন সূরা আল-ফুরকানের এ আয়াত নাযিল হল "আর তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে।" [আয়াতঃ ৬৮] তখন মক্কার মুশরিকরা বলতে লাগল, আমরা তো আল্লাহ্‌র হারাম করা আত্মাকে হত্যা করেছি, আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য ইলাহ্‌কেও ডেকেছি এবং ব্যভিচারও করেছি। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন "তারা নয়, যারা তাওবা করে, ঈমান আনে" সুতরাং এই আয়াতটুকু ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যাদের কথা পূর্বে এসেছে। কিন্তু সূরা আন-নিসার আয়াত "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।" এখানে ঐ লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে ইসলামকে ভালভাবে জানল, শরী'আতকে বুঝল, তারপর কোন

৯৪. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা করবে তখন যাচাই-বাছাই করে নেবে[১] এবং কেউ তোমাদেরকে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا

মুমিনকে হত্যা করল- তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। [বুখারীঃ ৩৮৫৫, ৪৭৬৪-৪৭৬৬, মুসলিমঃ ৩০২৩] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা আরো বলেনঃ এটি সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। একে কোন কিছু রহিত করেনি। [বুখারীঃ ৪৫৯০, মুসলিমঃ ৩০২৩] এতে বুঝা যায় যে, আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মত হল, যদি কেউ কোন মুমিনকে জেনেশুনে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে, তবে তার শাস্তি জাহান্নাম অবধারিত। আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লম বলেছেনঃ একজন মুমিন ব্যক্তি তার দ্বীনের ব্যাপারে মুক্তির সুযোগের মধ্যে থাকে যতক্ষন সে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা না করে। [বুখারীঃ ৬৮৬২] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের হত্যাকারীর জন্য তাওবাহ কবুল করতে আমার নিকট অস্বীকার করেছেন'। [আল-আহাদীসুল মুখতারাহঃ ৬/১৬৩, নং-২১৬৪] অন্য হাদীসে এসেছে, আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন দু মুসলিম তাদের অস্ত্র নিয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয় তখন হত্যাকারী ব্যক্তি ও হত্যাকৃত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী। আবু বাকরাহ বলেন, আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো স্পষ্ট, কিন্তু হত্যাকৃত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি জবাব দিলেন যে, সে তার সাথীকে হত্যা করার লালস করছিল। [বুখারীঃ ৬৮৭৫, মুসলিমঃ ২৮৮৮] হাদীসে আরো এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন প্রথম বিচার অনুষ্ঠিত হবে মানুষের রক্তক্ষরণ তথা হত্যার ব্যাপারে। [বুখারীঃ ৬৮৬৪, মুসলিমঃ ১৬৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হত্যাকারী কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, হত্যাকৃত ব্যক্তি হত্যাকারীর মাথা ধরে রাখবে এবং বলবেঃ হে রব! আপনি একে প্রশ্ন করুন, কেন আমাকে হত্যা করেছে? [ইবন মাজাহঃ ২৬২১, মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৪০]

(১) আয়াতের এ বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলিমরা কোন কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হচ্ছে- তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কাজ করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিমরূপে পরিচয় দেয়, কালেমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোন ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা আযান, সালাত ইত্যাদিতে যোগদান করে, তাকে মুসলিম মনে করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে মুসলিমদের মতই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলিম হয়েছে না কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, একথা প্রমাণ করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

সালাম করলে ইহ জীবনের সম্পদের আশায় তাকে বলো না, 'তুমি মুমিন নও[১]', কারণ আল্লাহ্‌র কাছে

প্রণিধানযোগ্য ও স্মরণযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাফের বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ, এরূপ কোন কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামী স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে মুসলিমই বলা হবে। তার সাথে মুসলিমের মতই ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারো থাকবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু কুফরী কালেমাও উচ্চারণ করে, অথবা প্রতিমাকে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোন অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাফেরদের কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে; যেমন গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তাকে সন্দেহাতীতভাবে কুফরী কাজকর্মের কারণে কাফের আখ্যা দেয়া হবে। তবে তাকে এ ব্যাপারে শরী'আতের জ্ঞান দিতে হবে এবং তার যদি এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে, সে সন্দেহ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে হবে। তারপরই কেবল তাকে কাফের বলা যাবে। নতুবা ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সবাই নিজেকে মুমিন-মুসলিম বলতো। মুসায়লামা কায্যাব শুধু কালেমার স্বীকারোক্তিই নয়, ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা আযান, সালাত ইত্যাদিরও অনুগামী ছিল। আযানে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর সাথে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্'ও উচ্চারণ করতো। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকেও নবী-রাসূল ও ওহীর অধিকারী বলে দাবী করতো, যা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। এ কারণেই তাকে দ্বীনত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়। তবে শর্ত এই যে, ঐ লোকের কাজটি যে ঈমান বিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে। আর তাকে সেটা জানাতে হবে এবং তার সন্দেহ থাকলে তা শরী'আতের দৃষ্টিতে অপনোদন করতে হবে।

(১) এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কেউ মুসলিম বলে নিজেকে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তার উক্তিকে কপটতা মনে করা কোন মুসলিমের জন্যই বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কোন কোন সাহাবী থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী-সুলাইমের এক ব্যক্তি একদিন ছাগলের পাল চরানো অবস্থায় একদল মুজাহিদ সাহাবীর সম্মুখে পতিত হয়। সে মুজাহিদ দলকে সালাম করল। তার পক্ষ থেকে এ বিষয়ের কার্যতঃ অভিব্যক্তি ছিল যে, সে একজন মুসলিম। কিন্তু মুজাহিদরা মনে করলো যে সে শুধু জীবন ও ছাগলের পাল রক্ষা করার জন্যই এ প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এ সন্দেহে তাঁরা লোকটিকে হত্যা করে তার ছাগলের পাল অধিকার করে নিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত করলেন।

فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো আগে এরূপই ছিলে[১], তারপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; কাজেই তোমরা যাচাই-বাছাই করে নেবে। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ

৯৫. মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়[২]। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদেরকে, যারা

এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামী পদ্ধতিতে তোমাকে সালাম করে, তার সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করো না যে, সে প্রতারণাপূর্বক নিজেকে মুসলিম বলে প্রকাশ করেছে। তার অর্থ-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ মাল মনে করে অধিকারে নিওনা। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/২৩৫, মুসনাদে আহমাদঃ ১/২২৯, ২৭২, ৩২৪, তিরমিযীঃ ৩০৩০]

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ দু'টি ঘটনা ছাড়া আরো দু'টি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এসব রেওয়ায়েতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। সমষ্টিগতভাবে কয়েকটি ঘটনাও আয়াতটি নাযিলের কারণ হতে পারে।

(১) অর্থাৎ তোমাদেরও আগে এমন এক সময় ছিল যখন তোমরা কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলে। যুলুম নির্যাতনের ভয়ে ইসলামের কথা বাধ্য হয়ে গোপন রাখতে। ঈমানের মৌখিক অঙ্গীকার ছাড়া তোমাদের কাছে তার আর কোন প্রমাণ ছিল না। এখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তোমরা সামাজিক জীবন-যাপনের সুবিধা ভোগ করছ। কাফেরদের মুকাবেলায় ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার যোগ্যতা লাভ করেছ। কাজেই যেসব মুসলিম এখনো প্রথম অবস্থায় আছে তাদের ব্যাপারে কোমল ব্যবহার ও সুবিধা দানের নীতি অবলম্বন না করলে তোমাদেরকে যে অনুগ্রহ করা হয়েছে, তার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না।

(২) বারা' ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ যখন নাযিল হল "মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়" তখন আব্দুল্লাহ্ ইবন উম্মে মাকতূম এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি তো অন্ধ। তখন নাযিল হল "যারা অক্ষম নয়"-এ অংশটুকু। [বুখারীঃ ২৮৩১, ৪৫৯৩, মুসলিমঃ ১৮৯৮]

اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ﴿٩٥﴾

ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন(১); তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

৯৬. এসব তাঁর কাছ থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

চৌদ্দতম রুকূ'

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۙ﴿٩٧﴾

৯৭. যারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফিরিশ্তাগণ বলে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম;' তারা বলে, 'আল্লাহ্র যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে(২)?' এদেরই

(১) আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবু সাঈদ! যে আল্লাহ্কে রব হিসাবে মেনে সন্তুষ্ট, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আবু সাঈদ এটা শুনে আশ্চার্য হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে আবার বলুন। রাসূল তাই করলেন। তারপর বললেনঃ 'আরো কিছু কাজ রয়েছে, যার দ্বারা জান্নাতে বান্দার মর্যাদা উন্নত করা হয়, দু'স্তরের মাঝখানের দূরত্ব আসমান ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের মত। তিনি বললেন, সেটা কি? হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূল বললেনঃ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ। [মুসলিমঃ ১৮৮৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'জান্নাতের একশত স্তর রয়েছে, দু'স্তরের মাঝখানের দূরত্ব শত বৎসরের' [তিরমিযীঃ ২৫২৯]

(২) হিজরত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন রকমের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে।

আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস[১]!

৯৮. তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না।

إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

(এক) হিজরতের ফযীলত, (দুই) হিজরতের দুনিয়া ও আখেরাতের বরকত ও (তিন) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দারুল-কুফর থেকে হিজরত না করার কারণে শাস্তিবাণী।

হিজরতের ফযীলতঃ এ বিষয়ে সূরা বাকারার এক আয়াতে রয়েছে- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾- অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ-প্রার্থী। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়"। [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ২১৮] অনুরূপভাবে আছে- ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ﴾ – অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী এবং তারাই সফলকাম"। [সূরা আত্-তাওবাহ্ঃ ২০] অন্যত্র এসেছে ﴿وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ﴾ – অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পথেই মৃত্যুবরণ করে তার সওয়াব আল্লাহ্‌র যিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়"। [সূরা আন্-নিসাঃ ১০০] মোটকথা, উপরোক্ত তিনটি আয়াতে দারুল-কুফর থেকে হিজরতে উৎসাহ দান এবং এর বিরাট ফযীলত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'হিজরত পূর্বকৃত সব গোনাহ্‌কে নিঃশেষ করে দেয়'। [মুসলিমঃ ১২১; সহীহ ইবন খুযাইমাহঃ ২৫১৫]

হিজরতের বরকতঃ হিজরতের বরকত সম্পর্কে সূরা নাহ্‌লের ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যারা আল্লাহ্‌র জন্য হিজরত করে নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দান করবো এবং আখেরাতের বিরাট সওয়াব তো রয়েছেই, যদি তারা বুঝে।" সূরা নিসার উল্লেখিত চার আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা ও সুযোগ-সুবিধা পাবে"।

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ কিছু মুসলিম কাফেরদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অংশগ্রহণ করত। এতেকরে কাফেরদের পাল্লা ভারী হত। কিন্তু যুদ্ধের সময় কোন কোন তীর এসে তাদেরকে হত্যা করত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে তাদেরকে এ অবস্থায় থাকা থেকে নিষেধ করেছেন। [বুখারীঃ ৪৫৯৬, ৭০৮৫]

৯৯. আল্লাহ্ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, কারণ আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

فَأُولَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

১০০. আর কেউ আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে। আর কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ ঘর থেকে মুহাজির হয়ে বের হবার পর তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র উপর; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

পনরতম রুকূ'

১০১. তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিত্না সৃষ্টি করবে, তবে সালাত 'কসর[২]' করলে তোমাদের কোন

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, হিজরত বাধ্যতামূলক হওয়ার সংবাদ পেয়ে অনেক সাহাবী মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে বের হওয়ার পর পথিমধ্যেই বিভিন্ন কারণে মারা যান। এতে কাফেররা তাদেরকে বিভিন্নভাবে উপহাস করতে আরম্ভ করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, যাতে বলা হয়েছে যে, কেউ খাঁটি নিয়তে আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করতে বের হলেই তার পক্ষ থেকে হিজরত ধরে নেয়া হবে। [দেখুন- মুসনাদে আবি ইয়া'লাঃ ২৬৭৯] আবার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, খালেদ ইবন হিযাম আবিসিনিয়ায় হিজরতকালে পথিমধ্যে সর্প-দংশনে মারা যান। তখন লোকেরা তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে থাকায় এ আয়াত নাযিল হয়। [তাবাকাতে ইবন সা'দ]

(২) কসর শুধু চার রাকা'আতের ফরয সালাতের বেলায় হবে। মাগরিব ও ফযরের সালাতে কোন কসর নেই। পূর্ণ সালাতের স্থলে অর্ধেক সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে কারো মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করে যে, বোধহয় এতে সালাত পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। কারণ, কসরও শরী'আতেরই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গোনাহ্ হয় না; বরং সওয়াব পাওয়া যায়। ইয়া'লা ইবন উমাইয়্যা বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে এ আয়াতে বর্ণিত 'যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিত্না

দোষ নেই। নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১০২. আর আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন তারপর তাদের সাথে সালাত কায়েম করবেন[১] তখন তাদের একদল আপনার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজ্‌দা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা আপনার সাথে যেন সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে[২]। কাফেররা

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

সৃষ্টি করবে' এটা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলাম যে, এখন তো মানুষ নিরাপদ হয়েছে তারপরও সালাতের কসর পড়ার কারণ কি? তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি যেটাতে আশ্চার্য হয়েছ, আমিও সেটাতে আশ্চার্যবোধ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'এটা একটি সদকা যেটি আল্লাহ্ তোমাদের উপর সদকা করেছেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র সদকা গ্রহণ কর'। [মুসলিমঃ ৬৮৬]

(১) আয়াতে বর্ণিত সালাতটিকে বলা হয়, 'সালাতুল খাওফ' বা ভয়-ভীতিকালীন নামায। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার 'উসফান' উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। রাসূল সাহাবাদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করতে দেখে কাফেরদের কেউ কেউ বলে বসল যে, এ সময় যদি আক্রমণ করা যেতো তবে তাদেরকে জব্দ করা যেতো। তখন তাদের একজন বলল, এরপর তাদের আরেকটি সালাত রয়েছে, যা তাদের কাছে আরও প্রিয়। অর্থাৎ আসরের সালাত। তখন তাদের কেউ কেউ সে সময়ে মুসলিমদের উপর আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করলে, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে 'সালাতুল খাওফ' পড়ার নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করে দেন। [মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ ২/৪৬৩; মুসান্নাফ আবদির রাযযাক ২/৫০৫; মুসনাদে আহমাদ ৪/৫৯; আবুদাউদ ১২৩৬; নাসায়ীঃ ১৭৭; মুস্তাদরাকে হাকিম ২/৩০৮]

(২) আয়াতে বলা হয়েছেঃ আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন-এতে এরূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল খওফ'- বা ভয়-ভীতিকালীন নামায- এর বিধান নেই। কেননা, তখনকার

কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও বা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নেই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى

১০৩. অতঃপর যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে[১], অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন

অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে। নবী বিদ্যমান থাকলে ওযর ব্যতীত অন্য কেউ সালাতে ইমাম হতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর এখন যে ইমাম হবেন, তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল খওফ' পড়াবেন। সব ফেকাহ্‌বিদের মতে 'সালাতুল খওফ'-এর বিধান এখনো অব্যাহত রয়েছে, রহিত হয়নি। মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশংকার কারণে 'সালাতুল খওফ' পড়া যেমন জায়েয, তেমনিভাবে যদি বাঘ-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং সালাতের সময়ও সংকীর্ণ হয়, তাহলে তখনো 'সালাতুল খওফ' পড়া জায়েয। আয়াতে উভয় দলের এক এক রাকা'আত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাকা'আতের নিয়ম হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকা'আতের পর সালাম ফিরিয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বুখারী: ৯৪২; মুসলিম: ৩০৫, ৩০৬; তিরমিযী: ৩০৩৫; আবু দাউদ: ১২৪২]

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখনই কোন ফরয তার বান্দাদের উপর অবধারিত করে দিয়েছেন তখনই সেটার একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তারপর যারা সেটা করতে সক্ষম হবে না তাদেরকে ভিন্ন পথ বাতলে দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, 'আল্লাহ্‌র যিকর'। এই যিকর এর ব্যাপারে যতক্ষণ কেউ সুস্থ বিবেকসম্পন্ন থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে ওযর আপত্তি পেশ করার সুযোগ দেন নি। সর্বাবস্থায় তাকে যিকর করতে হবে। রাত-দিন, জল-স্থল, সফর-মুকীম, ধনী-দরিদ্র, সুস্থ-অসুস্থ, গোপন-প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকর চালিয়ে যেতে হবে। এ আয়াতের এটাই ভাষ্য। [তাবারী, আত-তাফসীরুস সহীহ]

الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾

যথাযথ সালাত কায়েম করবে[১]; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য[২]।

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. আর শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হয়ো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা যা আশা কর ওরা তা আশা করে না[৩]। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ যখন তোমরা নিরাপদ হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করবে, তখন পূর্ণরূপ সালাত আদায় করবে। [তাবারী] অর্থাৎ কেউ যেন মনে না করে বসে যে, তাদের সালাত কমে গেছে বা কম পড়লেও চলবে।

(২) এখানে নির্ধারিত সময় বলে, সালাতের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যেক সালাতের জন্য নির্ধারিত ওয়াক্তসমূহকে বোঝানো হয়েছে। এখানে সে ওয়াক্তসমূহ বলে দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে অন্য আয়াতে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, “সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়” [সূরা আল-ইসরা: ৭৮] পাশাপাশি হাদীসে সালাতের ওয়াক্তের বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘সালাতের প্রথম ও শেষ সময় রয়েছে। যোহরের সালাতের প্রথম সময় হচ্ছে যখন সূর্য হেলে যাবে। আর শেষ সময় হচ্ছে, আসরের ওয়াক্ত প্রবেশ করা পর্যন্ত। অনুরূপভাবে আসরের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন এর ওয়াক্ত হবে। আর তার শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত। তদ্রূপ মাগরিবের প্রথম সময় হচ্ছে যখন সূর্য ডুবে যায়। তার শেষ সময় হচ্ছে, যখন দিগন্ত রেখা চলে যায়। আর এশার প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন দিগন্ত রেখা চলে যায়। আর শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে, মধ্য রাত পর্যন্ত। ফজরের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন সুবহে সাদিক উদিত হয়। আর শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন সূর্য উদিত হয়।’ [তিরমিযী: ১৫১]

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা সওয়াব, রহমত ও উঁচু মর্যাদা আশা কর, যা তারা করে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত ও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও” [সূরা আলে ইমরান: ১৩৯] আরও বলেন, “কাজেই তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, যখন তোমরা প্রবল; আর আল্লাহ্ তোমাদের সংগে আছেন এবং তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ন করবেন না” [সূরা মুহাম্মাদ: ৩৫]

ষোলতম রুকূ'

১০৫. আমরা[১] তো আপনার প্রতি সত্যসহ

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ

(১) সূরা আন-নিসার ১০৫ থেকে ১১৩ নং আয়াত এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঘটনাটি হচ্ছে, হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ মুসলিমদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের আটা কিংবা খেজুর কিংবা গমের আটা। এগুলো প্রায়ই মদীনায় পাওয়া যেতো না। সিরিয়া থেকে কোন চালান এলে কেউ কেউ তা সংগ্রহ করে রাখত। রিফা'আ ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের কিছু গমের আটা সংগ্রহ করে একটি বস্তায় রেখে দিয়েছিলেন। এ বস্তার মধ্যে কিছু অস্ত্র-শস্ত্রও রেখে একটি ছোট কক্ষে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। মদীনাতে তখন বনু উবাইরাক গোত্রের বিশর, বশীর ও মুবাশশির নামীয় তিন লোক বিশেষ কারণে খ্যাতি লাভ করেছিল। তন্মধ্যে বশীর ছিল প্রকৃতই মুনাফিক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বদনামী করে কবিতা রচনা করে অন্যের নামে চালিয়ে দিত। সেই বশীর সিঁধ কেটে রিফা'আ ইবন যায়েদের সে বস্তা বের করে নেয়। সকালে রিফা'আ রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যাপারটি তার ভ্রাতুষ্পুত্র কাতাদার কাছে বিবৃত করলেন। বনু উবায়রাক বললো, সম্ভবত এটা লবীদ ইবন সাহলের কীর্তি। লবীদ ইবন সাহল তা শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং তরবারী কোষমুক্ত করে বললেন, আমার উপর অপবাদ চাপানো হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পন্থায় কাতাদা ও রিফা'আ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এটি বনী উবাইরাকের কীর্তি। তখন কাতাদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে চুরির ঘটনা এবং তদন্তক্রমে বনু উবাইরাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনু উবায়রাক সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে রিফা'আ ও কাতাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরী'আতসম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করছে। আপনি তাদেরকে বারণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই করলেন। কিন্তু বেশীদিন অতিবাহিত না হতেই এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। যার মাধ্যমে সমস্ত ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তুলে ধরা হয়। প্রথমে আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমরা তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহ্ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে পারেন এবং বিশ্বাসঘাতকদের অর্থাৎ বনী উবাইরাক এর সমর্থনে তর্ক করবেন না।' আর আপনি ধারণার বশবর্তী হয়ে সাহাবী কাতাদা ইবন নু'মানকে যা বলা হয়েছে সে জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থী হোন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাস ভংগকারী পাপীকে পছন্দ করেন না। তারা মানুষ থেকে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্‌র থেকে গোপন করে না, অথচ তিনি তাদের সংগেই আছেন রাতে যখন তারা, তিনি যা পছন্দ করেন না- এমন বিষয়ে পরামর্শ করে এবং তারা যা করে

بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহ্ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে পারেন। আর আপনি বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন না[১]।

তা সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে। দেখ, তোমরাই ইহ জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে কে তাদের পক্ষে বিতর্ক করবে অথবা কে তাদের উকিল হবে? কেউ কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে পরে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে। অর্থাৎ যদি তারা ক্ষমা প্রার্থী হতো তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের ক্ষমা করে দিতেন। আর কেউ পাপ কাজ করলে সে ওটা তার নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। কেউ কোন দোষ বা পাপ করে পরে ওটা কোন নির্দোষ ব্যক্তি অর্থাৎ লবীদ ইবন সাহলের প্রতি আরোপ করলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলকে উদ্দেশ্য করে নাযিল করলেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করে না এবং আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ রয়েছে।' এ আয়াতসমূহ নাযিল হলে মূল ঘটনা স্পষ্ট হয়ে গেল। বনু উবাইরাকের কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিফা'আর কাছে তা ফেরৎ দিলেন। তিনি সে সমুদয় আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিলেন। এদিক বিশর মুনাফেকী অবস্থা ধরা পড়ে যাওয়ার কারণে মক্কায় সুলাফা বিনতে সা'দ ইবন সুমাইয়া নামীয় এক মহিলার কাছে গিয়ে সরাসরি মুর্তাদ হয়ে গেল। তখন ১১৫ নং আয়াত নাযিল হলো, যাতে হক প্রকাশিত হওয়ার পরে রাসূলের বিরুদ্ধাচারণের কারণে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে।' [তিরমিযীঃ ৩০৩৬; মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৩৮৫] ঘটনা যাই হোক, কুরআনের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে প্রদত্ত নির্দেশাবলী এ ঘটনার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগমনকারী মুসলিমদের জন্য ব্যাপক। এছাড়া এসব নির্দেশের মধ্যে অনেক মৌলিক ও শাখাগত মাসআলাও রয়েছে।

(১) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্‌র কসম অবশ্যই আমি দিনে সত্তর বারেরও অধিক আল্লাহর নিকট এস্তেগফার এবং তাওবা করে থাকি। [বুখারীঃ ৬৩০৭]

وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝١٠٦

১০৬. আর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَھُمْ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ۝١٠٧

১০৭. আর যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বিবাদ-বিসম্বাদ করবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারী পাপীকে পছন্দ করেন না ।

يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ
اللّٰهِ وَھُوَ مَعَھُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ
الْقَوْلِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝١٠٨

১০৮. তারা মানুষ থেকে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্‌র থেকে গোপন করে না, অথচ তিনি তাদের সংগেই আছেন রাতে যখন তারা, তিনি যা পছন্দ করেন না- এমন বিষয়ে পরামর্শ করে এবং তারা যা করে আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে আছেন ।

ھٰٓاَنْتُمْ ھٰٓؤُلَاۗءِ جٰدَلْتُمْ عَنْھُمْ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۣ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْھُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْھِمْ وَكِيْلًا ۝١٠٩

১০৯. দেখ, তোমরাই ইহ জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে কে তাদের পক্ষে বিতর্ক করবে অথবা কে তাদের উকিল হবে?

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْۗءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ
اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝١١٠

১১০. আর কেউ কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে পরে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে[১] ।

(১) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহ্‌র হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গোনাহ্ই তাওবা ও ইস্তেগফারের দ্বারা মাফ হতে পারে । তবে তাওবা ও ইস্তেগফারের স্বরূপ জানা জরুরী । শুধু মুখে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্ ওয়া আতুবু ইলাইহি' বলার নাম তাওবা ও ইস্তেগফার নয় । তাই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সে জন্য অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করতে সংকল্পবদ্ধ না হয়, তবে মুখে মুখে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলা তাওবার সাথে উপহাস বৈ কিছু নয় । তাওবার জন্য মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরীঃ

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾

১১১. আর কেউ পাপ কাজ করলে সে ওটা তার নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾

১১২. আর কেউ কোন দোষ বা পাপ করে পরে সেটা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে[১]।

সতরতম রুকূ'

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

১১৩. আর আপনার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করে না এবং আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন[২] এবং

(এক) অতীত গোনাহ্র জন্য অনুতপ্ত হওয়া, (দুই) উপস্থিত গোনাহ্ অবিলম্বে ত্যাগ করা এবং (তিন) ভবিষ্যতে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। তাছাড়া বান্দাহ্র হকের সাথে যেসব গোনাহ্র সম্পর্ক, সেগুলো বান্দাহ্র কাছ থেকেই মাফ করিয়ে নেয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেয়া তাওবার অন্যতম শর্ত।

(১) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, যে লোক নিজে পাপ করে এবং অপর নিরপরাধ ব্যক্তিকে সেজন্য অভিযুক্ত করে, সে নিজ গোনাহ্কে দ্বিগুণ ও অত্যন্ত কঠোর করে দেয় এবং নির্মম শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। একে তো নিজের আসল গোনাহ্র শাস্তি, দ্বিতীয়তঃ অপবাদের কঠোর শাস্তি।

(২) এ আয়াতে 'কিতাব'-এর সাথে 'হেকমত' শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ ও শিক্ষার নাম যে 'হেকমত' তাও আল্লাহ্ তা'আলারই নাযিলকৃত। পার্থক্য এই যে, সুন্নাহ্র শব্দাবলী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। এ কারণেই তা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য কুরআন ও সুন্নাহ্ উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত। তাই উভয়ের বাস্তবায়নই ওয়াজিব। সে জন্যই আলেমগণ বলেন, ওহী দুই প্রকারঃ (এক) مَتْلُوّ যা তিলাওয়াত করা হয় এবং (দুই) غَيْرُ مَتْلُوّ যা তিলাওয়াত করা হয় না। প্রথম প্রকার ওহী কুরআনকে বলা হয়, যার অর্থ ও শব্দাবলী উভয়ই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। দ্বিতীয় প্রকার

আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ রয়েছে ।

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

১১৪. তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় সাদকাহ, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের[১]; আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমরা মহা পুরস্কার দেব ।

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

১১৫. আর কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস[২]!

ওহী হাদীস বা সুন্নাহ্ । এর শব্দাবলী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং মর্ম আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ।

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মানুষের মধ্যে ভাল কিছু ইশারা করে বা বলে শান্তি স্থাপন করে দেয় । [বুখারীঃ ২৬৯২, মুসলিমঃ ২৬০৫] অন্য হাদীসে এসেছে, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না এমন কাজ যা সিয়াম, সালাত ও সদকা থেকেও উত্তম? তারা বললঃ অবশ্যই । রাসূল বললেনঃ মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া । কেননা, মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হওয়া গর্দান কাটার সমান ।' [তিরমিযীঃ ২৫০৯]

(২) এ আয়াত থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বের হয় । এক. আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরোধিতাকারী জাহান্নামী । দুই. কোন ব্যাপারে হক তথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত প্রকাশিত হওয়ার পর সেটার বিরোধিতা করাও জাহান্নামীদের কাজ । তিন. এ উম্মতের ইজমা বা কোন বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছার পর

আঠারতম রুকূ'

১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না; আর তার থেকে ছোট যাবতীয় গোনাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন, আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করে সে ভীষণভাবে পথ ভ্রষ্ট হয়।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾

১১৭. তাঁর পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে[১]।

إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلَّآ إِنٰثًا ۚ وَإِنْ يَّدْعُوْنَ إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾

১১৮. আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেন এবং সে বলে, 'আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নেব।

لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾

১১৯. আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব; অবশ্যই তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করব, আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে। আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা

وَّلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

সেটার বিরোধিতা করা অবৈধ। কারণ, তারা পথভ্রষ্টতায় একমত হবে না। মুমিনদের মত ও পথের বিপরীতে চলার কোন সুযোগ নেই।

(১) বর্তমান পৃথিবীতে ইয়াযিদী ফের্কা ছাড়া শয়তানকে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা করে না বা তাকে সরাসরি আল্লাহ্‌র মর্যাদায় অভিষিক্ত করে না। এ অর্থে কেউ শয়তানকে মা'বুদ বানায় না একথা সত্য; তবে নিজের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা-আকাংখা ও চিন্তা-ভাবনার লাগাম শয়তানের হাতে তুলে দিয়ে যেদিকে সে চালায় সেদিকেই চলা এবং এমনভাবে চলা যেন সে শয়তানের বান্দা ও শয়তান তার প্রভু- এটাই তো শয়তানকে মা'বুদ বানাবার একটি পদ্ধতি। এ থেকে জানা যায়, বিনা বাক্য ব্যয়ে নির্দেশ মেনে চলা এবং অন্ধভাবে কারো হুকুম পালন করার নামই ইবাদাত। আর যে ব্যক্তি এভাবে কারো আনুগত্য করে, সে আসলেই তার ইবাদাত করে।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করবে(১) ।' আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতঃই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

১২০. সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে । আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র ।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

১২১. এদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা থেকে তারা নিস্কৃতির উপায় পাবে না ।

أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

১২২. আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আমরা তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য । আর কে আল্লাহ্‌র চেয়ে কথায় সত্যবাদী(২) ?

وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

---

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত করেছেন সে সমস্ত মহিলাদের উপর যারা শরীর কেটে উল্কি আঁকে এবং যারা এ অংকনের কাজ করে, আরো লা'নত করেছেন যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ভ্রূ কাটে এবং যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত কাটে । আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে । [বুখারীঃ ৪৮৮৬] আয়াতে বর্ণিত, ﴿خَلْقَ اللّٰهِ﴾ অর্থ উপরে করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি । এর আরেক অর্থ, 'আল্লাহ্‌র দ্বীন' । যা ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে । [তাবারী] সুতরাং দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার জন্যও শয়তান কিছু লোককে নিয়োজিত করবে ।

(২) বস্তুত: আল্লাহ্‌র কথা বা বাণীর উপর কারও কথা সত্য হতে পারে না । আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সবচেয়ে উত্তম বাণী হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কিতাব । আর সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেয়া পদ্ধতি । আর সবচেয়ে খারাপ কাজ হচ্ছে, দ্বীনে প্রবর্তিত নতুন পদ্ধতিসমূহ, আর তোমাদেরকে যার ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই আসবে, তোমরা তাঁকে অপারগ করে দিতে সক্ষম নও ।' [বুখারী: ৭২৭৭; মুসনাদে আহমাদ ৩/৩১০]

১২৩. তোমাদের খেয়াল-খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হবে না[১]; কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে[২] এবং আল্লাহ্ ছাড়া তার জন্য সে কোন অভিভাবক ও সহায় পাবে না।

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتٰبِ ۗ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾

---

(১) আয়াতে মুসলিম ও আহলে-কিতাবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি কথোপকথন উল্লেখিত হয়েছে। এরপর কথোপকথন বিচার করে উভয় পক্ষকে বিশুদ্ধ হেদায়াত দেয়া হয়েছে। অবশেষে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার একটি মানদণ্ড ব্যক্ত করা হয়েছে, যা সামনে রাখলে মানুষ কখনো ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার শিকার হবে না। এতে বলা হয়েছে যে, এ গর্ব ও অহংকার কারো জন্য শোভা পায় না। শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবী দ্বারা কেউ কারো চাইতে শ্রেষ্ঠ হয় না; বরং প্রত্যেকের কাজকর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। কারো নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে। এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে- এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না।

(২) এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ "যে কেউ কোন অসৎকাজ করবে, সে জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে"। আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন আমরা খুব দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললামঃ এ আয়াতটি তো কোন কিছুই ছাড়েনি। সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেয়া হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ চিন্তা করো না, সাধ্যমত কাজ করে যাও। কেননা, (উল্লেখিত শাস্তি যে জাহান্নামই হবে, তা জরুরী নয়) তোমরা দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট বা বিপদাপদে পড়, তাতে তোমাদের গোনাহ্র কাফ্ফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে। এমনকি যদি কারো পায়ে কাঁটা ফুটে, তাও গোনাহ্র কাফ্ফারা বৈ নয়।' [মুসলিমঃ ২৫৭৪] অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'মুসলিম দুনিয়াতে যে কোন দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখ অথবা ভাবনা-চিন্তার সম্মুখীন হয়, তা তার গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়।' [বুখারীঃ ৫৬৪১, মুসলিমঃ ২৫৭৩] অন্য হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে কিছু বিপদাপদ দিয়ে থাকেন'। [বুখারী: ৫৬৪৫] মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শুধু দাবী ও বাসনায় লিপ্ত হয়ো না; বরং কাজের চিন্তা কর। কেননা, তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী- শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদনুযায়ী সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে।

১২৪. আর পুরুষ বা নারীর মধ্যে কেউ মুমিন অবস্থায় সৎ কাজ করলে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾

১২৫. তার চেয়ে দ্বীনে আর কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের মিল্লাতকে অনুসরণ করে? আর আল্লাহ্ ইব্‌রাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন[১]।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾

১২৬. আর আস্‌মান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং সবকিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾

ঊনিশতম রুকূ'

১২৭. আর লোকে আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও[২] এবং অসহায়

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿١٢٧﴾

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মনে রেখ, আমি প্রত্যেক অন্তরঙ্গ বন্ধুর অন্তরঙ্গতা থেকে বিমুক্ত ঘোষণা করছি, যদি আমি কাউকে 'খলীল' বা অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি নিজেই) আল্লাহ্‌র খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু। [মুসলিম: ২৩৮৩] মূলতঃ খলীল বলা হয়, এমন বন্ধুত্বকে যার বন্ধুত্ব অন্তরের অন্তঃস্থলে জায়গা করে নিয়েছে। অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেভাবে আল্লাহ্‌র খলীল, তেমনিভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহ্‌র খলীল।

(২) উরওয়া ইবন যুবাইর বলেন, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তখনকার সময় কারও কারও তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম

শিশুদের সম্বন্ধে ও ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে যা কিতাবে তোমাদেরকে শুনান হয়, তাও পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেন'। আর যে কোন সৎকাজ তোমরা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞানী।

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

১২৮. আর কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন গোনাহ্ নেই এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়। মানুষের অন্তরসমূহে লোভজনিত কৃপণতা বিদ্যমান। আর যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও ও মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তার খবর রাখেন(১)।

মেয়েরা থাকতো। তারা সে সব ইয়াতীম মেয়েদেরকে মাহ্‌র না দিয়েই বিয়ে করতে চাইতো। তখন এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। কিন্তু এর বাইরেও কিছু ইয়াতিম থাকতো যাদের সম্পদ ও সৌন্দর্য ছিল না। তারা তাদেরকে বিয়ে করতে চাইতো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [মুসলিম: ৩০১৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, জাহেলিয়াত যুগে কারও কাছে ইয়াতিম থাকলে সে তার উপর একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিত। যাতে করে অন্যরা তাকে বিয়ে করতে সমর্থ না হয়। তারপর যদি মেয়েটি সুন্দর হতো, তাহলে সে তাকে বিয়ে করত এবং তার সম্পদ নিয়ে নিত। পক্ষান্তরে অসুন্দর হলে সে তাকে আমৃত্যু বিয়ে দিতে বাধা দিত। এভাবে সে তার মৃত্যুর পর তার সম্পদের মালিক বনে যেত। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেটা নিষেধ করে দেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ এ আয়াতটি এমন মহিলা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে কোন পুরুষের কাছে ছিল কিন্তু তার সন্তান-সন্ততি হওয়ার সম্ভাবনা পেরিয়ে গেছে। ফলে সে তাকে তালাক দিয়ে আরেকটি বিয়ে করতে চাইল। তখন সে মহিলা বলল, আমাকে তালাক দিও না, আমাকে রাত্রির ভাগ দিও না। [বুখারীঃ ৪৬০১, আবু দাউদঃ ২১৩৫] ইবন আব্বাস বলেন, এ জাতীয় মীমাংসা শরী'আত অনুমোদন করেছে। [তিরমিযী: ৩০৪০] ইবন আব্বাস থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে,

১২৯. আর তোমরা যতই ইচ্ছে কর না | وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ

তিনি এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ আয়াত সে মহিলার ব্যাপারে, যে কোন লোকের স্ত্রী হিসেবে রয়েছে, সে লোক সাধারণতঃ স্ত্রীর কাছে যা কামনা করে তার কাছে তা দেখতে পায় না। আর সে লোকের অন্য স্ত্রীও রয়েছে। সে লোক অন্য স্ত্রীদেরকে তার উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা সে লোককে নির্দেশ দিচ্ছেন, সে যেন ঐ স্ত্রীকে এটা বলে যে, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, আমি তোমার উপর অন্যকে প্রাধান্য দিচ্ছি। তারপরও যদি তুমি আমার কাছে থাকতে চাও তবে আমি তোমার খোরপোষ দিব, তোমার সমব্যথী হব, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি আমার সাথে এ পরিস্থিতিতে থাকতে না চাও, তবে তোমার পথ ছেড়ে দেব। তুমি ইচ্ছা করলে চলে যাবে। এ কথা বলার পর যদি সে মহিলা সেটার উপর রাযি হয়, তবে সে পুরুষের জন্য আর কোন গোনাহ থাকবে না। তাই এখানে যে 'সুলহ' বলা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে, 'স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেয়া'। যার মাধ্যমে মীমাংসার পথ সুগম হয়। পরিবারের সমস্যা দূরিভুত হয়। [তাবারী; ইবন আবী হাতেম; আত-তাফসীরুস সহীহ]

মূলত: এ আয়াতটি এমনি সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পারিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করে। যেমন একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা কিংবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না, অন্য দিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়। এহেন পরিস্থিতিতে উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করে রাখতে হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করতে হয়। এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য কোন কোন অধিকারের ন্যায্য দাবী আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাবে। দায়-দায়িত্ব ও ব্যয়ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়ত এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে। কাজেই স্ত্রী হয়ত মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে, অথবা অনত্র আমার জীবন আরো দুর্বিসহ হতে পারে। তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই লাভজনক। স্বামী হয়ত মনে করবে যে, দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? অতএব, এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে।

حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না[১] ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না; যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

১৩০. আর যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়[২]।

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যার দু'জন স্ত্রী আছে তারপর সে একজনের প্রতি বেশী ঝুঁকে গেল, কেয়ামতের দিন সে এমনভাবে আসবে যেন তার একপার্শ্ব বাঁকা হয়ে আছে।' [আবু দাউদঃ ২১৩৩] তবে আয়াতে যে আদল বা ইনসাফের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, "আর তোমরা যতই ইচ্ছে কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি আদল বা সার্বিক সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না" সেটা হচ্ছে, ভালবাসা ও স্বাভাবিক মনের টান। কেননা, কোন মানুষই দু'জনকে সবদিক থেকে সমান ভালবাসতে পারে না। তবে শরী'আত নির্ধারিত অধিকার যেমন, রাত্রী যাপন, সহবাস, খোরপোষ ইত্যাদির ব্যাপারে 'আদল' অবশ্যই করা যায় এবং করতে হবে। সেটা না করতে পারলে তাকে একটি বিয়েই করতে হবে। যার কথা এ সূরারই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'আর যদি তোমরা আদল বা সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে না পার, তবে একটি স্ত্রীতেই সীমাবদ্ধ থাক' [আদওয়াউল বায়ান] সুতরাং মানসিক টান ও প্রবৃত্তিগত আবেগ কারও প্রতি বেশী থাকাটা আদল বা ইনসাফের বিপরীত নয়। কেননা তা মানবমনের ক্ষমতার বাইরে। [তাবারী]

(২) পূর্বে উল্লেখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের দাম্পত্য জীবনের এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথ-নির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পতিকেই যার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা, যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত বিবাদ তথা হানাহানি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কুরআনুল কারীম নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি

১৩১. আস্‌মানে যা আছে ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্‌রই[১]; তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ

লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণীকে এমন এক সার্থক পদ্ধতি বাতলে দেয়ার জন্য নাযিল হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক জীবন সুখী-সমৃদ্ধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর অনুসরণে পারস্পারিক তিক্ততা ও মর্মপীড়া, ভালবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যদি অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক ও সৌজন্যমূলক পন্থায় যেন তার পেছনে শত্রুতা, বিদ্বেষ ও উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে। এ আয়াতে শেষ চিকিৎসা তালাক ও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার ব্যাপারে হেদায়াত দিয়ে বলা হয়েছে যে, এটা মনে করার কোন সংগত কারণ নেই যে, সার্বিক সমঝোতা সম্ভব না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে আল্লাহ্ তাদের উভয়ের প্রতি দয়াশীল হবেন না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয়েরই রব। তিনি তাদের প্রত্যেককেই তাদের প্রয়োজনীয় জীবিকা নির্বাহ করবেন। সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদ পদ্ধতির ব্যাপারে কারও আপত্তি করা উচিত নয়।

মোটকথা, কুরআনুল কারীম উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনতঃ অধিকার দিয়েছে। অপরদিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র আয়ত্ব করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, বিবাহ বিচ্ছেদ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা কর্তব্য। বরং উভয় পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়। তারপরও যদি বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তবে জীবন সম্পর্কে হতাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ প্রত্যেককেই তাঁর রহমতে স্থান দিবেন।

(১) অর্থাৎ আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলার। এখানে এই উক্তিটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বোঝানো হয়েছে, আল্লাহ্‌র সচ্ছলতা, প্রাচুর্য ও তাঁর দরবারে অভাবহীনতা। তিনি অভাবীর কথা শুনেন ও অভাব দুর করবেন। কারও অভাব তাঁর অজানা নয়। তিনিই সবাইকে তার আরাধ্য বিষয় দিতে সামর্থ। দ্বিতীয়বার বোঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ্ তা'আলার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহ্ তা'আলার অপার রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ্‌ভীতি ও আনুগত্য কর, তবে তিনি তোমাদের সব কাজে সহযোগিতা করবেন, এবং অনায়াসে তা সু-সম্পন্ন করে দেবেন। তৃতীয় আয়াতে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অপরিসীম ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সবকিছু পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে তোমাদের স্থলে অন্যদেরকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম। অবাধ্যদের পরিবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনির্ভরতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অবাধ্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর(১)। আর তোমরা কুফরী করলেও আস্‌মানে যা আছে ও যমীনে যা আছে তা সবই আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন।

أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ وَإِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدٗا ١٣١

১৩২. আস্‌মানে যা আছে ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং কার্যোদ্ধারে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٣٢

১৩৩. হে মানুষ! তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে ও অপরকে আনতে পারেন(২); আর

إِن يَشَأۡ يُذۡهِبۡكُمۡ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأۡتِ بِـَٔاخَرِينَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرٗا ١٣٣

(১) এ আয়াত মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়্যত। আগের ও পরের যাবতীয় মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত। যার বড় আর কোন অসিয়্যত হতে পারে না। বিভিন্ন নবী-রাসূলগণও যুগে যুগে তাদের উম্মতদেরকে এ ওসিয়ত করেছেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তার কাছে কেউ ওসিয়্যতের অনুরোধ জানালে এ ওসিয়্যতটি প্রথমে করতেন। হাদীসে এসেছে, এক লোক এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ওসিয়্যত চাইলে তিনি বললেন, 'তোমার কর্তব্য হবে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করা। আর তুমি প্রতিটি উঁচুস্থানে উঠা বা উল্লেখযোগ্য স্থানে তাকবীর বা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা।' [তিরমিযী: ৩৪৪৫; মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৩৩] তাছাড়া যখনই কোন সেনাদল পাঠাতেন, তাদেরকে তাকওয়ার ওসিয়্যত করতেন। [মুসলিম ১৭৩১; আবু দাউদ: ২৬১২]

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ওহী নাযিল হওয়ার সময়ে যারা ছিল তাদেরকে নিয়ে গিয়ে তাদের স্থলে অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। অন্য আয়াতে তিনি যে অন্য কাউকে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন সেটার প্রমাণও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছে তোমাদের স্থানে আনতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন" [সূরা আল-আন'আম: ১৩৩] অন্য আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হবে, তারা তাদের মতো হবে না, বরং তাদের চেয়ে ভালো হবে। বলা হয়েছে, "আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারপর তারা তোমাদের মত হবে না" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩৮] অন্য আয়াতে এ কাজটিকে

আল্লাহ্ তা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

১৩৪. কেউ দুনিয়ার পুরস্কার চাইলে তবে (সে যেন জেনে নেয় যে) দুনিয়া ও আখেরাতের পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে[১]। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

বিশতম রুকূ'

১৩৫. হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্টতর। কাজেই তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল বা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তার সম্যক খবর রাখেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

১৩৬. হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, এবং সে কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। আর সে গ্রন্থের প্রতিও যা তার পূর্বে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

তাঁর জন্য অত্যন্ত সহজ বলে ঘোষণাও করেছেন। তিনি বলেন, “তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন। আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নয়” [সূরা ইবরাহীম: ১৯; সূরা ফাতির: ১৬]।

(১) এ আয়াতদৃষ্টে মনে হতে পারে যে, দুনিয়ার পুরস্কার চাইলেই তাকে তা দেয়া হবে। মূলত: অন্য আয়াতে সেটাকে শর্তযুক্ত করে বলা হয়েছে যে, “যে দুনিয়া চায়, তাকে আমি দুনিয়াতে যা ইচ্ছা করি যতটুকু ইচ্ছা করি প্রদান করি” [সূরা আল-ইসরা: ১৮] সুতরাং দুনিয়া চাইলেই পাবে, তা কিন্তু নয়। যাকে যতটুকু দেয়ার ইচ্ছা আল্লাহ্‌র হবে, ততটুকুই সে পাবে। এর বাইরে নয়।

তিনি নাযিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি কুফরী করে[১] সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হলো।

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا ﴿١٣٧﴾

১৩৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে, আবার কুফরী করে, তারপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্‌ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথ দেখাবেন না[২]।

بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾

১৩৮. মুনাফিকদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।

ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ

১৩৯. মুমিনগণের পরিবর্তে যারা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি ওদের কাছে ইয্‌যত চায়?

(১) কুফরী করার দু’টি অর্থ হয়। (এক) সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করা। (দুই) মুখে মেনে নেয়া কিন্তু মনে মনে অস্বীকার করা। অথবা নিজের মনের ভাবের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করা যে, সে যে জিনিষটি মেনে নেয়ার দাবী করছে আসলে সেটিকে মানে না। এখানে কুফরী শব্দটি দু’টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, বার বার কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে তাওবা করা ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলীলাদির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যত বড় কট্টর কাফের বা মুরতাদই হোক না কেন, যদি সত্যিকারভাবে তাওবা করে, তবে পূর্ববর্তী সমুদয় গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়। অতএব, বার বার কুফরী করার পরও যদি তারা সত্যিকারভাবে তাওবা করে, তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার আইন উন্মুক্ত রয়েছে। এখানে তাওবাহ কবুল না করার অর্থ এই যে, তারা কোন কোন গোনাহ থেকে তাওবা করলেও মূল গোনাহ অর্থাৎ শির্ক ও কুফর থেকে তাওবাহ করতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তাদের তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٣٩﴾

সমস্ত ইয্‌যত তো আল্লাহ্‌রই[১]।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ

১৪০. কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে

(১) এ আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে এ ধরণের আচরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করে একেও অযথা অবান্তর প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছেঃ “তারা কি ওদের কাছে গিয়ে ইজ্জত-সম্মান লাভ করতে চায়? তবে ইজ্জত-সম্মানতো সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন।” কাফের ও মুশরিকদের সাথে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং অন্তরঙ্গ মেলা-মেশার প্রধান কারণ এই যে, তাদের বাহ্যিক মানমর্যাদা, শক্তি-সামর্থ্য, ধনবলে প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে করে যে, তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় আমাদেরও মানমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, তারা এমন লোকদের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার আকাংখা করছে, যাদের নিজেদেরই সত্যিকারের কোন মর্যাদা নেই। তাছাড়া যে শক্তি ও বিজয়ের মধ্যে সত্যিকারের ইজ্জত ও সম্মান নিহিত, তা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই মালিকানাধীন। অন্য কারো মধ্যে যখন কোন ক্ষমতা বা সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত। অতএব, মানমর্যাদা দানকারী মালিককে অসন্তুষ্ট করে তাঁর শত্রুদের থেকে ইজ্জত হাসিল করার অপচেষ্টা কত বড় বোকামী। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, “আর ইজ্জত-সম্মান একমাত্র আল্লাহ্, রাসূল এবং ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফেকরা তা অবগত নয়।” [সূরা আল-মুনাফিকুন:৮] এখানে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা আংশিক মর্যাদা দান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগত, পছন্দনীয় ও প্রিয়পাত্র, তাই তিনি তাঁদেরকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফের ও মুশরিকদের ভাগ্যে সত্যিকার কোন ইজ্জত নেই। অতএব, তাদের সাথে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে সম্মান অর্জন করা সুদূর পরাহত। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি বান্দাদের (মাখলুকের) মর্যাদাবান হওয়ার বাসনা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করেন।' [বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান: ৭৪২১] সুতরাং আয়াতের মর্ম এই যে, কাফের, মুশরিক, পাপিষ্ঠ ও পথভ্রষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করা অন্যায় ও অপরাধ।

وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا ۝١٤٠

লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসো না[১], নয়তো তোমরাও তাদের মত হবে[২]। মুনাফিক এবং কাফের সবাইকে আল্লাহ্ তো জাহান্নামে একত্র করবেন।

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ
اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ
نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ
مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ
يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۝١٤١

১৪১. যারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জয় হলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না।' আর যদি কাফেরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মুমিনদের হাত থেকে

(১) এ আয়াতের মর্ম এই যে, যদি কোন প্রভাবে কতিপয় লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কোন আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে, তবে যতক্ষণ তারা এহেন গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কাজে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তাদের মজলিশে বসা বা যোগদান করা মুসলিমদের জন্য হারাম। বাতিলপন্থীদের মজলিশে উপস্থিত ও তার হুকুম কয়েক প্রকার। প্রথমতঃ তাদের কুফরী চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি সহকারে যোগদান করা। এটা মারাত্মক অপরাধ ও কুফরী। দ্বিতীয়তঃ গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন করা। এটা অত্যন্ত অন্যায় ও ফাসেকী। তৃতীয়তঃ পার্থিব প্রয়োজনবশতঃ বিরক্তি সহকারে বসা জায়েয। চতুর্থতঃ জোর-জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার যোগ্য। পঞ্চমতঃ তাদের সৎপথে আনয়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া সওয়াবের কাজ।

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, এমন মজলিশ যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও আহকামকে অস্বীকার, বিদ্রূপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহ্‌র অংশীদার হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ না করুন, তোমরা যদি তাদের কুফরী কথা-বার্তা মনে প্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুতঃ তোমরাও কাফের হয়ে যাবে। কেননা, কুফরী পছন্দ করাও কুফরী। আর যদি তাদের কথা-বার্তা পছন্দ না করা সত্বেও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে উঠাবসা কর এমতাবস্থায় তাদের সমতুল্য হবার অর্থ হবে তারা যেভাবে শরী'আতকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা তাদের আসরে যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতই ইসলামের ক্ষতি সাধন করছ।

রক্ষা করিনি[১]?' আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ্ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না[২] ।

একুশতম রুকূ'

১৪২. নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সাথে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুতঃ তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন[৩] । আর

إِنَّ الْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى الصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ

(১) এটিই প্রত্যেক যুগের মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য । মৌখিক স্বীকারোক্তি ও ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে নামমাত্র প্রবেশের মাধ্যমে মুসলিম হিসাবে যতটুকু স্বার্থ ভোগ করা যায় তা তারা ভোগ করে । আবার অন্যদিকে কাফের হিসাবে যে স্বার্থটুকু ভোগ করা সম্ভব তা ভোগ করার জন্য তারা কাফেরদের সাথে যোগ দেয় । তাদেরকে বলেঃ আমরা মোটেই গোঁড়া বা প্রতিক্রিয়াশীল অথবা মৌলবাদী-বিদ্বেষপরায়ণ মুসলিম নই । মুসলিমদের সাথে আমাদের নামের সম্পর্ক আছে কিন্তু আমাদের মানসিক ঝোঁক, আগ্রহ ও বিশ্বস্ততা রয়েছে তোমাদের প্রতি । চিন্তা-ভাবনা, আচার-ব্যবহার, রুচি-প্রকৃতি ইত্যাদি সবদিক দিয়ে তোমাদের সাথে আমাদের গভীর মিল । তাছাড়া ইসলাম ও কুফরীর সংঘর্ষে আমরা তোমাদের পক্ষই অবলম্বন করব ।

(২) এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে, দুনিয়াতে কোন কাফের ঈমানদারদের উপর বিজয়ী হবে না । কারণ, এটার মূলকথা আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত । আয়াতের শুরুতেই 'কিয়ামতের দিন' উল্লেখ করার মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এক লোক এসে বলল যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না" অথচ কাফেররা মুমিনদের উপর বিজয়ী হচ্ছে । তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আয়াতের প্রথমাংশের দিকে তাকাও । সেখানে বলা হয়েছে, 'কিয়ামতের দিন' । সুতরাং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না । [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩০৯; দ্বিয়া আল-মাকদেসী, আল-আহাদিসুল মুখতারাহ ২/৪০৬-৪০৭, হাদীস নং ৭৯৩] তবে ইমামগণ এ আয়াত থেকে দুনিয়াতে এ মাসআলা নিয়েছেন যে, কোন কাফের কোন মুমিনের ওয়ারিশ হয় না । [আত-তা'লিকুল মুমাজ্জাদ আলা মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ] ।

(৩) কাফেরদের ধোঁকার কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে ধোঁকায় ফেলা যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ । এতে আল্লাহ্‌র জন্য খারাপ গুণ বিবেচিত হবে না । কারণ, এটি তাদের কর্মের বিপরীতে আল্লাহর কর্ম । অনুরূপ আলোচনা সূরা আল-বাকারার ৯ ও ১৫ নং আয়াতের

النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾

যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে[১]।

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ وَلَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

১৪৩. দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে[২]! আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবেন না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

১৪৪. হে মুমিনগণ! মুমিনগণ ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের উপর

ব্যাখ্যাতেও বর্ণিত হয়েছে। তবে তাদেরকে কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ধোঁকায় ফেলবেন, তার বর্ণনায় সুদ্দী ও হাসান বসরী বলেন, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কিছু নূর বা আলো দেয়া হবে, ফলে তারা মুমিনদের সাথে চলতে থাকবে। যেমনিভাবে তারা দুনিয়াতে মুমিনদের সাথে ছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে নূর বা আলো ছিনিয়ে নিবেন। ফলে তাদের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। তখন তারা অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আর ঠিক তখনি তাদের ও মুমিনদের মধ্যে প্রাচীর পড়ে যাবে। পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] মূলত: এটি সূরা আল-হাদীদের ১৩ নং আয়াতের তাফসীরও বটে।

(১) আয়াতে মুনাফিকদের তিনটি খারাপ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক. তারা তাদের সালাতে অলসতা করে। দুই. তারা সালাতে প্রদর্শনেচ্ছাসহকারে দাঁড়ায়। তিন. তারা খুব কমই আল্লাহ্র যিকর করে। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও তাদের এ বদ স্বভাবসমূহের কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, সূরা আত-তাওবাহ: ৫৪; সূরা আল-মা'উন: ৪-৬। তাছাড়া হাদীসেও মুনাফিকের এ সমস্ত চরিত্রের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ঐটি হচ্ছে মুনাফিকের সালাত। সে সূর্যের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর যখন সূর্য শয়তানের দু' শিংয়ের মাঝখানে পৌঁছে (অর্থাৎ ডুবার কাছাকাছি পৌঁছে) তখন সে উঠে চারবার ঠোকর লাগায়। যাতে আল্লাহ্র স্মরণ খুব কমই করে থাকে।' [মুসলিম: ৬২২]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে, ঐ ছাগীর ন্যায়, যে দুই পাঠা ছাগলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। (প্রবৃত্তির তাড়নায়) কখনও এটার কাছে যায়, কখনও অপরটির কাছে যায়। [মুসলিম: ২৭৮৪] মুনাফিক নিজেকে মুশরিকও বলতে চায় না। আবার ঈমানদারও হতে চায় না। [তাবারী]

আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য অভিযোগ কায়েম করতে চাও[১]?

১৪৫. মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে[২] এবং তাদের জন্য আপনি কখনো কোন সহায় পাবেন না।

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

১৪৬. কিন্তু যারা তাওবাহ্ করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে[৩], আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাদের দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে[৪],

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

(১) এ আয়াতের তাফসীরে পূর্ববর্তী ১৩৯ নং আয়াতের তাফসীর ও সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াতের তাফসীর দেখা যেতে পারে।

(২) এ আয়াতে মুনাফিকদের স্থান নির্দেশ করে বলা হয়েছে যে, তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। অন্য স্থানে ফির'আউন ও তার অনুসারীদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। “আগুন, তাদেরকে তাতে উপস্থিত করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, ‘ফির'আউন গোষ্ঠীকে নিক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে” [সূরা গাফির: ৪৬] আবার অন্যত্র বনী ইসরাইলের মধ্যে যাদেরকে আকাশ থেকে দস্তরখানসহ খাবার দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা কুফরী করবে তাদের জন্য এমন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে শাস্তি আল্লাহ্ আর কাউকে দিবেন না। “আল্লাহ্ বললেন, ‘আমিই তোমাদের কাছে ওটা পাঠাব; কিন্তু এর পর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের আর কাউকেও দেব না” [সূরা আল-মায়িদাহ: ১১৫] সুতরাং এটাই বলা চলে যে, সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে এ তিন শ্রেণীর লোক। [আদওয়াউল বায়ান] এ আয়াতে বর্ণিত ‘দারকুল আসফাল’ বা নিম্নতম স্তর কি এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেটা হবে বদ্ধ সিন্ধুক। [মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ: ১৩/১৫৪, নং ১৫৯৭২] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দারকুল আসফাল হচ্ছে, এমন কিছু ঘর যেগুলোর দরজা বন্ধ করা আছে। আর সেগুলোকে উপর ও নিচ থেকে প্রজ্জলিত করা হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ, জাহান্নামের নীচে থাকবে। [তাবারী]

(৩) কাতাদাহ বলেন, এখানে সংশোধন করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে নেয়া। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে একমাত্র ঐসব আমলই গৃহীত ও কবুল হয় যা শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং কোনরূপ রিয়া তথা লোক দেখানো ও শোনানোর লেশমাত্র উদ্দেশ্য যার মধ্যে নেই।

তারা মুমিনদের সঙ্গে থাকবে এবং মুমিনদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই মহাপুরস্কার দেবেন।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৭. তোমরা যদি শোকর-গুজার হও[১] এবং ঈমান আন, তবে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্ কি করবেন? আর আল্লাহ্ (শোকরের) পুরস্কার দাতা, সর্বজ্ঞ।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾

১৪৮. মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না; তবে যার উপর যুলুম করা হয়েছে[২]। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা,

(১) আয়াতে শোকর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আসল অর্থ হচ্ছে নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়া ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং অনুগৃহীত হওয়া। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞ না হও এবং তাঁর সাথে নিমকহারামী না কর; বরং যথার্থই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ও শোকর আদায়কারী হও তাহলে আল্লাহ্ অনর্থক তোমাদের শাস্তি দেবেন না। মোটকথা: আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার এবং শোকরগুজারকে শাস্তি দিবেন না। [তাবারী] কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পদ্ধতি কি? বস্তুত: হৃদয়ের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে তার অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া, মুখে এ অনুভূতির স্বীকারোক্তি করা এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে অনুগৃহীত হওয়ার প্রমাণ পেশ করাই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক উপায়। এ তিনটি কাজের সমবেত রূপই হচ্ছে শোকর। এ শোকরের দাবী হচ্ছে প্রথমতঃ অনুগ্রহকে অনুগ্রহকারীর অবদান বলে স্বীকার করা। অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে অনুগ্রহকারীর সাথে আর কাউকে অংশীদার না করা। দ্বিতীয়তঃ অনুগ্রহকারীর প্রতি ভালবাসা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের অনুভূতি নিজের হৃদয়ে ভরপুর থাকা এবং অনুগ্রহকারীর বিরোধীদের প্রতি এ প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র ভালবাসা, আন্তরিকতা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক না থাকা। তৃতীয়তঃ অনুগ্রহকারীর আনুগত্য করা, তার হুকুম মেনে চলা, তার নেয়ামগুলোকে তার মর্জির বাইরে ব্যবহার না করা।

(২) এ আয়াতে দুনিয়া হতে জোর-যুলুমের অবসান ঘটানোর এক অপূর্ব বিধান পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে একদিকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের জন্য মযলুমকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আধিকার দিয়েছে। অন্যদিকে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আবার যুলুম ও বাড়াবাড়ি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তোমাদের উপর যে পরিমাণ যুলুম করা

সর্বজ্ঞ।

১৪৯. তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে করলে বা গোপনে করলে কিংবা দোষ ক্ষমা করলে তবে আল্লাহ্ও দোষ মোচনকারী, ক্ষমতাবান(১)।

إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

হয়েছে, তোমরা ঠিক ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে পার।" [সূরা আন-নাহলঃ ১২৬] সাথে সাথে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্বেও যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ক্ষমা করে দাও, তবে নিঃসন্দেহে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম। মোটকথাঃ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মযলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকদের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে অভিযোগ করে, তবে তা হারাম গীবতের আওতায় পড়বে না। কারণ যালিম নিজেই মযলুমকে অভিযোগ উত্থাপন করতে সুযোগ করে দিয়েছে, বরং বাধ্য করেছে।

(১) আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে মযলুমকে তার প্রতি যুলুমের সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। অপরদিকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা ও ক্ষমার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য আখেরাতের উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস শুনিয়ে ক্ষমা ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন। এ আয়াতে মুখ্য উদ্দেশ্য কারো অন্যায়কে ক্ষমা করার আদর্শ শিক্ষা দেয়া। প্রকাশ্যে বা গোপনে নেক কাজ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষমা করাও একটি বিশিষ্ট সৎকার্য। যে ব্যক্তি অন্যের অপরাধ মার্জনা করবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও করুণার যোগ্য হবে। আয়াতের শেষে আল্লাহ্র দু'টি গুণবাচক নাম উল্লেখ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। তথাপি তিনি অতি ক্ষমাশীল। আর মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা যখন সামান্য ও সীমাবদ্ধ, তাই ক্ষমা বা মার্জনার পথ অবলম্বন করা তার জন্য অধিক বাঞ্ছনীয়।

এ হচ্ছে অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের ইসলামী মূলনীতি এবং অভিভাবকসুলভ সিদ্ধান্ত। একদিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমা বা মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ "তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে দুশমনী ছিল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আন্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে।" [সূরা ফুস্‌সিলাতঃ ৩৪] আইন-আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে। যার ফলে পারস্পরিক বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার

১৫০. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (ঈমানের ব্যাপারে) তারতম্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতক-এর উপর ঈমান আনি এবং কতকের সাথে কুফরী করি'[১]। আর তারা মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করতে চায়,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾

১৫১. তারাই প্রকৃত কাফির। আর আমরা প্রস্তুত রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি[২]।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾

আশংকা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কুরআনুল কারীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শত্রুতাও গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সাদকাহ দ্বারা সম্পদ কমে না এবং কোন বান্দার মধ্যে ক্ষমা প্রবণতার গুণের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তার মর্যাদাই বৃদ্ধি করেন। আর যে কেউ আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ্ তাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন।' [মুসলিম: ২৫৮৮]

(১) কাতাদা বলেন, এরা হচ্ছে, আল্লাহ্র দুশমন ইয়াহূদ ও নাসারা সম্প্রদায়। কারণ, তাদের মধ্যে ইয়াহূদীরা তাওরাত ও মূসার উপর ঈমান আনে কিন্তু ইঞ্জীল ও ঈসার উপর ঈমান আনে না। আর নাসারারা ইঞ্জীল ও ঈসার উপর ঈমান আনে কিন্তু কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ঈমান আনে না। এভাবে এ দু'টি সম্প্রদায় ইয়াহূদী ও নাসারা হয়েছে। অথচ এ দু'টি মতই বিদ'আত বা নব উদ্ভাবিত। যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। এভাবে তারা সমস্ত নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন ইসলামকে পরিত্যাগ করেছে। [তাবারী]

(২) পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণা ঐসব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গোঁজামিলকেও ফাঁস করে দিয়েছে, যারা অন্যান্য ধর্মানুসারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের দ্বীন ও দ্বীনী বিশ্বাসকে বিজাতির পদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যগ্র। যারা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফয়সালাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকেও মুক্তি লাভ করবে বলে বুঝাতে চায়। অথচ তারা অধিকাংশ রাসূলকে অথবা অন্তত কোন কোন নবীকে অমান্য করে। যার ফলে তাদের কাফের ও জাহান্নামী হওয়ার কথা অত্র আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।

অমুসলিমদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা ও ইহ্সান বা হিতকামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজীরবিহীন। ইসলাম একদিকে মুসলিমদের

প্রতি সদ্ব্যবহার ও পরমসহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন উদার ও অবারিত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম অমুসলিমদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরী ও কু-প্রথার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম ও অমুসলিমরা দু'টি পৃথক জাতি এবং মুসলিমদের জাতীয় প্রতীক ও স্বাতন্ত্র্য সযত্নে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু 'ইবাদাতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলে চলবে না, বরং সামাজিকতার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। এ কথা কুরআন ও হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনুল কারীম ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, যে কোন ধর্মমতের সাহায্যে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জিহাদ পরিচালনা করা এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত ও কুরআন নাযিল করারও কোন প্রয়োজন থাকতো না।

পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, "নিশ্চয় যারা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছে (মুসলিম হয়েছে) এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং নাসারা (খৃষ্টান) ও সাবেয়ীনদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি ও কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে আর সৎকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তার সমীপে তাদের জন্য পূর্ণ প্রতিদান সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ৬২] এ আয়াত থেকেও ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই। কেননা, কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান শুধু তখনই গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয় যখন তার সাথে নবী-রাসূল, ফিরিশ্তা ও আসমানী কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা হয়। তাই তাদের প্রত্যেককে সাধারণ মুসলিমদের মত পুরোপুরি ঈমান আনতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের পাশাপাশি নবী-রাসূলগণের প্রতিও ঈমান আনা অপরিহার্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে (চিনে রাখুন যে) তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। অতএব, আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের মোকাবেলায় যথেষ্ট এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন"। [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৩৭] সূরা আন- নিসার আলোচ্য আয়াতে আরো স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত কোন একজন নবীকেও যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে প্রকাশ্য কাফের, তার জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব অবধারিত। রাসূলের প্রতি ঈমান ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সত্যিকার ঈমান সাব্যস্ত হয় না। শেষ আয়াতে পুনরায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখেরাতের মুক্তি ও কামিয়াবী শুধু ঐসব লোকের জন্যই সংরক্ষিত যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তাঁর নবী ও রাসূলগণের প্রতি যথার্থ ঈমান রাখে। বস্তুত: কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসীর করে। কুরআনী তাফসীরের পরিপন্থী কোন তাফসীর বর্ণনা কারো জন্য জায়েয নয়।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

১৫২. আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করেনি, অচিরেই তাদেরকে তিনি তাদের প্রতিদান দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বাইশতম রুকূ'

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

১৫৩. কিতাবীগণ আপনার কাছে তাদের জন্য আসমান হতে একটি কিতাব নাযিল করতে বলে; তারা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, 'আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে দেখাও।' ফলে তাদের সীমালংঘনের কারণে তাদেরকে বজ্র পাকড়াও করেছিল; তারপর স্পষ্ট প্রমাণ তাদের কাছে আসার পরও তারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; অতঃপর আমরা তা ক্ষমা করেছিলাম এবং আমরা মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছিলাম।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾

১৫৪. আর তাদের অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য 'তূর' পর্বতকে আমরা তাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'নত শিরে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর[১]।' আর আমরা তাদেরকে আরও বলেছিলাম, 'শনিবারে সীমালংঘন

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল যে, তোমরা (প্রস্তাবিত শহরে) সিজদারত অবস্থায় প্রবেশ কর এবং বল, (হে আল্লাহ্ !) আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তারা তা পরিবর্তন (সিজদারত অবস্থায় প্রবেশ না করে) নিতম্বের উপর ভর করে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন এর পরিবর্তে যবের দানা চাই বলতে বলতে প্রবেশ করল। [বুখারীঃ ৩৪০৩]

করো না'; এবং আমরা তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ।

১৫৫. অতঃপর (তারা অভিসম্পাত পেয়েছিল[১]) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করার জন্য, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' তাদের এ উক্তির জন্য । বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তার উপর মোহর মেরে দিয়েছেন । সুতরাং কেবল অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনবে ।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۠﴿۱۵۵﴾

১৫৬. আর তাদের কুফরীর জন্য এবং মার্‌ইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য[২] ।

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۙ﴿۱۵۶﴾

(১) বলা হয়েছে, 'আর তাদের অঙ্গিকার ভঙ্গের কারণে এবং---' কিন্তু এর কারণে কি হয়েছে সেটা বলা হয় নি । বরং উত্তরটি উহ্য রাখা হয়েছে । সূরা আল-মায়িদাহ এর ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তাদের অঙ্গিকার ভঙ্গের জন্য আমরা তাদেরকে লা'নত করেছিলাম' । সুতরাং এখানেও একই অর্থ গ্রহণ করা যায় । যাজ্জাজ বলেন, আয়াতের উত্তর হচ্ছে, তাদের অঙ্গিকার ভঙ্গের কারণে তাদের উপর আমরা অনেক হালাল বস্তু হারাম করেছি । কারণ, ১৬০ নং আয়াতে তা-ই বর্ণিত হয়েছে । কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ আয়াতের শেষে বর্ণিত, 'বরং আল্লাহ্ তাদের উপর মোহর করেছেন' এ কথাটিই উপরোক্ত কথার উত্তর । আবার কারও কারও মতে, আয়াতের শেষে বর্ণিত, 'কেবল অল্প সংখ্যকই ঈমান আনবে' এটাই হচ্ছে পূর্ববর্তী কথার উত্তর । [ফাতহুল কাদীর]

(২) মারইয়ামের উপর চাপানো তাদের গুরুতর অপবাদ কি ছিল তা এখানে বর্ণনা করা হয় নি । অন্যত্র এসেছে যে, তারা মারইয়ামকে ব্যভিচারের অপবাদ দিতে ত্রুটি করে নি । আল্লাহ্ বলেন, "তারপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হল; তারা বলল, 'হে মার্‌ইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত জিনিস নিয়ে এসেছ" । [সূরা মারইয়াম:২৭] এখানে অঘটন বলতে তারা ব্যভিচারের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল । কারণ পরবর্তী আয়াতে মারইয়ামের বাবা খারাপ লোক না হওয়া এবং মা-ও বেশ্যা না হওয়া বলার মাধ্যমে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে । [আদওয়াউল বায়ান]

وَّقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

১৫৭. আর 'আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মার্‌ইয়াম তনয় 'ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি' তাদের এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি; বরং তাদের জন্য (এক লোককে) তার সদৃশ করা হয়েছিল[১]।

---

(১) এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, ওরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যাও করতে পারেনি, শুলেও চড়াতে পারেনি, বরং আসলে ওরা সন্দেহে পতিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সন্দেহ কি ছিল এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে, সব বর্ণনার সার কথা হচ্ছে, ইয়াহূদীরা যখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলো, তখন তার ভক্ত-সহচরবৃন্দ এক স্থানে সমবেত হলেন। ঈসা 'আলাইহিস্ সালামও সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন চার হাজার ইয়াহূদী দূরাচার একযোগে গৃহ অবরোধ করলো। তখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় ভক্ত অনুচরগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এই ঘর থেকে বের হতে ও নিহত হতে এবং আখেরাতে জান্নাতে আমার সাথী হতে প্রস্তুত আছো কি? জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম নিজের জামা ও পাগড়ী তাঁকে পরিধান করালেন। অতঃপর তাঁকে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাদৃশ করে দেয়া হলো। যখন তিনি ঘর থেকে বের হলেন, তখন ইয়াহূদীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম মনে করে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শুলে চড়িয়ে হত্যা করলো। অপরদিকে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে তুলে নিলেন।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইয়াহূদীরা এক লোককে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইতোপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আকাশে তুলে নেয়ায় সে তাঁর নাগাল পেল না। বরং ইতিমধ্যে তার নিজের চেহারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মত হয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন অন্যান্য ইয়াহূদীরা তাকেই ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম মনে করে পাকড়াও করলো, এবং শুলে বিদ্ধ করে হত্যা করলো। উক্ত বর্ণনা দু'টির মধ্যে যে কোনটিই সত্য হতে পারে। কুরআনুল কারীম এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি। অতএব, প্রকৃত ঘটনার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। অবশ্য কুরআনুল কারীমের আয়াত ও তাফসীর সংক্রান্ত বর্ণনার সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা ইয়াহূদী-খৃষ্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম বিভ্রান্তির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে শুধু অনুমান করে বিভিন্ন উক্তি ও দাবী করছিল। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে যে, যারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে নানা মত পোষন করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে। তাদের কাছে এ

আর নিশ্চয় যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা অবশ্যই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি,

১৫৮. বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[১]।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾

১৫৯. কিতাবীদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে[২] তার উপর ঈমান

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ

সম্পর্কে কোন সত্যনির্ভর জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান করে কথা বলে। আর তারা যে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বললো, আমরা তো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মত হলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম। তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম হয়, তবে আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায়? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামই বা কোথায় গেলেন? মোটকথা: ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইয়াহূদী ও নাসারা যারাই কথা বলে তারাই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই।

(১) "আল্লাহ্ অতি পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা (প্রজ্ঞাময়)।" ইয়াহূদীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করার যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর হেফাযতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তখন তাঁর অসীম কুদরত ও অপার হেকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে? আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজে নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। জড়পূজারী বস্তুবাদীরা যদি ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে সশরীরে আকাশে উত্তোলনের সত্যটি উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদেরই দুর্বলতার প্রমাণ।

(২) অর্থাৎ ইয়াহূদীরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না এবং ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকেও অস্বীকার করে,

কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল। এ আয়াতের موته অর্থাৎ 'মৃত্যুর পূর্বে' শব্দে ইয়াহূদীদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তাফসীর এই যে, প্রত্যেক ইয়াহূদীই তার অন্তিম মুহূর্তে যখন আখেরাতের দৃশ্যাবলী অবলোকন করবে, তখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর নবুওয়তের সত্যতা ও নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফির'আওনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি। এ আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের বিপুল জামা'আত কর্তৃক গৃহীত ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো موته 'তার মৃত্যু' শব্দের সর্বনামে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তাফসীর হলো, কিতাবীরা এখন যদিও ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইয়াহূদীরা তো তাকে নবী বলে স্বীকারই করে না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যকার আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করে। অপরদিকে নাসারারা যদিও ঈসা মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-কে ভক্তি ও মান্য করার দাবীদার; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইয়াহূদীদের মতই ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে স্বয়ং আল্লাহ্ বা আল্লাহ্র পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে। কুরআনুল কারীমের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে যে, ইয়াহূদী ও নাসারারা বর্তমানে যদিও ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না, বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন এরাও তাঁর প্রতি পুরোপুরি ঈমান আনয়ন করবে। নাসারারা তখন মুসলিমদের মত সহীহ আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন সমগ্র দুনিয়া থেকে সর্বপ্রকার কুফরী ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে; সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈসা ইবন মারইয়াম 'আলাইহিস্ সালাম একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তিনি দাজ্জালকে কতল করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং ক্রুশকে চুরমার করবেন। তখন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত করা হবে।' আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আরো বলেন - 'তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কুরআনুল কারীমের এ আয়াত পাঠ করতে পার যাতে বলা হয়েছেঃ "আহলে-কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, বরং ওরা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾

আনবেই। আর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন[১]।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾

১৬০. সুতরাং ভাল ভাল যা ইয়াহূদীদের জন্য হালাল ছিল আমরা তা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম তাদের যুলুমের জন্য[২] এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে অনেককে বাধা দেয়ার জন্য।

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

১৬১. আর তাদের সূদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল; এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে। আর

প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।” [বুখারীঃ ৩৪৪৮] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ এর অর্থ ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর মৃত্যুর পূর্বে’। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘তখন তোমাদের কেমন লাগবে? যখন ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম তোমাদের মাঝে আগমন করবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে ঈমাম হবেন’। [বুখারীঃ ৩৪৪৯] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! অবশ্যই ইবন মারইয়াম ‘ফাজ্জ আর রাওহা’ থেকে হজ্জ বা উমরা অথবা উভয়টির জন্যই ইহরাম বাঁধবেন।’ [মুসলিম: ১২৫২] অন্য হাদীসে এসেছে, ‘ইবন মারইয়াম দাজ্জালকে ‘বাবে লুদ’ এ হত্যা করবে’। [তিরমিযী: ২২৪৪] মোটকথা: কিয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের ব্যাপারটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যখন তিনি আসবেন তখন সমস্ত বিভ্রান্ত নাসারা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হবে।

(১) কাতাদা বলেন, এর অর্থ তিনি সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি তাদের কাছে তার রবের রিসালত পৌঁছে দিয়েছেন এবং তিনি যে বান্দা এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করবেন। [তাবারী]

(২) ইসলামী শরী‘আতেও কোন কোন দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তবে তা শারিরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ইয়াহূদীদের জন্য কোন দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি, বরং তাদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ সেগুলো হারাম করা হয়েছিল। তাদের উপর কোন কোন জিনিস হারাম করা হয়েছিল তা সূরা আল-আন‘আমের ১৪৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আমরা তাদের মধ্য হতে কাফিরদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে মজবুত তারা ও মুমিনগণ আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে ঈমান আনে। আর সালাত প্রতিষ্ঠাকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনয়নকারী, তাদেরকে অচিরেই আমরা মহা পুরস্কার দেব[১]।

তেইশতম রুকূ'

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى

১৬৩. নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম[২], যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম[৩]। আর ইবরাহীম,

(১) এ আয়াতে কতিপয় মহান ব্যক্তির জন্য যে বিপুল প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তা তাঁদের ঈমান ও সৎকর্মের কারণে। তবে অবশ্যই ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হতে হবে।

(২) নবীগণের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নির্দেশ ও বাণীকে ওহী বলা হয়। হারিস ইবন হিশাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'অহী কোন কোন সময় ঘন্টার আওয়াজের মত আমার নিকট আসে। আর ওটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে কষ্টদায়ক অহী, এরপর ফেরেশ্তা আমার থেকে পৃথক হতো এমতাবস্থায় যে, তিনি যা বলেন তা শেষ হতেই তার কাছ থেকে আমি তা আয়ত্ব করে ফেলি। আবার কোন কোন সময় ফেরেশ্তা মানুষের আকারে এসে আমাকে যে অহী বলেন, আমি তা সাথে সাথে আয়ত্ব করে নেই। [বুখারীঃ ২]

(৩) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি যেমন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়েছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করেছেন। অতএব, পূর্ববর্তী নবীগণকে যারা মান্য করে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেও মান্য করতে বাধ্য। আর যারা

وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝١٦٣

ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের নিকটও ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে প্রদান করেছিলাম যাবূর।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۝١٦٤

১৬৪. আর অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে দেইনি(১)। আর অবশ্যই আল্লাহ্ মূসার সাথে কথা বলেছেন।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ

১৬৫. সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি(২), যাতে রাসূলগণ

তাকে অস্বীকার করে তারা যেন অন্যসব নবীকে এবং তাদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার করলো।

(১) এ আয়াতে নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরে যেসব নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তাদের সম্পর্কে প্রথমে সাধারণভাবে বলার পর তন্মধ্যে বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝানো হয়েছে যে, এরা সবাই আল্লাহ্র রাসূল এবং তাদের নিকটও বিভিন্ন পন্থায় ওহী প্রেরিত হয়েছে। কখনো ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে ওহী পৌঁছেছে, কখনো লিপিবদ্ধ কিতাব আকারে এসেছে, আবার কখনো আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথোপকথন করেছেন। যে কোন পন্থায়ই ওহী পৌঁছুক না কেন, তদানুযায়ী আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতএব, ইয়াহূদীদের এরূপ আবদার করা যে, তাওরাতের মত লিখিত কিতাব নাযিল হলে আমরা মান্য করবো, অন্যথায় নয় -সম্পূর্ণ আহম্মকী ও স্পষ্ট কুফরী। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাদের মধ্যে স্বতন্ত্র শরী'আতের অধিকারী রাসূলের সংখ্যা ছিল তিনশ' তের জন'। [সহীহ্ ইবন হিব্বানঃ ৩৬১]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের ঈমান ও সৎকর্মশীলতার পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতের সুসংবাদ দান করার জন্য এবং কাফের, বেঈমান ও দূরাচারদের কুফরী ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে অব্যাহতভাবে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেন কিয়ামতের শেষ বিচারের দিনে অবাধ্য ব্যক্তিরা অজুহাত উত্থাপন করতে না পারে যে, হে আল্লাহ্! কোন কাজে আপনি সন্তুষ্ট আর কোন কাজে আপনি অসন্তুষ্ট হন, তা আমরা উপলব্ধি করতে

عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾

আসার পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

১৬৬. কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন আপনার প্রতি যা তিনি নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে। তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানে। আর ফেরেশতাগণও সাক্ষী দিচ্ছেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট[১]।

পারিনি। জানতে পারলে অবশ্যই আমরা আপনার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করতাম। অতএব, আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয় এবং আমরা নিরপরাধ। পথভ্রষ্ট লোকেরা যাতে এহেন অজুহাত পেশ করতে বা বাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট নিদর্শনসহ নবীগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁরা সর্বস্ব উৎসর্গ করে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, এখন আর সত্য দ্বীন ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কোন বাহানারও অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌র ওহী এমন এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ যার মোকাবেলায় অন্য কোন প্রমাণই কার্যকর হতে পারে না। কুরআনুল কারীম এমন এক অকাট্য দলীল যার সামনে কোন অযুক্তি টিকতে পারে না। এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য সূরা ত্বা-হা এর ১৩৪ এবং সূরা আল-কাসাস এর ৪৭ নং আয়াত দেখা যেতে পারে।

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে একদল ইয়াহূদী উপস্থিত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা সন্দেহাতীতভাবে জান যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সত্য রাসূল। তারা অস্বীকার করলো। তখনই উক্ত আয়াত নাযিল হলো- আল্লাহ্ তা'আলা ঐ কিতাবের (আল-কুরআনের) মাধ্যমে -যা তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানের নিদর্শন- আপনার নবুওয়াতের সাক্ষী দিচ্ছেন। আর ফিরিশ্‌তাগণও এর সাক্ষী। অধিকন্তু সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্যদানের পর আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। [তাবারী, আত-তাফসীরুস সহীহ] এ আয়াতে কুরআনের সত্যতার উপর সাক্ষ্যদানের পাশাপাশি কুরআন যার উপর নাযিল হয়েছে তার সত্যতার উপরও সাক্ষ্য প্রদান হয়ে গেছে। তাছাড়া অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা শুধু কুরআনের জন্যও এ সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, "আর আমরা সত্য-সহই কুরআন নাযিল করেছি এবং তা সত্য-সহই নাযিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।" [সূরা আল-ইসরা: ১০৫]

১৬৭. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিয়েছে তারা অবশ্যই ভীষনভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

১৬৮. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে ও যুলুম করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

১৬৯. জাহান্নামের পথ ছাড়া; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

১৭০. হে লোকসকল! অবশ্যই রাসূল তোমাদের রবের কাছ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন; সুতরাং তোমরা ঈমান আন, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে[১] আর যদি তোমরা কুফরী কর তবে আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

১৭১. হে কিতাবীরা! স্বীয় দ্বীনের মধ্যে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না[২] এবং

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا

(১) অর্থাৎ একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের মধ্যেই হেদায়াত সীমাবদ্ধ; তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ করা চরম গোমরাহী। অতএব, ইয়াহূদীদের ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-কর্ম ভ্রান্ত ও বাতিল।

(২) غُلُوّ শব্দের অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অর্থ তার ন্যায়সঙ্গত সীমারেখা অতিক্রম করা। আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী-নাসারা উভয় জাতিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ এ বাড়াবাড়ি রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। নাসারারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তাকে স্বয়ং আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র পুত্র অথবা তিনের এক আল্লাহ্ বানিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে ইয়াহূদীরা তাঁকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ি পথ অবলম্বন করেছে। তারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে আল্লাহ্‌র নবী হিসেবে স্বীকার করেনি।

عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقٰىهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَا تَقُوْلُوْا

আল্লাহ্‌র উপর সত্য ব্যতীত কিছু বলো না। মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা মসীহ কেবল আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী[১], যা তিনি মার্‌ইয়ামের

বরং তাঁর মাতা মারইয়াম 'আলাইহাস্ সালাম-এর উপর মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তার নিন্দাবাদ করেছে। দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবড়ি ও সীমালংঘনের কারণে ইয়াহূদী ও নাসারাদের গোমরাহী ও ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বার বার প্রত্যক্ষ হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় উম্মতকে এ ব্যাপারে সংযত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জিত করো না, যেমন নাসারারা ঈসা ইবন মারইয়াম 'আলাইহিমুস্ সালাম-এর ব্যাপারে করেছে। স্মরণ রাখবে যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। অতএব, আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে।' [বুখারীঃ ৩৪৪৫] অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দা ও মানুষ হিসেবে আমিও অন্য লোকদের সমপর্যায়ের। তবে আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। এর চেয়ে অগ্রসর করে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিশেষণে বিশেষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা ইয়াহূদী-নাসারাদের মতো বাড়াবাড়ি করো না। হাদীসে এসেছে যে, হজের সময় 'রমীয়ে জামারাহ্' অর্থাৎ কংকর নিক্ষেপের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-কে কংকর আনতে আদেশ করলেন। তিনি মাঝারি আকারের পাথরকুচি নিয়ে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন, 'এ ধরণের মাঝারী আকারের কংকর নিক্ষেপ করাই পছন্দনীয়।' বাক্যটি তিনি দু'বার বললেন। তারপর বললেন, 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থেকো। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। [ইবন মাজাহঃ ৩০২৯] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি কাজ করলেন যাতে রুখসত বা ছাড় ছিল। কিন্তু কিছু লোক সেটা করতে অপছন্দ করল। সেটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি আল্লাহ্‌র হামদ ও প্রশংসার পর বললেন, কিছু লোকের এ কি অবস্থা হয়েছে যে, তারা আমি যা করছি তা করা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়? আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমি তাদের থেকে সবচেয়ে বেশী জানি এবং তাদের থেকেও বেশী আল্লাহ্‌র ভয় করি।' [বুখারীঃ ৭৩০১]

(১) এখানে 'কালেমাতুহূ' শব্দে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র কালেমা। মুফাস্‌সিরগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন-

(এক) 'কালেমাতুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র সুসংবাদ। এর দ্বারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর ব্যক্তি-সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইতোপূর্বে আল্লাহ্

ثَلٰثَةٌ ۚ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾

কাছে পাঠিয়েছিলেন ও তাঁর পক্ষ থেকে রূহ্ । কাজেই তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আন এবং বলো না, 'তিন[১]!' নিবৃত্ত হও,

তা'আলা ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে মারইয়াম 'আলাইহিস্ সালামকে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে যে সুসংবাদ দান করেছিলেন সেখানে 'কালেমা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَٰئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ﴾ "যখন ফিরিশ্‌তারা বললো, হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন এক 'কালেমা'র" ।[সূরা আলে-ইমরানঃ ৪৫] (দুই) কারো মতে এখানে 'কালেমা' অর্থ নিদর্শন । যেমন অন্য এক আয়াতে শব্দটি নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । যথা: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا﴾ [সূরা আত-তাহরীম: ১২] তাই আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মার্ইয়ামের প্রতি 'কালেমা' পাঠাবার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মার্ইয়াম 'আলাইহাস্ সালামের গর্ভাধারকে কোন পুরুষের শুক্রকীটের সহায়তা ছাড়াই গর্ভধারণের হুকুম দিলেন । সে হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালাম শুধু আল্লাহ্‌র কালেমা বা নির্দেশে চিরাচরিত প্রথার বিপরীতে পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন । (তিন) কাতাদা বলেন, কালেমা দ্বারা كُنْ বা 'হও' শব্দ বোঝানো হয়েছে । [তাবারী] ঈসা আলাইহিস সালামকে 'কালেমাতুল্লাহ' বলার কারণ হচ্ছে এই যে, ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারটি জাগতিক কোন মাধ্যম বাদেই আল্লাহ্‌র কালেমা দ্বারা সংঘটিত হয়েছে । এখানে তাকে 'আল্লাহ্‌র কালাম' বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করে সম্মানিত করাই উদ্দেশ্য । নতুবা সবকিছুই আল্লাহ্‌র কালেমার মাধ্যমেই হয় । তাঁর কালেমা ব্যতীত কিছুই হয় না । আল্লাহ্ ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর নিদর্শন ও আশ্চর্যতম সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন । তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে মারইয়ামের নিকট পাঠালেন । জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার জামার ফাঁকে ফু দিলেন । এ পবিত্র ফেরেশতার পবিত্র ফুঁ মারইয়ামের গর্ভে প্রবেশ করলে আল্লাহ্ তা'আলা সে ফুঁকটিকে পবিত্র রুহ হিসেবে পরিণত করলেন । আর এ জন্যই তাঁকে সম্মানিত করে 'রুহুল্লাহ' বলা হয়ে থাকে । [তাফসীরে সা'দী]

(১) কুরআন নাযিলের সমসাময়িক কালে খৃষ্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল । এক দল মনে করতো - মসীহ্ই আল্লাহ্ । স্বয়ং আল্লাহ্ই মসীহ্‌রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন । দ্বিতীয় দল বলতো - মসীহ্ পুত্র । তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল - তিন সদস্যের সমন্বয়ে আল্লাহ্‌র একক পরিবার । এ দলটি আবার দু'টি উপদলে বিভক্ত ছিল । এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মারইয়াম এ তিনের সমন্বয়ে এক আল্লাহ্ । অন্য একদলের মতে মারইয়াম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরিবর্তে 'রূহুল কুদুস' বা পবিত্র আত্মা জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম ছিলেন তিন আল্লাহ্‌র একজন ।
মোটকথা, খৃষ্টানরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে তিনের এক আল্লাহ্ মনে করতো ।

এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ্ই তো এক ইলাহ্; তাঁর সন্তান হবে---তিনি এটা থেকে পবিত্র-মহান। আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই; আর কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট(১)।

চব্বিশতম রুকূ'

১৭২. মসীহ্ আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় মনে করেন না, এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশ্তাগণও করে না। আর কেউ

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۗ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٢﴾

তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কুরআনুল কারীমে প্রত্যেকটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হলো ঈসা মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালাম তাঁর মাতা মারইয়াম 'আলাইহিস্ সালাম-এর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ ও আল্লাহ্ তা'আলার সত্য রাসূল। এর অতিরিক্ত তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা বা ধারণা করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তাঁর প্রতি ইয়াহূদীদের মত অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খৃষ্টানদের মত অতিভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের পথভ্রষ্টতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও অতিভক্তি দু'টি পরস্পর বিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ের সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

(১) অর্থাৎ আকাশ ও যমীনের উপর হতে নীচে পর্যন্ত যাকিছু আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। অতএব, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা একাই সর্বকার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট; অন্য কারো সাহায্য-সহযোগীতার প্রয়োজন নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না। সারকথা, কোন সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব, একমাত্র বিবেকবর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট কোন জীবকে তাঁর অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

তাঁর ইবাদাতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে তিনি অচিরেই তাদের সবাইকে তাঁর কাছে একত্র করবেন[১]।

১৭৩. অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পূর্ণ করে দিবেন তাদের পুরস্কার এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। আর যারা (আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা) হেয় জ্ঞান করেছে এবং অহংকার করেছে, তাদেরকে তিনি কষ্টদায়ক শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ্ ছাড়া তাদের জন্য তারা কোন অভিভাবক ও সহায় পাবে না।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ
أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ
اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ۙ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

(১) ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম স্বয়ং এবং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভকারী ফিরিশ্‌তাগণ কখনো আল্লাহ্‌র বান্দারূপে পরিচিত হতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না। কারণ, আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও গোলামী করা, তাঁর 'ইবাদাত-বন্দেগী করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। ঈসা মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালাম ও জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম প্রমূখ বিশিষ্ট ফিরিশ্‌তাগণ এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন। তাই এতে তাঁদের কোন লজ্জা নেই। আসলে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামী করাই লজ্জা বা অমর্যাদার কাজ। যেমন, নাসারারা ঈসা মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-কে আল্লাহ্‌র পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং মুশরিকরা ফিরিশ্‌তাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা ও দেবী সাব্যস্ত করে তাদের মূর্তি তৈরী করে পূজা-আর্চনা শুরু করেছে। অতএব, তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ও অপমান অবধারিত রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সঠিকভাবে ঈমান আনবে এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যে বক্তি এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর সত্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক এবং তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল আর ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং সে কালেমা যা তিনি মারইয়াম 'আলাইহাস্ সালাম-এর মধ্যে পৌঁছিয়েছেন এবং তার পক্ষ থেকে রূহ বিশেষ। আর এও ঈমান আনে যে, জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য। তার আমল যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। [বুখারীঃ ৩৪৩৫]

১৭৪. হে লোকসকল! তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ এসেছে(১) এবং আমরা তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি(২) নাযিল করেছি।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۝١٧٤

১৭৫. সুতরাং যারা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছে এবং তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করেছে তাদেরকে তিনি অবশ্যই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন এবং তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন।

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِهِۦ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ۝١٧٥

১৭৬. লোকেরা আপনার কাছে ব্যবস্থা জানতে চায়(৩)। বলুন, 'পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ

(১) 'বুরহান' শব্দের আভিধানিক অর্থ অকাট্য দলীল-প্রমাণ। এ আয়াতে এর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বুঝানো হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান ব্যক্তিত্বের জন্য 'বুরহান' শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তার বরকতময় সত্তা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ব মু'জিযাসমূহ, তার প্রতি বিস্ময়কর কিতাব আল-কুরআন নাযিল হওয়া ইত্যাদি তার রেসালাতের অকাট্য দলীল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যার পরে আর কোন সাক্ষ্য প্রমাণের আবশ্যক হয় না। অতএব, তার মহান ব্যক্তিত্বই তার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

(২) আলোচ্য আয়াতে نور (নূর) শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। যেমন, সূরা আল-মায়েদার ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ﴾ অর্থাৎ তোমাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তথা এক প্রকৃষ্ট কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআন এসেছে। আবার নূর অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল-কুরআনও হতে পারে। তখন এর অর্থ হবে, হেদায়াতের নূর। যে আলোর ছোয়া লাগলে মানুষের হিদায়াত নসীব হয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবীয় দৈহিকতা থেকে মুক্ত শুধু নূর ছিলেন, যেমনটি কোন কোন ভ্রষ্ট সম্প্রদায় বিশ্বাস করে থাকে।

(৩) জাবের ইবন আবদুল্লাহ বলেন, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। তিনি অজু করে আমার উপর পানি ছিটিয়ে দিলে আমার হুঁশ আসে। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মীরাস কারা পাবে? আমার তো 'কালালাহ' ছাড়া আর কোন ওয়ারিশ নেই। তখন ফারায়েযের আয়াত নাযিল হয়। [বুখারী: ১৯৪; মুসলিম: ১৬১৬]

امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾

ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন, কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে[১] তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর সে (মহিলা) যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। অতঃপর যদি দুই বোন থাকে তবে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ। আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে -এ আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিস্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত[২]।

---

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, এখানে এমন সব ভাই-বোনের মীরাসের কথা বলা হচ্ছে, যারা মৃতের সাথে বাবা-মা উভয়ের দিক থেকে অথবা শুধুমাত্র বাবার দিক থেকে শরীক। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার তার এক ভাষণে এ ব্যাখ্যাই করেছিলেন। কোন সাহাবা তার এই ব্যাখ্যার সাথে মতবিরোধ করেননি। ফলে এটি একটি ইজমা বা সর্বসম্মত মতে পরিণত হয়েছে। আয়াতে এক বোনের জন্য অর্ধেক। আর দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ ঘোষণা করা হয়েছে। যদি দুই এর অধিক বোন থাকে তবে তাদের ব্যাপারে এখানে কিছু বলা হয় নি। অন্য আয়াতে সেটাও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, বোনদের সর্বোচ্চ অংশ হচ্ছে, দুই তৃতীয়াংশ। তারা যত বেশীই হোক না কেন এ সীমা অতিক্রম করে যাবে না। বলা হয়েছে, 'অতঃপর যদি তারা দুই এর অধিক মহিলা হয়, তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশের মালিক হবে।' [সূরা আন-নিসা:১১]

(২) বারা' ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ সবশেষে নাযিলকৃত সূরা হল সূরা বারাআত (তাওবাহ)। আর সবশেষে নাযিলকৃত আয়াত হল এই আয়াত। [বুখারীঃ ৪৩৬৪, ৪৬০৫, ৪৬৫৬, মুসলিমঃ ১৬১৮]

৫- সূরা আল-মায়েদাহ্



সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ১২০ ।

নামকরণঃ এ সূরারই **১১২ ও ১১৬** নং আয়াতদ্বয়ে উল্লেখিত “মায়েদাহ” শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে । মায়েদা শব্দের অর্থঃ খাবারপূর্ণ পাত্র ।

সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপটঃ সূরা আল-মায়েদাহ্ সর্বসম্মত মতে মাদানী সূরা । মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যেও এটি শেষ দিকের সূরা । এমনকি, কেউ কেউ একে কুরআন মজীদের সর্বশেষ সূরাও বলেছেন । আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত আছে, সূরা আল-মায়েদাহ্ যে সময় নাযিল হয়, সে সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ‘আদ্ববা’ নামীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন । সাধারণতঃ ওহী অবতরণের সময় যেরূপ অসাধারণ ওজন ও বোঝা অনুভূত হতো, তখনও যথারীতি তা অনুভূত হয়েছিল । এমনকি ওজনের চাপে উষ্ট্রী অক্ষম হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীচে নেমে আসেন । [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৫৫] কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি ছিল বিদায় হজ্জের সফর । বিদায় হজ্জ নবম হিজরীর ঘটনা । এ হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় আশি দিন জীবিত ছিলেন । আবু হাইয়ান বলেনঃ সূরা মায়েদার কিয়দংশ হোদায়বিয়ার সফরে, কিয়দংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিয়দংশ বিদায় হজ্জের সফরে নাযিল হয় । এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সর্বশেষ সূরা না হলেও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে । [বাহরে মুহীত]

জুবায়ের ইবনে নুফায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একবার হজ্জের পর আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ জুবায়ের, তুমি কি সূরা মায়েদাহ্ পাঠ কর? তিনি আরয করলেন, জী-হ্যাঁ, পাঠ করি । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেন, এটি কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ সূরা । এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত আছে, তা অটল । এগুলো রহিত হওয়ার নয় । কাজেই এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান থেকো । [দেখুনঃ মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩১১]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ

১. হে মুমিনগণ[১]! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ[২]

(১) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন শুনবে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা ‘ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ’ বা ‘হে ঈমানদারগণ’ বলছে তখন সেটাকে কান লাগিয়ে শুন । কেননা, এর মাধ্যমে কোন কল্যানের নির্দেশ আসবে বা অকল্যাণ থেকে নিষেধ করা হবে । [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতে মুমিনগণকে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । এ কারণেই সূরা মায়েদার অপর নাম সূরা ‘উকুদ তথা ওয়াদা- অঙ্গীকারের সূরা । চুক্তি-অঙ্গীকার

পূর্ণ করবে[১]। যা তোমাদের নিকট | لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি বিশেষ করে এর প্রথম আয়াতটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'আমর ইবন হায্‌মকে ঐ আমলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করেন, তখন এ ফরমানের শিরোনামে উল্লেখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন। [দেখুন, নাসায়ী: ৪৮৫৬; আল খাতীবুল বাগদাদী, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ: হাদীস নং ৩১৮ (হাদীসটির সনদ হাসান); দেখুন, 'আদেল ইউসুফ আল-'আয্‌যাযীর টিকা এবং ইরউয়াউল গালীল ১ম খণ্ড: পৃষ্ঠা নং ১৫৮-১৬১]

(১) عُقُوْدٌ শব্দটি عقد শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা, আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও عقد বলা হয়েছে। এভাবে عقود এর অর্থ হয় عهود অর্থাৎ চুক্তি ও অঙ্গীকার। [তাবারী] বস্তুত: দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোন কাজ করা অথবা না করার বাধ্য-বাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই আমরা আমাদের পরিভাষায় চুক্তি বলে অভিহিত করে থাকি। অতএব, উপরোক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরী ও অপরিহার্য মনে কর। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস]

তবে এ আয়াতে চুক্তি বলে কোন্ ধরনের চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত যে সব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাযিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। তাফসীরকার যায়দ ইবনে আসলাম বলেনঃ এখানে ঐসব চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পরে একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি। মুজাহিদ, রবী, কাতাদা প্রমুখ বলেনঃ এখানে ঐসব শপথ ও অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা জাহেলিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করতো। [বাগভী]

প্রকৃতপক্ষে এ সব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই। কারণ, উপরোক্ত সব চুক্তি ও অঙ্গীকারই عقود শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কুরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে। ইমাম আবুল লাইস আস-সামারকান্দী বলেনঃ চুক্তির যত প্রকার রয়েছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেনঃ এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। (এক) পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণতঃ ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার। (দুই) নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন, নিজ যিম্মায় কোন বস্তুর মান্নত মানা অথবা শপথ করে কোন কাজ নিজের উপর জরুরী করে নেওয়া। (তিন) মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

বর্ণিত হচ্ছে[১] তা ছাড়া গৃহপালিত[২] চতুষ্পদ জন্তু[৩] তোমাদের জন্য হালাল করা হল, তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না[৪] ।

চুক্তি । এছাড়া সে সব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয় । বিভিন্ন সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেন-দেন,বিবাহ, ব্যবসা, শেয়ার, ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে সব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা মেনে চলা প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য । তবে শরী'আত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারও জন্যে বৈধ নয় । [তাফসীর আবুল লাইস আস-সামারকান্দী]

(১) 'যা বর্ণিত হচ্ছে' বলে যা বোঝানো হয়েছে, তা এখানে বর্ণিত হয় নি । পরবর্তী ৩ নং আয়াতে সেটার বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে । [আদওয়াউল বায়ান]

(২) আয়াতে বর্ণিত أنعام শব্দটি نعم এর বহুবচন । এর অর্থ পালিত পশু । যেমন- উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি । সূরা আল-আন'আমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে । এদের সবাইকে أنعام বলা হয় । এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, গৃহপালিত পশু আট প্রকার তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে । পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, عقود শব্দ বলে যাবতীয় চুক্তি-অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে । তন্মধ্যে একটি ছিল ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্ তা'আলা হালাল ও হারাম মেনে চলার ব্যাপারে বান্দার কাছ থেকে নিয়েছেন । আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ অঙ্গীকারটিই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে উট, ছাগল ,গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন । শরী'আতের নিয়ম অনুযায়ী তোমরা এগুলোকে যবেহ্ করে খেতে পার । [কুরতুবী]

(৩) এখানে সব ধরনের জন্তু বুঝানো হয়নি । বরং সুনির্দিষ্ট কিছু জন্তু বোঝানো হয়েছে । তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে بَهِيمَةٌ যেসব জীব-জন্তুকে সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে بَهِيمَةٌ বলা হয় । কেননা, মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না । ফলে তাদের বক্তব্য مُبْهَم তথা অস্পষ্ট থেকে যায় । এখানে 'বাহীমা' বলে কোন কোন সাহাবীর মতে, জবাইকৃত প্রাণীর উদরে যে বাচ্চা পাওয়া যায় সেটাকে বোঝানো হয়েছে । [তাফসীরে কুরতুবী; সা'দী; বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(৪) ইহরাম অবস্থায় শিকার করতে নিষেধ করার মাধ্যমে এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, পূর্বে বর্ণিত 'বাহীমাতুল আন'আম' বলতে সে সমস্ত প্রাণীকেও বোঝাবে, যেগুলোকে সাধারণত শিকার করা হয় । যেমন, হরিণ, বন্য গরু, খরগোশ ইত্যাদি । কারণ, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম হওয়ার অর্থ স্বাভাবিক অবস্থায় হালাল হওয়া । [সা'দী]

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যা ইচ্ছে আদেশ করেন[১]।

২. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ[২], পবিত্র মাস, কুরবানীর

يَآأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَآئِرَ اللّٰهِ

(১) আল্লাহ্ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী একচ্ছত্র শাসক। তিনি নিজের ইচ্ছেমত যে কোন হুকুম দেয়ার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন। কাতাদা বলেন, তিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে যা ইচ্ছে বিধান প্রদানের অধিকারী। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য যা ইচ্ছা তা বর্ণনা করেন, ফরয নির্ধারিত করেন, সীমা ঠিক করে দেন। আনুগত্যের নির্দেশ দেন ও অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] তাঁর সমস্ত বিধান জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুক্তি, ন্যায়-নীতি ও কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঈমানদার শুধু এ জন্যই তাঁর আনুগত্য করে না; বরং একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহ্‌র হুকুম বলেই তাঁর আনুগত্য করে। তাই কোন বস্তুর হালাল ও হারাম হবার জন্য আল্লাহ্‌র অনুমোদন ও অননুমোদন ছাড়া আর দ্বিতীয় ভিত্তির আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। তারপরও সেগুলোতে অনেক হেকমত নিহিত থাকে। যেমন তোমাদেরকে তিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ, এতে রয়েছে তোমাদের স্বার্থ। আর এর বিপরীত হলে, তোমাদের স্বার্থহানী হবে। তোমাদের জন্য কিছু প্রাণী হালাল করেছেন সম্পূর্ণ দয়ার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। আবার কিছু প্রাণী থেকে নিষেধ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্ত রাখার জন্য। অনুরূপভাবে তোমাদের জন্য ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষেধ করেছেন, তাঁর সম্মান রক্ষার্থে। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ হে মুমিনগন, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। এখানে شَعَائِر শব্দটি شَعِيْرَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় মুসলিম হওয়ার চিহ্নরূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে شَعَائِرُ الإسلام তথা 'ইসলামের নিদর্শনাবলী' বলা হয়। যেমন, সালাত, আযান, হজ, দাড়ী ইত্যাদি। অনুরূপভাবে সাফা, মারওয়া, হাদঈ ও কুরবানীর জন্তু ইত্যাদিও আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আয়াতে উল্লেখিত 'আল্লাহর নিদর্শনাবলী'র ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। সব উক্তির নির্যাস হলো এই যে, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অর্থ সব শরী'আত এবং ধর্মের নির্ধারিত ফরয, ওয়াজিব ও এদের সীমা। [ফাতহুল কাদীর]

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। আল্লাহর নিদর্শনাবলীর এক অবমাননা হচ্ছে, প্রথমতঃ এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়তঃ এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়তঃ নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। [সা'দী] আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশটিই অন্যস্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

জন্য কা'বায় পাঠানো পশু, গলায় পরান চিহ্নবিশিষ্ট পশু এবং নিজ রব-এর অনুগ্রহ ও সন্তোষলাভের আশায় পবিত্র ঘর অভিমুখে যাত্রীদেরকে বৈধ মনে করবে না(১)। আর যখন তোমরা ইহ্রামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার(২)। তোমাদেরকে মস্জিদুল্ হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালজ্ঘনে প্ররোচিত না করে(৩)। নেককাজ ও

প্রদর্শন করে, তা অন্তরের তাকওয়ারই লক্ষণ'। [সূরা আল-হাজ্জ:৩২] তাছাড়া আয়াতের বাকী অংশে এ নিদর্শণাবলীর কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

(১) অর্থাৎ পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এগুলোর অবমাননা করো না। [আত-তাফসীরুস সহীহ] পবিত্র মাস হচ্ছে জিলকদ, জিলহজ, মুহাররাম ও রজব। এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা শরী'আতের আইনে অবৈধ ছিল। অধিকাংশ আলেমের মতে পরবর্তী কালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রখ্যাত তাবে'য়ী ইমাম 'আতা, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এবং ইবনুল কাইয়্যেম মনে করেন যে, এ আদেশ রহিত হয় নি। যদি কেউ আক্রমণ করে বা যুদ্ধ এর আগে থেকেই চলে আসে তবে এ মাসে যুদ্ধ করা যাবে, নতুবা নয়। [সা'দী, ইবন কাসীর]
এ আয়াতে পরবর্তী নির্দেশ হচ্ছে, কুরবানী করার জন্তু, বিশেষতঃ যেসব জন্তুকে গলায় কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ কিছু পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে এদের হারাম পর্যন্ত পৌঁছতে না দেয়া অথবা ছিনিয়ে নেয়া। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, এগুলো কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা। আয়াত এসব পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে। আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা ঐসব লোকেরও অবমাননা করো না, যারা হজের জন্যে পবিত্র মসজিদের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় পালণকর্তার রহমত, দয়া ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। অর্থাৎ পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ করো না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দিয়ো না। [সা'দী]

(২) এখানে ইহরাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকারও করতে পারবে। [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ যে সম্প্রদায় হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মক্কায় প্রবেশ করতে এবং

তাক্ওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে[১] এবং পাপ ও সীমালংঘনে

ওমরা পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলে, এখন শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ থেকে এভাবে প্রতিশোধ নিও না যে, তোমরা তাদের কাবাগৃহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং হজ্জ করতে বাধা দিতে শুরু করবে। এটাই হবে যুলুম। আর ইসলাম যুলুমের উত্তরে যুলুম করতে চায় না। বরং ইসলাম যুলুমের প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়েম থাকার শিক্ষা দেয়। এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম হক দ্বীন। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) আলোচ্য আয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তি কি হবে সেটা আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন সৎকর্ম ও আল্লাহর ভয়কে আসল মাপকাঠি করেছে, এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। মূলতঃ সৎকর্ম ও তাকওয়াই হলো শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। কারণ, সমস্ত মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, 'কোন আরবের অনারবের উপর অথবা কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। আল্লাহ ভীতি ও আল্লাহর আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪১১] আয়াতে বর্ণিত সৎকাজ ও পাপকাজ এর সংজ্ঞায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বির বা সৎকাজ হচ্ছে, সচ্চরিত্রতা। আর পাপ হচ্ছে, যা তোমার অন্তরে উদিত হয় অথচ তুমি চাও না যে, মানুষ সেটা জানুক'। [মুসলিমঃ ২৫৫৩] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বির বা সৎকাজ হচ্ছে, যাতে অন্তর শান্ত হয়, চিত্তে প্রশান্তি লাভ হয়। আর পাপ হচ্ছে, যাতে অন্তরে শান্ত হয় না এবং চিত্তেও প্রশান্তি লাভ হয় না, যদিও ফতোয়াপ্রদানকারীরা তোমাকে ফতোয়া দিয়ে থাকুক'। [মুসনাদে আহমাদ ৪/১৯৪] আর সহযোগিতার ধরণ সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অত্যাচারিতকে তো আমরা সাহায্য করে থাকি। কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? রাসূল বললেন, তার দু'হাতে ধরে রাখবে। [বুখারীঃ ২৪৪৪] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে কেউ কোন মুসলিমের সম্মান-ইজ্জত-আব্রু নষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডল থেকে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন। [তিরমিযীঃ ১৯৩১; মুসনাদে আহমাদ ৬/৪৫০] তাকওয়া ও বির এর মধ্যে পার্থক্য করে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'নির্দেশিত বিষয় করার নাম বির, আর নিষেধকৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া।' [তাবারী]

একে অন্যের সাহায্য করবে না। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু[১], রক্ত[২], শূকরের গোস্ত[৩], আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা পশু[৪], গলা চিপে মারা যাওয়া জন্তু[৫], প্রহারে মারা যাওয়া জন্তু[৬], উপর থেকে পড়ে

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِۦ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟

(১) আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি জিনিস হারাম করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম হারাম বস্তু হিসেবে বলা হয়েছে, মৃত জিনিস। এখানে 'মৃত' বলে ঐ জন্তু বুঝানো হয়েছে, যা যবেহ্ ব্যতীত কোন রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এধরনের মৃত জন্তুর গোস্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। তবে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই প্রকার মৃতকে এ বিধানের বাইরে রেখেছেন, একটি মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টিড্ডী। [মুসনাদে আহমদঃ ২/৯৭, ইবন মাজাহঃ ৩৩১৪]

(২) আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় হারাম বস্তু হচ্ছে রক্ত। কুরআনের অন্য আয়াতে ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ বা 'প্রবাহিত রক্ত' [সূরা আল-আন'আম:১৬৫] বলায় বুঝা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই হারাম। সুতরাং কলিজা ও প্লীহা রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয়। পূর্বোক্ত যে হাদীসে মাছ ও টিড্ডীর কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও প্লীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

(৩) আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বস্তু হচ্ছে, শুকরের গোস্ত। গোস্ত বলে তার সম্পূর্ণ দেহ বুঝানো হয়েছে। চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। [ইবন কাসীর]

(৪) আয়াতে বর্ণিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদি যবেহ্ করার সময়ও অন্যের নাম নেয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শির্ক। এরূপ জন্তু সর্বসম্মতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরবের মুশরেকরা মূর্তিদের নামে যবেহ্ করত। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে কোন কোন মুর্খ লোক পীর-ফকীরের নামে যবেহ্ করে। যদিও যবেহ্ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে; কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে জবেহ বা কুরবানী করা হয়, তাই এ সব জন্তুও আয়াত দৃষ্টে হারাম।

(৫) আয়াতে বর্ণিত পঞ্চম হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু যাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোন জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে। [ইবন কাসীর]

(৬) আয়াতে বর্ণিত ষষ্ঠ হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচন্ড আঘাতে নিহত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারাল অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং

بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

মারা যাওয়া জন্তু[১], অন্য প্রাণীর শিং এর আঘাতে মারা যাওয়া জন্তু[২] এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু[৩]; তবে যা তোমরা যবেহ্‌ করতে পেরেছ তা ছাড়া[৪], আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলী দেয়া হয় তা[৫] এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ

তীরের আঘাতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। [ইবন কাসীর]

(১) আয়াতে বর্ণিত সপ্তম হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু, যা কোন পাহাড়, টিলা, উঁচু দালানের উপর থেকে অথবা কুপে পড়ে মরে যায়। এমনিভাবে কোন পাখিকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেটি পানিতে পড়ে যায়, তবে তা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ, এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতে বর্ণিত অষ্টম হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু, যা কোন সংঘর্ষে নিহত হয়। যেমন রেলগাড়ী, মোটর ইত্যাদির নীচে এসে মরে যায় অথবা কোন জন্তুর শিং- এর আঘাতে মরে যায়। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতে বর্ণিত নবম হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু, যেটি কোন হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায়। [ইবন কাসীর] এগুলো ছাড়াও হাদীসে অন্যান্য আরো কয়েক ধরনের প্রাণী হারাম করা হয়েছে।

(৪) উপরোক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ অর্থাৎ এসব জন্তুর মধ্যে কোনটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর যবেহ্‌ করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে। এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা, মৃত ও রক্তকে যবেহ্‌ করার সম্ভাবনা নাই এবং শূকর এবং আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত জন্তু সত্তার দিক দিয়েই হারাম। এ দুটোকে যাবেহ্‌ করা না করা উভয়ই সমান। এ কারণে আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চারটি পরবর্তী পাঁচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শেষোক্ত এ পাঁচ প্রকার জন্তুর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং তদবস্থায়ই বিসমিল্লাহ বলে যবেহ্‌ করে দেয়া হয়, তবে এগুলো খাওয়া হালাল হবে। [ইবনে কাসীর]

(৫) আয়াতে বর্ণিত দশম হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু, যাকে নুছুবের উপর যবেহ্‌ করা হয়। নুছুব ঐ প্রস্তর বা বেদীকে বলা হয়, যা কাবা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা এদের উপাসনা করত এবং এদের উদ্দেশ্যে জন্তু কোরবানী করত। একে তারা ইবাদত বলে গণ্য করত। জাহেলিয়াত যুগের আরবরা উপরোক্ত সব প্রকার জন্তুর গোস্ত ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে হারাম করেছেন। [ইবন কাসীর] বর্তমানেও যদি কোথাও আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও জন্য

নির্ণয় করা[১], এসব পাপ কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে[২]; কাজেই তাদেরকে ভয়

উৎসর্গ করার কোন বেদী বা কবর অথবা এ জাতীয় কিছু থাকে এবং সেখানে কেউ কোন কিছু যবেহ করে, তবে তাও হারাম হবে।

(১) আয়াতে উল্লেখিত একাদশ হারাম বস্তুটি হচ্ছে, 'ইস্তেকসাম বিল আযলাম'। যার অর্থ তীরের দ্বারা বন্টণকৃত বস্তু। أَزْلَامٌ শব্দটি زَلَمٌ এর বহুবচন। এর অর্থ ঐ তীর, যা জাহেলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে নির্ধারত ছিল। এ কাজের জন্যে সাতটি তীর ছিল। তম্মধ্যে একটিতে نعم (হ্যাঁ), একটিতে لا (না) এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কা'বাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোন কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে সে কা'বার খাদেমের কাছে পৌঁছে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। খাদেম তূন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। 'হ্যাঁ' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হয়ে আসলে মনে করা হত যে, কাজটি উপকারী। পক্ষান্তরে 'না' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না। হারাম জন্তুসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এ তীরগুলো জন্তুসমূহের গোস্ত বন্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন শরীক হয়ে উট ইত্যাদি যবেহ করে তা গোস্ত প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বন্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে বন্টন করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে কম এবং কেউ অনেক বেশী গোস্ত পেয়ে যেত। এ কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বন্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

আলেমগণ বলেন, ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব পন্থা প্রচলিত আছে; যেমন ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, ইত্যাদি সব اسْتِقْسَام بِالْأَزْلَام এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। اسْتِقْسَام بِالْأَزْلَام শব্দটি কখনও জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে গুটিকা নিক্ষেপ অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ধারণ করা হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা একে مَيْسِر নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। মোটকথা এ জাতীয় বস্তু দ্বারা কোন কিছু নির্ধারণ করা হারাম। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ অদ্য কাফেররা তোমাদের দ্বীনকে পরাভূত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে আল্লাহকে ভয় কর। এ আয়াতাংশ যখন নাযিল হয়, তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব মুসলিমদের করতলগত ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকায় ইসলামী বিধি-বিধান প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছেঃ ইতিপূর্বে কাফেররা মুসলিমদের সংখ্যা ও শক্তি অপেক্ষাকৃত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা করতো। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল-ভরসা নাই। এ কারণে মুসলিমরা তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত হয়ে স্বীয় রবের আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করুক। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌

করো না এবং আমাকেই ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম(১), আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম(২)। অতঃপর কেউ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আরব উপদ্বীপে মুসল্লীরা শয়তানের ইবাদত করবে এ ব্যাপারে সে নিরাশ হয়েছে, তবে সে তাদের মধ্যে গণ্ডগোল লাগিয়ে রাখতে পারবে" [বুখারী: ১১৬২; আবু দাউদ: ১৫৩৮; তিরমিযী: ৪৮০; ইবন মাজাহ: ১৩৮৩]। কোন কোন মুফাসসির বলেন, কাফেরদের নিরাশ হওয়ার অর্থ, তারা তোমাদের মত হবে এবং তোমাদের কর্মকাণ্ড তাদের মত হবে এ ব্যাপারে তারা নিরাশ হয়েছে, কারণ, তোমাদের গুণাগুণ তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । [ইবনে কাসীর]

(১) দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দেবার অর্থই হচ্ছে এর মধ্যে জীবনের সমস্ত প্রশ্নের নীতিগত ও বিস্তারিত জবাব পাওয়া যায়। হেদায়াত ও পথনির্দেশ লাভ করার জন্য এখন আর কোন অবস্থায়ই তার বাইরে যাবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং এ নবীর পরে কোন নবী নেই। এ শরী'আতের পরে কোন শরী'আত নেই। এ শরী'আতে যা যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে সত্য ও ইনসাফপূর্ণ। আল্লাহ্ বলেন, "সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রব-এর বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই।" [সূরা আল-আন'আম: ১১৫] [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতের এ অংশটি নাযিলের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আরাফার দিন। এ দিনটি পূর্ণ বৎসরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে এ দিনটি পড়েছিল শুক্রবারে। এর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজনবিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে-আরাফাত। এ স্থানটিই আরাফার দিনে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হওয়ার বিশেষ স্থান। সময় আছরের পর-যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষতঃ শুক্রবার দিনে। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এ দিনের এ সময়েই দো'আ কবুলের মূহুর্তটি ঘনিয়ে আসে। আরাফার দিনে আরও বেশী বৈশিষ্ট্য সহকারে দো'আ কবুলের সময়। হজ্জের জন্যে মুসলিমদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমাবেশ। প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবায়ে-কেরাম উপস্থিত। রাহমাতুল্লিল-আলামীন সাহাবায়ে-কেরামের সাথে আরাফার সে বিখ্যাত পাহাড়ের নীচে স্বীয় উষ্ট্রী আদ্ববার পিঠে সওয়ার। সবাই হজ্জের প্রধান রোকন অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত। এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও রহমতের ছত্রছায়ায় উল্লেখিত পবিত্র আয়াতটি নাযিল হয়। [দেখুন, তিরমিযীঃ ৩০৪৪] আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ এ আয়াত কুরআনের শেষ দিকের আয়াত। এরপর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। বলা হয় যে, শুধু

পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৪. মানুষ আপনাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? বলুন, ‘তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমস্ত পবিত্র জিনিস[১]। আর শিকারী পশু-পাখি, যাদেরকে তোমরা শিকার শিখিয়েছ - আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে সেগুলোকে তোমরা শিখিয়ে থাক - সুতরাং এই (শিকারী পশুপাখি)-গুলো যা কিছু তোমাদের জন্য ধরে আনে তা থেকে খাও। আর এতে আল্লাহ্‌র নাম স্বরণ কর[২] এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤﴾

উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত-এর পর নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। কেননা, দশম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জ তারিখে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত পান। [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতে বর্ণিত طيبات শব্দের তিনটি অর্থ হয়ে থাকে। এক. যাবতীয় রুচিসম্পন্ন। দুই. যাবতীয় হালালকৃত। তিন. যাবতীয় যবাইকৃত প্রাণী। কারণ, যবাই করার কারণে সেগুলোতে পরিচ্ছন্নতা এসেছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতে শিকারী কুকুর, বাজ ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার জন্যে কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম শর্তঃ কুকুর অথবা বাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। শিকার পদ্ধতি এই যে, আপনি যখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন, তখন সে শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে- নিজে খাওয়া শুরু করবে না। বাজপাখীর বেলায় পদ্ধতি এই যে, আপনি ফেরৎ আসার জন্যে ডাক দেয়া মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে- যদিও তখন কোন শিকারের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। শিকারী জন্তু এমনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গেলে বোঝা যাবে যে, সে আপনার জন্যে শিকার করে, নিজের জন্যে নয়। এমতাবস্থায় এগুলোর ধরে আনা শিকার স্বয়ং আপনারই শিকার বলে গন্য হবে। যদি শিকারী জন্তু কোন সময় এ শিক্ষার

অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।'

৫. আজ(১) তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۭ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

বিরুদ্ধাচরণ করে যেমন, কুকুর নিজেই খাওয়া আরম্ভ করে কিংবা বাজপাখী আপনার ডাকে ফেরৎ না আসে, তবে এ শিকার আপনার শিকার নয়। কাজেই তা খাওয়াও বৈধ নয়। দ্বিতীয় শর্তঃ আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে অথবা বাজকে শিকারের পেছনে প্রেরণ করবেন। কুকুর অথবা বাজ যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পেছনে দৌড়ে শিকার না করে। আলোচ্য আয়াতে এ শর্তটি مكلبين শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এটি تكليب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ কুকুরকে শিক্ষা দেয়া। এরপর সাধারণ শিকারী জন্তুকে শিক্ষা দেয়ার পর শিকারের দিকে প্রেরণ করা বা إرسال এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এর অর্থ শিকারের দিকে প্রেরণ করা। তৃতীয় শর্তঃ শিকারী জন্তু নিজে শিকারকে খাবে না; বরং আপনার কাছে নিয়ে আসবে। এ শর্তটি ﴿مِمَّآ اَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ﴾ বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ শর্তঃ শিকারী কুকুর অথবা বাজকে শিকারের দিকে প্রেরণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। উপরে বর্ণিত চারটি শর্ত পূর্ণ হলে শিকার আপনার হাতে পৌঁছার পূর্বেই যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল হবে; যবেহ্ করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি জীবিত অবস্থায় হাতে আসে, তবে যবেহ্ ব্যতীত হালাল হবে না। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিকার হিসেবে ঐসব বন্য জন্তুর ক্ষেত্রেই এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে, যে গুলো কারও করতলগত নয়। পক্ষান্তরে কোন বন্য জন্তু কারও করতলগত হয়ে গেলে, তা নিয়মিত যবেহ্ করা ব্যতীত হালাল হবে না। [ইবন কাসীর ও কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী আদী ইবন হাতিমকে বললেন, 'যখন তুমি শিকারের উদ্দেশ্যে তোমার কুকুরকে পাঠাবে এবং পাঠানোর সময় আল্লাহ্র নাম নিবে, তারপর যদি সে কুকুর কোন শিকার পাকড়াও করে, তবে তা থেকে খাও, যদিও সে শিকারটিকে হত্যা করে ফেলে থাকে। তবে যদি কুকুর সেটা থেকে নিজে খেয়ে নেয় সেটা ভিন্ন। সেটা খেয়ো না। কারণ, সেটা সে নিজের জন্য শিকার করেছে এমন আশংকা রয়েছে। অনুরূপভাবে অন্য কুকুর এর সাথে মিশে শিকার করলেও সেটা খেয়ো না।' [বুখারী: ৫৪৭৫; মুসলিম: ১৯২৯।

(১) এখানে 'আজ' বলে এ দিনকে বোঝানো হয়েছে, যেদিন এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ দশম হিজরীর বিদায় হজ্জের আরাফার দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আজ যেমন তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বস্তুসমূহ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্যে হালাল ছিল, চিরস্থায়ীভাবে হালাল রাখা হল। [কুরতুবী]

الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ؗ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۟﴿٥﴾

জিনিস হালাল করা হল[১] ও যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে[২] তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ। আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা[৩] নারীদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হল[৪] যদি তোমরা তাদের

---

(১) এ আয়াতে طيبات অর্থাৎ পবিত্র ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ হালাল করেন তাদের জন্যে طيبات এবং হারাম করেন خبائث [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭] এখানে طيبات এর বিপরীতে خبائث ব্যবহার করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। অভিধানে طيبات পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাম্য বস্তুসমূহকে এবং এর বিপরীতে خبائث নোংরা ও ঘৃণার্হ বস্তুসমূহকে বলা হয়। [জালালাইন] কাজেই আয়াতের এ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, যেসব বস্তু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্যে হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্তু নোংরা, ঘৃণার্হ ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যাপারে নবীদের সিদ্ধান্ত সবার জন্যে অকাট্য দলীলস্বরূপ। কেননা, মানুষের মধ্যে নবীগণই সর্বাধিক সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন। কোন কোন মুফাসসির এখানে طيبات এর অর্থ আল্লাহর নামে যবাইকৃত হালাল প্রাণী অর্থ করেছেন। [বাগভী]

(২) এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, আহলে কিতাব হওয়ার জন্য যে কিতাবটির অনুসারী বলে তারা দাবী করে, সে কিতাবটি আল্লাহ্‌ তা'আলার নাযিল করা কিতাব কি না তা প্রমাণিত হতে হবে। সাথে সাথে স্বীয় কিতাবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান থাকা এবং আমল করাও জরুরী। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জীল, যবুর, মূসা ও ইবরাহীম 'আলাইহিস্‌ সালামের সহীফা ইত্যাদি। আর যাদের গ্রন্থ আল্লাহর কিতাব বলে কুরআন ও সুন্নাহর নিশ্চিত পন্থায় প্রমাণিত নয়, তারা আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। মূলতঃ কুরআনের পরিভাষায় ইহুদী ও নাসারা জাতিই আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাসী। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে ইয়াহূদী ও নাসারা মহিলাদের বিয়ে করার ক্ষেত্রে একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তা হলো, তাদেরকে অবশ্যই 'মুহসানাহ্‌' বা সংরক্ষিত মহিলা হতে হবে। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা সংরক্ষিত বা নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারিনী নয়, তারা এর ব্যতিক্রম। [সা'দী]

(৪) আয়াতে আহলে কিতাবদের খাদ্য বলা হয়েছে। সর্বপ্রকার খাদ্যই এর অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগনের মতে 'খাদ্য' বলতে যবেহ্‌ করা জন্তুকে

মাহ্‌র প্রদান কর বিয়ের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার বা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণকারী হিসেবে নয়। আর কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হবে এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে(১)।

দ্বিতীয় রুকূ'

৬. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথায় মাসেহ কর(২) এবং পায়ের

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ

বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] কেননা, অন্য প্রকার খাদ্যবস্তুতে আহলে-কিতাব, পৌত্তলিক, মুশরেক সবাই সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে যবেহ্ করার প্রয়োজন নেই। এগুলো যে কোন লোকের কাছ থেকে যে কোন বৈধ পন্থায় অর্জিত হলে মুসলিমের জন্যে খাওয়া হালাল। [সা'দী] অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদের মতে, কাফেরদের মধ্য থেকে আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও নাসারাদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ হচ্ছে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে জন্তু যবেহ করাকে তারাও বিশ্বাসগতভাবে জরুরী মনে করে। এ ছাড়া মৃত জন্তুকেও তারা হারাম মনে করে। [ইবন কাসীর]

(১) ঈমানের সাথে কুফরী করার অর্থ, ইসলামী শরী'আতের সাথে কুফরী করলো শরী'আতের বিধি-বিধান মানতে অস্বীকার করল, তার সমস্ত আমল পণ্ড হয়ে যাবে। [ফাতহুল কাদীর, মুয়াচ্ছার, সাদী] যারাই এভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর দেয়া শরী'আতের সাথে কুফরী করে সে অবস্থায় মারা যাবে। সে ঈমান অবস্থায় করা যাবতীয় আমল ধ্বংস করে ফেলবে। আখেরাতে সে কিছুরই মালিক থাকবে না। আলেমগণ এ আয়াত থেকে দলীল নিয়েছেন যে, যারাই মুর্তাদ হবে এবং সে অবস্থায় মারা যাবে, তাদের সমস্ত আমল পণ্ড হয়ে যাবে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের হয়ে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমলসমূহ নিস্ফল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৭] [সা'দী]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হুকুমটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, কুলি করা ও নাক পরিস্কার করাও মুখমণ্ডল ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া

أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও[১]; এবং যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে, বা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও[২] এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। সুতরাং তা দ্বারা মুখমণ্ডলে ও হাতে মাসেহ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা করতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

মুখমণ্ডল ধোয়ার কাজটি কখনোই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর কান যেহেতু মাথার একটি অংশ, তাই মাথা মাসেহ্ করার মধ্যে কানের ভেতরের ও বাইরের উভয় অংশও শামিল হয়ে যায়। তাছাড়া অযু শুরু করার আগে দু'হাত ধুয়ে নেয়া উচিত। কারণ, যে হাত দিয়ে অযু করা হচ্ছে, তা পূর্ব থেকেই পবিত্র থাকার প্রয়োজন রয়েছে। সর্বোপরি অযু করার সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা ও অঙ্গসমূহ ধোয়ার মধ্যে বিলম্ব না করা উচিত। এসবের জন্যও হাদীসে বর্ণনা এসেছে। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিধি-বিধানের জন্য তাফসীরে ইবন কাসীর ও তাফসীর কুরতুবী দেখা যেতে পারে]

(১) নু'আইম আল-মুজ্‌মির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে মসজিদের ছাদে উঠলাম। তিনি ওযু করে বললেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতদেরকে কেয়ামতের দিন তাদেরকে 'গুর্‌রান-মুহাজ্জালীন' বলে ডাকা হবে। (অর্থাৎ ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো উজ্জ্বল অবস্থায় উপস্থিত হবে) কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে বৃদ্ধি করতে সক্ষম, সে যেন তা (বৃদ্ধি)করে। [বুখারী: ১৩৬]

(২) স্ত্রী সহবাসের কারণে জানাবাত হোক বা স্বপ্নে বীর্য স্খলনের কারণে হোক উভয় অবস্থায়ই গোসল ফরয। এ অবস্থায় গোসল ছাড়া সালাত আদায় করা ও কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি পানি না পাওয়া যায়, তবে তায়াম্মুমই যথেষ্ট। [সা'দী]

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৭. আর স্মরণ কর, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত এবং যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন তা; যখন তোমরা বলেছিলে, ‘শুনলাম এবং মেনে নিলাম’(১)। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۡ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে(২), এটা তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত(৩)।

---

(১) সত্যনিষ্ঠ মুফাসসিরদের মতে, এখানে কোন মুখ দিয়ে বের হওয়া অঙ্গীকার উদ্দেশ্য নয়। বরং ঈমান আনার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ-নিষেধ পালনের যে অঙ্গীকার স্বতঃই এসে যায়, তা-ই উদ্দেশ্য। [ইবন কাসীর, সা'দী, মুয়াসসার]

(২) এমনকি সন্তানদের মধ্যেও সুবিচার করতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। নু'মান ইবন বাশীর বলেন, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বললেন, আমি আমার এ সন্তানকে একটি দাস উপঢৌকন দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এ রকম উপঢৌকন দিয়েছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসূল বললেন, তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও।’ [বুখারী: ২৫৮৬; মুসলিম: ১৬২৩]

(৩) এ আয়াতের বিষয়বস্তু প্রায় এসব শব্দেই অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে বলা হয়েছিলঃ ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ﴾ [সূরা আন-নিসা: ১৩৫] আর এখানে বলা হচ্ছেঃ ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ﴾ । সাধারণতঃ দুটি

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ⑨

৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ⑩

১০. আর যারা কুফরী করে এবং আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑪

১১. হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নেয়ামত স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের হাত প্রসারিত করতে চেয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের হাত তোমাদের থেকে নিবৃত রাখলেন। আর তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর। আল্লাহ্র উপরই যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে(১)।

কারণ মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা-প্রদান এবং অন্যায় ও অবিচারে প্ররোচিত করে। (এক) নিজের অথবা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। (দুই) কোন ব্যাক্তির প্রতি শত্রুতা ও মনোমালিন্য। সূরা আন-নিসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেয়া হয়েছে আর সূরা আল-মায়েদার আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে। সূরা আন-নিসার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরও পরওয়া করো না। যদি ন্যায় বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায়, তবে তাতেই কায়েম থাক। সূরা আল-মায়েদার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোন শত্রুর শত্রুতার কারণে পশ্চাদপদ হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে। [বাহরে-মুহীত] তাছাড়া সত্য সাক্ষ্য দিতে ত্রুটি না করার প্রতি পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত বিভিন্ন ভঙ্গিতে জোর দিয়েছে। এক আয়াতে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, “সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপী” [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৮৩]।

(১) এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুরা বার বার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদেরকে হত্যা, লুণ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার যেসব পরিকল্পনা

তৃতীয় রুকূ’

১২. আর অবশ্যই আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা তাদের মধ্য থেকে বারজন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম। আর আল্লাহ্ বলেছিলেন, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের সংগে আছি; তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তাঁদেরকে সম্মান-সহযোগিতা কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে আমি তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।’ এর পরও কেউ কুফরী করলে সে অবশ্যই সরল পথ হারাবে।

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

১৩. অতঃপর তাদের[১] অঙ্গীকার ভঙ্গের

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا

করে, সেগুলো আল্লাহ্ ব্যর্থ করে দেন। ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কাফেরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। তাফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। সে সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের সাক্ষী হতে পারে। আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের অদৃশ্য হেফাযতের কথা উল্লেখ করার পর প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নেয়ামত লাভ করার জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা জরূরী। যে কোন জাতি অথবা ব্যক্তি যে কোন সময় বা কোন স্থানে এ দু’টি গুণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে তারই এভাবে হেফাযত ও সংরক্ষণ করা হবে। [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফসীর ইবন কাসীর]

(১) আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী-ইস্‌রাঈল দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে বিভিন্ন আযাবে নিক্ষেপ করেন। অবাধ্যতার ফলে তাদের অন্তর ও মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে যায়। তাতে চিন্তা-ভাবনা ও বুঝার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা পাপের পরিণামে আরও পাপে লিপ্ত হতে থাকে। [ইবন কাসীর]

قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣﴾

জন্য আমরা তাদেরকে লা'নত করেছি ও তাদের হৃদয় কঠিন করেছি; তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার একাংশ তারা ভুলে গেছে। আর আপনি সবসময় তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবেন[১], কাজেই তাদেরকে

---

(১) এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গের পাঁচটি শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে দু'টি শাস্তির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেনঃ "আমরা বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাজা হিসেবে তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিলাম"। ফলে এখন এতে কোন কিছুর সংকুলান রইল না। রহমত থেকে দূরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতাকেই সূরা আল-মুতাফ্ফিফীনে 'মরিচা' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্র আয়াত ও তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের অন্তরে পাপের কারণে 'মরিচা' পড়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেনঃ 'মানুষ প্রথমে যখন কোন পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তাওবা করে এং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ মিটিয়ে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং উপর্যুপরি পাপ কাজ করেই চলে, তবে প্রত্যেক গোনাহ্র কারণে একটি করে কাল দাগ বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অন্তর কাল দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন তার অন্তরের অবস্থা ঐ পাত্রের মত হয়ে যায়, যা উপুড় করে রাখা হয় এবং কোন জিনিস রাখলে তৎক্ষনাৎ বের হয়ে আসে। পরে পাত্রে কিছু থাকে না। ফলে কোন সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অন্তরে স্থান পায় না। তখন তার অন্তর কোন পুণ্য কাজকে পুন্য এবং মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না। [তিরমিযীঃ ৩৩৩৪, ইবন মাজাহ্ঃ ৪২৪৪, মুসনাদে আহমাদঃ ২/২৯৭] অর্থাৎ ব্যাপার উল্টো হয়ে যায়। দোষকে গুণ, পুণ্যকে পাপ এবং পাপকে সওয়াব মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতা বেড়েই চলে। এভাবে বনী-ইস্রাঈলরা অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ দুটি সাজা এই লাভ করে যে, মুক্তির সর্ববৃহৎ উপায় আল্লাহ্র রহমত থেকে তারা দূরে সরে যায় এবং অন্তর এমন পাষাণ হয়ে যায়। তৃতীয় সাজা হচ্ছে যে, আল্লাহ্র কালামকে তারা স্বস্থান থেকে ঘুরিয়ে দেয় অর্থাৎ আল্লাহ্র কালামে পরিবর্তন করে। কখনও শব্দে, কখনও অর্থে এবং কখনও তিলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পরিবর্তনের এ প্রকারগুলো কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক নাসারাও

ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন।

১৪. আর যারা বলে, 'আমরা নাসারা', তাদেরও অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করেছিলাম; অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার একাংশ তারা ভুলে গিয়েছে। ফলে আমরা তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি[১]। আর তারা যা করত আল্লাহ্‌ অচিরেই তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন।

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

১৫. হে কিতাবীরা! আমাদের রাসূল

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

তাদের মধ্যে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে তা কিছু কিছু স্বীকার করে। তাদের চতুর্থ সাজা হচ্ছে যে, তারা তাদেরকে কিতাবের যে অংশ দেয়া হয়েছিল তার অনেকাংশ হারিয়ে ফেলে বা ভুলে যায়। এটাও তাদের জন্য শাস্তিস্বরূপ। তাদের পঞ্চম শাস্তি হচ্ছে যে, তারা সবসময় খেয়ানতে লিপ্ত থাকবে। আল্লাহ্‌র সাথেও তারা খেয়ানত করবে, তাঁর নির্দেশ ও নিষেধে ভ্রুক্ষেপ করবে না। অনুরূপভাবে তারা মানুষের সাথেও খেয়ানত করতে থাকবে। [সা'দী]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নাসারাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের সাজা বর্ণনা করে বলেছেন যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সঞ্চারিত করে দেয়া হয়েছে- যা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। বর্তমানেও নাসারাদের মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বড় মতানৈক্য, পরস্পর বিভেদ ও বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। নাসারাদের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে যে সমস্ত বিভেদ তা বহুমাত্রিক। সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন কোনভাবেই সম্ভব নয়। [ইবন কাসীর] কাতাদা বলেন, 'এ সম্প্রদায় যখন আল্লাহ্‌র কিতাব ছেড়ে দিল, ফরযসমূহ নষ্ট করল, হৃদসমূহ বাস্তবায়ণ বন্ধ করল, তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক করে দেয়া হলো, এটা তাদেরই খারাপ কর্মফলের কারণে তাদের উপর আপতিত হয়েছে। যদি তারা আল্লাহ্‌র কিতাব ও তার নির্দেশের বাস্তবায়ন করত, তবে তারা এ ধরনের মতপার্থক্য ও বিদ্বেষে লিপ্ত হতো না।' [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, এ আয়াতে যাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রাখার কথা বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

তোমাদের নিকট এসেছেন[১], তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি সে সবের অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করছেন এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিচ্ছেন। অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে[২]।

(১) অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি তাদের মধ্যকার মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পথ বলে দেবার পাশাপাশি তারা যে সমস্ত বিষয় গোপন করেছে সেগুলোর অনেকটাই প্রকাশ করে দেন। [ইবন কাসীর] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে ব্যক্তি 'রাজম' তথা বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যার কথা অস্বীকার করবে, সে কুরআনের সাথে এমনভাবে কুফরী করল যে সে তা বুঝতেই পারছে না। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, 'হে কিতাবীরা! আমাদের রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি সে সবের অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করছেন'। তারা যে সমস্ত জিনিস গোপন করেছিল, রজমের বিধান ছিল তার একটি। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৩৫৯]

(২) এ আয়াতে উল্লিখিত 'নূর' সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। যা মূলত পরস্পর সম্পূরক, বিপরীত নয়। কারও কারও মতে, এখানে 'নূর' দ্বারা উদ্দেশ্য, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারও কারও মতে, কিতাব বা কুরআন। বস্তুত রাসূল ও কিতাব একটি অপরটির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাই রাসূল ও কিতাব উভয় ক্ষেত্রেই 'নূর' বিশেষণ ব্যবহার হয়। এখানে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য, ইসলামের দিকে আহ্বানকারী রাসূল, ইসলামের বিধানসম্বলিত কিতাব, অথবা রাসূল ও কিতাব উভয়ই। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় রাসূল ও কিতাব উভয়কে নূর বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। যেমন সূরা আহযাবের ৪৫-৪৬ নং আয়াতে 'নূর' ধাতু থেকে উদ্গত কর্তাবাচক বিশেষ্য 'মুনীর' শব্দ দ্বারা রাসূলকে বিশেষিত করা হয়েছে। আবার একাধিক জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআনকে 'নূর' দ্বারা বিশেষিত করেছেন। যেমন, সূরা আশ-শূরা: ৫২; সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭; সূরা আত-তাগাবুন: ৮; সূরা আন-নিসা: ১৭৪। এসব জায়গায় 'নূর' দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অহী তথা শুধু কুরআনুল কারীমকে বুঝিয়েছেন। অন্যত্র অনুরূপভাবে অন্যান্য নবীদের উপর নাযিলকৃত কিতাবকেও তিনি 'নূর' আখ্যা দিয়েছেন। যেমন, সূরা আল-আন'আম: ৯১; সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৪, ৪৬।

কুরআনের এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আসমান থেকে নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র সকল কিতাবই 'নূর'। লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যেরূপ 'নূর' শব্দের কর্তাবাচক শব্দ 'মুনীর' বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে,

يَّهۡدِىۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ بِاِذۡنِهٖ وَيَهۡدِيۡهِمۡ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ⑯

১৬. যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, এ দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন(১) এবং তাদেরকে নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর তাদেরকে সরল পথের দিশা দেন।

لَقَدۡ كَفَرَ الَّذِيۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡمَسِيۡحُ ابۡنُ مَرۡيَمَ ؕ قُلۡ فَمَنۡ يَّمۡلِكُ مِنَ

১৭. যারা বলে, 'নিশ্চয় মার্‌ইয়াম-তনয় মসীহই আল্লাহ্', তারা অবশ্যই কুফরী করেছে(২)। বলুন, 'আল্লাহ্ যদি

অনুরূপ বিশেষণ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের জন্য ব্যবহার করেছেন। যেমন, সূরা আলে ইমরান: ১৮৫। এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল, নাযিলকৃত অহী এবং সকল আসমানী কিতাব 'নূর'; যা বান্দাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে আগমন করেছে, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাকেই হিদায়াত করেন, যে তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, অর্থাৎ তার মনোনীত দ্বীনের আলোকে চলে। কুরআনের অন্যত্র এ ঘোষণা এসেছে, যেমন সূরা আল-মায়িদাহ: ৩; সূরা আয-যুমার: ২২; সূরা আল-আন'আম: ১২২। অতএব এ নূর হচ্ছে অহীর নূর। এর মাধ্যমে বান্দা তার রবের ইবাদাত সম্পর্কে দিকনির্দেশনা লাভ করে। মানুষের সাথে সম্পর্কের নীতিমালা অর্জন করে। এ নূরই তার সঙ্গীতে পরিণত হয় এবং পথহারা অবস্থায় এ নূর দ্বারাই সে পথের সঠিক দিশা লাভ করে। মোদ্দাকথা: নূর অর্থ অহী, এ অহী যেহেতু রাসূলের উপর নাযিল হয়েছে, তাই কখনো তাকে নূর হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে, কখনো কুরআনকে, কখনো তাওরাত ও ইঞ্জীলকে। অতএব আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অহী সম্বলিত রাসূল ও স্পষ্ট কিতাব আগমন করেছে।

(১) সুদ্দী বলেন, শান্তির পথ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র পথ যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য প্রবর্তন করেছেন এবং সেদিকে আহ্বান করেছেন। আর যা নিয়ে তিনি তাঁর রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। সেটিই হচ্ছে, ইসলাম। কোন মানুষ থেকে তিনি এটা ব্যতীত আর কোন আমল গ্রহণ করবেন না। ইয়াহূদীবাদও নয়, খ্রিষ্টবাদও নয়, মাজুসীবাদও নয়। [তাবারী]

(২) আলোচ্য আয়াতে নাসারাদের একটি উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে- যা তাদের একদলের বিশ্বাসও ছিল। অর্থাৎ তাদের একদলের বিশ্বাস ছিল যে, ঈসা মসীহ্ হুবহু আল্লাহ্। কিন্তু আয়াতে যে যুক্তি দ্বারা বিষয়টির খণ্ডন করা হয়েছে, তাতে নাসারাদের সব দলের একত্ববাদ বিরোধী ভ্রান্ত বিশ্বাসেরই খণ্ডন হয়ে যায়, তা মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালামের আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়া সংক্রান্ত বিশ্বাসই হোক অথবা তিন ইলাহ্‌র অন্যতম

اللهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

মার্‌ইয়াম-তনয় মসীহ্, তাঁর মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে ধ্বংস করতে ইচ্ছে করেন তবে তাঁকে বাধা দেবার শক্তি কার আছে?' আর আস্‌মানসমূহ ও যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন[১] এবং আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ

১৮. আর ইয়াহূদী ও নাসারারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়জন।' বলুন, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের

ইলাহ্ হওয়ার বিশ্বাসই হোক। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, যদি তিনি ঈসা ও তার মা মারইয়ামকে মারতে ইচ্ছা করেন, তবে কি এমন কেউ আছে যে তাদেরকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে? তারা নিজেরাও সেটা করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তারা কিভাবে ইলাহ হতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলার সামনে মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালাম এতই অক্ষম যে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না এবং যে জননীর খেদমত ও হেফাযত তার কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকেও রক্ষা করতে পারেন না। সুতরাং তিনিই কিভাবে ইলাহ হতে পারেন। আর তার মা যেহেতু মারা গেছেন সেহেতু কিভাবেই বা তিনি তিন ইলাহ্‌র অন্যতম ইলাহ্ বলে বিবেচিত হবেন? [তাফসীর মুয়াস্‌সার ও সা'দী]

(১) 'তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন' এ বাক্যে নাসারাদের পূর্বোক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণকে খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা, মসীহ্‌কে আল্লাহ্ মনে করার আসল কারণ তাদের মতে এই ছিল যে, তিনি জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীতে পিতা ছাড়া শুধুমাত্র মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষ হলে নিয়মানুযায়ী পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতেন। আলোচ্য বাক্যে এর উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যেমন অন্যত্র বলেছেন যে, "ঈসার উদাহরণ তো আদমের মত" [সূরা আলে-ইমরানঃ ৫৯] এ আয়াতেও উক্ত সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাধারণ নিয়মের বাইরে মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করা তার ইলাহ্ হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। লক্ষণীয় যে, আদমকে আল্লাহ্ তা'আলা পিতা ও মাতা উভয়ের মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহ্ সবকিছুই করতে পারেন। তিনিই স্রষ্টা, রব ও উপাসনার যোগ্য। অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। [সা'দী; মুয়াস্‌সার; ইবন কাসীর]

بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন[১]? বরং তোমরা তাদেরই অন্তর্গত মানুষ যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।' যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দেন[২]। আর আস্‌মানসমূহ ও যমীন এবং এ দুয়ের

---

(১) অর্থাৎ যদি সত্যি-সত্যিই তোমারা আল্লাহ্‌র প্রিয়বান্দা হতে তবে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিতেন না। অথচ তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা নও। আল্লাহ্ যে তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন এটা তোমরাও স্বীকার কর। তোমরা বলে থাক যে, 'আমাদেরকে সামান্য কিছুদিনই কেবল অগ্নি স্পর্শ করবে' [সূরা আল-বাকারাহ: ৮০; সূরা আলে ইমরান: ২৪] আর যদি সত্যি সত্যিই তোমাদের কোন শাস্তি হবে না তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর না কেন? দুনিয়ার কষ্ট থেকে বেঁচে গিয়ে আখেরাতের স্থায়ী শান্তি যদি তোমাদের জন্যই নির্ধারিত থাকে, তবে তোমাদের উচিত মৃত্যু কামনা করা। অথচ তোমরা হাজার বছর বাঁচতে আগ্রহী। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, বলুন, 'যদি আল্লাহ্‌র কাছে আখেরাতের বাসস্থান অন্য লোক ছাড়া বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর---যদি সত্যবাদী হয়ে থাক'। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা কখনো তা কামনা করবে না। [সূরা আল-বাকারাহ: ৯৪-৯৫] আরও বলেন, বলুন, 'হে ইয়াহূদী হয়ে যাওয়া লোকরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নয়; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তারা তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে (তাদের কৃতকর্ম) এর কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। [সূরা আল-জুম'আ: ৬-৭] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্ধুকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে দেন না।' [মুসনাদে আহমাদ ৩/১০৪] এক বর্ণনায় এসেছে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নো'মান ইবন আদ্বা, বাহরী ইবন আমর এবং শাস ইবন আদী এসে কথা বলল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানালেন, তাঁর শাস্তির ভয় দেখালেন। তখন তারা বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদেরকে কিসের ভয় দেখান? আমরা তো কেবল আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি ও তার প্রিয়জন! নাসারাদের মতই তারা বলল। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন। [তাবারী]

(২) সুদ্দী বলেন, এর অর্থ, যাকে ইচ্ছা তাকে আল্লাহ্ দুনিয়াতে হেদায়াত দেন, ফলে তাকে তিনি ক্ষমা করেন। আর যাকে ইচ্ছা কুফরীর উপর মৃত্যু দেন, ফলে তাকে তিনি শাস্তি দেন। [তাবারী]

মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে।

১৯. হে কিতাবীরা! রাসূল পাঠানোতে বিরতির পর(১) আমাদের রাসূল তোমাদের কাছে এসেছেন। তিনি তোমাদের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছেন, যাতে তোমরা না বল যে, 'কোন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের কাছে আসেনি। অবশ্যই তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী এসেছেন(২)। আর

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖۖ فَقَدۡ جَآءَكُم بَشِيرٞ وَنَذِيرٞۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٩

(১) অর্থাৎ নবীগণের আগমন-পরম্পরা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকার পর আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের পর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের সময় পর্যন্ত যে সময়টুকু অতিবাহিত হয়েছে, সে সুদীর্ঘকাল সময়ে আর কোন নবী আসে নি। আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ মূসা ও ঈসা 'আলাইহিমাস্ সালামের মাঝখানে এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে নবীগণের আগমন একাদিক্রমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনও বিরতি ঘটেনি। শুধু বনী-ইস্রাঈলের মধ্য থেকেই এক হাজার নবী এ সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। তারপর ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের জন্ম ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসল্লামের নবুওয়ত লাভের মাঝখানে মাত্র চারশ' বা পাঁচশ' বা ছয়শ' বছরকাল নবীগণের আগমন বন্ধ ছিল। এ সময়টিকেই فترة তথা বিরতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনও এত দীর্ঘ সময় নবীগণের আগমন বন্ধ ছিল না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি ইবন মারইয়ামের সবচেয়ে নিকটতম মানুষ। নবীরা বৈমাত্রেয় ভাই, আমার ও তাঁর মাঝে কোন নবী নেই।' [মুসলিম: ২৩৬৫; অনুরূপ বুখারী: ৩৪৪২]

(২) আলোচ্য আয়াতে আহলে-কিতাবদের সম্বোধন করে একথা বলার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তার আগমনকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নেয়ামত মনে করা। কেননা, নবীর আগমন সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। এখন তোমাদের জন্যে তা আবার খোলা হয়েছে।
নবী আসার পর তোমাদের আর কোন ওজর আপত্তি অবশিষ্ট রইল না। সুতরাং তোমাদের উচিত ঈমান আনা। আর যদি তা না কর তবে মনে রেখ যে, আল্লাহ্

আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

চতুর্থ রুকূ'

২০. আর স্মরণ করুন(১), যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَٰلَمِينَ ۝٢٠

তা'আলা অপরাধীকে শাস্তি ও আনুগত্যকারীকে শান্তি দিতে সক্ষম। [ইবন কাসীর, মুয়াসসার ও তাবারী]

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে বনী-ইস্‌রাঈলের একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, ফির'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হয় এবং মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তার সম্প্রদায় বনী-ইস্‌রাঈল ফির'আউনের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কিছু নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তাদের পৈতৃক দেশ শামদেশকেও তাদের অধিকারে প্রত্যার্পণ করতে চাইলেন। সেমতে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে তাদেরকে জিহাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র ভূমি শাম (বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তীন তথা বাইতুল মুকাদ্দাস) এলাকায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দেয়া হল। সাথে সাথে তাদেরকে আগাম সুসংবাদও দেয়া হল যে, এ জিহাদে তারাই বিজয়ী হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ পবিত্র ভূমির আধিপত্য তাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বনী-ইস্‌রাঈল প্রকৃতিগত হীনতার কারণে আল্লাহ্র বহু নেয়ামত তথা ফির'আউনের সাগরডুবি ও তাদের মিসর অধিকার ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখেও এক্ষেত্রে অঙ্গীকার পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হল না। তারা জিহাদ সম্পর্কিত আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় জেদ ধরে বসে রইল। পরিণতিতে তারা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে রইল। বাহ্যতঃ তাদের চারপাশে কোন বাধার প্রাচীর ছিল না এবং তাদের হাত-পা শেকলে বাঁধা ছিল না; বরং তারা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারা স্বদেশে অর্থাৎ মিসর ফিরে যাবার জন্য প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথও চলত; কিন্তু তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত, যেখান থেকে সকালে রওয়ানা হয়েছিল। ইত্যবসরে মূসা ও হারূন 'আলাইহিমাস্ সালামের ওফাত হয়ে যায় এবং বনী-ইস্‌রাঈল তীহ্ প্রান্তরেই উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হেদায়াতের জন্য অন্য একজন নবী প্রেরণ করলেন। এমনিভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বনী-ইস্‌রাঈলের অবশিষ্ট বংশধর তৎকালীন নবীর নেতৃত্বে শাম দেশের সে এলাকা তথা সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের জন্যে জিহাদের সংকল্প গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদাও পূর্ণতা লাভ করে। [ইবন কাসীর]

তোমাদের মধ্যে নবী করেছিলেন ও তোমাদেরকে রাজা-বাদশাহ করেছিলেন এবং সৃষ্টিকুলের কাউকেও তিনি যা দেননি তা তোমাদেরকে দিয়েছিলেন[১] ।

---

(১) আল্লাহ বলেনঃ "তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নেয়ামতকে স্বরণ কর । তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক নবী পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন নেয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কেউ পায়নি" । এতে তিনটি নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে । একটি ঈমানী নেয়ামত; অর্থাৎ তার সম্প্রদায়ে অব্যাহতভাবে বহু নবী প্রেরণ । এর চাইতে বড় সম্মান আর কিছু হতে পারে না । হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ইসরাইল বংশীয়দেরকে নবীরা শাসন করতেন । যখনই কোন নবী মারা যেত, তখনই অন্য নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন' । [বুখারী: ৩৪৫৫; মুসলিম: ১৮৪২] আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় নেয়ামতটি হচ্ছে পার্থিব ও বাহ্যিক । অর্থাৎ তাদেরকে রাজ্য দান । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী-ইস্রাঈল সুদীর্ঘ কাল ফির'আউন ও ফির'আউনবংশীয়দের ক্রীতদাসরূপে দিনরাত অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল । আজ আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউন ও তার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে বনী-ইস্রাঈলকে তার রাজ্যের অধিপতি করে দিয়েছেন । অথবা, এখানে রাজ্যদান বলতে রাজার হাল বোঝানো হয়েছে । কারণ, ইসরাইল বংশীয়দের মধ্যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম ব্যতীত তখনও আর কেউ রাজা হন নি । তাই এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা খুবই অবস্থাসম্পন্ন মানুষ ছিল । তারা রাজার হালে থাকত । ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তারা বাড়ী, নারী ও দাস-দাসী নিয়ে জীবন যাপন করত বলেই তাদেরকে রাজা বলা হয়েছে । [ইবন কাসীর] তৃতীয় নেয়ামত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার নেয়ামতের সমষ্টি । বলা হয়েছেঃ 'তোমাদেরকে এমনসব নেয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের আর কাউকে দেননি । আভ্যন্তরীণ সম্মান, নবুওয়াত এবং রেসালাতও এর অন্তর্ভুক্ত । এ ছাড়া বাহ্যিক রাজত্ব এবং অর্থ-সম্পদও এরই মধ্যে পরিগণিত । প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনের উক্তি অনুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায় অন্য সব উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ । কুরআনের উক্তি ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [সূরা আলে-ইমরানঃ ১১০] ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৪৩] -প্রভৃতি বাক্য এবং অসংখ্য হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন করে । এর উত্তর এই যে, আয়াতে সৃষ্টিকুলের ঐসব লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা মূসা 'আলাইহিস্ সালামের আমলে বিদ্যমান ছিল । তখন সমগ্র বিশ্বের কেউ ঐসব নেয়ামত পায়নি, যা বনী-ইস্রাঈল পেয়েছিল । পরবর্তী যুগের কোন উম্মত যদি আরো বেশী নেয়ামত লাভ করে, তবে তা আয়াতের পরিপন্থী নয় । [ইবন কাসীর]

২১. ‘হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি লিখে দিয়েছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর(১)

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا

(১) এখানে পবিত্র ভূমি বলতে কোন্ ভূমি বোঝানো হয়েছে, এ প্রশ্নে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো মতে বায়তুল-মুকাদ্দাস, কারো মতে কুদ্স শহর ও ইলিয়া এবং কেউ কেউ বলেন, আরিহা শহর- যা জর্দান নদী ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যস্থলে বিশ্বের একটি প্রাচীনতম শহর যা পূর্বেও ছিল এবং এখনও আছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, পবিত্র ভূমি বলে দামেস্ক ও ফিলিস্তিনকে এবং কারো মতে জর্দানকে বোঝানো হয়েছে। কাতাদাহ্ বলেনঃ সমগ্র শামই পবিত্র ভূমি। [ইবন কাসীর, আত-তাফসীরুস সহীহ]

আল্লাহ্ তা‘আলা মূসা ‘আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে বনী-ইস্রাঈলকে আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শামদেশ দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, এ পবিত্র ভূখণ্ড তাদের জন্যে লেখা হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। তা সত্ত্বেও বনী-ইস্রাঈল চিরাচরিত ঔদ্ধত্য ও বক্র স্বভাবের কারণে এ নির্দেশ পালনে স্বীকৃত হল না; বরং মূসা ‘আলাইহিস্ সালামকে বললঃ হে মূসা, এ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বাস করে। যতদিন এ দেশ তাদের দখলে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। যদি তারা অন্য কোথাও চলে যায়, তবে আমরা সেখানে যেতে পারি। বিভিন্ন তাফসীরে এসেছে, তখন সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাস আমালেকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তারা ছিল ‘আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দৈহিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ঠ ও ভয়াবহ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। তাদের সাথেই জিহাদ করে বায়তুল-মুকাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেয়া হয়েছিল। মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্যে বনী-ইস্রাঈলকে সঙ্গে নিয়ে শাম দেশ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কিন্তু বনী-ইস্রাঈল যেখানে নবীর কথার প্রতিই কর্ণপাত করল না, সেখানে তাদের উপদেশের আর মূল্য কি? তারা পূর্বের জবাবেরই আরও বিশ্রী ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করে বললঃ “আপনি ও আপনার আল্লাহ্ উভয়ে গিয়েই যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব”। কথাটি অত্যন্ত বিশ্রী ও পীড়াদায়ক। এ কারণেই তাদের এ বাক্যটি প্রবাদ বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। বদরযুদ্ধে নিরস্ত্র ও ক্ষুধার্ত মুসলিমদের মোকাবেলায় কাফেরদের এক হাজার সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে আল্লাহ্র দরবারে দো‘আ করতে লাগলেন। এতে সাহাবী মিকদাদ ইবন আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেনঃ ‘ইয়া রসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমরা কস্মিন কালেও ঐকথা বলব না, যা মূসা ‘আলাইহিস্ সালামকে তার স্বজাতি বলেছিল; বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।’ [বুখারীঃ ৩৭৩৬]

خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾

এবং পশ্চাদপসরণ করো না, করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।’

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ
نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا
فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তারা বলল, ‘হে মূসা! নিশ্চয় সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রয়েছে এবং তারা সে স্থান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনোই সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করব না। অতঃপর তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেলে তবে নিশ্চয় আমরা সেখানে প্রবেশ করব।’

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ
عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ
فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۬ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. যারা ভয় করত তাদের মধ্যে দুজন, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, ‘তোমরা তাদের মুকাবিলা করে দরজায় প্রবেশ কর, প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে এবং আল্লাহ্‌র উপরই তোমরা নির্ভর কর যদি তোমরা মুমিন হও।’

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا
فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا
قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তারা বলল, ‘হে মূসা! তারা যতক্ষণ সেখানে থাকবে ততক্ষণ আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করব না; কাজেই তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় আমরা এখানেই বসে থাকব।’

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ
فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. তিনি বললেন, ‘হে আমার রব! আমি ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো উপর আমার অধিকার নেই, সুতরাং আপনি আমাদের ও ফাসিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিন।’

২৬. আল্লাহ্ বললেন, 'তবে তা(১) চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হল, তারা যমীনে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে, কাজেই আপনি ফাসিক সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না(২) ।'

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

পঞ্চম রুকূ'

২৭. আর আদমের দু'ছেলের কাহিনী আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনান(৩) । যখন তারা উভয়ে কুরবানী

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ

(১) অর্থাৎ সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার অধিকার তারা চল্লিশ বছরের জন্য হারিয়েছে। কারণ তারা অবাধ্যতা করেছিল। এটা ছিল তাদের জন্য নির্ধারিত দুনিয়ার শাস্তি। হয়ত এর মাধ্যমে তাদের উপর আপতিত কোন কঠোর শাস্তি লাঘব করা হয়েছিল। চল্লিশ বছর নির্ধারনের কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, এ সময়ের মধ্যে সে জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের মৃত্যু সংঘটিত হবে, যারা ফির'আউনের দাসত্ব ও তাবেদারীর কারণে ইজ্জতের যিন্দেগী যাপন করার মত হিম্মত অবশিষ্ট ছিল না। পরবর্তীতে যারা সেই কঠোর প্রতিকুল অবস্থায় জন্মলাভ করেছিল তারাই শত্রুদের পরাভূত করার মত সাহসী হতে পেরেছিল। [সা'দী]

(২) মহান আল্লাহ্ যখন জানলেন যে, মূসা আলাইহিস সালাম সম্ভবতঃ তার কাওমের জন্য দয়াপরবশ হবেন এবং তাদের প্রতি নাযিলকৃত শাস্তির জন্য দুঃখবোধ করতে থাকবেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে এ ব্যাপারে আফসোস না করার নির্দেশ দিলেন। যাতে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, এ শাস্তিটুকু তাদের অপরাধের কারণে, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর সামান্যও জুলুম করেন নি। [সা'দী]

(৩) কুরআনুল কারীম কোন কিচ্ছা-কাহিনী অথবা ইতিহাস গ্রন্থ নয় যে, তাতে কোন ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হবে। এতদসত্ত্বেও অতীত ঘটনাবলী এবং বিগত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। এগুলোই ইতিহাসের আসল প্রাণ। তন্মধ্যে অনেক অবস্থা ও ঘটনা এমনও রয়েছে, যেগুলোর উপর শরী'আতের বিভিন্ন বিধি-বিধান ভিত্তিশীল। এসব উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনুল কারীমের সামগ্রিক রীতি এই যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে, অধিকাংশ স্থানে পূর্ণ ঘটনা এক জায়গায় বর্ণনা করে না; বরং ঘটনার যে অংশের সাথে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সম্পর্ক থাকে সে অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়। আদম 'আলাইহিস্ সালামের পুত্রদ্বয়ের কাহিনীটিও এই বিজ্ঞ রীতির ভিত্তিতে বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অনেক শিক্ষা ও উপদেশ

এবং প্রসঙ্গক্রমে শরী'আতের অনেক বিধি-বিধানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

আদম-পুত্রদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে সংক্ষেপে তা হল, যখন আদম ও হাওয়া 'আলাইহিমাস্ সালাম পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা- এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা-ভগিনী ছাড়া আদমের আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম 'আলাইহিস্ সালামের শরী'আতে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী হিসাবে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহনকারিনী কন্যা সহোদরা ভগিনী গণ্য হবে না। তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমাসুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত ভগিনীটি ছিল অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত ভগিনীটি কাবিলের ভাগে পড়ে। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জিদ ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ্ দিতে হবে। আদম 'আলাইহিস্ সালাম তাঁর শরী'আতের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আব্দার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেনঃ তোমরা উভয়েই আল্লাহ্র জন্যে নিজ নিজ কুরবানী পেশ কর। যার কুরবানী গৃহীত হবে, সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। আদম 'আলাইহিস্ সালামের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যে সত্য পথে আছে, তার কুরবানীই গৃহীত হবে। তৎকালে কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কুরবানীকে ভস্মিভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানী অগ্নি ভস্মিভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হত। হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্যে পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা এসে হাবিলের কুরবানীটি ভস্মীভূত করে দিল এবং কাবিলের কুরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিবাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে বলল, আল্লাহ্র নিয়ম এই যে, তিনি আল্লাহ্ভীরু মুত্তাকীদের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন করলে তোমার কুরবানীও গৃহীত হত। তুমি তা করনি, তাই কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٧﴾

করেছিল অতঃপর একজন থেকে কবুল করা হল এবং অন্যজনের কবুল করা হল না। সে বলল, 'অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব(১)।' অন্যজন বলল, 'আল্লাহ্‌ তো কেবল মুত্তাকীদের পক্ষ হতে কবুল করেন।'

لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. 'আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি তোমার হাত প্রসারিত করলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার প্রতি আমার হাত প্রসারিত করব না; নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌কে ভয় করি(২)।'

এতে আমার দোষ কি? তারপর যা ঘটেছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তা পবিত্র কুরআনে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। [ইবন কাসীর]

(১) আব্দুল্লাহ্‌ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যখন কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে, তখন তার পাপের একাংশ আদমের প্রথম সন্তানের উপর বর্তাবে।' [বুখারীঃ ৬৮৬৭] অন্য এক হাদীসে আব্দুল্লাহ্‌ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ 'আমার পরে তোমরা একে অপরের গলা কেটে কুফরীর পথে ফিরে যেয়ো না।' [বুখারীঃ ৬৮৬৮]

(২) আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যখন দু'জন মুসলিম তাদের হাতিয়ার নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হবে, তখন তাদের দু'জনই জাহান্নামে যাবে। বলা হল, এতে হত্যাকারীর ব্যাপারটি তো বোঝা গেল, কিন্তু যাকে হত্যা করা হয়েছে তার ব্যাপারটি কেমন? তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সেও তো তার সাথীকে হত্যা করতে চেয়েছিল'। [বুখারী: ৭০৮৩; মুসলিম: ২৮৮৮] অন্য হাদীসে এসেছে, সা'দ ইবন আবী ওক্কাস বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি সে আমার ঘরে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন কি করতে হবে আমাকে জানান। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি তখন আদম সন্তানদের মত হয়ে যাও'। তারপর বর্ণনাকারী তেলাওয়াত করলেন, 'যদি তুমি আমার প্রতি তোমার হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমার প্রতি আমার হস্ত প্রসারিত করব না। [আবু দাউদ: ৪২৫৭; তিরমিযী: ২১৯৪] এর অর্থ, তুমি তাকে হত্যা করবে না সেটা জানিয়ে দাও। অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

২৯. 'নিশ্চয় আমি চাই তুমি আমার ও তোমার পাপ নিয়ে ফিরে যাও[১] ফলে তুমি আগুনের অধিবাসী হও এবং এটা যালিমদের প্রতিদান ।'

إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. অতঃপর তার নফ্‌স তাকে তার ভাই হত্যায় বশ করল । ফলে সে তাকে হত্যা করল; এভাবে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল ।

فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٣٠﴾

৩১. অতঃপর আল্লাহ্ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের মৃতদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার জন্য মাটি খুঁড়তে লাগল[২] । সে বলল, 'হায়! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের

فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ﴿٣١﴾

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, হে আবু যর! তোমার কি করণীয় থাকবে, যখন দেখবে যে, আহযারু যাইত স্থানও রক্তে ডুবে গেছে? আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা পছন্দ করবেন । রাসূল বললেন, তোমার উচিত তখন তুমি যেখান থাকো সেখানে থাকা । অর্থাৎ পরিবার পরিজনের বাইরে না যাওয়া । তিনি বললেন, আমি কি আমার তরবারী নিয়ে ঘাঁড়ে লাগাব না? রাসূল বললেন, তাহলে তো তুমি তাদের সাথে হত্যায় শরীক হলে । আবু যর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে আমার করণীয় কি? তুমি তোমার ঘরে অবস্থান করবে । আমি বললাম, যদি তারা আমার ঘরে প্রবেশ করে? তিনি বললেন, যদি তুমি ভয় পাও যে, তরবারীর চমকানো আলো তোমাকে বিভ্রান্ত করবে, তাহলে তুমি তোমার চেহারার উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও, এতে করে (যদি তোমাকে সে হত্যা করে, তবে) সে তোমার ও তার গোনাহ নিয়ে ফিরে যাবে । [আবু দাউদ: ৪২৬১; ইবন মাজাহ: ৩৯৫৮; মুসনাদে আহমাদ ৫/১৬৩]

(১) কাতাদা ও মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, তুমি আমাকে হত্যা করার কারণে যে পাপ হবে তা তোমার পূর্ব পাপের সাথে যুক্ত হবে । [তাবারী]

(২) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, একটি কাক আরেকটি মৃত কাকের নিকট এসে তার উপর মাটি দিতে দিতে সেটাকে ঢেকে দিল । এটা দেখে যে তার ভাইকে হত্যা করেছে সে বলতে লাগল, 'হায়! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না' । [তাবারী]

মৃতদেহ গোপন করতে পারি?' অতঃপর সে লজ্জিত হল।

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. এ কারণেই বনী ইস্‌রাঈলের উপর এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা বা যমীনে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে(১) সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল(২), আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা

(১) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কবীরা গোনাহ্‌র মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শির্ক করা এবং কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। মিথ্যা কথা বলা, অথবা বলেছেন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। [বুখারীঃ ৬৮৭১] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাস বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক মা'বূদ নাই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, তার রক্ত তিনটি কারণ ব্যতীত প্রবাহিত করা অবৈধ। জীবনের বদলে জীবন (হত্যার বদলে কেসাস)। একজন বিবাহিত ব্যক্তি যদি অবৈধ যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম ত্যাগ করে এবং মুসলিম জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।' [বুখারীঃ ৬৮৭৮]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে, অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা কিংবা যমীনে ফেতনা- ফাসাদসৃষ্টিকারী হবে না, যারা তাদের হত্যা করবে, তারা যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। এ আয়াতে যারা হত্যার বিনিময়ে হত্যা, অথবা ফেতনা-ফাসাদসৃষ্টিকারী হবে, তাদের কি অবস্থা হবে সেটা বর্ণনা করা হয় নি। তবে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাও বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলে দিয়েছেন, "আর আমরা তাদের উপর তাতে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম।" [সূরা আল-মায়েদাহঃ ৪৫] আরও বলেন, "হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাসের বিধান লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস, নারীর বদলে নারী।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ১৭৮] আরও বলেন, "কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যা ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে" [সূরা আল-ইসরাঃ ৩৩] [আদওয়াউল বায়ান]

করল[১]। আর অবশ্যই তাদের কাছে আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন, তারপর এদের অনেকে এর পরও যমীনে অবশ্যই সীমালংঘনকারী।

৩৩. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি কেবল এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে[২]। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও আখেরাতে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে[৩]।

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, কাউকে জীবিত করার অর্থ, আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা হারাম ঘোষণা করেছেন সে ধরনের কোন মানুষকে হত্যা না করা। এতে করে সে যেন সবাইকে জীবিত রাখল। অর্থাৎ যে অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম মনে করে, তার থেকে সমস্ত মানুষ জীবিত থাকতে সমর্থ হলো। [তাবারী]

(২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে কেউ ইসলামের শৃঙ্গে হাতিয়ার ব্যবহার করবে, যাতায়াতকে ভীতিপ্রদ করে দিবে, (ডাকাতি রাহাজানি করবে) তারপর যদি তাদেরকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়, তবে মুসলিম শাসকের এ ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবেন, নতুবা শুলে চড়াবেন, অথবা তার হাত-পা কেটে দিবেন। [তাবারী] হাদীসে এসেছে, একদল লোক মদীনায় আসল, তারা মদীনার আবহাওয়া সহ্য করতে পারল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সাদকার উট যেখানে থাকে সেখানে অবস্থানের অনুমতি দিলেন। যাতে তারা উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করতে পারে। কিন্তু তারা রাখালকে হত্যা করল এবং উটগুলোকে নিয়ে চলে যেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পিছু ধাওয়া করতে নির্দেশ দিলেন। পরে তারা ধৃত হলো। তখন তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হলো, চোখ উপড়ে ফেলা হলো, এবং তাদেরকে মদীনার কালো পাথর বিশিষ্ট এলাকায় ফেলে রাখা হলো। [বুখারী: ১৫০১; মুসলিম: ১৬৭১]

(৩) ইসলামী শরী'আতে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ হুদূদ, কিসাস ও তা'যীরাত। তন্মধ্যে যেসব অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ্ নির্ধারণ করে

৩৪. তবে তারা ছাড়া, যারা তোমাদের আয়ত্তে আসার আগেই তওবা করবে[১]। সুতরাং জেনে রাখ যে,

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

দিয়েছে; তা হচ্ছে, হুদূদ ও কিসাস। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের কোন শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ্ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, সেসব শাস্তিকে শরী'আতের পরিভাষায় 'তা'যিরাত' তথা দণ্ড বলা হয়। কুরআনুল কারীম হুদূদ ও কিসাস পূর্ণ বিবরণ ব্যাখ্যা সহকারে নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দণ্ডনীয় অপরাধের বিবরণকে রাসূলের বর্ণনা ও সমকালীন বিচারকদের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিশেষ বিশেষ অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন।

আলেমরা বলেন, কুরআনুল কারীম যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহ্র হক হিসাবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে 'হুদূদ' বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে জারি করেছে, সেগুলোকে 'কিসাস' বলা হয়। কিসাসের শাস্তি হুদূদের মতই সুনির্ধারিত। প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদূদকে আল্লাহ্র হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না। কিন্তু কিসাস এর বিপরীত। কিসাসে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রবল হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে কেসাস হিসাবে তাকে মৃত্যুদণ্ডও করাতে পারে। যখমের কেসাসও তদ্রূপ। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, সে জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় 'তা'যীর' তথা 'দণ্ড'। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান অনেক বিষয়েই বিভিন্ন। তন্মধ্যে তা'যীর বা দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এ ব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হুদূদের বেলায় কোন বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না। শরী'আতে হুদূদ মাত্র পাঁচটিঃ ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ- এ চারটির শাস্তি কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি বিভিন্ন হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদূদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। [কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত]

(১) হুদুদ জাতীয় শাস্তি যেমন কোন শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তাওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তাওবা দ্বারা আখেরাতের গোনাহ্ মাফ হতে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি

আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ষষ্ঠ রুকূ'

৩৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর।(১) আর তাঁর

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ

ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তাওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তাওবার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পর তাওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হুদূদ তাওবা দ্বারাও মাফ হয় না, হোক সে তাওবা গ্রেফতারীর পূর্বে অথবা পরে। [ইবন কাসীর অনুরূপ বর্ণনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর। ﴿ٱلْوَسِيلَةَ﴾ শব্দটি وسل ধাতু থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। পূর্ববর্তী মনীষী, সাহাবী ও তাবে'য়ীগণ ইবাদাত, নৈকট্য, ঈমান সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লেখিত وسيلة শব্দের তাফসীর করেছেন। হাকেমের বর্ণনা মতে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'ওসীলা শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে'। ইবন জরীর আ'তা, মুজাহিদ ও হাসান বসরী রাহিমাহুমুল্লাহ্ থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতের তাফসীরে কাতাদাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, تَقَرَّبُوْا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالعَمَلِ بِمَا يُرْضِيْهِ অর্থাৎ আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে। [তাবারী; ইবন কাসীর] অতএব, আয়াতের সারব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অন্বেষণ কর। অন্য বর্ণনায় হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে এ আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনে বললেন যে, ওসীলা অর্থ, নৈকট্য। তারপর তিনি বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে যারা সংরক্ষণকারী তারা সবাই এটা ভালভাবেই জানেন যে, ইবন উম্ম আব্দ (ইবন মাসউদ) তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩১২; অনুরূপ তিরমিযী: ৩৮০৭; মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৯৫]

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'জান্নাতের একটি উচ্চ স্তরের নাম 'ওসীলা'। এর উর্ধ্বে কোন স্তর নেই। তোমরা আল্লাহ্র কাছে দো'আ কর যেন তিনি এ স্তরটি আমাকে দান করেন'। [মুসনাদে আহমাদঃ১১৩৭৪ আবু সাঈদ আল-খুদরী হতে] অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যখন মুয়ায্যিন আযান দেয়, তখন মুয়ায্যিন যা বলে, তোমরাও তাই বল। এরপর দুরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্য ওসীলার দো'আ কর'। [মুসলিমঃ ৩৮৪]

উপর্যুক্ত ওসীলা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং সাহাবী ও তাবে'য়ীগণের

পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা | لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٣٥

তাফসীর থেকে জানা গেল যে, যা দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ হয়, তাই অসীলা। পক্ষান্তরে শরী'আতের পরিভাষায় তাওয়াস্‌সুলের অর্থ হল - আল্লাহ্ যা বৈধ করেছেন তা পালন করে এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা ও জান্নাতে পৌঁছা।

ওসীলা শব্দটি কুরআন কারীমে দু'টি স্থানে এসেছেঃ সূরা আল- মায়েদার ৩৫ নং আয়াত এবং সূরা আল-ইস্‌রার ৫৭ নং আয়াত। আয়াতদ্বয়ে ওসীলার অর্থ হলঃ আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। হাফেয ইবন কাসীর রাহেমাহুল্লাহ প্রথম আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, ওসীলার অর্থ নৈকট্য। অনুরূপ তিনি মুজাহিদ, আবু ওয়ায়িল, হাসান বসরী, আবদুল্লাহ ইবন কাসীর, সুদ্দী, ইবন যায়েদ ও আরো একাধিক ব্যক্তি হতেও তা বর্ণনা করেন। আর সম্মানিত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয় আয়াতটি নাযিল হওয়া প্রসংগে বলেছেনঃ 'আয়াতটি আরবদের কিছুসংখ্যক লোকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা কিছুসংখ্যক জিনের উপাসনা করত। অতঃপর জিনেরা ইসলাম গ্রহণ করল, অথচ তাদের উপাসনাকারী মানুষেরা তা টেরই পেল না'। [মুসলিম:৩০৩০; বুখারী ৪৭১৪]

অসীলার প্রকারভেদঃ অসীলা দু' প্রকারঃ শরী'আতসম্মত অসীলা ও নিষিদ্ধ অসীলা।

১. শরী'আতসম্মত অসীলাঃ তা হল শরী'আত অনুমোদিত বিশুদ্ধ ওসীলা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। আর তা জানার সঠিক পন্থা হল কুরআন ও সুন্নার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ওসীলা সম্পর্কে এতদুভয়ে যা কিছু এসেছে সেগুলো জেনে নেয়া। অতএব যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় এ দলীল থাকবে যে, তা শরী'আত অনুমোদিত, তাহলে তাই হবে শরী'আতসম্মত অসীলা। আর এতদ্ব্যতীত অন্য সব অসীলা নিষিদ্ধ। শরী'আতসম্মত অসীলা তিন প্রকারঃ

প্রথমঃ আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের কোন একটি নাম অথবা তাঁর মহান গুণাবলীর কোন একটি গুণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন। যেমন মুসলিম ব্যক্তি তার দো'আয় বলবেঃ হে আল্লাহ! আপনি যে পরম করুণাময় ও দয়ালু সে ওসীলা দিয়ে আমি আপনার কাছে আমাকে সুস্থতা দানের প্রার্থনা করছি। অথবা বলবে 'আপনার করুণা যা সবকিছুতে ব্যপ্ত হয়েছে, তার ওসীলায় আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, যেন আমায় ক্ষমা করে দেন এবং দয়া করেন', ইত্যাদি। এ প্রকার তাওয়াস্‌সুল শরী'আতসম্মত হওয়ার দলীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ "আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সে সব নামেই ডাক"। [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৮০]

দ্বিতীয়ঃ সে সকল সৎ কর্ম দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন, যা বান্দা পালন করে থাকে। যেমন এরকম বলা যে, 'হে আল্লাহ! আপনার প্রতি আমার ঈমান, আপনার জন্য আমার ভালবাসা ও আপনার রাসূলের অনুসরণের ওসীলায়

সফলকাম হতে পার।

আমায় ক্ষমা করুন'। অথবা বলবেঃ 'হে আল্লাহ! আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আমার ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি আমার ঈমানের ওসীলায় আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যেন আমায় বিপদমুক্ত করেন'। এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ "যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি ; সুতরাং আপনি আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন"।[সূরা আলে-ইমরানঃ ১৬] আর এ বিষয়ের দলীলের মধ্যে রয়েছে তিন গুহাবাসীর কাহিনীও, যা সহীহ বুখারীতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।[বুখারীঃ ৩৪৬৫]

তৃতীয়ঃ এমন সৎ ব্যক্তির দো'আর ওসীলায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, যার দো'আ কবুলের আশা করা যায়। যেমন এমন ব্যক্তির কাছে কোন মুসলিমের যাওয়া, যার মধ্যে সততা, তাকওয়া ও আল্লাহর আনুগত্যের হেফাযত লক্ষ্য করা যায় এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আর আবেদন করা যাতে বিপদ থেকে মুক্তি ঘটে ও তার বিষয়টি সহজ হয়ে যায়। শরী'আতে এ প্রকার অনুমোদিত হওয়ার দলীল হল, সাহাবাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ব্যাপক ও নির্দিষ্ট সকল প্রকার দো'আ করার আবেদন জানাতেন। হাদীসে রয়েছে, 'এক ব্যক্তি জুমার দিন মিম্বরমুখী দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে দো'আ করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য বৃষ্টি অবতরণ করেন'। আনাস বলেনঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উঠিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমাদের পানি দিন, হে আল্লাহ! আমাদের পানি দিন"। আনাস বলেনঃ আল্লাহর কসম, আমরা আকাশে কোন মেঘ, ছড়ানো ছিটানো মেঘের খণ্ড বা কোন কিছুই দেখিনি। আমাদের মধ্যে ও সেলা' পাহাড়ের মধ্যে কোন ঘর-বাড়ী ছিলো না। তিনি বললেনঃ এরপর সেলা' পাহাড়ের পেছন থেকে ঢালের মত একখণ্ড মেঘের উদয় হল। মেঘটি আকাশের মাঝ বরাবর এসে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর বৃষ্টি হল।[বুখারীঃ ১০১৩, মুসলিমঃ ৮৯৭] তবে এ প্রকার অসীলা গ্রহণ শুধু ঐ ব্যক্তির জীবদ্দশায়ই হতে পারে, যার কাছে দো'আ চাওয়া হয়। তবে তার মৃত্যুর পর এটা জায়েয নেই; কেননা মৃত্যুর পর তার কোন আমল নেই।

২. **নিষিদ্ধ অসীলাঃ** তা হল- যে বিষয়টি শরী'আতে ওসীলা হিসাবে সাব্যস্ত হয়নি, তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন। এটি কয়েক প্রকার, যার কোন কোনটি অন্যটি থেকে অধিক বিপজ্জনক। তম্মধ্যে রয়েছে-

মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদেরকে আহ্বান করার মাধ্যমে, তাদের দ্বারা পরিত্রাণের আবেদন এবং তাদের কাছে অভাব মোচন, বিপদ থেকে মুক্তিদান প্রভৃতি প্রার্থনা করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন। এটা শির্কে আকবার বা বড় শির্ক

৩৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, কিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ যমীনে যা কিছু আছে যদি সেগুলোর সবটাই তাদের থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণও থাকে, তবুও তাদের কাছ থেকে সেসব গৃহীত হবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি[১]।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

৩৭. তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে; কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হবার নয় এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

৩৮. আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।
কবর ও মাযারের পাশে ইবাদাত পালন ও আল্লাহকে ডাকা, কবরের উপর সৌধ তৈরী করা এবং কবরে প্রদীপ ও গেলাফ দেয়া প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। এটা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত, যা তাওহীদ পরিপূর্ণ হওয়ার অন্তরায় এবং বড় শির্কের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়ার মাধ্যম।
নবীগণ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সম্মান এবং আল্লাহর কাছে তাদের মান ও মর্যাদার ওসীলায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। এটা হারাম। বরং তা নবআবিস্কৃত বেদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা এমনই তাওয়াস্‌সুল যা আল্লাহ বৈধ করেননি এবং এর অনুমতিও দেননি। এ ধরনের ওসীলা অবলম্বন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের যুগে পরিচিত ছিল না। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ 'দো'আকারী এ কথা বলা মাকরূহ যে, আমি আপনার কাছে অমুক ব্যক্তির যে হক্ব রয়েছে কিংবা আপনার অলীগণ ও রাসূলগণের যে হক্ব রয়েছে কিংবা বায়তুল্লাহ্‌ আল-হারাম (কা'বা শরীফ) ও মাশ'আরুল হারামের যে হক্ব রয়েছে তার ওসীলায় প্রার্থনা করছি'। [আত-তাওয়াসসুল ওয়াল অসীলা থেকে সংক্ষেপিত]

(১) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ আয়াত কাফেরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। [ইবনে হিব্বান, (আল-ইহসান) ১৬/৫২৭, ৭৪৮৩]

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে[১]। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৩৯. অতঃপর সীমালংঘন করার পর কেউ তওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾

৪০. আপনি কি জানেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই? যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দেন আর যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾

৪১. হে রাসূল! আপনাকে যেন তারা চিন্তিত না করে যারা কুফরীর দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়---যারা মুখে বলে, 'ঈমান এনেছি' অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে নি[৩]- এবং যারা ইয়াহূদী[৪]

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛۚ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ

(১) চুরির শাস্তি হচ্ছে, ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত কর্তন করা। তবে কতটুকু চুরি করলে সেটা করা হবে এবং কিভাবে চুরি করলে এ শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, এর বিস্তারিত আলোচনা ফিকহ এর কিতাবসমূহ থেকে জেনে নিতে হবে। শর্তপূরণ ও বাস্তবায়নের বাধা অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না। [বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে কুরতুবী দ্রষ্টব্য]

(২) চুরি করার পর তাওবাহ করলে, বান্দা ও আল্লাহ্‌র মধ্যকার গোনাহ মাফ হবে। কিন্তু বিচারকের কাছে চুরি যদি প্রমাণিত হয়, তবে তাকে তার শাস্তি পেতেই হবে। এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। তবে চুরির মাল ফেরত দিতে হবে কি না এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে দু'টি মত রয়েছে। [বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে ইবন কাসীর দ্রষ্টব্য]

(৩) এরা হচ্ছে মুনাফিক। তারা মুখে ঈমানের কথা বললেও অন্তরে ঈমানের কোন অস্তিত্ব নেই। তারা মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত। [ইবন কাসীর]

(৪) প্রাচীন কাল থেকেই ইয়াহূদীরা কখনো স্বজন-প্রীতির বশবর্তী হয়ে এবং কখনো নাম-যশ ও অর্থের লোভে ফতোয়াপ্রার্থীদের মনমত ফতোয়া তৈরী করে দিত। বিশেষতঃ

لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ

তারা (সকলেই) মিথ্যা শুনতে অধিক তৎপর[১], আপনার কাছে আসে নি

অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে এটিই ছিল তাদের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি। কোন ধনী ব্যক্তি অপরাধ করলে তারা তাওরাতের গুরুতর শাস্তিকে লঘু শাস্তিতে পরিবর্তন করে দিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং ইসলামের অভূতপূর্ব সুন্দর ব্যবস্থা ইয়াহূদীদের সামনে এল, তখন তারা একে একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল। যেসব ইয়াহূদী তাওরাতের কঠোর শাস্তিসমূহকে পরিবর্তন করে সহজ করে নিত, তারা এ জাতীয় মোকাদ্দমায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক নিযুক্ত করতে প্রয়াস পেত -যাতে একদিকে ইসলামের সহজ ও নরম বিধি-বিধান দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং অন্য দিকে তাওরাত পরিবর্তন করার অপরাধ থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেও তারা একটি দুষ্কৃতির আশ্রয় নিত। নিয়মিত বিচারক নিযুক্ত করার পূর্বে কোন না কোন পন্থায় মোকাদ্দমার রায় ফতোয়া হিসাবে জেনে নিতে চাইত। উদ্দেশ্য এ রায় তাদের আকাঙ্খিত রায়ের অনুরূপ হলে বিচারক নিযুক্ত করবে, অন্যথায় নয়। এসব কিছুই তাদের অন্তরের কলুষতা প্রমাণ করত। [দেখুন, তাফসীর সা'দী]

বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে এক ইয়াহূদীকে মুখ কালো ও বেত্রাঘাত করা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা কি ব্যভিচারের শাস্তি এরকমই তোমাদের কিতাবে পাও? তারা বলল: হ্যাঁ। তখন তিনি তাদের আলেমদের একজনকে ডেকে বললেন, "যে আল্লাহ্ মূসার উপর তাওরাত নাযিল করেছেন তাঁর দোহাই দিয়ে তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি, তোমাদের কিতাবে কি এটাই ব্যভিচারের শাস্তি? সে বলল, না। তবে যদি আপনি আমাকে এর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস না করতেন, তাহলে আমি কখনই তা বলতাম না। আমাদের কিতাবে আমরা এর শাস্তি হিসেবে 'প্রস্তারাঘাতকেই দেখতে পাই। কিন্তু এটা আমাদের সমাজের উঁচু শ্রেণীর মধ্যে বৃদ্ধি পায়। ফলে আমাদের উঁচু শ্রেণীর কেউ সেটা করলে তাকে ছেড়ে দিতাম। আর নিম্নশ্রেণীর কেউ তা করলে তার উপর শরী'আত নির্ধারিত হদ (তথা রজমের শাস্তি) প্রয়োগ করতাম। তারপর আমরা বললাম, আমরা এ ব্যাপারে এমন একটি বিষয়ে একমত হই যা আমাদের উঁচু-নীচু সকল শ্রেণীর উপর সমভাবে প্রয়োগ করতে পারি। তা থেকেই আমরা রজম বা প্রস্তারাঘাতের পরিবর্তে মুখ কালো ও চাবুক মারা নির্ধারণ করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আল্লাহ্! আমি প্রথম আপনার সেই মৃত নির্দেশকে বাস্তবায়ন করব, যখন তারা তা নিঃশেষ করে দিয়েছে'। তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দেয়া হল এবং তা বাস্তবায়িত হলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। [মুসলিম: ১৭০০]

(১) অনুরূপভাবে ইয়াহূদীদেরও একটি বদভ্যাস হলো যে, তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা

مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖۚ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٤١

এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে যারা কান পেতে থাকে(১)। শব্দগুলো যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে(২)। তারা বলে, ‘এরূপ বিধান দিলে গ্রহণ করো এবং সেরূপ না দিলে বর্জন করো(৩)।’ আর আল্লাহ্‌ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আপনার কিছুই করার নেই। এরাই হচ্ছে তারা যাদের হৃদয়কে আল্লাহ্‌ বিশুদ্ধ করতে চান না; তাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা, আর তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে মহাশাস্তি।

শোনাতে অভ্যস্ত। [ইবন কাসীর] এসব ইয়াহূদী তাদের ধর্মীয় আলেমদের দ্বারা তাওরাতের নির্দেশাবলীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ এবং তাদের বর্ণিত মিথ্যা ও অমূলক কিস্‌সা-কাহিনীই শুনতে থাকত। দ্বীনে তাদের মজবুতির অভাবে যে কোন মিথ্যা বলার জন্য বলা হলে, তারা তাতে অগ্রণী হয়ে যেত। [সা‘দী]

(১) এখানেও ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের দ্বিতীয় একটি বদঅভ্যাস বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এরা বাহ্যতঃ আপনার কাছে একটি দ্বীনী বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধর্মীয় বিষয় জানার জন্যেও আসে নি। বরং তারা এমন একটি ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের গুপ্তচর, যারা অহংকারবশতঃ আপনার কাছে আসেনি। তাদের বাসনা অনুযায়ী আপনার মত জেনে এরা তাদেরকে বলে দিতে চায়। এরপর মানা না মানা সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। [ইবন কাসীর]

(২) ইয়াহূদীদের তৃতীয় একটি বদ অভ্যাস হচ্ছে, তারা আল্লাহ্‌র কালামকে যথার্থ পরিবেশ থেকে সরিয়ে তার ভুল অর্থ করত এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশকে বিকৃত করত। এ বিকৃতি ছিল দ্বিবিধঃ তাওরাতের ভাষায় কিছু হেরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে তদস্থলে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা। ইয়াহূদীরা উভয় প্রকার বিকৃতিতেই অভ্যস্ত ছিল। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ ইয়াহূদীরা তাদের লোকদেরকে নবীজীর কাছে পাঠানোর সময় বলে দিত, যদি তোমাদেরকে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে মুখ কালো ও চাবুক মারার কথা বলে তবে তোমরা গ্রহণ করো, আর যদি তোমাদেরকে রজম তথা পাথর মেরে হত্যার কথা বলে তবে সাবধান হয়ে যাবে, অর্থাৎ তা গ্রহণ করো না। [মুসলিমঃ ১৭০০]

৪২. তারা মিথ্যা শুনতে খুবই আগ্রহশীল এবং অবৈধ সম্পদ খাওয়াতে অত্যন্ত আসক্ত[১]; সুতরাং তারা যদি আপনার কাছে আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবেন বা তাদেরকে উপেক্ষা করবেন[২]। আপনি যদি তাদেরকে

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۗ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ۗ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾

(১) ইয়াহূদীদের চতুর্থ বদভ্যাস হচ্ছে, উৎকোচ গ্রহণ। তারা 'সুহ্‌ত' খাওয়ায় অভ্যস্ত। সুহ্‌তের শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেয়া। এ অর্থেই কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ﴾ -অর্থাৎ "তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত না হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা আযাব দ্বারা তোমাদের মূলোৎপাটন করে দেবেন।[সূরা ত্বা-হা:৬১] অর্থাৎ তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেয়া হবে। অধিকাংশ মুফাসসির এখানে 'সুহত' এর অর্থ করেছেন, হারাম খাওয়া।[তাফসীর সা'দী, ইবন কাসীর, মুয়াস্‌সার] এ অর্থে এক হাদীসে এসেছে, 'নিশ্চয় বেশ্যার বেশ্যাবৃত্তির পয়সা, কুকুর- বিড়াল বিক্রির মূল্য এবং শিংগা লাগানোর বিনিময়ে অর্জিত সম্পদ 'সুহত' তথা হারাম সম্পদের অন্তর্ভুক্ত'।[সহীহ ইবন হিব্বান: ৪৯৪১]

তবে কোন কোন মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে 'সুহ্‌ত' বলে উৎকোচকে বোঝানো হয়েছে।[তাবারী; বাগভী; জালালাইন] উৎকোচ বা ঘুষ সমগ্র দেশ ও জাতিরও মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে বিভাগে ঘুষ চালু হয়ে পড়ে, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের উপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কারো জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকে না। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকনকেও সহীহ্‌ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালী বা মধ্যস্থতা করে'।[মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪/১১৫, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৭৯]

(২) আলোচ্য আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মোকাদ্দমার ফয়সালা করুন, নতুবা নির্লিপ্ত থাকুন। আরো বলা হয়েছে যে, আপনি যদি নির্লিপ্ত থাকতে চান তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পরে বলা হয়েছে, যদি আপনি ফয়সালাই করতে চান, তবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ফয়সালা করুন। অর্থাৎ নিজ শরী'আত অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সমস্ত শরী'আত রহিত হয়ে গেছে। কুরআনে যেসব আইন বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো অবশ্য রহিত হয়নি।[বাগভী]

উপেক্ষা করেন তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করেন তবে তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করবেন(১); নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

৪৩. আর তারা আপনার উপর কিভাবে বিচার ভার ন্যস্ত করবে অথচ তাদের কাছে রয়েছে তাওরাত যাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র বিধান? তা সত্ত্বেও তারা এরপর মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মুমিন নয়।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۗ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٣﴾

সপ্তম রুকূ’

৪৪. নিশ্চয় আমরা তাওরাত নাযিল করেছিলাম; এতে ছিল হেদায়াত ও আলো; নবীগণ, যারা ছিলেন অনুগত, তারা ইয়াহূদীদেরকে তদনুসারে হুকুম দিতেন(২)। আর রব্বানী ও বিদ্বানগণও

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ

(১) আব্দুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ বনু-নদ্বীর এবং বনু-কুরাইযার মধ্যে যুদ্ধ হত। বনু-নদ্বীর বনু-কুরাইযা থেকে নিজেদেরকে সম্মানিত দাবী করত। বনু-কুরাইযার কোন লোক যদি বনু-নদ্বীরের কাউকে হত্যা করত তাহলে তাকেও হত্যা করা হত। কিন্তু বনু-নদ্বীর যদি বনু-কুরাইযার কাউকে হত্যা করত তাহলে এর বিনিময়ে একশ’ ওসাক খেজুর রক্তপণ হিসাবে আদায় করত। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌ তা‘আলা মদীনায় পাঠালেন, তখন বনু-নদ্বীরের এক লোক বনু-কুরাইযার এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। বনু-কুরাইযা তাদের লোকের হত্যার বিনিময়ে কেসাস দাবী করল। তারা বললঃ আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাব এবং শেষ পর্যন্ত তার কাছেই আসল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [আবু দাউদঃ ৪৪৯৪]

(২) আলোচ্য আয়াতে নবীদের প্রতিনিধিবর্গকে দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ ‘রব্বানী’গণ এবং দ্বিতীয় ভাগ ‘আহবার’। তম্মধ্যে ‘রব্বানী’ শব্দটির অর্থ নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, رَبَّانِي শব্দটি رَبّ এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ্‌ওয়ালা বা আল্লাহ্‌ভক্ত। তবে বিজ্ঞ আলেমদের মতে, শব্দটি رُبَّانُ السَّفِينَة

شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

(তদনুসারে হুকুম দিতেন), কারণ তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল। আর তারা ছিল এর উপর সাক্ষী(১)। কাজেই তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর। আর আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য ক্রয় করো না। আর আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের(২)।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ

৪৫. আর আমরা তাদের উপর তাতে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছিলাম যে,

বা জাহাজের নাবিক ও কর্ণধার অর্থে। [মাজমু' ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়্যা] পক্ষান্তরে 'আহবার' শব্দটি 'হিবর' বা 'হাবর' এর বহুবচন। ইয়াহূদীদের বাক পদ্ধতিতে আলেমকে حبر বলা হত। কাতাদা বলেন, রব্বানী হচ্ছে ফকীহগণ। আর আহবার হচ্ছে, আলেমগণ। ইবন যায়দ বলেন, রাব্বানী হচ্ছেন শাসকগণ, আর আহবার হচ্ছে আলেমগণ [তাবারী] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, রাব্বানী ঐ সমস্ত জ্ঞানীদেরকে বলা হয়, যারা বড় কোন ইলম দেয়ার পূর্বে ছোট ইলম প্রদান করে, উম্মতকে প্রস্তুত করে নেন। [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ তারা এর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। [জালালাইন] অথবা, তারা এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে বলে সাক্ষ্য দিচ্ছিল। [কুরতুবী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ তাদেরকে তাওরাতের সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আর তারা এটা স্বীকার করতেও বাধ্য যে, যখনই এর কোন ব্যাপারে সাধারণ মানুষের সন্দেহ হবে, তারা সে সমস্ত ব্যাপারে আলেমদের মুখাপেক্ষী হবে। সাধারণ মানুষ যেখানে সালাত, সাওম, যাকাত, যিকর ইত্যাদি ইবাদত সম্পন্ন করার মাধ্যমেই নাজাত পাবে, সেখানে আলেমদের দায়িত্ব আরও বেশী। তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব হচ্ছে, উপরোক্ত ইবাদাতসমূহ সম্পন্ন করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের যা যা প্রয়োজন হবে, যেখানে যেখানে তাদেরকে সাবধান করার দরকার হবে, সেখানে তাদেরকে তাও করতে হবে। [সা'দী]

(২) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে কেউ আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছে তা অস্বীকার করবে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে। আর যে কেউ তা স্বীকার করবে, কিন্তু বাস্তবায়ন করে তদনুসারে বিধান দিবে না সে যালেম ও ফাসেক হবে। [তাবারী]

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তা তার জন্য কাফফারা হবে[১]। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا

৪৬. আর আমরা তাদের পশ্চাতে মার্‌ইয়াম-পুত্র 'ঈসাকে[২] পাঠিয়েছিলাম,

(১) এ আয়াতে তাওরাতের বরাত দিয়ে কেসাসের বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "আমি ইয়াহূদীদের জন্য তাওরাতের এ বিধান নাযিল করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং বিশেষ জখমেরও বিনিময় আছে"। এ উম্মতের জন্যও কিসাসের উক্ত বিধান পুরোপুরি প্রযোজ্য। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, বনী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাতে মূসা আলাইহিস সালামকে যে বিধান দিয়েছিলেন, তাতে হত্যা, জখম, দাঁত, চোখ, কান ইত্যাদির বিপরীতে দিয়াত দেয়ার কোন সুযোগ ছিল না। হয় কিসাস নিতে হবে, না হয় তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে। [তাবারী] এ উম্মতের জন্য তিনটি সুযোগ রয়েছে। তন্মধ্যে কিসাসের ব্যাপারটি এ আয়াতসহ অন্য আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর দিয়াতের ব্যাপারটি হাদীসে এসেছে, আনাস ইবন মালেকের ফুফী রুবাই' আনসারী এক মেয়ের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। রাসূলের কাছে যখন এ মোকদ্দমা আসল, তখন তিনি তারও দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস ইবন মালেকের চাচা আনাস ইবন নদর বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি রুবাইয়ার দাঁত ভেঙ্গে ফেলবেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্র কিতাব কিসাসের কথাই বলছে। সবশেষে আনসারী মহিলার অভিভাবকরা দিয়াত গ্রহণে রাজী হয়েছিল। [বুখারীঃ ৪৬১১; মুসলিমঃ ১৬৭৫] এ হাদীসে কিসাস ও দিয়াত উভয় বিধানই প্রমানিত হলো। আর ক্ষমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যে অংশের কেসাস ওয়াজিব হয়েছে সে অংশের কেসাস না নিয়ে সদকা করে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সে পরিমাণ গোনাহ্র কাফ্ফারা করে দেবেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩১৬]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমি মার্‌ইয়াম-পুত্র ঈসার সবচেয়ে বেশী নিকটতম। নবীগণ একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভাই; আমার এবং তার মধ্যে কোন নবী নেই।' [বুখারীঃ ৩৪৪২]

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾

তার সামনে তাওরাত থেকে যা বিদ্যমান রয়েছে তার সত্যতা প্রতিপন্নকারীরূপে। আর আমরা তাকে ইঞ্জীল দিয়েছিলাম, এতে রয়েছে হেদায়াত ও আলো; আর তা ছিল তার সামনে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যতা প্রতিপন্নকারী এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশস্বরূপ।

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর ইঞ্জীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ তাতে যা নাযিল করেছেন তদনুসারে হুকুম দেয়(১)। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসেক(২)।

---

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে কি বিধান ইঞ্জীলে দেয়া হয়েছে, সেটার বর্ণনা আসে নি। অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে সেটা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুসংবাদ। তার উপর ঈমান ও তার আনুগত্যের আবশ্যকতা। যেমন আল্লাহ্ বলেন, " আর স্মরণ করুন, যখন মার্‌ইয়াম-পুত্র 'ঈসা বলেছিলেন, 'হে বনী ইস্‌রাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আহ্‌মাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা।" [সূরা আস-সাফ: ৬] আরও বলেন "যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭] ইত্যাদি [আদওয়াউল বায়ান]।

(২) আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়ন করা একদিক থেকে তা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত, অপরদিকে তা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্‌কে একমাত্র আইনদাতা হিসাবে না মানলে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতে শির্ক করা হয়। অপরদিকে আল্লাহ্‌র আইনকে না মেনে অন্য কারো আইনে বিচার-ফয়সালা করলে তাতে তাওহীদুল উলুহিয়্যাতে শির্ক করা হয়। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র আইন ছাড়া অন্য কোন আইনের বিচার-ফয়সালা মনে-প্রাণে মেনে নেয়াও তাওহীদুল উলুহিয়্যাতে শির্ক করা হয়। সুতরাং এ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, আইনদাতা হিসেবে আল্লাহ্‌কে মেনে নেয়া এবং আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়ন করা তাওহীদের অংশ। [মাজমু ফাতাওয়া ও রাসাইলে ইবন উসাইমীন ২/১৪০-১৪৪ ও ৬/১৫৮-১৬২]
লক্ষণীয় যে, ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির"। পরবর্তী ৪৫ নং আয়াতে বলা

৪৮. আর আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি ইতোপূর্বেকার কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর তদারককারীরূপে[১]।

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ

হয়েছে, “আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম”। এর পরবর্তী ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, “আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসিক”। মোটকথা: যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিধান দেয় না। তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ্র আইনে বিচার-ফয়সালা না করলে যালিম বা ফাসিক হওয়ার ব্যাপারটি স্বাভাবিক হলেও, এর মাধ্যমে সর্বাবস্থায়ই কি বড় শির্ক বা বড় কুফরী হবে?

মূলতঃ আল্লাহর আইন অনুসারে না চলার কয়েকটি পর্যায় হতে পারেঃ (১) আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোন আইনে বিচার-ফয়সালা পরিচালনা জায়েয মনে করা। (২) আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কোন আইন দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা উত্তম মনে করা। (৩) আল্লাহর আইন ও অন্য কোন আইন শাসনকার্য ও বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের মনে করা। (৪) আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য কোন আইন প্রতিষ্ঠা করা। উপরোক্ত যে কোন একটি কেউ করলে সে সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু এর বাইরেও আরো কিছু পর্যায় রয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ্র আইনে বিচার না করা বা অন্য আইনের কাছে বিচার চাওয়ার কারণে গোনাহ্গার হলেও পুরোপুরি মুশরিক হয়ে যায় না। যেমন, (এক) কেউ আল্লাহ্র আইনে বিচার-ফয়সালা করা ফরয বলে মেনে নেয়ার পরে নিজের প্রবৃত্তি বা ঘুষের আশ্রয় নিয়ে অন্য কোন আইনে বিচার-ফয়সালা করে, তখন সে যালিম বা ফাসিক হিসেবে বিবেচিত হবে। (দুই) কেউ মানুষের উপর যুলুম করার মানসে আল্লাহ্র আইন ব্যতীত বিচার করে, আল্লাহ্র আইন বাস্তবায়ন করার সুযোগ না থাকে এবং বিচারের অভাবে মানুষের হক নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে। তখন সে ফাসিক বলে বিবেচিত হবে। শেষোক্ত দু'টি বড় শির্ক কিংবা বড় কুফরীর পর্যায়ে পড়ে না। যারা এ কাজ করবে, তারা ছোট শির্ক বা ছোট কুফরী করেছে বলে গন্য হবে। [বিস্তারিত দেখুন, আদওয়াউল বায়ান; মাজমু‘ ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়্যাহ ২৭/৫৮-৫৯; মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/১৩০-১৩২]

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ কুরআন এর পূর্বেকার সমস্ত গ্রন্থের জন্য আমানতদার হিসেবে নির্বাচিত। [তাবারী] সুতরাং অন্যান্য গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে, তা যদি কেউ পরিবর্তন করেও ফেলে কুরআন কিন্তু সেটা ঠিকই একজন আমানতদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সঠিকভাবে বর্ণনা করে দিবে। কাতাদা বলেন, এর অর্থ সাক্ষ্য। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত তথ্যের ব্যাপারে এই কুরআন সাক্ষ্যস্বরূপ।

مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

সুতরাং আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী আপনি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করুন এবং যে সত্য আপনার নিকট এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না[১]। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা একটা করে শরীয়ত ও স্পষ্টপথ নির্ধারণ করে দিয়েছি[২]। আর আল্লাহ্

(১) পূর্ববর্তী ৪২ নং আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন এবং ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমার শরী‘আত অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কারণ, তারা আপনার কাছে হকের অনুসরণের জন্য আগমন করে না। বরং তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণই করবে। তাদের মনঃপুত হলে তা গ্রহণ করবে, নতুবা নয়। সুতরাং তাদের মধ্যে ফয়সালা করার ব্যাপারটি আপনার পূর্ণ ইচ্ছাধীন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে তাদের মধ্যে ফয়সালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণে কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের বিধানকে রহিত করে দিয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্যে হক ফয়সালা করাই হচ্ছে বর্তমান কর্তব্য। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতটি ঐ সমস্ত অমুসলিম লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা আপনার কথা মানার জন্য আপনার সমীপে আগমণ করে। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনার ফয়সালা থাকা জরুরী। [ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সব আম্বিয়া ‘আলাইহিমুস্ সালাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, সহীফা ও শরী‘আতসমূহও যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থ ও শরী‘আতের মধ্যে প্রভেদ কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরী‘আতসমূহ পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরী‘আতকে রহিত করে দেয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, “আমরা তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি বিশেষ শরী‘আত ও বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি। এতে মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শাখাগত নির্দেশসমূহে কিছু প্রভেদ আছে। যদি আল্লাহ্ তোমাদের সবার জন্য একই গ্রন্থ ও একই শরী‘আত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা পছন্দ করেন নি। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা ইবাদাতের স্বরূপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্য সর্বদা তার অনুসরণে লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরী‘আত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হয়ে যাওয়ার কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুখভাবে আনুগত্যের

ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

৪৯. আর আপনি আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করুন ও তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হোন, যাতে আল্লাহ্ আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন তারা এর কোন কিছু হতে আপনাকে বিচ্যুত না করে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কেবল তাদের কোন কোন পাপের জন্য শাস্তি দিতে চান। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই তো ফাসেক।

وَاَنِ احۡكُمۡ بَيۡنَهُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ وَاحۡذَرۡهُمۡ اَنۡ يَّفۡتِنُوۡكَ عَنۡۢ بَعۡضِ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ اِلَيۡكَ‌ؕ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاعۡلَمۡ اَنَّمَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ اَنۡ يُّصِيۡبَهُمۡ بِبَعۡضِ ذُنُوۡبِهِمۡ‌ؕ وَاِنَّ كَثِيۡرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوۡنَ ﴿۴۹﴾

জন্য প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে কারা এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বিশেষ শরী'আত ও বিশেষ গ্রন্থকেই সম্বল করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসেবে আঁকড়ে থাকে- এর বিপক্ষে আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত করে না। কারণ, তাদের মধ্যে মৌলিক দিক তথা আকীদা-বিশ্বাসের দিয়ে পার্থক্য ছিল না। যেমন, তাওহীদের ব্যাপারে সমস্ত নবীই এক কথা বলেছেন। পার্থক্য তো শাখা-প্রশাখা ও কর্ম জাতীয় বিষয়ে। যেমন, কোন বস্তু বা বিষয় কোন সময় হারাম ছিল, আবার তা অন্য সময়ে হালাল করা হয়েছে। এসব কিছুই মূলত তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। কোন কোন মুফাসসির বলেন এখানে جَعَلۡنَا এর পরে ہٗ অব্যয়টি উহ্য ধরা হবে। তখন অর্থ হবে, এ কুরআনকে আমরা সমস্ত মানুষের জন্য সঠিক উদ্দেশ্য হাসিলের পন্থা ও সুস্পষ্ট পথ হিসেবে নির্ধারণ করেছি। [ইবন কাসীর]

৫০. তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে[১]? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহ্‌র চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

অষ্টম রুকূ’

৫১. হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন[২]। নিশ্চয় আল্লাহ্

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

---

(১) জাহেলিয়াত শব্দটি ইসলামের বিপরীত শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসলাম হচ্ছে পুরোপুরি জ্ঞানের পথ। কারণ, ইসলামের পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ্ নিজেই। আর আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। অপরদিকে ইসলামের বাইরের যে কোন পথই জাহেলিয়াতের পথ। আরবের ইসলামপূর্ব যুগকে জাহেলিয়াতের যুগ বলার কারণ হচ্ছে এই যে, সে যুগে জ্ঞান ছাড়াই নিছক ধারণা, কল্পনা, আন্দাজ, অনুমান বা মানসিক কামনা-বাসনার ভিত্তিতে মানুষেরা নিজেদের জন্য জীবনের পথ তৈরী করে নিয়েছিল। যেখানেই যে যুগেই মানুষেরা এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবে, তাকে অবশ্যই জাহেলিয়াতের কর্মপদ্ধতি বলা হবে। মোটকথা: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার বিপরীত বিধান প্রদান করাই জাহিলিয়াত। [সা‘দী] হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছে তিনজন। যে ব্যক্তি হারাম শরীফের মধ্যে অন্যায় কাজ করে, যে ব্যক্তি মুসলিম হওয়া সত্বেও জাহেলী যুগের রীতি-নীতি অনুসন্ধান করে এবং যে ব্যক্তি কোন অধিকার ব্যতীত কারো রক্তপাত দাবী করে।’ [বুখারীঃ ৬৮৮২] হাসান বসরী বলেন, যে কেউ আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানের বিপরীত বিধান প্রদান করল সে জাহিলিয়াতের বিধান দিল। [ইবন আবি হাতিম, ইবন কাসীর]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, বিভিন্ন আয়াত থেকে এটাই বুঝা যায় যে, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি ঐ সময়ই হবে, যখন ব্যক্তির সেখানে ইচ্ছা বা এখতিয়ার থাকবে। কিন্তু যখন ভয়-ভীতি বা সমস্যা থাকবে, তখন তাদের সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কস্থাপনের অনুমতি ইসলাম শর্তসাপেক্ষে দিয়েছে। তা হচ্ছে, যতটুকু করলে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও আন্তরিক বন্ধুত্ব থাকতে পারবে না। [আদওয়াউল বায়ান]

যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না ।

৫২. সুতরাং যাদের অন্তরে অসুখ রয়েছে আপনি তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি ওদের সাথে মিলিত হতে দেখবেন এ বলে, 'আমরা আশংকা করছি যে, কোন বিপদ আমাদের আক্রান্ত করবে[১] ।' অতঃপর হয়ত আল্লাহ্‌ বিজয় বা তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সে জন্য লজ্জিত হবে[২] ।

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۟

৫৩. আর মুমিনগণ বলবে, 'এরাই কি তারা, যারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, নিশ্চয় তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে?' তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়েছে; ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে[৩] ।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۟

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে যাদের অন্তরে অসুখ রয়েছে বলে মুনাফিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা ইয়াহূদীদের সাথে গোপন শলা-পরামর্শ ও তাদের খাতির করে কথা বলতে সাচ্ছন্দ বোধ করে। অনুরূপভাবে তারা তাদের সন্তানদের দুধ পান করাতেও অভ্যস্ত। এমতাবস্থায় তাদের আন্তরিক সম্পর্ক ইয়াহূদীদের সাথেই থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই তারা সবসময় ভাবে যে, ইয়াহূদীদেরই বিজয় হবে। আর তখন তাদের কাছ থেকে তারা বাড়তি সুবিধা পাবে। [তাবারী]

(২) মুসলিমরা সে বিজয় দেখেছিল। সুদ্দী বলেন, সে বিজয় হচ্ছে, মক্কা বিজয়। [তাবারী] কাতাদা বলেন, এখানে বিজয় বলে আল্লাহ্‌র ফয়সালা বুঝানো হয়েছে। [তাবারী] কাতাদা আরও বলেন, মুনাফিকরা তখন ইয়াহূদীদের সাথে তাদের যে গোপন আঁতাত, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও তাদের বিরুদ্ধাচারণ ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপের জন্য লজ্জিত হবে। [তাবারী]

(৩) এ আয়াতে বিষয়টি আরো পরিস্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফেকদের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবী ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

৫৪. হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ এমন এক সম্প্রদায়[১] আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না[২]; এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি তা দান করেন এবং আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ[৩] ।

মুসলিমরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলবে, এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহ্‌র নামে কঠোর শপথ করে বন্ধুত্বের দাবী করত? আজ এদের সব লোকদেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে অবস্থার কথা বর্ণনা করেছে, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই প্রত্যেক মুমিন-মুসলিম সবাই তার বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করেছিল। [সা'দী] আল্লামা শানকীতী বলেন, মুনাফিকদের মিথ্যা শপথের মূল কারণ হচ্ছে, তারা প্রচন্ড ভীতুপ্রকৃতির মানুষ ছিল। যদি কোথাও পালাবার পথ তাদের জানা থাকত তবে তারা সেটাই করত। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কঠোর হুশিয়ারী দেয়া হচ্ছে যে, যারাই আল্লাহ্‌র পথ ও তাঁর দ্বীন থেকে পিছু ফিরে যাবে, তারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর দ্বীনের জন্য নতুন কোন জাতিকে এগিয়ে আনবেন। [তাবারী] আইয়াদ আল-আশ'আরী বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আবু মূসা, এরা হল তোমার সম্প্রদায়।' আর রাসূল হাত দিয়ে ইশারা করছিলেন আবু মূসা আল-আশ'আরীর দিকে। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩১৩]

(২) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'তোমাদের মধ্যে কারো হক জানা থাকলে সে যেন তা বলতে কাউকে ভয় না করে।' বর্ণনাকারী আবু সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ হাদীস বর্ণনা করে কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা অনেক বিষয় দেখেছি, কিন্তু ভয় করেছি। [ইবন মাজাহ্‌: ৪০০৭; তিরমিযী: ২১৯১]

(৩) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলিমদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে

গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, সত্যদ্বীন ইসলামের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দূরের কথা, স্বয়ং মুসলিমদের কোন ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্যি সত্যিই ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ দ্বীনত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে এতেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না- হতে পারে না। মুসলিমরাও যদি দ্বীনত্যাগী হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জায়গায় অন্য কোন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন। সে জাতির মধ্যে বেশ কিছু গুণ থাকবে। তাদের প্রথম গুণ হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসবেন এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসবে। এ গুণটি দু'টি অংশে বিভক্ত- এক. আল্লাহ্‌র সাথে তাদের ভালবাসা। একে কোন না কোন স্তরে মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করা যায়। দুই. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে ভালবাসা। এতে বাহ্যতঃ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোন ভূমিকা নেই। যে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, তা মানুষকে শুনানোরও কোন বাহ্যিক সার্থকতা নেই। কিন্তু কুরআনুল কারীমের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, এ ভালবাসার উপায়-উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, তবে তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে রাসূল, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরন কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসতে থাকবেন, আর আল্লাহ্ তোমাদের অপরাধসমূহ মার্জনা করে দিবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।" [সূরা আলে-ইমরানঃ ৩১] এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুসরণে অবিচল থাকা। এমনটা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। তাদের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে যে, তারা মুসলিমদের সামনে নম্র হবে এবং কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হলে সত্যপন্থী হওয়া সত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থলে বাসস্থান দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছি, যে সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে।' [আবু দাউদঃ ৪৮০০] মোটকথা, তারা মুসলিমদের সাথে স্বীয় অধিকার কাজ-কারবারের ব্যাপারে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদ রাখবে না। তাদের তৃতীয় গুণ হচ্ছে যে, তারা কাফেরদের উপর প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীনের শত্রুদের মোকাবেলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। শত্রুরা তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না। উভয় বাক্য একত্রিত করলে সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, তারা হবে এমন এক জাতি, যাদের ভালবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্ত্বা ও সত্ত্বাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর দ্বীনের খাতিরে নিবেদিত হবে। এ একই বিষয়বস্তু সম্বলিত

৫৫. তোমাদের বন্ধু[১] তো কেবল আল্লাহ্, তাঁর রাসূল[২] ও মুমিনগণ- যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং তারা বিনীত[৩] ।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আর যে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তবে

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, ﴿أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ﴾ -অর্থাৎ "কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ।" [সূরা আল-ফাত্হঃ ২৯] তাদের চতুর্থ গুণ হচ্ছে, "তারা সত্য দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হবে ।" এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও দ্বীনত্যাগের মোকাবেলা করার জন্য শুধু কতিপয় প্রচলিত ইবাদাত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে । এই উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্য পঞ্চম গুণ বলা হয়েছে, "দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারই পরোয়া করবে না ।" [ইবন কাসীর থেকে সংক্ষেপিত]

(১) এ আয়াতে মুসলিমদের গভীর বন্ধুত্ব ও বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে হতে পারে, তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করা হচ্ছে । বলা হয়েছে, প্রথমতঃ তারা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত সালাত আদায় করে । দ্বিতীয়তঃ স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করে । তৃতীয়তঃ তারা বিনম্র ও বিনয়ী; স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্বিত নয়, তারা মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করে । [সা'দী]

(২) ফাইরোয আদ-দাইলামী বলেন, তার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের প্রতিনিধি পাঠালেন । তারা এসে বললঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমরা তো ঈমান এনেছি, এখন আমার বন্ধু-অভিভাবক কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল । তারা বললঃ আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট এবং আমরা সন্তুষ্ট । [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৩২]

(৩) আয়াতে উল্লেখিত ﴿وَهُمْ رَٰكِعُونَ﴾ এ ركوع শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে । কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ এখানে রুকূ' অর্থ পারিভাষিক রুকূ', যা সালাতের একটি রুকন । অর্থাৎ আর তারা রুকুকারী । [ফাতহুল কাদীর] এটা যেমন ফরয সালাতের সাধারণ রুকু উদ্দেশ্য হতে পারে, তেমনিভাবে নফল সালাত আদায়কারী অর্থেও হতে পারে । [বাগভী, জালালাইন] পক্ষান্তরে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে রুকু বলে বিনম্র ও খুশু-খুযু সম্পন্ন হওয়া বোঝানো হয়েছে । [ইবন কাসীর, সা'দী] প্রথম অর্থের ক্ষেত্রে واو টি عطف এর জন্য । আর দ্বিতীয় অর্থের ক্ষেত্রে واو টি حال বা অবস্থা নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । ইবন কাসীর এ অর্থটি গৌন বিবেচনা করেছেন ।

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী(১) ।

নবম রুকূ'

৫৭. হে মুমিনগণ! তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে ও কাফেরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক(২) ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. আর যখন তোমরা সালাতের প্রতি আহ্বান কর তখন তারা সেটাকে হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তুরূপে গ্রহণ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

(১) আয়াতে বলা হয়েছে, যারা কুরআনের নির্দেশ পালন করে বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা হবে বিজয়ী ও বিশ্বজয়ী । বলা হয়েছে, যেসব মুসলিম আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, তারা আল্লাহ্‌র দল । এরপর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, পরিণামে আল্লাহ্‌র দলই সবার উপর জয়ী হবে । পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম সবার উপর জয়ী হয়েছেন । এটি মূলত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক বড় সুসংবাদ । যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানবে, তারা তার দল ও বাহিনীভুক্ত হবে । তাদের জন্যই জয় অপেক্ষা করছে । যদিও মাঝে মাঝে তাদের উপর কোন কোন বিপদ আসে, তা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ তাঁর কোন ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার জন্য তা করিয়ে থাকেন । তবে শেষ পর্যন্ত শুভ পরিণাম ও বিজয় তাদেরই পক্ষে যায় । অন্য আয়াতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা অনুরূপ বলেছেন, তিনি বলেছেন, "আর আমাদের বাহিনী অবশ্যই বিজয়ী হবে" [সূরা আস-সাফফাত: ১৭৩] [সা'দী]

(২) অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাদেরকে সাথী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও খেলা মনে করে । এরা দুই দলে বিভক্ত এক. আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায় । দুই. মুশরিক সম্প্রদায় । আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের কাছে যে ঈমান আছে তার চাহিদা হচ্ছে, তোমরা তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাবে না । তাদের কাছে গোপন ভেদ প্রকাশ করবে না । তাদের সাথে বৈরীভাব রাখবে । তোমাদের কাছে যে তাকওয়া আছে তাও তোমাদেরকে তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করে । [সা'দী]

করে- এটা এ জন্যে যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা বোঝে না ।

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. বলুন, 'হে কিতাবীরা! একমাত্র এ কারণেই তো তোমরা আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর যে, আমরা আল্লাহ্ ও আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা আগে নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি । আর নিশ্চয় তোমাদের অধিকাংশ ফাসেক[১] ।'

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

৬০. বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে? যাকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন এবং যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন । আর যাদের কাউকে তিনি বানর ও কাউকে শূকর করেছেন[২] এবং (তাদের

(১) এ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে সম্বোধন করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত করেছেন । এর কারণ এই যে, তাদের কিছুসংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তাওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলীর অনুসারী এবং এতদুভয়ে বিশ্বাসী । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তি এবং কুরআন নাযিলের পর তারা রাসূল ও কুরআন অনুসারে তাদের জীবন যাপন করেছিল । তখন আয়াতের অর্থ হবে, "তোমরা এজন্যই আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে থাক যে আমরা ঈমান এনেছি, আর তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক হয়েছ । সুতরাং আমাদের ঈমান ও তোমাদের অধিকাংশের ফাসেকীই তোমাদেরকে আমাদের শত্রুতায় নিপতিত করেছে । এ আয়াতের অন্য একটি অনুবাদ হতে পারে, "আর তোমরা আমাদের সাথে এ জন্যই শত্রুতা করে থাক, কারণ তোমাদের অধিকাংশই ফাসেক" । তাছাড়া আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে যে, "আর তোমরা এ জন্যই আমাদের সাথে শত্রুতা করে থাক, আমরা আল্লাহ্ ও তিনি আমাদের উপর যা নাযিল করেছেন এবং যা তোমাদের উপর নাযিল করেছেন, তার উপর ঈমান এনেছি, আর আমরা এও বিশ্বাস করি যে, তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক ।" [ফাতহুল কাদীর, সা'দী, মুয়াসসার]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্

কেউ) তাগূতের ইবাদাত করেছে। তারাই অবস্থানের দিক থেকে নিকৃষ্ট এবং সরল পথ থেকে সবচেয়ে বেশী বিচ্যুত।'

৬১. আর তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি', অথচ তারা কুফর নিয়েই প্রবেশ করেছে এবং তারা তা নিয়েই বেরিয়ে গেছে। আর তারা যা গোপন করে, আল্লাহ্ তা ভালভাবেই জানেন।

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾

৬২. আর তাদের অনেককেই আপনি দেখবেন পাপে, সীমালঙ্ঘনে ও অবৈধ খাওয়াতে তৎপর(১); তারা যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট।

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

কোন বিকৃতদের বংশ বা উত্তরাধিকার রাখেন নি। এর আগেও বানর ও শূকর ছিল"। [মুসলিম: ২৬৬৩] সুতরাং বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা এভাবে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়েছিল তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে নি। বানর ও শুকর এ ঘটনার আগেও ছিল, বর্তমানেও আছে। বর্তমান বানর ও শূকরের সাথে বিকৃতদের কোন সম্পর্ক নেই।

(১) আয়াতে অধিকাংশ ইয়াহূদীদের চারিত্রিক বিপর্যয় ও ক্রমাগত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে -যাতে শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে আত্মরক্ষা করে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, তাদের সম্পর্কে 'দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়া' শিরোনাম ব্যবহার করে কুরআনুল কারীম ইঙ্গিত করেছেন যে, তারা এসব কুঅভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং এসব কুকর্ম মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে। এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে। এতে বুঝা যায় যে, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যে কোন কাজ উপর্যুপরি করতে থাকলে আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর তা করতে তার কোনরূপ কষ্ট ও দ্বিধা হয় না। ইয়াহূদীরা কুঅভ্যাসে এ সীমায়ই পৌঁছে গিয়েছিল। অথচ তারা মনে করে যে, তারা উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন। 'তারা যা আমল করে তা কতই না মন্দ!' [সা'দী] এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে, ﴿يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ﴾ অর্থাৎ "তারা দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়।" সৎকর্মে নবী এবং ওলীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাদের সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে এসেছে, ﴿يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ অর্থাৎ "তারা দৌড়ে দৌড়ে পূণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৯০]

لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. রাব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণ[১] কেন তাদেরকে পাপ কথা বলা ও অবৈধ খাওয়া থেকে নিষেধ করে না? এরা যা করছে নিশ্চয়ই তা কতই না নিকৃষ্ট[২]।

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, রব্বানী বলে নাসারাদের আলেম সম্প্রদায়, আর আহবার বলে ইয়াহূদীদের আলেমদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অপর মুফাসসিরগণ মনে করেন, এখানে শুধু ইয়াহূদীদের আলেমদেরকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ, এর পূর্বেকার আলোচনা তাদের সম্পর্কেই চলছিল। [ফাতহুল কাদীর] এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বর্ণনা এ সূরার ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে।

(২) আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছেঃ “সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ” করার কর্তব্যটি ত্যাগ করে ইয়াহূদীদের এসব মাশায়েখ ও আলেম অত্যন্ত বদভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে। জাতিকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেও তারা বাধা দিচ্ছে না। লক্ষণীয় যে, পূর্বোক্ত আয়াতে সর্বসাধারণের দুষ্কর্ম বর্ণিত হয়েছিল। তাই এর শেষে ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ বলা হয়েছে, কিন্তু এ আয়াতে ইয়াহূদী মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাই এর শেষে ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ বলা হয়েছে। কারণ, আরবী অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই فعل বলা হয়। عمل শব্দটি ঐ কাজকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং صنع ও صنعت শব্দ ঐ কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসাবে ঠিক করে করা হয়। তাই সর্বসাধারণের কুকর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে শুধু عمل শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ আর বিশিষ্ট মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্ত কাজের জন্য صنع শব্দ প্রয়োগে ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ﴾ বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] আব্দুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, মাশায়েখ ও আলেমদের জন্য সমগ্র কুরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর হুশিয়ারী আর কোথাও নাই। তাফসীরবিদ যাহ্‌হাক বলেন, আমার মতে মাশায়েখ ও আলেমদের জন্য এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ। [তাবারী]

এ কারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের জন্যে কুরআন ও হাদীসে ‘সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ’ এর প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। কুরআন এ কর্তব্যটিকে উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘কোন জাতির মধ্যে যখন কোন পাপ কাজ করা হয় অথচ কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৬৩] মালেক ইবন দীনার রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেন, আল্লাহ্‌ তা‘আলা এক জায়গায় ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক বস্তি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশ্‌তারা বললেন, এ বস্তিতে

৬৪. আর ইয়াহূদীরা বলে, ‘আল্লাহ্‌র হাত[১] রুদ্ধ’[২]। তাদের হাতই রুদ্ধ করা হয়েছে এবং তারা যা বলে সে জন্য তারা অভিশপ্ত[৩], বরং আল্লাহ্‌র উভয়

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ۚ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ

আপনার অমুক ইবাদতকারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এল, তাকেও আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাও- আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখনও ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি। [কুরতুবী, বাহরে মুহীত]

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা কেয়ামতের দিন সমস্ত যমীনকে তাঁর মুঠিতে ধারণ করবেন। এবং সমস্ত আকাশকে স্বীয় ডান হাতে নিয়ে নিবেন। তারপর বলবেন, আমিই একমাত্র বাদশাহ্।’ [বুখারীঃ ৭৪১২]

(২) হাত রুদ্ধ বলে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, কৃপণতা বোঝানো হয়েছে। সূরা আল-ইসরার ২৯ নং আয়াতেও এ শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ্‌র হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতে ইয়াহূদীদের একটি গুরুতর অপরাধ ও জঘন্য উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ হতভাগারা বলতে শুরু করেছে যে, ‘আল্লাহ্ তা‘আলা দরিদ্র হয়ে গেছেন’। ঘটনা ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা মদীনার ইয়াহূদীদেরকে বিত্তশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছিলেন, কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে, তখন পাষণ্ডরা সামাজিক মোড়লি ও কুপ্রথার মাধ্যমে প্রাপ্ত নযর-নিয়াযের খাতিরে এ আহ্বান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তখন মূর্খদের মুখ থেকে এ জাতীয় কথাবার্তা বের হতে থাকে যে, আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে অথবা আল্লাহ্ কৃপণ হয়ে গেছেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ কথাটি ইয়াহূদীরা ঐ সময় বলেছিল যখন তারা দেখল যে, আল্লাহ্ তা‘আলা কর্জে হাসানাহ দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন লোকের দিয়াতের ব্যাপারে সবার থেকে সহযোগিতা নিচ্ছেন। তখন তারা বলতে লাগল যে, মুহাম্মাদের ইলাহ ফকীর হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [কুরতুবী]

এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাত তো তাদেরই বাঁধা হবে এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত হবে, যার ফলে আখেরাতে আযাব এবং দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ তা‘আলার হাত সব সময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। তাঁর দান চিরকাল অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু তিনি যেমন ধনবান ও বিত্তশালী, তেমনি সুবিজ্ঞও বটে। তিনি বিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যয় করেন; যাকে উপযুক্ত মনে করেন, বিত্তশালী করে দেন এবং যার ঘাড়ে উপযুক্ত মনে করেন, অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেন। [সা‘দী]

رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

হাতই প্রসারিত(১); যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আর আপনার রব-এর কাছ থেকে যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা অবশ্যই তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবে। আর আমরা তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি(২)। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায় তখনই আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দেন এবং তারা দুনিয়ায় ফাসাদ করে বেড়ায়; আর আল্লাহ্ ফাসাদকারীদেরকে ভালবাসেন না।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর যদি কিতাবীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমরা তাদের পাপসমূহ অবশ্যই মুছে ফেলতাম এবং তাদেরকে সুখময় জান্নাতে প্রবেশ করাতাম।

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ

৬৬. আর তারা যদি তাওরাত, ইঞ্জীল ও তাদের রবের কাছ থেকে তাদের প্রতি

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ্র ডান হাত পরিপূর্ণ। খরচ করে তা কমানো যায় না। রাত-দিন সবাইকে তিনি দিচ্ছেন। তোমরা কি দেখনা আসমান-যমীনের সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তিনি সবাইকে যা দিচ্ছেন, তাতে তাঁর ডান হাতে যা আছে তার একটুও কমেনি। আর তাঁর আরশ রয়েছে পানির উপর। তাঁর অপর হাতে রয়েছে গ্রহণ করা। উন্নতি এবং অবনতি তাঁরই হাতে। [বুখারীঃ ৭৪১৯, মুসলিমঃ ৯৯৩]

(২) এখানে বলা হয়েছে যে, এরা উদ্ধত জাতি। আপনার প্রতি নাযিল করা কুরআনী নির্দেশাবলীর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফর ও অবিশ্বাস আরও কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঘোর মতানৈক্য সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। ফলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সাহসী হয় না এবং তাদের কোন চক্রান্তও সফল হয় না। [বাগবী, ইবন কাসীর, সা'দী, ফাতহুল কাদীর]

إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

যা নাযিল হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করত[১], তাহলে তারা অবশ্যই তাদের উপর থেকে ও পায়ের নীচ থেকে আহারাদী লাভ করত[২] । তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা মধ্যপন্থী; এবং তাদের অধিকাংশ যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট[৩] ।

---

(১) যিয়াদ ইবনে লাবীদ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ব্যাপার উল্লেখ করে বললেনঃ 'এটা ঐ সময়ই হবে যখন দ্বীনের জ্ঞান চলে যাবে । আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কিভাবে জ্ঞান চলে যাবে অথচ আমরা কুরআন পড়ছি, আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন পড়াচ্ছি, তারা তাদের সন্তানদেরকে পড়াবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত? তিনি বললেন. তোমার আম্মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক যিয়াদ! (আরবি ভাষায় ভর্ৎসনামূলক বাক্য) আমি তো মনে করেছিলাম তুমি মদীনার ফকীহ্‌দের অন্যতম । এই ইয়াহূদী এবং নাসারারা কি তাওরাত ও ইঞ্জীল পড়ে না, অথচ তারা এর থেকে কিছুই আমল করে না ।' [ইবন মাজাহ্ঃ ৪০৪৮]

(২) এর সারমর্ম এই যে, যদি ইয়াহূদীরা আজও তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনুল কারীমের নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেগুলো পুরোপুরি পালন করে- ক্রটি এবং মনগড়া বিষয়াদিকে দ্বীন বলে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা আখেরাতে প্রতিশ্রুত নেয়ামতরাজির যোগ্য হবে এবং দুনিয়াতেও তাদের সামনে রিয্‌কের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে । ফলে উপর-নীচ সবদিক থেকে তাদের উপর রিয্‌ক বর্ষিত হবে । আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করতেন । ফলে যমীন হতে ফসল উৎপাদিত হতো । আর এভাবেই তাদেরকে আসমান ও যমীনের বরকত প্রদান করা হতো । [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদর্শনার্থে এ কথা বলা হয়েছে যে, ইয়াহূদীদের যেসব বক্রতা ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সমস্ত ইয়াহূদীদের অবস্থা নয়; বরং তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সৎপথের অনুসারীও রয়েছে । সৎ পথের অনুসারী বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে ইয়াহূদী অথবা নাসারা ছিল, এরপর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে । অথবা তাদেরকে যারা ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সঠিক মত পোষণ করে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল ছিলেন । তিনি ইলাহ বা ইলাহের সন্তান ছিলেন না । [তাবারী] তারপর বলা হয়েছে যে, 'যদিও তাদের অধিকাংশই কুকর্মী' । কারণ, তাদের অধিকাংশই ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে হয় বাড়াবাড়ি নতুবা মর্যাদাহানিকর মন্তব্য করে থাকে । অনুরূপভাবে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও ঈমান আনে না । [তাবারী]

দশম রুকূ’

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না[১]। আর আল্লাহ্‌ আপনাকে মানুষ

(১) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচারকার্যের তাগিদ ও তার প্রতি সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে, যাতে করে তিনি নিরাশ কিংবা প্রচারকার্যে নিরুৎসাহিত না হন। বলা হচ্ছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা সম্পূর্ণটিই বিনা দ্বিধায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিন; কেউ মন্দ বলুক অথবা ভাল, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। অপরদিকে তাকে এ সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফেররা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ তা‘আলা স্বয়ং আপনার দেখাশুনা করবেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ্‌ তা‘আলার একটি নির্দেশও পৌঁছাতে বাকী রাখেন, তবে আপনি নবুয়তের দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন এ কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। বিদায় হজে তিনি সাহাবায়ে কেরামের অভূতপূর্ব সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেনঃ ‘শুন, আমি কি তোমাদের কাছে দ্বীন পৌঁছে দিয়েছি?’ সাহাবীগণ স্বীকার করলেন, ‘জী হ্যাঁ, অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছেন।’ এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ‘তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো।’ তিনি আরো বললেন, ‘এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেবে।’ [বুখারী: ৪১৪১, ৩২৬৬] অন্য এক হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, যে ব্যক্তি মনে করে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তিনি তার কিছু অংশ গোপন করেছেন, সে মিথ্যা বলেছে। [বুখারী: ৪৬১২]

আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াত ও অনুরূপ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলের দায়িত্ব শুধু প্রচার করা। আর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দায়িত্ব যথাযথই পালন করেছেন। এ জন্যে আল্লাহ্‌ বলেন, “কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, এতে আপনি তিরস্কৃত হবেন না।” [সূরা আয-যারিয়াত:৫৪] সুতরাং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। কোন কিছুই গোপন করেন নি। [আদওয়াউল বায়ান] হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যে কেউ তোমাকে বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তার কোন অংশ গোপন করেছেন, তাহলে মিথ্যা বলেছে।

থেকে রক্ষা করবেন[১]। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

৬৮. বলুন, 'হে কিতাবীরা! তাওরাত, ইঞ্জীল ও যা তোমাদের রব-এর কাছ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তা[২] প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

কারণ, আল্লাহ্ বলেন, "হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না" [বুখারী: ৪৬১২]

(১) আয়াতের এ বাক্যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যে যত বিরোধিতাই করুক, শত্রুরা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। হাদীসে বলা হয়েছে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে কয়েকজন সাহাবী দেহরক্ষী হিসাবে সাধারণভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতেন এবং গৃহে ও প্রবাসে তাকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। [দেখুন- তিরমিযী, ৩০৪৬] কারণ, এ দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রচারকার্যে কেউ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জিহাদে সাময়িকভাবে কোনরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থী নয়। তাছাড়া কোন কোন হাদীসে এ হিফাযতের বাস্তব নমূনাও আমরা দেখতে পাই। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নাজদের পথে যুদ্ধে বের হলাম। একটি ঘন বৃক্ষ সম্পন্ন উপত্যকায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তরবারীটি একটি গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে আরাম করছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম ছায়ার আশায় বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত ঘুরাফেরা করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একটি লোক এসে আমার ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগে আমার তরবারীটি হাতে নিল। আমি জাগ্রত হয়ে দেখলাম যে, লোকটি আমার মাথার উপর উন্মুক্ত অসি নিয়ে বলছে, তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ্। লোকটি দ্বিতীয়বার আমাকে বলল, তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ্। আর তখনি তরবারী পড়ে গেল। আর সে হচ্ছে এই বসা লোকটি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কিছু করলেন না। [মুসলিম:৮৪৩; অনুরূপ বুখারী: ২৯১০]

(২) আয়াতে কিতাবী সম্প্রদায় তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বলা হয়েছে, 'তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে'। পূর্বেই তাওরাত ও ইঞ্জীলের কথা বলা হয়েছে, সুতরাং এখানে 'তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের

طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

তোমরা কোন ভিত্তির উপর নও[১]।' আর আপনার রব-এর কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরীই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং আপনি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য আফসোস করবেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ

৬৯. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে, আর সাবেয়ী[২] ও

প্রতি' বলে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, পবিত্র কুরআনকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কারণ, কুরআন সবার জন্যই নাযিল হয়েছে। আর কুরআন ব্যতীত তাওরাত ও ইঞ্জীল বাস্তবায়ন করার সুযোগ নেই। তবে কোন কোন মুফাসসির মনে করেন, তাওরাত ও ইঞ্জীল ছাড়াও তাদের নবীদের উপর আরও যে সমস্ত বিধি-বিধান সম্বলিত নাযিল করা হয়েছিল তা-ই এখানে উদ্দেশ্য। [ফাতহুল কাদীর]

(১) আলোচ্য আয়াতে ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে শরী'আত অনুসরণের নির্দেশ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, হে ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়! তোমরা দ্বীনের কোন অংশেই নেই। কেননা, কুরআনের উপরও তোমাদের ঈমান নেই, নবীর উপরও নেই। অনুরূপভাবে, তোমরা তোমাদের নবী, কিতাব, শরী'আত কিছুই অনুসরণ করনি। সুতরাং তোমরা কোন হকের উপর নও, কোন ভিত্তিকেও আকড়িয়ে থাকতে পারনি। সুতরাং তোমরা কোন কিছুরই মালিক হবে না। যদি তোমরা শরী'আতের নির্দেশাবলী পালন না কর, তবে তোমরা কিছুই নও। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা চারটি সম্প্রদায়কে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এর কারণে আখেরাতে মুক্তির ওয়াদা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় হচ্ছে ﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ অর্থাৎ মুসলিম। দ্বিতীয়তঃ ﴿وَالَّذِيْنَ هَادُوْا﴾ অর্থাৎ ইয়াহূদী। তৃতীয়তঃ نصارى অর্থাৎ নাসারা, যারা ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী করে থাকে। চতুর্থতঃ সাবেউন। তন্মধ্যে এদের মধ্যে তিনটি জাতিঃ মুসলিম, ইয়াহূদী ও নাসারা সর্বজন পরিচিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান। কিন্তু 'সাবেয়ীন' সম্পর্কে চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। মুজাহিদ বলেন, সাবেয়ীরা হচ্ছে, নাসারা ও মাজুসীদের মাঝামাঝি এক সম্প্রদায়, যাদের কোন দ্বীন নেই। অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, তারা ইয়াহূদী ও মাজুসীদের মাঝামাঝি এক সম্প্রদায়। সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, তারা ইয়াহূদী ও নাসারাদের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। হাসান বসরী ও হাকাম বলেন, তারা মাজুসীদের মতই। কাতাদাহ বলেন, তারা ফেরেশতাদের পূজা করে থাকে এবং আমাদের কিবলা ব্যতীত অন্যদিকে

وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾

নাসারাগণের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[১]।

সালাত আদায় করে থাকে। আর তারা যাবূর পাঠ করে থাকে। ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ বলেন, তারা একমাত্র আল্লাহকেই চিনে। তাদের কোন শরী'আত নেই তবে তারা কুফরী করে না। ইবন ওয়াহাব বলেন, তারা ইরাকের কুফা অঞ্চলে বসবাস করে। তারা সমস্ত নবীর উপরই ঈমান আনে, ত্রিশ দিন সাওম পালন করে, ইয়ামানের দিকে ফিরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। তাছাড়া তাদের ব্যাপারে আরও কিছু বর্ণনা রয়েছে। [ইবন কাসীর] বর্তমানে তাদের অধিকাংশই ইরাকে বসবাস করে। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা বলেন, তাদের মধ্যে দু'টি দল রয়েছে। একটি মুশরিক, অপরটি একত্ববাদের অনুসারী। [মাজমূ' ফাতাওয়া] এ ব্যাপারে সূরা আল-বাকারার ৬২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(১) এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে গবেষণা করলে বুঝা যায় যে, এখানে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার কথা বলেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান ও তার অনুসরণের কথা বোঝানো হয়েছে। [মুয়াস্সার] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে এটা বোঝানই উদ্দেশ্য যে, মুক্তির একটিই পথ। আর সেটি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান, আখেরাতের উপর ঈমান এবং সৎকাজ করা। তিনি যখন যা নাযিল করেছেন তখন তা অনুসরণ করে চললে তাদের আর কোন ভয় বা চিন্তা থাকবে না। সর্বকালের জন্যই এটা মুক্তির পথ। সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের পরও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান, আখেরাতের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস এবং তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা নাযিল করেছেন সেটার উপর আমল করলে সবাই মুক্তি পাবে। [সা'দী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে 'সৎকর্ম' বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পরিপূর্ণ ঈমান ও তার অনুসরণ বুঝানো হয়েছে। এতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতে ঈমান স্থাপন ব্যতীত কারো মুক্তি নাই। কেননা, কোন কাজই ঐ পর্যন্ত সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে না যতক্ষণ তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত না হবে। [ইবন কাসীর] এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আজ যদি মূসা 'আলাইহিস্ সালাম জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তার উপায় ছিল না।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৩৩৮] অতএব, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলিম না হয়েই আখেরাতে মুক্তি পাবে, এরূপ আশা করা কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ।

৭০. অবশ্যই আমরা বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলাম ও তাদের কাছে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম। যখনি কোন রাসূল তাদের কাছে এমন কিছু আনে যা তাদের মনঃপূত নয়, তখনি তারা রাসূলগণের কারও উপর মিথ্যারোপ করেছে এবং অপর কাউকে হত্যা করেছে।

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের কোন বিপর্যয় হবে না[২]; ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তাদের তাওবাহ্

وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

(২) বনী-ইস্রাঈলের কাছে তাদের রাসূল যখন কোন নির্দেশ নিয়ে আসতেন, যা তাদের রুচি-বিরুদ্ধ হত, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহ্র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করত এবং নবীদের মধ্যে কারো প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং কাউকে হত্যা করত। এটি ছিল আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এত সব নির্মম অত্যাচার ও বিদ্রোহীসুলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকত। ভাবখানা এই যে, এসব কুকর্মের জন্য কোন সাজাই ভোগ করতে হবে না এবং কোন প্রকার অশুভ পরিণতি কখনো তাদের সামনে আসবে না। কেননা, তারা মনে করতে থাকে যে, তারা আল্লাহ্র পরিবার-পরিজন ও তাঁর প্রিয় বান্দা সুতরাং তাদের কোন অপরাধই ধর্তব্য নয়। এরূপ ধারণার কারণে তারা আল্লাহ্র নিদর্শন ও হুশিয়ারী থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে যায় এবং যা গর্হিত তাই করতে থাকে। এমনকি, কিছুসংখ্যক নবীকে তারা হত্যা করেছে আর কিছুসংখ্যককে বন্দী করে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বাদশাহ্ বখ্তে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। এরপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনৈক পারস্য সম্রাট তাদেরকে বখ্তে নসরের লাঞ্ছনা ও অবমাননার কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে আসেন। তখন তারা তাওবাহ্ করে এবং অবস্থা সংশোধনে মনোনিবেশ করে। আল্লাহ্ তাদের সে তাওবাহ্ কবূল করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার দুস্কৃতিতে মেতে উঠে এবং অন্ধ ও বধির হয়ে যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া 'আলাইহিমাস্ সালামকে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। এমনকি ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। [আইসারুত তাফাসীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

কবুল করেছিলেন। তারপর তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েছিল[1]। আর তারা যা আমল করে আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৭২. যারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি তো মার্‌ইয়াম-তনয় মসীহ্', অবশ্যই

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, বনী ইসরাঈল দু'বার অন্ধ ও বধির হয়েছিল। যার মাঝে আল্লাহ্ তাদের তাওবাহও কবুল করেছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সূরা আল-ইসরার ৪,৫,৬,৭ নং আয়াতে। যাতে বলা হয়েছে, "আর আমরা কিতাবে ওহী দ্বারা বনী ইস্‌রাঈলকে জানিয়েছিলাম, 'নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে" এটা ছিল প্রথমবার অন্ধ ও বধির হওয়া। এর শাস্তিস্বরূপ যা এসেছে, তার বর্ণনায় এসেছে, "তারপর এ দুটির প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হল তখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম আমাদের বান্দাদেরকে, যুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী; তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সব কিছু ধ্বংস করেছিল।" এরপর দ্বিতীয়বার তাদের অন্ধ ও বধির হওয়ার বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, "তারপর পরবর্তী নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে (আমি আমার বান্দাদের পাঠালাম) তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল আবার সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য।" এ দু অন্ধত্ব ও বধিরতা ও এ দুয়ের শাস্তির মাঝখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি দয়াবান হয়ে যে তাওবা কবুল করেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন, "তারপর আমরা তোমাদেরকে আবার তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম"। তারপর আল্লাহ্ বর্ণনা করলেন যে, আবার যদি তোমরা অন্ধ ও বধির হও এবং দুনিয়ার বুকে ফাসাদ সৃষ্টি কর, তবে আমি আবার তোমাদের জন্য শাস্তি নিয়ে আসব। তিনি বলেন, "কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমরাও পুনরাবৃত্তি করব"। [সূরা আল-ইসরা ৪-৮] বনী ইসরাঈল কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করার মাধ্যমে আবার অন্ধ ও বধির হয়েছিল এবং দুনিয়ার বুকে ফেতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল। তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সমস্ত গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে তারা গোপন করল। সুতরাং আল্লাহ্ও তাদের নবীর মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি দিলেন। বনু কুরাইযার যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হলো, তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করা হলো, বনু কাইনুকা' ও বনু নদ্বীরকে মদীনা থেকে নির্বাসন দেয়া হলো, যেমনটি আল্লাহ্ তার কিছু বর্ণনা সূরা আল-হাশরে উল্লেখ করেছেন। [আদওয়াউল বায়ান]

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

তারা কুফরী করেছে[১]। অথচ মসীহ্ বলেছিলেন, 'হে ইস্‌রাঈল-সন্তানগণ! তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর।' নিশ্চয় কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন[২] এবং তার আবাস

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী-ইস্‌রাঈলের ঔদ্ধত্য ও তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল- যারা তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা এবং তাদের দুনিয়া ও আখেরাত সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। কতক নবীকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কতককে হত্যা করে ফেলে। আলোচ্য আয়াতে বনী-ইস্‌রাঈলের কুটিলতার আরেকটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে থেকে আল্লাহ্‌র নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কতককে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার অপর প্রান্তে পৌঁছে নবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্‌তে পরিণত করে দিয়েছে। তারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি তো মারইয়াম তনয় মসীহ্' এ কথা বলে তারা কুফরী করল এবং কাফের হয়ে গেল। ইতিহাস বলে যে, যারা এ ধরণের উক্তি করত তারা হচ্ছে, নাসারাদের মালেকিয়্যা, ইয়া'কুবিয়্যা এবং নাসতুরিয়্যাহ সম্প্রদায়। [ইবন কাসীর] আলোচ্য আয়াতে যদিও এ উক্তিটি শুধু নাসারাদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র এ ধরণের বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা ইয়াহূদী এবং নাসারা উভয়ের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে, ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَٰرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ ۖ يُضَٰهِـُٔونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَٰتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ অর্থাৎ "আর ইয়াহূদীরা বলে, 'উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র', এবং খৃস্টানরা বলে, 'মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র।' ওটা তাদের মুখের কথা। আগে যারা কুফরী করেছিল ওরা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ ওদেরকে ধ্বংস করুন। কোন্ দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে?" [সূরা আত্-তাওবাহ্ঃ ৩০]

(২) অর্থাৎ নাসারারা যতই বাড়াবাড়ি করুক এবং ঈসাকে তাদের ইলাহ ঘোষণা করুক, ঈসা এতে কখনও সন্তুষ্ট নন। তিনি নিজেই এর বিপরীত ঘোষণা করেছিলেন। দুনিয়ায় আসার পর দোলনাতেই তার মুখের প্রথম কথা ছিল, ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ অর্থাৎ আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা বা দাস। [সূরা মারইয়াম: ৩০] তিনি আরও বলেছিলেন, আমার ও তোমাদের রব একমাত্র আল্লাহ্। তাঁরই ইবাদাত কর। সরল সঠিক পথ এটিই। [সূরা আলে ইমরান: ৫১; মারইয়াম: ৩৬; আযযুখরুফ: ৬৪] তাছাড়া যৌবনের পরবর্তী বয়সেও বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌রই ইবাদাত কর, যারা তাঁর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করে তাদের জন্যে আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করেছেন এবং

হবে জাহান্নাম । আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই ।

৭৩. তারা অবশ্যই কুফরী করেছে- যারা বলে, 'আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে তৃতীয়(১), অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই । আর তারা যা বলে তা থেকে বিরত না হলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের উপর অবশ্যই কষ্টদায়ক শাস্তি আপতিত হবে ।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا۟ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

৭৪. তবে কি তারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসবে না ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল,

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾

তার ঠিকানা হবে জাহান্নামে । যেমন অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্ শির্কের গোনাহ কখনও ক্ষমা করবেন না" । [সূরা আন-নিসা: ৪৮, ১১৬] অনুরূপভাবে জাহান্নামবাসীরা যখন জান্নাতবাসীদের কাছে খাদ্য ও পানি চাইবে, তখন তারা উত্তরে বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ এ দুটি জিনিস কাফেরদের উপর হারাম করে দিয়েছেন ।' [সূরা আল-আ'রাফ: ৫০] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করতে বলেছেন যে, 'শুধু মুমিন মুসলিমরাই জান্নাতে যাবে' । [মুসলিম: ১১১] আরও বলেছেন, 'যতক্ষণ তোমরা ঈমানদার না হবে ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ।' [মুসলিম: ৫৪] সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালাম কখনোও ইলাহ হওয়ার দাবী করেন নি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয়ও নয় । [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ ঈসা মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালাম, রূহুল কুদ্স ও আল্লাহ্, কিংবা মসীহ্, মার্ইয়াম ও আল্লাহ্ -সবাই আল্লাহ্ । তাদের মধ্যে একজন অংশীদার হলেন আল্লাহ্ । এরপর তারা তিনজনই এক এবং একজনই তিন । এ হচ্ছে নাসারাদের সাধারণ বিশ্বাস । নাসারাদের মালেকিয়্যা, ইয়া'কুবিয়্যা ও নাসতুরিয়্যা এ তিনটি দলই উপরোক্ত বিশ্বাস পোষণ করে । [ইবন কাসীর] এ যুক্তিবিরোধী ধর্মবিশ্বাসকে তারা জটিল ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় ব্যক্ত করে । অতঃপর বিষয়টি যখন কারো বোধগম্য হয় না, তখন একে 'বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য' বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয় । সুদ্দি বলেন, এখানে তিনের এক ইলাহ বলা হয়েছে । তিনজন বলতে, ঈসা, তার মা মারইয়াম এবং আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে । কারণ, অন্য আয়াতে কোন কোন নাসারাদের দ্বারা ঈসা ও তার মাকে ইলাহ হিসেবে গণ্য করার কথা উল্লেখ করে তা খণ্ডন করা হয়েছে । [আল-মায়েদাহ: ১১৬] ইবন কাসীর বলেন, এ মতটি অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত । [ইবন কাসীর]

পরম দয়ালু[১]।

৭৫. মার্‌ইয়াম-তনয় মসীহ্ শুধু একজন রাসূল। তার আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন[২] এবং তাঁর মা অত্যন্ত সত্য নিষ্ঠা ছিলেন। তারা দুজনেই খাওয়া-দাওয়া করতেন[৩]। দেখুন, আমরা তাদের জন্য আয়াতগুলোকে কেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি; তারপরও দেখুন, তারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়!

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর 'ইবাদাত কর যার কোন ক্ষমতা

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'বান্দা তাওবাহ্ করলে আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির চাইতেও বেশী খুশী হন, যে ব্যক্তি তার উটকে মরুভূমির অজানা পথে হারিয়ে ফেলে। চিন্তায় মুমূর্ষ হয়ে পড়েছে; ঠিক এই মুহূর্তে সে তার উটকে পেয়ে গেলে যতটা খুশি হয়।' [বুখারীঃ ৬৩০৯] এখানেও আল্লাহ্‌র অপার রহমত যে, তিনি বান্দার শির্কের পরও যদি তাঁর কাছে তাওবাহ করে তবে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ অন্যান্য নবী যেমন দুনিয়াতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে চলে গেছেন; কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না। তিনি অন্যান্য নবী-রাসূলদের মতই একজন মানুষ। একজন রাসূলের বেশী তো তিনি কিছু নন। তবে আল্লাহ্ তাকে বনী-ইসরাঈলদের জন্য নিদর্শন বানিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, "তিনি তো কেবল আমারই এক বান্দা, যার উপর আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে বানিয়েছিলাম বনী ইস্‌রাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত" [সূরা আয-যুখরুফ: ৫৯] [ইবন কাসীর]

(৩) যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী সে পৃথিবীর সবকিছুরই মুখাপেক্ষী। মাটি, বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীবজন্তু থেকে সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। পরমুখাপেক্ষীতার এ দীর্ঘ পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মসীহ্ ও মার্‌ইয়ামের উপাস্যতা খণ্ডণকল্পে যুক্তির আকারে এরূপ বলতে পারি, মসীহ্ ও মার্‌ইয়াম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও লোক পরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত। আর যে পানাহার থেকে মুক্ত নয়, যে সত্তা মানব-মণ্ডলীর মত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে বস্তুজগতের মুখাপেক্ষী, সে কিভাবে আল্লাহ্ হতে পারে? এ শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী ও মূর্খ সবাই সমভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থী- [বাগভী, ইবন কাসীর, সা'দী, আইসারুত তাফাসীর]

وَّلَا نَفْعًا ۗ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾

নেই তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার? আর আল্লাহ্ তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।’

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾

৭৭. বলুন, ‘হে কিতাবীরা! তোমরা তোমাদের দ্বীনে অন্যায়[১] বাড়াবাড়ি করো না[২]। আর যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না[৩] ।’

---

(১) আলোচ্য আয়াতে ﴿لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ﴾ বলার সাথে সাথে ﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। তাফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাকীদ অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, দ্বীনে বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, এখানে ﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ কথাটি دِيْن এর গুণ হিসেবে এসেছে। সুতরাং এর অর্থ হবে, তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, তোমাদের দ্বীনটি হকের বিপরীত অবস্থানে রয়েছে। [তাবারী]

(২) غُلُوّ শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। দ্বীনের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে দ্বীন যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা লংঘন করা। উদাহরণতঃ নবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবের মধ্যে তাদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্‌র পুত্র বলে দেয়া হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমা লংঘন। নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতেও কুণ্ঠিত না হওয়া অথবা তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্‌র পুত্র বলে দেয়া বনী-ইস্‌রাঈলের এ পরস্পর বিরোধী দু’টি কাজই হচ্ছে মূর্খতাপ্রসূত বাড়াবাড়ি। মূর্খ ব্যক্তি কখনো মিতাচার অথবা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারে না। হয় সে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় সীমালংঘনে। তাই আয়াতে বনী-ইসরাঈলদেরকে এ ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

(৩) আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বর্তমান কালের বনী-ইস্‌রাঈলদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছিল। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টতার স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যা ছিল বাড়াবাড়ি ও ত্রুটির মাঝখানে মধ্যবর্তী পথ। এর দ্বারা হয় তারা নিজেরাই

এগারতম রুকূ'

৭৮. ইস্‌রাঈল-বংশধরদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মার্‌ইয়াম-পুত্র 'ঈসার মুখে অভিশপ্ত হয়েছিল[১]। তা এ জন্যে যে, তারা অবাধ্যতা করেছিল আর তারা সীমালংঘন করত।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۷۸﴾

৭৯. তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট!

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۷۹﴾

৮০. তাদের অনেককে আপনি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন। তাদের অন্তর যা তাদের জন্য পেশ করেছে (তাদের করা কাজগুলো) কত নিকৃষ্ট! যে কারণে আল্লাহ্ তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। আর তারা আযাবেই স্থায়ী হবে।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۸۰﴾

৮১. আর তারা আল্লাহ্ ও নবীর প্রতি এবং তার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান আনলে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসিক।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۸۱﴾

৮২. অবশ্যই মুমিনদের মধ্যে শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরকেই আপনি সবচেয়ে উগ্র

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ

ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হয়েছিল, না হয় তাদেরকে অন্যরা ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেছিল। [তাবারী, ফাতহুল কাদীর]

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, বনী ইসরাঈলরা ইঞ্জীলে ঈসা আলাইহিস সালামের মুখে লা'নত প্রাপ্ত হয়েছিল। আর যাবূরে দাউদ আলাইহিস সালামের মুখে লা'নত প্রাপ্ত হয়েছিল। [তাবারী]

مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا
نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ
وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝٨٢

দেখবেন। আর যারা বলে ‘আমরা নাসারা’ মানুষের মধ্যে তাদেরকেই আপনি মুমিনদের কাছাকাছি বন্ধুত্বে দেখবেন, তা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী রয়েছে। আর এজন্যেও যে, তারা অহংকার করে না।

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى
اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ
الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝٨٣

৮৩. আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা যখন তারা শুনে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য আপনি তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত দেখবেন[১]। তারা বলে, ‘হে আমাদের

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠিতে ঐসব আহলে কিতাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যারা সত্যানুরাগ ও আল্লাহ্‌ভীতির কারণে মুসলিমদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করত না। কিন্তু ইয়াহূদীদের মধ্যে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা ছিল একান্তই নগণ্য। উদাহরণতঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমূখ। নাসারাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল বেশী। বিশেষতঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী এবং উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারলেন যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাসী একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, তখন তিনি জা‘ফর ইবন আবু তালেব, ইবন মাস‘উদ, উসমান ইবন মায‘উনসহ একদল সাহাবাকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দেন। তারা সেখানে সুখে-শান্তিতেই বসবাস করছিল। মক্কার মুশরিকরা এ খবর পেয়ে আমর ইবন ‘আসকে একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়ে নাজ্জাসীর কাছে পাঠায়। তারা নাজ্জাসীকে অনুরোধ জানায় যে, এরা আহম্মক ধরণের কিছু লোক। এরা বাপ-দাদার দ্বীন ছেড়ে আমাদেরই একজন লোক-যে নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে, তার অনুসরণ করছে। আমরা তাদেরকে ফেরৎ নিতে এসেছি। নাজ্জাসী জা‘ফর ইবন আবু তালেবকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ঈসা এবং তার মা সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? জবাবে তিনি বললেনঃ ঈসা আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর এমন কালেমা যা তিনি তাঁর পক্ষ থেকে মার্‌ইয়ামের কাছে অর্পণ করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ্। একথা শুনে নাজ্জাসী একটি কাঠি উঠিয়ে বললেনঃ তোমরা যা বলেছ, তার থেকে ঈসা এ কাঠি পরিমাণও বেশী নন। তারপর নাজ্জাসী তাদেরকে বললেনঃ তোমাদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে, তা থেকে কি আমাকে কিছু

রব! আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত করুন।'

৮৪. 'আর আল্লাহ্‌র প্রতি ও আমাদের কাছে আসা সত্যের প্রতি ঈমান না আনার কি কারণ থাকতে পারে যখন আমরা প্রত্যাশা করি যে, আমাদের রব আমাদেরকে নেককার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন?'

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ
اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫. অতঃপর তাদের এ কথার জন্য আল্লাহ্‌ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটা মুহসিনদের পুরস্কার।

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬. আর যারা কুফরী করেছে ও আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, তারাই জাহান্নামবাসী।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

বারতম রুকূ'

৮৭. হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না[১]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ
اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ

শুনাতে পার? তারা বললঃ হ্যাঁ। নাজ্জাসী বললেনঃ পড়। তখন জা'ফর ইবন আবু তালেব কুরআনের আয়াত পড়ে শুনালে নাজ্জাসীসহ তার দরবারে সে সমস্ত নাসারা আলেমগণ ছিলেন তারা সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। [সহীহ্‌ সনদসহ তাবারী, বাগভী]

(১) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ তিনজন লোক রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ঘরে এসে তার ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাদেরকে তা জানানো হলে তারা সেসবকে অল্প মনে করল এবং বলল, আমরা কোথায় আর রাসূল কোথায়? তার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ্‌ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা রাত সালাত আদায় করব। অন্যজন বলল,

الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾

এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না(১)।

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর প্রতি তোমরা মুমিন।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۭ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۭ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۭ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছে করে কর সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। তারপর এর কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, বা তাদেরকে বস্ত্রদান,

---

আমি সারা বছর সিয়াম পালন করব। অপরজন বলল, আমি মহিলাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকব এবং বিয়েই করব না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, 'তোমরা এসব কথা বলেছ? জেনে রাখ, আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাদের সবার চাইতে আল্লাহ্কে বেশী ভয় করি এবং বেশী তাকওয়ারও অধিকারী। কিন্তু আমি সিয়াম পালন করি, সিয়াম থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই এবং মেয়েদের বিয়েও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়।' [বুখারীঃ ৫০৬৩] অপর বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা যুদ্ধে যেতাম, আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীরা থাকত না। তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম যে, আমরা 'খাসি' হয়ে যাই না কেন? তখন আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল।' তারপর আবদুল্লাহ এ আয়াত পাঠ করলেন। [বুখারী: ৪৬১৫]

(১) ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তার কাছে একবার খাবার নিয়ে আসা হলো। একলোক খাবার দেখে একদিকে আলাদা হয়ে গেল এবং বলল, আমি এটা খাওয়া হারাম করছি। তখন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বললেন, কাছে আস এবং খাও। আর তোমার শপথের কাফফারা দাও। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩১৩,৩১৪; ফাতহুল বারী: ১১/৫৭৫]

কিংবা একজন দাস মুক্তি[১]। অতঃপর যার সামর্থ নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন[২]। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্‌ফারা। আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো[৩]। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

৯০. হে মুমিনগণ! মদ[৪], জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয় করার শর[৫] তো

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ

(১) এর সারমর্ম এই যে, ইয়ামীনে লাগ্ভ-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না অর্থাৎ কাফ্‌ফারা ওয়াজিব করেন না। অন্য শপথের জন্য কাফ্‌ফারা দিতে হবে। আর তা হল, তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ করতে হবে। (এক) দশ জন দরিদ্রকে মধ্যশ্রেণীর খাদ্য সকাল-বিকাল দু'বেলা খাওয়াতে হবে কিংবা (দুই) দশ জন দরিদ্রকে সতর ঢাকা পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উদাহরণতঃ একটি পাজামা অথবা একটি লুঙ্গি অথবা একটি লম্বা কোর্তা কিংবা (তিন) কোন গোলামকে মুক্ত করে দেয়া। [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(২) এরপর বলা হয়েছেঃ "কোন শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি এ আর্থিক কাফ্‌ফারা দিতে সমর্থ না হয়, তবে তার জন্য কাফ্‌ফারা এই যে সে তিন দিন রোযা রাখবে"। কোন কোন বর্ণনায় এখানে ধারাবাহিকভাবে তিনটি সিয়াম রাখার নির্দেশ রয়েছে। তাই ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ্ ও অন্যান্য কয়েকজন ইমামের মতে শপথের কাফ্‌ফারা হিসেবে যে সিয়াম পালন হবে তা ধারাবাহিকভাবে হওয়া জরুরী। [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(৩) আলোচ্য আয়াতে শপথের কাফ্‌ফারা প্রসঙ্গে প্রথমে إطعام শব্দ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ যেমন খাদ্য খাওয়ানো হয়, তেমনি কাউকে খাদ্য দান করাও হয়। [কুরতুবী]

(৪) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক সম্প্রদায় হবে যারা যিনা-ব্যভিচার, রেশমী কাপড় ব্যবহার, মদ্যপান ও গান বাদ্যকে হালাল করবে।' [বুখারীঃ ৫৫৯০] অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে ও তাওবাহ্ করবে না, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। [বুখারীঃ ৫৫৭৫]

(৫) أزلام শব্দটি زلم এর বহুবচন। আযলাম এমন শরকে বলা হয়, যা দ্বারা আরবে ভাগ্যনির্ধারণী জুয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে একটি উট

وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

কেবল ঘৃণার বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন কর-যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার(১)।

যবাই করত। অতঃপর এর মাংস সমান দশ ভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হত। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশের চিহ্ন অবিকৃত থাকত। কোনটিতে এক এবং কোনটিতে দুই বা তিন অংশ অংকিত থাকত। অবশিষ্ট তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত। এ শরগুলোকে তূনীর মধ্যে রেখে খুব নাড়াচাড়া করে নিয়ে প্রত্যেক অংশীদারের জন্যে একটি করে শর বের করা হত। যত অংশবিশিষ্ট শর যার নামে হত, সে তত অংশের অধিকারী হত এবং যার নামে অংশবিহীন শর হত, সে বঞ্চিত হত। [কুরতুবী] আজকাল এ ধরনের অনেক লটারী বাজারে প্রচলিত আছে। এগুলো জুয়া এবং হারাম। পূর্বে এ সূরার ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।

(১) মদ্যপানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কুরআনের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে এই যে, মদ্যপান সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম আয়াত ছিল, ﴿يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا﴾ [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৯] যাতে সাহাবায়ে কিরাম মদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তাতে মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত ছিল ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ﴾ সূরা আন-নিসা: ৪৩] এতে বিশেষভাবে সালাতের সময় মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্য অনুমতি রয়ে যায়। কিন্তু সূরা আল-মায়িদাহ এর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে পরিস্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] এ বিষয়ে শরী'আতের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা বিশেষতঃ নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হত। [ফাতহুল কাদীর]
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ 'সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে মদ। [ইবন মাজাহ: ৩৩৭১] কারণ, এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতর পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'মদ এবং ঈমান একত্রিত হতে পারে না'। [নাসায়ীঃ ৮/৩১৭] আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন। '(১) যে লোক নির্যাস বের করে, (২) প্রস্তুতকারক, (৩) পানকারী, (৪) যে পান করায়, (৫) আমদানীকারক, (৬) যার জন্য আমদানী করা হয়, (৭) বিক্রেতা, (৮) ক্রেতা, (৯) সরবরাহকারী এবং (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী'। [ইবন মাজাহ্ঃ ৩৩৮০] আনাস রাদিয়াল্লাহু

৯১. শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে। তবে কি তোমরা বিরত হবে না[১]?

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَٰوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

৯২. আর তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর সাবধানতা অবলম্বন কর; তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমাদের রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

‘আনহু তখন এক মজলিশে মদ্যপানে সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। আবু তালহা, আবু ওবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্, উবাই ইবন কা‘ব, সোহাইল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম প্রমূখ নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ সে মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন - এবার সমস্ত মদ ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল। [মুসনাদে আহমাদ ৩/১৮১; বুখারী: ৪৬২০; মুসলিম: ১৯৮০]

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যা-ই বিবেকশূণ্য করে তা-ই মদ। আর সমস্ত মাদকতাই হারাম। যে ব্যক্তি কোন মাদক সেবন করল, চল্লিশ প্রভাত পর্যন্ত তার সালাত অসম্পূর্ণ থাকবে। তারপর যদি সে তাওবা করে, তবে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করবেন, এভাবে চতুর্থবার পর্যন্ত। যদি চতুর্থবার পূণরায় তা করে, তখন আল্লাহ্‌র উপর হক হয়ে দাঁড়ায় তাকে ‘ত্বিনাতুল খাবাল’ থেকে পান করানো। বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ‘ত্বীনাতুল খাবাল’ কী? তিনি বললেন, জাহান্নামাবাসীদের পূঁজ। যে কেউ কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ককে মদ খাওয়াবে, যে হারাম হালাল সম্পর্কে জানে না, আল্লাহ্‌র উপর হক হয়ে যাবে যে তাকে ‘ত্বীনাতুল খাবাল’ পান করানো। [মুসলিম: ২০০২; আবু দাউদ: ৩৬৮০] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মদ খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেল এবং তাওবা না করে মারা গেল, সে আখেরাতে তা পান করতে পারবে না। [মুসলিম: ২০০৩] আবু সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনুগ্রহের খোঁটাদানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [নাসায়ী : ৫৬৭২]

৯৩. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা আগে যা কিছু পানাহার করেছে তার জন্য তাদের কোন গুনাহ্ নেই, যদি তারা তাকওয়া অবলম্বন করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে। তারপর তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে। তারপর তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ইহসান করে। আর আল্লাহ্ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন[১]।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ
فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا
وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

তেরতম রুকূ’

৯৪. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন শিকারের এমন বস্তু দ্বারা যা তোমাদের হাত[২] ও বর্শা[৩] নাগাল পায়, যাতে আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেন, কে তাঁকে গায়েবের সাথে ভয় করে[৪]। কাজেই

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ
تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ
بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾

(১) বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয় তখন জনগণ বলতে আরম্ভ করল, এটা হারাম হওয়ার পূর্বে যারা এটা পান করেছে এবং সে অবস্থায় মারা গেছেন তাদের কি হবে? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [তিরমিযী: ৩০৫১]

(২) অর্থাৎ সহজলভ্য শিকার। কারণ, এগুলো মুহরিম ব্যক্তির আশেপাশেই থাকে। এর মাধ্যমে মুহরিম ব্যক্তির পরীক্ষা করা হয়। মুজাহিদ বলেন, এখানে ছোট ও বাচ্চা শিকারকে বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(৩) এর অর্থ বড় শিকার। [ইবন কাসীর] কারণ, বড় শিকার করতেই সাধারণতঃ বর্শা ব্যবহার করতে হয়।

(৪) মুকাতিল বলেন, মুসলিমরা যখন উমরা পালনের উদ্দেশ্যে হুদায়বিয়ায় অবস্থান করছিলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। সেখানে বন্য চতুষ্পদ জন্তু, পাখী এবং অন্যান্য শিকার তাদের অবস্থানস্থলে জমা হয়েছিল। এরূপ দৃশ্য তারা ইতোপূর্বে দেখেনি। সুতরাং ইহরামের অবস্থায় তাদেরকে শিকার করতে নিষেধ করা হয়, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট করে দেন যে, কে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছে, আর কে

এরপর কেউ সীমালংঘন করলে তার জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।

৯৫. হে ঈমানদারগণ! ইহ্‌রামে থাকাকালে তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা করো না[১]; তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছে করে সেটাকে হত্যা করলে যা সে হত্যা করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক-কা'বাতে পাঠানো হাদঈরূপে[২]। বা সেটার কাফ্‌ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমান সংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ তা আবারো করলে আল্লাহ্

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

করছে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, 'আপনি শুধু তাকেই সতর্ক করতে পারেন যে 'যিকর' এর অনুসরণ করে এবং গায়েবের সাথে রহমানকে ভয় করে। অতএব তাকে আপনি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন।' [সূরা ইয়াসীন: ১১] [ইবন কাসীর]

(১) এ নিষেধাজ্ঞা অর্থের দিক দিয়ে ধরা হলে হালাল জন্তু, ওর বাচ্চা এবং হারাম প্রাণীগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এটাই অধিকাংশ আলেমের মত। কারণ, যে প্রাণীগুলোকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা বৈধ সেগুলোর বর্ণনা এক হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। তাই অপরাপর প্রাণীগুলো উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। [ইবন কাসীর] যে প্রাণীগুলো ইহরাম ও সাধারণ সর্বাবস্থায় বধ করার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে, পাঁচটি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'পাঁচ প্রকার প্রাণী আছে যা ইহ্‌রাম অবস্থায় হত্যা করলে কোন পাপ হয় না। কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং হিংস্র কুকুর। [বুখারীঃ ১৮২৯, মুসলিমঃ ১১৯৯]

(২) অর্থাৎ এ হাদঈ বা জন্তু কা'বা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। সেখানেই তা জবাই করতে হবে এবং হারাম শরীফের মিসকীনদের মধ্যে ওর গোশত বন্টন করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। [ইবন কাসীর] হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হিসেবে হারাম এলাকায় যে পশু যবেহ করা হয় তাকে হাদঈ বলা হয়।

তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী ।

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য । তোমরা যতক্ষণ ইহ্‌রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম । আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে ।

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا

৯৭. পবিত্র কা'বা ঘর, পবিত্র মাস, হাদঈ ও গলায় মালা পরানো পশুকে[১] আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণের[২] জন্য

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শান্তির কারণ বলে উল্লেখ করছেন । প্রথমতঃ কা'বা । আরবী ভাষায় কা'বা চতুষ্কোণবিশিষ্ট গৃহকে বলা হয় । জাহেলিয়াত যুগেও আল্লাহ্ তা'আলা আরবদের মনে হারাম শরীফের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল । দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে, সম্মানিত মাস । সম্মানিত মাস বলে এখানে কারও কারও মতে, জিলহজ্জ মাস বোঝানো হয়েছে । অপর কারও কারও মতে, এর দ্বারা হারাম মাসসমূহ বোঝানো হয়েছে । আর তা হচ্ছে, রজব, জিলকদ ও জিলহজ ও মুহাররাম । তৃতীয় বস্তু হচ্ছে, 'হাদঈ' । হারাম শরীফে যে জন্তুকে তামাত্তু ও কেরান হজের কারণে যবাই করতে হয়, তাকে হাদঈ বলা হয় । যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্তু থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত; তাকে কেউ কিছু বলত না । এভাবে কুরবানীর জন্তুও ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায় । চতুর্থ বস্তুটি হচ্ছে, قلائد এ শব্দটি قلادة শব্দের বহুবচন । এর অর্থ, গলার হার । আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজের উদ্দেশ্যে বের হলে চিহ্নস্বরূপ তার হাদঈর গলায় একটি হার পরিয়ে দিত । ফলে কেউ তাকে কোন কষ্ট দিত না । এ কারণে قلادة শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায় । [ফাতহুল কাদীর]

(২) قيام ও قوام এর অর্থ ঐসব বস্তু , যার উপর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল । তাই ﴿قِيَامًا لِّلنَّاسِ﴾ এর অর্থ হবে এই যে, কা'বা ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহ মানুষের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং উপায় । এর উপরই তাদের জীবিকা ও দ্বীন নির্ভরশীল ।

নির্ধারিত করেছেন। এটা এ জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার, নিশ্চয় যা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে আছে আল্লাহ্ তা জানেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৮. জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর, আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾

৯৯. প্রচার করাই শুধু রাসূলের কর্তব্য। আর তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ আল্লাহ্ তা জানেন[১]।

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَٰغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. বলুন, 'মন্দ ও ভাল এক নয়[২] যদিও

قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

এর মাধ্যমেই তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কর্মকাণ্ড সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে যারা ভীত তারা সেখানে নিরাপত্তা পায়। যারা ব্যবসায়ী তারা ব্যবসায় লাভবান হয়। যারা ইবাদাত করতে চায়, তারা নির্বিঘ্ন ইবাদাত করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমার রাসূলের দায়িত্ব এতটুকই যে, তিনি আমার নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন'। এরপর তা মানা না মানার লাভ ক্ষতি তারাই ভোগ করবে; তারা না মানলে আমার রাসূলের কোন ক্ষতি নেই। এ কথাও জেনো যে, আল্লাহ্তা'আলাকে ধোঁকা দেয়া যাবে না। তিনি তোমাদের প্রকাশ্যে ও গোপন কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি তোমাদের আমলের প্রকৃত অবস্থা জেনে সেটা অনুসারে তোমাদেরকে এর প্রতিফল দিবেন। [সা'দী]

(২) ﴿الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ আরবী ভাষায় দুটি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে الطَّيِّب এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে الخَبِيث বলা হয়। অর্থাৎ কোন প্রকার خَبِيث এর সাথেই কোন প্রকার طَيِّب এর তুলনা চলে না। আয়াতে خَبِيث শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং طَيِّب শব্দ দ্বারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে, এমনকি প্রত্যেক সুস্থ্য বুদ্ধিমান লোকের দৃষ্টিতে, পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল ও হারাম সমান হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ﴿الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ শব্দ দুটি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ-সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভাল ও মন্দ কাজ-কর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাই কোন বিচারেই সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সমান নয়। এ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে হালাল ও হারাম কিংবা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। ঈমান ও কুফরী সমান নয়। জান্নাত ও জাহান্নাম সমান নয়। আনুগত্য ও অবাধ্যতা সমান

كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

মন্দের আধিক্য তোমাকে[১] চমৎকৃত করে[২]। কাজেই হে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।’

চৌদ্দতম রুকূ’

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ

১০১. হে মুমিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ হলে তা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে[৩]।

নয়। সুন্নাতের অনুসারী ও বিদ‘আতের অনুসারী সমান নয়। [ইবন কাসীর, সা’দী, মুয়াসাসার]

(১) অর্থাৎ হে মানুষ! যদিও খারাপ বস্তু তোমাকে চমৎকৃত করে তবুও খারাপ বস্তু ও ভালো বস্তু কখনও সমান হতে পারে না। এখানে সাধারণভাবে সকল মানুষকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ যদিও মাঝে মাঝে মন্দ ও অনুৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাচুর্য দর্শকদের বিস্মিত করে দেয় এবং আশ-পাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভাল মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ত্রুটি বিশেষ। মন্দ বস্তু কখনও ভাল হতে পারে না। সুতরাং উপকারী হালাল বস্তু স্বল্প হলেও তা অপকারী হারাম বস্তু বেশী হওয়ার চেয়ে উত্তম। [ফাতহুল কাদীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘অল্প ও প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট জিনিস সেই অধিক জিনিস হতে উত্তম যা মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে গাফেল ও উদাসীন রাখে।’ [মুসনাদে আহমাদ ৫/১৯৭]

(৩) আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাটাঘাটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেয়া হয়নি সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরূপ প্রশ্ন না করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা কষ্টে পতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ার কারণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি যে এমন বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে, যা হারাম করা হয়নি। অতঃপর তার প্রশ্ন করার কারণে তা হারাম করে দেয়া হয়েছে।’ [বুখারীঃ ৭২৮৯, মুসলিমঃ ২৩৫৮] আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নুযুল এই যে, যখন হজ ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ নাযিল হয়, তখন আকরা‘ ইবন হাবেস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের জন্য কি প্রতি বছরই হজ করা

আর কুরআন নাযিলের সময় তোমরা যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে(১) ।

الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ۚ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

ফরয? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন। তিনি তবুও চুপ। প্রশ্নকারী তৃতীয় বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের সুরে বললেন, যদি আমি তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হ্যাঁ প্রতি বছরই হজ্জ ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন, যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দেইনা, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে দাও- ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্বে কোন কোন উম্মত বেশী প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল। আমি যে কাজের আদেশ দেই, সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজ নিষেধ করি, তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। [মুসলিম:১৩৩৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে এক অভূতপূর্ব ভাষণে বললেন, 'যদি তোমরা জানতে, যা আমি জানি তবে তোমরা অল্প হাসতে এবং বেশী করে কাঁদতে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ মুখ ঢেকে কান্না আরম্ভ করলেন। তখন এক লোক ডেকে বললঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার বাবা কে? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অমুক। তখন এ আয়াত নাযিল হল।' [বুখারীঃ ৪৬২১, মুসলিমঃ ২৩৫৯] অপর আরেক বর্ণনায় এসেছে, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঠাট্টা করে প্রশ্ন করত। কেউ কেউ বলতঃ আমার বাবা কে? কেউ বলতঃ আমার উট হারিয়ে গেছে, তা কোথায় আছে? এসব ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৬২২]

(১) বলা হয়েছে, কুরআন অবতরণকালে যদি তোমরা এরূপ প্রশ্ন কর, যাতে কোন বিধান বুঝতে তোমাদের সমস্যা হচ্ছে, তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে, যা একান্তই সহজ বিষয়। কিন্তু যদি অন্য সময় হয়, তবে তোমাদের উচিত এ ব্যাপারে চুপ থাকা। [সা'দী, ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যখন কুরআন নাযিল হচ্ছে, তখন তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আসবেই। কিন্তু তোমরা নিজেরা নতুন করে প্রশ্ন করতে যেও না; কারণ, এতে করে তোমাদের উপর কোন কঠিন বিধান এসে যেতে পারে। [ইবন কাসীর] এতে 'কুরআন অবতরণকাল' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন অবতরণ সমাপ্ত হলে নবুওয়াত ও ওহীর আগমনও বন্ধ করে দেয়া হবে। নবুওয়াতের আগমন খতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোন বিধান আসবে না এবং যা ফরয নয়, তা ফরয হবে না কিংবা ওহীর মাধ্যমে কারো গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে না, তথাপি অনাবশ্যক প্রশ্ন তৈরী করে সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা নবুওয়াত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিন্দনীয়

আল্লাহ্ সেসব[১] ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

১০২. তোমাদের আগেও এক সম্প্রদায় এ রকম প্রশ্ন করেছিল; তারপর তারা তাতে কাফির হয়ে গিয়েছিল[২]।

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كٰفِرِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. বাহীরাহ্, সায়েবাহ্, ওছীলাহ্ ও হামী আল্লাহ্ প্রবর্তণ করেননি; কিন্তু কাফেররা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই বুঝে না[৩]।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

ও নিষিদ্ধই থাকবে। কেননা, এতে করে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'মুসলিম হওয়ার একটি সৌন্দর্য এই যে, মুসলিম ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে।' [তিরমিযীঃ ২৩১৭, ইবন মাজাহ্ঃ ৩৯৭৬] ইসলামের অন্যতম শিক্ষা এই যে, কোন দ্বীনী কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য না হলে যে কোন জ্ঞানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়। তবে যদি কোন বিধানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কোন সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এসে থাকে, তবে সেটার বিস্তারিত জ্ঞান জেনে নেয়ার জন্য প্রশ্ন করা হলে সে ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা দেয়া হবে। আর যদি কোন বিষয়ে কোন বর্ণনাই না এসে থাকে, তবে সেটার ব্যাপারে নিরবতা পালন করাই হচ্ছে সঠিক নীতি। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি যতক্ষণ কোন বিষয় পরিত্যাগ করি ততক্ষণ তোমরা আমাকে ছাড় দাও; কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাদের নবীদেরকে বেশী প্রশ্ন এবং বেশী বাদানুবাদের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে'। [মুসলিমঃ ১৩৩৭] [ইবন কাসীর]

(১) আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে, এক. আল্লাহ্ তোমাদের অতীতের প্রশ্নগুলোর কারণে পাকড়াও করা ক্ষমা করেছেন। [জালালাইন] দুই. যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করছ আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোর বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে বান্দাদেরকে এর পরিণতি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারেন। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ তারা বিভিন্ন বিধি-বিধান চেয়ে নিয়েছিল। তারপর সেগুলোর উপর আমল করা ত্যাগ করে কুফরী করেছিল [জালালাইন] ফলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। [বাগভী] অথবা তারা বিভিন্ন বিধি-বিধান চেয়ে নিয়েছিল, তারপর সেগুলোকে মানতে অস্বীকার করেছিল, যার কারণে তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাই অতিরিক্ত প্রশ্নই তাদের কুফরির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল [কাশশাফ]

(৩) বাহিরাহ্, সায়েবাহ্, ওছীলাহ্, হামী প্রভৃতি সবই জাহেলিয়াত যুগের কুপ্রথা ও

১০৪. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস', তখন তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেটাতে পেয়েছি সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানত না এবং সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. হে মুমিনগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم

কুসংস্কারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরবিদদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তবে আলোচ্য শব্দগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভবপর। আমরা সহীহ্ বুখারী থেকে সায়ীদ ইবন মূসাইয়্যেবের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি- 'বাহীরাহ্' এমন জন্তুকে বলা হয় যার দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হত এবং কেউ নিজের কাজে ব্যবহার করত না। 'সায়েবাহ্' ঐ জন্তু যাকে প্রতিমার নামে আমাদের দেশের ষাঁড়ের মত ছেড়ে দেয়া হত। 'হামী' পুরুষ উট, যে বিশেষ সংখ্যক রমন ক্রিয়া সমাপ্ত করে। এরূপ উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত। 'ওছীলাহ্' যে উষ্ট্রী উপর্যুপরি মাদী বাচ্ছা প্রসব করে। জাহেলিয়াত যুগে এরূপ উষ্ট্রীকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত। [বুখারী: ৪৬২৩; অনুরূপ মুসলিম: ২৮৫৬] এসব কর্মকাণ্ড এমনিতেই শির্ক তদুপরি যে জন্তুর গোস্ত, দুধ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া আল্লাহ্র আইনে বৈধ, নিজেদের পক্ষ থেকে শর্তাদি আরোপ করে সে জন্তুকে হালাল ও হারাম করার অধিকার তারা কোথায় পেল? বাস্তবে তারা যেন শরী'আত প্রণেতার পদে নিজেরাই আসীন হয়ে গিয়েছিল। আরো অবিচার এই যে, নিজেদের এসব মুশরিকসুলভ কুপ্রথাকে তারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের উপায় বলে মনে করত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও এসব প্রথা নির্ধারণ করেননি; বরং তাদের বড়রা আল্লাহ্র প্রতি এ অপবাদ আরোপ করেছে এবং অধিকাংশ নির্বোধ জনগণ একে গ্রহণ করে নিয়েছে। [ফাতহুল কাদীর, সা'দী] যারা এরূপ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি আম্‌র ইবন 'আমের আল-খুজা'য়ীকে জাহান্নামে তার নিজের অন্ত্র নিয়ে টানাটানি করতে দেখলাম। কেননা, সে প্রথম সায়েবাহ্ ছেড়েছিল।' [বুখারীঃ ৪৬২৩-৪৬২৪, মুসলিমঃ ২৮৫৬, আহমাদঃ ২/২৭৫]

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

ভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না[1]। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন; তারপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي

১০৬. হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে

(১) এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট। অন্যরা যা ইচ্ছা করুক, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এ বিষয়টি কুরআনের যে সব আয়াতে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম জাতির একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার পরিপন্থি হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতটি নাযিল হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসালামের সামনে প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি 'সৎকাজে আদেশ দান'-এর পরিপন্থী নয়। তোমরা যদি 'সৎকাজে আদেশ দান' পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে। [ইবন কাসীর; সা'দী] আবুবকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এক ভাষণে বলেন, তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে প্রয়োগ করছ। জেনে রাখ, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেছিঃ যারা কোন পাপকাজ হতে দেখেও তা দমন করতে চেষ্টা করে না, আল্লাহ্ তা'আলা সত্ত্বরই হয় তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আযাবে নিক্ষেপ করবেন। [আবু দাউদঃ ৪৩৪১, তিরমিযীঃ ৩০৫৮, ইবন মাজাহ্ঃ ৪০১৪] তাই মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। 'সৎকাজে আদেশ দান'ও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। [সা'দী] কুরআনের ﴿إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ শব্দে চিন্তা করলে এ তাফসীরের যথার্থতা ফুটে উঠে। কেননা, এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের পথ ভ্রষ্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি 'সৎকাজে আদেশ দান'-এর কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়। সা'য়ীদ ইবন মুসাইয়্যাব বলেন, এর অর্থ, যদি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ কর, তাহলে কেউ পথভ্রষ্ট হলে, তাতে তোমার ক্ষতি নেই, যখন তুমি হিদায়াতপ্রাপ্ত হলে। [ইবন কাসীর]

الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا
مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا
نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ
شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

সাক্ষী রাখবে; অথবা[১] অন্যদের (অমুসলিমদের) থেকে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে, যদি তোমরা সফরে থাক এবং তোমাদেরকে মৃত্যুর বিপদ পেয়ে বসে। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে সালাতের পর অপেক্ষমান রাখবে। তারপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, 'আমরা তার বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ
مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا
وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. অতঃপর যদি এটা প্রকাশ হয় যে, তারা দুজন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তবে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য থেকে নিকটতম দুজন তাদের স্থলবর্তী হবে এবং আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য থেকে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি, করলে অবশ্যই আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব[২]।'

(১) অর্থাৎ যদি মুসলিম কোন সাক্ষী রাখা সম্ভবপর না হয়। কারণ, সাধারণতঃ সফর অবস্থায় সবসময় মুসলিমদের সাক্ষী হিসেবে পাওয়া দুস্কর। তাই প্রয়োজনের খাতিরে কাফেরদেরকে সাক্ষী রাখতে বলা হয়েছে। [মুয়াসসার] তবে তাদেরকে সাক্ষী রাখার ক্ষেত্রে কি নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে তা এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ বনী সাহ্‌মের এক লোক তামীম আদ্-দারী এবং আদী ইবনে বাদ্দারের সাথে সফরে বের হলেন। পথিমধ্যে সাহ্‌মী লোকটি মারা গেল; এমন জায়গায় মারা গেল যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। তারা দু'জন তার মীরাস নিয়ে যখন ফিরে আসল, তখন আত্মীয় স্বজনরা সোনা দিয়ে মোড়ানো

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. এ পদ্ধতিই[১] বেশী নিকটতর যে, তারা সাক্ষ্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করবে অথবা তারা (মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীরা) ভয় করবে যে, তাদের (নিকটাত্মীয়দের) শপথের পর (পূর্বোক্ত) শপথ প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং শুন[২]; আল্লাহ্‌ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

পনরতম রুকূ'

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١٠٩﴾

১০৯. স্মরণ করুন, যেদিন আল্লাহ্‌ রাসূলগণকে একত্র করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, 'আপনারা কি উত্তর পেয়েছিলেন?' তারা বলবেন, 'এ

একটি রুপার পাত্র খুঁজে পেল না। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে তাদের দু'জনকে শপথ করালে তারা এ সম্পর্কে কিছু জানে না বলে জবাব দিল। অপরদিকে এ পাত্রটি মক্কায় পাওয়া গেল এবং তারা বলল যে, আমরা তামীম এবং আদীর নিকট থেকে এ পাত্র খরিদ করেছি। অতঃপর সাহ্‌মীর পক্ষ থেকে দু'জন নিকটআত্মীয় দাঁড়িয়ে শপথ করে বলল যে, আমাদের শপথ ঐ দু'জনের শপথের চেয়ে উত্তম। এ পাত্রটি আমাদের লোকের। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।' [বুখারীঃ ২৭৮০, আবু দাউদঃ ৩৬০৬, তিরমিযীঃ ৩০৬০]

(১) অর্থাৎ সন্দেহের সময় সাক্ষীদেরকে সালাতের পরে শপথ করানো এবং তাদের মধ্যে শপথ ভঙ্গের সম্ভাবনা প্রাপ্ত হলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করাটা হচ্ছে সঠিকভাবে সাক্ষ্য উপস্থাপনে লোকদের বাধ্য করার সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি। হয় তারা আখেরাতের শাস্তির ভয়ে সঠিক সাক্ষ্য দিবে, না হয় দুনিয়ায় মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের পাল্টা শপথের মাধ্যমে তাদের সাক্ষ্যের অগ্রহণযোগ্যতা প্রকাশিত হওয়ার মত অপমানের ভয়ে তারা সঠিক সাক্ষ্য প্রদানে উদ্বুদ্ধ হবে। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করো না। তোমাদের মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে কোন হারাম সম্পদ কুক্ষিগত করো না। আর তোমাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তা ভালভাবে শোন এবং সেটা অনুযায়ী আমল কর। [মুয়াসসার]

বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই; আপনিইতো গায়েব সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল জানেন(১) ।'

(১) অর্থাৎ কেয়ামতে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একটি উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হবে। সবাই সে সুবিশাল ময়দানে উপস্থিত হবে এবং সবার কাছ থেকে তাদের সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। কিন্তু আয়াতে বিশেষভাবে নবী-রাসূলগণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ "ঐ দিনটি বাস্তবিকই স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা সব নবী-রাসূলকে হিসাবের জন্য একত্রিত করবেন"। উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত সবাইকে করা হবে, কিন্তু সর্ব প্রথম প্রশ্ন নবী-রাসূলগণকেই করা হবে যাতে সমগ্র সৃষ্টজগত দেখতে পায় যে, আজ হিসাব ও প্রশ্ন থেকে কেউ বাদ পড়বে না। নবী-রাসূলগণকে যে প্রশ্ন করা হবে, তা এই, আপনারা যখন নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সত্য দ্বীনের দিকে আহ্বান করেছিলেন, তখন তারা আপনাদেরকে কি উত্তর দিয়েছিল? তারা আপনাদের বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করেছিল, না অস্বীকার ও বিরোধিতা করেছিল। এ প্রশ্নের উত্তরে তারা বলবেনঃ "তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী"। ইমাম তাবারী বলেন, তারা আদব রক্ষার্থে বলবেন যে, আপনি ভাল জানেন। অথবা, তারা সেদিনের কঠিন অবস্থা বিবেচনায় জওয়াব দেয়ার চেয়ে আল্লাহ্র উপরই তার জওয়াবের ভার ছেড়ে দিবেন। অথবা তারা এটা এজন্যে বলবেন যে, বাস্তবিকই আল্লাহ্ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন। নবীদের দাওয়াতে কে কেমন সাড়া দিয়েছিল তা আল্লাহ্ তা'আলার চেয়ে কেউ ভাল জানে না। [ইবন কাসীর]

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ঝলক সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিসাব-নিকাষের কাঠগড়ায় আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় রাসূলগণ কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন। সুতরাং অন্যদের যে কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই এখন থেকেই সে ভয়াবহ দিনের চিন্তা করা উচিত এবং জীবনকে এ হিসাব-নিকাষের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেয়া হয়। প্রথম এই যে, সে জীবনের সুদীর্ঘ ও প্রচুর সংখ্যক দিবারাত্রকে কি কাজে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষভাবে কর্মক্ষম যৌবনকালকে সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তৃতীয় এই যে, সে অর্থকড়ি কোন্ (হালাল কিংবা হারাম) পথে উপার্জন করেছে? চতুর্থ এই যে, অর্থকড়িতে সে কোন্ (জায়েয কিংবা নাজায়েয) কাজে ব্যয় করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ ইলম অনুযায়ী সে কি আমল করেছে? [তিরমিযীঃ ২৪১৭]

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَىٰةَ وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾

১১০. স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ বলবেন, ‘হে মার্ইয়ামের পুত্র ‘ঈসা! আপনার প্রতি ও আপনার জননীর প্রতি আমার নেয়ামত[১] স্মরণ করুন, যখন ‘রুহুল কুদুস’[২] দিয়ে আমি আপনাকে শক্তিশালী করেছিলাম এবং আপনি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতেন; আপনাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছিলাম; আপনি কাদামাটি দিয়ে আমার অনুমতিক্রমে পাখির মত আকৃতি গঠন করতেন এবং তাতে ফুঁ দিতেন, ফলে আমার অনুমতিক্রমে তা পাখি হয়ে যেত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীদেরকে আপনি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতেন এবং আমার অনুমতিক্রমে আপনি মৃতকে জীবিত করতেন; আর যখন আমি আপনার থেকে ইস্রাঈল-সন্তানগণকে বিরত রেখেছিলাম[৩];

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে ঈসা ‘আলাইহিস্ সালামের ঐসব অনুগ্রহের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে, যা বিশেষভাবে ঈসা ‘আলাইহিস্ সালামকে মু‘জিযার আকার দেয়া হয়। এতে একদিকে বিশেষ অনুগ্রহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের অবতারণা করে বনী-ইস্রাঈলের ঐ জাতিদ্বয়কে হুশিয়ার করা হয়েছে, যাদের এক জাতি তাকে অপমানিত করে এবং নানা অপবাদ আরোপ করে কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি ‘আল্লাহ্’ কিংবা ‘আল্লাহ্র পুত্র’ আখ্যা দেয়। [আইসারুত তাফাসীর]

(২) রুহুল কুদুস অর্থ, পবিত্র আত্মা। এর দ্বারা জীবরিল আলাইহিস সালামকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়ে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহয় এ অর্থেই ‘রুহুল কুদুস’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। [যেমন, সুরা বাকারাহ:৮৭, ২৫৩; সূরা মায়েদাহ: ১১০; সূরা আন-নাহল: ১০২]

(৩) অর্থাৎ তারা যখন আপনাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন আমি তাদের হাত থেকে আপনাকে হেফাযত করে আপনাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলাম। অথচ আপনি তাদের কাছে প্রকাশ্য মু‘জিযা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। [মুয়াসসার]

আপনি যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলেন তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলেছিল, 'এটাতো স্পষ্ট জাদু।'

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾

১১১. আরো স্মরণ করুন, যখন আমি হাওয়ারীদের মনে ইলহাম করেছিলাম যে[১], 'তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন', তারা বলেছিল, 'আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।'

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১২. স্মরণ করুন, যখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, 'হে মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা! আপনার রব কি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা পাঠাতে সক্ষম?' তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা মুমিন হও[২]।'

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا

১১৩. তারা বলেছিল, 'আমরা চাই যে, তা

(১) আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হাওয়ারী দ্বারা ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমান ঢেলে দিয়েছিলেন, ফলে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছিল। এখানে ওহী শব্দ ব্যবহার হলেও এর অর্থ হচ্ছে, মনে ইলহাম করা বা ঢেলে দেয়া। [মুয়াসসার]

(২) যখন হাওয়ারীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের কাছে আকাশ থেকে পাত্রপূর্ণ খাদ্য অবতারণ দাবী করল, তখন তিনি উত্তরে বললেনঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্কে ভয় কর। এতে বুঝা যায় যে, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এ ধরনের আব্দার করে আল্লাহ্কে পরীক্ষা করা কিংবা তাঁর কাছে অলৌকিক বিষয় দাবী করা একান্ত অনুচিত। বরং ঈমানদার বান্দার পক্ষে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথে চলার ব্যাপারে চেষ্টা চালানো। তবে হাওয়ারীগণ এ সন্দেহ থেকে মুক্ত থেকে বললেন যে, তাদের উদ্দেশ্য শুধু এ দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা, তাদের ও তাদের পরবর্তীদের জন্য এটি নিদর্শন হিসেবে কাজ করা এবং ঈমান বর্ধিত করা। [ইবন কাসীর]

وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّٰهِدِينَ ﴿١١٣﴾

থেকে কিছু খাব ও আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমরা জানব যে, আপনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন এবং আমরা এর সাক্ষী থাকতে চাই।’

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّٰزِقِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. মার্‌ইয়াম-তনয় ‘ঈসা বললেন, ‘হে আল্লাহ্ আমাদের রব! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা পাঠান; এটা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য হবে আনন্দোৎসব স্বরূপ এবং আপনার কাছ থেকে নিদর্শন। আর আমাদেরকে জীবিকা দান করুন; আপনিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।’

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَٰلَمِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫. আল্লাহ্ বললেন, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে তা নাযিল করব; কিন্তু এর পর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে আমি এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি সৃষ্টিকুলের আর কাউকেও দেব না[১]।’

---

(১) এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, নেয়ামত অসাধারণ ও অনন্য হলে তার কৃতজ্ঞতার তাকিদও অসাধারণ হওয়া দরকার এবং অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও অসাধারণ হওয়াই স্বাভাবিক। এক হাদীসে এসেছে, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললঃ আপনি আপনার রবের নিকট দো‘আ করুন যেন তিনি আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করে দেন, এরপর আমরা আপনার উপর ঈমান আনব। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি তা করবে? জবাবে তারা বললঃ হ্যাঁ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো‘আ করলে জীব্‌রাঈল এসে বললেনঃ আপনার প্রভু আপনাকে সালাম দিচ্ছেন এবং বলছেনঃ যদি আপনি চান তবে তাদের জন্য তিনি সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করবেন। কিন্তু এরপর তাদের মধ্যে যদি কেউ কুফরী করে তাহলে আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি পৃথিবীর কাউকে কোনদিন দিব না, আর যদি আপনি চান তবে তাদের জন্য আমি তাওবাহ্ এবং রহমতের দরজা খুলে দেব।

ষোলতম রুকূ'

১১৬. আরও স্মরণ করুন, আল্লাহ্ যখন বলবেন, 'হে মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা! আপনি কি লোকদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আমাকে আমার জননীকে দুই ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর?' তিনি বলবেন, 'আপনিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে আপনি তো তা জানতেন। আমার অন্তরের কথাতো আপনি জানেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি জানি না; নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল জানেন।'

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

১১৭. 'আপনি আমাকে যে আদেশ করেছেন তা ছাড়া তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি, তা এই যেঃ তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কাজকর্মের সাক্ষী, কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন[১] তখন আপনিই

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেনঃ বরং আমি চাই তাওবাহ্ এবং রহমতের দরজা।' [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৪২, ২১৬৭, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৫৩]

(১) এ বাক্যটিকে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের মৃত্যুর দলীল ও আকাশে উত্থিত হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা ঠিক নয়। কেননা, এ কথোপকথন কেয়ামতের দিন হবে। তখন আকাশ থেকে অবতরণের পর তার সত্যিকার মৃত্যু হবে অতীত বিষয়। আয়াতের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে, আপনি যখন যমীনের বুকে আমার মেয়াদ পূর্ণ করলেন এবং আমাকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিলেন,

তো ছিলেন তাদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই সব বিষয়ে সাক্ষী[১] ।'

১১৮. 'আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারাতো আপনারই বান্দা[২], আর যদি

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ

তখন আপনিই কেবল তাদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত । আর আপনি সবকিছুর সাক্ষী । আসমান ও যমীনে কোন কিছু আপনার কাছে গোপন নেই । [মুয়াসসার]

(১) এ আয়াতে এবং এর পরবর্তী আয়াতসমূহ বিশেষ করে সূরার শেষ পর্যন্ত বিশেষভাবে বনী-ইস্রাঈলের শেষ নবী ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের সাথে আলোচনা ও তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কিছু বিবরণ দেয়া হয়েছে । হাশরে তাকে একটি বিশেষ প্রশ্ন ও তার উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে । এ প্রশ্নোত্তরের সারমর্ম ও বনী-ইস্রাঈল তথা সমগ্র মানব জাতির সামনে কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা । এ ময়দানে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকে প্রশ্ন করা হবে যে, আপনার উম্মত আপনাকে আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করেছে । ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সম্মান, মাহাত্ম্য, নিষ্পাপতা ও নবুওয়ত সত্ত্বেও অস্থির হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে সাফাই পেশ করবেন । একবার নয়, বার বার বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করবেন যে, তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দেননি । প্রথমে বলবেনঃ "আপনি পবিত্র, আমার কি সাধ্য ছিল যে, আমি এমন কথা বলব, যা বলার অধিকার আমার নেই"? স্বীয় সাফাইয়ের দ্বিতীয় ভঙ্গি এই যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে সাক্ষী করে বলবেনঃ "যদি আমি এরূপ বলতাম, তবে অবশ্যই আপনার তা জানা থাকত । কেননা, আপনি তো আমার অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবগত । কথা ও কর্মেরই কেন, আপনি তো 'আল্লামুল-গুয়ূব' যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী" । এ দীর্ঘ ভূমিকার পর ঈসা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং বলবেনঃ "আমি তাদেরকে ঐ শিক্ষাই দিয়েছি, যার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি আমার তোমাদের সকলের পালনকর্তা । এ শিক্ষার পর আমি যত দিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী ছিলাম, (তখন পর্যন্ত তাদের কেউ এরূপ কথা বলত না) এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নেন, তখন তারা আপনার দেখাশোনার মধ্যেই ছিল । আপনিই তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সম্যক সাক্ষী" । [সা'দী]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'নিশ্চয় কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে এবং কিছুসংখ্যক লোককে পাকড়াও করে বাম দিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে । তখন আমি বলবঃ আমার উম্মত! তখন আমাকে বলা হবেঃ আপনি জানেন না আপনার পরে তারা কি সব নতুন পদ্ধতির

তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়(১) ।’

أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

প্রচলন করেছে। তখন আমি বলবঃ যেমন নেক বান্দা বলেছেন, “এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কাজকর্মের সাক্ষী, কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই সব বিষয়ে সাক্ষী। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারাতো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [বুখারীঃ ৪৬২৬]

(১) অর্থাৎ আপনি বান্দাদের প্রতি যুলুম ও অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। তাই তাদেরকে শাস্তি দিলে তা ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতা-ভিত্তিকই হবে। আর যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এ ক্ষমাও অক্ষমতাপ্রসূত হবে না। কেননা, আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল। তাই কোন অপরাধী আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। তাদের শাস্তির ব্যাপারে আপনার ক্ষমতাই চূড়ান্ত। মোটকথা, অপরাধীদের ব্যাপারে আপনি যে রায়ই দেবেন, তাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞজনোচিত ও সক্ষমতাসুলভ হবে। ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম হাশরের ময়দানে এসব কথা বলবেন। যাতে নাসারাদেরকে সৃষ্টিকুলের সামনে কঠোরভাবে ধমকি দেয়া উদ্দেশ্য। [ইবন কাসীর] এর বিপরীতে ইব্রাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে দো‘আ করে বলেছিলেনঃ “হে রব, এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের মধ্যে যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার লোক এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, আপনি স্বীয় রহমতে (তাওবাহ্ ও সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের শক্তিদান করে অতীত গোনাহ্) ক্ষমা করতে পারেন”। হাদীসে এসেছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এ আয়াতখানি পাঠ করে হাত উঠালেন এবং দো‘আ করে বললেনঃ হে আল্লাহ্! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত! এবং কাঁদতে থাকলেন। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা জিব্রাঈলকে বললেনঃ মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর -যদিও তিনি সর্ববিষয়ে ভাল জানেন- কেন তিনি কাঁদছেন? জিব্রাঈল তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন আর রাসূলও তার উত্তর করলেন। তখন আল্লাহ্ আবার বললেনঃ হে জিব্রাঈল, মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাকে বল, আমরা আপনার উম্মাতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব; অসন্তুষ্ট করব না। [মুসলিমঃ ২০২] হাদীসে আরও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার কিছু উম্মতকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আমি তখন ‘আমার সাথী’ বলতে থাকব, তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, তারা আপনার পরে দ্বীনের মধ্যে নতুন কি কি পন্থা উদ্ভাবন করেছিল। আমি তখন সেই নেক বান্দার মত বলব, যিনি বলেছিলেন, ‘আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারাতো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ [বুখারী: ৪৬২৫; মুসলিম: ৩০২৩]

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١٩﴾

১১৯. আল্লাহ্ বলবেন, ‘এ সে দিন যেদিন সত্যবাদিগণ তাদের সত্যের জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট[১]; এটা মহাসফলতা[২]।’

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾

১২০. আস্‌মান ও যমীন এবং এদুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

---

(১) আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি। এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহ্ তা‘আলা বলবেনঃ বড় নেয়ামত এই যে, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট; এখন থেকে কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না। [বুখারী: ৬৫৪৯; মুসলিম: ১৮৩]

(২) এটিই মহান সফলতা। স্রষ্টা ও পরম প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে গেলে এর চাইতে বৃহত্তর সফলতা আর কি হতে পারে? আল্লাহ্ তা‘আলা অন্য আয়াতে এর জন্যই বলছেন যে, “এরূপ সাফল্যের জন্য আমলকারীদের উচিত আমল করা” [সূরা আস-সাফফাত: ৬১] আরও বলেন, “ আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক” [আল-মুতাফফিফীন: ২৬]

৬- সূরা আল আন্‌'আম



সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ১৬৫ ।

নামকরণঃ এ সূরারই ১৩৬, ১৩৯ ও ১৪২ নং আয়াতসমূহে উল্লেখিত "আল-আন'আম" শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে । আল-আন'আম শব্দের অর্থঃ গবাদি পশু ।

সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপটঃ

এ সূরা মক্কী সূরা বলেই প্রসিদ্ধ । কুরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে এটাই প্রথম মক্কী সূরা । এ সূরার মৌলিক আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত । মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মুজাহিদ, কালবী, কাতাদাহ প্রমূখও প্রায় এ কথাই বলেন । আবু ইসহাক ইসফিরায়িনী বলেন, এ সূরাটিতে তাওহীদের সমস্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে । [কুরতুবী, আত-তাফসীরুল মুনীর]

সূরার ফযিলত:

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ সূরা আল-আন'আমের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েকখানি আয়াত বাদে গোটা সূরাটিই একযোগে মক্কায় নাযিল হয়েছে । জাবের, ইবন আব্বাস, আনাস ও ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সূরা আল-আন'আম নাযিল হচ্ছিল, তখন এত ফিরিশ্‌তা তার সাথে অবতরণ করেছিলেন যে, তাতে আকাশের প্রান্তদেশ ছেয়ে যায় । [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৭০; ২৪৩১]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সূরা আল-আন'আম কুরআনের উৎকৃষ্ট অংশের অন্তর্গত । [সুনান দারমী ২/৫৪৫; ৩৪০১]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহ্‌মান, রহীম, আল্লাহ্‌র নামে ।।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই[1] যিনি

(১) এ সূরাটিকে ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾ বাক্য দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে । এতে খবর দেয়া হয়েছে যে, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য । এ খবরের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রশংসা শিক্ষা দেয়া । যেন বলা হচ্ছে, হে মানুষ! তোমরা তাঁর জন্যই যাবতীয় হামদ ও শোকর নির্দিষ্ট কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আরও সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন । তাঁর সাথে কাউকেও সামান্যতম অংশীদারও করবে না । এ বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষাদানের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরিপূর্ণ হাম্‌দ বা প্রশংসা একমাত্র তাঁরই, যার কোন শরীক নেই । তাকে ব্যতীত আর যে সমস্ত উপাস্যের ইবাদাত করা হয়, তারা এ হামদ প্রাপ্য নয় । [তাবারী] সুতরাং কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি স্বীয় ওজুদ বা সত্তার পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নিজেই প্রশংসনীয় । এ বাক্যের পর আসমান ও যমীন এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসনীয় হওয়ার

وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۚ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ①

আস্‌মান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো[১]। এরপরও কাফেরগণ তাদের রব-এর সমকক্ষ দাঁড় করায়[২]।

প্রমাণও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে সত্তা এহেন মহান শক্তি-সামর্থ্য ও বিত্তবান, তিনিই হাম্‌দ বা প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন। কাতাদা বলেন, এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা‘আলা আসমানকে যমীনের পূর্বে, অন্ধকারকে আলোর পূর্বে এবং জান্নাতকে জাহান্নামের পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। [তাবারী]

(১) এ আয়াতে سماوات শব্দটিকে বহুবচনে এবং أرض শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসমানের ন্যায় যমীনও সাতটি। [যেমন, সূরা আত-তালাক: ১২] এমনিভাবে ظلمات শব্দটিকে বহুবচনে এবং نور শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نور বলে বিশুদ্ধ সরল পথ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা মাত্র একটিই। আর ظلمات বলে ভ্রান্ত পথ ব্যক্ত করা হয়েছে, যা অসংখ্য। তাছাড়া نور বা আলো ظلمات বা অন্ধকার থেকে উত্তম [বাহরে মুহীত; ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে জগতের ঐসব জাতিকে হুশিয়ার করা যারা মূলতঃ একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করে বসেছে। অগ্নি উপাসকদের মতে জগতের স্রষ্টা দু’জন - ইয়ায্‌দান ও আহ্‌রামান। তারা ইয়ায্‌দানকে মঙ্গলের স্রষ্টা এবং আহ্‌রামানকে অমঙ্গলের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে। এ দু’টিকেই তারা অন্ধকার ও আলো বলে ব্যক্ত করে। এমনিভাবে নাসারারা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে ‘ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর মাতা মার’ইয়াম ‘আলাইহাস্ সালাম-কে আল্লাহ্ তা‘আলার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা ‘একে তিন’ এবং ‘তিনে এক’ এর অযৌক্তিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। আরবের মুশরিকরা প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি বড় পাথরকেও তাদের উপাস্য বানিয়েছে। [আল-মানার] মোটকথা, যে মানবকে আল্লাহ্ তা‘আলা ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ তথা সৃষ্টির সেরা করেছিলেন, তারা যখন পথভ্রষ্ট হল, তখন চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আকাশ, পানি, বৃক্ষলতা এমনকি পোকা-মাকড়কেও সিজ্‌দার যোগ্য উপাস্য, রুযীদাতা ও বিপদ বিদূরণকারী সাব্যস্ত করে নিল। কুরআনুল কারীমের আলোচ্য আয়াত আল্লাহ্ তা‘আলাকে যমীন ও আসমানের স্রষ্টা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরোক্ত সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেছে। কেননা, অন্ধকার ও আলো, আসমান ও যমীন এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্টি। অতএব, এগুলোকে কেমন করে আল্লাহ্ তা‘আলার অংশীদার করা যায়? যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি যারা সৃষ্টি করতে পারে না তাদের মত? সুতরাং কিভাবে ইবাদাতে ও সম্মানে তাঁর সমকক্ষ কাউকে দাঁড় করানো যায়? [ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর]।

২. তিনিই তোমাদেরকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন[১], তারপর একটা সময় নির্দিষ্ট করেছেন এবং আর একটি নির্ধারিত সময় আছে যা তিনিই জানেন, এরপরও তোমরা সন্দেহ কর[২]।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝

(১) প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগত অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তম বস্তুগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎবিশেষ। যদি এরই সূচনা, পরিণতি ও বাসস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য হয়ে সামনে ফুটে উঠবে। আল্লাহ্ বলেনঃ "আল্লাহ্ই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন।" আল্লাহ্ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্ সালাম-কে একটি বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। [ইবন কাসীর] সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই আদম-সন্তানরা বর্ণ, আকার, চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লালবর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিত্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র স্বভাবের হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে এমন এক মুষ্টি মাটি থেকে তৈরী করেছেন যে মুষ্টি সমস্ত মাটি থেকে নেয়া হয়েছে। তাই আদম সন্তান মাটির মতই হয়েছে। তাদের মধ্যে লাল, সাদা, কালো, আবার এর মাঝামাঝি রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ নম্র, কেউ চিন্তাগ্রস্ত, কেউ মন্দ, কেউ ভাল, কেউ এর মাঝামাঝি পর্যায়ের রয়েছে।' [আবুদাউদঃ ৪৬৯৩]

(২) পূর্বে আদমসন্তানদের সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন এর পরিণতির দু'টি মঞ্জিল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার উপকারে নিয়োজিত সৃষ্টিজগত- সবার সামষ্টিক পরিণতি, যাকে কেয়ামত বলা হয়। প্রথমটির ব্যাপারে বলেছেন, ﴿ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا﴾ অর্থাৎ মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তা'আলা তার স্থায়িত্ব ও আয়ুস্কালের জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার নাম মৃত্যু। এ মেয়াদ মানবের জানা না থাকলেও এর প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষ অবগত। কেননা, সে সর্বদা, সর্বত্র আশ-পাশের আদম-সন্তানদেরকে মারা যেতে দেখে। এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ কেয়ামতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "আরো একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা একমাত্র তাঁর কাছেই" অর্থাৎ আল্লাহ্ই জানেন, এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান ফিরিশ্‌তাদের নেই এবং মানুষেরও নেই। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগত অর্থাৎ গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহ্র

৩. আর আস্‌মানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ্[১], তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি জানেন[২]।

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ۝٣

৪. আর তাদের রব-এর আয়াতসমূহের এমন কোন আয়াত তাদের কাছে উপস্থিত হয় না যা থেকে তারা মুখ না

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝٤

সৃষ্টজীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈথিল্য থেকে জাগ্রত করার জন্য বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আয়ূষ্কাল রয়েছে, যার পর তার মৃত্যু অবধারিত। প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশ-পাশে প্রত্যক্ষ করে। এটা যেহেতু সত্য, সেহেতু এরপরও আরেকটি সময় তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। যার ঘোষণা আল্লাহ্ নিজেই দিয়েছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে না। [ইবন কাসীর, সা'দী, আল-মুনীর, ফাতহুল কাদীর, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এ কারণে আয়াতের শেষভাগে কিয়ামতের উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে ﴿ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ﴾ অর্থাৎ এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সত্বেও তোমরা কেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর! এটা অনুচিত।

(১) এ আয়াতের অনুবাদে কোন প্রকার ভুল বুঝার অবকাশ নেই। মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপরই রয়েছেন। আসমান ও যমীনের সর্বত্রই তাঁর দৃষ্টি, জ্ঞান ও ক্ষমতা রয়েছে। তিনি সর্বত্রই মা'বুদ। আয়াতের এক অর্থ এটাই। কোন কোন মুফাসসির অর্থ করেছেন, তিনিই আল্লাহ্ যিনি আসমান ও যমীনের যত গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। আবার কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এখানে আসমান বলে ঊর্ধ্বজগত বোঝানো হয়েছে। সেটা আরশও হতে পারে। সুতরাং আয়াতের অনুবাদ হবে, তিনিই আল্লাহ্ যিনি আসমানে তথা আরশের উপর রয়েছেন, সেখানে থাকলেও যমীনের যত গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়াদি রয়েছে সব কিছু জানেন। [তাবারী, বাগভী, কুরতুবী, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে প্রথম দু'আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই এমন এক সত্তা, যিনি আসমান ও যমীনে 'ইবাদাত ও আনুগত্যের যোগ্য এবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি পরিজ্ঞাত। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করো না। তিনি যেহেতু তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন সুতরাং তাঁর নাফরমানী করা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করো এবং এমন কাজ করবে, যা তোমাদেরকে তাঁর নৈকট্য প্রদান করবে, তাঁর রহমতের অধিকারী করবে। এমন কোন কাজ করো না, যাতে তার নৈকট্য থেকে দূরে সরে যাও। [সা'দী]

ফেরায়[১]।

৫. সুতরাং সত্য যখন তাদের কাছে এসেছে তারা তো তাতে মিথ্যারোপ করেছে[২]। অতএব যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার যথার্থ সংবাদ অচিরেই তাদের কাছে

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَٰؤُا مَا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ⑤

(১) এ আয়াতে অমনোযোগী মানুষের হঠকারিতা ও সত্যবিরোধী জেদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাদের কাছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী থাকার পাশাপাশি নবী-রাসূলগণ তাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে এসেছেন এবং তা তাদের কাছে স্পষ্টও হয়েছে। তা সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের হেদায়াতের জন্য যে কোন নিদর্শন প্রেরণ করা হলে, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়- এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করে না। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত হল, তখন তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এখানে 'সত্য'র অর্থ কুরআন হতে পারে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও হতে পারে। [তাবারী, কুরতুবী, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর] কেননা, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজীবন আরব গোত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান করেন। তার শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা এ কথা পুরোপুরিই জানত যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষা লাভ করেননি। এমনকি তিনি নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা আরবে তিনি উম্মি বা নিরক্ষর উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ তার মুখ দিয়ে নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পন্ন বাণীসমূহের এমন স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যা জগতের যাবতীয় জ্ঞানী-গুণীদেরকেও বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। তিনি আল্লাহ্‌র কালাম কুরআনের মোকাবেলা করার জন্য আরবের স্বনামখ্যাত, প্রাঞ্জলভাষী কবি-সাহিত্যিক ও অলঙ্কারবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জান-মাল, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কুরআনের একটি আয়াতের অনুরূপ বাক্য রচনা করার সামর্থ্য তাদের কারো হল না। এভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরআনের অস্তিত্ব ছিল সত্যের এক বিরাট নিদর্শন। এছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে হাজারো মু'জিযা ও খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পায়, যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ যা অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু কাফেররা এসব নিদর্শনকে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল।

পৌঁছবে[১]।

৬. তারা কি দেখে না[২] যে, আমরা তাদের আগে বহু প্রজন্মকে[৩] বিনাশ করেছি;

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ

(১) আয়াতের শেষে কাফেরদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের অশুভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, আজ তো এসব অপরিণামদর্শী লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু‘জিযা, তার আনীত হেদায়াত, কেয়ামত ও আখেরাত সবকিছু নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সে সময় দূরে নয়, যখন এগুলোর স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে আর যদি তা না করা হয় তবে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে তা দলীল-প্রমাণসহ তাদের সামনে উপস্থিত হবে। এত সাবধানবাণীর পরও কাফেররা তাদের অবস্থান থেকে সরে আসে নি। তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরে আসেনি। শেষপর্যন্ত আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর এ ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। বদরের দিন তিনি তাদের উপর তরবারীর মাধ্যমে সে ফয়সালা করে দেন। [তাবারী]
তাছাড়া তাদের বিচারের আরেক ব্যবস্থা রয়েছেই। তা কেয়ামতদিবসে প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানে প্রত্যেককে তার ঈমান ও আমলের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি পাবে। তখন এগুলোকে বিশ্বাস ও অস্বীকার করলেও কোন উপকার বা ক্ষতি হবে না। কেননা, সেটা কর্মজগত নয়-প্রতিদান দিবস। আল্লাহ্ তা‘আলা এখনো চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ সাধিত হবে। যদি তা না করে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা‘আলা মিথ্যারোপকারীদের বলবেন, “এটাই সে আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।” [সূরা আত-তূর:১৪] কিয়ামতের দিন কাফেরদের সামনে কিভাবে এ সত্যকে উপস্থাপন করা হবে তার বর্ণনায় আল্লাহ্ আরও বলেন, “আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র শপথ করে বলে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না । কেন নয়? তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই এটা জানে না-- তিনি পুনরুত্থিত করবেন যে বিষয়ে তাদের মতানৈক্য ছিল তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য এবং যাতে কাফিররা জানতে পারে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী” [সূরা আন-নাহল:৩৮, ৩৯] [সা‘দী]

(২) আলোচ্য প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রত্যক্ষ সম্বোধিত মক্কাবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা দেখেনি? দেখলে তা থেকে তারা শিক্ষা ও উপদেশ অর্জন করতে পারত। এখানে ‘দেখা’র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা, সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। [আল-মানার]

(৩) এ আয়াতে কাফেরদেরকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেয়ার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, “আমরা তাদের পূর্বে অনেক ‘করণ’ (প্রজন্ম)কে ধ্বংস করে দিয়েছি।” [সা‘দী] قرن শব্দের অর্থ সমসাময়িক লোকসমাজ এবং সুদীর্ঘ কাল।

فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۖ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ⑥

তাদেরকে যমীনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনটি তোমাদেরকেও করিনি এবং তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। আর তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম; তারপর তাদের পাপের জন্য তাদেরকে বিনাশ করেছি(১) এবং তাদের পর অন্য প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছি(২)।

দশ বছর থেকে একশ' বছর পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। [বাগভী, কুরতুবী] কিন্তু قرن শব্দের অর্থ যে এক শতাব্দী, কোন কোন ঘটনা ও হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে বুছরকে বলেছিলেনঃ 'সে এক 'করণ' পর্যন্ত জীবিত থাকবে'। পরে দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ' পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। [মুসনাদে আহমাদ ৪/১৮৯]

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা আল্লাহ্‌র বিধান ও নবীগণের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অবিশ্বাসীর দৃষ্টি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। [তাবারী, ইবন কাসীর] এ আয়াতে অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে তাদেরকে এমন বিস্তৃতি, শক্তি ও জীবন ধারণের সাজ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী লোকদের ভাগ্যে জুটেনি। কিন্তু তারাই যখন নবীগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শনের বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন প্রভূত জাঁকজমক, প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদ তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আদ ও সামূদ গোত্রের মত শক্তিবল তাদের নেই এবং সিরিয়া ও ইয়েমেনবাসীদের অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যশীলও তারা নয়। এসব অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত। বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার। [ইবন কাসীর, আইসারুত তাফাসীর, মুয়াসসার]

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত, অসাধারণ জাঁকজমক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহকে চোখের পলকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়ে যায় নি, বরং তাদেরকে ধ্বংস করার সাথে সাথে তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। সুতরাং মক্কাবাসীদের উচিত ভয় করা। [কুরতুবী, ইবন কাসীর]

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৭. আমরা যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম, অতঃপর তারা যদি সেটা হাত দিয়ে স্পর্শও করত তবুও কাফেররা বলত, 'এটা স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়(১)।'

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۗ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۝

৮. আর তারা বলে, 'তার কাছে কোন ফিরিশ্‌তা কেন নাযিল হয় না(২)?' আর যদি আমরা ফিরিশ্‌তা নাযিল করতাম, তাহলে বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হয়ে যেত, তারপর তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হত না(৩)।

---

(১) এ আয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের কাছে যদি কাগজে লিখা কিতাবও নাযিল করা হয় তবুও তারা ঈমান আনবে না। তেমনিভাবে অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, 'কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনো ঈমান আনব না যতক্ষন তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল না করবে যা আমরা পাঠ করব' [সূরা আল-ইসরা: ৯৩] এমনকি যদি সত্যি সত্যিই তাদেরকে এ কিতাব দেয়া হতো আর তারা সেটাকে হাত দ্বারা স্পর্শও করত, তারপরও তারা ঈমান আনবার ছিল না। বরং তারা সেটাকে জাদু বলত। আল্লাহ্ বলেন, 'যদি আমরা তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেই তারপর তারা তাতে আরোহন করতে থাকে, তবুও তারা বলবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।' [সূরা আল-হিজর: ১৫]

(২) এখানে এটা ভাবার অবকাশ নেই যে, কাফেররা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ফিরিশতা নাযিল হয় না এমনটি অস্বীকার করত। তারা স্পষ্টই জানত যে, রাসূলের কাছে ফিরিশতাই ওহী নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের কাছে তা জানাতেন। এখানে তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসূলের সাথে কেন অপর একজন ফিরিশতা সতর্ককারী হিসেবে সার্বক্ষনিক থাকে না। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আরও তারা বলে, 'এ কেমন রাসূল' যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে কোন ফিরিশ্‌তা কেন নাযিল করা হল না, যে তার সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে?" [সূরা আল-ফুরকান: ৭] [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) অর্থাৎ যদি ফিরিশতা নাযিল করা হতো তবে তারা তাদের অবাধ্যতা ও কুফরী দেখে তাদেরকে কোনরূপ সুযোগ না দিয়ে ধ্বংস করে দিতেন। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ বলেন, 'আমরা ফিরিশ্‌তাদেরকে যথার্থ কারণ ছাড়া প্রেরণ করি না; ফিরিশ্‌তারা উপস্থিত হলে তখন তারা আর অবকাশ পাবে না' [সূরা আল-হিজর:৮] আরও বলেন,

৯. আর যদি তাকে ফিরিশ্‌তা করতাম তবে তাঁকে পুরুষমানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম, আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে[১]।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ۝٩

১০. আর আপনার আগে অনেক রাসূলকে নিয়েই তো ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে। ফলে রাসূলদের সাথে বিদ্রূপকারীদেরকে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল তা-ই পরিবেষ্টন করেছে[২]।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠

‘যেদিন তারা ফিরিশ্‌তাদেরকে দেখতে পাবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, ‘রক্ষা কর, রক্ষা কর।’ [সূরা আল-ফুরকান:২২] [আদওয়াউল বায়ান]

(১) অর্থাৎ এ গাফেলরা এসব দাবী-দাওয়া করে মৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। কেননা, মানুষদের থেকে রাসূল পাঠানো আল্লাহ্‌র এক বিরাট রহমত। যাতে একে অপরকে বুঝতে পারে, হেদায়াত নেয়া উম্মতের জন্য সহজ হয়। প্রশ্ন করা ও উত্তর নেয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছেঃ স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব নবীকে এমনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতি ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তারা সাহস হারাননি। পরিণামে বিদ্রূপকারী জাতিকে সে আযাবই পাকড়াও করেছে, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। মোটকথা এই যে, আল্লাহ্‌র বিধানাবলী প্রচার করাই আপনার কাজ। এ দায়িত্ব পালন করে আপনি দায়মুক্ত হয়ে যান। কেউ তা গ্রহণ করল কি না তা দেখাশোনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। তাই এতে মশগুল হয়ে আপনি অন্তরকে ব্যথিত করবেন না। আপনার পূর্বেও নবী-রাসূলগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। যেমন নূহ আলাইহিস সালামকে তারা বলেছিল, ‘নবী হওয়ার পরে সুতার হয়ে গেলে’। হূদ আলাইহিস সালামকে বলেছিল, ‘আমরা তো এটাই বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে’ [সূরা হূদ:৫৪] সালেহ আলাইহিস সালামকে বলেছিল, ‘হে সালিহ্! তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এস, যদি তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।’ [সূরা আল-আ‘রাফ:৭৭] লূত আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তারা বলেছিল, ‘লূত-পরিবারকে তোমরা জনপদ থেকে বহিস্কার কর, এরা

দ্বিতীয় রুকূ‘

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾

১১. বলুন, ‘তোমরা যমীনে পরিভ্রমণ কর, তারপর দেখ, যারা মিথ্যারোপ করেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছিল(১)!’

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ

১২. বলুন, ‘আস্‌মানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা কার?’ বলুন, ‘আল্লাহ্‌রই’(২), তিনি তাঁর নিজের উপর দয়া করা লিখে নিয়েছেন(৩)। কিয়ামতের দিন

তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।’ [সূরা আন-নামল:৫৬] অনুরূপভাবে শু‘আইব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছিল ‘হে শু‘আইব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম, আর আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও’ [সূরা হূদ:৯১] তাছাড়া তারা নবীর সালাত নিয়েও ঠাট্টা করে বলত, ‘হে শু‘আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যার ‘ইবাদাত করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও ? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, বুদ্ধিমান।’ [সূরা হূদ:৮৭]। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) কাতাদা বলেন, অর্থাৎ তিনি তাদেরকে পাকড়াও করে ধ্বংস করেছেন তারপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে পৌঁছে দিয়েছেন। [তাবারী]

(২) এ আয়াতে কাফেরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কে? অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাচনিক উত্তর দিয়েছেনঃ সবার মালিক আল্লাহ্। কাফেরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাফেরদের কাছেও স্বীকৃত। তারা যদিও শির্ক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ্ তা‘আলাকেই মানতো। অর্থাৎ তারা তাওহীদুর রবুবিয়াতের এ অংশে বিশ্বাসী ছিল। আর তারা যেহেতু তাওহীদের এ অংশে বিশ্বাস করছে, তাদের উচিত হবে তাওহীদের বাকী অংশ তাওহীদুল উলুহিয়ার স্বীকৃতি দেয়া এবং একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করা। [সা‘দী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘যখন আল্লাহ্ তা‘আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেন, তখন একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ্ তা‘আলার কাছেই রয়েছে। এতে লিখিত আছেঃ আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে’। [বুখারী: ৭৪০৪; মুসলিম: ২৭৫১]

لَا يُؤْمِنُونَ ⑫

তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করবেন[(১)], এতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না[(২)]।

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑬

১৩. আর রাত ও দিনে যা কিছু স্থিত হয়, তা তাঁরই[(৩)] এবং তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑭

১৪. বলুন, 'আমি কি আস্‌মানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব[(৪)]? তিনিই খাবার দান করেন কিন্তু তাঁকে খাবার দেয়া

(১) এ বাক্যে إلى শব্দটি فِي অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে মর্ম দাঁড়িয়েছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বের ও পরের সব মানুষকে কেয়ামতের দিন সমবেত করবেন কিংবা এখানে কবরে একত্রিত করা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে কবরে একত্রিত করতে থাকবেন এবং কেয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করবেন আর তোমাদেরকে তোমাদের কর্মকাণ্ডের শাস্তি প্রদান করবেন। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) এতে ইঙ্গিত আছে যে, আয়াতের শুরুতে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহ থেকে যদি কাফের ও মুশরিকরা বঞ্চিত হয়, তবে স্বীয় কৃতকর্মের কারণেই হবে। কারণ, তারা অনুগ্রহ লাভের উপায় অর্থাৎ ঈমান অবলম্বন করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা আখেরাত ও কিয়ামতের বাস্তবতার উপর অনেক দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যাতে তা বাস্তব সত্যরূপে মানুষের কাছে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তারা অস্বীকার ছাড়া কিছুই করেনি। তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে, ফলে তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় নিপতিত হয়েছে এবং কুফরী করার মত দুঃসাহস দেখিয়েছে। এতে করে তারা তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিই বরবাদ করেছে। [সা'দী]

(৩) এখানে سُكُون অর্থ اِستَقَرَّ অবস্থান করা; অর্থাৎ পৃথিবীর দিবা-রাত্রিতে যা কিছু অবস্থিত আছে, তা সবই আল্লাহ্‌র [তাবারী] অথবা এর অর্থ سُكُون و حَرْكَت এর সমষ্টি। অর্থাৎ مَا سَكَنَ ومَا تَحَرَّكَ (স্থাবর ও অস্থাবর)। আয়াতে শুধু سُكُون উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত حَرْكَتْ আপনা-আপনিই বুঝা যায়। অথবা سَكَنَ অর্থ যাবতীয় সৃষ্টি। অর্থাৎ যাবতীয় সৃষ্টির মালিকানা আল্লাহ্‌রই। [কুরতুবী]

(৪) সুদ্দী বলেন, এখানে ওলীরূপে গ্রহণ করার অর্থ, যাকে অভিভাবক মানা হয় এবং যার রবুবিয়াত এর স্বীকৃতি দেয়া হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

হয় না[১]। বলুন, 'নিশ্চয় আমি আদেশ পেয়েছি যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে যেন আমি প্রথম ব্যক্তি হই[২], আর (আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে) 'আপনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।'

১৫. বলুন, 'আমি যদি আমার রব-এর অবাধ্যতা করি, তবে নিশ্চয় আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির[৩]।'

قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকুলের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। তিনি পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোন রিযিকের প্রয়োজন পড়ে না। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা সেটা বলেছেন, 'আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে। আমি তাদের কাছ থেকে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই তো রিয্‌কদাতা, প্রবল শক্তিধর, পরাক্রমশালী। [সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬-৫৮] [আদওয়াউল বায়ান]

(২) অর্থাৎ যে উম্মতের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি সে উম্মতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রথম ব্যক্তি হই। এর অর্থ এ নয় যে, সমস্ত জাতির মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হবেন। কারণ, কুরআনের বহু আয়াতে এটা এসেছে যে, তার পূর্বেও নবীগণ ইসলামের উপর ছিলেন এবং অনেক উম্মতও ইসলামের উপর গত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন, "স্মরণ করুন, যখন তার রব তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ করুন', তিনি বলেছিলেন, 'আমি সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম'।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৩১]। আর ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন, "আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" [সূরা ইউসুফ: ১০১] [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) আয়াতে নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি বলে দিন, মনে কর, যদি আমিও স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারো কিয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধিতা করলে যখন নবীগণের যিনি নেতা, তাকেও ক্ষমা করা যায় না, তখন অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য। যদি কেউ আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয় আর সে অবাধ্যতা হয় শির্ক বা কুফরীর মাধ্যমে তাহলে তার রক্ষা নেই। সে স্থায়ীভাবে আল্লাহ্‌র ক্রোধে ও জাহান্নামে অবস্থান করবে। [সা'দী]

مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾

১৬. 'সেদিন যার থেকে তা সরিয়ে নেয়া হবে, তার প্রতি তো তিনি দয়া করলেন(১) এবং এটাই স্পষ্ট সফলতা(২) ।'

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

১৭. আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই । আর যদি তিনি আপনাকে কোন কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান(৩) ।

---

(১) বলা হয়েছে, হাশর দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে । কাতাদা বলেন, এখানে যা সরানোর কথা বলা হচ্ছে, তা হচ্ছে শাস্তি । কারো উপর থেকে এ শাস্তি সরে গেলে মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র অশেষ করুণা হয়েছে । [তাফসীর আবদির রাযযাক]

(২) অর্থাৎ এটিই বৃহৎ ও প্রকাশ্য সফলতা । [কুরতুবী] এখানে সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ । কারণ, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ।

(৩) এ আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে । অর্থাৎ প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা । সত্যিকারভাবে কোন ব্যক্তি কারো সামান্য উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না । আল্লাহ্ যদি কারও লাভ করতে চান তবে তা বন্ধ করার ক্ষমতা কারও নেই । অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর আল্লাহ্ যদি আপনার মংগল চান তবে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিহত করার কেউ নেই । তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার কাছে সেটা পৌঁছান ।"[সূরা ইউনুস: ১০৭] এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম বাগভী আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, 'একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটে সওয়ার হয়ে আমাকে পিছনে বসিয়ে নিলেন । কিছু দূর যাওয়ার পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ 'হে বৎস'! আমি আরয করলামঃ আদেশ করুন, আমি হাযির আছি । তিনি বললেনঃ 'তুমি আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানকে হেফাযত করবে, আল্লাহ্ তোমাকে হেফাযত করবেন । তুমি আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানকে হেফাযত করো তাহলে আল্লাহকে সাহায্যের সাথে তোমার সামনে পাবে । তুমি শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখলে, বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন । কোন কিছু চাইতে হলে তুমি আল্লাহ্‌র কাছেই চাও এবং সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহ্‌র কাছেই চাও । জগতে যা কিছু হবে, ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে । সমগ্র সৃষ্টজীব সম্মিলিতভাবে তোমার কোন উপকার করতে চাইলে যা তোমার তাকদিরে লিখা নেই তারা কখনো তা করতে পারবে না । পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার এমন কোন ক্ষতি

১৮. আর তিনিই আপন বান্দাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী[১], আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١٨﴾

১৯. বলুন, 'কোন্ জিনিস সবচেয়ে বড় সাক্ষী'? বলুন, 'আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যদাতা[২]। আর এ কুরআন আমার নিকট ওহী করা হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট তা পৌঁছবে তাদেরকে এ দ্বারা

قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاُوْحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰی ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿١٩﴾

করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই, তবে কখনোই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস সহকারে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আমল করতে পার তবে অবশ্যই তা করো। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধর। কেননা, তুমি যা অপছন্দ করো তার বিপক্ষে ধৈর্য ধারণ করায় অনেক মঙ্গল রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহ্র সাহায্য ধৈর্যের সাথে জড়িত- কষ্টের সাথে সুখ এবং অভাবের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত'। [মুসনাদে আহমাদ: ১/৩০৭]

পরিতাপের বিষয়, কুরআনুল কারীমের এ সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আজীবনের শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলিমরা এ ব্যাপারে পথ ভ্রান্ত। তারা আল্লাহ্ তা'আলার সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। আজ এমন মুসলিমের সংখ্যা নগণ্য নয়, যারা বিপদের সময় আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে না এবং তারা তাঁর কাছে দো'আ করার পরিবর্তে বিভিন্ন নামের দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি লক্ষ্য করে না। কোন সৃষ্ট জীবকে অভাব পূরণের জন্য ডাকা এ কুরআনী নির্দেশের পরিপন্থী ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদেরকে সরল পথে কায়েম রাখুন।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সবাই তাঁর ক্ষমতাধীন ও মুখাপেক্ষী। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন মহোত্তম ব্যক্তিগণও সব কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে না এবং তার সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না; তিনি নৈকট্যশীল রাসূলই হোন কিংবা রাজা বাদশাহ। আর তিনি যা আদেশ, নিষেধ, সাওয়াব, শাস্তি, সৃষ্টি বা নির্ধারণ যাই করেন তাই প্রজ্ঞাময়। তিনি গোপন যাবতীয় কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। এ সবকিছুই তাঁর তাওহীদের প্রমাণ। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ কোন্ জিনিসের সাক্ষ্য সাক্ষী হিসেবে বড় বলে বিবেচিত? বলুন, আল্লাহ্। তিনিই সবচেয়ে বড় সাক্ষী। তাঁর সাক্ষ্যের মধ্যে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা নেই। সুতরাং তিনিই আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য যে, আমি রাসূল। [তাবারী, সা'দী]

সতর্ক করতে পারি[১]। তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌ও আছে? বলুন, ‘আমি সে সাক্ষ্য দেই না’। বলুন, ‘তিনি তো একমাত্র প্রকৃত ইলাহ্ এবং তোমরা যা শরীক কর তা থেকে আমি অবশ্যই বিমুক্ত।’

২০. আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে[২] সেরূপ চিনে যেরূপ চিনে তাদের সন্তানদেরকে। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারাই ঈমান আনবে না[৩]।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ
اَبْنَآءَهُمْ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

---

(১) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্যই ভীতিপ্রদর্শনকারী যার কাছে এ কুরআনের আহ্বান পৌঁছেছে, সে যে-ই হোক না কেন। সুতরাং যার কাছেই এ আহ্বান পৌঁছবে সে তাতে ঈমান আনতে বাধ্য। যদি তা না করে তবে সে হবে জাহান্নামী। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত যে সর্বকাল ও সর্বজনব্যাপী তার প্রমাণ কুরআনের অন্য আয়াতেও এসেছে, “বলুন, ‘হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল” [সূরা আল-আ‘রাফ: ১৫৮] আরও এসেছে, “আর আমরা তো আপনাকে কেবল সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি” [সূরা সাবা:২৮] আরও এসেছে, “কত বরকতময় তিনি ! যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, সৃষ্টিকুলের জন্য সতর্ককারী হতে” [সূরা আল-ফুরকান:১]। আর যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনবে না, তাদের শাস্তি যে জাহান্নাম এ কথাও কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, “অন্যান্য দলের যারা তাতে কুফরী করে, আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান” [সূরা হূদ:১৭] [আদওয়াউল বায়ান]

(২) এর অর্থ, যাদের উপর কিতাব নাযিল করেছি তারা ভালভাবেই জানে যে, ইলাহ মাত্র একজনই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য নবী ও রাসূল। [তাবারী] অনুরূপভাবে তারা এটাও ভাল করে জানে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালত, নবুওয়াত ও ওহীসহ যা নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ যারা তাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ঈমান ও তাওহীদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা‘আলার নেয়ামত থেকে মাহরূম হয়েছে, তারা যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। [সা‘দী]

তৃতীয় রুকূ‘

২১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে বা তাঁর আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয় যালিমরা সাফল্য লাভ করতে পারে না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

২২. আর স্মরণ করুন, যেদিন আমরা তাদের সবাইকে একত্র করব, তারপর যারা শির্ক করেছে তাদেরকে বলব, ‘যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়[১]?’

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. তারপর তাদের এ ছাড়া বলার অন্য কোন অজুহাত থাকবে না, ‘আমাদের রব আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো মুশরিকই ছিলাম না[২]।’

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾

---

(১) এখানে একটি সর্ববৃহৎ পরীক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে যা হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন-এর সামনে অনুষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছে ঐ দিনটিও স্মরণ যোগ্য, যেদিন আমরা সবাইকে অর্থাৎ মুশরিক ও তাদের তৈরী করা উপাস্যসমূহকে একত্রিত করব। অতঃপর আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করব যে, তোমরা যেসব উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় স্বীয় অভাব পূরণকারী ও বিপদ বিদূরণকারী মনে করতে, আজ তারা কোথায়? তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন? হাশরের মাঠে একত্রিত সবাই তখন তারা সে সব উপাস্যদের থেকে নিজদেরকে বিমুক্ত ঘোষণা করবে এবং বলবে, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো মুশরিকই ছিলাম না। এভাবে তারা বাতিল ও মিথ্যা কথা বলবে এবং ওযর-আপত্তি পেশ করতে চেষ্টা করবে। [তাবারী, কুরতুবী, মুয়াসসার, আইসারুত তাফাসীর]

(২) এ আয়াতে তাদের উত্তরকে فِتْنَةٌ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তখন আয়াতের অর্থ হবে, তাদের পরীক্ষায় তারা উপরোক্ত উত্তর দিবে। এ অর্থে তাদের পরীক্ষার উত্তরকেই পরীক্ষা বলা হয়েছে। আবার শব্দটির অন্য অর্থ হতে পারে, তাদের ফিতনার শাস্তি। তখন ফিতনা অর্থ কুফর ও শির্ক। অর্থাৎ তাদের কুফর ও শির্কের শাস্তি তাই হবে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কাতাদা বলেন, এখানে ফিতনা বলে তাদের ওযর আপত্তি পেশ করাকে বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] তাছাড়া ফিতনা শব্দটি কারো প্রতি আসক্ত হয়ে

পড়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থের উদ্দেশ্য এই যে, এরা পৃথিবীতে এসব মূর্তি ও স্বহস্ত নির্মিত উপাস্যদের প্রতি আসক্ত ছিল, স্বীয় অর্থ-সম্পদ এদের জন্যই উৎসর্গ করত। কিন্তু আজ সব ভালবাসা ও আসক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এ ছাড়া তাদের মুখে কোন উত্তর যোগাচ্ছে না। কাজেই তাদের থেকে নির্লিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারই দাবী করে বসল। [বাগভী]

তাদের উত্তরে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কেয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলী এবং রাব্বুল ‘আলামীন-এর শক্তি-সামর্থ্যের অভাবনীয় ঘটনাবলী দেখার পর তারা কোন সাহসে রাব্বুল ‘আলামীন-এর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলবে! তাও এমন বলিষ্ঠ চিত্তে যে, আল্লাহ্‌র মহান সত্তার কসম খেয়ে বলবে যে, আমরা মুশরিক ছিলাম না। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণ এর উত্তরে বলেনঃ তাদের এ উক্তি বিবেক-বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং ভয়ের আতিশয্যে হতবুদ্ধিতার আবেশে মুখে যা এসেছে, তাই বলেছে। কিন্তু হাশরের সাধারণ ঘটনাবলী ও অবস্থা চিন্তা করলে এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্য এ শক্তিও দিয়েছেন যে, তারা পৃথিবীর মত অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে যা ইচ্ছা বলুক- যাতে কুফর ও শির্কের সাথে সাথে তাদের এ দোষটিও হাশরবাসীদের জানা হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা ভাষণে অদ্বিতীয় পটু, এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কুরআনুল কারীমের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফিররা হাশরের মাঠে “আল্লাহ্‌র সাথে শপথ করে মিথ্যা বলবে, যেমন আজ মুসলিমদের সামনে মিথ্যা শপথ করে থাকে” [দেখুন, সূরা আল-মুজাদালাহঃ ১৮] সুতরাং বোঝা গেল যে, তারা স্বয়ং রাব্বুল ‘আলামীন-এর সামনেও মিথ্যা কসম খেতে দ্বিধা করবে না। হাশরের ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নিজ শির্ক ও কুফরী অস্বীকার করবে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের মুখে মোহর এঁটে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হস্ত-পদকে নির্দেশ দিবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, তারা কি করত। তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের হস্ত-পদ, চক্ষু-কর্ণ -এরা সবাই ছিল আল্লাহ্ তা‘আলার গুপ্ত পুলিশ। তারা সব কাজকর্ম একটি একটি করে সামনে তুলে ধরবে। এ সম্পর্কেই সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছেঃ “আমি আজ এদের মুখে মোহর মেরে দেব, এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এদের কৃতকর্মের”। [ইয়াসীনঃ ৬৫] এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোন তথ্য গোপনে ও মিথ্যা ভাষণে দুঃসাহসী হবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ অর্থাৎ “আর তারা আল্লাহ্ হতে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না”। [সূরা আন্-নিসাঃ ৪২] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা-এর মতে এর অর্থ এই যে, প্রথমে তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা শপথ করবে, কিন্তু স্বয়ং তাদের হস্ত-পদ যখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী হবে না। মহা বিচারপতির আদালতে সম্পূর্ণ

মুক্ত পরিবেশে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে। পৃথিবীতে যেভাবে সে মিথ্যা বলত, তখনো তার মিথ্যা বলার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হবে না। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তার মিথ্যার আবরণ স্বয়ং তার হস্তপদের সাক্ষ্য দ্বারা উন্মোচিত করে দেবেন। ফলে তারা কোন কিছুই গোপন করতে সমর্থ হবে না। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

মৃত্যুর পর কবরে মুনকীর-নকীর ফিরিশ্তাদ্বয়ের সামনে প্রথম পরীক্ষা হবে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছেঃ ‘মুনকীর-নকীর যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করবে, مَنْ رَبُّكَ، وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ অর্থাৎ তোমার রব কে, তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? কাফের বলবেঃ هَاهْ هَاهْ لَا أَدرِي অর্থাৎ হায়! হায়!! আমি কিছুই জানি না! এর বিপরীতে মুমিন বলবে, আমার রব আল্লাহ্, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মাদ। [আবু দাউদঃ ৪৭৫৩] এতে বুঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নতুবা কাফেরও মু'মিনের ন্যায় উত্তর দিতে পারতো। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছেন ফিরিশ্তা। তারা অদৃশ্য বিষয় জ্ঞাত নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হলে ফিরিশ্তা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ করতো, ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয়। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা কার্যকরী হবে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সাথে হাশরের মাঠের সাক্ষাতে বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিনি? তোমাকে নেতা বানাইনি? তোমাকে বিয়ে-শাদী দেইনি? তোমার জন্য ঘোড়া উট করায়ত্ত্ব করে দেইনি? তোমাকে নেতৃত্ব দিতে ও আরামে ঘুরতে ফিরতে দেইনি। তখন সে বলবে, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি বিশ্বাস করতে যে, আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে? সে বলবে, না। তখন তিনি বলবেন, আজ আমি তোমাকে ছেড়ে যাব যেমন তুমি আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে অনুরূপ করবেন, সেও তা বলবে আর আল্লাহ্ তা'আলাও তদ্রূপ উত্তর করবেন। তারপর তৃতীয় ব্যক্তিকে অনুরূপ বলবেন, সে বলবে, হে রব! আমি আপনার উপর, আপনার কিতাবের উপর ও আপনার রাসূলের উপর ঈমান এনেছিলাম, সালাত ও রোযা আদায় করেছিলাম, দান করেছিলাম এবং যত পারে প্রশংসা করবে। তখন তাকে বলা হবে এখানে তাহলে (অপেক্ষা কর)। তারপর তাকে বলা হবে, এখন তোমার উপর সাক্ষ্য উত্থাপন করা হবে। সে তখন তার মনে চিন্তা করবে, সেটা আবার কে যে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে? তখন তার মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে, আর তার উরু, মাংস ও অস্থিকে কথা বলতে নির্দেশ দেয়া হবে, ফলে তার উরু, মাংস ও অস্থি তার আমল সম্পর্কে বলবে ... [মুসলিমঃ ২৯৬৮]

কোন কোন মুফাস্সিরের মতে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে মিথ্যা শির্ককে অস্বীকার

২৪. দেখুন, তারা নিজেদের প্রতি কিরূপ মিথ্যাচার করে এবং যে মিথ্যা তারা রটনা করত তা কিভাবে তাদের থেকে উধাও হয়ে গেল[১]।

أُنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

করবে, তারা হলো সেসব লোক, যারা কোন সৃষ্টজীবকে খোলাখুলি আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি না বলেও আল্লাহ্‌র সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবে বন্টন করে দিয়েছিল। তারা নিজেদেরকে মুশরিক মনে করতো না। তাই হাশরের ময়দানেও কসম খেয়ে বলবে যে, তারা মুশরিক ছিল না। [ফাতহুল কাদীর] কিন্তু কসম খাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

(১) এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলা হয়েছে যে, দেখুন, তারা নিজেদের বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলছে; আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যাদেরকে মিছেমিছি শরীক তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই পতিত হবে। মনগড়া তৈরী করার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করার ব্যাপারটি ছিল মিছামিছি (শরীক) ও মনগড়া। আজ বাস্তব সত্য সামনে এসে যাওয়ায় এ মিথ্যা অকেজো হয়ে গেছে। মনগড়া তৈরীর অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা হাশরের ময়দানে উচ্চারণ করবে। অতঃপর হস্তপদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। কোন কোন মুফাস্‌সির বলেছেনঃ মনগড়া তৈরী করা বলতে মুশরিকদের ঐ সব অপব্যাখ্যাকে বুঝানো হয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে মনে করত। উদাহরণতঃ তারা বলতো ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾ অর্থাৎ আমরা উপাস্য মনে করে মূর্তির উপাসনা করি না, বরং উপাসনা করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করে আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেবে। হাশরে তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময় কেউ তাদের সুপারিশ করবে না।

উভয় আয়াতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হাশরের ভয়াবহ ময়দানে মুশরিকদেরকে যা ইচ্ছা বলার স্বাধীনতা দানের মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস এমন খারাপ অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন। সুতরাং যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কসম খেত, তারা এখানেও তা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ফলে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সামনে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে মিথ্যা বলার নিন্দা জোরালো ভাষায় করা হয়েছে। কুরআনের স্থানে স্থানে মিথ্যাবাদীদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপাচারের দোসর। মিথ্যা ও পাপাচার উভয়ই জাহান্নামে যাবে। [ইবনে হাব্বান: ৫৭৩৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ‘যে কাজের দরুন মানুষ জাহান্নামে যাবে, তা কি?’ তিনি বললেনঃ ‘সে কাজ হচ্ছে

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوهُ وَفِيٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتّٰىٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আপনার প্রতি কান পেতে শুনে, কিন্তু আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ করে দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে; আর আমরা তাদের কানে বধিরতা তৈরী করেছি[১]। আর যদি সমস্ত আয়াতও তারা প্রত্যক্ষ করে তবুও তারা তাতে ঈমান আনবে না। এমনকি তারা যখন আপনার কাছে উপস্থিত হয়, তখন তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'এটাতো আগেকার দিনের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।'

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُّهْلِكُونَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর তারা অন্যকে এগুলো শুনা থেকে বিরত রাখে এবং নিজেরাও এগুলো শুনা থেকে দূরে থাকে। আর তারা নিজেরাই শুধু নিজেদেরকে ধ্বংস করে, অথচ তারা উপলব্ধি করে না[২]।

মিথ্যা'। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৭৬] অনুরূপভাবে, মে'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কার্যধারা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তিনি জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'এ ব্যক্তি কে?' জিবরাঈল বললেনঃ 'এ হলো মিথ্যাবাদী'। [বুখারী: ১৩৮৬; মুসনাদে আহমাদ: ৫/১৪]

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে কুরাইশদের কথা বলা হচ্ছে, তারাই কান পেতে শুনত। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদাহ বলেন, মুশরিকরা তাদের কান দিয়ে শুনত কিন্তু সেটা তারা বুঝতো না। তারা জন্তু-জানোয়ারদের মতো, যারা কেবল হাঁক-ডাকই শুনতে পায়। তাদেরকে কি বলা হচ্ছে সেটা জানে না। [তাফসীর আবদির রাযযাক]

(২) দাহ্‌হাক, কাতাদাহ্, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমূখ মুফাস্‌সিরগণের মতে এ আয়াত মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা কুরআন শুনতে ও অনুসরণ করতে লোকদেরকে বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে

২৭. আপনি যদি দেখতে পেতেন[১] যখন তাদেরকে আগুনের উপর দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবে, 'হায়! যদি আমাদেরকে ফেরত পাঠানো হত, আর আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ না করতাম এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম[২]।'

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. বরং আগে তারা যা গোপন করত তা এখন তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। আর তাদের আবার (দুনিয়ায়) ফেরৎ পাঠানো হলেও তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ﴿٢٨﴾

থাকত। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবু তালেব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তিনি তাকে কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কুরআনে বিশ্বাস করতেন না। এমতাবস্থায় عنه শব্দের সর্বনামটির অর্থ কুরআনের পরিবর্তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হবেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩১৫]

(১) ইসলামের তিনটি মৌলনীতি রয়েছে- (এক) একত্ববাদ (দুই) রেসালাত ও (তিন) আখেরাতে বিশ্বাস। [তাফসীর মানার: ৯/৩৯] অবশিষ্ট সমস্ত বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে আখেরাত ও আখেরাতের প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস কার্যতঃ এমন একটি বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি একটি বিশেষ দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ কারণেই কুরআনুল কারীমের সব বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে আখেরাতের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি, অশেষ সওয়াব এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

(২) এ আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, আখেরাতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে এবং তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা আকাঙ্খা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস, আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলে আমরা রব-এর প্রেরিত নিদর্শনাবলী ও নির্দেশাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না, বরং এগুলো বিশ্বাস করে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। [মুয়াসসার]

হয়েছিল আবার তারা তাই করত এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী(১) ।

وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝٢٩

২৯. আর তারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমাদেরকে পুনরুত্থিতও করা হবে না(২) ।'

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝٣٠

৩০. আর আপনি যদি দেখতে পেতেন, যখন তাদেরকে তাদের রব-এর সম্মুখে দাঁড় করান হবে; তিনি বলবেন, 'এটা কি প্রকৃত সত্য নয়?' তারা বলবে, 'আমাদের রব-এর শপথ! নিশ্চয়ই সত্য' । তিনি বলবেন, 'তবে তোমরা যে কুফরী করতে তার জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর ।'

---

(১) তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে । অর্থাৎ তারা ওয়াদা করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করবো না, এর পরিণতি কিন্তু এরূপ হবে না; তারা দুনিয়াতে পৌঁছে আবারো মিথ্যারোপ করবে । [ইবন কাসীর] আবার এ মিথ্যা বলার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা এখনো যা কিছু বলছে, তা সদিচ্ছায় বলছে না, বরং সাময়িক বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাঁচার জন্যে বলছে- অন্তরে এখনো তাদের সদিচ্ছা নেই । [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে পৌঁছে এ কথাই বলবে যে, আমরা এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন মানি না; এ জীবনই একমাত্র জীবন । আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না । [ইবন কাসীর] মোট কথাঃ কাফের ও পাপীরা হাশরের ময়দানে প্রাণ রক্ষার্থে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নানা ধরণের কথাবার্তা বলবে । কখনো মিথ্যা কসম খাবে, কখনো দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরিত হওয়ার আকাঙ্খা করবে । এতে ফুটে উঠল যে, পার্থিব জীবন অনেক বড় নেয়ামত এবং অত্যন্ত মূল্যবান বিষয় । যদি তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় । তাই ইসলামে আত্মহত্যা হারাম এবং মৃত্যুর জন্য দো'আ ও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ । কারণ এতে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিরাট নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় । সারকথা এই যে, দুনিয়াতে যে বস্তুটি প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং যা সর্বাধিক মূল্যবান ও প্রিয়, তা হচ্ছে মানুষের জীবন । এ কথাও সবার জানা যে, মানুষের জীবনের একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডি রয়েছে কিন্তু তার সঠিক সীমা কারো জানা নেই যে, তা সত্তর বছর হবে, না সত্তর ঘন্টা হবে, না একটি শ্বাস ছাড়ারও সময় পাওয়া যাবে না । সুতরাং দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের জন্য সঠিকভাবে কাজে লাগানো উচিত ।

চতুর্থ রুকূ‘

৩১. যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে[১], এমনকি হঠাৎ তাদের কাছে যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে[২] তখন তারা বলবে, ‘হায়! এটাকে আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্য আক্ষেপ ।’ আর তারা তাদের পিঠে নিজেদের পাপ বহন করবে । সাবধান, তারা যা বহন করবে তা খুবই নিকৃষ্ট!

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاۤءِ اللّٰهِ ۗ حَتّٰۤى اِذَا جَاۤءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَاۤءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২. আর দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই উত্তম; অতএব, তোমরা কি অনুধাবন কর না?

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আমরা অবশ্য জানি যে, তারা যা বলে তা আপনাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়;

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ

---

(১) যে সমস্ত কাফের মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান হওয়াকে অস্বীকার করেছে, তারা যখন কিয়ামতকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে দেখতে পাবে, আর তাদের খারাপ পরিণতি তাদেরকে ঘিরে ধরবে, তখন তারা নিজেদের দুনিয়ার জীবনকে হেলায় নষ্ট করার জন্য আফসোস করতে থাকবে । আর তারা তখন তাদের পিঠে গোনাহের বোঝা বহন করতে থাকবে । তাদের এ বোঝা কতই না নিকৃষ্ট! [মুয়াসসার] এ আফসোসের কারণ সম্পর্কে এক হাদীসে আরও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘জাহান্নামীরা জান্নাতে তাদের জন্য যে স্থান ছিল সেটা দেখতে পাবে এবং সে জন্য হায় আফসোস! বলতে থাকবে ।’ [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) কিয়ামত হঠাৎ করেই হবে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কিয়ামত এমনভাবে সংঘটিত হবে যে, দু’জন লোক কোন কাপড় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রসারিত করেছে, সেটাকে তারা আবার মোড়ানোর সময় পাবে না । কিয়ামত এমনভাবে হবে যে, একজন তার জলাধার ঠিক করছে কিন্তু সেটা থেকে পানি পান করার সময় পাবে না । কিয়ামত এমনভাবে হবে যে, তোমাদের কেউ তার গ্রাসটি মুখের দিকে নেওয়ার জন্য উঠিয়েছে কিন্তু সে সেটা খেতে সময় পাবে না ।’ [বুখারী: ৬৫০৬; মুসলিম: ২৯৫৪]

لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾

কিন্তু তারা আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না, বরং যালিমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে(১)।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর আপনার আগেও অনেক রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করা হয়েছিল; কিন্তু তাদের উপর মিথ্যারোপ করা ও কষ্ট দেয়ার পরও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, যে পর্যন্ত না আমাদের সাহায্য তাদের কাছে এসেছে(২)। আর আল্লাহ্‌র বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই। আর অবশ্যই রাসূলগণের কিছু সংবাদ আপনার কাছে এসেছে।

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর যদি তাদের উপেক্ষা আপনার কাছে কষ্টকর হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ বা আকাশে সিঁড়ি খোঁজ করুন এবং তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আসুন। আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদের সবাইকে অবশ্যই সৎপথে একত্র করতেন। কাজেই আপনি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

---

(১) অর্থাৎ কাফেররা প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না, বরং আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতিই মিথ্যারোপ করে। অর্থাৎ কাফেররা আপনাকে নয়- আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কাফেররা বাহ্যতঃ যদিও আপনাকে মিথ্যা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে ও তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলা। কাতাদা বলেন, অর্থাৎ তারা জানে যে আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল কিন্তু তারা ইচ্ছা করে সেটাকে অস্বীকার করছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) কাতাদা বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং তাকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, আপনার পূর্বেও অনেক নবী-রাসূলকে অনুরূপ মিথ্যারোপের শিকার হতে হয়েছিল কিন্তু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। তাই আপনিও ধৈর্য ধারণ করুন। [তাবারী]

৩৬. যারা শুনতে পায় শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতদেরকে আল্লাহ্ আবার জীবিত করবেন[১]; তারপর তাঁর দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. আর তারা বলে, 'তার রব-এর কাছ থেকে তার উপর কোন নিদর্শন আসে না কেন?' বলুন, 'নিদর্শন নাযিল করতে আল্লাহ্ অবশ্যই সক্ষম,' কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না[২]।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ আয়াতে মৃত বলে কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে। অন্য আয়াতেও সেটা আমরা দেখতে পাই। যেমন, "যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমরা পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে" [সূরা আল-আন'আম: ১২২] "এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে শোনান; আর আপনি শোনাতে পারবেন না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে" [সূরা ফাতের: ২২] [আদওয়াউল বায়ান; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) মুশরিকরা এমন কোন অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল, যা দেখার পর তারা ঈমান আনবে বলে ওয়াদা করছে। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে এটাই ঘোষণা করছেন যে, তাদের চাহিদা মোতাবেক নিদর্শন দেখানো আল্লাহ্‌র পক্ষে অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু তারা প্রকৃত অবস্থা জানে না। অন্য আয়াতে তারা কি জানে না সেটাও ব্যক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, যদি তাদের কথামত নিদর্শন দেয়ার পর তারা ঈমান না আনে, তবে আল্লাহ্‌র শাস্তির পথে আর কোন বাধা থাকবে না। যেমনটি সালিহ্ আলাইহিস সালামের জাতির বেলায় ঘটেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর পূর্ববর্তিগণের নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাদেরকে নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত রাখে। আমরা শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ সামূদ জাতিকে উট দিয়েছিলাম, তারপর তারা এর প্রতি যুলুম করেছিল। আমরা শুধু ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শন পাঠিয়ে থাকি" [সূরা আল-ইসরা: ৫৯] অন্য আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, কুরআন নাযিল করার পর আর কোন নিদর্শনের প্রয়োজন নেই বিধায় তিনি তা নাযিল করেন না। "এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ঈমান আনে।" [সূরা আল-আনকাবূত:৫১] সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কুরআনই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মু'জিযা বা নিদর্শন। [আদওয়াউল বায়ান]

৩৮. আর যমীনে বিচরণশীল প্রতিটি জীব বা দু’ডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মত এক একটি উম্মত। এ কিতাবে[১] আমরা কোন কিছুই বাদ দেইনি; তারপর তাদেরকে তাদের রব-এর দিকে একত্র করা হবে[২]।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, তারা বধির ও বোবা, অন্ধকারে রয়েছে[৩]। যাকে ইচ্ছে আল্লাহ্ বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি সরল পথে স্থাপন করেন।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ ۗ مَنْ يَّشَإِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ۗ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٩﴾

---

(১) এখানে কিতাব বলে, লাওহে মাহফুজের লেখা বোঝানো হয়েছে। তাতে সবকিছুই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে [তাবারী]

(২) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কেয়ামতের দিন মানুষের সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকেও জীবিত করা হবে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ‘কেয়ামতের দিন তোমরা সব হক আদায় করবে, এমনকি (আল্লাহ্ তা‘আলা এমন সুবিচার করবেন যে,) কোন শিং বিশিষ্ট জন্তু কোন শিংবিহীন জন্তুকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকলে এ দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নেয়া হবে’। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৬২] এমনিভাবে ‘অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের প্রতিশোধও নেয়া হবে’। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৬২] অন্য হাদীসে এসেছে, যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়া সমাপ্ত হবে, তখন আদেশ হবেঃ ‘তোমরা সব মাটি হয়ে যাও’। সব পক্ষীকুল ও জন্তু-জানোয়ার তৎক্ষণাৎ মাটির স্তূপে পরিণত হবে। এ সময়ই কাফেররা আক্ষেপ করে বলবেঃ ﴿يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا﴾ অর্থাৎ “আফসোস আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম” এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেতাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘(কেয়ামতের দিন) সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে, এমনকি, শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে নেয়া হবে’। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৬৩, ৫/১৭২-১৭৩; মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৪৫; ৪/৬১৯]

(৩) কাতাদা বলেন, এটি কাফেরদের জন্য দেয়া উদাহরণ, তারা অন্ধ ও বধির। তারা হেদায়াতের পথ দেখে না। হেদায়াত থেকে উপকৃত হতে পারে না। হক থেকে তারা বধির। এমন অন্ধকারে তারা অবস্থান করছে যে, সেখান থেকে বের হওয়ার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। [তাবারী]

৪০. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হয় বা তোমাদের কাছে কিয়ামত উপস্থিত হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. 'না, তোমরা শুধু তাঁকেই ডাকবে, তোমরা যে দুঃখের জন্য তাঁকে ডাকছ তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের সে দুঃখ দুর করবেন এবং যাকে তোমরা তাঁর শরীক করতে তা তোমরা ভুলে যাবে।

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

পঞ্চম রুকু'

৪২. আর অবশ্যই আপনার আগে আমরা বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদেরকে অর্থসংকট ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করেছি[১],

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾

(১) এ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলী এবং তাদের উপর প্রয়োগকৃত বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেছি। দু'ভাবে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কষ্টে ফেলে দেখা হয়েছে যে, কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে কি না। তারা যখন এ পরীক্ষায় ফেল করল এবং আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করার পরিবর্তে তাতে আরো বেশী লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া হল। অর্থাৎ তাদের জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব দ্বার খুলে দেয়া হল এবং পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সবকিছুই তাদেরকে দান করা হল। আশা ছিল যে, তারা এসব নেয়ামত দেখে নেয়ামতদাতাকে চিনবে এবং এভাবে তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। কিন্তু এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হল। নেয়ামতদাতাকে চেনা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা ভোগ-বিলাসের মোহে এমন মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের বাণী এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর যখন তাদের ওযর-আপত্তির আর কোন ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা অকস্মাৎ তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং এমনভাবে নাস্তানাবুদ করে দিলেন যে, বংশে বাতি জ্বালাবারও কেউ অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর এ আযাব জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে

যাতে তারা অনুনয় বিনয় করে[১]।

৪৩. সুতরাং যখন আমাদের শাস্তি তাদের উপর আপতিত হল, তখন তারা কেন বিনীত হল না? কিন্তু তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।

فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ করা হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমরা তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লসিত হল তখন হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হল[২]।

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾

ধ্বংস করে দিয়েছে। নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর গোটা জাতিকে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের শৃঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি। আদ জাতির উপর দিয়ে উপর্যপুরি আট দিন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি। সামূদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়। লূত 'আলাইহিস্ সালাম-এর কওমের সম্পূর্ণ বস্তি উল্টে দেয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভূতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান। এ জলাশয়ে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি জীব-জন্তুও জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'বাহ্‌র মাইয়্যেত' বা 'মৃত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। মোটকথা, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আযাবের আকারে নাযিল হয়েছে, যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। কোন সময় তারা বাহ্যতঃ স্বাভাবিকভাবে মারা গেছে এবং পরবর্তীতে তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।

(১) অর্থাৎ আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শাস্তি দান নয়, বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়। সুতরাং কষ্ট ও বিপদাপদের মাধ্যমে তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে ধাবিত করাই উদ্দেশ্য। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ তাদের জন্য দুনিয়ার নেয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেয়া হয়। এতে সাধারণ মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে আছে এবং সফল জীবন

৪৫. ফলে যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌র জন্যই[১]।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. বলুন, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর করে দেন তবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ্ আছে যে তোমাদের এগুলো ফিরিয়ে দেবে?' দেখুন, আমরা কিরূপে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ্‌র শাস্তি হঠাৎ বা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হলে যালিম সম্প্রদায় ছাড়া আর কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?'

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর আমরা রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি। অতঃপর যারা ঈমান আনবে ও নিজেকে সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۖ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

যাপন করছে। অনেক সময় আযাবে পতিত অবাধ্য জাতিসমূহেরও এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে অকস্মাৎ কঠোর আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার ধন-দৌলত প্রদান করছেন, অথচ সে গোনাহ্ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে, তাকে ঢিল দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৪৫]

(১) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরাধী ও অত্যাচারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্য একটি নেয়ামত। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কারণ তিনি তাঁর বন্ধুদের সাহায্য করেছেন এবং তাঁর শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। [মুয়াসসার]

৪৯. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, তাদেরকে স্পর্শ করবে আযাব, কারণ তারা নাফরমানী করত।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝٤٩

৫০. বলুন, ‘আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারসমূহ আছে, আর আমি গায়েবও জানি না এবং তোমাদেরকে এও বলি না যে, আমি ফিরিশ্‌তা, আমার প্রতি যা ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি।’ বলুন, ‘অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে?’ তোমরা কি চিন্তা কর না?

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝٥٠

ষষ্ঠ রুকূ‘

৫১. আর আপনি এর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করুন, যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রব-এর কাছে সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ছাড়া তাদের জন্য থাকবে না কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী। যাতে তারা তাকওয়ার অধিকারী হয়[১]।

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝٥١

৫২. আর যারা তাদের রবকে ভোরে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করবেন না[২]। তাদের কাজের জবাবদিহিতার

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ

(১) যারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, “যারা আল্লাহ্‌র কাছে একত্রিত হওয়ার আশংকা করে, তাদেরকে কুরআন দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করুন”। কারণ, তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে। [সা’দী]

(২) সা’দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ আমরা ছয়জন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমনসময় কতিপয় কুরাইশ

مِّن شَىۡءٍ فَتَطۡرُدَهُمۡ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥٢

দায়িত্ব আপনার উপর নেই এবং আপনার কোন কাজের জবাবদিহিতার দায়িত্ব তাদের উপর নেই, যে আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন; করলে আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعۡضَهُم بِبَعۡضٍ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنۢ بَيۡنِنَآۗ أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَعۡلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ ٥٣

৫৩. আর এভাবেই আমরা তাদের কাউকে অপর কারও দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা বলে, 'আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন?' আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত নন?

وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلۡ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡۖ كَتَبَ رَبُّكُمۡ عَلَىٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمَةَ أَنَّهُۥ مَنۡ عَمِلَ مِنكُمۡ سُوٓءَۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٤

৫৪. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান আনে, তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন তাদেরকে আপনি বলুন, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক', তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর দয়া

সর্দার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, তুমি এদের তাড়িয়ে দাও, যাতে তারা আমাদের উপর কথা বলতে সাহস না পায়। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমি ছিলাম, ইবন মাসউদ ছিলেন, হুযাইলের এক লোক ছিলেন, বিলাল ছিল, আরও দু'জন লোক ছিল যাদের নাম উল্লেখ করব না। তখন রাসূলের মনে এ ব্যাপারে আল্লাহ্ যা উদয় করার তার কিছু উদয় হয়েছিল, তিনি মনে মনে কিছু বলে থাকবেন, তখনি আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। [মুসলিম: ২৪১৩] এতে উল্লেখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে।
উল্লেখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বুঝা যায় যে, কারো ছিন্নবস্ত্র কিংবা বাহ্যিক দূরবস্থা দেখে তাকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করার অধিকার কারো নেই। প্রায়ই এ ধরণের পোষাকে এমন লোকও থাকেন, যারা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'অনেক দুর্দশাগ্রস্ত, ধূলি-ধূসরিত লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র প্রিয়, তারা যদি কোন কাজের আব্দার করে বসেন, 'এরূপ হবে' তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে আব্দার অবশ্যই পূর্ণ করেন'। [তিরমিযী: ৩৮৫৪] অনুরূপভাবে, শুধু পার্থিব ধন-দৌলতকে শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা নীচতার মাপকাঠি মনে করা মানবতার অবমাননা। বরং এর প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম।

লিখে নিয়েছেন[১]। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত[২] যদি খারাপ

(১) এ বাক্যে উপরোল্লেখিত অনুগ্রহের উপর আরো অনুগ্রহ ও নেয়ামত দানের ওয়াদা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মুসলিমদেরকে বলে দিনঃ তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। কাজেই খুব ভীত ও অস্থির হয়ো না। এ বাক্যে প্রথমতঃ رب বা প্রতিপালক শব্দ ব্যবহার করে আয়াতের বিষয়বস্তুকে যুক্তিযুক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতিপালক। এখন জানা কথা যে, কোন প্রতিপালক স্বীয় পালিতদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না। অতঃপর رب শব্দটি যে দয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, তা পরিস্কারভাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাও এমন ভঙ্গিতে যে, তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। কাজেই কোন ভাল ও সৎ লোকের দ্বারাই যখন ওয়াদা খেলাফী হতে পারে না, তখন রাব্বুল 'আলামীন-এর দ্বারা তা কিভাবে হতে পারে? বিশেষ করে যখন ওয়াদাটি চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করে নেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যখন আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকের ভাগ্যের ফয়সালা করলেন, তখন একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে 'আর্‌শে রেখে দিলেন। তাতে লেখা আছে, আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়ে গেছে'। [বুখারীঃ ৭৪০৪, মুসলিমঃ ২১০৭, ২১০৮]

(২) আয়াতে অজ্ঞতা শব্দ দ্বারা বাহ্যতঃ কেউ ধারণা করতে পারে যে, গোনাহ্ ক্ষমা করার ওয়াদা একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অজ্ঞতাবশতঃ কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, জেনেশুনে গোনাহ্ করলে হয়ত এ ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা, এ স্থলে 'অজ্ঞতা' বলে অজ্ঞতার কাজ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এমন কাজ করে বসে, যা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ বা মূর্খ ব্যক্তিই করে। এর জন্যে বাস্তবে অজ্ঞ হওয়া জরুরী নয়। অর্থাৎ جهالت শব্দটি বাকপদ্ধতিতে কার্যগত অজ্ঞতার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই কোন কোন আলেম বলেন, যে কেউ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে সে তা 'জাহালাত' বশতঃই তা করে। [ইবন কাসীর] চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যখনই কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, তা কার্যগত অজ্ঞতার কারণেই হয়। এখানে কার্যগত অজ্ঞতাই বুঝানো হয়েছে। এর জন্য অজ্ঞান হওয়া জরুরী নয়। কেননা, কুরআনুল কারীম ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাওবা দ্বারা প্রত্যেক গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়- অমনোযোগিতা ও অজ্ঞতাবশতঃ হোক কিংবা জেনেশুনে মানসিক দূর্মতি ও প্রবৃত্তির তাড়নাবশতঃ হোক।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে দু'টি শর্তাধীনে গোনাহ্‌গারদের সম্পর্কে ক্ষমা ও রহমতের ওয়াদা করা হয়েছে- (এক) তাওবা অর্থাৎ গোনাহ্‌র জন্য অনুতপ্ত হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে, অনুশোচনার নামই হলো তাওবা। [ইবন মাজাহ: ৪২৫২; মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৭৬] (দুই) ভবিষ্যতের জন্য আমল

কাজ করে, তারপর তওবা করে এবং সংশোধন করে, তবে নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. আর এভাবে আমরা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আর যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

সপ্তম রুকূ‘

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. বলুন, ‘তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাক, তাদের ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।’ বলুন, ‘আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না; করলে আমি বিপথগামী হব এবং সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।’

قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. বলুন, ‘নিশ্চয় আমি আমার রব-এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা এতে মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও তা আমার

সংশোধন করা। কয়েকটি বিষয় এ আমল সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে এ পাপ কাজের নিকটবর্তী না হওয়ার সংকল্প করা ও সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং কৃত গোনাহ্‌র কারণে কারো অধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে যথাসম্ভব তা পরিশোধ করা, তা আল্লাহ্‌র অধিকার হোক কিংবা বান্দার অধিকার। [সা‘দী] আল্লাহ্‌র অধিকার যেমন, সালাত, সওম, যাকাত, হজ ইত্যাদি ফরয কর্মে ত্রুটি করা। আর বান্দার অধিকার- যেমন, কারো অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে করায়ত্ত করা ও ভোগ করা, কারো ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করা, কাউকে গালি-গালাজের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি।

(১) আর তিনি অত্যন্ত দয়ালু। অর্থাৎ ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হবেন না, বরং নেয়ামতও দান করবেন। এ জন্যই ক্ষমা গুণের সাথে রহমত গুণটিও উল্লেখ করা হয়েছে। বান্দা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে যতটুকু এগিয়ে আসবে তিনি তাঁর ক্ষমা ও রহমত দিয়ে বান্দাকে ততটুকু ঢেকে দিবেন। [সা‘দী]

কাছে নেই। হুকুম কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই, তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।'

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِیَ الْاَمْرُ بَیْنِیْ وَبَیْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِیْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. বলুন, 'তোমরা যা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও তা যদি আমার কাছে থাকত, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে তো ফয়সালা হয়েই যেত। আর আল্লাহ্ যালিমদের ব্যাপারে অধিক অবগত।'

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَیَعْلَمُ مَا فِی

৫৯. আর[১] গায়েবের চাবি[২] তাঁরই

(১) আলোচ্য ৫৯ থেকে ৬১ নং আয়াতসমূহে তাওহীদের মৌলিক দিকের পথনির্দেশ রয়েছে। সারা বিশ্বে যত ধর্ম প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে দ্বীন ইসলামের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ও প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে একত্ববাদে বিশ্বাস। শুধু আল্লাহ্‌র সত্তাকে এক ও অদ্বিতীয় জানার নামই একত্ববাদ নয়, বরং পূর্ণত্বের যত গুণ আছে সবগুলোতেই তাঁকে একক ও অদ্বিতীয় মনে করা, তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুকে এসব গুণে অংশীদার ও সমতুল্য মনে না করা এবং তিনি ব্যতীত আর কারো 'ইবাদাত না করাকে একত্ববাদ বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে হচ্ছে জীবন, শক্তি-সামর্থ্য, শ্রবণ, দর্শন, বাসনা, ইচ্ছা, সৃষ্টি, অন্নদান, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি। তিনি এসব গুণে এমন পরিপূর্ণ যে, কোন সৃষ্টজীব কোন গুণে তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। এসব গুণের মধ্যেও দু'টি গুণ সব চাইতে বিখ্যাত। (এক) জ্ঞান এবং (দুই) শক্তি-সামর্থ্য। তাঁর জ্ঞান বিদ্যমান-অবিদ্যমান, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ছোট-বড়, অণু-পরমাণু সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত এবং তাঁর শক্তি-সামর্থ্যও সবকিছুতেই পরিবেষ্টিত। [দেখুন, আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস; ৪৫৮-৪৯০ ও ৮৮৭-৯৮৯] যে ব্যক্তি এ আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও শক্তি এ দু'টি গুণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং চিন্তায় উপস্থিত রাখে, তার পক্ষে গোনাহ্ ও অপরাধ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বলাবাহুল্য, কথায় কাজে, উঠায়-বসায় এমনকি প্রতি পদক্ষেপে যদি কারো চিন্তায় এ কথা উপস্থিত থাকে যে, একজন সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান তাকে দেখছেন এবং তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ও মনের ইচ্ছা-কল্পনা পর্যন্ত জানেন তবে এ উপস্থিতি কখনো তাকে সর্ব শক্তিমানের অবাধ্যতার দিকে পা বাড়াতে দিবে না।

(২) مفاتح শব্দটি বহুবচন। এর একবচনে مفتاح ও مفتح উভয়টিই হতে পারে। مفتح এর অর্থ ভাণ্ডার এবং مفتاح এর অর্থ চাবি- আয়াতে উভয় অর্থ হওয়ারই অবকাশ আছে। তাই কোন কোন তাফসীরবিদ ও অনুবাদক مفاتح এর অনুবাদ করেছেন ভাণ্ডার,

ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى
ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ
مُّبِينٍ ٥٩

কাছে রয়েছে[১], তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত রয়েছেন, তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم
بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٦٠

৬০. তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যা কামাই কর তা তিনি জানেন। তারপর দিনে তোমাদেরকে তিনি আবার জীবিত করেন, যাতে নির্ধারিত সময় পূর্ণ করা হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

আবার কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন চাবি। উভয় অনুবাদের সারকথা এক। কেননা, ‘চাবির মালিক’ বলেও ‘ভাণ্ডারের মালিক’ বোঝানো যায়। [ফাতহুল কাদীর]

(১) কুরআনের পরিভাষায় গায়েবের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলার। উদাহারণতঃ কে কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে, কতটুকু বয়স পাবে, কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে কতটুকু রিয্‌ক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন, কোথায়, কি পরিমাণ হবে, অনুরূপভাবে স্ত্রী লোকের গর্ভাশয়ে যে ভ্রূণ অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু কারো জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশ্রী না কুশ্রী, সৎস্বভাব না বদস্বভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ যা সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি সীমা থেকে উহ্য রয়েছে। সুতরাং ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ﴾ এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে, গায়েবী বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ করায়ত্ত ও মালিকানায় থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, গায়েবী বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা অর্থাৎ কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে- তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত। কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ “প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছেই রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে নাযিল করি”। [সূরা আল-হিজরঃ ২১]

অষ্টম রুকূ'

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّٰىٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾

৬১. আর তিনি তাঁর বান্দাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকারী এবং তিনি তোমাদের উপর প্রেরণ করেন হেফাযতকারীদেরকে। অবশেষে তোমাদের কারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমাদের রাসূল (ফিরিশ্‌তা) গণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোন ত্রুটি করে না।

ثُمَّ رُدُّوٓا إِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحٰسِبِينَ ﴿٦٢﴾

৬২. তারপর তাদেরকে প্রকৃত রব আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে। জেনে রাখুন, হুকুম তো তাঁরই এবং তিনি সবচেয়ে দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَّئِنْ أَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشّٰكِرِينَ ﴿٦٣﴾

৬৩. বলুন, 'কে তোমাদেরকে নাজাত দেন স্থলভাগের ও সাগরের অন্ধকার থেকে? যখন তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁকে ডাক যে, আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. বলুন, 'আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে তা থেকে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে নাজাত দেন। এরপরও তোমরা শির্ক কর[১]।'

---

(১) এখানে ৬৩ ও ৬৪ নং আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে হুশিয়ার ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্দেশ দিয়ে বলছেন যে, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য দেব-দেবীকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌কে আহ্বান কর, কখনো প্রকাশ্যে বিনীতভাবে এবং কখনো মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। এর সাথে সাথে তোমরা এরূপ ওয়াদাও কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদেরকে

৬৫. বলুন[১], ‘তোমাদের উপর[২] বা | قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ

এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করব, তাঁকেই কার্যনিবাহী মনে করব, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করব না । কেননা বিপদেই যখন কাজে আসে না, তখন তাদের পূজাপাট আমরা কেন করবো? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতাবস্থায় কে তোমাদেরকে বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে? উত্তর নির্দিষ্ট ও জানা । কেননা, তারা এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন দেব-দেবী, পীর, ফকীর, ওলী প্রভৃতি এ অবস্থায় তাদের কাজে আসেনি । তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আদেশ দিয়েছেন যে, আপনিই বলে দিন, একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলাই তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন, বরং অন্যান্য সব কষ্ট-বিপদ থেকে তিনি উদ্ধার করবেন । কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও যখন তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শির্কে লিপ্ত হয়ে পড় । এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মূর্খতা!

সারকথা, কুরআন বর্ণিত প্রতিকারের প্রতি মানুষের দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলা-কৌশলকেও তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত হিসেবে ব্যবহার করা । এছাড়া নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই । প্রত্যেক মানুষের বিপদাপদ একমাত্র তিনিই দূর করতে পারেন এবং বিপদের মুহূর্তে যে তাঁকে আহ্বান করে, সে তাঁর সাহায্য স্বচক্ষে দেখতে পায় । কেননা, সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর তাঁর শক্তি-সামর্থ্য পরিপূর্ণ এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়াও অসাধারণ । তিনি ছাড়া অন্য কারো এরূপ শক্তি-সামর্থ্য নেই এবং সমগ্র সৃষ্টির প্রতিও এরূপ দয়া-মমতা নেই ।

(১) এখানে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা যেকোন আযাব ও যেকোন বিপদ দূর করতে যেমন সক্ষম, তেমনিভাবে তিনি যখন কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে চান, তখন যেকোন শাস্তি দেয়াও তাঁর পক্ষে সহজ । কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্য দুনিয়ার শাসনকর্তাদের ন্যায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দরকার হয় না এবং কোন সাহায্যকারীরও প্রয়োজন হয় না । বলা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা‘আলা এ বিষয়েও শক্তিমান যে, তোমাদের প্রতি উপরদিক থেকে কিংবা পদতল থেকে কোন শাস্তি পাঠিয়ে দেবেন কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি করে দেবেন এবং এক কে অপরের হাতে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন । মূলত: আল্লাহ্‌র শাস্তি তিন প্রকারঃ (এক) যা উপর দিক থেকে আসে, (দুই) যা নিচের দিক থেকে আসে এবং (তিন) যা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের আকারে সৃষ্টি হয় । এ সব প্রকার আযাব দিতে আল্লাহ্ তা‘আলা সক্ষম ।

(২) মুফাস্‌সিরগণ বলেন, উপর দিক থেকে আযাব আসার দৃষ্টান্ত বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে অনেক রয়েছে । যেমন, নূহ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবণাকারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, আদ জাতির উপর ঝড়-ঝঞ্ঝা চড়াও হয়েছিল, লূত ‘আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল এবং ইসরাঈল

فَوۡقِكُمۡ اَوۡ مِنۡ تَحۡتِ اَرۡجُلِكُمۡ اَوۡ يَلۡبِسَكُمۡ شِيَعًا وَّيُذِيۡقَ بَعۡضَكُمۡ بَاۡسَ بَعۡضٍ ؕ اُنۡظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِّفُ الۡاٰيٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَفۡقَهُوۡنَ ﴿٦٥﴾

নীচ থেকে শাস্তি পাঠাতে[১], বা তোমাদেরকে বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ দলে বিভক্ত করতে বা এক দলকে অন্য দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ

বংশধরদের উপর রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়েছিল। আব্‌রাহার হস্তীবাহিনী যখন মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন পক্ষীকুল দ্বারা তাদের উপর কঙ্কর বর্ষণ করা হয়। ফলে সবাই চর্বিত ভূষির ন্যায় হয়ে যায়। [বাগভী]

(১) এমনিভাবে বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে নীচের দিক থেকে আযাব আসারও বিভিন্ন প্রকার অতিবাহিত হয়েছে। নূহ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ের প্রতি উপরের আযাব বৃষ্টির আকারে এবং নীচের আযাব ভূতল থেকে পানি স্ফীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তারা একই সময়ে উভয় প্রকার আযাবে পতিত হয়েছিল। ফির‘আউনের সম্প্রদায়কে পদতলের আযাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কারুণ স্বীয় ধন-ভাণ্ডারসহ এ আযাবে পতিত হয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়েছিল। [বাগভী] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা, মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ প্রমূখ মুফাস্‌সিরগণ বলেন, উপরের আযাবের অর্থ অত্যাচারী বাদশাহ্ ও নির্দয় শাসকবর্গ এবং নীচের আযাবের অর্থ নিজ চাকর, নোকর ও অধীনস্ত কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতক, কর্তব্যে অবহেলাকারী ও আত্মসাৎকারী হওয়া। [ফাতহুল কাদীর]

আয়েশা রাদিআল্লাহু ‘আনহা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যখন আল্লাহ্ তা‘আলা কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার মঙ্গল চান, তখন তাকে উত্তম সহকারী দান করেন, যাতে প্রশাসক আল্লাহ্‌র কোন বিধান ভুলে গেলে সে তা স্মরণ করিয়ে দেয়, আর যদি প্রশাসক আল্লাহ্‌র বিধান স্মরণ করে তখন সে তা বাস্তবায়নে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে যখন কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন মন্দ লোকদেরকে তার পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয়; ফলে সে যখন আল্লাহ্‌র কোন বিধান ভুলে যায় তখন তারা তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর যদি সে প্রশাসক নিজেই স্মরণ করে তখন তারা তাকে তা বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করে না। [আবু দাউদঃ ২৯৩২; নাসায়ীঃ ৪২০৪] এসব হাদীস ও আলোচ্য আয়াতের উল্লেখিত তাফসীরের সারমর্ম এই যে, জনগণ শাসকবর্গের হাতে যেসব কষ্ট ও বিপদাপদ ভোগ করে, তা উপর দিককার আযাব এবং যেসব কষ্ট অধীন কর্মচারীদের দ্বারা ভোগ করতে হয়, সেগুলো নীচের দিককার আযাব! এগুলো কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং আল্লাহ্‌র আইন অনুসারে মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি। সুফিয়ান সওরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, যখন আমি কোন গোনাহ্ করে ফেলি, তখন এর ক্রিয়া স্বীয় চাকর, আরোহণের ঘোড়া ও বোঝা বহনের গাধার মেজাজেও অনুভব করি। এরা সবাই আমার অবাধ্যতা করতে থাকে।

করাতে[১] তিনি (আল্লাহ্) সক্ষম।'
দেখুন, আমরা কিরূপে বিভিন্নভাবে আয়াতসমূহ বিবৃত করি যাতে তারা ভালভাবে বুঝতে পারে।

(১) আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় প্রকার আযাব হচ্ছে, বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে যাওয়া এবং একদল অন্য দলের জন্য আযাব হওয়া। তাই আয়াতের অনুবাদ এরূপ হবে, এক প্রকার আযাব এই যে, জাতি বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে যাবে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'সাবধান! তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারতে শুরু করবে।' [বুখারীঃ ১২১]

সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেন, 'একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে চলতে চলতে বনী মুয়াবিয়ার মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলাম। তিনি তার রবের কাছে অনেকক্ষণ দু'আ করার পর বললেনঃ আমি রব-এর নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি- তিনি আমাকে দুটি বিষয় দিয়েছেন, আর একটি থেকে নিষেধ করেছেন। আমি প্রার্থনা করেছি যে, (এক) আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস করা না হয়, আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'আ কবূল করেছেন। (দুই) আমার উম্মতকে যেন নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'আও কবূল করেছেন। (তিন) আমার উম্মত যেন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দ্বারা ধ্বংস না হয়। আমাকে তা প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। [মুসলিমঃ ২৮৯০]

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর বিগত উম্মতদের ন্যায় আকাশ কিংবা ভূতল থেকে কোন ব্যাপক আযাব আগমন করবে না; কিন্তু একটি আযাব দুনিয়াতে তাদের উপরও আসতে থাকবে। এ আযাব হচ্ছে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দলীয় সংঘর্ষ। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত জোর সহকারে উম্মতকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি প্রতি ক্ষেত্রেই হুশিয়ার করেছেন যে, দুনিয়াতে যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি নেমে আসে, তবে তা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই আসবে।

অন্য আয়াতে এ বিষয়টি পূর্ববর্তী জাতিদের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, "তারা সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধই করতে থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম।" [সূরা হূদ: ১১৮-১১৯] এতে বুঝা গেল যে, যারা পরস্পর (শরী'আতসম্মত কারণ ছাড়া) মতবিরোধ করে, তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত কিংবা দূরবর্তী। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। কেননা যারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে তারা আল্লাহ্‌র রহমত হতে দূরে সরে এসেছে।

৬৬. আর আপনার সম্প্রদায় তো ওটাকে মিথ্যা বলেছে অথচ ওটা সত্য । বলুন, ‘আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নই ।’

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝٦٦

৬৭. প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে ।

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۡ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٦٧

৬৮. আর আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আমাদের আয়াতসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসংগ শুরু করে[১] । আর শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না[২] ।

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۗ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٦٨

(১) আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আল্লাহ্ তা‘আলার নিদর্শনাবলীতে শুধু ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য করে এবং ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন । এ আয়াতে প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে । এতে মুসলিমদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গোনাহ্, সেই কাজ যারা করে, তাদের মজলিসে যোগদান করাও গোনাহ্ । এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত ।

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, যদি শয়তান আপনাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয় অর্থাৎ ভুলক্রমে তাদের মজলিশে যোগদান করে ফেলেন- নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিশে আল্লাহ্র আয়াত ও রাসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা আপনার স্মরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছেন । উভয় অবস্থাতেই যখন স্মরণ হয় তখনই মজলিশ ত্যাগ করা উচিত । স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গোনাহ্ । অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, ‘যদি আপনি সেখানে বসে থাকেন, তবে আপনিও তাদের মধ্যে গণ্য হবেন’ । [সূরা আন-নিসা: ১৪০] আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, গোনাহ্র মজলিশ ও মজলিশের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া । এর উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিশ ত্যাগ করে চলে যাওয়া । কিন্তু মজলিশ ত্যাগ করার মধ্যে যদি জান, মাল কিংবা ইজ্জতের ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্য

৬৯. আর তাদের[১] কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের নয়। তবে উপদেশ দেয়া তাদের কর্তব্য, যাতে তারাও তাকওয়া অবলম্বন করে।

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. আর যারা তাদের দ্বীনকে খেল-

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ

পন্থা অবলম্বন করাও জায়েয। উদাহরণতঃ অন্য কাজে ব্যাপৃত হওয়া এবং তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। কিন্তু বিশিষ্ট লোক, দ্বীনী ক্ষেত্রে যাদের অনুকরণ করা হয়- তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান থেকে উঠে যাওয়াই সমীচীন।
মোটকথা, আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে কোন ভ্রান্ত কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আমার উম্মতকে ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির গোনাহ্ এবং যে কাজ অন্য কেউ জোর-যবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের গোনাহ্ থেকে অব্যাহতি দান করেছেন। [ইবনে মাজাহ্ঃ ২০৪০, ২০৪৩] এ আয়াত দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, যে মজলিশে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল কিংবা শরী‘আতের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করতে সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মজলিশ বর্জন করা মুসলিমদের উচিত। হ্যাঁ, সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিশে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোন দোষ নেই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে বুঝা যায় যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিশে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গোনাহ্; তারা তখন কোন অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের বেশী দেরী লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় যালিমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তখনো যুলুমে ব্যাপৃত থাকবে এরূপ কোন শর্ত আয়াতে নেই। কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়টি পরিস্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে, “অত্যাচারীদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করো না। নতুবা তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে”। [সূরা হূদ: ১১৩]

(১) অর্থাৎ পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত লোকেরা যালিম। কিন্তু তাদের হিসাব-নিকাশ ও তাদের শাস্তি বিধান করা সাধারণ মুমিন মুত্তাকীদের কাজ নয়। তারা তাদেরকে কেবল নসীহত ও হক কথা জানিয়ে দেয়ার কাজই করবে। যাতে তারা বাতিল পথ পরিহার করে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে। [মুয়াসসার] কিন্তু যদি তাদেরকে নসীহত করলে ক্ষতির পরিমাণ বেশী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন তাও পরিত্যাগ করতে হবে। [সা‘দী]

الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۟

তামাশারূপে গ্রহণ করে[১] এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে আপনি তাদের পরিত্যাগ করুন। আর আপনি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন[২], যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ছাড়া তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তা গ্রহণ করা হবে না[৩]। এরাই নিজেদের কৃতকর্মের

(১) আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা দ্বীনকে ক্রীড়া ও কৌতুক করে রেখেছে। এর দু'টি অর্থ হতে পারেঃ (এক) তাদের জন্য সত্য দ্বীন ইসলাম প্রেরিত হয়েছে; কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। (দুই) তারা আসল দ্বীন পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে। উভয় অর্থেরই সারমর্ম প্রায় এক।

(২) এখানে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। এটিই তাদের ব্যাধির আসল কারণ। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় লম্ফঝম্ফ ও ঔদ্ধত্যের আসল কারণই হচ্ছে, তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা প্রলোভিত এবং আখেরাত বিস্মৃত। আখেরাত ও কেয়ামতের বিশ্বাস থাকলে তারা কখনো এরূপ কাণ্ড করতো না। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাধারণ মুসলিমদেরকে দু'টি নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ (এক) উল্লেখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ইতিবাচকভাবে তাদেরকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং (দুই) আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের ভয় প্রদর্শন করা।

(৩) আয়াতের শেষে আযাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আয়াতে ﴿اَنْ تُبْسَلَ﴾ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং জড়িত হয়ে পড়া। কোন ভুল কিংবা কারো প্রতি অত্যাচার করে বসলে তার সম্ভাব্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। স্বীয় দলবল ব্যবহার করে অত্যাচারের প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হলে প্রভাবশালীদের সুপারিশ কাজে লাগায়। এতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ্ অপরাধীকে যখন শাস্তি দেবেন, তখন সে শাস্তির কবল

জন্য ধ্বংস হয়েছে; কুফরীর কারণে এদের জন্য রয়েছে অতি উষ্ণ পানীয় ও কষ্টদায়ক শাস্তি(১)।

নবম রুকূ‘

৭১. বলুন, ‘আল্লাহ্ ছাড়া আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব, যা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না? আর আল্লাহ্ আমাদেরকে হিদায়াত দেবার পর আমাদেরকে কি আগের অবস্থায় ফিরানো হবে(২) সে ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান যমীনে এমন শক্তভাবে পেয়ে বসেছে যে সে দিশেহারা? তার রয়েছে কিছু (ঈমানদার) সহচর, তারা তাকে হিদায়াতের প্রতি আহ্বান করে বলে, ‘আমাদের কাছে আস?’(৩) বলুন, ‘আল্লাহ্র হিদায়াতই সঠিক হিদায়াত এবং আমরা আদিষ্ট হয়েছি

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٧١

থেকে উদ্ধার করার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এগিয়ে আসবে না, আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কারো সুপারিশ কার্যকর হবে না এবং কোন অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা হবে না। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা বিনিময়স্বরূপ দিতে চায়, তবুও এ বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

(১) বলা হচ্ছে, এরা ঐ সব লোক, যাদেরকে কুকর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার জন্য দেয়া হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, “এ পানি তাদের নাড়িভূঁড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে।” [সূরা মুহাম্মাদ: ১৫] এ পানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, তাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে।

(২) অর্থাৎ ঈমানদার হওয়ার পরে কি আমরা কুফরীতে ফিরে যাব? [আইসারুত তাফাসীর]

(৩) কিন্তু সে ঈমানদার বন্ধুদের এ আহ্বানে সাড়া দেয় না। [মুয়াসসার]

সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে[১] ।'

৭২. 'এবং সালাত কায়েম করতে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করতে। আর তিনিই, যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে ।'

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ۚ وَهُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٧٢

৭৩. তিনিই যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর যেদিন তিনি বলবেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই সত্য। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিনের কর্তৃত্ব তো তাঁরই । গায়েব ও উপস্থিত

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۗ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ۗ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝٧٣

(১) এ আয়াত দ্বারা আরো জানা গেল যে, যারা আখেরাতের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের জন্য মারাত্মক । তাদের সংসর্গে উঠা-বসাকারীরাও পরিণামে তাদের অনুরূপ আযাবে পতিত হবে । পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতের সারমর্ম মুসলিমদেরকে অশুভ পরিবেশ ও খারাপ সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখা । এটি যে কোন মানুষের জন্যই বিষতুল্য । কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য উক্তি ছাড়াও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত করে। এ পরিবেশে জড়িয়ে পড়ার পর মানুষ প্রথমতঃ বিবেক ও মনের বিরুদ্ধে কুকর্মে লিপ্ত হয় । এরপর আস্তে আস্তে কুকর্ম যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মন্দের অনুভূতিও লোপ পায়, বরং মন্দকে ভাল এবং ভালকে মন্দ মনে করতে থাকে । যেমন এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যখন কোন ব্যক্তি প্রথমবার গোনাহ্ করে, তখন তার কলবে একটি কাল দাগ পড়ে । তারপর যখন তাওবা করে গোনাহের কাজ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তার কলব আবার পরিষ্কার হয়ে যায় । কিন্তু যদি গোনাহ বাড়িয়ে দেয়, তখন একের পর এক কালো দাগ বাড়াতে থাকে । কুরআনুল কারীমে ﴿رَانَ﴾ শব্দ দ্বারা এ অবস্থাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে । বলা হয়েছে, "কুকর্মের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে ।" [সূরা আল-মুতাফফিফীন:১৪] [ইবনে মাজাহ্ঃ ৪২৪৪, তিরমিযীঃ ৩৩৩৪, ইমাম আহ্‌মাদ, মুসনাদঃ ২/২৯৭] অর্থাৎ ভাল-মন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাই লোপ পেয়ে বসে । চিন্তা করলে বুঝা যায়, অধিকাংশ ভ্রান্ত পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গই মানুষকে এ অবস্থায় পৌঁছায় । এ কারণেই অভিভাবকদের কর্তব্য ছেলে-সন্তানদেরকে এ ধরণের পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা ।

বিষয়ে তিনি পরিজ্ঞাত। আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

৭৪. আর স্মরণ করুন[১], যখন ইব্‌রাহীম তাঁর পিতা আযরকে বলেছিলেন[২], 'আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে দেখছি[৩]।'

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে সম্বোধন এবং প্রতিমাপূজা ছেড়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করার আহ্বান বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহ্বানকেই সমর্থন দান করা হয়েছে। এ ভঙ্গি স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম ছিলেন সমগ্র আরবের পিতামহ। তাই গোটা আরব তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সর্বদা একমত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর একটি তর্কযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি প্রতিমাপূজা ও তারকাপূজার বিপক্ষে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন। [নাযমুদ দুরার]

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তার পিতা আযরকে বললেন, আপনি স্বহস্তে নির্মিত স্বীয় উপাস্য স্থির করেছেন। আমি আপনাকে এবং আপনার গোটা সম্প্রদায়কে পথ ভ্রষ্টতায় পতিত দেখতে পাচ্ছি। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পিতার নাম 'আযর' বলেই প্রসিদ্ধ। কোনও কোনও ইতিহাসবিদ তার নাম 'তারেখ' উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে 'আযর' তার উপাধি। তবে কুরআনের বর্ণনাই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। [বাগভী]

(৩) ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে সত্য প্রচারের কাজ শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেও অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, "আর আপনি নিকটআত্মীয়দেরকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন"। [সূরা আশ-শু'আরা: ২১৪] সে অনুযায়ী তিনি সর্বপ্রথম সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে সত্য প্রচারের জন্য পরিবারের সদস্যদেরকে একত্রিত করেন। [আর-রাহীকুল মাখতূম] এতে বুঝা যায় যে, পরিবারের কোন সম্মানিত যদি ভ্রান্ত পথে থাকে তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে আহ্বান করা সম্মানের পরিপন্থী নয়, বরং সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবী তা-ই। আরো জানা গেল যে, সত্য প্রচার ও সংশোধনের কাজ নিকটআত্মীয়দের থেকে শুরু করা নবীগণের দাওয়াত পদ্ধতি। এছাড়া আয়াতে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে

৭৫. এভাবে আমরা ইব্‌রাহীমকে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব[১] দেখাই, যাতে তিনি নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

وَكَذٰلِكَ نُرِيٓ اِبۡرٰهِيۡمَ مَلَكُوۡتَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَلِيَكُوۡنَ مِنَ الۡمُوۡقِنِيۡنَ ﴿٧٥﴾

৭৬. তারপর রাত যখন তাঁকে আচ্ছন্ন করল তখন তিনি তারকা দেখে বললেন, ‘এ আমার রব।’ তারপর যখন সেটা অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, ‘যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।’

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيۡهِ الَّيۡلُ رَاٰ كَوۡكَبًا‌ ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّىۡ‌ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الۡاٰفِلِيۡنَ ﴿٧٦﴾

৭৭. অতঃপর যখন তিনি চাঁদকে সমুজ্জ্বলরূপে উঠতে দেখলেন তখন বললেন, ‘এটা আমার রব।’ যখন

فَلَمَّا رَاَ الۡقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىۡ‌ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَـئِنۡ لَّمۡ يَهۡدِنِىۡ رَبِّىۡ لَاَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡقَوۡمِ

বলেনঃ আপনার সম্প্রদায় পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে। মুশরিক স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র পথে যে মহান ত্যাগ স্বীকার করেন, এ উক্তিতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে বলে দিলেন যে, ইসলামের সম্পর্ক দ্বারাই মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও দেশগত জাতীয়তা যদি মুসলিম জাতীয়তার পরিপন্থী হয়, তবে মুসলিম জাতীয়তার বিপরীতে সব জাতীয়তাই বর্জনীয়। কুরআনুল কারীম ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর এ ঘটনা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বলা হয়েছে, “ইবরাহীম ও তার সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য উত্তম আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য। তারা স্বীয় বংশগত ও দেশগত স্বজনদেরকে পরিস্কার বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের থেকে মুক্ত। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শত্রুতার প্রাচীর ততদিন অবস্থিত থাকবে, যতদিন তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে সমবেত না হও”। [সূরা আল-মুমতাহিনাহ্‌: ৪]

(১) ‘মালাকূত’ শব্দের অর্থ নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। ইকরামা বলেন, এর অর্থ আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব ও মালিকানা বা কর্তৃত্ব। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ, আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, আসমান ও যমীনের নিদর্শনাবলী। [তাবারী] অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয়, তাদের অসারতার কথা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট স্পষ্ট হওয়ার পর আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে আসমান ও যমীনের রাজত্ব, নিদর্শনাবলী ও বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জের পরিচালন ব্যবস্থা দেখান। [তাবারী]

الضَّآلِّيْنَ ۝٧٧

সেটাও অস্তমিত হল তখন বললেন, ‘আমাকে আমার রব হিদায়াত না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের শামিল হব ।’

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝٧٨

৭৮. অতঃপর যখন তিনি সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উঠতে দেখলেন তখন বললেন, ‘এটা আমার রব, এটা সবচেয়ে বড় ।’ যখন এটাও অস্তমিত হল, তখন তিনি বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর তার সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই ।

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٧٩

৭৯. ‘আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই[১] ।’

(১) আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, তারকাপুঞ্জ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়, যেমনিভাবে মূর্তি ও প্রতিমা উপাস্যের যোগ্য নয় । বলা হচ্ছে, এক রাত্রিতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হলো এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, তখন তিনি স্বজাতিকে শুনিয়ে বললেন, এ নক্ষত্র আমার রব । উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের রব । এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নেবে । কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম জাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেলেন । তিনি বললেন, আমি অস্তগামী বস্তুসমূহকে ভালবাসি না । যে বস্তু ইলাহ্ কিংবা উপাস্য হবে, তার সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হওয়া উচিত । এরপর অন্য কোন রাত্রিতে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন, (তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) এটি আমার রব । কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে । সেমতে চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন বললেন, যদি আমার রব আমাকে পথ প্রদর্শন না করতে থাকেন, তবে আমিও তোমাদের মত পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা এবং উপাস্য মনে করে বসতাম । কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এটিও আরাধনার যোগ্য নয় । এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আমার রব অন্য কোন শক্তি, যার পক্ষ থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পথ প্রদর্শন করা হয় । এরপর একদিন সূর্য উদিত

৮০. আর তাঁর সম্প্রদায় তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। তিনি বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো? অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন। আমার রব অন্য কোন ইচ্ছে না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরীক কর তাকে আমি ভয় করি না, আমার রব জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন, তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?'

وَحَآجَّهُۥ قَوْمُهُۥ ۚ قَالَ أَتُحَٰٓجُّوٓنِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْـًٔا ۗ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. 'আর তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? অথচ তোমরা ভয় করছ না যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করছ

وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا ۚ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে ঐভাবেই বললেনঃ (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার রব এবং এটি বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতি সত্ত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। সেমতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন, 'হে আমার জাতি! আমি তোমাদের এসব মুশরিকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত।' তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট জীবকেই আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করেছ। অতঃপর এ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্টবস্তুর মধ্যে কোনটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত। বরং সেই সত্তা আমাদের সবার রব, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি আমার চেহারা তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে ফিরিয়ে আল্লাহ্ 'ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু'-এর দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় মুশরিক বা অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। এ বিতর্কে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম নবীসুলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ প্রয়োগ করে এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক সচেতন মানুষের মন ও মস্তিস্ক প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবেই সত্যকে উপলব্ধি করে ফেলে। মনে রাখতে হবে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ তর্ক ছিল প্রতিপক্ষকে নিজের মত ও পথের পক্ষে যুক্তি দাড় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে। তিনি সম্পূর্ণ জেনে-বুঝেই প্রতিপক্ষের দাবী খণ্ডন করার জন্য এ প্রজ্ঞার আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাতে তারা উপস্থিত সকল বস্তুর ইবাদতের অসারতা ঝুঝতে সক্ষম হয়। [দেখুন, সা'দী]

এমন কিছু, যার পক্ষে তিনি তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ নাযিল করেন নি। কাজেই যদি তোমরা জান তবে বল, দু দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের বেশী হকদার।'

৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম(১) (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য(২)

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

(১) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা হচ্ছে- যুলুমের অর্থ শির্ক- সাধারণ গোনাহ্ নয়। কিন্তু ظلم শব্দটি نكرة ব্যবহার করায় আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ ব্যাপক হয়ে গেছে। অর্থাৎ যাবতীয় শির্কই এর অন্তর্ভুক্ত। يَلْبِسُوْا শব্দটি لَبْسٌ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ পরিধান করা কিংবা মিশ্রিত করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে কোন প্রকার শির্ক মিশ্রিত করে তার কোন নিরাপত্তা নেই। এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরিক বা মূর্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু শির্ক নয়, বরং সে ব্যক্তিও মুশরিক, যে কোন প্রতিমার পূজা করে না এবং ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করে; কিন্তু কোন ফিরিশ্‌তা কিংবা রাসূল কিংবা ওলীকে আল্লাহ্‌র কোন কোন বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে বা আল্লাহ্‌কে যা দিয়ে 'ইবাদাত করা হয় তাদেরকে তেমন কিছু দিয়ে 'ইবাদাত করে। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা কোন পীর, জ্বিন, ওলী বা মাযার ইত্যাদিকে 'মনোবাঞ্ছা পূরণকারী' বলে বিশ্বাস করে এবং কার্যতঃ মনে করে যে, আল্লাহ্‌র ক্ষমতা যেন তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই মুশরিক। তারা আল্লাহ্‌র রুবুবিয়াতে শির্ক করল। অনুরূপভাবে যারা কবরবাসী, ওলী, মাযার, জ্বিন ইত্যাদিকে আহ্বান করে, সিজ্‌দা করে, সাহায্য চায়, মান্নত করে, তাদের উদ্দেশ্যে যবেহ্ করে- তারা সবাই মুশরিক। তাদের নিরাপত্তা নেই। তারা আল্লাহ্‌র উলুহিয়াতে শির্ক করল এবং তাওবা না করে মারা গেলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।

(২) অর্থাৎ শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত তারাই হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে, তারপর সে ঈমানের সাথে কোনরূপ যুলুমকে মিশ্রিত করেনি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম চমকে উঠেন এবং আরয করেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর যুলুম করেনি? এ আয়াতে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য বিশ্বাসের সাথে যুলুমকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'যুলুম' বলতে শির্ককে বোঝানো হয়েছে।

এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

দশম রুকূ‘

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٨٣

৮৩. আর এটাই আমাদের যুক্তি-প্রমাণ যা ইব্‌রাহীমকে দিয়েছিলাম তার জাতির মোকাবেলায়, যাকে ইচ্ছা আমরা মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয়ই আপনার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٨٤

৮৪. আর আমরা তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়া‘কূব, এদের প্রত্যেককে হিদায়াত দিয়েছিলাম; পূর্বে নূহকেও আমরা হিদায়াত দিয়েছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও; আর এভাবেই মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করি;

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٨٥

৮৫. আর যাকারিয়্যা, ইয়াহ্‌ইয়া, ‘ঈসা এবং ইল্‌য়াসকেও (হিদায়াত দিয়েছিলাম)। এরা প্রত্যেকেই সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন;

وَإِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ٨٦

৮৬. এবং ইসমা‘ঈল, আল্‌-ইয়াসা‘, ইউনুস ও লূতকেও (হিদায়াত দিয়েছিলাম); আর তাদের প্রত্যেককে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম সৃষ্টিকুলের উপর।

وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَٰهُمْ

৮৭. এবং তাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভাইদের কিছুসংখ্যককে। আর আমরা

দেখ, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন, ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ অর্থাৎ “নিশ্চিত শির্ক বিরাট যুলুম”।’ [বুখারীঃ ৪৬২৯, ৬৯১৮] কাজেই আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনে, অতঃপর আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী এবং তাঁর ‘ইবাদাতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথ প্রাপ্ত।

وَهَدَيْنٰهُمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾

তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম ।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. এটা আল্লাহ্‌র হিদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তিনি এ দ্বারা হিদায়াত করেন । আর যদি তারা শির্ক করত তবে তাঁদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হত[১] ।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. এরাই তারা, যাদেরকে আমরা কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করেছি, অতঃপর যদি তারা এগুলোর সাথে কুফরী করে, তবে আমরা এমন এক সম্প্রদায়কে এগুলোর ভার দিয়েছি যারা এগুলোর সাথে কাফির নয়[২] ।

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত দানসমূহ বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের একটি নিয়ম ব্যক্ত করা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন ।" [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৬৩] অপরদিকে মক্কার মুশরিকদেরকে এসব অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সমগ্র পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র সত্তা হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা । তাঁর সাথে অন্যকে আরাধনায় শরীক করা কিংবা তাঁর বিশেষ গুণে তাঁর সমতুল্য মনে করা, তাঁর 'ইবাদাতে অপর কাউকে শরীক করা শির্ক, কুফর ও পথভ্রষ্টতা । অতএব, তোমরা যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত ।

(২) অর্থাৎ কিছুসংখ্যক সম্বোধিত ব্যক্তি যদি আপনার কথা অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণের নির্দেশ বর্ণনা করা সত্ত্বেও অস্বীকারই করতে থাকে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না । কেননা, আপনার নবুওয়াত স্বীকার করার জন্য আমি একটি বিরাট জাতি স্থির করে রেখেছি । তারা অবিশ্বাস করবে না । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত মুসলিম এ 'জাতি'র অন্তর্ভুক্ত । [আইসারুত তাফাসীর] এ আয়াত তাদের সবার জন্য গর্বের সামগ্রী । কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসার স্থলে তাদের উল্লেখ করেছেন ।

৯০. এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেছেন, কাজেই আপনি তাদের পথের অনুসরণ করুন[১]। বলুন, ‘এর জন্য আমি তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না, এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ[২]।’

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

এগারতম রুকূ‘

৯১. আর তারা আল্লাহকে তাঁর যথার্থ মর্যাদা দেয়নি, যখন তারা বলে, ‘আল্লাহ্ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযিল করেননি’[৩]। বলুন, ‘কে নাযিল করেছে

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে মক্কাবাসীদেরকে শোনানো হয়েছে যে, কোন জাতির পূর্বপুরুষরা শুধু পিতৃপুরুষ হওয়ার কারণেই অনুসরণীয় হতে পারে না যে, তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে অনুসরণযোগ্য মনে করতে হবে। আরবদের সাধারণ ধারণা তাই ছিল। অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে যে, যার অনুসরণ করা হবে, সে নিজেও বিশুদ্ধ পথে আছে কি না। তাই নবীগণ ‘আলাইহিমুস্ সালামদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, “এরা এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেছেন”। এরপর বলেছেন, “আপনিও তাদের হেদায়াত ও কর্মপন্থা অনুসরণ করুন”। এতে দু’টি নির্দেশ রয়েছে- (এক) আরববাসী ও সমগ্র উম্মতকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পৈত্রিক অনুসরণের কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত নবী-রাসূলদের অনুসরণ কর। (দুই) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনিও পূর্ববর্তী নবীগণের পন্থা অবলম্বন করুন।

(২) এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিশেষভাবে একটি ঘোষণা করতে বলা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী নবীগণও করেছেন। ঘোষণাটি হচ্ছে, আমি তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যেসব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের কাছে কোন ফি বা পারিশ্রমিক চাই না। তোমরা এসব নির্দেশ মেনে নিলে আমার কোন লাভ নাই এবং না মানলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ও শুভেচ্ছার বার্তা। বস্তুত: শিক্ষা ও প্রচারকার্যের জন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা সব যুগে সব নবীর নিকট অভিন্ন রীতি ছিল। প্রচারকার্য কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

(৩) এ আয়াতে ঐসব লোকের জবাব দেয়া হয়েছে, যারা বলেছিল, আল্লাহ্ তা‘আলা কোন মানুষের প্রতি কখনো কোন গ্রন্থ নাযিলই করেননি, গ্রন্থ ও রাসূলদের ব্যাপারটি মূলতঃ

قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

মূসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও হিদায়াতস্বরূপ, যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর ও অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানতে না তাও তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল?’ বলুন, ‘আল্লাহ্ই’; অতঃপর তাদেরকে তাদের অযাচিত সমালোচনার উপর ছেড়ে দিন, তারা খেলা করতে থাকুক(১)।

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

৯২. আর এটি বরকতময় কিতাব, যা আমরা নাযিল করেছি, যা তার আগের সব কিতাবের সত্যায়নকারী এবং যা দ্বারা আপনি মক্কা ও তার চারপাশের মানুষদেরকে সতর্ক

ভিত্তিহীন। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এটি মূর্তিপূজারী কুরাইশদের উক্তি [ইবন কাসীর]। ইবন জারীর তাবারী এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [তাবারী] কেননা, তারা কোন গ্রন্থ ও নবীর প্রবক্তা কোন কালেই ছিল না। অন্যান্য মুফাস্সিরদের মতে এটি ইয়াহূদীদের উক্তি। আয়াতের বর্ণনা পরম্পরা বাহ্যতঃ এরই সমর্থন করে। এমতাবস্থায় তাদের এ উক্তি ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও দ্বীনের পরিপন্থী ছিল। [বাগভী] যদি আয়াতে বর্ণিত লোকেরা ইয়াহূদী হয়, তবে এতে আল্লাহ্ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেছেন, যারা এমন বাজে কথা বলেছে, তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ্ তা‘আলাকে চিনে নি। নতুবা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ থেকে বেরই হত না। যারা সর্বাবস্থায় আসমানী গ্রন্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্ তা‘আলা কোন মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে যে তাওরাত তোমরা স্বীকার কর, সে তাওরাত কে নাযিল করেছে? তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইয়াহূদীরা সেগুলো তাওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিল। [তাবারী, বাগভী, মুয়াসসার]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা কোন কিতাব নাযিল না করে থাকলে তাওরাত কে নাযিল করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর তারা কি দেবে; আপনিই বলে দিন, আল্লাহ্ তা‘আলাই নাযিল করেছেন। [বাগভী] যখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা যে ক্রীড়া-কৌতুকে ডুবে আছে, তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন।

করেন[১]। আর যারা আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, তারা এটাতেও ঈমান রাখে[২] এবং তারা তাদের সালাতের হিফাযত করে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে, কিংবা বলে, 'আমার কাছে ওহী হয়,' অথচ তার প্রতি কিছুই ওহী করা হয় না এবং যে বলে, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন আমিও তার মত নাযিল করব?' আর যদি আপনি দেখতে

(১) অর্থাৎ তাওরাত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল- একথা যেমন তারা স্বীকার করে, তেমনিভাবে এ কুরআনও আমি নাযিল করেছি। কুরআনের সত্যতার জন্য তাদের পক্ষ থেকে এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জীলে নাযিলকৃত সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে। মক্কা মু'আয্‌যামাকে কুরআনুল কারীম 'উম্মুল কুরা' বলেছে। অর্থাৎ বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। তাছাড়া এ স্থানটিই সারা বিশ্বের কেবলা এবং মুখ ফেরানোর কেন্দ্রবিন্দু। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(২) যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে, তারা কুরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত সংরক্ষণ করে। এতে ইয়াহূদী ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ যা ইচ্ছা মেনে নেয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা, এর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরী করা- এটি আখেরাতে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্‌ভীতি অবশ্যই তাকে যুক্তি-প্রমাণে চিন্তা–ভাবনা করতে এবং পৈতৃক প্রথার পরওয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে। চিন্তা করলে দেখা যায়, আখেরাতের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ। কুফর ও শির্কসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। আখেরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোন সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে এবং অবশেষে তাওবা করে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ভীতি এবং আখেরাতভীতিই মানুষকে মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন সূরায় আখেরাতের চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যার অন্তরে আখেরাতের উপর ঈমান নেই সে কখনো অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে না, আর ন্যায় কাজ করতে উৎসাহ বোধ করে না। [দেখুন, তাবারী]

পেতেন, যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রনায় থাকবে এবং ফিরিশ্‌তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, ‘তোমাদের প্রাণ বের কর। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে, কারণ তোমরা আল্লাহ্‌র উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহংকার করতে।’

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ
شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد
تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ
تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. আর অবশ্যই তোমরা আমাদের কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ, যেমন আমরা প্রথম বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম; আর আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা তোমাদের পিছনে ফেলে এসেছ। আর তোমরা যাদেরকে তোমাদের ব্যাপারে (আল্লাহ্‌র সাথে) শরীক মনে করতে, তোমাদের সে সুপারিশকারিদেরকেও আমরা তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন হয়েছে এবং তোমরা যা ধারণা করেছিলে তাও তোমাদের থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

বারতম রুকূ‘

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ
تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী, তিনিই প্রাণহীন থেকে জীবন্তকে বের করেন এবং জীবন্ত থেকে প্রাণহীন বেরকারী[১]। তিনিই

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা‘আলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেন। মৃত বস্তু যেমন, বীর্য ও ডিম- এগুলো থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের করে দেন- যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত বস্তু থেকে বের হয়। [জালালাইন; মুয়াসসার]

তো আল্লাহ্, কাজেই তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে[১]?

৯৬. তিনি প্রভাত উদ্ভাসক[২]। আর তিনি রাতকে প্রশান্তি এবং সূর্য ও চাঁদকে সময়ের নিরুপক করেছেন[৩]; এটা

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٩٦﴾

(১) এগুলো সব এক আল্লাহ্র কাজ। অতঃপর এ কথা জেনে-শুনে তোমরা কোন দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছ? তোমরা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ-বিদূরণকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য বলতে শুরু করেছ। [মুয়াসসার]

(২) فالق শব্দের অর্থ ফাঁককারী এবং إصباح শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল। ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ -এর অর্থ প্রভাতের ফাঁককারী; অর্থাৎ গভীর অন্ধকারের চাদর ফাঁক করে প্রভাতের উন্মেষকারী। [জালালাইন] এটিও এমন একটি কাজ, যাতে জ্বিন, মানব ও সমগ্র সৃষ্ট জীবের শক্তিই ব্যর্থ। প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এ কথা বুঝতে বাধ্য যে, রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাতরশ্মির উদ্ভাবক জ্বিন, মানব, ফিরিশ্তা অথবা অন্য কোন সৃষ্টজীব হতে পারে না, বরং এটি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ। তিনি ধীরে ধীরে অন্ধকার চিরে আলোর উন্মেষ ঘটান। সে আলোতে মানুষ তাদের জীবিকার জন্যে বের হতে পারে। [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়-অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীনে রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বৎসর, মাস, দিন, ঘন্টা এমনকি মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল বিশাল গোলক ও এদের গতি-বিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতি-বিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। এ উজ্জ্বল গোলকদ্বয় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে বিচরণ করছে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রমকারী হওয়া। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে।" [সূরা ইয়াসীন:৪০] পরিতাপের বিষয়, প্রকৃতির এ অটল ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা থেকেই মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তারা এগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং উপাস্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এবং কলকব্জা মেরামতের জন্য কয়েকদিন বা কয়েক ঘন্টার বিরতি দেখা দিত, তবে মানুষ বুঝতে পারত যে, এসব মেশিন আপনা আপনিই চলে না, বরং এগুলোর পরিচালক ও নির্মাতা আছে। আসমানী কিতাব, নবী ও রাসূলগণ এ সত্য উদ্ঘাটন করার জন্যই প্রেরিত হন। কুরআনুল কারীমের এ বাক্য আরো ইঙ্গিত করেছে যে, বছর ও মাসের সৌর ও চান্দ্র উভয় প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং উভয়টিই আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত। এর মাধ্যমেই সময় ও কাল নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। এতে এক দিকে যেমন ইবাদতের সময় নির্ধারণ করা যায়, অপরদিকে এর মাধ্যমে লেন-দেনের সময়ও ঠিক রাখা যায়।

পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নির্ধারণ(১)।

৯৭. আর তিনিই তোমাদের জন্য তারকামণ্ডল সৃষ্টি করেছেন যেন তা দ্বারা তোমরা স্থলের ও সাগরের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাও(২)। অবশ্যই আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি(৩)।

وَهُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ النُّجُوۡمَ لِتَهۡتَدُوۡا بِهَا فِیۡ ظُلُمٰتِ الۡبَرِّ وَالۡبَحۡرِ ؕ قَدۡ فَصَّلۡنَا الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ ﴿۹۷﴾

তাছাড়া কতটুকু সময় পার হয়েছে আর কতটুকু বাকী রয়েছে সেটা জানাও এ দুটোর কারণেই হয়ে থাকে। যদি এগুলো না থাকত, তবে এ সময় নির্ধারণের ব্যাপারটি সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকত না। এর জন্য বিশেষ শ্রেণীর প্রয়োজন পড়ত। যাতে দ্বীন ও দুনিয়ার অনেক স্বার্থ হানি ঘটত। [সা‘দী]

(১) অর্থাৎ এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা- যাতে কখনো এক মিনিট ও এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয় না- এটি একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলারই দু’টি মহান গুণ অপরিসীম শক্তি ও অপার জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। [মানার] এজন্যেই বাক্যের শেষে আল্লাহ্‌র দু’টি গুণ বাচক নাম ‘পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী’ উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অপার শক্তির কারণে সমস্ত কিছু তার অনুগত বাধ্য হয়েছে। আর তার পরিপূর্ণ জ্ঞানের কারণে কোন গোপন বা প্রকাশ্য সবকিছু তার আয়ত্বাধীন রয়েছে। [সা‘দী]

(২) অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রও আল্লাহ্ তা‘আলার অপরিসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এগুলো সৃষ্টি করার পিছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে, তন্মধ্যে একটি এই যে, স্থল ও জলপথে ভ্রমণ করার সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ এসব নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করে নিতে পারে। [মুয়াসসার] অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, আজ বৈজ্ঞানিক কলকব্জার যুগেও মানুষ নক্ষত্রপুঞ্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। এ আয়াতেও মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কোন একজন নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন বিচরণ করছে। এরা স্বীয় অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও কর্মে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। যারা শুধু এদের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং আত্মপ্রবঞ্চিত।

(৩) অর্থাৎ আমি শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি বিজ্ঞজনদের জন্য। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও আল্লাহ্‌কে চিনে না, তারা বেখবর ও অচেতন। কোন নিদর্শনই তাদের কাজে লাগে না। নবীদের বর্ণনাও তাদের কোন সন্দেহ দূর করতে পারে না। তাদের কাছে এসব বর্ণনা যত স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবেই আসুক না কেন, তারা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। [সা‘দী]

৯৮. আর তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রয়েছে দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান(১)। অবশ্যই আমরা অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

وَهُوَ الَّذِيٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۭ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ۝٩٨

৯৯. আর তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তারপর তা দ্বারা আমরা সব রকমের উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করি; অতঃপর তা থেকে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি। যা থেকে আমরা ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি। আরও (নির্গত করি) খেজুর গাছের

وَهُوَ الَّذِيٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٩٩

(১) এ আয়াতে দু’টি শব্দ বলা হয়েছে, مستقرّ ও مستودع -তন্মধ্যে مستقر শব্দটি قرار থেকে উদ্ভুত। কোন বস্তুর অবস্থান স্থলকে مستقر বলা হয়। আর مستودع শব্দটি وديعت থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ কারো কাছে কোন বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রেখে দেয়া। অতএব, مستودع ঐ জায়গাকে বলা হবে, যেখানে কোন বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রাখা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সত্তা থেকে অর্থাৎ আদম ‘আলাইহিস্ সালাম থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্য একটি দীর্ঘকালীন এবং একটি স্বল্পকালীন অবস্থানস্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। [সা‘দী] কুরআনুল কারীমের ভাষা এরূপ হলেও এর ব্যাখ্যায় বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন, مستودع ও مستقر যথাক্রমে মাতৃগর্ভ ও দুনিয়া। আবার কেউ বলেছেন, কবর ও আখেরাত। [ফাতহুল কাদীর] আবার কেউ বলেছেন, মায়ের পেট হচ্ছে مستقر আর পিতার পিঠ হচ্ছে مستودع [আইসারুত তাফাসীর, মুয়াসসার] এছাড়া আরো বিভিন্ন উক্তি আছে এবং কুরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেনঃ مستقر হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নাম। আর মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে আখেরাত পর্যন্ত সবগুলো স্তর, তা মাতৃগর্ভই হোক কিংবা পৃথিবীতে বসবাসের জায়গাই হোক কিংবা কবর বা বরযখই হোক- সবগুলোই হচ্ছে مستودع অর্থাৎ সাময়িক অবস্থানস্থল। [সা‘দী] কুরআনুল কারীমের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির অগ্রগণ্যতা বুঝা যায়। যেখানে বলা হয়েছে, ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ -অর্থাৎ তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। [সূরা আল-ইনশিকাক:১৯-২০] এর সারমর্ম এই যে, আখেরাতের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে একজন মুসাফিরসদৃশ। বাহ্যিক স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়ও প্রকৃতপক্ষে সে জীবন-সফরের বিভিন্ন মন্‌যিল অতিক্রম করতে থাকে।

মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি, আংগুরের বাগান, যায়তুন ও আনার। একটার সাথে অন্যটার মিল আছে, আবার নেইও। লক্ষ্য করুন, ওগুলোর ফলের দিকে যখন সেগুলো ফলবান হয় এবং সেগুলো পেকে উঠার পদ্ধতির প্রতি। নিশ্চয় মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য এগুলোর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে[১]।

১০০. আর তারা জিনকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করে, অথচ তিনিই এদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র--- মহিমান্বিত! এবং তারা যা বলে তিনি তার উর্ধ্বে।

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾

তেরতম রুকূ'

১০১. তিনি আস্‌মান ও যমীনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কিভাবে? তাঁর তো কোন সঙ্গিনী নেই। আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবগত।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

১০২. তিনিই তো আল্লাহ্‌, তোমাদের রব;

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

(১) উপরোক্ত ৯৫- ৯৯ আয়াতসমূহে প্রথমে অধঃজগতের বস্তুসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। কারণ এগুলো আমাদের অধিক নিকটবর্তী। এরপর এগুলোর বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এক. মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগানের বর্ণনা এবং দুই. মানব ও জীবজন্তুর বর্ণনা। এরপর শূন্য জগতের উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ সকাল ও বিকাল। এরপর উর্ধ্ব জগতের সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে এগুলোর পূর্ণ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে।

فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾

তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; কাজেই তোমরা তাঁর 'ইবাদাত কর; তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

১০৩. দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না[১], অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ব করেন[২] এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক

(১) আলোচ্য আয়াতে أبصار শব্দটি بصر এর বহুবচন। এর অর্থ দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি। إدراك শব্দের অর্থ পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এস্থলে إدراك শব্দের অর্থ বেষ্টন করা বর্ণনা করেছেন। এতে আয়াতের অর্থ হয় এই যে, জ্বিন, মানব, ফিরিশ্‌তা ও যাবতীয় জীব-জন্তুর দৃষ্টি একত্রিত হয়েও আল্লাহ্‌র সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টজীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন এবং সবাইকে বেষ্টন করে দেখেন। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। (এক) সমগ্র সৃষ্ট জগতে কারও দৃষ্টি বরং সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না। (দুই) তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টিজগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অণু-কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে সমগ্র সৃষ্টজগত ও তার অণু-পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনো হয়নি এবং হতে পারেও না। কেননা, এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ।

(২) মানুষ আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পাবে কিনা। এ মাস'আলার দু'টি দিক আছেঃ
দুনিয়াতে তাঁকে কেউ দেখা সম্ভব কিনা? এ মাস'আলারও দু'টি দিক রয়েছে, একঃ তাঁকে স্বপ্নে দেখা। এ ধরণের দেখা সম্ভব বলেই অনেকে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা তাদের মতের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আল্লাহকে দেখার উপর বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করেন। দুই, দুনিয়াতে সরাসরি চোখ দ্বারা আল্লাহ্‌কে দেখা। দুনিয়াতে এ ধরণের দেখা কখনই সম্ভব নয়। এর দলীল হলোঃ মুসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌কে দেখতে চেয়ে বলেছিলেনঃ ﴿رَبِّ أَرِنِي﴾ "হে রব! আমাকে দেখা দিন", তখন উত্তরে বলা হয়েছিলঃ ﴿لَن تَرَانِي﴾ "আপনি আমাকে দেখতে পাবেন না"। [সূরা আল-আ'রাফ: ১৪৩] আল্লাহ্‌র নবী হয়েও যখন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম এ উত্তর পেয়েছিলেন, তখন অন্য কোন জ্বিন ও মানুষের সাধ্য কি যে দুনিয়ার এ চোখ দিয়ে আল্লাহ্‌কে দেখবে!
আখেরাতে ঈমানদারগণ আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পাবে। আখেরাতে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাত ঘটবে- হাশরে অবস্থানকালেও এবং জান্নাতে

পৌঁছার পরও। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ও বিশ্বাস। এর সপক্ষে দলীল প্রমাণাদি অনেক, নীচে তার কিছু উল্লেখ করা হলোঃ

কুরআন থেকেঃ

আল্লাহর বাণীঃ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ "সেদিন কিছু চেহারা হবে সজীব ও প্রফুল্ল। তারা স্বীয় রবকে দেখতে থাকবে। [সূরা আল-কিয়ামাহঃ২২-২৩]

আল্লাহ্‌র বাণীঃ ﴿لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ "তারা তাতে যা চাইবে তাই পাবে, আর আমাদের কাছে আছে আরো কিছু বাড়তি" [সূরা ক্বাফঃ৩৫]। এ আয়াতের তাফসীরে আলী ও আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'বাড়তি বিষয় হলোঃ আল্লাহর চেহারার দিকে তাকানোর সৌভাগ্য'।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অন্যত্র বলেছেনঃ ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ "কাফেররা সেদিন স্বীয় রব-এর সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত থাকবে" [সূরা আল-মুতাফফেফীনঃ ১৫]। এর দ্বারা কাফের ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহ্‌কে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ আয়াতের দ্বারা এটা স্পষ্ট হলো যে, যারা ঈমানদার তাদের এ শাস্তি হবে না। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে।

আল্লাহ্‌র বাণীঃ ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ "যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত,তদুপরি তার উপর রয়েছে কিছু বাড়তি"। [সূরা ইউনুসঃ২৬]। এ আয়াতের তাফসীরে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি আল্লাহ্‌কে দেখা বলে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। যার আলোচনা পরবর্তী বর্ণনায় হাদীস থেকে আসছে।

সহীহ্ হাদীস থেকেঃ বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, সে সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইমাম দারকুতনী এ সংক্রান্ত বিশটির মত হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আবুল কাসেম লালাকা'য়ী ত্রিশটির মত হাদীস বর্ণনা করেছেন। নীচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলোঃ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমরা যেসব নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ আরো কোন নেয়ামতের প্রয়োজন হলে বল, আমি তাও দেব। জান্নাতীরা নিবেদন করবেঃ ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন! এর বেশী আমরা আর কি চাইব। তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত হবে। এটিই হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত'। [সহীহ্ মুসলিমঃ ১৮১] জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ্‌র সাক্ষাতই হবে সর্ববৃহৎ নেয়ামত।

অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক চন্দ্রালোকিত রাতে সাহাবীদের সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাঁদের দিকে

অবহিত(১)।

১০৪. অবশ্যই তোমাদের রব-এর কাছ থেকে তোমাদের কাছে চাক্ষুষ প্রমাণাদি এসেছে। অতঃপর কেউ চক্ষুষ্মান হলে সেটা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, আর কেউ অন্ধ সাজলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে(২)। আর আমি তোমাদের উপর সংরক্ষক নই(৩)।

قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦۖ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَاۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۝١٠٤

দৃষ্টিপাত করে বললেনঃ 'তোমরা স্বীয় রবকে এ চাঁদের ন্যায় চাক্ষুষ দেখতে পাবে'। [বুখারীঃ ৫৫৪, ৭৪৩৫, ৭৪৩৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, [ইবন আবিল ইয্ আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত তাহাভীয়্যা]

(১) আরবী অভিধানে لطيف শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ (এক) দয়ালু, (দুই) সূক্ষ্ম বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা বা জানা যায় না। خبير শব্দের অর্থ খবর রাখে। এখানে অর্থ হবে- তিনি খবর রাখেন। সমগ্র সৃষ্টিজগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞান ও খবরের বাইরে নয়। এখানে لطيف শব্দের অর্থ দয়ালু নেয়া হলে আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজের খবর রাখেন এবং এজন্যে আমাদের গোনাহ্‌র কারণে আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও, তাই সব গোনাহ্‌র কারণেই পাকড়াও করেন না। [সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস্‌সুন্নাতি]

(২) এ আয়াতের بصائر শব্দটি بصيرة এর বহুবচন। এর অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান। অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা মানুষ অতিন্দ্রীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আয়াতে بصائر বলে ঐসব যুক্তি-প্রমাণ ও উপায়াদিকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব রূপকে জানতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য দর্শনের উপায়-উপকরণ পৌঁছে গেছে। [আল-মানার] অর্থাৎ কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বিভিন্ন মু'জিযা আগমন করেছে [ইবন কাসীর] তাছাড়া তোমরা রাসূলের চরিত্র, কাজকর্ম ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করছ। এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায়। অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার করে চক্ষুষ্মান হয়ে যায়, সে নিজেরই উপকার সাধন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। [আল-মানার; আইসারুত তাফাসীর; মুয়াসসার]

(৩) অর্থাৎ মানুষকে জবরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দায়িত্ব নয়, যেমন সংরক্ষকের দায়িত্ব হয়ে

১০৫. আর এভাবেই আমরা নানাভাবে আয়াতসমূহ বিবৃত করি(১) এবং যাতে তারা বলে, ‘আপনি পড়ে নিয়েছেন(২)’, আর যাতে আমরা এটাকে(৩) সুস্পষ্টভাবে জ্ঞানী

وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾

থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পৌঁছে দেয়া ও বুঝিয়ে দেয়া। এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা না করা মানুষের দায়িত্ব। [সা‘দী]

(১) অর্থাৎ এভাবেই আমরা আমাদের আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। [জালালাইন]

(২) এর মর্ম এই যে, হেদায়াতের সব সাজ-সরঞ্জাম, মু‘জিযা, অনুপম প্রমাণাদি- যেমন, কুরআন- একজন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্য প্রকাশ করা, যা ব্যক্ত করতে জগতের সব দার্শনিক পর্যন্ত অক্ষম এবং এমন অলঙ্কারপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হওয়া, যার সমতুল্য কালাম রচনা করার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত জ্বিন ও মানুষকে চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশ্ব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে- সত্য দর্শনের এসব সরঞ্জাম দেখে যে কোন হটকারী অবিশ্বাসীরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া উচিত ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান ছিল, তারা বলতে থাকে, এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান তুমি কারো কাছ থেকে অধ্যয়ন করে নিয়েছ। এটা ছিল কাফেরদের নিত্য-মন্তব্যের একটি। তারা এ ধরনের মন্তব্য করেই যাচ্ছিল। অন্য আয়াতেও এটা বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ বলেন, “আমরা অবশ্যই জানি যে, তারা বলে, ‘তাকে তো শুধু একজন মানুষ শিক্ষা দেয়।’ তারা যার প্রতি এটাকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য ঝুঁকছে তার ভাষা তো আরবী নয়; কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।” [সূরা আন-নাহল: ১০৩] আল্লাহ্ আরও বলেন, “অতঃপর সে বলল, ‘এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়, ‘এ তো মানুষেরই কথা।’ অচিরেই আমি তাকে দগ্ধ করব ‘সাকার’ এ” [আল-মুদ্দাসসির: ২৪-২৬] তিনি আরও বলেন, কাফেররা বলে, ‘এটা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়, সে এটা রটনা করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।’ সুতরাং অবশ্যই কাফেররা যুলুম ও মিথ্যা নিয়ে এসেছে।” তারা আরও বলে, ‘এগুলো তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; তারপর এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়।’ “বলুন, ‘এটা তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় রহস্য জানেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ [আল-ফুরকান: ৪-৬] [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) এখানে এটা বলে কুরআন উদ্দেশ্য হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] অনুরূপভাবে পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে যে হক প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে তাও হতে পারে।

সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করি[১] ।

১০৬. আপনার রব-এর কাছ থেকে আপনার প্রতি যা ওহী হয়েছে আপনি তারই অনুসরণ করুন, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন ।

اِتَّبِعۡ مَاۤ اُوۡحِیَ اِلَیۡكَ مِنۡ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡمُشۡرِكِیۡنَ ﴿۱۰۶﴾

১০৭. আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তারা শির্ক করত না । আর আমরা আপনাকে তাদের হিফাযতকারী বানাইনি এবং আপনি তাদের তত্ত্বাবধায়কও নন ।

وَ لَوۡ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشۡرَكُوۡا ؕ وَ مَا جَعَلۡنٰكَ عَلَیۡهِمۡ حَفِیۡظًا ۚ وَ مَاۤ اَنۡتَ عَلَیۡهِمۡ بِوَكِیۡلٍ ﴿۱۰۷﴾

উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের নানাভাবে বর্ণনা পদ্ধতি দ্বারা যারা জানে তারা হককে জানতে পারবে, সেটা গ্রহণ করতে পারবে, সে হকের অনুসরণ করতে পারবে । আর তারা হচ্ছে, মুমিনরা যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার উপর যা নাযিল হয়েছে সে সবের উপর উপর ঈমান আনয়ন করেছিল । [মুয়াসসার]

(১) অর্থাৎ সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানীদের জন্য এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত হয়েছে । মোটকথা এই যে, হেদায়াতের সরঞ্জাম সবার সামনেই রাখা হয়েছে । কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা এর দ্বারা উপকৃত হয়নি । পক্ষান্তরে সুস্থ জ্ঞানী মনীষীরা এর মাধ্যমে সত্যের পথ প্রদর্শক হয়ে গেছেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলা হয়েছে, কে মানে আর কে মানে না- তা আপনার দেখার বিষয় নয় । আপনি স্বয়ং ঐ পথ অনুসরণ করুন, যা অনুসরণ করার জন্য আপনার রব-এর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ওহী আগমন করেছে । এর প্রধান বিষয় হচ্ছে এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই । এ ওহী প্রচারের নির্দেশও রয়েছে । এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্য পরিতাপ করবেন না যে, তারা কেন গ্রহণ করল না । এর কারণ এটাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করতেন যে, সবাই মুসলিম হয়ে যাক, তবে কেউ শির্ক করতে পারতো না । কিন্তু তাদের দুষ্কৃতির কারণে তিনি ইচ্ছা করেননি, বরং তাদেরকে শাস্তি দিতেই চেয়েছেন । তাই শাস্তির সরঞ্জামও সরবরাহ করে দিয়েছেন । এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলিম করতে পারেন? আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি এসব কাজকর্মের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন । কাজেই তাদের কাজকর্মের ব্যাপারে আপনার উদ্বিগ্ন না হওয়াই বাঞ্ছনীয় । [দেখুন, আল-মানার]

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আর আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমলংঘন করে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌কেও গালি দেবে; এভাবে আমরা প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ শোভিত করেছি; তারপর তাদের রব-এর কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর তিনি তাদেরকে তাদের করা কাজগুলো সম্বন্ধে জানিয়ে দেবেন[১]।

(১) আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মাসআলা নির্দেশিত হয়েছে যে, যে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের কারণ ও উপায় হওয়াও বৈধ নয়। কুরাইশ সর্দাররা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললঃ 'হয় তুমি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হও, না হয় আমরা তোমার প্রভুকে গালি দিবো'। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। [তাবারী] যাতে বলা হয়েছে, "আপনি ঐ প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবেন না, যাদেরকে তারা উপাস্য বনিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহ্‌কে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশবকালেও কোন মানুষকে বরং কোন জন্তুকেও কখনো গালি দেননি। সম্ভবত কোন সাহাবীর মুখ থেকে এমন কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। [তাফসীরে বায়যাভী; আইসারুত তাফাসীর] কুরাইশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদেরকে গালি-গালাজ থেকে বিরত না হলে আমরা আপনার আল্লাহ্‌কেও গালি-গালাজ করব। এতে কুরআনের এ নির্দেশ নাযিল হয়েছে। এতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে কোন কঠোর বাক্য বলতে মুসলিমদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এ ঘটনা ও এ সম্পর্কিত কুরআনী নির্দেশ একটি বিরাট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং কতিপয় মৌলিক বিধান এ থেকে বের হয়ে এসেছে।

কোন পাপের কারণ হওয়া পাপঃ উদাহরণতঃ একটি মূলনীতি এই বের হয়েছে যে, যে কাজ নিজ সত্তার দিক দিয়ে বৈধ; বরং কোন না কোন স্তরে প্রশংসনীয়ও, সে কাজ করলে যদি কোন ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা, মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা অবশ্যই বৈধ এবং ঈমানী মর্যাদাবোধের দিক দিয়ে দেখলে সম্ভবতঃ সওয়াব ও প্রশংসনীয়ও বটে, কিন্তু এর

ফলশ্রুতিতে আশংকা দেখা দেয় যে, প্রতিমাপূজারীরা আল্লাহ্ তা'আলাকে মন্দ বলবে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবে, সে এ মন্দের কারণ হয়ে যাবে। তাই এ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। [কুরতুবী; রাযী]

হাদীসে এর আরও একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বললেনঃ জাহেলিয়াত যুগে এক দুর্ঘটনায় কা'বাগৃহ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তা পুনর্নির্মাণ করে। এ পুনর্নির্মাণে কয়েকটি বিষয় প্রাচীন ইবরাহিমী ভিত্তির খেলাফ হয়ে গেছে। প্রথমতঃ কা'বার যে অংশকে 'হাতীম' বলা হয়, তাও কা'বাগৃহের অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু পুনর্নির্মাণে অর্থাভাবের কারণে সে অংশ বাদ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কা'বাগৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের এবং অপরটি প্রস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জাহেলিয়াত যুগের নির্মাতারা পশ্চিমের দরজা বন্ধ করে একটি মাত্র দরজা রেখেছে। এটিও ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চে স্থাপন করেছে, যাতে কেউ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কা'বা গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেনঃ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে সম্পূর্ণ ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু আশংকা এই যে, তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ আরব জাতি নতুন মুসলিম হয়েছে। কা'বা গৃহ বিধ্বস্ত করলে তাদের মনে বিরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই আমি আমার বাসনা মুলতবী রেখেছি। [এ ব্যাপারে দেখুন মুসলিমঃ ১৩৩৩] এটা জানা কথা যে, কা'বা গৃহকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ করা একটি 'ইবাদাত ও সওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতার কারণে এতে আশংকা আঁচ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতিই জানা গেল যে, কোন বৈধ এমনকি সওয়াবের কাজেও যদি কোন অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে সে বৈধ কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

কোন কোন মুফাস্‌সির এখানে একটি আপত্তির বিষয় উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরয করেছেন। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল এই যে, কোন মুসলিম কোন কাফেরকে হত্যা করলে কাফেররাও মুসলিমদেরকে হত্যা করবে। অথচ মুসলিমকে হত্যা করা হারাম। এখানে জিহাদ মুসলিম হত্যার কারণ হয়েছে। অতএব, উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জিহাদও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এমনিভাবে আমাদের প্রচারকার্য, কুরআন তিলাওয়াত, আযান ও সালাতের প্রতি অনেক কাফের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। অতএব, আমরা কি তাদের ভ্রান্ত কর্মের দরুন নিজ 'ইবাদাত থেকেও হাত গুটিয়ে নেব? এর জবাব এই যে, একটি জরুরী শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। শর্তটি এই যে, ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে যে বৈধ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, তা ইসলামের উদ্দিষ্ট ও জরুরী কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া

১০৯. আর তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের কাছে যদি কোন নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা এতে ঈমান আনত[১]। বলুন, 'নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র কাছেই'। আর কিভাবে তোমাদের উপলব্ধিতে আসবে যে, যখন তা (নিদর্শন) এসে যাবে, তখন

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

চাই। যেমন মিথ্যা উপাসকদের মন্দ বলা। এর সাথে ইসলামের কোন উদ্দেশ্য সম্পর্কযুক্ত নয়। এমনিভাবে কা'বা গৃহের নির্মাণকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করার উপরও ইসলামের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। তাই এগুলোর কারণে যখন কোন ধর্মীয় অনিষ্টের আশংকা দেখা দিয়েছে, তখন এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং ইসলামের উদ্দেশ্য কিংবা কোন ইসলামী উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিধর্মীদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে তাতে কোন অনিষ্টও দেখা দেয়, তবু এ জাতীয় উদ্দেশ্যকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে না। বরং এরূপ কাজ স্বস্থানে অব্যাহত রেখে যতদূর সম্ভব অনিষ্টের কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

(১) এ আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা স্বীয় জিদ ও নতুন সংস্করণ রচনা করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বিশেষ বিশেষ ধরণের মু'জিযা দাবী করছে। কুরাইশ সর্দাররা দাবী উত্থাপন করেছে যে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত হওয়ার মু'জিযা আমাদেরকে দেখাতে পারেন, তবে আমরা আপনার নবুয়ত মেনে নেব এবং মুসলিম হয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আচ্ছা, শপথ কর! যদি এ মু'জিযা প্রকাশ পায়, তবে তোমরা মুসলিম হয়ে যাবে। তারা শপথ করল। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করার জন্য দাঁড়ালেন যে, এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। তৎক্ষণাৎ জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম ওহী নিয়ে এলেন যে, আপনি চাইলে আমি এক্ষুণি এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেব। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইন অনুযায়ী এর পরিণাম হবে এই যে, এরপরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে ব্যাপক আযাব নাযিল করে সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। বিগত সম্প্রদায়সমূহের বেলায়ও তাই হয়েছে। তারা বিশেষ কোন মু'জিযা দাবী করার পর তা দেখানো হয়েছে। এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব নাযিল হয়েছে। দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের অভ্যাস ও হঠকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই দয়াপরবশ হয়ে বললেনঃ এখন আমি এ মু'জিযার দু'আ করি না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। [তাবারী; সংক্ষিপ্তসার দেখুন আত-তাফসীরুস সহীহ]

তারা ঈমান আনবে না[১]?

১১০. আর তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ঈমান আনেনি, তেমনি আমরাও তাদের অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহ পাল্টে দেব এবং আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরপাক খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেব[২]।

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

চৌদ্দতম রুকূ‘

১১১. আর আমরা তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা পাঠালেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে সমবেত করলেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছে না হলে তারা কখনো

۞ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾

(১) এ আয়াতে তাদের উক্তির জবাব দেয়া হয়েছে যে, মু‘জিযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। যেসব মু‘জিযা ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তাঁর পক্ষ থেকেই ছিল এবং যেসব মু‘জিযা দাবী করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ করতেও তিনি পূর্ণরূপে সক্ষম। কিন্তু বিবেক ও ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ দাবী করার কোন অধিকার নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতের দাবীদার এবং এ দাবীর পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য মু‘জিযা আকারে উপস্থিত করেছেন। এখন এসব যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য খণ্ডন করার এবং ভ্রান্ত প্রমাণিত করার অধিকার প্রতিপক্ষের আছে। কিন্তু এসব সাক্ষ্য খণ্ডন না করে অন্য সাক্ষ্য দাবী করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এত নিদর্শন দেখার পরও যারা ঈমান আনেনি তারা আর ঈমান আনবে না। সুতরাং তাদের জন্য নতুন কোন মু‘জিযা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। [সা‘দী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, এভাবেই আমরা তাদেরকে শাস্তি দেব। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয়নি। অথচ তাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্‌র আহ্বান ও তারই বাণী। সুতরাং তাদের অন্তর চিরন্তন পাল্টে যেতে থাকবে, ঈমান ও তাদের মাঝে বাধা এসে যাবে, তারা সঠিক পথে চলতে সক্ষম হবে না। এটা আল্লাহ্‌র ইনসাফেরই দাবী। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা তাদের নিজের উপর অপরাধ করে, তাঁর অবারিত রহমত দর্শনের পরও তাতে অবগাহন না করে, সঠিক পথ দেখানোর পরও তাতে না চলে, তিনি তাদের থেকে সেটা গ্রহণ করার তাওফীক উঠিয়ে নেন। [সা‘দী]

ঈমান আনবে না; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ[১]।

১১২. আর এভাবেই আমরা মানব ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি[২], প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা একে অপরকে চমকপ্রদ বাক্যের কুমন্ত্রণা দেয়। যদি আপনার রব ইচ্ছে করতেন তবে তারা এসব করত না; কাজেই আপনি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রটনাকে পরিত্যাগ করুন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩. আর তারা এ উদ্দেশ্যে কুমন্ত্রণা দেয় যে, যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের মন যেন সে চমকপ্রদ কথার প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয়। আর তারা যে অপকর্ম করে তাই যেন তারা করতে থাকে[৩]।

وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৪. (বলুন) 'তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ফয়সালাকারী হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন!' আর আমরা যাদেরকে

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۗ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾

---

(১) আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আমি তাদের প্রার্থিত মু'জিযাসমূহ দেখিয়ে দেই; বরং এর চাইতেও বেশী ফিরিশ্‌তাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ এবং মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দেই, তবুও তারা মানবে না। [মুয়াসসার]

(২) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এরা যদি আপনার সাথে শত্রুতা করে, তবে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সমস্ত নবীদেরও অব্যাহতভাবে শত্রু ছিল। তারাও নবী-রাসূলগণ যা নিয়ে আসত, তার বিরুদ্ধে লেগে যেত। অতএব, আপনি এতে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। [সা'দী]

(৩) এতে এসব পাপাচারী কাজের কারণে তাদের প্রতি ধমকি দেয়া উদ্দেশ্য। [মুয়াসসার]

কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, নিশ্চয় এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে যথাযথভাবে নাযিলকৃত[১]। কাজেই আপনি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না[২]।

(১) অর্থাৎ তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলার এ ফয়সালার পর আমি অন্য কোন ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি? না, তা হতে পারে না। এরপর কুরআনুল কারীমের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কুরআনের সত্যতা এবং আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ারই প্রমাণ। বলা হয়েছে যে, (এক) কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলৌকিক গ্রন্থ- এর মোকাবেলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম। (দুই) যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত কিতাব নাযিল করার দু’টি অর্থ হতে পারে। এক. এখানে হারাম ও হালালের বিধান সম্পূর্ণভাবে বিবৃত করা হয়েছে। কোন প্রকার সন্দেহে ফেলে রাখা হয়নি। দুই. এ কুরআন একসাথে নাযিল করা হয়নি, বরং পর্যায়ক্রমে কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল করা হয়েছে। যাতে করে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয়। আর যাতে করে তা থেকে প্রয়োজনীয় বিধান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। [কুরতুবী, বাগভী] (তিন) পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও নাসারারাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সত্য কালাম। এরপর তাদের মধ্যে যারা সত্যভাষী ছিল, তারা এ কথা প্রকাশও করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, তারা বিশ্বাস সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেনি। [ফাতহুল কাদীর]

(২) কুরআনুল কারীমের এ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর “আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না”। এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সময়ই সংশয়কারী ছিলেন না, থাকতে পারেন না। তাই এখানে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে উম্মতের অন্যান্য লোকদেরকে শোনানই এর উদ্দেশ্য। এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে সরাসরি তাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেই যখন এরূপ বলা হয়েছে, তখন অন্য আর কে এরূপ সন্দেহ করতে পারে? [ফাতহুল কাদীর] অথবা এখানে ধরে নেয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আর ধরে নেয়ার পর্যায়ে থাকলে সেটা হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। [ইবন কাসীর] আয়াতের আরেক অনুবাদ হচ্ছে যে, ‘আপনি এ ব্যাপারে সন্দেহে থাকবেন না যে, যাদের ওপর কিতাব নাযিল হয়েছে তারা এর সত্যতা সম্পর্কে জানে’। [বাগভী, কুরতুবী]

১১৫. আর সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রব-এর বাণী পরিপূর্ণ(১)। তাঁর বাক্যসমূহের পরিবর্তনকারী কেউ নেই(২)। আর তিনি সর্বশ্রোতা,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾

(১) এ আয়াতে কুরআনুল কারীমের আরো দু'টি বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোও কুরআনুল কারীম যে আল্লাহ্‌র কালাম, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা হয়েছে, 'আপনার রব-এর কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ। তাঁর কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই।' এখানে ﴿وَتَمَّتْ﴾ শব্দে পরিপূর্ণ হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। [তাবারী] কুরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু'প্রকার- (এক) যাতে বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, অবস্থা, সৎকাজের জন্য পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎ কাজের জন্য শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং (দুই) যাতে মানব জাতির কল্যাণ ও সাফল্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। কুরআনুল কারীমের এ দু'প্রকার সাফল্য সম্পর্কে ﴿صِدْقًا وَّعَدْلًا﴾ দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। صدق এর সম্পর্ক প্রথম প্রকারের সাথে; অর্থাৎ কুরআনে যেসব ঘটনা, অবস্থা, ওয়াদা ও ভীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। এগুলোতে কোনরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। عدل এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ বিধানের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সব বিধান عدل তথা ন্যায়বিচার ভিত্তিক। [ইবন্ কাসীর] অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্তিশীল। এতে কারো প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোন কঠোরতাও নেই যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্ ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কারো প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৮৬]

কুরআনুল কারীমের এ অবস্থাটি অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন সবই সত্য; এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআন বর্ণিত যাবতীয় বিধান সমগ্র বিশ্ব ও কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক, এগুলোতে কারো প্রতি কোনরূপ অবিচার নেই এবং সমতা ও মধ্যবর্তিতার চুল পরিমাণও লঙ্ঘন নেই। কুরআনের এ বৈশিষ্ট্য আরো প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম।

(২) কুরআনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ﴾ অর্থাৎ আল্লাহর কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই।' তিনি যেটা যে সময়ে হবে বলেছেন সেটা সে সময়ে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। সেটাকে রদ বা পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা কারো নেই। [তাবারী] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর অর্থ বলেন, আল্লাহ্‌র ফয়সালাকে কেউ রদ করতে পারবে না। তাঁর বিধানকে পরিবর্তন করার অধিকার কারও নেই। অনুরূপভাবে তাঁর ওয়াদার বিপরীতও হবার নয়। [বাগভী] পরিবর্তনের এক প্রকার

সর্বজ্ঞ(১)।

১১৬. আর যদি আপনি যমীনের অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে(২)। তারা তো শুধু ধারণার

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

হচ্ছে যে, এতে কোন ভুল প্রমাণিত করার কারণে পরিবর্তন করা । পূর্ব আয়াতে আল্লাহ্‌র কালামকে পূর্ণ বলার কারণে কারো মনে আসতে পারে যে, কোন কিছু পূর্ণ হওয়ার পর তাতে কি আবার অপূর্ণাঙ্গতা আসবে? এ রকম প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়েছে। আর পরিবর্তনের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে জবরদস্তিমূলকভাবে পরিবর্তন করা। যেমন এর পূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জীলকে পরিবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কালাম এ সকল প্রকার পরিবর্তনেরই উর্ধ্বে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ওয়াদা করেছেনঃ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ অর্থাৎ "আমরাই এ কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষক"। [সূরা আল-হিজর:৯] এমতাবস্থায় কার সাধ্য আছে যে, এ রক্ষাবূহ্য ভেদ করে এতে পরিবর্তন করে? [রুহুল মা'আনী] কুরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রতি শতাব্দি ও প্রতি যুগে এর শত্রুদের সংখ্যাও এর অনুসারীদের তুলনায় বেশী ছিল; কিন্তু এর একটি যের-যবর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারো হয়নি। অবশ্য একটি তৃতীয় প্রকার পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। তা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে রহিত করে পরিবর্তন করতে পারতেন। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কুরআনের পরে আর কোন নবী ও কিতাব আসবে না। এমনকি ঈসা আলাইহিস সালাম যখন আবার আসবেন তিনি এ কুরআন অনুসারেই জীবন অতিবাহিত করবেন। [রুহুল মা'আনী] এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ রাসূল এবং কুরআন সর্বশেষ কিতাব। একে রহিতকরণের আর কোন সম্ভাবনা নেই। কুরআনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরো সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(১) আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ অর্থাৎ তারা যেসব কথাবার্তা বলছে, আল্লাহ্ সব শোনেন এবং সবার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত অবস্থা জানেন। তিনি প্রত্যেকের কার্যের প্রতিফল দেবেন। [তাবারী; আল- মানার; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। [ইবন কাসীর] আপনি এতে ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। কুরআন একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে, "আর তাদের আগেও পূর্ববর্তীদের বেশীর ভাগ বিপথগামী হয়েছিল" [সূরা আস-সাফফাত:৭১] অন্যত্র বলা হয়েছে, "আপনি যতই চান না কেন, বেশীর ভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয়।"

অনুসরণ করে; আর তারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।

১১৭. নিশ্চয় আপনার রব, কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে অধিক অবগত। আর সৎপথে যারা আছে, তাদের সম্বন্ধেও তিনি অধিক অবগত।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾

১১৮. সুতরাং তোমরা তাঁর আয়াতসমূহে ঈমানদার হলে, যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তা থেকে খাও;

فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

১১৯. আর তোমাদের কি হয়েছে যে, যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তা থেকে খাবে না? যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের কাছে বিবৃত করেছেন(১), তবে তোমরা নিরুপায়

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

[সূরা ইউসুফ: ১০৩] সুতরাং অনুসরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আলেমদেরই অনুসরণ করতে হবে। যারা জানে না তারা যত বেশীই হোক না কেন তাদের অনুসরণ পথভ্রষ্টতাই ডেকে আনবে [আইসারুত তাফাসীর] এ আয়াত দ্বারা আরো বুঝা গেল যে, সংখ্যাধিক্যতা কোন অবস্থাতেই সঠিক হওয়ার দলীল নয়। কারণ হক বা সঠিক পথ ও মত দলীল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যালঘুতার ভিত্তিতে নয়। সাধারণত, হকপন্থীরা সংখ্যায় কম থাকে, কিন্তু তারা আল্লাহর নিকট সওয়াবের দিক থেকে অধিক অগ্রগামী [সা'দী]

(১) অর্থাৎ কোনটি হারাম আর কোনটি হালাল তার বিশদ বিবরণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোস্ত , আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা পশু, গলা চিপে মারা যাওয়া জন্তু, প্রহারে মারা যাওয়া জন্তু, উপর থেকে পড়ে মারা যাওয়া জন্তু , অন্য প্রাণীর শিং এর আঘাতে মারা যাওয়া জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু ; তবে যা তোমরা যবেহ্ করতে পেরেছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলী দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ নির্ণয় করা, এসব পাপ কাজ। ...অতঃপর কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তবে

হলে তা স্বতন্ত্র [১]। আর নিশ্চয় অনেকে অজ্ঞতাবশত নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অন্যকে বিপথগামী করে; নিশ্চয় আপনার রব সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে অধিক জানেন।

১২০. আর তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর; নিশ্চয় যারা পাপ অর্জন করে অচিরেই তাদেরকে তারা যা অর্জন করে তার প্রতিফল দেয়া হবে।

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ یَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَیُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا یَقْتَرِفُوْنَ ﴿۱۲۰﴾

১২১. আর যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা খেও না; এবং নিশ্চয় তা গর্হিত[২]। নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর,

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّیٰطِیْنَ لَیُوْحُوْنَ اِلٰۤی اَوْلِیٰٓـِٕهِمْ لِیُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-মায়িদাহ: ৩] তবে সূরা আল-মায়িদার এ আয়াতটি মদীনায় আবতীর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা আল-আন‘আমের এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সে জন্য কুরতুবী বলেন, এখানে ‘বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন’ বলে ‘বিস্তারিত বর্ণনা করবেন’ বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] তাছাড়া এ সূরাতেই ১৪৫ নং আয়াতে হারাম বস্তুসমূহের কিছু বর্ণনা এসেছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) অর্থাৎ উপরোক্ত হারামকৃত বস্তুসমূহও তোমাদের অপারগ অবস্থায় খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন কেউ ক্ষুধায় কাতর হয়ে হালাল বস্তু না পেলে নিরুপায় অবস্থায় তার জন্য মৃত বস্তুও খাওয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। [সা‘দী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ যার উপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় নি এমন বস্তু খাওয়া ফিস্‌ক। এখানে ফিস্‌ক অর্থ আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তার বহির্ভূত [জালালাইন] সুতরাং যে সমস্ত প্রাণীর যবেহ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না হয়ে অপর কোন কিছুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে, যেমন মূর্তি বা দেব-দেবীর নামে যবেহ করা হবে, তাও এ আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে। অনুরূপভাবে ইচ্ছাকৃত আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করলে সে প্রাণীও অধিকাংশ আলেমের নিকট এ আয়াতের আওতাভুক্ত হওয়ার কারণে হারাম হবে। [সা‘দী]

তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক[১]।

পনরতম রুকূ‘

১২২. যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমরা পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সেখান থেকে আর বের হবার নয়? এভাবেই কাফেরদের জন্য তাদের কাজগুলোকে শোভন করে দেয়া হয়েছে।

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক জনপদে সেখানকার অপরাধীদের প্রধানকে সেখানে চক্রান্ত করতে দিয়েছি; কিন্তু তারা শুধু তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, অথচ তারা উপলব্ধি করে না।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. আর যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, ‘আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে যা দেয়া হয়েছিল আমাদেরকেও তার অনুরূপ না দেয়া পর্যন্ত আমরা কখনো ঈমান আনব না।’

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

---

(১) কাফেররা যখন শুনল যে, মুসলিমরা নিজে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যা যবাই করে তা খায়, আর যা যবাই করা হয় নি, এমনিতেই মারা যায় তারা তা খায় না, তখন তারা বলতে লাগল, ‘আল্লাহ্ স্বয়ং যেটা যবাই করলেন সেটা তোমরা খাও না, অথচ যেটা তোমরা যবাই কর সেটা খাও, (অর্থাৎ এটা কেমন কথা?) [আবু দাউদ: ২৮১৮; ইবন মাজাহ: ৩১৭৩] আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের এ কথার জবাব দিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন [সা‘দী] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আনুগত্যের মধ্যেও শির্ক রয়েছে [কিতাবুত তাওহীদ] অর্থাৎ কেউ কোন কিছু শরী‘আত হিসেবে প্রবর্তন করলো আর অন্যরা তার আনুগত্য করলো, এতে যারা শরী‘আত হিসেবে প্রবর্তন করলো তারা হলো, তাগুত। আর যারা তার আনুগত্য করে সেটা মেনে নিলো তারা আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করলো। [আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস. ৭৮-৭৯, ৪৯০-৪৯৩, ৯৯৫-১০৩১, ১১০৫-১১১৫]

আল্লাহ্ তাঁর রিসালাত কোথায় অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন। যারা অপরাধ করেছে, তাদের চক্রান্তের কারণে আল্লাহ্র কাছে[১] লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি অচিরেই তাদের উপর আপতিত হবে[২]।

১২৫. সুতরাং আল্লাহ্ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ খুব সংকীর্ণ করে দেন; (তার কাছে ইসলামের অনুসরণ) মনে হয় যেন সে কষ্ট করে আকাশে উঠছে[৩]। এভাবেই আল্লাহ্

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِۗ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾

(১) 'আল্লাহ্র কাছে' -এর এক অর্থ এই যে, তারা নিজেদেরকে সম্মানিত ভাবলেও আল্লাহ্র নিকট তারা সম্মানিত নয়। অথবা কেয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে, তখন অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ এই যে, এখানে অর্থ হবে, 'আল্লাহর কাছ থেকে' অর্থাৎ বর্তমানে বাহ্যতঃ তারা সর্দার ও সম্মানিত হলেও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে। এমনটি দুনিয়াতেও হতে পারে এবং আখেরাতেও। [কুরতুবী] যেমন, নবীগণের শত্রুদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এরূপ হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ তাদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বড় বড় শত্রু, যারা নিজেরা সম্মানী বলে খুব আস্ফালন করত, তারা একে একে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয় অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমূখ কুরাইশ সর্দারদের অবস্থা বিশ্ববাসীর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

(২) অর্থ এই যে, সত্যের যেসব শত্রু আজ স্বগোত্রে সর্দার ও বড় লোক খেতাবে ভূষিত, অতিসত্বর তাদের বড়ত্ব ও সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। [কুরতুবী] আল্লাহ্র কাছে তারা তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং কঠোর শাস্তিতে পতিত হবে। যা তাদের বর্তমান অহংকারেরই যথাযথ শাস্তি। [সা'দী]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছে, "যাকে আল্লাহ্ হেদায়াত দিতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন"। বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ, সহজ করে দেয়া, উদ্যমী করা। আল্লাহ

শাস্তি দেন তাদেরকে, যারা ঈমান আনে না[১]।

১২৬. আর এটাই আপনার রব নির্দেশিত

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا

তা‘আলা অন্য আয়াতে বলেছেনঃ “যার বক্ষকে আল্লাহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ফলে সে তার প্রভূর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নূরের উপর থাকে” [সূরা আয-যুমারঃ ২২] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ “কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে পছন্দনীয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিয়েছেন আর তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন কুফরী, ফাসেকী এবং অবাধ্যতা” [সূরা আল-হুজুরাতঃ ৭]। ইবনে আব্বাস বলেনঃ বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ হলোঃ তাওহীদ ও ঈমানের জন্য তা প্রশস্ত হওয়া। [ইবন কাসীর] তারপর আল্লাহ বলছেনঃ “আর যাকে আল্লাহ্ তা‘আলা পথভ্রষ্ট রাখতে চান, তার অন্তর সংকীর্ণ এবং অত্যাধিক সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারো আকাশে আরোহণ করা”। মুলতঃ বক্ষ সংকীর্ণ করার অর্থ, কঠিন, দুর্ভেদ্য করে দেয়া। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ মুনাফিকের কাল্ব হলো অনুরূপ সেখানে কোন ভাল কিছু পৌঁছুতে পারে না। [তাবারী; ইবন কাসীর] মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেন, এর অর্থ, সন্দেহে পড়ে থাকা। মানসিক অশান্তিতে বিরাজ করা। [ইবন কাসীর] আজ সমগ্র বিশ্ব এসব সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে নিপতিত। তারা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতে সচেষ্ট। অথচ এটা এর নির্ভুল পথ নয়। সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই ছিল যথার্থ পথ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নেয়ামত কল্পনায় উপস্থিত করে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য ও ভালবাসা সৃষ্টি করলে সন্দেহ সংশয় আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর রাসূল মূসা আলাইহিস সালাম-কে এ দু‘আ করার আদেশ দিয়েছেনঃ “হে আমার রব! আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিন”। [সূরা ত্বা-হাঃ ২৫]।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের প্রতি ধিক্কার দেন। তাদের অন্তরে সত্য আসন পায় না এবং তারা প্রত্যেক মন্দ ও অপকর্মে সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে ‘রিজস’ বলে কি বুঝানো হয়েছে তাতে কয়েকটি মত বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ এর দ্বারা শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সংকীর্ণ বক্ষে শয়তান ঝেঁকে বসে থাকে, ফলে তার ঈমান আনা নসীব হয় না। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ ‘রিজস’ দ্বারা কল্যাণহীন বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ঈমান আনবেনা তাদের মন সংকীর্ণ হওয়ার কারণে সেখানে কোন কল্যাণ নেই। আব্দুর রাহমান ইবনে যাইদ ইবনে আসলাম বলেনঃ এখানে ‘রিজস’ দ্বারা আযাব বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ঈমান আনবেনা তাদের উপর আযাব নির্ধারিত হয়ে আছে। [তাবারী; বাগভী; ইবন কাসীর]

الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

সরল পথ[১]। যারা উপদেশ গ্রহণ করে আমরা তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি[২]।

(১) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ এটা আপনার পালনকর্তার সরল পথ। এখানে هذا (এটা) শব্দ দ্বারা ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মতে কুরআনের দিকে এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মতে ইসলামের দিকে ইশারা করা হয়েছে। অথবা পূর্বে বর্ণিত বিষয়াদি যা দ্বীন হিসেবে পরিগণিত। [বাগভী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে, আপনাকে প্রদত্ত কুরআন কিংবা ইসলাম আপনার রব-এর পথ। অর্থাৎ এমন পথ, যা আপনার পালনকর্তা স্বীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্থির করেছেন এবং মনোনীত করেছেন। এখানে পথকে রব-এর দিকে সম্পৃক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন ও ইসলামের যে কর্মব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেয়া হয়েছে, তা পালন করা আল্লাহ্ তা'আলার উপকারের জন্য নয়, বরং পালনকারীদের উপকারের জন্য পালনকর্তার দাবীর ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে এমন শিক্ষাই দান করা উদ্দেশ্য যা তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে।

(২) এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ (এক) رب শব্দকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্বোধন করে তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশ করা হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] কেননা, পালনকর্তা ও উপাস্যের দিকে কোন বান্দাকে সামান্যতম সম্বন্ধ করা বান্দার জন্য পরম গৌরবের বিষয়। তদুপরি যদি পরম পালনকর্তা নিজেকে বান্দার দিকে সম্বন্ধ করে বলেন যে, "এটা আপনার প্রভূর রাস্তা" তখন তার সৌভাগ্যের সীমা-পরিসীমা থাকে না। বান্দার মনে তখন সদা জাগরুক থাকে যে, এটা আল্লাহ্‌র দেয়া পথ। (দুই) مستقيماً শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআনের এ পথই হলো সরল পথ। এখানেও مستقيماً কে صراط এর বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ না করে অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর; আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর] এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব পালকের স্থিরীকৃত পথ মুস্তাকীম বা সরল হওয়া ছাড়া আর কোন সম্ভাবনাই নাই। এ পথে চলে ভ্রষ্ট হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এতে বাড়াবাড়ি বা ছাড় প্রবণতা নেই। আঁকাবাকা পথে নয় বরং স্বাভাবিক পথের দিকেই এটি মানুষকে ধাবিত করে [বাগভী; মানার] (তিন) আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, "আমরা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহকে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছি"। এখানে ﴿فَصَّلْنَا﴾ শব্দটি تفصيل থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এক এক অধ্যায়কে পৃথক পৃথক করে বিশদভাবে বর্ণনা করা। এভাবে গোটা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। অতএব, تفصيل এর সারমর্ম হচ্ছে বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মৌলিক বিষয়গুলোকে পরিস্কার ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, এতে কোন সংক্ষিপ্ততা

১২৭. তাদের রব-এর কাছে তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আলয়[১] এবং তারা যা করত তার জন্য তিনিই তাদের অভিভাবক[২]।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

বা অস্পষ্টতা রাখিনি। [আইসারুত তাফাসীর] (চার) এতে ﴿لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ﴾ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুরআনের বক্তব্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট ও পরিস্কার হলেও, তা দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কুরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা করে; জিদ, হঠকারিতা এবং পৈতৃক প্রথার নিশ্চল অনুসরণের প্রাচীর যাদের সামনে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। [তাবারী; সা'দী]

(১) অর্থাৎ উপরোক্ত ব্যক্তি, যারা মুক্ত মনে উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কুরআনের পয়গাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ কুরআনী নির্দেশ মেনে চলে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে 'দারুস্-সালাম'-এর পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে 'দার' শব্দের অর্থ গৃহ এবং 'সালাম' শব্দের অর্থ যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা। কাজেই 'দারুস্-সালাম' এমন গৃহকে বলা যায়, যেখানে কষ্ট-শ্রম, দুঃখ, বিষাদ, বিপদাপদ ইত্যাদির সমাগম নেই। নিঃসন্দেহে এটা জান্নাতই হতে পারে। [তাবারী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] অথবা দারুস সালাম এ জন্যই তাদের জন্য থাকবে, কারণ তারা সিরাতে মুস্তাকিমে চলার কারণে নিজেদেরকে নিরাপত্তায় রাখতে সামর্থ হয়েছে। সুতরাং তাদের প্রতিফল তো তা-ই হওয়া বাঞ্ছনীয় যা নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আবদ্ধ। [ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'সালাম' আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম। 'দারুস্-সালাম' অর্থ আল্লাহ্‌র গৃহ। আল্লাহ্‌র গৃহ বলতে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বোঝায়। অতএব, সার অর্থ আবারো তাই হয় যে, এমন গৃহ যাতে শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি বিদ্যমান। অর্থাৎ জান্নাত। [তাবারী] জান্নাতকে দারুস্-সালাম বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একমাত্র জান্নাতই এমন জায়গা, যেখানে মানুষ সর্বপ্রকার কষ্ট, উৎকণ্ঠা, উপদ্রব ও স্বভাব বিরুদ্ধ বস্তু থেকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে নিরাপদ থাকে। [সা'দী] এরূপ নিরাপত্তা জগতে কোন রাজাধিরাজ এবং নবী-রাসূলও কখনো লাভ করেন না। কেননা, ধ্বংসশীল জগত এরূপ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী শান্তির জায়গাই নয়।

(২) আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব সৌভাগ্যশালীর জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে 'দারুস্-সালাম' রয়েছে। 'প্রতিপালকের কাছে' -এর অর্থ এই যে, এ দারুস্-সালাম দুনিয়াতে নগদ পাওয়া যাবে না; কেয়ামতের দিন যখন তারা স্বীয় রব-এর কাছে যাবে, তখনই তা পাবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দারুস্-সালামের ওয়াদা ভ্রান্ত হতে পারে না। রব নিজেই এর জামিন। তাঁর কাছে তা সংরক্ষিত রয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দারুস্-সালামের নেয়ামত ও আরাম আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে প্রতিপালকের কাছে এ ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে, তিনিই তা জানেন। [সা'দী]

১২৮. আর যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং বলবেন, 'হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা তো অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করেছিলে[১]' এবং মানুষের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অপর কিছু সংখ্যক দ্বারা লাভবান হয়েছে এবং আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি'। আল্লাহ্ বলবেন, 'আগুনই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ۚ يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, তাদের সৎকর্মের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অভিভাবক। [ইবন কাসীর] দুনিয়াতে অভিভাবক হিসেবে তিনি তাদেরকে সঠিক পথের হিদায়াত দেন। আর আখেরাতে তাদেরকে উপযুক্ত প্রতিফল দেন। [বাগভী] আর আল্লাহ্ যাদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে যান, তাদের সব মুশকিল আসান হয়ে যায়।

(১) এ আয়াতে হাশরের ময়দানে সব জিন ও মানবকে একত্রিত করার পর উভয় দলের সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শয়তান জ্বিনদেরকে সম্বোধন করে তাদের অপরাধ ব্যক্ত করবেন এবং বলবেন, তোমরা মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার কাজে ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছ। তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র পথ থেকে দূরে রেখেছ। আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলে। তোমরা মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করেছ। সুতরাং আজ তোমাদের উপর আমার লা'নত অবশ্যম্ভাবী, আমার শাস্তি অপ্রতিরোধ্য। তোমাদের অপরাধ অনুপাতে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিব। কিভাবে তোমরা আমার নিষিদ্ধ বিষয়ে অগ্রগামী হলে? কিভাবে আমার রাসূল ও নেক বান্দাদের বিরোধিতায় লিপ্ত হলে? অন্যদের পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারে তোমাদের কোন ওজর আপত্তি শোনা হবে না। আজ তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করারও কেউ নেই। তখন তাদের উপর যে শাস্তি, অপমান ও লাঞ্ছনা আপতিত হবে সেটা অবর্ণনীয়। এর উত্তরে জিনরা কি বলবে, কুরআন তা উল্লেখ করেনি। তবে এটা বোঝা যায় যে, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলার সামনে স্বীকারোক্তি করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তি উল্লেখ না করার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ প্রশ্ন শুনে তারা এমন হতবাক হয়ে যাবে যে, উত্তর দেয়ার জন্য মুখই খুলতে পারবে না। [সা'দী]

সেখানে স্থায়ী হবে,' যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছে করেন। নিশ্চয় আপনার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ(১)।

১২৯.আর এভাবেই আমরা যালিমদের কতককে কতকের বন্ধু বানিয়ে দেই, তারা যা অর্জন করত তার

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾

(১) এরপর মানব শয়তান অর্থাৎ দুনিয়াতে যে সমস্ত মানব শয়তানদের অনুগামী ছিল, নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র দরবারে একটি উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রশ্ন যদিও তাদেরকে করা হয়নি; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে তাদেরকেও যেন সম্বোধন করা হয়েছিল। কেননা, তারাও শয়তান জিনদের কাজ অর্থাৎ পথভ্রষ্টতাই প্রচার করেছিল। এ প্রাসঙ্গিক সম্বোধনের কারণে তারা উত্তর দিয়েছে। কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মানবরূপী শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হয়ে থাকবে। তা স্পষ্টতঃ এখানে উল্লেখ করা না হলেও অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ "হে আদম সন্তানরা! আমি কি তোমাদেরকে নবীগণের মাধ্যমে অঙ্গীকার নেইনি যে, শয়তানের ইবাদাত (অনুসরণ) করো না"? [সূরা ইয়াসীন:৬০] এতে বোঝা যায় যে, এ সময়ে মানুষ শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হবে। তারা উত্তরে স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা শয়তানদের কথা মান্য করার অপরাধ করেছি। তারা আরো বলবেঃ হ্যাঁ, জিন শয়তানরা আমাদের সাথে এবং আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ফল লাভ করেছি। মানুষ শয়তানরা তাদের কাছ থেকে এ ফল লাভ করেছে যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আহরণের উপায়াদি শিক্ষা করেছে এবং কোথাও কোথাও জিন শয়তানদের দোহাই দিয়ে কিংবা অন্য পন্থায় তাদের কাছ থেকে সাহায্যও লাভ করেছে; যেমন, মূর্তিপূজারীর মধ্যে বরং বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক মূর্খ মুসলিমের মধ্যেও এ পন্থা প্রচলিত আছে, যা দ্বারা শয়তান ও জিনদের কাছ থেকে কোন কোন কাজে সাহায্য নেয়া যায়। জিন শয়তানরা মানুষদের কাছ থেকে যে ফল লাভ করেছে, তা এই যে, তাদের কথা অনুসরণ করা হয়েছে এবং তারা মানুষকে অনুগামী করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি তারা মৃত্যু ও আখেরাতকে ভুলে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তারা স্বীকার করবে যে, শয়তানের বিপথগামী করার কারণে আমরা যে মৃত্যু ও আখেরাতকে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন তা সামনে এসে গেছে। এখন আপনি যে শাস্তি দিতে চান তা দিতে পারেন। কারণ এখন আপনারই একচ্ছত্র ক্ষমতা। এভাবে তারা যেন আল্লাহ্‌র কৃপাই পেতে চাইবে। কিন্তু এটা কৃপা করার সময় নয়। তাই এ স্বীকারোক্তির পর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তোমরা উভয় দলের অপরাধের শাস্তি এই যে, তোমাদের বাসস্থান হবে অগ্নি, যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। তবে আল্লাহ্ কাউকে তা থেকে বের করতে চাইলে তা ভিন্ন কথা। কুরআনের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাও চাইবেন না। তাই অনন্তকালই সেখানে থাকতে হবে। [সা'দী]

কারণে (১)।

ষোলতম রুকূ'

১৩০. 'হে জিন ও মানুষের দল! তোমাদের মধ্য থেকে কি রাসূলগণ তোমাদের কাছে আসেনি যারা আমার নিদর্শন তোমাদের কাছে বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত?' তারা বলবে, 'আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম।' বস্তুত

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝

(১) আয়াতে نُوَلِّى শব্দটির আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি অর্থ হতে পারে। মুফাস্‌সিরীন সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে উভয় প্রকার অর্থই বর্ণিত আছে। (এক) শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেয়া, বন্ধু বানিয়ে দেয়া। যারা তাদেরকে তাদের কর্মের কারণে পথভ্রষ্টতার দিকে চালিত করবে। আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, ইবন যায়েদ, মালেক ইবনে দীনার রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমূখ মুফাস্‌সিরীন থেকে এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের তাফসীর এরূপ বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা একজন যালিমকে অপর যালিমের উপর শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেন এবং এভাবে এক কে অপরের হাতে শাস্তি দেন। তাদের অপরাধের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর এমন কাউকে বসাবেন, এমন কাউকে সাথে জুড়ে দেবেন যারা তাদেরকে হক পথে চলা থেকে দূরে রাখবে, হক পথের প্রতি ঘৃণা ছড়াবে। খারাপ কাজের প্রতি উৎসাহ দেবে। এভাবেই মানুষের মধ্যে যখন ফাসাদ ও যুলমের আধিক্য হয়, আর আল্লাহ্‌র ফরয আদায়ে মানুষের মধ্যে গাফিলতি সৃষ্টি হয় তখনই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর তাদের গোনাহের শাস্তিস্বরূপ এমন কাউকে বসিয়ে দেন যারা তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবে। [বাগভী; ইবন কাসীর; সা'দী] (দুই) আয়াতে বর্ণিত نُوَلِّى শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে, পরস্পরকে যুক্ত করে দেয়া ও নিকটবর্তী করে দেয়া। সায়ীদ ইবনে যুবায়ের, কাতাদাহ্ রাহিমাহুমাল্লাহ্ প্রমূখ মুফাস্‌সিরগণ প্রথমোক্ত অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মানুষের দল বিভিন্ন বংশ, দেশ কিংবা ভাষার ভিত্তিতে হবে না; বরং কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে হবে। আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল মুসলিম যেখানেই থাকবে, সে মুসলিমদের সাথী হবে, তাদের বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে যতই দূরত্ব ও পার্থক্য থেকে থাকুক না কেন। এরপর মুসলিমদের মধ্যেও সৎ ও দ্বীনী লোকেরা সৎ ও দ্বীনী লোকদের সাথে থাকবে এবং পাপী ও কুকর্মীদেরকে পাপী ও কুকর্মীদের সাথে যুক্ত করে দেয়া হবে। [বাগভী; ইবন কাসীর]।

দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল[১], আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্যও দেবে, যে তারা কাফের ছিল[২] ।

---

(১) এ আয়াতে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে । এ প্রশ্নটি হাশরের ময়দানে জিন ও মানবকে করা হবে । প্রশ্নটি এইঃ তোমরা কি কারণে কুফর ও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় লিপ্ত হলে? তোমাদের কাছে কি আমার নবী পৌঁছেননি? তিনি তো তোমাদের মধ্য থেকেই ছিল এবং আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাত, আজকের দিনের উপস্থিতি এবং হিসাব-কিতাবের ভয় প্রদর্শন করত । এর উত্তরে তাদের সবার পক্ষ থেকে নবীগণের আগমন, আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছানো এবং এতদসত্ত্বেও কুফরে লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে । [কুরতুবী] এ ভ্রান্ত কর্মের কোন কারণ ও হেতু তাদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়নি; বরং আল্লাহ্ নিজেই এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, ﴿وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا﴾ অর্থাৎ তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ভোগ-বিলাস ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। ফলে তারা একেই মূখ্য মনে করে বসেছে, অথচ এটা প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয় । এভাবে তারা দুনিয়ার জীবনে রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করেছিল, তাদের আনিত সত্যে ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল । তাদের উপস্থাপিত মু'জিযার বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল । [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ এভাবে তারা হাশরের মাঠে নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে যে, তারা দুনিয়াতে কাফের ছিল । আয়াতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, অন্য কতিপয় আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে মুশরিকদেরকে কুফর ও শির্ক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা মুখ মুছে অস্বীকার করবে এবং রব-এর দরবারে কসম খেয়ে মিথ্যা বলবে, ﴿وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ﴾ অর্থাৎ আমাদের রব-এর কসম, আমরা কখনো মুশরিক ছিলাম না । [সূরা আল-আন'আম:২৩] অথচ এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা অনুতাপ সহকারে স্বীয় কুফর ও শির্ক স্বীকার করে নেবে । অতএব, আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধিতা দেখা দেয় । কিন্তু অন্যান্য আয়াতে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রথমে যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তখন তারা অস্বীকার করবে । সে মতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরাত-বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দেবেন । হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নেবেন । সেদিন আল্লাহ্‌র কুদরাতে সেগুলো বাকশক্তিপ্রাপ্ত হবে । সেগুলো পরিস্কারভাবে তাদের কুকর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে দেবে । তখন জিন ও মানব জানতে পারবে যে, তাদের হাত, পা, কান, জিহ্বা সবই ছিল আল্লাহ্‌র গুপ্ত প্রহরী, যারা সব কাজ-কারবার ও অবস্থার অভ্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করছে । এমতাবস্থায় তাদের আর অস্বীকার করার জো থাকবে না । তখন তারা সবাই পরিস্কার ভাষায় অপরাধ স্বীকার করে নেবে । [যামাখশারী; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

১৩১. এটা এ জন্যে যে, অধিবাসীরা যখন গাফেল থাকে, তখন জনপদসমূহের অন্যায় আচরনের জন্য তাকে ধ্বংস করা আপনার রব-এর কাজ নয়[১] ।

ذٰلِكَ اَنۡ لَّمۡ يَكُنۡ رَّبُّكَ مُهۡلِكَ الۡقُرٰى بِظُلۡمٍ وَّاَهۡلُهَا غٰفِلُوۡنَ ﴿١٣١﴾

১৩২. আর তারা যা আমল করে, সে অনুসারে প্রত্যেকের মর্যাদা রয়েছে এবং তারা যা করে সে সম্বন্ধে আপনার রব গাফেল নন ।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوۡا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩. আর আপনার রব অভাবমুক্ত, দয়াশীল[২] । তিনি ইচ্ছে করলে

وَرَبُّكَ الۡغَنِىُّ ذُو الرَّحۡمَةِ ؕ اِنۡ يَّشَاۡ يُذۡهِبۡكُمۡ

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূল প্রেরণ করা আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক । তিনি কোন জাতির প্রতি এমনিতেই শাস্তি প্রেরণ করেন না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে পূর্বাহ্নে নবীদের মাধ্যমে জাগ্রত করা হয় এবং হিদায়াতের আলো প্রেরণ করা হয় । যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে আদেশ-নিষেধ প্রদান না করবে । তাদেরকে আদেশ না মানার পরিণতি ও নিষেধে পতিত হওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে জাগ্রত না করা হয় । যুলমের শাস্তি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান না করা হয় । [ইবন কাসীর; আইসারুত তাফাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবী ও আসমানী কিতাবসমূহের অব্যাহত ধারা এজন্য ছিল না যে, বিশ্ব পালনকর্তা আমাদের 'ইবাদাত ও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী কিংবা তাঁর কোন কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল নয়, তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত । তবে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে সাথে তিনি দয়া গুণেও গুনান্বিত । সমগ্র বিশ্বকে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশ্ববাসীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মেটানোর কারণও তাঁর এ দয়াগুণ । নতুবা মানুষ তথা গোটা সৃষ্টি নিজের প্রয়োজনাদি নিজে সমাধা করার যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা, সে স্বীয় প্রয়োজনাদি চাওয়ার রীতি-নীতিও জানে না । বিশেষতঃ অস্তিত্বের যে নেয়ামত দান করা হয়েছে, তা যে চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের মত স্পষ্ট । কোন মানুষ কোথাও নিজের সৃষ্টির জন্য দো'আ করেনি এবং অস্তিত্ব লাভের পূর্বে দো'আ করা কল্পনাও করা যায় না । এমনিভাবে অন্তর এবং যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি হাত, পা, মন-মস্তিস্ক প্রভৃতি এগুলো কোন মানব চেয়েছিল কি?

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে ﴿وَرَبُّكَ الۡغَنِىُّ﴾ শব্দ দ্বারা বিশ্বপালকের অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করার সাথেই ﴿ذُو الرَّحۡمَةِ﴾ যোগ করে বলা হয়েছে যে, তিনি করুণাময়ও বটে । অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ । মানুষের মধ্যে এ গুণ

وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾

তোমাদেরকে অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছে তোমাদের স্থানে আনতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন।

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. নিশ্চয় তোমাদের সাথে যা ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে এবং তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না[১]।

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. বলুন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থানে থেকে কাজ কর, নিশ্চয় আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার পরিণাম মঙ্গলময়[২]। নিশ্চয় যালিমরা সফল হয় না।’

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ

১৩৬. আল্লাহ্‌ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন সে সবের মধ্য থেকে তারা আল্লাহ্‌র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট

নেই, কেননা, মানুষ অপরের প্রতি অমুখাপেক্ষি হয়ে গেলে সে অপরের লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করত না বরং অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে উদ্যত হত। আল্লাহ্‌ তা‘আলা অন্য এক আয়াতে বলেন, “মানুষ যখন নিজেকে অমুখাপেক্ষি দেখতে পায়, তখন অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে মেতে উঠে।” [সূরা আল-‘আলাক: ৬-৭] তাই আল্লাহ্‌ তা‘আলা মানুষকে এমন প্রয়োজনাদির শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণ হতে পারে না।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা‘আলার অমুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া এবং সর্বশক্তির অধিকরী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলা তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই আগমণ করবে এবং তোমরা সব একত্রিত হয়েও আল্লাহ্‌র সে আযাব প্রতিরোধ করতে পারবে না।

(২) অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হবে, তখন কার পরিণাম ভালো সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। [মুয়াসসার]

بِزَعۡمِهِمۡ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَاۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمۡ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمۡۗ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ١٣٦

করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, ‘এটা আল্লাহ্‌র জন্য এবং এটা আমাদের শরীকদের[১] জন্য’। অতঃপর যা তাদের শরীকদের অংশ তা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না এবং যা আল্লাহ্‌র অংশ তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছায়, তারা যা ফয়সালা করে তা কতই না নিকৃষ্ট[২]!

(১) অর্থাৎ মূর্তি, বিগ্রহ ইত্যাদি যাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক নির্ধারণ করেছে তাদের জন্য। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথভ্রষ্টতা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যা কিছু আমদানী হত, তার এক অংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এক অংশ উপাস্য দেব-দেবীর নামে পৃথক করে রাখত। আল্লাহ্‌র নামের অংশ থেকে গরীব-মিসকীনকে দান করা হতো এবং দেব-দেবীর অংশ মন্দিরের পূজারী, সেবায়েত ও রক্ষকদের জন্য ব্যয় করতো।

প্রথমতঃ এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদেরকে অংশীদার করা হত। তদুপরি তারা আরো অবিচার করত এই যে, কখনো উৎপাদন কম হলে তারা কমের ভাগটি আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলতঃ আল্লাহ্ তো সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোন সময় এমনও হত যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ থেকে কোন বস্তু আল্লাহ্‌র অংশে পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্য সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কোন বস্তু নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে পড়ে যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে দিত এবং বলতঃ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। কুরআনুল কারীম তাদের এ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করে বলেছেঃ ﴿سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ﴾ অর্থাৎ তাদের এ বিচার পদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্রী ও একপেশে। যে আল্লাহ্ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় বস্তু-সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমতঃ তারা তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করেছে। তদুপরি তাঁর অংশও নানা ছলনা ও কৌশলে অন্য দিকে পাচার করে দিয়েছে।

কাফেরদের প্রতি হুশিয়ারীতে মুসলিমদের জন্য শিক্ষাঃ এ হচ্ছে মুশরিকদের একটি পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির জন্য হুশিয়ারী। এতে ঐসব মুসলিমের জন্যও শিক্ষার চাবুক

১৩৭. আর এভাবে তাদের শরীকরা বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের সন্তানদের হত্যাকে শোভন করেছে, তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের দ্বীন সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য; আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তারা এসব করত না। কাজেই তাদেরকে তাদের মিথ্যা রটনা নিয়েই থাকতে দিন।

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ
قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ
وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ
مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮. আর তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, ‘এসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাকে ইচ্ছে করি সে ছাড়া কেউ এসব খেতে পারবে না,’ এবং কিছু সংখ্যক গবাদি পশুর পিঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক পশু যবেহ্ করার সময় তারা আল্লাহ্‌র নাম নেয় না। এ সবকিছুই তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা

وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ
لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ
حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ
اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۗ سَيَجْزِيْهِمْ
بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾

রয়েছে, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ কার্যক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে। বয়স ও সময়ের এক অংশকে তারা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করে; অথচ জীবনের সমস্ত সময় ও মুহূর্তকে তাঁরই ‘ইবাদাত ও আনুগত্যের ওয়াক্‌ফ করে মানবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য তা থেকে কিছু সময় নিজের জন্য বের করে নেয়াই সঙ্গত ছিল। সত্য বলতে কি, এরপরও আল্লাহ্‌র যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হতো না। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, দিন-রাত্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করি, তবে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কাজ-কারবার ও আরাম-আয়েশের সময় পুরোপুরি ঠিক রেখে তার সমস্তটুকু আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত সময় তথা সালাত, তেলাওয়াত ও ‘ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের থেকে কেটে নেই। কোন অতিরিক্ত কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখ-বিসুখ হলে সর্বপ্রথম এর প্রভাব ‘ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের উপর পড়ে। এটা নিঃসন্দেহে অবিচার, অকৃতজ্ঞতা এবং অধিকার হরণ। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং সব মুসলিমদেরকে এহেন গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

রটনার উদ্দেশ্যে বলে; তাদের এ মিথ্যা রটনার প্রতিফল তিনি অচিরেই তাদেরকে দেবেন।

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِنْ يَكُنْ
مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٣٩

১৩৯. তারা আরো বলে, ‘এসব গবাদি পশুর পেটে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এটা আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ, আর সেটা যদি মৃত হয় তবে সবাই এতে অংশীদার।’ তিনি তাদের এরূপ বলার প্রতিফল অচিরেই তাদেরকে দেবেন; নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ[১]।

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً
عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٤٠

১৪০. অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করেছে এবং আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে নিষিদ্ধ গণ্য করেছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না[২]।

---

(১) এ আয়াতসমূহে অব্যাহতভাবে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, গাফেল ও মূর্খ মানুষ ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্-প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া কুপ্রথাকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ তা‘আলা যেসব বস্তু অবৈধ করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক হালালকৃত অনেক বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে এবং কোন কোন বস্তুকে শুধু পুরুষদের জন্য হালাল, স্ত্রীলোকদের জন্য হারাম করেছে। আবার কোন কোন বস্তু স্ত্রীলোকদের জন্য হালাল, পুরুষদের জন্য হারাম করেছে।

(২) অর্থাৎ তারা তাদের পথভ্রষ্টতায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল, তাদের কোন কাজেই হিদায়াত নসীব হয় নি। [সা‘দী] আর তাদের মধ্যে হিদায়াত পাবার যোগ্যতাও ছিল না। [ফাতহুল কাদীর]

সতেরতম রুকূ'

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ڮ وَلَا تُسْرِفُوْا ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪১. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন এমন বাগানসমূহ যার কিছু মাচানির্ভর অপর কিছু মাচানির্ভর নয় এবং খেজুর বৃক্ষ ও শস্য, যার স্বাদ বিভিন্ন রকম, আর যায়তুন ও আনার, এগুলো একটি অন্যটির মত, আবার বিভিন্ন রূপেরও। যখন ওগুলো ফলবান হবে তখন সেগুলোর ফল খাবে এবং ফসল তোলার দিন সে সবের হক প্রদান করবে[১]। আর অপচয় করবে না;

(১) বিভিন্ন বৃক্ষ ও ফল সম্পর্কে উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দু'টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
প্রথম নির্দেশ মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির দাবীর পরিপূরক। বলা হয়েছেঃ এসব বৃক্ষের ও শস্যক্ষেত্রের ফল ভক্ষন কর, যখন এগুলো ফলন্ত হয়। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোন প্রয়োজন মেটাতে চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য এগুলো সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তোমরা খাও এবং উপকৃত হও। 'ফলন্ত হয়' একথা বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, বৃক্ষের ডাল থেকে ফল বের করা তোমাদের সাধ্যাতীত কাজ। কাজেই আল্লাহ্‌র নির্দেশে যখন ফল বের হয়ে আসে, তখনই তোমরা তা খেতে পার- পরিপক্ক হোক বা না হোক।
দ্বিতীয় নির্দেশ হলোঃ এ সমস্ত জমীনের ফসল কাটার সময় তার হক্ব আদায় কর। ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময়কে حصاد বলা হয়। حصادশব্দের পরে ব্যবহৃত ہ সর্বনাম পূর্বোল্লেখিত প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের অর্থ এই যে, এমন বস্তু খাও, পান কর এবং ব্যবহার কর; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। 'হক' বলে ফকীর-মিসকীনকে দান করা বুঝানো হয়েছেঃ ﴿وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ لِّلسَّاۗىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ﴾ ⁕ অর্থাৎ সৎ লোকদের ধন-সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে ফকীর-মিসকীনদের।
এখানে সাধারণ দান-সদকা বোঝানো হয়েছে, না ক্ষেতের যাকাত ও ওশর বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরীন সাহাবা ও তাবেয়ীগণের দু'রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে আর যাকাত মদীনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরয করা

নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

১৪২. আর গবাদি পশুর মধ্যে কিছু সংখ্যক ভারবাহী ও কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্রাকার পশু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ যা রিযিকরূপে তোমাদেরকে দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু;

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَّفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

১৪৩. নর ও মাদী আটটি জোড়া[১], মেষের দুটি ও ছাগলের দুটি; বলুন, 'নর দুটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন কিংবা মাদী দুটিই অথবা মাদী দুটির গর্ভে যা আছে তা? তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত কর'[২];

ثَمٰنِيَةَ أَزْوٰجٍ ۚ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ۖ نَبِّـُٔونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿١٤٣﴾

হয়েছে। তাই এখানে 'হক'-এর অর্থ ক্ষেতের যাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় নাযিল বলেছেন এবং حق -এর অর্থ যাকাত ও ওশর নিয়েছেন। তাদের মতে যেসব ক্ষেতে পানি সেচনের ব্যবস্থা নেই, শুধু বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হয়, সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব এবং যেসব ক্ষেত কূপ, নদী-নালা, পুকুর ইত্যাদির পানি দ্বারা সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব। এটাও বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

(১) অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত গবাদি পশুর মধ্যে উট গরু ও ছাগল মিলিয়ে আট প্রকার। সেগুলোকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোর কোনটিই আল্লাহ্ হারাম করেননি। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ উপরোক্ত আট প্রকার আবার দু' শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে চারটি ছাগল জাতীয় বা ছোট আকারের। দুটি হচ্ছে নর ও মাদী মেষ। বাকী দু'টি হচ্ছে ছাগলের নর ও মাদী। বলুন হে রাসূল, আল্লাহ্ তা'আলা কি ছাগল জাতীয় পশুর দু'প্রকার নরকে হারাম করেছেন? যদি তারা বলে, হ্যাঁ; তবে তারা মিথ্যা বলবে। কেননা তারা ছাগল ও মেষের প্রতিটি নরকে নিষিদ্ধ মনে করে না। আবার আপনি তাদেরকে আরো জিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহ্ তা'আলা কি ছাগল জাতীয় পশুর দু'প্রকার মাদীকে হারাম করেছেন? যদি তারা হ্যাঁ বলে, তবে তারা মিথ্যা বলবে। কেননা তারা ছাগল ও মেষের প্রত্যেক মাদীকে নিষিদ্ধ মনে করে না। তাদেরকে আরও জিজ্ঞাসা করুন,

১৪৪. এবং উটের দুটি ও গরুর দুটি। বলুন, 'নর দুটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন কিংবা মাদী দুটিই অথবা মাদী দুটির গর্ভে যা আছে তা? নাকি আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে এসব নির্দেশ দান করেন তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে?' কাজেই যে ব্যক্তি না জেনে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ
آٰلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ
عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۖ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ
وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى
اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٤٤

আঠারতম রুকূ'

১৪৫. বলুন, 'আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে, লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না, মৃত, বহমান রক্ত ও শুকরের মাংস ছাড়া[১]। কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য উৎসর্গের কারণে'। তবে যে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى
طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا
مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ
فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٤٥

আল্লাহ্ তা'আলা কি মেষ ও ছাগলের মাদীর গর্ভে যা আছে তা হারাম করেছেন? যদি তারা হ্যাঁ বলে, তবে তারা আবারও মিথ্যা বলবে, কেননা তারা গর্ভে অবস্থিত সকল ভ্রূণকেই নিষিদ্ধ মনে করে না। অতএব আমাকে এমন এক জ্ঞান ও প্রমাণের সন্ধান দাও, যা দ্বারা তোমাদের মতের সত্যতা বুঝতে পারি, যদি তোমরা তোমাদের রবের ব্যাপারে যা বলো সে বিষয়ে সত্যবাদী হও। [মুয়াসসার]

(১) পরবর্তীতে হাদীসের মাধ্যমে আরও কিছু প্রাণী ও পাখী হারাম করা হয়। যেমন প্রতিটি থাবা দিয়ে আক্রমণকারী পাখী ও দাঁত দিয়ে আক্রমণকারী প্রাণী, কুকুর ও গৃহপালিত গাধা। সেগুলো সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি থাবা দিয়ে আক্রমণকারী পাখী ও দাঁত দিয়ে আক্রমণকারী হিংস্র প্রাণী খেতে নিষেধ করেছেন"। [মুসলিম: ১৯৩৪]

করে নিরুপায় হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তবে নিশ্চয় আপনার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍؕ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. আর আমরা ইয়াহূদীদের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, তবে এগুলোর পিঠের অথবা অন্ত্রের কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি ছাড়া, তাদের অবাধ্যতার জন্য তাদেরকে এ প্রতিফল দিয়েছিলাম । আর নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী ।

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍۚ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. অতঃপর যদি তারা আপনার উপর মিথ্যারোপ করে, তবে বলুন, ‘তোমাদের রব সর্বব্যাপী দয়ার মালিক এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে তাঁর শাস্তি রদ করা হয় না ।’

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَاؕ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَاؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. যারা শির্ক করেছে অচিরেই তারা বলবে, ‘আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শির্ক করতাম না এবং কোন কিছুই হারাম করতাম না ।’ এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যারোপ করেছিল, অবশেষে তারা আমাদের শাস্তি ভোগ করেছিল । বলুন, ‘তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে? তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মনগড়া কথা বল[১] ।’

(১) মহান আল্লাহ্ এখানে এটাই বলছেন যে, এ এমন একটি খোঁড়া দলীল যা প্রতিটি মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী উম্মত তাদের রাসূলদের সাথে ব্যবহার করেছে । এর মাধ্যমে তারা রাসূলদের দাওয়াতকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট ছিল । কিন্তু এ জাতীয় দলীল-

প্রমাণাদি ও যুক্তি-তর্কাদি তাদের কোন কাজে আসে নি। তারা এর মাধ্যমে সাময়িক বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তি আপতিত হয়েছে, আর তারা ধ্বংস হয়েছে। যদি তাদের এসব যুক্তি-তর্ক সঠিক হত, তবে তা সে সমস্ত উম্মতের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত। আর যেহেতু তাদের উপর আযাব আপতিত হয়েছিল এবং এটাও জানা কথা যে, আল্লাহ্ তা‘আলা শাস্তির অধিকারী না হলে কাউকে শাস্তি দেন না, এতেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাদের এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণ অযৌক্তিক, বরং মিথ্যা সন্দেহ। কারণঃ যদি তাদের যুক্তি সঠিক হত, তবে তাদের উপর শাস্তি আসত না।

যে কোন যুক্তি-প্রমাণ জ্ঞান ও দলীল নির্ভর হতে হয়, কিন্তু যদি সেটি হয় কেবল অনুমান ও ধারণা নির্ভর, তবে সেটা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। কেননা, ধারণা কখনো সত্য ও সঠিক পথের দিশা দেয় না। সুতরাং সেটি বাতিল হতে বাধ্য। আর এজন্যই আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াতে কাফেরদের দাবীর বিপরীতে বলছেন যে, ‘তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে?’ যদি তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান থাকত, তবে তাদের মত ভীষণ ঝগড়াটে লোক তা পেশ করা থেকে পিছপা হতো না। তারপরও যখন তারা জ্ঞান-ভিত্তিক দলীল প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে, তখন এটাই প্রমাণ করছে যে, তাদের দাবীর সপক্ষে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। বরং তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, “তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মনগড়া কথা বল”। আর যে তার প্রমাণাদি কল্পনা নির্ভর করেছে সে অবশ্যই ভুলের উপর আছে। তদুপরি যদি সে সীমালঙ্ঘন ও অনাচারের আশ্রয় নেয়, তাহলে সেটা যে কেমন অন্যায় তা বলাই বাহুল্য।

চূড়ান্ত প্রমাণাদির মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা‘আলা। যার প্রমাণ পেশের পরে আর কারও কোন ওজর-আপত্তি থাকতে পারে না। যার প্রদত্ত প্রমাণের সত্যতার উপর সমস্ত নবী-রাসূল, আসমানী কিতাবসমূহ, নবীদের মতামত, সঠিক বিবেক, সরল-সোজা মনের টান, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীও সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুতরাং এ সব অকাট্য প্রমাণের বিপরীতে কাফের ও মুশরিকদের যুক্তি অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল। কারণ, হক্কের বিপরীতে বাতিল ছাড়া আর কিছু নেই।

তাছাড়া আল্লাহ্ তা‘আলা প্রতিটি সৃষ্টিকেই কোন কিছু করার ও ইচ্ছা করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। যার মাধ্যমে সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ তা‘আলা কারও অসাধ্য কোন কিছু তার উপর চাপিয়ে দেন নি। তাছাড়া এমন কিছুও হারাম করেন নি, যা ত্যাগ করা মানুষের জন্য অসম্ভব। সুতরাং এরপরও ভাগ্য ও পূর্ববর্তী ফয়সালার দোহাই দেয়া শুধু অন্যায়ই নয় বরং গোঁড়ামী।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা‘আলা বান্দাকে তাদের কাজের জন্য জবরদস্তি করেননি। বরাং আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের কর্মকাণ্ডকে তাদেরই পছন্দ অনুসারে নির্ধারণ

১৪৯. বলুন, 'চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ্‌রই[১]; সুতরাং তিনি যদি ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই হিদায়াত দিতেন।'

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. বলুন, 'আল্লাহ্ যে এটা নিষিদ্ধ করেছেন এ সম্বন্ধে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদেরকে হাযির কর।' তারা সাক্ষ্য দিলেও আপনি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিবেন না। আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না, যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে এবং যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না। আর তারাই তাদের রব-এর সমকক্ষ দাঁড় করায়।

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾

করেছেন। যদি তারা চায় করবে, না চাইলে করবে না। এটা এমন এক বিষয় যার বাস্তবতা অস্বীকার করার জো নেই। যদি কেউ অস্বীকার করে তবে সে অবশ্যই উদ্ধত ও গোঁয়ার। সে যেন একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে অস্বীকার করেছে। প্রতিটি মানুষই ইচ্ছাকৃত নড়াচড়া ও ইচ্ছাবহির্ভুত নড়াচড়ার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। যদিও সবই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার অধীন।

যারা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে অন্যায় কাজের পক্ষে দলীল পেশ করে, তারা স্ববিরোধিতায় লিপ্ত। তারা এ দোহাই সব জায়গায় মেনে নেয় না। যদি কেউ তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে কিংবা তাদের সম্পদ হরণ করে বা অনুরূপ কোন কাজ করে, এবং বলে যে, তোমার ভাগ্যে ছিল, তাহলে তারা সেটাকে গ্রহণ করে না। বরং তারা তাদের নিজেদের ঐ সমস্ত ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে মোটেই পিছপা হয় না। সুতরাং তাদের জন্য আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না, তারা অন্যায় ও অপরাধের সময় শুধু ভাগ্যের দোহাই দেয়, অন্য সময় নয়।

তাদের ভাগ্যের দোহাই দেয়া উদ্দেশ্য নয়, তারা জানে যে এটি কোন প্রমাণও নয়। বরং এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো, হকের বিরোধিতা করা। তারা হক কথা ও কাজকে আক্রমনকারী মনে করে তা দূর করার জন্য মনে যা আসে তাই বলে, যদিও তারা নিশ্চিত যে তা ভুল। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছেই চুড়ান্ত প্রমাণাদি। তাঁর প্রমাণাদি দ্বারা তিনি তোমাদের যাবতীয় ধারণা ও অনুমানের মুলোৎপাটন করতে পারেন। [মুয়াসসার]

ঊনিশতম রুকূ‘

১৫১. বলুন(১), ‘এস(২), তোমাদের রব

قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا

(১) আগত আয়াতসমূহে সেসব বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা‘আলা হারাম করেছেন। বিশদ বর্ণনায় নয়টি বস্তুর উল্লেখ হয়েছে। এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “এ দ্বীনই হচ্ছে আমার সরল পথ। এ পথের অনুসরণ কর”। এতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বীন যে বিষয়কে হালাল বলেছে, তাকে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম বলেছে, তাকে হারাম মনে করবে- নিজের পক্ষ থেকে হালাল-হারামের ফতোয়া জারি করবে না। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত পথকে অনুসরনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। তাঁর পথ ব্যতীত আরও বহু পথ রয়েছে সেগুলো মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। সঠিক পথ একটি, আর বাতিল পথ অনেক। যারা আল্লাহর পথে চলবে আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। [সা‘দী]

আগত আয়াতসমূহে যে দশটি বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, (১) আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে কাউকে ‘ইবাদাত ও আনুগত্যে অংশীদার স্থির করা, (২) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা, (৩) দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা, (৪) অশ্লীল কাজ করা, (৫) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৬) ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা, (৭) ওজন ও মাপে কম দেয়া, (৮) সাক্ষ্য, ফয়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা, (৯) আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ না করা এবং (১০) আল্লাহ্ তা‘আলার সোজা-সরল পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করা। মুফাস্সির আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ সূরা আলে ইমরানের মুহ্কাম আয়াতের বর্ণনায় এ আয়াতগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। আদম ‘আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবীগণের শরী‘আতই এসব আয়াত সম্পর্কে একমত। কোন দ্বীন বা শরী‘আতে এগুলোর কোনটিই মনসূখ বা রহিত হয়নি। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩১৭] আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘যে কেউ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ যে বিষয়ের উপর ছিলেন সেটা জানতে চায় সে যেন সূরা আল-আন‘আমের এ আয়াতগুলো পড়ে নেয়। [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতগুলোর প্রথমেই বলা হয়েছে تعالوا যার অর্থঃ ‘এস’। মূলতঃ উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নের লোকদেরকে নিজের কাছে ডাকা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। [কাশশাফ; কুরতুবী] এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দাওয়াত কবুল করার মধ্যেই তাদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিদ্যমান। এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলুন, এস, যাতে আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শোনাতে পারি যেগুলো আল্লাহ্ তা‘আলা

تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا

তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা তিলাওয়াত করি, তা হচ্ছে, 'তোমরা তাঁর সাথে কোন শরীক করবে না[১], পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে[২], দারিদ্র্যের

তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত বার্তা। এতে কারো কল্পনা, আন্দাজ ও অনুমানের কোন প্রভাব নেই [বাগভী] যাতে তোমরা এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করতে যত্নবান হও এবং অনর্থক নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র হালালকৃত বিষয়সমূহকে হারাম না কর। এ আয়াতে যদিও সরাসরি মক্কার মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যাপক হওয়ার কারণে সমগ্র মানব জাতিই এর আওতাধীন- মুমিন হোক কিংবা কাফের, আরব হোক কিংবা অনারব, উপস্থিত লোকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর। [দেখুন, তাফসীর আল-মানার]

(১) **সর্বপ্রথম মহাপাপ শির্ক, যা হারাম করা হয়েছেঃ** সযত্ন সম্বোধনের পর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক বা অংশীদার করো না। আরবের মুশরিকদের মত দেব-দেবীদেরকে বা মূর্তিকে ইলাহ্ বা উপাস্য মনে করো না। ইয়াহূদী ও নাসারাদের মত নবীগণকে আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করো না। অন্যদের মত ফিরিশ্‌তাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে আখ্যা দিও না। মূর্খ জনগণের মত নবী ও ওলীগণকে জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্যে আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করো না। আল্লাহ্‌র জন্য যে সমস্ত 'ইবাদাত করা হয়, তা অপর কাউকে দিও না; যেমন, দো'আ, যবেহ্, মানত ইত্যাদি।

এখানে شيئاً এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, 'জলী' অর্থাৎ প্রকাশ্য শির্ক ও 'খফী' অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন শির্ক- এ প্রকারদ্বয়ের মধ্য থেকে কোনটিতেই লিপ্ত হয়ো না। প্রকাশ্য শির্কের অর্থ সবাই জানে যে, 'ইবাদাত-আনুগত্য অথবা অন্য বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহ্ তা'আলার সমতুল্য অথবা তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রচ্ছন্ন শির্ক এই যে, নিজ কাজ-কর্মে দ্বীনী ও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহে এবং লাভ-লোকসানে আল্লাহ্ তা'আলাকে কার্যনির্বাহী বলে বিশ্বাস করেও কার্যতঃ অন্যান্যকে কার্যনির্বাহী মনে করা এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রাখা। এছাড়া লোক দেখানো 'ইবাদাত করা, অন্যদেরকে দেখানোর জন্য সালাত ইত্যাদি ঠিকমত আদায় করা, নাম-যশ লাভের উদ্দেশ্যে দান-সদকা করা অথবা কার্যতঃ লাভ-লোকসানের মালিক আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা ইত্যাদিও প্রচ্ছন্ন শির্কের অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন, আল-মানার; সা'দী; আশ-শির্ক ফীল কাদীম ওয়াল হাদীস, ১৬৮-১৮০; ১২৯৫-১৩১০]

(২) **দ্বিতীয় গোনাহ্ পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহারঃ** আয়াতে বলা হয়েছেঃ "পিতা-

بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমরাই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিয্‌ক দিয়ে থাকি(১)। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের ধারে-

মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা"। উদ্দেশ্য এই যে, পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো না। তাদেরকে কষ্ট দিও না; কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অন্য আয়াতে তাদের আনুগত্য ও সুখবিধানকে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাতের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে, "আপনার রব নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে"। [সূরা আল-ইসরা: ২৩] অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, "আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং পিতা-মাতার। তারপর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন"। [সূরা লুকমান:১৪] অর্থাৎ বিপরীত করলে শাস্তি পাবে। তাছাড়া আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টি'? তিনি উত্তরে বললেনঃ 'সঠিক ওয়াক্তে সালাত আদায় করা', তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ 'এরপর কোন্‌টি'? উত্তর হলঃ 'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার'। আবার প্রশ্ন করলেনঃ 'এরপর কোন্‌টি'? উত্তর হলঃ 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ'। [বুখারীঃ ৫২৭, মুসলিমঃ ৮৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বললেন, 'লাঞ্ছিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে।' সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কে লাঞ্ছিত হয়েছে'? তিনি বললেনঃ 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে নি'। [মুসলিমঃ ২৫৫১]

(১) **তৃতীয় হারাম- সন্তান হত্যাঃ** আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বিষয় হচ্ছে সন্তান হত্যা। এখানে পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, ইতোপূর্বে পিতা-মাতার হক বর্ণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য। এখন সন্তানের হক বর্ণিত হচ্ছে, যা পিতা-মাতার কর্তব্য। জাহেলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে অসদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছেঃ "দারিদ্র্যের কারণে স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমরা তোমাদেরকে এবং তাদেরকে- উভয়কেই জীবিকা দান করব"। জাহেলিয়াত যুগে এ নিকৃষ্টতম নির্দয়-পাষণ্ড প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। মাঝে মাঝে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে পাষণ্ডরা নিজ হাতে সন্তানদেরকে হত্যা করত। কুরআনুল কারীম এ কু-প্রথা রহিত করে দিয়েছে। [ইবন কাসীর]

কাছেও যাবে না(১) । আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করবে না(২) ।’

---

(১) **চতুর্থ হারাম নির্লজ্জ কাজঃ** আয়াতে বর্ণিত চতুর্থ হারাম বিষয় হচ্ছে নির্লজ্জ কাজ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ “প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন, যে কোন রকম অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না” । فواحش শব্দের সাধারণ অর্থঃ অশ্লীলতা ও নির্লজ্জ কাজ। যাবতীয় বড় গোনাহ্ فحش ও فحشاء এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, এ আয়াত নির্লজ্জতার প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত গোনাহ্‌কে এবং সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়ে ব্যভিচারের প্রকাশ্য ও গোপন সকল পন্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, এগুলোর কাছেও যেও না। কাছে যাওয়ার অর্থ এরূপ মজলিশ ও স্থান থেকে বেঁচে থাকা যেখানে গেলে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং এরূপ কাজ থেকেও বেঁচে থাক, যা দ্বারা এসব গোনাহ্‌র পথ খুলে যায়। কারণ, যে লোক নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায়। [সা‘দী] অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, “বলুন, নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা ।” [সূরা আল-আ‘রাফ: ৩৩] অনুরূপভাবে অন্যত্র এসেছে, “আর তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর” [সূরা আল-আন‘আম: ১২০] এ সব আয়াত একই অর্থবোধক। এসব আয়াতেই অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী আত্মাভিমানী কেউই নেই, সেজন্য তিনি প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীলতা হারাম ঘোষণা করেছেন।’ [বুখারী: ৪৬৩৪; মুসলিম: ২৭৬০]

(২) **পঞ্চম হারাম বিষয় অন্যায় হত্যাঃ** এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ “আল্লাহ্ তা‘আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, তবে ন্যায়ভাবে” । এ ‘ন্যায়ভাবে’র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘তিনটি কারণ ছাড়া কোন মুসলিমের খুন হালাল নয়। (এক) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, (দুই) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার কেসাস হিসাবে তাকে হত্যা করা যাবে এবং (তিন) সত্যদ্বীন ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে মুসলিমদের জামা‘আত থেকে পৃথক হয়ে গেলে। [বুখারীঃ ৬৮৭৮, মুসলিমঃ ১৬৭৬]

বিনা কারণে মুসলিমকে হত্যা করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে এমন কোন অমুসলিমকে হত্যা করাও হারাম, যে কোন ইসলামী দেশের প্রচলিত আইন মান্য করে বসবাস করে কিংবা যার সাথে মুসলিমের চুক্তি থাকে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন যিম্মী অমুসলিমকে হত্যা করে, সে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধী সত্তর বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়। [ইবন মাজাহ্: ২৬৮৭]

তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা বুঝতে পার ।

১৫২. আর ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ছাড়া তোমরা তার সম্পত্তির ধারে-কাছেও যাবে না[১] এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে[২] । আমরা কাউকেও

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ

(১) **ষষ্ঠ হারাম ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করাঃ** এ আয়াতে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ যে ভক্ষণ করা হারাম, সে সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ “ইয়াতীমের মালের কাছেও যেও না; কিন্তু উত্তম পন্থায়, যে পর্যন্ত না সে বালেগ হয়ে যায়” । এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীম শিশুদের অভিভাবককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা যেন ইয়াতীমদের সম্পদকে আগুন মনে করে এবং অবৈধভাবে তা খাওয়া ও নেয়ার ব্যাপারে নিকটবর্তীও না হয় । অন্য এক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে, “যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুণ ভর্তি করে ।” [সূরা আন-নিসা:১০] তবে ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবতঃ লোকসানের আশঙ্কা নেই- এরূপ কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরী পন্থা । ইয়াতীমদের অভিভাবকদের এ পন্থা অবলম্বন করা উচিত ।[কুরতুবী] আলোচ্য আয়াতে এরপর ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে, “সে বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত” । অর্থাৎ বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় । অতঃপর তার মাল তার কাছে সমর্পণ করতে হবে । أَشُدَّ শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি । আলেমগণের মতে বয়োঃপ্রাপ্ত হলেই এর সূচনা হয় । বালক-বালিকার মধ্যে বয়োঃপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দিলে, তাদের মধ্যে নিজের মালের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার । যোগ্যতা দেখলে বয়োঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করতে হবে । [কুরতুবী]

(২) **সপ্তম হারাম ওজন ও মাপে ত্রুটি করাঃ** এ আয়াতে সপ্তম নির্দেশ ওজন ও মাপ ন্যায়ভাবে পূর্ণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে । ‘ন্যায়ভাবে’ বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওজন করে দেবে, সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না এবং প্রতিপক্ষ নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশী নেবে না । দ্রব্য আদান-প্রদানে ওজন ও মাপে কম-বেশী করাকে কুরআন কঠোর হারাম সাব্যস্ত করেছে । যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য সূরা আল-মুতাফ্ফিফীনে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে । মুফাস্সির আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ ‘ওজন ও মাপ এমন একটি কাজ যে, এতে অন্যায় আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহ্র আযাবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে’ । [কুরতুবী; ইবন কাসীর; আদ-দুররুল মানসূর] আলোচ্য আয়াতে এরপর

তার সাধ্যের চেয়ে বেশী ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে, স্বজনের সম্পর্কে হলেও(১) এবং আল্লাহ্‌কে দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করবে(২)। এভাবে

اللهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

বলা হয়েছে, "আমরা কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দেই না।" এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সাধ্যমত পুরোপুরি ওজন করো, তারপরও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ওজনে কমবেশী হয়ে যায়, তবে তা মাফ। কেননা, এটা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; সা'দী]

(১) **অষ্টম নির্দেশ ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারামঃ** বলা হয়েছে, "তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে, যদি সে আত্মীয়ও হয়"। এখানে বিশেষ কোন কথার উল্লেখ নাই। তাই সাধারণ মুফাস্‌সিরীনগণের মতে সব রকম কথাই এর অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যাপারে সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা হোক অথবা পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তাই হোক- সব ক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ন্যায় ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [কুরতুবী] মোকাদ্দমার সাক্ষ্য কিংবা ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ এই যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে, নিজের পক্ষ থেকে কমবেশী না করে তা পরিস্কার বলে দেয়া- অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন কথা না বলা এবং এতে কারো উপকার কিংবা কারো অপকারের ভ্রূক্ষেপ না করা। মোকাদ্দমার ফয়সালার সাক্ষীদেরকে শরী'আতের নীতি অনুযায়ী যাচাই করার পর তাদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সূত্র দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাই ফয়সালা করা। সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারো বন্ধুত্ব ও ভালবাসা এবং কারো শত্রুতা ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। আত্মীয়তা বা অনাত্মীয় যেই হোক না কেন ন্যায় ও সত্যকে কোন অবস্থাতেই হাতছাড়া না করা। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী; আইসারুত তাফাসীর; মুয়াসসার]

(২) **নবম নির্দেশঃ আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করাঃ** বলা হয়েছে, "আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর"। এ অঙ্গীকারের দাবী হল এই যে, পালনকর্তার কোন নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে কাজের আদেশ দেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন, তার কাছেও যাওয়া যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বাঁচতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে। এছাড়া এর অর্থ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গীকারও হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলদের মুখে যে সমস্ত অঙ্গীকারের ঘোষণা দিয়েছেন সেগুলো পূর্ণ করা। আল্লাহ্ বলেন, "হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের থেকে এ অঙ্গীকার নেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? [সূরা ইয়াসীনঃ ৬০] আরও বলেন, "আর তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার

আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ কর[১] এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না[২], করলে তা তোমাদেরকে তাঁর

পূর্ণ করো যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর” [সূরা আন-নাহল: ৯১] অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যকার পরস্পর যে সমস্ত অঙ্গীকার হয়ে থাকে সেগুলোই উদ্দেশ্য। [সা‘দী] আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “আর প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করবে” [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৭] মোটকথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও স্বরূপের দিক দিয়ে শরী‘আতের যাবতীয় আদেশ নিষেধের মধ্যে পরিব্যপ্ত।

(১) **দশম নির্দেশঃ “ইসলামকে আঁকড়ে থাকবে”**। বলা হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত শরী‘আতই হল আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথে চল এবং অন্য কোন পথে চলো না। কেননা, সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এখানে هـٰـذا শব্দ দ্বারা দ্বীনে ইসলাম অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামই যখন আমার পথ এবং এটাই যখন সরল পথ, তখন মনযিলে মকসূদের বা অভিষ্ট লক্ষ্যের সোজা পথ হাতে এসে গেছে। তাই এ পথেই চল।

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আসল পথ তো একটিই, জগতে যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে। তোমরা সেসব পথে চলো না। কেননা, সেগুলো বাস্তবে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে না। কাজেই যে এসব পথে চলবে সে আল্লাহ্ থেকে দূরেই সরে পড়বে। হাদীসে এসেছে, নাওয়াস ইবন সাম‘আন আল-কিলাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ্ তা‘আলা একটি উদাহরণ পেশ করেছেন; একটি সরল পথ, এ পথের দু’পাশে প্রাচীর রয়েছে, তাতে দরজাগুলো খোলা। আর প্রত্যেক দরজার উপর রয়েছে পর্দা। পথটির মাথায় এক আহ্বানকারী আহ্বান করছে, আর তার উপর আরেক আহ্বানকারী আহ্বান করছে যে, ‘আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছে সরল পথে পরিচালিত করেন’। পথের দু’পাশের দরজাগুলো হল আল্লাহ্ তা‘আলার সীমারেখা, যে কেউ আল্লাহ্‌র সীমারেখা লজ্ঘন করবে তার জন্য সে পর্দা তুলে নেয়া হবে। উপরের আহ্বানকারী হল তার রব আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশ প্রদানকারী’। [তিরমিযী: ২৮৫৯] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত এবং সূরা আশ-শূরার ১৩ নং আয়াতসহ এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর‘আনের যাবতীয় আয়াত

পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।

১৫৪. তারপর আমরা মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, যে ইহসান করে তার জন্য পরিপূর্ণতা, সবকিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত এবং রহমতস্বরূপ---যাতে তারা তাদের রব-এর সাক্ষাত সম্বন্ধে ঈমান রাখে।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٤﴾

বিশতম রুকূ'

১৫৫. আর এ কিতাব, যা আমরা নাযিল করেছি - বরকতময়। কাজেই তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬. যেন তোমরা না বল যে, 'কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দু সম্প্রদায়ের প্রতিই নাযিল হয়েছিল; আমরা তাদের

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۖ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾

সম্পর্কে বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে পৃথক ও আলাদা হতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তাদের পূর্ববর্তীরা আল্লাহ্‌র দ্বীনে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়ার কারণে ধ্বংস হয়েছিল। [তাবারী]

কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রেরণ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ছাঁচে ঢেলে নিক এবং স্বীয় জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও পছন্দের ছাঁচে ঢেলে নিতে চাচ্ছে। কোন আয়াত কিংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীতে দেখলে তারা তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় প্রবৃত্তির পক্ষে নিয়ে যায়। এখান থেকেই অন্যান্য বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতার জন্ম। আয়াতে এসব পথ থেকে বেঁচে থাকতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো গাফিল ছিলাম,'

১৫৭. কিংবা যেন তোমরা না বল যে, 'যদি আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল হত, তবে আমরা তো তাদের চেয়ে বেশী হিদায়াত প্রাপ্ত হতাম[১]।' সুতরাং অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়াত ও রহমত এসেছে। অতঃপর যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? যারা আমাদের আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সত্যবিমুখিতার জন্য অচিরেই আমরা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দেব।

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, কুরআন নাযিল করার একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য হচ্ছে, মক্কার কাফেরদের কোন ওযর-আপত্তি অবশিষ্ট না রাখা। তারা হয়ত বলতে পারত যে, আমাদের প্রতি যদি কোন কিতাব নাযিল করা হতো যেমনিভাবে ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তবে অবশ্যই আমরা বেশী হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম। কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার সুযোগ আর রাখলেন না। অন্য আয়াতে এসেছে যে, তারা শপথ করে সেটা বলত। কিন্তু যখন তাদের কাছে কিতাব নাযিল করা হলো তখন তাদের জন্য শুধু হঠকারিতাই বৃদ্ধি করল। আল্লাহ্ বলেন, "আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলত যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসলে তারা অন্য সকল জাতির চেয়ে সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে; তারপর যখন এদের কাছে সতর্ককারী আসল তখন তা শুধু তাদের দূরত্বই বৃদ্ধি করল--- যমীনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। আর কূট ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করবে" [সূরা ফাতির:৪২-৪৩] [আদওয়াউল বায়ান] সুদ্দী বলেন, আয়াতের অর্থ, তোমাদের কাছে স্পষ্ট আরবী ভাষায় দলীল-প্রমাণাদি এসেছে, যখন তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিতাব পড়তে অক্ষম। আর যখন তোমরা বলেছিলে, আমাদের কাছে কিতাব আসলে তো আমরা তাদের থেকেও বেশী হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম। [তাবারী]

১৫৮. তারা শুধু এরই তো প্রতীক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা আসবে, কিংবা আপনার রব আসবেন, কিংবা আপনার রব-এর কোন নিদর্শন আসবে[1]? যেদিন আপনার রব-এর কোন নিদর্শন আসবে সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না,

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

(১) সূরা আল-আন‘আমের অধিকাংশই মক্কাবাসী ও আরব-মুশরিকদের বিশ্বাস ও ক্রিয়া-কর্মের সংস্কার এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জবাবে নাযিল হয়েছে। গোটা সূরায় এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মক্কা ও আরবের অধিবাসীদের সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হে কাফের সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু‘জিযা ও প্রমাণাদি দেখে নিয়েছ, তার সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনে নিয়েছ এবং একজন নিরক্ষরের মুখ থেকে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শোনার মু‘জিযাটিও লক্ষ্য করেছ। এখন ন্যায় ও সত্য সমুদয় পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অতএব, ঈমান আনার জন্য আর কিসের অপেক্ষা? এ বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলা হয়েছেঃ তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তাদের কাছে পৌঁছবে। না কি হাশরের ময়দানের জন্য অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা স্বয়ং আগমন করবেন অথবা কেয়ামতের কোন একটি সর্বশেষ নিদর্শন দেখে নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে?

বিচার-ফয়সালার জন্য কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ তা‘আলার উপস্থিতি কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ তা‘আলা কিভাবে এবং কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন, তা মানবজ্ঞান পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। তাই এ ধরণের আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের অভিমত এই যে, কুরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশ্বাস করতে হবে। উদাহরণতঃ এ আয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা কেয়ামতের ময়দানে প্রতিদান ও শাস্তির মীমাংসা করার জন্য উপস্থিত হবেন। তবে কিভাবে উপস্থিত হবেন, এ আলোচনা নিষিদ্ধ। কোন কোন আয়াতে এসেছে যে, আল্লাহ্‌র সাথে ফেরেশতাগণও কাতারে কাতারে উপস্থিত হবেন। “আর যখন আপনার রব আগমন করবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশ্‌তাগণও” [আল-ফাজর:২২] আবার কোথাও এসেছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা মেঘের ছায়া সমেত উপস্থিত হবেন। “তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও ফেরেশ্‌তাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন” [সূরা আল-বাকারাহ: ২১০] এসবগুলোই সত্য। এগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করা ফরয। তবে কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করা যাবে না। [আদওয়াউল বায়ান]

যে পূর্বে ঈমান আনেনি[১] অথবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করেনি[২]। বলুন, ‘তোমরা প্রতীক্ষা

---

(১) এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলার কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইতোপূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন বিশ্বাস স্থাপন করলে তা কবূল করা হবে না এবং যে ব্যক্তি পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে; কিন্তু কোন সৎকর্ম করেনি, সে তখন তওবা করে ভবিষ্যতে সৎকর্ম করার ইচ্ছা করলে তার তাওবাও কবূল করা হবে না। মোটকথা, কাফের স্বীয় কুফর থেকে এবং পাপাচারী স্বীয় পাপাচার থেকে যদি তখন তাওবা করতে চায়, তবে তা কবূল হবে না। কারণ, বিশ্বাস স্থাপন ও তাওবা যতক্ষণ মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে, ততক্ষণই তা কবূল হতে পারে। আল্লাহ্র শাস্তি ও আখেরাতের স্বরূপ ফুটে উঠার পর প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন ও তাওবা করতে আপনা থেকেই বাধ্য হবে। বলাবাহুল্য, এরূপ ঈমান ও তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যখন কেয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শনটি প্রকাশিত হবে, অর্থাৎ সূর্য পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে, তখন এ নিদর্শনটি দেখা মাত্রই সারা বিশ্বের মানুষ ঈমানের কালেমা পাঠ করতে শুরু করবে এবং সব অবাধ্য লোকও অনুগত হয়ে যাবে। কিন্তু তখনকার ঈমান ও তাওবা গ্রহণীয় হবে না। [বুখারীঃ ৪৬৩৬] এ আয়াত থেকে এ কথা জানা গেল যে, কেয়ামতের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কোন কাফের কিংবা ফাসেকের তাওবা কবূল হবে না। হুযায়ফা ইবনে আসীদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর কেয়ামতের লক্ষণাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ ‘দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কেয়ামত হবে না। (এক) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (দুই) বিশেষ এক প্রকার ধোঁয়া, (তিন) দাব্বাতুল-‘আরদ, (চার) ইয়াজুয-মাজুযের আবির্ভাব, (পাঁচ) ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর অবতরণ, (ছয়) দাজ্জালের অভ্যুদয়, (সাত, আট, নয়) প্রাচ্য, প্রাশ্চাত্য ও আরব উপদ্বীপ-এ তিন জায়গায় মাটি ধ্বসে যাওয়া এবং (দশ) আদনগর্ত থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সামনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া’। [মুসলিমঃ ২৯০১] ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘এসব নিদর্শনের মধ্যে সর্বপ্রথম নিদর্শনটি হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ও দাব্বাতুল-‘আরদের আবির্ভাব’। [মুসলিমঃ ২৯৪১]

(২) সুদ্দী বলেন, ‘তারা ঈমান আনার পরে কোন কল্যাণকর কাজ তথা সৎকাজ করেনি।’ এটা দ্বারা সেসব কিবলার অনুসারী মুমিন লোকদের বোঝানো হয়েছে যারা ঈমান

কর, আমরাও প্রতীক্ষায় রইলাম।’

১৫৯. নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন দায়িত্ব আপনার নয়; তাদের বিষয় তো আল্লাহ্‌র নিকট, তারপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাবেন[১]।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

এনেছে সত্য কিন্তু কোন সৎকাজ করে নি। যখনই তারা আল্লাহ্‌র কোন বৃহৎ নিদর্শন- পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া- দেখবে, তখনই সৎকাজের জন্য তৎপর হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের তখনকার আমল কোন কাজে আসবে না। কিন্তু যদি তারা এ নিদর্শন দেখার পূর্বে সৎকাজ করে থাকে, তবে এ নিদর্শন দেখার পরে সৎকাজ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।’ [তাবারী]

(১) এ আয়াতে মুশরিক, ইয়াহূদী, নাসারা ও মুসলিম সবাইকে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র সরল পথ পরিহার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলা হয়েছে যে, এসব ভ্রান্ত পথের মধ্যে কিছু পথ সরল পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীও রয়েছে; যেমন, মুশরিক ও আহ্‌লে-কিতাবদের অনুসৃত পথ এবং কিছু পথ রয়েছে যা বিপরীতমুখী নয়, কিন্তু সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে ডানে-বামে নিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ও বিদ‘আতের পথ। এগুলোও মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেয়। “যারা দ্বীনের মধ্যে বিভিন্ন পথ আবিস্কার করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের কাজ আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট সম্পর্কিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিবৃত করবেন।” আয়াতে উল্লেখিত ‘দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করা’ এবং ‘বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার’ অর্থ দ্বীনের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোঁকা ও সন্দেহে লিপ্ত হয়ে দ্বীনে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেয়া অথবা কিছু বিষয় তা থেকে বাদ দেয়া। কিছু লোক দ্বীনের মূলনীতি বর্জন করে সে জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ উম্মতের বিদ‘আতীরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তারা সবাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন, ‘বনী-ইসরাঈলরা যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার উম্মতও সেগুলোর সম্মুখীন হবে। তারা যেমন কর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আমার উম্মতও তেমনি হবে। বনী-ইসরাঈলরা ৭২ টি দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মতে ৭৩ টি দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি? উত্তর হল, যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের

১৬০. কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে। আর কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তার অনুরূপ প্রতিফলই দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না[১]।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

পথ অনুসরণ করবে, তারাই মুক্তি পাবে’। [তিরমিযীঃ ২৬৪০, ২৬৪১] অনুরূপভাবে ইরবায ইবন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা বিস্তর মতানৈক্য দেখতে পাবে। তাই (আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে,) তোমরা আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থেকো। নতুন নতুন পথ থেকে সযত্নে গা বাঁচিয়ে চলো। কেননা, দ্বীনে নতুন সৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়ই বিদ‘আত এবং প্রত্যেক বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা’। [আবূদাউদঃ ৪৬০৭; তিরমিযীঃ ২৬৭৬; ইবন মাজাহঃ ৪৩; মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১২৬]

(১) এ আয়াতে আখেরাতের প্রতিদান ও শাস্তির একটি সহৃদয় বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করবে, তাকে দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ্ করবে, তাকে শুধু একটি গোনাহ্র সমান বদলা দেয়া হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজের শুধু ইচ্ছা করে, তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়- ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করুক বা না করুক। অতঃপর যখন সে সৎকাজটি সম্পাদন করে, তখন তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা কার্যে পরিণত না করে, তার আমলনামায়ও একটি নেকী লেখা হয়। অতঃপর যদি সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে, তবে একটি গোনাহ্ লেখা হয়। কিংবা একেও মিটিয়ে দেয়া হয়। এহেন দয়া ও অনুকম্পা সত্ত্বেও আল্লাহ্র দরবারে ঐ ব্যক্তিই ধ্বংস হতে পারে, যে ধ্বংস হতেই দৃঢ়সংকল্প। [বুখারীঃ ৬৪৯১; মুসলিমঃ ১৩১]

অপর হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করে, সে দশটি সৎকাজের সওয়াব পায় বরং আরো বেশী পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ্ করে সে তার শাস্তি এক গোনাহ্র সমপরিমাণ পায় কিংবা তাও আমি মাফ করে দেব। যে ব্যক্তি পৃথিবী ভর্তি গোনাহ্ করার পর আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তার সাথে ততটুকুই ক্ষমার ব্যবহার করব। যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে বা‘ (অর্থাৎ দুই বাহু প্রসারিত) পরিমাণ অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে লাফিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/১৫৩] এসব হাদীস থেকে জানা যায়, আয়াতে যে সৎকাজের

১৬১. বলুন, 'আমার রব তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইব্‌রাহীমের মিল্লাত (আদর্শ), তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না[১]।'

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

১৬২. বলুন, 'আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌রই জন্য[২]।'

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

প্রতিদান দশগুণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সর্বনিম্ন পরিমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তা আরো বেশী দিতে পারেন এবং দিবেন। অন্যান্য হাদীস দ্বারা সত্তর গুণ বা সাতশ' গুণ পর্যন্ত প্রমাণিত রয়েছে।

(১) অর্থাৎ এ দ্বীন সুদৃঢ় যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত মজবুত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; কারো ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা নয় এবং যাতে সন্দেহ হতে পারে- এমন কোন নতুন দ্বীনও নয়, বরং এটিই ছিল পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীন। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর নাম উচ্চারণ করার কারণ এই যে, জগতের প্রত্যেক দ্বীনী ব্যক্তিরাই তাঁর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে বিশ্বাসী। বর্তমান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ইয়াহূদী, নাসারা ও আরবের মুশরিকরা যতই ভিন্ন মতাবলম্বী হোক না কেন, ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে সবাই একমত। নেতৃত্বের এ মহান পদমর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে দান করেছেন। [তাফসীর আল-মানার] তাছাড়া ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেভাবে এ দ্বীনকে সঠিকভাবে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন সেটা পরবর্তীদের জন্য আদর্শ হয়ে আছে। সুতরাং বিশেষ করে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে نسك শব্দের অর্থ কুরবানী। হজের ক্রিয়াকর্মকেও نسك বলা হয়। মুজাহিদ বলেন, نسك বলতে সে প্রাণীকে বুঝায় যা হজ বা উমরাতে যবেহ করা হয়। [তাবারী] তবে এ শব্দটি সাধারণ 'ইবাদাত-উপাসনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই ناسك শব্দটি عابد বা 'ইবাদাতকারী অর্থেও বলা হয়। [কুরতুবী] আয়াতে এ সবক'টি অর্থই নেয়া যেতে পারে। মুফাস্‌সিরীন সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকেও এসব তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে সাধারণ 'ইবাদাত অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত মনে হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার সালাত, আমার সমগ্র 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ- সবই বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত। এখানে দ্বীনের শাখাগত কাজকর্মের মধ্যে প্রথমে সালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এটি যাবতীয়

১৬৩. ‘তাঁর কোন শরীক নেই । আর আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে[১] এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম ।’

لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

১৬৪. বলুন, ‘আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যকে রব খুঁজব? অথচ তিনিই সবকিছুর রব ।’ প্রত্যেকে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার গ্রহণ করবে না । তারপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের রব-এর দিকেই, অতঃপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে, তা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন ।

قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

১৬৫. তিনিই তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন[২] এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কিছু

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿١٦٥﴾

সৎকর্মের প্রাণ ও দ্বীনের স্তম্ভ । এরপর অন্যান্য সব কাজ ও ‘ইবাদাত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে । অতঃপর সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা এবং সবশেষে মরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমার এ সবকিছুই একমাত্র বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত- যাঁর কোন শরীক নেই । এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল । মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় এ কথা মনে রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর দাস এবং সর্বদা তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছি ।

(১) অর্থাৎ আমাকে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা করার এবং আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । আর আমি সর্বপ্রথম অনুগত মুসলিম । উদ্দেশ্য এই যে, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম আমি । [আত-তাফসীরুস সহীহ] কেননা, প্রত্যেক উম্মতের সর্বপ্রথম মুসলিম স্বয়ং ঐ নবীই হন, যার প্রতি ওহী নাযিল করা হয় । আর প্রত্যেক নবীর দ্বীনই ছিল ইসলাম । [ইবন কাসীর]

(২) এখানে খলীফা অর্থ স্থলাভিষিক্ত করা । অর্থাৎ এক প্রজন্মের উপর অপর প্রজন্মকে তাদের জায়গায় স্থান দিয়েছেন । কখনও কখনও এক জাতিকে ধ্বংস করে অপর জাতিকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নিশ্চয় আপনার রব দ্রুত শাস্তিপ্রদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়(১)।

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মুমিন যদি জানত, আল্লাহ্‌র কাছে শাস্তির পরিমাণ কতখানি, তাহলে কেউই তাঁর জান্নাতের লোভ করত না। আর কাফের যদি জানত, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা কতখানি, তাহলে কেউই তার রহমত থেকে নিরাশ হতো না।” [মুসলিম: ২৭৫৫]

৭- সূরা আল-আ'রাফ



সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ২০৬ আয়াত।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ এ সূরা সর্বসম্মতভাবে মক্কী সূরা।

সূরার ফযীলতঃ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ প্রথম সাতটি সূরা গ্রহণ করবে সে আলেম হিসেবে গণ্য হবে"। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৮৫, ৬/৯৬]

সূরার নামকরণঃ এ সূরার নাম আল-আ'রাফ। এ নামকরণ এ জন্যই করা হয়েছে যে, এ সূরার ৪৬ ও ৪৮ নং আয়াতদ্বয়ে আল-আ'রাফ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ নামকরণের অর্থঃ এটা এমন একটি সূরা যাতে আ'রাফবাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

الٓمّٓصٓ ①

১. আলিফ, লাম, মীম, সাদ[১]।

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ②

২. এ কিতাব[২] আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সুতরাং আপনার মনে যেন এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ[৩] না থাকে। যাতে আপনি এর দ্বারা সতর্ক করতে পারেন[৪]। আর তা মুমিনদের

---

(১) এ হরফগুলোকে 'হুরুফে মুকাত্তা'আত' বলে। এ সম্পর্কে সূরা আল-বাকারার প্রথমে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(২) কিতাব বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে সবচেয়ে স্বচ্ছ মত হল- পবিত্র কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। [বাগভী] কারো কারো মতে এখানে শুধু এ সূরার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) 'হারাজ' হবার মানে হচ্ছে এই যে, বিরোধিতা ও বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার না দেখে মানুষের মন সামনে এগিয়ে চলতে পারে না; থেমে যায়। তাই মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, এখানে 'হারাজ' বলে 'সন্দেহ' বুঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়বস্তুকে 'দাইকে সদর' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, সূরা আল-হিজরঃ ৯৭, সূরা আন্-নাহলঃ ১২৭, সূরা আন্-নামলঃ ৭০, সূরা হুদঃ ১২।

(৪) এ আয়াতে কাদেরকে সতর্ক করতে হবে তা বলা হয়নি। অন্য আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ বলেন, "এবং বিতণ্ডাপ্রিয় সম্প্রদায়কে তা দ্বারা সতর্ক করতে

জন্য উপদেশ ।

৩. তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না । তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর[১] ।

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣

৪. আর এমন বহু জনপদ রয়েছে, যা আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি । তখনই আমাদের শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল রাতে অথবা দুপুরে যখন তারা বিশ্রাম করছিল[২] ।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ۝٤

পারেন ।"[মারইয়াম: ৯৭] আরও বলেন, "বস্তুত এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে দয়াস্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক কওমকে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে;"[আল-কাসাস:৪৬] আরও বলেন, "বরং তা আপনার রব হতে আগত সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি, হয়তো তারা হিদায়াত লাভ করবে ।" [সূরা আস-সাজদাহ:৩] অনুরূপভাবে এ আয়াতে কিসের থেকে সতর্ক করতে হবে তাও বলা হয়নি । অন্যত্র তা বলে দেয়া হয়েছে, যেমন, "তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য" [সূরা আল-কাহাফ:২] "অতঃপর আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি ।" [সূরা আল-লাইল:১৪] এ আয়াতে ভীতিপ্রদর্শন এবং সুসংবাদ প্রদান একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে । এখানে ভীতিপ্রদর্শন কাফেরদের জন্য আর সুসংবাদ মুমিনদের জন্য । [আদওয়াউল বায়ান]

(১) অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনকেই নিজের পথ প্রদর্শক হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে যে হিদায়াত ও পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন একমাত্র তারই অনুসরণ করতে হবে । যারাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে এবং আল্লাহ্র পাঠানো নবীর আদর্শ অনুসরণ না করে অন্যের কাছ থেকে কিছু নিতে চেষ্টা করবে, তারাই আল্লাহ্র হুকুমকে বাদ দিয়ে অন্যের হুকুম গ্রহণ করল । [ইবন কাসীর]

(২) পূর্ববর্তী লোকদের উপর রাতে বা দুপুরে যে শাস্তি এসেছিল তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষদেরকে সতর্ক করছেন । অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, "তবে কি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের উপর রাতে আসবে, যখন তারা থাকবে গভীর ঘুমে? নাকি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে

৫. অতঃপর যখন আমাদের শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল, তখন তাদের দাবী শুধু এই ছিল যে, তারা বলল, 'নিশ্চয় আমরা যালিম ছিলাম[১] ।'

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

৬. অতঃপর যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল অবশ্যই তাদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করব এবং রাসূলগণকেও অবশ্যই আমরা জিজ্ঞেস করব[২] ।

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের উপর আসবে দিনের বেলা, যখন তারা খেলাধুলায় মেতে থাকবে?"[সূরা আল-আ'রাফঃ ৯৭-৯৮] আরও বলেন, "বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রাতে অথবা দিনে এসে পড়ে, তবে অপরাধীরা তার কোনটিকে তাড়াতাড়ি পেতে চায়" [সূরা ইউনুস:৫০] বিশেষ করে যারাই খারাপ কুটকৌশল ও ষড়যন্ত্র করেছে তাদের পরিণতি যে কি ভয়াবহ হতে পারে সে ব্যাপারেও অন্যত্র আল্লাহ্ সাবধান করেছেন, "যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না অথবা তাদের উপর আসবে না শাস্তি এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধিও করবে না? অথবা চলাফেরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? অতঃপর তারা তা ব্যর্থ করতে পারবে না । অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না? নিশ্চয় তোমাদের রব অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু" । [আন-নাহল:৪৫-৪৬]

(১) অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন । আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা ধ্বংস করেছি বহু জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিল যালেম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি । তারপর যখন তারা আমাদের শাস্তি টের পেল তখনই তারা সেখান থেকে পালাতে লাগল । 'পালিয়ে যেও না এবং ফিরে এসো যেখানে তোমরা বিলাসিতায় মত্ত ছিলে ও তোমাদের আবাসগৃহে, যাতে এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় ।"[সূরা আল-আম্বিয়াঃ ১১-১৩]

(২) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমি তোমাদের কাছে রাসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? নবীগণকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ যেসব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো আপনারা নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছিয়েছেন কি না? এ আয়াতে রাসূলদেরকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে এবং প্রেরিত লোকদেরকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তা বর্ণনা করা হয়নি । তবে কুরআনের অন্যত্র সেটা বর্ণিত হয়েছে । যেমন প্রথমটি সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "স্মরণ করুন, যেদিন আল্লাহ্

৭. অতঃপর অবশ্যই আমরা তাদের কাছে পূর্ণ জ্ঞানের সাথে তাদের কাজগুলো বিবৃত করব, আর আমরা তো অনুপস্থিত ছিলাম না(১) ।

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ ۝

রাসূলগণকে একত্র করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, 'আপনারা কি উত্তর পেয়েছিলেন?" [সূরা আল-মায়িদাহ:১০৯] আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "আর সেদিন আল্লাহ্ এদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা রাসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে?" [সূরা আল-কাসাস:৬৫] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন যে, তিনি মানুষদেরকে তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, "কাজেই শপথ আপনার রবের! অবশ্যই আমরা তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই, সে বিষয়ে, যা তারা আমল করত ।" [সূরা আল-হিজর:৯২-৯৩]
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ কেয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি আল্লাহ্র বাণী পৌঁছিয়েছি কি না? তখন তোমরা উত্তরে কি বলবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আমরা বলব, আপনি আল্লাহ্র বাণী আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন । একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'হে আল্লাহ্, আপনি সাক্ষী থাকুন' । [মুসলিমঃ ১২১৮]
অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেনঃ আমি তাঁর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়েছি কি না । আমি উত্তরে বলবঃ পৌঁছিয়েছি । কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হও যে, যারা এখন উপস্থিত রয়েছ, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেয় । [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে বলছেন যে, তিনি তাঁর বান্দারা ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বহীন যা করত বা বলত সবকিছু সম্পর্কে কিয়ামতের মাঠে বিস্তারিত জানাবেন । কারণ, তিনি সবকিছু দেখছেন, কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই, কোন কিছু সম্পর্কেই তিনি বেখবর নন । বরং তিনি চোখের খিয়ানত ও অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কেও অবগত । আল্লাহ্ বলেন, "তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না । মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই ।"[সূরা আল-আন'আম:৫৯] [ইবন কাসীর] সুতরাং আল্লাহ্ হাশরের মাঠে তাদেরকে যা জানাবেন তা জ্ঞানের ভিত্তিতেই জানাবেন । দুনিয়াতে যা কিছুই ঘটেছে সবই তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে । সবকিছু তিনি জানার পরও তাঁর ফেরেশতাদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন । অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি

৮. আর সেদিন ওজন[১] যথাযথ হবে[২] । | وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

উপস্থিত থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক তিনি তো তাদের সংগেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন । তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত ।" [সূরা আল-মুজাদালাহ:৭] অন্যত্র বলেন, "তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে নির্গত হয় আর যা আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয়" [সূরা সাবা:২] আরও বলেন, "তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা থেকে বের হয় এবং আসমান হতে যা কিছু নামে ও আসমানে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন---তিনি (জ্ঞানে) তোমাদের সংগে আছেন" [সূরা আল-হাদীদ:৪] আরও বলেন, "আর আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে কাজই কর না কেন, আমরা তোমাদের সাক্ষী থাকি- যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আর আসমানসমূহ ও যমীনের অণু পরিমাণও আপনার রবের দৃষ্টির বাইরে নয় এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই" [সূরা ইউনুস:৬১] [আদওয়াউল বায়ান]

(১) সেদিনের সে দাঁড়িপাল্লায় কোন অপরাধীর অপরাধ বাড়িয়ে দেয়া হবে না। আর কোন নেককারের নেক কমিয়ে দেয়া হবে না। [আদওয়াউল বায়ান] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ সেটা বলেছেন, "আর কেয়ামতের দিনে আমরা ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব, সুতরাং কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না এবং কাজ যদি শস্য দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমরা উপস্থিত করব;" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৪৭] তবে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন নেক বান্দার আমলকে বহুগুণ বর্ধিত করবেন। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। আর কোন পুণ্য কাজ হলে আল্লাহ্ সেটাকে বহুগুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন ।" [সূরা আন-নিসা:৪০] অনুরূপভাবে 'হাদীসে বিতাকাহ' নামে বিখ্যাত হাদীসেও [দেখুন, ইবন মাজাহ: ৪৩০০; তিরমিযী: ২১২৭] সেটা বর্ণিত হয়েছে।

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "সেদিন যে ভাল-মন্দ কাজকর্মের ওজন হবে তা সত্য-সঠিকভাবেই হবে ।" এতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে যে, যেসব বস্তু ভারী, সেগুলোর ওজন ও পরিমান হতে পারে। মানুষের ভাল-মন্দ কাজকর্ম কোন জড় পদার্থ নয় যে, এগুলোকে ওজন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওজন কিরূপে করা হবে? উত্তর এই যে, প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। অতএব, আমরা যা ওজন করতে পারি না আল্লাহ্ তা'আলাও তা ওজন করতে পারবেন, এটা বিচিত্র কিছু নয়। দ্বিতীয়তঃ আজকাল জগতে ওজন করার নতুন নতুন যন্ত্র আবিস্কার হয়েছে যাতে দাঁড়িপাল্লা, স্কেলকাঁটা ইত্যাদির কোন প্রায়োজন নেই। এসব নবাবিস্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল এমন বস্তুও ওজন করা

فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۝

সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে[১]।

যায়, যা ইতোপূর্বে ওজন করার কল্পনাও করা যেত না। আজকাল বাতাসের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায়। এমনকি শীত-গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়িপাল্লা। যদি আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তি-বলে মানুষের কাজকর্ম ওজন করে নেন, তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। হাদীসে রয়েছে যে, 'যদি কোন বান্দার ফরয কাজসমূহে কোন ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে রাব্বুল 'আলামীন বলবেনঃ দেখ, তার নফল কাজও আছে কি না। নফল কাজ থাকলে ফরযের ত্রুটি নফল দ্বারা পূরণ করা হবে।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৬৫]
আমলের ওজন পদ্ধতিঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'কেয়ামতের দিন কিছু মোটা লোক আসবে। তাদের মূল্য আল্লাহ্‌র কাছে মশার পাখার সমানও হবে না। এ কথার সমর্থনে কুরআনুল কারীমের এ আয়াত পাঠ করলেন। ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ وَزْنًا﴾ -অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আমি তাদের কোন ওজন স্থির করবো না।' [বুখারীঃ ৪৪৫২, মুসলিমঃ ২৭৮৫] আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর প্রশংসায় বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তার পা দু'টি বাহ্যতঃ যতই সরু হোক, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, কেয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় তার ওজন ওহূদ পর্বতের চাইতেও বেশী হবে।' [মুসনাদে আহমাদ:১/৪২০] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'দু'টি বাক্য উচ্চারণের দিক দিয়ে খুবই হাল্‌কা; কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহ্‌র কাছে অতি প্রিয়। বাক্য দু'টি হচ্ছে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী', 'সুবহানাল্লাহিল আযীম'। [বুখারীঃ ৭৫৬৩] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ 'সুব্‌হানাল্লাহ্' বললে আমলের দাঁড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যায় আর 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্' বললে বাকী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৬০, ৫/৩৬৫; সুনান দারমীঃ ৬৫৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমলের ওজনের বেলায় কোন আমলই সচ্চরিত্রতার সমান ভারী হবে না।' [আবু দাউদঃ ৪৭৯৯; তিরমিযীঃ ২০০৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়, তার আমলের ওজনে দু'টি কিরাত রেখে দেয়া হবে [বুখারীঃ ১২৬১]। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এই কিরাতের ওজন হবে ওহূদ পাহাড়ের সমান।' [মুসলিমঃ ৬৫৪] কেয়ামতে আমলের ওজন সম্পর্কে এ ধরণের বহু হাদীস রয়েছে।

(১) মানুষের জীবনের সমগ্র কার্যাবলী দু'টি অংশে বিভক্ত হবে। একটি ইতিবাচক বা সৎকাজ এবং অন্যটি নেতিবাচক বা অসৎকাজ। ইতিবাচক অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে সত্যকে জানা ও মেনে নেয়া এবং সত্যের অনুসরণ করে সত্যের খাতিরে কাজ করা। আখেরাতে এটিই হবে ওজনদার, ভারী ও মূল্যবান। আর সে মূল্যবান কাজের

وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِيۡنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ خَسِرُوۡٓا اَنۡفُسَهُمۡ بِمَا كَانُوۡا بِاٰيٰتِنَا يَظۡلِمُوۡنَ ۝٩

৯. আর যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে, তারাই সে সব লোক, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে[১], যেহেতু তারা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি যুলুম করত।

وَلَقَدۡ مَكَّنّٰكُمۡ فِى الۡاَرۡضِ وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيۡهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيۡلًا مَّا تَشۡكُرُوۡنَ ۝١٠

১০. আর অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর[২]।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَلَقَدۡ خَلَقۡنٰكُمۡ ثُمَّ صَوَّرۡنٰكُمۡ ثُمَّ قُلۡنَا لِلۡمَلٰٓئِكَةِ

১১. আর অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে

ফলাফলও মূল্যবান হবে। এ আয়াতে তা উল্লেখ না হলেও অন্য আয়াতে সেটা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "অতঃপর যার পাল্লাসমূহ ভারী হবে, সে তো থাকবে সন্তোষজনক জীবনে।" [সূরা আল-কারি'আহ্:৬-৭] অর্থাৎ জান্নাতে। অন্যদিকে সত্য থেকে গাফিল হয়ে অথবা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ নিজের নফস-প্রবৃত্তি বা অন্য মানুষের ও শয়তানের অনুসরণ করে অসত্য পথে যা কিছুই করে, তা সবই নেতিবাচক অংশে স্থান লাভ করবে। আর এ নেতিবাচক অংশটি কেবল যে মূল্যহীন হবে তাই নয়, বরং এটি মানুষের ইতিবাচক অংশের মর্যাদাও কমিয়ে দেবে। কাজেই মানুষের জীবনের সমুদয় কার্যাবলীর ভাল অংশ যদি তার মন্দ অংশের ওপর বিজয় লাভ করে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনেক কিছু দেবার পরও তার হিসেবে কিছু না কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবেই আখেরাতে তার সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

(১) এখানে ক্ষতি বলতে কি তা বলা হয়নি। অন্য আয়াতে সেটা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "আর যার পাল্লাসমূহ হাল্‌কা হবে, তার স্থান হবে 'হা-ওয়িয়াহ্', আর আপনাকে কিসে জানাবে সেটা কী? অত্যন্ত উত্তপ্ত আগুন" [সূরা আল-কারি'আহ: ৮-১১] আরও বলেন, "আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়" [সূরা আল-মুমিনূন: ১০৩-১০৪]

(২) মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে সঞ্চিত রেখেছেন। কাজেই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু মানুষ গাফেল হয়ে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পার্থিব দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছেঃ "তোমরা খুব কম লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।"

اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾

সৃষ্টি করেছি, তারপর আমরা তোমাদের আকৃতি প্রদান করেছি[১], তারপর আমরা ফিরিশ্‌তাদেরকে বললাম, আদমকে সিজ্‌দা কর। অতঃপর ইবলীস ছাড়া সবাই সিজ্‌দা করল। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না।

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

১২. তিনি বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কি তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সিজদা করলে না?' সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন[২]।'

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾

১৩. তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি এখান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে, এটা হতে পারে না। সুতরাং তুমি বের হয়ে যাও, নিশ্চয়

(১) এ আয়াতের তাফসীরে ইবন আব্বাস বলেন, এখানে সৃষ্টি করার অর্থ প্রথমে আদমকে সৃষ্টি করা। আর আকৃতি প্রদানের কথা বলে তার সন্তানদেরকে বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, এখানে সৃষ্টি করার কথা বলে আদম এবং আকৃতি প্রদানের কথা বলে, আদমের সন্তানদেরকে আদমের পৃষ্ঠে আকৃতি প্রদানের কথা বোঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইবলীসকে আল্লাহ্ তা'আলা আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর যদি ইবলীসকে সমস্ত জিন জাতির পিতা বলা হয়, তখন তো এ ব্যাপারে আর কোন কথাই থাকে না। কারণ অন্যান্য আয়াতেও জিন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "আর এর আগে আমরা সৃষ্টি করেছি জিনদেরকে অতি উষ্ণ নির্ধুম আগুন থেকে" [সূরা আল-হিজর:২৭] তাছাড়া অন্যত্র আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, জিন জাতিকে 'মারেজ' থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর 'মারেজ' হচ্ছে, নির্ধুম অগ্নিশিখা। আল্লাহ্ বলেন, "এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম আগুনের শিখা হতে।" [সূরা আর-রহমান: ১৫] [আদওয়াউল বায়ান]

তুমি অধমদের[১] অন্তর্ভুক্ত।'

(১) 'সাগেরীন' শব্দটি বহুবচন। এক বচন হলো 'সাগের'। অর্থ লাঞ্ছনা ও অবমাননার মধ্যে নিজেকে নিয়ে রাখা। শব্দটি মূল হচ্ছে, 'সাগার' যার অর্থ, সবচেয়ে কঠিন লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হওয়া। [আদওয়াউল বায়ান] অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেই লাঞ্ছনা, অবমাননা ও নিকৃষ্টতর অবস্থা অবলম্বন করে। সুতরাং আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্টি হয়েও তোমার অহংকারে মত্ত হওয়া এবং তুমি নিজের মর্যাদা ও শ্রেষ্টত্বের যে ধারণা নিজেই তৈরী করে নিয়েছ তার দৃষ্টিতে তোমার রবের হুকুম তোমার জন্য অবমাননাকর মনে হওয়া ও সে জন্য তা অমান্য করার অর্থ নিজেই নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে দেয়া। শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা অহমিকা, মর্যাদার ভিত্তিহীন দাবী এবং কোন জন্মগত স্বতঃসিদ্ধ অধিকার ছাড়াই নিজেকে অযথা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন মনে করা তোমাকে বড়, শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাশীল করতে পারে না। বরং এর ফলে তুমি মিথ্যুক, লাঞ্ছিত ও অপমানিতই হবে এবং তোমার এ লাঞ্ছনা ও অবমাননার কারণ হবে তুমি নিজেই। কুরআনের অন্যত্র মিথ্যা অহঙ্কারের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে যে, অহঙ্কারী আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও তাঁর নিদর্শনাবলী বুঝতে অক্ষম হয়ে যায়। সে তা থেকে হিদায়াত পায় না। আল্লাহ্ বলেন, "যমীনে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমার নিদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সৎপথ দেখলেও সেটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভুল পথ দেখলে সেটাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৪৬] আবার কোথাও বলা হয়েছে যে, অহঙ্কারীর ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আল্লাহ্ বলেন, "কাজেই তোমরা দরজাগুলো দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ী হয়ে। অতঃপর অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!" [সূরা আন-নাহল: ২৯] আরও বলেন, "অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?" [সূরা আয-যুমার:৬০] আরও বলেন, "বলা হবে, 'জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। অতএব অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!" [সূরা আয-যুমার:৭২] "নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।" [সূরা গাফির:৬০] আবার বলা হয়েছে যে, অহঙ্কারীদের ঈমান নসীব হয় না। আল্লাহ্ বলেন, "শুধু তারাই আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, যারা সেটার দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হলে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর তারা অহংকার করে না।" [সূরা আস-সাজদাহ:১৫] আরও বলেন, "তাদেরকে -অপরাধীদেরকে- 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই' বলা হলে তারা অহংকার করত।" [সূরা আস-সাফফাত:৩৫] আবার কোথাও এসেছে যে, আল্লাহ্ অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না। "নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।" [সূরা আন-নাহল:২৩] [আদওয়াউল বায়ান]

قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾

১৪. সে বলল, 'আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।'

قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾

১৫. তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত(১)।'

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾

১৬. সে বলল, 'আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, সে কারণে অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনার সরল পথে মানুষের জন্য বসে থাকব(২)।'

---

(১) এ আয়াতে ইবলীসকে দেয়া সময় সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। শুধু এটুকু বলা হয়েছে যে, তোমাকে অবকাশ দেয়া হল। কিন্তু অন্যান্য সূরায় এ অবকাশ নির্ধারণ করে বলা হয়েছে, ﴿إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ﴾ [সূরা আল-হিজরঃ ৩৮, সোয়াদঃ ৮১] এ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, ইবলীসের প্রার্থিত অবকাশ কেয়ামত পর্যন্ত দেয়া হয়নি, বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ আলেমদের নিকট তার অবকাশের মেয়াদ হচ্ছে শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক দেয়া পর্যন্ত। [আদওয়াউল বায়ান] সুদ্দি বলেন, তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়নি। কারণ, যখন শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক দেয়া হবে, তখন ﴿فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ﴾ বা আসমান ও যমীনের সবাই মারা পড়বে, আর তখন ইবলীসও মারা যাবে। [তাবারী]
আলোচ্য ইবলিসের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, কাফেরদের দো'আ কবুল করা হয়। অথচ অন্যত্র আল্লাহর বাণী ﴿وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ﴾ "কাফেরদের দো'আ তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবেই" [সূরা আর-রা'দঃ ১৪] এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, কাফেরের দো'আ কবুল হয় না। এর উত্তর এই যে, দুনিয়াতে কাফেরের দো'আও কবুল হতে পারে। ফলে ইবলীসের মত মহা কাফেরের দো'আও কবুল হয়ে গেছে। কিন্তু আখেরাতে কাফেরের দো'আ কবুল হবে না। উল্লেখিত আয়াত আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। আর কাফেরের কোন কোন দো'আ কবুল হয় বলে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা মাযলূমের দো'আ থেকে বেঁচে থাক, যদিও সে কাফের হয়; কেননা তার দো'আ কবুলের ব্যাপারে কোন পর্দা নেই।' [মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৫৩; দিয়া আল-মাকদেসী, হাদীস নং ২৭৪৮]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'শয়তান আদম সন্তানের যাবতীয় পথে বসে পড়ে। তার ইসলামের পথে বসে পড়ে তাকে বলেঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে এবং আপন দ্বীন ও বাপ-দাদার দ্বীন ত্যাগ করবে? তারপর সে

১৭. 'তারপর অবশ্যই আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে ও তাদের পিছন থেকে, তাদের ডানদিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে(১) এবং

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾

নাফরমানী করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর শয়তান তার হিজরতের পথে বসে পড়ে তাকে বলতে থাকেঃ তুমি হিজরত করে তোমার ভূমি ও আকাশ ত্যাগ করবে? লম্বা পথে মুহাজিরের উদাহরণ তো হলো ঘোড়ার মত। কিন্তু সে তার নাফরমানী করে হিজরত করে। তারপর শয়তান তার জেহাদের পথে বসে বলতে থাকেঃ তুমি কি জিহাদ করবে এতে নিজের জান ও মালের ক্ষতির আশংকা, যুদ্ধ করবে এতে তুমি মারা পড়বে, তারপর তোমার স্ত্রীর বিয়ে হয়ে যাবে, সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে। তাতেও সে শয়তানের নাফরমানী করে জিহাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'যে ব্যক্তি এতটুকু করতে পারবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মহান আল্লাহর জন্য যথাযথ হয়ে পড়ে, যদি কাউকে হত্যা করা হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র উপর যথাযথ হয়ে পড়ে। আর যদি ডুবেও যায় তবুও আল্লাহ্র জন্য যথাযথ হয়ে পড়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো অথবা যদি তার সফর করার জন্তু থেকে পড়ে সে মারা যায় তবুও আল্লাহ্র উপর যথাযথ হয়ে পড়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৪৮৩]

(১) মানুষের উপর শয়তানের হামলা শুধু চতুর্দিকেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আরো ব্যাপক। আলোচ্য আয়াতে ইবলীস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ করার জন্য চারটি দিক বর্ণনা করেছে- অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বাম। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হল প্রত্যেক দিক ও প্রত্যেক কোণ থেকে। এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপন্থী নয় যে, শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে। তারপর সমগ্র দেহে হস্তক্ষেপ করে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে সামনে থেকে আসার অর্থ, দুনিয়ায়। পশ্চাৎ দিক থেকে আসার অর্থ আখেরাতে। ডানদিক থেকে আসার অর্থ, নেককাজের মাধ্যমে আসা। আর বামদিক থেকে আসার অর্থ, গুনাহের দিক থেকে আসা। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদাহ বলেন, ইবলীস মানুষের সামনে থেকে এসে বলে, পুনরুত্থান নেই, জান্নাত নেই, জাহান্নাম নেই। মানুষের পিছন দিক থেকে দুনিয়াকে তার কাছে চাকচিক্যময় করে তোলে এবং দুনিয়ার প্রতি লোভ লাগিয়ে সেদিক আহ্বান করতে থাকে। তার ডানদিক থেকে আসার অর্থ নেক কাজ করার সময় সেটা করতে দেরী করায়, আর বাম দিক থেকে আসার অর্থ, গোনাহ ও অপরাধমূলক কাজকে সুশোভিত করে দেয়, সেদিকে আহ্বান করে, সেটার প্রতি নির্দেশ দেয়। হে বনী আদম! শয়তান তোমার সবদিক থেকেই আসছে, তবে সে তোমার উপর দিক থেকে আসে না, কারণ, সে তোমার ও আল্লাহ্র রহমতের মধ্যে বাধা হতে পারে না। [তাবারী]

আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না[১]।'

১৮. তিনি বললেন, 'এখান থেকে বের হয়ে যাও ধিকৃত, বিতাড়িত অবস্থায়। মানুষের মধ্যে যারাই তোমার অনুসরণ করবে, অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব[২]।'

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

১৯. 'আর হে আদম! আপনি ও আপনার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করুন, অতঃপর যেথা হতে ইচ্ছা খান, কিন্তু এ গাছের ধারে-কাছেও যাবেন না, তাহলে আপনারা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।'

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

(১) শয়তান এটা বলেছিল তার ধারণা অনুসারে। সে মনে করেছিল যে, তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে, তার অনুসরণ করবে। যাতে সে তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র শয়তানের এ ধারণার কথা স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আর অবশ্যই তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মুমিন দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল" [সূরা সাবা:২০] [আদওয়াউল বায়ান] ইবন আব্বাস বলেন, এখানে মানুষদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ না থাকার কথা বলে, তাওহীদের কথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আপনি তাদেরকে তাওহীদবাদী পাবেন না। [তাবারী]

(২) আয়াতে শয়তান ও শয়তানের অনুসারীদের দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করার কথা বলা হয়েছে। এ কথা অন্য আয়াতেও এসেছে, যেমন, "তিনি বললেন, 'তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি-- 'অবশ্যই তোমার দ্বারা ও তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সবার দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।" [সূরা ছোয়াদ ৮৪-৮৫] আরও এসেছে, "আল্লাহ্ বললেন, 'যাও, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় জাহান্নামই হবে তোমাদের সবার প্রতিদান, পূর্ণ প্রতিদান হিসেবে। 'আর তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পার পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও।' আর শয়তান ছলনা ছাড়া তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না।" [সূরা আল-ইসরা: ৬৩-৬৪] আরও বলেন, "তারপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টকারীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অধোমুখী করে এবং ইব্‌লীসের বাহিনীর সকলকেও" [সূরা আশ-শু'আরা: ৯৪-৯৫] অনুরূপ অন্যান্য আয়াত। [আদওয়াউল বায়ান]

২০. তারপর তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশ্‌তা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হও, এ জন্যেই তোমাদের রব এ গাছ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।'

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَاوٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১. আর সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বলল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের শুভাকাংখীদের একজন(১)।'

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾

২২. অতঃপর সে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করল। এরপর যখন তারা সে গাছের ফল খেল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এ গাছ থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু?'

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

(১) কাতাদা বলেন, শয়তান তাদের দু'জনের কাছে শপথের মাধ্যমে এগিয়ে এসে ধোঁকা দিয়েছিল। কখনও কখনও আল্লাহ্‌র উপর খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তিও ধোঁকা খেয়ে থাকে। অনুরূপ এখানেও শয়তান তাদের দু'জনকে ধোঁকা দিয়েছিল। সে বলেছিল, 'আমি তোমাদের আগে সৃষ্ট হয়েছি। আমি তোমাদের থেকে ভাল জানি। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব।' কোন কোন মনীষী বলেন, কেউ আমাদেরকে আল্লাহর কথা বলে ধোঁকা দিলে আমরা ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। [তাবারী]

২৩. তারা বলল, 'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব[১]।'

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾

২৪. তিনি বললেন, 'তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং যমীনে কিছুদিনের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।'

قَالَ اهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾

২৫. তিনি বললেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই তোমরা মারা যাবে। আর সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করা হবে[২]।'

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

তৃতীয় রুকূ'

২৬. হে বনী আদম! অবশ্যই আমরা তোমাদের জন্য পোষাক নাযিল করেছি, তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকা ও বেশ-ভূষার জন্য। আর তাকওয়ার পোষাক[৩], এটাই

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

(১) কাতাদা বলেন, তারা দু'জন নিজেদের লজ্জাস্থান পরস্পর দেখতে পেত না। কিন্তু অপরাধের পর সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন, হে রব! যদি আমি তাওবা করি এবং ক্ষমা চাই তাহলে কি হবে আমাকে জানান? আল্লাহ্ বললেন, তাহলে আমি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। কিন্তু ইবলীস ক্ষমা চাইলো না, বরং সে অবকাশ চাইল। ফলে আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বিষয় দান করলেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) ইবন কাসীর বলেন, এ আয়াতের অর্থ অন্য আয়াতের মত, যেখানে এসেছে, "আমরা মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব।" [সূরা ত্বা-হা: ৫৫]

(৩) لِبَاسُ التَّقْوَىٰ শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোষাক দ্বারা গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করা ও সাজ-সজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতি।

সর্বোত্তম(১) । এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা

এ আল্লাহ্‌ভীতি পোষাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পায় । তাই পোষাকে যেন গুপ্তাঙ্গগুলি পুরোপুরি আবৃত হয় । উলঙ্গের মত দৃষ্টিগোচর না হয় । অহংকার ও গর্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই । অপব্যয় না থাকা চাই । মহিলাদের জন্য পুরুষের পোষাকের মত আর পুরুষের জন্য মহিলাদের পোষাকের মত না হওয়া চাই । পোষাকে বিজাতির অনুকরণ না হওয়া চাই । এর প্রত্যেকটির ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে ।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ তোমাদের পোষাক আল্লাহ্ তা'আলার একটি মহান নেয়ামত । একে যথার্থ মূল্য দাও । এখানে মুসলিমদেরকে সম্বোধন করা হয়নি- সমগ্র বনী-আদমকে করা হয়েছে । এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোষাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন । জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে । অতঃপর এর বিশদ বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে ।

(এক) ﴿لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ﴾ -এখানে يُوَارِي **শব্দটি** موارة থেকে উদ্ভুত, এর অর্থ আবৃত করা । আর سَوْآت **শব্দটি** سوءة এর বহুবচন, এর অর্থ মানুষের ঐসব অঙ্গ, যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবতই খারাপ ও লজ্জাকর মনে করে । উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে এমন একটি পোষাক সৃষ্টি করেছি, যা দ্বারা তোমরা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার । মুজাহিদ বলেন, আরবের কিছু লোক আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ উলঙ্গ হয়ে সম্পাদন করত । আবার কোন কোন লোক যে পোষাক পরিধান করে তাওয়াফ করেছে সে পোষাক আর পরিধান করত না । এ আয়াতে তাদেরকেও উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । [তাবারী]

(দুই) ﴿وَرِيْشًا﴾ -অর্থাৎ সাজ-সজ্জার জন্য মানুষ যে পোষাক পরিধান করে, তাকে ريش বলা হয় । অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার জন্য তো সংক্ষিপ্ত পোষাকই যথেষ্ট হয়; কিন্তু আমি তোমাদেরকে আরো পোষাক দিয়েছি, যাতে তোমরা তা দ্বারা সাজ-সজ্জা করে বাহ্যিক দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পার । ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে 'রীশ' বলে 'সম্পদ' বোঝানো হয়েছে । [তাবারী] বাস্তবিকই পোষাক একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ ।

(তিন) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তৃতীয় এক প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ﴾ অর্থাৎ তা হচ্ছে তাকওয়ার পোষাক আর এটিই সর্বোত্তম পোষাক । ইবন আব্বাস ও উরওয়া ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের তাফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার পোষাক বলে সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌ভীতি বুঝানো হয়েছে । এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায় । এ কারণেই এটি সর্বোত্তম পোষাক । কাতাদা বলেন, তাকওয়ার পোষাক বলে ঈমানকে বোঝানো হয়েছে । [তাবারী]

উপদেশ গ্রহণ করে[১] ।

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم
مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ يَنزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوۡءَٰتِهِمَآۚ إِنَّهُۥ
يَرَىٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡۗ إِنَّا جَعَلۡنَا
ٱلشَّيَٰطِينَ أَوۡلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ٢٧

২৭. হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে---যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল, সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য[২] বিবস্ত্র করেছিল[৩] । নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না । নিশ্চয় আমরা শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছি, যারা ঈমান আনে না ।

وَإِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةٗ قَالُواْ وَجَدۡنَا عَلَيۡهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ
أَمَرَنَا بِهَاۗ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ أَتَقُولُونَ
عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٢٨

২৮. আর যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে[৪] তখন বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এতে পেয়েছি এবং আল্লাহ্‌ও আমাদেরকে এরই নির্দেশ দিয়েছেন ।' বলুন, 'আল্লাহ্ অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না । তোমরা কি আল্লাহ্

---

(১) অর্থাৎ মানুষকে এ তিন প্রকার পোষাক দান করা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তির নিদর্শনসমূহের অন্যতম- যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ।

(২) শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে । তাই মানুষের সর্বপ্রথম মঙ্গল বিধানকারী শরী'আত গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা । সালাত, সিয়াম ইত্যাদি সবই এরপর ।

(৩) মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোষাক খসে পড়েছিল । আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয় । শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে দূরে ঠেলে সাধারণ্যে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না ।

(৪) فاحشة ও فحش، فحشاء এমন প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণমাত্রায় সুস্পষ্ট । [ফাতহুল কাদীর]

সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না[১]?'

২৯. বলুন, 'আমার রব নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের[২]।' আর তোমরা প্রত্যেক সাজদাহ্ বা ইবাদতে তোমাদের লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্‌কেই নির্ধারণ কর[৩] এবং তাঁরই আনুগত্যে

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۟ ﴿٢٩﴾

(১) ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কুরাইশ ছাড়া কোনো ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোন কুরাইশীর কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হত, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করতে হত। এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেয়া কুরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ মহিলা অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণতঃ রাতের অন্ধকারে তাওয়াফ করত। তাদের নিকট এ শয়তানী কাজের যুক্তি হলো, যেসব পোষাক পরে আমরা পাপকাজ করি, সেগুলো পরিধান করে আল্লাহ্‌র ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবী। এ জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টি বুঝত না যে, উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা আরো বেশী বেআদবীর কাজ। হারামের সেবক হওয়ার সুবাদে শুধু কুরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল। এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। [তাবারী] এতে বলা হয়েছেঃ তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করত, তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলতঃ আমাদের বাপ-দাদা ও মুরুব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরিকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরো বলত আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। প্রথমটি সত্য হলেও দ্বিতীয়টি নিঃসন্দেহে মিথ্যা।

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যেসব মূর্খ উলঙ্গ তাওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র দিকে করে, আপনি তাদের বলে দিনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা قسط এর নির্দেশ দেন। قسط এর আসল অর্থ ন্যায়বিচার ও সমতা। এখানে ঐ কাজকে বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ ত্রুটিও নেই এবং নির্দিষ্ট সীমার লঙ্ঘনও নেই। অর্থাৎ স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত। শরী'আতের সব বিধি-বিধানের অবস্থা তাই। এজন্য قسط শব্দের অর্থে যাবতীয় ইবাদাত, আনুগত্য ও শরী'আতের সাধারণ বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(৩) এখানে ইবাদতের সময় সবকিছু বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ইখলাসের সাথে আল্লাহকে উদ্দেশ্য নিতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে মাসজিদসমূহে যখন ইবাদত করা হয়। [মুয়াসসার] ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, এ আয়াতে 'কিয়ামুল ওয়াজহ' বলে অন্য আয়াত 'ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া' যা বুঝানো হয়েছে, তাই বোঝানো হয়েছে। এ সবের অর্থ

বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাক(১)। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে(২)।

৩০. একদলকে তিনি হিদায়াত করেছেন। আর অপরদল, তাদের উপর পথ

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَٰلَةُ

হচ্ছে, ইখলাসের সাথে যাবতীয় ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা। [ইসতিকামাহ ২/৩০৬] এখানে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইবাদতের জন্য বিশেষ করে ইখলাসের সাথে ইবাদতের জন্য সবচেয়ে উত্তম স্থান হচ্ছে মাসজিদ, মাযার নয়। যেমনটি কোন কোন মানুষ মনে করে থাকে। [ইবন তাইমিয়্যাহ, ইকতিদায়ুস সিরাতিল মুস্তাকীম ১/৩৯২] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্‌ আয়াতের অর্থে বলেন, 'তোমরা তোমাদের চেহারাকে প্রতিটি মসজিদেই কিবলামূখী কর, যেখানেই সালাত আদায় কর না কেন'। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলাকে এমনভাবে ডাক, যেন ইবাদাত খাঁটিভাবে তাঁরই জন্য হয়; এতে যেন অন্য কারো অংশীদারিত্ব না থাকে; এমন কি গোপন শির্ক অর্থাৎ লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই। এতে বোঝা গেল যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকেই শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। আন্তরিকতা ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আনুগত্যই যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে শুধুমাত্র আন্তরিকতাও রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আতের অনুসরণ ব্যতীত গ্রহনযোগ্য নয়।

(২) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে জমায়েত হবে খালি পা, কাপড় বিহীন, খতনাবিহীন অবস্থায়। তারপর তিনি বললেনঃ "তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে" এখান থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়লেন। তারপর বললেনঃ 'মনে রেখ! কেয়ামতের দিন প্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হলেন ইব্‌রাহীম। মনে রেখ! আমার উম্মতের কিছু লোককে নিয়ে আসা হবে তারপর তাদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবঃ হে রব! এরা আমার প্রিয় সাথীবৃন্দ। তখন বলা হবেঃ আপনি জানেন না তারা আপনার পরে কি নতুন পদ্ধতির আবিস্কার করেছে। তারপর আমি তা বলব যা নেক বান্দা বলেছিল, "আর আমি তাদের মাঝে যতদিন ছিলাম তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম, তারপর যখন আপনি আমাকে মৃত্যু দেন আপনিই তো তখন তাদের উপর খবরদার ছিলেন" তখন বলা হবেঃ আপনি তাদের কাছ থেকে চলে আসার পর থেকেই এরা তাদের পিছনে ফিরে গিয়েছিল। [বুখারীঃ ৪৬২৫, মুসলিমঃ ২৮৫৯]

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝٣٠

ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে[১]। নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক-রূপে গ্রহণ করেছিল এবং মনে করত[২] তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا

৩১. হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোষাক গ্রহণ

(১) এ আয়াতের সমর্থনে আরও আয়াত ও অনেক হাদীস এসেছে। সূরা আত-তাগাবুনের ২নং আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এটা তাক্‌দীরের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে কাফের ও মুমিন এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। কিন্তু মানুষ জানেনা সে কোনভাগে। সুতরাং তার দায়িত্ব হবে কাজ করে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীসেও তা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদের কেউ কেউ এমন কাজ করে যে, বাহ্য দৃষ্টিতে সে জান্নাতের অধিবাসী অথচ সে জাহান্নামী। আবার তোমাদের কেউ কেউ এমন কাজ করে যে, বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় সে জাহান্নামী অথচ সে জান্নাতী। কারণ মানুষের সর্বশেষ কাজের উপরই তার হিসাব নিকাশ'। [বুখারীঃ২৮৯৮, ৪২০২, মুসলিমঃ ১১২, আহমাদ ৫/৩৩৫] অন্য হাদীসে এসেছে, 'প্রত্যেক বান্দাহ পুনরুত্থিত হবে সেটার উপর যার উপর তার মৃত্যু হয়েছে'। [মুসলিমঃ২৮৭৮]

(২) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এটা বর্ণনা করেছেন যে, কাফেররা শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক বানিয়েছে। তাদের এ অভিভাবকত্বের স্বরূপ হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ্‌র শরী'আতের বিরোধিতা করে শয়তানের দেয়া মত ও পথের অনুসরণ করে থাকে। তারপরও মনে করে থাকে যে, তারা হিদায়াতের উপর আছে। অন্য আয়াতে যারা এ ধরণের কাজ করবে তাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। " বলুন, 'আমরা কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কাজে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? ওরাই তারা, 'পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকাজই করছে " [সূরা আল-কাহাফ: ১০৩-১০৪] [আদওয়াউল বায়ান] মূলত: শরী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কে মূর্খতা ও অজ্ঞতা কোন স্থায়ী ওযর নয়। যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা অবলম্বন করে, তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমার যোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে চেতনা, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান-বুদ্ধি এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে সে তা দ্বারা আসল ও মেকী এবং অশুদ্ধ ও শুদ্ধকে চিনে নেয়। অতঃপর তাকে এ জ্ঞান বুদ্ধির উপরই ছেড়ে দেননি, নবী প্রেরণ করেছেন এবং গ্রন্থ নাযিল করেছেন। এসবের মাধ্যমে শুদ্ধ ও ভ্রান্ত এবং সত্য ও মিথ্যাকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কর[১]। আর খাও এবং পান কর | وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

---

(১) আয়াতে পোষাককে 'যীনাত' বা 'সাজ-সজ্জা' শব্দের মাধ্যমে এ জন্যই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সালাতে শুধু গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ-সজ্জার পোষাক পরিধান করা শ্রেয়। হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সালাতের সময় উত্তম পোষাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন, তাই আমি প্রতিপালকের সামনে সুন্দর পোষাক পরে হাজির হই।' যে গুপ্ত-অঙ্গ সর্বাবস্থায় বিশেষতঃ সালাত ও তাওয়াফে আবৃত করা ফরয, তার সীমা কি? কুরআনুল কারীম সংক্ষেপে গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করার নির্দেশ দিয়ে এর বিবরণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষের গুপ্তাঙ্গ নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ মুখমন্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল ছাড়া সমস্ত দেহ। হাদীসসমূহে এসব বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। এ হচ্ছে গুপ্ত অঙ্গের ফরয সম্পর্কিত বিধান। এটি ছাড়া সালাতই হয় না। সালাতে শুধু গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করাই কাম্য নয়; বরং সাজ-সজ্জার পোষাক পরিধান করতেও বলা হয়েছে। যেমন সাদা পোষাক, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমাদের পোষাকাদির মধ্যে সাদা পোষাক পরিধান কর। কেননা, পোষাকাদির মধ্যে তাই উত্তম পোষাক। আর এতে তোমাদের মৃতদেরকে কাফনও দাও।' [আবু দাউদঃ ৩৮৭৮, তিরমিযীঃ ৯৯৪, ইবন মাজাহ্ঃ ১৪৭২] অনেকে সাজসজ্জার পোষাক পরাকে অহংকারী পোষাক মনে করে থাকে এটা আসলে ঠিক নয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। এক লোক বললঃ কোন লোক পছন্দ করে তার পোষাক উত্তম হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। রাসূল বললেনঃ 'অবশ্যই আল্লাহ্ সুন্দর, সুন্দরকে ভালবাসেন। অহংকার হল, হককে না মানা, মানুষকে অবজ্ঞা করা।' [মুসলিমঃ ১৪৭] আবার অহংকার হয় এমন পোষাকও পরা যাবে না যদিও তাতে কারো কারো নিকট বাহ্যিক সুন্দর রয়েছে। যেমনঃ টাখনুর নীচে কাপড় পরা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে অহংকার বশে কাপড় টাখনুর নীচে ছেড়ে দিবে আল্লাহ্ তার দিকে তাকাবেন না।' [বুখারীঃ ৫৭৮৩] আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে এসেছে যে, আরবের মুশরিকরা জাহেলিয়াতে মাসজিদে হারামে কা'বার তাওয়াফ করার সময় উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত। এ ব্যাপারে তাদের দর্শন ছিল, যে কাপড় পরে গুণাহ করেছি তা দিয়ে তাওয়াফ করা যাবে না। বিশেষতঃ কুরাইশরা এ বিধি-বিধানের প্রবর্তন করে। তারাই শুধু তাওয়াফের জন্য কাপড় দিতে পারবে। এতে করে তারা কিছু বাড়তি সুবিধা আদায় করতে পারত। এমনকি মহিলারাও উলঙ্গ তাওয়াফ করত। শয়তান তাদেরকে এভাবে ইবাদাত করতে উদ্বুদ্ধ করত এবং এ কাজকে তাদের মনে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিত। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'মহিলা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বার তাওয়াফ করত আর বলত, কে আমাকে তাওয়াফের কাপড় ধার দেবে? যা তার লজ্জাস্থানে রাখবে। আরও বলতঃ

কিন্তু অপচয় কর না(১)। নিশ্চয় তিনি

আজ হয় কিছু অংশ প্রকাশ হয়ে পড়বে নয়ত পুরোটাই। আর যা আজ প্রকাশিত হবে তা আর হালাল করব না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়- "তোমরা তোমাদের মাসজিদ তথা ইবাদাতের স্থানে সুন্দর পোষাক পরবে।' [মুসলিমঃ ৩০২৮]

(১) এ আয়াত থেকে একটি মাসআলা এরূপ বুঝা যায় যে, জগতে পানাহারের যত বস্তু রয়েছে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ বস্তুর অবৈধতা ও নিষিদ্ধতা শরী'আতের কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। আয়াতে ﴿وَلَا تُسْرِفُوٓا۟﴾ বলে পানাহারের অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত إسراف শব্দের অর্থ সীমালংঘন করা। সীমালংঘন কয়েক প্রকারের হতে পারে। (এক) হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছা এবং হারাম বস্তু পানাহার করতে থাকা। এ সীমালংঘন যে হারাম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। (দুই) আল্লাহ্র হালালকৃত বস্তুসমূহকে শরী'আত সম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে বর্জন করা। হারাম বস্তু ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও গোনাহ্, তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও আল্লাহ্র আইনের বিরোধিতা ও কঠোর গোনাহ্। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরয কর্ম সম্পাদনের শক্তি না থাকা- এটাও সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লেখিত উভয় প্রকার অপব্যয় নিষিদ্ধ করার জন্য কুরআনুল কারীমের এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ "অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" [সূরা আল-ইস্‌রাঃ ২৭] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে- প্রয়োজনের চাইতে বেশী ব্যয় করে না এবং কমও করে না।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ৬৭] এ আয়াতে পানাহার সম্পর্কে যে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু পানাহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিধান ও বসবাসের প্রত্যেক কাজেই মধ্য পন্থা পছন্দনীয় ও কাম্য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'সীমালংঘন ও অহংকার না করে খাও, দান কর এবং পরিধান কর।' [নাসাঈঃ ৫/৭৯, ইবন মাজাহ্ঃ ৩৬০৫] অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ যা ইচ্ছা পানাহার কর এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, তবে শুধু দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাক। (এক) তাতে অপব্যয় অর্থাৎ প্রয়োজনের চাইতে বেশী না হওয়া চাই এবং (দুই) গর্ব ও অহংকার না থাকা চাই। [বুখারী] অন্যত্র এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বর্ণিত হয়েছে। [নাসায়ী: ২৫৫৯] তবে এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বাভাবিক সীমা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ 'আদম সন্তান যে সমস্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করে, তন্মধ্যে পেট হল সবচেয়ে খারাপ। আদম সন্তানের জন্য স্বল্প কিছু লোকমাই যথেষ্ট, যা দিয়ে সে তার পিঠ সোজা রাখতে পারে। এর বেশী করতে চাইলে এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ নিঃশ্বাসের জন্য নির্দিষ্ট করে।' [তিরমিযীঃ ২৩৮০, ইবন মাজাহঃ ৩৩৪৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৩২]

অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না ।

চতুর্থ রুকূ'

৩২. বলুন, 'আল্লাহ্ নিজের বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে(১)?' বলুন, 'পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কেয়ামতের দিনে এ সব

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

﴿وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا﴾ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি মাসআলা জানা যায়। (এক) যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানাহার করা ফরয। (দুই) শরী'আতের কোন দলীল দ্বারা কোন বস্তুর অবৈধতা প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত সব বস্তুই হালাল। (তিন) আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে ব্যবহার করা অপব্যয় ও অবৈধ। (চার) যেসব বস্তু আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করাও অপব্যয় এবং মহাপাপ। (পাঁচ) পেট ভরে খাওয়ার পরও আহার করা সমীচীন নয়। (ছয়) এতটুকু কম খাওয়াও অবৈধ, যদ্দরুন দুর্বল হয়ে ফরয কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(১) কোন বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয়, যারা আল্লাহ্র হালালকৃত উৎকৃষ্ট পোষাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সংগতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও নয়। খোরাক ও পোষাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সুন্নাতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোষাক ও খোরাক সহজলভ্য তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। আয়াতের তাফসীরে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, আরবরা জাহিলিয়াতে কাপড়-চোপড় সহ বেশ কিছু জিনিস হারাম করত। অথচ এগুলো আল্লাহ্ হারাম করেননি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ্ তোমাদের যে রিয্ক দিয়েছেন তারপর তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ' বলুন, 'আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রটনা করছ?" [সূরা ইউনুস:৫৯] তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য এ আয়াত নাযিল করেন। [তাবারী] কাতাদা বলেন, 'এ আয়াত দ্বারা জাহেলিয়াতের কাফেররা বাহীরা, সায়েবা, ওসীলা, হাম ইত্যাদি নামে যে সমস্ত প্রাণী হারাম করত সেগুলোকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।' [তাবারী]

তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে[১] ।' এভাবে আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি ।

৩৩. বলুন, 'নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা[২] । আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা- যার কোন সনদ তিনি নাযিল করেননি । আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

(১) আয়াতের এ বাক্যে একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব নেয়ামত; উৎকৃষ্ট পোষাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মুমিনদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের কল্যাণেই অন্যেরা ভোগ করতে পারছে । কিন্তু আখেরাতে সমস্ত নেয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে । আয়াতের এ বাক্যে বলা হয়েছে, "আপনি বলে দিনঃ সব পার্থিব নেয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনেও মুমিনদেরই প্রাপ্য এবং কেয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে ।" [তাবারী ইবন আব্বাস হতে] আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার অপর মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পার্থিব সব নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আখেরাতে শাস্তির কারণ হবে না- এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মুমিন বান্দাদেরই প্রাপ্য । কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এরূপ নয় । পার্থিব নেয়ামত তারাও পায় বরং আরো বেশী পায়; কিন্তু এসব নেয়ামত আখেরাতে তাদের জন্য শাস্তি ও স্থায়ী আযাবের কারণ হবে । কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নেয়ামত তাদের জন্য সম্মান ও সুখের বস্তু নয় । [কুরতুবী] কোন কোন তাফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব নেয়ামতের সাথে পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ও নানারকম দুঃখ-কষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নেয়ামত ও অনাবিল সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই । তবে কেয়ামতে যারা এসব নেয়ামত লাভ করবে, তারা নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবে । এগুলোর সাথে কোনরূপ পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশংকা এবং কোন চিন্তা-ভাবনা থাকবে না । [বাগভী] উপরোক্ত তিন প্রকার অর্থই আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । তাই সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদগণ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন ।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আর কেউ নেই; এজন্যই তিনি অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন আর আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক প্রশংসাপ্রিয় আর কেউ নেই ।' [বুখারীঃ ৫২২০]

কিছু বলা যা তোমরা জান না[১] ।'

৩৪. আর প্রত্যেক জাতির জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে[২] । অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকাল দেরি করতে পারবে না এবং এগিয়েও আনতে পারবে না ।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. হে বনী আদম! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেন, যারা আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বিবৃত করবেন, তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না ।

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে এবং তার ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ।

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٣٦﴾

---

(১) আল্লাহ্‌র উপর না জেনে কথা বলার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে সাবধান করা হয়েছে । যেমনঃ সূরা আল-বাকারার ১৬৯, এবং সূরা আল-ইসরার ৩৬ নং আয়াত । আল্লাহর উপর না জেনে কথা বলা আসলেই বড় গোনাহ্‌র কাজ । আল্লাহ্ সম্পর্কে, গায়েব সম্পর্কে, আখেরাত সম্পর্কে, আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে যাবতীয় কথা যতক্ষন পর্যন্ত কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক না হবে ততক্ষন তা আল্লাহ্‌র উপর না জেনে কথা বলার আওতায় পড়বে । অনুরূপভাবে যারা না জেনে-বুঝে ফাতাওয়া দেয় তারাও আল্লাহ্‌র উপর না জেনে কথা বলেন । আর এজন্যই বলা হয়ঃ 'ফাতাওয়া দানে যে যতবেশী তৎপর জাহান্নামে যাওয়ার জন্যও সে ততবেশী তৎপর' ।

(২) এ সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসে থাকতে পারবে । কিন্তু এরপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাকড়াও করতে চাইবেন তখন তাদের আর সময় দেয়া হবে না । এ ব্যাপারে বিভিন্ন সূরায় অনুরূপ আলোচনা এসেছে, যেমনঃ সূরা আল-হিজ্‌রঃ ৫ ও সূরা নূহঃ ৪, সূরা আল-মুনাফিকূনঃ ১১ ।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ
بِآيَاتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۖ
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا
أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا
ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? তাদের জন্য যে অংশ লেখা আছে তা তাদের কাছে পৌঁছবে(১)। অবশেষে যখন আমাদের ফিরিশ্‌তাগণ তাদের জান কবজের জন্য তাদের কাছে আসবে, তখন তারা জিজ্ঞেস করবে, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে(২) তারা কোথায়?' তারা বলবে, 'তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়েছে' এবং তারা নিজেদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে, নিশ্চয় তারা কাফের ছিল।

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ
وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ
حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ
لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا
مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমাদের আগে যে জিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা আগুনে প্রবেশ কর'। যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অন্য দলকে তারা অভিসম্পাত করবে(৩)। অবশেষে যখন সবাই তাতে

---

(১) অর্থাৎ তাদের শাস্তির যে পরিমাণ লেখা আছে তা তাদের কাছে পৌঁছবেই। [তাবারী] কাতাদা বলেন, দুনিয়াতে তারা যে আমল করেছে সেটার ফলাফল আখেরাতে তাদের কাছে পৌঁছবেই। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকতে, যাদের তোমরা ইবাদত করতে এখন তারা কোথায়? তারা কি তোমাদেরকে এখন সাহায্য করতে পারে না? তারা কি তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না? তখন তারা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তারা আহ্বান করত, যাদের ইবাদত করত, তারা সবাই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। এভাবে তারা তাদের নিজেদের বিপক্ষে সাক্ষী দিল যে, তারা মুশরিক ছিল, তাওহীদবাদী ছিল না। [মুয়াসসার]

(৩) অর্থাৎ যখনই কোন ধর্মাবলম্বী জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখনই সে তার ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আগে যারা প্রবেশ করেছে তাদেরকে অভিসম্পাত দিতে থাকবে। সুতরাং মুশরিকরা মুশরিকদেরকে, ইয়াহূদীরা ইয়াহূদীদেরকে, নাসারারা

একত্র হবে, তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের রব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল[১]; কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন।' আল্লাহ্ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না।'

৩৯. আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কাজেই তোমরা যা অর্জন করেছিলে, তার জন্য শাস্তি ভোগ কর[২]।'

وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

পঞ্চম রুকূ'

৪০. নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তা সম্বন্ধে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

নাসারাদেরকে, সাবেয়ীরা সাবেয়ীদেরকে, অগ্নিউপাসকরা অগ্নিউপাসকদেরকে লা'নত দিতে থাকবে। তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অভিসম্পাত দিবে। [তাবারী]

(১) এ আয়াতে তাদেরকে কি কারণে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়েছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। সূরা আল-আহযাবের ৬৭ নং আয়াতে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা ছিল তাদের নেতা গোছের লোক। তাদের নেতৃত্বের প্রভাবেই এরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। সূরা সাবা'র ৩১ ও ৩২ নং আয়াতে এর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি বা দল কোন ভুল চিন্তা বা কর্মনীতির ভিত্ রচনা করে সে কেবল নিজের ভুলের ও গোনাহের জন্য দায়ী হয় না বরং দুনিয়ায় যতগুলো লোক তার দ্বারা প্রভাবিত হয় তাদের সবার গোনাহের একটি অংশও তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকে। এ বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

না[১]- যতক্ষন না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এ আয়াতের বর্ণিত এক তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের আমল ও তাদের দো'আর জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ তাদের দো'আ কবূল করা হবে না এবং তাদের আমলকে ঐ স্থানে যেতে দেয়া হবে না, যেখানে আল্লাহ্র নেক বান্দাদের আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। কুরআনের সূরা আল-মুতাফ্ফিফীনে এ স্থানটির নাম ইল্লি'য়্যীন বলা হয়েছে। কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতেও উল্লেখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ -অর্থাৎ "মানুষের পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উত্থিত করে।" [সূরা ফাতেরঃ ১০]

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অপর এক বর্ণনা আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে যে, কাফেরদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন বারা' ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গমন করেন। কবর প্রস্তুতে কিছু বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহাবায়ে কেরামও তার চারদিকে চুপচাপ বসে যান। তিনি মাথা উঁচু করে বললেনঃ মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারাবিশিষ্ট ফিরিশ্তারা আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির সামনে বসে যায়। অতঃপর মালাকুল মাউত আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নিশ্চিন্ত আত্মা, পালনকর্তার মাগফেরাত ও সন্তুষ্টির জন্য বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা, এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফিরিশ্তাদের কাছে সমর্পণ করে। ফিরিশ্তারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফিরিশ্তার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করেঃ এ পাক আত্মা কার? ফিরিশ্তারা তার ঐ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থে ব্যবহার হত এবং বলেঃ ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফিরিশ্তারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরো ফিরিশ্তা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌঁছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমার এ বান্দার আমলনামা ইল্লি'য়্যীনে লিখ এবং তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফিরিশ্তা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করেঃ তোমার পালনকর্তা কে? তোমার দ্বীন কি? সে বলেঃ আমার পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা এবং দ্বীন ইসলাম। এরপর প্রশ্ন হয়ঃ এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে আল্লাহ্র রাসূল। তখন একটি আওয়াজ হয় যে, আমার বান্দা সত্যবাদী। তার জন্য জান্নাতের শয্যা পেতে দাও,

প্রবেশ করে[1] । আর এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব ।

৪১. তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও; আর এভাবেই আমরা যালিমদেরকে প্রতিফল দেব ।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে- আমরা কারো উপর তার

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا

জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার কবরের দরজা খুলে দাও । এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে । তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য তার কাছে এসে যায় । এর বিপরীতে কাফেরের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কাল রঙের ভয়ঙ্কর মূর্তি ফিরিশ্‌তা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায় । অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোন কাঁটাবিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয় । আত্মা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয় । ফিরিশ্‌তারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফিরিশ্‌তার সাথে সাক্ষাৎ হয় । তারা জিজ্ঞেস করেঃ এ দুরাত্মাটি কার? ফিরিশ্‌তারা তখন তার ঐ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দ্বারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল । অর্থাৎ সে অমুকের পুত্র অমুক । অতঃপর প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললে তার জন্য দরজা খোলা হয় না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও । সেখানে অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয় । এ আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে । সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে কেবল 'আঁ-আঁ-- আমি জানি না' বলে । তাকে জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোষাক দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে তার কবরের দরজা খুলে দেয়া হয় । ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌঁছাতে থাকে এবং কবরকে তার জন্য সংকীর্ণ করে দেয়া হয় । [আহমাদঃ ৪/২৮৭, ২/৩৬৪-৩৬৫, ৬/১৪০; ইবন মাজাহ্: ৪২৬২; নাসায়ী: ৪৬২]

(১) আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উটের মত বিরাট পেট বিশিষ্ট জন্তু সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে । এর দ্বারা উদ্দেশ্য, সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবতঃ অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব । এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ।

إِلَّا وُسْعَهَآ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٤٢﴾

সাধ্যের অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দেই না- তারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَقَالُوا۟ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ۖ وَنُودُوٓا۟ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর আমরা তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করব[১], তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। আর তারা বলবে, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদেরকে এ পথের হিদায়াত করেছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে হিদায়াত না করলে, আমরা কখনো হিদায়াত পেতাম না। অবশ্যই আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন।' আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের[২] ওয়ারিস করা হয়েছে।'

(১) এ আয়াতে জান্নাতীদের বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "জান্নাতীদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোন মালিন্য থাকে, তবে আমরা তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দেব, তাদের নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে"। সূরা আল-হিজ্‌রের ৪৭ নং আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, "আমরা জান্নাতীদের অন্তর থেকে যাবতীয় মালিন্য দূর করে দেব, তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্টি ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে মুখোমুখী হয়ে খাটিয়ায় থাকবে এবং বসবাস করবে।" অনুরূপভাবে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'মুমিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারো প্রতি কারো কোন কষ্ট থাকে কিংবা কারো কাছে কারো পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌঁছে পরস্পরের প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার করে নেবে। এভাবে হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই জান্নাতে তার ঘরকে দুনিয়ায় তার ঘরের চেয়ে বেশী চিনবে।' [বুখারীঃ ২৪৪০]

(২) জান্নাতের বর্ণনা কুরআন ও সহীহ হাদীসে ব্যাপকভাবে এসেছে, সেখানে মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন স্পেশাল ঘোষণা থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

৪৪. আর জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের রব আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের রব তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' অতঃপর একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে, 'আল্লাহ্‌র লা'নত যালিমদের উপর---

وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّٗا فَهَلۡ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقّٗاۖ قَالُواْ نَعَمۡۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُۢ بَيۡنَهُمۡ أَن لَّعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٤

৪৫. 'যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত এবং সে পথে জটিলতা খুঁজে বেড়াত; এবং তারা আখেরাতকে অস্বীকারকারী ছিল।'

ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبۡغُونَهَا عِوَجٗا وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ كَٰفِرُونَ ٤٥

৪৬. আর তাদের উভয়ের মধ্যে পর্দা থাকবে। আর আ'রাফে[১] কিছু

وَبَيۡنَهُمَا حِجَابٞۚ وَعَلَى ٱلۡأَعۡرَافِ رِجَالٞ يَعۡرِفُونَ

বলেনঃ 'আহ্বানকারী আহবান করে বলবেঃ তোমাদের জন্য এটাই উপযোগী যে, তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনো তোমরা রোগাক্রান্ত হবে না। তোমাদের জন্য উপযোগী হলো জীবিত থাকা, সুতরাং তোমরা কখনো মারা যাবে না। তোমাদের জন্য উচিত হলো যুবক থাকা, সুতরাং তোমরা কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য উচিত হলো নেয়ামতের মধ্যে থাকা, সুতরাং তোমরা কখনো অভাব-অভিযোগে থাকবে না। আর এটাই হলো আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ যেখানে তিনি বলেছেনঃ "এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে"।' [মুসলিমঃ ২৮৩৭]

(১) **আ'রাফ কি?ঃ** সূরা হাদীদের ১২ থেকে ১৯নং আয়াতে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে। (এক) সুস্পষ্ট কাফের ও মুশরিক। (দুই) মুমিনের দল। তাদের সাথে ঈমানের আলো থাকবে। (তিন) মুনাফেকের দল। এরা দুনিয়াতে মুসলিমদের সাথে মিলে থাকত। হাশরের ময়দানেও প্রথম দিকে সাথে মিলে থাকবে এবং পুলসেরাত চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে। মুমিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে সামনে এগিয়ে যাবে। মুনাফেকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবেঃ একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা

كُلًّا بِسِيمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۚ

লোক থাকবে, যারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনবে[১]। আর তারা

উপকৃত হই। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ফিরিশ্‌তা বলবেঃ পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলো তালাশ কর। এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্মের। এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মুমিন ও মুনাফেকদের মধ্যে একটি প্রাচীর বেষ্টনী দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবলই আযাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং ভেতরে মুমিনরা থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহ্‌র রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে। ইবন জারীর ও অন্যান্য তাফসীরবিদের মতে এ আয়াতে উল্লেখিত أعراف বলে ঐ প্রাচীর বেষ্টনীকেই বুঝানো হয়েছে। এ প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগের নামই আ'রাফ। কেননা, أعراف শব্দটি عرف এর বহুবচন। এর অর্থ প্রত্যেক বস্তুর উপরিভাগ। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী প্রাচীর-বেষ্টনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছুসংখ্যাক লোক থাকবে। তারা জান্নাত ও জাহান্নাম উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয়পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা বলবে।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'আ'রাফ উঁচু টাওয়ারের মত যা জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝখানে থাকবে। গোনাহ্‌গার কিছু বান্দাকে সেখানে রেখে দেয়া হবে।' কেউ কেউ বলেনঃ আ'রাফ নামকরণ এজন্য করা হয়েছে যে, এখান থেকে তারা একে অপরকে চিনতে পারবে।

আ'রাফবাসী কারাঃ বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, আ'রাফবাসী ঐ সমস্ত লোকেরা যাদের সৎ এবং অসৎকর্ম সমান হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেনঃ কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা জাহান্নাম থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার আশা পোষণ করবে। তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়। ইবন জারীর বলেন, তাদের সম্পর্কে এটা বলাই বেশী সঠিক যে, তারা হচ্ছে এমন কিছু লোক যারা জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে তাদের নিদর্শনের মাধ্যমে চিনতে পারবে। [তাবারী]

(১) এ আয়াতে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিহ্ন কেমন হবে তা বর্ণনা করা হয়নি। অন্য আয়াতে তাদের কিছু চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "সেদিন কিছু মুখ উজ্জল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে; যাদের মুখ কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে), তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে।" [সূরা আলে-ইমরান: ১০৬] "আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন" [সূরা আল-মুতাফফিফীন:২৪] আরও বলেন, "সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ২২] আরও বলেন, "অনেক চেহারা সেদিন হবে উজ্জ্বল" [সূরা আবাসা:৩৮] সুতরাং চেহারা শুভ্র

لَمۡ يَدۡخُلُوهَا وَهُمۡ يَطۡمَعُونَ ۝٤٦

জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের উপর সালাম[১]।' তারা তখনো জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আকাংখা করে।

وَإِذَا صُرِفَتۡ أَبۡصَٰرُهُمۡ تِلۡقَآءَ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٤٧

৪৭. আর যখন তাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না[২]।'

ষষ্ঠ রুকূ'

وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأَعۡرَافِ رِجَالٗا يَعۡرِفُونَهُم

৪৮. আর আ'রাফবাসীরা এমন লোকদেরকে ডাকবে, যাদেরকে তারা তাদের চিহ্ন

ও সুন্দর হওয়া জান্নাতীদের চিহ্ন। আর চেহারা কালো, বিকট ও নীলচক্ষুবিশিষ্ট হওয়া জাহান্নামীদের চিহ্ন। আল্লাহ্ বলেন, "তাদের মুখমন্ডল যেন রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [সূরা ইউনুস: ২৭] আরও বলেন, "আর অনেক চেহারা সেদিন হবে ধূলিধূসর" [সূরা আবাসা: ৪০] আরও বলেন, "যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং যেদিন আমরা অপরাধীদেরকে নীলচক্ষু তথা দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব।" [সূরা ত্বা-হা: ১০২] আর এ জন্যই ইবন আব্বাস বলেন, জাহান্নামীদের চেনা যাবে তাদের কালো চেহারায়; আর জান্নাতীদের চেনা যাবে তাদের চেহারার শুভ্রতায়। [তাবারী]

(১) আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবেঃ 'সালামুন 'আলাইকুম'। এ বাক্যটি দুনিয়াতেও পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সম্মান প্রদর্শনার্থে বলা হয় এবং বলা সুন্নাত। মৃত্যুর পর কবর যিয়ারতের সময় এবং হাশর ও কেয়ামতেও বলা হবে। অনুরূপভাবে ফিরিশ্তাগণও জান্নাতীদেরকে এ বাক্য দ্বারা সালাম করবে। [সূরা আর্-রা'আদঃ ২৪, সূরা আয্-যুমারঃ ৭৩] [তাবারী] কিন্তু আয়াত ও হাদীসদৃষ্টে জানা যায় যে, দুনিয়াতে 'আস্সালামু 'আলাইকুম' বলা সুন্নাত।

(২) অর্থাৎ আ'রাফবাসীরা সবাইকে চিনবে, তারপর যখন জান্নাতীদেরকে তাদের পাশ দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা তাদেরকে 'সালামুন আলাইকুম' বলবে। যদিও জান্নাতে প্রবেশ করেনি তবুও তারা আশায় থাকবে। পক্ষান্তরে জাহান্নামীদেরকে যখন তাদের পাশ দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হবে এবং বলতে থাকবে, হে আমাদের রব আমাদেরকে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। [তাবারী]

بِسِيمٰهُمْ قَالُوا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

দ্বারা চিনবে, তারা বলবে, 'তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না।'

اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. এরাই কি তারা[১], যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে রহমতে শামিল করবেন না? (এদেরকেই বলা হবে,) 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না।'

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. আর জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের উপর ঢেলে দাও কিছু পানি, অথবা তা থেকে যা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদেরকে দিয়েছেন।' তারা বলবে, 'আল্লাহ্ তো এ দুটি হারাম করেছেন কাফেরদের জন্য।

(১) জান্নাতের ঈমানদার লোকদের দিকে ইঙ্গিত করে আ'রাফবাসীরা কাফেরদেরকে বলবে, তোমরা দুনিয়াতে ঈমানদারদের ব্যাপারে উপহাস করতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি কোন প্রকার দয়া করবেন না। অথচ এখন তারাই জান্নাতে রয়েছে, তাদেরকে ভয়-ভীতি ও পেরেশানী ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তোমাদের অহংকার তোমাদের কোন কাজে আসে নি [মুয়াসসার] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আরাফবাসী হচ্ছে এমন কিছু লোক, যাদের অনেক বড় বড় গুনাহ রয়েছে। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয়েছে। তাদেরকে দেয়ালের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং তারা যখন জান্নাতীদের দিকে তাকাবে তখন তারা জান্নাতের আশা করবে, আর যখন জাহান্নামীদের দিকে তাকাবে তখন তারা জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি কামনা করবে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করা হবে। আর তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, হে জাহান্নামবাসী, তোমরা কি এ আরাফবাসীদের নিয়েই বলতে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর রহমতে প্রবেশ করাবেন না? হে 'আরাফবাসী! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর তোমাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই। [তাবারী]

৫১. ‘যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছিল। আর দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল।’ কাজেই আজ আমরা তাদেরকে (জাহান্নামে) ছেড়ে রাখব, যেমনিভাবে তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাতের জন্য কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিল[১], আর (যেমন) তারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল।

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২. আর অবশ্যই আমরা তাদের নিকট নিয়ে এসেছি এমন এক কিতাব, যা আমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশদ ব্যাখ্যা করেছি[২]। আর যা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. তারা কি শুধু সে পরিণামের অপেক্ষা করে? যেদিন সে পরিণাম প্রকাশ পাবে, সেদিন যারা আগে সেটার

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ

(১) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে কেয়ামতের দিন দেখতে পাব? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র দীদার সংক্রান্ত কথা উল্লেখ করে বললেনঃ ‘তারপর আল্লাহ্ তাঁর কোন এক বান্দার সাথে সাক্ষাত করে বলবেন, হে অমুক! তোমাকে কি আমি সম্মানিত করিনি? নেতৃত্ব দেইনি? বিয়ে করাইনি? তোমার জন্য ঘোড়া ও উট আয়ত্বাধীন করে দেইনি? তোমাকে কি প্রধান এবং শুল্ক আদায়কারী বানাইনি? (তোমাকে এমন আরামে রেখেছি যে, তোমার কোন কষ্ট অনুভূত হয়নি।) সে বলবেঃ হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি কি আমার সাক্ষাতে বিশ্বাসী ছিলে? সে বলবেঃ না। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ আজ আমি তোমাকে ছেড়ে দেব যেমন তুমি আমাকে ছেড়েছিলে। [মুসলিমঃ ২৯৬৮]

(২) আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে কাফের-মুশরিকদের ওজর আপত্তি তোলার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের জন্য রাসূলের মাধ্যমে কিতাব দিয়েছেন, যে কিতাবে সবকিছু স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য আয়াতেও এ বিস্তারিত আলোচনার কথা আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। [ইবন কাসীর]

رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদের রবের রাসূলগণ তো সত্যবাণী এনেছিলেন, আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি আবার ফেরত পাঠানো হবে-- যেন আমরা আগে যা করতাম তা থেকে ভিন্ন কিছু করতে পারি?' অবশ্যই তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রটনা করত, তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।

সপ্তম রুকূ'

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়[১] দিনে[২]

(১) এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ছয় দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে সূরা ফুস্সিলাতের নবম ও দশম আয়াতে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে ভূমণ্ডল, দু'দিনে ভূমণ্ডলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের পানাহারের বস্তু-সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হল। বলা হয়েছেঃ ﴿خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ﴾ আবার বলা হয়েছেঃ ﴿وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ﴾ যে দু'দিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দু'দিন ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজ-সরঞ্জাম পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছেঃ ﴿فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ﴾ -অর্থাৎ "অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দু'দিনে।" [সূরা ফুস্সিলাতঃ ১২] বাহ্যতঃ এ দু'দিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার; অর্থাৎ এ পর্যন্ত ছয় দিন হল। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) জানা কথা যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হল? কোন কোন তাফসীরবিদ বলেছেনঃ ছয় দিন বলে জাগতিক ৬ দিন বুঝানো হয়েছে। কিন্তু পরিস্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দিবা-রাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে; যেমন জান্নাতের দিবা-রাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবেনা। সহীহ্ বর্ণনা

فِىۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰى عَلَى الۡعَرۡشِ يُغۡشِى الَّيۡلَ النَّهَارَ يَطۡلُبُهٗ حَثِيۡثًا ۙ وَّالشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ وَالنُّجُوۡمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمۡرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الۡخَلۡقُ وَالۡاَمۡرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۵۴﴾

সৃষ্টি করেছেন(১); তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন(২)। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি,

অনুযায়ী যে ছয় দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবার শেষ হয়।

(১) এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কুরআনুল কারীমেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথা বার বার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছেঃ "এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়।" [সূরা আল-কামারঃ ৫০] আবার কোথাও বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেনঃ হয়ে যাও। আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়"।[যেমন, সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১১৭] এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার কারণ কি? তাফসীরবিদ সায়ীদ ইবন জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ্ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনার ধারাবাহিকতা ও কর্মতৎপরতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে।

(২) আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপর উঠেছেন এটা সহীহ্ আকীদা। কিন্তু তিনি কিভাবে উঠেছেন, কুরআন-সুন্নায় এ ব্যাপারে কোন বক্তব্য নাই বিধায় তা আমরা জানি না। এ বিষয়ে সূরা আল-বাকারার ২৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ্কে কেউ استواء সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেনঃ استواء শব্দের অর্থ তো জানাই আছে; কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানব বুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এর অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্ঞেস করা বিদ'আত। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরনের প্রশ্ন কখনো করেননি। কারণ, তারা এর অর্থ বুঝতেন। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা এ গুণে কিভাবে গুণান্বিত হলেন, তা শুধু মানুষের অজানা। এটি আল্লাহ্র একটি গুণ। আল্লাহ্ তা'আলা যে রকম, তাঁর গুণও সে রকম। সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওযা'য়ী, লাইস ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে 'উয়াইনা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমুখ বলেছেনঃ যেসব আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এগুলো হক এবং এগুলোর অর্থও স্পষ্ট। তবে গুণান্বিত হওয়ার ধরণের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। বরং যেভাবে আছে সেভাবে রেখে কোনরূপ অপব্যাখ্যা ও সাদৃশ্য ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত।[এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, ইমাম যাহাবী রচিত আল-উলু]

যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন[১]। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই[২]। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ কত বরকতময়!

৫৫. তোমরা বিনিতভাবে ও গোপনে[৩]

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশ্বকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবা-রাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহ্র কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায় -মোটেই দেরী হয় না। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী। এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। কারণ, এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্র আদেশে চলছে। এ চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও অসম্ভব। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগুলোকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর তখনই হবে কেয়ামত।

(২) الخلق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা এবং الأمر শব্দের অর্থ আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। যেমনিভাবে তিনিই উপর-নীচের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে নির্দেশ দানের অধিকারও তাঁর। এ নির্দেশ দুনিয়ায় তাঁর শরী'আত সম্বলিত নির্দেশকে বোঝানো হবে। আর আখেরাতে ফয়সালা ও প্রতিদান-প্রতিফল দেয়াকে বোঝানো হবে। [সা'দী]

(৩) এখানে দো'আর কতিপয় আদব শেখানো হচ্ছে। বলা হয়েছেঃ ﴿تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ এর মধ্যে تضرع শব্দের অর্থ অক্ষমতা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা এবং خفية শব্দের অর্থ গোপন। এ শব্দদ্বয়ে দো'আর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ অপারগতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা; যা দো'আর প্রাণ। আল্লাহ্র কাছে এর মাধ্যমে নিজের অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয়তঃ চুপিচুপি ও সংগোপনে দো'আ করা; যা উত্তম এবং কবূলের নিকটবর্তী। কারণ, উচ্চস্বরে দো'আ চাওয়ার মধ্যে প্রথমতঃ বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ এতে রিয়া এবং সুখ্যাতিরও আশংকা রয়েছে। তৃতীয়তঃ এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই কথা জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নীরব সব কথাই তিনি শোনেন। এ কারণেই খাইবার যুদ্ধের সময় দো'আ করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'তোমরা কোন বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছ না যে, এত জোরে বলতে হবে; বরং একজন শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে সম্বোধন করছ।' [বুখারীঃ ৬৬১০, মুসলিমঃ ২৭০৪] অনুরূপভাবে,

الْمُعْتَدِيْنَ۝

তোমাদের রবকে ডাক(১); নিশ্চয় তিনি

আল্লাহ্ তা'আলা জনৈক নবীর দো'আ উল্লেখ করে বলেনঃ ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا﴾ -অর্থাৎ "যখন সে তার পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকলেন।" [সূরা মার্ইয়ামঃ ৩] এতে বুঝা গেল যে, অনুচ্চস্বরে দো'আ করা আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দ।

পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ অধিকাংশ সময় আল্লাহ্র স্মরণে ও দো'আয় মশগুল থাকতেন, কিন্তু কেউ তাদের আওয়াজ শুনতে পেত না। বরং তাদের দো'আ তাদের ও আল্লাহ্র মধ্যে সীমিত থাকত। তাদের অনেকেই সমগ্র কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করতেন; কিন্তু অন্য কেউ টেরও পেত না। অনেকেই প্রভূত দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতেন; কিন্তু মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে বেড়াতেন না। অনেকেই রাতের বেলায় স্বগৃহে দীর্ঘ সময় সালাত আদায় করতেন; কিন্তু আগন্তুকরা তা বুঝতেই পারত না। হাসান বসরী আরো বলেনঃ আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা গোপনে সম্পাদন করার মত কোন ইবাদাত কখনো প্রকাশ্যে করেন নি। দো'আয় তাদের আওয়াজ অত্যন্ত অনুচ্চ হত। ইবন জুরাইজ বলেনঃ দো'আয় আওয়াজকে উচ্চ করা এবং শোরগোল করা মাকরূহ। [ইবন কাসীর] আবু বকর জাস্সাস বলেনঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, নীরবে দো'আ করা জোরে দো'আ করার চাইতে উত্তম। এমনকি আয়াতে যদি দো'আর অর্থ যিক্র ও ইবাদাত নেয়া হয়, তবে এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী মনীষীদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, নীরবে যিক্র সরব যিক্র অপেক্ষা উত্তম। [আহকামুল কুরআন]

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও সময়ে সরব যিক্রই কাম্য ও উত্তম। উদাহরণতঃ আযান ও একামত উচ্চঃস্বরে বলা, সরব সালাতসমূহে উচ্চঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা, সালাতের তাকবীর, আইয়ামে তাশরীকের তাকবীর এবং হজে পুরুষদের জন্য লাব্বাইকা উচ্চঃস্বরে বলা ইত্যাদি। এ কারণেই এ সম্পর্কে আলেমগণের সিদ্ধান্ত এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিশেষ অবস্থা ও স্থানে কথা ও কর্মের মাধ্যমে সরব যিক্র করার শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে সজোরেই করা উচিত। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও স্থানে নীরব যিক্রই উত্তম ও অধিক উপকারী।

(১) এ আয়াতে এদিকে দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে যে, একমাত্র আল্লাহ্ই যখন অসীম শক্তির অধিকারী এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নেয়ামত প্রদানকারী, তখন বিপদাপদ ও অভাব-অনটনে তাঁকেই ডাকা এবং তাঁর কাছেই দো'আ-প্রার্থনা করা উচিত। তাঁকে ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্খতা ও বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর। আরবী ভাষায় দো'আর দু'টি অর্থ হয়- (এক) বিপদাপদ দূরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্য কাউকে ডাকা; যাকে দো'আয়ে-মাসআলা বলে। (দুই) যে কোন অবস্থায় ইবাদাতের মাধ্যমে কাউকে স্মরণ করা; যাকে দো'আয়ে-ইবাদাত বলে। আয়াতে দো'আ দ্বারা উভয় অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অভাব পূরণের জন্য স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার ইবাদাত কর। প্রথম অবস্থায় অর্থ হবে স্বীয় অভাব-অনটনের

সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না[১]।

৫৬. আর যমীনে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না[২]। আর আল্লাহকে ভয় ও আশার

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

সমাধান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই প্রার্থনা কর। আর দ্বিতীয় অবস্থার অর্থ হবে, স্মরণ ও ইবাদাত একমাত্র তাঁরই কর। [সা'দী] উভয় তাফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী ও তাফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(১) مُعْتَدِيْنَ শব্দটি اِعْتِدَاء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তা দো'আয় সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোন কাজে- কোনটিই আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সীমা ও শর্তাবলী পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। সালাত, সিয়াম, হজ, যাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরী'আতের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো ইবাদাতের পরিবর্তে গোনাহে রূপান্তারিত হয়ে যায়।

দো'আয় সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকারে হতে পারে। (এক) দো'আয় শাব্দিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা। এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয়। (দুই) দো'আয় অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা। যেমন, বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু স্বীয় পুত্রকে এভাবে দো'আ করতে দেখলেনঃ 'হে আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে জান্নাতে শুভ্র রঙ্গের ডান দিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি। তিনি পুত্রকে বারণ করে বললেনঃ বৎস, তুমি আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাত চাও এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এমন কিছু লোক হবে যারা দো'আ এবং পবিত্রতার মধ্যে সীমাতিক্রম করবে।' [আবু দাউদঃ ৯৬, ইবন মাজাহ্ঃ ৩৮৬৪, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৮৭, ৫/৫৫] (তিন) সাধারণ মুসলিমদের জন্য বদ দো'আ করা কিংবা এমন কোন বিষয় কামনা করা যা সাধারণ লোকের জন্য ক্ষতিকর এবং অনুরূপ এখানে উল্লেখিত দো'আয় বিনা প্রয়োজনে আওয়াজ উচ্চ করাও এক প্রকার সীমা অতিক্রম। (চার) এমন অসম্ভব বিষয় কামনা করা যা হবার নয়। যেমন, নবীদের মর্যাদা বা নবুওয়ত চাওয়া।

(২) এখানে صلاح ও فساد শব্দ দু'টি পরস্পর বিরোধী। صلاح শব্দের অর্থ সংস্কার আর إصلاح শব্দের অর্থ সংস্কার করা এবং فساد শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ আর إفساد শব্দের অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করা। মূলতঃ সমতা থেকে বের হয়ে যাওয়াকে 'ফাসাদ' বলা হয়; তা সামান্য হোক কিংবা বেশী। কম বের হলে কম ফাসাদ এবং বেশী বের হলে বেশী ফাসাদ হবে। কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি

সাথে ডাক[১] । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ | الْمُحْسِنِينَ

করো না, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সংস্কার করার পর ।
আল্লাহ্ তা'আলার সংস্কার কয়েক প্রকার হতে পারে। (এক) প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা। যেমন, সূরা মুহাম্মাদের ২নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ (দুই) অনর্থ আসার পর তা দূর করা। যেমন, সূরা আল-আহ্যাবের ৭১নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ (তিন) সংস্কারের নির্দেশ দান করা। যেমন, এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যখন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।" এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) বাহ্যিক সংস্কার; অর্থাৎ পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপনের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্য মাটি থেকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। (দুই) পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। নবী-রাসূল, গ্রন্থ ও হেদায়াত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শির্ক, পাপাচার ইত্যাদি থেকে পবিত্র করেছেন। সৎ আমল দিয়ে পূর্ণ করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন তোমরা এতে গোনাহ্ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় ও আশা সহকারে ডাক। একদিকে দো'আ অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর করুণা লাভের পূর্ণ আশাও থাকবে। এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দু'টি বাহু। এ বাহুদ্বয়ের সাহায্যে সে ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদ মর্যাদা অর্জন করে। এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও ভয় সমান সমান হওয়া উচিত। কোন কোন আলেম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন, যাতে আনুগত্যে ত্রুটি না হয়, আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে। কেননা, এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে। করুণা লাভের আশা করাই এখন তার একমাত্র কাজ। [কুরতুবী] মোটকথা, দো'আর দু'টি আদব হল- বিনয় ও নম্রতা এবং আস্তে ও সংগোপনে দো'আ করা। এ দু'টি গুণই মানুষের বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, বিনয়ের অর্থ হল দো'আর সময় দৈহিক আকার-আকৃতিকে অপারগ ও ফকীরের মত করে নেয়া, অহংকারী ও বেপরোয়ার মত না হওয়া। দো'আ সংগোপনে করার সম্পর্কও জিহ্বার সাথে যুক্ত। এ আয়াতে দো'আর আরো দু'টি আভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর তা হল এই যে, দো'আকারীর মনে এ ভয় ও আশংকা থাকা উচিত যে, সম্ভবতঃ দো'আটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দো'আ কবূল হতে পারে। তবে দো'আকারীর মনে এটা প্রবল

মুহসিনদের খুব নিকটে[১]।

৫৭. আর তিনিই সে সত্তা; যিনি তাঁর রহমত বৃষ্টির আগে বায়ূ প্রবাহিত করেন সুসংবাদ হিসেবে[২],

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ

থাকতে হবে যে, তার দো'আ কবূল হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা আল্লাহ্‌কে এমনভাবে ডাকবে যে, তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি তা কবূল করবেন।' [তিরমিযীঃ ৩৪৭৯, হাকেমঃ ১/৪৯৩, মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৭৭]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার করুণা সৎকর্মীদের নিকটবর্তী। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দো'আর সময় ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই থাকা বাঞ্চনীয়, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে প্রবল। কেননা, বিশ্ব প্রতিপালক পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহে কোন ত্রুটি ও কৃপণতা নেই। তিনি মন্দ লোকের দো'আও কবূল করতে পারেন। কবূল না হওয়ার আশংকা স্বীয় কুকর্ম ও গোনাহ্‌র অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ, আল্লাহ্‌র রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সৎকর্মী হওয়া প্রয়োজন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে, স্বীয় বেশভূষা ফকীরের মত করে এবং আল্লাহ্‌র সামনে দো'আর হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু তার খাদ্য, পানীয় ও পোষাক সবই হারাম- এরূপ লোকের দো'আ কিরূপে কবূল হতে পারে?' [মুসলিমঃ ১০১৫] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'বান্দা যতক্ষণ কোন গোনাহ্ অথবা আত্নীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দো'আ না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দো'আ কবূল হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ তড়িঘড়ি দো'আ করার অর্থ কি? তিনি বলেনঃ এর অর্থ হল এরূপ ধারণা করে বসা যে, আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দো'আ করছি, অথচ এখনো পর্যন্ত কবূল হল না। অতঃপর নিরাশ হয়ে দো'আ ত্যাগ করা। [মুসলিমঃ ২৭৩৫] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখনই আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করবে তখনই কবূল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দো'আ করবে' [মুসনাদ আহমাদঃ ২/১৭৭, তিরমিযীঃ ৩৪৭৯] অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমতের ভাণ্ডারের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দো'আ করলে অবশ্যই দো'আ কবুল হবে বলে মনকে মজবুত কর। এমন মনে করা, গোনাহ্‌র কারণে দো'আ কবুল না হওয়ার আশংকা অনুভব করা এর পরিপন্থী নয়।

(২) এতে رياح শব্দটি ريح শব্দের বহুবচন। এর অর্থ বায়ূ। আর بُشراً শব্দের অর্থ সুসংবাদ। এবং রহমত বলে বৃষ্টির রহমত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদ দেয়ার জন্য বায়ূ প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির পূর্বে ঠান্ডা বায়ূ প্রেরণ করা আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি। এ বাতাস দ্বারা স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুল্লতা অর্জন করে এবং তা যেন ভাবী বৃষ্টির সংবাদও পূর্বাহ্ণে প্রদান করে।

لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

অবশেষে যখন সেটা ভারী মেঘমালা বয়ে আনে[১] তখন আমরা সেটাকে মৃত জনপদের দিকে চালিয়ে দেই, অতঃপর আমরা তার দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করি[২], তারপর তা দিয়ে সব রকমের ফল উৎপাদন করি। এভাবেই আমরা মৃতদেরকে বের করব, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর[৩]।

(১) سحاب শব্দের অর্থঃ মেঘ, এবং ثقال শব্দটি ثقيل এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী। অর্থাৎ বায়ূ যখন ভারী মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। ভারী মেঘমালার অর্থ, পানিতে ভরপুর মেঘমালা- যা বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে উপরে উঠে যায়। এভাবে হাজারো মণ ভারী পানি বাতাসে ভর করে উপরে পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্র আপনা-আপনি সমুদ্র থেকে বাস্প (মৌসুমী বায়ূ) উত্থিত হতে থাকে এবং উপরে উঠে মেঘমালার আকার ধারণ করে।

(২) অর্থাৎ বাতাস যখন ভারী মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি মেঘমালাকে কোন মৃত শহরের দিকে পরিচালিত করি। মৃত শহর বলে এমন জনপদকে বুঝানো হয়েছে, যা পানির অভাবে উজাড়প্রায়। [মানার; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

এ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয়-বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণিত হল। প্রথমতঃ বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়। এতে বুঝা গেল যে, যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও 'সামা' (আকাশ) শব্দ দ্বারা মেঘমালাকেই বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কোন বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে মেঘমালা ধাবিত হওয়া সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দান করেন। মেঘমালা আল্লাহ্র সে নির্দেশই পালন করে মাত্র।

এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মাঝে মাঝে কোন শহর অথবা জনপদের উপর মেঘমালা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে, কিন্তু মেঘমালা সেখানে এক ফোঁটা পানিও দেয় না; বরং আল্লাহ্র নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য নির্ধারিত থাকে, সেখানে পৌঁছেই বর্ষিত হয়। নির্দিষ্ট শহর ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ করার সাধ্য কারো নেই।

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলছেনঃ আমি মৃত শহরে পানি বর্ষণ করি, তারপর পানি দ্বারা সব রকম ফল-মূল উৎপন্ন করি। এভাবেই আমি মৃতদেরকে কেয়ামতের দিন উত্থিত করব যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আমি যেভাবে মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর উৎকৃষ্ট ভূমি-তার ফসল তার রবের আদেশে উৎপন্ন হয়। আর যা নিকৃষ্ট, তাতে কঠোর পরিশ্রম না করলে কিছুই জন্মে না[১]। এভাবে আমরা

করি এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফল-মূল নির্গত করি, তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে তুলব। আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্য বর্ণনা করি, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাও এবং ঈমান আন [জালালাইন]। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতে দু'বার শিঙ্গা ফুঁকা হবে। প্রথম ফুঁৎকারের পর সারা বিশ্ব ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে, কোনকিছুই জীবিত থাকবে না। দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পর নতুনভাবে সারা বিশ্ব সৃজিত হবে এবং সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, উভয়বার শিঙ্গায় ফুঁৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। এ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। এ সময়ের মধ্যেই প্রতিটি মৃত মানুষ ও জন্তুর দেহের অংশ একত্রিত করে পূর্ণ কাঠামো তৈরী করা হবে। অতঃপর শিঙ্গা ফুঁকার সাথে সাথে এসব মৃতদেহে আত্মা এসে যাবে এবং জীবিত হয়ে দণ্ডায়মান হবে। [দেখুন,মুসলিমঃ ২৯৫৫]

(১) অর্থাৎ বৃষ্টির কল্যাণধারা যদিও প্রত্যেক শহর ও ভূখণ্ডে সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়ে ভূখণ্ড দু' প্রকার হয়ে থাকে। (এক) উর্বর ও ভাল- যাতে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরণের ভূখণ্ড থেকে সর্বপ্রকার ফল-মূল উৎপন্ন হয়। (দুই) শক্ত ও লবনাক্ত ভূখণ্ড। এতে উৎপাদনের যোগ্যতা নেই। এরূপ ভূখণ্ডে হয়তো কিছুই উৎপন্ন হয় না, আর কিছু হলেও খুব অল্প পরিমাণে হয়। তাও অকেজো ও নষ্ট হয়ে থাকে। [তাবারী, বাগভী, ইবন কাসীর, সা'দী, জালালাইন] এর উদাহরণ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্ আমাকে যে হেদায়াত ও ইলম নিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হল এমন মুষল বৃষ্টির মত যা কোন যমীনের উপর গিয়ে পড়ল। কিন্তু সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর যমীন ছিল। তন্মধ্যে কিছু ভাল জমি ছিল যা পানি গ্রহণ করল ফলে তাতে ফসল ও প্রচুর ঘাস জন্মালো, আবার তন্মধ্যে এমন কিছু নিম্ন যমীনও ছিল যা পানি আটকে রাখতে সক্ষম হয়েছিল, ফলে আল্লাহ্ তার দ্বারা মানুষের উপকার করলেন। তারা তা পান করল এবং ফসল সিক্ত করল, ক্ষেত খামার করল। আবার তন্মধ্যে এমন কিছু যমীনও ছিল যা শক্ত ভূমি যা পানিও ধারণ করতে পারল না, কিছু উৎপন্নও করতে পারল না। ঠিক এটাই হল ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দ্বীনের ফিকহ্ তথা সুক্ষ্ণ জ্ঞান অর্জন করেছে আর আল্লাহ্ আমাকে যা নিয়ে পাঠিয়েছে তা তার উপকারে আসল, সে সেটা নিজে জানল অপরকে জানাল। আর ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে এর প্রতি মাথা উঠিয়ে তাকাল না, আর আমি যে হেদায়াত নিয়ে এসেছি তা কবুল করল না। [বুখারীঃ ৭৯, মুসলিমঃ ২২৮২]

কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃত করি[১]।

অষ্টম রুকূ‘

৫৯. অবশ্যই আমরা নূহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। অতঃপর তিনি বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।’

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَٰقَوْمِ
ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥٩

৬০. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলেছিল, ‘আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত দেখছি।’

قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى ضَلَٰلٍ
مُّبِينٍ ٦٠

৬১. তিনি বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন ভ্রষ্টতা নেই, বরং আমি তো সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে রাসূল।’

قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلَٰلَةٌ وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن
رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٦١

৬২. ‘আমি আমার রবের রিসালাত (যা নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা) তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি। আর তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জানি।’

أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦٢

৬৩. তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ

(১) বৃষ্টির কল্যাণধারার মত আল্লাহ্‌র হেদায়াত ও নির্দেশাবলীর কল্যাণও সব মানুষের জন্য ব্যাপক; কিন্তু প্রতিটি ভূখণ্ডই যেমন বৃষ্টি থেকে উপকার লাভ করে না, তেমনি প্রতিটি মানুষও এ হেদায়াত থেকে ফায়দা হাসিল করে না; বরং একমাত্র তারাই ফায়দা হাসিল করে, যারা কৃতজ্ঞ ও এর মর্যাদা দিয়ে থাকে। [সা‘দী]

مِّنۡكُمۡ لِيُنۡذِرَكُمۡ وَلِتَتَّقُوۡا وَلَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ﴿٦٣﴾

তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ[১] এসেছে, যাতে তিনি তোমাদেরকে সতর্ক করেন এবং যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। আর যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও ?'

فَكَذَّبُوۡهُ فَاَنۡجَيۡنٰهُ وَالَّذِيۡنَ مَعَهٗ فِى الۡفُلۡكِ وَاَغۡرَقۡنَا الَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا قَوۡمًا عَمِيۡنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. অতঃপর তারা তার উপর মিথ্যারোপ করল। ফলে তাকে ও তার সাথে যারা নৌকায় ছিল আমরা তাদেরকে উদ্ধার করি এবং যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দেই। তারা তো ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়[২]।

---

(১) মূলে ذكر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদেরই একজন লোক, যার বংশ ও সত্যবাদিতা তোমাদের কাছে স্বীকৃত। তার কাছে এমন কিছু এসেছে যা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবে, যাতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। [মুয়াসসার]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের উম্মতের অবস্থা ও তাদের সংলাপের বিবরণ রয়েছে। আদম 'আলাইহিস্ সালাম যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তার আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর দ্বন্দ ছিল না। কুফর ও কাফেরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শির্কের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের আমল থেকেই শুরু হয়। রিসালাত ও শরী'আতের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথম রাসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচে ছিল, তারা ছিল নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম ও তার নৌকাস্থিত সঙ্গী-সাথী। তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। এই কাহিনীতে সাড়ে নয়শ' বছরের সুদীর্ঘ আয়ূষ্কাল, তার নবীসুলভ চেষ্টা-চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, 'আদম 'আলাইহিস্ সালাম ও নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের মাঝখানে দশ 'করণ' বা প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে।' [মুস্তাদরাক হাকেমঃ ২/৫৪৬] কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তার বয়স হয়েছিল নয়শ' পঞ্চাশ বছর। [সূরা আল-আনকাবূতঃ ১৪] কেউ কেউ বলেনঃ তিনি এক হাজার বছরই আয়ূ পেয়েছিলেন তন্মধ্যে নয়শ' পঞ্চাশ বছর প্লাবনের পূর্বে আর পঞ্চাশ বছর প্লাবনের পরে। উপরোক্ত আয়াতেও এ ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে। নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায় ইরাকে বসবাসকারী ছিল এবং শির্কে লিপ্ত

ছিল । তাদের শির্ক সম্পর্কে সুস্পষ্ট কথা এই যে, তারাই যমীনের বুকে সর্বপ্রথম শির্ক করেছিল । হাদীসে এসেছে যে, 'তাদের সম্প্রদায়ের পাঁচজন মহাব্যক্তিত্ব যাদের নাম যথাক্রমে- উদ্দ, সুওয়া', ইয়াগূস, ইয়া'উক ও নাসর; তারা অত্যন্ত নেককার লোক ছিলেন । হঠাৎ করেই তারা মারা যান । এতে করে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে । তখন শয়তান এসে তাদেরকে বলেঃ আমি কি তোমাদেরকে তাদের কিছু ছবি বানিয়ে দেব না, যাতে তোমরা তাদেরকে দেখে দেখে বেশী ইবাদাত করতে পার? তারা অনুমতি দিলে শয়তান কিছু ছবি বানিয়ে তাদের ইবাদাতখানার পিছনে টাঙিয়ে রাখে । পরবর্তী প্রজন্ম সেগুলোকে ইবাদাতখানার সম্মুখভাগে নিয়ে আসে এবং সেগুলোকে মূর্তির আকৃতি দান করে । তখনো তাদের ইবাদাত শুরু হয়নি । এ প্রজন্ম মারা যাওয়ার পরে পরবর্তী প্রজন্ম কি উদ্দেশ্যে এ মূর্তিগুলো স্থাপন করা হয়েছিল তা ভুলে গেলে শয়তান তাদের কাছে এসে বললঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এগুলোর ইবাদাত করত এবং এগুলোর উসিলায় আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করত । শেষপর্যন্ত তারা এগুলোর ইবাদাত শুরু করে ।' [বুখারীঃ ৪৯২০] আর এখান থেকেই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার উদ্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূহে তার বিস্তারিত আলোচনা করে কিভাবে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন । এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের দাওয়াতের কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন । তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেনঃ "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত কর । তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই । আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি ।" এখানে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের দাওয়াত রয়েছে । এটাই সব নীতির মূলনীতি । তারপর শির্ক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে । এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল । অতঃপর ঐ মহাশাস্তির আশংকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি । এর অর্থ আখেরাতের মহাশাস্তিও হতে পারে এবং দুনিয়ার প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে । তার সম্প্রদায়ের ملأ বা নেতা গোছের লোকেরা উত্তরে বললঃ আমরা মনে করি যে, তুমি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে রয়েছ । কারণ, তুমি আমাদেরকে বাপ-দাদার দ্বীন পরিত্যাগ করতে বলছ । কেয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি কুসংস্কার বৈ আর কিছু নয় ।

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম নবীসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হেদায়াত । উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সাদাসিধা ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন । বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন ভ্রষ্টতা নেই । তবে আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক দ্বীনের অনুসারী নই; বরং বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে রাসূল । আমি যা কিছু

নবম রুকূ‘

৬৫. আর ‘আদ[১] জাতির নিকট তাদের

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا

বলি, পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ্ তা‘আলার বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছাই। এতে তোমাদের মঙ্গল। এতে না আল্লাহ্‌র কোন লাভ আছে এবং না আমার কোন স্বার্থ আছে। এরপর তারা যেহেতু নূহ্ ‘আলাইহিস্ সালামকে তাদের মত মানুষ হওয়ার কারণে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করছিল, সেহেতু তিনি তার জবাবে বলেনঃ তোমরা কি এর ফলে বিস্মিত যে, তোমাদের পালনকর্তার বাণী তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও এবং রহমত লাভে ধন্য হও? অর্থাৎ তার ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর যাতে করে তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল হয়।

স্বজাতির মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে নূহ্ ‘আলাইহিস্ সালামের দয়ার্দ্র এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা অন্ধভাবেই মিথ্যারোপ করে যেতে থাকল। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ এর পরিণতিতে আমরা নূহ্ ও তার সঙ্গীদেরকে নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছি। নিশ্চয়ই তারা ছিল অন্ধ।

মোটকথা, এখানে নূহ্ ‘আলাইহিস্ সালামের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে- (এক) পূর্বতন সমস্ত নবী-রাসূলের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিন্ন। (দুই) আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে কঠিন বিপদেও রক্ষা করেন। (তিন) রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করা আল্লাহ্‌র আযাব ডেকে আনারই নামান্তর। পূর্ববর্তী উম্মতরা যেমন নবীগণের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, এ কালের লোকদেরও এ থেকে ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়।

(১) ‘আদ’ ছিল আরবের প্রাচীনতম জাতি। ‘আদ’ প্রকৃতপক্ষে নূহ্ ‘আলাইহিস্ সালামের পুত্র সামের বংশধরের এক ব্যক্তির নাম। তার বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় ‘আদ’ নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কুরআনুল কারীমে ‘আদের সাথে কোথাও ‘আদে উলা’ বা ‘প্রথম আদ’ এবং কোথাও আদ ইরাম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, ‘আদ সম্প্রদায়কে ‘ইরাম’ও বলা হয় এবং প্রথম ‘আদের বিপরীতে কোন দ্বিতীয় ‘আদও রয়েছে। এ সম্পর্কে তাফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, দ্বিতীয় ‘আদ হলো সামূদ জাতি। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, ‘আদ ও সামূদ উভয়ই ইরামের দু’শাখা। এক শাখাকে প্রথম ‘আদ এবং

اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝٦٥

ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না[১]?'

অপর শাখাকে সামূদ অথবা দ্বিতীয় 'আদ বলা হয়। ইরাম শব্দটি 'আদ ও সামূদ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। [তাফসীর ইবন কাসীর; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

কুরআনের বর্ণনা মতে এ জাতিটির আবাসস্থল ছিল 'আহকাফ' এলাকা। এ এলাকাটি হিজায, ইয়ামন ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী 'রুবয়ুল খালী'র দক্ষিন পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে তারা ইয়ামানের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল এবং ওমান ও হাদরামাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ জাতিটির নিদর্শণাবলী দুনিয়ার বুক থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিন আরবের কোথাও কোথাও এখনো কিছু পুরাতন ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। সেগুলোকে আদ জাতির নিদর্শন মনে করা হয়ে থাকে।

(১) আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের হেদায়াতের জন্য হূদ 'আলাইহিস্ সালামকে নবীরূপে প্রেরণ করেন। তিনি 'আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তার আদেশ অমান্য করে। তারা শক্তিমত্ত হয়ে বলে বসলঃ "আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে"? [সূরা ফুসসিলাত: ১৫] এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আযাব নাযিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদস্বত্ত্বেও তারা শির্ক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করল না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব সওয়ার হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালান-কোঠা মাটির সাথে মিশে যায়। মানুষ ও জীব-জন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে 'আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তাই বলা হয়েছেঃ "আমরা মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি"। হূদ 'আলাইহিস্ সালামের আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শির্কে লিপ্ত থাকার কারণে যখন 'আদ জাতির উপর আযাব নাযিল হয়, তখন হূদ 'আলাইহিস্ সালাম ও তার সঙ্গীদেরকে আল্লাহ্ রক্ষা করেন। হূদ 'আলাইহিস্ সালাম ও তার সঙ্গীরা আযাব থেকে মুক্তি পেলেন। [বিস্তারিত ঘটনা দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]
'আদ জাতির উপর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আযাব আসা কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্টভাবে

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা কুফরী করেছিল, তারা বলেছিল, 'আমরা তো তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় নিপতিত দেখছি। আর আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি(১)।'

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে একজন রাসূল(২)।'

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. 'আমি আমার রবের রিসালাত (যা নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা) তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি এবং

উল্লেখিত রয়েছে। সুরা আল-মুমিনূনে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ "অতঃপর আমি তাদের পরে আরো একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি"। বাহ্যতঃ এরাই হচ্ছে 'আদ' জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের কাজকর্ম ও কথাবার্তা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছেঃ একটি বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ 'আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আযাব এসেছিল। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ও ঘূর্ণিঝড় উভয়টিই হয়েছিল। [তাফসীর ইবন কাসীর ৫/৪৭৪; সূরা আল-মুমিনূনের ৪১ নং আয়াতের তাফসীর]

(১) অর্থাৎ তারা মনে করতে থাকল যে, তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা বলছেন তা মিথ্যা। [মুয়াসসার] যদিও তারা তাকে ব্যক্তিগতভাবে মিথ্যাবাদী মনে করত না। কারণ নবীগণ সর্বযুগেই সত্যবাদী ছিলেন।

(২) অর্থাৎ সম্প্রদায়ের নেতা গোছের লোকেরা বললঃ "আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ধারণা তুমি একজন মিথ্যাবাদী।" এটা প্রায় নূহ্ 'আলাইহিস্সালামের সম্প্রদায়ের প্রত্যুত্তরের মতই– শুধু কয়েকটি শব্দের পার্থক্য মাত্র। হূদ 'আলাইহিস্সালাম এর উত্তরে বললেনঃ আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। ব্যাপার শুধু এতটুকুই যে, আমি বিশ্ব পালনকর্তার কাছ থেকে রাসূল হয়ে এসেছি। তাঁর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের হিতাকাংখী। তাই তোমাদের পৈত্রিক মুর্খতায় তোমাদের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য কথা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই। কিন্তু তা তোমাদের মনঃপুত নয়।

আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাংখী।

৬৯. 'তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে(১)? এবং স্মরণ কর যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের (ধ্বংসের) পরে তোমাদেরকে (তোমাদের আগের লোকদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন(২) এবং সৃষ্টিতে (দৈহিক গঠনে) তোমাদেরকে বেশী পরিমাণে হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ করেছেন। কাজেই তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহসমূহ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِى ٱلْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۖ فَٱذْكُرُوٓا۟ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٦٩

৭০. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা যেন এক আল্লাহ্র ইবাদাত করি এবং আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদাত

قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٧٠

(১) এখানে 'আদ জাতির সে আপত্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের পূর্বে নূহ্ 'আলাইহিস্সালামের সম্প্রদায় উত্থাপন করেছিল। অর্থাৎ আমরা নিজেদেরই মত কোন মানুষকে নেতারূপে কিভাবে মেনে নিতে পারি? কোন ফিরিশ্তা হলে মেনে নেয়া সম্ভবপর ছিল। এর উত্তরেও হূদ 'আলাইহিস্ সালাম তেমনি জবাব দিয়েছিলেন, যা নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কোন মানুষ আল্লাহ্র রাসূল হয়ে মানুষকে ভয় প্রদর্শনের জন্য আসবেন। কেননা, মানুষকে বুঝানোর জন্য মানুষেরই নবী হওয়া বাস্তবসম্মত হতে পারে।

(২) 'আদ জাতির পূর্বে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের উপর পতিত মহাশক্তির স্মৃতি তখনো মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই হূদ 'আলাইহিস্ সালাম আযাবের কঠোরতা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করেননি। বরং এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তোমরা কি ভয় করনা?

করত তা ছেড়ে দেই[১]? কাজেই তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যা ভয় দেখাচ্ছ[২] তা নিয়ে এস।'

৭১. তিনি বললেন, 'তোমাদের রবের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের উপর নির্ধারিত হয়েই আছে; তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতগুলি নাম সম্বন্ধে যেগুলোর নাম তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখেছ[৩], যে সম্বন্ধে

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۭ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَاۗءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاۗؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

(১) এখানে একথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ জাতিটিও আল্লাহকে অস্বীকার করতো না, আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল না। অথবা তাঁর ইবাদাত করতে অস্বীকার করছিল না। আসলে তারা হুদ আলাইহিস্‌সালামের একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে এবং তাঁর ইবাদাতের সাথে আর কারোর ইবাদাত যুক্ত করা যাবে না- এ বক্তব্যটি মেনে নিতে অস্বীকার করছিল।

(২) মূলে تَعِدُنَا শব্দ এসেছে। যার সাধারণ অর্থ, 'তুমি যার ওয়াদা আমাদের কাছে করছ'। কিন্তু এখানে খারাপ কোন পরিণতির ভয় প্রদর্শন উদ্দেশ্য। [মুয়াসসার] আলেমগণ বলেন, এখানে وعد শব্দটি وعيد এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আ'রাফের ৭৭, সূরা হূদ এর ৩২ এবং সূরা আল-আহকাফের ২২ নং আয়াতেও এ শব্দটি একই অর্থে এসেছে।

(৩) অর্থাৎ তোমরা কাউকে বৃষ্টির দেবতা, কাউকে বায়ূর দেবতা, কাউকে ধন-সম্পদের দেবতা, আবার কাউকে রোগের দেবতা বলে থাকো। অথচ তাদের কেউ মূলতঃ কোন জিনিসের স্রষ্টা ও প্রতিপালক নয়। বর্তমান যুগেও আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখি। এ যুগেও লোকেরা দেখি কাউকে বিপদ মোচনকারী বলে থাকে। অথচ বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতাই তার নেই। লোকেরা কাউকে 'গন্‌জ বখশ' (গুপ্ত ধন ভান্ডার দানকারী) বলে অভিহিত করে থাকে। অথচ তার কাছে কাউকে দান করার মত কোন ধনভান্ডার নেই। কাউকে 'গরীব নওয়াজ' আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। অথচ তিনি নিজেই গরীব। যে ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ফলে কোন গরীবকে প্রতিপালন ও তার প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে সেই ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে তার কোন অংশ নেই। কাউকে 'গাউস' (ফরিয়াদ শ্রবণকারী) বলা হয় অথচ কারোর ফরিয়াদ শুনার এবং তার প্রতিকার করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। কাজেই এ ধরনের যাবতীয় নাম বা উপাধি নিছক নাম বা উপাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নামগুলোর পিছনে কোন সত্তা বা ব্যক্তিত্ব নেই। যারা এগুলো নিয়ে ঝগড়া ও বিতর্ক করে তারা আসলে

আল্লাহ্ কোন সনদ নাযিল করেননি[১]? কাজেই তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।'

৭২. তারপর আমরা তাকে ও তার সাথীদেরকে আমাদের অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম; আর আমাদের আয়াতসমূহে যারা মিথ্যারোপ করেছিল এবং যারা মুমিন ছিল না তাদেরকে নির্মূল করেছিলাম[২]।

فَأَنجَيْنَٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَمَا كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

দশম রুকূ'

৭৩. আর সামূদ[৩] জাতির নিকট তাদের

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا قَالَ يَٰقَوْمِ

কোন বাস্তব জিনিসের জন্য নয়, বরং কেবল কতিপয় নামের জন্যই ঝগড়া ও বিতর্ক করে।

(১) অর্থাৎ তোমরা নিজেরাই যে আল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ রব বলে থাকো তিনি তোমাদের এ বানোয়াট ইলাহদের সার্বভৌম ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের সপক্ষে কোন সনদ দান করেননি। তিনি কোথাও বলেননি যে, আমি অমুকের ও অমুকের কাছে আমার ইলাহী কর্তৃত্বের এ পরিমাণ অংশ স্থানান্তরিত করে দিয়েছি। কাউকে 'বিপদত্রাতা' অথবা 'গনজ বখশ' বা 'গাউস' হবার কোন পরোয়ানা তিনি দেননি। তোমরা নিজেরাই নিজেদের ধারণা ও কল্পনা অনুযায়ী তাঁর ইলাহী ক্ষমতার যতটুকু অংশ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে দিয়েছো।

(২) এ অনুবাদটি এ হিসেবে যে, তাদের ধ্বংসের কারণ দু'টি। তারা মিথ্যারোপ করেছিল এবং ঈমান না এনে কুফরী করেছিল। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আয়াতের অর্থ এভাবেও করা যায় যে, যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছিল তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি। আর তারা ঈমান গ্রহণকারী ছিল না, কারণ তারা আয়াতসমূহের উপর মিথ্যারোপ এবং সৎকাজ ছেড়ে দিয়েছিল। [মুয়াসসার]

(৩) সামূদ আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় জাতি। আদ জাতির পরে এরাই সবচেয়ে বেশী খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করে। উত্তর-পশ্চিম আরবের যে এলাকাটি আজো 'আল হিজর' নামে খ্যাত, সেখানেই ছিল এদের আবাস। আজকের সাউদী আরবের অন্তর্গত মদীনা ও তাবুকের মাঝখানে মদীনা থেকে প্রায় ২৫০ কিঃমিঃ দূরে একটি স্টেশন রয়েছে, তার নাম মাদায়েনে সালেহ। এটিই ছিল সামূদ জাতির কেন্দ্রীয় স্থান। সামূদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে যেসব বিপুলায়তন ইমারত

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۷۳﴾

ভাই সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে[১]।

নির্মাণ করেছিল এখনো অনেক এলাকা জুড়ে সেগুলো অবস্থান করছে। [ড.শাওকী আবু খালীল, আতলাসুল কুরআন, পৃ. ৩৪-৩৬]

(১) অর্থাৎ এখন তো একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে। এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী। এ আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে এবং কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। এ উষ্ট্রির ঘটনা এই যে, সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তার কাছে এমন একটি দাবী করতে হবে যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং আমরা তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করব। সে মতে তারা দাবী করল যে, তুমি যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র নবী হও, তবে আমাদেরকে পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে দেখাও।

সালেহ্ 'আলাইহিস্‌সালাম প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবী পূরণ করে দেই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না? সবাই যখন এই মর্মে অঙ্গীকার করল, তখন সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করলেন। দো'আর সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দন দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভেতর থেকে দাবীর অনুরূপ একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এল।

সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামের এ বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে কিছু লোক তৎক্ষণাৎ ঈমান এনে ফেলল এবং অবশিষ্টরাও ঈমান আনার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেব-দেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজার ঠাকুর ধরণের কিছু সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। সালেহ্ 'আলাইহিস্‌সালাম স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শংকিত হলেন যে, এদের উপর আযাব এসে যেতে পারে। তাই নবীসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেনঃ এ উষ্ট্রীর দেখাশোনা কর। একে কোনরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়ত তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে। আয়াতে এ উষ্ট্রীকে 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী' বলা হয়েছে কারণ, এটি আল্লাহ্‌র আসীম শক্তির নিদর্শন এবং সালেহ্ 'আলাইহিস্

এটি আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তাকে আল্লাহ্‌র যমীনে চরে খেতে দাও এবং তাকে কোন কষ্ট দিও না, দিলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে পেয়ে বসবে(১)।

৭৪. 'আর স্মরণ কর, 'আদ জাতির (ধ্বংসের) পরে তিনি তোমাদেরকে (তোমাদের আগের লোকদের)

وَاذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ عَادٍ
وَبَوَّأَكُمْ فِى الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن

সালামের মু'জিযা হিসেবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের জন্মও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাকে রূহুল্লাহ্ বা 'আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আত্মা' বলা হয়েছে। এর দ্বারা ঈসাকে সম্মানিত করাই উদ্দেশ্য।
সামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরণের উষ্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফয়সালা করে দিলেন যে, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নিবে। কুরআনের অন্যত্র এভাবে পানি বন্টনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ "হে সালেহ্, আপনি স্বজাতিকে বলে দিন যে, কূপের পানি তাদের এবং উষ্ট্রীর মধ্যে বন্টন হবে।" অর্থাৎ একদিন উষ্ট্রীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। [বিস্তারিত দেখুন, তাফসীর ইবন কাসীর ও আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

(১) জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজর এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন, তোমরা নিদর্শন চেয়ো না। সালেহ এর কাওম নিদর্শন চেয়েছিল। ফলে সেটা এ রাস্তা দিয়ে ঢুকত আর ঐ রাস্তা দিয়ে বের হত। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের রবের নির্দেশ অমান্য করল এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করল। সে উষ্ট্রীর জন্য একদিনের পানি নির্দিষ্ট ছিল, আর তাদের জন্য তার দুধ নির্ধারিত ছিল অপরদিন। কিন্তু তারা সেটাকে হত্যা করল। তখন তাদেরকে এক বিকট চিৎকার পেয়ে বসল। যা আসমানের নীচে তাদের যারা ছিল তাদের সবাইকে নিস্তেজ করে দিল। তবে একজন ছাড়া। সে ছিল আল্লাহ্‌র হারামে (মক্কায়)। বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে লোকটি কে? তিনি বললেন, সে হচ্ছে, আবু রিগাল। কিন্তু সে যখনই হারাম থেকে বের হল তখনই তার পরিণতি তা-ই হয়েছিল যা তার সম্প্রদায়ের হয়েছিল।' [মুসনাদে আহমাদ ৩/২৯৬; মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩২০]

سُهُوۡلِهَا قُصُوۡرًا وَّتَنۡحِتُوۡنَ الۡجِبَالَ بُيُوۡتًا ۚ فَاذۡكُرُوۡۤا اٰلَاۤءَ اللّٰهِ وَلَا تَعۡثَوۡا فِى الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ ۝٧٤

স্থলাভিষিক্ত করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে যমীনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ ও পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি তৈরী করছ(১)। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না(২)।'

قَالَ الۡمَلَاُ الَّذِيۡنَ اسۡتَكۡبَرُوۡا مِنۡ قَوۡمِهٖ لِلَّذِيۡنَ اسۡتُضۡعِفُوۡا لِمَنۡ اٰمَنَ مِنۡهُمۡ اَتَعۡلَمُوۡنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرۡسَلٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوۡۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرۡسِلَ بِهٖ مُؤۡمِنُوۡنَ ۝٧٥

৭৫. তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা সে সম্প্রদায়ের যারা ঈমান এনেছিল- যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি জান যে, সালিহ্ তার রব এর পক্ষ থেকে প্রেরিত?' তারা বলল, 'নিশ্চয় তিনি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, আমরা তার উপর ঈমানদার।'

قَالَ الَّذِيۡنَ اسۡتَكۡبَرُوۡۤا اِنَّا بِالَّذِىۡۤ اٰمَنۡتُمۡ بِهٖ كٰفِرُوۡنَ ۝٧٦

৭৬. যারা অহংকার করেছিল তারা বলল, 'নিশ্চয় তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তাতে কুফরীকারী(৩)।'

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত স্মরণ কর যে, তিনি 'আদ জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদেরকে অভিষিক্ত করেছেন। তাদের ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তি তোমাদেরকে দান করেছেন এবং তোমাদেরকে এ শিল্পকার্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, উন্মুক্ত জায়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরী কর।

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, দ্বীনের মূল বিশ্বাসসমূহে সব নবীই একমত। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা।

(৩) এখানে সামূদ জাতির দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। একদল সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী কাফেরদের। বলা হয়েছেঃ সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহংকারী ছিল, তারা যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হত-অর্থাৎ যারা

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

৭৭. অতঃপর তারা সে উষ্ট্রীকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালিহ্! তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এস, যদি তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।'

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝

৭৮. অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে (মরে) রইল[১]।

বিশ্বাস স্থাপন করেছিল-তাদেরকে বললঃ তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল? উত্তরে মুমিনরা বললঃ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে হেদায়াতসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী। সামূদ জাতির মুমিনরা কি চমৎকার উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিনি রাসূল কি না। আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয়; বরং জাজ্বল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আনীত বাণী। জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু থাকলে তা এই যে, কে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না? আল্লাহ্র দয়ায় আমরা তার আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের এ অলংকারপূর্ণ উত্তর শুনেও সামূদ জাতি পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বললঃ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধন-সম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপদ রাখুন। এগুলো মানুষের চোখে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা জাজ্বল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে।

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামের দো'আয় পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উষ্ট্রী বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এ উষ্ট্রীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সেমতে সে জনপদের সব মানুষ ও জীব-জন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উষ্ট্রী তার সব পানি পান করে ফেলত। তাই সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম তাদের জন্য পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা। সুতরাং এ উষ্ট্রীর কারণে জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু আযাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হত না। কিন্তু তাদের সম্প্রদায়ের এক যুবক উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। সে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং তরবারীর আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করল। কুরআনুল কারীম তাকেই সামূদ জাতির সর্ববৃহৎ

হতভাগ্য লোক বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেঃ ﴿إِذِ انۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا﴾ [সূরা আস্-শামসঃ ১২] কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আযাবে পতিত হয়।

উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা জানার পর সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবন কাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে। এরপরই আযাব নেবে আসবে। এ ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্য কোন উপদেশ ও হুশিয়ারী কার্যকর হয় না। হতভাগ্য জাতি একথা শুনেও ক্ষমা ও প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামকেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের পূর্বে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দেই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। সামূদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলা সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার গৃহপানে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ "তারাও গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যুত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, তারা তা জানতেই পারল না।" [সূরা আন্-নমলঃ ৫০] শেষপর্যন্ত ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধঃমুখী হয়ে ভূশায়ী হল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লেখিত রয়েছে। অন্যান্য আয়াতে ভীষণ চিৎকার ও বিকট শব্দের কথা এসেছে। উভয় আয়াতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার আযাবই এসেছিল; নীচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার।

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামূদ জাতির উপর আযাব এসেছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আযাব-বিধ্বস্ত এলাকার ভেতরে প্রবেশ কিংবা এর কূপের পানি ব্যবহার না করে। আর যদি ঢুকতেই হয় তবে যেন ক্রন্দনরত অবস্থায় ঢুকে [দেখুন, বুখারীঃ ৪৩৩, ৩৩৭৮, ৩৩৭৯, ৩৩৮১, ৪৭০২, ৪৪২০, মুসলিমঃ ২৯৮০, ২৯৮১, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৬৬, ১১৭, ৭২, ৯১]

কোন কোন হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে আবু রেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কার হারামের সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে হারাম থেকে বাইরে যায়, তখন সামূদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও মৃত্যুমুখে

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার রবের রিসালত (যা নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা) তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দ কর না(১) ।'

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ

৮০. আর আমি লূতকেও(২)

পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে মক্কার বাইরে আবু রেগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেনঃ তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। [দেখুন, মুসনাদে আহমাদঃ ৩/২৯৬, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৪০, ৩৪১, সহীহ ইবন হিব্বানঃ ৬১৯৭]
এসব আযাব-বিধ্বস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য শিক্ষাস্থল হিসেবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কুরআনুল কারীম আরবদেরকে বার বার হুশিয়ার করেছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজো শিক্ষার কাহিনী হয়ে বিদ্যমান রয়েছে।

(১) স্বজাতির উপর আযাব নাযিল হওয়ার পর সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম ও ঈমানদারগণ সে এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম প্রস্থানকালে জাতিকে সম্বোধন করে বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি, কিন্তু আফসোস, তোমারা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দই কর না।

(২) লূত 'আলাইহিস্ সালাম ছিলেন ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামের ভ্রাতুস্পুত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামের পরিবারও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামকে নবী করে পাঠান। কিন্তু সবাই তার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অগ্নি পর্যন্ত গড়ায়। স্বয়ং পিতা তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন। নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু স্ত্রী সারা ও ভ্রাতুস্পুত্র লূত মুসলিম হন। অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম দেশ ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহ্র নির্দেশে ইব্রাহীম 'আলাইহিস্

সালাম বায়তুল মোকাদ্দাসের অদূরেই বসতি স্থাপন করেন।
লূত 'আলাইহিস্ সালামকেও আল্লাহ্ তা'আলা নবুওয়াত দান করে জর্দান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদূমের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় বড় শহর ছিল। কুরআনুল কারীম বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে 'মু'তাফেকা' ও 'মু'তাফেকাত' শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব শহরের মধ্যে সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হত। লূত 'আলাইহিস্ সালাম এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্যশ্যামল। এখানে সর্ব প্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা লূত 'আলাইহিস্ সালামকে তাদের হেদায়াতের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলেনঃ "তোমরা এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।" অর্থাৎ লূত 'আলাইহিস্ সালামের জাতি নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করত। এটা ছিল এমন কাজ যা এর পূর্বে কোন জাতি করেনি। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলছেনঃ তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ডিঙ্গিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ। লূত 'আলাইহিস্ সালামের উপদেশের জবাবে তার সম্প্রদায় বললঃ এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবী করে। এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও। তখন গোটা জাতিই আল্লাহ্র আযাবে পতিত হল। শুধু লূত 'আলাইহিস্ সালাম ও তার কয়েকজন সঙ্গী আযাব থেকে বেঁচে রইলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ "আমি লূত ও তার পরিবারকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি।" কারণ, লূত 'আলাইহিস্ সালামের ঘরের লোকেরাই শুধু মুসলিম ছিল। সুতরাং তারাই আযাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তার স্ত্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সারকথা এই যে, গোণা-গুণতি কয়েকজন মুসলিম ছিল। তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা লূত 'আলাইহিস্ সালামকে নির্দেশ দেন যে, স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল লোককে নিয়ে শেষ রাত্রে বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পিছনে ফিরে দেখবেন না। কেননা, আপনি যখন বস্তি থেকে বের হয়ে যাবেন, তখনই কালবিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে। লূত 'আলাইহিস্ সালাম এ নির্দেশ মত স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীলদেরকে নিয়ে শেষ রাত্রে সাদূম ত্যাগ করেন। তার স্ত্রী প্রসঙ্গে দু'রকম বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, কিছু দূর সঙ্গে চলার পর আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীতে পিছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। ফলে সাথে সাথে আযাব এসে তাকেও পাকড়াও করল। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাদের উপর আপতিত আযাব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যখন আমার আযাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

পাঠিয়েছিলাম[১]। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা কি এমন খারাপ কাজ করে যাচ্ছ যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি?

إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. 'তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষের কাছে যাও, বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি এ কাফেরদের থেকে বেশী দূরে নয়।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নীচে থেকে জীব্‌রাঈল 'আলাইহিস্ সালাম গোটা ভূখণ্ডকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। সূরা আল-হিজরের আয়াতে এ আযাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছেঃ সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। লূত 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উল্টে দেয়ার আযাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে। কারণ, তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল। সূরা হূদের বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে আল্লাহ্ তা'আলা আরবদেরকে হুশিয়ার করে এ কথাও বলেছে যে, উল্টে দেয়া বস্তিগুলো যালেমদের কাছ থেকে বেশী দূরে নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। এ দৃশ্য শুধু কুরআন নাযিলের সময়েরই নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি 'লূত সাগর' অথবা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিতি। এর ভূ-ভাগ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশে নদীর আকারে আশ্চর্য ধরণের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়। কথিত আছে, এটাই সাদূমের অবস্থান স্থল। [ড.শাওকী আবু খালীল, আতলাসুল কুরআন, পৃ. ৫৭-৬১]

(১) বর্তমানে যে এলাকাটিকে ট্রান্স জর্দান বলা হয় সেখানেই ছিল এ জাতিটির বাস। ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে এ এলাকাটি অবস্থিত। এ এলাকা এমনই শ্যামল সবুজে পরিপূর্ণ ছিল যে, মাইলের পর মাইল জুড়ে এ বিস্তৃত এলাকা যেন একটি বাগান মনে হতো। এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করত। কিন্তু আজ এ জাতির নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনকি তাদের জনপদগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত ছিল তাও আজ সঠিকভাবে জানা যায় না। মৃত সাগরই তাদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে।

৮২. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বহিস্কার কর, এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়।'

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩. অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিজনদের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছাড়া, সে ছিল পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. আর আমরা তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। কাজেই দেখুন, অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল[১]।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

এগারতম রুকূ'

৮৫. আর মাদ্‌য়ানবাসীদের[২] নিকট তাদের

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশী ভয় পাচ্ছি যে, তারা লুতের জাতির কাজ করে বসবে'। [তিরমিযীঃ ১৪৫৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য যবেহ করে আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেছেন, যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে তাকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, যে ব্যক্তি কোন অন্ধ ব্যক্তিকে পথ ভুলিয়ে দেয় তাকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে গালি দেয় আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেছেন, যে ব্যক্তি তার আপন মনিব ব্যতীত অন্য কাউকে মনিব বানায় আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেছেন, আর যে ব্যক্তি লুতের জাতির কাজ করে তাকেও আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, আর যে ব্যক্তি লুতের জাতির কাজ করে তাকেও আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, আর যে ব্যক্তি লুতের জাতির কাজ করে তাকেও আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩০৯] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যদি কাউকে তোমরা লুত জাতির কাজ করতে দেখ তবে যে এ কাজ করছে এবং যার সাথে করা হচ্ছে উভয়কে হত্যা কর'। [আবু দাউদঃ ৪৪৬২]

(২) মাদ্‌ইয়ানবাসীদের মূল এলাকাটি হেজাযের উত্তর পশ্চিমে এবং ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন যুগে যে বাণিজ্যিক সড়কটি লোহিত সাগরের উপকূল ধরে ইয়েমেন থেকে মক্কা ও ইয়াম্বু হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দ্বিতীয় যে বাণিজ্যিক সড়কটি ইরাক থেকে মিশরের

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই; তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। কাজেই তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না; তোমরা মুমিন হলে তোমাদের জন্য এটাই কল্যাণকর।'

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۠ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. 'আর তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য, আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিতে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতে তোমরা প্রতিটি পথে বসে থেকো না।' আর স্মরণ কর, 'তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তা লক্ষ্য কর।'

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا

৮৭. 'আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে

দিকে চলে যেতো তাদের ঠিক সন্ধিস্থলে এ জাতির জনপদগুলো অবস্থিত ছিল। এ কারণে আরবের লোকেরা মাদইয়ান জাতি সম্পর্কে জানতো। কারণ তাদের ব্যবসাও এ পথে চলাচল করতো।
মাদ্‌ইয়ানের বর্তমান নাম 'আল বিদা'। এ এলাকাটি একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। সৌদী আরবের শেষ প্রান্তে মিশরের সীমান্ত সংলগ্ন এ এলাকায় এখনো শু'আইব আলাইহিস সালামের জাতির বিভিন্ন চিহ্ন রয়ে গেছে। যা 'মাগায়েরে শু'আইব নামে খ্যাত। [ড.শাওকী আবু খালীল, আতলাসুল কুরআন, পৃ. ৭২]

بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

এবং কোন দল ঈমান না আনে, তবে ধৈর্য ধর, যতক্ষন না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ।'

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۗ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿٨٨﴾ ۚ

৮৮. তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা বলল, 'হে শু'আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে ।' তিনি বললেন, 'যদিও আমরা সেটাকে ঘৃণা করি তবুও?'

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۗ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۗ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۗ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. 'তোমাদের ধর্মাদর্শ থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করব । আর আমাদের রব আল্লাহ্ ইচ্ছে না করলে তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয় । সবকিছুই আমাদের রবের জ্ঞানের সীমায় রয়েছে, আমরা আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করি । হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফয়সালা করে দিন এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ।'

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. আর তার সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলল, 'তোমরা যদি শু'আইবকে অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।'

৯১. অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে (মরে) রইল।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٩١﴾

৯২. শু'আইবকে যারা মিথ্যাবাদী বলেছিল, মনে হল তারা যেন কখনো সেখানে বসবাসই করেনি। শু'আইবকে যারা মিথ্যাবাদী বলেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَٰسِرِينَ ﴿٩٢﴾

৯৩. অতঃপর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার রবের রিসালাত (প্রাপ্ত বাণী) আমি তো তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। সুতরাং আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করি(১)!'

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَٰفِرِينَ ﴿٩٣﴾

(১) শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কুরআনুল কারীমে কোথাও তাদেরকে 'আহ্‌লে মাদ্‌ইয়ান' ও 'আসহাবে মাদ্‌ইয়ান' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোথাও 'আসহাবে আইকাহ্' নামে। 'আইকাহ্' শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ 'আসহাবে মাদ্‌ইয়ান' ও 'আসহাবে আইকাহ্' পৃথক পৃথক জাতি। তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম প্রথমে এই জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। উভয় জাতির উপর যে আযাব আসে, তার ভাষাও বিভিন্ন রূপ। আসহাবে মাদ্‌ইয়ানের উপর কোথাও صيحة এবং কোথাও رجفة এবং আসহাবে আইকাহ্‌র উপর কোথাও ظلة -এর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। صيحة শব্দের অর্থ বিকট চিৎকার এবং ভীষণ শব্দ। رجفة শব্দের অর্থ ভূমিকম্পন এবং ظلة শব্দের অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আসহাবে আইকাহ্‌র উপর এভাবে আযাব নাযিল করা হয় যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের বস্তিতে ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দেয়। ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে বস্তির সবাই জঙ্গলে জমায়েত হয়। এভাবে অপরাধীরা কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই নিজ পায়ে

হেঁটে বধ্যভূমিতে গিয়ে পৌঁছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, তখন মেঘমালা থেকে অগ্নি বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং নীচের দিকে শুরু হয় ভূমিকম্পন। ফলে সবাই নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।

কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ 'আসহাবে মাদ্ইয়ান' ও 'আসহাবে আইকাহ্' একই সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বোল্লেখিত তিন প্রকার আযাবই তাদের উপর নাযিল হয়েছিল। প্রথমে মেঘমালা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়, অতঃপর বিকট চীৎকার শোনা যায় এবং সবশেষে ভূমিকম্পন হয়। ইবনে কাসীর এ তাফসীরেরই প্রবক্তা। [আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস, পৃ. ২৮৫-২৯৩]

মোটকথা, উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হোক কিংবা একই সম্প্রদায়ের দু'নাম হোক শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম তাদের কাছে তাওহীদের বাণীই পৌঁছান। তারা শির্কের পাশাপাশি এমনকিছু কুকর্মে লিপ্ত ছিল, যা থেকে শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে নিষেধ করেন। তারা একদিকে আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করছিল, অপরদিকে বান্দার হকও নষ্ট করছিল। তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাদের নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহ্‌র হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ে মাপ ও ওজনে কম দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত এবং পথিকদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিত এবং শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা এভাবে ভূ-পৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হেদায়াতের জন্য শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম প্রেরিত হয়েছিলেন। শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম তাদের সংশোধনের জন্য তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব নবী দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ। এ সম্প্রদায়ও সৃষ্ট বস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী ও হক সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ বাণী পৌঁছানো হয়েছে। আরো বলা হয়েছেঃ তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ'-এর অর্থ ঐসব মু'জিযা, যা শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না। এতে প্রথমে একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দিয়ে করা হত। অতঃপর সর্ব প্রকার হকে ত্রুটি করাকে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা ধন-সম্পদ, ইয্যত-আবরু অথবা অন্য যে কোন বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন। এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্যান্য হকে ত্রুটি করাও হারাম। কারো ইয্যত-আবরু নষ্ট করা, কারো পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য জরুরী তাদের আনুগত্যে

ত্রুটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায় করত। বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের ইয্যত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। তৃতীয়তঃ পৃথিবীর সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িও না। অর্থাৎ পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হল, প্রত্যেকটি বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা, এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বস্তুতঃ তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর আভ্যন্তরীণ সংস্কার হল আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তাঁর নির্দেশাবলী পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি পরিত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। ফলে পৃথিবীতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব রকম অনর্থ বিরাজমান ছিল। তাই তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক।

অতঃপর বলা হয়েছেঃ যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, তবে তোমাদের জন্য উত্তম। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যদি তোমরা অবৈধ কাজ-কর্ম থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। দ্বীন ও আখেরাতের মঙ্গলের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এটি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাবে জড়িত। দুনিয়ার মঙ্গল এ জন্য যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওজনে এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে। এরপর তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত স্মরণ করানো হয়েছে যে, তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা তোমরা ধন-সম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐশ্বর্য্য দান করে তোমাদের স্বনির্ভর করে দিয়েছেন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছেঃ পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর- কওমে নূহ্, 'আদ, সামূদ ও কওমে লূতের উপর কি ভীষণ আযাব এসেছে। তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ কর। শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের দাওয়াতের পর তার সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক মুসলিম হয়, এবং কিছু সংখ্যক কাফেরই থেকে যায়। কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করতে থাকে। এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফের হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছেঃ তাড়াহুড়া কিসের? আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে অপরাধীদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, তখন

সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করে দেয়া হয়। তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। তোমরা যদি কুফর থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্বর কাফেরদের উপর চূড়ান্ত আযাব নাযিল হয়ে যাবে। জাতির অহংকারী সর্দারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম বুঝতে পারলেন যে, তারা কোন কিছুতেই প্রভাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে কথা-বার্তা ছেড়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দো'আ করলেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে সত্যভাবে ফয়সালা করে দিন, এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সম্প্রদায়ের কাফেরদেরকে ধ্বংস করার দো'আ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ দো'আ কবূল করে ভুমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের আযাবকে এখানে ভূমিকম্প বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে, তাদেরকে ছায়াদিবসের আযাব পাকড়াও করেছে। [সূরা আশ-শু'আরা: ১৮৯] 'ছায়া দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কাল মেঘের ছায়া পতিত হয়। তারা এর নীচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর প্রস্তর অথবা অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেনঃ শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমন কি পানিতেও তাদের জন্য শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ট হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে দেখল সেখনে আরো বেশী গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হল। সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা একটি ঘন কাল মেঘ পাঠিয়ে দিলেন যার নীচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নিচে এসে ভিড় করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হল এবং ভূমিকম্পও এল। ফলে তারা সবাই ভস্মস্তূপে পরিণত হল। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আযাব উভয়টিই আসে। [তাবারী, ৬/৯/৪; আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস পৃ. ২৯২-২৯৩]

স্বজাতির উপর আযাব আসতে দেখে শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম বদদো'আ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু যখন আযাব এসে গেল তখন নবীসুলভ দয়ার কারণে তার অন্তর ব্যথিত হল। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে বললেনঃ আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাংখায় কোন ত্রুটি করিনি; কিন্তু আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি? [এ জাতির বিস্তারিত ঘটনা ও পরিণতি জানার জন্য দেখুন, ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১/৪৩৯]

বারতম রুকূ'

৯৪. আর আমরা কোন জনপদে নবী পাঠালেই সেখানকার অধিবাসীদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করি, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে[১]।

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّبِىٍّ إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫. তারপর আমরা অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি। অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করেছে।' অতঃপর হঠাৎ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করি, এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধিও করতে পারে না[২]।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا۟ وَّقَالُوا۟ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

---

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায় এবং 'আদ' ও 'সামূদ জাতিকে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা শুধুমাত্র তাদের সাথেই এককভাবে সম্পৃক্ত নয়; বরং সকল জাতির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কুরাইশ কাফেরদের জন্যও প্রযোজ্য। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন স্বীয় রীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্ত জাতি-সম্প্রদায়ের সংশোধন ও কল্যাণ সাধনকল্পে যেসব নবী-রাসূল প্রেরণ করেন তাদের আদেশ-উপদেশের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে না প্রথমে তাদেরকে পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়, যাতে এই বিপদাপদের চাপে আল্লাহ্র দিকে মনোযোগী হতে পারে। তাঁরই দিকে ফিরে আসতে পারে, নবী-রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করা থেকে বিরত হয়। [তাবারী; সা'দী]

(২) আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে দু'ধরণের পরীক্ষা নিয়েছেন। প্রথম পরীক্ষাটি নেয়া হয়েছে তাদেরকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে অকৃতকার্য হয়, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেয়া হয় দারিদ্র, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং তা অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখ কষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে। কিন্তু কর্মবিমুখ, শৈথিল্য পরায়ণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি; বরং বলতে শুরু করে দেয় যে, এটা কোন নতুন বিষয় নয়। সৎ কিংবা

৯৬. আর যদি সে সব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম[১], কিন্তু তারা

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

অসৎ কর্মের পরিণতিও নয়; বরং প্রাকৃতিক নিয়মই তাই- কখনো সুখ, কখনো দুঃখ, কখনো রোগ, কখনো স্বাস্থ্য, কখনো দারিদ্র্য, কখনো স্বচ্ছলতা এমনই হয়ে থাকে। আমাদের পিতা-পিতামহ প্রমুখ পূর্ব-পুরুষদেরও এমনি সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতে করে তারা তখনই নিপতিত হলো আকস্মিক আযাবের মধ্যে। অর্থাৎ তারা যখন উভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হল না, তখন আমি তাদেরকে আকস্মিক আযাবের মাধ্যমে ধরে ফেল্লাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন খবরই ছিল না। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) বরকতের শাব্দিক অর্থ প্রবৃদ্ধি। আর বরকতের মূল হচ্ছে, কোন কিছু নিয়মিত থাকা। [বাগভী] 'আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকত খুলে দেয়া' বলতে উদ্দেশ্য হল সব রকম কল্যাণ সবদিক থেকে খুলে দেয়া। অর্থাৎ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হত আর যমীন থেকে যে কোন বস্তু তাদের মনমত উৎপাদিত হত এবং অতঃপর সেসব বস্তু দ্বারা তাদের লাভবান হওয়ার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেয়া হত। [ফাতহুল কাদীর] তাতে তাদেরকে এমন কোন চিন্তা-ভাবনা কিংবা টানাপোড়নের সম্মুখীন হতে হত না যার দরুন বড় বড় নেয়ামতও পঙ্কিলতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিটি বিষয়ে বরকত বা প্রবৃদ্ধি ঘটত।

পৃথিবীতে বরকতের বিকাশ ঘটে দু'রকমে। কখনো মুল বস্তুটি প্রকৃতভাবেই বেড়ে যায়। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযাসমূহের মধ্যে রয়েছে একটা সাধারণ পাত্রের পানি দ্বারা গোটা কাফেলার পরিতৃপ্ত হওয়া। কিংবা সামান্য খাদ্য দ্রব্যে বিরাট সমাবেশের পেটভরে খাওয়া যা সঠিক ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। আবার কোন কোন সময় মূল বস্তুতে বাহ্যতঃ কোন বরকত বা প্রবৃদ্ধি যদিও হয় না, পরিমাণে যা ছিল তাই থেকে যায় কিন্তু তার দ্বারা এতবেশী কাজ হয় যা এমন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বস্তুর দ্বারাও সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণভাবেও দেখা যায় যে, কোন একটা পাত্র কাপড়-চোপড় কিংবা ঘরদুয়ার অথবা ঘরের অন্য কোন আসবাবপত্র এমন বরকতময় হয় যে মানুষ তাতে আজীবন উপকৃত হওয়ার পরেও তা তেমনি বিদ্যমান থেকে যায়। পক্ষান্তরে অনেক জিনিষ তৈরী করার সময়ই ভেঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা অটুট থাকলেও তার দ্বারা উপকার লাভের কোন সুযোগ আসে না। অথবা উপকারে আসলেও তাতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। এই বরকত মানুষের ধন সম্পদে হতে পারে, মন মস্তিস্কে হতে পারে আবার কাজ কর্মেও হতে পারে।

মিথ্যারোপ করেছিল; কাজেই আমরা তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছি।

৯৭. তবে কি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের উপর রাতে আসবে, যখন তারা থাকবে গভীর ঘুমে?

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮. নাকি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের উপর আসবে দিনের বেলা, যখন তারা খেলাধুলায় মেতে থাকবে?

أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾

৯৯. তারা কি আল্লাহ্‌র কৌশল থেকেও নিরাপদ হয়ে গেছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহ্‌র কৌশলকে নিরাপদ মনে করে না[১]।

أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩٩﴾

কোন কোন সময় মাত্র এক গ্রাস খাদ্যও মানুষের জন্য পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের কারণ হয়। আবার কোন কোন সময় অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বা ঔষধও কোন কাজে আসে না। তেমনিভাবে কোন সময়ের মধ্যে বরকত হলে মাত্র এক ঘন্টা সময়ে এত অধিক কাজ করা যায়, যা অন্য সময় চার ঘন্টায়ও করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক দিয়ে সম্পদ বা সময় বাড়ে না সত্য, কিন্তু এমনি বরকত তাতে প্রকাশ পায় যাতে কাজ হয় বহুগুণ বেশী।

(১) মূলে 'মকর' শব্দ ব্যবহার হয়েছে, আরবীতে এর মূল অর্থ হচ্ছে, ধোকাগ্রস্ত করা [ফাতহুল কাদীর] বা গোপনে গোপনে কোন চেষ্টা তদবীর করা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমনভাবে গুটি চালানো, যার ফলে তার উপর চরম আঘাত না আসা পর্যন্ত সে জানতেই পারে না যে, তার উপর এক মহা বিপদ আসন্ন। বরং বাইরের অবস্থা দেখে সে একথাই মনে করতে থাকে যে, সব কিছু ঠিকমত চলছে। [আল-মানার ১১/২৭৪]

তবে এ আয়াতে যে 'মকর' বা কৌশল অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে, তা আল্লাহর এক গুণ। তিনি তার বিরোধীদের পাকড়াও করার জন্য যে কৌশলই অবলম্বন করেন তা অবশ্যই প্রশংসাপূর্ণ গুণ হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ তারাও আল্লাহর সাথে অনুরূপ করে বলে মনে করে থাকে। তিনি যে রকম তাঁর গুণও সে রকম। তাঁর এ গুণে গুণান্বিত হবার ধরণ সম্পর্কে কেউ জানতে পারে না। এ জাতীয়

তেরতম রুকূ‘

১০০. কোন দেশের জনগনের পর যারা ঐ দেশের উত্তরাধিকারী হয় তাদের কাছে এটা কি প্রতীয়মান হয়নি যে, আমরা ইচ্ছে করলে তাদের পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি(১)? আর আমরা তাদের হৃদয় মোহর করে দেব, ফলে তারা শুনবে না(২) ।

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝١٠٠

আলোচনা সূরা বাকারায় বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে ।[আরও দেখুন, সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ]

(১) আয়াতে يهد অর্থ চিহ্নিতকরণ, প্রতীয়মান হওয়া এবং বাতলে দেয়া । এখানে এর কর্তা হল সে সমস্ত ঘটনাবলী যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে । অর্থাৎ বর্তমান যুগের লোকেরা যারা অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের পরে তাদের ভূ-সম্পত্তি ও ঘর-বাড়ীর উত্তরাধিকারী হয়েছে কিংবা পরে হবে, তাদেরকে শিক্ষণীয় সেসব অতীত ঘটনাবলী একথা বাতলে দেয়নি যে, কুফরী ও অস্বীকৃতি এবং আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধিতার পরিণতিতে যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষেরা (অর্থাৎ বিগত জাতিসমূহ) ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে । তেমনিভাবে তারাও যদি অনুরূপ অপরাধে লিপ্ত থাকে তাহলে তাদের উপরও আল্লাহ্‌র তা‘আলার আযাব ও গযব আসতে পারে । [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআনের স্থানে স্থানে এ বিষয়টি বার বার উল্লেখ করে মানুষকে পূর্ববর্তী জাতিদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন । যেমনঃ সূরা তোয়াহাঃ ১২৮, সুরা আস্ সাজদাহঃ ২৬, সূরা ইবরাহীমঃ ৪৫, সূরা মারইয়ামঃ ৯৮, সূরা আল-আন‘আমঃ ৬, ১০, সূরা আল-আহকাফঃ ২৫-২৭, সূরা সাবাঃ ৪৫, সূরা আল-মুলকঃ ১৮, সূরা আল-হাজঃ ৪৫-৪৬ ।

(২) অর্থাৎ এরা অতীত ঘটনাবলী থেকেও কোন রকম শিক্ষা গ্রহণ করে না । ফলে আল্লাহ্‌র গযবের দরুন তাদের অন্তরে মোহর এঁটে যায়, তারা তখন কিছুই শুনতে পায় না । হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘কোন লোক যখন প্রথমবার পাপ কাজ করে তখন তার অন্তরে মালিন্যের একটা বিন্দু লেগে যায় । দ্বিতীয়বার পাপ করলে দ্বিতীয় বিন্দু লাগে আর তৃতীয়বার পাপ করলে তৃতীয় বিন্দুটি লেগে যায় । এমনকি সে যদি অনবরত পাপের পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং তাওবাহ্ না করে তাহলে এই কালি-বিন্দু তার সমগ্র অন্তরকে ঘিরে ফেলে ।’ [দেখুন- ইবন মাজাহ্ঃ ৪২৪৪] তখন মানুষের অন্তরে ভাল-মন্দকে চেনার এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা যে স্বাভাবিক যোগ্যতাটি দিয়ে রেখেছেন, তা হয় নিঃশেষিত না হয় পরাভূত হয়ে যায় । আর তখন তার ফল দাঁড়ায় এই যে,

১০১. এসব জনপদের কিছু বিবরণ আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করছি, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন; কিন্তু পূর্বে তারা যাতে মিথ্যারোপ করেছিল, তাতে তারা ঈমান আনার ছিল না[১], এভাবে আল্লাহ্ কাফেরদের হৃদয় মোহর করে দেন।

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَٰفِرِينَ ﴿١٠١﴾

১০২. আর আমরা তাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাইনি; বরং আমরা তাদের অধিকাংশকে তো ফাসেকই পেয়েছি[২]।

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ۖ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَٰسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

সে ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল এবং ইষ্টকে অনিষ্ট ও অনিষ্টকে ইষ্ট বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থানটিকেই কুরআনে رأن القلوب অর্থাৎ 'অন্তরের মরচে' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এ অবস্থার সর্বশেষ পরিণতিকেই আলোচ্য আয়াতে এবং আরো বহু আয়াতে 'মোহর এঁটে দেয়া হয়' বলা হয়েছে। এ অবস্থায় উপণীত হলে সত্যসেখানে প্রবেশের সুযোগ পায় না, কল্যাণের কোন স্থান সেখানে থাকে না, যা তাদের উপকারে আসবে এমন কিছু শুনতে পায় না। শুধু সেটাই শুনতে পায় যা তাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগে। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ তাদের অন্তর মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির এমন একটি মনস্তাত্বিক নিয়মের আওতাধীন হয়ে যায়, যার দৃষ্টিতে একবার জাহেলী বিদ্বেষ বা হীন ব্যক্তি স্বার্থের ভিত্তিতে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার পর মানুষ নিজের জিদ ও হঠকারিতার শৃংখলে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে যেতে থাকে যে, তারপর কোন প্রকার যুক্তি-প্রমাণ, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, নিরীক্ষাই সত্যকে গ্রহণ করার জন্য তার মনের দুয়ার খুলে দেয় না। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ, যদি আমরা তাদেরকে আবার জীবিতও করতাম, তারপরও তারা ঈমান আনত না। কারণ কুফরী ও শির্ক করা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে উদ্দেশ্য এই যে, তারা পূর্বে যখন আমি তাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তখনই মিথ্যারোপ করেছিল। আল্লাহকে রব ও রাসূলদের মেনে ঈমান আনতে তখনও স্বতঃস্ফুর্তভাবে চায়নি। বরং তারা অনিচ্ছাসত্বেই ঈমানের কথা বলেছিল। সুতরাং যাতে তারা পূর্বে ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল তাতে তারা কখনও ঈমান আনবে না। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ কোন ধরনের অংগীকার পালনের পরোয়াই তাদের নেই। আল্লাহর পালিত বান্দা হবার কারণে জন্মগতভাবে প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর সাথে যে অংগীকারে

১০৩. তারপর আমরা তাদের পরে মূসাকে আমাদের নিদর্শনসহ ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছি; কিন্তু তারা সেগুলোর সাথে অত্যাচার করেছে[১]। সুতরাং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য করুন।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. আর মূসা বললেন, 'হে ফির'আউন[২]!

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ

আবদ্ধ, তা প্রতিপালনের কোন পরোয়াই তাদের নেই। তারা সামাজিক অংগীকার পালনেরও কোন পরোয়া করে না, মানব সমাজের একজন সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তি যার সাথে একটি সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ অন্যদিকে নিজের বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তগুলোতে অথবা কোন সদিচ্ছা ও মহৎ বাসনা পোষণের মুহূর্তে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর সাথে যে অংগীকারে আবদ্ধ হয়, তাও তারা পালন করে না। এ ধরনের অংগীকার ভঙ্গ করাকে এখানে ফাসেকী বলা হয়েছে। [সা'দী] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে অঙ্গীকার বলে সে অঙ্গীকারই উদ্দেশ্য যা আল্লাহ্ তা'আলা আদমের পিঠে মানুষ থেকে নিয়েছিলেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) আল্লাহ্‌র আয়াত বা নিদর্শনের প্রতি যুলুম করার অর্থ হল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত বা নিদর্শনের কোন মর্যাদা বুঝেনি। সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরী অবলম্বন করেছে। কারণ যুলুমের প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে- কোন বস্তু বা বিষয়কে তার সঠিক স্থান কিংবা সঠিক সময়ের বিপরীতে ব্যবহার করা। সে হিসেবে ফির'আউন মূসা আলাইহিস সালাম যে সমস্ত নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন সেগুলোর সাথে যুলুম করেছিল। অন্য আয়াতে সে যুলুমের ব্যাখ্যা এসেছে, "আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিল" [সূরা আন-নামল:১৪] সুতরাং তারা সত্য জেনেও সেগুলোকে যুলুমবশতঃ অস্বীকার করেছিল। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) মিসরীয় শাসকরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর প্রত্যেকটি শাসক নিজেদের জন্য "ফির'আউন" (ফারাও) উপাধি গ্রহণ করে দেশবাসীর সামনে একথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে যে, আমি-ই তোমাদের প্রধান রব বা মহাদেব। পরবর্তীতে ফির'আউন শব্দটি অহংকারী দাম্ভিক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। কেউ যদি অহংকারী ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে তখন বলা হয়, تَفَرْعَنَ فُلَانٌ বা অমুক দাম্ভিকতা, অহংকার ও সীমালঙ্ঘনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। [কাশশাফ] কোন কোন মুফাসসির বলেন, প্রত্যেক চক্রান্তকারী ও ষড়যন্ত্রকারীকে تَفَرْعَنَ বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর]

الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে প্রেরিত।'

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. 'এটা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া বলব না। তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আমি তোমাদের কাছে এসেছি, কাজেই বনী ইস্রাঈলকে তুমি আমার সাথে পাঠিয়ে দাও[১]।'

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. ফির'আউন বলল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাক, তবে তুমি সত্যবাদী হলে তা পেশ কর।'

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭. অতঃপর মূসা তাঁর হাতের লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং সাথে সাথেই তা এক অজগর সাপে পরিণত হল[২]।

---

(১) মুসা আলাইহিস সালামকে দু'টি জিনিসের দাওয়াত সহকারে ফেরাউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এক, আল্লাহর বন্দেগী তথা ইসলাম গ্রহণ করো। দুই, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়, যারা আগে থেকেই মুসলিম ছিল, তাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। কুরআনের কোথাও এ দু'টি দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এক সাথে আবার কোথাও স্থান-কাল বিশেষে আলাদা আলাদাভাবে এদের উল্লেখ এসেছে।

(২) সারকথা, আমার কথার উপর তোমাদের বিশ্বাস এজন্য স্থাপন করা কর্তব্য যে, আমার সত্যতা তোমাদের সবার সামনে ভাস্কর; আমি কখনো মিথ্যা বলিওনি বলতে পারিও না। কারণ নবী-রাসূলগণ খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত নিষ্পাপ। তাছাড়া শুধুমাত্র তাই নয় যে, আমি কখনো মিথ্যা বলিনি; বরং আমার দাবীর সপক্ষে আমার মু'জিযাসমূহ প্রমাণ হিসাবে রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তোমরা আমার কথা শুন এবং আমার কথা মান। বনী-ইস্রাঈলকে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমার সাথে দিয়ে দাও। কিন্তু ফির'আউন অন্য কোন কথাই লক্ষ্য করল না; মু'জিযা দেখবার দাবী করতে লাগল এবং বললঃ বাস্তবিকই যদি তুমি কোন মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।
মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তার দাবী মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন, আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল। 'সূ'বান' বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। আর তার গুণবাচক 'মুবীন' শব্দ উল্লেখ করে বলে দেয়া

১০৮. এবং তিনি তাঁর হাত বের করলেন[১] আর সাথে সাথেই তা দর্শকদের কাছে শুভ্র উজ্জ্বল দেখাতে লাগল[২]।

وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ ۝١٠٨

চৌদ্দতম রুকূ'

১০৯. ফির'আউন সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, 'এ তো একজন সুদক্ষ জাদুকর[৩],'

قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ۝١٠٩

হয়েছে যে, সে লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোন ঘটনা ছিল না যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটে থাকবে যা কেউ দেখে থাকবে, কেউ দেখবে না। সাধারণতঃ যা জাদুকরদের বেলায় ঘটে থাকে। বরং এ ঘটনাটি সংঘটিত হল প্রকাশ্য দরবারে সবার সামনে।

(১) نزع অর্থ হচ্ছে কোন একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভেতর থেকে কিছুটা বল প্রয়োগের মাধ্যমে বের করা। অর্থাৎ নিজের হাতটিকে টেনে বের করলেন। এখানে কিসের ভেতর থেকে বের করলেন তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে দু'টি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এক স্থানে এসেছে স্বীয় হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচ থেকে অর্থাৎ কখনো গলাবন্ধর ভিতরে ঢুকিয়ে তা বের করলে আবার কখনো বগল-তলে দাবিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলে এ মু'জিযা প্রকাশ পেত অর্থাৎ সে হাতটি দর্শকদের সামনে প্রদীপ্ত হতে থাকত।

(২) তখন ফির'আউনের দাবীতে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম দু'টি মু'জিযা প্রদর্শন করেছিলেন। একটি হল লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া আর অপরটি হল হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে দাবিয়ে বের করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মু'জিযাটি ছিল বিরোধীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য আর দ্বিতীয়টি তাদেরকে আকৃষ্ট করে আনার উদ্দেশ্যে। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের শিক্ষায় হেদায়াতের জ্যোতি রয়েছে আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ।

(৩) ملأ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোন সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবর্গকে বুঝানোর জন্য। অর্থ হচ্ছে, ফির'আউন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসব মু'জিযা দেখে তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললঃ এ যে বড় পারদর্শী জাদুকর। তার কারণ প্রত্যেকের চিন্তা তার নিজ যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে। সে হতভাগারা আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কুদরাত ও মহিমা সম্পর্কে কি বুঝবে, যারা জীবনভর ফির'আউনকে 'রব' আর জাদুকরদেরকে নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করেছে এবং জাদুকরদের ভোজবাজীই দেখে এসেছে। কাজেই তারা এহেন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর এছাড়া আর কিইবা বলতে পারত যে, এটা একটা মহাজাদু। কিন্তু তারাও এখানে ساحر এর সাথে عليم শব্দটি যোগ করে একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মু'জিযা সম্পর্কে তাদের মনেও এ অনুভূতি জন্মেছিল যে, এ কাজটি সাধারণ জাদুকরদের

১১০. 'এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও[১]?'

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

১১১. তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও[২],'

قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿١١١﴾

কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। এজন্যই স্বীকার করে নিয়েছে যে, তিনি বড়ই বিজ্ঞ জাদুকর।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বযুগেই নবী- রাসূলগণের মু'জিযাসমূহকে এমনি ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, দর্শকবৃন্দ যদি সামান্যও চিন্তা করে আর হঠকারীতা অবলম্বন না করে তাহলে মু'জিযা ও জাদুর মাঝে যে পার্থক্য তা নিজেরাই বুঝতে পারে। জাদুকররা সাধারণতঃ অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকে। পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা যত বেশী হবে তাদের জাদুও তত বেশী কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হল নবী-রাসূলগণের সহজাত অভ্যাস। তাছাড়া মু'জিযা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার কুদরাতের কাজ। তাই কুরআনুল কারীমে এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন ﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾ "এবং আল্লাহ্ তা'আলাই সে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন"। [সূরা আল-আনফাল:১৭]

সারমর্ম এই যে, ফির'আউনের সম্প্রদায়ও মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মু'জিযাকে নিজেদের জাদুকরদের কার্যকলাপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্রই মনে করেছিল। সেজন্যই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ তো বড় বিজ্ঞ জাদুকর, সাধারণ জাদুকররা যে এমন কাজ দেখাতে পারে না।

(১) এ আয়াতগুলোতে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের অবশিষ্ট কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে যে, ফির'আউন যখন মূসা 'আলাইহিস্ সালামের প্রকৃষ্ট মু'জিযা দেখল; লাঠি মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং আবার যখন সেটাকে হাতে ধরলেন, তখন পুনরায় তা লাঠি হয়ে গেল। আর হাতকে যখন গলাবন্ধের ভিতরে দাবিয়ে বের করলেন তখন তা প্রদীপ্ত হয়ে চকমক করতে লাগল। এ আসমানী নিদর্শনের যৌক্তিক দাবী ছিল মূসা 'আলাইহিস্ সালামের উপর ঈমান নিয়ে আসা। কিন্তু ভ্রান্তবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর মিথ্যার শিরোনাম লাগিয়ে থাকে, ফির'আউন এবং তার সম্প্রদায়ের নেতারাও তাই করল। বললঃ তিনি বড় বিজ্ঞ জাদুকর এবং তার উদ্দেশ্য হল তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদেরকে বের করে দেয়া। কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত?

(২) সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, ইনি যদি জাদুকর হয়ে থাকেন এবং জাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তার মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾

১১২. 'যেন তারা তোমার কাছে প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকর উপস্থিত করে।'

وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا۟ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿١١٣﴾

১১৩. জাদুকররা ফির'আউনের কাছে এসে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো[১]?'

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. সে বলল, 'হ্যাঁ এবং তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

মোটেই কঠিন নয়। আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ জাদুকর রয়েছে; যারা তাকে জাদুর দ্বারা পরাভূত করে দেবে। কাজেই কিছু সৈন্য-সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন। তারা সব শহর থেকে জাদুকরদেরকে ডেকে নিয়ে আসবে। তখন জাদু মন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর জাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর মূসা 'আলাইহিস্ সালামকেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মু'জিযা এজন্যই দেয়া হয়েছিল যাতে জাদুকরদের সাথে তার প্রতিদ্বন্দিতা হয় এবং মু'জিযার মোকাবেলায় জাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার রীতিও ছিল তাই। প্রত্যেক যুগের নবী-রাসূলকেই তিনি সে যুগের জনগণের কাছে বহুল প্রচলিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত মু'জিযা দান করেছেন। ঈসা আলাইহিস্সালামের যামানায় চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের চরম শিখরে ছিল, সেহেতু তাকে মু'জিযা দেয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেয়া এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে সুস্থ করে তোলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আরবে অলংকার শাস্ত্র ও বাগ্মীতার চরম উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মু'জিযা হল কুরআন, যার মোকাবেলায় গোটা আরব-আজম অসমর্থ হয়ে পড়ে।

(১) ফির'আউনের জাদুকররা প্রথমে এসেই মজুরী নিয়ে দরকষাকষি করতে শুরু করল। তার কারণ যারা ভ্রান্তবাদী পার্থিব লাভই হল তাদের মূখ্য। কাজেই যেকোন কাজ করার পূর্বে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের প্রশ্ন। অথচ নবী-রাসূলগণ এবং তাদের যারা নায়েব বা প্রতিনিধি তারা প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করেনঃ "আমরা যে সত্যের বাণী তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদেরকে পৌঁছে দেই তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান কামনা করি না। বরং আমাদের প্রতিদানের দায়িত্ব শুধু আল্লাহ্র উপরই রয়েছে"। [সূরা আস-শু'আরাঃ ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০] ফির'আউন তাদেরকে বললঃ তোমরা পারিশ্রমিক চাইছ? আমি পারিশ্রমিক তো দেবই আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরকে শাহী দরবারের ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত করে নেব।

১১৫. তারা বলল, 'হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করব(১)?'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৬. তিনি বললেন, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর'। যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকদের চোখে জাদু করল, তাদেরকে আতংকিত করল এবং তারা এক বড় রকমের জাদু নিয়ে এল(২)।

قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾

১১৭. আর আমরা মূসার কাছে ওহী পাঠালাম যে, 'আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন'(৩)। সাথে সাথে সেটা তারা

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾

(১) অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যখন মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন জাদুকররা মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে বললঃ হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপ করি। সম্ভবত তারা নিজেদের নিশ্চয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্যই তা বলেছিল। উদ্দেশ্য যেন এই যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন পরোয়াই নেই, যে ইচ্ছা প্রথমে তার কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করুক। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিয়ে নিজের মু'জিযা সম্পর্কে আশ্বস্ততার দরুন প্রথম তাদেরকেই সুযোগ দিলেন। বললেন, "তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর"। কারণ, তাদের কর্মকাণ্ডের পর মু'জিযা বের হলে সেটা তাদের অন্তরে কঠোরভাবে রেখাপাত করতে বাধ্য হবে। [ইবন কাসীর; সা'দী]

(২) অর্থাৎ জাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নযরবন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে দিল এবং মহাজাদু দেখাল। এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের জাদু ছিল এক প্রকার নযরবন্দী যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এই লাঠি আর দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল তেমনি লাঠি ও দড়ি যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সম্মোহনী, যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়। [ইবন কাসীর] কিন্তু তাই বলে এ কথা প্রতীয়মান হয় না যে, জাদু এ প্রকারেই সীমাবদ্ধ। বরং জাদুর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। প্রত্যেক প্রকার অনুসারে শরী'আতে তার বিধানও ভিন্ন হয়ে থাকে।

(৩) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জাদুকরদের বিপরীতে মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে কিভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে বলেনঃ আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম যে, আপনার লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিন। তা মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড়

যে অলীক বস্তু বানিয়েছিল তা গিলে ফেলতে লাগল;

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা বাতিল হয়ে গেল। فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾

১১৯. সুতরাং সেখানে তারা পরাভূত হল ও লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল, فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২০. এবং জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হল। وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১. তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম সৃষ্টিকুলের রবের প্রতি'। قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২২. 'মূসা ও হারূনের রব।' رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. ফির'আউন বলল, 'কি! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগে তোমরা তাতে ঈমান আনলে? এটা তো এক চক্রান্ত; তোমরা এ চক্রান্ত করেছ নগরবাসীদেরকে এখান থেকে বের করে দেয়ার জন্য[১]। সুতরাং قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾

সাপ হয়ে সমস্ত সাপগুলোকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো জাদুকররা জাদুর দ্বারা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু মূসা 'আলাইহিস্ সালামের লাঠি যখন এক বিরাট আযদাহা বা অজগরের আকার ধারণ করে এল তখন সে সবগুলোকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেলল।

(১) অর্থাৎ এটা একটা ষড়যন্ত্র যা তোমরা প্রতিদ্বন্দিতার মাঠে আসার পূর্বেই শহরের ভেতরে নিজেদের মধ্যে স্থির করে রেখেছিল। তারপর জাদুকরদেরকে লক্ষ্য করে বললঃ তোমরা কি আমার অনুমতির পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে ফেললে। অস্বীকৃতিবাচক এই কৈফিয়তটি ছিল হুমকি ও তাম্বীহ্‌স্বরূপ। স্বীয় অনুমতির পূর্বে ঈমান আনার কথা বলে লোকেদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল যে, আমারো কাম্য ছিল যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি প্রতীয়মান হয়ে যায় তাহলে আমিও তাকে মেনে নেব এবং লোকদেরও মুসলিম হওয়ার জন্য অনুমতি দান করব। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করলে এবং প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে-শুনেই একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেলে।

এই চাতুর্যের মাধ্যমে একদিকে লোকের সামনে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মু'জিযা

তোমরা শীঘ্রই এর পরিণাম জানতে পারবে ।

১২৪. 'অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে টুকরো করে ফেলব; তারপর অবশ্যই তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব[১] ।'

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾

১২৫. তারা বলল, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের কাছেই ফিরে যাব;'

قَالُوٓا۟ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৬. 'আর তুমি তো আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছ শুধু এ জন্যে যে, আমরা আমাদের রবের নিদর্শনে ঈমান এনেছি যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের রব! আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিমরূপে আমাদেরকে মৃত্যু দিন ।'

وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾

আর জাদুকরদের স্বীকৃতিকে একটা ষড়যন্ত্র সাব্যস্ত করে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করল। অপরদিকে রাজনৈতিক চালাকীটি করল এই যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের কার্যকলাপ এবং জাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ একান্তই একটা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বলল, "তোমরা এই ষড়যন্ত্র এ জন্য করেছ যে তোমরা মিসর দেশের উপর জয়লাভ করে এ দেশের অধিবাসীদেরকে এখান থেকে বহিস্কার করতে চাও"। অথচ মূসা 'আলাইহিস্ সালামের কার্যকলাপ এবং জাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ ফির'আউনের পথভ্রষ্টতাকে পরিস্কার করে তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল, জাতি ও জনসাধারনের সাথে যার কোন সম্পর্কই ছিল না।

(১) ফির'আউন মূল বিষয়টাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার মত চালাকীর পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক এবং সরকারের প্রভাব ও ভীতি সঞ্চার করার জন্য জাদুকরদের হুমকি দিতে আরম্ভ করল। প্রথমে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বলল, "তোমাদের যে কি পরিণতি, তোমরা এখনই দেখতে পাবে" অতঃপর তা পরিস্কারভাবে বলল, "আমি তোমাদের সবার বিপরীত দিকের হাত-পা কেটে তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়াব"। বিপরীত দিকের কাটা অর্থ হল ডান হাত, বাম পা। যাতে উভয় পার্শ্বে জখমী হয়ে বেকার হয়ে পড়বে।

পনরতম রুকূ‘

১২৭. আর ফির‘আউন সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, ‘আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে[১] বর্জন করতে দেবেন?’ সে বলল, ‘শীঘ্রই আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব। আর নিশ্চয় আমরা তাদের উপর শক্তিধর[২]।’

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৮. মূসা তার সম্প্রদায়কে বললেন, ‘আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধর; নিশ্চয় যমীন আল্লাহ্‌রই। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

---

(১) এ কালেমায় দু’টি কেরাআত আছে, (এক) وآلهتك অর্থাৎ আপনার মা‘বুদদেরকে। তখন এর অর্থ হবেঃ ফির‘আউন নিজে ইলাহ হওয়ার দাবী করলেও তার আরও কিছু মা‘বুদ ছিল। তার জাতির নেতা শ্রেণীর লোকেরা বলতে লাগল যে, কিভাবে এরা আপনাকে এবং আপনার মা‘বুদদের ইবাদত ত্যাগ করার মত দুঃসাহস দেখাতে পারে? (দুই) وإلاهتك অর্থাৎ আপনার ইবাদতকে। তখন এর অর্থ হবেঃ ফির‘আউন আর কোন মা‘বুদের ইবাদত করত না, বরং তার জাতির নেতা গোছের লোকেরা তাকে এ বলে উস্কাতে লাগল যে, তাদের কেমন সাহস যে, তারা আপনার ইবাদতকে ত্যাগ করতে পারে? [তাবারী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) ফির‘আউনের সভাষদ নেতা গোছের লোকেরা ফির‘আউনকে বলল যে, তাহলে কি তুমি মূসা এবং তার সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দেবে, যাতে তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদেরকে পরিহার করে দেশময় দাঙ্গা-ফাসাদ করতে থাকবে? এতে বাধ্য হয়ে ফির‘আউন বললঃ তার বিষয়টি আমাদের পক্ষে তেমন চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নেব যে, তাদের মধ্যে কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব শুধু কন্যা-সন্তানদের বাঁচতে দেব। যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে; থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী। তাছাড়া তাদের উপর তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছেই; যা ইচ্ছা তাই করব। এরা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

ওয়ারিশ বানান। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই[১]।'

১২৯. তারা বলল, 'আপনি আমাদের কাছে আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনি আসার পরও।' তিনি বললেন, 'শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে যমীনে স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারপর তোমরা কি কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন।'

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٩﴾

ষোলতম রুকূ'

১৩০. আর অবশ্যই আমরা ফির'আউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১. অতঃপর যখন তাদের কাছে কোন কল্যাণ আসত, তখন তারা বলত, 'এটা আমাদের পাওনা।' আর যখন কোন অকল্যাণ পৌঁছত তখন তারা মূসা ও তার সাথীদেরকে

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾

(১) ফির'আউন মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে বনী-ইস্‌রাঈলের ছেলেদেরকে হত্যা করে মেয়েদেরকে জীবিত রাখার আইন তৈরী করে দিল। এতে বনী-ইস্‌রাঈলরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের জন্মের পূর্বে ফির'আউন তাদের উপর যে আযাব চাপিয়ে দিয়েছিল তা আবার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন তা উপলব্ধি করলেন, তখন একান্তই রাসূলজনোচিত সোহাগ ও দর্শনানুযায়ী সে বিপদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাদেরকে দু'টি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। (এক) শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা এবং (দুই) কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্য ধারণ। সেই সঙ্গে একথাও বাতলে দিলেন যে, এই ব্যবস্থা যদি অবলম্বন করতে পার, তাহলে এ দেশ তোমাদের, তোমরাই জয়ী হবে। আর একথা নিশ্চিত যে, শেষ পর্যন্ত মুত্তাকীরাই কৃতকার্যতা লাভ করে থাকে।

অলক্ষুণে[১] গণ্য করত। সাবধান! তাদের অকল্যাণ তো কেবল আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে; কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না।

১৩২. আর তারা বলত, আমাদেরকে জাদু করার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের কাছে পেশ কর না কেন, আমরা তোমার উপর ঈমান আনব না।'

وَقَالُوا۟ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩. অতঃপর আমরা তাদের উপর তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত বিস্তারিত নিদর্শন হিসেবে প্রেরণ করি। এরপরও তারা অহংকার করল। আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়[২]।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَٰتٍ مُّفَصَّلَٰتٍ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾

(১) কুলক্ষণ নেয়া কাফের মুশরিকদেরই কাজ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কুলক্ষণ নেয়া শির্ক'। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৮৯] যুগে যুগে মুশরিকরা ঈমানদারদেরকে কুলক্ষণে, অপয়া ইত্যাদি বলে অভিহিত করত।

(২) ফির'আউনের জাদুকরদের সাথে সংঘটিত সে ঐতিহাসিক ঘটনার পরও মূসা 'আলাইহিস্ সালাম দীর্ঘ দিন যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী শুনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। এ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে নয়টি নিদর্শন দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফির'আউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্য পথে আনা। আলোচ্য আয়াতে এই নয়টি নিদর্শন সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

এই নয়টি নিদর্শনের মধ্যে প্রথম দু'টি অর্থাৎ লাঠির সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের শুভ্রতা ফির'আউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। আর এগুলোর মাধ্যমেই জাদুকরদের বিরুদ্ধে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম জয়লাভ করেন। তারপরের একটি নিদর্শন যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে তা ছিল ফির'আউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন। যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভের দো'আ করায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ তো মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يٰمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. আর যখন তাদের উপর শাস্তি আসত তারা বলত, 'হে মূসা! তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সাথে তিনি যে অংগীকার করেছেন সে অনুযায়ী; যদি তুমি আমাদের থেকে শাস্তি দূর করে দিতে পার তবে আমরা তো তোমার উপর ঈমান আনবই এবং বনী ইস্‌রাঈলকেও তোমার সাথে অবশ্যই যেতে দেব ।'

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلٰٓى أَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. আমরা যখনই তাদের উপর থেকে শাস্তি[১] দূর করে দিতাম এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অংগীকার ভংগ করত ।

আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে, তা হল আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি । এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য । তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে আরো ছয়টি এমন নিদর্শন দেন যার উদ্দেশ্য ছিল ফির'আউনের সম্প্রদায়কে সৎপথে নিয়ে আসা । আল্লাহ্ বলেনঃ অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি তুফান, পঙ্গপাল, ঘুন পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত । এতে ফির'আউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আযাবের কথা আলোচিত হয়েছে । এসব আযাবে অসহ্য হয়ে সবাই মূসা 'আলাইহিস্ সালামের কাছে পাকাপাকি ওয়াদা করল যে, তারা এ সমস্ত আযাব থেকে মুক্তি পেলে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের উপর ঈমান আনবে । মূসা 'আলাইহিস্ সালাম দো'আ করলেন, ফলে তারা এ সমস্ত আযাব থেকে মুক্তি পেল । কিন্তু যে জাতির উপর আল্লাহ্‌র আযাব চেপে থাকে, তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোন কাজই করে না । কাজেই এ ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং ঈমান আনতে অস্বীকার করল ।

(১) এখানে শাস্তি বলে মহামারী জাতীয় কিছু বুঝানো হয়েছে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মহামারী এমন একটি শাস্তি যা আল্লাহ্ বনী ইস্‌রাঈলের উপর পাঠিয়েছিলেন । সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোথাও তা বিদ্যমান তখন তোমরা সেখানে যেও না । আর যদি মহামারী এলাকায় তোমরা থাক, তবে সেখান থেকে পালানোর জন্য বের হয়ো না । [বুখারীঃ ৬৯৭৪, মুসলিমঃ ২২১৮]

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. কাজেই আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছি। কারণ তারা আমাদের নিদর্শনকে অস্বীকার করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল।

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে আমরা আমাদের কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি[১]; এবং বনী ইস্‌রাঈল সম্বন্ধে আপনার রবের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হল, যেহেতু তারা ধৈর্য ধরেছিল, আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি।

---

(১) বলা হয়েছেঃ "যে জাতিকে দুর্বল ও হীন বলে মনে করা হত, তাদেরকে আমি সে ভূমির উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি বানিয়ে দিয়েছি, যাতে আমি রেখেছি বরকত বা আশীর্বাদ।" কুরআনের শব্দগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে "যে জাতিকে ফির'আউনের সম্প্রদায় দুর্বল ও হীন মনে করেছিল" বলা হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, "যে জাতি দুর্বল ও হীন ছিল।" এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে জাতির সহায়তায় থাকেন প্রকৃতপক্ষে তারা কখনো দুর্বল হয় না। যদিও কোন সময় তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যান্য লোক ধোঁকায় পড়ে যায় এবং তাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে বসে। কিন্তু শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে সবাই দেখতে পায় যে, তারা মোটেই দুর্বল ও হীন ছিল না। কারণ, প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌রই হাতে।

আর যমীনের মালিক বানিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে وَأَوْرَثْنَا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। مَشَارِقَ শব্দটি مَشْرِقٌ এর বহুবচন। আর مَغَارِب হচ্ছে مَغْرِبٌ এর বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়াস্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে 'মাশারিক' বা উদয়াচলসমূহ এবং 'মাগারিব' বা অস্তাচলসমূহ বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও যমীন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনের মতে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে- যাতে আল্লাহ্ তা'আলা কওমে-ফির'আউন ও কওমে-আমালেকাকে ধ্বংস করার পর বনী-ইস্‌রাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন। [ইবন কাসীর; সা'দী]

১৩৮. আর আমরা বনী ইস্‌রাঈলকে সাগর পার করিয়ে দেই; তারপর তারা মূর্তিপূজায় রত এক জাতির কাছে উপস্থিত হয়। তারা বলল, 'হে মূসা! তাদের মা'বুদদের ন্যায় আমাদের জন্যও একজন মা'বুদ স্থির করে দাও(১)। তিনি বললেন, 'তোমরা তো এক জাহিল সম্প্রদায়।'

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۗ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯. 'এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো বিধ্বস্ত করা হবে এবং তারা যা করছে তাও অমূলক।'

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০. তিনি আরো বললেন, 'আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ্ খোঁজ করব অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?'

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪১. আর স্মরণ কর, যখন আমরা তোমাদেরকে ফির'আউনের

وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ

(১) বনী ইসরাঈলদের মত অবস্থা এ উম্মতের মধ্যে ঘটেছে এবং নিত্য ঘটছে। এ উম্মাতের মধ্যেও কিছু না বুঝে না শুনে অন্যান্য জাতির অনুকরণে শির্ক ও কুফরী করার মানসিকতা রয়ে গেছে। আবু ওয়াকিদ আল-লাইসি বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীসে এসেছে, আবু ওয়াকিদ বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুনাইনের দিকে এক যুদ্ধে বের হলাম। আমরা একটা বরই গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহর নবী! আমাদের জন্য এ গাছটিকে লটকানোর জন্য নির্ধারিত করে দিন যেমনটি নির্ধারিত রয়েছে কাফেরদের জন্য। কারণ কাফেরদের একটি বরই গাছ ছিল যাতে তারা তাদের হাতিয়ার লটকিয়ে রাখত এবং তার চতুষ্পার্শ ঘিরে বসত। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহু আকবার! এটা তো এমন যেমন বনী ইসরাঈল মূসাকে বলেছিলঃ "তাদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে আমাদের জন্যও তেমন উপাস্য নির্ধারিত করে দিন"। অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে'। [তিরমিযীঃ ২১৮০, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২১৮, ইবন হিব্বানঃ ৬৭০২]

الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

অনুসারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তারা তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; এতে ছিল তোমাদের রবের এক মহাপরীক্ষা[১]।

(১) অর্থাৎ আমরা বনী-ইস্‌রাঈলকে সাগর পার করে দিয়েছি। ফির'আউন সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় বনী-ইস্‌রাঈলের যে অলৌকিক কৃতকার্যতা ও প্রশান্তি লাভ হয়, তার সে প্রতিক্রিয়াই হয়েছে যা সাধারণতঃ প্রাচুর্য আসার পর বস্তুবাদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ তারাও ভোগবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করল। ঘটনাটি হল এই যে, এই জাতি মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মু'জিযা বলে সদ্য লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল এবং গোটা ফির'আউন সম্প্রদায়ের সাগরে ডুবে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও একটু অগ্রসর হতেই তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর বাসভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। এই দেখে বনী ইস্‌রাঈলেরও তাদের সেসব রীতি-নীতি পছন্দ হতে লাগল। তাই মূসা 'আলাইহিস্ সালামের নিকট আবেদন জানাল, এসব লোকের যেমন বহু উপাস্য রয়েছে, আপনি আমাদের জন্যও এমনি ধরণের কোন একটা উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা একটা দৃষ্ট বস্তুকে সামনে রেখে ইবাদাত করতে পারি, আল্লাহ্‌র সত্তা তো আর সামনে আসে না। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বললেন, "তোমাদের মধ্যে বড়ই মূর্খতা রয়েছে"। যাদের রীতি-নীতি তোমরা পছন্দ করছ, তাদের সমস্ত আমল তো বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে। এরা মিথ্যার অনুগামী। তাদের এসব ভ্রান্ত রীতি-নীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য বানিয়ে দেব? অথচ তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়াবাসীর উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। কারণ, তখন মূসা 'আলাইহিস্ সালামের উপর যারা ঈমান এনেছিল, তারাই ছিল অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন ও উত্তম। অতঃপর বনী-ইস্‌রাঈলকে তাদের বিগত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, ফির'আউনের কওমের হাতে তারা এমনই নির্যাতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করে নারীদেরকে অব্যাহতি দেয়া হত সেবাদাসী বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ মূসা 'আলাইহিস্ সালামের বদৌলতে এবং তার দো'আর বরকতে তাদেরকে সে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই অনুগ্রহের প্রভাব কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই রাব্বুল 'আলামীনের সাথে দুনিয়ার নিকৃষ্টতম পাথরকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। এযে মহা যুলুম। এই থেকে তাওবাহ্ কর।

وَوٰعَدۡنَا مُوۡسٰی ثَلٰثِیۡنَ لَیۡلَۃً وَّاَتۡمَمۡنٰهَا بِعَشۡرٍ فَتَمَّ مِیۡقَاتُ رَبِّهٖۤ اَرۡبَعِیۡنَ لَیۡلَۃً ۚ وَقَالَ مُوۡسٰی لِاَخِیۡهِ هٰرُوۡنَ اخۡلُفۡنِیۡ فِیۡ قَوۡمِیۡ وَاَصۡلِحۡ وَلَا تَتَّبِعۡ سَبِیۡلَ الۡمُفۡسِدِیۡنَ ﴿۱۴۲﴾

সতেরতম রুকূ'

১৪২. আর মূসার জন্য আমরা ত্রিশ রাতের ওয়াদা করি[১] এবং আরো দশ দিয়ে তা পূর্ণ করি। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতে[২] পূর্ণ হয়। এবং মূসা তার ভাই হারূনকে বললেন, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনি আমার প্রতিনিধিত্ব করবেন, সংশোধন করবেন আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না[৩]।

---

(১) وَاعَدْنَا শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল দু'পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দান করা। এখানেও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ছিল তাওরাত দানের প্রতিশ্রুতি আর মূসা 'আলাইহিস্ সালামের পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত এবং এ'তেকাফের প্রতিজ্ঞা। কাজেই وَوَعَدْنَا না বলে وَوَاعَدْنَا বলা হয়েছে। ওয়াদার তাৎপর্য হল, কাউকে লাভজনক কোন কিছু দেয়ার পূর্বে তা প্রকাশ করে দেয়া যে, তোমার জন্য অমুক কাজ করব। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি স্বীয় কিতাব নাযিল করার ওয়াদা করেছেন এবং সেজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ত্রিশ রাত্রি তূর পর্বতে আল্লাহ্‌র ইবাদাতে অতিবাহিত করবেন। অতঃপর এই ত্রিশ রাত্রির উপর আরো দশ রাত্রি বাড়িয়ে চল্লিশ রাত্রি করে দিয়েছেন।

(২) এখান থেকে একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, নবী-রাসূলগণের শরী'আতে তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ, এ আয়াতে ত্রিশ দিনের ক্ষেত্রে ত্রিশ রাত্রি আর চল্লিশ দিনের ক্ষেত্রে চল্লিশ রাত্রি উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ সৌর হিসাব পার্থিব লাভের জন্য, আর চান্দ্র হিসাব হলো ইবাদতের জন্য। [কুরতুবী]

(৩) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা অনুসারে তূর পর্বতে গিয়ে যখন এ'তেকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় ভাই হারূন 'আলাইহিস্ সালামকে বললেনঃ "আমার অবর্তমানে আপনি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করুন।" এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন তবে প্রয়োজনবোধে কোথাও যেতে হলে সে কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য কোন লোক নিয়োগ করে যাওয়া উত্তম। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কখনো যদি তাকে মদীনার বাইরে যেতে হত, তখন তিনি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। একবার তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে

১৪৩. আর মূসা যখন আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন(১), তখন তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে দর্শন দান করুন, আমি আপনাকে দেখব'। তিনি বললেন, 'আপনি আমাকে

وَلَمَّا جَآءَ مُوسٰى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرٰىنِي وَلٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ

প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন এবং একবার আব্দুল্লাহ্ ইবন উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে খলীফা নিযুক্ত করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমকে মদীনায় খলীফা নিযুক্ত করে তিনি বাইরে যেতেন। [কুরতুবী]

মূসা 'আলাইহিস্ সালাম হারূন 'আলাইহিস্ সালামকে খলীফা নিযুক্ত করার সময় তাকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে,কাজের সুবিধার জন্য প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে যেতে হয়। এই হেদায়াত বা নির্দেশাবলীর মধ্যে প্রথম নির্দেশ হল وَأَصْلِحْ এখানে أَصْلِحْ এর কোন 'কর্ম' উল্লেখ করা হয়নি যে, কার ইসলাহ্ বা সংশোধন করা হবে। এতে বুঝা যায় যে, নিজেরও ইসলাহ্ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সম্প্রদায়েরও ইসলাহ্ করবেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামাজনিত কোন বিষয় আঁচ করতে পারলে তাদেরকে সরল পথে আনয়নের চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় হেদায়াত হল এই যে, ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ অর্থাৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না। বলাবাহুল্য, হারূন 'আলাইহিস্ সালাম হলেন আল্লাহ্‌র নবী, তার নিজের পক্ষে ফাসাদে পতিত হওয়ার কোন আশংকাই ছিল না। কাজেই এই হেদায়াতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোন সাহায্য-সহায়তা করবেন না। সুতরাং হারূন 'আলাইহিস্ সালাম যখন দেখলেন, তার সম্প্রদায় 'সামেরী'-এর অনুগমন করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন তার সম্প্রদায়কে এহেন ভণ্ডামী থেকে বাধা দান করলেন এবং সামেরীকে সে জন্য শাসালেন। অতঃপর ফিরে এসে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন ধারণা করলেন যে, হারূন 'আলাইহিস্ সালাম আমার অবর্তমানে কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন, তখন তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করলেন।

(১) কুরআনের প্রকৃষ্ট শব্দের দ্বারাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সাথে কথা বলেছেন। তাঁর এ কালাম দ্বারা উদ্দেশ্য প্রথমতঃ সেসব কালাম যা নবুওয়াত দানকালে হয়েছিল। আর দ্বিতীয়তঃ সেসব কালাম যা তাওরাত দানকালে হয়েছিল এবং যার আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের কথা বলা হক ও বাস্তব। এতে বিশ্বাস করতেই হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ 'কথা বলা' সাব্যস্ত হচ্ছে। [দেখুন, সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াসসুন্নাহ্, ২১৬-২১৯]

إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾

দেখতে পাবেন না[১]। আপনি বরং পাহাড়ের দিকেই তাকিয়ে দেখুন[২], সেটা যদি নিজের জায়গায় স্থির থাকে তবে আপনি আমাকে দেখতে পাবেন।' যখন তাঁর রব পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন[৩] তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন[৪]। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে

(১) দর্শন যদিও অসম্ভব নয়, কিন্তু যার প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বর্তমান অবস্থায় তা সহ্য করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে দর্শন যদি আদৌ সম্ভব না হত, তাহলে ﴿لَن تَرَانِي﴾ না বলে বলা হত لَنْ أُرَى "আমার দর্শন হতে পারে না।" এতে প্রমাণিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সংঘটনের অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর এটাই হল অধিকাংশ আহ্‌লে সুন্নাহ্‌র মত যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দীদার বা দর্শন লাভ যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। যেমন হাদীসে রয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার রবকে দেখতে পারবে না।' [মুসলিমঃ ২৯৩১, আবু দাউদঃ ৪৩২০, ইবন মাজাহ্‌ঃ ৪০৭৭] এ ব্যাপারে সূরা আল-আন'আমের ১০নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থায় দর্শক আল্লাহ্‌র দর্শন সহ্য করতে পারবে না বলেই পাহাড়ের উপর যৎসামান্য ছটা বিকিরণ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাও আপনার পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর নয়; মানুষ তো একান্ত দুর্বলচিত্ত সৃষ্টি; সে তা কেমন করে সহ্য করবে?

(৩) আরবী অভিধানে تَجَلَّى অর্থ প্রকাশিত ও বিকশিত হওয়া। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাথায় বৃদ্ধাঙ্গুলিটি রেখে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার এতটুকু অংশই শুধু প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে পাহাড় পর্যন্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য এতে গোটা পাহাড়ই যে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেতে হবে তা অপরিহার্য নয়; বরং পাহাড়ের যে অংশে আল্লাহ্‌র তাজাল্লী বিচ্ছুরিত হয়েছিল, সে অংশটিই হয়ত প্রভাবিত হয়ে থাকবে। [আহমাদঃ ৩/১২৫, তিরমিযীঃ ৩০৭৪, হাকেমঃ ২/৩২০]

(৪) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলায় তার পুরস্কারস্বরূপ হাশরের মাঠে তাকে প্রথম সচেতন হিসাবে দেখা যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কেয়ামতের মাঠে মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে, আমিই সর্বপ্রথম সংজ্ঞা ফিরে পাব, তখন দেখতে পাব যে, মূসা আল্লাহ্‌র আরশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

পেলেন তখন বললেন, 'মহিমাময় আপনি, আমি অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে তাওবাহ্ করছি এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।'

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ بِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. তিনি বললেন, 'হে মূসা! আমি আপনাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দিয়ে মানুষের উপর বেছে নিয়েছি; কাজেই আমি আপনাকে যা দিলাম তা গ্রহণ করুন এবং শোকর আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ

১৪৫. আর আমরা তার জন্য ফলকসমূহে[১] সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে[২] দিয়েছি; সুতরাং

আমি জানি না তিনি কি আমার আগে সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছেন, না কি তূর পাহাড়ে যে সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন, তার বিনিময়ে তিনি সচেতনই ছিলেন।' [বুখারীঃ ৪৬৩৮, মুসলিমঃ ২৩৭৪]

(১) এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তাওরাতের পাতা বা তখ্‌তী মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে অর্পণ করা হয়েছিল। আর সে তখ্‌তীগুলোর নামই হল 'তাওরাত'। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ তখতীগুলো তাওরাতের আগে প্রদত্ত। [ইবন কাসীর]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আদম এবং (মূসা 'আলাইহিমাস্ সালাম) তর্ক করলেন। মূসা বললেন, আপনিই তো আমাদের পিতা, আশা-ভরসা সব শেষ করে দিয়ে আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে আসলেন। আদম বললেন, হে মূসা, আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য পছন্দ করেছেন, স্বহস্তে আপনার জন্য লিখে দিয়েছেন। আপনি আমাকে এমন বিষয়ে কেন তিরস্কার করছেন, যা আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আমার তাকদীরে লিখেছেন। এভাবে আদম মূসার উপর তর্কে জিতে গেলেন। তিনবার বলেছেন। [বুখারীঃ ৬৬১৪] এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে তাওরাত লিখেছেন এবং আদম 'আলাইহিস্ সালামের জান্নাত থেকে বের হওয়াটা যেহেতু বিপদ ছিল সেহেতু তিনি তাকদীরের দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। মূলতঃ তাকদীরের দ্বারা দলীল গ্রহণ শুধুমাত্র বিপদের সময়ই জায়েয। গোনাহ্র কাজের মধ্যে জায়েয নাই। [মাজমু ফাতাওয়া ৮/১০৭; দারয়ু তা'আরুযুল আকলি ওয়ান নাকলি: ৪/৩০৩]

قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

এগুলো শক্তভাবে ধরুন এবং আপনার সম্প্রদায়কে তার যা উত্তম তাই গ্রহণ করতে নির্দেশ দিন(১)। আমি শীঘ্রই(২) ফাসেকদের বাসস্থান(৩) তোমাদেরকে দেখাব।

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের ওয়াজিব ও মুস্তাহাবগুলো গ্রহণ কর। আর নিষেধকৃত বস্তু পরিত্যাগ কর [সা'দী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অথবা আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্‌র বাণীর যদি কয়েক ধরনের অর্থ হয়, তখন যেন তারা কেবল উত্তম ও আল্লাহ্‌র শানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থটিই গ্রহণ করে। [ইবন কাসীর: আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ]

(২) অর্থাৎ সামনে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন সব জাতির প্রাচীন ধ্বংশাবশেষ দেখবে যারা আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং ভুল পথে চলার ব্যাপারে অবিচল ছিল। সেই ধ্বংশাবশেষগুলো দেখে এ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বনের পরিণাম কি হয় তা তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে।

(৩) আয়াতের এক অর্থ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, "আমি শীঘ্রই ফাসেকদের বাসস্থান তোমাদের দেখাব।" এ হিসেবে এখানে ফাসেকদের বাসস্থান বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। একটি মিসর, অপরটি শাম বা সিরিয়া। কারণ, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের বিজয়ের পূর্বে মিসরে ফির'আউন এবং তার সম্প্রদায় ছিল শাসক ও প্রবল। এ হিসাবে মিসরকে 'দারুল ফাসেকীন' বা পাপাচারীদের আবাসস্থল বলা যায়। [ফাতহুল কাদীর] আর সিরিয়ায় যেহেতু তখন আমালেকা সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যেহেতু ওরাও ছিল ফাসেক বা পাপাচারী, সেহেতু তখন সিরিয়াও ছিল ফাসেকদেরই আবাসভূমি। [ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর] এতদুভয় অর্থের কোন্‌টি যে এখানে উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর তার ভিত্তি হল এই যে, ফির'আউনের সম্প্রদায় ডুবে মরার পর বনী-ইস্‌রাঈলরা মিসরে ফিরে গিয়েছিল কি না? যদি মিসরে ফিরে গিয়ে থাকে এবং মিসর সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে; যেমন ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ﴾ আয়াতের দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়, তবে মিসরে তাদের আধিপত্য আলোচ্য তূর পর্বতে তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকিরণের ঘটনার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে এ আয়াতে ﴿دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ অর্থ শাম দেশ বা সিরিয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তখন তারা মিসরে ফিরে না গিয়ে থাকে, তাহলে উভয় দেশই উদ্দেশ্য হতে পারে। আয়াতের অপর অর্থ হচ্ছে, 'শীঘ্রই আমি যারা ফাসেক তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের পরিণাম ফল কি হবে তা দেখাব।' এ হিসেবে পরিণাম ফল হিসেবে তীহ মাঠে তাদের যে কি মারাত্মক অবস্থা হয়েছে সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

سَاَصۡرِفُ عَنۡ اٰیٰتِیَ الَّذِیۡنَ یَتَكَبَّرُوۡنَ فِی
الۡاَرۡضِ بِغَیۡرِ الۡحَقِّ ؕ وَاِنۡ یَّرَوۡا كُلَّ اٰیَۃٍ لَّا
یُؤۡمِنُوۡا بِهَا ۚ وَاِنۡ یَّرَوۡا سَبِیۡلَ الرُّشۡدِ لَا یَتَّخِذُوۡهُ
سَبِیۡلًا ۚ وَاِنۡ یَّرَوۡا سَبِیۡلَ الۡغَیِّ یَتَّخِذُوۡهُ
سَبِیۡلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ كَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَكَانُوۡا
عَنۡهَا غٰفِلِیۡنَ ﴿۱۴۶﴾

১৪৬. যমীনে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমার নিদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সৎপথ দেখলেও সেটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভুল পথ দেখলে সেটাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্য যে, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল।

وَالَّذِیۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَلِقَآءِ الۡاٰخِرَۃِ
حَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ ؕ هَلۡ یُجۡزَوۡنَ اِلَّا مَا كَانُوۡا
یَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۴۷﴾

১৪৭. আর যারা আমাদের নিদর্শন ও আখেরাতের সাক্ষাতে মিথ্যারোপ করেছে তাদের কাজকর্ম বিফল হয়ে গেছে। তারা যা করে সে অনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।

আঠারতম রুকূ'

وَاتَّخَذَ قَوۡمُ مُوۡسٰی مِنۡۢ بَعۡدِهٖ مِنۡ حُلِیِّهِمۡ
عِجۡلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمۡ یَرَوۡا اَنَّهٗ لَا
یُكَلِّمُهُمۡ وَلَا یَهۡدِیۡهِمۡ سَبِیۡلًا ۘ اِتَّخَذُوۡهُ
وَكَانُوۡا ظٰلِمِیۡنَ ﴿۱۴۸﴾

১৪৮. আর মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুর তৈরী করল, একটা দেহ, যা 'হাম্বা' শব্দ করত। তারা কি দেখল না যে, এটা তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা এটাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল যালেম[১]।

(১) এ থেকে বুঝা গেল যে, যারা গো বাচ্চার পূজা করেছিল তাদের বিবেক সঠিকভাবে কাজ করেনি। তারা দেখতেই পাচ্ছিল যে, শুধু হাম্বা রব ছাড়া আর কোন কথাই তার মুখ থেকে বের হচ্ছে না। তার কাছ থেকে কোন হিদায়াতের কথা আসছে না, তারপরও সে কিভাবে ইলাহ হতে পারে? অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরও

১৪৯. আর তারা যখন অনুতপ্ত হল এবং দেখল যে, তারা বিপথগামী হয়ে গেছে, তখন তারা বলল, 'আমাদের রব যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবই[১]।'

وَلَمَّا سُقِطَ فِىٓ أَيۡدِيهِمۡ وَرَأَوۡاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمۡ يَرۡحَمۡنَا رَبُّنَا وَيَغۡفِرۡ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ١٤٩

স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, "তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না" [সূরা ত্বা-হা:৮৯]

(১) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন তাওরাত গ্রহণ করার জন্য তূর পাহাড়ে ইবাদাত করতে গেলেন এবং ইতোপূর্বে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ইবাদাতের যে নির্দেশ হয়েছিল; সে মতে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, ত্রিশ দিন পরে আমি ফিরে আসব, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা যখন আরো দশ দিন মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইস্‌রাঈলী সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত তাড়াহুড়া ও ভ্রষ্টতার দরুন নানা রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ করল। তার সম্প্রদায়ে 'সামেরী' নামে একটি লোক ছিল। সে ছিল একান্তই দুর্বল বিশ্বাসের লোক। কাজেই সে সুযোগ বুঝে বনী-ইস্‌রাঈলের লোকদের বললঃ তোমাদের কাছে ফির'আউন সম্প্রদায়ের যেসব অলংকারপত্র রয়েছে, সেগুলো তো তোমরা কিবতীদের কাছ থেকে ধার করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলংকারগুলো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে, কাজেই এগুলো আমাকে দাও। বনী-ইস্‌রাঈলরা তার কথামত সমস্ত অলংকারাদি তার (সামেরীর) কাছে এনে জমা দিল। সে এই সোনা-রুপা দিয়ে একটি বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরী করল এবং জিব্‌রীল 'আলাইহিস্ সালাম-এর ঘোড়ার খুরের তলার মাটি যা পূর্ব থেকেই তার কাছে রাখা ছিল, সোনা-রুপাগুলো আগুনে গলাবার সময় সে তাতে ঐ মাটি মিশিয়ে দিল। ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিটিতে জীবনী শক্তির নিদর্শন সৃষ্টি হল এবং তার ভিতর থেকে গাভীর মত হাম্বা রব বেরুতে লাগল। এ ক্ষেত্রে ﴿عِجۡلًا﴾ শব্দের ব্যাখ্যায় ﴿جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ﴾ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

সামেরীর এ আবিস্কার যখন সামনে উপস্থিত হল, তখন সে বনী-ইস্‌রাঈলদেরকে কুফরীর প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, "এটাই হল ইলাহ্। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তো আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলার জন্য গেছেন তূর পাহাড়ে। মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সত্যিই ভুলই হয়ে গেল।" বনী-ইস্‌রাঈলদের সবাই পূর্ব থেকেই সামেরীর কথা শুনত। আর এখন তার এই অদ্ভুত ম্যাজিক দেখার পর তো আর কথাই নেই; সবাই একেবারে তার ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং সে বাছুরকে ইলাহ্ মনে করে তারই ইবাদাতে প্রবৃত্ত হল।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا
قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِى مِنۢ بَعْدِىٓ ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ
رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥٓ
إِلَيْهِ ۚ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِى
وَكَادُوا۟ يَقْتُلُونَنِى فَلَا تُشْمِتْ بِىَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا
تَجْعَلْنِى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. আর মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুদ্ধ হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসলেন তখন বললেন, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ! তোমাদের রবের আদেশের আগেই তোমরা তাড়াহুড়ো করলে?' এবং তিনি ফলকগুলো ফেলে দিলেন(১) আর তার ভাইকে চুলে ধরে নিজের দিকে টেনে আনতে লাগলেন। হারূন বললেন, 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। সুতরাং তুমি আমার সাথে এমন করবে না যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে না।'

قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِى رَحْمَتِكَ ۖ
وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٥١﴾

১৫১. মূসা বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আপনার রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট করুন। আর আপনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

ঊনিশতম রুকূ'

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن
رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى

১৫২. নিশ্চয় যারা গো-বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, দুনিয়ার জীবনে তাদের উপর তাদের রবের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কানে শুনা খবর কখনো চাক্ষুষ দেখার মত হয় না। মহান আল্লাহ্ মূসাকে বাছুর নিয়ে কি করেছে তা জানানোর পরে তিনি তখতিগুলোকে ফেলে দেন নি, তারপর যখন তাদের কর্মকাণ্ড স্বচক্ষে দেখলেন তখন তখ্তীগুলোকে ফেলে দিলেন। ফলে সেগুলো ভেঙ্গে যায়।' [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৭১]

الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾

আপতিত হবেই[১]। আর এভাবেই আমরা মিথ্যা রটনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি[২]।

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. আর যারা অসৎকাজ করে, তারা পরে তওবা করলে ও ঈমান আনলে আপনার রব তো এরপরও পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৩]।

---

(১) আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কোন কোন পাপের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায়, যেমনটি হয়েছিল সামেরী ও তার সঙ্গীদের বেলায়, কারণ গোবৎস উপাসনা থেকে যখন তারা যথার্থভাবে তাওবাহ্ করল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সামেরীকে এ পৃথিবীতে অপমান-অপদস্থ করে ছেড়েছেন। তাকে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সে যেন সকলের কাছ থেকে পৃথক থাকে; সেও যাতে কাউকে না ছোঁয় এবং তাকেও যেন কেউ না ছোঁয়। সুতরাং সারাজীবন এমনিভাবে জীবজন্তুর সাথে বসবাস করতে থাকে; কোন মানুষ তার সংস্পর্শে আসত না। কাতাদাহ্ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর এমন আযাব চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখনই সে কাউকে স্পর্শ করত কিংবা তাকে কেউ স্পর্শ করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই গায়ে জ্বর এসে যেত। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ "যারা আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি।" সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ 'যারা দ্বীনী ব্যাপারে বিদ'আত অবলম্বন করে (অর্থাৎ দ্বীনে কোন প্রকার কুসংস্কার সৃষ্টি অথবা গ্রহণ করে,) তারাও আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী হয়ে সে শাস্তিরই যোগ্য হয়ে পড়ে। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, দ্বীনী ব্যাপারে যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বিদ'আত বা কুসংস্কার আবিস্কার করে তাদের শাস্তি এই যে, তারা আখেরাতে আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হবে এবং পার্থিব জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে। [ইবন কাসীর;কুরতুবী]

(৩) এ আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সতর্কীকরণের পর নিজেদের এই অপরাধের জন্য তাওবাহ্ করে নিয়েছে এবং তাওবাহ্র জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে কঠোরতর শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে থাকলেই তাওবাহ্ কবূল হবে- তারা সে শর্তও পালন করল, তখন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশক্রমে তাদেরকে বললেনঃ তোমাদের সবার তাওবাহ্ই কবুল হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে আর যারা বেঁচে রয়েছে, তারা এখন ক্ষমাপ্রাপ্ত। [তাবারী] এ আয়াতে বলা হয়েছে, যেসব লোক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা সে কাজ যত বড় পাপই হোক, কুফরীও যদি হয়, তবুও পরবর্তীতে তাওবাহ্ করে নিলে

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۚ
وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ
يَرْهَبُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. আর মূসার রাগ যখন প্রশমিত হল, তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন। যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য সে কপিগুলোতে[১] যা লিখিত ছিল তাতে ছিল হিদায়াত ও রহমত।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ
فَلَمَّا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ
مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ؕ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ
هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ
تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ
الْغٰفِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. আর মূসা তার সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোককে আমাদের নির্ধারিত স্থানে একত্র হওয়ার জন্য মনোনীত করলেন। অত:পর তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, তখন মূসা বললেন, 'হে আমার রব! আপনি ইচ্ছে করলে আগেই তো এদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতেন! আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা যা করেছে সে জন্য কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? এটা তো শুধু আপনার পরীক্ষা, যা দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছে বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথে পরিচালিত করেন। আপনিই তো আমাদের অভিভাবক; কাজেই আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং

এবং ঈমান ঠিক করে ঈমানের দাবী অনুযায়ী নিজের আমল বা কর্ম সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ্ তাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই কারো দ্বারা কোন পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তাওবাহ্ করে নেয়া একান্ত কর্তব্য।

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের রাগ যখন প্রশমিত হয়,তখন তাড়াতাড়ি ফেলে রাখা তাওরাতের তখতিগুলি আবার তুলে নিলেন। نسخة বা সংকলন বলা হয় সে লেখাকে যা কোন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, মূসা আলাইহিস সালাম ক্রোধবশত যখন তাওরাতের তখতিগুলি মাথা থেকে তাড়াহুড়া করে নামিয়ে রাখেন, তখন সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা পরে অন্য কোন কিছুতে লিখে তাওরাত দিয়েছিলেন, একেই নোসখা বলা হয়। [কুরতুবী]

আমাদের প্রতি দয়া করুন। আর ক্ষমাশীলদের মধ্যে আপনিই তো শ্রেষ্ঠ।'

১৫৬. 'আর আপনি আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে কল্যাণ লিখে দিন এবং আখেরাতেও। নিশ্চয় আমরা আপনার কাছে ফিরে এসেছি[১]।' আল্লাহ্ বললেন, 'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছে দিয়ে থাকি আর আমার দয়া- তা তো প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছে[২]।

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ۗ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٥٦

(১) কুরআনের শব্দ هُدْنَا অর্থ আমরা ফিরে এসেছি অথবা তাওবাহ্ করেছি। কোন কোন মুফাস্সির বলেন, এই শব্দ থেকে তাদের নামকরণ করা হয়েছে 'ইয়াহূদ'। [ইবন কাসীর]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়েই অহংকার করল। জাহান্নাম বলল, হে রব! আমার কাছে প্রবেশ করে প্রতাপান্বিত-অত্যাচারী, অহংকারী, রাজা-বাদশা ও নেতাগোছের লোকেরা। আর জান্নাত বলল, হে রব! আমার কাছে প্রবেশ করে দূর্বল, ফকীর, মিসকীনরা। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার শাস্তি। তোমার দ্বারা যাকে ইচ্ছা আমি তাকে তা পৌঁছাই। আর জান্নাতকে বললনে, তুমি আমার রহমত, যা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর তোমাদের প্রত্যেককেই পূর্ণ করা আমার দায়িত্ব। তখন জাহান্নামে তার বাসিন্দাদের নিক্ষেপ করা হবে......।" [মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩; ৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা একশত রহমত সৃষ্টি করেছেন। তা থেকে মাত্র একটি রহমত তিনি সৃষ্টিকুলকে দিয়েছেন। প্রতিটি রহমত আসমান ও যমীনের চেয়েও প্রকাণ্ড। এর কারণেই মা তার সন্তানকে দয়া করে, এর কারণেই পাখি ও জীব-জন্তু পানি পান করে। অতঃপর যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন তিনি সমস্ত সৃষ্টিকুল থেকে এ রহমতটি নিয়ে নিবেন এবং এটি ও বাকী ৯৯টির সবগুলিই তিনি মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট করবেন। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র এ আয়াত, "কাজেই আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে"এর মর্ম। [মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ: ১৩/১৮২] কাতাদা ও হাসান বলেন, দুনিয়াতে তিনি নেককার ও বদকার সবার জন্যই রহমত লিখেছেন তবে আখেরাতে তা শুধু মুত্তাকীদের জন্য। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস বলেন, এখানে তাকওয়া অর্থ শির্ক থেকে বেঁচে থাকা। [তাবারী] কাতাদা বলেন, যাবতীয় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। [তাবারী]

কাজেই আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান আনে।

১৫৭. 'যারা অনুসরণ করে রাসূলের, উম্মী[১] নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়[২],

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ

(১) আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি পদবী 'রাসূল' ও 'নবী' এবং এর সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য 'উম্মী'-এরও উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন আব্বাস বলেন, أمّي 'উম্মী' শব্দের অর্থ হল নিরক্ষর। যে লেখা-পড়া কোনটাই জানে না। [বাগভী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছেন, "আমরা নিরক্ষর জাতি। লিখা জানি না, হিসাব জানি না"। [বুখারী: ১০৮০] সাধারণ আরবদেরকে এ কারণেই কুরআন أُمِّيِّيْنَ বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করেছে যে, তাদের মধ্যে লেখা-পড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল। কারও কারও মতে উম্মী শব্দটি 'উম্ম' শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বলা হয়েছে। আর উম্ম অর্থ, মা। অর্থাৎ সে তার মা তাকে যেভাবে প্রসব করেছে সেভাবে রয়ে গেছে। কারও কারও মতে শব্দটি 'উম্মত' শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বলা হয়েছে। পরে সম্পর্ক করার নিয়মানুসারে 'তা' বর্ণটি পড়ে গেছে। তখন অর্থ হবে, উম্মতওয়ালা নবী। কারও কারও মতে, শব্দটি 'উম্মুল কুরা' যা মক্কার এক নাম, সেদিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কাবাসী। [বাগভী]

তবে বিখ্যাত মত হচ্ছে যে, উম্মী অর্থ নিরক্ষর। যদিও নিরক্ষর হওয়াটা কোন মানুষের জন্য প্রশংসনীয় গুণ নয়; বরং ত্রুটি হিসাবেই গণ্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান-গরিমা, তত্ত্ব ও তথ্য অবগতি এবং অন্যান্য গুণবৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া তার পক্ষে বিরাট গুণ ও পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাগত, কার্যগত ও নৈতিক পরাকাষ্ঠা যদি কোন লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়ে থাকে তার সে লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি, কিন্তু কোন একান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্ত্ব-তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পেলে, তা তার প্রকৃষ্ট মু'জিযা ছাড়া আর কি হতে পারে?

(২) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব গুণবৈশিষ্ট্য তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলোর কিছু আলোচনা তাওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে কুরআনুল কারীমেও করা হয়েছে। আর কিছু সে সমস্ত মনীষীবৃন্দের উদ্ধৃতিতে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের আসল সংকলন স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা নিজে পড়েই

মুসলিম হয়েছেন। যেমন, কোন এক ইয়াহূদী বালক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করত। হঠাৎ সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা জানার জন্য সেখানে গেলেন। তিনি দেখলেন, তার পিতা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তাওরাত তিলাওয়াত করছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'হে ইয়াহূদী, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সে মহান সত্তার যিনি মূসা 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন, তুমি কি তাওরাতে আমার অবস্থা ও গুণবৈশিষ্ট্য এবং আবির্ভাব সম্পর্কে কোন বর্ণনা পেয়েছ? সে অস্বীকার করল। তখন তার ছেলে বললঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি (অর্থাৎ এই ছেলের পিতা) ভুল বলছেন। তাওরাতে আমরা আপনার আলোচনা এবং আপনার গুণবৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন হক মা'বূদ নাই এবং আপনি তাঁর প্রেরিত রাসূল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন যে, এখন এ বালক মুসলিম। তার মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফন মুসলিমরা করবে। তার পিতার হাতে দেয়া হবে না। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এক ইয়াহূদী ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে সবগুণ বর্ণনা করেছে যা সে তাওরাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে দেখেছে। তিনি বলেন, আমি আপনার সম্পর্কে তাওরাতে এ কথাগুলো পড়েছি- "মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ্, তার জন্ম হবে মক্কায়, তিনি হিজরত করবেন 'তাইবা'র দিকে; আর তার দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর মেজাজের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না, হাটে-বাজারে তিনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তিনি দূরে থাকবেন।" [মুস্তাদরাকঃ ২/৬৭৮ হাদীসঃ ৪২৪২]

কা'আবে আহবার বলেছেনঃ তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে লেখা রয়েছেঃ "মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল ও নির্বাচিত বান্দা। তিনি না কঠোর মেজাজের লোক, না বাজে বক্তা। না-ইবা তিনি হাটে-বাজারে হট্টগোল করার লোক। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। তার জন্ম হবে মক্কায়, আর হিজরত হবে তাইবায়। তার দেশ হবে শাম (সিরিয়া)। আর তার উম্মাত হবে 'হাম্মাদীন'। অর্থাৎ আনন্দ-বেদনা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তারা যে কোন ঊর্ধ্বারোহণকালে তাকবীর বলবে। তারা সূর্যের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যাতে সময় নির্ণয় করে যথাসময়ে সালাত আদায় করতে পারে। তিনি তার শরীরের নিম্নাংশে লুঙ্গি পরবেন এবং হস্ত-পদাদি ওযুর মাধ্যমে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তাদের আযানদাতা আকাশে সুউচ্চ স্বরে আহ্বান করবেন। জিহাদের ময়দানে তাদের সারিগুলো এমন হবে যেমন সালাতে হয়ে থাকে। রাতের বেলায় তাদের তিলাওয়াত ও যিক্রের শব্দ এমনভাবে উঠতে থাকবে, যেন মধুমক্ষিকার

যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ | وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ

শব্দ । [সুনান দারামীঃ ৫, ৮, ৯]

ইবন সা'আদ রাহিমাহুল্লাহ্ সাহাল মওলা খাইসামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে সনদ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাল বলেনঃ আমি নিজে ইঞ্জীলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ পড়েছি যে- 'তিনি খুব বেঁটেও হবেন না আবার খুব লম্বাও হবেন না । উজ্জ্বল বর্ণ ও দু'টি কেশ-গুচ্ছধারী হবেন । তার দু'কাঁধের মধ্যস্থলে নবুওয়াতের মোহর থাকবে । তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না । গাধা ও উটের উপর সওয়ারী করবেন । ছাগলের দুধ নিজে দুইয়ে নেবেন । তিনি ইসমাঈল 'আলাইহিস্ সালামের বংশধর হবেন । তার নাম হবে আহ্মাদ ।' [তাবাকাত ইবন সা'আদঃ১/৩৬৩]

'আতা ইবন ইয়াসার বলেনঃ আমি আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা কে বললাম, আমাকে তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাগুণ কেমন এসেছে তা বর্ণনা করুন, তিনি বললেনঃ 'তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছেঃ 'হে নবী, আমি আপনাকে সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষী, সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদদাতা, অসৎকর্মীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মিয়ীন অর্থাৎ আরবদের জন্য রক্ষণা-বেক্ষণকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি । আপনি আমার বান্দা ও রাসূল । আমি আপনার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' রেখেছি । আপনি কঠোর মেজাজও নন, দাঙ্গাবাজও নন । হাটে-বাজারে হট্টগোলকারীও নন । মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন । আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মৃত্যু দেবেন না; যতক্ষণ না তার মাধ্যমে বাঁকা জাতিকে সোজা করে নেবেন । এমনকি যতক্ষণ না তারা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই' -এ কালেমার স্বীকৃতিদানকারী হয়ে যাবে, যতক্ষণ না অন্ধ চোখ খুলে দেবেন, বধির কান যতক্ষণ না শোনার যোগ্য বানাবেন এবং বদ্ধ হৃদয় যতক্ষণ না খুলে দেবেন ।' [বুখারী : ২১২৫; ৪৮৩৮] তাওরাত ও ইঞ্জীল বর্ণিত শেষনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উম্মাতের গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বহু স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে । রহমতুল্লাহ্ কীরানভী মুহাজেরে মক্কী রাহিমাহুল্লাহ্ তার গ্রন্থ 'ইয্হারুল-হক'-এ বিষয়টিকে অত্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও গবেষণাসহ লিখেছেন । তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান যুগের তাওরাত ও ইঞ্জীল- যাতে সীমাহীন বিকৃতি সাধিত হয়েছে-তাতেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাওরাত ও ইনজীলের নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন- এসব স্থানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে । যেমন, দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ ১৫-১৯, মথি-২১ঃ ৩৩-৪৬, যোহন-১ঃ ১৯-২১, ১৪ঃ ১৫-১৭, ২৫-৩০, ১৫ঃ ২৫-২৬, ১৬ঃ ৭-১৫ ।

الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ أُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٧﴾

দেন, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন[১]। আর তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃংখল হতে মুক্ত করেন যা তাদের উপর ছিল[২]। কাজেই যারা তার

(১) দ্বিতীয় গুণটি এই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির জন্য পবিত্র ও পছন্দনীয় বস্তু-সামগ্রী হালাল করবেন; আর পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করবেন। অর্থাৎ অনেক সাধারণ পছন্দনীয় বস্তুসামগ্রী যা শাস্তি স্বরূপ বনী-ইস্রাঈলের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোর উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নেবেন। উদাহরণতঃ পশুর চর্বি বা মেদ প্রভৃতি যা বনী-ইস্রাঈলের অসদাচরণের শাস্তি হিসাবে হারাম করে দেয়া হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। আর নোংরা ও পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে শুকরের মাংস, সুদ এবং যে সমস্ত খাবার আল্লাহ্ হারাম করেছেন অথচ তারা সেগুলোকে হালাল বলে চালিয়েছিল। [তাবারী] অনুরূপভাবে, রক্ত, মৃত পশু, মদ ও অন্যান্য হারাম জন্তু এর অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্ হারাম উপায়ে আয় যথা- সুদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের উপর চেপে থাকা বোঝা ও প্রতিবন্ধকতাও সরিয়ে দেবেন। إصر 'ইসর' শব্দের অর্থ এমন ভারী বোঝা যা নিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে অক্ষম। আর أغلال 'আগলাল' غل এর বহুবচন। 'গাল্লুন' সে হাতকড়াকে বলা হয় যা দ্বারা অপরাধীর হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয় এবং সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে। إصر 'ইসর' ও أغلال 'আগলাল' অর্থাৎ অসহনীয় চাপ ও আবদ্ধতা বলতে এ আয়াতে সে সমস্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর একান্ত শাস্তি হিসাবে আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, বিধর্মী কাফেরদের সাথে জিহাদ করে গনীমতের যে মাল পাওয়া যেত, তা বনী-ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল না; বরং আকাশ থেকে একটি আগুন নেমে এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিত। শনিবার দিন শিকার করাও তাদের জন্য বৈধ ছিল না। এ সমস্ত কঠিন ও জটিল বিধানসমূহ যা বনী-ইসরাঈলদের উপর আরোপিত ছিল, কুরআনে সেগুলোকে 'ইসর' ও 'আগলাল' বলা হয়েছে এবং সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কঠিন বিধি-বিধানের পরিবর্তন অর্থাৎ এগুলোকে রহিত করে তদস্থলে সহজ বিধি-বিধান প্রবর্তন করবেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'দ্বীন সহজ।' [বুখারীঃ ৩৯]

প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে নাযিল হয়েছে সেটার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম[১] ।

কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছেঃ ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ "আল্লাহ্ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।" [সূরা আল-হাজ্জঃ ৭৮]

(১) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ ও পরিপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পর বলা হয়েছেঃ তাওরাত ও ইঞ্জীলে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বাতলে দেয়ার পরিণতি এই যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার সহায়তা করবে আর সেই নূরের অনুসরণ করবে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে -অর্থাৎ যারা কুরআনের অনুসরণ করবে, তারাই হল কল্যাণপ্রাপ্ত। এখানে কল্যাণ লাভের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা, দ্বিতীয়তঃ তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তৃতীয়তঃ তার সাহায্য ও সহায়তা করা এবং চতুর্থতঃ কুরআন অনুযায়ী চলা। শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বুঝাবার জন্য ﴿وَعَزَّرُوهُ﴾ 'আয্যারূহু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা تعزير থেকে উদ্ভুত। 'তা'যীর' অর্থ সস্নেহে বারণ করা ও রক্ষা করা। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ﴿وَعَزَّرُوهُ﴾ 'আয্যারূহু' -এর অর্থ করেছেন শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। অর্থাৎ রাসূল হিসাবে তার প্রতি ঈমান আনতে হবে, নির্দেশদাতা হিসাবে তার প্রতিটি নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে, প্রিয়জন হিসাবে তার সাথে গভীরতম ভালবাসা রাখতে হবে এবং নবুওয়তের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ, তাই তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। অপর এক আয়াতেও বলা হয়েছে ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ অর্থাৎ "তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কর"। [সূরা আল-ফাতহঃ ৯] এছাড়া আরো কয়েকটি আয়াতে এই হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে এত উচ্চস্বরে কথা বলো না, যা তার স্বর থেকে বেড়ে যেতে পারে। [দেখুন, সূরা হুজুরাতঃ ২] অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল থেকে এগিয়ে যেয়ো না"। অর্থাৎ যদি মজলিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত থাকেন এবং তাতে কোন বিষয় উপস্থাপিত হয়, তাহলে তোমরা তার আগে কোন কথা বলো না। এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে কোন কোন সাহাবী বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে কেউ কথা বলবে না এবং তিনি যখন কোন কথা বলেন, তখন সবাই তা নিশ্চুপ বসে শুনবে। অনুরূপভাবে কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকার সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এমনভাবে ডাকবে

বিশতম রুকূ'

১৫৮. বলুন, 'হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল(১), যিনি আসমানসমূহ ও

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

না; নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাক। [দেখুন, সূরা হুজুরাতঃ ২] এ আয়াতে শেষে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এ নির্দেশের খেলাফ কোন অসম্মানজনক কাজ করা হলে সমস্ত সৎকর্ম ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম যদিও সর্বক্ষণ-সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই কঠিন হয়ে থাকে; তবুও তাদের অবস্থা এই ছিল যে, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে এমনভাবে কথা বলব যেন কোন ভাইয়ের কাছে কেউ গোপন বিষয়ে বলে। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৪৬২] এমনি অবস্থা ছিল উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুরও। [দেখুন- বুখারীঃ ৪৮৪৫] আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা আমার কোন প্রিয় ব্যক্তি সারা বিশ্বে ছিল না। আর আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি তার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেও পারতাম না। আমার কাছে যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকার-অবয়ব সম্পর্কে কেউ জানতে চায়, তাহলে তা বলতে আমি এজন্য অপারগ যে, আমি কখনো তার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও দেখিনি। [মুসলিমঃ ১২১] উরওয়া ইবন মাসউদকে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলিমদের অবস্থা জানার জন্য মদীনায় পাঠাল। সে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন নিবেদিত প্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিল যে, আমি কিস্‌রা ও কায়সারের দরবারও দেখেছি এবং সম্রাট নাজ্জাশীর সাথেও সাক্ষাত করেছি, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা, তোমরা কষ্মিনকালেও তাদের মোকাবেলায় জয়ী হতে পারবে না। [সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ১১/২১৬]

(১) এ আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে রিসালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জিন ও মানবজাতি তথা কেয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি মানুষকে বলে দিনঃ "আমি তোমাদের সবার প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি"। আমার নবুওয়ত লাভ ও রিসালাতপ্রাপ্তি বিগত নবীগণের মত কোন বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ ভূখণ্ড

অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য, বিশ্বের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য কেয়ামতকাল পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত। অন্য আয়াতেও এসেছে, "আর আমরা তো আপনাকে কেবল সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি" [সূরা সাবা: ২৮] অনুরূপভাবে সূরা আলে ইমরান: ২০; সূরা আল-আন'আম: ৯০; সূরা হূদ: ১৭; সূরা ইউসুফ: ১০৪; সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭; সূরা আল-ফুরকান: ১; সূরা ছোয়াদ: ৮৭; সূরা আল-কালাম: ৫২; সূরা আত-তাকওয়ীর: ২৭।

হাফেজ ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন যে, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতামুন্নাবিয়্যীন বা শেষ নবী হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও রিসালাত যখন কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত বংশধরদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোন নতুন রাসূলের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেই না। [ইবন কাসীর]

হাদীসে এসেছে, আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মধ্যে কোন এক বিষয়ে মতবিরোধ হয়। তাতে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নারায হয়ে চলে যান। তা দেখে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও তাকে মানাবার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কিছুতেই রাযী হলেন না। এমনকি নিজের ঘরে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে হাযির হন। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিজের এহেন আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের ঘটনা বিবৃত করেন। আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন লক্ষ্য করলেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর প্রতি ভর্ৎসনা করা হচ্ছে, তখন নিবেদন করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, দোষ আমারই বেশী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমার একজন সহচরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকাটাও কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে আমি যখন বললামঃ 'হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সমস্ত লোকের জন্য আল্লাহ্ রাসূল। তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। শুধু এই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুই ছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।' [বুখারীঃ ৪৬৪০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাবূক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় হচ্ছিল যে, শত্রুরা না এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। রাসূল সালাত শেষ

করে বললেনঃ আজকের রাতে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোন নবী-রাসূলকে দেয়া হয়নি। তার একটি হল এই যে, আমার রিসালাত ও নবুওয়াতকে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার পূর্বে যত নবী-রাসূলই এসেছেন, তাদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমাকে আমার শত্রুর মোকাবেলায় এমন প্রভাব দান করা হয়েছে যাতে তারা যদি আমার কাছ থেকে এক মাসের দূরত্বেও থাকে, তবুও তাদের উপর আমার প্রভাব ছেয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ কাফেরদের সাথে যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে-গনীমত আমার জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য তা হালাল ছিল না। বরং এসব মালের ব্যবহার মহাপাপ বলে মনে করা হত। তাদের গনীমতের মাল ব্যয়ের একমাত্র স্থান ছিল এই যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সে সমস্তকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দিয়ে যাবে। চতুর্থতঃ আমার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ করে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করার উপকরণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে আমাদের সালাত যমীনের যে কোন অংশে, যে কোন জায়গায় শুদ্ধ হয়, কোন বিশেষ মসজিদে সীমাবদ্ধ না হয়। পক্ষান্তরে পূর্ববতী উম্মতদের ইবাদাত শুধু তাদের উপাসনালয়েই হত, অন্য কোথাও নয়। নিজেদের ঘরে কিংবা মাঠে-ময়দানে তাদের সালাত বা ইবাদাত হত না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের যখন সামর্থ্য না থাকে, তা পানি না পাওয়ার জন্য হোক কিংবা কোন রোগ-শোকের কারণে, তখন মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেয়াই পবিত্রতা ও অযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববতী উম্মতদের জন্য এ সুবিধা ছিল না। অতঃপর বললেনঃ আর পঞ্চমটি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক রাসূলকে একটি দো'আ কবূল হওয়ার এমন নিশ্চয়তা দান করেছেন, যার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাদের নিজ নিজ দো'আকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়েছে। আমাকে তাই বলা হল যে, আপনি কোন একটা দো'আ করুন। আমি আমার দো'আকে আখেরাতের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছি। সে দো'আ তোমাদের জন্য এবং কেয়ামত পর্যন্ত لا إله إلا الله 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক মা'বুদ নেই' কালেমার সাক্ষ্য দানকারী যেসব লোকের জন্য হবে, তাদের কাজে লাগবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/২২২]

আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে উদ্ধৃত বর্ণনায় আরো উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে শুনবে, তা সে আমার উম্মতদের মধ্যে হোক কিংবা ইয়াহূদী-নাসারা হোক, যদি সে আমার উপর ঈমান না আনে, তাহলে জাহান্নামে যাবে'। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৫০]

সারমর্ম এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য, প্রত্যেক দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য

وَالْأَرْضِ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই; তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। কাজেই তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূল উম্মী নবীর প্রতি যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান রাখেন। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।'

وَمِنْ قَوْمِ مُوسٰىٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. আর মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রয়েছে যারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সে অনুযায়ীই (বিচারে) ইনসাফ করে[১]।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপকভাবে রাসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর যে লোক তার প্রতি ঈমান আনবে না, সে লোক কোন সাবেক শরী'আত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোন ধর্ম ও মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কষ্মিনকালেও মুক্তি পাবে না।

(১) এ আয়াতে সত্যনিষ্ঠ দল বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে-

এক. অধিকাংশ অনুবাদক এ আয়াতের অনুবাদ এভাবে করেছেন- "মূসার জাতির মধ্যে এমন একটি দল আছে যারা সত্য অনুযায়ী পথনির্দেশ দেয় এবং ইনসাফ করে"। অর্থাৎ তাদের মতে কুরআন নাযিল হবার সময় বনী-ইস্‌রাঈলীদের যে নৈতিক ও মানসিক অবস্থা বিরাজমান ছিল তারই কথা এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বিগত আয়াতসমূহে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের অসদাচরণ, কুটতর্ক এবং গোমরাহীর বর্ণনা ছিল। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিটাই এমন নয়; বরং তাদের মধ্যে কিছু লোক ভালও রয়েছে যারা সত্যানুসরণ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা হল সেসব লোক, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের যুগে সেগুলোর হেদায়াত অনুযায়ী আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়, তখন তাওরাত ও ইঞ্জীলের সুসংবাদ অনুসারে তার উপর ঈমান আনে এবং তার যথাযথ অনুসরণও করে। বনী-ইস্‌রাঈলদের এই সত্যনিষ্ঠ দলটির উল্লেখও কুরআনুল

১৬০. আর তাদেরকে আমরা বারটি গোত্রে বিভক্ত করেছি। আর মূসার সম্প্রদায় যখন তার কাছে পানি চাইল, তখন আমরা তার প্রতি ওহী পাঠালাম, 'আপনার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত করুন'; ফলে তা থেকে বারটি ঝর্ণা ধারা উৎসারিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনে নিল। আর আমরা মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া দান করেছিলাম এবং তাদের উপর আমরা মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছিলাম। (বলেছিলাম) 'তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু খাও।' আর তারা আমাদের প্রতি কোন যুলুম করেনি, বরং তারা নিজদের উপরই যুলুম করত।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬১. আর স্মরণ করুন, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা এ জনপদে বাস কর ও যেখানে খুশি খাও এবং

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا

কারীমে বারংবার করা হয়েছে। যেমন, সূরা আলে-ইমরানঃ ১১৩, ১৯৯, সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১২১, সূরা আল-ইস্রাঃ ১০৭-১০৯, সূরা আল-কাসাসঃ ৫২-৫৪। [ইবন কাসীর]

দুই. পূর্বাপর আলোচনা বিশ্লেষণ করে কোন কোন মুফাস্সির এ মত দিয়েছেন যে, এখানে মূসার সময় তথা বনী-ইস্রাঈলীদের যে অবস্থা ছিল তারই কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে এ বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ জাতির মধ্যে যখন বাছুর পূজার অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার উপর পাকড়াও করা হয় তখন সমগ্র জাতি গোমরাহ ছিল না; বরং তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তখনো সৎ ছিল। [তাবারী; ইবন কাসীর] মোটকথা, আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা সব সময়ই সত্যে সুদৃঢ় ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সংবাদ শুনে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তারাই হোক অথবা মূসার যুগে যারা হকপন্থী ছিল তারা। যারা গো-বাছুর পূজা করেনি বা নবীদেরকে হত্যা করেনি।

حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ۭ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾

বল, 'ক্ষমা চাই' । আর নতশিরে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর; আমরা তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব । অবশ্যই আমরা মুহসিনদেরকে বাড়িয়ে দেব ।'

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاۗءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. অতঃপর তাদের মধ্যে যারা যালিম ছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল । কাজেই আমরা আসমান থেকে তাদের প্রতি শাস্তি পাঠালাম, কারণ তারা যুলুম করত ।

একুশতম রুকূ'

وَسْــَٔـلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. আর তাদেরকে সাগর তীরের জনপদবাসী[১] সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করুন, যখন তারা শনিবারে সীমালংঘন করত; যখন শনিবার পালনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের কাছে আসত । কিন্তু যেদিন তারা শনিবার পালন করত না, সেদিন তা তাদের কাছে আসত না । এভাবে আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করতাম, কারণ তারা ফাসেকী করত ।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۭ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আর স্মরণ করুন, যখন তাদের একদল বলেছিল, 'আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন?' তারা বলেছিল, 'তোমাদের রবের কাছে দায়িত্ব-মুক্তির জন্য এবং

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ জনপদটি সাগর তীরে ছিল । মদীনা ও মিশরের মাঝামাঝি । যাকে 'আইলা' বলা হত । [তাবারী] বর্তমানে এটাকে 'ঈলাত' বলা হয় । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে, এজন্য ।'

১৬৫. অতঃপর যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন যারা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করত তাদেরকে আমরা উদ্ধার করি । আর যারা যুলুম করেছিল তাদেরকে আমরা কঠোর শাস্তি দেই, কারণ তারা ফাসেকী করত(১) ।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

(১) এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ জনপদে তিন ধরনের লোক ছিল । এক, যারা প্রকাশ্যে ও পূর্ণ ঔদ্ধত্য সহকারে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করছিল । দুই, যারা নিজেরা বিরুদ্ধাচারণ করছিল না কিন্তু অন্যের বিরুদ্ধাচারণকে নীরবে হাত পা গুটিয়ে বসে বসে দেখছিল এবং উপদেশ দানকারীদের বলছিল, এ হতভাগাদের উপদেশ দিয়ে কী লাভ? তিন, যারা ঈমানী সম্ভ্রমবোধ ও মর্যাদাবোধের কারণে আল্লাহর আইনের এহেন প্রকাশ্য অমর্যাদা বরদাশত করতে পারেনি এবং তারা এ মনে করে সৎকাজের আদেশ দিতে ও অসৎকাজ থেকে অপরাধীদেরকে বিরত রাখতে তৎপর ছিল যে, হয়তো ঐ অপরাধীরা তাদের উপদেশের প্রভাবে সৎপথে এসে যাবে, আর যদি তারা সৎপথে নাও আসে তাহলে অন্তত নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী কর্তব্য পালন করে তারা আল্লাহর সামনে নিজেদের দায়মুক্তির প্রমাণ পেশ করতে পারবে । [ইবন কাসীর] এ অবস্থায় এ জনপদের উপর যখন আল্লাহর আযাব নেমে এলো, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী তখন এ তিনটি দলের মধ্য থেকে তৃতীয় দলটিকেই বাঁচিয়ে নেয়া হয়েছিল আর যারা অপরাধ করেছিল তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করা হয়েছিল । কিন্তু দ্বিতীয় দলটি, যারা অন্যায় করেনি তবে অন্যায় থেকে নিষেধ করেনি তাদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি । কারণ তারা ভাল কিংবা মন্দ কিছুই করেনি যে, তাদের কথা আলোচনায় আসবে । [ইবন কাসীর] এমতাবস্থায় দ্বিতীয় দলটির পরিণতি কেমন হয়েছিল তাদের সম্পর্কে তাফসীরবিদদের দু'টি মত পরিলক্ষিত হয় । ইবন আব্বাস থেকে এক সহীহ বর্ণনায় এসেছে যে, একমাত্র তারাই আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল, যারা অন্যায় করেছিল । আর বাকী দু'টি দল যারা বলেছিল যে, "আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন?" আর যারা বলেছিল "তোমাদের রবের কাছে দায়িত্ব-মুক্তির জন্য" আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয় দলকেই শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন । [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]
কোন কোন তাফসীরবিদ, যারা অন্যায় করেনি তবে অন্যায় থেকে নিষেধও করেনি তাদেরকেও শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে বলে মনে করেন । এ বর্ণনাটিও ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে । [ইবন কাসীর] তবে ইবন কাসীর প্রথম

১৬৬. অতঃপর তারা যখন নিষিদ্ধ কাজ বাড়াবাড়ির সাথে করতে লাগল তখন আমরা তাদেরকে বললাম, 'ঘৃণিত বানর হও!'

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿١٦٦﴾

মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ শেষোক্ত মতের পক্ষের লোকরা বলেন, কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, সামষ্টিক অপরাধের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা একই ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ ﴿وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاۤصَّةً﴾ [সূরা আল-আনফালঃ ২৫] অর্থাৎ সেই বিপর্যয় থেকে বেঁচে থাক যার কবলে বিশেষভাবে কেবলমাত্র তোমাদের মধ্য থেকে যারা যুলুম করেছে তারাই পড়বে না। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মহান আল্লাহ বিশেষ লোকদের অপরাধের দরুন সর্বসাধারণকে শাস্তি দেন না, যতক্ষণ সাধারণ লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে না পৌঁছে যায় যে, তারা নিজেদের চোখের সামনে খারাপ কাজ হতে দেখে এবং তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশের ক্ষমতাও রাখে এরপরও কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে না। কাজেই লোকেরা যখন এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন'। [আবু দাউদ:৪৩৩৮; তিরমিযী: ২১৬৮; ইবন মাজাহ্: ৪০০৫: মুসনাদে আহমাদঃ ১/২] এ ছাড়াও আলোচ্য আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, এ জনপদের উপর দুই পর্যায়ে আল্লাহর আযাব নাযিল হয়। প্রথম পর্যায়ে নাযিল হয় কঠিন শাস্তি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে যারা নাফরমানী অব্যাহত রেখেছিল তাদেরকে বানরে পরিণত করা হয়। [ফাতহুল কাদীর] দৃশ্যতঃ প্রথম পর্যায়ের আযাবে উভয় দলই শামিল ছিল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের আযাব দেয়া হয়েছিল কেবলমাত্র প্রথম দলকে।

কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বিশুদ্ধ বর্ণনা ও তাফসীরবিদদের অধিকাংশের মত হচ্ছে যে, দ্বিতীয় দলটিও শাস্তি থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ছিল। কারণ, তারা তো কোন যুলুম করেনি। আয়াতে শুধু যালেমদেরকেই শাস্তি দেয়ার কথা আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন। আরও একটি বিষয় এখানে জানা আবশ্যক যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা ফরযে কিফায়া। যদি কেউ সেটা করে তবে অন্যদের থেকে কর্তব্য আদায় হয়ে যায়। সুতরাং যারা নিষেধ করেছে, তারা চুপ থাকা লোকদের থেকে ফরযে কিফায়া আদায় করে দিয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় দলটি যে একেবারে চুপ ছিল তা নয়, তারা বলেছিল যে, 'আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন বা কঠোর শাস্তি দেবেন, তাদেরকে নসীহত করে কি লাভ?' এতে এক ধরণের ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। [সা'দী] সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, তারা সম্পূর্ণরূপে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা থেকে বিরত ছিল না। তাই তাদের উপর আযাব আসেনি এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

১৬৭. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ঘোষণা করেন যে[১] অবশ্যই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন লোকদেরকে পাঠাবেন, যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে[২]। আর নিশ্চয় আপনার রব শাস্তি দানে তৎপর এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾

১৬৮. আর আমরা তাদেরকে যমীনে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছি[৩]; তাদের কেউ

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ

(১) 'তাআযযানা' বাক্যাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, ঘোষনা দিয়ে জানিয়ে দেয়া। দুই, সুদৃঢ় ইচ্ছা এবং সে অনুসারে নির্দেশ। [ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের অবশিষ্ট কাহিনী বিবৃত করার পর তার উম্মত অর্থাৎ ইয়াহূদীদের অসৎকর্মশীল লোকদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির বর্ণনা এসেছে। সে অনুসারে তাদের উপর শাস্তির ঘোষণা খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে প্রায় প্রতিটি গ্রন্থে দেয়া হয়েছে। এমনকি ঈসা আলাইহিসসালামও তাদেরকে এ একই সতর্কবাণী শুনান। বিভিন্ন ইনজীল গ্রন্থে তাঁর একাধিক ভাষণ থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সবশেষে কুরআনুল কারীমেও এ কথাটিকে দৃঢ়ভাবে পূনর্ব্যক্ত করেছে। আর তা হল কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর এমন কোন ব্যক্তিকে অবশ্যই চাপিয়ে রাখতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইয়াহূদীরা সবসময়ই সর্বত্র ঘৃণিত, পরাজিত ও পরাধীন অবস্থায় রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, মূসা আলাইহিস সালাম তাদের উপর সাত বছর বা তেরো বছর খাজনা আরোপ করেছিলেন। তারপর গ্রীক, কাশদানী, কালদানী নৃপতিরা তাদের উপর কঠোর শাস্তি নিয়ে আপতিত হয়েছিল। পরে বুখতানাসারের হাতে, তারপর নাসারাদের হাতে, তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। সবশেষে তারা দাজ্জালের সহযোগীরূপে বের হবে, তারপর দাজ্জাল যখন মারা পড়বে, তখন মুসলিমরা ঈসা আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে তাদের হত্যা করবে। [দেখুন, বুখারীঃ ২৯২৫, ২৯২৬] [ইবন কাসীর]।

(৩) এ আয়াতে ইয়াহূদীদের উপর আরোপিত অন্য আরেক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। তা হল, তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। কোথাও কোন এক দেশে তাদের সমবেতভাবে বসবাসের সুযোগ হয়নি। ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا﴾

وَمِنْهُمْ دُونَ ذٰلِكَ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾

কেউ সৎকর্মপরায়ণ আর কেউ অন্যরূপ(১)। আর আমরা তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে(২)।

এর মর্মও তাই। قَطَّعْنَا শব্দটি تقطيع থেকে নির্গত। যার অর্থ খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া। আর أُمَمًا হল أمّة এর বহুবচন। যার অর্থ দল বা শ্রেণী। এর মর্ম হল, আমি ইয়াহূদী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি। সুতরাং যেখানেই কেউ ঢুকবে সেখানে ইয়াহূদীদের কোন সম্প্রদায় দেখতে পাবে। [তাবারী]

(১) এ আয়াতে ইয়াহুদীদের শ্রেণী বিভাগ করে বলা হচ্ছেঃ ﴿مِنْهُمُ الصّٰلِحُونَ﴾ অর্থাৎ "এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সৎ এবং কিছু অন্য রকম।" "অন্য রকম" -এর মর্ম হল এই যে, কাফের দুস্কৃতকারী ও অসৎ লোক রয়েছে। অর্থাৎ ইয়াহূদীদের মধ্যে সবই এক রকম লোক নয়, কিছু সৎও আছে। [তাবারী; ইবন কাসীর] এর অর্থ, সেসব লোক, যারা তাওরাতের যুগে তাওরাতের নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুশীলন করেছে। না তার হুকুমের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেছে, আর না কোন রকম অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এছাড়া এতে তারাও উদ্দেশ্য হতে পারেন, যারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছেন। অপরদিকে রয়েছে সে সমস্ত লোক, যারা তাওরাতকে আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করা সত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিংবা তার আহ্কাম বা বিধি বিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের আখেরাতকে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট বস্তু-সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছেঃ "আমি ভাল-মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ থেকে ফিরে আসে।" "ভাল অবস্থার দ্বারা"-এর অর্থ হল এই যে, তাদেরকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান। আর "মন্দ অবস্থার দ্বারা"-এর অর্থ হয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সে অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে, অথবা কোন কোন সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। [তাবারী; ইবন কাসীর] সারমর্ম এই যে, মানব জাতির আনুগত্য ও ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার দু'টিই প্রক্রিয়া। তাদের ব্যাপারে উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ইহূদী সম্প্রদায় এতদুভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের জন্য নেয়ামতের দুয়ার খুলে দিয়ে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন তারা বলতে শুরু করেছে, ﴿إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَّنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্ হলেন ফকীর আর আমরা ধনী।" [সূরা আলে-ইমরানঃ ১৮১] আর তাদেরকে যখন দারিদ্র্য ও দুর্দশার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন বলতে শুরু করেছেঃ ﴿يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্র হাত সংকুচিত হয়ে গেছে।" [সূরা আল-মায়েদাহ্ঃ ৬৪]

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ
عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ
يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ
مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ
وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়(১); তারা এ তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে(২)।' কিন্তু ওগুলোর অনুরূপ সামগ্রী তাদের কাছে আসলে তাও তারা গ্রহণ করে; কিতাবের অঙ্গীকার কি তাদের কাছ থেকে নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া বলবে

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে অযোগ্য উত্তরপুরুষ বলে নাসারাদের বোঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন কাসীর বলেন, এখানে ইয়াহূদী, নাসারাসহ পরবর্তী সবাই উদ্দেশ্য হতে পারে। [ইবন কাসীর] মুজাহিদ বলেন, দুনিয়ার যে বস্তুতেই তাদের চোখ পড়বে, সেটা হালাল কিংবা হারাম যাই হোক না কেন, তারা তাই গ্রহণ করে, তারপর ক্ষমার তালাশে থাকে। আবার যদি আগামী কাল অনুরূপ কিছু নজরে পড়ে সেটাও গ্রহণ করে। [তাবারী] সুদ্দী বলেন, তাদের মধ্যে কাউকে বিচারক নিয়োগ করা হলে সে ঘুষ খেয়ে বিচার করত, তখন তাদের ভাললোকেরা একত্র হয়ে বলল যে, এটা করা যাবে না এবং ঘুষও দেয়া যাবে না। কিন্তু পূণরায় তাদের কেউ কেউ ঘুষ খেতে আরম্ভ করে। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে বলতো যে, আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। তখন অন্যরা তাকে খারাপ বলত। তারপর এ বিচারকের পদচ্যুতি বা মৃত্যুর কারণে যদি অন্য কাউকেও নিয়োগ করা হতো, সেও ঘুষ খেত। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র কিতাব পড়েছে কিন্তু কিতাবের হুকুমের বিরোধিতা করেছে। দুনিয়ার যত নিকৃষ্ট কামাই আছে যেমন ঘুষ ইত্যাদি তা-ই তারা গ্রহণ করে। কারণ তাদের লোভ ও লালসা প্রচণ্ড। তারা গোনাহ্ করে, তারা জানে এ কাজটি করা গুণাহ। তবুও এ আশায় তারা এ কাজটি করে যে, কোন না কোনভাবে তাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। কারণ তারা মনে করে, তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং তারা যত কঠিন অপরাধই করুক না কেন তাদের ক্ষমালাভ অপরিহার্য। এ ভুল ধারণার ফলে কোন গুনাহ করার পর তারা লজ্জিত হয় না এবং তাওবাও করে না। বরং একই ধরনের গোনাহ্ করার সুযোগ এলে তারা তাতে জড়িয়ে পড়ে। তারপর আবার যদি তাদের কাছে দুনিয়ার কোন ভোগ এসে যায়, তা যত হারামই হোক তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। বরং তা বারবার করতে থাকে। [মুয়াসসার]

না(১)? অথচ তারা এতে যা আছে তা অধ্যয়নও করে(২)। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই উত্তম; তোমরা কি এটা অনুধাবন কর না?

১৭০. যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারন করে ও সালাত কায়েম করে, আমরা তো সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না(৩)।

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۞

(১) অর্থাৎ তারা নিজেরাই জানে যে, আল্লাহ কখনো তাদেরকে একথা বলেননি এবং তাদের নবীগণও কখনো তাদেরকে এ ধরণের নিশ্চয়তা দেননি যে, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পারো, তোমাদের সকল গুনাহ অবশ্যি মাফ হয়ে যাবে। তাছাড়া আল্লাহ নিজে যে কথা কখনো বলেননি তাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করার কি অধিকারই বা তাদের থাকতে পারে? অথচ তাদের কাছ থেকে অংগীকার নেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর নামে কোন অসত্য কথা তারা বলবে না। তাওরাত কায়েম করবে, সে অনুযায়ী আমল করবে। কুরআনের অন্যত্র তাদের এ অঙ্গীকারটি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এসেছে, "স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন: 'অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।' এরপরও তারা তা তাদের পেছনে ফেলে রাখে (অগ্রাহ্য করে) ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে; কাজেই তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট!" [সূরা আলে ইমরান: ১৮৭] কিন্তু তারা কিতাবের বিধান জানার পরও সেটাকে নষ্ট করে দেয়, তা অনুসারে আমল করে না। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ এমন নয় যে, তারা বুঝে না। তারা আল্লাহ্‌র কিতাব অধ্যয়ণ করে, তারা জানে যে, তাদেরকে এ ধরনের হারাম বস্তু গ্রহণ করা থেকে তাদের কিতাবে নিষেধ করা হয়েছে। এমন নয় যে, তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তা করছে। বস্তুত: তাদের কোন সন্দেহ নেই। তারা জেনে-বুঝেই এ অন্যায় করছে। এটা নিঃসন্দেহে খারাপ কাজ। [সা'দী]

(৩) পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে একটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বিশেষতঃ বনী-ইস্রাঈলের আলেম সম্প্রদায়ের নিকট থেকে তাওরাত সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল যে, এতে কোন রকম পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করবে না এবং সত্য ও সঠিক বিষয় ছাড়া মহান রবের প্রতি অন্য কোন বিষয় আরোপ করবে না। আর এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখিত হয়ে গিয়েছিল যে, বনী-ইস্রাঈলের আলেমগণ

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তাওরাতের বিধি-বিধানের পরিবর্তন করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাতলিয়েছে। এখানে আলোচ্য এই আয়াতটিতে সে বর্ণনারই উপসংহার হিসাবে বলা হয়েছে যে, বনী-ইস্‌রাঈলের সব আলেমই এমন নয়; কোন কোন আলেম এমনও রয়েছে যারা তাওরাতের বিধি-বিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজেও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে। আর যথারীতি সালাতও প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনি লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন না, যারা নিজেদের সংশোধন করে। কাজেই যারা ঈমান ও আমলের উভয় ফরয আদায়ের মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের প্রতিদান বা প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না। এ আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে-

প্রথমতঃ কিতাব বলতে এতে সে কিতাবই উদ্দেশ্য যার আলোচনা ইতোপূর্বে এসেছে। অর্থাৎ তাওরাত। অর্থাৎ যারা তাদের কিতাবে যে নবীর কথা বলা হয়েছে সে অনুসারে ঈমান এনেছে। মুজাহিদ বলেন, এ অনুসারে এটি আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আর এও হতে পারে যে, এতে কুরআনকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যারা বর্তমান নাযিলকৃত কিতাবের অনুসরণ করে তাদের প্রচেষ্টা ও আমল নষ্ট হবার নয়। তখন উম্মতে মুহাম্মাদীই উদ্দেশ্য হবে। [বাগভী; জালালাইন; সা'দী] অথবা সমস্ত আসমানী কিতাবই উদ্দেশ্য। তখন অর্থ হবে, যাদেরকেই আমরা কিতাব দিয়েছি তারা যদি তাদের সময়কার কিতাব অনুসারে চলে আমরা তাদের কর্মকাণ্ড ও আমল নষ্ট করি না। আর বর্তমানে কুরআন অনুসারেই সকলকে চলতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। তাতে যত হুকুম-আহকাম আছে তারা সেটার উপর যত্ন সহকারে আমল করে, এ ব্যাপারে তাদের কোন শৈথিল্য হয় না। যাদের আমল বিনষ্ট হয় না। তাদের পরিচয় হচ্ছে যে, তারা কঠোরভাবে এ কিতাবে বর্ণিত শরী'আতের উপর আমল করে। [আইসারুত তাফাসীর] সুতরাং একান্ত আদব ও সম্মানের সাথে অতি যত্ন সহকারে নিজের কাছে শুধু রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; বরং তার বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীর অনুবর্তীও হতে হবে।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল, এখানে একটিমাত্র বিধান সালাত প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হল সালাত। [সা'দী] তদুপরি সালাতের অনুবর্তিতা আসমানী বিধানসমূহের অনুবর্তিতার বিশেষ লক্ষণ। এরই মাধ্যমে চেনা যায়, কে কৃতজ্ঞ আর কে কৃতঘ্ন। আর এর নিয়মানুবর্তিতার একটা বিশেষ কার্যকারিতাও রয়েছে যে, যে লোক সালাতে নিয়মানুবর্তী হয়ে যাবে, তার জন্য অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে

১৭১. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা পর্বতকে তাদের উপরে উঠাই, আর তা ছিল যেন এক শামিয়ানা। তারা মনে করল যে, সেটা তাদের উপর পড়ে যাবে[১]। (বললাম,) 'আমরা যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা তাক্‌ওয়ার অধিকারী হও।'

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

বাইশতম রুকূ'

১৭২. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব আদম-সন্তানের পিঠ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি[২]

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে লোক সালাতের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী নয়, তার দ্বারা অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সম্ভব হয় না। সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'সালাত হল দ্বীনের স্তম্ভ', [তিরমিযীঃ ২৬১৬] অর্থাৎ যার উপরে তার ইমারত রচিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এই স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, যে এ স্তম্ভকে বিধ্বস্ত করেছে, সে গোটা দ্বীনের ইমারতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। যে সালাতের ব্যাপারে গাফলতি করে, সে যত তাস্‌বীহ্-ওযীফাই পড়ুক কিংবা যত প্রচেষ্টা করুক না কেন, আল্লাহ্‌র নিকট সে কিছুই নয়।

(১) অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা সেটা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "আর তাদের অংগীকার গ্রহণের জন্য 'তূর' পর্বতকে আমরা তাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম" [সূরা আন-নিসা: ১৫৪] ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, বনী-ইসরাঈলদেরকে যখন তাওরাত দেয়া হলো, তারা সেটা গ্রহণ করতে দ্বিধা করতে লাগল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তূর পাহাড়কে সমূলে সামিয়ানার মত তাদের উপর তুলে ধরলেন এবং বললেন, যা দেয়া হয়েছে সেগুলোকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করার ঘোষণা দাও, নতুবা তোমাদের উপর ছেড়ে দেব। [তাবারী] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে তখন তারা সিজদায় পতিত হয়। তবে তারা তাদের বাম চক্ষুর পার্শ্বে সিজদা করে অপর চক্ষু দিয়ে উপরের দিকে তাকাতে থাকে। এখনও প্রত্যেক ইয়াহূদী অনুরূপ সিজদা করে থাকে। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতগুলোতে মহা প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা স্রষ্টা ও

গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই[১]?' তারা বলেছিল,

إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

সৃষ্টি এবং দাস ও মনিবের মাঝে সে সময় হয়েছিল, যখন এই পৃথিবীতে কোন সৃষ্টি আসেওনি। যাকে বলা হয় "প্রাচীন অঙ্গীকার"। কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতে বহু প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিসালাতের বাণীসমূহ অবশ্যই উম্মতকে পৌঁছে দেন। এতে যেন কারো ভয়-ভীতি, মানুষের অপমান ও ভর্ৎসনার কোন আশংকাই তাদের জন্য অন্তরায় না হয়। আল্লাহ্র রাসূলগণ নিজেদের এই প্রতিশ্রুতির হক পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করেছেন। রিসালতের বাণী পৌঁছাতে গিয়ে তারা নিজেদের সবকিছু কুরবান করে দিয়েছেন। এমনিভাবে প্রত্যেক রাসূল ও নবীর উম্মতের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে যে, তারাও নিজ নিজ নবী-রাসূলের যথাযথ অনুসরণ করবে। তারপর প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এবং বিশেষভাবে সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যয় করার জন্য- যা কেউ পূরণ করেছে, কেউ করেনি। এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো সে প্রতিশ্রুতি, যা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সমস্ত নবী-রাসূলগণের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে যে, তারা 'নবীয়ে-উম্মী', খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবেন। আর যখনই সুযোগ পাবেন, তাকে সাহায্য-সহায়তা করবেন। যার আলোচনা সূরা আলে ইমরানের ৮১ নং আয়াতে করা হয়েছে। আবার বনী-ইস্রাঈলদের কাছ থেকেও তাওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সূরা আল-আ'রাফের বিগত আয়াতগুলোয় সে বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেই বিশ্বজনীন প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করছেন, যা সমস্ত আদমসন্তানের কাছ থেকে এই দুনিয়ায় আসারও পূর্বে সৃষ্টিলগ্নে তিনি নিয়েছিলেন। যা সাধারণ ভাষায় 'প্রাচীন অঙ্গীকার' বলে প্রসিদ্ধ।

(১) পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের তাফসীরে দু'টি প্রসিদ্ধ মত বর্ণিত হয়েছে। এক, এখানে যে অঙ্গীকার নেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তা ফিতরাত বা স্বভাবজাত দ্বীনের উপর মানুষকে সৃষ্টি করা, যাতে তারা কোন প্রকার পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত না হলে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী হতো, এ বিষয়টিকে বুঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ্র প্রশ্ন ও মানবজাতির প্রত্যুত্তর সবই অবস্থাভিত্তিক। অর্থাৎ তাদের মুখ দিয়ে কথা বের হয়নি। তাদের অবস্থাই একথার স্বীকৃতি দিচ্ছিল যে, তারা আল্লাহ্র রবুবিয়াতে পূর্ণ বিশ্বাসী। এ মতের সমর্থনে ঐ সমস্ত আয়াত ও হাদীস পেশ করা যায় যাতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে ফিতরাত বা স্বভাবজাত দ্বীন ইসলামের উপর সৃষ্টি করেছেন তারপর তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে ইয়াহূদী বা নাসারা বা মাজুসী বানিয়েছে। শয়তান তাদেরকে দ্বীন

থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সত্যনিষ্ঠ আলেমদের এক বিরাট দল এ মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ইবন কাসীর, ইবন আবুল ইযয আল হানাফী, আব্দুর রহমান আস-সা'দী রাহিমাহুমুল্লাহ্ সহ আরো অনেকে।

দুই, আল্লাহ্ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্ সালামের পিঠ থেকে তার সন্তানদেরকে বের করে তাদের কাছ থেকে তিনি মৌখিক অঙ্গীকার নিয়েছেন। এ মতের সপক্ষে বাহ্যিকভাবে আলোচ্য আয়াত, সূরা আল-বাকারার ২৭ এবং সূরা আল-হাদীদের ৮ নং আয়াতকে তারা তাদের দলীল হিসাবে পেশ করেন। এ ছাড়াও এ মতের সমর্থনে বেশ কিছু হাদীস, সাহাবা-তাবেয়ীনদের উক্তি এবং মুফাসসেরীনদের মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসের বর্ণনায় সৃষ্টিলগ্নের এই প্রতিশ্রুতির আরো কিছু বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। কিছু লোক উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তার কাছে যে উত্তর আমি শুনেছি তা হল এই- "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আদম 'আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করেন। তারপর নিজের হাত যখন তার পিঠে বুলিয়ে দিলেন, তখন তার ঔরসে যত সৎমানুষ জন্মাবার ছিল তারা সব বেরিয়ে এল। তখন তিনি বললেনঃ এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতেরই কাজ করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তার পিঠে হাত বুলালেন। তখন যত পাপী-তাপী মানুষ তার ঔরসে জন্মাবার ছিল, তাদেরকে বের করে আনলেন এবং বললেনঃ এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জাহান্নামে যাবার মতই কাজ করবে"। সাহাবীগণের মধ্যে একজন নিবেদন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, প্রথমেই যখন জান্নাতী ও জাহান্নামী সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে, তখন আর আমল করানো হয় কি উদ্দেশ্যে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "যখন আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে জান্নাত বাসের কাজই করতে শুরু করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কাজের ভেতরেই হয়, যা জান্নাতবাসীদের কাজ। আর আল্লাহ্ যখন কাউকে জাহান্নামের জন্য তৈরী করেন, তখন সে জাহান্নামের কাজই করতে আরম্ভ করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কোন কাজের মাধ্যমেই হয়, যা জাহান্নামের কাজ"। [মুয়াত্তাঃ ২/৮৯৮, মুসনাদে আহমাদঃ ১/৪৪, আবু দাউদঃ ৪৭০৩, তিরমিযীঃ ৩০৭৫, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ১/২৭, ২/৩২৪, ৫৪৪]। অর্থাৎ মানুষ যখন জানে না যে, সে কোন শ্রেণীভুক্ত, তখন তার পক্ষে নিজের সামর্থ্য, শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জান্নাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য যে, সেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ছাড়া অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রথমবারে যারা আদম 'আলাইহিস্ সালামের ঔরস থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল শ্বেতবর্ণ- যাদেরকে বলা হয়েছে জান্নাতবাসী। আর দ্বিতীয়বার যারা বেরিয়েছিল তারা ছিল

'হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম।' এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম[১]।'

১৭৩. কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদের পিতৃপুরুষরাও তো আমাদের আগে শির্ক করেছে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি (শির্কের মাধ্যমে) যারা তাদের আমলকে বাতিল করেছে তাদের কৃতকর্মের জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন[২]?'

أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

কৃষ্ণবর্ণ- যাদেরকে জাহান্নামবাসী বলা হয়েছে। [দেখুন, মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৪১] অপর এক বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে যে, এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জন্মানোর মত যত আদমসন্তান বেরিয়ে এল, তাদের সবার ললাটে একটা বিশেষ ধরনের দীপ্তি ছিল। [দেখুন, তিরমিযী: ৩০৭৬, মুস্তাদরাকে হাকেম: ২/২৮৬]। অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, মহান আল্লাহ্ সবচেয়ে অল্প আযাবে লিপ্ত জাহান্নামবাসীকে জিজ্ঞাসা করবেন, যদি দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব তোমার হয় তাহলে কি তুমি এ আযাবের বিনিময় হিসাবে দিতে? সে বলবে, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমার কাছে তার থেকেও সামান্য জিনিস চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদমের পিঠে ছিলে, তা হল, আমার সাথে শির্ক কর না। কিন্তু তুমি শির্ক ছাড়া কিছু করলে না। [বুখারী: ৩৩৩৪; মুসলিম: ২৮০৫]

(১) এ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ করেছি যাতে তোমরা কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সৃষ্টিলগ্নে তোমাদের অন্তরে ঈমানের মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনকে পালনকর্তা স্বীকার না করে কোন অব্যাহতি থাকবে না। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে অঙ্গীকার নেয়ার আরেকটি কারণ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ অঙ্গীকার আমি এ জন্যও গ্রহণ করেছি, আবার না তোমরা কেয়ামতের দিন এমন কোন ওযর-আপত্তি করতে থাক যে, শির্ক ও পৌত্তলিকতা তো আসলে আমাদের বড়রা অবলম্বন করেছিল, আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরের বংশধর। আমরা তো খাঁটি-অখাঁটি ভুল-শুদ্ধ কোনটাই জানতাম না। কাজেই বড়রা যা কিছু করেছে, আমরাও তাই করেছি। অতএব, বড়দের শাস্তি আমাদেরকে দেয়া হবে কেন? আল্লাহ্ তা'আলা বাতলে দিয়েছেন যে, অন্যের শাস্তি তোমাদেরকে দেয়া হয়নি বরং স্বয়ং তোমাদেরই

১৭৪. আর এভাবে আমরা নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করি যাতে তারা ফিরে আসে[১]।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. আর তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনান[২] যাকে আমরা দিয়েছিলাম নিদর্শনসমূহ, তারপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতঃপর শয়তান

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾

শৈথিল্য ও গাফলতির শাস্তি দেয়া হয়েছে। কারণ, সৃষ্টিলগ্নের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানবাত্মায় এমন এক বীজ রোপন করে দেয়া হয়েছিল যাতে সামান্য চিন্তা করলেই এটুকু বিষয় বুঝতে পারা কঠিন ছিল না যে, একজন স্রষ্টা রয়েছেন, আমাকে তাঁরই ইবাদত করা উচিত। [দেখুন, তাবারী; বাগভী; ফাতহুল কাদীর; মুয়াসসার]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্‌র নিদর্শণাবলী বর্ণনার কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে যে, আমরা নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে কেউ যদি সামান্য লক্ষ্যও করে, তাহলে সে সেই সৃষ্টিলগ্নের প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসতে পারে। অর্থাৎ একটু লক্ষ্য করলেই তারা শির্ক থেকে ফিরে আসবে এবং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের পালনকর্তা হওয়ার স্বীকৃতি দিতে শুরু করবে। তাঁর পথের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতে কোন নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। মুফাসসিরগণ রাসূলের যুগের এবং তাঁর পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে এ দৃষ্টান্তের লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 'বাল'আম ইবন আবার' এর নাম নিয়েছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আবদুল্লাহ ইবন আমর নিয়েছেন উমাইয়া ইবন আবীসসালতের নাম। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস বলেন, এ ব্যক্তি ছিল সাইফী ইবনুর রাহেব। [ইবন কাসীর] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদাহরণ হিসেবে যে বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকা এখানে পেশ করা হয়েছে সে তো পর্দারন্তরালেই রয়ে গেছে। তবে যে ব্যক্তিই এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে তার ব্যাপারে এ উদাহরণটি প্রযোজ্য হবেই। তবে বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে যে, তখনকার দিনে এক লোক ছিল যার দো'আ কবুল হত। যখন মূসা আলাইহিস সালাম শক্তিশালী লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হলেন। তখন লোকেরা তার কাছে এসে বলল, তোমার দো'আ তো কবুল হয়, সুতরাং তুমি মূসার বিরুদ্ধে দো'আ কর। সে বলল, আমি যদি মূসার বিরুদ্ধে দো'আ করি, তবে আমার দুনিয়া ও আখেরাত সবই যাবে। কিন্তু তারা তাকে ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত সে দো'আ করল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবুল হওয়ার সুযোগ রহিত করে দিলেন। [ইবন কাসীর]

তার পিছনে লাগে, আর সে বিপথ গামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৬. আর আমরা ইচ্ছে করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে যমীনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে(১) এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মত; তার উপর বোঝা চাপালে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে এবং বোঝা না চাপালেও জিহ্বা বের করে হাঁপায়(২)।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

---

(১) অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম, দুনিয়ার পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি দিতে পারতাম।[ইবন কাসীর] কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঐ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হল প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেবে, তার জন্য এই জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে।

(২) এখানে যে ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করা হয়েছে সে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী ছিল। অর্থাৎ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত ছিল। এ ধরনের জ্ঞানের অধিকারী হবার কারণে যে কর্মনীতিকে সে ভুল বলে জানতো তা থেকে দূরে থাকা এবং যে কর্মনীতিকে সঠিক মনে করতো তাকে অবলম্বন করাই তার উচিত ছিল। এ যথার্থ জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করলে আল্লাহ তাকে মানবতার উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করতেন। কিন্তু সে দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ ও আরাম আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রবৃত্তির লালসার মুকাবিলা করার পরিবর্তে সে তার সামনে নতজানু হয়। উচ্চতর বিষয়সমূহ লাভের জন্য সে পার্থিব লোভ-লালসার ঊর্ধে উঠার পরিবর্তে তার মধ্যে এমনভাবে ডুবে যায় যার ফলে নিজের সমস্ত উচ্চতর আশা-আকাংখা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা পরিত্যাগ করে বসে। ফলে শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং অনবরত তাকে এক অধঃপতন থেকে আরেক অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে এ যালেম শয়তান তাকে এমন সব লোকের দলে ভিড়িয়ে দেয় যারা তার ফাঁদে পা দিয়ে বুদ্ধি বিবেক সব কিছু হারিয়ে বসেছিল।
এরপর আল্লাহ এ ব্যক্তির অবস্থাকে এমন একটি কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন যার জিভ সবসময় ঝুলে থাকে। তার উপর বোঝা থাকলেও হাঁপাতে থাকে। আর বোঝা না থাকলেও একই অবস্থায় হাঁপাতে থাকে। মুজাহিদ বলেন, এ উদাহরণ দিয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে কিতাব পড়ে কিন্তু তার উপর আমল করে না।[তাবারী;

যে সম্প্রদায় আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করে তাদের অবস্থাও এরূপ। সুতরাং আপনি বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন যাতে তারা চিন্তা করে[১]।

আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ উদাহরণটি কুকুরের জন্য এ উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছে যে, তাকে কোন জ্ঞান ও হিকমতের কথা বললে সে তা নেয়ার মত যোগ্যতা রাখে না। আর যদি তাকে কোন কিছু না দিয়ে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হয়, তবে কোন কল্যাণই বয়ে আনতে পারে না। যেমনিভাবে কুকুর বসে থাকলেও হাঁপাতে থাকে। আর দৌড়ালেও হাঁপায়। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] কারও কারও মতে আয়াতের অর্থ, সে তার পথভ্রষ্টতায় নিপতিত থাকা এবং ঈমানের দিকে আহ্বান জানানো হলে তা দ্বারা উপকৃত না হওয়ার দিক থেকে কুকুরের মত। তার উপর বোঝা চাপলেও সে হাঁপায়, না চাপলেও হাঁপায়। অনুরূপভাবে এ লোকটি উপদেশ ও ঈমানের প্রতি দাওয়াত দ্বারা উপকৃত হয়নি। অন্য আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, "যারা কুফরী করেছে আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তারা ঈমান আনবে না।" [সূরা আল-বাকারাহ: ৬] অন্য আয়াতে এসেছে, "আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন একই কথা; আপনি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৮০] অনুরূপ আরও আয়াতসমূহ। কারও কারও মতে, কাফের, মুনাফিক ও পথভ্রষ্টের অন্তর যেহেতু দুর্বল, হিদায়াতশূন্য থাকে সেহেতু সে খুব বেশী অস্থিরমতি। [ইবন কাসীর]

(১) উল্লেখিত আয়াতগুলোতে চিন্তা করলে যে শিক্ষা আমরা পাই তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলোঃ প্রথমতঃ কারো পক্ষেই নিজের জ্ঞান-গরিমা এবং ইবাদাত-বন্দেগীর ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ, সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী হতে দেরী হয় না। ইবাদাত-বন্দেগীর সাথে সাথে আল্লাহ্র শোকরগোযারী ও তাতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা কর্তব্য। [কুরতুবী] দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ যে সমস্ত উদাহরণ পেশ করেছেন সেগুলোতে গবেষণা করলে জ্ঞান বাড়বে। আর জ্ঞান বাড়লে সেটা অনুযায়ী আমল করতে হবে। [সা'দী] তৃতীয়ত: আল্লাহ্র আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ স্বয়ং একটি আযাব এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরো হাজার রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমত সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত না থাকা তার একান্ত কর্তব্য। চতুর্থত: এমনসব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে স্বীয় দ্বীনী ব্যাপারে ক্ষতির আশংকা থাকে। বিশেষ করে ধন-সম্পদ, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

১৭৭. সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত কত মন্দ! যারা আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করে। আর তারা নিজদের প্রতিই যুলুম করত।

سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত[১]।

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴿١٧٨﴾

১৭৯. আর আমরা তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি[২]; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা তারা শুনে না; তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও বেশী বিভ্রান্ত। তারাই হচ্ছে গাফেল[৩]।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَـٰفِلُونَ ﴿١٧٩﴾

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেসবের উপর আপন নূরের জ্যোতি ফেললেন। যার উপর সে জ্যোতি পড়েছে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে আর যার উপর সে জ্যোতি পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হবে। এজন্য আমি বলি, আল্লাহ্র জ্ঞানের উপর লিখে কলম শুকিয়ে গেছে।’ [তিরমিযীঃ ২৬৪২]

(২) এর অর্থ এটা নয় যে, আমি বিনা কারণে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্যই সৃষ্টি করেছিলাম এবং তাদেরকে সৃষ্টি করার সময় এ সংকল্প করেছিলাম যে, তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করবো। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, আমি তো তাদেরকে হৃদয়, মস্তিষ্ক, কান, চোখ সবকিছুসহ সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু এ বেকুফরা এগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেনি এবং নিজেদের অসৎ কাজের বদৌলতে শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তাদের আমলই তাদেরকে জাহান্নামের উপযুক্ত করেছে। তাদের জাহান্নাম দেয়া আল্লাহ্র ইনসাফের চাহিদা। সে হিসেবে তিনি যেহেতু আগে থেকেই জানেন যে, তারা জাহান্নামে যাবে, সুতরাং তাদেরকে যেন তিনি জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছেঃ এরা কিছুই বোঝে না, কোন কিছু দেখেও না এবং শুনেও না। অথচ বাস্তবে এরা পাগল বা উম্মাদ নয় যে, কিছুই বুঝতে পারে না। অন্ধও

১৮০. আর আল্লাহ্‌র জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক[1]; আর যারা

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا

নয় যে, কোন কিছু দেখবে না, কিংবা বধিরও নয় যে, কোন কিছু শুনবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা পার্থিব বিষয়ে অধিকাংশ লোকের তুলনায় অধিক সতর্ক ও চতুর। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের যা বুঝা বা উপলব্ধি করা উচিত ছিল তারা তা করেনি, যা দেখা উচিত ছিল তা তারা দেখেনি, যা কিছু তাদের শুনা উচিত ছিল তা তারা শুনেনি। আর যা কিছু বুঝেছে, দেখেছে এবং শুনেছে, তা সবই ছিল সাধারণ জীবজন্তুর পর্যায়ের বুঝা, দেখা ও শুনা, যাতে গাধা-ঘোড়া, গরু-ছাগল সবই সমান। এ জন্যই উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশে এসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "এরা চতুস্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত", শুধুমাত্র শরীরের বর্তমান কাঠামোর সেবায় নিয়োজিত। খাদ্য আর পেটই হলো তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর। অতঃপর বলা হয়েছেঃ "এরা চতুস্পদ জীব-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট।" তার কারণ চতুস্পদ জীব-জানোয়ার শরী'আতের বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়- তাদের জন্য কোন সাজা-শাস্তি কিংবা দান-প্রতিদান নেই। তাদের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র জীবন ও শরীর-কাঠামোতে সীমিত থাকে তবেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষকে যে স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সেজন্য তাদের সুফল কিংবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই এসব বিষয়কেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে সাব্যস্ত করে বসা জীবজন্তুর চেয়েও অধিক নিবুর্দ্ধিতা। তাছাড়া জীব-জানোয়ার নিজের প্রভূ ও মালিকের সেবা যথার্থই সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ না-ফরমান মানুষ স্বীয় মালিক, পালনকর্তার আনুগত্যে ক্রটি করতে থাকে। সে কারণে তারা চতুস্পদ জানোয়ার অপেক্ষা বেশী নির্বোধ ও গাফেল। কাজেই বলা হয়েছে "এরাই হলো প্রকৃত গাফেল।" [দেখুন, তাবারী; ইবন কাসীর]

(১) আয়াতে বলা হয়েছে যে, "সব উত্তম নাম আল্লাহ্‌রই জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।" এখানে উত্তম নাম বলতে সে সমস্ত নামকে বুঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকে চিহ্নিত করে। বলাবাহুল্য, কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ স্তর যার ঊর্ধ্বে আর কোন স্তর থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র মহান পালনকর্তা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্টির পক্ষে এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। সে কারণেই আয়াতে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, এসব আসমাউল-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য লাভ করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়; কাজেই এ বিষয়টি যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের কিছু আসমাউল-হুসনা রয়েছে এবং সে সমস্ত 'ইসম' বা নাম একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট, তখন আল্লাহ্‌কে যখনই ডাকবে এসব নামে ডাকাই কর্তব্য। 'দো'আ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, ডাকা কিংবা আহ্বান করা। আর দো'আ শব্দটি কুরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হল আল্লাহ্‌র যিকির, প্রশংসা ও

তাসবীহ্-তাহ্লীলের সাথে যুক্ত। যা ইবাদাতগত দো'আ নামে খ্যাত। আর অপরটি হল নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। যাকে প্রার্থনাগত দো'আ বলা হয়। এ আয়াতে "দো'আ" শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যাপক। অতএব, আয়াতের মর্ম হল এই যে, হামদ, সানা, গুণ ও প্রশংসা, তাসবীহ্-তাহ্লীলের যোগ্যও শুধু তিনিই এবং বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তাঁরই ক্ষমতায়। কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণগান করতে হয়, তবে তাঁরই করবে আর নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদমুক্তির জন্য ডাকতে হলে, সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাঁকেই ডাকবে, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে। আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব আসমাউল-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ দ্বারা ডাকবে যা আল্লাহ্র নাম বলে প্রমাণিত।

বস্তুত: এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতি দো'আ প্রার্থনার বিষয়ে দুটি হেদায়াত বা দিক নির্দেশ লাভ করেছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্তাই প্রকৃত হামদ-সানা কিংবা বিপদমুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যে কোন শব্দে ইচ্ছা ডাকতে থাকবে, বরং আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহপরবশ হয়ে আমাদিগকে সেসব শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন যা তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার উপযোগী। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার গুণ-বৈশিষ্ট্যের সব দিক লক্ষ্য রেখে তাঁর মহত্ত্বের উপযোগী শব্দ চয়ন করতে পারা মানুষের সাধ্যের ঊর্ধ্বে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে-কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি এমন নাম রয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি এগুলোকে আয়ত্ত করে নেয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' [বুখারীঃ ৬৪১০, মুসলিমঃ ২৬৭৭] এই নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও হাকেম সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সরাসরি সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়নি তাই সেগুলো নির্ধারনে কোন অকাট্য কিছু বলা যাবে না। আবার এটা জেনে নেওয়াও জরুরী যে, আল্লাহ্র নাম নিরানব্বইটিতেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ্র নামের অসীলা দিয়ে দো'আ করা জরুরী। আল্লাহ্ স্বয়ং ওয়াদা করেছেনঃ "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব।" [সূরা গাফেরঃ ৬০] আরও বলেনঃ "যখন আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই" [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৮৬] উদ্দেশ্যসিদ্ধি কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য দো'আ ছাড়া অন্য কোন পন্থা এমন নেই যাতে কোন না কোন ক্ষতির আশংকা থাকবে না এবং ফললাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তদুপরি একটা নগদ লাভ হল এই যে, দো'আ যে একটি ইবাদাত তার সওয়াব দো'আকারীর আমলনামায় তখনই লেখা হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ 'দো'আই হল ইবাদাত।' [আবু দাউদঃ ১৪৭৯,

يَعْمَلُوْنَ۝

তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর[১]; তাদের কৃতকর্মের ফল

তিরমিযীঃ ৩২৪৭] যে উদ্দেশ্যে মানুষ দো'আ করে অধিকাংশ সময় হুবহু সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, যে বিষয়টিকে প্রার্থনাকারী নিজের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছিল, তা তার পক্ষে কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে সে দো'আকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন, যা তার জন্য একান্ত উপকারী ও কল্যাণকর। আর আল্লাহ্‌র হামদ ও সানার মাধ্যমে যিক্‌র করা হল ঈমানের খোরাক। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মানুষের মহব্বত ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ও তাতে সামান্য পার্থিব দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হলেও শীঘ্রই তা সহজ হয়ে যায়।

সেজন্যই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে লোক চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী কিংবা কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়া উচিত। তাতে সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে যাবেঃ لَا إِلَه إِلّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمُ، لَا إِلَه إِلّا اللهُ رَبُّ السَموات وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ।' অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি মহান, সহনশীল। আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি আরশের মহান প্রতিপালক। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইবাদতের যোগ্য মা'বূদ নেই, তিনি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক এবং আরশের মহান প্রতিপালক। [বুখারীঃ ৬৩৪৫, মুসলিমঃ ২৭৩০] অন্য এক হাদীসে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লাম ফাতেমা যাহ্‌রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বলেনঃ 'আমার ওসীয়তগুলো শুনে নিতে (এবং সেমতে আমল করতে) তোমার বাধা কিসে? সে ওসীয়তটি হল এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দো'আটি পড়ে নেবে' يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِح لِي شَأْنِي كُلَّه ولَا تَكِلْنِيْ إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ 'হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছুর ধারক! আমি আপনার রাহমাতের বিনিময়ে উদ্ধার কামনা করছি, আমার যাবতীয় ব্যাপার ঠিক করে দিন আর আমাকে আমার নিজের কাছে ক্ষনিকের জন্যও সোপর্দ করেন না'। [তিরমিযীঃ ৩৫২৪, অনুরূপ আবুদাউদঃ ৫০৯০] [সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ]

সারকথা হল এই যে, উল্লেখিত আয়াতের এ বাক্যে উম্মতকে দু'টি হেদায়াত দেয়া হয়েছে। একটি হল এই যে, যে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, যে কোন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কেই ডাকবে। কোন সৃষ্টিকে নয়। অপরটি হল এই যে, তাঁকে সে নামেই ডাকবে যা আল্লাহ্ তা'আলার নাম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে; তার শব্দের কোন পরিবর্তন করবে না।

(১) আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছেঃ সে সমস্ত লোকের কথা ছাড়ুন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে-হুসনার ব্যাপারে বাঁকা চাল অবলম্বন করে। তারা তাদের কৃত বাঁকামীর প্রতিফল পেয়ে যাবে। অভিধান অনুযায়ী 'ইলহাদ' অর্থ

অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে ।

ঝুঁকে পড়া এবং মধ্যমপন্থা থেকে সরে পড়া । কুরআনের পরিভাষায় 'ইলহাদ' বলা হয় সঠিক অর্থ ছেড়ে তাতে এদিক সেদিকের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ জুড়ে দেয়াকে । এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, আপনি এমন সব লোকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে-হুস্নার ব্যাপারে বক্রতা অর্থাৎ অপব্যাখ্যা ও অপবিশ্লেষণ করে ।

আল্লাহ্র নামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির কয়েকটি পন্থাই হতে পারে । আর সে সমস্তই এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত । প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এমন কোন নাম ব্যবহার করা যা কুরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত নয় । সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে কারুরই এমন কোন অধিকার নেই যে, যে যা ইচ্ছা নাম রাখবে কিংবা যে গুণে ইচ্ছা তাঁর গুণাগুণ প্রকাশ করবে । শুধুমাত্র সে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করাই আবশ্যক যা কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহ্ তা'আলার নাম কিংবা গুণ হিসেবে উল্লেখিত রয়েছে । যেমন, আল্লাহ্কে 'কারীম' বলা যাবে, কিন্তু 'ছখী' নামে ডাকা যাবে না । 'নূর' নামে ডাকা যাবে, কিন্তু জ্যোতি ডাকা যাবে না । কারণ, এই দ্বিতীয় শব্দগুলো প্রথম শব্দের সমার্থক হলেও কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি । বিকৃতি সাধনের দ্বিতীয় পন্থাটি হলো আল্লাহ্র যে সমস্ত নাম কুরআন-হাদীসে উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন নামকে অশোভন মনে করে বর্জন বা পরিহার করা । এতে সে নামের প্রতি বেআদবী বা অবজ্ঞা প্রদর্শন বুঝা যায় । বিকৃতির তৃতীয় পন্থা হলো আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত নাম অন্য কোন লোকের জন্য ব্যবহার করা । তবে এতে এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, আসমায়ে-হুসনাসমূহের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলো স্বয়ং কুরআন ও হাদীসে অন্যান্য লোকের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে । আর কিছু নাম রয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো জন্য ব্যবহার করার কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীসে নেই । যেসব নাম আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, সেসব নাম অন্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে । যেমন, রাহীম, রাশীদ, আলী, কারীম, আজীজ প্রভৃতি । পক্ষান্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো জন্য যেসব নামের ব্যবহার কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেগুলো একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট । আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য এগুলোর ব্যবহার করাই উল্লেখিত 'ইল্হাদ' তথা বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত এবং না-জায়েয ও হারাম । যেমন, রাহ্মান, রায্যাক, খালেক, গাফ্ফার, কুদ্দুস প্রভৃতি । [সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ] তদুপরি এই নির্দিষ্ট নামগুলো যদি আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো ক্ষেত্রে কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় যে, যাকে এসব শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হচ্ছে তাকেই যদি খালেক কিংবা রায্যাক মনে করা হয়, তাহলে তা বড় শির্ক । আর বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত না হয়, শুধুমাত্র অমনোযোগিতা কিংবা না বুঝার দরুন কাউকে খালেক, রায্যাক, রাহ্মান বলে ডেকে থাকে, তাহলে তা যদিও কুফর নয়, কিন্তু শির্কীসুলভ শব্দ হওয়ার কারণে কঠিন পাপের কাজ বটে । [আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস]

১৮১. আর যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায়(১) ও সে অনুযায়ীই (বিচারে) ইনসাফ করে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

তেইশতম রুকূ'

১৮২. আর যারা আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, অচিরেই আমরা তাদেরকে এমনভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না(২)।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾

১৮৩. আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি; নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

১৮৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সাথী মোটেই উন্মাদ নন(৩); তিনি তো

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে একদল আল্লাহ্র সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র আদেশকে বাস্তবায়ন করার জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। তাদেরকে কেউ মিথ্যারোপ করবে অথবা অপমান করবে তার পরোয়া তারা করবে না।' [বুখারীঃ ৭৪৬০, মুসলিমঃ ১০৩৭]

(২) অর্থাৎ দুনিয়াতে রিযিক ও জীবনোপকরণের ভাণ্ডার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন। ফলে তারা মনে করবে যে, তারা যা করে চলছে তা গ্রহণযোগ্য। এভাবেই তারা প্রতারিত হতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করবেন। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও এসেছে, "অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমরা তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লসিত হল তখন হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হল। ফলে যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্র জন্যই।" [সূরা আল-আন'আম: ৪৪-৪৫]

(৩) সাথী বলতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘোষণা দিয়েছেন, "আর তোমাদের সাথী উন্মাদ নন" [আত-তাকওয়ীর: ২২] আরও বলেন, "বলুন, 'আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিঃ তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দু-দুজন অথবা এক-একজন করে

نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾

এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. তারা কি লক্ষ্য করে না, আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে?[১] আর এর সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাদের নির্ধারিত সময় নিকটে এসে গিয়েছে, কাজেই এরপর তারা আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে?

দাঁড়াও, তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখ---তোমাদের সাথীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তিনি তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী মাত্র" [সাবা: ৪৬] অর্থাৎ তিনি তাদের মধ্যেই জন্মলাভ করেন। তাদের মধ্যে বসবাস করেন। শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পদার্পন করেন। নবুওয়াত লাভের পূর্বে সমগ্র জাতি তাকে একজন অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট-ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাব প্রকৃতি ও সুস্থ মন-মগজধারী মানুষ বলে জানতো। নবুওয়াত লাভের পর যে-ই তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছাতে শুরু করলেন, অমনি তাকে পাগল বলা আরম্ভ হয়ে গেল। একথা সুস্পষ্ট, নবী হওয়ার আগে তিনি যেসব কথা বলতেন সেগুলোর জন্য তাকে পাগল বলা হয়নি বরং নবী হওয়ার পর তিনি যেসব কথা প্রচার করতে থাকেন সেগুলোর জন্য তাকে পাগল বলা হতে থাকে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে, যে কথাগুলো তিনি বলছেন তার মধ্যে কোন্‌টি পাগলামির কথা? কোন্ কথাটি অর্থহীন, ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক? যদি তারা চিন্তা করতো তাহলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারতো যে, শিরকের মতবাদ খণ্ডন, তাওহীদের প্রমাণ, রবের বন্দেগীর দাওয়াত এবং মানুষের দায়িত্ব পালন ও জবাবদিহি সম্পর্কে তাদের সাথী তাদেরকে যা কিছু বুঝাচ্ছেন তা কোন পাগলের কথা নয়। তাঁর স্বভাব ও চরিত্র সবচেয়ে উন্নত। তার কথা সবচেয়ে সুন্দর। তিনি তো শুধু কল্যাণের দিকেই আহ্বান করেন। অন্যায় ও অকল্যাণ থেকেই শুধু নিষেধ করেন। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীরা তারা কি আসমান ও যমীনে আল্লাহ্‌র রাজত্ব ও ক্ষমতা, এতদুভয়ে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে না? তাহলে তারা এর মাধ্যমে শিক্ষা নিতে পারত যে, এগুলো একমাত্র সে সত্ত্বার জন্য যার কোন দৃষ্টান্ত নেই, নেই কোন সমকক্ষ, ফলে তারা তাঁর উপর ঈমান আনত, তাঁর রাসূলকে সত্য বলে মানত। তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসত। তার জন্য সাব্যস্ত করা যাবতীয় শরীক ও মূর্তি থেকে নিজেদেরকে বিমুক্ত ঘোষণা করত। তাছাড়া তারা এটাও বুঝতে সক্ষম হতো যে, এভাবে তাদের জীবনের মেয়াদও ফুরিয়ে আসছে, তখন যদি কুফরি অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় তবে তাদের স্থান হবে আল্লাহ্‌র আযাবেই। [ইবন কাসীর]

১৮৬. আল্লাহ্ যাদেরকে বিপথগামী করেন তাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেন(১)।

مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭. তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (বলে) 'তা কখন ঘটবে'?(২) বলুন, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার রবেরই নিকট। শুধু তিনিই যথাসময়ে সেটার প্রকাশ ঘটাবেন; আসমানসমূহ ও যমীনে সেটা ভারী বিষয়(৩)। হঠাৎ করেই তা

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ۗ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ۘؔ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٧﴾

(১) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর আল্লাহ্ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আপনার কিছুই করার নেই।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৪১] আরও বলেন, "বলুন, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর।' আর যারা ঈমান আনে না, নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন এমন সম্প্রদায়ের কোন কাজে আসে না" [সূরা ইউনুস: ১০১]

(২) এ আয়াতগুলো নাযিলের পেছনে বিশেষ একটি ঘটনা কার্যকর ছিল। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, জাবাল ইবন আবি কুশাইর ও শামওয়াল ইবন যায়দ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লামের নিকট ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনি কেয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন- এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কেয়ামত কোন সালের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে তো আমরাও জানি। এ ঘটনার ভিত্তিতেই আয়াতটি নাযিল হয়। [তাবারী]

(৩) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে, এক. কিয়ামতের জ্ঞান অত্যন্ত ভারী বিষয়, আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের থেকে তা গোপন রাখা হয়েছে। সুতরাং কোন নবী-রাসূল বা ফেরেশতাকেও আল্লাহ্ সে জ্ঞান দেননি। আর যে কোন জ্ঞান গোপন রাখা হয় তা অন্তরের উপর ভারী হয়ে থাকে। দুই. কিয়ামত এত ভারী সংবাদ যে আসমান ও যমীন সেটাকে সহ্য করতে পারে না। কারণ, আসমানসমূহ ফেটে যাবে, তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। আর সাগরসমূহ শুকিয়ে যাবে। তিন. কিয়ামতের গুণাগুণ বর্ণনা আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের উপর কঠিন। চার. কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা তাদের জন্য এক ভারী বিষয়। [ফাতহুল কাদীর]

তোমাদের উপর আসবে(১) ।' আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানী মনে করে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে । বলুন, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই নিকট,

(১) এ আয়াতে উল্লেখিত الساعة শব্দটি আরবী ভাষায় সামান্য সময় বা মুহূর্তকে বলা হয় । আভিধানিকভাবে যার কোন বিশেষ পরিসীমা নেই । আর গাণিতিকদের পরিভাষায় রাত ও দিনের চব্বিশ অংশের এক অংশকে বলা হয় "সা'আহ্", যাকে বাংলায় ঘন্টা নামে অভিহিত করা হয় । কুরআনের পরিভাষায় এ শব্দটি সে দিবসকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হবে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যুদিবস এবং সেদিনকেও বলা হয় যাতে সমগ্র সৃষ্টি পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে । أيان (আইয়্যানা) অর্থ কবে । আর مُرسى (মুরসা) অর্থ অনুষ্ঠিত কিংবা স্থাপিত হওয়া । يُجَلِّيهَا শব্দটি تجلية থেকে গঠিত । এর অর্থ প্রকাশিত এবং খোলা । بغتة (বাগতাতান) অর্থ অকস্মাৎ । حفي (হাফিয়্যুন) অর্থ আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, জ্ঞানী ও অবহিত ব্যক্তি । প্রকৃতপক্ষে এমন লোককে 'হাফী' বলা হয়, যে প্রশ্ন করে বিষয়ের পরিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে নিতে পারে । [তাবারী] কাজেই আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, এরা আপনার নিকট কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, তা কবে আসবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, এর নির্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার পালনকর্তারই রয়েছে । এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কারো জানা নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পারবে না । নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তা প্রকাশ করে দেবেন । এতে কোন মাধ্যম থাকবে না । কেয়ামতের ঘটনাটি আসমান ও যমীনের জন্যও একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে । সেগুলোও টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকবে । সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার দাবী । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যস্ত থাকবে । এক লোক খরিদদারকে দেখাবার উদ্দেশ্যে কাপড়ের থান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে (সওদাগর) এ বিষয়টিও সাব্যস্ত করতে পারবে না, এরই মধ্যে কেয়ামত এসে যাবে । এক লোক তার উটনীর দুধ দুইয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনো তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে । কেউ নিজের হাউজ মেরামত করতে থাকবে- তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে । কেউ হয়ত খাবারের লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেবার পূর্বেই কেয়ামত হয়ে যাবে ।[বুখারীঃ ৬৫০৬, মুসলিমঃ ২৯৫৪] সুতরাং যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে কেয়ামতকেও-যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর-তাকে গোপন এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান ।

কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না[১] ।’

১৮৮. বলুন, ‘আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই । আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে তো আমি অনেক কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না । ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আমি তো আর কিছুই নই[২] ।’

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ
اللّٰهُ ۗ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ
الْخَيْرِ ۚۛ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۚۛ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ
وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾

(১) বলা হয়েছে, আপনি লোকদিগকে বলে দিন যে, প্রকৃতপক্ষে কেয়ামতের সঠিক তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর কোন ফিরিশ্তা কিংবা নবী-রাসূলগণেরও জানা নেই । তবে হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে কেয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞান দান করা হয়েছে । আর তা হল এই যে, এখন তা নিকটবর্তী । এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বহু বিশুদ্ধ হাদীসে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন । তিনি বলেছেনঃ ‘আমার আবির্ভাব এবং কেয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দু’টি আঙ্গুল’ । [বুখারীঃ ৬৫০৩-৬৫০৫, মুসলিমঃ ২৯৫০]

(২) এ আয়াতে মুশরিক ও সাধারণ মানুষের সেই ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করা হয়েছে; যা তারা নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে পোষণ করত যে, তারা গায়েবী বিষয়েও অবগত রয়েছেন । তাদের এই শির্কী আকীদার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, ইলমে-গায়েব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক ইলম শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলারই রয়েছে । এটা তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য । এতে কোন সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা ফিরিশ্তাই হোক আর নবী ও রাসূলগণই হোক, শির্ক এবং মহাপাপ । তেমনিভাবে প্রত্যেক লাভ-ক্ষতি কিংবা মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক হওয়াও এককভাবে আল্লাহ্ তা‘আলারই গুণ । এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করানোও শির্ক । বস্তুতঃ এই শির্ক বা আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীনের সাথে কোন অংশীদারিত্বের আকীদাকে খণ্ডন করার জন্যই কুরআন নাযিল হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটেছে । তাই এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি ‘আলেমুল-গায়েব নই যে, যাবতীয় পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে । তাছাড়া আমার যদি গায়বী জ্ঞান থাকতই, তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম, কোন একটি

চব্বিশতম রুকূ‘

هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ اِلَيۡهَا‌ ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰٮهَا حَمَلَتۡ حَمۡلًا خَفِيۡفًا فَمَرَّتۡ بِهٖ‌ ۚ فَلَمَّاۤ اَثۡقَلَتۡ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنۡ اٰتَيۡتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوۡنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيۡنَ ﴿۱۸۹﴾

১৮৯. তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়(১)। তারপর যখন সে তার সাথে সংগত হয় তখন সে এক হালকা গর্ভধারণ করে এবং এটা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে। অতঃপর গর্ভ যখন ভারী হয়ে আসে তখন তারা উভয়ে তাদের রব আল্লাহ্‌র কাছে

লাভও আমার হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা রক্ষিত থাকতাম। কখনো কোন ক্ষতি আমার ধারে-কাছে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না। অথচ এতদুভয় বিষয়ের কোনটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেননি। তাছাড়া বহু দুঃখ-কষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম বেঁধে সাহাবায়ে কেরামের সাথে উমরা করার উদ্দেশ্যে হারাম শরীফের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যান, কিন্তু হারাম শরীফে প্রবেশ কিংবা উমরা করা তখনো সম্ভব হতে পারেনি; সবাইকে ইহ্‌রাম খুলে ফিরে আসতে হয়েছে। তেমনিভাবে ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হন এবং মুসলিমদেরকে সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরো বহু অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে সংঘটিত হয়েছে। এ সবগুলো থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি গায়েবের জ্ঞান রাখেন না। শুধু ততটুকুই জানেন, যতটুকু আল্লাহ্ তাদের জানিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার পর সেটা জানাকে আর গায়েবের জ্ঞান বলা যাবে না।

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাওয়াকে আদম থেকে সৃষ্টি করার কারণ হচ্ছে, তার কাছে গেলে মন প্রশান্ত হবে। তার সাথে সহজ সম্পর্ক তৈরী হবে, সন্তুষ্টি আসবে। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে যে, তিনি সন্তান-সন্ততিদেরকেও একই উদ্দেশ্যে মানুষকে প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, “আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহমর্মিতা। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।” [সূরা আর-রূম: ২১]

প্রার্থনা করে, 'যদি আপনি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন তাহলে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব ।'

১৯০. অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সুসন্তান দান করেন, তখন তারা তাদেরকে তিনি যা দিয়েছেন সেটাতে আল্লাহ্‌র বহু শরীক নির্ধারণ করে[১]; বস্তুত তারা যাদেরকে (তাঁর সাথে) শরীক করে আল্লাহ্ তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে[২] ।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾

---

(১) কাতাদা বলেন, হাসান বসরী বলতেন, এর দ্বারা ইয়াহূদী ও নাসারাদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করেন, কিন্তু তারা সেগুলোকে ইয়াহূদী কিংবা নাসারা বানিয়ে ছাড়ে । [তাবারী; ইবন কাসীর]

(২) ইয়াহূদী ও নাসারা ছাড়াও বাস্তবে যারাই আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামতকে অন্যের জন্য নির্দিষ্ট করে তারাও এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে । কারণ মহান সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহই সর্বপ্রথম মানব জাতিকে সৃষ্টি করেন । মুশরিকরাও এ কথা অস্বীকার করে না । তারপর পরবর্তী কালের প্রত্যেকটি মানুষকেও তিনি অস্তিত্ব দান করেন । আর একথাটিও মুশরিকরা জানে । তাই দেখা যায়, গর্ভাবস্থায় সুস্থ, সবল ও নিখুঁত অবয়বধারী শিশু ভূমিষ্ঠ হবার ব্যাপারে আল্লাহর উপরই পূর্ণ ভরসা করা হয় । কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হয়ে যদি চাঁদের মত ফুটফুটে সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলেও জাহেলী কর্মকাণ্ড নবতর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে । কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন দেবী, অবতার, অলী ও পীরের নামে নজরানা ও শিন্নি নিবেদন করা হয় এবং শিশুকে এমন সব নামে অভিহিত করা হয় যেন মনে হয় সে আল্লাহর নয়, বরং অন্য কারোর অনুগ্রহের ফল । যেমন তার নামকরণ করা হয় হোসাইন বখশ, (হোসাইনের দান) পীর বখশ (পীরের দান), আব্দুর রাসূল (রাসূলের দাস), আবদুল উয্‌যা (উয্‌যার দাস), আবদে শামস (সূর্য দেবতার দাস) ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

আরবের মুশরিক সম্প্রদায়ের অপরাধ ছিল এই যে, তারা সুস্থ, সবল ও পূর্ণ অবয়ব সম্পন্ন সন্তান জন্মের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করতো কিন্তু সন্তানের জন্মের পর আল্লাহর এ দানে অন্যদেরকে অংশীদার করতো । নিঃসন্দেহে তাদের এ অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ । কিন্তু বর্তমানে তাওহীদের দাবীদারদের মধ্যে আমরা যে শির্কের চেহারা দেখছি তা তার চাইতেও খারাপ । এ তাওহীদের তথাকথিত দাবীদাররা সন্তানও চায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে । গর্ভ সঞ্চারের পর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের নামে মানত মানে এবং সন্তান জন্মের পর তাদেরই আস্তানায় গিয়ে

১৯১. তারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট(১),

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾

১৯২. ওরা না তাদেরকে সাহায্য করতে পারে আর না নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে(২)।

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾

নজরানা নিবেদন করে। এরপরও জাহেলী যুগের আরবরাই কেবল মুশরিক, আর এরা নাকি পাক্কা তাওহীদবাদী !!

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করছেন, যারা আল্লাহ্র সাথে মূর্তি, দেব-দেবী ইত্যাদিকে শরীক করে। অথচ তারা সৃষ্ট, মানুষের হাতের তৈরী। তারা কিছুরই মালিক নয়। ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। উপাসনাকারীদের পক্ষে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। বরং এগুলো হচ্ছে, মৃত। নড়াচড়া কিংবা শোনা বা দেখার ক্ষমতাও তাদের নেই। বরং উপাসনাকারীরা এগুলোর চেয়ে বেশী শক্তিশালী; কারণ তাদের চোখ আছে, কান আছে, তারা পাকড়াও করার ক্ষমতা রাখে। তাহলে তোমরা কিভাবে তাদের ইবাদত করছ যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করেনি? কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতাও যাদের নেই? [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ বলেছেন, "হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগের সাথে তা শোন: তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হলেও। এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের কাছ থেকে, এটাও তারা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষনকারী ও অন্বেষনকৃত কতই না দুর্বল; তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি যেমন মর্যাদা দেয়া উচিত ছিল, আল্লাহ্ নিশ্চয় ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।" [সূরা হজ-৭৩-৭৪] আল্লাহ্ বলেন, যে, তাদের উপাস্যগুলো সবাই একত্রিত হলেও কোন একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না। বরং যদি মাছি এ সমস্ত উপাস্যদের কোন নিকৃষ্ট খাবার নিয়ে উড়ে চলে যায়, তারা সেটাও মাছির কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। যার অবস্থা হচ্ছে এই, রিযক কিংবা সাহায্য লাভের জন্য কিভাবে ইবাদত তার করা হবে? [ইবন কাসীর]

(২) এমনকি কেউ তাদের ক্ষতি করতে চাইলেও তারা নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ সমস্ত মা'বুদদেরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন এবং এ বিষয়টি নিয়ে মুশরিকদের উপাস্যদেরকে অপমান করতে ছাড়েন নি। আল্লাহ্ বলেন, "তারপর ইবরাহীম তাদের উপর সবলে আঘাত হানলেন।" [সূরা আস-সাফফাত: ৯৩] আরও বলেন, "তারপর তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন মূর্তিগুলোকে, তাদের প্রধানটি ছাড়া ; যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৫৮] [ইবন কাসীর]

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. আর তোমরা তাদেরকে সৎপথে ডাকলেও তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে না; তোমরা ওদেরকে ডাক বা চুপ থাক, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান(১)।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪. আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরই মত বান্দা; সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাক, অতঃপর তারা যেন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. তাদের কি পা আছে যা দিয়ে ওরা চলে? তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে ওরা ধরে? তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে ওরা দেখে? কিংবা তাদের কি কান আছে যা দিয়ে ওরা শুনে? বলুন, 'তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক করেছ তাদেরকে ডাক তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না(২)';

---

(১) অর্থাৎ মুশরিকদের বাতিল মা'বুদদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের পক্ষে কাউকে সঠিক পথ দেখানো এবং নিজেদের অনুগামী ও পূজারীদেরকে পথের সন্ধান দেয়া তো দূরের কথা, তারা তো কোন পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করারও যোগ্যতা রাখে না। এমন কি কোন আহবানকারীর আহবানের জবাব দেবার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাদেরকে কেউ ডাকল কি তাদেরকে পিষে ফেলল, সবই তাদের কাছে সমান। একথাটিই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পিতাকে বলেছিলেন, "যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, 'হে আমার প্রিয় পিতা! আপনি তার 'ইবাদাত করেন কেন যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোন কাজেই আসে না?" [সূরা মারইয়াম:৪২] [ইবন কাসীর]

(২) এখানে আল্লাহ্ ছাড়া তারা যাদের আহ্বান করে, যাদের ইবাদত করে, যাদের প্রতি তাদের আশা-আকাঙ্খা ও ভয়-ভীতি পোষণ করে, তাদের অপারগতা ও অসহায়তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের

১৯৬. 'আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন(১) ।

إِنَّ وَلِـِّۧيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ ١٩٦

আহ্বান করে থাক, তাদের কি পাকড়াও করার মত সত্যিকারের হাত আছে? নাকি তাদের সত্যিকারের চোখ আছে যে, তারা দেখবে? নাকি তাদের সত্যিকারের কান আছে যে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে? মানুষের কাছে যে সমস্ত শক্তি আছে তাদের কাছে তো তাও নেই । যদি এগুলো তোমাদের কোন কাজেই না আসে, তোমাদের আহ্বানেও সাড়া না দেয়, তারা তোমাদের মতই বান্দা বরং তোমরা তাদের থেকেও পরিপূর্ণ, তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমরা তাদের ইবাদত কর? তোমরা ও তোমাদের উপাস্যরা একত্রিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, আমাকে কোন প্রকার অবকাশ দিও না । দেখতে পাবে যে, তোমরা আমার কোন ক্ষতি পৌঁছাতে সক্ষম নও । [সা'দী]

(১) এখানে 'ওলী' অর্থ রক্ষাকারী' সাহায্যকারী, অভিভাবক । আর 'কিতাব' অর্থ কুরআন । 'সালেহীন' অর্থ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার ভাষায় সে সমস্ত লোক, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করে না । এতে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলিম পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভুক্ত । আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তোমাদের বিরোধিতার কোন ভয় আমার এ কারণেই নেই যে, আমার রক্ষাকারী, সাহায্যকারী ও অভিভাবক হলেন আল্লাহ্, যিনি আমার উপর কুরআন নাযিল করেছেন । এখানে আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত গুণাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে কুরআন নাযিল করার গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা যে আমার শত্রুতা ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে আছ তার কারণ হচ্ছে যে, আমি তোমাদেরকে কুরআনের শিক্ষা দেই এবং কুরআনের প্রতি আহ্বান করি । কাজেই যিনি আমার উপর কুরআন নাযিল করেছেন তিনিই আমার সাহায্যদাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী । অতএব, আমার কি চিন্তা?

আয়াতের শেষ বাক্যটিতে একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণের মর্যাদা তো বহু উর্ধ্বে, সাধারণ সৎ মুসলিমদের জন্যও আল্লাহ্ সহায়, রক্ষাকারী ও অভিভাবক । অর্থাৎ আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট । তিনিই আমার সাহায্যকারী, তাঁর উপরই আমার ভরসা । আর তাঁর কাছেই আমি আশ্রয় চাই । দুনিয়া ও আখেরাতে তিনিই আমার অভিভাবক । আর আমার পরে প্রত্যেক নেককার বান্দারও তিনি অভিভাবক । [ইবন কাসীর] এ আয়াতের সমর্থনে অন্যত্র এসেছে, "আমরা তো এটাই বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে ।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা শরীক কর, 'আল্লাহ্ ছাড়া । সুতরাং তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর; তারপর

১৯৭. আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তারা তাদের নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٧﴾

১৯৮. আর যদি আপনি তাদেরকে সৎপথে ডাকেন তবে তারা শুনবে না[১] এবং আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে; অথচ তারা দেখে না[২]।

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا۟ ۖ وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾

১৯৯. মানুষের (চরিত্র ও কর্মের) উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন[৩]।

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

আমাকে অবকাশ দিও না। আমি তো নির্ভর করি আমার ও তোমাদের রব আল্লাহ্‌র উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয় ; নিশ্চয় আমার রব আছেন সরল পথে।" [সূরা হূদ: ৫৪-৫৬]

(১) অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না।" [সূরা ফাতের: ১৪]

(২) অর্থাৎ এ উপাস্যদের দিকে তাকালে মনে হবে যেন, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। বস্তুত: তারা তাদের এ নির্জীব চোখ দিয়ে তোমাদের দিকে তাকাতে দেখলেও তারা কিন্তু তোমাদের দেখতে পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। [ইবন কাসীর]

(৩) আলোচ্য আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম চরিত্রের হেদায়াত দেয়া হয়েছে। [সা'দী] তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, আপনি عفو গ্রহণ করুন। এখানে উল্লেখিত العفو শব্দটির আরবী অভিধান মোতাবেক একাধিক অর্থ হতে পারে এবং একত্রে সব ক'টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তাফসীরবিদ আলেমগণের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। (এক) অধিকাংশ তাফসীরকার যে অর্থ নিয়েছেন তা হল এই যে, عفو বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে, যা সহজে কোন রকম আয়াস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে। [ইবন কাসীর] তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ অনায়াসে করতে পারে। অর্থাৎ শরী'আত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে

আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবী করবেন না; বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। মুফাসসিরগণের মতে, এ আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষের আমল-আখলাকের ব্যাপারে সাধারণ আনুগত্য কবূল করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ মানুষ যা করতে পারে তার প্রকাশ্য রূপ দেখেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। তাদের প্রকৃতি যেটা করতে সমর্থ নয় সেটা তাদের উপর চাপিয়ে দেব না। তাদের ভুল-ত্রুটি হলে সেটা উপেক্ষা করে যাব। তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করব না [ইবন কাসীর; সা'দী; ফাতহুল কাদীর] (দুই) عفو এর অপর অর্থ ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেয়াও হয়ে থাকে। তাফসীরকার আলেমগণের এক দল এক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম সাব্যস্ত করেছেন এই যে, আপনি পাপী-অপরাধীদের ক্ষমা করে দিন। [ইবন কাসীর, যায়দ ইবন আসলাম হতে]

আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে, আপনি عرف এর নির্দেশ দিন। এখানে العرف শব্দটির অর্থ, সৎকাজ বা পরিচিত কাজ। যে কোন ভাল ও প্রশংসনীয় কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে সৎকাজেরও উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়নীতির মাধ্যমেই নয়; বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

আয়াতের তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে, আপনি জাহেল বা মূর্খদেরকে উপেক্ষা করুন। যারা জাহেল তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণকর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং একান্ত কোমলতার সাথে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে যারা এহেন ভদ্রোচিত আচরণে প্রভাবিত হয় না; বরং এমতাবস্থায়ও তারা মূর্খজনোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এমন ধরনের লোকদের সাথে আপনার আচরণ হবে এই যে, তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খ-জনোচিত কথা-বার্তায় দুঃখিত হয়ে তাদেরই মত ব্যবহার আপনিও করবেন না; বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন। তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে-কাসীর রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ দূরে সরে থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের হেদায়াত করাও বর্জন করতে হবে। কারণ, এটা রিসালাত ও নবুওয়তের দায়িত্ব এবং মর্যাদার যোগ্য নয়।

এক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা রয়েছে যে, উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খেলাফত আমলে উয়াইনাহ্ ইবনে হিসন একবার মদীনায় আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র হুর ইবন কায়সের মেহমান হয়। হুর ইবনে কায়স ছিলেন সে সমস্ত বিজ্ঞ আলেমদের একজন যারা ফারূকে আযম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়াইনাহ্ স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র

২০০. আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[১]।

وَاِمَّا يَنۡزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ۝٢٠٠

হুরকে বললঃ তুমি তো আমীরুল মু'মীনের একজন অতি ঘনিষ্ঠ লোক; আমার জন্য তার সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এসো। হুর ইবনে কায়স রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়াইনাহ্ আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চান। তখন তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু উয়াইনাহ্ উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দরবারে উপস্থিত হয়েই একান্ত অমার্জিত ও ভ্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগল যেঃ 'আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ'। উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হুর ইবন কায়স নিবেদন করলেনঃ 'হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন, "আপনি ক্ষমা করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন" আর এ লোকটিও জাহেলদের একজন'। এই আয়াতটি শোনার সাথে সাথে উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোন কিছুই বললেন না। উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল যে, আল্লাহ্‌র কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ। [বুখারীঃ ৪৬৪২]

(১) এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ, এতে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করে এবং মূর্খজনোচিত ব্যবহার করে, তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ বিষয়টি মানব প্রকৃতির পক্ষে একান্তই কঠিন। বিশেষতঃ এমন পরিস্থিতিতে সৎ এবং ভাল মানুষদেরকেও শয়তান রাগান্বিত করে লড়াই-ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করেই ছাড়ে। সে জন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বুঝবেন শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হল আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়া, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লামের সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। তারপর বললেনঃ বাক্যটি হল এই أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ সে লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তার রোষানল প্রশমিত হয়ে গেল। [বুখারীঃ ৩২৮২, ৬০৪৮, ৬১১৫, মুসলিমঃ ২৬১০, ইবন হিব্বানঃ ৫৬৯২, আবু দাউদঃ ৪৭৮০, তিরমিযীঃ ৩৪৫২,

২০১. নিশ্চয় যারা তাক্ওয়া অবলম্বন ক র ছ, তা দর ক শয়তান যখন কুমন্ণা[১] দেয় তখন তারা আল্লাহ্‌কে রণ ক র এবং সা থ সা থই তা দর চাখ খু ল যায়[২] ।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾

২০২. তা দর সঙ্গী-সাথীরা তা দর ক ভু লর দি ক ট ন নয়। তারপর এ বিষ য় তারা কান টি ক র না[৩] ।

وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِى الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৪৪,নাসায়ী, আমলুল ইয়াওমে ওয়াল্লাইলাঃ৩৯৩] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়ালে তিনবার তাকবীর বলতেন, তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেন, সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী তিনবার বলতেন, তারপর বলতেনঃ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই, তার কুমন্ত্রণা হতে, অহংকার হতে, তার হাতে মৃত্যু হওয়া থেকে। [আবু দাউদঃ ৭৬৪, ইবন মাজাহঃ ৮০৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৮৫]

(১) মূল আরবী হচ্ছে, طائف। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ ক্রোধ। [তাবারী] ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ শয়তানের কোন ছোঁয়া বা স্পর্শ। [তাবারী]

(২) শয়তান যেহেতু ইসলামের পথের দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজটির উন্নতি কখনো দু'চোখে দেখতে পারে না তাই সে হামেশাই এ ব্যাপারে প্রতিকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা মুত্তাকী তারা নিজেদের মনে কোন শয়তানী প্ররোচনার প্রভাব এবং কোন অসৎ চিন্তার ছোঁয়া অনুভব করতেই সাথে সাথেই সজাগ হয়ে উঠে। তারপর এ পর্যায়ে কোন্ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বনে দ্বীনের স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং সত্য প্রীতির প্রকৃত দাবী কি তা তারা পরিষ্কার দেখতে পায়। তারা তাওবা করে এবং প্রচুর পরিমাণে সৎকাজ করে। ফলে শয়তান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যাদের কাজের সাথে স্বার্থপ্রীতি অংগাংগীভাবে জড়িত এবং এ জন্য শয়তানের সাথে যাদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তারা অবশ্যি শয়তানী প্ররোচনার মোকাবিলায় টিকে থাকতে পারে না এবং তার কাছে পরাজিত হয়ে ভুল পথে পা বাড়ায়। একের পর এক খারাপ ও পাপের পথে শয়তান তাদেরকে নিয়ে যায়। এসব কাজ করতে তারা সামান্যতমও পিছপা হয় না। সুতরাং শয়তান তাদের পথভ্রষ্টতায় কমতি করে না। আর তারাও খারাপ কাজে যেতে কসূর করে না। [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ শয়তান মানুষদের মধ্যে যাদেরকে তাদের অনুগত পায়, তাদেরকে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত করতেই থাকে। তারপর শয়তানরা তাদেরকে প্ররোচনা দিতেই থাকে,

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৩. আপনি যখন তাদের কাছে (তাদের চাওয়া মত) কোন আয়াত[1] নিয়ে আসেন না, তখন তারা বলে, 'আপনি নিজেই একটি আয়াত বানিয়ে নেন না কেন?' বলুন, 'আমার রবের পক্ষ থেকে যা আমার কাছে ওহী হিসেবে প্রেরণ করা হয়, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি। এ কুরআন তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ। আর হিদায়াত ও রহমত এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে[2]।

এ ব্যাপারে তারা কোন প্রকার কমতি করে না। অনুরূপভাবে শয়তানের অনুসারীরাও শয়তানরা তাদেরকে যে সমস্ত গর্হিত কাজের প্ররোচনা দেয় সেগুলোর উপর আমল করতে সামান্যতম কুণ্ঠিত হয় না। [মুয়াসসার] সুতরাং অন্যায় কাজে তারা একে অপরের সহযোগী। তারা সর্বক্ষণ পথভ্রষ্টতাতেই লিপ্ত থাকে। তাদের কাছে কোন প্রকার ওয়ায নসীহত আসলেও তা কাজে লাগে না। ওয়ায ও নসীহত তাদের চক্ষু খুলে দেয় না, যেমনটি পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়লেও ওয়ায-নসীহত পেলে তাদের চোখ খুলে যায় এবং তারা অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসে। কিন্তু যারা খারাপ লোক তারা শয়তানের প্ররোচনা ও ভ্রষ্টতাতেই লিপ্ত থাকে। তারা কখনো চক্ষুষ্মান হয় না। [জালালাইন]

(১) এখানে আয়াত বলে মু'জিযা ও অলৌকিক কিছু প্রদর্শনের কথা বোঝানো হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আমরা ইচ্ছে করলে আসমান থেকে তাদের কাছে এক নিদর্শন নাযিল করতাম, ফলে সেটার প্রতি তাদের ঘাড় বিনত হয়ে পড়ত" [সূরা আশ-শু'আরা:৪] কারণ মক্কার কুরাইশ ও কাফেররা সবসময় এটা বলত যে, আপনি কষ্ট করে এমন একটি মু'জিযা নিয়ে আসেন না কেন, যা দেখে আমরা ঈমান আনতে বাধ্য হয়ে যাই। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে বলছেন যে, আপনি বলুন, মু'জিযা নিয়ে আসা আমার কাজ নয়। আমি তো শুধু আমার রবের ওহীর অনুসরণ করি। তিনি যদি কোন মু'জিযা আমাকে প্রদান করেন আমি সেটা গ্রহণ করি। আর যদি না দেন তবে আমি নিজের পক্ষ থেকে সেটা চেয়ে নেই না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা কুরআন গ্রহণ করার প্রতি পথনির্দেশ করলেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ এই কুরআন তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আগত বহুবিধ দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনের এক সমাহার। এতে সামান্য লক্ষ্য করলেই একথা বিশ্বাস না করে উপায়

২০৪. আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুন এবং নিশ্চুপ হয়ে থাক যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়[১]।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

২০৫. আর আপনি আপনার রবকে নিজ মনে স্মরণ করুন[২] সবিনয়ে, সশংকচিত্তে

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً

থাকে না যে, এটি যথার্থই আল্লাহ্‌র কালাম। এতে কোন সৃষ্টিরই কোন হাত নেই। অতঃপর বলা হয়েছেঃ এই কুরআন সারা বিশ্বের জন্য সত্য দলীল তো বটেই, তদুপরি যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ্‌র রহমত ও হেদায়াত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার অবলম্বনও বটে।

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুরআন মুমিনদের জন্য রহমত। কিন্তু এই রহমতের দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত ও প্রক্রিয়া রয়েছে, যা সাধারণ সম্বোধনের মাধ্যমে এভাবে বলা হয়েছে- "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা সবাই তার প্রতি কান লাগিয়ে চুপচাপ থাকবে"। তবে আয়াতের হুকুমটি কি সালাতের কুরআন পাঠ সংক্রান্ত, না কোন বয়ান-বিবৃতিতে কুরআন পাঠের ব্যাপার, নাকি সাধারণভাবে কুরআন পাঠের বেলায়; তা সালাতেই হোক অথবা অন্য যে কোন অবস্থায় হোক। এ ব্যাপারে মত পার্থক্য রয়েছে। [বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীর ইবন কাসীর দ্রষ্টব্য] এখানে প্রকৃত বিষয় হল এই যে, কুরআনুল কারীমকে যাদের জন্য রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেজন্য শর্ত হচ্ছে যে, তাদেরকে কুরআনের আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে। আর কুরআনের বড় আদব হলো এই যে, যখন তা পাঠ করা হয়, তখন শ্রোতা সেদিকে কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকবে। [সা'দী]

(২) স্মরণ করা অর্থ নামাযও এবং অন্যান্য ধরনের স্মরণ করাও। চাই মুখে মুখে বা মনে মনে যে কোনভাবেই তা হোক না কেন। সকাল-সাঁঝ বলতে সুনির্দিষ্টভাবে এ দু'টি সময়ও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আর এ দু' সময়ে আল্লাহর স্মরণ বলতে বুঝানো হয়েছে সকালের ও বিকালের নামাযকে। [তাবারী] অনুরূপ অর্থে অপর সূরায় এসেছে, "এবং আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে" [সূরা কাফ: ৩৯] পক্ষান্তরে সকাল-সাঁঝ কথাটা "সর্বক্ষণ" অর্থেও ব্যবহৃত হয় [কাশশাফ] এবং তখন এর অর্থ হয় সবসময় আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকা। এর উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, তোমাদের অবস্থা যেন গাফেলদের মত না হয়ে যায়। দুনিয়ায় যা কিছু গোমরাহী ছড়িয়েছে এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রে ও কর্মকাণ্ডে যে বিপর্যয়ই সৃষ্টি হয়েছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, মানুষ ভুলে যায়, আল্লাহ তার রব, সে আল্লাহর বান্দা, দুনিয়ার জীবন শেষ হবার পর তাকে তার রবের কাছে হিসাব দিতে হবে।

وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝٢٠٥

ও অনুচ্চস্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۝٢٠٦

২০৬. নিশ্চয় যারা আপনার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তাঁর ইবাদাতের ব্যাপারে অহঙ্কার(১) করে না। আর তারা তাঁরই তাসবীহ পাঠ করে(২) এবং তাঁরই জন্য সিজ্‌দা(৩) করে।

---

(১) যারা আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছেন তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করা ও রবের বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া শয়তানের কাজ। এর ফল হয় অধঃপতন ও অবনতি। পক্ষান্তরে আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়া এবং তাঁর বন্দেগীতে অবিচল থাকা একটি ফেরেশ্‌তাসুলভ কাজ। এর ফল হয় উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ। যদি তোমরা এ উন্নতি চাও তাহলে নিজেদের কর্মনীতিকে শয়তানের পরিবর্তে ফেরেশ্‌তাদের কর্মনীতির অনুরূপ করে গড়ে তোল।

(২) আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করে অর্থাৎ আল্লাহ যে ত্রুটিমুক্ত, দোষমুক্ত, ভুলমুক্ত সব ধরনের দুর্বলতা থেকে তিনি যে একেবারেই পাক-পবিত্র এবং তিনি যে লা-শরীক, তুলনাহীন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এ বিষয়টি সর্বান্তকরণে মেনে নেয়। মুখে তার স্বীকৃতি দেয় ও অংগীকার করে এবং স্থায়ীভাবে সবসময় এর প্রচার ও ঘোষণায় সোচ্চার থাকে।

(৩) এখানে সালাত সংক্রান্ত ইবাদাতের মধ্য থেকে শুধু সিজ্‌দার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সালাতের সমগ্র আরকানের মধ্যে সিজ্‌দার একটি বিশেষ ফযীলত রয়েছে। হাদীসে রয়েছে যে, 'কোন এক লোক সওবান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমাকে এমন একটা আমল বাতলে দিন যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। সওবান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নীরব রইলেন; কিছু বললেন না। লোকটি আবার নিবেদন করলেন, তখনও তিনি চুপ করে রইলেন। এভাবে তৃতীয়বার যখন বললেন, তখন তিনি বললেনঃ আমি এ প্রশ্নটিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে করেছিলাম। তিনি আমাকে ওসীয়ত করেছিলেন যে, অধিক পরিমাণে সিজ্‌দা করতে থাক। কারণ, তোমরা যখন একটি সিজ্‌দা কর তখন তার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মর্যাদা এক ডিগ্রি বাড়িয়ে দেন এবং একটি গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। লোকটি বললেনঃ সওবান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে আলাপ করার পর আমি আবুদদারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছেও একই নিবেদন করলাম এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন। [মুসলিমঃ ৪৮৮]

অন্য এক হাদীসে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘বান্দা স্বীয় রবের সর্বাধিক নিকটবর্তী তখনই হয়, যখন সে বান্দা সিজ্‌দায় অবনত থাকে। কাজেই তোমরা সিজ্‌দারত অবস্থায় খুব বেশী করে দো‘আ-প্রার্থনা করবে। তাতে তা কবুল হওয়ার যথেষ্ট আশা রয়েছে। [মুসলিমঃ ৪৭৯, ৪৮২]

সুরা আল-আ‘রাফের শেষ আয়াতটি হল আয়াতে সিজ্‌দা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘কোন আদম সন্তান যখন কোন সিজ্‌দার আয়াত পাঠ করে অতঃপর সিজ্‌দায়ে তেলাওয়াতে সম্পন্ন করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে যে, আফসোস, মানুষের প্রতি সিজ্‌দার হুকুম হল আর সে তা আদায়ও করল, ফলে তার ঠিকানা হল জান্নাত, আর আমার প্রতিও সিজ্‌দার হুকুম হয়েছিল, কিন্তু আমি তার না-ফরমানী করেছি বলে আমার ঠিকানা হল জাহান্নাম।’ [মুসলিমঃ ১৩৩]

৮- সূরা আল-আনফাল



সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ৭৫ ।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ এ সূরা সর্বসম্মতভাবে মাদানী সূরা ।

নামকরণঃ এ সূরার নাম সূরা আল-আনফাল; কারণ সূরার প্রথম আয়াতেই এ শব্দটির উল্লেখ আছে, যার অর্থ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ । এর অধিকাংশ বর্ণনা এ সংক্রান্ত । কেউ কেউ এটাকে সূরা 'বদর'ও নাম দিয়েছেন ।[বুখারীঃ ৪৮৮২] কারণ, অধিকাংশ আলোচনা ছিল বদর যুদ্ধের । আবার কেউ কেউ এ সূরাকে সূরা 'জিহাদ' নামেও অভিহিত করেছেন ।

নাযিল হওয়ার সময়কালঃ সূরা আল-আনফাল সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে । [বুখারীঃ ৪৬৪৫, মুসলিমঃ ৩০৩১] । সে হিসেবে এই সূরা ২য় হিজরী সনে বদর যুদ্ধের পরেই নাযিল হয়েছে ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ

১. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে[১]

(১) এ আয়াতটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত । আয়াতের বিস্তারিত তাফসীরের পূর্বে সে ঘটনাটি জানা থাকলে এর তাফসীর বুঝতে সহজ হবে । ঘটনাটি হল এই যে, কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে যখন মুসলিমদের বিজয় সূচিত হয়ে গেল এবং কিছু গনীমতের মাল-সামান হাতে এল, তখন সেগুলোর বিলি-বন্টন নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ হয়,যার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয় । [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩২২] বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উবাদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট কোন এক ব্যক্তি আয়াতে উল্লেখিত 'আনফাল' শব্দের মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'এ আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে । সে ঘটনাটি ছিল এই যে, গনীমতের মালামাল বিলি-বন্টনের ব্যাপারে আমাদের মাঝে সামান্য মতবিরোধ হয়ে গিয়েছিল, যাতে আমাদের পবিত্র চরিত্রে একটি অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে গনীমতের সমস্ত মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে অর্পণ করেন । আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে তা সমভাবে বন্টন করে দেন' ।

অন্য এক হাদীসে উবাদা ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'বদরের যুদ্ধে আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'আলা যখন শত্রুদের পরাজিত করেন, তখন আমাদের সেনাবাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় । কিছু লোক শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, যাতে তারা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে । কিছু

আনফাল[১] (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) সম্বন্ধে; | وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

লোক কাফেরদের পরিত্যক্ত গনীমতের মালামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। আর কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে এসে সমবেত হন, যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোন শত্রু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধ শেষে সবাই যখন নিজেদের অবস্থানে এসে উপস্থিত হন, তখন যারা গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলেন, তারা বলতে লাগলেন যে, এ সমস্ত মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, কাজেই এতে আমাদের ছাড়া অপর কারো ভাগ নেই। আর যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েছিলেন, তারা বললেন, এতে তোমরা আমাদের চাইতে বেশী অধিকারী নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনীমতের মালামালগুলো সংগ্রহ করে আনতে পার। পক্ষান্তরে যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযতকল্পে তার পাশে সমবেত ছিলেন, তারা বললেন, আমরাও ইচ্ছা করলে গনীমতের এই মাল সংগ্রহে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা জিহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযতে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর অধিকারী। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম-দের এসব কথাবার্তা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছার পর এ আয়াতটি নাযিল হয়। এতে পরিস্কার হয়ে যায় যে, এসব মালামাল আল্লাহ্ তা'আলার; একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতিত এর অন্য কোন মালিক বা অধিকারী নেই; শুধু তাকে ছাড়া, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর নির্দেশ অনুযায়ী এসব মালামাল জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেন'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩২৪] অতঃপর সবাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের এই সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন।

(১) أَنْفَالٌ শব্দটি نَفْلٌ এর বহুবচন। এর অর্থ অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল সালাত, রোযা, সদকা প্রভৃতিকে এ কারণেই 'নফল' বলা হয় যে, এগুলো কারো উপর অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজিব নয়। যারা তা করে, নিজের খুশীতেই করে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় 'নফল ও আনফাল' গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যা যুদ্ধকালে কাফেরদের থেকে লাভ করা হয়। তবে কুরআনুল কারীমে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- (১) আন্‌ফাল (২) গনীমত এবং (৩) ফায়। أَنْفَالٌ শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে। আর غنيمة (গনীমত) শব্দ এবং তার বিশ্লেষণ এ সূরার একচল্লিশতম আয়াতে আসবে। আর فيئ এবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশরের আয়াত ﴿وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ﴾ ... প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির জায়গায় শুধু 'গনীমতের মাল' অর্থেও ব্যবহার করা হয়।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ①

বলুন, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের(১); সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র

أَنْفَالٌ বা গনীমত সাধারণতঃ সে মালকে বলা হয়, যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে হাসিল করা হয়। [কুরতুবী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আর فيئ বা ফায় বলা হয় সে মালকে যা কোন রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফেররা পালিয়েই যাক, অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাজী হোক। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আর نفل বা أنفال (নফল বা আনফাল) পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের অধিনায়ক কোন বিশেষ মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসেবে গনীমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার হিসেবে দিয়ে থাকেন। [কাশশাফ; আত তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকেও এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। আবার কখনো 'নফল' ও 'আনফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ গনীমতের মালকেও বোঝানো হয়। এ আয়াতের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ মুফাস্‌সির এই সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি সাধারণ-অসাধারণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে কোন মতবিরোধ নেই। বস্তুতঃ এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা হলো সেটাই; যা ইমাম আবু ওবাইদ রাহিমাহুল্লাহ্ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মূল অভিধান অনুযায়ী নফল বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এই উম্মতের প্রতি এটা এক বিশেষ দান যে, জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে যেসব মাল-সামান কাফেরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়, সেগুলো মুসলিমদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। বিগত উম্মতের মধ্যে এই প্রচলন ছিল না। [কিতাবুল আমওয়াল:৪২৬; ইবন কাসীর]

(১) উল্লেখিত আয়াতে আনফালের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহ্‌র এবং রাসূলের। তার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সেগুলোর ব্যবস্থাপক। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক স্বীয় কল্যাণ বিবেচনায় সেগুলো বিলি-বন্টন করবেন। সেজন্যই আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস, ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম এবং মুজাহিদ ও সুদ্দী রাহিমাহুমাল্লাহ্ প্রমূখ তাফসীরবিদগণের মতে এই হুকুমটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক আমলের, যখন গনীমতের মাল-সামান বিলি-বন্টনের ব্যাপারে কোন আইন নাযিল হয়নি। [ইবন কাসীর] এ আয়াতে গনীমতের যাবতীয় মালামালের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্যাণ বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে বিস্তারিত বিধি-বিধান এসেছে, তাতে বলা হয়েছে যে, গনীমতের সম্পূর্ণ মালামালকে পাঁচ ভাগ করে তার এক ভাগ বায়তুলমালে সাধারণ মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাকী চার ভাগ বিশেষ নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে

জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সে সমস্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সূরা আল-আনফালের আলোচ্য প্রথম আয়াতটিকে রহিত করে দিয়েছে। আবার কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, এখানে কোন 'নাসেখ-মনসূখ' অর্থাৎ রহিত কিংবা রহিতকারী নেই, বরং সংক্ষেপন ও বিশ্লেষণের পার্থক্য মাত্র। [বাগভী] সূরা আল-আনফালের প্রথম আয়াতে যা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, একত্রিশতম আয়াতে তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য 'ফায়'-এর মালামাল- যার বিধান সূরা হাশরে বিবৃত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকারভুক্ত। তিনি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। সে কারণেই সেখানে তার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ "আমার রাসূল যা কিছু তোমাদের দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক"। এই বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গনীমতের মাল হলো সে সমস্ত মালামাল- যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে হস্তগত হয়। আর 'ফায়' হলো সে সমস্ত মালামাল- যা কোন রকম জিহাদ এবং লড়াই ছাড়াই হাতে আসে। আর أنفال (আন্ফাল) শব্দটি উভয় মালামালের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার বা উপঢৌকনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের নেতা বা পরিচালক দান করেন।

এ প্রসঙ্গে সাথীদেরকে পুরস্কার দেয়ার চারটি রীতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে প্রচলিত ছিল। (এক) এ কথা ঘোষণা করে দেয়া যে, যে লোক কোন বিরোধী শত্রুকে হত্যা করতে পারবে- যে সামগ্রী তার সাথে থাকবে সেগুলো তারই হয়ে যাবে, যে হত্যা করেছে। এসব সামগ্রী গনীমতের সাধারণ মালামালের সাথে জমা হবে না। (দুই) বড় কোন সৈন্যদল থেকে কোন দলকে পৃথক করে কোন বিশেষ দিকে জিহাদ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া এবং এমন নির্দেশ দেয়া যে, এদিক থেকে যেসব গনীমতের মালামাল সংগৃহীত হবে সেগুলো উল্লেখিত বিশেষ দলের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তবে এতে শুধু এটুকু করতে হবে যে, সমস্ত মালামাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ সাধারন মুসলিমদের প্রয়োজনে বায়তুল মালে জমা করতে হবে। (তিন) বায়তুল মালে গনীমতের যে এক-পঞ্চমাংশ জমা করা হয়, তা থেকে কোন বিশেষ গাযী (জয়ী)-কে তার কোন বিশেষ কৃতিত্বের প্রতিদান হিসেবে আমীরের কল্যাণ বিবেচনা অনুযায়ী কিছু দান করা। (চার) সমগ্র গনীমতের মালামালের মধ্য থেকে কিছু অংশ পৃথক করে যারা মুজাহিদ বা সৈনিকদের ঘোড়া প্রভৃতি দেখাশোনা এবং তাদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে তাদেরকে বিনিময় হিসাবে দান করা। [ইবন কাসীর]

তাহলে আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু দাঁড়ালো এই যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, আপনার নিকট লোকেরা 'আনফাল' সম্পর্কে প্রশ্ন করে- আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, 'আনফাল' সবই হল আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের। অর্থাৎ নিজস্বভাবে কেউ

তাকওয়া অবলম্বন কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হও।'

২. মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহ্কে স্মরণ করা হলে কম্পিত হয়[১] এবং তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে[২]। আর তারা তাদের

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

এসবের অধিকারী কিংবা মালিক নয়। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোর ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তাই কার্যকর হবে।

(১) এ আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতে সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি মুমিনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। আয়াতে বর্ণিত প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, "তাদের সামনে যখন আল্লাহ্র আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে উঠে"। অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও ভালবাসায় ভরপুর, যার দাবী হলো ভয় ও ভীতি। কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "(হে নবী!) সুসংবাদ দিয়ে দিন সে সমস্ত বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদিগকে, যাদের অন্তর তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্র আলোচনা করা হয়।" [সূরা হজ:৩৪] আর অপর আয়াতটিতে আল্লাহ্র যিক্র-এর এই বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে, "জেনে রাখ, আল্লাহ্র যিক্র-এর দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়।" [সূরা আর-রা'দ:২৮]

(২) মুমিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। এ আয়াত এবং এ ধরণের অসংখ্য আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে যে, ঈমান যেহেতু মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী দ্বীনী নির্দেশের উপর আমল করা এ তিনটি বস্তুর নাম, সেহেতু এগুলোর হ্রাস-বৃদ্ধিতে ঈমানেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যে ব্যক্তি কুরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে ভালভাবে জানলো, সে ব্যক্তির ঈমান ঐ ব্যক্তির চেয়ে অবশ্যই বেশী যার সে আয়াতের জ্ঞান নেই। সুতরাং ঈমানদারগণ তাদের ঈমানে সমপর্যায়ের নন। যেমন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর ঈমান অন্যান্য সাহাবাদের ঈমানের চেয়ে অনেক বেশী। সাহাবাদের ঈমান তাবেয়ীদের ঈমানের চেয়ে অনেক বেশী। অনুরূপভাবে যারা শরী'আতের হুকুম-আহ্কামের উপর আমল করে, তাদের ঈমান ঐ লোকদের থেকে বেশী যারা শরী'আতের হুকুম-আহ্কাম ঠিকমত পালন করে না।

সুতরাং যে সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্‌র হুকুম-আহ্‌কাম ও তাঁর বিধান অনুযায়ী না চলেও ঈমানের দাবী করে, তারা মূলতঃ ঈমানই বুঝে না। তাদের ঈমান সবচেয়ে নিম্নস্তরের ঈমান।

কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, আনুগত্যের দ্বারা ঈমান বর্ধিত হয় আর অবাধ্যতার কারণে ঈমান কমে যায়। মহান আল্লাহর বাণীঃ ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ "আর যারা হেদায়াত অবলম্বন করে তিনি তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন, তাদেরকে তাকওয়া প্রদান করেন"। [সূরা মুহাম্মাদঃ ১৭] মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ "মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, এবং যখন তাঁর আয়াত সমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে"। [সূরা আল- আনফালঃ২] অনুরূপভাবে তিনি আরো বলেনঃ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ "তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন যাতে করে তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বর্ধিত হয়"। [সূরা আল-ফাতহঃ ৪] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নাম থেকে বের হবে'। [বুখারীঃ ৭৫১০, মুসলিমঃ ১৯৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ঈমানের সত্তরের উপর শাখা রয়েছে, তম্মধ্যে সর্বোচ্চ হলোঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ব্যতীত আর কোন হক্ক মা'বুদ নেই, সর্বনিম্ন হলোঃ পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা'। [সহীহ মুসলিমঃ ৫৭]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মোটকথা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের কারণে ঈমান বাড়ে। আর তাদের অবাধ্যতার কারণে ঈমান কমে যায়। এমনকি কারো কারো ঈমানের পর্যায় সরিষা পরিমাণে পৌঁছে যায়। যেমনটি হাদীসে এসেছে। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি লাভ হয় এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, যাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটা প্রকৃতিগত ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ অবস্থাকেই এক হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। [দেখুন, বুখারীঃ ১৬]

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হলো, একজন পরিপূর্ণ মুমিনের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হবে, তখনই তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, সাধারণ মুসলিমরা যেভাবে কুরআন পাঠ করে এবং শোনে, যাতে থাকে না কুরআনকে বোঝার চেষ্টা, থাকে না কুরআনের আদব

রব-এর উপরই নির্ভর করে[১],

৩. যারা সালাত কায়েম করে[২] এবং আমরা তাদেরকে যা রিয্‌ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে[৩];

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ ۝٣

৪. তারাই প্রকৃত মুমিন[৪]। তাদের রব-

أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجٰتٌ

ও মর্যাদাবোধের কোন খেয়াল, আর থাকে না আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর মহত্বের প্রতি লক্ষ্য, সে ধরণের তেলাওয়াত উদ্দেশ্যও নয় এবং এতে উচ্চতর ফলাফলও সৃষ্টি হয় না।

(১) মুমিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করবে। তাওয়াক্কুল অর্থ হলো আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক সত্তা আল্লাহ্ তা'আলার উপর। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ বাহ্যিক জড়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করে বরং নিজের সামর্থ্য ও সাহস অনুযায়ী জড়-উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা-চালানোর পর সাফল্য আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপকরণও তাঁরই সৃষ্টি এবং সে উপকরণসমূহের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন।

(২) মুমিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো সালাত প্রতিষ্ঠা করা। আয়াতে সালাতের জন্য 'ইকামত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুত: ইকামত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছুকে সোজা করে দাঁড় করানো। কাজেই সালাত কায়েম করার মর্মার্থ হচ্ছে, যেমন করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে শিখিয়ে দিয়েছেন, সেভাবে ফরয ও নাফল যাবতীয় সালাত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সার্বিক দিক থেকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, যেমন সালাতে কলব হাযির থাকা; কেননা এটাই সালাতের মূল বিষয়। [সা'দী] কাতাদা বলেন, ইকামাতুস সালাত অর্থ, সুনির্দিষ্ট সময়ে, ওজুসহ, রূকু-সাজদাসহ আদায় করা। [ইবন কাসীর]

(৩) মুমিনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ্ তাকে যে রিয্‌ক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করবে। আল্লাহ্‌র পথে এই ব্যয় করার অর্থ ব্যাপক। এতে শরী'আত নির্ধারিত যাকাত, নফল দান-খয়রাত, আত্মীয়দেরকে প্রদান, বড়দের কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি কৃত আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি দান-সদকাই অন্তর্ভুক্ত। [সা'দী]

(৪) মুমিনের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, ﴿أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ অর্থাৎ এমনসব লোকেই হলো সত্যিকার মুমিন যাদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ। অন্যথায় যাদের মধ্যে এসমস্ত বৈশিষ্ট অবর্তমান, তারা মুখে কালেমা পড়লেও বললেও তাদের অন্তরে থাকে না তাওহীদের রং, আর থাকে না

عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ④

এর কাছে তাদেরই জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদাসমূহ, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা(১)।

كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ ⑤

৫. এটা এরূপ, যেমন আপনার রব আপনাকে ন্যায়ভাবে আপনার ঘর থেকে বের করেছিলেন(২) অথচ মুমিনদের এক দল তো তা অপছন্দ করছিল(৩)।

রাসূলের আনুগত্য। কোন এক ব্যক্তি হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে- 'হে আবু সাঈদ! আপনি কি মুমিন? তখন তিনি বললেন: ভাই, ঈমান দুই প্রকার। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে যে, আমি আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর এবং জান্নাত-জাহান্নাম, কেয়ামত ও হিসাব-কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখি কি না? তাহলে উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই আমি মুমিন। পক্ষান্তরে সূরা আল-আনফালের আয়াতে যে মুমিনে কামেল বা পরিপূর্ণ মুমিনের কথা বলা হয়েছে, তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, আমি তেমন মুমিন কি না? তাহলে আমি তা কিছুই জানি না যে, আমি তার অন্তর্ভুক্ত কি না। [বাগভী; কুরতুবী]

(১) এখানে মুমিনদের জন্য তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। (১) সুউচ্চ মর্যাদা, (২) মাগফেরাত বা ক্ষমা এবং (৩) সম্মানজনক রিয্ক।

(২) আপনার ঘর থেকে। অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে আপনার ঘর থেকে বের করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই 'ঘর' বলতে মদীনা তাইয়্যেবার ঘর কিংবা মদীনা মুনওয়ারাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে হিজরতের পর তিনি অবস্থান করছিলেন। [মুয়াসসার] কারণ, বদরের ঘটনাটি হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে بِالْحَقِّ শব্দ ব্যবহার করে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় বিষয়টিই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে সত্যের মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ মুসলিমদের কোন একটি দল এ জিহাদ কঠিন মনে করেছিল এবং পছন্দ করছিল না। কারণ, সাহাবায়ে কিরাম এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ঘটনাটি ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মদীনায় এ সংবাদ এসে পৌঁছে যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্যিক কাফেলা বাণিজ্যিক পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কুরাইশ অংশীদার। ইবন আব্বাস, ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমূখের বর্ণনা মতে, এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কুরাইশদের চল্লিশ জন ঘোড়সওয়ার

সর্দার যাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস, মাখরামাহ্ ইবন নওফেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানতো যে, এই বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক এই পুঁজিই ছিল কুরাইশদের সবচেয়ে বড় শক্তি। এরই ভরসায় তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীসাথীদেরকে উৎপীড়ন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিরিয়া থেকে এই কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, এখনই কাফেলার মোকাবেলা করে কুরাইশদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন ছিল রমাদান মাস। যুদ্ধেরও কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও অনেকে কিছুটা দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও সবার উপর এ জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক করলেন না; বরং তিনি হুকুম করলেন, যাদের কাছে সওয়ারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাতে অনেকে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর যারা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাদের সওয়ারী ছিল গ্রাম এলাকায়, তারা গ্রাম থেকে সওয়ারী আনিয়ে পরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু এতটা অপেক্ষা করার মত সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হলো, যাদের নিকট এই মুহূর্তে সওয়ারী উপস্থিত রয়েছে এবং জিহাদেও যেতে চায়, শুধু তারাই যাবে। বাইরে থেকে সওয়ারী আনিয়ে নেবার মত সময় এখন নেই। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরী হতে পারলেন। বস্তুতঃ যারা এই জিহাদে অংশগ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি তাদের এই অনিচ্ছার কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অংশ গ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, এটা একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র, কোন যুদ্ধবাহিনী নয়, যার মোকাবেলা করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীদেরকে খুব বেশী পরিমাণ সৈন্য কিংবা মুজাহিদীনের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বি'রে সুক্ইয়া' নামক স্থানে পৌঁছে যখন একজন সাহাবীকে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা গুণে নিয়ে জানান তিন'শ তের জন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেনঃ তালুতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল। কাজেই লক্ষণ শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই লক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে সর্বমোট উটের সংখ্যা ছিল সত্তরটি। প্রতি তিনজনের জন্য একটি, যাতে তারা পালাক্রমে সওয়ার হয়েছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অপর দু'জন একটি উটের অংশীদার ছিলেন। তারা ছিলেন আবু লুবাবাহ্ ও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে হেঁটে চলার পালা আসতো, তখন

তারা বলতেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি উটের উপরেই থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলবো। এ কথার প্রেক্ষিতে রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসতোঃ না তোমরা আমার চাইতে বেশী বলিষ্ঠ, আর না আখেরাতের সওয়াবে আমার প্রয়োজন নেই যে, আমার সওয়াবের সুযোগটি তোমাদেরকে দিয়ে দেব। সুতরাং নিজের পালা এলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও পায়ে হেঁটে চলতেন।

অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান 'আইনে-যোরকায়' পৌঁছে এক ব্যক্তি কুরাইশ কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানকে এ সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কাফেলার অপেক্ষা করছেন; তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবু সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যখন কাফেলাটি হেজাযের সীমানায় পৌঁছাল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম জনৈক দম্‌দম্ ইবন উমরকে কুড়ি মেসকাল সোনা অর্থাৎ প্রায় দু'হাজার টাকা মজুরী দিয়ে এ ব্যাপারে রাযি করাল যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাশীঘ্র মক্কা মুকার্‌রামায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌঁছে দেবে যে, তাদের কাফেলা মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীসাথীদের আক্রমণ আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েছে।

দম্‌দম্ ইবন উমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশঙ্কা ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক ও কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোষাকের সামনে-পিছনে ছিঁড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিল। এটি ছিল সেকালের ঘোর বিপদের চিহ্ন। যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকলো, তখন গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈ চৈ পড়ে গেল, সাজ সাজ রব উঠল। সমস্ত কুরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরী হয়ে গেল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা কোন কারণে অপারগ ছিল, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কুরাইশ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গড়িমসি করত তাদেরকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলিমদের সমর্থক বলে মনে করত। কাজেই এ ধরণের লোককে তারা বিশেষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলিম ছিলেন এবং কোন অসুবিধার দরুন তখনো হিজরত করতে না পেরে তখনো মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তাদেরকে এবং বনু-হাশেম গোত্রের যেসব লোকের প্রতি সন্দেহ হতো যে, এরা মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে, তাদেরকেও এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং আবু তালেবের দুই পুত্র তালেব ও আকীলও ছিলেন। এভাবে সব মিলিয়ে এ বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান, দু'শ' ঘোড়া, ছ'শ' বর্মধারী এবং সারী গায়িকা বাঁদীদল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদিসহ বদর অভিমুখে রওয়ানা হল। প্রত্যেক মঞ্জিলে

তাদের খাবারের জন্য দশটি করে উট জবাই করা হতো।

অপরদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রমাদান শনিবার মদীনা মুনওয়ারা থেকে রওয়ানা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর বদরের নিকট এসে পৌঁছে দু'জন সাহাবীকে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন। সংবাদবাহকরা ফিরে এসে জানালেন যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে সাগরের তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কুরাইশরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলিমদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। [ইবন কাসীর]

বলাবাহুল্য, এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কি না। কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবেলা করার মত শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়েও আসিনি। তখন সিদ্দীকে আকবর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং রাসূলের নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর ফারূকে আযম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জিহাদের প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। অতঃপর মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উঠে নিবেদন করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহ্র কসম, আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী-ইসরাঈলরা দিয়েছিল মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে। তারা বলেছিলঃ ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ অর্থাৎ কাজেই তুমি আর তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব। সে সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার 'বার্কুলগিমাদ' স্থানে নিয়ে যান, তবুও আমরা জিহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব'।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দো'আ করেন। কিন্তু তখনো আনসারগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আনসারগণের যে সহযোগীতার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, যেহেতু তা ছিল মদীনার অভ্যন্তরের জন্য, সেহেতু তারা মদীনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, আমরা এই জিহাদে মদীনার বাইরে এগিয়ে যাব কি না? এ সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসারগণ। সা'দ ইবন মো'আয আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে

৬. সত্য[১] স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে। মনে হচ্ছিল তাদেরকে যেন মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তারা যেন তা অবলোকন করছে।

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٦

৭. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু দলের[২] একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে; অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক[৩]। আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٧

নিবেদন করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন'? তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ'। তখন সা'দ ইবন মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন, তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যে কোন অবস্থায় আপনার আনুগত্য করবো। অতএব, আপনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে দ্বীনে-হক সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদিগকে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্য থেকে কোন একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদেরকে শত্রুর সম্মুখীন করে দেন, তবুও আমাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্র নামে আমাদেরকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান'। এ বক্তব্য শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশী হলেন এবং স্বীয় কাফেলাকে হুকুম করলেন, আল্লাহ্র নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দু'টি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের বিজয় হবে। দু'টি দল বলতে- একটি হলো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা, আর অপরটি হলো মক্কা থেকে আগত সৈন্যদল। অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র কসম, আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি। [বাগভী]

(১) এখানে 'হক' বলে যুদ্ধও উদ্দেশ্য হতে পারে। [বাগভী]

(২) অর্থাৎ বানিজ্য কাফেলা কিংবা কুরাইশ সৈন্য। [মুয়াসসার]

(৩) অর্থাৎ বানিজ্য কাফেলা, যার সাথে কেবলমাত্র ত্রিশ-চল্লিশ জন রক্ষী ছিল। [বাগভী]

যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদেরকে নির্মূল করেন[১];

৮. এটা এ জন্যে যে, তিনি সত্যকে সত্য ও বাতিলকে বাতিল প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা এটা পছন্দ করে না।

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝٨

৯. স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রব-এর নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফিরিশ্‌তা দিয়ে, যারা একের পর এক আসবে।'

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝٩

১০. আর আল্লাহ্ এটা করেছেন শুধু সুসংবাদ স্বরূপ এবং যাতে তোমাদের অন্তরসমূহ এর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে; আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আসে; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝١٠

দ্বিতীয় রুকূ'

১১. স্মরণ কর[২], যখন তিনি তাঁর পক্ষ

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم

(১) অর্থাৎ যার ফলে বাতিলকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করা যায়। আর মুমিনদেরকে এমন বিজয় দেখাবেন যার কল্পনাও তাদের অন্তরে আসেনি। [সা'দী]

(২) আয়াতে বদর যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। ইসলামের সর্বপ্রথম এই সমর যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখন মক্কার কাফের বাহিনী প্রথমে সেখানে পৌঁছে গিয়ে পানির কূপ সংলগ্ন উঁচু জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম সেখানে পৌঁছলে তাদেরকে অবস্থান গ্রহণ করতে হয় নিম্নাঞ্চলে। আল্লাহ্ তা'আলা এই যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা সূরার বিয়াল্লিশতম আয়াতে বিবৃত করেছেন।

বদরে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে প্রথম অবস্থান গ্রহণ করেন, সে স্থানের সাথে পরিচিত হোবাব ইবন মুন্‌যির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু স্থানটিকে যুদ্ধের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করে নিবেদন করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে জায়গাটি আপনি গ্রহণ করেছেন, তা কি আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে গ্রহণ করেছেন, যাতে আমাদের কিছু বলার কোন অধিকার নেই, নাকি শুধুমাত্র নিজের মত ও অন্যান্য কল্যাণ বিবেচনায় বেছে নিয়েছেন'? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'না, এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ নয়; এতে পরিবর্তনও করা যেতে পারে। তখন হোবাব ইবন মুন্‌যির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিবেদন করলেনঃ 'তাহলে এখান থেকে গিয়ে মক্কীসর্দারদের বাহিনীর নিকটবর্তী একটি পানিপূর্ণ স্থান রয়েছে, সেটি অধিকার করাই হবে উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে পানিপূর্ণ জায়গা দখল করেন। একটি হাউজ বানিয়ে তাতে পানির সঞ্চয় গড়ে তোলেন। অবস্থানগ্রহণ স্থল নিশ্চিত হওয়ার পর সা'দ ইবন মো'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিবেদন করেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার জন্য কোন একটি সুরক্ষিত স্থানে একটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিতে চাই। সেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং সওয়ারীগুলিও আপনার কাছেই থাকবে। এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আল্লাহ্ যদি আমাদিগকে বিজয় দান করেন, তবে তো এটাই উদ্দেশ্য। আর যদি অন্য কোন অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনার সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিশবেন, যারা মদীনা-তাইয়্যেবায় রয়ে গেছেন। কারণ, আমার ধারণা, তারাও একান্ত জীবন উৎসর্গকারী এবং আপনার সাথে মহব্বতের ক্ষেত্রে তারাও আমাদের চাইতে কোন অংশে কম নয়। আপনার মদীনা থেকে বের হয়ে আসার সময় তারা যদি একথা জানতেন যে, আপনাকে এহেন সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, তাহলে তাদের একজনও পেছনে থাকতেন না। আপনি মদীনায় গিয়ে পৌঁছলে তারা হবেন আপনার সহকর্মী'। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই বীরোচিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে দো'আ করলেন। পরে রাসূলের জন্য একটি সামিয়ানার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। তাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সিদ্দীকে আকবার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাদের হেফাজতের জন্য তরবারী হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। যুদ্ধের প্রথম রাত। তিনশ' তের জন নিরস্ত্র লোকের মোকাবেলা নিজেদের চাইতে তিনগুণ অর্থাৎ প্রায় এক হাজার লোকের এক বাহিনীর সাথে। যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত স্থানটিও তাদের দখলে। পক্ষান্তরে নিম্নাঞ্চল, তাও বালুকাময় এলাকা, যাতে চলাফেরাও কষ্টকর, সেটি পড়ল মুসলিমদের ভাগে। স্বাভাবিকভাবেই পেরেশানী ও চিন্তা-দুর্ভাবনা সবারই মধ্যে ছিল; কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারণারও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ন্যায়ের

مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

থেকে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন[১] এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র

উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী কর এবং এখনো আরাম করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের সালাতে ব্যাপৃত রয়েছ। অথচ সবদিক দিয়েই শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভাল অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিলেন। তাতে ঘুমানোর কোন প্রবৃত্তি থাক বা নাই থাক সবারই ঘুম চলে আসলো। বদর যুদ্ধের এই রাতে কেউ ছিল না, যে ঘুমায়নি। শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জেগে থেকে ভোর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়োজিত থাকেন। [সীরাত ইবন হিশাম]

ইবন কাসীর বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে যখন স্বীয় 'আরীশ' অর্থাৎ সামিয়ানার নীচে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়োজিত ছিলেন তখন তার চোখেও সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠে বলেনঃ 'হে আবু বকর! সুসংবাদ শুন; এই যে জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। একথা বলতে বলতে তিনি ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আয়াতের অর্থ এই যে, "এ দল তো (শত্রুপক্ষ) শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখাবে"। [সূরা আল-কামারঃ ৪৫] কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সামিয়ানার বাইরে এসে বিভিন্ন জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেনঃ 'এটা আবু জাহলের হত্যার স্থান, এটা অমুকের, সেটা অমুকের'। অতঃপর ঘটনা তেমনিভাবে ঘটতে থাকে। আর বদর যুদ্ধে যেমন ক্লান্তি-পরিশ্রান্তি দূর করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উপর এক বিশেষ ধরণের তন্দ্রা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি ঘটনা ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উদ্ধৃত করেছেন যে, 'যুদ্ধাবস্থায় ঘুম আসাটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ, আর সালাতের সময় ঘুম আসাটা শয়তানের পক্ষ থেকে'। [ইবন কাসীর] ওহুদের যুদ্ধেও মুসলিমগণ এ অভিজ্ঞতাই লাভ করে, যেমন সূরা আলে ইমরানের ১৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে। উভয় স্থানে মূল কারণ একই ছিল। যে সময়টি কঠিন ভয় ও শংকায় প্রকম্পিত, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের দিলকে এমন চিন্তাশূন্য ও ভয়ভীতি মুক্ত করে দিলেন যে, তাদের তন্দ্রা আসতে লাগল।

(১) ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে তন্দ্রা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর সালাতে আসে শয়তানের পক্ষ থেকে"। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

করেন[১], আর তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করেন, তোমাদের হৃদয়সমূহ দৃঢ় রাখেন এবং এর মাধ্যমে তোমাদের পা-সমূহ স্থির রাখেন।

১২. স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা মুমিনদেরকে অবিচলিত রাখ'। যারা কুফরী করেছে অচিরেই আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; কাজেই তোমরা আঘাত কর তাদের ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগে এবং জোড়ে[২]।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

(১) এ রাতে মুসলিমগণ দ্বিতীয় যে নেয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা ছিল বৃষ্টি। এ বৃষ্টিপাতে কয়েকটি ফায়দা হয়। এক, মুসলিমরা যথেষ্ট পরিমাণে পানি লাভ করে এবং তারা সংগে সংগে কূপ বানিয়ে পানি আটকিয়ে রাখে। দুই, এতে গোটা সমরাঙ্গনের চেহারাই পাল্টে যায়। কুরাইশ সৈন্যরা যে জায়গাটি দখল করেছিল তাতে বৃষ্টি হয় খুবই তীব্র এবং সারা মাঠ জুড়ে কাদা হয়ে গিয়ে চলাচলই দুস্কর হয়ে পড়ে। আর যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করছিলেন, সেখানে বালুর কারণে চলাচল করা ছিল দুস্কর। বৃষ্টি এখানে অল্প হয়। যাতে সমস্ত বালুকে বসিয়ে দিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেয়া হয়। [ইবন ইসহাক; ইবন কাসীর; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আলোচ্য আয়াতে আরেকটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যা বদরের সমরাঙ্গনে মুসলিমদেরকে দেয়া হয়েছে। তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব ফিরিশ্‌তাকে মুসলিমদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদিগকে সাহস যোগাতে। আমি এখনই কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিচ্ছি। তোমরা কাফেরদের গর্দানের উপর অস্ত্রের আঘাত হান; তাদের হত্যা কর দলে দলে। এভাবে ফিরিশ্‌তাদেরকে দু'টি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথমতঃ মুসলিমদের সাহস বৃদ্ধি করবে। এ কাজটি ফিরিশ্‌তাগণ কর্তৃক মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দলবৃদ্ধি করে কিংবা

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

১৩. এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে। আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

১৪. এটি শাস্তি, সুতরাং তোমরা এর আস্বাদ গ্রহণ কর। আর নিশ্চয় কাফেরদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾

১৫. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কাফের বাহিনীর সম্মুখীন[১] হবে পরস্পর নিকটবর্তী অবস্থায়, তখন তোমরা তাদের সামনে পিঠ ফিরাবে না;

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ

১৬. আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে যোগ দেয়া[২] ছাড়া কেউ

তাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করার মাধ্যমেও হতে পারে এবং নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিমদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেও হতে পারে। তাদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, ফিরিশ্তাগণ নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কাফেরদের উপর আক্রমণও করবেন। সুতরাং এ আয়াতের দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফিরিশ্তাগণ উভয় দায়িত্বই যথাযথ সম্পাদন করেছেন। [ইবন কাসীর; সা'দী]

(১) এ আয়াতে زحف শব্দের মর্মার্থ হলো, উভয় বাহিনীর মোকাবেলা ও সংঘর্ষ। দুটি দল পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ এমনভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবার পর পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলিমদের জন্য জায়েয নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এর থেকে ঈমানদারদেরকে নিষেধ করছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা দুই অবস্থায় জায়েয। প্রথমতঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র যুদ্ধের কৌশল স্বরূপ, শত্রুকে দেখাবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের কোন উদ্দেশ্য থাকবে না; বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্কাবস্থায় ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটাই হল ﴿اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ﴾ এর অর্থ। কারণ, تَحَرُّف অর্থ হয় কোন একদিকে ঝুঁকে পড়া।
দ্বিতীয়তঃ বিশেষ কোন অবস্থা- যাতে সমরক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে, তা হলো যাতে মুজাহিদগণ অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায়

আক্রমণ করতে সমর্থ হয়। ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ﴾ এর অর্থ তাই। কারণ, تَحَيُّز এর আভিধানিক অর্থ হলো মিলিত হওয়া এবং فِئَةٍ অর্থ হল দল। কাজেই এর মর্মার্থ হচ্ছে, নিজেদের দলের সাথে মিলিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গন থেকে পেছনের দিকে সরে আসলে তা জায়েয। [ইবন কাসীর]

এ আয়াত দু'টির দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা, শক্তি ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে যত বেশীই হোক না কেন, মুসলিমদের জন্য তাদের মোকাবেলার পশ্চাদপসরণ করা হারাম, তবে উল্লেখিত দু'টি স্বতন্ত্র অবস্থা ব্যতীত। বদর যুদ্ধকালে যখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন এটাই ছিল সাধারণ হুকুম যে, নিজেদের সৈন্য সংখার সাথে প্রতিপক্ষের কোন তুলনা করা না গেলেও পশ্চাদপসরণ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া জায়েয নয়। বদর যুদ্ধের অবস্থাও ছিল তাই। মাত্র তিনশ' তের জনকে মোকাবেলা করতে হচ্ছিল তিন গুণ অর্থাৎ এক হাজারের অধিক সৈন্যের সাথে। [ইবন কাসীর] তারপর অবশ্য এই হুকুমটি শিথিল করার জন্য সূরা আল-আনফালের ৬৫ ও ৬৬তম আয়াত নাযিল করা হয়। ৬৫তম আয়াতে বিশজন মুসলিমকে দু'শ' কাফেরের সাথে এবং একশ' মুসলিমকে এক হাজার কাফেরের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়। তারপর ৬৬তম আয়াতে তা আরো শিথিল করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এই বিধান জারি করেছেন যে, দৃঢ়চিত্ত মুসলিম যদি একশ' হয় তবে তারা দু'শ' কাফেরের উপর জয়ী হতে পারবে।" এতে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় মুসলিমদেরই জয়ী হওয়ার আশা করা যায়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করা জায়েয নয়। তবে প্রতিপক্ষের সংখ্যা যদি দ্বিগুণের চেয়ে বেশী হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা জায়েয রয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'যে ব্যক্তি একা তিন ব্যক্তির মোকাবেলা থেকে পালিয়ে যায়, তা পলায়ন নয়। [বাগভী; কুরতুবী] অবশ্য যে দু'জনের মোকাবেলা থেকে পালায় সে-ই পলাতক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হবে। এখন এই হুকুমই কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অধিকাংশ উম্মত এবং চার ইমামের মতেও এটাই শরী'আতের নির্দেশ যে, প্রতিপক্ষের সংখ্যা যতক্ষণ না দ্বিগুণের বেশী হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া হারাম ও কবীরা গোনাহ্। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি বিষয়কে মানুষের জন্য মারাত্মক বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন- বুখারীঃ ২৭৬৬, মুসলিমঃ ৮৯] তাছাড়া আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর এক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মদীনা এসে আশ্রয় নেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে এই বলে

أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

তাদেরকে পিঠ দেখালে সে তো আল্লাহ্‌র গজব নিয়েই ফিরল এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট ফিরে যাওয়ার স্থান(১)।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ

১৭. সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহ্‌ই তাদেরকে হত্যা করেছেন(২)। আর আপনি যখন

অপরাধ স্বীকার করেন যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক অপরাধীতে পরিণত হয়ে পড়েছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে তাকে দান করলেন। বললেনঃ بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ অর্থাৎ ‘তোমরা পলাতক নও; বরং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে পুনর্বার আক্রমণকারী, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সে অতিরিক্ত শক্তি’। [আবু দাউদঃ ২৬৪৭, তিরমিযীঃ ১৭১৬] এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাস্তবতাকেই পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, তাদের পালিয়ে এসে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ সেই স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্ভুক্ত যাতে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গন ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

(১) অর্থাৎ যারা এই স্বতন্ত্রাবস্থা ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে কিংবা পশ্চাদপসরণ করেছে। তারা আল্লাহ্ তা‘আলার গযব নিয়ে ফিরে যায় এবং তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর সেটি হল নিকৃষ্ট অবস্থান। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে, বদর যুদ্ধের দিনে যখন মক্কার এক হাজার জওয়ানের বাহিনী ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলিমদের সংখ্যাল্পতা এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা একান্ত গর্বিত ও সদম্ভ ভঙ্গিতে উপস্থিত হয়। সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো‘আ করেনঃ ‘ইয়া আল্লাহ্! আপনাকে মিথ্যা জ্ঞানকারী এই কুরাইশরা গর্ব ও দম্ভ নিয়ে এগিয়ে আসছে, আপনি বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথাশীঘ্র পূরণ করুন’। তখন জিবরাঈল ‘আলাইহিস্ সালাম এসে নিবেদন করেনঃ ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে শত্রুবাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন’। তিনি তাই করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার মাটি ও কাঁকরের মুঠো তুলে নেন এবং একবার শত্রুবাহিনীর ডান অংশের উপর, একবার বাম অংশের উপর এবং একবার সামনের দিকে নিক্ষেপ করেন। সেই এক কিংবা তিন মুঠি কাঁকরকে আল্লাহ্ তাঁর একান্ত কুদরতে এমন বিস্তৃত করে দেন যে, প্রতিপক্ষের সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকী ছিল না, যার চোখ অথবা মুখমণ্ডলে এই ধুলি ও কাঁকর পৌঁছেনি। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গোটা শত্রুবাহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। [তাবারী] এভাবে মুসলিমগণ এই মহান বিজয় লাভে সমর্থ হন। আয়াতে মুসলিমদেরকে

بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন(১) এবং এটা মুমিনদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উত্তমরূপে পরীক্ষার (মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করার) জন্য(২); নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ذٰلِكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِينَ ﴿١٨﴾

১৮. এটা তোমাদের জন্য, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন(৩)।

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ

১৯. যদি তোমরা মীমাংসা চেয়ে থাক, তাহলে তা তো তোমাদের কাছে এসেছে; আর যদি তোমরা বিরত হও

হেদায়াত দান করা হয় যে, নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জন্য গর্ব করো না; যা কিছু ঘটেছে তা শুধুমাত্র তোমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমেরই ফসল নয়; বরং এটা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত সাহায্য ও সহায়তারই ফল। তোমাদের হাতে যেসব শত্রু নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি; বরং আল্লাহ্ তা'আলাই হত্যা করেছেন।

(১) অর্থাৎ আপনি যে কাঁকরের মুঠো নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং স্বয়ং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন। কাঁকর নিক্ষেপের এই কাজটি যদিও আপনার দ্বারা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো কাফেরদের চোখে-মুখে পৌঁছে দেয়ার কাজটি ছিল আল্লাহ্‌র। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ আমি মুমিনগণকে এই মহাবিজয় দিয়েছি তাদের পরিশ্রমের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়ার উদ্দেশ্যে। بَلَاءً এর শব্দগত অর্থ হল পরীক্ষা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিনা যুদ্ধেই মুসলিমদের বিজয় দানে সক্ষম, কিন্তু তিনি চাচ্ছেন যেন মুসলিমরা যুদ্ধ করে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। [সা'দী] بَلَاء দ্বারা নেয়ামতও উদ্দেশ্য হতে পারে। তখন অর্থ হবে, আমি তাদেরকে যে নে'আমত দান করেছি তারা যেন সেটার শুকরিয়া করে। [আইসারুত তাফাসীর]

(৩) অর্থাৎ মুসলিমদেরকে এ বিজয় এ কারণেই দেয়া হয়েছে যেন এর মাধ্যমে কাফেরদের পরিকল্পনা ও কলা-কৌশলসমূহকে নস্যাৎ করে দেয়া যায় এবং যাতে কাফেররা এ কথা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহায়তা আমাদের প্রতি নেই এবং কোন কলা-কৌশল তথা পরিকল্পনাই আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কৃতকার্য হতে পারে না। তাদের কলা-কৌশল তাদেরই বিরুদ্ধে যাবে। [স'াদী]

عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, কিন্তু যদি তোমরা আবার যুদ্ধ করতে আস তবে আমরাও আবার শাস্তি নিয়ে আসব। আর তোমাদের দল সংখ্যায় বেশী হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের সাথে আছেন(১)।

তৃতীয় রুকূ‘

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

২০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শোন তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে

(১) এ আয়াতে পরাজিত কুরাইশ কাফেরদের সম্বোধন করে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুসলিমদের সাথে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে কুরাইশ বাহিনীর মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় ঘটেছিল। ঘটনাটি এই যে, কুরাইশ কাফেরদের বাহিনী মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাহিনী প্রধান আবু জাহ্ল প্রমূখ বায়তুল্লাহ্‌র পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই দো‘আ করতে গিয়ে তারা নিজেদের বিজয়ের দো‘আর পরিবর্তে সাধারণ বাক্যে এভাবে দো‘আ করেছিলঃ ‘ইয়া আল্লাহ্! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি হেদায়াতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের যেটি বেশী ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে দ্বীন উত্তম তাকেই বিজয় দান কর’। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪৩১]

এই নির্বোধেরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলিমদের তুলনায় আমরাই উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হেদায়াতের উপর রয়েছি, কাজেই এ দো‘আটি আমাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এই দো‘আর মাধ্যমে তারা কামনা করছিল, আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে যেন হক ও বাতিল তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল, যখন আমরা বিজয় অর্জন করব, তখন এটাই হবে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে আমাদের সত্যতার ফয়সালা। কিন্তু তারা একথা জানত না যে, এই দো‘আর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের জন্য বদদো‘আ ও মুসলিমদের জন্য নেকদো‘আ করে যাচ্ছে। যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে বলে দিলেন ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন মুসলিমদের সাথে রয়েছেন, তখন কোন দল তোমাদের কিইবা কাজে লাগতে পারে?

নিও না[১];

২১. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বলে, 'শুনলাম'; আসলে তারা শুনে না[২]।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾

২২. নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম বিচরণশীল জীব হচ্ছে বধির, বোবা, যারা বুঝে না[৩]।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. আর আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু আছে জানতেন তবে তিনি তাদেরকে শুনাতেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে শুনালেও তারা উপেক্ষা

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

(১) মুসলিমগণ (তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্বেও) শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যের মাধ্যমেই এহেন বিপুল বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এ সাহায্য আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের আনুগত্যের ফল। এই আনুগত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর"। এবং তাতে স্থির থাক। কারণ, তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্দেশ, অসীয়ত, নসীহত সবই শুনতে পাচ্ছ। সুতরাং কুরআন ও সত্যবাণী শুনে নেবার পরেও তোমরা আনুগত্য-বিমুখ হয়ো না। বিমুখ হলে বর্তমান অবস্থা থেকে তোমাদেরকে নিকৃষ্ট অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা মুখে এ কথা বলে সত্য যে, আমরা শুনে নিয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই শোনেনি। কাজেই তাদের এই শ্রবণ না শোনারই শামিল। মুসলিমদেরকে এদের অনুরূপ হতে বারণ করা হয়েছে। কারণ, ঈমান দাবীর নাম নয়, ঈমান হচ্ছে যা অন্তরে প্রবেশ করে এবং যা সত্য হওয়ার উপর বান্দার আমল প্রমাণ বহন করে। [সা'দী]

(৩) الدَّوَابِّ শব্দটি دابة এর বহুবচন। অভিধান অনুযায়ী যমীনের উপর বিচরণকারী প্রতিটি জীবকেই دابة বলা হয়। [কাশশাফ] কিন্তু সাধারণ প্রচলন ও পরিভাষায় دابة বলা হয় শুধুমাত্র চতুষ্পদ জন্তুকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ্‌র নিকট সে সমস্ত লোকই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও চতুষ্পদ জীবতুল্য যারা সত্য ও ন্যায়ের শ্রবণের ব্যাপারে বধির এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মুক। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হক জানা ও সে পথে চলার জন্য চোখ ও কান দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সেটা না করে সেগুলোকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করেছে। [সা'দী]

করে মুখ ফিরিয়ে নিত[১]।

২৪. হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন[২]। আর নিশ্চয়

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদের মধ্যে সামান্যতম কল্যাণকর দিক তথা সৎচিন্তা দেখতেন, তবে তাদের বিশ্বাস সহকারে শোনার সামর্থ্য দান করতেন কিন্তু বর্তমান সত্যানুরাগ না থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও ন্যায় কথা তাদেরকে শুনিয়ে দেন, তাহলে তারা অনীহাভরে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করবে। তাদের এ বিমুখতা এ কারণে হবে না যে, তারা দ্বীনের মধ্যে কোন আপত্তিকর বিষয় দেখতে পেয়েছে, সে জন্যই তা গ্রহণ করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যের বিষয়ে কোন লক্ষ্যই করেনি। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তাকেই ঈমান থেকে বঞ্চিত করেন যার মধ্যে কোন কল্যাণ অবশিষ্ট নেই, যে পবিত্র হতে চায় না, যার কোন ভাল কথা কোন ফল দেয় না। আর এতে রয়েছে বিরাট হিকমত ও রহস্য। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। এ বাক্যটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে।
(এক) একটি অর্থ হতে পারে যে, যখনই কোন সৎকাজ করার কিংবা পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেল; এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনীমত জ্ঞান কর। কারণ, যে কোন সময় মানুষের রোগ-শোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোন কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে পারে, যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গনীমত মনে করা। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ, এ কথা কারোরই জানা নেই যে, কাল কি হবে। পরবর্তীতে ভাল কাজ করতে চাইলে সক্ষম নাও হতে পার। [সা'দী]
(দুই) এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি মানুষ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই তিনি কোন বান্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তার অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারো ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হয়। সে কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই দো'আ

তাঁরই দিকে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

২৫. আর তোমরা ফেৎনা থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম শুধু তাদের উপরই আপতিত হবে না। আর জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর(১)।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

করতেন يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوب ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ অর্থাৎ 'হে অন্তরসমূহের বিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন'। [তিরমিযীঃ ২১৪১] [ইবন কাসীর]

(তিন) ইবনে অব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন,এর অর্থ আল্লাহ্ কাফেরের ঈমান ও মুমিনের কুফরীর মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। [মুসানদে আহমাদ ৩/১১২] [ইবন কাসীর]

(চার) কেউ কেউ বলেনঃ আয়াতটি যেহেতু বদর যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু তার অর্থ হবে- জেনে রাখ, আল্লাহ্ তাঁর নেক বান্দাদের ভাগ্যকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করেন। আর কাফেরদের প্রশান্ত অন্তরে অশান্তি ও ভয়ে পরিবর্তন করে দেবেন। আবার তিনি ইচ্ছে করলে মুসলিমদের নিরাপদ অবস্থাকে ভীত অবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারেন। [ফাতহুল কাদীর]

(১) এ আয়াতে কিছু পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, পাপের আযাব শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পাপ করেনি এমন লোকও তাতে জড়িয়ে পড়ে। সে পাপ যে কি, সে সম্পর্কে মুফাস্সিরীন ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ এখানে ফেতনা বলতে সে সব সামাজিক সামগ্রিক ফেতনা বুঝানো হয়েছে, যা এক সংক্রামক ব্যাধির মত জন-সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, যাতে কেবল গোনাহ্গার লোকরাই নিপতিত হয় না, সে লোকেরাও এতে পড়ে মার খায়, যারা গোনাহ্গার সমাজে বসবাস করাকে বরদাশত করে থাকে। [ইবন কাসীর] মুতাররিফ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইরকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আবদিল্লাহ! আপনারা কী জন্য এসেছেন? আপনারা এক খলীফা (উসমান) কে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। তারপর তার রক্তের দাবী নিয়ে এসেছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর বললেন, আমরা ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً﴾... এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমর ও উসমানের সময় পড়েছিলাম, কিন্তু আমরা মনে করেনি যে, আমরাই এর দ্বারা উদ্দিষ্ট। শেষ পর্যন্ত তা আমাদের মধ্যেই যেভাবে ঘটার ঘটে গেল। [মুসনাদে আহমাদ: ১/১৬৫] [ইবন কাসীর]

কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ 'আম্‌র বিল্ মা'রূফ' তথা সৎকাজের নির্দেশ দান এবং 'নাহী 'আনিল মুনকার' অর্থাৎ অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা

২৬. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, যমীনে তোমরা দুর্বল হিসেবে গণ্য হতে। তোমরা আশংকা

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ

পরিহার করাই হল এই পাপ। [ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'আল্লাহ্ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা নিজের এলাকায় কোন অপরাধ ও পাপানুষ্ঠান হতে না দেয়। কারণ, যদি তারা এমন না করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরাধ ও পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে তা থেকে বারণ না করে, তবে আল্লাহ্ স্বীয় আযাব সবার উপরই ব্যাপক করে দেন'। [তাবারী] তখন তা থেকে না বাঁচতে পারে কোন গোনাহ্গার, আর না বাঁচতে পারে নিরপরাধ।

এখানে নিরপরাধ বলতে সেসব লোককেই বোঝানো হচ্ছে যারা মূল পাপে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও 'আমর বিল্ মা'রূফ' বর্জন করার পাপে পাপী। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যখন কোন জাতির এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে নিজের এলাকায় পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে বাধা দানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা দেয় না, তখন আল্লাহ্র আযাব সবাইকে ঘিরে ফেলে'। [আবু দাউদঃ ৩৭৭৬, ইবন মাজাহ্ঃ ৩৯৯৯] আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার এক ভাষণে বলেছেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মানুষ যখন কোন অত্যাচারীকে দেখেও অত্যাচার থেকে তার হাতকে প্রতিরোধ করবে না, শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের সবার উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করবেন। [আবু দাউদঃ ৩৭৭৫, তিরমিযীঃ ২০৯৪] নু'মান ইবন বশীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যারা আল্লাহ্র কানুনের সীমালংঘনকারী গোনাহ্গার এবং যারা তাদের দেখেও মৌনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সেই পাপানুষ্ঠান থেকে বাধা দান করে না, এতদুভয় শ্রেণীর উদাহরণ এমন একটি সামুদ্রিক জাহাজের মত যাতে দু'টি শ্রেণী রয়েছে এবং নীচের শ্রেণীর লোকেরা উপরে উঠে এসে নিজেদের প্রয়োজনে পানি নিয়ে যায়, যাতে উপরের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে। নীচের লোকেরা বলে বসে যে, যদি আমরা জাহাজের তলায় ছিদ্র করে নিজেদের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ করতে শুরু করি, তবে আমরা আমাদের উপরের লোকদের কষ্ট দেয়া থেকে অব্যাহতি পাব। এখন যদি নিচের লোকদেরকে এ কাজ করতে দেয়া হয় এবং বাধা না দেয়া হয়, তবে বলাবাহুল্য যে, গোটা জাহাজেই পানি ঢুকে পড়বে। আর তাতে নীচের লোকেরা যখন ডুবে মরবে, তখন উপরের লোকেরাও বাঁচতে পারবে না'। [সহীহ্ আল-বুখারীঃ ২৪৯৩] এসব বর্ণনার ভিত্তিতে অনেক মুফাস্সির মনীষী সাব্যস্ত করেছেন যে, এ আয়াতে فتنة (ফিত্নাহ্) বলতে 'এই পাপ' অর্থাৎ 'সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান' বর্জনকেই বোঝানো হয়েছে।

وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾

করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে হঠাৎ এসে ধরে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, নিজের সাহায্য দিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জিনিষগুলো জীবিকারূপে দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. হে ঈমানদারগণ! জেনে-বুঝে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের খেয়ানত করো না[১] এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও[২] খেয়ানত করো না[৩];

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা। আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার[৪]।

---

(১) আল্লাহ্‌র আমানত বলতে অধিকাংশের মতে যাবতীয় ফরয কাজ বুঝানো হয়েছে। আর রাসূলের আমানত বলতে তার সুন্নাত ও নির্দেশ বুঝানো হয়েছে। সে হিসাবে খেয়ানত হলো সেগুলো না মানা। [ফাতহুল কাদীর]

(২) নিজেদের আমানত বলতে সে সব দায়িত্ব বুঝানো হয়েছে, যা কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করে তার উপর ন্যস্ত করা হয়। তা ওয়াদা পূরনের দায়িত্ব হতে পারে, সামগ্রিক সামাজিক চুক্তি হতে পারে, কোন সংস্থার আভ্যন্তরীণ গোপন তথ্য হতে পারে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ধন-সম্পদ হতে পারে। কারো প্রতি বিশ্বাস করে জন-সমাজ যদি তাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে তবে তাও এর মধ্যে শামিল মনে করতে হবে। বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আন- নিসার ৫৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

(৩) আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে, প্রথম অর্থ যা উপরে করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং তোমাদের আমানতসমূহেরও খেয়ানত করো না। [তাবারী; ইবন কাসীর] দ্বিতীয় অর্থ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না কারণ এতে করে তোমরা তোমাদের উপর অর্পিত আমানতেরই খেয়ানত করে বসবে। [তাবারী; বাগভী]

(৪) যেহেতু আল্লাহ্ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফেলতী ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণতঃ মানুষের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে

চতুর্থ রুকূ‘

২৯. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান[১] তথা

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, “আর জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফেৎনা।” [সা‘দী] ‘ফেৎনা’ শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়; আবার আযাবও হয়। তাছাড়া এমনসব বিষয়কেও ফেৎনা বলা হয় যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এই তিনটি অর্থেই ফেৎনা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুতঃ এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে।

(১) আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, যে লোক বিবেককে স্বভাবের উপর প্রবল রেখে এই পরীক্ষায় দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও মহব্বতকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করবে-যাকে কুরআন ও শরী‘আতের পরিভাষায় ‘তাকওয়া’ বলা হয়-তাহলে সে এর বিনিময়ে কয়েকটি প্রতিদান লাভ করবে। (এক) ফুরকান, (দুই) পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও (তিন) মাগফেরাত বা পরিত্রাণ। (চার) জান্নাত। [সা‘দী; আইসারুত তাফাসীর]

فرقان ও فرق দু’টি ধাতুর সমার্থক। পরিভাষাগতভাবে فرقان (ফুরকান) এমনসব বস্তু বা বিষয়কে বলা হয় যা দু’টি বস্তুর মাঝে প্রকৃষ্ট পার্থক্য ও দূরত্ব সূচিত করে দেয়। [কুরতুবী] সেজন্যই কোন বিষয়ের মীমাংসাকে ফুরকান বলা হয়। কারণ তা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। তাছাড়া আল্লাহ্ তা‘আলার সাহায্যকেও ফুরকান বলা হয়। কারণ, এর দ্বারাও সত্যপন্থীদের বিজয় এবং তাদের প্রতিপক্ষের পরাজয় সূচিত হওয়ার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সে জন্যই কুরআনুল কারীমে বদরের যুদ্ধকে ‘ইয়াওমুল-ফুরকান’ তথা পার্থক্যসূচক দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ আয়াতে বর্ণিত তাকওয়া অবলম্বনকারীদের প্রতি ‘ফুরকান’ দান করা হবে- কথাটির মর্ম অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা‘আলার সাহায্য ও সহায়তা থাকে এবং তিনি তাদের হেফাজত করেন। কোন শত্রু তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। যাবতীয় উদ্দেশ্যে তারা সাফল্য লাভে সমর্থ হন এবং যে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পান। [ইবন কাসীর]

কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, এ আয়াতে ফুরকান বলতে সেসব আলো বা জ্ঞান-বুদ্ধিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা ও খাঁটি-মেকীর মাঝে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়। [আইসারুত তাফাসীর; সা‘দী] অতএব, মর্ম দাঁড়ায় এই যে, যারা ‘তাকওয়া’ অবলম্বন করেন, আল্লাহ্ তাদেরকে এমন জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন যাতে তাদের পক্ষে ভাল-মন্দ পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়।

ইবনে ওয়াহাব বলেন, আমি ইমাম মালেককে প্রশ্ন করেছি এখানে ফুরকান অর্থ

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন(১) এবং আল্লাহ্ মহাকল্যাণের অধিকারী(২) ।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. আর স্মরণ করুন, যখন কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বন্দী করার জন্য, বা হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য । আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও (তাদের ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে) ষড়যন্ত্র করেন; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ

কি? তিনি বললেন, এখানে ফুরকান অর্থ, উত্তরণের পথ । তারপর তিনি দলীল হিসেবে সূরা আত-তালাকের এই আয়াত পাঠ করলেন, "আর যে কেউ আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন" । [সূরা আত-তালাক: ২] কারও কারও মতে, এখানে 'ফুরকান' দ্বারা আখেরাতে মুমিনদেরকে জান্নাত এবং কাফেরদেরকে জাহান্নামে দেয়া বোঝানো হয়েছে । [কুরতুবী]

(১) দ্বিতীয়তঃ তাকওয়ার বিনিময়ে যা লাভ হয়, তা হলো পাপের মোচন । অর্থাৎ পার্থিব জীবনে মানুষের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায়, দুনিয়াতে সেগুলোর কাফ্ফারা ও বদলার ব্যবস্থা করে দেয়া হয় । এমন সৎকর্ম সম্পাদনের তৌফিক তার হয়, যা তার সমুদয় ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর প্রাধান্য লাভ করে । তাকওয়ার বিনিময়ে তৃতীয় যে জিনিষটি লাভ হয়, তা হচ্ছে, আখেরাতে মুক্তি ও যাবতীয় পাপের ক্ষমা লাভ । পাপের মোচন এবং মাগফিরাত দুটি সমার্থবোধক শব্দ হলেও একত্রে ব্যবহার হলে দুটির অর্থ ভিন্ন হয় । তখন পাপ মোচন দ্বারা ছোট গোনাহের ক্ষমা, আর মাগফিরাত দ্বারা বড় গোনাহের ক্ষমা উদ্দেশ্য হয় । [সা'দী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময় । তিনি বিরাট অনুগ্রহ ও ইহ্সানের অধিকারী । তাঁর দান ও দয়া কোন পরিমাপের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় এবং তাঁর দান ও ইহ্সানের অনুমান করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয় । কাজেই তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য তিনটি নির্ধারিত প্রতিদান ছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে আরো বহু দান ও অনুগ্রহ লাভের আশা রাখা কর্তব্য । তবে শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার উপর স্থান দিতে হবে । [সা'দী] কেউ কেউ এটাকে জান্নাত দ্বারা তাফসীর করেছেন । [আইসারুত তাফাসীর]

কৌশলী[১]।

(১) হিজরত-পূর্বকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাফের পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং তারা তাকে হত্যা কিংবা বন্দী করার ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করছিল, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাদের এ অপবিত্র হীন চক্রান্তকে ধূলিস্মাৎ করে দেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে দেন। ঘটনা এই যে, মদীনা থেকে আগত আনসারদের মুসলিম হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়, তখন মক্কার কুরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো তার ব্যাপারটি মক্কার ভেতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন যখন মদীনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন, তখন এদের একটি কেন্দ্র মদীনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এরা যেকোন রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলব্ধি করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদীনায় গিয়েছেন, কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে মসজিদুল হারাম সংলগ্ন 'দারুন্-নাদ্ওয়া'তে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। যাতে আবু জাহ্ল, নযর ইবন হারেস, উমাইয়া ইবন খাল্ফ, আবু সুফিয়ান প্রমূখসহ সমগ্র বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবেলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা হয়। এখানে বসেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। [এর জন্য দেখুনঃ মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৪৮]

পরামর্শ অনুযায়ী কাফেররা সন্ধ্যা থেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ীটি অবরোধ করে ফেলে। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং তিনি তা সবার দিকে লক্ষ্য করে ছিটিয়ে দিয়ে তাদের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসেন। [সা'দী] কুরাইশ সর্দারদের পরামর্শে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক যে তিনটি মত উপস্থাপিত হয়েছিল সে সবক'টিই কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে "সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে বের করে দেবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সবচাইতে উত্তম ব্যবস্থাপক, যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে চাপিয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার সাথে পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩১. আর যখন তাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা তো শুনলাম, ইচ্ছে করলে আমরাও এর মত করে বলতে পারি, এগুলো তো শুধু পুরোনো দিনের লোকদের উপকথা(১) ।'

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾

৩২. আর স্মরণ করুন, যখন তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ্! এগুলো যদি আপনার কাছ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা আমাদের উপর কোন মর্মন্তুদ শাস্তি নিয়ে আসুন(২) ।'

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾

---

(১) এটা ছিল কাফের কুরাইশদের মুখের কথা। তারা কুরআনের বিপরীতে কিছুই আনতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। এটা বলে তারা নিজেদেরকে ধোঁকায় ফেলছিল এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল। [ইবন কাসীর] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আয়াতখানা নদর ইবন হারেসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। [তাবারী; বগভী] সে জাহেলী যুগে ইরানের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও ইয়াহূদী ও নাসারাদের বিভিন্ন কাহিনী আয়ত্ব করেছিল। রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআনে কোন জাতি সম্পর্কে বলতেন তখন সে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন আজেবাজে কাহিনী রচনা করত এবং তার সঙ্গী-সাথীদের বলতঃ আমার গল্প মুহাম্মাদ যা নিয়ে এসেছে তার থেকে উত্তম। [বাগভী] বদরের যুদ্ধে মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মিথ্যাচার, অপবাদ, ঠাট্টা বিদ্রূপের শাস্তি স্বরূপ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কাফেরগণ প্রায়ই এ কুরআনকে গল্প বলে প্রচার করতে চেষ্টা করত এবং এর বিপরীত কিছু নিয়ে আসার দাবী করত কিন্তু তারা তা আনতে পারত না। [ইবন কাসীর] সুরা আল- ফুরকানের ৫ ও ৬ নং আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সমস্ত হঠকারিতাপূর্ণ কথা উল্লেখ করে তার জবাব দিয়েছেন।

(২) আবু জাহ্ল এ বলে দো'আ করত যে, 'হে আল্লাহ্! এই কুরআনই যদি আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোন কঠিন আযাব নাযিল করে দিন'। তখন এ আয়াত নাযিল হয় যে, তাদের মধ্যে আপনার অবস্থান করা অবস্থায় আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না আর আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। [বুখারীঃ ৪৬৪৮]

৩৩. আর আল্লাহ্ এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন[১]।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝٣٣

৩৪. আর তাদের কী ওজর আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না?[২]

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ

(১) এখানে কারা ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করবে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির বলেনঃ এখানে কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ তারা উক্ত কথা বলার পরে লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে তারা কাবা ঘরের তাওয়াফ করার সময় বলত, 'গোফরানাকা, গোফরানাক'। [আইসারুত তাফাসীর] অথবা, তাদের মাঝে ঐ সমস্ত লোকদেরকে এ আয়াতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা ঈমান আনবে বলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইলমে গায়েবে নির্ধারিত করেছেন। [ইবন কাসীর] অপরপক্ষে, কোন কোন মুফাস্সির বলেনঃ এখানে ঐ সমস্ত ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা মক্কায় অসহায় অবস্থায় জীবন-যাপন করছিলেন; হিজরত করতে সমর্থ হননি। তারা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাচ্ছিলেন। [ইবন কাসীর] এ আয়াতটি উদ্দেশ্য করে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আল্লাহ্ আমাদেরকে দু'টি নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। যার একটি চলে গেছে। (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু।) কিন্তু আরেকটি রয়ে গেছে। (অর্থাৎ ইস্তেগফার) [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ১/৫৪২] অনুরূপ বর্ণনা ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকেও রয়েছে। অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'ইবলিস তার রবকে উদ্দেশ্য করে বললঃ আপনার সম্মান ও ইজ্জতের শপথ করে বলছি, যতক্ষণ বনী আদমের দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে থাকব। ফলে আল্লাহ্ বললেনঃ আমি আমার সম্মান-প্রতিপত্তির শপথ করে বলছিঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব যতক্ষণ তারা আমার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/২৯, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪/২৬১]

(২) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি তাদের মধ্যে থাকতে তাদেরকে আমি কিভাবে শাস্তি দেব? আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকবেন না, যখন আপনাকে বের করে আনব তখনই কেবল তাদের উপর শাস্তি আসতে পারে। কারণ, নবী-রাসূলরা যে জনপদে থাকবেন সেখানে আমি শাস্তি নাযিল করি না। তাছাড়া তারা তাদের গোনাহও কুফরী থেকে যদি তাওবাহ করে তবুও আমি তাদের উপর শাস্তি নাযিল করব না। কিন্তু তারা তো ক্ষমা প্রার্থনা করছে না বরং তাদের গোনাহর

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

যখন তারা লোকদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করে? অথচ তারা সে মসজিদের অভিভাবক নয়, এর অভিভাবক তো কেবল মুত্তাকীগণই; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না ।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর কা'বাঘরের কাছে শুধু শিস ও হাততালি দেয়াই তাদের সালাত, কাজেই তোমরা শাস্তি ভোগ কর, কারণ তোমরা কুফরী করতে[১] ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদেরকে নিবৃত্ত করার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অচিরেই তারা তা ব্যয় করবে; তারপর সেটা তাদের আফসোসের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে[২] । আর যারা

উপর স্থির রয়েছে সুতরাং তাদেরকে আমি কেন শাস্তি দেব না? তদুপরি তাদের শাস্তির আরও একটি কারণ অবধারিত হয়ে গেছে, তা হচ্ছে তারা মাসজিদুল হারাম থেকে মানুষদেরকে বাঁধা দেয়, অথচ তারা মাসজিদুল হারামের কেউ নয় । [তাবারী] আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা ক্ষমা প্রার্থনার কারণে যদি দুনিয়াতে তাদের আযাব রহিত হয়েও গিয়ে থাকে, আখেরাতে তাদের আযাব তো অবশ্যম্ভাবী । [তাবারী]

(১) আযাব বলতে এখানে দুনিয়ার আযাবও হতে পারে যা বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের মাধ্যমে তাদের উপর নাযিল হয় । [তাবারী; ইবন কাসীর]

(২) এ ঘটনার বিবরণ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা মতে আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে উদ্ধৃত রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের পর অবশিষ্ট আহত মক্কাবাসী কাফেররা যখন মক্কায় গিয়ে পৌঁছল, তখন যাদের পিতা-পুত্র এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তারা বাণিজ্যিক কাফেলার আমীর আবু সুফিয়ানের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আপনি তো জানেন, এ যুদ্ধটি বাণিজ্যিক কাফেলার হেফাজতকল্পে করা হয়েছে, যার ফলে জান-মালের এহেন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় । কাজেই আমরা চাই, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের কিছু সাহায্য করা হোক, যাতে আমরা ভবিষ্যতে মুসলিমদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ

কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে ।

৩৭. যাতে আল্লাহ্ অপবিত্রদেরকে পবিত্রদের থেকে আলাদা করেন[১] । তিনি

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ

করতে পারি । তারা এ দাবী মেনে নিয়ে তাদেরকে এক বিরাট অঙ্কের অর্থ দিয়ে দেয় যা তারা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওহুদ যুদ্ধে ব্যয় করে এবং তাতেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় । ফলে পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে অর্থ অপচয়ের অতিরিক্ত অনুতাপ যোগ হয়ে যায় ।

আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন এই আয়াতে এই ঘটনার পূর্বেই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে দেন । বলা হয়, যারা কাফের তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে মানুষকে বাধা দান করার কাজে ব্যয় করতে চাইছে । অতএব, তার পরিণতি হবে এই যে, নিজেদের ধন-সম্পদও ব্যয় করে বসবে এবং পরে এ ব্যয়ের জন্য তাদের অনুতাপ হবে । অথচ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরাজয়ই বরণ করতে হবে । বস্তুতঃ ওহুদের যুদ্ধে ঠিক তাই ঘটেছে; সঞ্চিত ধন-সম্পদও ব্যয় করে ফেলেছে এবং পরে যখন পরাজিত হয়েছে, তখন পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অনুতাপ ও দুঃখ পোহাতে হয়েছে । [ইবন কাসীর]

তাফসীরকার দাহহাক এ আয়াতের বিষয়বস্তুকে বদর যুদ্ধের ব্যয়সংক্রান্ত বলেই অভিহিত করেছেন । [ইবন কাসীর] কারণ, বদর যুদ্ধে এক হাজার জওয়ানের বাহিনী মুসলিমদের মোকাবেলা করতে গিয়েছিল । তাদের খাবার-দাবার এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ভার মক্কার বার জন সর্দার নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছিল । বলাবাহুল্য, এক হাজার লোকের যাতায়াত ও খানা-পিনা প্রভৃতিতে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়েছিল । কাজেই নিজেদের পরাজয়ের সাথে সাথে অর্থ ব্যয়ের জন্যও বিপুল অনুতাপ ও আফসোস হয়েছিল । হাফেয ইবন কাসীর ও ইমাম তাবারীর মতে, ঘটনাটি উহুদ বা বদরের সাথে সম্পৃক্ত হলেও এর ভাষা ব্যাপক । এর দ্বারা কাফেরদের যাবতীয় ব্যয়ই উদ্দেশ্য । তাদের ব্যয়ের কোন ভবিষ্যত নেই । তারা শুধু আফসোসই করবে । [তাবারী; ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ কাফেররা যেসব সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এবং পরে যার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ করেছে আর অপমানিত-অপদস্থ হয়েছে, তাতে ফায়দা হয়েছে এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা যাতে অপবিত্র পঙ্কিল এবং পবিত্র বস্তুতে পার্থক্য প্রকাশ করে দেন । طيب ও خبيث দু’টি বিপরীতার্থক শব্দ । এখানে خبيث ও طيب বলতে কি বোঝানো হয়েছে তাতে দু’টি মত রয়েছে ।

(এক) অধিকাংশ মুফাস্‌সির خبيث ও طيب এর সাধারণ অর্থ যথাক্রমে অপবিত্র ও পবিত্র বলেই সাব্যস্ত করেছেন এবং পবিত্র বলতে মুমিন এবং অপবিত্র বলতে কাফের বুঝিয়েছেন । [তাবারী] এ অর্থে উল্লেখিত অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা

الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

অপবিত্রদের একটাকে আরেকটার উপর রাখবেন এবং সেগুলোকে একসাথে স্তূপ করবেন, তারপর তা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

পঞ্চম রুকূ‘

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. যারা কুফরী করে তাদেরকে বলুন, ‘যদি তারা বিরত হয় তবে যা আগে হয়ে গেছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করবেন; কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের রীতি তো গত হয়েছেই[১]।

পবিত্র ও অপবিত্র অর্থাৎ মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য করতে চান; সমস্ত মুমিন জান্নাতে আর সমস্ত কাফের জাহান্নামে সমবেত হোক, এটাই তাঁর ইচ্ছা।
(দুই) خبيث শব্দটি অপবিত্র, পঙ্কিল ও হারাম বস্তুকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর طيب তার বিপরীত পবিত্র, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তুকে বোঝাতে বলা হয়। এখানে এ দু’টি শব্দের দ্বারা যথাক্রমে কাফেরদের অপবিত্র ধন-সম্পদ এবং মুসলিমদের পবিত্র সম্পদ ও অর্থ বোঝা যেতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে এই যে, কাফেররা যে বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে তা ছিল অপবিত্র ও হারাম সম্পদ। ফলে তার অশুভ পরিণতিতে মালও গেছে এবং জানও গেছে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা অতি অল্প পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেছে, কিন্তু সে সম্পদ ছিল পবিত্র ও হালাল। ফলে তা ব্যয়কারীরা বিজয় অর্জন করেছেন এবং সাথে সাথে গনীমতের মালামাল অর্জনেও সমর্থ হয়েছেন। এ অর্থে জাহান্নামে জমা করার অর্থ, এ সম্পদের দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে এবং সে সব দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৩৫]

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলঃ ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা জাহেলিয়াতে (অর্থাৎ কাফের অবস্থায়) যা করেছি, তার জন্য কি জবাবদিহি করতে হবে’? তিনি বললেনঃ ‘যদি কেউ ইসলামে সুন্দরভাবে আমল করে তবে জাহেলিয়াতের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি করতে হবে না। আর যদি খারাপ আমল করে তবে পূর্বাপর সবকিছুর জন্যই ধরা হবে’। [বুখারীঃ ৬৯২১]

৩৯. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেৎনা দূর হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায়[১] তারপর যদি তারা বিরত

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

(১) এ আয়াতে বর্ণিত ফেৎনা ও দ্বীন শব্দ দু'টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যবহার অনুযায়ী আয়াতে শব্দ দু'টির একাধিক অর্থ করা হয়ে থাকেঃ

এক. ফেৎনা অর্থ কুফর ও শির্ক আর দ্বীন অর্থ ইসলাম। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকেও এই বিশ্লেষণই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে, মুসলিমদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষণ না শির্ক ও কুফর নিঃশেষিত হয়ে যায়। [তাবারী; ইবন কাসীর] এক্ষেত্রে এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হবে কিয়ামত পর্যন্ত শর্ত সাপেক্ষে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না দুনিয়া থেকে শির্ক ও কুফর নিঃশেষিত না হবে বা শির্কের প্রভাব কমে না যাবে।

দুই. যা আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা প্রমূখ সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে, 'ফেৎনা' হচ্ছে দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের ধারা, পক্ষান্তরে 'দ্বীন' শব্দের অর্থ প্রভাব ও বিজয়। মক্কার কাফেররা সদাসর্বদা মুসলিমদের উপর এ ফেৎনা অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থান করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদীনায় হিজরত করেন, তারপরও গোটা মদীনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা-রোষই প্রকাশ পেতে থাকে। এ ক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে যে, মুসলিমগণকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তারা অন্যায়-অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন, মুসলিম আপন দ্বীন পালন করতে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয় [ইবন কাসীর]

তিন. আয়াতের তৃতীয় আরেকটি অর্থ হচ্ছে, এখানে জিহাদ করার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যের নেতিবাচক দিক হচ্ছে ফেৎনা না থাকা আর ইতিবাচক দিক হচ্ছে দ্বীন সম্পূর্ণরূপে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য হবে। কেবলমাত্র এ সর্বাত্মক উদ্দেশ্যের জন্য লড়াই করাই মুসলিমদের জন্য জায়েয বরং ফরয। তা ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে লড়াই করা মোটেই জায়েয নহে। তাতে অংশগ্রহণও ঈমানদার লোকদের শোভা পায় না। এ মতের সমর্থন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসে পাই, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কি? আমাদের কেউ কেউ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করে, আবার কেউ নিজস্ব অহমিকা (চাই তা গোত্রীয় বা জাতিগত যাই হোক তা) ঠিক রাখার জন্য যুদ্ধ করে। তখন রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীর প্রতি মাথা উঠিয়ে বললেনঃ 'যে আল্লাহ্‌র কালেমা

হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ্ তো তার সম্যক দ্রষ্টা ।

৪০. আর যদি তারা মুখ ফিরায় তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۭ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

৪১. আর জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমরা গনীমত হিসেবে লাভ করেছ, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র(১), রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং সফরকারীদের(২)

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰي عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ

(তাওহীদ/দ্বীন/কুরআন)কে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে সে মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল' । [বুখারীঃ ১২৩] কোন কোন মুফাসসির এখানে উপরোক্ত তিনটি অর্থই গ্রহণ করেছেন । [মুয়াসসার]

(১) এ আয়াতে গনীমতের বিধান ও তার বন্টননীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে । অভিধানে গনীমত বলা হয় সে সমস্ত মাল-সামানকে যা শত্রুর নিকট থেকে লাভ করা হয় । শরী'আতের পরিভাষা অনুযায়ী অমুসলিমদের নিকট থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজয়ার্জনের মাধ্যমে যে মালামাল অর্জিত হয়, তাকেই বলা হয় 'গনীমত' । [ফাতহুল কাদীর] আর যা কিছু আপোষ, সন্ধি-সম্মতির মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাকে বলা হয় 'ফাই' । [ইবন কাসীর] কুরআনুল কারীমে এতদুভয় শব্দের মাধ্যমে (অর্থাৎ 'গনীমত' ও 'ফাই') এতদুভয় প্রকার মালামালের হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে এবং এ আয়াতে শুধুমাত্র গনীমতের মালামালের কথাই আলোচিত হয়েছে যা যুদ্ধকালে অমুসলিমদের কাছ থেকে লাভ হয়েছে । 'ফাই'-এর আলোচনা সূরা হাশর-এ আসবে ।

(২) এখানে জিহাদের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গণীমতের হকদারদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে । সমস্ত সম্পদ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে । এর চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা হবে । আর বাকী এক পঞ্চমাংশ পাঁচভাগে ভাগ করা হবে । প্রথমভাগ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের । এ অংশ মুসলিমদের সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষনে ব্যয় হবে । দ্বিতীয়ভাগ রাসূলের স্বজনদের জন্য নির্ধারিত । তারা হলেন ঐ সমস্ত লোক যাদের উপর সদকা খাওয়া হারাম । অর্থাৎ বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব । কারণ তাদের দেখাশুনার দায়িত্ব রাসূলের ছিল । তিনি তাঁর নবুওয়াতের কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকায় তাদের জন্য এ গণীমতের মাল থেকে দেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই । তৃতীয়ভাগ ইয়াতিমদের জন্য সুনির্দিষ্ট । চতুর্থভাগ ফকীর ও মিসকিনদের জন্য, আর পঞ্চম ভাগ

الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾

যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ্‌তে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম[১], যে দিন দু দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾

৪২. স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল দূর প্রান্তে আর আরোহী দল[২] ছিল তোমাদের থেকে নিম্নভূমিতে। আর যদি তোমরা পরস্পর যুদ্ধ সম্পর্কে কোন পূর্বসিদ্ধান্তে থাকতে তবে এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমরা মতভেদ করতে। কিন্তু যা ঘটার ছিল, আল্লাহ্ তা সম্পন্ন করলেন, যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে

মুসাফিরদের জন্য। [ইবন কাসীর] ইবন তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, পুরো এক পঞ্চমাংশই বর্তমানে ইমামের কর্তৃত্বে থাকবে। তিনি মুসলিমদের অবস্থা অনুযায়ী কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবেন। [ইবন কাসীর] সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, গণীমতের মাল যদিও পূর্বে সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বলা হয়েছে তবুও তা মূলতঃ মুসলিমদের মধ্যেই পুনরায় বন্টন হয়ে গেছে। রাসূল তার জন্য তার জীবদ্দশায় যা কিছু পেতেন তাও বর্তমানে সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়ে থাকে।

(১) অর্থাৎ সে সাহায্য ও সহায়তা, যার বদৌলতে তোমরা জয়লাভ করেছ। [মুয়াসসার] এখানে মীমাংসার দিন বলে বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে। কারণ এ দিন তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, ঈমানের কালেমাকে কুফরীর কালেমার উপর বিজয়ী করেছেন এবং তাঁর দ্বীন, তাঁর নবী ও অনুসারীদেরকে উপরে উঠিয়েছেন। [ইবন কাসীর]

(২) আরোহী দল বলে এখানে মক্কার কুরাইশ কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে। যাদের নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান, যারা ব্যবসায়ী পণ্য নিয়ে সমুদ্রের পাশ ঘেঁষে যাচ্ছিল [ইবন কাসীর]

জীবিত থাকবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর জীবিত থাকে[১]; আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ
أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي
الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

৪৩. স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় কম[২]; যদি আপনাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় বেশী তবে অবশ্যই তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে । কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন । অবশ্যই তিনি অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত ।

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا
وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

৪৪. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে

---

(১) বিনা ঘোষণায় কাফের ও ঈমানদারদেরকে বদরের এ যুদ্ধে নিয়ে আসার পিছনে কি রহস্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাই ব্যক্ত করছেন । আর তা হলো, যাতে তোমাদেরকে কাফেরদের উপর বিজয় দেই, হকের ঝান্ডা বাতিলের উপর বুলন্দ করে দেখাই, ফলে কোনটা হক এবং কোনটা বাতিল তা স্পষ্ট হয়ে যায় । ইসলাম ও তার অনুসারীদের সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং কুফর-শির্ক ও তাদের অনুসারীরা অসম্মানিত হয় । [ইবন কাসীর] যাতে অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা মানুষ বুঝে নিতে পারে যে, মুসলিমরা হকের উপর আছে ফলে তাদের বিজয় এসেছে, আর কাফেররা বাতিলের উপর আছে ফলে তাদের বিপর্যয় ঘটেছে । সুতরাং যারা জীবিত আছে তারা দলীল প্রমাণসহ হক বেছে নিতে পারে । আর তাদের মধ্যে যে বাতিল বেছে নেয় সে তার স্বইচ্ছায় হক স্পষ্ট হওয়ার পরও বাতিলকে গ্রহণ করে নিজের ধ্বংসকেই ডেকে আনলো । মূলতঃ বদরের যুদ্ধের পর অধিকাংশ মানুষের কাছে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায় । আজও মানুষ বদর যুদ্ধের বিজয়কে হক ও বাতিল চেনার ক্ষেত্রে এক বিরাট নিদর্শন বলে বিশ্বাস করে ।

(২) মুফাসসির মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সংখ্যা কম করে দেখানো হয়েছিল । আর তাই তিনি সাহাবাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন । [তাবারী]

مَفْعُوْلًا ۗ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ ۝

স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন(১) এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন, যাতে আল্লাহ্ সম্পন্ন করেন এমন কাজ যা ঘটারই ছিল। আর আল্লাহ্‌র দিকেই সব বিষয় প্রত্যাবর্তন করা হয়।

ষষ্ঠ রুকূ'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

৪৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাক(২) এবং আল্লাহ্‌কে বেশী পরিমাণ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও(৩)।

---

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ বলেন, বদরের দিন কাফেরদেরকে আমাদের দৃষ্টিতে কম করে দেখানো হয়েছিল। এমনকি আমার পাশের লোককে বলছিলাম যে, তুমি তাদের সংখ্যা সত্তর দেখতে পাও? সে বললঃ আমি একশত দেখতে পাচ্ছি। আব্দুল্লাহ বলেনঃ শেষে আমরা তাদের একজনকে বন্দী করে জিজ্ঞাসা করলে সে তাদের সংখ্যা এক হাজার বলে জানায়। [তাবারী]

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক যুদ্ধে তিনি এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আবি আওফা বলেনঃ এক যুদ্ধে রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য্য পশ্চিমাকাশে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ হে মানুষগণ! তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাতের আকাংখায় থেকো না। আল্লাহর কাছে এর থেকে বিমুক্তি চাও। তারপরও যদি সাক্ষাত হয়ে যায় তখন ধৈর্যের সাথে টিকে থাক এবং মনে রেখ যে, তরবারীর ছায়ার নীচে জান্নাত। [বুখারীঃ ২৯৬৫, ২৯৬৬]

(৩) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমগণকে যুদ্ধক্ষেত্র এবং শত্রুর মোকাবেলার জন্য এক বিশেষ হেদায়াত দান করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে, দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির-অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় হচ্ছে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র। আল্লাহ্‌র যিক্‌র-এ নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে, তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং দৃঢ়পদ থাকা ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র এ দু'টি বিজয়ের প্রধান কারণ। [সা'দী; আইসারুত তাফাসীর]

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ﴿۴۶﴾

৪৬. আর তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর[১] এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না[২], করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে[৩] । আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর[৪]; নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন[৫] ।

(১) এ আয়াতের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কুরআনী হেদায়াতনামার তিনটি ধারা সাব্যস্ত হয়ে যায় । তা হল দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও আনুগত্য ।

(২) অর্থাৎ তোমরা পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ো না । এটি চতুর্থ হিদায়াত । [আইসারুত তাফাসীর]

(৩) এখানে আরও একটি হিদায়াত দেয়া হয়েছে । যাতে দূর্বল ও শক্তিহীন হওয়ার কারণ বলে দেয়া হয়েছে, যাতে তা থেকে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া যায় । বলা হয়েছে, তোমরা যদি বিবাদে লিপ্ত হও তবে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে । [আইসারুত তাফাসীর] এখানে আনুগত্য না করার ক্ষতিকর দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । এটি পঞ্চম হিদায়াত ।

(৪) বলা হয়েছে, ‘আর ধৈর্য ধারণ কর ।’ এটি ষষ্ঠ হিদায়াত । [আইসারুত তাফাসীর] এটা যেমন বিবাদ-বিসংবাদ থেকে রক্ষা পাবার একান্ত কার্যকর ব্যবস্থা, তেমনি নিজেদের লোভ-লালসা ও আবেগ উচ্ছাসের ধারা সংযত রাখার উপায় । তাড়াহুড়া, ঘাবড়িয়ে যাওয়া, কাতর হয়ে পড়া, লোভ ও অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনা পরিহার কর । বিপদ ও কঠিন অবস্থা সম্মুখে আসলেও যেন পদস্খলন না ঘটে, সে বিষয়ে সচেতন থাকবে । যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মত মানসিকতা রাখতে হবে । মনকে এ ব্যাপারে তৈরী করে নিতে হবে ।

(৫) এখানে সবর অবলম্বনের এক বিরাট উপকারিতার কথা বলে এর তিক্ততা দূর করে দিয়েছেন যে, ﴿اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾ (যারা সবর তথা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে রয়েছেন ।) এটি এমন এক মহা সম্পদ যে, দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সম্পদ এর মোকাবেলায় নগণ্য । যারা এ সমস্ত অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে পারবে আল্লাহর সহায়তা ও সাহায্য কেবল তারাই লাভ করবে । মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্‌র কারো সাথে থাকার অর্থ এ নয় যে, তার সাথে লেগে থাকবে । বরং এর অর্থ দু’টি: এক. সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা সাথে থাকা । দুই. জ্ঞানের মাধ্যমে সাথে থাকা । কারণ, সবকিছুই আল্লাহ্‌র জ্ঞানে রয়েছে । কোন কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে গোপন নেই । [সিফাতিল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ] এখানে সবরকারীদের সাথে থাকার অর্থ সাহায্য ও সহযোগিতায় তাদের সাথে থাকা । [সা’দী]

৪৭. আর তোমরা তাদের মত হবে না যারা গর্বের সাথে ও লোক দেখানোর জন্য নিজ ঘর থেকে বের হয়েছিল[১] এবং তারা লোকজনকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। আর তারা যা করে, আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর স্মরণ কর, যখন শয়তান তাদের জন্য তাদের কার্যাবলীকে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয় অর্জনকারী নেই, আর নিশ্চয় আমি তোমাদের পাশে অবস্থানকারী।' অতঃপর দু দল যখন পরস্পর দৃশ্যমান হল তখন সে পিছনে সরে পড়ল এবং বলল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত, নিশ্চয় আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি,' আর আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর[২]।

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

(১) অর্থাৎ ইখলাসের সাথে যুদ্ধ করবে, আর একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই অভিযানে বের হতে হবে। এটি সপ্তম হিদায়াত। [আইসারুত তাফাসীর] সুতরাং মুমিন কখনো কাফের, মুশরিক ও পাপাচারীদের মত হবে না। যেমনটি করেছিল আবু জাহল ও তার কাফের বাহিনী। কারণ তারা অত্যন্ত জাঁক-জমক ও শান-শওকত, গান বাদ্য, নারী দাসী সহ বের হয়েছিল। [ইবন কাসীর]

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে, মক্কার কুরাইশ বাহিনী যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এমন এক আশংকা চেপে ছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনূ-বকর গোত্রও আমাদের শত্রু; আমরা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সেই সুযোগে শত্রু গোত্র না আবার আমাদের বাড়ী-ঘর এবং নারী-শিশুদের উপর হামলা করে বসে! সুতরাং কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানের ভয়ার্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ী থেকে তারা বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু মনের এ আশংকা তাদের পায়ের বেড়ী হয়ে রইল। এমনি সময়ে শয়তান সোরাকাহ্ ইবন মালেকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে

উপস্থিত হল যে, তার হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তার সাথে রয়েছে বীর সৈনিকদের একটি খণ্ড দল। সুরাকাহ্ ইবন মালিক ছিল সে এলাকার এবং গোত্রের বড় সর্দার। কুরাইশদের মনে তারই আক্রমণের আশংকা ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কুরাইশ জওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক ভাষণ দিয়ে বলল, আজকের দিনে এমন কেউ নেই যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। আর বনূ-বকর প্রভৃতি গোত্রের ব্যাপারে তোমাদের মনে যে আশংকা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়-দায়িত্ব আমি নিয়ে নিচ্ছি। আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। [তাবারী] মক্কার কুরাইশরা সুরাকাহ্ ইবন মালেক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল। কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তাদের মন বসে গেল এবং বনূ-বকর গোত্রের আক্রমণাশংকা মুক্ত হয়ে মুসলিমদের মোকাবেলায় উদ্বুদ্ধ হল। এ দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দিকে দাবড়ে দিল। কিন্তু যখন মক্কার মুশরিক ও মুসলিম উভয় দল (বদর প্রাঙ্গণে) সম্মুখ সমরে লিপ্ত হল, তখন শয়তান পিছন ফিরে পালিয়ে গেল। বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরিকদের সহায়তায় একটি শয়তানী বাহিনীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মোকাবেলায় জিবরাঈল ও মিকাঈল 'আলাইহিমাস্ সালাম-এর নেতৃত্বে ফিরিশ্তাদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবন জরীর আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন সুরাকাহ্ ইবন মালেকের রূপে স্বীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তখন সে জিবরাঈল-আমীন এবং তার সাথী ফিরিশ্তা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাত এক কুরাইশী যুবক হারেস ইবন হিশামের হাতে ধরা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেস তিরস্কার করে বললঃ এ কি করছ? তখন সে বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে হারেসকে ফেলে দিল এবং নিজের বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারেস তাকে সোরাকাহ্ মনে করে বললঃ হে আরব সর্দার সোরাকাহ্! তুমি তো বলেছিলে আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ! তখন শয়তান সুরাকাহর বেশেই উত্তর দিল, আমি কৃত চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ, আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না। অর্থাৎ ফিরিশ্তা বাহিনী। আর আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। কাজেই তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। [তাবারী]

শয়তান যখন ফিরিশ্তা বাহিনী দেখতে পেল এবং সে যেহেতু তাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল, তখন বুঝল যে, এবার আর পরিত্রাণ নেই। তবে তার বাক্য 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করি' সম্পর্কে তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম কাতাদাহ্ বলেন যে, কথাটি সে মিথ্যে বলেছিল। [ইবন কাসীর] ইবন ইসহাক বলেন, আর যখন সে বলেছিল যে, 'আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না।' এ কথাটি সত্যি বলেছে। [ইবন কাসীর]

সপ্তম রুকূ‘

৪৯. স্মরণ কর, যখন মুনাফেক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলছিল, ‘এদের দ্বীন এদের বিভ্রান্ত করেছে।’ বস্তুতঃ কেউ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করলে আল্লাহ্ তো প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়(১)।

إِذْ يَقُولُ الْمُنَٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

৫০. আর আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন ফিরিশ্‌তাগণ যারা কুফরী করেছে তাদের প্রাণ হরণ করছিল, তাদের মুখমণ্ডলে ও পিঠে আঘাত করছিল(২)। আর বলছিল ‘তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ কর(৩)।’

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

---

(১) বদরের ময়দানে মুষ্টিমেয় এই মুসলিমরা যে এহেন বিরাট শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে, তাদেরকে তাদের দ্বীনই প্রতারণায় ফেলে মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড় করিয়েছে, এটাকেই মুনাফিকরা ধোঁকা বলছে। কারণ, তারা ঈমানদারগণকে সংখ্যায় কম দেখে মনে করেছিল যে, তারা নিশ্চিত মারা পড়বে [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের উত্তরে বলেছেন ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে, জেনে রাখ, সে কখনো অপমানিত ও অপদস্ত হয় না। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলা সবকিছুর উপর পরাক্রমশালী। তাঁর কৌশলের সামনে সবার জ্ঞান-বুদ্ধিই বিকল হয়ে যায়। তিনি প্রজ্ঞাময়, হিকমতওয়ালা। তিনি জানেন কে সহযোগিতা পাওয়ার উপযুক্ত, আর কে অপমানিত হওয়ার উপযুক্ত। সে অনুসারে তিনি সম্মানিত বা অপমানিত করে থাকেন [ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, ‘যখন আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণ কাফেরদের রূহ কবজ করছিলেন, তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন যে, আগুনে জ্বলার আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর; আপনি যদি সে সময় তাদের অবস্থা দেখতেন’ এতটুকু বলা হয়েছে। এখানে ‘যদি’ শব্দের উত্তর বর্ণিত হয়নি, মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে উত্তর উহ্য রয়েছে, যার মূল কথা হচ্ছে, ‘তখন আপনি এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেতেন’। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) এ আয়াতে ‘যারা কুফরী করেছে’ বলে কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে; এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছেঃ

কোন কোন মুফাসসির এ বিবরণকে সে সমস্ত কুরাইশ কাফেরের অবস্থা বলে সাব্যস্ত

৫১. এটা তো সে কারণে, যা তোমাদের হাত আগে পাঠিয়েছিল, আর আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নন[১] ।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٥١﴾

করেছেন, যারা বদর যুদ্ধে মুসলিমদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য ফিরিশ্তা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে এই যে, বদর যুদ্ধে যেসব কাফের সর্দার নিহত হয়, তাদের মৃত্যুতে ফিরিশ্তাদের হাত ছিল। তারা তাদেরকে সামনের দিক দিয়ে তাদের মুখে এবং পিছন দিক থেকে তাদের পিঠে আঘাত করে তাদেরকে হত্যা করেছিলেন আর সেই সঙ্গে আখেরাতে জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দিচ্ছিলেন। [ইবন কাসীর]

কোন কোন মুফাস্সিরের মতে এখানে ঐ সমস্ত কাফেররাই উদ্দেশ্য যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বদর যুদ্ধে মারা যায়নি। সে হিসেবে এসমস্ত কাফেরদের মৃত্যুকালে কি হাল-অবস্থা হবে তা পূর্ব থেকেই জানিয়ে দিয়ে একদিকে ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা, অপরদিকে কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর]

অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে, 'যারা' শব্দের ব্যাপকতার ভিত্তিতে এর বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যখন কোন কাফের মারা যায়, তখন মৃত্যুর ফিরিশ্তা রূহ্ কবজ করার সময় তার মুখে ও পিঠে আঘাত করেন। কিন্তু যেহেতু এই আযাবের সম্পর্ক জড় জগতের সাথে নয়, বরং কবর জগতের সাথে যাকে বরযখ বলা হয়, কাজেই এই আযাব সাধারণতঃ চোখে দেখা যায় না। এ ব্যাপারে কুরআনের অন্যান্য আয়াত যেমন, সূরা আল-আন'আম: ৯৩; সূরা মুহাম্মাদ:২৭ এবং বারা ইবন আযিব বর্ণিত বিখ্যাত কবরের আযাবের হাদীসটি প্রমাণবহ । [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতে এ আযাব তোমাদের নিজেদের হাতেরই অর্জিত। সাধারণ কাজকর্ম যেহেতু হাতের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেহেতু এখানেও হাতেরই উল্লেখ করা হয়েছে। [জালালাইন] মর্মার্থ হল এই যে, এসব আযাব দুনিয়ার জীবনে তোমাদের নিজেদের খারাপ আমলেরই ফলাফল। সেটার শাস্তিই তোমাদের দেয়া হচ্ছে। [ইবন কাসীর] আর এ কথা সত্য যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর যুলুমকারী নন যে, অকারণেই কাউকে আযাবে নিপতিত করে দেবেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুম করা আমার উপর নিষিদ্ধ করে নিয়েছি। আর তা তোমাদের উপরও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! এগুলো তো তোমাদের আমল যা আমি তোমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব করে

৫২. ফির'আউনের বংশধর ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে; ফলে আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর(১)।

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٥٢

৫৩. এটা এজন্যে যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তাতে পরিবর্তন আনবেন; এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ(২)।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰي قَوْمٍ حَتّٰي يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٥٣

রাখি। যদি তোমাদের কেউ ভাল দেখতে পায়, তবে সে যেন আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে। আর যদি এর ব্যতিক্রম দেখতে পায়, তবে যেন সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে তিরস্কার না করে। [মুসলিমঃ ২৫৭৭]

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব অপরাধীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার এই আযাব নতুন কিছু নয়, বরং এটাই আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ রীতি। [ইবন কাসীর; সা'দী]

(২) এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর নেয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। "আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতিকে যে নেয়ামত দান করেন, তিনি তা ততক্ষণ পর্যন্ত বদলান না, যে পর্যন্ত না সে জাতি নিজেই নিজের অবস্থা ও কার্যকলাপ বদলে দেয়"। সুতরাং যে জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন নেয়ামত দান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপকে পরিবর্তিত করে আল্লাহ্ তা'আলার আযাবকে আমন্ত্রণ জানায়। এ আয়াতটির ভাষ্য অন্যত্রও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর কোন সম্প্রদায়ের জন্য যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছে করেন তবে তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই।" [সূরা আর-রা'দ: ১১]
অবস্থা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে সৎ ও ভাল অবস্থা ও কর্মের পরিবর্তে মন্দ অবস্থা ও কার্যকলাপ অবলম্বন করে নেয়া কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত আগমনের সময় যে সমস্ত মন্দ ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল নেয়ামত প্রাপ্তির পর তার চেয়ে অধিক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়া। [সা'দী]

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. ফির'আউনের বংশধর ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত এরা এদের রব-এর আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছিল। ফলে তাদের পাপের জন্য আমরা তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফির'আউনের বংশধরকে নিমজ্জিত করেছি। আর তারা সকলেই ছিল যালেম।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾ۖ

৫৫. বিচরণকারী প্রাণীদের মধ্যে তারাই তো আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্ট, যারা কুফরী করেছে। সুতরাং তারা ঈমান আনবে না।

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. যাদের থেকে আপনি অঙ্গীকার নিয়েছেন, তারপর তারা প্রত্যেকবার তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে[১]। আর তারা তাকওয়া অবলম্বন করে না[২]।

---

(১) অর্থাৎ যারা কুফরী, বেঈমানী ও খিয়ানত এ তিনটি বদঅভ্যাসের সমাহার নিজেদের মধ্যে ঘটিয়েছে, তারা কোন অঙ্গীকারের মূল্য দিবে না, কোন কথা রাখবে না। তারা হচ্ছে বিচরণশীল প্রাণীদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট প্রাণী। তারা গাধা ও কুকুর ইত্যাদির চেয়েও বেশী নিকৃষ্ট। তাদের মধ্যে কল্যাণের আশা করা বৃথা। সুতরাং তাদেরকে সমূলে উৎপাটন করাই শ্রেয়। যাতে করে তাদের রোগ অন্যদের মধ্যে প্রসারিত না হয়। [সা'দী] এ আয়াতটি মদীনার ইয়াহূদী বনূ-কুরাইযা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। [তাবারী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার ইয়াহূদীদের সাথে এক চুক্তি করেছিলেন। চুক্তির পূর্ণ ভাষ্য ইবন কাসীর এর 'আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্' গ্রন্থে এবং সীরাত ইবন হিশাম প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুত এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদীনার ইয়াহূদীগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুকে প্রকাশ্য কিংবা গোপন সাহায্য করবে না। কিন্তু তারা এ চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি।

(২) অর্থাৎ চুক্তি ভংগের ব্যাপারে সামান্যতম তাকওয়াও দেখায় না। চুক্তি লঙ্ঘনকারী লোকদের যে অশুভ পরিণতি হয়ে থাকে সে ব্যাপারে তারা মোটেই সাবধান হয় না। চুক্তি ভঙ্গ হয় এমন কোন কিছু করতে তারা মোটেই পিছপা হয় না। [ফাতহুল কাদীর]

৫৭. অতঃপর যুদ্ধে তাদেরকে যদি আপনি আপনার আয়ত্তে পান, তবে তাদের (শাস্তিদানের) মাধ্যমে তাদের পিছনে যারা আছে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিন, যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে[১]।

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. আর যদি আপনি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করেন, তবে আপনি তাদের চুক্তি তাদের প্রতি সরাসরি নিক্ষেপ করুন[২]; নিশ্চয় আল্লাহ্ চুক্তি ভংগকারীদেরকে পছন্দ করেন না[৩]।

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

---

(১) আয়াতের অর্থ, “আপনি যদি কোন যুদ্ধে তাদের উপর ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়ে যান, তবে তাদের এমন কঠোর শাস্তি দিন যা অন্যদের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে যায়”। এর মর্ম হল এই যে, তাদেরকে এমন শাস্তিই যেন দেয়া হয়, যা দেখে মক্কার মুশরিক ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হবে এবং ভবিষ্যতে মুসলিমদের মোকাবেলা করার সাহস করবে না। [তাবারী] হয়তবা এহেন অবস্থা দেখে এরা কিছুটা চেতনা ফিরে পাবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের সংশোধন করে নেবে অথবা অঙ্গিকার ভঙ্গ করা ত্যাগ করবে। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ তাদেরকে তাদের চুক্তি সম্পর্কে অবহিত করুন। তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের সাথে কৃত চুক্তির কার্যকারিতা শেষ হয়েছে। তারা যেন আপনাকে কোন দোষারোপ করতে না পারে যে, আমরা আপনার সাথে কৃত চুক্তি শেষ হওয়ার ব্যাপারে অবহিত ছিলাম না। [জালালাইন, সা'দী]

(৩) আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বলে দেয়া হয়েছে। যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা অর্থাৎ চুক্তি লজ্ঘনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েয নয়। বরং যদি কোন প্রস্তুতি নিতে হয়, তা এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পরেই নেবেন। নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং রোমবাসীদের মধ্যে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছিল। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ইচ্ছা করলেন যে, এই চুক্তির দিনগুলিতে নিজেদের সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম নিজেদের সে সম্প্রদায়ের কাছাকাছি নিয়ে রাখবেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু ঠিক যখন মু'আবিয়ার সৈন্যদল সেদিকে রওয়ানা হচ্ছিল, দেখা

অষ্টম রুকূ'

৫৯. আর কাফেররা যেন কখনো মনে না করে যে, তারা নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে; নিশ্চয় তারা (আল্লাহ্‌কে) অপারগ করতে পারবে না[১]।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. আর তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত রাখ শক্তি ও অশ্ব-

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن

গেল, একজন বুড়ো লোক ঘোড়ায় চড়ে খুব উচ্চঃস্বরে বললেনঃ 'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! সম্পাদিত চুক্তি পূরণ করা কর্তব্য। এর বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, কোন জাতি-সম্প্রদায়ের সাথে কোন সন্ধি বা চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে, তার বিরুদ্ধে কোন গিট খোলা বা বাঁধাও উচিত নয়'। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে বিষয়টি জানানো হল। দেখা গেল, কথাগুলো যিনি বলেছেন, তিনি হলেন সাহাবী আমর ইবন আবাসাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। [আবু দাউদঃ ২৭৫৯, তিরমিযীঃ ১৫৮০, মুসনাদে আহ্‌মাদঃ ৪/১১১,১১৩] মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তৎক্ষনাৎ স্বীয় বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যাতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদে সৈন্য স্থাপনার পদক্ষেপের দরুন খেয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়েন।

(১) এ আয়াতে সে সমস্ত কাফেরের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে বেঁচে গেছে কিংবা অংশ নিয়েও পালিয়ে গিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে। [জালালাইন] তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা যেন এমন ধারণা না করে যে, বাস্তবিক পক্ষেই আমরা বেঁচে গেছি। কারণ, বদরের যুদ্ধটি কাফেরদের জন্য এক আযাব। এই পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং বলা হয়েছে ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾ অর্থাৎ এরা নিজেদের চতুরতার দ্বারা আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারবে না, তিনি যখনই তাদেরকে ধরতে চাইবেন, তখন এরা এক পা'ও সরতে পারবে না। হয়তবা পৃথিবীতেই এরা ধরা পড়ে যেতে পারে, না হয় আখেরাতে তো তাদের আটকে পড়া অবধারিত। তিনি তাদেরকে ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। সময়মত তিনি ঠিকই তাদের পাকড়াও করবেন। তিনি যে তাদের তাৎক্ষণিক শাস্তি না দিয়ে অবকাশ দিয়ে থাকেন এতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে অনেক প্রজ্ঞা। যেমন, মুমিন বান্দাদের পরীক্ষা নেয়া, যাতে তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অন্বেষণে ব্যপ্ত হয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে। অনুরূপভাবে তারা এর মাধ্যমে এমন গুণ ও চরিত্রের অধিকারী হবে যা অন্য কোনভাবে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আর সেটি হচ্ছে জিহাদের পথ। যার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে এসেছে। [সা'দী]

رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

বাহিনী[১], তা দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্

(১) এতে সমর যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতি এবং শরীরচর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। কুরআনুল কারীম এখানে তৎকালে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের কোন উল্লেখ করেনি, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিয়েছে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর-তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপর বন্দুক-তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে বোমা, রকেট-এর যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এসব কিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যে কোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে সেসবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবেলা করা হবে, তাহলে তাও জিহাদেরই শামিল। [দেখুন, সা'দী]

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট 'ইবাদাত ও মহাপূণ্য লাভের উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করে বললেনঃ জেনে রাখ, শক্তি হল, তীরন্দাযী। শক্তি হলো তিরন্দাযী। [সহীহ মুসলিমঃ ১৯১৭] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ 'তোমরা তিরন্দাযী কর এবং ঘোড়সওয়ার হও, তবে তীরন্দাযী করা ঘোড়সওয়ারী হওয়ার চেয়ে উত্তম। [আবু দাউদঃ২৫১৩, তিরমিযীঃ ১৬৩৭]

এখানে তৈরী রাখার অর্থ, যুদ্ধের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম ও এক স্থায়ী সৈন্যবাহিনী সব সময়ই মওজুদ ও প্রস্তুত করে রাখা। যেন যথা সময়ে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। বিপদ মাথার উপর ঘনীভূত হয়ে আসার পর ঘাবড়িয়ে গিয়ে ও তাড়াহুড়া করে স্বেচ্ছাসেবী, অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করার চেষ্টা অর্থহীন। কেননা যতদিনে এ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে ততদিনে শত্রুপক্ষ তাদের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলবে।

প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বযুগে ও সব জাতিতে আলাদা রকম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- 'মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান-মাল ও মুখ এবং হাতের মাধ্যমে জিহাদ কর'। [আবু দাউদঃ ২৫০৪, নাসায়ীঃ ৩০৯৮] এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, জিহাদ ও প্রতিরোধ যেমন অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোন কোন সময় মুখেও হয়ে থাকে। তাছাড়া কলমও মুখেরই পর্যায়ভুক্ত। ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে কাফের ও মুলহেদদের আক্রমণ এবং তার বিকৃতি সাধনের প্রতিরোধ মুখে কিংবা কলমের দ্বারা করাও এই সুস্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

তাদেরকে জানেন(১)। আর আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না(২)।

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

৬১. আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন(৩) এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন(৪);

---

(১) যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে যাদেরকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য তাদের অনেককে মুসলিমরা জানে। সেসব লোকদের সাথে মুসলিমদের মোকাবেলা চলছে। এছাড়াও কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে এখনো মুসলিমরা জানে না। এর মর্ম হল সারা দুনিয়ার কাফের ও মুশরিক, যারা এখনো মুসলিমদের মোকাবেলায় আসেনি কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষ বাধতে পারে। কোন কোন মুফাসসির এটাকে বনু কুরাইযা বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, পারস্যবাসী। [তাবারী; ফাতহুল কাদীর] তবে এখানে সুনির্দিষ্ট করে না বলে কিয়ামত পর্যন্ত যত শত্রুই মুসলিমদের মুকাবিলা করবে তাদের সবাইকে উদ্দেশ্য নেয়া যেতে পারে।

(২) যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয়। সে জন্যই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র রাহে মাল বা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত এবং তার মহা-প্রতিদানের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে যে, এ পথে তোমরা যাই কিছু ব্যয় করবে তার বদলা পুরোপুরিভাবে তোমাদেরকে দেয়া হবে। কোন কোন সময় দুনিয়াতেই গনীমতের মালের আকারে এ বদলা মিলে যায়, না হয় আখেরাতের বদলা তো নির্ধারিত রয়েছেই। বলাবাহুল্য, সেটিই অধিকতর মূল্যবান। সেটি সাতশত গুণ ও আরও বেশী পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। [সা'দী]

(৩) এ আয়াতে সন্ধির হুকুম বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি কাফেররা কোন সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে আপনারও তাই করা উচিত। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, নিরাপত্তা সবসময়ই কাঙ্খিত বিষয়। সুতরাং যদি তারা সন্ধিতে আগ্রহী হয়, তবে আপনার উচিত তাদের সাথে সন্ধি করা। তাছাড়া এর মাধ্যমে মুসলিমদের শক্তি সঞ্চিত থাকবে, পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। অনুরূপভাবে সন্ধির অন্য সুবিধা হচ্ছে, মানুষ যখন নিরাপদ হবে, ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন ইসলামের পাল্লা ভারী হবে, কারণ, যার বিবেক আছে সে বিবেক খরচ করলেই বুঝতে পারবে যে, ইসলামই সত্য। [সা'দী]

(৪) অর্থাৎ যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ পেলে আপনি তাদের সাথে সন্ধি করবেন। তাতে যদি এমন কোন সম্ভাবনা থাকে যে, তারা মুসলিমদেরকে ধোঁকা

নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬২. আর যদি তারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায় তবে আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি আপনাকে নিজের সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন[১],

وَإِنْ يُرِيدُوٓا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

৬৩. আর তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি[২] স্থাপন করেছেন।

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ

দিবে বা শৈথিল্যে ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে, সে সম্ভাবনার বিপরীতে আপনি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করুন। কারণ, তিনিই যথার্থ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। তিনি তাদের কথাবার্তাও শোনেন এবং তাদের মনের গোপন ইচ্ছাও জানেন। তিনি আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম ফল তাদের উপরই এসে যাবে। [সা'দী]

(১) এ আয়াতে সন্ধির বিষয়টিকে আরো কিছুটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এ সম্ভাবনাই যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে গিয়ে তাদের নিয়ত যদি খারাপ থাকে এবং আপনাকে যদি এভাবে ধোঁকা দিতে চায়, তবুও আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহ্র সাহায্য-সমর্থনেই আপনার ও মুমিনদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে। তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে বদরে আপনার সহায়তা করেছেন। আবার বাহ্যিকভাবে মুমিনদেরকে আপনার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন [আইসারুত তাফাসীর] সুতরাং যিনি প্রকৃত মালিক ও মহাশক্তিমান, যিনি বিজয় ও কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন, তিনি আজও শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার ব্যাপারে আপনার সাহায্য করবেন।

(২) এখানে সে ভ্রাতৃত্বভাব ও বন্ধুত্বের কথা বলা হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার আরববাসীদের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি করে তাদেরকে এক মজবুত বাহিনী বানিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ এ বাহিনীর লোকেরা শতাব্দী কাল ধরে শত্রুতা ও যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছিল। বিশেষভাবে আওস ও খজরাজ গোত্রদ্বয়ের ব্যাপারে আল্লাহর এ রহমত ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকট। তারা পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য গত একশত বিশ বছর লিপ্ত ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর এরূপ কঠিন শত্রুতাকে মাত্র দু-তিন বছরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও অপূর্ব অকৃত্রিম ভালবাসায় পরিণত করা এবং পরস্পর ঘৃণিত ব্যক্তিদের জুড়িয়ে এক অক্ষয় দূর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করা নিঃসন্দেহে একমাত্র আল্লাহ্রই কৃপায় সম্ভব হয়েছিল। নিছক বৈষয়িক সামগ্রী দ্বারা এ রূপ বিরাট কীর্তি সম্পাদন ছিল সত্যই অসম্ভব। [আইসারুত তাফাসীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

যমীনের যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও আপনি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন; নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়(১) ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. হে নবী! আপনার জন্য ও আপনার অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট ।

নবম রুকূ‘

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن

৬৫. হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন; তোমাদের মধ্যে

ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে যখন মক্কার নওমুসলিমদেরকে অধিক হারে গণীমতের মাল দিলেন অথচ আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না, তখন আনসারদের মনে কিছুটা কষ্ট অনুভব হতে দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ ‘হে আনসার সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি? তারপর আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন । আর তোমরা ছিলে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত, আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন । তোমরা ছিলে দরিদ্র, আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদেরকে সম্পদশালী করেছেন । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের ডাকে সাড়া দিতে কেন কুণ্ঠাবোধ করছ?’ তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ‘তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা ছাগল আর উট নিয়ে যাবে অপরদিকে তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাবে?’ [বুখারীঃ ৪৩৩০]

(১) এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের অন্তরে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ্ তা‘আলার দান । তাছাড়া এতে একথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলার না-ফরমানীর মাধ্যমে তাঁর দান অর্জন করা সম্ভব নয়; বরং তাঁর দান লাভের জন্য তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা একান্ত শর্ত । কুরআনুল হাকীম এই বাস্তবতার প্রতিই কয়েকটি আয়াতে ইঙ্গিত করেছে । এক জায়গায় বলা হয়েছে “আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না ।” [আলে ইমরানঃ ১০৩] এই আয়াতে মতবিরোধ ও অনৈক্য থেকে বাঁচার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যে, সবাই মিলে আল্লাহ্র রজ্জুকে অর্থাৎ কুরআন তথা ইসলামী শরী‘আতকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর । তাহলে সবাই আপনা থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক যেসব বিরোধ রয়েছে, তা মিটে যাবে । ঝগড়া-বিবাদ তখনই হয়, যখন শরী‘আত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হয় ।

يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

বিশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে এক'শ জন থাকলে এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন এবং তিনি তো অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, কাজেই তোমাদের মধ্যে এক'শ জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহ্‌র অনুজ্ঞাক্রমে তারা দু হাজারের উপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন[১]।

---

(১) আয়াতে সাধারণ নীতি আকারে বলা হয়েছে ﴿وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীল লোকদের সাথে রয়েছেন। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীও অন্তর্ভুক্ত এবং শরী'আতের সাধারণ হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতায় দৃঢ়তা অবলম্বনকারীরাও শামিল। তাদের সবার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সহযোগিতার এ প্রতিশ্রুতি। আর এটাই প্রকৃতপক্ষে তাদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের মূল রহস্য। কারণ, যে ব্যক্তি একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে সমর্থ হবে, তাকে সারা বিশ্বের সমবেত শক্তিও নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দু নাড়াতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে থাকার সাথে কোন কিছুর তুলনা চলে না। কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক বলেছেন, সবরকারীগণ দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। কেননা, তারা আল্লাহ্‌র সাথে থাকার গৌরব অর্জন করেছে। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি তাদের হিফাযত করবেন, তত্ত্বাবধান করবেন, সংরক্ষণ করবেন। অন্যত্র তিনি সবরকারীদেরকে তিনটি বস্তুর ওয়াদা করেছেন, যার প্রতিটি দুনিয়া ও তাতে যা আছে তা থেকে উত্তম। তিনি তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে স্মরণ, রহমত এবং হিদায়াতপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, "এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৫৭] [ইবনুল কাইয়্যেম, 'উদ্দাতুস সাবেরীন:৯২]

৬৭. কোন নবীর জন্য সংগত নয় যে[১] তার | مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ

(১) আয়াতটি বদরের যুদ্ধে বিশেষ এক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এগুলোর তাফসীর করার ব্যাপারে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য রেওয়ায়েত ও হাদীসের মাধ্যমে ঘটনাটি বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়। ঘটনাটি হল এই যে, বদর যুদ্ধটি ছিল ইসলামের প্রথম জিহাদ। তখনো জিহাদ সংক্রান্ত হুকুম-আহ্কামের কোন বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে নাযিল হয়নি। যেমন, জিহাদ করতে গিয়ে গনীমতের মাল হস্তগত হলে তা কি করতে হবে, শত্রু-সৈন্য নিজেদের আয়ত্বে এসে গেলে তাকে বন্দী করা জায়েয হবে কিনা এবং বন্দী করে ফেললে তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে প্রভৃতি। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সেগুলোর মাঝে এও একটি যে, কাফেরদের সাথে প্রাপ্ত গনীমতের মালামাল কারো জন্য হালাল ছিল না, কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল করে দেয়া হয়েছে।[দেখুন- বুখারীঃ ৩৩৫, মুসলিমঃ ৫২১] গনীমতের মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টির ব্যাপারে বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। অথচ বদর যুদ্ধে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমগণকে ধারণা-কল্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। শত্রুরা বহু মালামালও ফেলে যায়, যা গনীমত হিসেবে মুসলিমদের হস্তগত হয় এবং তাদের বড় বড় সত্তর জন সর্দারও মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়ে আসে। কিন্তু এতদুভয় বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে কোন ওহী তখনো আসেনি।

সে কারণেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এহেন তড়িৎ পদক্ষেপের দরুন ভর্ৎসনা নাযিল হয়। এই ভর্ৎসনা ও অসন্তুষ্টিই এই ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বাহ্যতঃ দু'টি অধিকার মুসলিমগণকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এই ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে, বিষয়টির দু'টি দিকের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একটি পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দনীয়। সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ দু'টি বিষয় যখন ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পেশ করা হল যে, এদেরকে যদি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে হয়ত এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোন সময় মুসলিম হয়ে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হল জিহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারিতা। দ্বিতীয়তঃ এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলিমগণ যখন নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সত্তর জনের আর্থিক মুক্তিপণ অর্জিত হলে এ কষ্টও কিছুটা লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে জিহাদের প্রস্তুতির জন্যও কিছুটা সহায়ক হতে পারে। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এ মতই প্রদান করলেন যে, বন্দীগণকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হোক। শুধুমাত্র উমর ইবনুল খাত্তাব ও সা'দ ইবন মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা প্রমূখ কয়েকজন সাহাবী এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা করার পক্ষে মত দান করলেন।

فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

নিকট যুদ্ধবন্দী থাকবে, যতক্ষণ না তিনি যমীনে (তাদের) রক্ত প্রবাহিত করেন(১)। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ(২) এবং আল্লাহ্ চান আখেরাত; আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا

৬৮. আল্লাহ্র পূর্ব বিধান না থাকলে(৩)

তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের মোকাবেলায় শক্তি ও সামর্থ্যের বলে যোগদানকারী সমস্ত কুরাইশ সর্দার এখন মুসলিমদের হস্তগত হলেও পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একান্তই কল্পনানির্ভর। কিন্তু ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করবে সে ধারণাই প্রবল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন, তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দু'টি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ করে নিলেন, যাতে বন্দীদের ব্যাপারে রহমত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও ছিল সহজ। অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া। [দেখুন, সীরাতে ইবন হিশাম; বাগভী; কুরতুবী; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

(১) এ আয়াতে ﴿حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। إثخان এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারো শক্তি ও দম্ভকে ভেঙ্গে দিতে গিয়ে কঠোরতর ব্যবস্থা নেয়া। [তাবারী; কাশশাফ; ফাতহুল কাদীর] এর সারার্থ হল এই যে, শত্রুর দম্ভকে ধুলিস্মাৎ করে দেন। যাতে বেশীরভাগ স্থানেই মুসলিমদের বিজয় সূচিত হয়। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) আয়াতে সে সমস্ত সাহাবাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে রাসূলের কোন দোষ নেই। তোমরাই আমার রাসূলকে এ পরামর্শ দান করছো। কারণ, শত্রুদের বশে পাওয়ার পরেও তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্টকর শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে মুসলিমদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন নবীর পক্ষেই শোভন নয়। যেসব সাহাবী মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাদের সে মতে যদিও নির্ভেজাল একটি দ্বীনী প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল- অর্থাৎ মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলিম হয়ে যাবার আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্মস্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থ-সম্পদ এসে যাবে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) এখানে পূর্ব বিধান বলতে বুঝানো হয়েছে যে, পূর্ব থেকে এ উম্মাতের জন্য গণীমতের মাল ও ফিদিয়া গ্রহণ করা হালাল হওয়ার কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত ও

أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

তোমরা যা গ্রহণ করেছ সে জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত।

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

৬৯. সুতরাং তোমরা যে গনীমত লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

দশম রুকূ'

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾

৭০. হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে বলুন, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে তা থেকে উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।'

ফয়সালা অর্থাৎ 'কাদ্বা' ও 'কাদর' হিসাবে লিখা না হত তবে তোমাদের উপর আযাব আসত। এ ব্যাখ্যা অনুসারে এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করার কারণ হিসাবে তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত ও ফয়সালাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। [সা'দী; ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এখানে 'কিতাব' বলে বুঝানো হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্‌র কাছে বদরে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমার ব্যাপারটি আগে নির্ধারিত না থাকত, তবে অবশ্যই তোমাদের উপর শাস্তি আপতিত হত। অথবা যদি এটা পূর্বেই লিখিত না থাকত যে, আপনি তাদের মাঝে থাকাকালীন আমি তাদেরকে শাস্তি দেব না, তবে অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি পেয়ে বসত। অথবা যদি না জানা অপরাধের কারণে পাকড়াও করবে না এটা লিখা না থাকত, তবে অবশ্যই তাদের উপর শাস্তি আসত। অথবা যদি আমি এ উম্মতের কবীরা গোনাহ্ তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা করব এটা লিখা না থাকত তবে অবশ্যই তাদের উপর শাস্তি আসত। [ফাতহুল কাদীর]

(১) বদর যুদ্ধের বন্দীদিগকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। ইসলাম ও মুসলিমদের সে শত্রু যা তাদেরকে কষ্ট দিতে, মারতে এবং হত্যা করতে কখনোই কোন ত্রুটি করেনি; যখনই কোন রকম সুযোগ পেয়েছে একান্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়ে আসার পর এহেন শত্রুদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে

দেয়াটা সাধারণ ব্যাপার ছিল না; এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি এবং অসাধারণ দয়া ও করুণা। পক্ষান্তরে মুক্তিপণ হিসেবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও ছিল অতি সাধারণ। এটা আল্লাহ্‌র একান্ত দয়া ও মেহেরবাণী যে, এই সাধারণ অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে তাদের যে কষ্ট হয়, তাও তিনি কি চমৎকারভাবে দূর করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, যদি আল্লাহ্ তোমাদের মন-মানসিকতায় কোন রকম কল্যাণ দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাদের দিয়ে দেবেন। তদুপরি তোমাদের অতীত পাপও তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এখানে خير অর্থ ঈমান ও নিষ্ঠা। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ মুক্তি লাভের পর সেসব বন্দীদের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা যে মুক্তিপণ দিয়েছে, তার চাইতে অধিক ও উত্তম বস্তু পেয়ে যাবে। বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়ার সাথে সাথে তাদেরকে এমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, তারা যেন মুক্তি লাভের পর নিজেদের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। সুতরাং বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা মুসলিম হয়েছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান করা ছাড়াও পার্থিব জীবনে এত অধিক পরিমাণ ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, যা তাদের দেয়া মুক্তিপণ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও অধিক ছিল।

অধিকাংশ মুফাস্‌সির বলেছেন যে, এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। কারণ, তিনিও বদরের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার কাছ থেকেও মুক্তিপণ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তার বৈশিষ্ট ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফের সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে বিশ ওকিয়া (স্বর্ণমূদ্রা) সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান। যখন মুক্তিপণ দেয়ার সময় আসে, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি তো মুসলিম ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনার ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। যদি আপনার কথা সত্য হয় তবে আল্লাহ্ আপনাকে এর প্রতিফল দিবেন। আমরা তো শুধু প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডের উপর হুকুম দেব। সুতরাং আপনি আপনার নিজের এবং দুই ভাতিজা 'আকীল ইবন আবী তালেব ও নওফেল ইবন হারেসের মুক্তিপণও পরিশোধ করবেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আবেদন করলেন, আমার এত টাকা কোত্থেকে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কেন, আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময়ে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফয্‌লের নিকট রেখে এসেছেন? আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন? আমি যে রাত্রের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট অর্পণ করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোন লোকই অবগত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

৭১. আর তারা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইলে, তারা তো আগে আল্লাহ্‌র সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; অতঃপর তিনি তাদের উপর (আপনাকে) শক্তিশালী করেছেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

৭২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে[১], তারা পরস্পর পরস্পরের

ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে ব্যাপারে আমার রব আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন। তখন আব্বাস বললেন, আমার কাছে যে স্বর্ণ ছিল, সেগুলোকেই আমার মুক্তিপণ হিসেবে গণ্য করা হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে সম্পদ আপনি কুফরীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তা তো মুসলিমদের গনীমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, ফিদ্‌ইয়া বা মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। তারপর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিজের ও দুই ভাতিজার ফিদইয়া দিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [সীরাতে ইবন হিশাম; ইবন কাসীর] আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইসলাম প্রকাশের পর প্রায়ই বলে থাকতেন, আমি তো সে ওয়াদার বিকাশ-বাস্তবতা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছি। কারণ আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ বাবদ বিশ উকিয়া সোনা নেয়া হয়েছিল। অথচ এখন আমার বিশটি গোলাম (ক্রীতদাস) বিভিন্ন স্থানে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের কারো ব্যবসায়ই বিশ হাজার দিরহামের কম নয়। [দেখুন, মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩/৩২৪] তদুপরি হজের সময় হাজীদের পানি খাওয়ানোর খেদমতটিও আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে যা আমার নিকট এমন এক অমূল্য বিষয় যে, সমগ্র মক্কাবাসীর যাবতীয় ধন-সম্পদও এর তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হয়।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। তাদের একশ্রেণী হচ্ছে, মুহাজির। যারা তাদের ঘর ও সম্পদ ছেড়ে বের হয়ে এসেছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে, তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে। আর এ পথে তাদের যাবতীয় জান ও মাল ব্যয় করেছে। মুমিনদের অপর শ্রেণী হচ্ছে, আনসার। যারা তখনকার মদীনাবাসী মুসলিম, তাদের মুহাজির ভাইদেরকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের ঘরে, তাদের প্রতি সমব্যথী হয়ে সম্পদ বন্টন করে দিয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য যুদ্ধ

حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ
فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِّيْثَاقٌ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٢﴾

অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই[১]; আর যদি তারা দ্বীন সম্বন্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য[২], তবে যে

করেছে। এ দু'শ্রেণী একে অপরের বেশী হকদার। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের দু'জন ছিল ভাই। একে অপরের ওয়ারিশ হতো। শেষ পর্যন্ত যখন মীরাসের আয়াত নাযিল হয়, তখন এ বিধানটি রহিত হয়ে যায়।[ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুহাজির ও আনসারগণ একে অপরের 'ওলী'। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৬৩] এখানে কুরআনুল কারীম 'ওলী ও 'বেলায়াত' শব্দ ব্যবহার করেছে, যার প্রকৃত অর্থ হল বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, হাসান, কাতাদাহ্ ও মুজাহিদ রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমূখ তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের মতে এখানে 'বেলায়াত' অর্থ উত্তরাধিকার এবং 'ওলী' অর্থ উত্তরাধিকারী। এ তাফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম এই যে, মুসলিম মুহাজির ও আনসার পারস্পরিকভাবে একে অপরের ওয়ারিস হবেন। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক না থাকবে অমুসলিমদের সাথে, আর না থাকবে সে সমস্ত মুসলিমদের সাথে যারা হিজরত করেনি। পরবর্তীতে এ বিধান রহিত হয়ে যায়। আর কেউ কেউ এখানে এর আভিধানিক অর্থ বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহায়তা নিয়েছেন। সে হিসেবে এ বিধান রহিত করার প্রয়োজন পড়ে না। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ এরা মুসলিমদের তৃতীয় গোষ্ঠী।[ইবন কাসীর] যারা ঈমান আনার পরে হিজরত করেনি। তাদের মীরাসের অধিকারী তোমরা নও। তারা এ আয়াত অনুসারে আমল করত, সুতরাং আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণেও ঈমান ও হিজরতে সাথী হওয়ার পরও 'যবিল আরহাম' রক্ত সম্পর্কীয় গোষ্ঠী ওয়ারিস হত না। তারপর যখন তাদের মীরাসের আয়াত (সূরা আল-আনফালের ৭৫ এবং আল-আহযাবের ৬) নাযিল হয় তখন এটা রহিত হয়ে যায় এবং যবিল আরহাম বা রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের জন্য মীরাস নির্ধারিত হয়ে যায় [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু যে কোন অবস্থায় তারাও মুসলিম। যদি তারা নিজেদের দ্বীনের হেফাজতের জন্য মুসলিমদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা মুসলিমদের উপর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। [তাবারী] কিন্তু তাই বলে ন্যায় ও ইনসাফের অনুবর্তিতার নীতিকে বিসর্জন দেয়া যাবে না। তারা যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট

সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়[১]। আর তোমরা যা করছ আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৭৩. আর যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক[২], যদি তোমরা তা না কর তবে যমীনে ফিত্না ও মহাবিপর্যয় দেখা

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তবে সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সেসব মুসলিমের সাহায্য করা জায়েয নয়। [ইবন কাসীর]

(১) হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং চুক্তির শর্তে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এখন মক্কা থেকে যে ব্যক্তি মদীনায় চলে যাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক এই সন্ধি চুক্তিকালেই আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-যাকে কাফেররা মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল এবং নানাভাবে নির্যাতন করছিল-কোন রকমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং নিজের উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যে নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে আগমন করেছিলেন, একজন নিপীড়িত মুসলিমের ফরিয়াদ শুনে তিনি কি পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন, তার অনুমান করাও যে কারও জন্য সম্ভব নয়, কিন্তু এহেন মর্মপীড়া সত্ত্বেও উল্লেখিত আয়াতের হুকুম অনুসারে তিনি তার সাহায্যের ব্যাপারে অপারগতা জানিয়ে ফিরিয়ে দেন। [দেখুন, বুখারী: ২৭০০; মুসনাদে আহমাদ ৪/৩২৩]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘দুই মিল্লাতের লোকেরা পরস্পর ওয়ারিস হবে না। কোন মুসলিম কোন কাফেরকে ওয়ারিস করবে না। অনুরূপভাবে কোন কাফেরও মুসলিমকে ওয়ারিস করবে না।’ তারপর তিনি আলোচ্য এ আয়াত পাঠ করলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম:২/২৪০; অনুরূপ: মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৫২; মুসলিম: ১৭৩১; বুখারী: ৬৭৬৪] সুতরাং কাফেররা পরস্পর ওয়ারিস হবে। কারণ, তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। এখানেও আল্লাহ্ তা‘আলা وَلِيٌّ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটি একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। এতে যেমন ওয়ারাসাত বা উত্তরাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, তেমনি অন্তর্ভুক্ত বৈষয়িক সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ও।

দেবে[১]।

৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন; তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে[২]।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে থেকে জিহাদ করেছে[৩] তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়রা আল্লাহ্‌র বিধানে একে অন্যের জন্য বেশী হকদার। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

(১) অর্থাৎ তোমরা যদি এমনটি না কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। এ বাক্যটি সে সমস্ত হুকুম-আহ্‌কামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন মুহাজিরীন ও আনসারগণকে একে অপরের অভিভাবক হতে হবে- যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা এবং ওরাসাত তথা উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। আর কাফেরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। এটা না করে যদি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং মুমিনদের সাথে শত্রুতা কর তবে দুনিয়াতে গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ তাদের জন্য মাগফেরাত নির্ধারিত। যেমন, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, "ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়।" [মুসলিমঃ ১২১]

(৩) এ আয়াতে মুহাজিরদের বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজির, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে হিজরত করেছেন এবং কেউ কেউ রয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের মুহাজির, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে হিজরত করেছেন। এর ফলে তাদের পরকালীন মর্যাদায় পার্থক্য হলেও পার্থিব বিধান মতে তাদের অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদেরই অনুরূপ। তারা সবাই পরস্পরের ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী হবেন। সুতরাং প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মুহাজিররাও তোমাদেরই পর্যায়ভুক্ত। সে কারণেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতেও তাদের হুকুম সাধারণ মুহাজিরদের মতই। [বাগভী; সা'দী]

সম্বন্ধে সম্যক অবগত[১]।

(১) এটি সূরা আন্‌ফালের সর্বশেষ আয়াত। এর শেষাংশে উত্তরাধিকার আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে সেই সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে, যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের মুহাজির ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃবন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল।

এ আয়াত এই মূলনীতি বাতলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার মান অনুসারে বন্টন করা কর্তব্য। আর ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ সাধারণভাবে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন অর্থেই বলা হয়। [ইবন কাসীর] তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কুরআনুল কারীম সূরা আন্-নিসায় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "যাবিল ফুরূযে"র অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির 'আসাবাগণ' অর্থাৎ পিতামহ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে দেয়া হবে। [বুখারী: ৬৭৩২] অর্থাৎ নিকটবর্তী আসাবাকে দূরবর্তী আসাবা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আসাবার বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা হবে। আর 'আসাবা'-এর মধ্যে আর কেউ জীবিত না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করা হবে। আসাবা ছাড়াও অন্যান্য যেসব লোক আত্মীয় হতে পারে, ফরায়েয শাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের বোঝাবার জন্য 'যওয়িল আরহাম' শব্দ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালে হয়েছে। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত 'উলুল আরহাম' আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। এতে যওয়িল ফরূয, আসাবা এবং যওয়িল আরহাম সবাই মোটামুটিভাবে অন্তর্ভুক্ত [ইবন কাসীর]।

সূরা আনফালের শেষ আয়াতের সর্বশেষ বাক্যাংশটি দ্বারা ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সে ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে মুহাজিরীন ও আনসারগণ আত্মীয়তার কোন বন্ধন না থাকলেও পরস্পরের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। [বাগভী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] মূলতঃ এ হুকুমটি ছিল একটি সাময়িক হুকুম যা হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে দেয়া হয়েছিল। সে সাময়িক প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা মীরাসের ব্যাপারে তাঁর স্থায়ী বিধান নাযিল করেন যা সুরা আন-নিসায় বর্ণিত হয়েছে।

৯- সূরা আত-তাওবাহ্



সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

সূরা নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরাটি সর্বসম্মতভাবে মাদানী সূরা। বারা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ সূরা বারা‘আত সবশেষে অবতীর্ণ সূরা। [বুখারীঃ ৪৬৫৪, মুসলিমঃ ১৬১৮]

আয়াত সংখ্যাঃ ১২৯।

সূরার নামকরণঃ

তাফসীরে এ সূরার ১৩ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তম্মধ্যে বিখ্যাত হলোঃ সূরা আত-তাওবাহ্, সূরা আল- বারাআহ্ বা বারাআত। বরাআত বলা হয় এ জন্য যে, এতে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তির উল্লেখ রয়েছে। আর ‘তাওবাহ্’ বলা হয় এজন্য যে, এতে মুসলিমদের তাওবাহ্ কবুল হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়াও এ সূরার আরও কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হয়, যেমন- সূরা আল-ফাদিহা বা গোপন বিষয় প্রকাশ করে লজ্জা দিয়ে মাথা হেটকারী।[বুখারীঃ ৪৮৮২, মুসলিমঃ ৩০৩১, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৩২৭৪] এ সূরার আরেক নামঃ সূরা আল-আযাব। এ ছাড়াও এ সূরার অন্যান্য নামের মধ্যে রয়েছে, ‘আল মুকাশকেশাহ’ ‘আল বুহুস’ ‘আল-মুনাক্কেরাহ’ ’আল-হাফেরাহ’ ‘আল-মুসীরাহ’ ‘আল মুবা‘সিরাহ’ ‘আল মুদামদিমাহ’ ‘আল মুখযিয়াহ’ ‘আল মুনাক্কিলাহ’ ‘আল মুশাররিদাহ’। পরবর্তী নামগুলোর অধিকাংশই মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনাকারী। [আসমাউ সুওয়ারিল কুরআন]

সূরাটির প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়া না পড়ার হুকুমঃ

সূরাটির একটি বৈশিষ্ট্য হল, কুরআন মজীদে এর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লেখা হয় না, অথচ অন্যান্য সকল সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা হয়। কুরআন সংগ্রাহক উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু স্বীয় শাসনামলে যখন কুরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন অন্যান্য সূরার মত করে সূরা তাওবার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ লিখা হয়নি। ইবনে আব্বাস বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম, কি কারণে আপনারা আল-আনফালকে মাসানী বা শতের চেয়েও ছোট হওয়া সত্ত্বেও সূরা বারাআত এর সাথে রাখলেন, অথচ বারাআত হচ্ছে, শত আয়াত সম্পন্ন সূরা? আবার এ দু’সূরার মাঝখানে কেনইবা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লাইনটি লিখলেন না? তারপরও সেটাকে লম্বা সাতটি সূরার অন্তর্ভুক্ত কেন করলেন? তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কুরআনে মজীদ বিভিন্ন সময় ধরে অল্প অল্প করে নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোন আয়াত নাযিল হত, তখনই যারা ওহী লিখত তাদের কাউকে ডেকে বলতেন, এটাকে ঐ সূরার মধ্যে সন্নিবেশিত করে দিবে যাতে অমুক অমুক বিষয় লিখা আছে। সুতরাং যখনই কোন সূরা নাযিল হত, তখনই তিনি তাদেরকে বলতেন, এটাকে অমুক অমুক বিষয় যে সূরায় আলোচনা আছে তোমরা সেখানে স্থান দাও। আর সূরা আল-আনফাল ছিল মদীনায় নাযিল হওয়া প্রাথমিক সূরাগুলোর অন্যতম। পক্ষান্তরে

'বারাআত' ছিল কুরআনের শেষে নাযিল হওয়া সূরা। কিন্তু এ দু'টির ঘটনা একই ধরনের। তাই আমি মনে করেছি যে, এটা পূর্বের সূরারই অংশ। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হয়। অথচ তিনি আমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দেননি যে, এটি পূর্বের সূরার অংশ। এজন্যই আমি এ দু'টিকে একসাথে লিখেছি এবং এ দু'য়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিনি। তারপর সেটাকে প্রাথমিক সাতটি লম্বা সূরার মধ্যে স্থান দিলাম। [তিরমিযী: ৩০৮৬; মুসনাদে আহমাদ ১/৫৭; আবু দাউদ: ৭৮৬; নাসায়ী ফিল কুবরা: ৮০০৭; মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৩০]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা কর্তৃক আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে অপর একটি বর্ণনায় সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ দর্শানো হয় যে, বিসমিল্লাহ্তে আছে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম, কিন্তু সূরা তাওবায় কাফেরদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তিগুলো নাকচ করে দেয়া হয়। [কুরতুবী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

১. এটা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে, সে সব মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে(১)।

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١

২. অতঃপর তোমরা যমীনে চারমাস সময় পরিভ্রমণ কর(২) এবং জেনে

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবম হিজরীতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হজের আমীর করে পাঠানোর পরে এ আয়াতসমূহ নিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠালেন। তিনি কুরবানীর দিন এগুলোকে মানুষের মধ্যে ঘোষণা করলেন। এর সাথে আরও ঘোষণা ছিল যে, এরপর আর কোন লোক উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করবে না। কোন মুশরিক হজ করবে না। মুমিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। এভাবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটা বলতেন, যখন অপারগ হতেন, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন। [ইবন কাসীর]

(২) এ চারমাস সময় কাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত থাকলেও সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, এ চারমাস সময় ঐ সমস্ত কাফেরদেরকে দেয়া হয়েছে যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন মেয়াদী চুক্তি ছিল না অথবা যাদের সাথে চারমাসের কম চুক্তি ছিল। কিন্তু যাদের সাথে মেয়াদী চুক্তি ছিল আর তারা সে চুক্তি বিরোধী কোন কাজ করে নি, তাদেরকে তাদের সুনির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করতে দেয়া হয়েছিল। সে অনুসারে এ মেয়াদপূর্তির পর তাদের সাথে আর কোন নতুন চুক্তি করা হয়নি। [সা'দী]

مُعۡجِزِي اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخۡزِي الۡكٰفِرِيۡنَ ②

রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে অপদস্থকারী[১]।

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوۡمَ الۡحَجِّ الۡاَكۡبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىۡٓءٌ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ۙ وَرَسُوۡلُهٗ ؕ فَاِنۡ تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ۚ وَاِنۡ تَوَلَّيۡتُمۡ فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍۙ ③

৩. আর মহান হজের দিনে[২] আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, নিশ্চয় মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অতএব, তোমরা যদি তাওবাহ্ কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে অক্ষম করতে পারবে না এবং কাফেরদেরকে

---

(১) এখানে বলা হচ্ছে যে, যদিও তাদেরকে চারমাসের সময় দেয়া হয়েছে, তাতে তাদেরকে শুধু আল্লাহ্‌র দ্বীন বোঝা ও জানার জন্য সে সময়টুকু দেয়া হচ্ছে। যদি তারা এ সময়টুকু সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারে এবং ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তারা যেন ভাল করেই জেনে নেয় যে, যমীনের কোথাও পালিয়ে থাকলেও আল্লাহ্‌র হাত থেকে তাদের নিস্তার নেই। [সা'দী]

(২) এখানে মহান হজের দিনে বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, উমর, আবদুল্লাহ ইবন ওমর এবং আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখ সাহাবা বলেনঃ এর অর্থ আরাফাতের দিন। [ইবন কাসীর] কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে এরশাদ করেছেন "হজ হল আরাফাতের দিন"। [তিরমিযী: ৮৮৯] পক্ষান্তরে আলী, আবদুল্লাহ ইবন আবি আওফা, মুগীরা ইবন শু'বাহ, ইবন আব্বাসসহ সাহাবায়ে কিরামের এক বড় দল এবং অনেক মুফাসসির বলেন, এর অর্থ কোরবানীর দিন বা দশই যিলহজ। [ইবন কাসীর] এর সপক্ষে বেশ কিছু সহীহ হাদীস রয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর দিন প্রশ্ন করেছিলেন, "এটা কোন দিন? লোকেরা চুপ ছিল এমনকি মনে করেছিল যে, তিনি হয়ত: অন্য কোন নামে এটাকে নাম দিবেন, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা কি বড় হজের দিন নয়?"। [বুখারী: ৪৪০৬; মুসলিম: ১৬৭৯] ইমাম সুফিয়ান সওরী রাহিমাহুল্লাহ্ এবং অপরাপর ইমামগণ এ সকল উক্তির সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বলেন, হজের দিনগুলো হজ্জে আকবরের দিন। এতে আরাফাত ও কোরবানীর দিনগুলোও রয়েছে। [ইবন কাসীর]

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন ।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

৪. তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি[১], তোমরা তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন[২] ।

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ

৫. অতঃপর নিষিদ্ধ মাস[৩] অতিবাহিত

(১) এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মুশরিকরা যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তবে তাদেরকে হত্যা করা জায়েয । [আদওয়াউল বায়ান] অন্য আয়াতেও অনুরূপ বলা হয়েছে । যেমন, "যতক্ষন তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে" [সূরা আত-তাওবাহ:৭] অন্য আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, "আর যদি তারা তাদের চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে কটূক্তি করে, তবে কুফরের নেতাদের সাথে যুদ্ধ কর; এরা এমন লোক যাদের কোন প্রতিশ্রুতি নেই; যেন তারা নিবৃত্ত হয় ।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১২] তবে এর বিপরীত কাউকে হত্যা করা জায়েয নেই । হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ কোন অঙ্গীকারবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না । অথচ এর গন্ধ চল্লিশ বছরের পথের দুরত্ব থেকেও পাওয়া যায় ।" [বুখারী: ৬৯১৪]

(২) কাতাদা বলেন, এরা হচ্ছে কুরাইশ মুশরিক, যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়ার সন্ধি করেছিলেন । ঐ বছর কুরবানীর দিনের পর তাদের সুনির্দিষ্ট মেয়াদের তখনও চারমাস বাকী ছিল । তাই আল্লাহ্ তাঁর নবীকে এ সময়টুকু পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন । আর যাদের সাথে কোন চুক্তি ছিল না তাদেরকে অবকাশ দিলেন মুহাররাম মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত । আর যাদের সাথে চুক্তি ছিল সে চুক্তি শেষ হওয়ার পর আর কোন চুক্তি করা হবে না ঘোষণা দিলেন, সুতরাং তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' সাক্ষ্য দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন । তাদের কাছ থেকে অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না । [তাবারী]

(৩) এখানে "আশহুরে হুরুম" বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে । ১) বিখ্যাত চারটি মাস যা হারাম হওয়া শরী'আতের স্বীকৃত সে চারটি মাস বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ রজব, জিলকদ, জিলহজ্জ ও মুহাররাম । ২) এখানে মূলতঃ পূর্ববর্তী

حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা কর[১], তাদেরকে পাকড়াও কর[২], অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাক; কিন্তু যদি তারা তাওবাহ্ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়[৩] তবে

আয়াতে অবকাশ দেয়া চার মাসকেই বুঝানো হয়েছে। আর এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদেরকে যে চারমাসের অবকাশ দেয়া হয়েছে তা যখনি শেষ হয়ে যাবে তখনি তাদের সাথে আর কোন চুক্তি করা হবে না। তাদের হয় ইসলাম গ্রহণ করতে হবে নয় তো মক্কা ছেড়ে যেতে হবে। এর জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন হলে তা ও করতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা চার তরবারী নিয়ে পাঠিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে। যার প্রমাণ আলোচ্য আয়াত। দ্বিতীয়টি আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে। তার প্রমাণ সূরা আত-তাওবার ২৯ নং আয়াত। তৃতীয়টি মুনাফিকদের বিরুদ্ধে। যা সূরা আত- তাওবার ৭৩ ও সূরা আত-তাহরীমের ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থটি বিদ্রোহী, সীমালংঘনকারীদের বিরুদ্ধে। যার আলোচনা সূরা আল-হুজুরাত এর ৯ নং আয়াতে এসেছে। [ইবন কাসীর]

(২) চাই তা হত্যার মাধ্যমে হোক বা বন্দী করার মাধ্যমে হোক, যে প্রকারেই হোক তাদের পাকড়াও করবে। তবে বন্দীকেই أَخِيْذ বলা হয়। তাই এর অর্থ হচ্ছে, তাদের বন্দী কর। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] ইবন কাসীর আরও বলেন, এ আয়াতে যেখানে পাও পাকড়াও করার সাধারণ কথা বলা হলেও তা অন্য আয়াত দ্বারা বিশেষিত। অন্য আয়াতে হারাম এলাকায় হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "আর মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৯১]

(৩) ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং সালাত কায়েম করবে আর যাকাত প্রদান করবে। অতঃপর যদি তারা তা করে, তবে তাদের জান ও মাল আমার হাত থেকে নিরাপদ হবে, কিন্তু যদি ইসলামের অধিকার আদায় করতে হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাব নেয়ার ভার তো আল্লাহ্র উপর।" [বুখারী: ২৫; মুসলিম: ২২]

তাদের পথ ছেড়ে দাও[১]; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

৬. আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দিন; যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۟

(১) আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ আয়াত দ্বারা যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষে দলীল পেশ করেছেন। [দেখুন, বুখারীঃ২৫; মুসলিমঃ ২২] কেননা এখানে কুফরী ও শির্কী থেকে মুক্তির আলামত হিসাবে সালাত আদায়ের সাথে সাথে যাকাত প্রদানের কথাও বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর] বর্তমানেও যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করবে তাদের ব্যাপারে একই বিধান প্রযোজ্য হবে। [সা'দী] কাতাদা বলেন, আল্লাহ্ যাদেরকে ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছেন তাদেরকে ছেড়ে দাও। মানুষ তো তিন ধরনের। এক. মুসলিম, যার উপর যাকাত ফরয। দুই. মুশরিক, তার উপর জিযইয়া ধার্য। তিন. কাফের যোদ্ধা যে মুসলিমদের সাথে ব্যবসা করতে চায়, তার উপর কর ধার্য। [তাবারী]

(২) সুতরাং তিনি যারা তাওবাহ করবে তাদের শির্কসহ যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করবেন। তাদেরকে তাওফীক দেয়ার মাধ্যমে দয়া করবেন। তারপর তাদের থেকে তা কবুল করবেন। [সা'দী] সূরা তাওবাহ্‌র প্রথম পাঁচ আয়াতে মক্কাবিজয়ের পর মক্কা ও তার আশ-পাশের সকল কাফের-মুশরিকের জান-মালের সার্বিক নিরাপত্তা দানের বিষয়টি উল্লেখিত হয়। তবে তাদের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তাদের সাথে আর কোন চুক্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সত্বেও ইতিপূর্বে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় এবং যারা চুক্তিভঙ্গ করেনি, তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া অবধি চুক্তি রক্ষার জন্য এ আয়াতসমূহে মুসলিমদের আদেশ দেয়া হয়। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি হয়নি, কিংবা যাদের সাথে কোন মেয়াদী চুক্তি হয়নি, তাদের প্রতি এই অনুকম্পা করা হয় যে, তড়িৎ মক্কা ত্যাগের আদেশের স্থলে চার মাসের সময় দেয়া হয়। যাতে এ অবসরে যেদিকে সুবিধা চলে যেতে পারে, অথবা এ সময়ে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলিম হতে পারে। আল্লাহর এ সকল আদেশের উদ্দেশ্য হল, আগামী সাল নাগাদ যেন মক্কা শরীফ সকল বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের থেকে পবিত্র হয়ে যায়। অধিকাংশ আলেম এ সর্বশেষ আয়াতকে 'আয়াতুস সাইফ' বা তরবারীর আয়াত আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ হলো, এর মাধ্যমে যাবতীয় চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। এখন হয় ইসলাম না হয় তরবারীই তাদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারে। [বাগভী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

পায়(১), তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিন(২); কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা জানে না।

দ্বিতীয় রুকূ'

৭. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে মুশরিকদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে মসজিদুল হারামের সন্নিকটে(৩) তোমরা পারস্পারিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যতক্ষণ তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُولِهٖٓ اِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

(১) আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন বিধর্মী যদি ইসলামের সত্যতার দলীল জানতে চায়, তবে প্রমাণপঞ্জী সহকারে তার সামনে ইসলামকে পেশ করা মুসলিমদের কর্তব্য। অনুরূপভাবে কোন বিধর্মী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তত্ত্বাবলী হাসিলের জন্যে যদি আমাদের কাছে আসে, তবে এর অনুমতি দান ও তার নিরাপত্তা বিধান আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। তাকে বিব্রত করা বা তার ক্ষতিসাধন অবৈধ। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থান যেখান থেকে সে এসেছে সেখানে পৌঁছে দেয়াও মুসলিমের দায়িত্ব। [তাবারী] এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কুরআন আল্লাহর কালাম, তিনি স্বয়ং এ বাণীর প্রবক্তা। সুতরাং কুরআন সৃষ্ট নয়, যেমনটি কোনও কোনও বিদআতপন্থীরা মনে করে থাকে।

(২) এ সহনশীলতা প্রদর্শনের কারণ হলো, কাফের মুশরিকদেরকে আল্লাহ্র কালাম শুনে এবং মুসলিমদের বাস্তব অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দেয়া। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও রাসূলের প্রতি সাহাবাদের ভালবাসা দেখার পরে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল যা তাদের ঈমান গ্রহণে সহযোগিতা করেছিল। [ইবন কাসীর]
তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, তারা মূর্খতা বা অজ্ঞতা বশত: বিরোধিতায় লিপ্ত। আল্লাহ্র কালাম শোনার পর তাদের মধ্যে ভাবান্তর হবে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ হুদায়বিয়ার দিন যে চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল এখানে তাই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] এখানে মাসজিদুল হারাম বলে পুরো হারাম এলাকা বুঝানো হয়েছে। কুরআনের সুরা আল-ফাত্হ এর ২৫ নং আয়াতেও মাসজিদুল হারাম বলে মক্কার পুরো হারাম এলাকা বুঝানো হয়েছে। আর হুদায়বিয়ার একাংশ হারাম এলাকার ভিতরে, যা সবচেয়ে নিকটতম হারাম এলাকা।

থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে[১]; নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।

৮. কেমন করে চুক্তি বলবৎ থাকবে? অথচ তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না; তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাদের হৃদয় তা অস্বীকার করে; আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক ।

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ⑧

(১) কুরআন মজীদ মুসলিমদের তাকিদ করে যে, শত্রুদের বেলায়ও ইনসাফ থেকে কোন অবস্থায় যেন বিচ্যুত না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন, নগণ্যসংখ্যক মুশরিক ছাড়া বাকী সবাই চুক্তিভংগ করেছে। সাধারণতঃ এমতাবস্থায় বাছ-বিচার তেমন থাকে না। নির্দোষ ক্ষুদ্র দলকেও সংখ্যা গুরু অপরাধী দলের ভাগ্যই বরণ করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা "তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন করেছ" বলে ওদের পৃথক করে দেয়, যারা চুক্তিভংগ করেনি এবং আদেশ দেয়া হয় যে, সংখ্যাগুরু চুক্তিভংগকারী মুশরিকদের প্রতি রাগ করে এদের সাথে তোমরা চুক্তিভংগ করোনা; বরং এরা যতদিন তোমাদের প্রতি সরল ও চুক্তির উপর অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি সরল থাক। ওদের প্রতি আক্রোশ বশতঃ এদের কষ্ট দেবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি অন্যত্র পরিষ্কার ব্যক্ত করেছেন, "কোন জাতির শত্রুতা যেন বে-ইনসাফ হতে তোমাদের উদ্বুদ্ধ না করে"। [সূরা আল- মায়েদাহ্: ৮] অনুরূপভাবে আলোচ্য সূরা আত-তাওবাহ এর ৮ নং আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ "এদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী"। অর্থাৎ এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভদ্র চিত্ত লোক চুক্তির উপর অবিচল থাকতে চায়। কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভয়ে তারাও জড়সড়। যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তারা কারা এটা নির্ধারণে কয়েকটি মত রয়েছে। ইমাম তাবারী বলেন, তারা হচ্ছে, কিনানা এর বনী বকরের কোন কোন গোষ্ঠী। যারা তাদের অঙ্গীকারে অটল ছিল। কুরাইশ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যা সংঘটিত হয়েছিল তাতে তাদের কোন ভুমিকা ছিল না। কারণ নবম হিজরীতে যে সময় এ ঘোষণা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রদান করেছিলেন, তখন মক্কাতে কুরাইশ বা খুযা'আতে কোন কাফের অবশিষ্ট ছিল না, আর কুরাইশ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝেও আর কোন চুক্তি অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং বুঝা গেল যে, তারা ছিল কিনানার বনী বকরের কিছু লোক। [তাবারী]

৯. তারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে ফলে তারা লোকদেরকে তাঁর পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে; নিশ্চয় তারা যা করেছে তা অতি নিকৃষ্ট!

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ اِنَّهُمْ سَاۗءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑨

১০. তারা কোন মুমিনের সাথে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, আর তারাই সীমালংঘনকারী(১)।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ⑩

১১. অতএব তারা যদি তাওবাহ্ করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে দ্বীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই(২); আর আমরা আয়াতসমূহ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۭ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ⑪

(১) এ আয়াতে তাদের চরম হঠকারিতার বর্ণনা দিয়ে বলা হয় যে, এরা চুক্তিবদ্ধ মুসলিমদের সাথেই যে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মীয়তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করে তা নয় বরং তারা যে কোন মুসলিমের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, আত্মীয়তাকেও জলাঞ্জলি দেবে। সুতরাং যে কারণে তারা তোমাদের বিরোধিতা করছে তা হচ্ছে, ঈমান। সেটাই তাদের কাছে কঠোর হয়েছে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দ্বীনের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ কর। তোমাদের দ্বীনের শত্রুদেরকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ কর। [সা'দী]

(২) মুশরিকদের উপরোক্ত ঘৃণ্য চরিত্রের প্রেক্ষিতে মুসলিমদের জন্যে তাদের সাথে চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না কুরআন যে আদর্শ ও ন্যায় নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আলোকে মুসলিমদের হেদায়াত দেয়ঃ "তবে, তারা যদি তাওবাহ্ করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই"। এখানে বলা হয় যে, কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন সে মুসলিম হয়, তখন আল্লাহ যেমন তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন, তেমনি সকল তিক্ততা ভুলে তাদের ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং ভ্রাতৃত্বের সকল দাবী পূরণ করা মুসলিমদের কর্তব্য। এ শর্ত পূরণ করার ফলে তাদের উপর হাত তোলা ও তাদের জান-মাল নষ্ট করাই শুধু তোমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে না, বরং তার অধিক ফায়েদা এই হবে যে, তারা অন্যান্য মুসলিমদের সমান হতে পারবে। কোনরূপ বৈষম্য ও পার্থক্য থাকবে না। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম, কুফর ও শির্ক থেকে তাওবাহ্। দ্বিতীয় সালাত কায়েম করা, তৃতীয় যাকাত আদায় করা। [আইসারুত তাফাসীর] কারণ, ঈমান ও তাওবাহ্ হল গোপন বিষয় এর যথার্থতা সাধারণ মুসলিমের জানার কথা নয়। তাই ঈমান ও তাওবাহ্‌র দুই প্রকাশ্য আলামতের উল্লেখ করা হয়, আর তা হল,

স্পষ্টভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে(১) ।

১২. আর যদি তারা তাদের চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে কটুক্তি করে(২), তবে কুফরের নেতাদের সাথে যুদ্ধ কর(৩); এরা এমন লোক যাদের কোন

وَإِنْ نَّكَثُوٓا أَيْمَانَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾

সালাত ও যাকাত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ এ আয়াত সকল কেবলানুসারী মুসলিমের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। [তাবারী; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ যারা নিয়মিত সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করে এবং ইসলামের বরখেলাফ কথা ও কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলিমরূপে গণ্য, তাদের অন্তরে সঠিক ঈমান বা মুনাফিকী যাই থাক না কেন। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ আয়াত থেকে অস্ত্রধারনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ নিরসন করেছিলেন। [তাবারী]

(১) এখানে জ্ঞান সম্পন্ন লোক বলতে তাদের বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার পরিণাম জানে ও বুঝে এবং তাঁর ভয়ও তাদের মনে জাগরুক রয়েছে। তাদের জন্যই আগের কথাগুলো বলা হলো, তাদের মাধ্যমেই আয়াত ও আহকাম জানা যাবে, আর তাদের মাধ্যমেই দ্বীন ইসলাম ও শরী'আত জানা যাবে। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে তাদের মধ্যে গণ্য করুন যারা জানে ও সে অনুসারে আমল করে [সা'দী]

(২) এ বাক্য থেকে আলেমগণ প্রমাণ করেন যে, মুসলিমদের ধর্মের প্রতি বিদ্রুপ করা চুক্তিভঙ্গের নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম, ইসলামের নবী বা ইসলামী শরী'আতকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। শরী'আত তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলে। [ইবন কাসীর]

(৩) কতিপয় মুফাস্‌সির বলেন, এখানে কুফর-প্রধান বলতে বোঝায় মক্কার ঐ সকল কোরাইশ প্রধান যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লোকদের উস্কানি দান ও রণ প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষতঃ এদের সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ এজন্যে দেয়া হয় যে, মক্কাবাসীদের শক্তির উৎস হল এরা। [তাবারী; ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এখানে অঙ্গীকার অর্থ, ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্য। কারণ সন্ধি-চুক্তি তো পূর্বেই প্রত্যাহার করা হয়েছিল, তারপর ভবিষ্যতে তাদের সাথে নতুন করে কোন চুক্তি বা সন্ধি করার এখন কোন ইচ্ছাই ছিল না। কাজেই এখানে অঙ্গীকার ভংগ করা ও চুক্তি বিরোধী কাজ করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তা ছাড়া এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের পরেই উল্লেখিত হয়েছে। আর পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তারা যদি তাওবা করে, নামাজ পড়ে ও যাকাত আদায় করে তা হলে তারা

প্রতিশ্রুতি নেই(১); যেন তারা নিবৃত্ত হয়(২)।

১৩. তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বের করে দেয়ার জন্য সংকল্প করেছে? আর তারাই প্রথম তোমাদের সাথে (যুদ্ধ) আরম্ভ করেছে(৩)। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে বেশী সমীচীন যদি তোমরা মুমিন হও।

أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

তোমাদের ভাই হবে"। এরপর "তারা যদি অঙ্গীকার ভংগ করে" বলার পরিষ্কার অর্থ এই হতে পারে যে, এর দ্বারা সে লোকদের ইসলাম কবুল ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করা-ই বুঝানো হয়েছে। আসলে এ আয়াতে মুর্তাদ হওয়ার ফেতনার কথাই বলা হয়েছে, যা তখনো আসেনি। যা এর দেড় বছর পর আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খিলাফতের শুরুতে হয়েছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ সময় যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন তা কিছুকাল পূর্বে এ আয়াতে দেওয়া হেদায়াত অনুরূপই ছিল। [তাবারী; ইবন কাসীর]

(১) এখানে বলা হয়েছেঃ "এদের কোন শপথ নেই"; কারণ, এরা শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যস্ত। তাই এদের শপথের কোন মূল্য মান নেই। [সা'দী]

(২) এ থেকে বুঝা যায় যে, মুসলিমদের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য অপরাপর জাতির মত শত্রু নির্যাতন ও প্রতিশোধ স্পৃহা নিবারণ, কিংবা সাধারণ রাষ্ট্রনায়কগণের মত নিছক দেশ দখল না হওয়া চাই। বরং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি এবং বিপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা। হয়ত তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে, ইসলামে অপবাদ দেয়া বাদ দিবে, অথবা ঈমান আনবে। [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ কাফেররাই প্রথম শুরু করেছে, কি শুরু করেছে? কেউ কেউ বলেনঃ এর দ্বারা বদরের যুদ্ধ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [তাবারী] কারণ কাফের কুরাইশগণ যখন বদরে জানতে পারল যে, তাদের বাণিজ্য কাফেলা আশংকামুক্ত হয়েছে তখন তাদের মনের ভিতর হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তারা মুসলিমদের আক্রমণ করা ব্যতীত ক্ষান্ত হতে চাইল না, তারাই তখন বদরের প্রান্তরে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে পাগলপ্রায় হয়ে গেল। কেউ কেউ বলেনঃ এর দ্বারা তাদের চুক্তিভঙ্গ করে বনু বকরের সাথে মিলিত হয়ে রাসূলের মিত্র বনু খোযা'আকে আক্রমণ করা বুঝানো হয়েছে। [সা'দী]

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١٤

১৪. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে অপদস্থ করবেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মুমিন সম্প্রদায়ের চিত্ত প্রশান্তি করবেন,

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝١٥

১৫. আর তিনি তাদের[১] অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে তার তাওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١٦

১৬. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে অথচ এখনও আল্লাহ্ প্রকাশ করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি[২]? আর তোমরা যা কর, সে

---

(১) অর্থাৎ ঈমানদারদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। [তাবারী]

(২) এখানে জিহাদের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হল, জিহাদের দ্বারা মুসলিমদের পরীক্ষা করা। [তাবারী] এ পরীক্ষায় নিষ্ঠাবান মুসলিম এবং মুনাফিক ও দুর্বল ঈমান সম্পন্নদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অতএব, এ পরীক্ষা জরুরী। তাই বলা হয়েছেঃ তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কলেমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবী শুনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেয়া হবে। অথচ আল্লাহ্ প্রকাশ্য দেখতে চান কারা আল্লাহ্র রাহে জিহাদকারী এবং কারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে না। এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলিমদের প্রতি। এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক প্রকৃতির, আর কিছু দুর্বল ঈমানসম্পন্ন ইতস্ততঃকারী, যারা মুসলিমদের গোপন বিষয়গুলো নিজেদের অ-মুসলিম বন্ধুদের বলে দিত। সেজন্য এ আয়াতে নিষ্ঠাবান মুসলিমদের দু'টি আলামতের উল্লেখ করা হয়। এক. শুধু আল্লাহ্র জন্যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে। দুই. কোন অমুসলিমকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করে না। আয়াতে উল্লেখিত শব্দ وليجة এর অর্থ, অন্তরঙ্গ বন্ধু, যে গোপন কথা জানে। অন্য এক আয়াতে এ অর্থে بطانة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

তৃতীয় রুকূ'

১৭. মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহের আবাদ করবে---এমন হতে পারে না[১]। তারা এমন যাদের সব কাজই নষ্ট হয়েছে[২] এবং তারা আগুনেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۗ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮. তারাই তো আল্লাহ্র মসজিদের আবাদ করবে[৩], যারা ঈমান আনে আল্লাহ্

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

[তাবারী] এর আভিধানিক অর্থ কাপড়ের ঐ স্তর যা অন্যান্য কাপড়ের ভেতর পেট বা শরীরের স্পর্শে থাকে। বলা হয়েছেঃ "হে ঈমানদারগণ, মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করো না, তারা তোমাদের ধ্বংস সাধনে কোন ত্রুটি বাকী রাখবে না।" [সূরা আলে ইমরান: ১১৮]

মোটকথাঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা জিহাদের মাধ্যমে তিনি ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিবেন। এ ধরনের কথা সূরা আল-আনকাবূত এর ১-৩, সূরা আলে ইমরানের ১৪২, ১৭৯ আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে। [তাবারী]

(১) অর্থাৎ যে মসজিদ একমাত্র আল্লাহ্র বন্দেগীর জন্য নির্মিত হয়েছে, তার মুতাওয়াল্লী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, খাদেম ও আবাদকারী হওয়ার জন্য সেই লোকেরা কখনই যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না, যারা আল্লাহ্র সাথে আল্লাহর গুণাবলী, হক-হুকুক ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারের ব্যাপারে অন্যদের শরীক করে। আল্লাহ্র ইবাদাতের সাথে অন্যদেরও ইবাদত করে। তাছাড়া তারা নিজেরাই যখন তাওহীদের দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করছে এবং নিজেদের দাসত্ব-বন্দেগীকে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করতে প্রস্তুত নয় বলে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে, তখন যে ইবাদতখানার নির্মাণই হয়েছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য তার মুতাওয়াল্লী হওয়ার তাদের কি অধিকার থাকতে পারে? [তাবারী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী; আইসারুত তাফাসীর]

(২) অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র ঘরের যে সামান্য কিছু খেদমত করেছে বলে যে অহঙ্কার করছে, তাও বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে গেছে [ফাতহুর কাদীর] এই কারণে যে, তারা এ খেদমতের সঙ্গে সঙ্গে শির্কের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। [আইসারুত তাফাসীর] তাদের সামান্য পরিমাণ ভালো কাজকে তাদের বড় আকারের মন্দ কাজ নিষ্ফল করে দিয়েছে।

(৩) এ আয়াতে আল্লাহর মসজিদ নির্মানের ও আবাদের যোগ্যতা কাদের রয়েছে তা জানিয়ে বলা হচ্ছেঃ আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রয়েছে উপরোক্ত

وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾

ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত[১]।

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. হাজীদের জন্য পানি পান করানো ও মসজিদুল হারাম আবাদ করাকে তোমরা কি তার মত বিবেচনা কর, যে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে[২]? তারা আল্লাহ্‌র কাছে

গুণাবলীসম্পন্ন নেককার মুসলিমদের। এই থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি মসজিদের হেফাযত, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও অন্যান্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিক্‌র বা দ্বীনী ইল্‌মের শিক্ষা দানে কিংবা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করে, তা তার কামেল মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি স্থান প্রস্তুত করেন।' [বুখারীঃ ৬৬২, মুসলিমঃ ৬৬৯] সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিয়ারতকারী মেহমান, আর মেজবানের কর্তব্য হল মেহমানের সম্মান করা।' [আত-তাবরানী ফিল কাবীর ৬/২৫৫] তৃতীয় খলীফা উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মসজিদে নববী নতুন করে তৈরী করছিলেন তখন লোকেরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলছিল। তখন তিনি বললেন, তোমরা বড্ড বেশী কথা বলছ, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে কেউ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ বানাবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর বানাবেন।' [বুখারী: ৪৫০; মুসলিম: ৫৩৩]

(১) ইবন আব্বাস থেকে এ আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তিই মসজিদ নির্মাণ করবে, যে আল্লাহ্‌র তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছে, শেষ দিবসের উপর ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা স্বীকার করে নিয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করেছে, আর আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করেনি, নিশ্চয় তারাই হবে সফলকাম। কুরআনে যেখানেই আল্লাহ্ তা'আলা 'আশা করা যায়' বলেছেন সেটাই অবশ্যম্ভাবী। [তাবারী]

(২) সুতরাং জিহাদ ও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এ দুটি অবশ্যই হাজীদেরকে পানি পান

সমান নয়(১)। আর আল্লাহ্ যালিম

করানো এবং মসজিদে হারামের আবাদ বা সেবা করা থেকে বহুগুণ উত্তম। কেননা, ঈমান হচ্ছে দ্বীনের মূল, এর উপরই আমল কবুল হওয়া নির্ভর করে এবং চারিত্রিক মাধুর্যতা প্রকাশ পায়। আর আল্লাহ্র পথে জিহাদ হচ্ছে দ্বীনের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, যার মাধ্যমে দ্বীনে ইসলামী সংরক্ষিত হয়, প্রসারিত হয়, সত্য জয়যুক্ত হয় এবং মিথ্যা অপসৃত হয়। পক্ষান্তরে মাসজিদুল হারামের সেবা করা এবং হাজিদেরকে পানি পান করানো যদিও সৎকাজ, কিন্তু এ সবই ঈমানের উপর নির্ভরশীল। ঈমান ও জিহাদে দ্বীনের যে স্বার্থ আছে তা এতে নেই। [সা'দী]

(১) এ আয়াত এবং এর পরবর্তী তিনটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তা হল মক্কার অনেক মুশরিক মুসলিমদের মোকাবেলায় গর্ব সহকারে বলতঃ মসজিদুল-হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর উপর আর কারো কোন আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হতে পারে না। নু'মান ইবন বশীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক জুমআর দিন তিনি কতিপয় সাহাবার সাথে মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেনঃ ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মত মর্যাদাসম্পন্ন আর কোন আমল নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারি না। তার উক্তি খণ্ডন করে অপরজন বললেনঃ মসজিদুল হারাম আবাদ করার মত উত্তম আমল আর নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারি না। অপর আরেকজন বললেনঃ আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করার মত উত্তম আমল আর নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারি না। এভাবে তাদের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাদের ধমক দিয়ে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের কাছে শোরগোল বন্ধ কর! জুম'আর সালাতের পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি পেশ কর। কথামত প্রশ্নটি তার কাছে রাখা হল। এর প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। [সহীহ মুসলিমঃ ১৮৭৯] এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের উপর জিহাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

সে যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে মুশরিকদের কা'বা নিয়ে গর্বের অন্ত ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-মু'মেনুনের ৬৬, ৬৭ নং আয়াতেও তা উল্লেখ করেছেন। আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল মুলতঃ মুশরিকদের অহংকার নিবারণ উদ্দেশ্যে। অতঃপর মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে, তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় এ সকল আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতারা ধরে নিয়েছে যে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়। উপরোক্ত আয়াতে যে সত্যটি তুলে ধরা হয় তা হল, শির্ক মিশ্রিত আমল তা যত বড় আমলই হোক কবূল যোগ্য নয় এবং এর কোন মূল্যমানও নেই। সে কারণে কোন মুশরিক মসজিদ

সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না[১]।

রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলিমদের মোকাবেলায় ফযীলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জিহাদের মর্যাদা মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশি। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি পান করানোর জায়গায় আসলেন এবং পানি চাইলেন, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে ফযল! তুমি তোমার মায়ের কাছ থেকে পানি নিয়ে আস, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে পানি পান করাও। আব্বাস বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরা পাত্রের পানিতে হাত ঢুকিয়ে ফেলে। তিনি বললেন, আমাকে পানি দাও। অতঃপর তিনি তা থেকে পান করলেন। তারপর তিনি যমযমের কাছে আসলেন, দেখলেন তারা সেখানে কাজ করছে। তখন তিনি বললেন, তোমরা কাজ করে যাও, তোমরা ভালো কাজ করছ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তোমাদের কাজের উপর ব্যাঘাত আসার সম্ভাবনা না থাকত তাহলে আমিও নীচে নামতাম এবং এর উপর অর্থাৎ ঘাড়ের উপরে করে পানি নিয়ে আসতাম'। [বুখারী: ১৬৩৫]

মোটকথাঃ নেক আমলগুলোর মর্যাদার তারতম্য রয়েছে। সেমতে আমলকারীর মর্যাদায়ও তারতম্য হবে। অর্থাৎ সকল আমলকারীকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। আর একটি কথা হল, আমলের আধিক্যের উপর ফযীলত নির্ভরশীল নয়; বরং আমলের সৌন্দর্যের উপর তা নির্ভরশীল। সূরা আল-মুলকের দ্বিতীয় আয়াতে আছেঃ ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ অর্থাৎ "যাতে আল্লাহ্ পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কার আমল কত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"

(১) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, 'আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।' এখানে যুলুমের সর্বশেষ পর্যায় অর্থাৎ কুফর ও শির্ক বোঝানোই উদ্দেশ্য। সুতরাং যারা কুফরী করবে তারা কখনো ভাল কাজ দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাবে না। তারা ভাল কাজ করার তাওফীকও পাবে না। [মুয়াসসার] বস্তুতঃ ঈমান হল আমলের প্রাণ। ঈমানবিহীন আমল প্রাণশূন্য দেহের মত যা গ্রহণের অযোগ্য। আখেরাতের মুক্তির ক্ষেত্রে এর কোন দাম নেই। গোনাহ্ ও পাপাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। এর বিপরীতে অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ "তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে তিনি ভাল-মন্দ পার্থক্যের শক্তি দান করবেন।" [সূরা আল-আনফাল: ২৯] অর্থাৎ ইবাদাত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহেযগারীর ফলে বিবেক প্রখর হয়, সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনার শক্তি আসে। তাই সে ভাল-মন্দের পার্থক্যে ভুল করে না। পক্ষান্তরে যারা যালিম, যারা নিজেদের নাফসের উপর যুলুম করেছে, তারা ভাল-মন্দের পার্থক্যে ভুল করে, ফলে তাদের হিদায়াত নসীব হয় না।

২০. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই সফলকাম[১]।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১. তাদের রব তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের[২] এবং এমন জান্নাতের যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী নেয়ামত।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾

২২. সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে আছে মহাপুরস্কার[৩]।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٢﴾

(১) এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত ‘সমান নয়’ এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।[ফাতহুল কাদীর; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] বলা হয়েছেঃ “যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাহে মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা এবং তারাই সফলকাম।” পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ মুশরিকদের কোন সফলতা আল্লাহ্ দান করেন না। তবে সাধারণ মুসলিমগণ এ সফলতার অংশীদার, কিন্তু দেশত্যাগী মুজাহিদগণের সফলতা সবার উর্ধ্বে। তাই পূর্ণ সফলতার অধিকারী হল তারা। সে হিসেবে অর্থ দাঁড়ায়, “যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে তারা তাদের থেকে উত্তম যারা ঈমান আনলেও হিজরত করেনি। কারণ, তারা হিজরত না করার কারণে অনেক জিহাদেই অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। এ আয়াতে হিজরত বলে মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করা বোঝানো হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে কেউ জান্নাতে যাবে, সে শুধু নে‘আমতই প্রাপ্ত হবে, কখনও নিরাশ হবে না, তার প্রতি কঠোরতা করা হবে না। তার কাপড় কখনও পুরান হবে না, তার যৌবনও কখনও শেষ হবে না।’ [মুসলিম: ২৮৩৬] অন্য হাদীসে এসেছে, ‘যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ জিনিস দেব। তারা বলবে, হে আমাদের রব! এর থেকেও শ্রেষ্ঠ জিনিস কি? তিনি বলবেন, আমার সন্তুষ্টি।’ [তাবারী]

(৩) আরাম-আয়েশের স্থায়িত্বের জন্য দু’টি বিষয় আবশ্যক। এক. নেয়ামতের স্থায়িত্ব। দুই. নেয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়া। তাই আল্লাহ্‌র সৎ বান্দাদের জন্যে এ আয়াতে এবং পূর্বের আয়াতে এ দু’টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। আয়াতে আল্লাহ্‌র সৎ বান্দাদের জন্য যে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে তার বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে

২৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতৃবর্গ ও ভ্রাতৃবৃন্দ যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে পছন্দ করে, তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না[১]। তোমাদের

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ

রয়েছে, তাদের অন্তরে খুশীর অনুপ্রবেশ ঘটানো, তাদের সফলতার নিশ্চয়তা, আল্লাহ্ তা'আলা যে তাদের উপর সন্তুষ্ট সেটা জানিয়ে দেয়া, তিনি যে তাদের প্রতি দয়াশীল সেটার বর্ণনা, তিনি যে তাদের জন্য স্থায়ী নে'আমতের ব্যবস্থা করেছেন সেটার পরিচয় দেয়া। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) পূর্বের আয়াতসমূহে হিজরত ও জিহাদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে দেশ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অর্থ-সম্পদকে বিদায় জানাতে হয়। আর এটি হল মনুষ্য স্বভাবের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। তাই সামনের আয়াতে এগুলোর সাথে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার নিন্দা করে হিজরত ও জিহাদের জন্য মুসলিমদের উৎসাহিত করা হয়। বলা হয়েছেঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের বদলে কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমালংঘনকারী।" মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ দিয়ে কুরআনের বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক তা মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেয়ার উপযুক্ত। যেখানে এ দু'সম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক কতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক রাখা যাবে আর কখন রাখা যাবে না সে সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন, "আপনি পাবেন না আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারিদেরকে--- হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা। আর তিনি এদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে এরা স্থায়ী হবে; আল্লাহ্ এদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এরাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম।" [সূরা আল-মুজাদালাহঃ ২২]। এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে সবকিছুর উপর স্থান দিতে হবে। আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ থেকে অপর কিছুকে প্রাধান্য দিবে তাদের জন্য কঠোর সাবধানবাণী দেয়া হয়েছে। আর সেটা চেনার উপায় হচ্ছে, যদি দুটি বিষয় থাকে একটি নিজের মনের বিরুদ্ধে যায়, কিন্তু তাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে। আর অপরটি নিজের মনের পক্ষে কিন্তু তাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের

الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই যালিম।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ٰاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. বলুন, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশী প্রিয় হয়[১] তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের সন্তানরা, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আপনগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস[২], তবে অপেক্ষা

অসন্তুষ্টি রয়েছে, এমতাবস্থায় যদি সে নিজের মনের পছন্দের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয় তবে বুঝা যাবে যে সে যালিম। তার উপর যে ওয়াজিব ছিল সেটাকে সে ত্যাগ করেছে। [সা'দী] পক্ষান্তরে যদি কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, তবে এটা হবে প্রকৃত ত্যাগ ও কুরবানী। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামা'আতরূপে সাহাবায়ে কেরাম যে অভিহিত, তার মূলে রয়েছে তাদের এ ত্যাগ ও কুরবানী। তারা সর্বক্ষেত্রে-সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই আফ্রিকার বেলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, রোমের সোহাইব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, মক্কার কুরাইশ ও মদীনার আনসারগণ গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ওহুদ ও বদর যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে দাঁড়াতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যদি তোমরা 'ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা কর, গাভীর লেজ ধরে থাক, ক্ষেত-খামার নিয়েই সন্তুষ্ট থাক, আর জিহাদ ছেড়ে দাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন যে, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ সে অপমান তোমাদের থেকে তিনি সরাবেন না।' [আবু দাউদ: ৩৪৬২]

(২) এখানে সরাসরি সম্বোধন রয়েছে তাদের প্রতি, যারা হিজরত ফরয হওয়াকালে পার্থিব সম্পর্কের মোহে হিজরত করেনি। তবে আয়াতটির সংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যাপক অর্থে সকল মুসলিমের প্রতি এ আদেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে এমন উন্নত স্তরে রাখা ওয়াজিব, যে স্তর অন্য কারো ভালবাসা অতিক্রম করবে না। এ ব্যাপারে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কোন ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল

কর আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত।[১]' আর আল্লাহ্ ফাসিক

লোক থেকে অধিক প্রিয় হই।' [বুখারীঃ ১৪, মুসলিমঃ ৪৪] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য, শত্রুতা রেখেছে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য, অর্থ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র জন্য এবং অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রয়েছে আল্লাহ্‌র জন্য, সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।' [আবু দাউদঃ ৪৬৮১; অনুরূপ তিরমিযীঃ ২৫২১] হাদীসের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসাকে অপরাপর ভালবাসার ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া এবং শত্রুতা ও মিত্রতায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের অনুগত থাকা পূর্ণতর ঈমান লাভের পূর্বশর্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও শরী'আতের হেফাযত এবং এতে ছিদ্র সৃষ্টিকারী লোকদের প্রতিরোধ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ।

(১) সূরা আত্-তাওবাহ্‌র এ আয়াতটি নাযিল হয় মূলতঃ তাদের ব্যাপারে যারা হিজরত ফরয হওয়াকালে মক্কা থেকে হিজরত করে নি। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও অর্থ-সম্পদের মায়া হিজরতের ফরয আদায়ে এদের বিরত রাখে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ "যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ্ নাফরমানদিগকে কৃতকার্য করেন না।"

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে কথা আছে, তৎসম্পর্কে তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ এখানে 'বিধান' অর্থে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মক্কা জয়ের আদেশ। [তাবারী] বাক্যের মর্ম হল, যারা দুনিয়াবী সম্পর্কের জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। মক্কা যখন বিজিত হবে আর এ সকল নাফরমানেরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে, তখন দুনিয়াবী সম্পর্ক তাদের কোন কাজে আসবে না। হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ এখানে বিধান অর্থ আল্লাহ্‌র আযাবের বিধান। যা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। [কুরতুবী; সা'দী] অর্থাৎ আখেরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত রয়েছে, আল্লাহ্‌র আযাব অতি শীঘ্র তাদের গ্রাস করবে। দুনিয়ার মধ্যেই এ আযাব আসতে পারে। অন্যথায় আখেরাতের আযাব তো আছেই। হাদীসে এসেছে, 'শয়তান বনী আদমের তিন স্থানে বসে পড়ে তাকে এগোতে দেয় না। সে তার

সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না[১]।

চতুর্থ রুকূ‘

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ

২৫. অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে[২] যখন তোমাদেরকে

ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সে বলতে থাকে তুমি কি তোমার পিতা-পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করবে? তারপর বনী আদম তার বিরোধিতা করে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন সে তার হিজরতের পথে বাঁধ সাধে। সে বলতে থাকে, তুমি কি তোমার সম্পদ ও পরিবার-পরিজন ত্যাগ করবে? তারপর বনী আদম তার বিরোধিতা করে হিজরত করে, তখন সে তার জিহাদের পথে বাঁধ সাধে। সে বলতে থাকে, তুমি কি জিহাদ করবে এবং নিহত হবে? তখন তোমার স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাবে, তোমার সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে, তারপর বনী আদম তার বিরোধিতা করে জিহাদ করে। এমতাবস্থায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র হক হয়ে যায়।' [নাসায়ী: ৩১৩৪]

(১) অর্থাৎ যারা হিজরতের আদেশ আসা সত্ত্বেও আল্লাহ্র নির্দেশকে অমান্য করেছে, উপরোক্ত বস্তুগুলোকে বেশী ভালবেসেছে, দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে আত্মীয়-স্বজন এবং অর্থ-সম্পদকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে, আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বগৃহে আরাম-আয়েশ ও ভোগের আশা পোষণ করে আছে, জিহাদের আহ্বান আসার পরও সহায়-সম্পত্তির লোভ করে বসে আছে, তারা ফাসেক ও নাফরমান। আর আল্লাহ্র রীতি হল, তিনি নাফরমান লোকদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন না। তাদেরকে হিদায়াত করেন না। তাদেরকে সফলতা ও সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করেন না। [সা'দী; আইসারুত তাফাসীর]

(২) এ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্র সেই দয়া ও দানের উল্লেখ রয়েছে যা প্রতি ক্ষেত্রে মুসলিমরা লাভ করে। বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে।" এরপর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় হুনাইন যুদ্ধের কথা। কারণ, সে যুদ্ধে এমনসব ধারণাতীত অদ্ভুত ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের ঈমানী শক্তি প্রবল ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়।
'হুনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। যা মক্কা শরীফ থেকে পূর্ব দিকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি অনেকটা আরাফার দিকে। বর্তমানে এ স্থানকে 'আশ-শারায়ে' বলা হয়। [আতেক গাইস আল-বিলাদী, মু'জামুল মা'আলিমিল জুগরাফিয়্যাহ: ১০৭] অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে যখন মক্কা বিজিত হয় আর মক্কার কুরাইশগণ অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াযেন গোত্র-যার একটি শাখা তায়েফের বনূ-সকীফ নামে পরিচিত, তাদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে তারা একত্রিত হয়ে

উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের | تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ

আশংকা প্রকাশ করতে থাকে যে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলিমদের বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তখন পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হবে তায়েফ। তাই তাদের আগে আমাদের আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। পরামর্শ মত এ উদ্দেশ্যে হাওয়াযেন গোত্র মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত শাখা-গোত্রগুলোকে একত্রিত করে। আর বিশাল সে গোত্রের প্রায় সবাই যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়।

এ অভিযানের নেতা ছিলেন মালেক ইবন আউফ। অবশ্য পরে তিনি মুসলিম হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীব্র প্রেরণা ছিল তার মনে। তাই স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ গোত্রের অপর দু'টি ছোট শাখা- বনূ-কা'ব ও বনূ-কেলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তাদের কিছু দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। তারা বলতে থাকে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াও যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তথাপি তিনি সকলের উপর জয়ী হবেন, আমরা আল্লাহ্র শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।

এই দুই গোত্র ছাড়া বাকী সবাই যুদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনানায়ক মালেক ইবন আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদের সুদৃঢ় রাখার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের পরিবার-পরিজনও উপস্থিত থাকবে এবং প্রত্যেকের জীবিকার প্রধান সহায় পশুপালও সাথে রাখতে হবে। উদ্দেশ্য, কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেযুল-হাদীস আল্লামা ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ চব্বিশ বা আটাশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক মনে করেন। আর কেউ কেউ বলেনঃ এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চব্বিশ বা আটাশ হাজার, আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার।

মোটকথা, এদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফেই অবহিত হন এবং তিনিও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় আত্তাব ইবন আসাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে আমীর নিয়োগ করেন এবং মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে লোকদের ইসলামী তা'লীম দানের জন্য তার সাথে রাখেন। তারপর মক্কার কুরাইশদের থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ধারস্বরূপ সংগ্রহ করেন। ইমাম যুহরীর বর্ণনামতে চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এতে ছিলেন মদীনার বার হাজার আনসার যারা মক্কা বিজয়ের জন্য তার সাথে এসেছিলেন। বাকী দু'হাজার ছিলেন আশপাশের অধিবাসী, যারা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলিম হয়েছিলেন এবং যাদের বলা হত 'তোলাকা' অর্থাৎ সাধারণ ক্ষমায় মুক্তিপ্রাপ্ত। ৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল শুক্রবার রাসূলের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। রাসূল

সংখ্যাধিক্য হওয়া; কিন্তু তা তোমাদের | بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'ইনশাআল্লাহ্, আগামীকাল আমাদের অবস্থান হবে খায়ফে বনী-কেনানার সে স্থানে, যেখানে মক্কার কুরাইশগণ ইতিপূর্বে মুসলিমদের সাথে সামাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল।

চৌদ্দ হাজারের এ বিরাট সেনাদল জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষও যুদ্ধের দৃশ্য উপভোগের জন্যে বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল, এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার একটা ভাল সুযোগ হবে। আর যদি তারা জয়ী হয়ে যায় তা হলেও আমাদের ক্ষতি নেই। সে যা হোক, মুসলিম সেনা দল হুনাইন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। এ সময় সুহাইল ইবন হানযালা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ জনৈক অশ্বারোহী এসে শত্রুদলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। স্মিতহাস্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ চিন্তা করো না, ওদের সবকিছু গনীমতের মাল হিসাবে মুসলিমদের হস্তগত হবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনে অবস্থান নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবন হাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে গোয়েন্দারূপে পাঠান। তিনি দু'দিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এক সময় শত্রু সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফকে স্বীয় লোকদের একথা বলতে শোনেনঃ 'মুহাম্মাদ এখনো কোন সাহসী যুদ্ধবাজদের পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কুরাইশদের দমন করে তিনি বেশ দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারবে কার সাথে তার মোকাবেলা। আমরা তার সকল দম্ভ চূর্ণ করে দেব। তোমরা কাল ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রত্যেকের পেছনে তার স্ত্রী-পরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারীর কোষ ভেঙ্গে ফেলবে এবং সকলে একসাথে আক্রমণ করবে'। বস্তুতঃ কাফেরদের ছিল প্রচুর যুদ্ধ অভিজ্ঞতা। তাই তারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে কয়েকটি সেনাদল লুকায়িত রেখে দেয়।

এ হল শত্রুদের রণপ্রস্তুতির একটি চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসাবে এটি ছিল মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজারের এক বিরাট বাহিনী। এ ছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর। তাই কারো কারো মন থেকে বের হয়ে আসেঃ আজকের জয় অনিবার্য, পরাজয় অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই শত্রুদল পালাতে বাধ্য হবে। কিন্তু মুসলিমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা না করে জনবলের উপর তৃপ্ত থাকবে এটা আল্লাহ্‌র পছন্দ ছিল না। এটাই হুনাইনের যুদ্ধে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

হাওয়াযেন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলিমদের প্রতি সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ঘাঁটিতে লুকায়িত কাফের সেনারা চতুর্দিক থেকে মুসলিমদের ঘিরে ফেলে। এ সময় আবার ধূলি-ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে। এতে সাহাবাগণের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হলো না। ফলে তারা পিছু

কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও যমীন তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। তারপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েছিলে[১]।

২৬. তারপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূলের উপর ও মুমিনদের উপর

ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى

হটতে শুরু করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। তার সাথে ছিলেন অল্প সংখ্যক সাহাবী। এরাও চাচ্ছিলেন যেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর না হন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেনঃ উচ্চঃস্বরে ডাক দাও, বৃক্ষের নীচে জিহাদের বাই'আত গ্রহণকারী সাহাবীগণ কোথায়? সূরা বাক্বারাওয়ালারা কোথায়? জান কুরবানের প্রতিশ্রুতিদানকারী আনসারগণই বা কোথায়? সাবই ফিরে এস, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই আছেন।

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর এ আওয়ায রণাঙ্গনকে প্রকম্পিত করে তোলে। পলায়নরত সাহাবীগণ ফিরে দাঁড়ান এবং প্রবল সাহসিকতার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ্ এদের সাহায্যে ফেরেশতাদল পাঠিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। কাফের সেনানায়ক মালেক ইবন আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়েফ দূর্গে আত্মগোপন করে। এরপর গোটা শত্রুদল পালাতে শুরু করে। যুদ্ধ শেষে মুসলিমদের হাতে আসে তাদের সকল মালামাল, ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উট, চব্বিশ হাজার ছাগল এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য। [কুরতুবী; বাগভী; ইবন কাসীর; প্রমূখ। বিস্তারিত জানার জন্য আরও দেখুন, ইবরাহীম ইবন ইবরাহীম কুরাইবী কৃত মারওয়িয়াতু গাযওয়াতি হুনাইন ওয়া হিসারুত তায়িফ]

(১) অর্থাৎ তোমরা সংখ্যাধিক্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলে, কারণ তারা সংখ্যায় ছিল বার হাজার, মতান্তরে ষোল হাজার। [কুরতুবী] এটা নিঃসন্দেহে এক বিরাট বাহিনী। তাদের কেউ কেউ বলেও বসল যে, আমরা আজ সংখ্যায় স্বল্পতার কারণে পরাজিত হব না। কিন্তু পরাজিত তাদের হতেই হলো, সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে আসল না। প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল। তারপর তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলিমরা সংখ্যাধিক্যে কখনও জয়লাভ করে না। তারা জয়লাভ করে আল্লাহ্‌র সাহায্যে [কুরতুবী]। এরপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং তোমাদের উপর তাঁর 'সাকীনাহ' বা প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং ফেরেশ্তাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করেন যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফেরদেরকে শাস্তি দিলেন।

ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦﴾

প্রশান্তি নাযিল করেন[১] এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী নাযিল করলেন যা তোমরা দেখতে পাওনি[২]। আর তিনি কাফেরদেরকে শাস্তি দিলেন; আর এটাই কাফেরদের প্রতিফল।

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٧﴾

২৭. এরপরও যার প্রতি ইচ্ছে আল্লাহ্ তার তাওবাহ কবুল করবেন; আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৩]।

---

(১) এ বাক্যের অর্থ হলো, হুনাইনের যুদ্ধে প্রথম আক্রমণে যে সকল সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোবল ফিরে পাবার পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন, আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও মুমিনদের ব্যাপারে প্রশান্তি লাভ করলেন। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহর প্রশান্তি ছিল দু’প্রকার। এক প্রকার পলায়নরত সাহাবীদের জন্য, অন্য প্রকার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের। এ কথার ইঙ্গিত দানের জন্য على বা ‘উপর’ শব্দটি দু’বার ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছেঃ “অতঃপর আল্লাহ্ প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের উপর এবং মুমিনদের উপর”। সাহাবাদের প্রতি প্রশান্তি প্রেরণের অর্থ হলো, তারা ভয়-ভীতির পরে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর প্রশান্তি নাযিল হওয়ার অর্থ মুসলিমদের ব্যাপারে তার মনে প্রশান্তি নাযিল হওয়া এবং বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) তারা ছিল ফেরেশতা। তাদের কাজ ছিল মুমিনদের পদযুগলে দৃঢ়তা স্থাপন আর কাফেরদের মনে ভয়-ভীতি উদ্রেককরণ [সা’দী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এখানে বলা হয়েছে যে, তারা তাদেরকে দেখেনি। মূলতঃ এটা হলো সাধারণ লোকদের ব্যাপারে, তাই কেউ কেউ তাদেরকে মানুষের রুপে দেখেছেন বলে যে কতিপয় বর্ণনায় এসেছে, তা উপরোক্ত উক্তির বিরোধী নয়।

(৩) এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, যারা মুসলিমদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং কুফরী আদর্শের উপর অটল রয়েছে, তাদের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ্ ঈমানের তাওফীক দেবেন। বাস্তবেও পরাজিত হাওয়াযেন ও সক্বীফ গোত্রদ্বয়ের অনেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদান্যতা ও ভদ্র ব্যবহার দেখে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ফেরৎ পেয়েছিল। [সা’দী] আর আল্লাহ্ প্রশস্ত রহমতের অধিকারী। তাঁর রহমত সর্বব্যাপী। তাওবাহকারীদের বড় গোনাহও ক্ষমা করে দেন। আর তাদেরকে তাওবাহ করার তাওফীক দেন, তাদের অপরাধসমূহ মার্জনা করেন, সুতরাং বান্দা যত অন্যায়ই করুক না কেন তাঁর রহমত থেকে যেন সে নিরাশ না হয়। [সা’দী]

২৮. হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র[১]; কাজেই এ বছরের পর[২] তারা যেন মসজিদুল হারামের ধারে-কাছে না আসে[৩]। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর তবে আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন[৪]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, কাফেরগণ ব্যহ্যিক ও আত্মিক সর্ব দিক থেকেই অপবিত্র। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] তবে অধিকাংশ মুফাসসির বলেনঃ এখানে নাপাক বলতে তাদের দেহ সত্তা বুঝানো হয়নি, বরং দ্বীনী বিষয়াদিতে তাদের অপবিত্রতা বোঝানো হয়েছে। সে হিসেবে এর অর্থ, তাদের আকীদাহ-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র, আমল ও কাজ, তাদের জীবন - এসবই নাপাক। [ইবন কাসীর; সা'দী] আর এ সবের নাপাকির কারণেই হারাম শরীফের চৌহদ্দির মধ্যে তাদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

(২) এ বছর বলতে অধিকাংশ মুফাসসিরীনদের মতে ৯ম হিজরী বুঝানো হয়েছে। কাতাদা বলেন, এটা ছিল সে বছর যে বছর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের নিয়ে হজ করেছেন। তখন আলী এ বিষয়টির ঘোষণা লোকদের মধ্যে দিয়েছিলেন। তখন হিজরতের পর নবম বছর পার হচ্ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তী বছর হজ করেছিলেন। তিনি এর আগেও হজ করেন নি, পরেও করেন নি। [তাবারী]

(৩) এখানে "মাসজিদুল হারাম" বলতে সাধারণতঃ বুঝায় বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকের আঙ্গিনাকে যা দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে কুরআন ও সুন্নার কোন কোন স্থানে তা মক্কার পূর্ণ হারাম শরীফ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যা কয়েক বর্গমাইল এলাকব্যাপী। যার সীমানা চিহ্নিত করেছেন ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম। যেমন, মে'রাজের ঘটনায় মাসজিদুল হারামের উল্লেখ রয়েছে। ইমামগণের ঐক্যমতে এখানে "মাসজিদুল হারাম অর্থ বায়তুল্লাহর আঙ্গিনা নয়। কারণ, মে'রাজের শুরু হয় উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ঘর থেকে, যা বায়তুল্লাহর আঙ্গিনার বাইরে। অনুরূপ সূরা তাওবার শুরুতে ৭ নং আয়াতে যে মাসজিদুল হারামের উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থও পূর্ণ হারাম শরীফ। কারণ, এখানে উল্লেখিত সন্ধির স্থান হলো 'হুদায়বিয়া' যা হারাম শরীফের সীমানার বাইরে তার অতি সন্নিকটে অবস্থিত। [আল-বালাদুল হারাম: আহকাম ওয়া আদাব]

(৪) ইবনে আব্বাস বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে মাসজিদুল হারামে যাওয়া থেকে নিষেধ করলেন, তখন শয়তান মুমিনদের অন্তরে চিন্তার উদ্রেক ঘটাল যে, তারা কোথেকে খাবে? মুশরিকদেরকে তো বের করে দেয়া হয়েছে, তাদের বানিজ্য কাফেলা তো আর আসবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল

নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২৯. যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে(১) তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌তে ঈমান আনে না এবং শেষ দিনেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না, আর সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ কর(২), যে পর্যন্ত না

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

করলেন। যাতে তিনি তাদেরকে আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। আর এর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দিলেন। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে বলে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এসেছে তারা হলোঃ ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আলা আরবের মুশরিক সম্প্রদায়ের ওজর বন্ধ করার জন্য বলেনঃ "তোমরা হয়তো বলতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দু'সম্প্রদায়ের প্রতিই নাযিল হয়েছে, আর আমরা তো এর পঠন ও পাঠন থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম।[আল-আন'আমঃ১৫৬]
এ আয়াতে আহলে কিতাব তথা যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে। তাবুকে আহলে কিতাবদের সাথে মুসলিমদের যে যুদ্ধ অভিযান সংঘটিত হয়েছিল, আয়াত দু'টি তারই পটভূমি।[বাগভী; ইবন কাসীর] আহলে কিতাবের উল্লেখ করে এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের সাথে যে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে, তা শুধু আহলে কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফের সম্প্রদায়ের জন্যই। কারণ, যুদ্ধ করার যে সকল হেতু বর্ণিত হয়েছে, তা সকল কাফেরদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। [বগভী; কুরতুবী; সা'দী] তবে বিশেষভাবে আহলে কিতাবের উল্লেখ করা হয়, কারণ এদের কাছে রয়েছে তাওরাত ইঞ্জীলের জ্ঞান, যে তাওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনছে না।[ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে যুদ্ধের চারটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমতঃ তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না। দ্বিতীয়তঃ আখেরাতের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই। তৃতীয়তঃ আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে তারা হারাম মনে করে না। চতুর্থতঃ সত্য দ্বীন গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক। [কুরতুবী] ইয়াহূদী-নাসারাগণ যদিও প্রকাশ্যে আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে না, কিন্তু পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা মতে ইয়াহূদীগণ উযায়ের আর নাসারাগণ ঈসাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে প্রকারান্তরে শির্ক তথা অংশীবাদকেই সাব্যস্ত করছে। [বাগভী] অনুরূপভাবে আখেরাতের প্রতি যে ঈমান

তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিয্‌ইয়া(১)

রাখা দরকার তা আহলে কিতাবের অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাদের অনেকের ধারণা হল, কিয়ামতে মানুষ দেহ নিয়ে উঠবে না; বরং তা হবে মানুষের এক ধরনের রূহানী জিন্দেগী। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বিশেষ কোন স্থানের নাম নয়; বরং আত্মার শান্তি হল জান্নাত আর অশান্তি হল জাহান্নাম। তাদের এ বিশ্বাস কুরআনে পেশকৃত ধ্যান ধারণার বিপরীত। সুতরাং আখেরাতের প্রতি ঈমানও তাদের যথাযোগ্য নয়। তৃতীয় কারণ বলা হয়েছে যে, ইয়াহূদী-নাসারাগণ আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে না। এ কথার অর্থ হল তাওরাত ও ইঞ্জীলে যে সকল বস্তুকে হারাম করে দেয়া হয়েছে, তা তারা হারাম বলে গণ্য করে না। সেটা অনুসরণ করে না। [সা'দী] যেমন, সুদ ও কতিপয় খাদ্যদ্রব্য- যা তাওরাত ও ইঞ্জীলে হারাম ছিল, তারা সেগুলোকে হারাম মনে করত না। এ থেকে এ মাস'আলা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করা যে শুধু পাপ তা' নয়, বরং কুফরীও বটে। অনুরূপ কোন হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরী। চুতর্থত: তারা সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে না। যদিও তারা মনে করে থাকে যে, তারা একটি দ্বীনের উপর আছে। কিন্তু তাদের দ্বীন সঠিক নয়। আল্লাহ্ সেটা কখনো অনুমোদন করেননি। অথবা এমন শরী'আত যেটা আল্লাহ্ রহিত করেছেন। তারপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরী'আত দিয়ে সেটা পরিবর্তন করেছেন। সুতরাং রহিত করার পর সেটা পাকড়ে থাকা জায়েয নয়। [সা'দী]

(১) 'জিয্‌ইয়া'র শাব্দিক অর্থঃ বিনিময়ে প্রদত্ত পুরস্কার। [ফাতহুল কাদীর] শরী'আতের পরিভাষায় জিয্‌ইয়া বলা হয় কাফেরদেরকে হত্যা থেকে মুক্তি এবং তাদেরকে মুসলিমদের মাঝে নিরাপত্তার সাথে অবস্থান করার বিনিময়ে গৃহীত সম্পদকে। যা প্রতি বছরই গ্রহণ করা হবে। ধনী, দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত প্রত্যেকে তার অবস্থানুযায়ী সেটা প্রদান করবে। যেমনটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার পরবর্তী খলীফাগণ গ্রহণ করেছিলেন। [সা'দী]

সঠিক মত হচ্ছে যে, দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে জিয্‌ইয়ার যে হার ধার্য হবে তাতে শরী'আতের পক্ষ থেকে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ধার্যকৃত হারে জিয্‌ইয়া নেয়া হবে। যেমন, নাজরানের নাসারাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি হয় যে, তারা সকলের পক্ষ থেকে বার্ষিক দু'হাজার জোড়া বস্ত্র প্রদান করবে। [আস-সুনানুস সগীর লিল বাইহাকী] প্রতি জোড়ায় থাকবে একটা লুঙ্গি ও একটা চাদর। প্রতি জোড়ার মূল্যও ধার্য হয়। অর্থাৎ এক উকিয়া রুপার সমমূল্য। চল্লিশ দিরহামে হয় এক উকিয়া। যা আমাদের দেশের প্রায় সাড়ে এগার তোলা রুপার সমপরিমাণ। অনুরূপ তাগলিব গোত্রীয় নাসারাদের সাথে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর চুক্তি হয় যে, তারা যাকাতের নেসাবের দ্বিগুণ পরিমাণে জিয্‌ইয়া কর প্রদান করবে। [মুয়াত্তা,

দেয়[১]।

ইমাম মুহাম্মাদের বর্ণনায়] তাই মুসলিমগণ যদি কোন দেশ যুদ্ধ করে জয় করে নেয় এবং সে দেশের অধিবাসিগণকে তাদের সহায় সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের উপর বহাল রাখে এবং তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হিসাবে থাকতে চায়, তবে তাদের জিযিয়ার হার তা হবে যা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আপন শাসনকালে ধার্য করেছিলেন। তাহলো উচ্চবিত্তের জন্যে মাসিক চার দিরহাম, মধ্যবিত্তের জন্যে দু' দিরহাম এবং স্বাস্থ্যবান শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিম্নবিত্তের জন্য মাত্র এক দিরহাম। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস] বিকলাঙ্গ, মহিলা শিশু, বৃদ্ধ এবং সংসারত্যাগী ধর্মজাযক এই জিযিরা কর থেকে অব্যাহতি পায়। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস] কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ জিয্‌ইয়া আদায়ের বেলায় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাগিদ ছিল যে, কারো সাধ্যের বাইরে যেন কোনরূপ জোর জবরদস্তি করা না হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর যুলুম চালাবে, কিয়ামতের দিন আমি যালেমের বিরুদ্ধে ঐ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব' [আবুদাউদঃ ৩০৫২]।

উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে কতিপয় ইমাম এক মত পোষণ করেন যে, শরী'আত জিয্‌ইয়ার বিশেষ কোন হার নির্দিষ্ট করে দেয়নি, বরং তা ইসলামী শাসকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল। তিনি অমুসলিমদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যা সঙ্গত মনে হয়, ধার্য করবেন।

জিয্‌ইয়া প্রদানে স্বীকৃত হলে ওদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার যে আদেশ আয়াতে হয়েছে তা অধিকাংশ ইমামের মতে সকল অমুসলিমের বেলায় প্রযোজ্য। তারা আহলে কিতাব হোক বা অন্য কেউ। [কুরতুবী] আর এ জন্যই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাজুসীদের থেকেও জিযইয়া নিয়েছিলেন। [দেখুন, বুখারী: ৩১৫৬]

আলোচ্য আয়াতে يد শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ নির্ধারণ নিয়ে মতভেদ হয়েছে। স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে, নিজেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদান করা। কারও কারও মতে এর অর্থ, স্বহস্তে প্রদান করা। কারও কারও মতে, নগদ প্রদান করা, বাকী না করা। কারও কারও মতে, জোর করে নেয়া। কারও কারও মতে, এটা বুঝিয়ে নেয়া যে, তাদেরকে হত্যা না করে এ অর্থ নেয়ার দ্বারা তাদের উপর দয়া করা হচ্ছে। কার কারও মতে, ধিকৃত। [ফাতহুল কাদীর] তাই জিয্‌ইয়া যেন খয়রাতি চাঁদা প্রদানের মত না হয়, বরং তা হবে ইসলামের বিজয়কে মেনে নিয়ে একান্ত অনুগত নাগরিক হিসেবে।

(১) আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যতক্ষণ না তারা বিনীত হয়ে জিয্‌ইয়া প্রদান করে"। এ বাক্য দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহের একটি সীমা ঠিক করে দেয়া হয়। অর্থাৎ তাবেদার প্রজারূপে জিয্‌ইয়া কর প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। [সা'দী]

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ۨابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

পঞ্চম রুকূ‘

৩০. আর ইয়াহূদীরা বলে, ‘উযাইর আল্লাহ্‌র পুত্র’(১), এবং নাসারারা বলে, ‘মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র।’ এটা তাদের মুখের কথা। আগে যারা কুফরী করেছিল তারা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন। কোন্ দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে(২)!

(১) আয়াতের ভাষ্য হতে বুঝা যায় যে, ইয়াহূদীদের সবাই এ কথা বলেছিল। কারও কারও মতে, এটি ইয়াহূদীদের এক গোষ্ঠী বলেছিল। সমস্ত ইয়াহূদীদের আকীদা বিশ্বাস নয়। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, সাল্লাম ইবন মিশকাম, নু'মান ইবন আওফা, শাস ইবন কায়স ও মালেক ইবনুস সাইফ তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমরা কিভাবে আপনার অনুসরণ করতে পারি, অথচ আপনি আমাদের কেবলা ত্যাগ করেছেন, আপনি উযায়েরকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে মেনে নেন না? তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। [তাবারী; সীরাতে ইবন হিশাম ১/৫৭০] উযায়ের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ইয়াহূদীরা যখন তাওরাত হারিয়ে ফেলেছিল তখন উযায়ের সেটা তার মুখস্থ থেকে পুণরায় জানিয়ে দিয়েছিল। তাই তাদের মনে হলো যে, এটা আল্লাহ্‌র পুত্র হবে, না হয় কিভাবে এটা করতে পারল।[সা‘দী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] এটা নিঃসন্দেহে একটি মিথ্যা কথা যে, উযায়ের তাদেরকে মূল তাওরাত তার মুখস্থ শক্তি দিয়ে এনে দিয়েছিল। কারণ উযায়ের কোন নবী হিসেবেও আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়নি। এর মাধ্যমে ইয়াহূদীরা তাদের হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থের ধারাবাহিকতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা তাদের দাবী মাত্র। ঐতিহাসিকভাবে এমন কিছু প্রমাণিত হয়নি। [দেখুন, ড. সাউদ ইবন আবদুল আযীয, দিরাসাতুন ফিল আদইয়ান- আল-ইয়াহূদিয়্যাহ ওয়ান নাসরানিয়্যাহ]

(২) এ আয়াতটি হলো পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যা। পূর্বে আয়াতে মোটামুটিভাবে বলা হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখে না। এখানে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, ইহুদীরা উযাইরকে আর নাসারারা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে। [ইবন কাসীর] তাই তাদের ঈমান ও তাওহীদের দাবী নিরর্থক। এরপর বলা হয়ঃ “এটি তাদের মুখের কথা”। এর অর্থ তারা মুখে যে কুফরী উক্তি করে যাচ্ছে তার পেছনে না কোন দলীল আছে, না কোন যুক্তি। কত মারাত্মক সে উক্তি যা তারা করে যাচ্ছে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা বলেছেন, “এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য কী সাংঘাতিক! তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে” [সূরা আল-কাহাফ: ৫] অতঃপর বলা হয়ঃ

৩১. তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগিদের[1]কে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে[2] এবং

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ

"এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে, আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন। এরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে। [ইবন কাসীর] এর অর্থ হল ইয়াহূদী ও নাসারারা নবীগণকে আল্লাহর পুত্র বলে পূর্ববর্তী কাফের ও মুশরিকদের মতই হয়ে গেল, তারা ফেরেশতা ও লাত মানাত মূর্তিদ্বয়কে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছিল। [বাগভী]

(১) أحبار শব্দটি حبر এর বহুবচন। ইয়াহূদীদের আলেমকে حبر বলা হয়। পক্ষান্তরে رهبان শব্দটি راهب এর বহুবচন। নাসারাদের আলেমকে راهب বলা হয়। তারা বেশীরভাগই সংসার বিরাগী হয়ে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে বলা হয় যে, ইয়াহূদী-নাসারাগণ তাদের আলেম ও যাজক শ্রেণীকে আল্লাহর পরিবর্তে রব ও মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। অনুরূপ ঈসা আলাইহিস সালামকেও মা'বুদ মনে করে। তাকে আল্লাহর পুত্র মনে করায় তাকে মা'বুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ হল, তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মা'বুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দার প্রতি আল্লাহর রয়েছে, তাকে তারা যাজক শ্রেণীর জন্যে উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ তারা যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে চলে; যতই তা আল্লাহ্র নির্দেশের বিরোধী হোক না কেন? বলাবাহুল্য পাদ্রী ও পুরোহিতগণের আল্লাহ বিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা তাদেরকে মা'বুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর, আর এটি হল প্রকাশ্য কুফরী ও শির্ক। আদী ইবন হাতেম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি গলায় একটি সোনার ক্রুশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেনঃ হে আদী, তোমার গলা থেকে এ মূর্তিটি সরিয়ে ফেল এবং তাকে সূরা আত্-তাওবাহ্র এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে শুনলাম- "তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে।" আমি বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমরা তো তাদের ইবাদাত করি না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তারা তোমাদের জন্য কোন কিছু হালাল করলে তোমরা সেটাকে হালাল মনে কর আর কোন কিছুকে হারাম করলে তোমরা সেটাকে হারাম হিসাবে গ্রহণ কর। [তিরমিযীঃ ৩০৯৫]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শরী'আতের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে ওলামায়ে কেরামের নির্দেশনার অনুসরণ বা ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতের অনুসরণর ততক্ষণই করতে পারবে যতক্ষণ না এর বিপরীতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে কোন কিছু প্রমাণিত হবে। যখনই কোন কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মতের বিপক্ষে হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে তখনি তা ত্যাগ করা ওয়াজিব। অন্যথায় ইয়াহূদী নাসারাদের মত হয়ে যাবে। কারণ ইয়াহূদী-নাসারাগণ আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসূলের আদেশ-

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

মার্‌ইয়াম-পুত্র মসীহ্‌কেও। অথচ এক ইলাহের ‘ইবাদাত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ্‌ নেই। তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি কত না পবিত্র(১)!

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁর নূর পরিপূর্ণ করা ছাড়া আর কিছু করতে অস্বীকার করছেন। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে(২)।

নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বার্থপর আলেম এবং অজ্ঞ পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। আয়াতে তারই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ অথচ তাদেরকে তো শুধু এ নির্দেশই দেয়া হচ্ছিল যে, তারা এক ইলাহেরই ইবাদত করবে, যিনি কোন কিছু হারাম করলেই কেবল তা হারাম হবে, আর যিনি হালাল করলেই তা হালাল হবে। অনুরূপভাবে যিনি শরী‘আত প্রবর্তন করলে সেটাই মানা হবে, তিনি হুকুম দিলে সেটা বাস্তবায়িত হবে। তিনি ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ নেই। তারা যা তাঁর সাথে শরীক করছে তা থেকে তিনি কতই না পবিত্র! তাঁর কোন শরীক নেই, সমকক্ষ নেই, সাহায্যকারী নেই, বিপরীতে কেউ নেই, সন্তান-সন্ততি নেই, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি ছাড়া কোন রব নেই। [ইবন কাসীর] কিন্তু তারা সে নির্দেশের বিপরীত কাজ করেছে। তাঁর সাথে শরীক করেছে। মহান আল্লাহ্‌ তাদের সে সমস্ত অপবাদ ও শরীক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর পূর্ণতার বিপরীত তাঁর জন্য যে সমস্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ গুণ সাব্যস্ত করে তা গ্রহণযোগ্য নয়। [সা‘দী]

(২) এ আয়াতে বলা হয় যে, তারা গোমরাহী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং আল্লাহর সত্য দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। তারা দ্বীনের এ আলো, হিদায়াতের এ জ্যোতি, তাওহীদের এ আহ্বানকে শুধুমাত্র তাদের কথা, ঝগড়া ও মিথ্যাচার দিয়ে মিটিয়ে দিতে চায়। আয়াতে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এরা মুখের ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ এটি তাদের জন্যে অসম্ভব, যেভাবে সূর্যের আলো বা চাঁদের আলোকে কেউ ফুৎকারে মিটিয়ে দিতে পারে না। বরং আল্লাহর অমোঘ ফয়সালা যে, তিনি নিজের নূর তথা দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, তা কাফের ও মুশরিকদের যতই মর্মপীড়ার কারণ হোক না কেন? [ইবন কাসীর]

৩৩. তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ[১] পাঠিয়েছেন, যেন তিনি আর সব দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে[২]।

هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে হিদায়াত বলে সত্য সংবাদসমূহ, সহীহ ঈমান, উপকারী ইলম বোঝানো হয়েছে। আর দ্বীনে হক বলে দুনিয়া ও আখেরাতে কাজে আসবে এ রকম যাবতীয় বিশুদ্ধ আমল বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতের সারকথা এটাই যে, আল্লাহ আপন রাসূলকে হেদায়েতের উপকরণ কুরআন এবং সত্য দ্বীন ইসলাম সহকারে এজন্যে প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর দ্বীনের উপর ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। এ মর্মে আরও কতিপয় আয়াত কুরআনে রয়েছে। যাতে সকল দ্বীনের উপর ইসলামের বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার জন্য যমীনকে একত্রিত করে (সঙ্কোচন করে) এনে দেখিয়েছেন। তাতে আমি যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম দেখতে পেয়েছি। আর নিশ্চয় আমার উম্মত ততটুকু করায়ত্ব করবে যতটুকু আমাকে জমা করে দেখানো হয়েছে। আর আমাকে লাল ও সাদা (স্বর্ণ ও রৌপ্য)দুটি খনি প্রদান করা হয়েছে। (সোনা ও রুপার মালিক রোম সম্রাট সিজার ও পারস্য সম্রাট খসরুর সম্পদ)। আর আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছি তিনি যেন আমার উম্মতকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে শেষ না করে দেন এবং তাদের উপর তাদের নিজেদের ব্যতীত তাদের শত্রুকে চাপিয়ে না দেন, যাতে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে বা তাদের সম্মান নষ্ট হবে। আমার রব আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আমি যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয় না। আমি আপনার উম্মতের জন্য আপনাকে এটা প্রদান করলাম যে, তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে ধ্বংস করব না। আর তাদের উপর তাদের নিজেদের ছাড়া শত্রুদেরকে এমনভাবে চাপিয়ে দেব না, যাতে তাদের ধ্বংস হয়। যদিও তাদের বিরুদ্ধে সবস্থানের লোক একত্রিত হয় তবুও নয়। তবে তাদের একে অপরকে ধ্বংস করবে, একে অপরকে বন্দী করে রাখবে। [মুসলিম: ২৮৮৯] অপর হাদীসে এসেছে, আদী ইবন হাতেম বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, হে আদী! ইসলাম গ্রহণ কর, তুমি নিরাপদ হবে। আমি বললাম, আমি একটি দ্বীনের উপর আছি। তিনি বললেন, আমি তোমার দ্বীন সম্পর্কে তোমার থেকে বেশী জানি। আমি বললাম, আপনি আমার দ্বীন সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশী জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি কি (নাসারাদের) রাকূসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নও? আর তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের মিরবা' বা এক চতুর্থাংশ খাও না? (জাহেলী যুগে সমাজের নেতারা অন্যদের আয়ের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করত) আমি বললাম, অবশ্যই হ্যাঁ।

৩৪. হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত এবং সংসার- | يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ

তিনি বললেন, এটা তো তোমার দ্বীনে (নাসারাদের দ্বীনে) বৈধ নয়। আদী বলেন, এটা বলার সাথে সাথে আমি বিনীত হয়ে গেলাম। তারপর তিনি বললেন, আমি জানি কোন জিনিস তোমাকে ইসলাম গ্রহণে বাঁধা দিচ্ছে। তুমি বলবে, এ দ্বীন তো দুর্বল লোকেরা গ্রহণ করেছে, যাদের কোন শক্তি-সামর্থ নেই; যাদেরকে আরবরা নিক্ষেপ করেছে। তুমি কি 'হীরা' চেন? আমি বললাম, দেখিনি তবে শুনেছি। তিনি বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! আল্লাহ্ এ দ্বীনকে এমনভাবে পূর্ণ করবেন যে, হীরা থেকে কোন মহিলা সওয়ারী বের হয়ে অবশেষে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে, তার সাথী কেউ থাকবে না। আর খসরু ইবন হুরমুয এর সম্পদরাশি তোমাদের হস্তগত হবে। আমি বললাম, খসরু ইবন হুরমুয? তিনি বললেন, হ্যাঁ, খসরু ইবন হুরমুয। অচিরেই সম্পদ এমন বেশী হবে যে, অধিক পরিমানে ব্যয় হবে কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না। আদী ইবন হাতেম বলেন, এই যে, মহিলা সওয়ারী বের হচ্ছে, সে কারও সাহচর্য ছাড়াই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছে। আর আমি নিজেই খসরু ইবন হুরমুযের সম্পদরাশি হস্তগত হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলাম। যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, তৃতীয়টিও সংঘটিত হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটি বলেছেন। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৭৭]

কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ অন্যান্য দ্বীনের উপর দ্বীনে ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদগুলো অধিকাংশ অবস্থা ও কালানুপাতিক। যেমন: মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এমন কোন কাঁচা ও পাকা ঘর দুনিয়ার বুকে থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। সম্মানিতদের সম্মানের সাথে এবং লাঞ্ছিতদের লাঞ্ছনার সাথে, আল্লাহ যাদের সম্মানিত করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে এবং যাদের লাঞ্ছিত করবেন তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে কিন্তু কালেমায়ে ইসলামীর অনুগত হবে'। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৪] আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হয়। যার ফলে গোটা দুনিয়ার উপর প্রায় এক হাজার বছর যাবত ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তৃত থাকে। কিন্তু সে পরিস্থিতি সবসময় এক থাকবে না। আবার মানুষের মধ্যে কুফরীর সয়লাব হবে। হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত লাত ও উযযা উপাসনা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাত-দিন শেষ হবে না। (কিয়ামত হবে না) আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যখন আল্লাহ্ "তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি আর সব দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে" [সূরা তাওবাহ: ৩৩; সূরা আস-সাফ: ৯] এ আয়াত নাযিল করেছিলেন, তখন আমি মনে করেছিলাম যে, এটা পরিপূর্ণ হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয় এটা হবে, এবং যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন ততদিন থাকবে। তারপর আল্লাহ্

وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই তো জনসাধারণের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায় এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে[১]। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না[২] আপনি তাদেরকে

এক পবিত্র বায়ূ প্রেরণ করবেন, যা এমন প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে, যার মধ্যে সরিষা পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট থাকবে। এরপর যারা জীবিত থাকবে তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ থাকবে না, তারা তখন কুফরীতে ফিরে যাবে।’ [মুসলিমঃ ২৯০৭]

(১) এ আয়াতে মুসলিমদের সম্বোধন করে ইয়াহূদী নাসারা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ও পাদ্রীদের কুকীর্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা লোকসমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইয়াহূদী-নাসারাদের আলোচনায় মুসলিমদের হয়তো এ উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও যেন ওদের মত না হয়। আয়াতে ইয়াহূদী-নাসারা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ও পাদ্রীদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাদের অধিকাংশই গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহর সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত রাখছে। এ বাতিল পন্থা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তারা গীর্জা ও ধর্মের নামে মানুষদের থেকে কর আদায় করত। এতে তারা মানুষদেরকে বোঝাত যে, এগুলো আল্লাহ্‌র নৈকট্যের জন্যই গ্রহণ করছে। অথচ তারা এ সম্পদগুলো কুক্ষিগত করত। [কুরতুবী] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারা বিচারকার্য ঘুষের উপর করত। [কুরতুবী] এভাবে তারা পয়সা নিয়ে তওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তওরাতের বিধি নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা বাহানা সৃষ্টি করে নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট হতোনা বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়াতো। [সা’দী] কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকী থাকে না। তাছাড়া তাদের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ মিথ্যাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নেয়। অথবা আল্লাহ্‌র দ্বীন বলে এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] অর্থাৎ তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হয়েছেই। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান না এনে অর্থলোভে পড়ে আছে। অন্যদেরকেও তেমনি ইসলামে প্রবেশ করা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ থেকে বাঁধা দিচ্ছে। [কুরতুবী]

(২) ইয়াহূদী নাসারা গোষ্ঠীর আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয় অর্থের লোভ লালসা থেকে। এজন্যে আয়াতে অর্থলিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজার কথা বর্ণিত হয়। এরশাদ হয়েছেঃ “যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে,

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন[১]।

৩৫. যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে এবং সে সব দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে, বলা হবে, 'এগুলোই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। কাজেই তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তার স্বাদ ভোগ কর[২]।'

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

তা খরচ করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন"। এখানে 'আর তা খরচ করে না আল্লাহর পথে' বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধানমতে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থ সম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে মালামালের যাকাত দেয়া হয়, তা জমা রাখা সঞ্চিত ধন-রত্নের শামিল নয়।' [আবুদাউদ: ১৫৬৪]। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গোনাহ নয়।

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন, তারপর সে যে সম্পদের যাকাত দিবে না, কিয়ামতের দিন তার সম্পদ তার জন্য চক্ষুর পাশে দু'টি কালো দাগবিশিষ্ট বিষাক্ত সাপে পরিণত হবে, তারপর সেটি তার চোয়ালের দু'পাশে আক্রমন করবে এবং বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত ধন। [বুখারী: ১৪০৩] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি তাঁর উটের যাকাত দিবে না সে যেভাবে দুনিয়াতে ছিল তার থেকে উত্তমভাবে এসে তাকে পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ছাগলের যাকাত দিবে না সে যেভাবে দুনিয়াতে ছিল তার থেকেও উত্তমভাবে এসে তাকে তার খুর ও শিং দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকবে... আর তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন তাঁর কাধে ছাগল নিয়ে উপস্থিত না হয়, যে ছাগল চিৎকার করতে থাকবে, তখন সে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আর আমি বলব, আমি তোমার জন্য কোন কিছুরই মালিক নই, আমি তো তোমার কাছে বাণী পৌঁছিয়েছি। আর তোমাদের কেউ যেন তাঁর কাধে কোন উট নিয়ে উপস্থিত না হয়, যা শব্দ করছে। তখন সে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আমি বলব, আমি তোমার জন্য কোন কিছুর মালিক নই, আমি তো তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি। [বুখারী: ১৪০২; মুসলিম: ৯৮৮]

(২) এ আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয়

৩৬. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির দিন থেকেই[১] আল্লাহর বিধানে[২] আল্লাহ্‌র কাছে গণনায় মাস বারটি[৩], তার মধ্যে চারটি

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ

যে, তার এ সাজা তারই অর্জন করা। অর্থাৎ যে অর্থ সম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার যাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য আযাবের কারণ হয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে তাদেরকে সেই জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথরের ছেঁকার সুসংবাদ দিন, যা জাহান্নামের আগুনের দ্বারা দেয়া হবে। যা তাদের কারও স্তনের বোঁটার মধ্যে রাখা হবে, আর তা বের হবে দু কাঁধের উপরিভাগে। আর দু কাঁধের উপরিভাগে রাখা হবে যা স্তনের বোঁটার মধ্য দিয়ে বের হবে।' [মুসলিম: ৯৯২] অন্য হাদীসে এসেছে, যে কোন সোনার মালিক বা রুপার মালিক যাকাত প্রদান করবে না, কিয়ামতের দিন সেগুলো তার জন্য আগুনের পাত হিসেবে বানিয়ে নেয়া হবে, তারপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দিয়ে তার কপাল, পাঁজর ও পিঠে ছেঁকা দেয়া হবে। যখনই সেগুলো ঠাণ্ডা হবে, আবার তা উত্তপ্ত করা হবে, এমন দিনে যার পরিমান হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। যতক্ষণ না বান্দাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করা শেষ হবে। তারপর তার স্থান জান্নাত কিংবা জাহান্নামে সেটা দেখানো হবে। [মুসলিম: ৯৮৭]

কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, যে কৃপন ব্যক্তি আল্লাহর রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায়; কিংবা যাকাত তলব করে, তখন সে প্রথমে ভ্রুকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্যে বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আযাব দানের উল্লেখ করা হয়েছে। [কুরতুবী]

(১) এর দ্বারা এদিকে ঈঙ্গিত করা হয় যে, মাসগুলোর ধারাবহিকতা নির্ধারিত হয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টি পরবর্তী মুহুর্তে। [সা'দী]

(২) এখানে ﴿فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ বলে স্পষ্ট করা হয় যে, বিষয়টি সৃষ্টির প্রথম দিনেই তাকদীরে সুনির্দিষ্ট করা আছে। [সা'দী] আর সে অনুসারে লওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গণনায় মাস হল বারটি।' এখানে উল্লেখিত عدة অর্থ গণনা। شهور হল شهر এর বহুবচন। আয়াতের সারমর্ম হল, আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যাটি বারটি নির্ধারিত, এতে কম বেশি করার কারো সুযোগ নেই। জাহেলিয়াতের লোকেরা বদলালেও তোমরা সেটা বদলাতে পার না। তোমাদের কাজ হবে আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ মোতাবেক সেটাকে ঠিক করে নেয়া। [কুরতুবী]

الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾

নিষিদ্ধ মাস[১], এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন[২]। কাজেই এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

(১) বিদায় হজ্জের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খোতবায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন: 'তিনটি মাস হল ধারাবাহিক- যিলকদ, যিলহজ ও মহররম, অপরটি হল রজব। [বুখারী: ৩১৯৭; মুসলিম: ১৬৭৯] আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় সময় আবার ঘুরে তার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ফিরে এসেছে। যে পদ্ধতিতে আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিনের মত। মাসের সংখ্যা বারটি। তন্মধ্যে চারটি হচ্ছে, হারাম মাস। তিনটি পরপর যিলকদ, যিলহজ, ও মুহাররাম। আর হচ্ছে মুদার গোত্রের রজব মাস, যা জুমাদাস সানী ও শা'বান মাসের মাঝখানে থাকে।' [বুখারী: ৪৬৬২; মুসলিম: ১৬৭৯]

(২) অর্থাৎ মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ ও সম্মানিত মাসুগলোর সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহকামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের ইলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল রাখাই হল সঠিক দ্বীন। এতে কোন মানুষের কম-বেশী কিংবা পরিবর্তন - পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের আলামত। এর দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলোর যে নাম ইসলামী শরী'আতে প্রচলিত, তা মানবরচিত পরিভাষা নয়, বরং রাব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই মাসের তারতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম আহকাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে শরী'আতের আহকামের ক্ষেত্রে চন্দ্রমাসই নির্ভরযোগ্য। চন্দ্রমাসের হিসেব মতেই রোযা, হজ ও যাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। [কুরতুবী] তবে কুরআন মজীদ চন্দ্রের মত সূর্যকেও সন-তারিখ ঠিক করার মানদন্ডরূপে অভিহিত করেছেন। [সূরা আল-আন'আম: ৯৬; সূরা আর-রাহমান: ৫; সূরা ইউনুস:৫] অতএব চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েজ। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহর অধিকতর পছন্দ। তাই শরী'আতের আহকামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্যে চন্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরযে-কেফায়া, সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গোনাহগার হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার করা জায়েয আছে।

إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া তো শুধু কুফরীতে বৃদ্ধি সাধন করা, যা দিয়ে কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা এটাকে কোন বছর বৈধ করে এবং কোন বছর অবৈধ করে যাতে তারা, আল্লাহ্‌ যেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে, ফলে আল্লাহ্‌ যা হারাম করেছেন তা হালাল করে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে; আর আল্লাহ্‌ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।

ষষ্ঠ রুকূ‘

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا مِنَ الْءَاخِرَةِ فَمَا مَتَٰعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا فِى الْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

৩৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনে ঝুঁকে পড়? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ তো নগণ্য[১]।

---

(১) অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, দ্বীনের ব্যাপারে সকল আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গোনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়া প্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। সেজন্য আয়াতে বলা হয়ঃ “হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে?” হাদীসে এসেছে, “বৃদ্ধ মানুষের মনও দু’টি ব্যাপারে যুবক থেকে যায়, একটি হচ্ছে দুনিয়াপ্রীতি অপরটি বেশী বেশী আশা-আকাঙ্খা” [বুখারী: ৬৪২০] রোগ নির্ণয়ের পর তার প্রতিকার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পার্থিব জিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগণ্য। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হচ্ছে, যেমন তোমাদের কেউ তার আঙ্গুলকে সমুদ্রের

৩৯. যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের পরিবর্তে আনয়ন করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান[১]।

إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৪০. যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তো তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাঁকে বহিস্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ

মধ্যে ডুবায়, সুতরাং সে দেখুক, সে আঙ্গুল কি নিয়ে আসে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।' [মুসলিম: ২৮৫৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার কোন এক উঁচু স্থান দিয়ে বাজারে প্রবেশ করলেন। বাজার লোকে লোকারণ্য। তিনি একটি কানকাটা মরা ছাগলের পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি সেটির কানের বাকী অংশে ধরলেন। তারপর বললেন, কে এটিকে এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে রাজী আছ? লোকরা বলল, আমরা কেউ এটিকে কোন কিছুর বিনিময়ে গ্রহণ করব না। আর আমরা এটাকে নিয়ে কি করব? তিনি বললেন, তোমরা কি চাও যে এটা তোমাদের হোক? তারা বলল, যদি জীবিতও থাকত তারপরও সেটা দোষযুক্ত ছিল; কেননা তার কান নেই। তদুপরি সেটা মৃত। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি দুনিয়া আল্লাহ্‌র কাছে এর চেয়েও বেশী মূল্যহীন।' [মুসলিম: ২৯৫৭] সারকথা হল, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা- ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুতঃ আখেরাতের চিন্তাই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

(১) এ আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকার উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরা জিহাদে বের না হলে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দ্বীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। কাতাদা বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে শামের দিকে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বের হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি জানেন এ যুদ্ধে কত কষ্ট রয়েছে। তারপরও তিনি এ যুদ্ধে বের না হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করেছেন। [তাবারী]

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; তিনি তখন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, ‘বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্‌ তো আমাদের সাথে আছেন ।’ অতঃপর আল্লাহ্‌ তার উপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের কথা হেয় করেন । আর আল্লাহ্‌র কথাই সমুন্নত এবং আল্লাহ্‌ পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[১] ।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ

৪১. অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় হোক বা ভারি অবস্থায় এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের সম্পদ

(১) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহর রাসূল কোন মানুষের সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন । আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে সাহায্য করতে সক্ষম । যেমন হিজরতের সময় করা হয়, যখন তার আপন গোত্র ও দেশবাসী তাকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে । সফরসঙ্গী হিসেবে একমাত্র সিদ্দীকে আকবর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ছাড়া আর কেউ ছিলনা । পদব্রজী ও অশ্বারোহী শত্রুরা সর্বত্র তাঁর খোজ করে ফিরছে । অথচ আশ্রয়স্থল কোন মজবুত দুর্গ ছিল না । বরং তা এক গিরী গুহা, যার দ্বারপ্রান্তে পর্যন্ত পৌঁছেছিল তার শত্রুরা । তখন গুহা সঙ্গী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর চিন্তা নিজের জন্য ছিল না, বরং তিনি এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে, হয়তো শত্রুরা তার বন্ধুর জীবন নাশ করে দেবে, কিন্তু সে সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পাহাড়ের মত অনড়, অটল ও নিশ্চিত । শুধু যে নিজের তা নয়, বরং সফর সঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলছিলেন, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন । (অর্থাৎ তাঁর সাহায্য আমাদের সাথে রয়েছে ।) আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি গিরী গুহায় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম । তখন আমি কাফেরদের পদশব্দ শুনতে পেলাম । আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাদের কেউ যদি পা উঁচিয়ে দেখে তবে আমাদের দেখতে পাবে । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে দুজনের সাথে আল্লাহ্‌ তৃতীয়জন তাদের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? [বুখারীঃ ১৭৭] [তাছাড়া পুরো ঘটনাটির জন্য দেখুন, সীরাতে ইবন হিশাম]

كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

ও জীবন দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে(১)!

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. যদি সহজে সম্পদ লাভের আশা থাকত ও সফর সহজ হত তবে তারা অবশ্যই আপনার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের কাছে যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর অচিরেই তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, 'পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে বের হতাম।' তারা তাদের নিজেদেরকেই ধ্বংস করে। আর আল্লাহ্ জানেন নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী(২)।

সপ্তম রুকূ'

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ

৪৩. আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করেছেন। কারা সত্যবাদী তা আপনার কাছে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা

(১) এ আয়াতে তাগিদদানের উদ্দেশ্যে পুনরোল্লেখ করা হয়েছে যে, জিহাদে বের হবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তোমাদের আদেশ করেন, তখন সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্য ফরয হয়ে গেল। আর এ আদেশ পালনের জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করা তোমাদের জন্য বসে থাকা থেকে উত্তম। কেননা এ জিহাদেই রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর এর মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র কাছে উঁচু মর্যাদা পেতে পারে। আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সাহায্য করতে পারে। এভাবেই একজন আল্লাহ্‌র সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। [সা'দী] তাদের এ কল্যাণ দুনিয়া ও আখেরাত ব্যাপী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে বের হবে, সে যদি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র বাণীতে ঈমানের কারণেই বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জিম্মাদারী নিলেন অথবা সে যে গনীমতের মাল গ্রহণ করেছে তা সহ তাকে তার পরিবারের কাছে ফেরৎ পাঠাবেন।' [বুখারী: ৭৪৫৭]

(২) এ আয়াতে অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন লোকদের একটি ওযরকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে যে, এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আল্লাহ্ যে শক্তি সামর্থ্য তাদের দান করেছেন, তা আল্লাহ্‌র রাহে সাধ্যমত ব্যয় করেনি। তাই তাদের অসমর্থ থাকার ওযর গ্রহণযোগ্য নয়।

الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾

মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত আপনি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন?

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে যেতে আপনার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে না। আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।

اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. আপনার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে শুধু তারাই যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না। আর তাদের অন্তরসমূহ সংশয়গ্রস্ত হয়ে গেছে, সুতরাং তারা আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর যদি তারা বের হতে চাইত তবে অবশ্যই তারা সে জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্ অপছন্দ করলেন। কাজেই তিনি তাদেরকে অলসতার মাধ্যমে বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হল, 'যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক।'

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاۡاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তবে তোমাদের ফাসাদই বৃদ্ধি করত এবং ফিত্‌না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটোছুটি করত। আর তোমাদের মধ্যে তাদের জন্য কথা শুনার লোক রয়েছে[১]। আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।

(১) অর্থাৎ "তোমাদের কথা শুনে সেগুলো অন্যের কাছে পাচার করে থাকে"। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

৪৮. অবশ্য তারা আগেও[১] ফিত্না সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তারা আপনার বহু কাজে ওলট-পালট করেছিল, অবশেষে সত্যের আগমন ঘটল এবং আল্লাহ্র হুকুম বিজয়ী হল[২], অথচ তারা ছিল অপছন্দকারী।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, 'আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিত্নায় ফেলবেন না।' সাবধান! তারাই ফিত্নাতে পড়ে আছে[৩]। আর জাহান্নাম তো

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِينَ ﴿٤٩﴾

(১) অর্থাৎ তারা চিন্তাশক্তি ও মতামতকে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে খাটিয়েছিল। তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছে আপনার দ্বীনকে অপমানিত করতে। যেমন প্রথম যখন আপনি মদীনায় আগমন করেছিলেন তখন আপনার বিরুদ্ধে ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তারপর যখন বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা জয়লাভ করল তখন আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ও তার সাথীরা বলল, এ কাজ তো দেখি পথে উঠে এসেছে। তারপর তারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর যখনই কোথাও মুসলিমদের বিজয় দেখে তখনই তা তাদেরকে পীড়া দেয়। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ "আল্লাহর আদেশ বিজয় হল", যাতে মুনাফিকরা মর্মপীড়া বোধ করছিল। এর দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, জয় বিজয় সবই আল্লাহর আয়ত্তে। যেমন ইতিপূর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, তেমনি এ যুদ্ধেও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে পড়বে।

(৩) এ আয়াতে জদ বিন কায়স নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহীর বর্ণনা দেয়া হয়। সে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে ওযর পেশ করে বলেছিল আমি এক পৌরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের সাথে যুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাদের সুন্দরী যুবতীদের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। [সা'দী] আল্লাহ্ তা'আলা তার কথার উত্তরে বলেনঃ "ভাল করে শোন", এই নির্বোধ এক সম্ভাব্য আশংকার বাহানা করে এক নিশ্চিত আশংকা অর্থাৎ রাসূলের অবাধ্যতা ও জিহাদ পরিত্যাগের অপরাধে এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল। সে যদি মহিলাদের মোহে পড়ার ফিতনা থেকে বাঁচতে এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত থাকে তবে জেনে নিক যে, সে আরও বড় ফিতনায় পড়েছে। আর সেটা হচ্ছে, দুনিয়াতে শির্ক ও কুফর, আর আখেরাতে তার শাস্তি। [ইবনুল কাইয়্যেমঃ ইগাসাতুল লাহফান ২/১৫৮-১৫৯]

কাফেরদের বেষ্টন করেই আছে[১]।

৫০. আপনার মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয়, আর আপনার বিপদ ঘটলে তারা বলে, 'আমরা তো আগেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম' এবং তারা উৎফুল্ল চিত্তে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. বলুন, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা লিখেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু ঘটবে না; তিনি আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্র উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত[২]।'

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

(১) "আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে।" তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। [ইবন কাসীর; সা'দী] পরিবেষ্টন করার অর্থ, যারাই আল্লাহ্র সাথে কুফরী করবে, তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে, জাহান্নামে তাদের ঘিরে রাখবে, কিয়ামতের দিন তাদের সবাইকে একত্রিত করবে। [তাবারী]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদেরকে মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আসল সত্যকে সদা সামনে রাখার নির্দেশ দিয়ে বলছেনঃ "বলুনঃ আমাদের বিপদতো অতটুকুই হবে যতটুকু আল্লাহ্ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন"। অর্থাৎ আমরা যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হই, তা আগেই আল্লাহ আমাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রতিটি বস্তুরই হাকীকত রয়েছে। কোন বান্দাই প্রকৃত ঈমানের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না এটা দৃঢ়ভাবে জানবে যে, তার যা ঘটেছে তা কখনো তাকে ছেড়ে যেতো না। আর যা তাকে ছেড়ে গেছে তা কখনো তার জন্য ঘটতো না।" [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৪৪১-৪৪২] তাই মুসলিমদের আবশ্যক আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা রাখা এবং পার্থিব উপায় উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা। আর মনে করা যে, এগুলোর উপর ভাল মন্দ নির্ভরশীল নয়। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্র হাতে। আমার উপর দায়িত্ব হবে সঠিক কাজটি করে যাওয়া এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। তাঁরই কাছে সার্বিক সহযোগিতা কামনা। হাদীসে এসেছে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে বৎস! নিশ্চয় আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব, তুমি আল্লাহকে হিফাযত কর, তিনিও তোমার

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. বলুন, 'তোমরা আমাদের দুটি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করছ এবং আমরা প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন সরাসরি নিজ পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দ্বারা। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি[১]।'

হিফাযত করবেন, তুমি আল্লাহ্‌র হিফাযত কর, তুমি তাকে তোমার দিকে পাবে। যখন তুমি কোন কিছু চাইবে তখন তা চাইবে কেবল আল্লাহ্‌র কাছে। আর যখন সাহায্য চাইবে তখন কেবল আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইবে। আর জেনে রাখ, যদি উম্মতের সবাই তোমার কোন উপকার করতে একত্রিত হয়, তারা তোমার কোন উপকার করতে সমর্থ হবে না, তবে শুধু ঐটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ্ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি সবাই তোমার কোন ক্ষতি করতে ইচ্ছা করে, তবে শুধু ঐটুকু করতে পারবে যা আল্লাহ্ তোমার উপর লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আর গ্রন্থটি শুকিয়ে গেছে।' [তিরমিযী: ২৫১৬]

(১) এ আয়াতে মুমিনদের এক বিরল অবস্থার উল্লেখ করে তাদের বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফেরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল, তাকে আমরা বিপদই মনে করিনা বরং তা আমাদের জন্য শান্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, মুমিন আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী সওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, আর এটিই সকল সফলতার মূলকথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও কৃতকার্য। আল্লাহ্ বলেন, বলুন, 'তোমরা কি আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ'?। ইবন আব্বাস বলেন, সে দু'টি বিষয় হচ্ছে, বিজয় তথা গনীমত অথবা শাহাদাত। আমরা নিহত হলেও শাহাদাতে ধন্য হব, সেটা তো জীবন ও জীবিকার নাম। অথবা আল্লাহ্ আমাদের হাতে তোমাদেরকে অপমানিত করবেন। [তাবারী; কুরতুবী] অপরদিকে কাফেরদের অবস্থা হল তার বিপরীত। আযাব থেকে কোন অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলিমগনের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনিয়ায় কোন প্রকারে নিস্কৃতি পেয়েও যায়, তবে আখেরাতের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই; তা অবশ্যই ভোগ করবে। আর দুনিয়ার আযাব, হয়ত সে আযাব হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ধ্বংসকারী আযাব নাযিল হওয়ার মাধ্যমে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণকে পেয়ে বসেছিল। অথবা তিনি তোমাদের হত্যা করার অনুমোদন দিবেন। সুতরাং তোমরা শয়তানের ওয়াদার অপেক্ষায় থাকো, আমরাও আল্লাহ্‌র ওয়াদার অপেক্ষায় থাকলাম। [কুরতুবী]

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۭ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝٥٣

৫৩. বলুন, 'তোমরা ইচ্ছাকৃত ব্যয় কর অথবা অনিচ্ছাকৃত, তোমাদের কাছ থেকে তা কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না; নিশ্চয় তোমরা হচ্ছ ফাসিক সম্প্রদায়।'

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۝٥٤

৫৪. আর তাদের অর্থসাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এজন্যেই যে, তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে[১] এবং সালাতে উপস্থিত হয় কেবল শৈথিল্যের সাথে, আর অর্থসাহায্য করে কেবল অনিচ্ছাকৃতভাবে[২]।

---

(১) কারণ, ঈমান থাকা আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। কাফের যত আমলই করুক না কেন ঈমান না থাকার কারণে সেটা আখেরাতে তার কোন কাজে আসবে না। কাফের যদি কোন ভাল কাজ করে, যেমন আত্মীয়দের দান করে, অসহায়কে সহায়তা দেয়, কাউকে বিপদ থেকে উত্তরণে সহায়তা করে, সে এ সমস্ত ভাল কাজের দ্বারা আখেরাতে উপকৃত হতে পারবে না। তবে দুনিয়াতেই তাকে সেটার কারণে পর্যাপ্ত রিযক দেয়া হবে। হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইবন জুদ'আন, সে তো জাহেলিয়াতের যুগে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করত, মিসকীনদের খাওয়াত, এগুলো কি তার কোন উপকার দিবে? তিনি বললেনঃ না, তার কোন উপকার দিবে না। কেননা, সে কোন দিন বলেনি, হে রব! কিয়ামতের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও।' [মুসলিমঃ ২১৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কোন মুমিনের সামান্যতম সৎকাজও নষ্ট হতে দেন না। দুনিয়াতে সেটার বিনিময় দেন আর আখেরাতে তো তার জন্য প্রতিফল রয়েছেই। পক্ষান্তরে কাফের, তাকে তার প্রশংসনীয় কাজগুলোর বিনিময় দুনিয়াতে জীবিকা প্রদান করেন। অবশেষে যখন আখেরাতে পৌঁছবে, তখন তার এমন কোন কাজ থাকবে না যার প্রতিফল তিনি তাকে দেবেন।' [মুসলিমঃ ২৮০৮]

(২) আয়াতে মুনাফিকদের দুটি আলামত বর্ণিত হয়েছে। সালাতে অলসতা ও দান খয়রাতে কুণ্ঠাবোধ। এতে মুসলিমদের প্রতি হুশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দুপ্রকার অভ্যাস থেকে দুরে থাকে। বরং তারা যেন সালাতে অত্যন্ত তৎপরতা ও আগ্রহের সাথে হাজির হয়, তাদের মধ্যে বিমর্ষভাব, অনীহা না থাকে। দানের ক্ষেত্রেও তারা যেন মন খুলে খুশী মনে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াবের আশা করে দান করে। কোনক্রমেই মুনাফিকদের মত না হয় [সা'দী]

৫৫. কাজেই তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো এসবের দ্বারাই তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিতে চান। আর তাদের আত্মা দেহত্যাগ করবে কাফের থাকা অবস্থায়(১)।

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুত

وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

(১) এ আয়াতে মুনাফিকদের জন্যে তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততিকে যে আযাব বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার কারণ হল, দুনিয়ার মোহে উন্মত্ত থাকা মানুষের জন্যে পার্থিব জীবনেও এক বড় আযাব। প্রথমে অর্থ উপার্জনের সুতীব্র কামনা, অতঃপর তা হাসিলের জন্যে নানা চেষ্টা তদবীর নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, না দিনের আরাম না রাতের ঘুম, না স্বাস্থ্যের হেফাযত আর না পরিবার পরিজনের সাথে আমোদ আহলাদের অবকাশ। অতঃপর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারা যা কিছু অর্জিত হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে দ্বিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি করার অবিশ্রান্ত চিন্তা ভাবনা প্রভৃতি হল একেকটি স্বতন্ত্র আযাব। এরপরে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা রোগ ব্যাধির কবলে পতিত হয়, তখন যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সবই যদি ঠিক থাকে এবং মনের চাহিদামত অর্থকড়ি আসতে থাকে, তখন তার নিরাপত্তার প্রয়োজন ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তখন সে চিন্তা ফিকির তাকে মুহুর্তের জন্যও আরামে বসতে দেয়না। পরিশেষে এ সকল অর্থ সম্পদ যখন মৃত্যুকালে বা তার আগে হাত ছাড়া হতে দেখে, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার অন্ত থাকেনা। বস্তুতঃ এসবই হল আযাব। অজ্ঞ মানুষ একে শান্তি ও আরামের সম্বল মনে করে। কিন্তু মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি কিসে, তার সন্ধান নেয় না। তাই শান্তির এই উপকরণকেই প্রকৃত শান্তি মনে করে তা নিয়েই দিবা নিশি ব্যস্ত থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ার জীবনে তার আরামের শত্রু এবং আখেরাতের আযাবের পটভুমি। [ইবনুল কাইয়্যেম: ইগাসাতুল লাহফান: ১/৩৫-৩৬] এ আয়াতের সমর্থনে কুরআনের অন্যত্র আরও এসেছে, "আর আপনি আপনার দু'চোখ কখনো প্রসারিত করবেন না তার প্রতি, যা আমরা বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। আপনার রব-এর দেয়া জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।" [সূরা ত্বা-হা: ১৩১] আরও বলেন, "তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সহযোগিতা করছি, তার মাধ্যমে, তাদের জন্য সকল মংগল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা উপলব্ধি করে না" [সূরা আল-মুমিনূন: ৫৫-৫৬]

তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভয় করে থাকে।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা লুকিয়ে থাকার কোন প্রবেশস্থল পেলে সেদিকেই পালিয়ে যাবে দ্রুততার সাথে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সদকা বন্টন সম্পর্কে আপনাকে দোষারোপ করে, তারপর এর কিছু তাদেরকে দেয়া হলে[১] তারা সন্তুষ্ট হয়, আর এর কিছু তাদেরকে না দেয়া হলে সাথে সাথেই তারা বিক্ষুব্ধ হয়।

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ

৫৯. আর ভাল হত যদি তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন

(১) আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পদ বন্টন করছিলেন, তখন যুল খুওয়াইসরা আত-তামীমী এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইনসাফ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দুর্ভোগ তোমার, কে ইনসাফ করবে যদি আমি ইনসাফ না করি? উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমাকে ছাড়ুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূল বললেন, তাকে ছেড়ে দাও; তার কিছু সঙ্গী-সাথী রয়েছে যাদের সালাতের কাছে তোমরা তোমাদের সালাতকে, তাদের সাওমের কাছে তোমাদের সাওমকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর তূণীর থেকে বেরিয়ে যায়। ... আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বলেছেন এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। [বুখারী: ৬৯৩৩] এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথাই বর্ণনা করছেন যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বন্টনের উপর আপত্তি উত্থাপন করত। তাদের এ আপত্তি বা সমালোচনা কোন সঠিক উদ্দেশ্য বা গ্রহণযোগ্য মতের উপর ভিত্তি করে ছিল না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল কিছু পাওয়া। কিছু দেওয়া হলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর কিছু না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এ অবস্থা বান্দার জন্য কাম্য হতে পারে না যে, তার সন্তুষ্টি ও ক্রোধ নির্ভর করবে তার দুনিয়ার চাহিদা বা খারাপ উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার উপর, বরং প্রত্যেকের উচিত তার চাহিদা হবে তার রবের সন্তুষ্টি অনুযায়ী। [সা'দী]

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

তাতে সন্তুষ্ট হত এবং বলত, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ্ আমাদেরকে দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রাসূলও; নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্রই প্রতি অনুরক্ত।'

অষ্টম রুকূ'

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ

৬০. সদকা[১] তো শুধু[২] ফকীর,

(১) সাহাবা ও তাবেয়ীগনের ঐক্যমতে এ আয়াতে সেই ওয়াজিব সদকার খাতগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যা মুসলিমদের জন্যে সালাতের মতই ফরয। কারণ, এ আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফরয সদকারই খাত। হাদীস অনুযায়ী নফল সদকা আট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর পরিসর আরও প্রশস্ত। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকাতের ব্যয় খাত ঠিক করে দিয়ে কারা যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত তা বাতলে দিয়েছেন। আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হুকুম মতেই যাকাতের বিলি বন্টন করেছেন নিজের খেয়াল খুশীমত নয়। এক হাদীসে এ সত্যটি প্রমাণিত হয়। যিয়াদ ইবন হারিস আস-সুদায়ী বলেন, 'আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তার গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে সৈন্যের একটি দল অচিরেই প্রেরণ করবেন। আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বিরত হোন আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তারা সবাই আপনার বশ্যতা স্বীকার করে এখানে হাযির হবে। তারপর আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, 'তুমি তোমার গোত্রের একান্ত প্রিয় নেতা'। আমি আরয করলাম এতে আমার কৃতিত্বের কিছুই নেই। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা হেদায়েত লাভ করে মুসলিম হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন আমি এই বৈঠকে থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু সাহায্য চাইল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জবাব দিলেন, সদকার ভাগ বাটোয়ার দায়িত্ব আল্লাহ নবী বা অন্য কাউকে দেননি। বরং তিনি নিজেই সদকার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই আট শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি।' [আবুদাউদ: ১৬৩০; দারা কুতনী: ২০৬৩]

(২) আলোচ্য আয়াতের শুরুতে إِنَّمَا শব্দ আনা হয়। যার অর্থঃ কেবলমাত্র, শুধুমাত্র। তাই শুরু থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, সদকার যে সকল খাতের বর্ণনা সামনে দেয়া হচ্ছে কেবল সে আটটি খাতেই সকল ওয়াজিব সদকা ব্যয় করা হবে, এছাড়া অন্য কোন ভাল খাতেও ওয়াজিব সদকা ব্যয় করা যাবে না। [কুরতুবী] সদকা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নফল ও ফরয উভয় দানই এতে শামিল রয়েছে। নফলের জন্যে শব্দটির

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

মিসকীন[১] ও সদকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য[২], যাদের

প্রচুর ব্যবহার, তেমনি ফরয সদকার ক্ষেত্রেও কুরআনের বহুস্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। বরং কোন কোন মুফাসসিরের তথ্য মতে কুরআনে যেখানে শুধু সদকা শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ফরয সদকা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। [কুরতুবী] আবার কতিপয় হাদীসে সদকা বলতে প্রত্যেক সৎকর্মকেও বোঝানো হয়েছে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে, 'কোন মুসলিমের সাথে সৎ ও উত্তম কথা বলা সদকা, কোন বোঝা বহনকারীর কাঁধে ভার তুলে দেওয়াও সদকা'। [মুসলিমঃ ১০০৯] 'কুপ থেকে নিজের জন্যে উত্তোলিত পানির কিছু অংশ অন্যকে দান করাও সদকা।' [তিরমিযীঃ ১৯৫৬] এ হাদীসে সদকা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

(১) প্রথম ও দ্বিতীয় খাত হল যথাক্রমে ফকীর ও মিসকীনের। আসল অর্থে যদিও পার্থক্য রয়েছে। যথা, ফকীর হল যার কিছুই নেই এবং মিসকীন হল যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। [কুরতুবী] ফকীর ও মিসকীনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তারা যাকাতের হুকুমে সমান। মোটকথাঃ যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ অর্থ নেই তাকে যাকাত দেয়া যাবে এবং সে ও নিতে পারবে। প্রয়োজনীয় মালামালের মধ্যে থাকার ঘর, ব্যবহৃত বাসন-পেয়ালা, পোশাক পরিচ্ছদ ও আসবাব পত্র প্রভৃতি শামিল রয়েছে। সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্য যার কাছে রয়েছে এবং সে ঋণগ্রস্ত নয়, সেই নেসাবের মালিক। তাকে যাকাত দেয়া ও তার পক্ষে যাকাত নেয়া জায়েয নয়। [কুরতুবী] অনুরূপ যার কাছে কিছু রূপা বা নগদ কিছু টাকা এবং কিছু স্বর্ণ আছে সব মিলিয়ে যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা রুপার সমমূল্য হয় তবে সেও নেসাবের মালিক, তাকেও যাকাত দেয়া নেয়া জায়েয নয়। কারণ সে ধনী ব্যক্তি। আর ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সদকা গ্রহণ জায়েয নয় ধনীর জন্য, অনুরূপভাবে শক্তিশালী উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্য' [আবু দাউদঃ ১৬৩৪; তিরমিযীঃ ৬৫২] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জন শক্তিশালী লোককে সদকার জন্য দাঁড়াতে দেখে বললেন, 'তোমরা চাইলে আমি তোমাদের দেব, কিন্তু এতে ধনী এবং শক্তিশালী উপার্জনক্ষমের কোন হিস্যা নেই'। [আবু দাউদঃ ১৬৩৩]

(২) আমেলীনে সদকা অর্থাৎ সদকা সম্পৃক্ত কাজে নিযুক্ত কর্মী। এরা ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে লোকদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে বায়তুলমালের জমা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। [কুরতুবী] এরা যেহেতু এ কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের উপর বর্তায়। কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত যাকাতের একাংশ তাদের জন্য রেখে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকেই আদায় করা হবে। এর মূল রহস্য হল এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের থেকে যাকাত ও অপরাপর

অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য[১], দাসমুক্তিতে[২], ঋণ ভারাক্রান্ত

وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً

সদকা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। সূরার শেষের দিকে এক আয়াতে বলা হয়েছে, "হে রাসূল! আপনি তাদের মালামাল থেকে সদকা গ্রহণ করুন।" [১০৩] উক্ত আয়াত মতে রাসূলের অবর্তমানে তার উত্তরাধিকারী খলীফা বা আমীরুল মুমেনীন বা রাষ্ট্রপ্রধানের উপর যাকাত ও সদকা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়। বলাবাহুল্য, সহকারী ব্যতীত আমীরের পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে "আমেলীন" বলতে যাকাত আদায়কারী তথা সেসব সহকারীদের কথাই বলা হয়েছে। এ আয়াত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এ সকল সাহাবীর অনেকে ধনীও ছিলেন। হাদীসে এসেছে, 'ধনীদের জন্য সদকার অর্থ হালাল নয়, তবে পাঁচ ব্যক্তির জন্য হালাল। প্রথমতঃ যে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ তার নেই যদিও সে স্বদেশী ধনী। দ্বিতীয়তঃ সদকা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। তৃতীয়তঃ সেই অর্থশালী ব্যক্তি যার মজুদ অর্থের তুলনায় ঋণ অধিক। চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি মূল্য আদায় করে গরীব মিসকীন থেকে সদকার মালামাল ক্রয় করে। পঞ্চমতঃ যাকে গরীব লোকেরা সদকার প্রাপ্ত মাল হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে' [আবু দাউদ: ১৬৩৫]

(১) যাকাতের চতুর্থ ব্যয় খাত হল 'মুআল্লাফাতুল কুলুব'। সাধারণত তারা তিন চার শ্রেণীর বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলিম, কিছু অমুসলিম। মুসলিমদের মধ্যে কেউ ছিল চরম অভাবগ্রস্ত এবং নওমুসলিম, এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা এজন্যে নেয়া হয়, যেন তাদের ইসলামী বিশ্বাস পরিপক্ক হয়। আর কেউ ছিল ধনী কিন্তু তাদের অন্তর তখনো ইসলামে রঞ্জিত হয়নি। আর কেউ কেই ছিল পরিপক্ক মুসলিম, কিন্তু তার গোত্রকে এর দ্বারা হেদায়েতের পথে আনা উদ্দেশ্য ছিল। অমুসলিমদের মধ্যেও এমন অনেকে রয়েছে, যাদের শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্যে তাদের পরিতুষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল। আর কেউ ছিল, যারা ওয়ায নসীহত কিংবা যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও ইসলামে প্রভাবিত হচ্ছে না, বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা দয়া,দান ও সদ্ব্যবহারে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমগ্র জীবনের প্রচেষ্টা ছিল কুফরীর অন্ধকার থেকে আল্লাহর বান্দাদের ঈমানের আলোয় নিয়ে আসা। তাই এ ধরনের লোকদের প্রভাবিত করার জন্য যে কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করতেন। এরা সবাই মুআল্লাফাতুল কুলুবের অন্তর্ভুক্ত এবং আলোচ্য আয়াতে এদেরকে সদকার চতুর্থ ব্যয়খাত রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

(২) যাকাতের পঞ্চম ব্যয়খাত হলো, দাসমুক্তিতে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা। আর তা হলো ঐ সমস্ত দাস যাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য তাদের মনিব তাদেরকে কিছু টাকা পয়সা দেয়ার চুক্তি করেছে। আর সে দাস তা পরিশোধ করতে পারছে না।

دَ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ﴿٦٠﴾

দের জন্য[১], আল্লাহ্‌র পথে[২] ও

(১) যাকাতের ষষ্ঠ ব্যয়খাত হল দেনাদার বা ঋণগ্রস্ত। আয়াতে বর্ণিত "গারেমীন" হলো "গারেম" এর বহুবচন। এর অর্থ দেনাদার, [জালালাইন]। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, সে ঋণগ্রস্তের কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, যাতে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কারণ, অভিধানে এমন ঋণী ব্যক্তিকেই "গারেম" বলা হয়, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে তার নিজ ও পরিবারের ব্যয় মেটানোর জন্য খরচ করতে গিয়ে এমন ঋণী হয়ে গেছে যে, সেটা শোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। [আইসারুত তাফাসীর] আবার কোন কোন ইমাম এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য না করে থাকে। [কুরতুবী] কোন পাপ কাজের জন্য যদি ঋণ করে থাকে-যেমন, মদ কিংবা নাজায়েয প্রথা অনুষ্ঠান প্রভৃতি, তবে এমন ঋণগ্রস্তকে যাকাতের অর্থ থেকে দান করা যাবে না, যাতে তার পাপ কাজও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ দান করা না হয়।

এখানে জানা আবশ্যক যে, ঋণগ্রস্থতা কয়েক কারণে হতে পারে। এক. মানুষের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক জোড়া লাগানোর জন্য, মীমাংসার জন্য কেউ কেউ ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে। যেমন, দু'দল লোকের মধ্যে সমস্যা লেগে গেছে, একজন লোক পয়সা খরচ করে দু'দলের সমস্যাটা সমাধান করে দেয়। এ ধরনের লোকের জন্য শরী'আতে যাকাতের টাকায় হিস্যা রেখেছে, যাতে করে মানুষ এ ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়। দুই. যে ঋণগ্রস্থ হয় নিজের জন্য, তারপর ফকীর হয়ে যায়, তাকে তার ঋণগ্রস্থতা থেকে মুক্তির জন্য যাকাত থেকে দেয়া যেতে পারে। [বাগভী; সা'দী] প্রথম প্রকারের উদাহরণ যেমন হাদীসে এসেছে, কাবীসা ইবন মুখারিক আল-হিলালী বলেন, আমি একবার পরস্পর সম্পর্ক ঠিক রাখতে গিয়ে মাথার উপর ঋণের বিরাট বোঝা বহন করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আসি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আমাদের কাছে অবস্থান কর, যাতে করে সদকা তথা যাকাতের মাল আসলে তোমাকে দিতে পারি। তারপর তিনি বললেন, হে কাবীসা! তিন জনের জন্যই কেবল চাওয়া জায়েয। এক. যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ঋণের বোঝা বহন করেছে, তার জন্য চাওয়া জায়েয, যতক্ষণ না সে তা পাবে। তারপর তাকে চাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। দুই. আর একজন যার সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেছে। তারজন্যও কোন প্রকার জীবিকার ব্যবস্থা করা পর্যন্ত চাওয়া জায়েয। তিন. আর একজন লোক যাকে দারিদ্রতা পেয়ে বসেছে। তখন তার কাওমের তিনজন গ্রহণযোগ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে যে, আল্লাহ্‌র শপথ! অমুক হত-দরিদ্র হয়ে পড়েছে। সে ব্যক্তিও জীবিকার ব্যবস্থা হওয়া পর্যন্ত যাচঞা করতে পারে। এর বাইরে যত চাওয়া আছে সবই হারাম। [মুসলিম: ১০৪৪]

(২) সপ্তম যাকাতের ব্যয়খাত হলোঃ "ফি সাবীলিল্লাহ"। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর মর্ম সেসব গাযী ও মুজাহিদ, যাদের অস্ত্র ও জিহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই। এ জাতীয় কাজই নির্ভেজাল দ্বীনী খেদমত ও ইবাদাত। কাজেই যাকাতের মাল

মুসাফিরদের[১] জন্য। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত[২]। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়[৩]।

৬১. আর তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে তো কর্ণপাতকারী।' বলুন, 'তাঁর কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তা-ই শুনে।'

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ

এতে ব্যয় করা খুব জরূরী। [কুরতুবী] এমনিভাবে ফেকাহবিদগণ ছাত্রদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ, তারাও একটি ইবাদত আদায় করার জন্যই এ ব্রত গ্রহণ করে থাকে। [সা'দী]

(১) যাকাতের অষ্টম ব্যয়খাত হলোঃ মুসাফির। যাকাতের ব্যয়খাতের ক্ষেত্রে এমন মুসাফির বা পথিককে বুঝানোই উদ্দেশ্য, যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ নেই, স্বদেশে তার যত অর্থ-সম্পদই থাক না কেন। এমন মুসাফিরকে যাকাতের মাল দেয়া যেতে পারে, যাতে করে সে তার সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারবে এবং স্বদেশ ফিরে যেতে সমর্থ হবে। [কুরতুবী; সা'দী]

(২) অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করার ব্যাপারেও যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে যে, এসব খাতে কোন হকদারকে যাকাতের মালের উপর মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার দিয়ে দিতে হবে। মালিকানা অধিকার দেয়া ছাড়া যদি কোন মাল তাদেরই উপকার কল্পে ব্যয় করা হয়, তবুও যাকাত আদায় হবে না।

(৩) এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, এ আটটি খাত মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। তিনি জানেন বান্দাদের স্বার্থ কোথায় আছে। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারেই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, এ আটটি খাতকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। এক. এমন কিছু খাত আছে যেগুলোতে ঐ লোকদেরকে তাদের প্রয়োজন পূরণার্থে ও উপকারার্থে দেয়া হচ্ছে, যেমন, ফকীর, মিসকীন ইত্যাদি। দুই. এমন কিছু খাত আছে যেগুলোতে তাদেরকে দেয়া হচ্ছে তাদের প্রতি আমাদের প্রয়োজনে, ইসলামের উপকারার্থে, কোন ব্যক্তির প্রয়োজনার্থে নয়। যেমন, মুআল্লাফাতি কুলূবুহুম, আমেলীন ইত্যাদি। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদের সাধারণ ও বিশেষ যাবতীয় প্রয়োজনীয় পূরণের ব্যবস্থা করেছেন। যদি ধনীগণ শরী'আত মোতাবেক তাদের যাকাত প্রদান করত, তবে অবশ্যই কোন মুসলিম ফকীর থাকত না। তাছাড়া এমন সম্পদও মুসলিমদের হস্তগত হতো যা দিয়ে তারা মুসলিম দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে সমর্থ হতো। আর যার মাধ্যমে তারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে পারত এবং যাবতীয় দ্বীনী স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব হতো। [সা'দী]

اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

তিনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনেন এবং মুমিনদেরকে বিশ্বাস করে; আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তিনি তাদের জন্য রহমত। আর যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি[১]।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا

৬২. তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র শপথ করে[২]। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, নাবতাল ইবনুল হারেস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বসত। তারপর সেখানে যা শুনত তা মুনাফিকদের কাছে পাচার করত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ সে তাদের কাছে গিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে বলেছিল যে, তিনি কান কথা বেশী শুনেন। তিনি সবার কথা শুনেন। [তাবারী] অথবা তারা বলতে চেয়েছিল যে, আমরা যা বলছি তা যদি মুহাম্মাদের কানে যায়, তারপরও কোন অসুবিধা নেই, কারণ তার কাছে গিয়ে ওজর পেশ করব। আর তিনি সব কথাই শুনে থাকেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। এভাবে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমন খারাপ মন্তব্য করতে লাগল যে, তিনি সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম নন। অথচ তিনি তাদের হিদায়াতের জন্যই প্রেরিত। এটা নিঃসন্দেহে রাসূলকে কষ্ট দেয়া। [সা'দী]

আল্লাহ্ তা'আলা তার জবাবে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল কথা শুনেন। তার কথাগুলো ঈমানদারদের জন্য কল্যাণকর। তিনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখেন এবং মুমিনদেরকে বিশ্বাস করেন। [তাবারী] শানকীতী বলেন, আয়াতে সে সমস্ত লোকদের জন্য কঠোর শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত ও তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সেখানে এসেছে, "নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি" [সূরা আল-আহযাব: ৫৭]

(২) কাতাদা বলেন, মুনাফিকদের এক লোক বলেছিল যে, যদি মুহাম্মদ যা বলে তা সত্য হয় তবে তারা গাধার চেয়েও অধম। একথা শুনে মুসলিমদের এক ব্যক্তি বলল যে, আল্লাহ্‌র শপথ, মুহাম্মাদ যা বলে তা সত্য, আর তুমি গাধার চেয়েও

مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

রাসূলই এর বেশী হকদার যে, তারা তাঁদেরকেই সন্তুষ্ট করবে[১], যদি তারা মুমিন হয়।

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

৬৩. তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে[২] তার জন্য তো আছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে সে স্থায়ী হবে? এটাই চরম লাঞ্ছনা।

يَحْذَرُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا۟

৬৪. মুনাফেকরা ভয় করে, তাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা না নাযিল হয়, যা ওদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে দেবে[৩]!

অধম। মুসলিম লোকটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ঘটনাটি জানাল। তিনি মুনাফিকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এ কথাটি তুমি কেন বলেছ? সে লা'নত দিতে লাগল এবং আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলল যে, সে তা বলেনি। তখন মুসলিম লোকটি বলল, হে আল্লাহ্! আপনি সত্যবাদীকে সত্যায়ন করুন আর মিথ্যাবাদীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করুন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে আল্লাহ্র নামে শপথ করে সন্তুষ্ট করতে চায়। অথচ তাদের উচিত ঈমান এনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করবে। [মুয়াসসার] কারণ একজন মুমিনের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা। মুমিন এর উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেয় না। তারা যেহেতু সেটা করছে না সেহেতু প্রমাণিত হলো যে, তারা ঈমানদার নয়। [সা'দী]

(২) তারা যেহেতু রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, মুমিনদের কাছে মিথ্যা শপথ করে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে, সুতরাং তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় নেমেছে। আর যারাই আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় নামে তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আর তা নিঃসন্দেহে লাঞ্ছিত জীবন। [সা'দী;মুয়াসসার]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে জানাচ্ছেন যে, মুনাফিকরা এ ভয়ে থাকে যে, কখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন সূরা নাযিল হয়ে তাদের অপমানিত করবে, তাদের মনের অব্যক্ত কথা ব্যক্ত করে দিবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিলেন যে, তারা যতই গোপন করুক না কেন আল্লাহ্ তা অবশ্যই বের করে দেবেন। [আদওয়াউল বায়ান] মুজাহিদ বলেন, তারা নিজেদের মধ্যে কোন কথা বলে তারপর ভাবতে থাকে যে, এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ্ আমাদের এ গোপন

إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

বলুন, 'তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক; তোমরা যা ভয় কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা বের করে দেবেন ।'

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম ।' বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে(১)?'

কথা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন? কাতাদা বলেন, তাদের মনের গোপন কথাগুলো বলে দিয়ে আল্লাহ্ তাদেরকে অপমানিত করলেন । আর এ জন্যই এ সূরার অপর নাম আল-ফাদিহা বা অপদস্থকারী বা অপমানকারী [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও তাদের এ আশঙ্কার কথা আল্লাহ্ জানিয়েছেন । যেমন, "যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ কখনো তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না, আর আমরা ইচ্ছে করলে আপনাকে তাদের পরিচয় দিতাম; ফলে আপনি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন । তবে আপনি অবশ্যই কথার ভংগিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন । আর আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় আমল সম্পর্কে জানেন ।" [সূরা মুহাম্মাদ: ২৯-৩০] অন্য আয়াতে তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবের কথা অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । "তারা যে কোন আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে ।" [সূরা আল-মুনাফিকুন:৪]

(১) যায়দ ইবন আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক মুনাফিক আওফ ইবন মালিককে তাবুকের যুদ্ধে বলে বসল: আমাদের এ কারীসাহেবগণ (রাসূল ও সাহাবায়ে কিরামদেরকে মুনাফিকদের পক্ষ থেকে উপহাস করে দেয়া নাম) উদরপূর্তির প্রতি বেশী আগ্রহী, কথাবার্তায় মিথ্যাচার, আর শত্রুর সামনে সবচেয়ে ভীরু । তখন আওফ ইবন মালিক বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি মুনাফিক, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা জানাব । আওফ তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাতে গেলে দেখতে পেলেন কুরআন তার আগেই সেটা জানিয়েছে । যায়দ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন উমর বলেন, তখন আমি ঐ মুনাফিক লোকটিকে দেখতে পেলাম যে, সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীর পেছনের দিকে ঝুলে ছিল, পাথর তার উপর ছিটে এসে পড়ছিল, সে বলছিল, আমরা তো কেবল আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম' । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছিলেন, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে?' [তাবারী]

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ
عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً ۢ
بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. ‘তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। আমরা তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব---কারণ তারা অপরাধী[১]।’

নবম রুকূ‘

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۘ
يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ
وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ
الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী একে অপরের অংশ, তারা অসৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে নিষেধ করে, তারা তাদের হাতগুটিয়ে রাখে, তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন; মুনাফেকরা তো ফাসিক।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ
جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ
اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۙ﴿٦٨﴾

৬৮. মুনাফেক পুরুষ, মুনাফেক নারী ও কাফেরদেরকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের আগুনের, যেখানে তারা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদেরকে লা‘নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি;

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً
وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ
فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ

৬৯. তাদের মত, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল, তারা শক্তিতে তোমাদের চেয়ে প্রবল ছিল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল তোমাদের

(১) ইকরিমা বলেন, মুনাফিকদের একজনকে আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক ক্ষমা করলে সে বলল, হে আল্লাহ্! আমি একটি আয়াত শুনতে পাই যাতে আমাকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, যা আমার চামড়া শিহরিত করে এবং অন্তরে আঘাত করে। হে আল্লাহ্! সুতরাং আমার মৃত্যু যেন আপনার রাহে শাহাদাতের মাধ্যমে হয়। কেউ যেন বলতে না পারে যে, আমি অমুককে গোসল দিয়েছি, তাকে কাফন দিয়েছি, তাকে দাফন করেছি। ইকরিমা বলেন, সে ইয়ামামাহ এর যুদ্ধে মারা গেল, কিন্তু অন্যান্য মুসলিমদের লাশ পাওয়া গেলেও তাকে পাওয়া যায় নি। [ইবন কাসীর]

مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي
خَاضُوا ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾

চেয়ে বেশী। অতঃপর তারা তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে; আর তোমরাও তোমাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে। আর তোমরাও সেরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত রয়েছ যেরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় তারা লিপ্ত ছিল(১)। ওরা তারাই যাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে, আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

(১) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, এ লোকগুলো সে রকম আযাবই পেয়েছে যে রকম আযাব তাদের পূর্ববর্তীরা পেয়েছে। অথচ তারা এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ও বেশী সম্পদ ও সন্তান সন্ততির অধিকারী ছিল। অতঃপর তারা ভোগ করেছে তাদের অংশ। হাসান বসরী বলেন, এখানে অংশ বলে দ্বীন বোঝানো হয়েছে। তারা তাদের দ্বীনের অংশ অনুসারে আমল করে চলেছে। যেমনিভাবে তোমরা তোমাদের দ্বীনের অংশ অনুসারে আমল করে চলছ। অনুরূপভাবে তোমরা মিথ্যা ও অসার আলোচনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছ যেমনি তারা মিথ্যা ও অসার আলোচনায় লিপ্ত হয়েছিল। [ইবন কাসীর] ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, এর অর্থ তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে তোমরাও তা-ই করছ। আর তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দ্বীনের মধ্যে না জেনে কথা বলেছে, তোমরাও তা বলছ। তোমাদের ও তাদের পথভ্রষ্টতার ধরণ একই। কারণ দ্বীন নষ্ট হয় দু'ভাবে। কখনও বাতিল বিশ্বাস ও সে অনুসারে কথা বলার মাধ্যমে, আবার কখনও সঠিক জ্ঞানের বাইরে চলে বাতিল আমল করার মাধ্যমে। প্রথমটি হচ্ছে, বিদ'আত। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, খারাপ আমল। প্রথমটি সন্দেহ থেকে আসে আর দ্বিতীয়টি আসে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে। বর্তমান যুগের ফাসেক লোকরাও পূর্ববর্তী লোকদের মতই এ দু'টিতে লিপ্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। [ইগাসাতুল লাহফান: ২/১৬৬-১৬৭] রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়মপদ্ধতি অনুসরণ করবে, প্রতি গজে গজে প্রতি হাতে হাতে তাদের অনুসরণ করবে। এমনকি যদি তারা 'দব' তথা ষাণ্ডার গর্তেও প্রবেশ করে থাকে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়? তিনি বললেন, তবে আর কারা? [বুখারী: ৩৪৫৬]

৭০. তাদের পূর্ববর্তী নূহ, 'আদ ও সামূদের সম্প্রদায়, ইব্‌রাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদ্‌ইয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীদের সংবাদ কি তাদের কাছে আসেনি? তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন। অতএব, আল্লাহ্ এমন নন যে, তাদের উপর যুলুম করেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল।

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۙ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু(১), তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; তারাই, যাদেরকে আল্লাহ্ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

৭২. আল্লাহ্ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের---যার নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আরও (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম বাসস্থানের(২)। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিনগণকে তুমি দেখবে তাদের দয়া, ভালবাসা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে এক শরীরের ন্যায়। যার এক অংশে ব্যাথা হলে তার সারা শরীর নির্ঘুম ও জ্বরে ভোগে। [বুখারী: ৬০১১; মুসলিম: ২৫৮৬]

(২) জান্নাতের বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসেও এসেছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতীরা জান্নাতের কামরাগুলোকে এমনভাবে দেখবে যেমন তোমরা আকাশে তারকা দেখতে পাও"। [বুখারী: ৬৫৫৫] অন্য হাদীসে

সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটাই মহাসাফল্য ।

দশম রুকূ‘

٧٣ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ

৭৩. হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন[১], তাদের

এসেছে, ‘জান্নাতে এমন কিছু কক্ষ আছে যে কক্ষের ভেতর থেকে বাইরের অংশ দেখা যায় আর বাইরে থেকে ভেতরের অংশ দেখা যায় । আল্লাহ তা‘আলা এগুলো তো তাদের জন্য তৈরী করেছেন, যারা অপরকে খাদ্য খাওয়ায়, নম্রভাবে কথা বলে, নিয়মিত সাওম পালন করে এবং যখন মানুষ ঘুমন্ত, তখন সালাত আদায় করে ।’ [মুসনাদ আহমাদ: ৫/৩৪৩] অন্য হাদীসে এসেছে, “জান্নাতের প্রাসাদের এক ইট হবে রৌপ্যের, আরেক ইট হবে স্বর্ণের । ...” । [মুসনাদ আহমাদ: ২/৩০৪] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মুমিন ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি তাবু থাকবে, যা হবে মাত্র একটি ফাঁপা মুক্তা, আর যার উচ্চতা হবে ষাট মাইল । মুমিন ব্যক্তির জন্য তাতে পরিবার-পরিজন থাকবে, সে তাদের কাছে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু তাদের একজন আরেকজনকে দেখতে পাবে না ।” [বুখারী: ৪৮৭৯, মুসলিম: ২৮৩৪] আর আরশের অধিক নিকটবর্তী, জান্নাতের সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থানের নাম ওয়াসীলা । এটাই জান্নাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসস্থান । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যদি তোমরা মুয়ায্যিনের আযান শোন, তবে সে আযানের জবাব দাও । অতঃপর আমার উপর সালাত পাঠ কর । কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করে, আল্লাহ্ তা‘আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার সালাত পাঠ করেন । তারপর আমার জন্য তোমরা ‘ওয়াসীলা’র প্রার্থনা কর । আর ওয়াসীলা হল জান্নাতের এমন এক মর্যাদাসম্পন্ন স্থান, যা কেবলমাত্র একজন বান্দা ছাড়া আর কারও উপযুক্ত নয় । আর আমি আশা করি, আমি-ই সে বান্দা । সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলার প্রার্থনা করবে, সে কেয়ামতের দিন আমার শাফা‘আত পাবে ।” [মুসলিম: ১৩৮৪] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আল্লাহ্ তা‘আলা জান্নাতবাসীদেরকে বলবে, ‘হে জান্নাতবাসীরা!’ তখন তারা বলবে, হে রব আমরা হাজির, আমরা হাজির, আর সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে । তখন তিনি বলবেন, ‘তোমরা কি সন্তুষ্ট?’ তখন তারা বলবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না, অথচ আপনি আমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছেন, যা আপনার কোন সৃষ্টিকেই দেন নি? তখন তিনি বলবেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দেব না?’ তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম কী হতে পারে? তখন তিনি বলবেন, ‘আমি আমার সন্তুষ্টি তোমাদের উপর অবতরণ করাব; এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না’ ।” [বুখারী: ৬৫৪৯, মুসলিম: ২৮২৯]

(১) আয়াতে কাফের ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া

عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوٰىهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ

প্রতি কঠোর হোন[১]; এবং তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

يَحۡلِفُوۡنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوۡاؕ وَلَقَدۡ قَالُوۡا كَلِمَةَ الۡكُفۡرِ

৭৪. তারা আল্লাহ্‌র শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি[২]; অথচ তারা তো কুফরী

হয়েছে। [তাবারী] প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের তাদের সাথে জিহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট যে তাদের বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে জিহাদ করতে হবে, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জিহাদ কিভাবে করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাদের বিরুদ্ধেও হাত দিয়ে, সম্ভব না হলে মুখ দিয়ে, তাতেও সম্ভব না হলে অন্তর দিয়ে জিহাদ করতে হবে। আর সেটা হচ্ছে তাদেরকে দেখলে কঠোরভাবে তাকানো। [বাগভী] ইবন আব্বাস বলেন, তাদের সাথে জিহাদ করার মর্ম হল মৌখিক জিহাদ এবং কোমলতা পরিত্যাগ। [তাবারী] অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবীতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে। দাহহাক বলেন, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ হচ্ছে, কথায় কঠোরতা অবলম্বন। কাতাদা বলেন, এক্ষেত্রে বাস্তব ও কার্যকর কঠোরতাই বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ তাদের উপর শরী'আতের হুকুম জারী করতে গিয়ে কোন রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। [বাগভী]

(১) এখানে বর্ণিত غلظة এর প্রকৃত অর্থ হল, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে আচরণের যোগ্য হবে তাতে কোন রকম কোমলতা যেন না করা হয়। এ শব্দটি رأفة এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হল কোমলতা ও করুণা। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠক-সমাবেশে কুফরী কথাবার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন মুসলিমরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদের সুচিতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গযওয়ায়ে তাবুক প্রসঙ্গে এক ভাষণ দান করেন যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দূরাবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজ বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেন তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাইতেও নিকৃষ্ট। তার এ বাক্যটি আমের ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু নামক এক সাহাবী শুনে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন আমের ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন।

وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

বাক্য বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কুফরী করেছে; আর তারা এমন কিছুর সংকল্প করেছিল যা তারা পায়নি। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা

জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমের ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে (আমি এমন কথা বলিনি)। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়কে 'মিম্বরে-নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথ্যা কথা বলেছে। আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু– এর পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তব্য সম্পর্কে) কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দো'আ করেন যে, হে আল্লাহ্ আপনি ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত মুসলিম 'আমীন' বললেন। তারপর সেখান থেকে তাঁদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীলে–আমীন ওহী নিয়ে হাযির হন যাতে উল্লেখিত আয়াতখানি নাযিল হয়। জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ এখন স্বীকার করছি যে, এ ভুলটি আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছিল। আমের ইবন কায়েস যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাওবাহ্ করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহ্র নিকট মাগফেরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তাওবাহ্ করছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার তাওবাহ্ কবুল করে নেন এবং তারপর তিনি নিজ তাওবায় অটল থাকেন। তাতে তার অবস্থাও শুধরে যায়। [বাগভী]

কোন কোন তফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে–নুযূল প্রসঙ্গে এমনি ধরণের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। যেমন, তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, মুনাফিকদের বার জন লোক পাহাড়ী এক ঘাঁটিতে এমন উদ্দেশ্যে লুকিয়ে বসেছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এখানে এসে পৌঁছবেন, তখন আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবে। এ ব্যাপারে জিবরীলে আমীন তাকে খবর দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান এবং এতে করে তাদের হীনচক্রান্ত ধুলিস্মাৎ হয়ে যায়। [ইবন কাসীর] এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে এসবের মধ্যে কোন বৈপরীত্ব কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে।

مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾

করেছিল[১]। অতঃপর তারা তাওবাহ্ করলে তা তাদের জন্য ভাল হবে, আর তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন; আর যমীনে তাদের কোন অভিভাবক নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকার করেছিল, 'আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদেরকে দান করলে আমরা অবশ্যই সদকা দেব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ হতে দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেল।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا

৭৭. পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে মুনাফেকী রেখে দিলেন[২] আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত,

(১) অনুরূপ কথাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট তারপর আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন। তোমরা ছিলে বিভক্ত, তারপর আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন। আর তোমরা ছিলে দরিদ্র, আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদেরকে ধনী করেছেন। তারা যখনই রাসূলের মুখ থেকে কোন কথা শুনছিল তখনই বলছিল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দয়াই বেশী' [বুখারী: ৪৩৩০; মুসলিম:১০৬১]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অপকর্ম ও অঙ্গীকার লংঘনের ফলে তাদের অন্তরসমূহে মুনাফিকী বা কুটিলতাকে আরো পাকাপোক্ত করে বসিয়ে দেন, যাতে তাদের তাওবাহ্ করার ভাগ্যও হবে না। হাদীসে মুনাফিকদের আলামত বর্ণিত হয়েছে, "মুনাফিকের আলামত হচ্ছে, তিনটি, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে।" [বুখারী: ৩৩; মুসলিম: ৫৯]

يَكْذِبُوْنَ ۝٧٧

তারা আল্লাহ্‌র কাছে যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করার কারণে এবং তারা যে মিথ্যা বলেছিল সে কারণে।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝٧٨

৭৮. তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ জানেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ গায়েবসমূহের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত?

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٧٩

৭৯. মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ছাড়া কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে[১]। অতঃপর তারা তাদের নিয়ে উপহাস করে, আল্লাহ্ তাদেরকে নিয়ে উপহাস করেন[২]; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

৮০. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন একই কথা; আপনি

(১) আবু মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন সদকার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আমরা পরস্পর অর্থের বিনিময়ে বহন করতাম। তখন আবু আকীল অর্ধ সা' নিয়ে আসল। অন্য একজন আরও একটু বেশী আনল। তখন মুনাফিকরা বলতে লাগল, আল্লাহ্ এর সদকা থেকে অবশ্যই অমুখাপেক্ষী, আর দ্বিতীয় লোকটিও দেখানোর জন্যই এটা করেছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারী: ৪৬৬৮]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক কাফের মুনাফিকদের উপহাসের বিপরীতে উপহাস করা কোন খারাপ গুণ নয়। তাই তাদের উপহাসের বিপরীতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপহাস হতে পারে। [সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি] এ উপহাস সম্পর্কে কোন কোন মুফাসসির বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের পক্ষ নিয়ে কাফের ও মুনাফিকদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন। তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। এভাবেই তিনি তাদের সাথে উপহাস করবেন। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে তাদের উপর বদদো'আ করা হয়েছে যে, যেভাবে তারা মুমিনদের সাথে উপহাস করেছে আল্লাহ্ও তাদের সাথে সেভাবে উপহাস করুন। [ফাতহুল কাদীর]

كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না(১)।

এগারতম রুকূ'

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

৮১. যারা পিছনে রয়ে গেল(২) তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ(৩) করে বসে থাকতেই আনন্দ বোধ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপছন্দ

(১) তাফসীরবিদগণ বলেন, এ আয়াত তখন নাযিল হয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন মুনাফিকের জন্য ক্ষমার দো'আ করছিলেন। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আয়াতে উল্লেখিত مخلفون শব্দটি مخلف এর বহুবচন। অর্থ– 'পরিত্যক্ত'। অর্থাৎ যাকে পরিহার করা ও পিছনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। [বাগভী; কুরতুবী] এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা নিজেরা একথা মনে করে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি এবং জিহাদে শামিল হতে হয়নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এহেন সম্মান পাবার যোগ্য মনে করেননি। কারণ তারা হয় মুসলিমদের ক্ষতি করত না হয় তাদের অন্তর অপবিত্র হওয়ার কারণে জিহাদের সৌভাগ্য তাদের নসীব হয়নি। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] কাজেই এরা জিহাদ 'বর্জনকারী' নয়; বরং জিহাদ থেকে 'বর্জিত'। কারণ, রাসলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বর্জনযোগ্য মনে করেছেন। [কুরতুবী]

(৩) আয়াতে উল্লেখিত خلاف শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে, একঃ পেছনে বা পরে, আবু ওবায়দা রহমাতুল্লাহ আলাইহি এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাতে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, এরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদে চলে যাবার পর তাঁর পেছনে রয়ে যেতে পারল বলে আনন্দিত হচ্ছে যা বাস্তবিক পক্ষে আনন্দের বিষয়ই নয়। দ্বিতীয় অর্থ এক্ষেত্রে خلاف অর্থ مخالفة তথা বিরোধিতাও হতে পারে। অর্থাৎ এরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা করে ঘরে বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল না; বরং অন্যান্য লোকদেরকেও এ কথাই বুঝাল যে, "গরমের সময়ে জিহাদে বেরিয়ো না"। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর; জালালাইন; ফাতহুল কাদীর]

করল এবং তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।' বলুন, 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম[১],' যদি তারা বুঝত!

৮২. কাজেই তারা অল্প কিছু হেসে নিক, তারা প্রচুর কাঁদবে[২] সেসব কাজের প্রতিফল হিসেবে যা কিছু তারা করেছে।

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَّلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

---

(১) একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবুক যুদ্ধের অভিযান এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচন্ড গরম পড়ছিল। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার উত্তরদান প্রসঙ্গে বলেছেন ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ অর্থাৎ এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছে এবং তা থেকে বাঁচার চিন্তা করছে। মূলত এর ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের না-ফরমানীর দরুন যে জাহান্নামের আগুনে সম্মুখীন হতে হবে সে কথা ভাবছেই না তাহলে কি মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা বেশী? জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, 'তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তরভাগের একভাগ' বলা হল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! এতটুকুই তো যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ আগুনের চেয়েও সেটা ঊনসত্তর গুণ বেশী, প্রতিটির উত্তাপই এর মত।' [বুখারী: ৩২৬৫; মুসলিম: ২৮৪৩] জাহান্নামের আগুনের আরও আন্দাজ পাওয়া যায় এ হাদীস থেকে, যাতে বলা হয়েছে, 'সবচেয়ে হাল্কা আযাব কিয়ামতের দিন যার হবে, তার আগুনের দুটি জুতা ও পিতা থাকবে, কিন্তু তার উত্তাপে তার মগজ এমনভাবে উৎরাতে থাকবে যেমন পাতিল উনুনের তাপে উতরায়। সে জাহান্নামীদের কাউকে তার চেয়ে বেশী শাস্তিপ্রাপ্ত মনে করবে না। অথচ সে সবচেয়ে হাল্কা আযাবপ্রাপ্ত।' [বুখারী: ৬৫৬২; মুসলিম: ২১৩]

(২) আয়াতের শব্দার্থ করলে "তারা যেন কম হাসে এবং বেশী বেশী কাঁদে" এ বাক্যটি যদিও নির্দেশবাচক পদ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তফসীরবিদ মনীষীবৃন্দ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশবাচক পদ ব্যবহারের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছে যে, এমনি ঘটা অবধারিত ও নিশ্চিত। অর্থাৎ নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তাদের এ আনন্দ ও হাসি হবে অতি সাময়িক। এরপর আখেরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে।[বাগভী; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] এ আয়াতের তফসীরে ইবন আব্বাস থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে "দুনিয়া সামান্য কয়েক দিনের অবস্থানস্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। তারপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে যা আর নিবৃত্ত হবে না।" [ইবন কাসীর]

৮৩. অতঃপর আল্লাহ্ যদি আপনাকে তাদের কোন দলের কাছে ফেরত আনেন এবং তারা অভিযানে বের হওয়ার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন আপনি বলবেন, 'তোমরা তো আমার সাথে কখনো বের হবে না[1] এবং তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে; কাজেই যারা পিছনে থাকে তাদের সাথে বসেই থাক।'

فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا۟ مَعِىَ أَبَدًا وَلَن تُقَـٰتِلُوا۟ مَعِىَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْخَـٰلِفِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. আর তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার জন্য জানাযার

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ

(১) অর্থাৎ এরা যদি ভবিষ্যতে কোন জিহাদে অংশগ্রহনের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না; যখন রওয়ানা হবার সময় হবে, পূর্বেকার মতই নানা রকম ছলছুতার আশ্রয় নেবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নির্দেশ হল যে, তারা নিজেরাও যখন কোন জিহাদে অংশগ্রহনের কথা বলবে, তখন আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতলে দিন যে, তোমাদের কোন কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। তোমরা না যাবে জিহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে ইসলামের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্থিব শাস্তি হিসাবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোন জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরকে অংশগ্রহন করতে দেয়া না হয়। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; আদওয়াউল বায়ান] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদেরকে অনুরূপ ভাল কাজে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা বলবে, 'আমাদেরকে তোমাদের সংগে যেতে দাও ।' তারা আল্লাহ্‌র বাণী পরিবর্তন করতে চায় । বলুন, 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সংগী হতে পারবে না। আল্লাহ্ আগেই এরূপ ঘোষণা করেছেন ।" [সূরা আল-ফাতহ: ১৫] কারণ, তাদের এক অপরাধ অন্য অপরাধকে ডেকে এনেছে, আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, "আর তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ঈমান আনেনি, তেমনি আমরাও তাদের অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহ পাল্টে দেব এবং আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরপাক খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেব" [সূরা আল-আন'আম: ১১০]

عَلٰى قَبْرِهٖ ۗ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

সালাত পড়বেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না [১]; তারা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং ফাসেক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. আর তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে; আল্লাহ্ তো এগুলোর দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান; আর তারা কাফের থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ-ত্যাগ করে[২]।

(১) এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন কাফেরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তার সমাধিতে দাঁড়ানো কিংবা তা যেয়ারত করতে যাওয়া জায়েয নয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কোন মুনাফিকের জানাযায় হাজির হতেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াতেন না। [ইবন কাসীর] আবু কাতাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যখন কোন জানাযা হাজির হতো, তখন তিনি তার সম্পর্কে লোকদের জিজ্ঞেস করতেন, তারা যদি ভালো বলে সত্যয়ন করত তখন তিনি তার উপর সালাত আদায় করতেন। পক্ষান্তরে যদি তারা তার সম্পর্কে অন্য কিছু বলতো, তখন তিনি বলতেন, তোমরা এটাকে নিয়ে কি করবে কর, তিনি নিজে সালাত আদায় করতেন না। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৯৯] অথচ যদি ঈমানদার হতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দো'আ করার জন্য কবরের পাশে দাঁড়াতেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কেউ জানাযার সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবে তার জন্য এক কীরাত, আর যে কেউ সালাত শেষ হওয়ার পর দাফন পর্যন্ত থাকবে তার জন্য দুই কীরাত। বলা হল, কেমন দুই কীরাত? তিনি বললেন, তার ছোটটি ওহুদ পাহাড়ের সমতুল্য। [বুখারী: ১৩২৫; মুসলিম: ৯৪৫] অন্য হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দাফন শেষ করতেন, তখন তার কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও, আর তার জন্য স্থিতি বা দৃঢ়তার জন্য দো'আ কর; কেননা তাকে এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে।' [আবুদাউদ: ৩২২১]

(২) আয়াতে সেসব মুনাফিকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত থেকেছিল। সেসব মুনাফিকের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালী লোকও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলিমদের ধারণা হতে পারত

৮৬. আর 'আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর'---এ মর্মে যখন কোন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের মধ্যে যাদের শক্তিসামর্থ্য আছে তারা আপনার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে, 'আমাদেরকে রেহাই দিন, যারা বসে থাকে আমরা তাদের সাথেই থাকব।'

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُوا۟ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَـْٔذَنَكَ أُو۟لُوا۟ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا۟ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. তারা অন্তঃপুর বাসিনীদের সাথে অবস্থান করাই পছন্দ করেছে এবং তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দেয়া হলো; ফলে তারা বুঝতে পারে না।

رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮. কিন্তু রাসূল এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন

لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟

যে, এরা যখন আল্লাহ্‌র নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নেয়ামত পাবে? এর উত্তরে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তাদের এ ধন- সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন রহ্‌মত ও নেয়ামত নয়; বরং পার্থিবজীবনেও এগুলো তাদের জন্য আযাব বিশেষ। আখেরাতের আযাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে আযাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধন-সম্পদের মহব্বত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা- ভাবনা তাদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোন সময় কোন অবস্থাতেই স্বস্তি পেতে দেয় না। আরাম আয়েশের যত উপকরণই তাদের কাছে থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনের শান্তি ও স্বস্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার এসব ধন-সম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখেরাত সম্পর্কে গাফেল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আযাবের কারণ হিসাবেও এগুলোকে আযাব বলা যেতে পারে। তারা যখন মারা যায় তখনো এগুলোর ভালবাসা তাদের অন্তরে বেশী থাকার কারণে তাদের মৃত্যু হলেও সম্পদ হারানোর কারণে ভীষণ কষ্টে থাকে। এ কারণেই কুরআনের ভাষায় لِيُعَذِّبَهُم بِهَا বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ সমস্ত ধন সম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। সুতরাং এ কথা কক্ষনো ভাবা যাবে না যে, তাদেরকে এগুলো দিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্মানিত করছেন। বরং এগুলো দিয়ে তিনি তাদেরকে অপমানিত করেছেন। [সা'দী; ইগাসাতুল লাহফান]

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে; আর তাদের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

৮৯. আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে; এটাই মহাসাফল্য।

বারতম রুকূ'

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

৯০. আর মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করতে আসল যেন এদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল, তারা বসে রইল, তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে অচিরেই তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাবে[১]।

---

(১) আয়াতের অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, এসব বেদুইন যাযাবরদের মধ্যে দু'রকম লোক ছিল। প্রথমত, যারা ছল–ছুতা পেশ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয় যাতে তাদেরকে জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে অব্যাহতি দান করা হয়। আর কিছু লোক ছিল এমন উদ্ধত যারা অব্যাহতি লাভের তোয়াক্কা না করেই নিজ নিজ অবস্থানে নিজের মতেই বসে থাকে। এতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। [ইবন কাসীর]
আল্লামা সা'দী বলেন, আয়াতের অর্থ, যারা রাসূলের সাথে বের হওয়ার ব্যাপারটি গুরুত্বহীন মনে করেছে এবং বের হতে কসুর করেছে, তাদের অসভ্যতা ও লজ্জাহীনতার কারণে এবং তাদের দুর্বল ঈমানের কারণে, রাসূলের কাছে এসে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল। কিন্তু যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা মনে করেছিল তারা সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে বসে রইল, অব্যাহতি নেয়াও ছেড়ে দিল। অথবা আয়াতে 'ওজর পেশকারীরা' বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের সত্যিকার অর্থেই ওজর ছিল। তারা রাসূলের কাছে ওজর পেশ করার জন্য এসেছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল যে, কেউ ওজর পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। আর যারা অভিযানে

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾

৯১. যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাদের কোন অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়[১]। মুহসিনদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন পথ নেই; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۪ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. আর তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা আপনার কাছে বাহনের জন্য আসলে আপনি বলেছিলেন, 'তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না'; তারা অশ্রুবিগলিত চোখে ফিরে গেল, কারণ তারা খরচ করার মত কিছুই

বের হওয়ার আবশ্যকতা সংক্রান্ত ঈমানের দাবীতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা বলেছিল তারা বসেই রইল, বের হওয়ার ব্যাপারে কোন কাজ করল না। [সা'দী]

(১) এখানে সে সমস্ত নিষ্ঠাবান মুসলিমদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, যারা প্রকৃতই অপরাগতার দরুণ জিহাদে অংশ গ্রহণে অসমর্থ ছিল। এদের মধ্যে কিছু লোক ছিল অন্ধ বা অসুস্থতার কারণে অপারগ এবং যাদের অপরাগতা ছিল একান্ত সুস্পষ্ট। আর কিছু লোক ছিল যারা জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল, বরং জিহাদে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, কিন্তু তাদের কাছে সফর করার জন্য সওয়ারীর কোন জীব ছিল না। বস্তুতঃ সফর ছিল সুদীর্ঘ এবং মওসুমটি ছিল গরমের। তারা নিজেদের জিহাদী উদ্দীপনা এবং সওয়ারীর অভাবে তাতে অংশগ্রহণে অপরাগতার কথা জানিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করে যে, আমাদের জন্য সওয়ারীর কোন ব্যবস্থা করা হোক। তাফসীরের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের একাধিক ঘটনার কথা লেখা হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; আত-তাফসীরুস সহীহ] তবে আয়াতে একটি শর্ত দেয়া হয়েছে যে তাদের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হিতাকাঙ্খী হতে হবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হিতাকাঙ্খাকেই দ্বীন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, দ্বীন হচ্ছে, নসীহত বা হিতাকাঙ্খা, দ্বীন হচ্ছে, হিতাকাঙ্খা, দ্বীন হচ্ছে, হিতাকাঙ্খা, আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম ইমামদের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য। [মুসলিম: ৫৫]

পায়নি[১] ।

৯৩. যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ আছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে থাকাই পছন্দ করেছিল; আর আল্লাহ্ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন, ফলে তারা জানতে পারে না ।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪. তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা তোমাদের কাছে অজুহাত পেশ করবে[২] । বলুন, 'তোমরা অজুহাত

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا

(১) আলোচ্য আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে যাদের অপারগতা আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও যুদ্ধে বের হওয়ার পর যারা আগ্রহ থাকা সত্বেও যুদ্ধে আসতে পারেনি তাদের ব্যাপারটি মনে রাখার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন, মদীনাতে এমন একদল লোক রয়েছে, তোমরা যে উপত্যকাই অতিক্রম কর না কেন, যে জায়গায়ই সফর কর না কেন তারা তোমাদের সাথে আছে । তারা বলল, তারা তো মদীনায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদেরকে ওযর আটকে রেখেছে ।' [বুখারী: ২৮৩৯; মুসলিম: ১৯১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তারা তোমাদের সাথে সওয়াবে শরীক হবে । অসুস্থতা তাদেরকে আটকে রেখেছে' [মুসলিম: ১৯১১; ইবন মাজাহ: ২৭৬৫] এ আয়াতের পরে এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, বিপদ শুধু তাদের ক্ষেত্রে যারা সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও জিহাদে অনুপস্থিত থাকাকে নারীদের মত পছন্দ করে নিয়েছে ।

(২) আব্দুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালেক বলেন, আমি কা'ব ইবন মালেককে তাবুকের যুদ্ধে পিছিয়ে থাকা সম্পর্কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র শপথ! ঈমান আনার পরে আল্লাহ্ আমার উপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সত্য কথা বলার মত নে'আমত আর অন্য কিছু দেন নি । যখন অপরাপর মিথ্যুকরা মিথ্যা কথা বলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । যখন তার কাছে ওহী নাযিল হয়েছিল এ বলে যে, তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে অচিরেই তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্র শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের উপেক্ষা কর । কাজেই তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল । তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও । অতঃপর তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ তো ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না । [বুখারী: ৪৬৭৩]

اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾

পেশ করো না, আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করব না; অবশ্যই আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন এবং তাঁর রাসূলও। তারপর গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে অতঃপর তোমরা যা করতে, তা তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন[১]।'

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۖ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۖ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে অচিরেই তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের উপেক্ষা কর[২]। কাজেই

(১) এ আয়াতে সে সব লোকদের আলোচনা করা হচ্ছে, যারা জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মিথ্যা ওযর আপত্তি পেশ করছিল। এ আয়াতগুলো মদীনায় ফিরে আসার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে পরবর্তী সময়ে সংঘটিতব্য ঘটনার সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আপনি যখন মদীনায় ফিরে যাবেন, তখন মুনাফিকরা ওযর–আপত্তি নিয়ে আপনার নিকট আসবে। [ফাতহুল কাদীর] বস্তুতঃ ঘটনাও তাই ঘটেছিল। এ আয়াতগুলোতে তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, যখন এরা আপনার কাছে ওযর আপত্তি পেশ করার জন্য আসে, আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, মিথ্যা ওযর পেশ করো না। আমরা তোমাদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করব না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা বাতলে দিয়েছেন। ফলে তোমাদের মিথ্যাবাদিতা আমাদের কাছে প্রকৃষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কোন রকম ওযর আপত্তি বর্ণনা করা অর্থহীন। তবে এখনও অবকাশ রয়েছে যেন তারা মুনাফিকী পরিহার করে সত্যিকার মুসলিম হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন যে, তা কি এবং কোন ধরনের হয়। যদি তোমরা তাওবাহ্ করে নিয়ে সত্যিকার মুসলিম হয়ে যাও, তবে সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হবে; তোমাদের পাপ মাফ হয়ে যাবে। অন্যথায় তা তোমাদের কোন উপকারই সাধন করবে না। [দেখুন, তাবারী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(২) এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব লোক আপনার ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম

তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল।

৯৬. তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। অতঃপর তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ তো ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না[১]।

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ٩٦

৯৭. আ'রাব[২] বা মরুবাসীরা কুফরী ও মুনাফেকীতে শক্ত; এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর যা নাযিল করেছেন, তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার অধিক উপযোগী[৩]। আর আল্লাহ্

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٩٧

খেয়ে খেয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাইবে এবং তাতে তাদের উদ্দেশ্য হবে, আপনি যেন তাদের জিহাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং সেজন্য যেন কোন ভর্ৎসনা না করেন। এরই প্রেক্ষিতে এরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের এই বাসনা পূরণ করে দিন। অর্থাৎ আপনি তাদের বিষয় উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভর্ৎসনাও করবেন না কিংবা তাদের সাথে উৎফুল্ল সম্পর্কও রাখবেন না। কারণ, ভর্ৎসনা করে কোন ফায়দা নেই। তাদের মনে যখন ঈমান নেই এবং তার বাসনাও নেই, তখন ভর্ৎসনা করেই বা কি হবে। [দেখুন, তাবারী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(১) এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এরা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে এবং মুসলিমদেরকে রাযী করাতে চাইবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েত দান করেছেন যে, তাদের প্রতি রাযী হবেন না। এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাযী নন। তাছাড়াও তারা যখন নিজেদের কুফরী ও মুনাফিকীর উপরই অটল থাকল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা কেমন করে রাযী হবেন? আর ঈমানদাররাই বা কি করে রাযী হতে পারে, যখন ঈমানদাররা সেটাতেই রাযী হয়ে থাকে যাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল রাযী? [দেখুন, তাবারী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(২) أعراب শব্দটি عرب শব্দের বহুবচন নয়; বরং এটি একটি শব্দ পদ বিশেষ যা শহরের বাইরের অধিবাসীদের বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর একজন বুঝাতে হলে أعرابي বলা হয়। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) আলোচ্য আয়াতে মরুবাসী বেদুঈনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা কুফরী ও

সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৯৮. আর মরুবাসীদের কেউ কেউ, যা তারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তা জরিমানা গণ্য করে এবং তোমাদের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। তাদের উপরই হোক নিকৃষ্টতম বিপর্যয় (১)। আর আল্লাহ্

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

মুনাফিকীর ব্যাপারে শহরবাসী অপেক্ষাও বেশী কঠোর। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এরা এলম ও আলেম তথা জ্ঞান ও জ্ঞানী লোকদের থেকে দূরে অবস্থান করে। ফলে এরা আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কারণ, না কুরআন তাদের সামনে আছে, না তার অর্থ মর্ম ও বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে, বিশেষ করে যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন। এ জন্যই কাতাদা বলেন, এখানে রাসূলের সুন্নাত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] এক হাদীসেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'যে কেউ মরুবাসী হবে সে অসভ্য হবে, যে কেউ শিকারের পিছনে ছুটবে সে অন্যমনস্ক হবে, আর যে কেউ ক্ষমতাশীনদের কাছে যাবে সে ফিৎনায় পড়বে।" [আবুদাউদ: ২৮৫৯] আর যেহেতু অসভ্যতা বেদুঈনদের সাধারণ নিয়ম, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্য থেকে কোন নবী-রাসূল পাঠান নি। আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা আপনার আগে কেবল জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকে রাসূল বানিয়েছিলাম" [সূরা ইউসুফ: ১০৯] অন্য হাদীসে এসেছে, একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু হাদীয়া দেয়। তিনি তাকে রাজী করতে দ্বিগুণ প্রদান করেন। তখন তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, হাদীয়া শুধু কুরাইশী অথবা সাকাফী অথবা আনসারী বা দাওসী থেকেই নেব।' [তিরমিযী: ৩৯৪৫] কারণ এ গোত্রগুলো লোকালয়ে বাস করার কারণে তাদের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতি রয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতেও এ সমস্ত বেদুঈনেরই একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা যাকাত, জিহাদ প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে এক প্রকার জরিমানা বলে মনে করে। তার কারণ, তাদের অন্তরে তো ঈমান নেই, শুধু নিজেদের কুফরীকে লুকাবার জন্য সালাতও পড়ে নেয় এবং ফরয যাকাতও দিয়ে দেয়। কিন্তু মনে এ কালিমা থেকেই যায় যে, এ অর্থ অনর্থক খরচ হয়ে গেল। আর সেজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, কোন রকমে মুসলিমদের উপর কোন বিপদ নেমে আসুক এবং তারা পরাজিত হয়ে থাক; তাহলেই আমাদের এহেন অর্থদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উত্তরে বলছেন, তাদেরই উপর মন্দ অবস্থা আসবে। আর এরা নিজেদের সেসব কাজ কর্ম ও কথাবার্তার কারণে অধিকতর অপমানিত। মুমিনদের

সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৯৯. আর মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও রাসূলের দো'আ লাভের উপায় গণ্য করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় তা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উপায়; অচিরেই আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন[১]। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾

জন্য রয়েছে তাদের শত্রুদের বিপরীতে উত্তম ফলাফল। [দেখুন, আইসারুত তাফাসীর; সা'দী]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সে সব বেদুঈনের আলোচনা সংগত মনে করেছেন যারা সত্যিকার ও পাকা মুসলিম। আর তা এজন্য যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, সব বেদুঈনই এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক আছে। তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা যে যাকাত-সদকা দেয়, তাকে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দো'আ প্রাপ্তির আশায় দিয়ে থাকে। ইবন আব্বাস বলেন, এখানে ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ বলে রাসূল তাদের জন্য যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন সেটা বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

(২) আলোচ্য আয়াত থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা পাই। এক. বেদুঈনরাও শহরবাসীর মতই। তাদের মধ্যেও ভালো-খারাপ উভয় ধরনের লোক রয়েছে। সুতরাং তারা বেদুঈন হয়েছে বলেই তাদের দুর্নাম করা হয়নি। বরং তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ না জানাটাই তাদের নিন্দার কারণ। দুই. কুফর ও নিফাক অবস্থাভেদে বেশী, কম, কঠোর ও হাল্কা হয়ে থাকে। তিন. এ আয়াত দ্বারা ইলমের সম্মান বুঝা যাচ্ছে। যার ইলম নেই সে ক্ষতির অধিক নিকটবর্তী সে লোকের তুলনায়, যার কাছে ইলম আছে। আর এজন্যই আল্লাহ্ তাদের নিন্দা করেছেন। চার. এ আয়াত থেকে আরও বুঝা যায় যে, উপকারী ইলম সেটাই যা মানুষের কাজে লাগে। যা থাকলে মানুষ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা জানতে পারে। যেমন, ঈমান, ইসলাম, ইহসান, তাকওয়া, সফলতা, আনুগত্য, সৎ, সুসম্পর্ক সম্পর্কে জ্ঞান। অনুরূপভাবে, কুফর, নিফাক, ফিসক, অবাধ্যতা, ব্যভিচার, মদ, সুদ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা; কেননা এগুলো জানলে আল্লাহ্‌র নির্দেশগুলো মানা যায়, আর নিষেধকৃত বস্তুগুলো পরিত্যাগ করা যায়। পাঁচ. ঈমানদারের উচিত তার কর্তব্যকর্ম অত্যন্ত খুশীমনে আদায় করা। সে সবসময় খেয়াল রাখবে যে সে এগুলো করতে পেরে লাভবান, ক্ষতিগ্রস্ত নয়। [সা'দী]

তেরতম রুকূ‘

১০০. আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী(১) এবং যারা

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

(১) এ আয়াতে সাহাবাদের প্রশংসায় আল্লাহ্ তা‘আলা “সাবেকীন আওয়ালীন” বা ‘প্রথম অগ্রগামী’ শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ “সাবেকীন আওয়ালীন কারা তা নির্ধারণে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

ক) কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এ আয়াতে “সাবেকীন আওয়ালীন” এর পরে ﴿مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ﴾ বাক্যে ব্যবহৃত مِن অব্যয়টি কারো কারো মতে تبعيض বা কিছু সংখ্যক বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ তাফসীর অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের দু’টি শ্রেণী সাব্যস্ত হয়েছে। একটি হল সাবেকীনে আওয়ালীনের, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কেবলা পরিবর্তন কিংবা বদরযুদ্ধ অথবা বাইআতে রেদওয়ান অথবা মক্কা বিজয়ের পরে যারা মুসলিম হয়েছে তারা সবাই। তখন সাহাবাগণ দু’শ্রেণীতে বিভক্ত হবেন, এক) মুহাজেরীন ও আনসারদের মধ্যে যারা “সাবেকীন আওয়ালীন” বা ঈমান গ্রহণে ও হিজরতে অগ্রবর্তী। দুই) অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম। এ তাফসীর অনুসারে সাহাবাদের মধ্যে কারা “সাবেকীন আওয়ালীন বলে গণ্য হবেন এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি মত রয়েছেঃ ১) কোন কোন মনীষী সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে “সাবেকীন আওয়ালীন তাদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা উভয় কেবলা অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস ও কা‘বার দিকে মুখ করে সালাত পড়েছেন। অর্থাৎ যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে মুসলিম হয়েছে তাদেরকে “সাবেকীন আওয়ালীন” গণ্য করেছেন। এমনটি হল সাঈদ ইবন মুসাইয়্যেব ও কাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু– এর মত। [কুরতুবী] ২) আতা ইবন আবী রাবাহ্ বলেছেন যে, ‘সাবেকীনে আওয়ালীন’ হলেন সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। [কুরতুবী] ৩) ইমাম শা‘বী রাহিমাহুল্লাহ্ এর মতে যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারাই ‘সাবেকীন আওয়ালীন’। [কুরতুবী] লক্ষণীয় যে, সবার নিকটই যারা কিবলা পরিবর্তনের আগে হিজরত করেছেন তারা নিঃসন্দেহে ‘সাবেকীন আওয়ালীন’। আর যারাই বাই‘আতে রিদওয়ান তথা হুদায়বিয়ার পরে হিজরত করেছেন তারা সবার মত অনুযায়ীই মুহাজির হোক বা আনসার সাবেকীনে আওয়ালীনের পর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে যারা হিজরত করেছে তারা সবাই সাবেকীনে আওয়ালীন। [ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ: ১/১৫৪-১৫৫]

খ) কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এ আয়াতে مِنْ অব্যয়টি আংশিক বুঝাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি বরং বিবরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর মর্ম হবে এই যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম অন্যান্য সমস্ত উম্মতের তুলনায় সাবেকীনে আওয়ালীন। এ তাফসীরের মর্ম হল এই যে, সাহাবায়ে কেরামই হলেন মুসলিমদের মধ্যে সাবেকীনে আওয়ালীন। কারণ, ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাঁরাই সমগ্র উম্মতের অগ্রবর্তী ও প্রথম। পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত সবাই তাবেয়ীন বা তাদের অনুসারী [ফাতহুল কাদীর]

ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে[১] আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন[২]। আর তিনি তাদের জন্য

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٠٠

(১) অর্থাৎ যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে অগ্রবর্তী মুসলিমদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে। উপরোক্ত প্রথম তফসীর অনুযায়ী 'যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে বলে হুদায়বিয়ার সন্ধি পরবর্তী সে সমস্ত সাহাবা এবং মুসলিম, যারা কেয়ামত অবধি ঈমান গ্রহণ, সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর চলবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাদের অনসুরণ করবে। [কুরতুবী] আর উপরোক্ত দ্বিতীয় তফসীর অনুযায়ী এর দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলিমগণ অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পারিভাষিকভাবে 'তাবেয়ী' বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেয়ীগণের পর কেয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলিমও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত। যদি দুনিয়াতে তাদের কারো দ্বারা কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। এর প্রমাণ হলো কুরআন করীমের এ আয়াত। এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত সাহাবা সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, ﴿رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ﴾ অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে বলেছেনঃ ﴿وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ "যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করেছে"। সুতরাং তাবেয়ীনদের ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের পরিপূর্ণ সুন্দর অনুসরণের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সবাই কোন রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিধন্য। এ ব্যাপারে আরও প্রমাণ হলো, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ অবশ্যই আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন মুমিনদের থেকে, যখন তারা গাছের নীচে আপনার হাতে বাই'আত হচ্ছিল"। [সূরা আল-ফাত্হঃ ১৮]। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মুজাদালাহ্‌র ২২ নং আয়াতেও সাহাবাদের প্রশংসা করে তাদের উপর সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন। এছাড়াও সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে আরো স্পষ্ট দলীলের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ্‌র বাণীঃ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ﴾ "মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ 'হুসনা' বা সবচেয়ে ভাল পরিণামের ওয়াদা করেছেন"। [সূরা আন-নিসাঃ ৯৫]। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র আরো বলেনঃ ﴿لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۚ أُولٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ﴾ "তোমাদের মধ্যে

তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।

১০১. আর মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশপাশে আছে তাদের কেউ কেউ মুনাফেক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, তারা মুনাফেকীতে চরমে পৌঁছে গেছে। আপনি তাদেরকে জানেন না[১]; আমরা তাদেরকে জানি। অচিরেই আমরা তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব তারপর তাদেরকে মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

১০২. আর অপর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এক সৎকাজের সাথে অন্য অসৎকাজ মিশিয়ে ফেলেছে; আল্লাহ্ হয়ত

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾

যারা ফাতহ তথা হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের চেয়ে, যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। [সূরা আল-হাদীদঃ১০]। এতে বিস্তারিত এভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হোন কিংবা পরবর্তী পর্যায়ের, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সবার জন্যই জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

(১) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, "আর আমরা ইচ্ছে করলে আপনাকে তাদের পরিচয় দিতাম; ফলে আপনি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন। তবে আপনি অবশ্যই কথার ভংগিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন।" [সূরা মুহাম্মাদ:৩০] এবং বিভিন্ন হাদীসে যে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ১৪ বা ১৫ জনের নাম জানিয়ে দিয়েছেন সেটার সাথে এ আয়াতের কোন দ্বন্ধ নেই। কারণ, সূরা মুহাম্মাদের আয়াতে তাদের চিহ্ন বলে দেয়া উদ্দেশ্য, সবাইকে জানা নয়। অনুরূপভাবে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যাদের নাম জানিয়েছেন তা দ্বারাও এটা সাব্যস্ত হচ্ছে না যে, তিনি সবার নাম ও পরিচয় পূর্ণভাবে জানতেন। [ইবন কাসীর]

তাদেরকে ক্ষমা করবেন[১]; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

(১) যে দশজন মুমিন বিনা ওযরে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন তাঁদের সাত জন মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন । এদের উল্লেখ রয়েছে এ আয়াতে । ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, দশজন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি । এদের মধ্যে সাতজন নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিল । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা, যারা নিজেদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধেছে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এরা আবু লুবাবা ও তার কিছু সাথী । যারা আপনার সাথে যাওয়া থেকে পিছনে ছিল । তারা নিজেদেরকে নিজেরা বেঁধে নিয়েছে এ বলে যে, যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আমাদের বাঁধন খুলে দিবেন এবং আমাদের ওযর কবুল করবেন, ততক্ষণ আমাদেরকে যেন কেউ না খুলে দেয় । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমিও তাদের বাঁধন খুলব না, তাদের ওযর গ্রহণ করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ নিজেই তাদের ছেড়ে দেন বা ওযর গ্রহণ করেন । তারা আমার থেকে বিমুখ ছিল, মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে যায়নি । যখন তাদের কাছে এ কথা পৌঁছল তারাও বলল, আমরাও আল্লাহ্‌র শপথ নিজেদেরকে ছাড়িয়ে নেব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাদের ছাড়ানোর ব্যবস্থা না করেন । তখন এ আয়াত নাযিল হয় । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নেন । [আত-তাফসীরুস সহীহ] ঘটনা যদিও সুনির্দিষ্ট তথাপি এর দাবী ব্যাপক । যারাই ভাল ও মন্দ আমলের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য । যেমন হাদীসে এসেছে, সামুরা ইবন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, গত রাত্রে আমার কাছে দুজন এসেছেন, তারা আমাকে উঠালেন, তারপর আমাকে নিয়ে এমন এক নগরীতে নিয়ে গেলেন যার একটি ইট স্বর্ণের অপরটি রৌপ্যের । সেখানে আমরা কিছু লোক দেখলাম, যাদের শরীরের একাংশ এত সুন্দর যত সুন্দর তুমি মনে করতে পার । আর অপর অংশ এত বিশ্রী যত বিশ্রী তুমি মনে করতে পার । তারা দু'জন তাদেরকে বলল, তোমরা ঐ নালাতে গিয়ে পতিত হও । তারা সেখানে পড়ল । তারপর যখন তারা আমাদের কাছে আসল, দেখলাম যে, তাদের খারাপ অংশ চলে গেছে, অতঃপর ভীষণ সুন্দর হয়ে গেছে । তারা দু'জন আমাকে বলল, এটা হলো জান্নাতে আদন । আর ওখানেই আপনার স্থান । তারা দু'জন বলল, আর যাদেরকে আপনি অর্ধেক সুন্দর আর বাকী অর্ধেক বিশ্রী দেখেছেন, তারা হচ্ছেন,'যারা এক সৎকাজের সাথে অন্য অসৎকাজ মিশিয়ে ফেলেছে ।' [বুখারী: ৪৬৭৪]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

১০৩. আপনি তাদের সম্পদ থেকে ‘সদকা’ গ্রহণ করুন[১]। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দো‘আ করুন। আপনার দো‘আ তো তাদের জন্য প্রশান্তি কর[২]। আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

---

(১) মুফাসসিরগণ এ সাদকার প্রকৃতি নির্ধারণ নিয়ে দুটি মত দিয়েছেন। কারও কারও মতে, এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের তাওবাহ কবুল করা হয়েছে তাদের সদকা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। সেটা ফরয বা নফল যে কোন সদকা হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] এ মতের সমর্থনে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন পূর্বোক্ত লোকদের তাওবা কবুল করা হয়, তখন তারা তাদের সম্পদ নিয়ে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো আমাদের সম্পদ, এগুলো গ্রহণ করে আমাদের পক্ষ থেকে সদকা দিন এবং আমাদের জন্য ক্ষমার দো‘আ করুন। তিনি বললেন, আমাকে এর নির্দেশ দেয়া হয়নি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] তবে অধিকাংশের মতে, নির্দেশটি ব্যাপক, সবার জন্যই প্রযোজ্য। তবে সেটা ফরয সদকা বা যাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। [ফাতহুল কাদীর] এ মতের সমর্থনে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে, যাতে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাত প্রদানকারীদের জন্য দো‘আ করেছেন।

(২) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশ মোতাবেক সাহাবীদের মধ্যে কেউ যাকাত নিয়ে আসলে তাদের পরিবারের জন্য দো‘আ করতেন। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবি আওফা বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা যাকাত নিয়ে আসলে তিনি বলতেন, ‘আল্লাহুম্মা সাল্লে ‘আলা আলে ফুলান’। (হে আল্লাহ্‌! অমুকের বংশধরের জন্য সালাত প্রেরণ করুন) অতঃপর আমার পিতা তার কাছে যাকাত নিয়ে আসলে তিনি দো‘আ করলেন, আল্লাহুম্মা সাল্লে ‘আলা আলে আবি আওফা’। হে আল্লাহ্‌! আবু আওফার বংশধরের জন্য সালাত প্রেরণ করুন) [বুখারী: ১৪৯৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি আমার ও আমার স্বামীর জন্য দো‘আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘সাল্লাল্লাহু আলাইকে ওয়া ‘আলা যাওজিকে’। (আল্লাহ্‌ তোমার ও তোমার স্বামীর জন্য সালাত প্রেরণ করুন)। [আবু দাউদ: ১৫৩৩]

১০৪. তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তাওবাহ্ কবুল করেন এবং 'সদকা' গ্রহণ করেন[১], আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু?

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ
وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ
ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

১০৫. আর বলুন, 'তোমরা কাজ করতে থাক; আল্লাহ্ তো তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।'

وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ
وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ
وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. আর আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কিছু সংখ্যক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়া হল---তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন, না ক্ষমা করবেন[২]। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا
يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

---

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন তার সম্পূর্ণ পবিত্র সম্পদ থেকে কোন একটি খেজুর সদকা করে তখন সেটি আল্লাহ্ নিজ ডান হাতে গ্রহণ করেন, তারপর সেটা আল্লাহ্‌র হাতে এমনভাবে বেড়ে উঠে যে পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড হয়ে পড়ে।' [মুসলিম: ১০১৪]

(২) এখানে পূর্বোল্লেখিত দশ জন সাহাবী যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশ নেয়নি এবং মসজিদের স্তম্ভের সাথে নিজেদের বেঁধে নেয়নি এমন বাকী তিন জনের হুকুম রয়েছে। এ আয়াত নাযিল করে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। এক বছর পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা ছিল। তাদেরকে কি শাস্তি দেয়া হবে, নাকি তাদের তাওবা কবুল করা হবে তা তারা জানে না। [আত-তাফসীরুস সহীহ] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সমাজচ্যুত করার, এমনকি তাঁদের সাথে সালাম-দোয়ার আদান প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর তাদের অবস্থা শোধরে যায় এবং তারা এখলাসের সাথে অপরাধ স্বীকার করে তাওবাহ্ করে নেন। ফলে তাদের জন্য ক্ষমার আদেশ দেয়া হয়। যার আলোচনা অচিরেই আসবে।

১০৭. আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন[১], কুফরী ও মুমিনদের

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا

(১) মদীনায় আবু 'আমের নামের এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে নাসারা ধর্ম গ্রহণ করে আবু 'আমের পাদ্রী নামে খ্যাত হলো । তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহু যার লাশকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন । কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও নাসারাদের দ্বীনের উপরই ছিল । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হলে আবু 'আমের তার কাছে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিযোগের জবাব দান করেন । কিন্তু তাতে সেই হতভাগার সান্তনা আসলো না । তদুপরি সে বলল, 'আমরা দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে ।' সে একথাও বলল যে, আপনার যে কোন প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাবো । সে মতে হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলিমদের বিপরীতে অংশ নেয় । হাওয়াযেনের মত সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলিমদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় চলে গেল । [বাগভী] কারণ, তখন এটি ছিল নাসারাদের কেন্দ্রস্থল ।

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে যে, "রোম সম্রাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি । কিন্তু যথা সময় সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোন সম্মিলিত শক্তি তোমাদের থাকা চাই । এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদীনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মুসলিমদের অন্তরে কোন সন্দেহ না আসে । তারপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ–সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর । তারপর আমি রোম সম্রাটকে নিয়ে এসে মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের উৎখাত করব ।" [তাবারী]

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফিক মদীনার কুবা মহল্লায়, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন– সেখানে সে মুনাফিকরা আরেকটি মসজিদের ভিত্তি রাখল । [ইবন হিশাম, কুরতুবী; ইবন কাসীর প্রমুখ ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণ এ বার জনের নাম উল্লেখ করেছেন] তারপর তারা মুসলিমদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা এক ওয়াক্ত সালাত সেখানে পড়াবে । এতে মুসলিমগণ নিশ্চিত হবে যে, পুর্বনির্মিত মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ । এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করে যে, কুবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে । দূর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর । এছাড়া মসজিদটি এমন প্রশস্তও নয় যে,

وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এর আগে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে তার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে(১), আর তারা অবশ্যই শপথ করবে, 'আমরা কেবল ভালো চেয়েছি;' আর আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী।

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আপনি তাতে কখনো সালাতের জন্য দাঁড়াবেন না(২); যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাক্‌ওয়ার

এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন, তবে আমরা ধন্য হব। [বাগভী; ইবন কাসীর]

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে আছি। ফিরে এসে সালাত আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদে দ্বিরার সম্পর্কিত এই আয়াতগুলো নাযিল হয়। এতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া হল। আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবীকে এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশমতে তারা গিয়ে মসজিদটি সমুলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। [বাগভী; সীরাতে ইবন হিশাম; ইবন কাসীর]

(১) এখানে এ মাসজিদ নির্মাণের মোট চারটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথমতঃ মুসলিমদের ক্ষতিসাধন। দ্বিতীয়তঃ কুফরী করার জন্য, তৃতীয়তঃ মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা। চতুর্থতঃ সেখানে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের আশ্রয় মিলবে যেন আবু আমের আর রাহেব এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারবে। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে মসজিদে দাঁড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে দাঁড়ানো থেকে নিষেধ করার অর্থ, আপনি সে মসজিদে কখনো সালাত আদায় করবেন না। [ইবন কাসীর]

উপর[১], তাই আপনার সালাতের জন্য দাড়ানোর বেশী হকদার। সেখানে এমন লোক আছে যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে, আর পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন[২]।

১০৯. যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি আল্লাহ্র তাকওয়া ও সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্বংসোন্মুখ কিনারে, ফলে যা তাকেসহ

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

(১) প্রশংসিত সে মসজিদ কোনটি, তা নির্ণয়ে দু'টি মত রয়েছে, কোন কোন মুফাসসির আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তা হলো মসজিদে কুবা। [ইবন কাসীর; সা'দী] যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সালাত আদায় করতে আসতেন। [মুসলিম: ১৩৯৯] যার কেবলা জিবরীল নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন [আবুদাউদ: ৩৩; তিরমিযী: ৩১০০; ইবন মাজাহ: ৩৫৭] যেখানে সালাত আদায় করলে উমরার সওয়াব হবে বলে ঘোষণা করেছেন। [তিরমিযী: ৩২৪; ইবন মাজাহ: ১৪১১] হাদীসের কতিপয় বর্ণনা থেকেও এটিই যে তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত মসজিদ সে কথার সমর্থন পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এ মসজিদ বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ উল্লেখ করা হয়েছে। [উদাহরণস্বরূপ দেখুন, মুসলিম: ১৩৯৮; মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৩১] বস্তুত: এ দু'য়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ উভয় মাসজিদই তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [কুরতুবী; সা'দী]

(২) এখানে সেই মসজিদকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার ভিত্তি শুরু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসেবে মসজিদে কুবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসল্লীগণ পাক-পবিত্রতা অর্জনে সবিশেষ যত্নবান। পাক-পবিত্রতা বলতে এখানে সাধারণ না-পাকী ও ময়লা থেকে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া বুঝায়। আর মসজিদে নববীর মুসল্লীগণ সাধারণতঃ এসব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবাবাসীদের বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ পবিত্রতার ব্যাপারে তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তোমরা কিভাবে পবিত্র হও? তারা বলল, আমরা সালাতের জন্য অযু করি, জানাবাত থেকে গোসল করি এবং পানি দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করি। [ইবন মাজাহ: ৩৫৫]

জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়ে? আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

১১০. তাদের ঘর যা তারা নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে- যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

চৌদ্দতম রুকূ'

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের হক ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্‌র চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও। আর সেটাই তো মহাসাফল্য[১]।

(১) আয়াতের শুরুতে ক্রয় শব্দের ব্যবহার করা হয়। মুসলিমদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয় বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়; কেননা, এর দ্বারা অস্থায়ী জান-মালের বিনিময়ের স্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। মালামাল হলো আল্লাহ্‌রই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে অর্থ সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেয়া সে অর্থের বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করেন। তাই উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'এ এক অভিনব বেচা-কেনা, মালও মূল্য উভয়ই তোমাদেরকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ্। [বগভী] হাসান বসরী বলেন, 'লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ্ সকল মুমিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন'। [বগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও। [বগভী] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির জন্য জামিন

১১২. তারা[১] তাওবাহ্‌কারী, 'ইবাদাতকারী, আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী[২], রুকূ'কারী, সিজ্‌দাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী[৩]; আর

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

হয়ে যান যিনি তাঁর রাস্তায় বের হয়। তাকে শুধুমাত্র আমার রাহে জিহাদই এবং আমার রাসূলের উপর বিশ্বাসই বের করেছে। আল্লাহ তার জন্য দায়িত্ব নিয়েছেন যে, যদি সে মারা যায় তবে তাকে জান্নাত দিবেন অথবা সে যা কিছু গনীমতের মাল পেয়েছে এবং সওয়াব পেয়েছে তা সহ তাকে তার সে ঘরে ফিরে পৌঁছিয়ে দিবেন যেখান থেকে বের হয়েছে'। [বুখারী: ৩১২৩; মুসলিম: ১৮৭৬]।

(১) এ গুণাবলী হলো সেসব মুমিনের যাদের সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে– 'আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন'। আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। তবে এখানে যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তরূপে নয়। কারণ, আল্লাহ্‌র রাহে কেবল জিহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত, তারা এ সকল গুণের অধিকারী হয়। [কুরতুবী]

(২) অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে আয়াতে উল্লেখিত السائحون দ্বারা উদ্দেশ্য সাওম পালনকারীগণ। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ ও আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, কুরআন মজীদে ব্যবহৃত سائحين শব্দের অর্থ রোযাদার। [বগভী; কুরতুবী] তাছাড়া سائح বলে জিহাদকারীদেরকেও বুঝায়। তবে মূল শব্দটি سياحة যার অর্থঃ দেশ ভ্রমণ। বিভিন্ন ধর্মের লোক দেশ ভ্রমণকে ইবাদাত মনে করতো। অর্থাৎ মানুষ পরিবার পরিজন ও ঘর–বাড়ী ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। ইসলাম একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে [ইবন কাসীর] এর পরিবর্তে সিয়াম পালনের ইবাদতকে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আবার কতিপয় বর্ণনায় জিহাদকেও দেশ ভ্রমনের অনুরূপ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমার উম্মতের দেশভ্রমণ হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।' [আবুদাউদ: ২৪৮৬]

(৩) আলোচ্য আয়াতে মুমিন মুজাহিদের আটটি গুণ উল্লেখ করে নবম গুণ হিসেবে বলা হয়েছে "আর আল্লাহ্‌র দেয়া সীমারেখার হেফাযতকারী" মূলতঃ এতে রয়েছে উপরোক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ। অর্থাৎ সাতটি গুণের মধ্যে যে তাফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো যে, এরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরী'আতের হুকুমের অনুগত ও তার হেফাযতকারী। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

আপনি মুমিনদেরকে শুভ সংবাদ দিন ।

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾

১১৩. আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী[১] ।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿١١٤﴾

১১৪. আর ইব্‌রাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; তারপর যখন এটা তার কাছে সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন ইব্‌রাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন । ইব্‌রাহীম তো কোমল হৃদয়[২] ও সহনশীল ।

---

(১) কোন কোন বর্ণনায় এসেছে এ আয়াত আবু তালেবের মৃত্যুর সাথে সম্পর্কযুক্ত । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন । তখন এ আয়াত নাযিল হয় । [দেখুন, বুখারী: ৪৬৭৫; মুসলিম: ২৪] অন্য বর্ণনায় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এসেছে, তিনি বলেন, এক লোককে তার পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা চাইতে দেখলাম । অথচ তারা ছিল মুশরিক । আমি বললাম, তারা মুশরিক হওয়া সত্বেও তুমি কি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছ? সে বলল, ইবরাহীম কি তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন নি? তখন এ আয়াত নাযিল হয় । [তিরমিযী]

(২) (أواه) শব্দটির অর্থ নির্ধারণে কয়েকটি মত এসেছে । ইবন মাসউদ ও উবাইদ ইবন উমায়রের মতে এর অর্থ, বেশী বেশী প্রার্থনাকারী । হাসান ও কাতাদা বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি বেশী দরদী । ইবন আব্বাস বলেন, এটি হাবশী ভাষায় মুমিনকে বোঝায় । কালবী বলেন, এর অর্থ যিনি জনমানবশূণ্য ভূমিতে আল্লাহকে আহ্বান করে । কারও কারও মতে, বেশী বেশী যিকিরকারী । কারও কারও মতে, ফকীহ । আবার কারও কারও মতে বিনয়ী ও বিনম্র । কারও কারও মতে, এর অর্থ এমন ব্যক্তি যে নিজের গোনাহের কথা স্মরণ হলেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে । কারও কারও মতে এর অর্থ, যিনি আল্লাহ্ যা অপছন্দ করেন তা থেকে সর্বদা প্রত্যাবর্তন করতে থাকে । কারও কারও মতে এর অর্থ, যিনি কল্যাণের কথা মানুষদের শিক্ষা দেন । তবে এ শব্দটির মূল অর্থ যে বেশী বেশী আহ্ আহ্ বলে কোন গোনাহ হয়ে গেলে আফসোস করতে থাকে । মনে ব্যথা অনুভব হতে থাকে এবং এর জন্য তার মন থেকে আফসোসের শব্দ হতে থাকে । [ফাতহুল কাদীর]

১১৫. আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে হিদায়াত দানের পর তাদেরকে বিভ্রান্ত করবেন--- যতক্ষণ না তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন, যা থেকে তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করবে তা; নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ্, আসমান ও যমীনের মালিকানা তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন এবং তিনি মৃত্যু ঘটান। আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।

اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾

১১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা তার অনুসরণ করেছিল সংকটময় মুহূর্তে[১]- তাদের এক দলের হৃদয়

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ

(১) কুরআন মজীদ তাবুক যুদ্ধের সময়টিকে ‘সঙ্কটকময় মুহুর্ত’ বলে অভিহিত করেছে। কারণ, সে সময় মুসলিমরা বড় অভাব-অনটনে ছিলেন। সে সময় তাদের না ছিল পর্যাপ্ত বাহন। দশ জনের জন্য ছিল একটি মাত্র বাহন, যার উপর পালা করে তাঁরা আরোহণ করতেন। তদুপরি সফরের সম্বলও ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। অন্যদিকে ছিল গ্রীষ্মকাল, পানিও ছিল পথের মাত্র কয়েকটি স্থানে এবং তাও অতি অল্প পরিমাণে। এমনকি কখনও কখনও একটি খেজুর দু’জনে ভাগ করে নিতেন। কখনও আবার খেজুর শুধু চুষে নিতেন। তাই আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করেছেন, তাদের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেছেন। [ইবন কাসীর] এ যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে ইবন আব্বাস উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তাবুকের যুদ্ধে বের হলাম। আমরা এক স্থানে অবস্থান নিলাম। আমাদের পিপাসার বেগ প্রচণ্ড হল। এমনকি আমরা মনে করছিলাম যে, আমাদের ঘাঁড় ছিড়ে যাবে। এমনকি কোন কোন লোক পানির জন্য বের হয়ে ফিরে আসত, কিন্তু কিছুই পেত না। তখন পিপাসায় তার ঘাড় ছিড়ে যাবার উপক্রম হতো। এমনকি কোন কোন লোক তার উট যবাই করে সেটার ভূড়ি নিংড়ে তা পান করত। আর কিছু বাকী থাকলে সেটা কলজের উপর বেঁধে রাখত। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে

فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٧﴾

সত্যচ্যুত হওয়ার উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করলেন; নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۗ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ

১১৮. আর তিনি তাওবা কবুল করলেন অন্য তিনজনেরও[১], যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো দেখেছি, আপনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করলে কল্যাণ লাভ করি। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দো'আ করুন। তিনি বললেন, তুমি কি তা চাও? আবু বকর বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু' হাত উঠালেন। হাত গোটানোর আগেই একখণ্ড মেঘ আমাদের ছায়া দিল এবং সেখান থেকে বৃষ্টি পড়ল। সবাই তাদের সাথে যা ছিল তা পূর্ণ করে নিল। তারপর আমরা অবস্থা দেখতে গেলাম, দেখলাম যে, আমাদের সেনাবাহিনীর বাইরে আর কোন বৃষ্টি নেই। [ইবন হিব্বান: ১৩৮৩]

(১) এরা তিন জন হলেন কা'আব ইবন মালেক, মুরারা ইবন রবি' এবং হেলাল ইবন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাঁরা তিন জনই ছিলেন আনসারদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। যাঁরা ইতিপূর্বে বাই'আতে 'আকাবা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্রে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফিকরা কপটতার দরুন এ যুদ্ধে শরীক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুললো তারপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহর সোর্পদ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হলেন, ফলে তারা দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে আর ঐ তিন সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারা ও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাঁদের বিবেক সায় দিল না। কারণ, প্রথম অপরাধ ছিল জিহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহ্র নবীর সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিস্কার ভাষায় তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন যে অপরাধের সাজা স্বরূপ তাদের সমাজ চ্যুতির আদেশ দেয়া হয়। আর এদিকে কুরআন মজীদ সকল গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়। অত্র সুরার ৯৪ থেকে ৯৮ আয়াত পর্যন্ত রয়েছে এদের অবস্থাও নির্মম পরিণতির বর্ণনা। কিন্তু যে তিন জন সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, এ আয়াতটি তাঁদের তাওবাহ্ কবুল হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিসহ অবস্থা ভোগের পর তারা আবার আনন্দিত মনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ۚ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۚ إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾

স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না যমীন বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সেটা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল আর তারা নিশ্চিত উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য তিনি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। তারপর তিনি তাদের তাওবাহ্ কবুল করলেন যাতে তারা তাওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

পনরতম রুকূ‘

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক[১]।

ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন। [এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে তাবারী; বাগভী; ইবন কাসীর প্রমূখগণ বর্ণনা করেছেন]

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জিহাদ থেকে বিরত থাকায় যে ত্রুটি কতিপয় নিষ্ঠাবান সাহাবীর দ্বারাও হয়ে গেল এবং পরে তাঁদের তাওবাহ্ কবুল হলো, এ ছিল তাঁদের তাকওয়ারই ফলশ্রুতি। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে সমস্ত মুসলিমকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর "তোমরা সবাই সত্যবাদীদের সাথে থাক" বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য এবং তাদের অনুরূপ আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভ হয়। আর এভাবেই কেউ ধ্বংস থেকে মুক্তি পেতে পারে। প্রতিটি বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারে। [ইবন কাসীর] হাদীসেও সত্যবাদিতার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর; কেননা সত্যবাদিতা সৎকাজের দিকে নিয়ে যায়, আর সৎকাজ জান্নাতের পথনির্দেশ করে। মানুষ সত্য বলতে থাকে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করতে থাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে সত্যবাদী হিসেবে লিখা হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক; কেননা মিথ্যা পাপের পথ দেখায়, আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, আর একজন মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা বলার চেষ্টায় থাকে শেষ পর্যন্ত তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখা হয়।" [বুখারীঃ ৬০৯৪; মুসলিম; ২৬০৭]

১২০. মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সহগামী না হয়ে পিছনে রয়ে যাবে এবং তার জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করবে; কারণ আল্লাহ্‌র পথে তাদেরকে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা পেয়ে বসে এবং কাফেরদের ক্রোধ উদ্রেক করে তাদের এমন প্রতিটি পদক্ষেপ আর শত্রুদেরকে কোন কষ্ট প্রদান করে[১], তা তাদের জন্য সৎকাজরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহসিনদের কাজের প্রতিফল নষ্ট করেন না।

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১. আর তারা ছোট বা বড় যা কিছুই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়---যাতে তারা যা করে আল্লাহ্ তার উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দিতে পারেন।

وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

১২২. আর মুমিনদের সকলের একসাথে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। অতঃপর তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন[২] করতে

۞ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

(১) উপরোক্ত অনুবাদটিই অধিকাংশ মুফাসসির উল্লেখ করেছেন। তবে আবুস সা'উদ তাফসীরকারের মতে এখানে আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, শত্রুদের পক্ষ থেকে তাদের উপর যে বিপদই অনুষ্ঠিত হোক না কেন তা তাদের জন্য সওয়াব হিসেবে লিখা হয়। [তাফসীর আবুস সাউদ]

(২) বলা হয়েছে ﴿لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ "যাতে দ্বীনের মধ্যে বিজ্ঞতা অর্জন করে"। উদ্দেশ্যে হলো দ্বীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন করা। تفقه শব্দের অর্থও তাই। এটি فقه থেকে উদ্ভুত। فقه অর্থ বুঝা, অনুধাবন করা, সুক্ষ্মভাবে বুঝা।

পারে[১] এবং তাদের সম্প্রদায়কে

(১) এ আয়াতটি দ্বীনের এলম হাসিলের মৌলিক দলীল। [কুরতুবী] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে এ ব্যাপারে আরও কিছু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এলেম হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন পথ দিয়ে চলে, আল্লাহ্ এই চলার সওয়াব হিসাবে তাঁর রাস্তাকে জান্নাতমুখী করে দেবেন। আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ দ্বীনী জ্ঞান আহরণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন। আলেমের জন্য আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির মৎস্যকুল দো'আ ও মাগফেরাত কামনা করে। অধিকহারে নফল এবাতদকারী লোকের উপর আলেমের ফযীলত অপরাপর তারকারাজির উপর পূর্ণিমা চাঁদের অনুরূপ। আলেমসমাজ নবীগণের ওয়ারিশ। নবীগণ স্বর্ণ, রূপার মীরাস রেখে যান না। তবে এলমের মীরাস রেখে যান। তাই যে ব্যক্তি এলমের মীরাস পায়, সে যেন মহা-সম্পদ লাভ করল। [তিরমিযী: ২৬৮২] অপর হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। সদকায়ে জারিয়া (যেমন, মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠান)। এমন ইল্‌ম যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়। (যেমন, শাগরিদ রেখে গিয়ে এলমে দ্বীনের চর্চা অব্যাহত রাখা বা কোন কিতাব লিখে যাওয়া।) নেক্‌কার সন্তান–যে তার পিতার জন্য দো'আ করে। [মুসলিম: ১৬৩১] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয।' [ইবন মাজাহ: ২২৪; ইবন আবদিল বার, জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি: ২৫, ২৬] বলাবাহুল্য, এ হাদীস ও উপরোক্ত অপরাপর হাদীসে উল্লেখিত ইল্‌ম' শব্দের অর্থ দ্বীনের ইল্‌ম। তবে অন্যান্য বিষয়ের মত দুনিয়াবী জ্ঞান–বিজ্ঞানও মানুষের জন্য জরুরী। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সবের ফযীলত বর্ণিত হয়নি। কারণ, দ্বীনী জ্ঞান অর্জন দু'ভাগে বিভক্ত। ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া। ফরযে আইনঃ শরী'আত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম আহকাম ও মাসআল মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক নর–নারীর জন্য ফরয। যেমন, ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাহসমূহের জ্ঞান, পবিত্রতা ও অপবিত্রতার হুকুম-আহকাম, সালাত, সাওম, যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান। ফরযে কেফায়াঃ যেমন, অধিকার আদায় করা, হুদুদ প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের মধ্যে বিবাদ নিরসন ইত্যাদি। কেননা, সবার পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকে এটা করতে গেলে নিজেদের অবস্থাও খারাপ হবে, অন্যদেরও। নিজেদের জীবন-জীবিকা অসম্পূর্ণ হবে বা বাতিল হবে। তাই কাউকে না কাউকে সুনির্দিষ্ট করে এর জন্য থাকতে হবে। আল্লাহ্ যাকে এর জন্য সহজ করে দেন সে এটা করতে পারে। তিনি প্রতিটি মানুষকে পূর্বেই এমন কিছু যোগ্যতা দিয়েছেন যা অন্যদের দেননি। সে হিসেবে প্রত্যেকে তার জন্য যা সহজ হয় তা-ই বহন করবে। [কুরতুবী; বাগভী]

ভীতিপ্রদর্শন করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে[১], যাতে

---

(১) ইবনে কাসীর বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সবাইকে যুদ্ধে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো, বলা হলো যে, "তোমরা হাল্কা ও ভারী সর্বাবস্থায় বেরিয়ে পড়" [সূরা আত-তাওবাহ: ৪১] এবং বলা হলো, "মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় যে, তারা আল্লাহ্র রাসূলের সহগামী না হয়ে পিছনে রয়ে যাবে এবং তার জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করবে" [সূরা আত-তাওবাহ: ১২০] তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন যুদ্ধে বেরিয়ে পড়লে সবার উপরই বের হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। তারপর এ আয়াত নাযিল করে সে নির্দেশের ব্যাপকতা রহিত করা হয়। তবে রহিত না বলে এটাও বলা যেতে পারে যে, আগের যে সমস্ত আয়াতে যুদ্ধে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এ আয়াতে সে নির্দেশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, এর দ্বারা প্রতিটি গোত্রের সবাই বের হবার অর্থ, প্রতি গোত্র থেকে সবার বের না হতে পারলে তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক বের হবে, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থেকে তার উপর যে সমস্ত ওহী নাযিল হয় সেটা গভীরভাবে জানবে, অনুধাবন করবে, তারপর তারা যখন তাদের গোত্রের কাছে ফিরে যাবে তখন তাদেরকে শত্রুদের অবস্থা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করবে। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে যুদ্ধে বের হওয়া দ্বারা তাদের দু'টি কাজই পূর্ণ হবে। (রাসূলের কাছে অবস্থান করে ওহীর জ্ঞান অর্জন ও সেখান থেকে এসে নিজের জাতিকে শত্রুদের অবস্থা সম্পর্কে জানানো।) তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে যারাই গোত্র থেকে এভাবে যুদ্ধে বের হবে, তারা দু'টি সুবিধা পাবে না। তারা হয় ওহীর জ্ঞান অর্জনের জন্য, না হয় জিহাদের জন্য বের হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর এভাবে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া ফরযে কিফায়া। [ইবন কাসীর] ইবন আব্বাস বলেন, আয়াতের অর্থ, মুমিনদের উচিত নয় যে, তারা সবাই যুদ্ধের জন্য বের হয়ে যাবে, আর রাসূলকে একা রেখে যাবে। যাতে করে তাদের মধ্যে যারা রাসূলের নির্দেশ ও অনুমতি নিয়ে বের হবে, তারা যখন ফিরে আসবে, তখন এ সময়ে রাসূলের কাছে যারা অবশিষ্ট ছিল তারা কুরআনের যা নাযিল হয়েছে তা যারা যুদ্ধে গেছে তাদেরকে জানাবে। তারা বলবে যে, তোমাদের যুদ্ধে যাওয়ার পরে আল্লাহ্ তোমাদের নবীর উপর কুরআনের যা নাযিল করেছেন তা আমরা শিখেছি। এভাবে যারা বের হয়েছিল তারা অবস্থান করে তাদের যাওয়ার পরে যা নাযিল হয়েছে তা শিখে নেবে। আর অন্য দল তখন যুদ্ধের জন্য বের হবে। আর এটাই হচ্ছে "যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে" এর অর্থ। অর্থাৎ যাতে করে নবীর কাছে যা নাযিল হয়েছে অবস্থান কারীরা তা জেনে নেয় এবং যারা অভিযানে গেছে তারা ফেরৎ আসলে সেটা অবস্থানকারীদের কাছ থেকে

তারা সতর্ক হয়।

জেনে নিতে পারে। এভাবে তারা সাবধান হতে পারে। [ইবন কাসীর]
ইবনে আব্বাস থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এ আয়াত জিহাদের ব্যাপারে নয়, বরং যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুদার বংশের উপর দুর্ভিক্ষের বদদো'আ করেন, তখন তাদের দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন পুরো গোত্রই মদীনায় আসা আরম্ভ করে দিল এবং তারা মুসলিম বলে মিথ্যা দাবী করতে লাগল। এভাবে তারা মদীনার খাবার ও পানীয়ের সংকট সৃষ্টি করে সাহাবীদের কষ্ট দিতে আরম্ভ করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন যে, তারা মুমিন নয়। ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তাদের পরিবার-স্বজনদের নিকট ফিরিয়ে দিলেন এবং তাদের কাওমকে এরকম করা থেকে সাবধান করে দিলেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে, তারা সবাই যেন নবীর কাছে চলে না আসে। তাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে কিছু লোক দ্বীন শেখার জন্য আসতে পারে। অতঃপর তারা যখন তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাবে তখন তাদের সম্প্রদায়কে সাবধান করতে পারে। [ইবন কাসীর]
হাসান বসরী বলেন, এ আয়াতে 'দ্বীনের গভীর জ্ঞান ও সাবধান করা'র যে কথা বলা হয়েছে এ উভয় কাজটিই যারা অভিযানে বের হয়েছে তাদের জন্য নির্দিষ্ট। তখন অর্থ হবে, কেন একটি দল দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে বের হয় না। অর্থাৎ তারা দেখবে ও শিক্ষা নিবে যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের উপর তাদেরকে বিজয় দিয়েছেন, আর কিভাবে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের সাহায্য করেছেন। আর তারা যখন তাদের কাওমের কাছে ফিরে যাবে তখন তারা তাদের কাওমের কাফেরদেরকে সেটা দ্বারা সাবধান করবে, তাদেরকে জানাবে, কিভাবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাহায্য করে থাকেন। ফলে তারা রাসূলের বিরোধিতা থেকে দুরে থাকবে। [বাগভী]
মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, সবাই একসাথে দাওয়াতের জন্য বের হবে না। বরং প্রতিটি বড় দল থেকে কোন ছোট একটি গ্রুপ দ্বীন শেখা এবং তাদের যাওয়ার পরে যা নাযিল হয়েছে তা জানার জন্য জ্ঞানীর কাছে যাবে। তারা জানার পর তাদের সম্প্রদায়ের সবাইকে সাবধান করবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাবে। যাতে তারা আল্লাহ্র ভয় ও শাস্তি থেকে সাবধান হয়। আর তখনও একটি গ্রুপ কল্যাণের কথা জানার জন্য বসে থাকবে। [বাগভী]
মূলত: ফিকহ হচ্ছে, দ্বীনের আহকাম জানা। [বাগভী] এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দ্বীনের ফিকহ প্রদান করেন" [বুখারী:৭১; মুসলিম:১০৩৭] অন্য হাদীসে এসেছে, "মানুষ যেন গুপ্তধন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের গুপ্তধনের মত। তাদের মধ্যে যারা জাহেলিয়াতে উত্তম তারা ইসলামেও উত্তম, যদি তারা দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে।" [বুখারী: ৩৪৯৩; মুসলিম: ২৫২৬]

ষোলতম রুকূ‘

১২৩. হে ঈমানদারগণ! কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের কাছাকাছি তাদের সাথে যুদ্ধ কর[১] এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা[২] দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

(১) এ আয়াতসমূহে কোন নিয়মে কাফেরদের সাথে জিহাদ করা হবে তা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ করবে। এখানে নিকট বলে নিকটবর্তী অবস্থান ও নিকট সম্পর্ক এ দু'রকমের হতে পারে। [বাগভী] (এক) অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ কর। [ইবন কাসীর] (দুই) গোত্র, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে যারা নিকটবর্তী অন্যান্যদের আগে তাদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাও। [বাগভী] যেমন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়ে বলেনঃ "হে রাসূল, নিজের নিকটআত্মীয়গণকে আল্লাহর আযাবের ভয়প্রদর্শন করুন।" [সূরা আশ-শু'আরা: ২১৪] তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহ্র বাণী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ, তিনি স্থান হিসাবে প্রথমে মদীনার আশ-পাশের কাফের তথা -বনু- কোরাইযা, বনু-নদীর ও খায়বরবাসীদের সাথে বুঝাপড়া করেন। তারপর পূর্ববর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করেন এবং সবশেষে রোমানদের সাথে জিহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। [ইবন কাসীর]

(২) غلظة শব্দের অর্থঃ কঠোরতা [ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর] কারণ, প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে, ঈমানদারদের সাথে নরম ব্যবহার করে, আর কাফেরদের সাথে থাকে কঠোর। [ইবন কাসীর] সুতরাং তাদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোন দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ নির্দেশটি দিয়েছেন। তিনি বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৫৪] আরও বলেন, "মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল; তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল" [সূরা আল-ফাতহ:২৯] আরও বলেন, "হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।" [সূরা আত-তাওবাহ:৭৩; আত-তাহরীম:৯]

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٢٤

১২৪. আর যখনই কোন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে, ‘এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল[১]?’ অতঃপর যারা মুমিন এটা তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়।

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ١٢٥

১২৫. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এটা তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ যুক্ত করে। আর তাদের মৃত্যু ঘটে কাফের অবস্থায়।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦

১২৬. তারা কি দেখে না যে, ‘তাদেরকে প্রতি বছর একবার বা দু’বার বিপর্যস্ত করা হয়[২]?’ এর পরও তারা তাওবাহ্ করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

---

(১) আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কুরআনের আয়াতের তেলাওয়াত, চিন্তা–ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। তার উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। ঈমানের নূর ও আস্বাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা সহজ হয়ে উঠে। ইবাদাতে স্বাদ পায়, গুনাহের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে ও কষ্টবোধ হয়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন এটি নূরের শ্বেতবিন্দুর মত দেখায়। তারপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি গোনাহ্ ও মুনাফিকীর ফলে প্রথমে অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। তারপর পাপাচার ও কুফরীর তীব্রতার সাথে সাথে সে কাল দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর কালো হয়ে যায়। [বাগভী] এজন্য সাহাবায়ে কেরাম একে অন্যকে বলতেন আস, কিছুক্ষন একত্রে বসি এবং দ্বীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। [বুখারী]

(২) এখানে মুনাফিকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের কপটতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের পরিণতিতে প্রতিবছরই তারা কখনো একবার, কখনো দু’বার নানা ধরনের বিপদে বা পরীক্ষায় নিপতিত হয়। মুজাহিদ বলেন, তারা দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধায় পতিত হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অথবা রোগ-শোকে। হাসান বসরী বলেন, রাসূলের সাথে যুদ্ধ ও জিহাদে অংশগ্রহণের মাধ্যমে [কুরতুবী] তাছাড়া কখনো তাদের কাফের মিত্ররা পরাজিত হয়, কখনো তাদের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবানিশি মর্মপীড়া ভোগ করে। [বাগভী]

১২৭. আর যখনই কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করছে কি?' তারপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করে দেন; কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভালভাবে বোঝে না।

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৮. অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু[১]।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৯. অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলুন, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই[২]। আমি তাঁরই উপর

فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের উপর তার ইহসানের কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই সমগোত্রীয় এবং তাদেরই সমভাষার লোককে প্রেরণ করেছেন। [ইবন কাসীর] একথাটিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জা'ফর ইবন আবি তালিব নাজাসীর দরবারে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে আমাদেরই একজনকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন যাকে আমরা চিনি, তার বংশ ও গুণাগুণ সম্পর্কেও আমরা অবহিত। তার ভিতর ও বাহির সম্পর্কে, সত্যবাদিতা, আমানতদারী সম্পর্কেও আমরা জ্ঞাত। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২০১] আরও বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সৃষ্টির উপর, বিশেষতঃ মুমিনদের উপর বড় দয়াবান ও স্নেহশীল।

(২) অর্থাৎ আপনার যাবতীয় চেষ্টা-তদবীরের পরও যদি কিছু লোক ঈমান গ্রহণে বিরত থাকে, তবে ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখুন। কারণ নবীগনের সমস্ত

নির্ভর করি এবং তিনি মহা‘আর্‌শের[১]
রব ।’

কাজ হল স্নেহ-মমতা ও হামদর্দির সাথে আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে ডাকা, তাদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা ও যাতনার সম্মুখীন হলে, তা আল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ করা এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা ।

(১) আরশ সম্পর্কে আলোচনা সূরা আল-আ‘রাফের ৫৪ নং আয়াতে চলে গেছে ।

১০- সূরা ইউনুস



সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ১০৯।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরা ইউনুস মক্কায় নাযিল হয়েছে। [ইবন কাসীর] কেউ কেউ সূরার মাত্র তিনটি আয়াতকে মাদানী বলে উল্লেখ করেছেন, যা মদীনায় হিজরত করার পর নাযিল হয়েছে। [কুরতুবী]

নামকরণঃ এ সূরার নাম সূরা ইউনুস। কারণ সূরার ৯৮ নং আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে।

।। **রহমান, রহীম আল-াহ্‌র নামে**।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ্-লাম-রা[১]। এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ①

২. মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা তাদেরই একজনের কাছে ওহী পাঠিয়েছি এ মর্মে যে, আপনি মানুষকে সতর্ক করুন[২] এবং

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؔ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ

(১) এগুলোকে 'হরফে মোকাত্তা'আত' বলা হয়। এগুলোর আলোচনা পূর্বে সূরা আল-বাকারায় করা হয়েছে।

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফের মুশরিকদের একটি সন্দেহ ও তার উত্তর তুলে ধরেছেন। সন্দেহটি ছিল এই যে, কাফেররা তাদের মূর্খতার দরুন সাব্যস্ত করে রেখেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে নবী বা রাসূল আসবেন তিনি মানুষ হবেন না। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাদের এ সন্দেহকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা যে শুধু কুরাইশ কাফেরদের সন্দেহ তা নয়। পূর্ববর্তী উম্মতরাও তা বলেছিল। তারা বলেছিল "মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দেবে ?" [সূরা আত-তাগাবুনঃ ৬] নূহ ও হূদ এর কাওমও এ রকম বিস্মিত হয়েছিল। তখন নবীগণ তার জবাবে বলেছেন, "তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে?" [সূরা আল-আ'রাফঃ ৬৩; ৬৯] অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাওমও বলেছে, "সে কি বহু ইলাহ্‌কে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? এটা তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!" [সূরা সোয়াদঃ ৫] ইবন আব্বাস বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে পাঠালেন তখন আরবরা



মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে আছে উচ্চ মর্যাদা[১]! কাফিররা বলে, ‘এ তো এক সুস্পষ্ট জাদুকর!’

সেটা মানতে অস্বীকার করেছিল। অথবা তাদের মধ্যে অনেকেই এ জন্য অস্বীকার করেছিল যে, আল্লাহ্ মহান যে তিনি তাঁর রাসূল বানাবেন মুহাম্মাদের মত একজন মানুষকে। তিনি এটা করতেই পারেন না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার উত্তর কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রকারে দিয়েছেন। এক আয়াতে বলেছেনঃ “যমীনের উপর যদি ফিরিশ্তারা বাস করত, তাহলে আমি তাদের জন্য কোন ফিরিশ্তাকেই রাসূল বানিয়ে পাঠাতাম”। [আল-ইসরাঃ ৯৫] যার মূল কথা হল এই যে, রিসালাতের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূল এবং যাদের মধ্যে রাসূল পাঠানো হচ্ছে এ দু'য়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। বস্তুতঃ ফিরিশ্তার সম্পর্ক থাকে ফিরিশ্তাদের সাথে আর মানুষের সম্পর্ক থাকে মানুষের সাথে। যখন মানুষের জন্য রাসূল পাঠানোই উদ্দেশ্য, তখন কোন মানুষকেই রাসূল বানানো উচিত।

(১) এ বাক্যের দ্বারা সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ ‘যিকরুল আউয়াল’ তথা লাওহে মাহফূযে তাদের তাকদীরে সৌভাগ্যবান লিখা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, তারা যে উত্তম আমল পেশ করেছে সে জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে। [ইবন কাসীর; সা'দী] অতএব, বাক্যের অর্থ দাঁড়ালো এই যে, ঈমানদারদেরকে এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে অনেক বড় সম্মানিত মর্যাদা রয়েছে যা তারা নিশ্চিতই পাবে এবং পাওয়ার পর কখনো তা শেষ হয়ে যাবে না। চিরকালই তারা সে সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। এ আয়াতের তাফসীর যদি আমরা কুরআনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, এর সমার্থে সূরা আল-কাহফের ২-৩ নং আয়াতে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে, ‘তারা সেখানে সর্বদা অবস্থান করবে’। মুজাহিদ বলেন, এর দ্বারা পূর্বে তারা যে আমল করেছে যেমন, তাদের সালাত, সাওম, সাদকা, তাসবীহ ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, এক্ষেত্রে صدق শব্দ প্রয়োগের মাঝে এমন ইশারা করাও উদ্দেশ্য যে, জান্নাতের এসব উচ্চমর্যাদা একমাত্র সত্যনিষ্ঠা ও ইখলাসের কারণেই পাওয়া যাবে। কোন কোন মুফাসসির বলেন এখানে ‘যাবতীয় কল্যাণ’ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ এখানে ﴿قَدَمَ صِدْقٍ﴾ বলে তাদের সৎকর্মকাণ্ডসমূহকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, তাদের সালাত, সাওম, সাদকা, তাসবীহ ইত্যাদি। [ফাতহুল কাদীর]

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣

৩. তোমাদের রব তো আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন(১), তারপর তিনি ‘আর্‌শের উপর উঠলেন(২)। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন(৩)। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই(৪)। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের

(১) এ আয়াতে তাওহীদকে এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার মধ্যে অতঃপর সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার মধ্যে যখন আল্লাহ্ তা‘আলার কোন শরীক-অংশীদার নেই, তখন ‘ইবাদাত-বন্দেগী এবং হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অন্য কেউ কি করে শরীক হতে পারে? বরং এতে (‘ইবাদাতে) অন্য কাউকে শরীক করা একান্তই অবিচার এবং সীমালঙ্ঘনের শামিল। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে আল্লাহ্ তা‘আলা মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এখানে কি পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য তা একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন। যদিও কোন কোন মুফাসসির এ দিনগুলোকে আমাদের বর্তমান ‘দিন’ এর মত মনে করেছেন। কোন কোন মুফাসসির মত প্রকাশ করেছেন যে, এ দিনগুলো অন্য আয়াতে বর্ণিত, একদিন সমান একহাজার বছরের মত। [ইবন কাসীর]

(২) তারপর বলেছেন ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ অর্থাৎ ‘আরশের উপর উঠেছেন। কুরআন এবং হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা‘আলার ‘আরশ এক প্রকাণ্ড সৃষ্টি আর তা সমস্ত সৃষ্টিজগতের ছাদস্বরূপ। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর আরশের উপর উঠা বাস্তব বিষয়। এটা আল্লাহ্‌র একটি মহান কার্যগত গুণ। তিনি যে রকম তাঁর আরশের উপর উঠাও সেরকম। আমরা তার আরশের উপর উঠা কথাটা বুঝি তবে সে উঠার ধরণ আমরা জানিনা। আল্লাহর আরশের উপর উঠা সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা সূরা আল-বাকারায় করা হয়েছে।

(৩) সৃষ্টিজগতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড তিনিই পরিচালনা করেন। “আসমানও যমীনের অণু পরিমান বস্তুও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই।” [সাবাঃ ৩] কোন ব্যাপারে মনযোগ দিতে গিয়ে অন্য ব্যাপার তাঁর বাঁধা হয় না। [বুখারী] অগণিত আবেদনকারীর আবেদন তাঁর জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। চাওয়ার প্রচণ্ডতায় তিনি বিরক্ত হোন না। বৃহৎ কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করতে গিয়ে ছোট ছোট বস্তুগুলো তার খেয়ালচ্যুত হয়না। চাই তা সমুদ্রে বা পাহাড়ে বা জনবসতিপূর্ণ এলাকা যেখানেই হোক না কেন। [এ ব্যাপারে আরো দেখুনঃ সূরা হূদঃ ৬, সূরা আল-আন‘আমঃ ৫৯]

(৪) অর্থাৎ দুনিয়ার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অন্য কারোর হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা, কারো আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাঁর কোন ফায়সালা পরিবর্তন করার

রব; কাজেই তোমরা তাঁরই ‘ইবাদাত কর[১]। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না[২]?

৪. তাঁরই কাছে তোমাদের সকলের ফিরে যাওয়া[৩]; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَؤُا

অথবা করো ভাগ্য ভাঙা-গড়ার ইখতিয়ারও নেই। বড়জোর সে আল্লাহর কাছে দো‘আ করতে পারে। কিন্তু তার দো‘আ কবুল হওয়া না হওয়া পুরোপুরি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর এ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার রাজ্যে নিজের কথা নিশ্চিতভাবে কার্যকর করিয়ে নেবার মতো শক্তিধর কেউ নেই। এমন শক্তি কারোর নেই যে,তার সুপারিশকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। এ সুপারিশের বিষয়টি আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। [দেখুনঃ সূরা আল-বাকারাহঃ ২৫৫, সূরা আন-নাজমঃ ২৬, সূরা সাবাঃ ২৩]

(১) উপরের তিনটি বাক্যে প্রকৃত সত্য বর্ণনা করা হয়েছিল, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব। এখন বলা হচ্ছে, এ প্রকৃত সত্যের উপস্থিতিতে তোমাদের কোন্ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। মূলত রবুবীয়াত তথা বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতা, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব যখন পরোপুরি আল্লাহর আয়ত্বাধীন তখন এর অনিবার্য দাবী স্বরুপ মানুষকে তাঁরই বন্দেগী করতে হবে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা‘আলা সেটা বলেছেন, তিনি বলেন, “আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে , তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ্।’ অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?” [সূরা আয-যুখরুফ: ৮৭] আরও বলেন, “বলুন, ‘সাত আসমান ও মহা-‘আরশের রব কে?’ অবশ্যই তারা বলবে, ‘আল্লাহ্।’ বলুন, ‘তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?” [সূরা আল-মুমিনূন: ৮৬-৮৭] তাছাড়া সূরা ইউনুসের এ আয়াতের আগের ও পরের আয়াতেও একই বক্তব্য এসেছে।

(২) অর্থাৎ যখন এ সত্য তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ সত্যের উপস্থিতিতে তোমাদের কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তখন এরপরও কি তোমাদের চোখ খুলবে না এবং তোমরা এমন বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে থাকবে? তোমরা কি তোমাদের অস্বীকার ও গোঁড়ামীতেই রত থাকবে যে তোমরা মোটেই উপদেশ গ্রহণ করবে না? [আইসারুত তাফাসীর]

(৩) অর্থাৎ তোমাদের এ দুনিয়া থেকে ফিরে গিয়ে নিজেদের রবের কাছে হিসেব দিতে হবে। সে সুনির্দিষ্ট সময়ে তিনি তোমাদের সবাইকে একত্রিত কববেন। [ইবন কাসীর; সা‘দী]

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ
حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ④

সত্য[১]। সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, তারপর সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন[২] যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফপূর্ণ প্রতিফল প্রদানের জন্য। আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয়[৩] ও অতীব

(১) এ আয়াতে সমগ্র সৃষ্টিজগতের বহু নিদর্শন উল্লেখিত হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ কুদরত ও পরিপূর্ণ হেকমতের স্বাক্ষর বহন করে এবং এ দাবী প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকে ধ্বংস করে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম এবং পরে পুনরায় সেই কণাসমূহকে একত্রিত করে একেবারে নতুন অবস্থায় জীবিত করে হিসাব-নিকাশের পর পুরস্কার কিংবা শাস্তির আইন জারি করবেন। কুরাইশ কাফেরদের অধিকাংশই আল্লাহকে তাদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারাই তাদের উপর দলীল নিচ্ছেন যে, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে পারেন তিনি অবশ্যই ধ্বংসের পর দ্বিতীয়বার সেটাকে অস্তিত্বে আনতে সক্ষম। [কুরতুবী] আর এটা তাঁর ওয়াদা। এ ওয়াদা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন। কারণ, এর মাধ্যমে তিনি যারা হৃদয় দিয়ে ঈমান এনেছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে ওয়াজিব ও মুস্তাহাব পালন করে নেক আমল করেছে, তাদেরকে প্রতিফল দিবেন। [সা'দী] আর যারা কুফরী করবে তাদেরকেও তাদের কুফরীর কারণে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।

(২) এ বাক্যটির মধ্যে দাবী ও প্রমাণ উভয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। দাবী হচ্ছে, আল্লাহ পুনর্বার মানুষকে সৃষ্টি করবেন। এর প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে, তিনিই প্রথমবার মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর যে ব্যক্তি একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। সে কখনো আল্লাহর পক্ষে এ সৃষ্টির পুনরাবৃত্তিকে অসম্ভব বা দুর্বোধ্য মনে করতে পারে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "যেভাবে আমরা প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; এটা আমার কৃত প্রতিশ্রুতি, আর আমরা তা পালন করবই।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৪]

(৩) এ অত্যন্ত গরম পানীয় কাফেরদের জন্য শাস্তি স্বরূপ থাকবে। এ প্রচণ্ড গরম পানীয়ের বিভিন্ন গুণাগুণ অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা আর-রাহমানের ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটোছুটি করবে" আবার কোথাও বলা হয়েছেঃ "এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?"। [সূরা মুহাম্মাদঃ ১৫] আরো বলা হয়েছে " তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা দ্বারা তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে"। [সূরা আল-হাজ্জঃ ১৯-২০]

কষ্টদায়ক শাস্তি; কারণ তারা কুফরী করত।

৫. তিনিই সূর্যকে দীপ্তিময় ও চাঁদকে আলোকময় করেছেন এবং তার জন্য মন্‌যিল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ্‌ এগুলোকে যথাযথ ভাবেই সৃষ্টি করেছেন[১]। তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

৬. নিশ্চয় দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্‌ আসমানসমূহ ও যমীনে যা সৃষ্টি করেছেন[২] তাতে নিদর্শন রয়েছে

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ “তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে” [সূরা আল-কাহ্‌ফঃ ২৯] আরো বলা হয়েছেঃ “তারপর তোমরা পান করবে তার উপর অতি উষ্ণ পানি, ফলে তারা পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়।” [সূরা আল-ওয়াকি‘আহঃ ৫৪-৫৫] কুরআনের কোন কোন আয়াতে এ গরম পানিকে পুঁজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, বলা হয়েছেঃ “এবং পান করানো হবে গলিত পুঁজ; যা সে অতি কষ্টে এককে ঢোক করে গিলবে এবং তা গিলা প্রায় সহজ হবে না”। [সূরা ইব্‌রাহীমঃ ১৬-১৭] আবার কোন কোন স্থানে বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য সমভাবে গরম পানীয় ও পুঁজ উভয়টিই থাকবে, “কাজেই তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ”। [সূরা সোয়াদঃ ৫৭] আরো এসেছেঃ “সেখানে তারা আস্বাদন করবে না শীত, না কোন পানীয়, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া ; [সূরা আন-নাবা ২৪-২৫]।

(১) অর্থাৎ তিনি এগুলো অনাহুত সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রত্যেকটি কাজই প্রজ্ঞায় পূর্ণ। আসমান ও যমীন সৃষ্টির মাঝে কোন হেকমত নেই এমন কথা শুধুমাত্র কাফেররাই বলতে পারে। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন, সূরা সোয়াদঃ ২৭, সূরা আল-মুমিনূনঃ ১১৫-১১৬]।

(২) আসমান ও যমীনে আল্লাহ্‌ তা‘আলা যা সৃষ্টি করেছেন তাতে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সেগুলো আল্লাহ্‌রই মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছে। কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও আল্লাহ্‌ তা‘আলা এ বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যেমন, সূরা ইউসুফঃ ১০৫, সূরা ইউনুসঃ ১০১, সূরা সাবাঃ ৯, সূরা আলে ইমরানঃ ১৯০। এগুলোর পরিবর্তনের অর্থ, একটির পর অপরটি এমনভাবে আসা তাদের সুনির্দিষ্ট নিয়মের

এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

৭. নিশ্চয় যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছে এবং এতেই পরিতৃপ্ত থাকে[১], আর যারা আমাদের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফিল,

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ ۝

৮. তাদেরই আবাস আগুন; তাদের কৃতকর্মের জন্য।

أُولَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

৯. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের রব তাদের ঈমান আনার কারণে তাদেরকে পথ

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَٰرُ فِى جَنَّٰتِ

কোন ব্যঘাত ঘটে না। [ইবন কাসীর] এ ব্যাপারে সূরা আল-আ'রাফ এর ৫৪, সূরা ইয়াসীন এর ৪০ নং এবং সূরা আল-আন'আমের ৯৬ নং আয়াতেও চাঁদ ও সূর্যের নিয়মানুবর্তিতার কথা বর্ণিত হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) কাতাদা বলেন, দুনিয়াদারদের তুমি দেখবে যে, তারা দুনিয়ার জন্যই খুশী হয়, দুনিয়ার জন্যই চিন্তিত হয়, দুনিয়ার জন্যই অসন্তুষ্ট হয় আর দুনিয়ার জন্যই সন্তুষ্ট হয়। [তাবারী] এ আয়াতে জাহান্নামের অধিবাসীদের বিশেষ লক্ষণসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথমতঃ তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আশা করে না, বিশ্বাসও করে না। দ্বিতীয়তঃ তারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন ও তার অনন্ত-অসীম সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে তারা এমন নিশ্চিত হয়ে বসেছে যেন এখান থেকে আর কোথাও তাদের যেতেই হবে না; চিরকালই যেন এখানে থাকবে। কখনো তাদের একথা মনে হয় না যে, এ পৃথিবী থেকে প্রত্যেকটি লোকের বিদায় নেয়া এমন বাস্তব বিষয় যে, এতে কখনো কোন সন্দেহ হতে পারে না। তাছাড়া এখান থেকে নিশ্চিতই যখন যেতে হবে, তখন যেখানে যেতে হবে, সেখানকার জন্যও তো খানিকটা প্রস্তুতি নেয়া কর্তব্য ছিল। চতুর্থতঃ এসব লোক আমার নিদর্শনাবলী ও আয়াতসমূহের প্রতি ক্রমাগত গাফিলতী করে চলেছে। সুতরাং এরা না আল্লাহ্‌র কুরআনের আয়াত দ্বারা উপকৃত হয়, না আসমান-যমীন কিংবা এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোন সাধারণ সৃষ্টি অথবা নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও চিন্তা-ভাবনা করে। তাই তাদের ঠিকানা, অবস্থান ও বাসস্থান হবে জাহান্নাম যেখান থেকে তারা আর কোথাও যেতে বা পালাতে পারবে না। কারণ তারা কুফরী, শির্ক ও বিভিন্ন প্রকার পাপের মাধ্যমে তাই অর্জন করেছে। [সা'দী]

النَّعِيْمِ ⑨

নির্দেশ করবেন[১]; নিয়ামতে ভরপুর জান্নাতে তাদের পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে[২] ।

(১) আয়াতে بِإِيْمَانِهِمْ শব্দের সাথে যে 'بِ' হরফটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার দু'টি অর্থ হতে পারে- (এক) কারণে। তখন আয়াতের অর্থ হবে- যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের প্রভু ঈমানের কারণে মহাপুরষ্কারের ব্যবস্থা করবেন। তিনি তাদেরকে হিদায়াত দিবেন। তিনি তাদেরকে তাদের জন্য যা উপকারী তা শিক্ষা দিবেন। হিদায়াতের কারণে তারা ভালো আমল করার তৌফিক লাভ করবেন, তারা আল্লাহ্‌র আয়াত ও নিদর্শনসমূহে দৃষ্টি দিতে পারবেন। এ দুনিয়াতে সৎপথে পরিচালিত করবেন। হিদায়াতুল মুস্তাকীম নসীব করবেন আর আখেরাতে পুল-সিরাতের পথে তাদের পরিচালিত করবেন যাতে তারা জান্নাতে পৌঁছতে পারে। [সা'দী] (দুই) সাহায্যে বা দ্বারা। [কাশশাফ; ইবন কাসীর] মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ 'তাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করবেন ফলে তারা সে আলোকে আলোকিত হয়ে পথ চলতে পারবে'। [তাবারী] অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনও তাদের আলোকিত হবে। তারা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানা থাকার কারণে অন্ধকারে হাতিয়ে বেড়াবে না। তাদের জীবন হবে আলোকিত জীবন। [দেখুনঃ সূরা আল-আন'আমঃ ১২২, সূরা আশ-শুরাঃ ৫২, সূরা আল হাদীদঃ ২৮] আর আখেরাতের জীবনেও তারা তাদের প্রভুর যাবতীয় কল্যাণ লাভে সামর্থ হবেন। পুলসিরাতেও তাদের আলোর ব্যবস্থা থাকবে। যাবতীয় সংকটময় মুহূর্তে তাদের প্রভু তাদের পথ দেখানোর ব্যবস্থা করবেন। [দেখুনঃ সূরা আল-হাদীদঃ ১৩] কাতাদা ও ইবন জুরাইজ বলেন, তার আমল তার জন্য সুন্দর সূরত ও সুগন্ধিযুক্ত বাতাসের রূপ ধারণ করে যখন সে কবর থেকে উঠবে তখন তার সম্মুখীন হয়ে তাকে যাবতীয় কল্যাণের সুসংবাদ জানাবে। সে তখন তাকে বলবে, তুমি কে? সে বলবে, আমি তোমার আমল। তখন তার সামনে আলোর ব্যবস্থা করবে যতক্ষণ না সে জান্নাতে প্রবেশ করায়। আর এটাই এ আয়াতের অর্থ। পক্ষান্তরে কাফেরের জন্য তার আমল কুৎসিত সূরত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে আসবে এবং তার সার্বক্ষণিক সাথী হবে যতক্ষণ না সে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাচ্ছে। [তাবারী; ইবন কাসীর]

(২) যদি কেউ প্রশ্ন করে, কিভাবে বলা হল যে, তাদের নিচ দিয়ে নালাসমূহ প্রবাহিত হবে, আর আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের সবখানেই জান্নাতের এ নালাসমূহকে বাগানের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কথা জানিয়েছে, এটা তো সম্ভব শুধু এক অবস্থায়, সেটা হচ্ছে, তারা যমীনের উপরে থাকবে, আর নালাসমূহ থাকবে যমীনের নীচ দিয়ে? এটা তো জান্নাতের নালাসমূহের বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ, সেগুলো প্রবাহিত হবে যমীনের মধ্যে কোন প্রকার গর্ত না করে? উত্তর হচ্ছে, এ অর্থ নেয়াটা শুদ্ধ নয়। বরং নিচে দিয়ে নালা প্রবাহিত হওয়ার অর্থ তাদের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হওয়া। তাদের সামনে দিয়ে নে'আমতপূর্ণ বাগানসমূহে। এর অনুরূপ কথা আল্লাহ্ তা'আলা মারইয়ামকে

১০. সেখানে তাদের ধ্বনি হবেঃ ‘হে আল্লাহ্! আপনি মহান, পবিত্র[১]!

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا

সম্বোধন করে বলেছিলেন, “অবশ্যই তোমার রব তোমার নিচ দিয়ে প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছেন” [সূরা মারইয়াম: ২৪] আর এটা জানা কথা যে, সে প্রস্রবণটি মারইয়ামের বসার নিচে ছিল না। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে যে, তার নিকটে। তার সামনে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউনের ভাষণ সম্পর্কে বলেছেন, সে বলেছিল: “মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এ নালাসমূহ কি আমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত নয়?” [সূরা আয-যুখরুফ: ৫১] এখানে নিচ দিয়ে অর্থ, কাছে বা সামনে। [তাবারী]

(১) এ আয়াতে জান্নাতবাসীদের প্রথম ও প্রধান অবস্থা বর্ণিত হয়েছে [সা'দী] বলা হয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের دعوى হবে ﴿سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ﴾। এখানে دعوى শব্দটির অর্থ কি, এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। কারণ, دعوى শব্দটির কয়েকটি অর্থ রয়েছে-

(এক) দাবী করা। তখন আয়াতের অর্থ হবে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে সবসময়ই জান্নাতবাসীগণের দাবী ছিল আল্লাহ্ তা'আলাকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটিমুক্ত ঘোষণা করা, তাঁর জন্য উলুহিয়্যাত তথা যাবতীয় ‘ইবাদাত সাব্যস্ত করা। তাই তারা জান্নাতেও এটার দাবী করবে। [তাবারী] কোন কোন মুফাস্সির আবার এ অর্থ করেছেন যে, এখানে দাবী করার অর্থ সার্বক্ষণিক এ কাজে লেগে থাকা। যেমনিভাবে দুনিয়াতে কেউ কারো কাছে কিছু দাবী করলে সার্বক্ষণিক তার পিছনে ছুটতে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

(দুই) দো'আ করা। [তাবারী] আর দো'আ করার অর্থ নির্ধারণে আলেমগণ বেশকিছু মতামত ব্যক্ত করেছেন- (ক) তাদের আহ্বান ও সম্বোধন হবে তাস্বীহ্ ও তাহ্মীদের মাধ্যমে। (খ) তাদের ‘ইবাদাত হবে ‘সুবাহানাকাল্লাহুম্মা’ এ কালেমার মাধ্যমে। [বাগভী] (গ) তাদের কথা ও কাজও হবে উক্ত কালেমার মাধ্যমে। [বাগভী] এসবগুলোই অর্থ হতে পারে। কারণ, আমরা জানি যে, দু'আ দু'প্রকার। (এক) চাওয়ার মাধ্যমে দু'আ। যেমন আল্লাহ্ আমাকে অমুক বস্তু দান করুন। এ ধরণের দো'আ অনেক পরিচিত। (দুই) ‘ইবাদাত ও প্রশংসার মাধ্যমে দো'আ। যাতে আল্লাহ্র প্রশংসা এবং শুকরিয়া থাকে। এ হিসাবে কুরআন ও সুন্নায় বহু দো'আ এসেছে। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ‘সবচেয়ে উত্তম দো'আ হলো আলহামদুলিল্লাহ্’। [তিরমিযীঃ ৩৩০৫, ইবনে মাজাহ্ঃ ৩৭৯০] অনুরূপভাবে অন্য হাদীসে বলা হয়েছেঃ ‘মুসীবতের দো'আ হচ্ছে- لَا إله إلّا الله العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إله إلَّا الله رَبُّ العَرْشِ العَظِيم، لَا إِلَه إلّا الله رَبُّ السَّموَاتِ وَرَبُّ الأَرْض وَرَبُّ العَرْش الكَرِيم অর্থাৎ ‘আল্লাহ্ ছাড়া ‘ইবাদাতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি মহান, সহিষ্ণু। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি ‘আরশের মহান রব। আল্লাহ্ ছাড়া ‘ইবাদাতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি আসমান-যমীনের রব এবং ‘আরশের মহান রব’। [বুখারীঃ ৬৩৪৫, মুসলিমঃ ২৭৩০]

سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম'[১] আর তাদের শেষ ধ্বনি

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ 'যিন্‌নূন (ইউনুস) 'আলাইহিস্ সালাম যখন মাছের পেটে ছিলেন তখন তার দো'আ (লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুব্‌হানাকা ইন্নি কুন্‌তু মিনায্‌যোয়ালিমীন)এ দো'আ দ্বারা যখনই কোন মুসলিম কিছুর জন্য দো'আ করবে, আল্লাহ্ তার দো'আ কবুল করবেন'। [তিরমিযীঃ ৩৫০০] এ সমস্ত হাদীস এবং এ জাতীয় অন্যান্য অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে দো'আ করার নির্দেশ শরী'আতে এসেছে। তাই অনেক আলেম এ ধরণের প্রশংসাসূচক দো'আকে চাওয়াসূচক দো'আ হতে শ্রেষ্ঠ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এসব কিছু থেকে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, জান্নাতের অধিবাসীগণের আল্লাহ্‌র প্রশংসা, পবিত্রতা ঘোষণা করা মূলতঃ আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করা। কোন কোন মুফাসসির বলেন, যেহেতু তাদের উপর থেকে ইবাদতের যাবতীয় বোঝা নামিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে শুধু বাকী থাকবে সবচেয়ে বড় স্বাদের বিষয়। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র যিকর করা। যা অন্যান্য যাবতীয় নে'আমতের চেয়ে তাদের কাছে বেশী মজাদায়ক হবে। যাতে থাকবে না কোন কষ্ট। [সা'দী]

(তিন) আশা-আকাঙ্খা করা, [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ জান্নাতে তাদের সবধরণের নেয়ামত লাভের পর তাদের আর কোন চাহিদা বাকী থাকবে না। তাই তারা শুধু 'সুবাহানাকাল্লাহুম্মা' বা 'হে আল্লাহ্! আপনি কতই না পবিত্র!' এ প্রশংসামূলক বাক্যই তাদের দ্বারা সর্বক্ষণ ঘোষিত হোক এমনটি আশা করবে এবং বলতে চাইবে। [ইবন কাসীর] মোটকথা, জান্নাতবাসীদের যাবতীয় দো'আ, কাজ, কথা, দাবী, আশা-আকাঙ্খা সবকিছুই হবে আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ পাঠ ও তাঁর তাহ্‌মীদ বা প্রশংসায় নিয়োজিত থাকা। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে খাবে এবং পান করবে, কিন্তু কোন থুথু, পায়খানা-পেশাব, সর্দি-কাশির সম্মুখীন হবে না। শুধুমাত্র ঢেকুর আসবে যাতে মিস্‌কের সুঘ্রাণ থাকবে। তাদের মনে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই আল্লাহ্‌র তাস্‌বীহ্-তাহ্‌মীদ (সুবাহানাল্লাহ্-আল্‌হামদুলিল্লাহ্) পাঠ করতে ইলহাম (মনে উদিত করে দেয়া) হবে'। [মুসলিমঃ ২৮৩৫]

(১) জান্নাতবাসীদের দ্বিতীয় অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ﴿وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ﴾ প্রচলিত অর্থে تَحِيَّةٌ বলা হয় এমন শব্দ বা বাক্যকে যার মাধ্যমে কোন আগন্তুক কিংবা অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। যেমন, সালাম, স্বাগতম, খোশ আমদেদ, কিংবা আহ্‌লান ওয়া সাহ্‌লান প্রভৃতি। সুতরাং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অথবা ফিরিশ্‌তাদের পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে سلام এর মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ এ সুসংবাদ দেয়া হবে যে, তোমরা যে কোন রকম কষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাযতে থাকবে। এ সালাম

الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠

হবেঃ 'সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌র প্রাপ্য[১]!'

স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, সূরা ইয়াসীনে রয়েছে ﴿سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ﴾ আবার ফিরিশ্‌তাদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। আবার ফিরিশতা কর্তৃক তাদের রবের পক্ষ থেকেও হতে পারে। [বাগভী] যেমন, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ﴿وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ﴾ অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাগণ প্রতিটি দরজা দিয়ে 'সালামুন 'আলাইকুম' বলতে বলতে জান্নাতবাসীদের কাছে আসতে থাকবেন। [সূরা আর-রা'দঃ ২৩-২৪] আর এ দু'টি বিষয়ে বিরোধ-বৈপরীত্ব নেই যে, কখনো সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং কখনো ফিরিশ্‌তাদের পক্ষ থেকে সালাম আসবে। আবার জান্নাতীগণ পরস্পরকে এ সালামের মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানাবেন। [ফাতহুল কাদীর; সা'দী] আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ﴾ অর্থাৎ "যেদিন তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের পরস্পর সম্ভাষণ হবে সালামের মাধ্যমে"। [সূরা আহ্‌যাবঃ ৪৪, অনুরূপ আয়াত আরো দেখুন, ওয়াকি'আঃ ২৫-২৬] অর্থাৎ সালাম শব্দটি তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, ফিরিশ্‌তাদের পক্ষ থেকে এবং মুমিনগণ পরস্পর নিজেদের মধ্যে বিনিময় করবে। সালাম শব্দের আরেক অর্থ দো'আ বা যাবতীয় আপদ থেকে নিরাপত্তা। তখন অর্থ হবে, জাহান্নামবাসীরা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে তোমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে। [তাবারী]

(১) জান্নাতবাসীদের তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের সর্বশেষ দো'আ হবে ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পৌঁছার পর আল্লাহ্ তা'আলাকে জানার ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি লাভ করবে। তখন তারা শুধু তাঁর প্রশংসাই করতে থাকবে। জান্নাতবাসীদের প্রাথমিক দো'আ হবে ﴿سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ﴾ আর সর্বশেষ দো'আ হবে ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ এতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর বিশেষ কিছু গুণ-বৈশিষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। [বাগভী] যেমন, পরাক্রম ও মহত্ত্ব গুণ যাতে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হতে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরো রয়েছে 'সিফাতে করম' যাতে তাঁর মহানুভবতা, পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। কুরআনুল কারীমের ﴿تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ﴾ [সূরা আর্-রাহমান: ৭৮] আয়াতে এতদুভয় গুণ-বৈশিষ্টের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ আয়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সদা প্রশংসিত। সহীহ হাদীসে এসেছে, "জান্নাতবাসীগণকে তাসবীহ ও তাহমীদ যথা সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহর ইলহাম এমনভাবে করা হবে যেমনিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ইলহাম করা হবে" [মুসলিমঃ ২৮৩৫] এটা একথাই প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ্ সদা প্রসংশিত। আমরা যদি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের প্রতি তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, আল্লাহ্ নিজেকে বিভিন্নভাবে প্রশংসনীয় বলে ব্যক্ত করেছেন। সূরা আল-ফাতিহার তাফসীরে তার বর্ণনা চলে গেছে।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾

১১. আর আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণে (সাড়া দিতে) তাড়াতাড়ি করেন, যেভাবে তিনি তাদের কল্যাণে (সাড়া দিতে) তাড়াতাড়ি করেন, তবে অবশ্যই তাদের মৃত্যুর সময় এসে যেত(১)। কাজেই যারা আমাদের

(১) এ আয়াতে الشر বা খারাপ বস্তু কি? এ নিয়ে মতভেদ আছে। এক. কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এখানে খারাপ বস্তু বলতে নদর ইবনে হারেস নামীয় কাফেরের বদদো'আ বোঝানো হয়েছে। যাতে সে বলেছিলঃ হে আল্লাহ্! যদি মুহাম্মাদের দ্বীন সত্য হয়, তবে আমার উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করে আমাকে ধ্বংস করে দিন। [বাগভী] এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়েই ক্ষমতাশীল, প্রতিশ্রুত এ আযাব এক্ষণেই নাযিল করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর মহান হেকমত ও দয়া-করুণার দরুন এ মূর্খরা নিজেদের জন্য যে বদদো'আ করে এবং বিপদ ও অকল্যাণ কামনা করে তা নাযিল করেন না। যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বদদো'আগুলোও তেমনিভাবে যথাশীঘ্র কবুল করে নিতেন, যেভাবে তাদের ভাল দো'আগুলো কবুল করেন, তাহলে এরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত। দুই. অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনের মতে এক্ষেত্রে বদদো'আর মর্ম এই যে, কোন কোন সময় কেউ কেউ রাগের বশবর্তী হয়ে নিজের সন্তান-সন্ততির কিংবা অর্থ-সম্পদ ধ্বংসের বদদো'আ করে বসে কিংবা বস্তুসামগ্রীর প্রতি অভিসম্পাত করতে আরম্ভ করে- আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণা ও মহানুভবতাবশতঃ সহসাই এসব দো'আ কবুল করেন না। [তাবারী; কুরতুবী; বাগভী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এতে প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভ দো'আ-প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় তিনি সেগুলো শীঘ্র কবুল করে নেন। অবশ্য কখনো কখনো হেকমত ও কল্যাণের কারণে কবূল না হওয়া এর পরিপন্থী নয়। কিন্তু মানুষ যে কখনো নিজেদের অজান্তে এবং কোন দুঃখ-কষ্ট ও রাগের বশে নিজের কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বদদো'আ করে বসে, অথবা আখেরাতের প্রতি অস্বীকৃতির দরুন আযাবকে প্রহসন মনে করে নিজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবূল করেন না; বরং অবকাশ দেন, যাতে অস্বীকারকারীরা বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট, রাগ-রোষ কিংবা যদি মনোবেদনার কারণে বদদো'আ করে বসে, তাহলে সে যেন নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ লক্ষ্য করে, তার পরিণতি বিবেচনা করে তা থেকে বিরত হবার অবকাশ পেতে পারে। তারপরও কোন কোন সময় এমন কবূলিয়ত বা মঞ্জুরীর সময় আসে, যখন মানুষের মুখ থেকে যে কোন কথা বের হয়,

সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাদেরকে আমরা তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরতে ছেড়ে দেই।

১২. আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ডেকে থাকে[১]। অতঃপর আমরা যখন তার দুঃখ-দৈন্য দূর করি, তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে যেন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়। সেজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'নিজের সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-সম্পদের জন্য কখনো বদদো'আ করো না। এমন যেন না হয় যে, সে সময়টি হয় মঞ্জুরীর সময় এবং দো'আ সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়'। [আবু দাউদঃ ১৫৩২, মুসলিমঃ ৩০০৯]

(১) এ আয়াতে সাধারণ মানুষের এক রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তা হলো এই যে, সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় এরা আল্লাহ্ ও আখেরাতের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়, অন্যান্যদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করে এবং তাদেরই কাছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করে, কিন্তু যখন কোন বিপদে পড়ে তখন এরা নিজেরাও আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত লক্ষ্যস্থলের প্রতি নিরাশ হয়ে গিয়ে শুধু আল্লাহ্‌কেই ডাকতে আরম্ভ করে। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁকেই ডাকতে বাধ্য হয়। [সা'দী] অথচ তাঁরই সাথে তাদের অনুগ্রহ বিমুখতার অবস্থা হল এই যে, যখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখনই আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে এমন মুক্ত হয়ে যায়, যেন কখনো তাঁকে ডাকেইনি, তাঁর কাছে যেন কোন বাসনাই প্রার্থনা করেনি। এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করেছেন। যেমন, সূরা আয-যুমারঃ ৮, আয-যুমারঃ ৪৯, আল-ইসরাঃ ৮৩, ফুসসিলাতঃ ৫১।

কিন্তু যাদের হেদায়াত নসীব হয়েছে এবং ঈমান এনেছে, তারা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সূরা হূদের ১১ নং আয়াতে ব্যতিক্রম বলে ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মুমিনের কাজ-কারবার দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়, আল্লাহ্ তার জন্য যা কিছুই ঘটাক সেটাই তার জন্য কল্যাণের রূপ নেয়। যদি তার কোন ক্ষতি বা দুঃখজনক কিছু ঘটে তখন সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তার কোন খুশী বা লাভজনক কিছু হয় তাতে সে কৃতজ্ঞ হয়, শুকরিয়া আদায় করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। এটা একমাত্র মুমিনই পেতে পারে, আর কারো পক্ষে নয়'। [মুসলিমঃ ২৯৯৯]

তার জন্য সে আমাদেরকে ডাকেইনি। এভাবেই সীমালংঘনকারীদের কাজ তাদের কাছে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

১৩. আর অবশ্যই আমরা তোমাদের আগে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি যখন তারা যুলুম করেছিল। আর তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল, কিন্তু তারা ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি[১]।

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

১৪. তারপর আমরা তোমাদেরকে তাদের পর যমীনে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কিরূপ কাজ কর তা দেখার জন্য[২]।

---

(১) অর্থাৎ কেউ যেন আল্লাহ্ তা'আলার অবকাশ দানের কারণে এমন ধারণা করে না বসে যে, পৃথিবীতে আযাব আসতেই পারে না। বিগত জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাদের ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার সাক্ষীস্বরূপ বিভিন্ন রকম আযাব এ পৃথিবীতেই এসে গেছে। এটা হচ্ছে জাতিসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ্র নীতি। [সা'দী] আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দো'আ কবুল করে নিয়েছেন যে, কোন সাধারণ ব্যাপক আযাব এ উম্মতের উপর আসবে না। ফলে আল্লাহ্ তা'আলার এহেন করুণা, অনুগ্রহ এসব লোককে এমন নির্ভয় করে দিয়েছে যে, তারা একান্ত দুঃসাহসের সাথে আল্লাহ্র আযাবকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং তার দাবী করতে তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তা'আলার আযাব সম্পর্কে এ নিশ্চিন্ততা কোন অবস্থাতেই তাদের জন্য সমীচীন ও কল্যাণকর নয়। কারণ, গোটা উম্মত এবং সমগ্র বিশ্বের উপর ব্যাপক আযাব না আসলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর আযাব নেমে আসা অসম্ভব নয়।

(২) অর্থাৎ অতঃপর পূর্ববর্তী জাতি-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি। এই মর্যাদা ও সম্মান দানের পিছনে আসল উদ্দেশ্য হলো তোমাদের পরীক্ষা নেয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "দুনিয়া হলো সুফলা সুমিষ্ট জিনিস, আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধিত্ব

وَاِذَا تُتۡلٰی عَلَیۡهِمۡ اٰیَاتُنَا بَیِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِیۡنَ
لَا یَرۡجُوۡنَ لِقَآءَنَا ائۡتِ بِقُرۡاٰنٍ غَیۡرِ هٰذَاۤ اَوۡ
بَدِّلۡهُ ؕ قُلۡ مَا یَكُوۡنُ لِیۡۤ اَنۡ اُبَدِّلَهٗ مِنۡ تِلۡقَآیِٔ
نَفۡسِیۡ ۚ اِنۡ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوۡحٰۤی اِلَیَّ ۚ اِنِّیۡۤ اَخَافُ
اِنۡ عَصَیۡتُ رَبِّیۡ عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ ﴿۱۵﴾

১৫. আর যখন আমাদের আয়াত, যা সুস্পষ্ট, তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না[১] তারা বলে, 'অন্য এক কুরআন আন এটা ছাড়া, বা এটাকে বদলাও ।' বলুন, 'নিজ থেকে এটা বদলানো আমার কাজ নয় । আমার প্রতি যা ওহী হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ

করাবেন । এতে করে তিনি দেখতে চান তোমাদের আমল কেমন? সুতরাং তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন কর এবং মহিলাদের ব্যাপারেও তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর । কেননা বনী ইসরাঈলদের প্রথম পরীক্ষা ছিল মহিলাদের দ্বারা" । [মুসলিমঃ ২৭৪২]

(১) এ আয়াতে আখেরাত অস্বীকারকারীদের একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং অন্যায় আবদারের খণ্ডন করা হয়েছে । এসব লোক আল্লাহ্ তা'আলার ওহী ও রেসালাত সম্পর্কিত কোন পরিচয় জানত না । যে কুরআনুল কারীম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পৌঁছেছে, তার সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল এই যে, এটি স্বয়ং তারই কালাম, তারই রচনা । এ ধারণার প্রেক্ষিতেই তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে দাবী জানায় যে, কুরআন এটি তো আমাদের বিশ্বাসের বিরোধী; যে মূর্তি-বিগ্রহকে আমাদের পিতা-পিতামহ সততঃ সম্মান করে এসেছে, কুরআন সে সমুদয়কে বাতিল ও পরিতাজ্য সাব্যস্ত করে । তদুপরি কুরআন আমাদের বলে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে । এসব বিষয় আমাদের বুঝে আসে না । আমরা এসব মানতে রাযী নই । সুতরাং হয় আপনি এ কুরআনের পরিবর্তে অন্য কুরআন তৈরী করে দিন যাতে এসব বিষয় থাকবে না, আর না হয় অন্ততঃ এতেই সংশোধন করে সে বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিন । [দেখুন, বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তারা আরও চাচ্ছিল যে, হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দিন । [তাবারী; কুরতুবী] আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হেদায়াত দান করেছেন যে, আপনি তাদের বলে দিনঃ এটি আমার কালামও নয় এবং নিজের ইচ্ছামত আমি এতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করতে পারি না । আমি তো শুধুমাত্র আল্লাহ্র ওহীর তাবেদার । আমি আমার ইচ্ছামত এতে যদি সামান্যতম পরিবর্তনও করি, তাহলে অতি কঠিন গোনাহ্গার হয়ে পড়ব এবং নাফরমানদের জন্য যে আযাব নির্ধারিত রয়েছে, আমি তার ভয় করি । কাজেই আমার পক্ষে এমনটি অসম্ভব । [ফাতহুল কাদীর]

করি(১)। আমি আমার রবের অবাধ্যতা করলে অবশ্যই মহা দিনের শাস্তির আশংকা করি।

১৬. বলুন, 'আল্লাহ্ যদি চাইতেন আমিও তোমাদের কাছে এটা তিলাওয়াত করতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এ বিষয়ে জানাতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি(২); তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না(৩)?'

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦﴾

---

(১) এটি হচ্ছে ওপরের দু'টি কথার জবাব। এখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আমি এ কিতাবের রচয়িতা নই বরং অহীর মাধ্যমে এটি আমার কাছে এসেছে এবং এর মধ্যে কোন রকম রদবদলের অধিকারও আমার নেই। আর তাছাড়া এ ব্যাপারে কোন প্রকার সমঝোতার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই। যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে এ সমগ্র দ্বীনকে হুবহু গ্রহণ করতে হবে, নয়তো পুরোপুরি রদ করে দিতে হবে।

(২) এ সময়টুকু ছিল, চল্লিশ বৎসর। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুওয়াত দেন"। [বুখারীঃ ৩৫৪৮, মুসলিমঃ ২৩৪৭]

(৩) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নিজে এ কিতাবের রচয়িতা নন বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে এটি তার ওপর নাযিল হচ্ছে, তার এ দাবীর সপক্ষে এটি একটি জোরালো যুক্তি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন তো তাদের মাঝেই ছিল। নবুওয়াত লাভের আগে পুরো চল্লিশটি বছর তিনি তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন। কোন লেখা পড়া জানতেন না। [কুরতুবী] তিনি তাদের শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের চোখের সামনে তাঁর শিশুকাল অতিক্রান্ত হয়। সেখানেই বড় হন। যৌবনে পদার্পণ করেন তারপর প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেন। থাকা-খাওয়া, ওঠাবসা, লেনদেন, বিয়ে শাদী ইত্যাদি সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তাদের সাথেই ছিল এবং তার জীবনের কোন দিক তাদের কাছে গোপন ছিল না। তার এ জীবনধারার মধ্যে দু'টি বিষয় একেবারেই সুস্পষ্ট ছিল। মক্কার প্রত্যেকটি লোকই তা জানতো। এক, নবুওয়াত লাভ করার আগে তার জীবনের পুরো চল্লিশটি বছরে তিনি এমন কোন শিক্ষা, সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ লাভ করেননি এবং তা থেকে এমন তথ্যাদি সংগ্রহ করেননি যার ফলে একদিন হঠাৎ নবুওয়াতের দাবী করার সাথে সাথেই তার কণ্ঠ থেকে এ তথ্যাবলীর ঝর্ণাধারা নিঃসৃত হতে আরম্ভ করেছে। দ্বিতীয় যে কথাটি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে সুস্পষ্ট ছিল সেটি এই যে, নবুওয়াত লাভের পূর্ব থেকেই তিনি

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝١٧

১৭. অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা বা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে(১)? নিশ্চয় অপরাধীরা সফলকাম হবে না(২)।

সততা ও আমানতদারীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। [কুরতুবী] মিথ্যা, প্রতারণা, জালিয়াতী, ধোঁকা, শঠতা, ছলনা এবং এ ধরনের অন্যান্য অসৎগুণাবলীর কোন সামান্যতম গন্ধও তাঁর চরিত্রে পাওয়া যেতো না। মূলতঃ এটা এমন একটি দিক যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের অত্যন্ত সুস্পষ্ট দলীল। সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমরা কি তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) এ-ধরনের (অর্থাৎ নবুওয়তের) দাবীর পূর্বে কখনো মিথ্যা বলার অপবাদ দিতে? আবু সুফিয়ান তখন বলেছিল, না-- অথচ আবু সুফিয়ান ঐ সময় কাফেরদের সর্দার ছিল। তারপরও সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হক কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল। আর জানা কথা যে, শত্রুদের মুখ থেকে যে প্রশংসা বের হয় তা যথার্থ প্রশংসা। মোট কথাঃ তখন সম্রাট হিরাক্লিয়াস বলেছিলেনঃ "আমি এটা অবশ্যই বুঝি যে, সে মানুষের সাথে মিথ্যা কথা ত্যাগ করেছে তারপর সে আল্লাহর উপর মিথ্যা কথা বলবে এটা কখনো হতে পারে না"। [বুখারীঃ ৭, মুসলিমঃ ১৭৭৩] অনুরূপভবে জা'ফর ইবনে আবি তালেবও আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাসির দরবারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বলেছেন যে, "আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে এমন একজন রাসূলকে পাঠিয়েছেন যার গুণাগুণ বংশ পরিচয় ও আমানতদারী সম্পর্কে আমাদের সবাই জানে"। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২০১]

(১) অর্থাৎ তার চাইতে বড় যালেম আর কেউ নেই যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করে এবং তাঁর বাণী পরিবর্তন করে। আর তিনি যা নাযিল করেছেন তার সাথে কোন কিছু যোগ করে দেয়। অনুরূপভাবে তোমাদের থেকে বড় যালেমও আর কেউ হবে না যদি তোমরা কুরআনকে অস্বীকার কর এবং আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ দাও এবং বল যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম নয়। এটাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তিনি তাদেরকে এটা জানিয়ে দেন। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যাচার করে তারা কখনো সফলকাম হবে না। তাদের কর্মকাণ্ড মানুষের কাছে মিথ্যা হিসেবে বিবেচিত হবেই। মূলত: নবী সত্য বা মিথ্যা এটা জানার বিভিন্ন পদ্ধতি বিদ্যমান। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, দু'জনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কথাবার্তা, চাল-চলন ইত্যাদি তুলনা করা। বিবেকবান মাত্রই এ কাজটি সহজে করতে পারে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসাইলামা কায্যাবের কোন তুলনা কি চলে? আমর ইবনে 'আস একবার মুসাইলামার কাছে গেল। মুসাইলামা তার পুরাতন বন্ধু ছিল। আমর তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি।

১৮. আর তারা আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর 'ইবাদাত করছে যা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এগুলো আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী।' বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আসমানসমূহ ও যমীনের এমন কিছুর সংবাদ দেবে যা তিনি জানেন না[১]? তিনি মহান, পবিত্র'

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

তখন মুসাইলামা তাকে জিজ্ঞাসা করলঃ হে আমর! তোমাদের লোকের (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর) উপর এ সময়ে কি নাযিল হয়েছে? আমর ইবনে 'আস জবাবে বললঃ আমি তার সাথীদের একটি সূরা পড়তে শুনেছি। মুসাইলামা বললঃ সেটা কি? আমর বললোঃ ﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ সূরাটি শুনে মুসাইলামা কিছুক্ষণ চিন্তা করতে থাকলো, তারপর বললোঃ আমার উপরও অনুরূপ নাযিল করা হয়েছে। আমর বললোঃ সেটা কি? সে বললঃ يَا وَبَر، إِنَّمَا أَنْتَ أُذُنَانِ وَصَدَرُ، وَسَائِرُكَ حَقَرٌ نَقَرٌ তারপর মুসাইলামা বাহাদুরী নেয়ার আশায় আমরের দিকে তাকিয়ে বললোঃ আমর! কেমন লাগলো? তখন আমর বললোঃ আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তুমি অবশ্যই এটা জানো যে, আমি জানি, তুমি মিথ্যা বলছ"। [ইবন কাসীর; ইবন রাজাব, জামে'উল 'উলুম ওয়াল হিকাম: ১১২] এটাই যদি একজন কাফেরের বিশ্লেষণ তাহলে মুমিন কত সহজেই সত্য নবী ও মিথ্যা নবীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে তা বলাই বাহুল্য। অপরদিকে আমরা সত্য নবীর ব্যাপারেও তার সততার সাক্ষ্য খুব সহজভাবেই দেখতে পাই। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলেনঃ "যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমণ করলেন তখন লোকেরা চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসলো। আমিও তাদের সাথে আসার পর যখন আমি তাকে দেখলাম তখনি বুঝতে পারলাম যে, তার চেহারা কোন মিথ্যুক লোকের চেহারা নয়। তখন আমি প্রথম যে কথা কয়টি শুনেছিলাম তা হলোঃ হে মানব সম্প্রদায়! সালামের প্রসার কর, খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখো এবং রাতে মানুষেরা যখন ঘুমন্ত থাকে তখন সালাত আদায় কর, ফলে তোমরা প্রশান্তির সাথে বা সালামের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে"। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪২৮৩]।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞানী। আসমান ও যমীনে যা আছে তাঁর জ্ঞান সেটাকে ঘিরে আছে। তিনি তোমাদের জানাচ্ছেন যে, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর সাথে কোন ইলাহ নেই। আর হে মুশরিক সম্প্রদায়! তোমরা মনে করছ যে, তাঁর শরীক পাওয়া যায়? তোমরা কি তাঁকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তাঁর কাছে গোপন রয়েছে

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

এবং তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

১৯. আর মানুষ ছিল একই উম্মত, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে(১)। আর আপনার রবের পূর্ব-ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়েই যেত(২)।

এবং তোমরা জেনে নিয়েছ? এটা নিঃসন্দেহে বড় অসার কথা। এ মূর্খ লোকগুলো কি রাব্বুল আলামীনের চেয়ে বেশী জানে? এ বিষয়টি সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলেই এর অসারতা ধরা পড়ে। [সা'দী] কারণ, কোন জিনিসের আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, সেটির কোন অস্তিত্বই নেই। কারণ, যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সবই আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আল্লাহ তো জানেন না আকাশে ও পৃথিবীতে তাঁর কোন শরীক আছে। অনুরূপভাবে তিনি জানেন না তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন সুপারিশকারী আছে, এটি সুপারিশকারীদের অস্তিত্বহীনতার ব্যাপারে একটি চমৎকার বর্ণনা পদ্ধতি। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে যখন কোন সুপারিশকারী আছে বলে আল্লাহর জানা নেই এখন তোমরা কোন্ সুপারিশকারীদের কথা বলছ? [ফাতহুল কাদীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটি বলেছেন। তিনি বলেন, "আর তারা আল্লাহ্‌র বহু শরীক সাব্যস্ত করেছে। বলুন, তাদের পরিচয় দাও। নাকি তোমরা যমীনের মধ্যে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও যা তিনি জানেন না?" [সূরা আর-রা'দ: ৩৩]

(১) অর্থাৎ সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে একত্ববাদে বিশ্বাসী একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। শির্ক ও কুফরের নামও ছিল না। পরে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। একই উম্মত এবং সবার মুসলিম থাকার সময়কাল কতদিন এবং কবে ছিল তা বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর যুগ পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আদম ও নূহের মধ্যে দশ প্রজন্ম ছিল যারা তাওহীদের উপর ছিল। [তাবারী; ইবন কাসীর] এরপর মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শির্কী বিস্তার লাভ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলদেরকে ভীতিপ্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদানকারী হিসেবে কিতাবসহ প্রেরণ করেন। "যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর জীবিত থাকে" [সূরা আল-আনফাল: ৪২] [ইবন কাসীর]

(২) কোন কোন মুফাসসির বলেন, সে কলেমাটি হচ্ছে এই যে, তিনি এ উম্মতকে সবশেষে আনবেন এবং তাদেরকে দুনিয়াতে আযাব না দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। যদি এ অবকাশ না থাকত তবে অবশ্যই তাদের আযাব দিয়ে শেষ করে দেয়া

২০. আর তারা বলে, 'তার রবের কাছ থেকে তার কাছে কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন(১)?' বলুন, 'গায়েবের

وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟

হতো অথবা কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যেত। [কুরতুবী] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, এখানে 'কালেমা' বলে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, তিনি কাউকে দলীল-প্রমাণাদি ছাড়া পাকড়াও করবেন না। আর সেটা হচ্ছে, রাসূল প্রেরণ। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত শাস্তি প্রদানকারী নই" [সূরা আল-ইসরা: ১৫] কারও কারও মতে, এখানে 'কালেমা' বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে বর্ণিত একটি কালেমাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে এসেছে, 'আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে' [বুখারী: ৭৫৫৩; মুসলিম: ২৭৫১] যদি তা না হতো তবে তিনি অপরাধীদেরকে তাওবার সময় দিতেন না। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ এ ব্যাপারে নিদর্শন যে, তিনি যথার্থই সত্য নবী এবং যা কিছু তিনি পেশ করছেন তা পুরোপুরি ঠিক। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে, নিদর্শন পেশ করার দাবী তারা এ জন্য করেনি যে, তারা সাচ্চা দিলে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। আসলে নিদর্শনের এ দাবী শুধুমাত্র ঈমান না আনার জন্য একটি বাহানা হিসেবে পেশ করা হচ্ছিল। তাদেরকে যাই কিছু দেখানো হতো তা দেখার পরও তারা একথাই বলতো, আমাদের কোন নিদর্শনই দেখানো হয়নি। কারণ তারা ঈমান আনতে চাচ্ছিল না। আল্লাহ্ বলেনঃ "কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছে করলে আপনাকে দিতে পারেন এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু-উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত এবং তিনি দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ! কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে তার জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন"। [সূরা আল-ফুরকানঃ ১০] অন্য আয়াতে বলেনঃ "পূর্ববর্তীগণের নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন পাঠান থেকে বিরত রাখে।" [সূরা আল-ইসরাঃ ৫৯] কারণ, তাদের চাহিদা মোতাবেক নিদর্শন পাঠানোর পর যদি ঈমান না আনে তাহলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। কারণ, আল্লাহ্র নিয়ম হচ্ছে যে, সুনির্দিষ্ট কোন নিদর্শন চাওয়া হলে সেটা দেয়ার পর যদি ঈমান না আনে তবে তাদের ধ্বংস করা হয়। আর এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যখন নিদর্শন দেয়া ও অবকাশ না দেয়া আর নিদর্শন না দিয়ে অবকাশ দেয়ার মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছিলেন [ইবন কাসীর] কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মোটেই কোন নিদর্শন দেখাননি। তাদেরকে অনেক বড় নিদর্শন দেখিয়েছেন। যেমন তাদের চাহিদা মোতাবেক চাঁদকে এমনভাবে দ্বিখণ্ডিত করে দেখিয়েছেন যে, কাফেরগন দু'খণ্ডের মাঝে পাহাড় দেখতে পেয়েছিল। [বুখারীঃ ৩৬৩৬, মুসলিমঃ ২৮০০] কিন্তু তারপরও তারা ঈমান আনেনি। বরং আরো বেশী নিদর্শন দাবী করতে লাগল। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ঈমান আনা নয়, তাদের

إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۝٢٠

জ্ঞান তো শুধু আল্লাহ্‌রই আছে। কাজেই তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি[১]।'

তৃতীয় রুকূ'

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۝٢١

২১. আর দুঃখ-দৈন্য তাদেরকে স্পর্শ করার পর যখন আমরা মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদন করাই তারা তখনই আমাদের আয়াতসমূহের বিরুদ্ধে অপকৌশল

উদ্দেশ্য হঠকারিতা। আল্লাহ্ বলেনঃ "তারা যত নিদর্শনই দেখুক না কেন ঈমান আনবে না"। [সূরা আল-আন'আমঃ ২৫] আরো বলেনঃ "তারা যাবতীয় নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনবে না"। [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৪৬] আরো বলেনঃ "নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না। যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে"। [সূরা ইউনুসঃ ৯৬-৯৭] অন্য আয়াতে বলেনঃ "আমরা তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা পাঠালেও, মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে হাজির করলেও তারা কখনো ঈমান আনবে না; তবে যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছে হয়" [সূরা আল-আন'আমঃ ১১১]। অহংকার ও সত্যকে অস্বীকার করা তাদের মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। তারা সুস্পষ্ট বিষয়কেও জেনে বুঝে অস্বীকার করতে দ্বিধা করে না। আল্লাহ্ বলেনঃ "যদি তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহন করতে থাকে, তবুও তারা বলবে,'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।'[সূরা আল-হিজরঃ ১৪-১৫] আরো বলেনঃ "তারা আকাশের কোন খন্ড ভেংগে পড়তে দেখলে বলবে, 'এটা তো এক পুঞ্জিভূত মেঘ।"[সূরা আত-তূরঃ ৪৪] আল্লাহ আরো বলেনঃ "আমরা যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম আর তারা যদি সেটা হাত দিয়ে স্পর্শও করত তবুও কাফিররা বলত, 'এটা স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।" [সূরা আল-আন'আমঃ ৭]

(১) অর্থাৎ আয়াত নাযিল করা একান্ত গায়েবী বিষয়। [কুরতুবী] আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তা আমি পেশ করে দিয়েছি। আর যা তিনি নাযিল করেননি তা আমার ও তোমাদের জন্য "গায়েবী বিষয়" এর ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইখতিয়ার নেই। তিনি চাইলে তা নাযিল করতে পারেন। এখন আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেননি তা আগে তিনি নাযিল করুন—একথার ওপর যদি তোমাদের ঈমান আনার বিষয়টি আটকে থাকে তাহলে তোমরা তার অপেক্ষায় বসে থাকো। [কুরতুবী] অথবা আয়াতের অর্থ, তোমরা আমাদের আল্লাহ্‌র ফয়সালার অপেক্ষা কর। তিনি হককে অবশ্যই বাতিলের উপর প্রকাশ করে দিবেন। [বাগভী]

করে[১]। বলুন, 'আল্লাহ্ কৌশল অবলম্বনে আরো বেশী দ্রুততর[২]।' নিশ্চয় তোমরা যে অপকৌশল কর তা আমাদের ফিরিশ্‌তারা লিখে রাখে।

২২. তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান। এমনকি তোমরা যখন নৌযানে আরোহন কর এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বেরিয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদিক থেকে উত্তাল তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা নিশ্চিত ধারণা করে যে, এবার তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে, তখন তারা আল্লাহকে তাঁর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে ডেকে বলেঃ 'আপনি আমাদেরকে এ থেকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

هُوَالَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰۤى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۲۲﴾

(১) অর্থাৎ যখনই আল্লাহর রহমতে তোমাদের বিপদ দূরীভূত হয়েছে তখনই তোমরা এ বিপদ আসার ও দূরীভূত হবার হাজারটা ব্যাখ্যা (চালাকি) করতে শুরু করে থাকো। এখানে বিপদ বলে সার্বিক বিপদ হলেও কোন কোন মুফাসসিরের মতে, অনাবৃষ্টির পরে বৃষ্টি, খরার পরে সতেজতা আসা। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] এটা যে আমার নিদর্শন সেটা স্বীকার করতে চাও না। বরং তোমরা আমাদের নিদর্শন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাক। [কুরতুবী] তারা তখন হককে প্রতিহত করার জন্য বাতিল নিয়ে আসে। [সা'দী] এভাবে তারা তাওহীদকে মেনে নেয়া থেকে নিস্কৃতি পেতে এবং নিজেদের শির্কের ওপর অবিচল থাকতে চায়।

(২) আয়াতে আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেও مكر শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী অভিধান অনুসারে مَكْر বলা হয় গোপন পরিকল্পনাকে, যা ভালও হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে। এ ব্যাপারে সূরা বাকারার ১৫ নং আয়াতে বিস্তারিত টিকা দেয়া হয়েছে। এর বাইরেও তোমরা যা কিছু করবে আল্লাহর ফেরেশতারা তা লিখে নিতে থাকবেন। এভাবে এক সময় অকস্মাৎ মৃত্যুর পয়গাম এসে যাবে। তখন নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব দেবার জন্য তোমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন তিনি তোমাদের ছোট বড় সবকিছুর প্রতিদান দিবেন। [ইবন কাসীর]

فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَـٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখন তারা যমীনে অন্যায়ভাবে সীমালজ্ঘন করতে থাকে[১]। হে মানুষ! তোমাদের সীমালজ্ঘন কেবলমাত্র তোমাদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে[২]; দুনিয়ার জীবনের সুখ ভোগ করে নাও[৩], পরে আমাদেরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমরা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা যা করতে।

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ

২৪. দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত তো এরূপঃ যেমন আমরা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন

(১) এর সমার্থে আরো আয়াত দেখুন, সূরা আল-ইসরাঃ ৬৭।

(২) অর্থাৎ তোমাদের অন্যায়-অনাচারের বিপদ তোমাদেরই উপর পড়ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, যুলুমের কারণে বিপদ অবশ্যম্ভাবী এবং দুনিয়াতেও তা ভোগ করতে হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'অন্যায়-অনাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই প্রাপ্ত হওয়া উপযুক্ত। তদুপরি আখেরাতে তার শাস্তি তো রয়েছেই'। [আবু দাউদঃ ৪৯০২, তিরমিযীঃ ২৫১১, ইবনে মাজাহ্‌ঃ ৪২১১] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ দু'টি গোনাহ্‌র শাস্তি তাড়াতাড়ি দেয়া হয়, দেরী করা হয় না। অন্যায়-অনাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৬, বুখারী আদাবুল মুফরাদঃ ৮৯৫, হাকেম মুস্তাদরাকঃ ৪/১৭৭] তাছাড়া হাদীসে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "সীমালজ্ঘন বা যুলুম করো না, আল্লাহ্ যুলুমকারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ বলেনঃ 'তোমাদের যুলুম তো তোমাদের নিজের নফস বা আত্মার উপরই"। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৩৮]

(৩) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. তোমাদের সীমালজ্ঘন তো দুনিয়ার ভোগ অর্জনের জন্যই। দুই. সীমালজ্ঘন করে তোমরা দুনিয়ার ভোগ অর্জন করতে পারবে। তিন. তোমাদের সীমালজ্ঘনের মাধ্যমে কেবল দুনিয়ার জীবনের সময়টুকুতেই উপকৃত হতে পারবে। চার. তোমরা যে সীমালজ্ঘন করছ তার উদাহরণ হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে ভোগ অর্জনের মত। [ফাতহুল কাদীর]

وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ
وَظَنَّ اَهْلُهَاۤ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَاۤ ۙ اَتٰىهَاۤ اَمْرُنَا
لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ
تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীব-জন্তু খেয়ে থাকে। তারপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারিগণ মনে করে সেটা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিনে বা রাতে আমাদের নির্দেশ এসে পড়ে তারপর আমরা তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকালও সেটার অস্তিত্ব ছিল না[১]। এভাবে আমরা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে[২]।

---

(১) অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু এতই ক্ষনস্থায়ী যে, সেটা হস্তচ্যুত হয়ে গেলে এমন মনে হয় যেন তা কোনদিনই তার ছিল না। পক্ষান্তরে আখেরাতের নেয়ামত এমন হবে যে, তার তুলনায় দুনিয়ার সব দুঃখ কষ্ট মানুষ বেমালুম ভুলে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেনঃ "দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী নেয়ামতের অধিকারীকে কিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে একবার ঢুকিয়ে আনার পর জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি তোমার দুনিয়ার জীবনে কোন ভাল বা কল্যাণ কিছু পেয়েছিলে? তুমি কি কোন নেয়ামত পেয়েছিলে? সে বলবেঃ না। অপরপক্ষে, দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কষ্টের মধ্যে ছিল এমন লোককে নিয়ে আসা হবে তারপর তাকে জান্নাতে ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি কখনো দুঃখ কষ্ট দেখেছিলে? সে বলবেঃ না।"[মুসলিমঃ ২৮০৭]

(২) কারণ চিন্তাশীল মাত্রই বুঝতে পারে যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। শুধু তাই নয় ধোকাবাজও। দুনিয়ার চরিত্রই হলো এমন যে, যারা এর পিছনে ছুটে সে তাদের থেকে দূরে ছুটে যায় আর যার তার থেকে দূরে থাকতে চায় সে তাদের পিছু নেয়। দুনিয়ার উদাহরণ হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'যমীনের মধ্যে উৎপন্ন উদ্ভিদ' বলে উল্লেখ করেছেন। [ইবন কাসীর] যেমন, "তাদের কাছে পেশ কর উপমা দুনিয়ার জীবনের: এটা পানির ন্যায় যা আমরা বর্ষণ করি আকাশ থেকে, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, তারপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সব কিছুর উপর শক্তিমান" [সূরা আল-কাহফ: ৪৫] অনুরূপ আয়াত আরও এসেছে সূরা আয-যুমার ও সূরা আল-হাদীদে। [ইবন কাসীর]

২৫. আর আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন[১] এবং যাকে ইচ্ছে

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ۗ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শান্তির আলয়ের দিকে আহ্বান করেন। অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবন যাপন করার এমন পদ্ধতির দিকে তোমাদের আহবান জানান, যা আখেরাতের জীবনে তোমাদের দারুস সালাম বা শান্তির ভবনের অধিকারী করে। যে শান্তি ভবনে রয়েছে সর্ববিধ নিরাপত্তা ও শান্তি। না আছে তাতে কোন রকম দুঃখ-কষ্ট, না আছে ব্যাথা-বেদনা, না আছে রোগ-তাপের ভয়, আর না আছে ধ্বংস। এখানে السَّلام শব্দ দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছেঃ

একঃ 'দারুস্সালাম'-এর মর্মার্থ হলো জান্নাত। একে 'দারুস্সালাম' বলার কারণ হলো এই যে, প্রত্যেকেই এখানে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ করবে। [বাগভী; ইবন কাসীর]

দুইঃ কোন কোন মুফাস্সির বলেনঃ এখানে সালাম অর্থ সম্ভাষণ, সালাম যা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান হয়। সে হিসেবে 'দারুস্সালাম' এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এতে বসবাসকারীদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং ফিরিশ্তাদের পক্ষ থেকেও সালাম পৌঁছতে থাকবে। অনুরূপভাবে তারাও একে অন্যের সাথে সালাম বিনিময় করতে থাকবে। [কুরতুবী]

তিনঃ হাসান ও কাতাদাহ্ বলেনঃ 'আস্সালাম' যেহেতু আল্লাহ্র নাম, সেহেতু তাঁর ঘর হলো জান্নাত, সে হিসেবে 'দারুস্সালাম' অর্থ আল্লাহ্র ঘর। আর আল্লাহ্ তাঁর ঘরের দিকে আহ্বানের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, মনে হলো জিবরীল আমার মাথার কাছে, আর মীকাঈল পায়ের কাছে অবস্থান করছে, তাদের একজন অন্যজনকে বলছেঃ এর একটা উদাহরণ দাও। অপরজন তার উত্তরে বললঃ শুনুন! আমার কান শুনছে, অনুধাবন করুন, আপনার হৃদয় অনুধাবন করছে। আপনার এবং আপনার উম্মতের উদাহরণ হলো এমন বাদশাহ্র মত যিনি একটি বাড়ী নির্মাণ করে তাতে একটি ঘর বানালেন, তারপর সেখানে তিনি মেহমানদারীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেন, তারপর সেখানে খাবার খাওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে দূত প্রেরণ করলেন। দাওয়াতকৃতদের মধ্যে কেউ কেউ তার দাওয়াত গ্রহণ করে নিল। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তা বর্জন করল। এখানে আল্লাহ্ হলেন বাদশাহ্, তাঁর বাড়ী হলো ইসলাম, তাঁর ঘর হলো জান্নাত আর হে মুহাম্মাদ! আপনি হলেন দূত। যে আপনার দাওয়াত কবূল করল সে ইসলামে প্রবেশ করল, আর যে ইসলামে প্রবেশ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে জান্নাতে প্রবেশ করল সে তা থেকে খাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করল'। [তাবারীঃ ১৭৬২৪, মুসতাদরাকঃ ৩/৩৩৮-৩৩৯]

অন্য এক হাদীসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'প্রতিদিন

সরল পথে পরিচালিত করেন[১]।

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

২৬. যারা ইহসানের সাথে আমল করে (উত্তমরূপে কাজ করে) তাদের জন্য আছে জান্নাত এবং আরো বেশী[২]।

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ

সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে তার দু'পার্শ্বে দু'জন ফিরিশ্‌তা ডাকতে থাকে, যা মানুষ ও জিন ব্যতীত সবাই শোনে। তারা বলতে থাকেঃ হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রভূর কাছে আস...'। [তাবারীঃ ১৭৬২৩, ইবনে হিব্বানঃ ২৪৭৬, আহমাদঃ ৫/১৯৭]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পৌঁছে দেন। এখানে 'সিরাতুল মুস্তাকীম'-এর অর্থ কোন কোন মুফাসসিরের মতে, কুরআন। [কুরতুবী] কাতাদা ও মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ- হক, সত্য ও ন্যায়। আবুল আলীয়া ও হাসান বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার দুই সাথী আবু বকর ও উমর। [তাবারী] আবার কারও কারও মতে, ইসলাম। এর মর্মার্থ হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দারুস্‌সালামের দাওয়াত সমগ্র মানবজাতির জন্যই ব্যাপক। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে হেদায়াতও ব্যাপক। কিন্তু হেদায়াতের বিশেষ প্রকার- সরল-সোজা পথে তুলে দেয়া এবং তাতে চলার তাওফীক বিশেষ বিশেষ লোকদের ভাগ্যেই জোটে। আর তারা হলেন ঐ সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। [বাগভী; কুরতুবী] 'সিরাত' এর তাফসীর ইসলাম দ্বারা করলে সমস্ত অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। তাছাড়া এটি এক হাদীস দ্বারা সমর্থিত। যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরাতে মুস্তাকীমের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি একটি সোজা রাস্তা দেখালেন, যার দু' পাশে দু'টি দেয়াল রয়েছে, যাতে রয়েছে অনেকগুলো খোলা দরজা। যে দরজাগুলোতে আবার ঢিলে করে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। আর পথের উপর একজন আহ্বানকারী রয়েছেন। তিনি বলছেন, হে লোকসকল, তোমরা সকলে পথে প্রবেশ কর। বাঁকা পথে চলো না। (অথবা বাঁকা পথের দিকে তাকিয়ে আনন্দ নিতে চেষ্টা করো না) আর একজন ডাকছে রাস্তার মাঝখান থেকে। তারপর যখনই কেউ কোন দরজা খুলতে চেষ্টা করে, তখনি সে বলতে থাকে, তোমার জন্য আফসোস! তুমি এটা খুলো না, কেননা, তুমি এটা খুললে তাতে প্রবেশ করে বসবে। আর সে পথটি হচ্ছে ইসলাম। তার দু' পাশের দু'টি দেয়াল হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমানা। আর খোলা দরজাগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্‌র হারামকৃত বিষয়াদি। আর পথের মাথা থেকে যে ডাকছে সে হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব। আর যে রাস্তার উপর বা মাঝখান থেকে ডাকছে সে হচ্ছে, প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে আল্লাহ্‌র নসীহতকারী।' [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৮২]

(২) এ আয়াতে أَحْسَنُوا বলে বুঝানো হয়েছে ঐ সমস্ত লোকদেরকে যারা ইহ্‌সানের সাথে তাদের সৎকাজ করেছে। আর ইহ্‌সানের অর্থ যা হাদীসে এসেছে তা হলো, এমনভাবে

فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ۝٢٦

কালিমা ও হীনতা তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না[১]। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَالَّذِيۡنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۢ بِمِثۡلِهَا ۙ وَتَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ مِنۡ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَاۤ اُغۡشِيَتۡ وُجُوۡهُهُمۡ قِطَعًا مِّنَ الَّيۡلِ مُظۡلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ

২৭. আর যারা মন্দ কাজ করে, প্রতিটি মন্দের প্রতিদান হবে তারই অনুরূপ মন্দ এবং হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে[২]; আল্লাহ্‌ থেকে তাদের রক্ষা

আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করা যেন সে আল্লাহকে দেখছে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে এটা যেন বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তো তাকে দেখছেন। সুতরাং যারা ইহ্‌সানের সাথে তাদের 'ইবাদাত সম্পাদন করেছে তারা হলো পরিপূর্ণ তাওহীদ বাস্তবায়নকারী। তাদের জন্য দু'টি পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে- (১) الْحُسْنٰى যার অর্থ জান্নাত। (২) زِيَادَةٌ যার অর্থ বাড়তি পাওনা। এর অর্থ এও হতে পারে যে, তাদেরকে শুধু তাদের কাজ অনুসারেই প্রতিফল দেয়া হবে না বরং তাদের আমলের সওয়াব দশগুণ ও ততোধিক বহুগুণ যেমন সত্তরগুণে বর্ধিত করে দেয়া হবে। এ ছাড়া তাদের জন্য সেখানে অট্টালিকা, উদ্যান ও সুন্দর সুন্দর স্ত্রীসমূহ থাকবে। [ইবন কাসীর] তাছাড়া আরো থাকবে আল্লাহর দীদার। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে যে, 'যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামবাসীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন একজন আহ্বানকারী ডেকে বলবেঃ হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের সাথে আল্লাহর একটি ওয়াদা রয়েছে যা তিনি পূরণ করতে চান। তারা বলবেঃ সেটা কি? তিনি কি আমাদের মীযানের পাল্লা ভারী করে দেননি? আমাদের চেহারা শুভ্র করে দেন নি? আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান নি? আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন নি? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তারপর তাদের জন্য তাঁর পর্দা খুলে দেয়া হবে ফলে তারা তাঁর দিকে তাকাবে। আল্লাহর শপথ করে বলছিঃ আল্লাহ তাদেরকে তাঁর দিকে তাকানোর চেয়ে প্রিয় এবং চক্ষু শীতলকারী আর কোন জিনিস দেননি। [সহীহ মুসলিমঃ ১৮১, তিরমিযীঃ ২৫৫২, মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৩৩] সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে زِيَادَةٌ বা বাড়তি পাওনার মধ্যে আল্লাহ্‌র দীদার তথা তাঁর চেহারা মুবারকের দিকে তাকানো ও আল্লাহ্‌ তা'আলাকে দেখার সৌভাগ্যও শামিল। সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, মুজতাহেদীনসহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক আলেম থেকে এ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। [তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) বরং তাদের চেহারা হবে শুভ্র, মন হবে আনন্দে উদ্বেলিত। যেমনটি সূরা আল-ইনসানের ১১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(২) আল্লাহ্‌ তা'আলা হাশরের মাঠে কাফেরদের চেহারা কেমন হবে তা এ আয়াতসহ আরো বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করেছেন। যেমন সূরা আশ-শূরাঃ ৪৫, সূরা ইবরাহীমঃ ৪২-৪৪।

أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٢٧﴾

করার কেউ নেই[১]; তাদের মুখমন্ডল যেন রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত[২]। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. আর যেদিন আমরা তাদের সবাইকে একত্র করে যারা মুশরিক তাদেরকে বলব, 'তোমরা এবং তোমরা যাদেরকে শরীক করেছিলে তারা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর[৩];' অতঃপর আমরা

(১) যেমনটি সূরা আল-কিয়ামাহ এর ১০-১২ নং আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে।

(২) যেমনটি সূরা আলে ইমরান এর ১০৬-১০৭ এবং সূরা আবাসা এর ৩৮-৪২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের মাঠে সবাইকে একত্রিত করবেন। কুরআনের অন্যত্রও আল্লাহ্ এ ঘোষণা দিয়েছেন। কোথাও কোথাও বলেছেন যে, তিনি কাউকেই ছাড়বেন না। যেমন, "আর আমরা তাদের সকলকে একত্র করব; তারপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।" [সূরা আল-কাহাফ: ৪৭] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমরা মানুষদের উপরে একটি উঁচু জায়গায় থাকব। তখন প্রত্যেক জাতিকে তাদের দেব-দেবীসহ ধারাবাহিকভাবে একের পর এক ডাকা হবে। তারপর আমাদের মহান রব আসবেন এবং বলবেন, তোমরা কিসের অপেক্ষায় আছ? তখন তারা বলবে, আমরা আমাদের মহান রবের অপেক্ষায় আছি। তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে, আমরা তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখব। তখন তিনি তাদের জন্য তাজাল্লি দিবেন এমতাবস্থায় যে, তিনি হাসছেন। আর তখন মুমিন ও মুনাফিক প্রত্যেককে নূর দিবেন। যার উপরে অন্ধকার চাপা থাকবে। তারপর তারা তার অনুসরণ করবে পুল-সিরাতের দিকে। তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। সে পুল-সিরাতে থাকবে লোহার হুক ও বর্শি। এগুলো যাকে ইচ্ছা পাকড়াও করবে। তারপর মুনাফিকদের নুর নিভিয়ে দেয়া হবে। আর মুমিনরা নাজাত পাবে। তখন প্রথম দল যারা নাজাত পাবে তাদের চেহারা হবে চৌদ্দ তারিখের রাত্রির চাঁদের মত। সত্তর হাজার লোক, তাদের কোন হিসাব হবে না। তারপর যারা তাদের কাছাকাছি হবে তারা হবে আকাশের সবচেয়ে উজ্জল তারকাটির মত। তারপর অন্যরা। শেষ পর্যন্ত শাফা'আত আপতিত হবে। ফলে তারা শাফা'আত করবে, এমনকি যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, যার অন্তরে যব পরিমাণ তা থাকবে তাকেও বের করা হবে। তাকে জান্নাতের আঙ্গিনায় রাখা হবে। আর জান্নাতিরা তাদের গায়ে পানি ফেলতে থাকবে, ফলে তারা বন্যার উদ্ভিদ যেভাবে

তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেব[১] এবং তারা যাদেরকে শরীক করেছিল তারা বলবে, তোমরা তো আমাদের 'ইবাদাত করতে না[২] ।'

২৯. 'সুতরাং আল্লাহ্ই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদের 'ইবাদাত করতে এ বিষয়ে তো আমরা গাফিল ছিলাম ।'

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ۝٢٩

৩০. সেখানে তাদের প্রত্যেকে তার পূর্ব কৃতকর্ম পরীক্ষা করে নেবে[৩] এবং

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّاۤ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ

উৎপন্ন হয় সেভাবে উদ্গত হবে। আর তাদের পোড়া চলে যাবে। তারপর তারা আল্লাহ্র কাছে চাইবে, শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য থাকবে দুনিয়া ও তার মত দশগুণ। [মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৪৫-৩৪৬]

(১) আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ﴾ কোন কোন তাফসীরকার এর অর্থ করেছেনঃ আমরা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করবো [বাগভী] আবার কোন কোন তাফসীরকারের মতে এর অর্থ হচ্ছে, আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবো অথবা তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেবো। [তাবারী; সা'দী] অথবা অর্থ হবে, তাদের মধ্যে এবং মুমিনদের মধ্যে আমরা পার্থক্য করে দেবো। [জালালাইন] যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর 'হে অপরাধিরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও" [সূরা ইয়াসীনঃ ৫৯]

(২) অর্থাৎ যাদেরকে দুনিয়ায় দেবদেবী বানিয়ে পূজা করা হয়েছে, তারা সেখানে নিজেদের পূজারীদেরকে পরিষ্কার বলে দেবে, তোমরা যে আমাদের পূজা করতে তা তো আমরা জানতামই না। আমরা তোমাদেরকে আমাদের ইবাদাত করার জন্য কোন নির্দেশই দেইনি। আল্লাহ্ সাক্ষী যে, আমরা তোমাদের ইবাদতে সন্তুষ্ট ছিলাম না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] আর যদি মা'বুদ বলে এখানে শয়তানদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়ে থাকে, তখন অর্থ হবে, তারা এ কথাগুলো ভীত হয়ে কিংবা বাঁচার জন্য মিথ্যা বলবে। [কুরতুবী]

(৩) আয়াতে এটা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন প্রতিটি আত্মা পরীক্ষা করে নেবে এবং জানবে ভাল বা মন্দ যা সে আগে করেছে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা বলেছেন, "সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে" [সূরা আল-কিয়ামাহঃ ১৩] আরও বলেন, "যেদিন গোপন

مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾

তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে এবং তাদের উদ্ভাবিত মিথ্যা তাদের কাছ থেকে অন্তর্হিত হবে।

চতুর্থ রুকূ'

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. বলুন, 'কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন[১], জীবিতকে মৃত থেকে কে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে কে বের করেন এবং সব বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন?' তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। সুতরাং বলুন, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না[২]?'

বিষয় পরীক্ষিত হবে" [সূরা আত-তারেক: ৯] আরও বলেন, "তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসেব-নিকেশের জন্য যথেষ্ট" [সূরা আল-ইসরা: ১৪-১৫] আরও এসেছে, "আর উপস্থাপিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে আপনি অপরাধিদেরকে দেখবেন আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট বড় কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছুই হিসেব করে রেখেছে।' আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে; আপনার রব তো কারো প্রতি যুলুম করেন না।" [সূরা আল-কাহাফ: ৪৯]

(১) অর্থাৎ যিনি তোমাদেরকে শোনার শক্তি ও দেখার শক্তি দান করেছেন তিনি যদি ইচ্ছে করেন সেগুলোকে নিয়ে যেতে পারেন। সেগুলো তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ বলেছেন, "বলুন, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ" [সূরা আল-মুলক: ২৩] আরও বলেন, " বলুন, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করে দেন তবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ্ আছে যে তোমাদের এগুলো ফিরিয়ে দেবে?" [সূরা আল-আন'আম: ৪৬]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতসমূহে মুশরিকদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করছেন যে,

৩২. অতএব, তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের সত্য রব[১]। সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে[২]? কাজেই তোমাদেরকে কোথায় ফেরানো হচ্ছে[৩]?

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾

তাদেরই স্বীকৃতি মোতাবেক যদি তিনি আল্লাহ্ই একমাত্র রব হয়ে থাকেন, তবে একমাত্র তাঁর ইবাদত কেন করা হবে না? তাই তিনি বলছেন যে, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন? অর্থাৎ কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তার ক্ষমতায় যমীন ফাটিয়ে তা থেকে বের করে আনেন, "নিশ্চয় আমরা প্রচুর বারি বর্ষণ করি, তারপর আমরা যমীনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি, অতঃপর তাতে আমরা উৎপন্ন করি শস্য; আংগুর, শাক-সব্জি, অনেক গাছবিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদি খাদ্য" [সূরা আবাসা: ২৫-৩১] তিনি ছাড়া কি আর কোন ইলাহ আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে যে, এটা শুধু আল্লাহ্ই করে থাকেন। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ বলেন, "এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিয্ক দান করবে, যদি তিনি তাঁর রিয্ক বন্ধ করে দেন ? " [সূরা আল-মুলক: ২১]।

(১) অর্থাৎ যদি এসবই আল্লাহর কাজ হয়ে থাকে, যেমন তোমরা নিজেরাও স্বীকার করে থাকো, তাহলে তো প্রমাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত মালিক, রব, প্রভু এবং তোমাদের বন্দেগী ও ইবাদাতের হকদার। [ইবন কাসীর] কাজেই অন্যের, যাদের এসব কাজে কোন অংশ নেই তারা কেমন করে রবের দায়িত্বে শরীক হয়ে গেলো। কিভাবে তারা ইবাদত পেতে পারে?

(২) ইনিই হলেন সেই মহান সত্তা যাঁর গুণ-পরাকাষ্ঠার বিবরণ এইমাত্র বর্ণিত হলো, তারপরে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিশ্চিত উপাস্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন প্রমাণিত হলো যে, তিনি ছাড়া আর সবই বাতিল। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। [ইবন কাসীর] সুতরাং সেই নিশ্চিত সত্যকে পরিহার করে অন্যান্যদের প্রতি মনোনিবেশ করা কঠিন নির্বুদ্ধিতার কাজ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ঈমান ও কুফরির মাঝে কোন সংযোগ নেই। যা ঈমান হবে না, তাই কুফরী হবে। [কুরতুবী]

(৩) বলা হচ্ছে, "তোমাদেরকে কোথায় ফেরানো হচ্ছে?" অর্থাৎ যখন তোমরা জানতে পারলে যে, আল্লাহ্ই একমাত্র রব, তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন তখন কিভাবে তাঁর ইবাদাত ছেড়ে অন্যের ইবাদতের দিকে তোমাদের ফেরানো হয়? [ইবন কাসীর] এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এমন কিছু বিভ্রান্তকারী রয়েছে যারা লোকদেরকে সঠিক দিক থেকে টেনে নিয়ে ভুল দিকে ফিরিয়ে দেয়। তাই মানুষকে আবেদন জানানো হচ্ছে, তোমরা অন্ধ হয়ে ভুল পথপ্রদর্শনকারীদের পেছনে ছুটে যাচ্ছো কেন? নিজেদের বুদ্ধি ব্যবহার করে চিন্তা করছো না কেন যে, প্রকৃত সত্য যখন

৩৩. যারা অবাধ্য হয়েছে এভাবেই তাদের সম্পর্কে আপনার রবের বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না[১]।

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. বলুন, 'তোমরা যাদের শরীক কর তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনে ও পরে সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটায়?' বলুন, 'আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন ও পরে সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন[২]'। কাজেই (সত্য থেকে) তোমাদেরকে কোথায় ফেরানো হচ্ছে?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

এই, তখন তোমাদেরকে কোন্ দিকে চালিত করা হচ্ছে?

(১) অর্থাৎ এ মুশরিকরা যেহেতু কুফরী করেছে এবং কুফরি চালিয়েই যাচ্ছে, আর আল্লাহ্‌র সাথে অন্যের ইবাদাত করছে, অথচ তারা জানে ও স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, তিনিই স্রষ্টা, তাঁর রাজত্বের সবকিছুর একমাত্র নিয়ন্ত্রক, সেহেতু তাদের উপর আল্লাহ্‌র বাণী সত্য হয়ে গেছে যে, তারা হতভাগা। জাহান্নামের অধিবাসী। [ইবন কাসীর] অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা তা বলেছেন, "তারা বলবে, 'অবশ্যই হ্যাঁ।' কিন্তু শাস্তির বাণী কাফিরদের উপর বাস্তবায়িত হয়েছে।" [সূরা আয-যুমার: ৭১]

(২) সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে মুশরিকরাও স্বীকার করতো যে, এটা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। তাঁর সাথে যাদেরকে তারা শরীক করে তাদের কারো এ কাজে কোন অংশ নেই। আর সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ প্রথমে যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর পক্ষেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু যে প্রথমবারই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি সে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারে কেমন করে? অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ্, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিয্ক দিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন অবশেষে তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। (আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্তকৃত) তোমাদের মা'বুদগুলোর এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোন কিছু করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে, তিনি (আল্লাহ্) সে সব (শরীক) থেকে মহিমাময়-পবিত্র ও অতি উর্ধ্বে।" [সূরা আর-রূম: ৪০] আরও বলেন, "আর তারা তাঁর পরিবর্তে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।" [সূরা আল-ফুরকান: ৩]

৩৫. বলুন, ‘তোমরা যাদেরকে শরীক কর তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সত্যের পথ নির্দেশ করে?’ বলুন, ‘আল্লাহ্ই সত্য পথ নির্দেশ করেন। যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর হকদার, না যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না-সে(১)? সুতরাং তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেমন বিচার করছ?’

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُّتَّبَعَ أَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ إِلَّآ أَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর তাদের অধিকাংশ কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান তো কোন কাজে আসে না, তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত(২)।

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

(১) আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা সমস্ত মুশরিককে এবং নবীর শিক্ষা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এমন সকল লোককে জিজ্ঞেস করে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের বন্দেগী করো তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যার মাধ্যমে তোমরা ‘সত্যের পথনির্দেশনা’ লাভ করতে পারো? অবশ্যি সবাই জানে, এর জবাব ‘না’ ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি না পারে তবে কেবলমাত্র যিনি পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত কে হিদায়াত দিতে পারেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্। যিনি ব্যতীত কোন হক ইলাহ নেই। তাহলে বান্দা কি তার অনুসরণ করবে যে হকের দিকে পথ দেখাতে পারে, যে অন্ধত্ব থেকে চক্ষুষ্মান করতে পারে, নাকি অনুসরণ করবে তার যে তার অন্ধ ও বোবা হওয়ার কারণে কোন কিছুর দিকেই পথ দেখাতে পারে না? [ইবন কাসীর] এ ব্যাপারটিই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পিতাকে বলেছিলেন, “হে আমার প্রিয় পিতা! আপনি তার ‘ইবাদাত করেন কেন যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোন কাজেই আসে না?” [সূরা মারইয়াম: ৪২]

(২) অর্থাৎ তাদের নেতারা যারা বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তন করেছে, দর্শন রচনা করেছে তারাও এসব কিছু জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় বরং আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে এগুলোকে ইলাহ সাব্যস্ত করে নিয়েছে। অনুমান করেই বলছে যে এগুলো শাফা‘আত করবে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন দলীল-প্রমাণ নেই। আর যারা এসব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করেছে তারাও জেনেবুঝে নয় বরং নিছক অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে তাদের পেছনে চলেছে। [কুরতুবী] কারণ তারা মনে করে, এত বড় বড় লোকেরা যখন একথা বলেন এবং আমাদের বাপ-দাদারা এসব মেনে আসছেন আবার এ সংগে দুনিয়ার

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. আর এ কুরআন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো রচনা হওয়া সম্ভব নয়। বরং এর আগে যা নাযিল হয়েছে এটা তার সত্যায়ন এবং আল কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা[১]। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে[২]।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ

৩৮. নাকি তারা বলে, 'তিনি এটা রচনা করেছেন?' বলুন, 'তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস[৩] এবং

বিপুল সংখ্যক লোক এগুলো মেনে নিয়ে এ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই এই লোকেরা ঠিক কথাই বলে থাকবেন।

(১) "যা কিছু আগে এসে গিয়েছিল তার সত্যায়ন" –অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জীল সহ অন্যান্য কিতাবাদির সত্যায়ন। কারণ, সেগুলোতে এ কুরআনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। তারপর এ কুরআন সে সুসংবাদকে সত্যায়ন করে আগমন করেছে। শুরু থেকে নবীদের মাধ্যমে মানুষকে যে মৌলিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে তথা তাওহীদ, আখেরাতের উপর ঈমান ইত্যাদিকে পাকাপোক্ত করছে। কারও কারও মতে, এখানে অর্থ হচ্ছে, কিন্তু এ কুরআন তার সামনে যে নবী রয়েছেন অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার সত্যায়ন করছে। কেননা তারা কুরআন শোনার আগ থেকেই তাকে দেখেছে। [কুরতুবী] তারপর বলা হয়েছে যে, এটি "আল কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা" –অর্থাৎ সমস্ত আসমানী কিতাবের সারমর্ম যে মৌলিক শিক্ষাবলীর সমষ্টি, সেগুলো এর মধ্যে দিয়ে যুক্তি -প্রমাণ সহকারে উপদেশ দান ও বুঝাবার ভংগীতে, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং বাস্তব অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। অথবা এর অর্থ, এতে যে বিধানাবলী রয়েছে সেগুলোকে স্পষ্ট করে বিস্তারিত বর্ণনা করছে। [বাগভী; কুরতুবী]

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীকেই তার (যুগ) উপযোগী মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। সে অনুসারে মানুষ তার উপর ঈমান এনেছে। আর নিশ্চয়ই আমাকে অহী দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর নাযিল করেছেন। অতএব, আমি আশা করছি যে, কিয়ামতের দিন আমার অনুগামী তাদের থেকে বেশী হবে। [বুখারীঃ ৪৯৮১]

(৩) এটা আল-কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তৃতীয় চ্যালেঞ্জ। [ইবন কাসীর] তারা যদি কুরআন সম্পর্কে সন্দিহান হয় তবে তারা যেন এর মত একটি সূরা নিয়ে আসে। এর পূর্বে কাফেরদেরকে কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার

صٰدِقِيْنَ ۝٣٨

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ ۚ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝٣٩

৩৯. বরং তারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করেনি তাতে মিথ্যারোপ করেছে[১], আর যার প্রকৃত পরিণতি এখনো তাদের কাছে আসে নি[২]। এভাবেই

ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছিল। [দেখুন, সূরা আল-ইসরা: ৮৮] তারপর তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, কুরআনের মত কুরআন না আনতে সক্ষম হলে কুরআনের দশটি সূরা যেন নিয়ে আসে। [দেখুন, সূরা হূদ: ১৩] কিন্তু তারা তাতেও অপারগ হয়। তখন তাদেরকে এ আয়াতে কুরআনের সূরাসমূহের একটি সূরা নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ করা হয় কিন্তু কাফের-মুশরিকগণ তাও আনতে সক্ষম হয়নি। আর তারা সেটা আনতে পারবেও না। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ বলেন, "অতএব যদি তোমরা তা করতে না পার আর কখনই তা করতে পারবে না" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৪]

এ চ্যালেঞ্জ কুরআনের শুধু ভাষাশৈলীর উপর করা হয়নি। সাধারণভাবে লোকেরা এ চ্যালেঞ্জটিকে নিছক কুরআনের ভাষাশৈলী অলংকার ও সাহিত্য সুষমার দিক দিয়ে ছিল বলে মনে করে। কুরআন তার অনন্য ও অতুলনীয় হবার দাবীর ভিত্তি নিছক নিজের শাব্দিক সৌন্দর্য সুষমার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেনি। নিঃসন্দেহে ভাষাশৈলীর দিক দিয়েও কুরআন নজিরবিহীন। কিন্তু মূলত যে জিনিসটির ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, কোন মানবিক মেধা ও প্রতিভা এহেন কিতাব রচনা করতে পারে না, সেটি হচ্ছে তার বিষয়বস্তু, অলংকারিত্ব ও শিক্ষা। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ তারা কুরআনকে এ জন্যই মিথ্যা সাব্যস্ত করার প্রয়াস চালাচ্ছে যে, তারা এটাকে বুঝতে পারেনি, চিনতে পারেনি। [কুরতুবী] তাদের অজ্ঞতাই কুরআনকে মানতে নিষেধ করছে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ এ রকম কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "আর যখন তারা এটা দ্বারা হেদায়াত পায়নি তখন তারা অচিরেই বলবে, 'এ এক পুরোনো মিথ্যা" [সূরা আল-আহকাফ: ১১]

(২) এখানে تَأْوِيلُ এর মর্মার্থ হলো প্রতিফল ও শেষ পরিণতি। অর্থাৎ এরা নিজেদের গাফলতী ও নির্লিপ্ততার দরুন কুরআন সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেনি। তারা একটু চিন্তা করতে পারত যে পূর্ববর্তী যে সমস্ত সংবাদ এ কুরআন দিয়েছে তা সত্য কি না? বা ভবিষ্যতের যে সমস্ত সংবাদ দিচ্ছে তা সঠিকভাবে ঘটে কি না? কিন্তু তারা কোন কিছু ভাল করে বুঝার আগে তা অস্বীকার করে বসেছে। ফলে এর প্রতি মিথ্যারোপে লিপ্ত রয়েছে। যদি তারা সত্যিকারভাবে এটা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করত

তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল, কাজেই দেখুন, যালিমদের পরিণাম কি হয়েছে!

৪০. আর তাদের মধ্যে কেউ এর উপর ঈমান আনে আবার কেউ এর উপর ঈমান আনে না এবং আপনার রব ফাসাদসৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে অধিক অবগত(১)।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ۚ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝

তাহলে অবশ্যই কুরআনকে বুঝতে পারত। আর এটাও বুঝত যে, এটা আল্লাহ্‌র বাণী। [ফাতহুল কাদীর] আর যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান কাজ করে না যেমন পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম, ইত্যাদি সেগুলোকে তারা অস্বীকার করে বসেছে, সেগুলোর সাথে কুফরি করেছে, অথচ এখনও কিতাবে তাদের উপর যা আপতিত হওয়ার ওয়াদা করা হচ্ছে তার প্রকৃত অবস্থা আসেনি। আর এ মুশরিকরা যেভাবে আল্লাহ্‌র ভীতি প্রদর্শনে মিথ্যারোপ করেছে তাদের পূর্বেকার উম্মতরাও তা অস্বীকার করেছিল। [মুয়াসসার]

(১) অর্থাৎ যারা কুরআনে মিথ্যারোপ করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের অন্তরে এর প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং ভাল করেই জানে যে, এটি সত্য ও হক। কিন্তু সে অহংকার ও গোঁড়ামী করে তাতে মিথ্যারোপ করে থাকে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা এর উপর অন্তর থেকেই অবিশ্বাসী। তারা মূলত না জেনে এর উপর মিথ্যারোপ করছে। অথবা আয়াতের অর্থ, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখন এ কুরআনে মিথ্যারোপ করলেও ভবিষ্যতে ঈমান আনবে। আবার কেউ কেউ ভবিষ্যতেও এর উপর ঈমান আনবে না বরং অস্বীকার ও অবিশ্বাসের উপর অটল থাকবে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে কুরআনকে বোঝানো হয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। তখনও উপরে বর্ণিত উভয় প্রকার অর্থ হতে পারে। তাছাড়া কারও কারও মতে, আয়াতটি মক্কাবাসীদের সাথে নির্দিষ্ট। অপর কারও কারও মতে সেটি সকল কাফেরের জন্য ব্যাপক। [ফাতহুল কাদীর]
এরপর আল্লাহ্ বলছেন যে, তিনি বিপর্যয়সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে অধিক অবগত।" সে অনুসারে তাদেরকে তিনি প্রতিফল দিবেন। যারা গোঁড়ামী করে কুফরিতে অটল রয়েছে তিনি তাদের ভাল করেই জানেন। অথবা আয়াতের অর্থ, যারা ঈমান আনবে আর যারা ঈমান আনবে না তাদের সবাইকে তিনি ভালভাবে জানেন। তাদের মধ্যে যারা বিপর্যয়সৃষ্টিকারী তাদের সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। অনুরূপভাবে কারা অন্তরে ঈমান থাকার পরও মুখে স্বীকার করছে না, আর কারা অন্তর থেকেই না জেনে এর উপর কুফরী করছে তিনি সবাইকে ভালভাবেই জানেন। [ফাতহুল কাদীর]

পঞ্চম রুকূ’

وَاِنۡ كَذَّبُوۡكَ فَقُلۡ لِّیۡ عَمَلِیۡ وَلَكُمۡ عَمَلُكُمۡ ۚ اَنۡتُمۡ بَرِيۡٓـــُٔوۡنَ مِمَّاۤ اَعۡمَلُ وَاَنَا بَرِیۡٓءٌ مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۴۱﴾

৪১. আর তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে আপনি বলুন, ‘আমার কাজের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত[১]।’

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّسۡتَمِعُوۡنَ اِلَيۡكَ ؕ اَفَاَنۡتَ تُسۡمِعُ الصُّمَّ وَلَوۡ كَانُوۡا لَا يَعۡقِلُوۡنَ ﴿۴۲﴾

৪২. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে কান পেতে রাখে। তবে কি আপনি বধিরকে শুনাবেন, তারা না বুঝলেও[২]?

---

(১) অর্থাৎ অযথা বিরোধ ও কূটতর্ক করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি আমি মিথ্যা আরোপ করে থাকি তাহলে আমার কাজের জন্য আমি দায়ী হবো। এর কোন দায়ভার তোমাদের ওপর পড়বে না। আর যদি তোমরা সত্য কথাকে মিথ্যা বলে থাকো তাহলে এর মাধ্যমে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং এর দ্বারা তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করছো। এটা দ্বারা তাদের কাজ-কর্মের স্বীকৃতি নয় বরং তাদের সাথে সম্পর্কচ্যুতির ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। যেমনটি সূরা আল-কাফেরূনে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইবরাহীম আলাইহিসসালামও তার জাতির সাথে এ ধরণের সম্পর্কচ্যুতির ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেনঃ “তোমাদের সংগে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ‘ইবাদাত কর তার সংগে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আনো”। [সূরা আল-মুমতাহিনাহঃ ৪]

(২) শ্রবণ কয়েক রকমের হতে পারে। পশুরা যেমন আওয়াজ শোনে তেমনি এক ধরনের শ্রবণ আছে। তাদের কথাও আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন। [যেমন দেখুন, সূরা আল-বাকারাহ: ১৭১] আবার আর এক ধরনের শ্রবণ হয়, যার মধ্যে অর্থের দিকে নজর থাকে এবং এমনি ধরনের একটা প্রবণতা দেখা যায় যে, যুক্তিসংগত কথা হলে মেনে নেয়া হবে। তাদের কথাও আল্লাহ্ কুরআনের অন্যত্র উল্লেখ করেছেন [যেমন দেখুন, সূরা আল-আন‘আম: ৩৬] তবে যারা কোন প্রকার বদ্ধ ধারণা বা অন্ধ বিদ্বেষে আক্রান্ত থাকে এবং যারা আগে থেকেই ফায়সালা করে বসে থাকে যে, নিজের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আকীদা-বিশ্বাস ও পদ্ধতিসমূহের বিরুদ্ধে এবং নিজের প্রবৃত্তির আশা-আকাংখা ও আগ্রহ বিরোধী কথা যত যুক্তিসংগতই হোক না

৪৩. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে কি আপনি অন্ধকে পথ দেখাবেন, তারা না দেখলেও[১]?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ۗ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না[২], বরং মানুষই

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ

কেন মেনে নেবো না, তারা সবকিছু শুনেও আসলে কিছুই শোনে না। তাদের কথাও আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। [যেমন দেখুন, সূরা আয-যুখরুফ: ২২-২৩] তেমনিভাবে যারা দুনিয়ায় পশুদের মত উদাসীন জীবন যাপন করে, চারদিকে বিচরণ করা ছাড়া আর কিছুতেই যাদের আগ্রহ নেই অথবা যারা প্রবৃত্তির স্বাদ-আনন্দের পেছনে এমন পাগলের মতো দৌড়ায় যে, তারা নিজেরা যা কিছু করছে তার ন্যায় বা অন্যায় হবার কথা চিন্তা করে না তারা শুনেও শোনে না। এদেরকে আল্লাহ্ পশুর সাথে তুলনা করেছেন। [যেমন, সূরা আল-আ'রাফ: ১৭৯] এ ধরনের লোকদের কান বধির হয় না কিন্তু মন বধির হয়। এ ধরনের বধির লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোনাতে পারবেন না বলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন। এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে আপনি যাদের শ্রবণেন্দ্রিয় নেই তাদেরকে শোনাতে পারেন না তেমনিভাবে তাদেরকেও হিদায়াতের দিকে নিয়ে আসতে পারবেন না। আর আল্লাহ্ও তাদের উপর লিখে দিয়েছেন যে, তারা ঈমান আনবে না। [কুরতুবী]

(১) তাদের এ তাকানোর দ্বারা তারা আপনার কাছে নবুওয়াতের যে দলীল-প্রমাণাদি আছে তা দেখতে পায়, কিন্তু তারা এর দ্বারা উপকৃত হয় না। পক্ষান্তরে মুমিনগণ আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেই আপনার সততার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে। তাই আপনার প্রতি সম্মানে তাদের চোখ ভরে যায়। কাফেরগণ আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও সম্মানের সাথে দেখে না। [ইবন কাসীর] আর যারা সম্মানের সাথে দেখবে না তাদের হিদায়াত তাওফীক হবে না। [কুরতুবী] আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে আরও বলেনঃ "তারা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, 'এই-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? 'সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ হতে দূরে সরিয়ে দিত, যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম।' যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন তারা জানবে কে বেশী পথভ্রষ্ট।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ৪১-৪২]

(২) হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার নিজের উপর হারাম করেছি এবং তা তোমাদের মাঝেও হারাম ঘোষণা করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে

নিজেদের প্রতি যুলুম করে থাকে[১]। | أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

যাদেরকে আমি হেদায়াত করেছি তারা ব্যতীত সবাই পথভ্রষ্ট। সুতরাং তোমরা আমার কাছেই হেদায়াত চাও আমি তোমাদের হেদায়াত দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যাকে আমি খাবার খাওয়াই সে ব্যতীত সবাই অভূক্ত, ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও আমি তোমাদেরকে খাওয়াব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যাকে আমি পরিধান করাই সে ব্যতীত সবাই কাপড়হীন। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পরিধেয় বস্ত্র চাও আমি তোমাদেরকে পরিধান করাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিন-রাত অপরাধ করে যাচ্ছ আর আমি তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করি। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতি করার কাছেও পৌঁছতে পারবে না যে আমার ক্ষতি করবে। এমনকি তোমরা আমার কোন উপকার করার নিকটবর্তীও হতে পারবে না যে, আমার কোন উপকার তোমরা করে দেবে। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের যাবতীয় মানুষ ও জ্বিন একত্র হয়ে তাকওয়ার দিক থেকে একজনের অন্তরে পরিণত হও তাতেও আমার রাজত্বের সামান্য বৃদ্ধি ঘটবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জ্বিন একত্র হয়ে অন্যায় করার দিক থেকে একজনের অন্তরে পরিণত হও তাতেও আমার রাজত্বের তথা ক্ষমতার সামান্যও কমতি ঘটবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বাপর এবং যাবতীয় মানুষ ও জ্বিন এক মাঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে প্রত্যেকেই চায় তারপর আমি তাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বস্তু দেই তাতে আমার ভাণ্ডার থেকে ততটুকুই কমবে যতটুকু সমুদ্রে সুঁই ঢুকালে কমে। হে আমার বান্দাগণ! এগুলো তো শুধু তোমাদের আমল, আমি তা তোমাদের জন্য সংরক্ষন করে রাখি। তারপর তোমাদেরকে তা পূর্ণভাবে দেব। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ভালকিছু পাবে সে যেন আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে। আর যে অন্য কিছু পায় সে যেন তার নিজেকে ছাড়া আর কাউকে তিরস্কার না করে। [মুসলিমঃ ২৫৭৭]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ তো তাদের কানও দিয়েছেন এবং মনও দিয়েছেন। হক ও বাতিলের পার্থক্য দেখার ও বুঝার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন কোন জিনিস তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাদের দিতে কার্পণ্য করেননি। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের চোখ কানা করে নিয়েছে, কানে তালা লাগিয়েছে এবং অন্তরকে বিকৃত করে ফেলেছে। ফলে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দিয়েছেন, যাকে ইচ্ছা অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে পথ দেখিয়েছেন। কিছু অন্ধ চক্ষু চক্ষুষ্মান করেছেন, কিছু বধিরকে শুনিয়েছেন। কিছু বদ্ধ অন্তরকে খুলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কিছু লোককে ঈমান থেকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। নিজের রাজত্বে তিনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। তার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায় না। বরং লোকদেরকে তিনি প্রশ্ন করবেন। কারণ তিনি জ্ঞানী, তিনি প্রজ্ঞাবান, তিনি ইনসাফকারী। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

৪৫. আর যেদিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন (সেদিন তাদের মনে হবে দুনিয়াতে) যেন তাদের অবস্থিতি দিনের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল[১]; তারা পরস্পরকে চিনবে[২]। অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করেছে[৩] এবং তারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আর আমরা তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিছু যদি আপনাকে (দুনিয়াতে) দেখিয়ে দেই অথবা (তাদের উপর তা আসার আগেই) আপনার মৃত্যু দিয়ে দেই, তাহলে তাদের ফিরে আসা তো

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

(১) অর্থাৎ কাফেরগণ হাশরের মাঠে দুনিয়ার সময়টুকুকে অত্যন্ত সামান্য সময় বিবেচনা করবে। তাদের কেউ কেউ মনে করবে যে, দুনিয়াতে একঘন্টা অবস্থান করেছিল। যেমনটি এ আয়াতে এবং সূরা আল-আহকাফের ৩৫, সূরা ত্বা-হা এর ১০২-১০৪ এবং সূরা আর-রূমের ৫৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার তাদের কেউ কেউ মনে করবে যে, সে এক বিকাল বা দিবসের প্রথমভাগ অবস্থান করেছিল। যেমনটি সূরা আন-নাযি'আতের ৪৬ এবং সূরা আল-মুমিনূন এর ১১২-১১৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ কেয়ামতে যখন মৃতদেহকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন একে অপরকে চিনতে পারবে এবং মনে হবে দেখা-সাক্ষাত হয়নি তা যেন খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়। তবে অন্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা চিনতে পারলেও একে অপরকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "সেদিন তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে না" [সূরা আল-কাসাসঃ ৬৬] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সেদিন তাদের মাঝে না থাকবে বংশের সম্পর্ক, না তারা একে অপরকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে" [সূরা আল-মুমিনুনঃ ১০১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "সেদিন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু অপর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না"[সূরা আল-মা'আরিজঃ১০]

(৩) অর্থাৎ একদিন আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে, তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাত হবে, একথাকে মিথ্যা বলেছে।

আমাদেরই কাছে; তদুপরি তারা যা করে আল্লাহ্ই তার সাক্ষী[১]।

৪৭. আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য আছে একজন রাসূল[২] অতঃপর যখন তাদের রাসূল আসে তখন তাদের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করা হয় এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হয় না[৩]।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

(১) অর্থাৎ যদি আপনার জীবদ্দশায়ই তাদের উপর কোন প্রতিশ্রুত শাস্তি এসে পড়ে অথবা আপনাকে তার পূর্বেই মৃত্যু দিয়ে দেই তারপরও তো তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল আমার কাছেই। আমি তাদের কাজ-কর্মের সাক্ষী। সে অনুসারেই তাদের বিচার করব।

(২) বলা হয়েছে, “প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল রয়েছে।” এ ধরনের আয়াত আরো দেখুন, সূরা আন-নাহলঃ ৩৬, সূরা ফাতেরঃ ২৪। এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্বের দাবী রাখে তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা যদিও রাসূলকে সার্বজনিন করেছেন তারপরও তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে হেদায়াতকারীদের প্রেরণ করে থাকেন। তারা নবী বা রাসূল না হলেও নবী-রাসূলদের বাণী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে বহন করে থাকেন। এ ব্যাপারে সূরা রা'দ এর ৭ নং আয়াতে এসেছে যে, “প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াতকারী বা পথপ্রদর্শক আছেন”।

(৩) এর অর্থ হচ্ছে, রাসূলের দাওয়াত কোন মানব গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর ধরে নিতে হবে যে, সেই গোষ্ঠীর হেদায়াতের জন্য আল্লাহর যা কিছু করণীয় ছিল, তা করা হয়ে গেছে। এরপর কেবল ফায়সালা করাই বাকি থেকে যায়। অতিরিক্ত যুক্তি বা সাক্ষ্য-প্রমাণের অবকাশ থাকে না। আর চূড়ান্ত ইনসাফ সহকারে এ ফায়সালা করা হয়ে থাকে। যারা রসূলের কথা মেনে নেয় এবং নিজেদের নীতি ও মনোভাব পরিবর্তন করে তারা আল্লাহর রহমত লাভের অধিকারী হয়। আর যারা তাঁর কথা মেনে নেয় না তারা শাস্তি লাভের যোগ্য হয়। তাদেরকে এ শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় দেয়া যেতে পারে বা এক জায়গায়। তাদের কাছে রাসূল এ জন্যই পাঠাতে হয়, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল না পাঠিয়ে, মানুষদেরকে সাবধান না করে কাউকে শাস্তি দেন না। আল্লাহ্ বলেন, “আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত শাস্তি প্রদানকারী নই।” [সূরা আল-ইসরা: ১৫] [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

তাছাড়া এ আয়াতের আরেক প্রকার ব্যাখ্যাও বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ এখানে রাসূলদের আগমন করার অর্থঃ কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে তাদের আগমণের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমনটি সূরা আয-যুমারের ৬৯ নং

৪৮. আর তারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, (তবে বল) এ প্রতিশ্রুতি কবে ফলবে[১]?'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

৪৯. বলুন, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার কোন অধিকার নেই আমার নিজের ক্ষতি বা মন্দের।' প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও পিছাতে বা এগুতেও পারবে না।

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝

আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ "যমীন তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, 'আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না"। সুতরাং প্রত্যেক উম্মতের আমলনামাই তাদের নবী-রাসূলদের উপস্থিতিতে পেশ করা হবে। তাদের ভাল-মন্দ আমল তাদের সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে আমল সংরক্ষণকারী ফিরিশ্তাগণদের মধ্য থেকেও সাক্ষী থাকবে। এভাবেই উম্মতের পর উম্মতের মধ্যে ফয়সালা করা হবে। উম্মতে মুহাম্মাদীয়ারও একই অবস্থা হবে তবে তারা সবশেষে আসা সত্ত্বেও সর্বপ্রথম তাদের হিসাব-নিকাশ করা হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমরা সবশেষে আগমণকারী তবে কিয়ামতের দিন সবার অগ্রে থাকব। [বুখারীঃ ৮৭৬] অপর হাদীসে এসেছে, "সমস্ত সৃষ্টিজগতের পূর্বে তাদের বিচার-ফয়সালা করা হবে" [মুসলিমঃ ৮৫৫]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে কাফেরদের কুফরির সংবাদ দিয়ে বলছেন যে, কাফেররা যে আল্লাহ্র আযাবকে তাড়াতাড়ি চাচ্ছে এবং এর জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণের কথা বলছে, এতে তাদের কোন লাভ নেই। অন্যত্রও আল্লাহ্ এ কথা বলেছেন, "যারা এটাতে ঈমান রাখে না তারাই তা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা ঈমান এনেছে তারা তা থেকে ভীত থাকে এবং তারা জানে যে, তা অবশ্যই সত্য।" [সূরা আশ-শূরা:১৮] আরও বলেন, "আর তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভংগ করেন না। আপনার রব-এর কাছে একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান" [সূরা আল-হজ: ৪৭] আরও বলেন, "তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই।" [সূরা আল-আনকাবূত: ৫৪] তাছাড়া এ সূরার ৫০ নং আয়াতে তাদেরকে রীতিমত সাবধানও করেছেন।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَٰتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রাতে অথবা দিনে এসে পড়ে, তবে অপরাধীরা তার কোনটিকে তাড়াতাড়ি পেতে চায়[১]?'

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ۚ ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ

৫১. তবে কি তোমরা এটা ঘটার পর তাতে ঈমান আনবে? এখন[২]?! অথচ

(১) সারা জীবন তারা যে জিনিসটিকে মিথ্যা বলতে থাকে, যাকে মিথ্যা মনে করে সারাটা জীবন ভুল কাজে ব্যয় করে এবং যারা সংবাদদানকারী নবী-রাসূলদেরকে বিভিন্নভাবে দোষারোপ করতে থাকে, সেই জিনিসটি যখন তাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে গুড়িয়ে দিয়ে অকস্মাৎ সামনে এসে দাঁড়াবে তখন তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। নিজের কৃতকর্মের হাত থেকে বাঁচার কোন পথ থাকবে না। মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। লজ্জায় ও আক্ষেপে অন্তর ভিতরে ভিতরেই দমে যাবে। সুতরাং কত বড় বিপদকে তারা তাড়াতাড়ি ডেকে আনছে? [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]
আয়াতের অন্য অর্থ এও হতে পারে যে, বলুন, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রাতে অথবা দিনে এসে পড়ে তাহলে অপরাধীরা কোন জিনিস পেতে তাড়াতাড়ি করছে? আযাব তো তাদের খুব কাছের জিনিস। সকাল বা সন্ধ্যা যে কোন সময় এসে যেতে পারে। [দেখুন, বাগভী]

(২) অর্থাৎ তোমরা কি তখন ঈমান আনবে, যখন তোমাদের উপর আযাব পতিত হয়ে যাবে? চাই তা মৃত্যুর সময়ে হোক কিংবা তার পূর্বে। কিন্তু তখন তোমাদের ঈমানের উত্তরে কি বলা হবে- ﴿ءَآلْـَٰٔنَ﴾ এতক্ষণে ঈমান আনলে, যখন ঈমানের সময় চলে গেছে? যেমন, জলমগ্ন হবার সময়ে ফির'আউন যখন বললঃ "আমি ঈমান আনছি, নিশ্চয়ই কোন হক উপাস্য নেই তিনি ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈলরা" [সূরা ইউনুসঃ ৯০]। উত্তরে বলা হয়েছিল- ﴿ءَآلْـَٰٔنَ﴾ অর্থাৎ এতক্ষণে ঈমান আনলে? বস্তুতঃ তার ঈমান কবুল করা হয়নি। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তাওবা কবূল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন ঊর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়"। [তিরমিযীঃ ৩৫৩৭, মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৩২, হাকেম মুস্তাদরাকঃ ৪/২৫৭, ইবনে মাজাহ্ঃ ৪২৫৩, ইবনে হিব্বানঃ ৬২৮] অর্থাৎ মৃত্যুকালীন গরগরা বা ঊর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর ঈমান ও তাওবা আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে দুনিয়াতে আযাব সংঘটিত হওয়ার পূর্বাহ্নে তাওবা কবুল হতে পারে। কিন্তু আযাব এসে যাবার পর আর তাওবা কবুল হয় না। আয়াতের শেষে এবং সূরা গাফেরের ৮৪ ও ৮৫ নং আয়াতদ্বয়ে একথাটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সূরার শেষাংশে ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম-এর কওমের ঘটনা আসছে যে, তাদের তাওবা কবুল করে নেয়া হয়েছিল, তা এই

تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝٥١

তোমরা তো এটাকেই তাড়াতাড়ি পেতে চাইছিলে!

ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝٥٢

৫২. তারপর যারা যুলুম করত তাদেরকে বলা হবে, 'স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন কর; তোমরা যা করতে, তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে[১]।'

وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ۗ قُلْ اِيْ وَرَبِّيْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝٥٣

৫৩. আর তারা আপনার কাছে জানতে চায়, 'এটা কি সত্য?' বলুন, 'হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! এটা অবশ্যই সত্য[২] আর তোমরা মোটেই অপারগকারী নও।'

ষষ্ঠ রুকূ'

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ۗ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝٥٤

৫৪. আর যমীনে যা রয়েছে, তা যদি প্রত্যেক যুলুমকারী[৩] ব্যক্তির হয়ে যায়, তবে সে মুক্তির বিনিময়ে সেসব দিয়ে দেবে এবং অনুতাপ গোপন করবে যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। আর

মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল। কারণ, তারা দূরে থেকে আযাব আসতে দেখেই বিশুদ্ধ-সত্য মনে কেঁদে-কেটে তাওবা করে নিয়েছিল। তাই আযাব সরে যায়। যদি আযাব তাদের উপর পতিত হয়ে যেত, তবে আর তাওবা কবুল হত না।

(১) এটা তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে। কারণ তারা এ আযাবকে অস্বীকার করেছিল। সূরা আত-তুরের ১৩-১৬ নং আয়াতেও তা বর্ণিত হয়েছে।

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে আল্লাহ্‌র সত্বার শপথ করে কেয়ামত যে আসন্ন তা বলতে নির্দেশ দিচ্ছেন। পবিত্র কুরআনের আরো দু'টি স্থানে এ ধরণের নির্দেশ এসেছে, যেমন সূরা সাবাঃ ৩, এবং আত-তাগাবুনঃ ৭] মূলতঃ কেয়ামতের ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখার কারণেই আল্লাহ্ তাঁর নবীকে শপথ করে বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

(৩) এখানে যুলুম বলতে শির্ক ও কুফর বোঝানো হয়েছে। [মুয়াসসার] কারণ, শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলম। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, 'নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে বড় যুলুম'। [সূরা লুকমান:১৩]

তাদের মীমাংসা ন্যায়ভিত্তিক করা হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না[১]।

৫৫. জেনে রাখ! আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٥

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

هُوَ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٦

৫৭. হে লোকসকল! তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও অন্তরসমূহে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত[২]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে উপস্থিত করে বলা হবেঃ যদি তোমার নিকট পৃথিবীর সমান পরিমান স্বর্ণ থাকে, তাহলে কি তুমি এর বিনিময়ে এ শাস্তি থেকে মুক্তি কামনা করবে? তখন তারা বলবেঃ হ্যাঁ, তাকে বলা হবে যে, তোমার নিকট এর চেয়েও সহজ জিনিস চাওয়া হয়েছিল... আমার সাথে আর কাউকে শরীক না করতে কিন্তু তুমি তা মানতে রাজি হওনি। [বুখারীঃ ৬৫৩৮]

(২) এখানে কুরআনুল কারীমের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে- এক. ﴿مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ – مَوْعِظَةٌ ও وَعْظٌ এর প্রকৃত অর্থ হলো উৎসাহ কিংবা ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে পরিণাম সম্পর্কে স্মরণ করে দেয়া। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ এমন বিষয় বর্ণনা করা, যা শুনে মানুষের অন্তর কোমল হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ে। পার্থিব গাফলতীর পর্দা ছিন্ন হয়ে মনে আখেরাতের ভাবনা উদয় হয়। যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লিলতা থেকে বিরত করে। [ইবন কাসীর] কুরআনুল কারীমের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই 'মাওয়ায়েযে হাসানাহ্'-এর অত্যন্ত সালঙ্কার প্রচারক। এর প্রতিটি জায়গায় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সাথে সাথে ভীতি-প্রদর্শন, সওয়াবের সাথে সাথে আযাব, পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও কৃতকার্যতার সাথে সাথে ব্যর্থতা ও পথভ্রষ্টতা প্রভৃতির এমন সংমিশ্রিত আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার পর পাথরও পানি হয়ে যেতে পারে।

৫৮. বলুন, 'এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়; কাজেই এতে তারা যেন আনন্দিত হয়।' তারা যা পুঞ্জীভূত

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

দুই. কুরআনুল কারীমের দ্বিতীয় গুণ ﴿وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ﴾ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। شِفَاءٌ অর্থ রোগ নিরাময় হওয়া আর صُدُوْرٌ হলো صَدْرٌ এর বহুবচন, যার অর্থ বুক। আর এর মর্মার্থ অন্তর। সারার্থ হচ্ছে যে, কুরআনুল কারীম অন্তরের ব্যাধিসমূহ যেমন সন্দেহ, সংশয়, নিফাক, মতবিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদির জন্য একান্ত সফল চিকিৎসা ও সুস্থতা এবং রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। [কুরতুবী] অনুরূপভাবে অন্তরে যে সমস্ত পাপ পঙ্কিলতা রয়েছে সেগুলোর জন্যও মহৌষধ। [ইবন কাসীর] সঠিক আকীদা বিশ্বাস বিরোধী যাবতীয় সন্দেহ কুরআনের মাধ্যমে দূর হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন যে, কুরআনের এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি বিশেষতঃ অন্তরের রোগের শিফা; দৈহিক রোগের চিকিৎসা নয়। কিন্তু অন্যান্য মনীষীবৃন্দ বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কুরআন সর্ব রোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক। [আদ-দুররুল মানসূর] তবে আত্মিক রোগের ধ্বংসকারিতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা বেশী মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও যে কারো সাধ্যের ব্যাপার নয়। সে কারণেই এখানে শুধু আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, দৈহিক রোগের জন্য এটি চিকিৎসা নয়। হাদীসের বর্ণনা ও উম্মতের আলেম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ যে, কুরআনুল কারীম যেমন আন্তরিক ব্যাধির জন্য অব্যর্থ মহৌষধ, তেমনি দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্যও উত্তম চিকিৎসা। তিন. কুরআনুল কারীমের তৃতীয় গুণ হচ্ছেঃ কুরআন হলো হেদায়াত। অর্থাৎ যে তার অনুসরণ করবে তার জন্য সঠিক পথের দিশা প্রদানকারী [কুরতুবী] আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কুরআনকে হেদায়াত বলে অভিহিত করেছেন। যেমন সূরা আল-বাকারার ২য় আয়াত, সূরা আল ইসরার নবম আয়াত, সূরা আল-বাকারাহঃ ৯৭, ১৮৫, সূরা আলে-ইমরানঃ ১৩৮, সূরা আল-আন'আমঃ ১৫৭, সূরা আল-আ'রাফঃ ৫২, ২০৩, সূরা ইউসুফঃ ১১১, সূরা আন-নাহলঃ ৬৪, ৮৯, ১০২, সূরা আয-যুমারঃ ২৩, সূরা ফুসসিলাতঃ ৪৪, সূরা আল-জাসিয়াহঃ ২০। চার. কুরআনুল কারীমের চতুর্থ গুণ হচ্ছেঃ কুরআন হলো রহমত। যার এক অর্থ হচ্ছে নে'আমত। [কুরতুবী] অনুরূপভাবে সূরা আল-ইসরার ৮২, সূরা আল-আন'আমঃ ১৫৭, আল-আ'রাফঃ ১৫২, ২০৩, সূরা ইউসুফঃ ১১১, সূরা আন-নাহলঃ ৬৪, ৮৯, সূরা আল-ইসরাঃ ৮২, সূরা আন-নামলঃ ৭৭, সুরা লুকমানঃ ৩, সূরা আল-জাসিয়াহঃ ২০, সূরা আল-কাসাসঃ ৮৬ নং আয়াতেও কুরআনকে রহমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসবই কিন্তু মুমিনদের জন্য কারণ তারাই এর দ্বার উপকৃত হয়, কাফেররা এর দ্বারা উপকৃত হয় না, কারণ তারা এ ব্যাপারে অন্ধ। [মুয়াসসার]

করে তার চেয়ে এটা উত্তম[১]।

(১) অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রকৃত আনন্দের বিষয় মনে করা এবং একমাত্র তাতেই আনন্দিত হওয়া। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও মান-সম্ভ্রম কোনটাই প্রকৃতপক্ষে আনন্দের বিষয় নয়। কারণ, একে তো কেউ যত অধিক পরিমাণেই তা অর্জন করুক না কেন, সবই অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে; পরিপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয়তঃ সর্বদাই তার পতনাশঙ্কা লেগেই থাকে। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- ﴿هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্র করুণা-অনুগ্রহ সে সমস্ত ধন-সম্পদ ও সম্মান-সাম্রাজ্য অপেক্ষা উত্তম, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের সমগ্র জীবনের ভরসা বিবেচনা করে সংগ্রহ করে। এ আয়াতে দু'টি বিষয়কে আনন্দ-হর্ষের বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হলো فضل 'ফদল', অপরটি হলো رحمة 'রহমত'। আবু সাঈদ খুদরী ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাসহ অনেক মুফাস্‌সির বলেছেন যে, 'ফদল' অর্থ কুরআন; আর 'রহমত' অর্থ ইসলাম। [কুরতুবী] অন্য বর্ণনায় ইবন আব্বাস বলেন, 'ফদল' হচ্ছে, কুরআন, আর তাঁর রহমত হচ্ছে এই যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের অনুসারী করেছেন। হাসান, দাহহাক, মুজাহিদ, কাতাদা বলেন, এখানে 'ফদল' হচ্ছে ঈমান, আর তাঁর রহমত হচ্ছে, কুরআন। [তাবারী; কুরতুবী] বস্তুতঃ রহমতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনের শিক্ষা দান করেছেন এবং এর উপর আমল করার সামর্থ্য দিয়েছেন। কারণ, ইসলামও এ তথ্যেরই শিরোনাম। যখন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট ইরাকের খারাজ নিয়ে আসা হলো তখন তিনি তা গুনছিলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছিলেন। তখন তার এক কর্মচারী বললঃ এগুলো আল্লাহর দান ও রহমত। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ তোমার উদ্দেশ্য সঠিক নয়। আল্লাহর কুরআনে যে কথা বলা হয়েছে যে, "বল তোমরা আল্লাহর দান ও রহমত পেয়ে খুশী হও যা তোমরা যা জমা করছ তার থেকে উত্তম" এ আয়াত দ্বারা দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদ বুঝানো হয়নি। কারণ আল্লাহ তা'আলা জমা করা যায় এমন সম্পদ থেকে অন্য বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তা উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদই জমা করা যায়। সুতরাং আয়াত দ্বারা দুনিয়ার সম্পদ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। [ইবনে আবী হাতিম] বরং ঈমান, ইসলাম ও কুরআনই এখানে উদ্দেশ্য। আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারাও এ অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। সুতরাং এ জাতীয় দ্বীনী কোন সুসংবাদ যদি কারো হাসিল হয় তিনিও এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আব্দুর রহমান ইবনে আবযা তার পিতা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেনঃ "আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে এবং আমাকে তা তোমাকে পড়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে"। তিনি বললেন, আমি বললামঃ আমার নাম নেয়া হয়েছে? রাসূল বললেনঃ হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি আমার পিতা (উবাই রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)

৫৯. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ্ তোমাদের যে রিয্ক[১] দিয়েছেন তারপর তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ[২]' বলুন, 'আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রটনা করছ[৩]?'

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۝٥٩

কে বললামঃ হে আবুল মুনযির! আপনি কি তাতে খুশী হয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমাকে খুশী হতে কিসে নিষেধ করল অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ "বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তারই রহমতের উপর তোমরা খুশী হও"।[মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৩/৩০৪, আবুদাউদঃ ৩৯৮০]

(১) আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে ইবন আব্বাস বলেন, জাহেলী যুগে তারা কিছু জিনিস-কাপড় ইত্যাদি নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল, সেটার সংবাদই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে প্রদান করেছেন। তারপর আল্লাহ্ অন্য আয়াতে সেটার ব্যাপারে বলেছেন, "বলুন, কে তোমাদের উপর সে সব বস্তু হারাম করেছেন যেগুলো আল্লাহ্ বান্দাদের জন্য বের করেছেন?" [সূরা আল-আ'রাফ: ৩২] [তাবারী] মূলতঃ রিযিক শব্দটি নিছক খাদ্যের অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং রকমারি দান, অনুদানও এর আওতাভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ দুনিয়ায় মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই তার রিযিক। এমনকি সন্তান-সন্ততিও রিযিক। হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর পেটে একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি শিশুর রিযিক এবং তার আয়ু ও কর্ম লিখে দেন। [দেখুন, বুখারীঃ ৩০৩৬] এখানে রিযিক মানে শুধু খাদ্য নয়, যা ভূমিষ্ঠ হবার পরে এ শিশু লাভ করবে। বরং এ দুনিয়ায় তাকে যা কিছু দেয়া হবে সবই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "যা কিছু আমি তাদের রিয্ক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ৩]

(২) অর্থাৎ তোমরা যে এটা কতবড় মারাত্মক বিদ্রোহাত্মক অপরাধ করছো তার কোন অনুভূতিই তোমাদের নেই। রিযিকের মালিক আল্লাহ। তোমরা নিজেরাও আল্লাহর অধীন। এ অবস্থায় আল্লাহর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ এবং তা ব্যবহার ও ভোগ করার জন্য তার মধ্যে বিধি-নিষেধ আরোপ করার অধিকার তোমরা কোথা থেকে পেলে? বিধি-নিষেধ তো তিনিই দেবেন। তিনিই হালাল বা হারামকারী, অন্য কেউ নয়। আর তা তাঁর রাসূলের মাধ্যমেই আসতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আবুল আহওয়াছ আউফ ইবনে মালেক ইবনে নাদলাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খুব অবিন্যস্ত অবস্থায় আসলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ "তোমার কি সম্পদ আছে?" আমি বললামঃ হ্যাঁ, তিনি বললেনঃ "কি সম্পদ"? আমি বললামঃ

৬০. আর যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করে, কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের কি ধারণা? নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না[১]।

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٠﴾

সপ্তম রুকূ'

৬১. আর আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এবং আপনি সে সম্পর্কে

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ

সবধরণের সম্পদ, উট, দাস, ঘোড়া এবং ছাগল। তখন তিনি বললেনঃ "আল্লাহ্ যদি তোমাকে কোন সম্পদ দিয়ে থাকেন তবে তা তোমার নিকট দেখা যাওয়া উচিত।" এরপর আরো বললেনঃ "তোমার সম্প্রদায়ের উটের বাচ্চা সুস্থ কান সম্পন্ন হওয়ার পরে তুমি ক্ষুর নিয়ে সেগুলোর কান কেটে বল না যে, এগুলো 'বুহুর'? এবং সেগুলো ফাটিয়ে দিয়ে বা সেগুলোর চামড়া ফাটিয়ে তুমি কি বলনা যে, এগুলোঃ 'ছুরম'? আর এতে করে তুমি সেগুলোকে তোমার এবং তোমার পরিবারের জন্য হারাম বানিয়ে নাও না? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন তা অবশ্যই তোমার জন্য হালাল। আল্লাহ্‌র বাহুর ক্ষমতা তোমার বাহুর ক্ষমতা থেকে নিঃসন্দেহে বেশী শক্তিশালী, আর আল্লাহ্‌র ক্ষুর তোমার ক্ষুরের চাইতে ধারালো"। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪৭৩] সুতরাং কোন হালাল বস্তুকে হারাম করার ক্ষমতা মানুষকে আল্লাহ্ দেন নি। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আখেরাতের কঠিন ভয় দেখিয়ে এরূপ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন।

(১) অর্থাৎ এ সমস্ত লোকদের সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? তাদেরকে কি আল্লাহ্ এমনিই ছেড়ে দিবেন? কিয়ামতের দিন কি তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না? [ইবন কাসীর] কিন্তু তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। তাঁর অনুগ্রহের এক প্রকাশ হচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে দুনিয়ার বুকে এর কারণে দ্রুত শাস্তি দেন না। [তাবারী] আরেক প্রকাশ হচ্ছে, তিনি ঐ সব বস্তুই হারাম করেছেন যা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিকর বিবেচিত। পক্ষান্তরে যা উপকারী তা অবশ্যই হালাল করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ্‌র শোকরিয়া জ্ঞাপন না করে আল্লাহ্ তাদের জন্য যা হালাল করেছেন তা হারাম করছে, এতে করে তারা তাদের নিজেদের উপর দুনিয়াকে সংকীর্ণ করে নিচ্ছে। আর এ কাজটা মুশরিকরাই করে থাকে, তারা নিজেদের জন্য শরী'আত প্রবর্তন করে নিয়েছে। অনুরূপভাবে আহলে কিতাবগণও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ তারাও দ্বীনের মধ্যে বিদ'আতের প্রবর্তন করেছে। [ইবন কাসীর]

وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَلَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرَ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾

কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে আমলই কর না কেন, আমরা তোমাদের সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আর আসমানসমূহ ও যমীনের অণু পরিমাণও আপনার রবের দৃষ্টির বাইরে নয় এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[১]।

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র অলীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রশংসা ও পরিচয় বর্ণনার সাথে সাথে তাদের প্রতি আখেরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- যারা আল্লাহ্‌র অলী তাদের না থাকবে কোন অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোন উদ্দেশ্যে ব্যর্থতার গ্লানি। এদের জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখেরাতেও। দুনিয়াতেও তারা দুঃখ-ভয় থেকে মুক্ত। আর আখেরাতে তাদের মনে কোন চিন্তা-ভাবনা না থাকার অর্থ জান্নাতে যাওয়া। এতে সমস্ত জান্নাতবাসীই অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতে উল্লেখিত 'আওলিয়া' শব্দটি অলী শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় অলী অর্থ 'নিকটবর্তী'ও হয় এবং 'দোস্ত-বন্ধু'ও হয়। শরী'আতের পরিভাষায় অলী বলতে বুঝায়ঃ যার মধ্যে দু'টি গুণ আছেঃ ঈমান এবং তাকওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, "জেনে রাখ! আল্লাহর অলী তথা বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা, যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে"। [সূরা ইউনুসঃ ৬২-৬৩] যদি আল্লাহর অলী বলতে ঈমানদার ও মুত্তাকীদের বুঝায় তাহলে বান্দার ঈমান ও তাকওয়া অনুসারে আল্লাহর কাছে তার বেলায়াত তথা বন্ধুত্ব নির্ধারিত হবে। সুতরাং যার ঈমান ও তাকওয়া সবচেয়ে বেশী পূর্ণ, তার বেলায়াত তথা আল্লাহর বন্ধুত্ব সবচেয়ে বেশী হবে। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে আল্লাহর বেলায়াতের মধ্যেও তারতম্য হবে।

আল্লাহ্‌র অলীদের সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

আল্লাহর নবীরা তার সর্বশ্রেষ্ঠ অলী হিসাবে স্বীকৃত। নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন তার রাসূলগণ। রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেনঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ তথা নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা, 'ঈসা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর

সমস্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেনঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।
এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহর অলীগণ দুশ্রেণীতে বিভক্তঃ প্রথম শ্রেণীঃ যারা অগ্রবর্তী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত । দ্বিতীয় শ্রেণীঃ যারা ডান ও মধ্যম পন্থী । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাদের উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেনঃ "যখন যা ঘটা অবশ্যম্ভাবী (ক্বিয়ামত) তা ঘটবে, তখন তার সংঘটনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কেউ থাকবে না । তা কাউকে নীচ করবে, কাউকে সমুন্নত করবে । যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে যমীন । পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে । ফলে তা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পর্যবসিত হবে । এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেনীতে- ডান দিকের দল; ডান দিকের দলের কি মর্যাদা! আর বাম দিকের দল; বাম দিকের দলের কি অসম্মান! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী । তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত- নেয়ামত পূর্ণ জান্নাতে । [সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ ১-১২] এখানে তিন শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করা হয়েছেঃ যাদের একদল জাহান্নামের, তাদেরকে বামদিকের দল বলা হয়েছে । আর বাকী দু'দল জান্নাতের, তারা হলেনঃ ডানদিকের দল এবং অগ্রবর্তী ও নৈকট্যপ্রাপ্তগণ । তাদেরকে আবার এ সূরা আল-ওয়াকি'আরই শেষে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করে বলেছেন, "তারপর যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয় তবে তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও নেয়ামত পূর্ণ জান্নাত । আর যদি সে ডান দিকের একজন হয় তবে তোমার জন্য সালাম ও শান্তি; কারণ সে ডানপন্থীদের মধ্যে" । [সূরা আল- ওয়াকি'আহঃ ৮৮-৯১] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অলীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত হাদীসে বলেনঃ "মহান আল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম । আমার বান্দার উপর যা আমি ফরয করেছি তা ছাড়া আমার কাছে অন্য কোন প্রিয় বস্তু নেই যার মাধ্যমে সে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে । আমার বান্দা আমার কাছে নফল কাজ সমূহ দ্বারা নৈকট্য অর্জন করতেই থাকে, শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালবাসি । তারপর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যার দ্বারা সে শুনে, তার দৃষ্টি শক্তি হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধারণ করে আর তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলে । তখন আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে তা অবশ্যই দেব, আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে অবশ্যই উদ্ধার করব" । [বুখারীঃ ৬৫০২] এর মর্ম হলো এই যে, তার কোন গতি-স্থিতি ও অন্য যে কোন কাজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় না । বস্তুতঃ এই বিশেষ ওলীত্ব বা নৈকট্যের স্তর অগণিত ও অশেষ । এর সর্বোচ্চ স্তর নবী-রাসূলগণের প্রাপ্য । কারণ, প্রত্যেক নবীরই ওলী হওয়া অপরিহার্য । আর এর সর্বোচ্চ স্তর হলো সাইয়্যেদুল আম্বীয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর । এর পর প্রত্যেক ঈমানদার তার ঈমানের শক্তি ও স্তরের বৃদ্ধি-ঘাটতি

অনুসারে বেলায়েতের অধিকারী হবে। সুতরাং নেককার লোকেরা হলোঃ ডান দিকের দল, যারা আল্লাহর কাছে ফরয আদায়ের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করে। তারা আল্লাহ তাদের উপর যা ফরয করেছেন তা আদায় করে, আর যা হারাম করেছেন তা পরিত্যাগ করে। তারা নফল কাজে রত হয় না। কিন্তু যারা অগ্রবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত দল তারা আল্লাহর কাছে ফরয আদায়ের পর নফলের মাধ্যমে নৈকট্য লাভে রত হয়।

এখানে আরও একটি বিষয় জানা আবশ্যক যে, আল্লাহর অলীগণ অন্যান্য মানুষদের থেকে প্রকাশ্যে কোন পোষাক বা বেশ-ভূষা দ্বারা বিশেষভাবে পরিচিত হন না। বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে প্রকাশ্য বিদ'আতকারী ও অন্যায়কারী ছাড়া সর্বস্তরে আল্লাহর অলীগণের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাদের অস্তিত্ব রয়েছে কুরআনের ধারক-বাহকদের মাঝে, জ্ঞানী-আলেমদের মাঝে, জিহাদকারী ও তরবারী-ধারকদের মাঝে, ব্যবসায়ী, কারিগর ও কৃষকের মাঝে।

আল্লাহর অলীগণের মধ্যে নবী-রাসূলগণ ছাড়া আর কেউ নিষ্পাপ নন, তাছাড়া কোন অলীই গায়েব জানেনা, সৃষ্টি বা রিযিক প্রদানে তাদের কোন প্রভাবও নেই। তারা নিজেদেরকে সম্মান করতে অথবা কোন ধন-সম্পদ তাদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে মানুষদেরকে আহবান করেন না। যদি কেউ এমন কিছু করে তাহলে সে আল্লাহর অলী হতে পারে না, বরং মিথ্যাবাদী, অপবাদ আরোপকারী, শয়তানের অলী হিসাবে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ্‌র অলী হওয়ার জন্য একটিই উপায় রয়েছে, আর তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রঙে রঞ্জিত হওয়া, তার সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করা। যারা এ ধরনের অনুসরণ করতে পেরেছেন তাদের মর্যাদাই আলাদা। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্‌র এমন কিছু বান্দা রয়েছে যাদেরকে শহীদরাও ঈর্ষা করবে। বলা হলোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তারা কারা? হয়ত তাদের আমরা ভালবাসবো। রাসূল বললেনঃ "তারা কোন সম্পদ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ব্যতীতই একে অপরকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবেসেছে। নূরের মিম্বরের উপর তাদের চেহারা হবে নূরের। মানুষ যখন ভীত হয় তখন তারা ভীত হয় না। মানুষ যখন পেরেশান ও অস্থির হয় তখন তারা অস্থির হয় না।" তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। [ইবনে হিব্বানঃ ৫৭৩, আবুদাউদঃ ৩৫২৭] অন্য বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "বিভিন্ন দিক থেকে মানুষ আসবে এবং বিভিন্ন গোত্র থেকে মানুষ এসে জড়ো হবে, যাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবেসেছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধে কাতারবন্দী হয়েছে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের জন্য নূরের মিম্বরসমূহ স্থাপন করবেন, তারপর তাদেরকে সেগুলোতে বসাবেন। তাদের বৈশিষ্ট হলো মানুষ যখন ভীত হয় তখন তারা ভীত হয় না, মানুষ যখন পেরেশান হয় তখন

৬৩. যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. তাদের জন্যই আছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে(১), আল্লাহ্‌র

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

তারা পেরেশান হয় না। তারা আল্লাহর অলী, তাদের কোন ভয় ও পেরেশানী কিছুই থাকবে না। [মুসনাদে আহমাদ [৫/৩৪৩]। [উসুলুল ঈমান ফী দাওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত, পৃ. ২৮২-২৮৬ (বাংলা সংস্করণ)]

(১) এখানে আল্লাহর অলীদের জন্য দুনিয়ার সুসংবাদ বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে এসেছে যে, তা হলো "কোন মুসলিম তার জন্য কোন ভাল স্বপ্ন দেখা বা তার জন্য অন্য কেউ কোন ভাল স্বপ্ন দেখা"। [মুসলিমঃ ২৬৪২, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩১৫, ৬/৪৪৫, তিরমিযীঃ ২২৭৩, ২২৭৫, ইবনে মাজাহঃ ৩৮৯৮] কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যখন সময় (কিয়ামত) নিকটবর্তী হবে তখন মুসলিম ব্যক্তির স্বপ্ন প্রায় সত্য হবে। তোমাদের মধ্যে যে বেশী সত্যবাদি তার স্বপ্নও বেশী সত্য। মুসলিম ব্যক্তির স্বপ্ন নবুওয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের একভাগ। স্বপ্ন তিন প্রকারঃ সৎ স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ। আরেক প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে শয়তানের পুঞ্জিভূত করা বিষয়াদি। অন্য আরেক প্রকার স্বপ্ন আছে যা কোন ব্যক্তির নিজের সাথে কৃত কথাবার্তা। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে সে যেন উঠে সালাত আদায় করে এবং কাউকে না বলে।" [বুখারীঃ ৭০১৭, মুসলিমঃ ২২৬৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মুবাশশিরাত ব্যতীত নবুওয়তের আর কিছু বাকী নেই। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ মুবাশশিরাত কি? তিনি বললেনঃ সৎস্বপ্ন"। [মুসলিমঃ ৪৭৯]

অবশ্য কোন কোন মুফাসসিরের মতে এখানে দুনিয়ার সুসংবাদ বলতে মুমিন বান্দাদের মৃত্যুর সময় তারা যে জান্নাত ও রহমতের ফেরেশ্‌তাদের পক্ষ থেকে উত্তম আচরণ পেয়ে থাকেন তাই বুঝানো হয়েছে। [তাবারী] যেমন সুরা ফুসসিলাতের ৩০-৩২ নং আয়াতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বারা' ইবনে 'আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত এক বড় হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুকালীন সময়ে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি কি কি দেখতে পায় এবং তার কি অবস্থা হয় তা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। [দেখুনঃ মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৮৭-২৮৮, আবু দাউদঃ ৪৭৫৩] মূলতঃ উভয় তাফসীরই বিশুদ্ধ। এতে কোন স্ববিরোধিতা নেই।

আর আখেরাতে সুসংবাদ হচ্ছে জান্নাত ও উত্তম ব্যবহার। যা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও রাসূলের বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত এসেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾

বাণীর কোন পরিবর্তন নেই[১]; সেটাই মহাসাফল্য।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۚ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর তাদের কথা আপনাকে যেন চিন্তিত না করে। নিশ্চয় সমস্ত সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক আল্লাহ্; তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ۗ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. জেনে রাখ! নিশ্চয় যারা আসমানসমূহে আছে এবং যারা যমীনে আছে তারা আল্লাহ্‌রই। আর যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে শরীকরূপে ডাকে, তারা কিসের অনুসরণ করে?[২] তারা তো শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু মিথ্যা কথাই বলে।

বলেনঃ “তাদেরকে (হাশরের মাঠের) কঠিন ভীতিকর অবস্থা পেরেশান করবে না, আর ফেরেশ্‌তাগণ তাদের সাক্ষাৎ করে বলবে, এটা তো ঐ দিন যার ওয়াদা তোমাদের করা হতো”। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ১০৩] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ “সেদিন আপনি দেখবেন মুমিন নর-নারীদের সামনে ও ডানে তাদের জ্যোতি ছুটতে থাকবে। বলা হবে, ‘আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য।” [সূরা আল-হাদীদঃ১২]

(১) অর্থাৎ উপরে আল্লাহ্ তা‘আলা মুমিন মুত্তাকীদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা কখনো পরিবর্তনশীল নয়। এটা স্থায়ী অঙ্গীকার। [কুরতুবী]

(২) আয়াতের অন্য অনুবাদ হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্যদের ডাকে, তারা মূলত শরীকদের অনুসরণ করে না। কেননা, যাকে প্রকৃত অর্থে ডাকতে হবে, তিনি হবেন রব। আর এ সমস্ত শরীকগুলো কখনও রব হতে পারে না। তাদেরকে তারা শরীক বললেও প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আল্লাহ্‌র শরীক নয়। আল্লাহ্‌র রবুবিয়াতে শরীক সাব্যস্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে থাকে। [কুরতুবী] তাছাড়া কোন কোন মুফাসসির অনুবাদ করেছেন, আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য যাদেরকে তারা ডাকে, তারা তো তাদের ধারণা অনুসারে তাদেরই সাব্যস্ত করা শরীক। প্রকৃত অর্থে তারা শরীক নয়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে, এর অর্থ, তারা যাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া শরীক সাব্যস্ত করে থাকে সে সমস্ত নবী ও ফিরিশতাগণ তো আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেন না। সুতরাং তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো? [ফাতহুল কাদীর]

৬৭. তিনিই তৈরী করেছেন তোমাদের জন্য রাত, যেন তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং দেখার জন্য দিন। যে সম্প্রদায় কথা শুনে নিশ্চয় তাদের জন্য এতে আছে অনেক নিদর্শন।

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّسْمَعُوْنَ ﴿۶۷﴾

৬৮. তারা বলে, ‘আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি মহান পবিত্র![1] তিনি অভাবমুক্ত[2]! যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যা কিছু আছে যমীনে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোন সনদ নেই। তোমরা কি আল্লাহ্‌র উপর এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না[3]?

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِیُّ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۸﴾

---

(১) অর্থাৎ “আল্লাহ সকল দোষ-ক্রুটি মুক্ত।” উদ্দেশ্য, আল্লাহ তো ক্রুটিমুক্ত, কাজেই তাঁর সন্তান আছে একথা বলা কেমন করে সঠিক হতে পারে! এখানে আল্লাহ্ তাঁর জন্য স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, অংশীদার ও সমকক্ষ নির্ধারণ করা থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। [কুরতুবী] তিনি এ সব থেকে মুক্ত, তিনি অমুখাপেক্ষী, আর সবাই তার মুখাপেক্ষী। [ইবন কাসীর]

(২) সন্তানের সাথে অভাবমুক্তির সম্পর্ক হচ্ছে, মানুষ চায় সন্তান সন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে তার কাজ-কারবারে সাহায্য হবে। আর মৃত্যুর পর সে বেঁচে থাকবে এবং তার না থাকা জনিত অভাব কিছুটা প্রশমিত হবে। আল্লাহ্ তো সর্বক্ষম এবং সর্বদা আছেন। সুতরাং সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে তাঁর কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তাঁর অবর্তমানে অভাব ঘুচানোর ব্যাপারটি আসছে না। [তাবারী]

(৩) এটা দ্বারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মারাত্মক ভয়প্রদর্শন করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র উপর না জেনে কিভাবে কথা বলছ? এর পরিণতি কি হতে পারে তোমরা কি ভেবে দেখেছ? তোমাদেরকে কি তিনি এমনিতে ছেড়ে দিবেন? পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও একই পদ্ধতিতে আল্লাহর উপর না জেনে কথা বলার উপর প্রচণ্ড ধমকি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, “তারা বলে, ‘দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তোমরা তো এমন এক বীভৎস বিষয়ের অবতারণা করছ। যাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের শোভন নয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে

৬৯. বলুন, 'যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রটনা করবে তারা সফলকাম হবে না।'

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. দুনিয়াতে তাদের জন্য আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ; পরে আমাদেরই কাছে তাদের ফিরে আসা। তারপর তাদেরকে আমরা কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব; কারণ তারা কুফরী করত।

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

অষ্টম রুকূ'

৭১. আর তাদেরকে নূহ্-এর বৃত্তান্ত শোনান[১]। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্র আয়াতসমূহ দ্বারা আমার উপদেশ প্রদান তোমাদের কাছে যদি দুঃসহ হয় তবে আমি তো আল্লাহ্র উপর নির্ভর করি। সুতরাং তোমরা তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও এবং তোমরা যাদেরকে শরীক করেছ তাদেরকেও

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ﴿٧١﴾

বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে আসবে একাকী অবস্থায়।" [সূরা মারইয়ামঃ ৮৮-৯৫]

(১) এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তাতে এ লোকদেরকে ন্যায়সংগত যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশের মাধ্যমে তাদের আকীদা-বিশ্বাসে কি কি ভুল-ভ্রান্তি আছে এবং সেগুলো ভুল কেন আর এর মোকাবিলায় সঠিক পথ কি এবং তা সঠিক কেন, একথা বুঝানো হয়েছিল। এখানে আল্লাহ তাঁর নবীকে হুকুম দিচ্ছেন, তাদেরকে নূহের ঘটনা শুনিয়ে দিন, এ ঘটনা থেকেই তারা আপনার ও তাদের মধ্যকার ব্যাপারটির জবাব পেয়ে যাবে। যেখানে তারা দেখতে পাবে যে, যারা কুফরিতে নিপতিত ছিল তাদেরকে কিভাবে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। [কুরতুবী] সুতরাং যারাই অনুরূপ কাজ করবে, আপনার উপর মিথ্যারোপ করবে, আপনার বিরোধিতা করবে তাদের পরিণতিও তা-ই হবে। [ইবন কাসীর]

ডাক, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন অস্পষ্টতা না থাকে। তারপর আমার সম্বন্ধে তোমাদের কাজ শেষ করে ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিও না[১]।

৭২. 'অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমাদের কাছে আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাইনি, আমার পারিশ্রমিক আছে তো কেবল আল্লাহ্‌র কাছে, আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি[২]।'

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٧٢

(১) এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। বলা হচ্ছে, আমি নিজের কাজ থেকে বিরত হবো না। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যা করতে চাও করো। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখি। এ ব্যাপারে আরো দেখুন সূরা হুদের ৫৫নং আয়াত।

(২) অর্থাৎ আমাকে যে ইসলামের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার আনুগত্য আমি করছি। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলাম সমস্ত নবী-রাসূলদের দ্বীন। তাদের শরী'আত বিভিন্ন ছিল কিন্তু দ্বীন একই ছিল। নূহ আলাইহিস সালামের দ্বীন যে ইসলাম ছিল তা এ আয়াতে তার কথা থেকে আমরা তা জানতে পারলাম। অনুরূপভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামও ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, "আমি রাব্বুল আলামীনের জন্য আত্মসমর্পন তথা ইসলাম গ্রহণ করেছি"[সূরা আল-বাকারাহঃ১৩১] তাছাড়া ইয়াকুব আলাইহিসসালামও তার দ্বীনকে ইসলাম বলে ঘোষণা করেছিলেন [দেখুন সূরা আল-বাকারাহঃ১৩২] আর ইউসুফ ও মূসা আলাইহিমাসসালামও সেটা ঘোষণা করেছিলেন [দেখুন, সূরা ইউসুফঃ১০১, সূরা ইউনুসঃ৮৪] বরং মূসা আলাইহিসসালামের উপর ঈমান গ্রহণকারী জাদুকরগণ, রাণী বিলকিস, ঈসা আলাইহিসসালামের হাওয়ারীগণ এরা সবাই তাদের দ্বীনকে ইসলাম বলে জানিয়েছেন [দেখুনঃ সূরা আল-আ'রাফঃ১২৬, সূরা আন-নামলঃ ৪৪, সূরা আল-মায়েদাহঃ৪৪, ১১১] এমনকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও আল্লাহ্ তা'আলা এ দ্বীনের অনুসারী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ "বলুন, 'আমার সালাত, আমার 'ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের রব আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে।' 'তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এরই জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।" [সূরা আল-আন'আমঃ১৬২,১৬৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমরা নবীগোষ্ঠি বৈমাত্রেয় ভাই, আমাদের দ্বীন একই'। [বুখারীঃ৩৪৪৩, মুসলিমঃ ২৩৬৫]

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَٰهُمْ خَلَٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩. অবশেষে তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল; ফলে আমরা তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকাতে ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম এবং তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করি। আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম। কাজেই দেখুন, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল?

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. তারপর আমরা নূহের পরে অনেক রাসূলকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই; অতঃপর তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল। কিন্তু তারা আগে যাতে মিথ্যারোপ করেছিল তাতে ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিল না[১]। এভাবে আমরা

(১) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কয়েকটি মত রয়েছে,
আল্লাহ্ তা'আলা নূহের পরে রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠান; কিন্তু নবীগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসার পরও সে সমস্ত সম্প্রদায় নবীরা যা নিয়ে এসেছিল তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল যেমনিভাবে তারা নবী আসার পূর্বে অস্বীকার করত। [কুরতুবী]
আল্লাহ তা'আলা নূহের পরে রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠান; কিন্তু তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসার পরেও সে সমস্ত সম্প্রদায় নবীরা যা নিয়ে এসেছিল তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল যেমনিভাবে নূহের জাতি নূহ আলাইহিস্সালামের দাওয়াতকে এর আগে অস্বীকার করেছিল। [তাবারী; ফাতহুল কাদীর]
আল্লাহ্ তা'আলা নূহের পরে রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠান; কিন্তু তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসার পরেও সে সমস্ত সম্প্রদায় নবীরা যা নিয়ে এসেছিল তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল; তারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী আসার পূর্বেই তড়িঘড়ি করে রাসূলদের দাওয়াত মানতে অস্বীকার করেছিল, ফলে যখন তাদের কাছে রাসূলগণ নিদর্শনাবলী নিয়ে আসলেন তখন পূর্বে অস্বীকার করণের শাস্তি স্বরূপ তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য

সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয় মোহর করে দেই[১] ।

৭৫. তারপর আমরা আমাদের নিদর্শনসহ মূসা ও হারূনকে ফির'আউন ও তার সভাষদদের কাছে পাঠাই । কিন্তু তারা অহংকার করে[২] এবং তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়[৩] ।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوسَىٰ وَهَٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ بِـَٔايَٰتِنَا فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬. অতঃপর যখন তাদের কাছে আমাদের নিকট থেকে সত্য আসল তখন তারা বলল, 'এটা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট

فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾

হলো না । এটা ছিল তাদের জন্য এক প্রকার শাস্তি । কারণ তারা পূর্বে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ঈমান আনেনি । সুতরাং নিদর্শনাবলী দেখার পরেও পূর্বোক্ত হটকারিতার কারণে তাদেরকে ঈমানের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে হলো । [তাবারী; ফাতহুল কাদীর] এ অর্থের সমর্থনে অন্যত্র এসেছে, "তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ঈমান আনেনি তেমনি আমিও তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দেব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেব" । [সূরা আল-আন'আম:১১০] [সা'দী]

(১) সীমা অতিক্রমকারী লোক তাদেরকে বলে যারা একবার ভুল করার পর আবার নিজের কথার বক্রতা, একগুঁয়েমী ও হঠকারীতার কারণে নিজের ভুলের ওপর অবিচল থাকে এবং যে কথা মেনে নিতে একবার অস্বীকার করেছে তাকে আর কোন প্রকার উপদেশ, অনুরোধ-উপরোধ ও কোন উন্নত থেকে উন্নত পর্যায়ের যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে মেনে নিতে চায় না । এ ধরনের লোক যারা কুফরী ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে সীমা অতিক্রম করে যায় তাদের ওপর শেষ পর্যন্ত আল্লাহর এমন লানত পড়ে যে, তাদের আর ঈমান নসীব হয় না । [কুরতুবী] তাদের আর কোনদিন সঠিক পথে চলার সুযোগ হয় না । তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, ফলে সেখানে কোন কল্যাণ প্রবেশ করে না । এতে স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ্ তাদের উপর যুলুম করেন নি । বরং তারাই তাদের কাছে হক আসার পরে হককে প্রতিহত করে এবং প্রথমবার হকের সাথে মিথ্যারোপ করে তাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছিল । [সা'দী]

(২) অর্থাৎ তারা নিজেদের ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে হক গ্রহণ করতে অহংকার করেছিল । [কুরতুবী] ।

(৩) অর্থাৎ মুশরিক সম্প্রদায় । [কুরতুবী]

জাদু(১) ।’

৭৭. মূসা বললেন, ‘সত্য যখন তোমাদের কাছে আসল তখন তা সম্পর্কে তোমরা এরূপ বলছ? এটা কি জাদু? অথচ জাদুকরেরা সফলকাম হয় না(২) ।’

قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّٰحِرُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮. তারা বলল, ‘আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তুমি কি তা থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করার জন্য আমাদের কাছে এসেছ এবং যাতে যমীনে তোমাদের দুজনের প্রতিপত্তি হয়, এজন্যে? আমরা তোমাদের প্রতি ঈমান আনয়নকারী নই ।’

قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

৭৯. আর ফির‘আউন বলল, ‘তোমরা আমার কাছে সমস্ত সুদক্ষ জাদুকরকে নিয়ে আস ।’

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾

(১) অর্থাৎ মূসার বাণী শুনে তারা সেই একই কথা বলেছিল যা মক্কার কাফেররা বলেছিল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে । কাফেররা বলেছিল, “এ ব্যক্তি তো পাক্কা জাদুকর ।” [সূরা ইউনুস: ২, অনুরূপ দেখুন, সূরা ছোয়াদ ৪] মূসা ও হারূন আলাইহিমাসসালামের দায়িত্ব তা-ই ছিল যা কুরআনের দৃষ্টিতে সকল নবীর নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল এবং সূরা নাযিআতে যে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে বলে দেয়া হয়েছেঃ “ফিরআউনের কাছে যান, কারণ সে সীমা অতিক্রম করে গেছে এবং তাকে বলেন, তুমি কি নিজেকে শুধরে নেবার জন্য তৈরী আছো? আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাবো তুমি কি তাঁকে ভয় করবে?” [১৭-১৯] কিন্তু ফির‘আউন ও তার রাজ্যের প্রধানগণ এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি ।

(২) অর্থাৎ তোমরা এসব গুণাগুণ দেখে অবশ্যই বুঝতে পার যে আসলে এটা কি জাদু নাকি জাদু নয় । তাছাড়া জাদুকররা দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও সফলকাম হয় না । সুতরাং তোমরা দেখো কার পরিণাম কেমন হয়, আর কে-ই বা সফল হয় । পরবর্তীতে তারা ঠিকই সেটা জানতে পেরেছিল এবং প্রত্যেকের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মূসা আলাইহিস সালামই সফলকাম । তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সবখানেই সফল । [সা‘দী] এ সমগ্র বিষয় শুধু একটি বাক্যের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে, “জাদুকর কোন কল্যাণ প্রাপ্ত লোক হয় না ।”

৮০. অতঃপর যখন জাদুকরেরা আসল তখন তাদেরকে মূসা বললেন, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার, নিক্ষেপ কর।'

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বললেন, 'তোমরা যা এনেছ তা জাদু, নিশ্চয় আল্লাহ্ সেগুলোকে অসার করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সার্থক করেন না।'

فَلَمَّآ أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

৮২. আর অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

নবম রুকূ'

৮৩. কিন্তু ফির'আউন এবং তার পরিষদবর্গ নির্যাতন করবে এ আশংকায় মূসার সম্প্রদায়ের এক ছোট্ট নওজোয়ান দল[১] ছাড়া আর কেউ তার প্রতি ঈমান

فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾

(১) কুরআনের মূল বাক্যে ذُرِّيَّةٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে সন্তান-সন্ততি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এখানে যে মুষ্টিমেয় যুবকদেরকে ঈমান এনেছিল বলে জানানো হলো এরা কারা? তারা কি ফির'আউনের বংশের? নাকি মূসা আলাইহিসসালামের বংশের লোক? আল্লামা ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এ মতের সমর্থনে বিভিন্ন প্রমাণাদি পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লামা ইবনে জরীর আত-তাবারী রাহেমাহুল্লাহ ও আব্দুর রহমান ইবন নাসের আস-সা'দী দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দু'টি মতের স্বপক্ষেই যুক্তি রয়েছে। তবে আয়াত থেকে একটি বিষয় বুঝা যাচ্ছে যে, যারাই তখন ঈমান এনেছিল তারা ছিল অল্প বয়স্ক যুবক। [ইবন কাসীর; সা'দী]

কুরআনের একথা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট করে পেশ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মক্কার জনবসতিতেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সহযোগিতা করার জন্য যারা এগিয়ে এসেছিলেন তারাও জাতির বয়স্ক ও বয়োবৃদ্ধ লোক ছিলেন না বরং তাদের বেশিরভাগই ছিলেন বয়সে নবীন।

আনেনি। আর নিশ্চয় ফির‘আউন ছিল যমীনে পরাক্রমশালী এবং সে নিশ্চয় ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত(১)।

৮৪. আর মূসা বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনে থাক, তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক’(২)।

وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾

৮৫. অতঃপর তারা বলল, ‘আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করবেন না(৩)।’

فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٥﴾

---

(১) আয়াতে مُسْرِفِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, সীমা অতিক্রমকারী। সে সত্যিকার অর্থেই সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। কারণ সে কুফরির সীমা অতিক্রম করেছিল। সে ছিল দাস, অথচ দাবী করল প্রভুত্বের। [কুরতুবী]

(২) মূসা আলাইহিসসালাম তার জাতিকে ঈমানের সাথে সাথে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার আহ্বান জানান। কারণ যারাই আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে আল্লাহ্ তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান [সূরা আয-যুমারঃ ৩৬, সূরা আত-তালাকঃ৩] আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ঈমান ও ইবাদতের সাথে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার জন্য জোর নির্দেশ দিয়েছেন। [যেমন, সূরা হূদঃ১২৩, সূরা আল-মুলকঃ২৯, সূরা আল-মুয্‌যাম্মিলঃ ৯]।

(৩) “আমাদেরকে জালেম লোকদের ফিতনার শিকারে পরিণত করবেন না”। অর্থাৎ তাদেরকে আমাদের উপর বিজয় দিবেন না। কারণ এটা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে আমাদেরকে বিভ্রান্তিতে নিপতিত করবে। [কুরতুবী] অথবা তাদের হাতে আমাদের শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ আমাদের শত্রুদের হাতে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। আর আমাদেরকে এমন কোন শাস্তিও দিবেন না যা দেখে আমাদের শত্রুরা বলে যে, যদি এরা সৎপন্থী হতো তবে আমরা তাদের উপর করায়ত্ব করতে পারতাম না। এতে তারাও বিভ্রান্ত হবে, আমরাও। আবু মিজলায বলেন, এর অর্থ, তাদেরকে আমাদের উপর বিজয় দিবেন না, ফলে তারা মনে করবে যে, তারা আমাদের চেয়ে উত্তম, তারপর তারা আমাদের উপর সীমালঙ্ঘনের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

৮৬. 'আর আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করুন ।'

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝٨٦

৮৭. আর আমরা মূসা ও তার ভাইকে ওহী পাঠালাম যে, 'মিসরে আপনাদের সম্প্রদায়ের জন্য ঘর তৈরী করুন এবং তোমাদের ঘরগুলোকে 'কিবলা(১) তথা ইবাদাতের ঘর বানান, আর সালাত কায়েম করুন এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন(২) ।'

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨٧

(১) এখানে ﴿وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً﴾ -এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে তা নির্ধারনে কয়েকটি মত রয়েছে-
(এক) কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে এর অর্থ তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কেবলামুখী করে তৈরী করে নাও । যাতে করে সেগুলোতে সালাত আদায় করলে ফির'আউনের লোকেরা বুঝতে না পারে । [ইবন কাসীর]
(দুই) কোন কোন মুফাস্‌সির-এর মতে এর অর্থ তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করে নাও । যাতে সেগুলোতে সালাত আদায় করার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে । কারণ পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর সালাত আদায় করার জন্য মসজিদ হওয়া শর্ত ছিল । যেখানে সেখানে সালাত আদায়ের অনুমতি ছিল না । [ইবন কাসীর]
(তিন) কাতাদাহ্‌ রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেনঃ এর অর্থ তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে মসজিদ বানিয়ে নেবে যাতে তার দিক হয় কেবলার দিকে এবং সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করবে । [কুরতুবী] এ আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, সালাত আদায়ের জন্য কেবলামুখী হওয়ার শর্তটি পূর্ববর্তী নবীগণের সময়ও বিদ্যমান ছিল । [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । তখন অর্থ হবে, বর্তমানে ঈমানদারদের ওপর যে হতাশা, ভীতি-বিহ্বলতা ও নিস্তেজ-নিস্পৃহ ভাব ছেয়ে আছে তা দূর করে তাদেরকে আশান্বিত করুন । তাদেরকে উৎসাহিত ও উদ্যমশীল করুন । অপর মুফাসসিরগণের মতে এখানে মূসা আলাইহিস সালামকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । আর এটা বেশী সুস্পষ্ট । অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে সু সংবাদ দিন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের শত্রুদের উপর বিজয় দান করবেন । [কুরতুবী]

৮৮. মূসা বললেন, ‘হে আমাদের রব! আপনি তো ফির‘আউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়ার জীবনে শোভা ও সম্পদ[১] দান করেছেন, হে আমাদের রব! যা দ্বারা তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে ভ্রষ্ট করে[২]। হে আমাদের রব! তাদের সম্পদ বিনষ্ট করুন, আর তাদের হৃদয় কঠিন করে দিন, ফলে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না[৩]।’

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

৮৯. তিনি বললেন, ‘আপনাদের দুজনের দো‘আ কবূল হল, কাজেই আপনারা

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا

(১) অর্থাৎ আড়ম্বর, শান-শওকত ও সাংস্কৃতিক জীবনের এমন চিত্তাকর্ষক চাকচিক্য, যার কারণে দুনিয়ার মানুষ তাদের ও তাদের রীতি-নীতির মোহে মত্ত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের পর্যায়ে পৌঁছার আকাঙ্খা করতে থাকে।

(২) অর্থাৎ উপায়-উপকরণ, যেগুলোর প্রাচুর্যের কারণে নিজেদের কলা-কৌশলসমূহ কার্যকর করা তাদের জন্য সহজসাধ্য ছিল। হে আমাদের রব, আপনিই তাদেরকে এগুলো দিয়েছেন, অথচ আপনি জানতেন যে, আপনি যা নিয়ে তাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন তারা তার উপর ঈমান আনবে না। এটা তো আপনি করেছেন তাদেরকে পরীক্ষামূলক ছাড় দেয়ার জন্য। [ইবন কাসীর]

(৩) এ দো‘আটি মূসা আলাইহিস সালাম এমন সময় করেছিলেন যখন একের পর এক সকল নিদর্শন দেখে নেবার এবং দ্বীনের সাক্ষ্য প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যাবার পরও ফির‘আউন ও তার রাজসভাসদরা সত্যের বিরোধিতার চরম হঠকারিতার সাথে অবিচল ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে পয়গম্বর যে বদদোয়া করেন তা কুফরীর ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে হঠকারিতার ভূমিকা অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহর নিজের ফায়সালারই অনুরূপ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদেরকে আর ঈমান আনার সুযোগ দেয়া হয় না। মূসা আলাইহিসসালামের এ দো‘আটি নূহ আলাইহিসসালামের দো‘আর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেখানে বলা হয়েছেঃ “হে আমার প্রভু! যমীনের বুকে কাফেরদের কোন আস্তানা অবশিষ্ট রাখবেন না; কারণ তাদেরকে যদি আপনি পাকড়াও না করে এমনি ছেড়ে দেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং প্রচণ্ড অপরাধী এবং অতিশয় কাফের ছাড়া আর কিছুর জন্মও তারা দেবে না”। [সূরা নূহঃ ২৭]।

وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

দৃঢ় থাকুন[১] এবং আপনারা কখনো যারা জানে না তাদের পথ অনুসরণ করবেন না ।'

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. আর আমরা বনী ইস্রাঈলকে সাগর পার করালাম[২] । আর ফির'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে এবং সীমালংঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল । পরিশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল তখন বলল, আমি ঈমান আনলাম যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, যার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে । আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত ।

آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. 'এখন! ইতোপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে[৩] ।

---

(১) দো'আর উপর দৃঢ় থাকার অর্থ হচ্ছে, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাড়াতাড়ি না করা । আর তাড়াতাড়ি তখনই করবে না যখন মনে প্রশান্তি আসবে । আর প্রশান্তি তখনই আসবে যখন গায়েবী ব্যাপারে যা প্রকাশ পাবে তাতে উত্তমভাবে সন্তুষ্টি লাভ হবে । [কুরতুবী]

(২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন তিনি দেখলেন ইয়াহূদীরা আশুরার সাওম পালন করছে । তিনি এ ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললঃ এ দিন আল্লাহ্ তা'আলা মূসাকে ফির'আউনের উপর বিজয় দিয়েছিলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা মূসার সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে তাদের থেকেও বেশী হকদার । সুতরাং তোমরা এদিনে সাওম পালন কর' । [বুখারীঃ ৪৬৮০]

(৩) এ আয়াতে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর বিখ্যাত মু'জিযা সাগর পাড়ি দেয়া এবং ফির'আনের ডুবে মরার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- ﴿حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ অর্থাৎ যখন তাকে জলডুবিতে পেয়ে বসল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান এনেছি যে, আল্লাহ্র উপর বনী-ইসরাঈলরা ঈমান এনেছে তাঁকে ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই । আর আমি তাঁরই আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত । স্বয়ং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে তার উত্তর দেয়া হয়েছে- ﴿آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ﴾ অর্থাৎ কি এতক্ষণে ঈমান এনেছ? অথচ ঈমান

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾

৯২. 'সুতরাং আজ আমরা তোমার দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক(১)। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল(২)।'

আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মৃত্যুকালে ঈমান আনা শরী'আত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টির আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসের দ্বারাও হয়, যাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তাওবা ততক্ষণ পর্যন্তই কবুল করে থাকেন, যতক্ষণ না মৃত্যুর ঊর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়'। [তিরমিযীঃ ৩৫৩৭]

মৃত্যুকালীন ঊর্ধ্বশ্বাস বলতে সে সময়কে বুঝানো হয়েছে, যখন জান কবজ করার সময় ফিরিশ্‌তা সামনে এসে উপস্থিত হন। তখন কর্মজগত পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত হয়ে আখেরাতের হুকুম-আহ্‌কাম আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সে সময়কার কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। এমন সময়ে যে লোক ঈমান গ্রহণ করে, তাকেও মুমিন বলা যাবে না এবং কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, ফির'আউনের এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঐকমত্যে ফির'আউনের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে। তাছাড়া কুরআনের প্রকৃষ্ট নির্দেশেও এটাই সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে অন্য কিছু বলা বা বিশ্বাস করা কুরআন হাদীসের পরিপন্থী।

(১) এখানে ফির'আউনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নতার পর আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার পরবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তির নিদর্শন ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে। কাতাদা বলেন, সাগর পাড়ি দেবার পর মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন বনী-ইসরাঈলদেরকে ফির'আউনের নিহত হবার সংবাদ দেন, তখন তারা ফির'আউনের ব্যাপারে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল যে, তা অস্বীকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফির'আউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ঢেউয়ের মাধ্যমে ফির'আউনের মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। [তাবারী] তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এল এবং তার লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে গেল। লাশের কি পরিণতি হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

(২) অর্থাৎ আমি তো শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক নিদর্শনসমূহ দেখিয়েই যেতে থাকবো, যদিও বেশীর ভাগ লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, বড় বড় শিক্ষণীয় নির্দশন দেখেও তাদের চোখ খোলে না। আর জানা কথা যে, ফির'আউন ও তার দলবলের ধ্বংস ও বনী ইসরাঈলের নাজাত ছিল আশুরার দিনে। [ইবন কাসীর]

দশম রুকূ’

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আর অবশ্যই আমরা বনী ইস্‌রাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস করালাম(১) এবং আমরা তাদেরকে উত্তম রিয্‌ক দিলাম, অতঃপর তাদের কাছে জ্ঞান আসলে তারা বিভেদ সৃষ্টি করল(২)। নিশ্চয় তারা যে বিষয়ে

(১) এ আয়াতে ফির‘আউনের করুণ পরিণতির মোকাবেলায় সে জাতির ভবিষ্যৎ দেখানো হয়েছে, যাদেরকে ফির‘আউন হীন ও পদদলিত করে রেখেছিল। বলা হয়েছে, আমি বনী-ইসরাঈলকে উত্তম আবাস দান করেছি। আর এ উত্তম আবাসকে কুরআনুল কারীমে ﴿مُبَوَّأَ صِدْقٍ﴾ শব্দে ব্যক্ত করেছে। এখানে صِدْقٍ অর্থ উপযোগী। [মুয়াসসার] অর্থাৎ এমন আবাসভূমি তাদেরকে দান করা হয়েছে যা তাদের জন্য সর্বদিক দিয়েই কল্যাণকর ও উপযোগী ছিল। অধিকাংশ মুফাসসির ‘উত্তম আবাসভূমি’ বলে সূরা আল-ইসরায় বর্ণিত ﴿الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ বলে যা বুঝানো হয়েছে তা সবই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। [ইবন কাসীর; আদওয়াউল বায়ান] তখন এ স্থানটি অত্যন্ত ব্যাপক এলাকাকে শামিল করবে। অর্থাৎ বায়তুল মাকদিস সংলগ্ন এলাকা, যা বর্তমান ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন ও জর্দানের বেশ কিছু এলাকাকে শামিল করে। এ ছাড়া সাধারণভাবে মিশরও তাদের পদানত হওয়ার কথা। কারণ, ফির‘আউন ধ্বংস হওয়ার পর মিশর রাজত্ব যতটুকু ছিল ততটুকু সবটাই মূসা আলাইহিস সালামের আয়ত্বে চলে আসে। [ইবন কাসীর] কিন্তু ইতিহাসে এটা প্রমাণিত হয়নি যে, তারা আবার মিশরে ফিরে গিয়েছিল।

(২) অর্থাৎ তারা এরপর যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করেছিল তা অজ্ঞতার কারণে নয়। তাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল। যার অর্থ হচ্ছে বিভেদ ও মতপার্থক্য না করা। কারণ, জ্ঞান দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের থেকে সন্দেহ, সংশয় দূর করেছিলেন। কিন্তু তারা মতভেদই করেছিল। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, পরবর্তী পর্যায়ে তারা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে যে দলাদলি শুরু করে এবং নতুন নতুন মাযহাব তথা ধর্মীয় চিন্তাগোষ্ঠির উদ্ভব ঘটায় তার কারণ এ ছিল না যে, তারা প্রকৃত সত্য জানতো না এবং এ না জানার কারণে তারা বাধ্য হয়ে এমনটি করে। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে সত্য দ্বীন, তার মূলনীতি, তার দাবী ও চাহিদা, কুফর ও ইসলামের পার্থক্য সীমা, আনুগত্য ইত্যাদির জ্ঞান দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে গোনাহ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা সম্পর্কেও জ্ঞান দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ সুস্পষ্ট হেদায়াত সত্ত্বেও তারা একটি দ্বীনকে অসংখ্য দ্বীনে পরিণত করে এবং আল্লাহর দেয়া বুনিয়াদগুলো বাদ দিয়ে অন্য বুনিয়াদের ওপর নিজেদের ধর্মীয় ফেরকার প্রাসাদ নির্মাণ করে। তাদের এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের কারণে বায়তুল মুকাদ্দাস

বিভেদ সৃষ্টি করত[1] আপনার রব তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিনে সেটার ফয়সালা করে দেবেন ।

৯৪. অতঃপর আমরা আপনার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে যদি আপনি

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ

ও ফিলিস্তিন এলাকায় অবস্থান কালে বারবার বিভিন্ন বিপর্যয়ে পতিত হয় । মূসা ও হারূন আলাইহিমাসসালামের মৃত্যুর পর ইউসা' বিন নূন তাদেরকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকা জয় করেন । তারপর বুখতনসর তাদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করে । কিন্তু তারা আবার আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসলে আবার তাদের হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস ফিরে আসে । এরপর তারা আবার পথভ্রষ্ট হয়ে পড়লে তারা গ্রীকদের অধীন হয় । ইত্যবসরে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মাঝে ঈসা আলাইহিসসালামকে পাঠালেন । কিন্তু তারা গ্রীক রাজাদেরকে ঈসা আলাইহিসসালামের উপর এই বলে ক্ষেপিয়ে তুলল যে, তিনি প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির পঁয়তারা চালাচ্ছেন । গ্রীকগণ তখন ঈসা আলাইহিসসালামকে ধরার জন্য লোক পাঠাল । কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের একজনকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈসা আলাইহিসসালামের আকৃতি দিয়ে ঈসা আলাইহিসসালামকে আসমানে উঠিয়ে নিলেন । এর ৩০০ বছর পরে গ্রীক সম্রাট কস্টান্টিন নাসারা ধর্মে প্রবেশ করে । সে তখন বিভিন্ন ভিন্নমতাবলম্বী এবং নিজের পক্ষ থেকে জুড়ে দিয়ে নতুন অনেকগুলো আক্বীদা-বিশ্বাস ও শরী'আত প্রবর্তন করল এবং রাষ্ট্রিয় ক্ষমতাবলে সেগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করল । যারা ঈসা আলাইহিসসালাম আনীত দ্বীনের উপর ছিল তাদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করল । তারা বিভিন্নস্থানে পালিয়ে গেল । সে সবস্থানে তার মনমত লোক সেট করল । এবং দেশে দেশে তার মতের লোকদের দ্বারা উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করল । তাদের সে সমস্ত নতুন আকীদার মধ্যে ছিল, ঈসা আলাইহিসসালাম নবী নন । তিনি তিন ইলাহর একজন । তার মধ্যে ঐশ্বরিক এবং মানবিক দু'ধরণের গুণের সমাহার ছিল । তখন থেকে তারা ক্রুশকে পবিত্র চিহ্ন বলে বিবেচনা করল । শুকরের গোস্ত হালাল করল । বিভিন্ন গীর্জায় ঈসা ও মারইয়াম আলাইহিমাসসালামের কল্পিত ছবি স্থাপন করল । এভাবে তারা তাদের দ্বীনকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে ফেলল । পরিণতিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে এ পবিত্র ভূমির উত্তরাধিকার থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে সুস্থ সঠিক আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিমদের প্রতিষ্ঠা করেন । উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সময়ে সাহাবাগণ বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিকারী হন । [ইবন কাসীর, সংক্ষেপিত]

(১) তাদের বিভেদ সৃষ্টি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে, ইয়াহূদীগণ একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে । আর নাসারাগণ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে । আর এ উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে । [সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৬২৪৭, ৬৭৩১]

الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾

সন্দেহে থাকেন তবে আপনার আগের কিতাব যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন; অবশ্যই আপনার রবের কাছ থেকে আপনার কাছে সত্য এসেছে[১]। কাজেই আপনি কখনো সন্দেহপ্রবণদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না,

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. এবং যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে আপনি কখনো তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না- তাহলে আপনিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. নিশ্চয় যাদের বিরুদ্ধে আপনার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না[২]।

(১) বাহ্যত এ সম্বোধনটা করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও সন্দেহে ছিলেন না। কাতাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন যে, 'আমি সন্দেহ করিনা এবং প্রশ্নও করিনা' [ইবন কাসীর, মুরসাল উত্তম সনদে] আসলে যারা তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিল তাদেরকে শুনানোই মূল উদ্দেশ্য। এ সংগে আহলে কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের সাধারণ মানুষ যথার্থই আসমানী কিতাবের জ্ঞানের সাথে মোটেই পরিচিত ছিল না। তাদের জন্য এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন আওয়াজ। কিন্তু আহলে কিতাবের আলেমদের মধ্যে যারা ন্যায়নিষ্ঠ মননশীলতার অধিকারী ছিলেন তারা একথার সত্যতার সাক্ষ্য দিতে পারতেন যে, কুরআন যে জিনিসটির দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে পূর্ববর্তী যুগের সকল নবী তারই দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। তাছাড়া আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ নবীর কথা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যা তাদের কিতাবে লিখা আছে। [ইবন কাসীর] যেমন আল্লাহ্ বলেন, "যারা অনুসরণ করে রাসূলের, উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭]

(২) সে কথাটি হচ্ছে এই যে, যারা নিজেরাই সত্যের অন্বেষী হয় না এবং যারা নিজেদের মনের দুয়ারে জিদ, হঠকারিতা, অন্ধগোষ্ঠি প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ-বিদ্বেষের তালা রাখে আর যারা দুনিয়া প্রেমে বিভোর হয়ে পরিণামের কথা চিন্তাই করে না তারাই ঈমান লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। হ্যাঁ তারা একসময় ঈমান আনবে, আর তা

৯৭. যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে(১)।

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝

৯৮. অতঃপর কোন জনপদবাসী কেন এমন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? তবে ইউনুস(২)এর সম্প্রদায় ছাড়া, তারা যখন ঈমান আনল তখন আমরা তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনের হীনতাজনক শাস্তি দূর করলাম এবং তাদেরকে কিছু কালের জন্য

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۚ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝

হচ্ছে, যখন তারা মর্মন্তুদ শাস্তি দেখতে পাবে। কিন্তু তখনকার ঈমান আর গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এজন্যই মূসা আলাইহিস সালাম যখন ফির'আউন ও তার সভাষদদের উপর বদ-দো'আ করলেন, তখন বলেছিলেন, “হে আমাদের রব! তাদের সম্পদ বিনষ্ট করুন, আর তাদের হৃদয় কঠিন করে দিন, তারা তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না”। [ইবন কাসীর]

(১) শাস্তি দেখার পর তাদের ঈমান আর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। সূরা ইউনুসের ৮৮ নং আয়াতেও এ কথা বলা হয়েছে, মূসা আলাইহিসসালাম ফির'আউন সম্পর্কে বলেছিলেন যে, “ওরা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না” অনুরূপভাবে সূরা আল-আন'আমের ১১১ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ “আমি তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা পাঠালেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে হাযির করলেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছে না হলে তারা কখনো ঈমান আনবে না; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ”। অর্থাৎ ঈমান না আনা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে সুতরাং যত নিদর্শনই তাদের কাছে আসুক না কেন তা কোন কাজে লাগবে না।

(২) ইউনুস আলাইহিস সালামকে আসিরিয়ানদের হেদায়াতের জন্য ইরাকে পাঠানো হয়েছিল। এ কারণে আসিরীয়দেরকে এখানে ইউনুসের কওম বলা হয়েছে। সে সময় এ কওমের কেন্দ্র ছিল ইতিহাস খ্যাত নিনোভা নগরী। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান। দাজলা নদীর পূর্ব তীরে আজকের মুসেল শহরের ঠিক বিপরীত দিকে এ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ জাতির রাজধানী নগরী নিনোভা প্রায় ৬০ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত ছিল। এ থেকে এদের জাতীয় উন্নতির বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে।

জীবনোপভোগ করতে দিলাম[১]।

(১) আয়াতের পরিষ্কার মর্ম এই যে, পৃথিবীর সাধারণ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে আফসোসের প্রকাশ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা কেনই বা এমন হলো না যে, এমন সময়ে ঈমান নিয়ে আসত যে সময় পর্যন্ত ঈমান আনলে তা লাভজনক হতো! অর্থাৎ আযাব কিংবা মৃত্যুতে পতিত হবার আগে যদি ঈমান নিয়ে আসতো, তবে তাদের ঈমান কবূল হয়ে যেত। কিন্তু ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায় তা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ তারা আযাবের লক্ষণাদি দেখে আযাবে পতিত হওয়ার পূর্বেই যখন ঈমান নিয়ে আসে, তখন তাদের ঈমান ও তাওবা কবুল হয়ে যায়। আয়াতের এই প্রকৃষ্ট মর্ম প্রতীয়মান করে যে, এখানে আল্লাহ্‌র চিরাচরিত নিয়মে কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি; বরং একান্তভাবে তাঁর নিয়মানুযায়ীই তাদের ঈমান ও তাওবা কবুল করে নেয়া হয়েছে।

অধিকাংশ মুফাস্‌সির এ আয়াতের এ মর্মই লিখেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ে তাওবা কবুল হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্‌র সাধারণ রীতির আওতায়ই হয়েছে। তাবারী প্রমূখ তাফসীরকারও এ ঘটনাকে ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। সে সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ মনে তাওবা করা ও আল্লাহ্‌র জ্ঞানে তার নিঃস্বার্থ হওয়া প্রভৃতিই আযাব না আসার কারণ। ঘটনা এই যে, ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক তিন দিন পর আযাব আসার দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেন। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে, আযাব আসেনি, তখন ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম-এর মনে এ ভাবনা চেপে বসলো যে, আমি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে গেলে তারা আমাকে মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করবে। অতএব, এ সময় এ দেশ থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু নবী-রাসূলগণের রীতি হলো এই যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন দিকে হিজরত করার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নিজের ইচ্ছামত তারা হিজরত করেন না। ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম- আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমোদন আসার পূর্বেই হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করে বসেন। সূরা আস্-সাফ্‌ফাতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ "স্মরণ করুন, যখন তিনি বোঝাই নৌযানের দিকে পালিয়ে গেলেন" [আস্-সাফ্‌ফাতঃ ১৪০] এতে হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করাকে أَبَقَ শব্দে বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া। অন্য সূরায় এসেছে, "আর স্মরণ করুন, যুন্-নূন-এর কথা, যখন তিনি ক্রোধ ভরে চলে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমরা তাকে পাকড়াও করব না।" [আল-আম্বিয়াঃ ৮৭] এতে স্বভাবজাত ভীতির কারণে সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে হিজরত করাকে ভর্ৎসনার সুরে ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং তার প্রতি ভর্ৎসনা আসার কারণ হলো, অনুমতির পূর্বে হিজরত করা। মোটকথা: পূর্বের কোন নবী-রাসূলের জনপদের সবাই ঈমান আনেনি। এর ব্যতিক্রম ছিল

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۚ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. আর আপনার রব ইচ্ছে করলে যমীনে যারা আছে তারা সবাই ঈমান আনত[১]; তবে কি আপনি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবেন[২]?

ইউনুসের কাওম। তারা ছিল নিনোভার অধিবাসী। তাদের ঈমানের কারণ ছিল, তারা তাদের রাসূলের মুখে যে আযাব আসার কথা শুনেছিল সেটার বিভিন্ন উপসর্গ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আর তারা দেখল যে, তাদের রাসূলও তাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছেন। তখন তারা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইল, তাঁর কাছে উদ্ধার কামনা করল, কান্নাকাটি করল এবং বিনয়ী হল। আর তারা তাদের শিশু-সন্তান, জন্তু-জানোয়ারদের পর্যন্ত উপস্থিত করেছিল এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। আর তখনই আল্লাহ্ তাদের উপর রহমত করেন এবং তাদের আযাব উঠিয়ে নেন, তাদেরকে কিছু দিনের জন্য দুনিয়াকে উপভোগ করার সুযোগ প্রদান করেন [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ যদি চাইতেন যে, এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র তাঁর আদেশ পালনকারী অনুগতরাই বাস করবে এবং কুফরী ও নাফরমানীর কোন অস্তিত্বই থাকবে না তাহলে তাঁর জন্য সারা দুনিয়াবাসীকে মুমিন ও অনুগত বানানো কঠিন ছিল না এবং নিজের একটি মাত্র সৃজনী ইংগিতের মাধ্যমে তাদের অন্তর ঈমান ও আনুগত্যে ভরে তোলাও তাঁর পক্ষে সহজ ছিল। কিন্তু মানব জাতিকে সৃষ্টি করার পেছনে তাঁর যে প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্য কাজ করছে এ প্রাকৃতিক বল প্রয়োগ তা বিনষ্ট করে দিতো। তাই আল্লাহ নিজেই ঈমান আনা বা না আনা এবং আনুগত্য করা বা না করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীন রাখতে চান। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন, সূরা হূদঃ ১১৮, ১১৯, সূরা আর-রা'দঃ৩১]

(২) ইবন আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত মানুষই ঈমান আনুক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, যাদের ঈমানের কথা পূর্বেই প্রথম যিকর তথা মানুষের তাকদীরে লিখা হয়েছে কেবল তারাই ঈমান আনবে, আর যাদের দূর্ভাগ্যের কথা প্রথম যিকর তথা প্রথম তাকদীর নির্ধারণে লিখা হয়েছে কেবল তারাই দূর্ভাগা হবে। [তাবারী; কুরতুবী] এর অর্থ প্রমাণের সাহায্যে হেদায়াত ও গোমরাহীর পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরার এবং সঠিক পথ পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেবার যে দায়িত্ব ছিল তা আমার নবী পুরোপুরি পালন করেছেন। এখন যদি তোমরা নিজেরাই সঠিক পথে চলতে না চাও এবং তোমাদের সঠিক পথে যদি এর ওপর নির্ভরশীল হয় যে, কেউ তোমাদের ধরে বেঁধে সঠিক পথে চালাবে, তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত, নবীকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি। যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করবেন না তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই। এমন কেউ

১০০. আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া ঈমান আনা কারো সাধ্য নয় এবং যারা বোঝে না আল্লাহ্ তাদেরকেই কলুষলিপ্ত করেন ।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. বলুন, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর ।' আর যারা ঈমান আনে না, নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন এমন সম্প্রদায়ের কোন কাজে আসে না[১] ।

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

নেই যে, তার মনের উপর জোর করে ঈমানের জন্য সেটাকে প্রশস্ত করে দেবে । তবে যদি আল্লাহ্ সেটা চান তবে ভিন্ন কথা । [আদওয়াউল বায়ান] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ সেটা বর্ণনা করেছেন যে, "আর আল্লাহ্ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আপনার কিছুই করার নেই ।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৪১] আরও বলেন, "আপনি যাকে ভালবাসেন ইচ্ছে করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না । তবে আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছে সৎপথে আনয়ন করেন এবং সৎপথ অনুসারীদের সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন ।" [সূরা আল-কাসাস: ৫৬] অনুরূপ আরও অন্যান্য আয়াতেও এসেছে, যেমন, সূরা আন-নিসা: ৮৮, ১৪৩; সূরা আর-আ'রাফ: ১৭৮; সূরা আর-রা'দ: ৩৩; সূরা আল-ইসরা: ৯৭; সূরা আল-কাহাফ: ১৭; সূরা আয-যুমার: ২৩; ৩৬; সূরা গাফির: ৩৩; সূরা আশ-শূরা: ৪৪; ৪৬ ।

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত বান্দাদেরকে এ নির্দেশই দিচ্ছেন যে, তারা যেন আসমান ও যমীনের বৃহৎ সৃষ্টিগুলোর দিকে তাকায় যেগুলো তাঁর মহত্বতা, পূর্ণতা, ও তিনিই যে একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ তার উপর প্রমাণবহ । অনুরূপ নির্দেশ তিনি অন্য আয়াতেও দিয়েছেন । যেমন, "অচিরেই আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাব, বিশ্ব জগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য । এটা কি আপনার রবের সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব কিছুর উপর সাক্ষী?" [সূরা ফুসসিলাত: ৫৩] । [আদওয়াউল বায়ান] বস্তুত: ঈমান আনার জন্য তারা যে দাবীটিকে শর্ত হিসেবে পেশ করতো এটি হচ্ছে তার শেষ ও চূড়ান্ত জবাব । তাদের এ দাবীটি ছিল, আমাদের এমন কোন নির্দশন দেখান যার ফলে আপনার নবুওয়াতকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারি । এর জবাবে বলা হচ্ছে, যদি তোমাদের মধ্যে সত্যের আকাংখা এবং সত্য গ্রহণ করার আগ্রহ থাকে তাহলে যমীন ও আসমানের চারদিকে যে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এগুলো মুহাম্মদের বাণীর সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের নিশ্চিন্ত করার জন্য শুধু যথেষ্ট নয় বরং তার চাইতেও

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. তবে কি তারা কেবল তাদের আগে যা ঘটেছে সেটার অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে? বলুন, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি[১] ।'

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. তারপর আমরা আমাদের রাসূলদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে উদ্ধার করি। এভাবে মুমিনদেরকে উদ্ধার করা আমাদের দায়িত্ব [২] ।

একাদশ রুকূ'

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. বলুন, 'হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বীনের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের 'ইবাদাত কর আমি তাদের 'ইবাদাত করি না। বরং আমি 'ইবাদাত করি আল্লাহ্‌র যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান

বেশী। শুধুমাত্র চোখ খুলে সেগুলো দেখার প্রয়োজন। কিন্তু যদি এ চাহিদা ও আগ্রহই তোমাদের মধ্যে না থাকে, তাহলে অন্য কোন নির্দশন, তা যতই অলৌকিক, অটল ও চিরন্তন রীতি ভংগকারী এবং বিস্ময়কর ও অত্যাশ্চর্য হোক না কেন, তোমাদেরকে ঈমানের নিয়ামত দান করতে পারে না।

(১) অর্থাৎ তারা তো কেবল তাদের পূর্বে যারা চলে গেছে, নূহ, হূদ ও সামূদের কাওমের উপর দিয়ে যে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল সেটার মত ঘটনারই অপেক্ষা করছে। [তাবারী] পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে যারা নবী-রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করেছিল, তাদের উপর যেমন শাস্তি এসেছিল এরাও কি তদ্রূপ শাস্তিরই অপেক্ষা করছে? [ইবন কাসীর]

(২) এ দায়িত্ব আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর নিজের উপর নিয়ে নিয়েছেন। কেউ তাঁকে বাধ্য করার নেই। তিনি নিজ করুণাবশতঃ মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "তোমাদের প্রভূ তার নিজের উপর রহমতকে লিখে নিয়েছেন" [সূরা আল-আন'আমঃ৫৪] অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তাঁর কাছে আরশের উপর একটি কিতাবে লিখে রেখেছেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে'। [বুখারীঃ ৩১৯৪, মুসলিমঃ ২৭৫১]

এবং আমি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি,

১০৫. আর এটাও যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন[১] এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না[২],

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. 'আর আপনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেন না, যা আপনার উপকারও করে না, অপকারও করে না, কারণ এটা করলে তখন আপনি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন ।'

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. 'আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে কোন ক্ষতির স্পর্শ করান, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই । আর যদি আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল চান, তবে

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۚ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾

(১) অর্থাৎ "নিজের চেহারাকে স্থির করে নিন ।" এর অর্থ, আপনি এদিক ওদিক, সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে মুড়ে যাবেন না । একেবারে বরাবর সোজা পথে দৃষ্টি রেখে চলুন, যেপথ আপনাকে দেখানো হয়েছে । তারপর বলা হয়েছে حنيفاً অর্থাৎ সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র একদিকে মুখ করে থাকুন । কাজেই দাবী হচ্ছে, এ দ্বীন, আল্লাহর বন্দেগীর এ পদ্ধতি এবং জীবন যাপন প্রণালীর ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত-বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য করতে ও হুকুম মেনে চলতে হবে । এমন একনিষ্ঠভাবে করতে হবে যে, অন্য কোন পদ্ধতির দিকে সামান্যতম ঝুঁকে পড়াও যাবে না । অন্য আয়াতেও সে নির্দেশ এসেছে, যেমন, "কাজেই আপনি একনিষ্ঠ হয়ে নিজ চেহারাকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন । আল্লাহ্র ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি বা দ্বীন ইসলাম), এর উপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন ; আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই । এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না ।" [সূরা আর-রূম: ৩০]

(২) অর্থাৎ যারা আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে কোনভাবে অন্য কাউকে শরীক করে কখনো তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি তোমাদের উপর দাজ্জালের চেয়েও যা বেশী ভয় করছি তা কি বলে দিবনা? আমরা বললামঃ হ্যাঁ, তিনি বললেনঃ 'শির্কে খফী' । আর তা হলোঃ কোন মানুষ অপরের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোন নেক আমল করা । [মুসনাদে আহমাদ ৩/৩০]

তাঁর অনুগ্রহ প্রতিহত করার কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার কাছে সেটা পৌঁছান। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু[১]।'

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾

১০৮. বলুন, 'হে লোকসকল! অবশ্যই তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসেছে। কাজেই যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমাদের উপর কর্মবিধায়ক নই[২]।'

وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. আর আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে আপনি তার অনুসরণ করুন এবং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন, আর তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাপ্রদানকারী[৩]।

(১) অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা বলেছেন। যেমন, "আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর যদি তিনি আপনাকে কোন কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান" [সূরা আল-আন'আম: ১৭]

(২) অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা বলেছেন। যেমন, "যে সৎপথ অবলম্বন করবে সে তো নিজেরই মংগলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করে এবং যে পথভ্রষ্ট হবে সে তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য।" [সূরা আল-ইসরা: ১৫]

(৩) আল্লামা শানকীতী বলেন, এখানে নবী ও তার শত্রুদের মাঝে কি ফয়সালা করেছেন সেটা বর্ণনা করেন নি। অন্য আয়াতে অবশ্য তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি কাফেরদের উপর নবী ও তার অনুসারীদেরকে বিজয় দিয়েছেন। তাঁর দ্বীনকে অপরাপর সমস্ত দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা

ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী” [সূরা আন-নাসর] আরও বলেন, “নিশ্চয় আমরা আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয় যেন আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন , এবং আল্লাহ্ আপনাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।” [সূরা আল-ফাতহ: ১-৪] আরও বলেন, “তারা কি দেখে না যে, আমরা এ যমীনকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি ? আর আল্লাহ্ই আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই এবং তিনি হিসেব গ্রহণে তৎপর।” [সূরা আর-রা'দ: ৪১] অনুরূপ “তারা কি দেখছে না যে, আমরা যমীনকে চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি।” [সূরা আল-আম্বিয়া: ৪৪] [আদওয়াউল বায়ান]

১১- সূরা হূদ

سُوْرَةُ هُوْدٍ

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ১২৩ ।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরা হূদ মক্কায় নাযিল হয়েছে। [ইবন কাসীর]

নামকরণঃ এ সূরার নাম সূরা হূদ। একজন প্রখ্যাত রাসূলের নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। তার বাহ্যিক কারণ হচ্ছে, এ সূরার ৫৩ নং আয়াতে এর উল্লেখ আছে। যেখানে হূদ আলাইহিস সালাম ও তার কাওমের মধ্যকার কথোপকথন আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ এ সূরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সুরা হুদ ঐসব সুরার অন্যতম যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমুহের উপর আপতিত আল্লাহর গযব ও বিভিন্ন কঠিন আযাবের এবং পরে কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বললেনঃ হ্যাঁ, সুরা হুদ এবং ওয়াকি'আ, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলুন, ইযাস-শামছু কুওওয়িরাত আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। [তিরমিযীঃ৩২৯৭] উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সুরাগুলিতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম এর পবিত্র চেহারায় বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দেয়। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ সূরার একটি আয়াতে এসেছে, ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ﴾ "যেভাবে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে দৃঢ়পদ থাকুন" [১১২] এ নির্দেশই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। [কুরতুবী]

।। রহমান, রহীম আল-াহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-রা, এ কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট(১), সুবিন্যস্ত ও

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝١

(১) অর্থাৎ এ কিতাবে যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলো পাকা ও অকাট্য কথা এবং সেগুলোর কোন নড়চড় নেই। ভালোভাবে যাচাই পর্যালোচনা করে সে কথাগুলো বলা হয়েছে। সুতরাং কুরআন পাকের আয়াতসমূহ সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, অপরিবর্তিত। বাতিল এর কাছে প্রবেশের কোন সুযোগ পায় না [তাবারী] তাওরাত, ইঞ্জীল, ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাবসমুহ পবিত্র কুরআন নাযিলের ফলে যেভাবে মনসূখ বা রহিত হয়েছে কুরআন পাক নাযিল হওয়ার পর যেহেতু নবীর আগমন এবং ওহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব আর রহিত

পরে বিশদভাবে বিবৃত[১] প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্তার কাছ থেকে[২];

২. যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ‘ইবাদাত করো না[৩], নিশ্চয় আমি

أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝٢

হবে না। [কুরতুবী] এর আয়াতসমূহ শব্দের দিক থেকে মুহকাম বা সুপ্রতিষ্ঠিত ও অপরিবর্তিত। হাসান ও আবুল আলীয়া বলেন, নির্দেশ ও নিষেধ দ্বারা এটাকে মজবুত করা হয়েছে। [তাবারী; কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ এ আয়াতগুলো বিস্তারিতও। এর মধ্যে প্রত্যেকটি কথা খুলে খুলে ও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বক্তব্য জটিল, বক্র ও অস্পষ্ট নয়। প্রত্যেকটি কথা আলাদা আলাদা করে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। এর অর্থ, ওয়াদা, ধমক, সাওয়াব ও শাস্তির বিষয়াদি এতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। [তাবারী; কুরতুবী] কাতাদা বলেন, আল্লাহ্ এটাকে বাতিলের জন্য অপ্রতিরোধ্য করেছেন, তারপর হালাল ও হারাম সংক্রান্ত বিষয়াদি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, সামগ্রিকভাবে এটাকে মজবুত করেছেন। তারপর তাওহীদ, নবুওয়াত ও আখেরাতের পুনরুত্থানের বর্ণনা এক একটি আয়াত করে প্রদান করা হয়েছে। [কুরতুবী] সুতরাং এতে আকায়েদ, ইবাদত, লেন-দেন আচার ব্যবহার ও নীতি নৈতিকতার বিষয়বস্তুগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে তো পূর্ণ কুরআন মজীদ একসাথে লাওহে মাহফুজে উৎকীর্ণ করা হয়েছে, কিন্তু তারপর স্থান কাল পাত্র পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে, যাতে এর স্মরণ রাখা, মর্ম অনুধাবণ ক্রমানুসারে তদনুযায়ী আমল করা সহজ হয়। [কুরতুবী] অথবা এক এক আয়াত করে পর্যায়ক্রমে নাযিল করা হয়েছে যাতে এর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করা যায়। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ এসব আয়াত এমন এক মহান সত্তার পক্ষ হতে আগত হয়েছে, যিনি তাঁর বাণীসমূহ ও বিধানসমূহে মহা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে কুরআনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ তাওহীদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবে না। অর্থাৎ এ কুরআন মজবুত ও বিস্তারিতভাবে এজন্যই নাযিল করা হয়েছে যাতে তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ইবাদত না কর। [ইবন কাসীর] আয়াতের এটাও অর্থ হতে পারে যে, কুরআনকে এভাবে নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও ইবাদত করবে না। [কুরতুবী] মোটকথা: আয়াতে কুরআনের বিষয়বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না, যাকে

তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা(১)।

৩. আরো যে, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁর দিকে ফিরে আস(২), তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের এক উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন(৩) এবং তিনি প্রত্যেক গুণীজনকে

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ﴿۳﴾

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বলা হয়। এটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বলা হয়েছে। মূলতঃ এটাই সমস্ত নবী-রাসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য। এ কথা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। [যেমন, সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২৫, সূরা আন-নাহলঃ৩৬]

(১) এখানে কুরআনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে, আর তা হচ্ছেঃ রিসালাত। ইরশাদ হচ্ছে, "নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা"। এ আয়াতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি সারা বিশ্ববাসীকে যেন জানিয়ে দেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ প্রদানকারী। যে আমার অনুসরণ করবে সে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে যাবে, আর যে আমার বিরোধিতা করবে সে কঠোর শাস্তিতে নিপতিত হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কুরাইশদের সমস্ত শাখা গোত্রকে ডেকে বললেনঃ "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি যদি তোমাদেরকে এ সংবাদ দেই যে, এক আক্রমণকারী সেনাদল তোমাদেরকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে তাহলে কি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারবে?" তারা বললঃ আমরা তো আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি। তখন তিনি বললেনঃ "তাহলে আমি তোমাদের জন্য এক কঠোর শাস্তির ভীতিপ্রদর্শনকারী"। [বুখারীঃ১৩৯৪, মুসলিমঃ ২০৮]

(২) অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে পূর্ববর্তী যাবতীয় গুণাহ হতে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে আসার আহ্বান জানাই। এবং ভবিষ্যতে একমাত্র আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে থাকার প্রচেষ্টা চালাতে বলি। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করো, কারণ আমি দিনে একশত বার তাঁর কাছে তাওবা করি। [মুসলিম: ২৭০২]

(৩) অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমাদের অবস্থান করার জন্য যে সময় নির্ধারিত রয়েছে সেই সময় পর্যন্ত তিনি তোমাদের খারাপভাবে নয় বরং ভালোভাবেই রাখবেন। তাঁর নিয়ামতসমূহ তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে। তাঁর বরকত ও প্রাচূর্য লাভে তোমরা ধন্য হবে। তোমরা সচ্ছল ও সুখী-সমৃদ্ধ থাকবে। তোমাদের জীবন শান্তিময় ও নিরাপদ হবে। তোমরা

তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবেন(১)। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর মহাদিনের শাস্তির আশংকা করি ।

লাঞ্ছনা, হীনতা ও দীনতার সাথে নয় বরং সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করবে। এ বক্তব্যটিই সূরা নাহ্‌লের ৯৭নং আয়াতে এভাবে বলা হয়েছেঃ “যে ব্যক্তিই ঈমান সহকারে সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো।” অনুরূপভাবে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাই খরচ করবে তাতেই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এর জন্য সওয়াব পাবে। এমনকি যা তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তাতেও”। [বুখারীঃ ৫৬, মুসলিমঃ ১৬২৮] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ ‘যদি কেউ গুণাহর কাজ করে তখন তার জন্য একটি গুণাহ লিখা হয়। পক্ষান্তরে যদি সওয়াবের কাজ করে তবে তার জন্য দশটি সওয়াব লিখা হয়। তারপর যদি দুনিয়াতে তার গুণাহের শাস্তি পেয়ে যায় তবে তার জন্য আখেরাতে দশটি সওয়াবই বাকী থাকে, কিন্তু যদি দুনিয়াতে শাস্তি না পায় তবে আখেরাতে একটি গুণাহের বিনিময়ে একটি সওয়াব চলে গেলেও তার আরও নয়টি সওয়াব অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং যার একক দশকের উপর প্রাধান্য পায় তার তো ধ্বংসই অনিবার্য।’ [তাবারী] এরপর আয়াতে বলা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ্ ‘উত্তম জীবন সামগ্রী’ প্রদান করবেন। এ হচ্ছে ইস্তেগফার ও তাওবার ফল। [কুরতুবী] আল্লামা শানকীতী বলেন, আয়াতে ‘উত্তম জীবন সামগ্রী’ বলে প্রশস্ত রিযক, জীবিকার উন্নত অবস্থা, দুনিয়াতে সার্বিক নিরাপত্তা বোঝানো হয়েছে। আর ‘নির্দিষ্ট সময়’ বলে মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে। অন্য আয়াতেও সেটা বলা হয়েছে, যেমন হূদ আলাইহিস সালাম তার কাওমকে বলেছিলেন, “হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁর দিকেই ফিরে আস। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন। আর তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না” [সূরা হূদঃ ৫২] অনুরূপ নূহ আলাইহিস সালামের সাথে তার কাওমের কথোপকথন সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, “অতঃপর বলেছি, ‘তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল, ‘তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, ‘এবং তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা” [সূরা নূহঃ ১০-১২] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করো, কারণ আমি দিনে একশত বার তাঁর কাছে তাওবা করি। [মুসলিমঃ ২৭০২]

(১) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, তার যে সমস্ত কাজ সে সওয়াবের আশায় করেছে। চাই তা সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে হোক অথবা হাত বা পা দ্বারা কোন ভাল আমল করেছে, অথবা কোন ভাল কথা বলেছে, অথবা তার যে সমস্ত ভাল কাজ অতিরিক্ত করেছে সে সবই তাকে প্রদান করা হবে। [তাবারী] কাতাদা বলেন, তা আখেরাতে প্রদান করা হবে। [তাবারী]

৪. আল্লাহ্‌রই কাছে তোমাদের ফিরে যাওয়া এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৫. জেনে রাখ! নিশ্চয় তারা তাঁর কাছে গোপন রাখার জন্য তাদের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে। জেনে রাখ! তারা যখন নিজেদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন[১]। অন্তরে

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

(১) আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফেরগণ সন্দেহ সংশয় করে মুখ লুকিয়ে থাকে আর মনে করে যে, এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে আড়াল করতে পারবে। তারা মূলতঃ আল্লাহ্ থেকে কখনো আড়াল করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা থেকে কোন কিছুই আড়াল নেই। তাই যত চেষ্টাই করুক না কেন তারা নিজেদের আড়াল করতে পারবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "আমরাই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি।" [সূরা ক্বাফঃ ১৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ "আর জেনে রাখ যে, তোমাদের অন্তরে যা গোপন আছে আল্লাহ্ তা জানেন সুতরাং তোমরা তাকে ভয় কর"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৩৫] অন্য আয়াতে বলেনঃ "তারপর আমরা অবশ্যই জ্ঞানসহ তাদের কাছে তা ব্যক্ত করব, আর আমরা তো অনুপস্থিত ছিলাম না।" [সূরা আল-আ'রাফঃ৭] আরও বলেনঃ "আপনি যে কোন অবস্থায় থাকেন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে কোনো কাজ কর, আমি তোমাদের পরিদর্শক---যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও আপনার প্রতিপালকের দৃষ্টির বাইরে নয় এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই"। [সূরা ইউনুসঃ ৬১]

তবে তারা যে শুধু হক শোনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত তা'ই নয়। বরং তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র যে বাণী শোনাত তা'ও না শোনার ভান করত। আর মনে করত যে, এভাবে তারা আল্লাহ্ থেকে গোপন করছে। কারণ, মক্কায় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হলো তখন সেখানে এমন বহু লোক যারা বিরোধিতায় প্রকাশ্যে তেমন একটা তৎপর ছিল না কিন্তু মনে মনে তার দাওয়াতের প্রতি ছিল চরমভাবে ক্ষুব্ধ ও বিরূপভাবাপন্ন। তারা তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলতো। তাঁর কোন কথা শুনতে চাইতো না। কোথাও তাঁকে বসে থাকতে দেখলে পেছন ফিরে চলে যেতো। দূর থেকে তাঁকে আসতে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতো অথবা কাপড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলতো, যাতে তাঁর মুখোমুখি হতে না হয় এবং তিনি তাদেরকে সম্বোধন

যা আছে, নিশ্চয় তিনি তা সবিশেষ অবগত ।

৬. আর যমীনে বিচরণকারী সবার জীবিকার(১) দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই(২) এবং

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

করে কথা বলতে শুরু করে না দেন । এখানে এ ধরনের লোকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে । [তাবারী; বাগভী; সা'দী; ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অপর অনুবাদ হচ্ছে, তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বা রাসূলের কাছ থেকে নিজেদের লুকানোর জন্য মাথা নীচু করে সামনের দিকে ঝুঁকে কাপড় দিয়ে ঢেকে চলে যেত । অথচ যত কাপড় দিয়েই তারা নিজদেরকে ঢাকুক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা ঠিকই তাদের দেখছেন । [ইবন কাসীর] তাই আয়াতে বলা হয়েছে, এরা সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পায় এবং উটপাখির মত বালির মধ্যে মুখ গুঁজে রেখে মনে করে, যে সত্যকে দেখে তারা মুখ লুকিয়েছে তা অন্তর্হিত হয়ে গেছে । অথচ সত্য নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং এ তামাশাও দেখছে যে, এ নির্বোধরা তার থেকে বাঁচার জন্য মুখ লুকাচ্ছে । অথবা আয়াতের অর্থ, তারা তাদের কুফরী তাদের অন্তরে গোপন করে রাখে আর মনে করে যে, আল্লাহ্ থেকে গোপন করছে । অথচ তারা যত কাপড় দিয়েই নিজেদেরকে আড়াল করুক না কেন আল্লাহ্ তো তাদের অবস্থা জানেন । [মুয়াসসার]

আবার তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোকও ছিল যারা তাদের প্রাত্যহিক গোপনীয় কাজসমূহ যেমন স্ত্রী-সহবাস, পায়খানা ব্যবহার করার সময়ও নিজেদের কাপড় খুলতে লজ্জাবোধ করত এবং তা আকাশের দিকে হয়ে যাওয়ার ভয় করত । কিন্তু অন্যান্য সময় আল্লাহ্‌র কোন খেয়াল রাখত না । তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ অদ্ভুত কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে এ আয়াত নাযিল করেন । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'তারা (কাফেরগণ) স্ত্রী-সহবাসের সময় বা পায়খানা ব্যবহার করার সময় আকাশের দিকে মুখ করতে লজ্জাবোধ করত এবং কাপড় দিয়ে নিজেদের মাথা ঢেকে রাখত । তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন' । [বুখারীঃ ৪৬৮১, ৪৬৮২, ৪৬৮৩]

(১) রিযিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যা কোন প্রাণী আহার্যরূপে গ্রহণ করে, যার দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন রক্ষা করে থাকে । রিযিকের জন্য মালিকানা স্বত্ব শর্ত নয় । সকল জীব জন্তু রিযিক ভোগ করে থাকে কিন্তু তারা তার মালিক হয় না । কারণ, মালিক হওয়ার যোগ্যতাই ওদের নেই । অনুরূপভাবে ছোট শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু ওদের রিযিক অব্যাহতভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে । [কুরতুবী]

(২) এমন সব প্রাণীকে دابة বলে যা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে । [কুরতুবী] পক্ষীকুলও এর অন্তর্ভুক্ত । কারণ, খাদ্য গ্রহনের জন্য তারা ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে এবং তাদের

رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٦

তিনি সেসবের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি(১) সম্বন্ধে অবহিত; সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে আছে(২) ।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ

৭. আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর 'আর্‌শ

বাসস্থান ভু-পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহ ও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল। কেননা, সাগর-মহাসাগরের তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। মোটকথা, সমুদয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহন করছেন। এবং একথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যদ্বারা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা যায়। ইরশাদ হয়েছে, "তাদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত"। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার উপর এহেন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার মত কোন ব্যক্তি বা শক্তি নেই, বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে গ্রহন করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আর এক পরম সত্য, দাতা ও সর্বশক্তিমান সত্তার ওয়াদা যাতে নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই। সুতরাং নিশ্চয়তা বিধান করণার্থে এখানে على শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা ফরয বা অবশ্যকরণীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অথচ আল্লাহর উপর কোন কাজ ফরয বা ওয়াজিব হতে পারে না, তিনি কারো হুকুমের তোয়াক্কা করেন না। বরং এটি সম্পূর্ণ তার অনুগ্রহ। [কুরতুবী] কোন কোন মুফাসসির অবশ্য বলেছেন যে, এখানে على বা উপরে বলে من বা হতে বলা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সবার রিযক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। [কুরতুবী]

(১) আয়াতে উল্লেখিত مستقر এবং مستودع এর অর্থ, مستقر শব্দটির কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে, ১. যমীনের বুকে অবস্থান স্থল। বা পিতার পিঠে অবস্থানকে। ২. দিন বা রাতে আশ্রয় নেয়ার স্থান। আর مستودع শব্দটিরও কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, ১. মায়ের রেহেমে অবস্থান বা ডিমের মধ্যে অবস্থানকে। ২. মৃত্যু হওয়ার স্থানকে। [দেখুন, তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; সা'দী] এ ব্যাপারে এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যখন কারো মৃত্যু কোন যমীনে লিখা থাকে তখন সে সেখানে যাওয়ার জন্য কোন না কোন প্রয়োজন অনুভব করবে। তারপর সে যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তাকে মৃত্যু দেয়া হয়। আর কিয়ামতের দিন যমীন তাকে বের করে দিয়ে বলবে, هٰذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِيْ অর্থাৎ এটা আমার কাছে আপনি আমানত রেখেছিলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ১/৪২, সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকীঃ ৯৮৮৯] কালেমাদ্বয়ের আরো বিস্তারিত তাফসীর সূরা আল-আন'আমের ৯৮ নং আয়াতে করা হয়েছে।

(২) আয়াতে বর্ণিত সুস্পষ্ট কিতাব বলতে লাওহে মাহফুজকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সমস্ত কর্মকাণ্ড সুস্পষ্ট কিতাবে লিখে নিয়েছেন এবং তার জ্ঞান থেকে এর সামান্যও গোপন থাকে না, এটা তিনি পবিত্র কুরআনে বারবার ঘোষণা করেছেন। [দেখুন, সূরা আল-আন'আমঃ৩৮, ৫৯, সূরা ইউনুসঃ ৬১]

ছিল পানির উপর[১], তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ঠ[২] তা পরীক্ষা করার

أَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্‌র ডান হাত পরিপূর্ণ, দিন-রাত খরচ করলেও তা কমে না। তোমরা কি দেখ না যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সময় থেকে আজ পর্যন্ত তিনি কত বিপুল পরিমাণে খরচ করেছেন? তবুও তার ডান হাতের কিছুই কমেনি। আর তাঁর আরশ পানির উপর অবস্থিত ছিল। তাঁর অন্য হাতের রয়েছে ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা, সে অনুসারে বৃদ্ধি-ঘাটতি বা উন্নতি অবনতি ঘটান। [বুখারীঃ ৭৪১৯] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "শুধু আল্লাহ্ই ছিলেন, তাঁর পূর্বে কেউ ছিল না। আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর এবং তিনি যিক্‌র বা ভাগ্যফলে সবকিছু লিখে নেন এবং আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেন। [বুখারীঃ ৩১৯১] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্টি জগতের তাকদীর লিখে রেখেছেন। আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর"। [মুসলিমঃ ২৬৫৩]

মোট কথা, কুরআনের ২১টি আয়াতে আরশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশের বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। সে সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মূলতঃ আরশ হলো আল্লাহ্‌র প্রথম সৃষ্টি। সেটা প্রকাণ্ড ও সর্ববৃহৎ সৃষ্টি। আরশের সামনে কুরসী একটি রিং এর মতো, যেমনিভাবে আসমান ও যমীন কুরসীর সামনে রিং এর মতো। আরশের গঠন গম্বুজের মত। যা সমস্ত সৃষ্টি জগতের উপরে রয়েছে। এমনকি জান্নাতুল ফেরদাউসও আরশের নীচে অবস্থিত। আরশের কয়েকটি পা রয়েছে। মূসা আলাইহিসসালাম হাশরের মাঠে তার একটি ধরে থাকবেন। এ আরশের বহনকারী কিছু ফিরিশ্‌তা রয়েছেন। তাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ঘোষণা দিচ্ছেন যে, কিয়ামতের দিন তারা হবেন আট। [সূরা আল-হাক্কাহঃ ১৭] তবে এ ব্যাপারে ভিন্ন মত রয়েছে যে, আরশের বহনকারী ফিরিশ্‌তাগণ কি আট জন নাকি আট শ্রেণী নাকি আট কাতার। এ আয়াতে বর্ণিত পানির উপর আরশ থাকার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার আরশ কোন কিছু সৃষ্টি করার আগে পানির উপর ছিল। এর দ্বারা পানি আগে সৃষ্টি করা বুঝায় না। তবে এখানে পানি দ্বারা দুনিয়ার কোন সমুদ্রের পানি বুঝানো হয়নি। কেননা, তা আরো অনেক পরে সৃষ্ট। বরং এখানে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সুনির্দিষ্ট কোন পানি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ইবনে কাসীর প্রণীত আল- বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১ম খণ্ড]।

(২) লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ "কে কাজে শ্রেষ্ঠ" তা তিনি পরীক্ষা করবেন। তিনি 'কে বেশী কাজ করেছে পরীক্ষা করবেন' তা কিন্তু বলেননি। কেননা,

জন্য[১]। আর আপনি যদি বলেন, | أَحْسَنُ عَمَلًاۗ وَلَىِٕنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ

আল্লাহ্‌র দরবারে পরিমানের চেয়ে মান-সম্মত হওয়াই গ্রহণযোগ্য। আর আল্লাহ্‌র দরবারে কোন কাজ মান-সম্মত সে সময়ই হতে পারে যখন তা আল্লাহর নির্দেশ মত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পন্থায় হবে। নতুবা তা গ্রহণযোগ্যতাই হারাবে।

(১) এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী এজন্য সৃষ্টি করেছেন যা মূলত তোমাদের (অর্থাৎ মানুষ) সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে পরীক্ষা করা। তিনি সেটাকে অকারণে বা অনাহূত তৈরী করেন নি। তিনি নিজেকে এ ধরনের অনাহূত ও বেহুদা সৃষ্টি করা থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া এটাও বলেছেন যে, কাফেররাই শুধু আসমান ও যমীনকে বেহুদা সৃষ্টি করেছেন বলে মনে করে থাকে। তাদের এ ধারণার জন্য তিনি তাদের উপর কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, "আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা তাদের যারা কাফির, কাজেই কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। [সূরা সোয়াদঃ ২৭] আরো বলেনঃ "তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; সম্মানিত 'আর্‌শের তিনি অধিপতি।' [সূরা আল-মুমিনূনঃ ১১৫-১১৬] তিনি আরো বলেনঃ "আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা একমাত্র আমারই 'ইবাদাত করবে। [সূরা আয-যারিয়াতঃ৫৬] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মহান আল্লাহ্ বলেন, তুমি ব্যয় কর, তোমার উপর ব্যয় করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, আল্লাহ্‌র হাত পরিপূর্ণ। কোন প্রকার ব্যয় তাতে কোন কিছুর ঘাটতি করে না। দিন-রাত তা প্রচুর পরিমানে দান করে। তোমরা আমাকে জানাও, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিলগ্ন থেকে যত কিছু ব্যয় হয়েছে সেসব কিছু তার হাতে যা আছে তাতে সামান্যও ঘাটতি করে না। আর তার আরশ হচ্ছে পানির উপর এবং তার হাতেই রয়েছে মীযান, তিনি সেটাকে উপর-নীচু করেন।' [বুখারী: ৪৬৮৪; মুসলিম: ৩৭] অন্য হাদীসে ইমরান ইবন হুসাইন বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম আর আমার উটটি দরজার কাছে বেঁধে রাখলাম। তখন তার কাছে বনু তামীম প্রবেশ করলে তিনি বললেন, বনু তামীম তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা বলল, সুসংবাদ তো দিলেন, এবার আমাদেরকে কিছু দিন (সম্পদ)। এটা তারা দু'বার বললেন। তখন রাসূলের কাছে ইয়ামেনের কিছু লোক প্রবেশ করল। তিনি বললেন, হে ইয়ামেনবাসী তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, যখন বনু তামীম সেটা গ্রহণ করল না। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তা গ্রহণ করলাম। তারা আরও বলল, আমরা এ বিষয়ে প্রথম কি তা জানতে চাই। তিনি বললেন, আল্লাহ্ই ছিলেন, তিনি ছাড়া আর কিছু ছিল না। আর তাঁর আরশ ছিল

بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

'নিশ্চয় মৃত্যুর পর তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে', তবে কাফেররা অবশ্যই বলবে, 'এ তো সুস্পষ্ট জাদু(১) ।'

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ

৮. নির্দিষ্ট কালের জন্য(২) আমরা যদি

পানির উপর । আর তিনি সবকিছু যিকর (লাওহে মাহফূযে) লিখে রেখেছিলেন । আর তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন । বর্ণনাকারী ইমরান ইবন হুসাইন বলেন, তখন একজন আহ্বানকারী ডেকে বলল, হে ইবনুল হুসাইন! তোমার উষ্ট্রীটি চলে গেছে । তখন আমি বেরিয়ে পড়ে দেখলাম, উটটি এতদুর চলে গেছে যে, যেদিকে তাকাই শুধু মরিচিকা দেখতে পাই । আল্লাহ্‌র শপথ! আমার ইচ্ছা হচ্ছিল আমি যেন সেটাকে একেবারেই ছেড়ে দেই (অর্থাৎ রাসূলের মাজলিস থেকে বের হতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না)' [বুখারী: ৩১৯১]

(১) অর্থাৎ যখন আপনি তাদেরকে পুনরুত্থানের কথা বুঝাতে থাকেন তখন তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে এবং আপনাকে এ বলে বিদ্রুপ করতে থাকে যে, আপনি তো জাদুকরের মতো কথা বলছেন । এভাবে তারা আখেরাতের দাবী ও যৌক্তিকতাকে বুঝা সত্ত্বেও মেনে নিতে পারেনি । অথচ যিনি একবার সৃষ্টি করেছেন তারপক্ষে পূনর্বার সৃষ্টি করা কোন ব্যাপারই নয় । আল্লাহ্ বলেনঃ "আর তিনিই সৃষ্টিজগতকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনিই তা পূনর্বার করবেন, এটা তার জন্য অত্যন্ত সহজ ।" [সূরা আর রূমঃ ২৭] আল্লাহ্ আরো বলেনঃ "তোমাদের সৃষ্টি ও পূনঃসৃষ্টি তো একজনের মতই" [সূরা লুকমানঃ ২৮]

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা أمة শব্দটি ব্যবহার করেছেন । এ শব্দটি স্থানভেদে বিভিন্ন অর্থ প্রদান করে থাকে [দ্রঃ কুরতুবী]

ক) সময় বা সুনির্দিষ্ট কাল, যেমন আলোচ্য আয়াত ও সূরা ইউসুফের ৪৫ নং আয়াত । ইবন আব্বাস থেকে এখানে এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে । [তাবারী]

খ) অনুসরণযোগ্য ইমাম, যেমন সূরা আন-নাহলের ১২০ নং আয়াতে ইবরাহীম আলাইহিসসালামের ব্যাপারে বলা হয়েছে ।

গ) ধর্ম ও রীতিনীতি অর্থে, যেমন সূরা আয-যুখরুফের ২৩ নং আয়াত ।

ঘ) দল বা বড় শ্রেণী বা জামা'আত তথা অনেক লোককে বুঝানোর অর্থে, যেমন সূরা আল-কাসাসের ২৩ নং আয়াত ।

ঙ) জাতি অর্থে, যাতে মুমিন কাফির সবাই অন্তর্ভুক্ত । যেমন সূরা আন-নাহলঃ৩৬, ইউনুসঃ৪৭ ।

চ) শুধু ঈমানদার জাতি বুঝানোর জন্য । যেমন সুরা আলে-ইমরানঃ ১১০ । অনুরূপভাবে হাদীসে এসেছে, হাশরের মাঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেনঃ "উম্মতি, উম্মতি" আমার উম্মত, আমার উম্মত । এখানে শুধু মুসলিম জাতিকে বুঝানো হয়েছে ।

لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥٓ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۝٨

তাদের থেকে শাস্তি স্থগিত রাখি তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'কিসে সেটা নিবারণ করছে?' সাবধান! যেদিন তাদের কাছে এটা আসবে সেদিন তাদের কাছ থেকে সেটাকে নিবৃত্ত করা হবে না এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ ۝٩

৯. আর যদি আমরা মানুষকে আমাদের কাছ থেকে রহমত আস্বাদন করাই[১] ও পরে তার কাছ থেকে আমরা তা ছিনিয়ে নেই তবে তো নিশ্চয় সে হয়ে পড়ে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ।

وَلَئِنْ أَذَقْنَٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝١٠

১০. আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর আমরা তাকে সুখ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলবে, আমার বিপদ-আপদ কেটে গেছে', আর সে তো হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী।

ছ) এ ছাড়া এ শব্দ দ্বারা কোন গোষ্ঠী বা অংশ বুঝানোর অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, সূরা আল-আ'রাফঃ১৫৯, সূরা আলে ইমরানঃ ১১৩]

(১) অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর আমরা তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের আস্বাদন দেই তখন সে অবশ্যই বলে থাকে, 'এ আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে । আর আমি যদি আমার রবের কাছে ফিরে যাইও তাঁর কাছে নিশ্চয় আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।' অতএব, আমরা কাফিরদেরকে তাদের আমল সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি।" [সূরা ফুসসিলাত: ৫০] আরও বলেন, "আর আমরা যখন মানুষকে আমাদের পক্ষ থেকে কোন রহমত আস্বাদন করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ-আপদ ঘটে তখন তো মানুষ হয়ে পড়ে খুবই অকৃতজ্ঞ।" [সূরা আশ-শূরা: ৪৮]

১১. কিন্তু যারা ধৈর্যশীল[১] ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

১২. তবে কি আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার কিছু আপনি বর্জন করবেন এবং তাতে আপনার মন সংকুচিত হবে এ জন্যে যে, তারা বলে, 'তার কাছে ধন-ভান্ডার নামানো হয় না কেন অথবা তার সাথে ফিরিশ্‌তা আসে না কেন?' আপনি তো কেবল সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সবকিছুর কর্মবিধায়ক[২]।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

(১) এ আয়াতে সত্যিকার মানুষকে সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করে বলা হয়েছে যে, সে সব ব্যক্তি সাধারণ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে যাদের মধ্যে দুটি বিশেষ গুণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ধৈর্য ও সহনশীলতা, দ্বিতীয়টি সৎকর্মশীলতা। সবর শব্দটি আরবী ভাষায় অনেক ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেয়া, বন্ধন করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় অন্যায় কার্য হতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করাকে সবর বলে। সুতরাং শরী'আতের পরিপন্থী যাবতীয় পাপকার্য হতে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন সবরের অন্তর্ভুক্ত তদ্রূপ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি নেক কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে বাধ্য করাও সবরের শামিল। এর বাইরে বিপদাপদে নিজেকে সংযত রাখতে পারাও সবরের অন্তর্ভুক্ত। [ইবনুল কাইয়্যেম: মাদারেজুস সালেকীন] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যার হাতে আমার আত্মা তাঁর শপথ করে বলছি, একজন মু'মিনের উপর আপতিত যে কোন ধরনের চিন্তা, পেরেশানী, কষ্ট, ব্যথা, দুর্ভাবনা এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তার গুণাহের কাফ্‌ফারা করে দেন"। [বুখারীঃ৫৬৪১, ৫৬৪২, মুসলিমঃ ২৫৭৩] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ মু'মিনের জন্য যে ফয়সালাই করেছেন এটা তার জন্য ভাল হয়ে দেখা দেয়, যদি কোন ভাল কিছু তার জুটে যায় তখন সে শুকরিয়া আদায় করে সুতরাং তা তার জন্য কল্যাণ। আর যদি খারাপ কিছু তার ভাগ্যে জুটে যায় তখন সে ধৈর্য ধারণ করে তখন তার জন্য তা কল্যাণ হিসেবে পরিগণিত হয়। একমাত্র মুমিন ছাড়া কারো এ ধরনের সৌভাগ্য হয় না। [মুসলিমঃ ২৯৯৯]

(২) এ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কাফেরদের কিছু অন্যায় আব্দারের কারণে তার মনের যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার জবাব দিয়ে সান্ত্বনা

১৩. নাকি তারা বলে, 'সে এটা নিজে রটনা করেছে?' বলুন, 'তোমরা যদি (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার (এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য) ডেকে নাও[১] ।'

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ⑬

১৪. অতঃপর যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখ, এটা তো আল্লাহ্র জ্ঞান অনুসারেই নাযিল

فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ⑭

দেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] মূলতঃ তাদের আবদার ছিল নিরেট মুর্খতা ও চরম অজ্ঞতাপ্রসূত। যেমন এক আয়াতে এসেছে, "আরও তারা বলে , 'এ কেমন রাসূল' যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে কোন ফিরিশ্তা কেন নাযিল করা হল না, যে তার সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে?' 'অথবা তার কাছে কোন ধনভাণ্ডার এসে পড়ল না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন, যা থেকে সে খেতো ?' যালিমরা আরো বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।" [সূরা আল-ফুরকান: ৭-৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযাস্বরূপ সাথে সাথে যদি কোন ফেরেশতা থাকতেন, তবে যখনই কেউ তাকে অমান্য করত তৎক্ষনাৎ গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হত।

(১) আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের বড় মু'জিযা কুরআন তোমাদের সম্মুখে রয়েছে, যার অলৌকিকত্ব তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মু'জিযার দাবী করে থাক তাহলে কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের দাবী পুরণ করা হয়েছে। সুতরাং নতুন কোন মু'জিযা দাবী করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। আর যদি তারা বলতে চায় যে, কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম নয়; বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তা রচনা করেছেন? যদি তোমরা তাই মনে করে থাক তা হলে, তোমরা অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে দেখাও। আর একই ব্যক্তি দশটি সূরা তৈরি করতে হবে, এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। বরং সারা দুনিয়ার পণ্ডিত, সাহিত্যিক মানুষ, জিন, তথা দেব দেবী সবাই মিলেই তা রচনা কর। কিন্তু তারা যখন দশটি সূরাও তৈরী করতে পারছে না, তাই আপনি বলুন যে, এই কুরআন যদি কোন মানুষের রচিত কালাম হতো তাহলে অন্য মানুষেরাও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হতো। সকলের অপারগ হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এই কুরআন আল্লাহ পাকের কালাম, এটি ইলম ও কুদরতে নাযিল হয়েছে। এটা রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত।

করা হয়েছে এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। অতঃপর তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হবে?

১৫. যে কেউ দুনিয়ার জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমরা তাদের কাজের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿١٥﴾

১৬. তাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করেছিল আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে। আর তারা যা করত তা ছিল নিরর্থক[১]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

(১) অর্থাৎ প্রতিটি সৎকার্য গ্রহণযোগ্য ও আখেরাতের মুক্তির কারণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সেটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মোতাবেক হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানই রাখে না, তার যাবতীয় কার্যকলাপ গুণ গরিমা, নীতি নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায়। যার বাহ্যিক আকৃতি অতি সুন্দর হলেও আখেরাতে তার কানাকড়িরও মূল্য নেই। তবে দৃশ্যতঃ সেটা যেহেতু পূণ্যকার্য ছিল এবং তা দ্বারা বহু লোক উপকৃত হয়েছে, তাই আল্লাহ তা'আলা এহেন তথাকথিত সৎকার্যকে সম্পূর্ণ বিফল ও বিনষ্ট করেন না, বরং এসব লোকের যা মূখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল যেমন তার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি হবে, লোকে তাকে দানশীল, মহান ব্যক্তিরূপে স্মরণ করবে, নেতারূপে তাকে বরণ করবে ইত্যাদি আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবনেই তাকে দান করেন। অপরদিকে আখেরাতে মুক্তিলাভ করা যেহেতু তাদের কাম্য ছিল না এবং তাদের প্রাণহীন সৎকার্য আখেরাতের অপূর্ব ও অনন্ত নেয়ামতসমূহের মূল্য হওয়ার যোগ্য ছিল না, কাজেই আখেরাতে তার কোন প্রতিদানও লাভ করবে না। বরং নিজেদের কুফরী, শেরেকী ও গোনাহের কারণে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল তাদের জ্বলতে হবে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নেই।" এতে করে বোঝা যায় যে, এ আয়াত কাফেরদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা, একজন মুসলিম যত বড় পাপীই হোক না কেন, তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আরাম আয়েশ ও নেয়ামত লাভ করবে।

১৭. তারা[১] কি তার সমতুল্য যে তার রব প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত[২]

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ

কোন কোন মুফাসসিরের মতে এ আয়াতে ঐসব মুসলিমদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা কার্যের বিনিময়ে শুধু পার্থিব জীবনে সুখ শান্তি যশ খ্যাতি প্রত্যাশা করে। লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের মর্ম হবে এই যে, তারা নিজেদের পাপের শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। পরিশেষে পাপের শাস্তি ভোগান্তে তারাও অবশ্য সৎকাজের প্রতিদান লাভ করবে। [কুরতুবী] সত্যনিষ্ঠ আলেমদের কারও কারও মতে, অত্র আয়াতে ঐসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, যারা তাদের যাবতীয় সৎকার্য শুধু পার্থিব ফায়দা হাসিলের জন্য করে থাকে, চাই সে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাফের হোক অথবা নামধারী মুসলিম হোক। তাই যদি কোন মুসলিম শুধুমাত্র লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে সৎকাজ করে অথবা শুধু দুনিয়া অর্জনের জন্য করে, তবে এ সব দুনিয়াকামী লোক ইচ্ছা ও বাসনায় আল্লাহর সাথে শির্ককারী বলে বিবেচিত হবে। আর যে আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করে তার যাবতীয় আমলই বিনষ্ট হয়ে যায়। সে হিসেবে ঐসব নামধারী মুসলিমও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদের পরিণাম হবে জাহান্নাম। শির্ক করার কারণে তারা কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু, মাইমুন ইবনে মেহরান ও মুজাহিদ রাহিমাহুমুল্লাহ এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ পূর্ব ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে বর্ণিত কাফেরগণ কি এ আয়াতে আগত লোকদের সমতুল্য। [মুয়াসসার] অথবা যারা তাদের রবের প্রেরিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তারা কি তাদের মত যারা তাদের রব প্রেরিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? [জালালাইন]

(২) বলা হয়েছে, যে তার রবের পক্ষ থেকে আগত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা ঈমানদারগণ সবাই। [জালালাইন] আর 'স্পষ্ট প্রমাণ' বলতে কি বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে।

এক. এখানে 'বাইয়েনাহ' বা স্পষ্ট প্রমাণ বলে ফিতরাত তথা স্বভাবগত বিশ্বাসকে বুঝানো হয়েছে। মূলতঃ প্রত্যেক মানুষই ফিতরাত তথা স্বভাবগতভাবে দ্বীন-ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে। [ইবন কাসীর] পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সঙ্গদোষ, শয়তান, গাফিলতি ইত্যাদি তাদেরকে সে স্বভাবজাত দ্বীন-ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয় না। সে হিসেবে আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সত্যিকারের মুমিনদের অবস্থা ঐসব লোকদের মোকাবেলায় তুলে ধরা হয়েছে- যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে শুধু দুনিয়া হাসিল করা। যেন দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে যে, এই দুটি শ্রেণী কখনো সমকক্ষ হতে পারে না।

দুই. অথবা আয়াতে 'বাইয়েনাহ' বা স্পষ্ট প্রমাণ বলে কুরআনকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [জালালাইন] তখন আয়াতের অর্থ হবে, যিনি বা যারা অর্থাৎ মুহাম্মাদ

مِّنۡهُ وَمِنۡ قَبۡلِهٖ كِتٰبُ مُوۡسٰۤى اِمَامًا وَّرَحۡمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ

এবং যার অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত সাক্ষী[১] এবং যার আগে ছিল মূসার

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা মুমিনগণ স্পষ্ট প্রমাণ কুরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তার অনুসরণ করে একজন সাক্ষী তিনি হচ্ছেন জিবরীল। তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের উপর সাক্ষী। তাছাড়া দ্বিতীয় আরেকটি সাক্ষ্যও রয়েছে আর তা হচ্ছে এ কুরআনের পূর্বে আগত কিতাব তাওরাত যা মূসা আলাইহিসসালামের উপর নাযিল হয়েছে। সে কিতাবও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য। [জালালাইন]

তিন. অথবা আয়াতে বর্ণিত বাইয়্যেনাহ বা স্পষ্ট প্রমাণ বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ কুরআনই নিজেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার উপর প্রথম সাক্ষী। তার দ্বিতীয় সাক্ষী হচ্ছে জিবরীল অথবা স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তৃতীয় সাক্ষী হচ্ছে পূর্বে মূসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিলকৃত কিতাব তাওরাত। যিনি এ তিন সাক্ষী-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তিনি কি দুনিয়া পুজারীদের মত? [মুয়াসসার]

(১) এ আয়াতে شاهد শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক ইমামগণের কয়েকটি অভিমত রয়েছেঃ

১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে শাহেদ অর্থ পবিত্র কুরআনের إعجاز এ'জায বা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া যা কুরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে যে কুরআনের উপর কায়েম রয়েছে? আর কুরআনের সত্যতার একটি সাক্ষী তো কুরআনের সাথেই বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ এর বিস্ময়করতা এবং মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ইতোপূর্বে তাওরাতরূপে এসেছে, যা মুসা আলাইহিসসালাম আল্লাহ তা'আলার রহমতস্বরূপ দুনিয়াবাসীর অনুসরণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কেননা, কুরআন যে আল্লাহ্ তা'আলার সত্য কিতাব এ সাক্ষ্য তাওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত ছিল।

২) কোন কোন মুফাসসিরের মতে এখানে شاهد বলতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই বুঝানো হয়েছে। [মুয়াসসার]

৩) কোন কোন মুফাসসিরের মতে এখানে شاهد বলতে فطرة বা বুদ্ধিবৃত্তিক সাক্ষ্যকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন এসে এ প্রকৃতিগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাক্ষ্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলো এবং তাকে জানালো তুমি বিশ্বপ্রকৃতিতে ও জীবন ক্ষেত্রে যার নিদর্শন ও পূর্বাভাস পেয়েছো প্রকৃতপক্ষে তাই সত্য। [ইবন কাসীর]

৪) ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ এখানে شاهد বলতে জিবরাইল আলাইহিসসালামকে বুঝানো হয়েছে; কেননা এর পরে বলা হয়েছে, "যার আগে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ" আর এটা নিঃসন্দেহ যে, মুহাম্মাদ এর

يُؤْمِنُونَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ? তারাই এটাতে[১] ঈমান রাখে। অন্যান্য দলের যারা তাতে[২] কুফরী করে, আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান[৩]। কাজেই আপনি এতে[৪] সন্দিগ্ন হবেন না। এটা তো আপনার রবের প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না[৫]।

আগে কখনো মূসা আলাইহিসসালামের গ্রন্থ তেলাওয়াত করেননি। তাই এখানে সাক্ষ্য বলে জিবরাইল আলাইহিসসালাম হওয়াই যুক্তিযুক্ত; কেননা তিনি মূসা আলাইহিসসালামের গ্রন্থও নিয়ে এসেছিলেন। [তাবারী]

(১) অর্থাৎ এ কুরআনে ঈমান রাখে এবং এর নির্দেশ অনুসারে চলে। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ অন্যান্য যাবতীয় লোকেরা যারা কুরআনের উপর ঈমান রাখে না এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও রাসূল হিসেবে মানে না তাদের স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।

(৩) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "এ জাতি এবং ইয়াহূদী বা নাসারা যে জাতিই হোক না কেন তাদের কেউ যদি আমার কথা শোনার পরও আমার উপর ঈমান না আনবে তারা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে"। [মুসলিম: ১৫৩] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ আমি এ কথার সত্যায়নে আল্লাহ্র কিতাব থেকে প্রমাণাদি খুজছিলাম, শেষ পর্যন্ত এ আয়াত পেলাম "অন্যান্য দলের যারা এটাকে অস্বীকার করে, আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান"। তারপর ইবনে আব্বাস বললেনঃ এখানে الأحزاب বলে যাবতীয় দল ও গোষ্ঠীকে বুঝানো হয়েছে। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৩৪২]

(৪) অর্থাৎ এ কুরআনের সত্যতার উপর আপনি সন্দেহে থাকবেন না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও সন্দেহে নেই। এখানে উম্মতকে সাধারণভাবে পথ নির্দেশ দেয়াই উদ্দেশ্য। [মুয়াসসার] শানকীতী বলেন, কুরআনের অন্যত্রও এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখানেও এ কুরআনকে সন্দেহমুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন, সূরা আল-বাকারাহ: ২; সূরা সাজদাহ: ২। [আদওয়াউল বায়ান]

(৫) মূলত: ঈমান আনার জন্য সোজা মন ও আল্লাহ্র তাওফীক থাকতে হয়। সুতরাং নবী ইচ্ছা করলেই বা কুরআনের সত্যতা স্পষ্ট হলেই অধিকাংশ মানুষ ঈমান নিয়ে আসবে ব্যাপারটি এরকম নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষের মতামতই যে সঠিক সিদ্ধান্ত হবে এমন কথাও ঠিক নয়। [এ ব্যাপারে আরো দেখুনঃ সূরা আল-আন'আমঃ ১১৬, ইউসুফঃ ১০৩, আর-রা'দঃ১, আল-ইসরাঃ ৮৯, আল-ফুরকানঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

১৮. আর যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে তাদের চেয়ে অধিক যালিম কে? তাদেরকে তাদের রবের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের রবের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছিল ।[১] সাবধান! আল্লাহ্র লা'নত যালিমদের উপর,

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

১৯. যারা আল্লাহ্র পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে; আর এরাই তো আখিরাত অস্বীকারকারী ।

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ

২০. তারা যমীনে আল্লাহ্কে অপারগ করতে পারত না[২] এবং আল্লাহ্ ছাড়া তাদের অন্য কোন সাহায্যকারী ছিল না; তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা

৫০, আস-সাফ্ফাতঃ৭১, গাফিরঃ ৫৯, আল-বাকারাহঃ১০০, আশ-শু'আরাঃ৮, ৬৭, ১০৩, ১২১, ১৩৯, ১৫৮, ১৭৪, ১৯০]

(১) এটা হচ্ছে আখেরাতের জীবনের বর্ণনা । সেখানে এ ঘোষণা দেয়া হবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে রাব্বুল আলামীনের এত নিকটে আনা হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের কাঁধে হাত রেখে তার গুনাহ সমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করিয়ে নেবেন । তাকে জিজ্ঞেস করবেন, অমুক গুনাহ জানা আছে কি? মনে আছে কি? ঈমানদার বলবে, হে আমার প্রভু, আমি আমার গুনাহর কথা স্বীকার করছি, এমন এমন গুনাহ অবশ্যই আমার থেকে সংঘটিত হয়েছে । সুতরাং এভাবে দু'বার ঈমানদার স্বীকার করবে । তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ সমূহ ও অপরাধ গোপন রেখেছি । কিন্তু আজ তোমাকে মাফ করে দিচ্ছি । তারপর সৎকাজ সমূহের আমলনামা ভাঁজ করে তাকে দেয়া হবে । পক্ষান্তরে অপর দল তথা কাফেরদেরকে সাক্ষী-সমক্ষে ডেকে বলা হবে, এরাই ছিল সেসব লোক, যারা তাদের রবের উপর মিথ্যারোপ করেছিল । সাবধান! আল্লাহর লা'নত যালিমদের উপর ।" [বুখারীঃ ৪৬৮৫]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ যালেমকে ছাড় দিতে থাকেন শেষ পর্যন্ত যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তার পক্ষে আর পালানো বা হস্তচ্যুত হওয়া সম্ভব হয় না ।" [বুখারীঃ ৪৬৮৬, মুসলিমঃ ২৫৮৩]

وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝٢٠

হবে[১]; তাদের শুনার সামর্থ্যও ছিল না এবং তারা দেখতেও পেত না[২]।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝٢١

২১. এরা তো নিজেদেরই ক্ষতি করল এবং তারা যে মিথ্যা রটনা করত তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল[৩]।

(১) একটি আযাব হবে নিজের গোমরাহ হবার জন্য এবং আর একটি আযাব হবে অন্যদেরকে গোমরাহ করার । [সা'দী] [এ ব্যাপারে আরো দেখুন, সূরাঃ আন-নাহলঃ ৮৮, আল-আ'রাফঃ৩৮]

(২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কাফের-মুশরিকদের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন যে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জাহানেই আল্লাহ্‌র আনুগত্যে সক্ষম হবে না। দুনিয়াতে তারা আনুগত্য করতে সক্ষম হবে না যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তাদের শুনার সামর্থ্যও ছিল না এবং ওরা দেখতেও পেত না"। আর আখেরাতের ব্যাপারে বলেছেনঃ "সেদিন তাদেরকে ডাকা হবে সিজ্‌দা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না; তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে" [সূরা আল-কালামঃ৪২-৪৩]

(৩) অর্থাৎ তারা আল্লাহ, বিশ্ব-জগত এবং নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে যেসব মতবাদ তৈরী করে নিয়েছিল তা সবই ভিত্তিহীন হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের উপাস্য, সুপারিশকারী ও পৃষ্ঠপোষকদের ওপর যেসব আস্থা স্থাপন করেছিল সেগুলোও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। আর মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে যেসব চিন্তা-অনুমান করে রেখেছিল তাও ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। তারা তখন সত্যিই বুঝতে পারবে যে, তারা প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, আল্লাহ্ বলেনঃ " যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু এবং ঐগুলো তাদের 'ইবাদাত অস্বীকার করবে।" [সূরা আল-আহকাফঃ৬] আরো বলেনঃ "তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করে এজন্যে যাতে ওরা তাদের সহায় হয়; কখনই নয়, ওরা তো তাদের 'ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।" [সূরা মারইয়ামঃ ৮১, ৮২] আরো বলেনঃ "ইব্‌রাহীম বললেন, 'তোমরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পারিক বন্ধুত্বের খাতিরে। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে লা'নত দেবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।" [সূরা আল-আনকাবূতঃ২৫] আরো বলেনঃ "যখন নেতারা অনুসারীদের দায়িত্ব অস্বীকার করবে এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে ও তাদের পারস্পারিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ১৬৬]

২২. নিঃসন্দেহে তারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمۡ فِی الۡاٰخِرَۃِ هُمُ الۡاَخۡسَرُوۡنَ ﴿۲۲﴾

২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, এবং তাদের রবের প্রতি বিনয়াবনত হয়েছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ।

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخۡبَتُوۡۤا اِلٰی
رَبِّهِمۡ ۙ اُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ الۡجَنَّۃِ ۚ هُمۡ فِیۡهَا
خٰلِدُوۡنَ ﴿۲۳﴾

২৪. দল দুটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্নের ন্যায়, তুলনায় এ দুটো কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

مَثَلُ الۡفَرِیۡقَیۡنِ کَالۡاَعۡمٰی وَالۡاَصَمِّ وَالۡبَصِیۡرِ
وَالسَّمِیۡعِ ؕ هَلۡ یَسۡتَوِیٰنِ مَثَلًا ؕ اَفَلَا تَذَکَّرُوۡنَ ﴿۲۴﴾

তৃতীয় রুকূ’

২৫. আর অবশ্যই আমরা নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম । তিনি বলেছিলেন, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী,’

وَلَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا اِلٰی قَوۡمِهٖۤ ۫ اِنِّیۡ لَکُمۡ نَذِیۡرٌ
مُّبِیۡنٌ ﴿۲۵﴾

২৬. ‘যেন তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর ‘ইবাদাত না কর; আমি তো তোমাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশংকা করি ।’

اَنۡ لَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّیۡۤ اَخَافُ عَلَیۡکُمۡ
عَذَابَ یَوۡمٍ اَلِیۡمٍ ﴿۲۶﴾

২৭. অতঃপর তাঁর সম্প্রদায়ের নেতারা, যারা কুফরী করেছিল, তারা বলল[১], ‘আমরা তো তোমাকে আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছু দেখছি না; আমরা তো দেখছি, তোমার অনুসরণ করছে তারাই, যারা আমাদের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতেই অধম এবং আমরা

فَقَالَ الۡمَلَاُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ قَوۡمِهٖ مَا نَرٰىکَ
اِلَّا بَشَرًا مِّثۡلَنَا وَمَا نَرٰىکَ اتَّبَعَکَ اِلَّا الَّذِیۡنَ
هُمۡ اَرَاذِلُنَا بَادِیَ الرَّاۡیِ ۚ وَمَا نَرٰی لَکُمۡ عَلَیۡنَا
مِنۡ فَضۡلٍۭ بَلۡ نَظُنُّکُمۡ کٰذِبِیۡنَ ﴿۲۷﴾

(১) নূহ আলাইহিস সালাম যখন তার জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন জাতি তার নবুওয়াত ও রেসালাতের উপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল । নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে তাদের প্রতিটি উক্তির উপযুক্ত জবাব দান করেন । আলোচ্য আয়াতসমুহে এ ধরনের একটি কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে ।

আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না[১], বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।'

(১) অর্থাৎ কওমের জাহেল লোকেরা সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেনীকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল- যাদের কাছে পার্থিব ধন-সম্পদ ও বিষয় বৈভব ছিল না । মূলত তা ছিল তাদের জাহেলী চিন্তাধারার ফল। প্রকৃতপক্ষে ইজ্জত কিংবা অসম্মান ধন দৌলত বিদ্যা বুদ্ধির অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সম্পদ এবং সম্মানের মোহ একটি নেশার মত, যা অনেক সময় সত্য ন্যায়কে গ্রহন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সত্য ও ন্যায় হতে বিচ্যুত করে। দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মুখে যেহেতু এরূপ কোন অন্তরায় থাকে না কাজেই তারাই সর্বাগ্রে সত্য ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে যুগে যুগে দরিদ্র দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল। [কুরতুবী]

অনুরূপভাবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ঈমানের আহ্বান সম্বলিত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চিঠি লাভ করল, তখন গুরুত্ব সহকারে নিজেই সেটার তদন্ত তাহকীক করতে মনস্থ করে। কেননা, সে তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব পাঠ করে সত্য নবীগণের আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে পুঙ্খানুপঙ্খরূপে পারদর্শী ছিল। কাজেই তৎকালে আরব দেশের যেসব ব্যবসায়ী সিরিয়ায় উপস্থিত ছিল, তাদের একত্রিত করে উক্ত আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল যে, তার অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণী ঈমান এনেছে নাকি ধনী শ্রেণী? তারা উত্তরে বলেছিল, বরং দরিদ্র ও দূর্বল শ্রেণী। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করল, এটা তো সত্য রাসূল হওয়ার লক্ষণ। কেননা, যুগে যুগে দরিদ্র দুর্বল শ্রেণীই প্রথমে নবীগণের আনুগত্য স্বীকার করেছে। [দেখুন, বুখারীঃ ৭, ৫১, মুসলিমঃ ১৭৭৩]

মোদ্দাকথা: দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে ইতর এবং হেয় মনে করা চরম মূর্খতা ও অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইতর ও ঘৃণিত তারাই যারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা মালিককে চিনে না, তার নির্দেশ মেনে চলে না। সুফিয়ান সওরী রাহেমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইতর ও হীন কে? তিনি উত্তর দিলেন- যারা বাদশাহ ও রাজকর্মচারীদের খোশামোদ- তোষামোদে লিপ্ত হয়, তারাই হীন ও ইতর। আল্লামা ইবনুল আ'রাবী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, যারা দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে তারাই হীন। পুনরায় প্রশ্ন করা হল- সবচেয়ে হীন কে? তিনি জবাব দিলেন- যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দ্বীন ও ঈমানকে বরবাদ করে। ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের নিন্দা-সমালোচনা করে, সে-ই ইতর ও অর্বাচীন। [কুরতুবী] কারণ, সাহাবায়ে কিরামই সমগ্র উম্মতের সর্বাপেক্ষা হিত সাধনকারী। তাদের মাধ্যমেই ঈমানের অমূল্য দৌলত ও শরী'আতের আহকাম সকলের কাছে পৌঁছেছে।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ۝٢٨

২৮. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার রব প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করে থাকেন, অতঃপর সেটা তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়, আমরা কি এ বিষয়ে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি, যখন তোমরা এটা অপছন্দ কর?'

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝٢٩

২৯. 'হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের কাছে কোন ধন-সম্পদ চাই না[১]। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌রই কাছে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়াও আমার কাজ নয়; তারা নিশ্চিতভাবে তাদের রবের সাক্ষাত লাভ করবে[২]।

(১) আমি একজন নিঃস্বার্থ উপদেশদাতা। নিজের কোন লাভের জন্য নয় বরং তোমাদেরই ভালোর জন্য এত কঠোর পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছি। এ সত্যের দাওয়াত দেওয়ার, এর জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করার ও বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হবার পেছনে আমার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ সক্রিয় আছে এমন কথা তোমরা প্রমাণ করতে পারবে না।

(২) অর্থাৎ তাদের রবই তাদের মর্যাদা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। তাঁর সামনে যাবার পরই তাদের সবকিছু প্রকাশিত হবে। তারা যদি সত্যিকার মহামূল্যবান রত্ন হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের ছুঁড়ে ফেলার কারণে তারা তুচ্ছ মূল্যহীন পাথরে পরিণত হয়ে যাবে না। আর যদি তারা মূল্যহীন পাথরই হয়ে থাকে তাহলে তাদের মালিকের ইচ্ছা, তিনি তাদেরকে যেখানে চান ছুঁড়ে ফেলতে পারেন। মোটকথা, এ আয়াতে কওমের লোকদের মূর্খতা প্রসূত ধ্যান ধারণা খণ্ডন করার জন্য প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, কারো ধন- সম্পদের প্রতি নবী রাসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তারা নিজেদের খেদমত ও তালীমের বিনিময়ে কারো থেকে কোন পারিশ্রমিক গ্রহন করেন না। তাদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই দায়িত্বে। কাজেই, তাদের দৃষ্টিতে ধনী- দরিদ্র এক সমান। তোমরা এমন অহেতুক আশংকা পোষণ করো না

কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

৩০. 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তবে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?'

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣٠

৩১. 'আর আমি তোমাদেরকে বলি না, 'আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধন-ভান্ডার আছে,' আর না আমি গায়েব জানি[১]

وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ

যে, আমরা ধন-সম্পদশালীরা যদি ঈমান আনয়ন করি তবে হয়ত আমাদের বিত্ত-সম্পদে ভাগ বসানো হবে। দ্বিতীয়তঃ তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসাবে চাপ সৃষ্টি করছ যেন আমি দরিদ্র ঈমানদারগণকে তাড়িয়ে দেই। কিন্তু আমার দ্বারা তা কখনো সম্ভবপর নয়। কারণ, আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহর দরবারে তাদের প্রবেশাধিকার ও উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদেরকে তাড়িয়ে দেয়া অন্যায় ও অসঙ্গত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও একই ধরনের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আপনি অবশ্যই এ সমস্ত দরিদ্র মুমিনদের তাড়িয়ে দিবেন না। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করার চিন্তাও করবেন না। [দেখুনঃ সূরা আল-আন'আমঃ৫২, আল-কাহাফঃ ২৮] আল্লাহ্ তা'আলা মূলতঃ দরিদ্র মুমিনদেরকে ঈমান আনার তাওফীক দেয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন যে, কারা তাদের আত্মম্ভরিতা ও অহংকার ত্যাগ করে হক্ক কবুল করতে পারে আর কারা তা না পেরে বলতে থাকে যে, আল্লাহ্ কি তাদের মত লোকদের ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না? মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "আমি এভাবে তাদের একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করেছি যেন তারা বলে, 'আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন?' আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন?" [সূরা আল-আন'আমঃ৫৩]

(১) আর আমি গায়েবও জানিনা যে তোমাদের গোপন ও অব্যক্ত কথা ও কাজ বলে দেব। [সা'দী] আল্লাহ্ যা জানিয়েছেন সেটার বাইরে তো আমি তোমাদেরকে গায়েবের কোন সংবাদ জানাতে পারবো না। [ইবন কাসীর] সম্ভবত: উক্ত জাহেলদের আরো বিশ্বাস ছিল যে, যারা সত্যিকার নবী, তারা নিশ্চয়ই গায়েবের খবর জানবেন। নূহ আলাইহিস সালামের উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবুওয়াত ও রেসালতের জন্য গায়েবের ইল্‌ম অপরিহার্য নয়। আর তা হবেই বা কি করে? গায়েবের ইলম তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ছিফাত বা বৈশিষ্ট্য। কোন নবী, অলী বা ফেরেশ্‌তা সেটার

تَزۡدَرِيٓ أَعۡيُنُكُمۡ لَن يُؤۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيۡرًاۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا فِيٓ أَنفُسِهِمۡ إِنِّيٓ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٣١

এবং আমি এটাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্‌তা[১]। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই মঙ্গল দান করবেন না; তাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ্ অধিক অবগত। (যদি এরূপ উক্তি করি) তা হলে নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব[২]।'

قَالُواْ يَٰنُوحُ قَدۡ جَٰدَلۡتَنَا فَأَكۡثَرۡتَ جِدَٰلَنَا فَأۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٣٢

৩২. তারা বলল, 'হে নূহ! তুমি তো আমাদের সাথে বিতন্ডা করেছ---তুমি বিতণ্ডা করেছ আমাদের সাথে অতি মাত্রায়; কাজেই তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ওয়াদা তুমি করছ তা আমাদের কাছে নিয়ে আস।'

قَالَ إِنَّمَا يَأۡتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ ٣٣

৩৩. তিনি বললেন, 'ইচ্ছে করলে আল্লাহ্ই তা তোমাদের কাছে উপস্থিত করবেন এবং তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।'

অংশীদার হতে পারে না। তাদেরকে এ গুণে গুনান্বিত মনে করা স্পষ্ট শির্কী কাজ।

(১) বিরোধী পক্ষ তাঁর ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল, তোমাকে তো আমরা আমাদেরই মত একজন মানুষ দেখছি। তাদের আপত্তির জবাবে একথা বলা হয়েছিল। এখানে নূহ আলাইহিস্‌সালাম বলেন, যথার্থই আমি একজন মানুষ। একজন মানুষ হওয়া ছাড়া নিজের ব্যাপারে তো আমি আর কিছুই দাবী করিনি। আমি তো কখনো ফেরেশতা হওয়ার দাবী করিনি। আমার বৈশিষ্ট্য এই যে, আমাকে মু'জিযা দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] আমি কখনও আমার নিজেকে আমার মর্যাদার উপরে অন্য কারো মর্যাদার বলে দাবী করিনি। আমাকে আল্লাহ্ যে মর্যাদা দিয়েছেন আমি তো সেটাই বলি। কারও উপর আমি মনগড়া কোন কথাও বলি না। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ যাদেরকে তোমরা হেয় গণ্য করছ, তাদের সম্পর্কে আমি এটা বলি না যে, তাদের রবের কাছে তাদের ঈমানের কোন সওয়াব নেই। কারণ, আল্লাহ্ই জানেন তাদের ঈমানের অবস্থা। যদি তারা প্রকাশ্যে যেভাবে ঈমানদার তেমনি সত্যিকার অর্থেই ঈমানদার হয় তবে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। যদি তারা ঈমানদার হওয়ার পরও কেউ তাদের সাথে খারাপ কথা বলে, তবে অবশ্যই সে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এমন কথা বলে যাতে তার কোন জ্ঞান নেই। [ইবন কাসীর]

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ۭ هُوَ رَبُّكُمْ ۣ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৩৪. 'আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান[১]। তিনিই তোমাদের রব এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْۗءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ۝

৩৫. নাকি তারা বলে যে, তিনি এটা রটনা করেছেন? বলুন, 'আমি যদি এটা রটনা করে থাকি, তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হব। তোমরা যে অপরাধ করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত[২]।'

(১) অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের হঠকারিতা, দুর্মতি এবং সদাচারে অনাগ্রহ দেখে এ ফায়সালা করে থাকেন যে, তোমাদের সঠিক পথে চলার সুযোগ আর দেবেন না এবং যেসব পথে তোমরা উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে চাও সেসব পথে তোমাদের ছেড়ে দেবেন তাহলে এখন আর তোমাদের কল্যাণের জন্য আমার কোন প্রচেষ্টা সফলকাম হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা নুহ আলাইহিসসালামকে প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রাণপন চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনলনা তখন তিনি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন- "নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিবা রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্যপথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।"[সূরা নূহঃ ৫-৬] সুদীর্ঘকাল যাবত অসহনীয় কষ্ট ক্লেশ ভোগ করার পর তিনি দো'আ করলেন, "হে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।" [সুরা আল মুমিনূনঃ৩৯]

(২) কোন কোন মুফাসসির বলেন, এটিও নূহ আলাইহিস সালামের সাথে তার কাওমের কথা, যার ধারাবাহিকতা আগে থেকে চলে আসছিল। [বাগভী; কুরতুবী] তবে অন্যান্য মুফাসসিরদের মতে, এ বাক্যটুকু আগের বক্তব্যের মাঝখানে এসেছে আগের কাহিনীকে তাগিদ দেয়ার জন্য। [ইবন কাসীর] মনে হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে নূহ আলাইহিস্সালামের এ কাহিনী শুনে বিরোধীরা আপত্তি করে থাকবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপর প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে নিজেই এ কাহিনী বানিয়ে পেশ করছে। যেসব আঘাত সে সরাসরি আমাদের ওপর করতে চায় না সেগুলোর জন্য সে একটি কাহিনী তৈরী করেছে।

চতুর্থ রুকূ'

৩৬. আর নূহের প্রতি অহী করা হয়েছিল, 'যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আপনার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না। কাজেই তারা যা করে তার জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না।'

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. 'আর আপনি আমাদের চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে ও আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করুন[১] এবং যারা

وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾

এ কারণে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ভেংগে এ বাক্যে তাদের আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। [কুরতুবী]

বস্তুত: কোন একটি বক্তব্য নিরেট সত্য অথবা স্রেফ একটি বানোয়াট কাহিনী উভয়ই হতে পারে। এ উভয় রকমের সম্ভাবনা যেখানে সমান সমান, সে ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হবে তাকে একটি যথার্থ সত্য কথা মনে করে তার শিক্ষণীয় দিক থেকে ফায়দা হাসিল করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন প্রকার সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই এ মর্মে দোষারোপ করে যে, বক্তা নিছক তার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য এ মনগড়া কাহিনী রচনা করেছে তাহলে সে হবে নেহাতই একজন কুধারণা পোষক ও বক্র দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তি। এ কারণে বলা হয়েছে, যদি আমি এ কাহিনী তৈরী করে থাকি তাহলে আমার অপরাধের জন্য আমি দায়ী কিন্তু তোমরা যে অপরাধ করছো তা তো যথাস্থানে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তার জন্য আমি নই, তোমরাই দায়ী হবে এবং তোমরাই পাকড়াও হবে। তোমরা যে অন্যায় করে গেলে তার কারণে তোমাদের পাকড়াও করা হবে, তাই তোমাদের অপরাধ থেকে নিজেকে বিমুক্ত ঘোষণা করছি। আমি কখনও বলব না যে, এটা বানোয়াট বা রটনা। কেননা যারা এর উপর মিথ্যারোপ করবে আল্লাহ্‌র কাছে তাদের জন্য কেমন শাস্তি নির্ধারিত আছে তা আমি জানি। [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার চক্ষু রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাও তাই। [মাজমু' ফাতাওয়া: ৫/৯০] এ আয়াত থেকে অনেক মুফাসসিরই এটা বুঝেছেন যে, নূহ আলাইহিসসালামই সর্বপ্রথম নৌকা তৈরী করেছিলেন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] কেননা পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ "আর আপনি নৌকা তৈরী করুন আমার চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে ও অহী অনুসারে"। এতে করে বুঝা গেল যে, নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল আল্লাহ্ তাকে অহীর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

যুলুম করেছে তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কোন আবেদন করবেন না; তারা তো নিমজ্জিত হবে(১) ।'

৩৮. আর তিনি নৌকা নির্মাণ করতে লাগলেন এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের নেতারা তার পাশ দিয়ে যেত, তাকে নিয়ে উপহাস করত; তিনি বললেন, 'তোমরা যদি আমাদেরকে নিয়ে উপহাস কর, তবে নিশ্চয় আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ(২);

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. 'অতঃপর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার উপর আসবে এমন শাস্তি

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ

(১) আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। সুতরাং আপনি আমার কাছে তাদের কারও জন্য ক্ষমা চাইবেন না। তাদের কাউকে ক্ষমা করতে বলবেন না। তারা তাদের অর্জিত কুফরির কারণে তুফানে ডুবে মরবে। [তাবারী] এরূপ অবস্থায়ই নূহ আলাইহিসসালামের মুখে তার কাওম সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছিলঃ 'হে আমার রব! যমীনের কাফিরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দেবেন না, 'আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুস্কৃতিকারী ও কাফির ।[সূরা নূহঃ২৬-২৭] এই বদদো'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হল। যার ফলে সমস্ত কওম ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

(২) এ আয়াতে নৌকা তৈরীকালীন সময়ে নূহ আলাইহিসসালামের কওমের উদাসীনতা গাফিলতি ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশক্রমে নূহ আলাইহিসসালাম যখন নৌকা নির্মাণকর্যে ব্যস্ত ছিলেন তখন তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে জিজ্ঞেস করত আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিতেন অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে তাই নৌকা তৈরী করছি। তখন তারা বলত, হে নূহ! আপনি তো আগে ছিলেন নবী এখন কি তাহলে কাঠমিস্ত্রি হয়ে গেলেন। আরও বলত: আপনি ডাঙ্গাতে জাহাজ কিভাবে চালাবেন? এভাবে তারা বিভিন্নভাবে উপহাস করেছিল [ফাতহুল কাদীর]। এর উত্তরে নূহ আলাইহিসসালাম বলতেন, যদিও আজ তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ কিন্তু মনে রেখো সেদিন দূরে নয় যেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করব। অর্থাৎ তোমরাও উপহাসের পাত্র হবে।

وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

যা তাকে লাঞ্ছিত করবে, আর তার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।'

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا
مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ
عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا
قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾

৪০. অবশেষে যখন আমাদের আদেশ আসল এবং উনান উথলে উঠল[১]; আমরা বললাম, এতে উঠিয়ে নিন প্রত্যেক শ্রেণীর যুগলের দুটি[২], যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ছাড়া আপনার পরিবার-পরিজনকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। আর তার সাথে ঈমান এনেছিল কেবল অল্প কয়েকজন[৩]।

(১) এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, প্লাবনের সূচনা হয় একটি বিশেষ চুলা থেকে। তার তলা থেকে পানির স্রোত বের হয়ে আসে। তারপর একদিকে আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হতে থাকে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গায় মাটি ফুঁড়ে পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসতে থাকে। এখানে কেবল চুলা থেকে পানি উথলে ওঠার কথা বলা হয়েছে এবং সামনের দিকে গিয়ে বৃষ্টির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু সূরা 'আল-কামার ১১-১৩' এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছেঃ "আমি আকাশের দরজা খুলে দিলাম। এর ফলে অনবরত বৃষ্টি পড়তে লাগলো। মাটিতে ফাটল সৃষ্টি করলাম। ফলে চারদিকে পানির ফোয়ারা বের হতে লাগলো। আর যে কাজটি নির্ধারিত করা হয়েছিল এ দু'ধরনের পানি তা পূর্ণ করার জন্য পাওয়া গেলো।" তাছাড়া এ আয়াতে "তান্নুর" (চুলা) শব্দটির ওপর আলিফ-লাম বসানোর মাধ্যমে একথা প্রকাশ করা হয় যে, একটি বিশেষ চুলাকে আল্লাহ এ কাজ শুরু করার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই চুলাটির তলা ঠিক সময়মতো ফেটে পানি উথলে ওঠে। পরে এ চুলাটিই প্লাবনের চুলা হিসেবে পরিচিত হয়। সূরা মুমিনূনের ২৭ আয়াতে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, এ চুলাটির কথা নূহ আলাইহিস্‌সালামকে বলে দেয়া হয়েছিল। তবে আয়াতে বর্ণিত 'তান্নুর' শব্দটির অর্থ ইবন আব্বাস ও ইকরিমা এর মতে, ভূপৃষ্ঠ। [তাবারী; বাগভী; ইবন কাসীর] তখন অর্থ হবে, পুরো যমীনটাই ঝর্ণাধারার মতো হয়ে গেল যে, তা থেকে পানি উঠতে থাকল। এমনকি যে আগুনের চুলা থেকে আগুন বের হওয়ার কথা তা থেকে আগুন না বের হয়ে পানি নির্গত হতে আরম্ভ করল। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ জোড় বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন। [ইবন কাসীর]

(৩) তারপর নূহ আলাইহিসসালামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বেঈমান কাফেরদের বাদ

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤١﴾

৪১. আর তিনি বললেন, 'তোমরা এতে আরোহন কর, আল্লাহ্‌র নামে এর গতি ও স্থিতি[1], আমার রব তো অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।'

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۚ وَنَادٰى نُوْحُ ۨابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. আর পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে এটা তাদেরকে নিয়ে বয়ে চলল; নূহ তাঁর পুত্রকে, যে পৃথক ছিল, ডেকে বললেন, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আমাদের সাথে আরোহন কর এবং কাফিরদের সঙ্গী হয়ো না ।'

দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারগণকে কিশ্‌তিতে তুলে নিন । তবে তখন ঈমানদারদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল । জাহাজে আরোহনকারীদের সঠিক সংখ্যা কুরআনে ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি । তাই এ ব্যাপারে কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা ঠিক হবে না । [তাবারী]

(১) এ হলো মুমিনের সত্যিকার পরিচয় । কার্যকারণের এ জগতে সে অন্যান্য দুনিয়াবাসীর ন্যায় প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী সমস্ত উপায় ও কলাকৌশল অবলম্বন করে । কিন্তু সে উপায় ও কলা-কৌশলের উপর ভরসা করে না । ভরসা করে একমাত্র আল্লাহর উপর । আর এটি অনস্বীকার্য সত্য যে প্রত্যেকটি যানবাহনের গতি ও স্থিতি, নিয়ন্ত্রণ ও হেফাযত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অধীন । তাই আয়াতে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার চলা ও থামা সবই আল্লাহ্‌র নামে হোক । আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও কর্তৃত্বেই সেটি চলবে । [সা'দী] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালামকে এরপর বলেছিলেন যে, "যখন আপনি ও আপনার সংগীরা নৌযানের উপরে স্থির হবেন তখন বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন যালেম সম্প্রদায় থেকে ।' আরো বলুন, 'হে আমার রব! আমাকে নামিয়ে দিন কল্যাণকরভাবে; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী ।" [সূরা মুমিনূন: ২৮-২৯] আর এ জন্যই যখন কেউ কোন নৌকা কিংবা বাহনে উঠবে তার জন্য বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব । যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান ও গৃহপালিত জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর ; যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করবে যখন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বসবে ; এবং বলবে, 'পবিত্র-মহান তিনি, যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন । আর আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে ।" [সূরা আয-যুখরুফ: ১২-১৪] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতেও এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা এসেছে । [ইবন কাসীর]

قَالَ سَاٰوِیۡۤ اِلٰی جَبَلٍ یَّعۡصِمُنِیۡ مِنَ الۡمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الۡیَوۡمَ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنۡ رَّحِمَ ۚ وَ حَالَ بَیۡنَهُمَا الۡمَوۡجُ فَکَانَ مِنَ الۡمُغۡرَقِیۡنَ ﴿۴۳﴾

৪৩. সে বলল, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে।' তিনি বললেন, 'আজ আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে যাকে আল্লাহ্ দয়া করবেন সে ছাড়া।' আর তরঙ্গ তাদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেল, ফলে সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল[১]।

وَ قِیۡلَ یٰۤاَرۡضُ ابۡلَعِیۡ مَآءَکِ وَ یٰسَمَآءُ اَقۡلِعِیۡ وَ غِیۡضَ الۡمَآءُ وَ قُضِیَ الۡاَمۡرُ وَ اسۡتَوَتۡ عَلَی الۡجُوۡدِیِّ وَ قِیۡلَ بُعۡدًا لِّلۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۴۴﴾

৪৪. আর বলা হল, 'হে যমীন! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও, হে আকাশ! ক্ষান্ত হও।' আর পানি হ্রাস করা হল এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হল। আর নৌকা জুদী পর্বতের উপর স্থির হল[২]

---

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে নূহ আলাইহিসসালামের পরিবারবর্গ কিশতিতে আরোহন করল, কিন্তু একটি ছেলে বাইরে রয়ে গেল। কোন কোন মুফাসসির বলেন এর নাম হচ্ছে, ইয়াম। [ইবন কাসীর] অপর কারো মতে, কিন'আন [কুরতুবী] তখন পিতৃসুলভ স্নেহবশতঃ নূহ আলাইহিসসালাম তাকে ডেকে বললেন প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে নৌকায় আরোহন কর; কাফেরদের সাথে থেকো না, তাহলে পানিতে ডুবে মরবে। কাফের ও দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলেটির যোগসাজস ছিল এবং সে নিজেও কাফের ছিল। কিন্তু নূহ আলাইহিসসালাম তার কাফের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। [কুরতুবী] পক্ষান্তরে যদি তিনি তার কুফরী সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন তাহলে তার আহ্বানের মর্ম হবে নৌকায় আরোহনের পূবশর্ত হিসাবে কুফরী হতে তওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত এবং কাফেরদের সঙ্গ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন। [মুয়াসসার] কিন্তু হতভাগা প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে বলেছিল, আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন হতে আত্নরক্ষা করব। নূহ আলাইহিসসালাম পুনরায় তাকে সতর্ক করে বললেন যে, আজকে কোন উঁচু পর্বত বা প্রাসাদ কাউকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহর খাস রহমত ছাড়া বাঁচার অন্য কোন উপায় নেই। দূর থেকে পিতা পুত্রের কথোপকথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করল এবং নিমজ্জিত করল। আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে যমীন ও আসমান হুকুম পালন করল, প্লাবন সমাপ্ত হল, জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়ল আর বলে দেয়া হল যে দুরাত্মা কাফেররা চিরকালের জন্য আল্লাহর রহমত হতে দূরীভূত হয়েছে।

(২) জুদী পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামেই পরিচিত। সেটি ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে

এবং বলা হল, 'যালিম সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংস'।

৪৫. আর নূহ্ তার রবকে ডেকে বললেন, 'হে আমার রব! নিশ্চয় আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য(১), আর আপনি তো বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক(২)।'

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

৪৬. আল্লাহ্ বললেন, 'হে নূহ্! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়(৩)। সে

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ

ইবনে ওমর দ্বীপের অদুরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত। আধুনিক কালে এ পাহাড়ে নূহ আলাইহিসসালামের কিশতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। মূলতঃ জুদি একটি পর্বতমালার অংশবিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম আরারাত পর্বত। বর্তমান তাওরাতে দেখা যায় যে, নূহ আলাইহিসসালামের কিশতি আরারাত পর্বতে ভিড়েছিল। উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নাই।

(১) অর্থাৎ আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমার পরিজনদেরকে এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবেন। এখন ছেলে তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাকেও রক্ষা করুন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এরপর আর কোন আবেদন নিবেদন খাটবে না। আর আপনি নির্ভেজাল জ্ঞান ও পূর্ণ ইনসাফের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। সে অনুসারে আপনি কারও জন্য নাজাতের নির্দেশ দিয়েছেন আর কারও জন্য দিয়েছেন ডুবে যাওয়ার নির্দেশ। [কুরতুবী] অথবা আয়াতের অর্থ, সুতরাং আপনি আমার জন্য পূর্বে যে ওয়াদা করেছেন সেটা পূর্ণ করুন আর আমার ছেলেকে নাজাত দিন। [তাবারী]

(৩) এ আয়াতাংশের তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ এখানে 'সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়' বলে বুঝানো হয়েছে যে, যাদেরকে নাজাত দেয়ার ওয়াদা আমি করেছিলাম সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' [ইবন কাসীর] এর কারণ হলো, সে কাফের ছিল। আর মুক্তি বা নাজাতের ব্যাপারে কাফেরের সাথে ঈমানদারের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাছাড়া পূর্ব আয়াতে এসেছে যে, "আপনার পরিবারকেও (তাতে উঠান) কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের ছাড়া"। সে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে কুফরি ও তার পিতার অবাধ্যতার কারণে ডুবে মরবে। [ইবন কাসীর]

صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّیْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِیْنَ ﴿۴۶﴾

অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ[১]। কাজেই যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করবেন না[২]। আমি আপনাকে উপদেশ

(১) এটি হচ্ছে কুফরী ও ঈমানের বিরোধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপার। এখানে শুধুমাত্র যারা সৎ তাদেরকে রক্ষা করা হবে এবং যারা অসৎ ও নষ্ট হয়ে গেছে তাদেরকে খতম করে দেয়া হবে। তার আমল যেহেতু খারাপ সুতরাং রক্ষা করা যাবে না। সে নিয়্যত ও আমলে আপনার বিপরীত কাজ করেছে। [তাবারী] তাছাড়া এ আয়াতের আরেকটি অর্থও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো, এখানে إنه বলে নূহ আলাইহিসসালামের দো'আকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হে নূহ! আপনি যে আপনার কাফের সন্তানের জন্য আমার শরনাপন্ন হয়েছেন এ কাজটা সৎ কাজ নয়। আপনার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কিছু চাওয়া ভাল কাজ নয়। [তাবারী; সা'দী]

(২) অর্থাৎ যে জিনিসের পরিণাম আপনার জানা নেই যে এটা ভাল-কি মন্দ বয়ে নিয়ে আসবে এমন কাজে আপনি এগিয়ে যাবেন না। এমন কিছু আমার কাছে চাইবেন না। আমি আপনাকে নসীহত করছি এমন এক নসীহত যা দ্বারা আপনি পূর্ণতা লাভ করবেন এবং জাহেলদের কর্মকাণ্ড থেকে নাজাত পাবেন। তখন নূহ আলাইহিস সালাম যা করেছেন সে জন্য ভীষণ লজ্জিত হলেন এবং বললেন, 'হে আমার রব! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এ জন্য আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। সুতরাং ক্ষমা ও রহমতের দ্বারাই কেউ নাজাত পেতে পারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্তি পেতে পারে [সা'দী] আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, নূহ আলাইহিস সালাম তার সন্তানের নাজাতের জন্য যে ডাক দিয়েছিলেন সেটা যে হারাম ছিল তা তার জানা ছিল না। তিনি মনে করেননি যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত "যারা যুলুম করেছে তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কোন আবেদন করবেন না; তারা তো নিমজ্জিত হবে" সেটা দ্বারা তাকে তার সন্তানের ব্যাপারে দো'আ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষ করে তার কাছে দু'টি নির্দেশের মধ্যে বিরোধ লেগে গিয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন, তার সন্তানের জন্য নাজাতের আহ্বান পূর্বোক্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে "আর আপনার পরিবারকে" নৌকাতে উঠিয়ে নিন, সে ঘোষণায় তার সন্তান অন্তর্ভুক্ত হবে। সে হিসেবে তিনি নাজাতের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, সে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য কোন প্রকার দো'আ করা যাবে না। তখন তিনি সে অনুসারে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চান এবং তাঁর দয়া তলব করেন। [ফাতহুল কাদীর; সা'দী] এতে স্পষ্ট হলো যে, একজন মহান মর্যাদাশালী নবী নিজের চোখের সামনে নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে ডুবে যেতে দেখছেন এবং অস্থির হয়ে সন্তানের গোনাহ মাফ করার

দিচ্ছি, আপনি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হন।'

৪৭. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এ জন্য আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব[১]।'

قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنۡ أَسۡـَٔلَكَ مَا لَيۡسَ لِي بِهِۦ عِلۡمٞۖ وَإِلَّا تَغۡفِرۡ لِي وَتَرۡحَمۡنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ۝٤٧

জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহর দরবার থেকে জবাবে তাকে ধমক দেয়া হচ্ছে। কারণ একটিই, সে ছেলের মধ্যে রয়েছে শির্ক ও কুফর। সুতরাং যার কাছে থাকবে শির্ক ও কুফর তার জন্য কেউ কোন সুপারিশ করতেও সক্ষম হবে না। [দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাঃ মাজমু' ফাতাওয়া ১/১৩১]

(১) উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একটি মাসআলা জানা গেল যে, দো'আকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার জন্য ও যে কাজের জন্য দো'আ করা হবে তা জায়েয হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেয়া। সন্দেহজনক কোন বিষয়ের জন্য দো'আ করা নিষিদ্ধ। এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে যতই নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাক না কেন ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যতই সম্ভ্রান্ত বংশীয় হোক না কেন যতই বড় বুযুর্গের সন্তান হোক না কেন, যদি সে ঈমানদার না হয় তবে দ্বীনী দৃষ্টিকোণ হতে তার আভিজাত্য ও নবীর নিকটাত্মীয় হওয়ার কোন মূল্য নেই। ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে। যার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হয়েছে সে পর হলেও আপনজন। অন্যথায় আপন আত্মীয় হলেও সে পর। দ্বীনী ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয়তার লক্ষ্য রাখা হতো তাহলে ভাইয়ের উপর ভাই কখনো তলোয়ার চালাতো না। বদর ওহুদ ও আহযাবের লড়াই তো একই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। যাতে করে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা বংশ, বর্ণ, ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে না, বরং ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে। তারা যে কোন বংশের, যে কোন গোত্রের, যে কোন বর্ণের, যে কোন দেশের, যে কোন ভাষাভাষী হোক না কেন সবাই মিলে এক জাতি একই ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। তাই আল্লাহ্‌র বাণী "সকল মুসলিম ভাই ভাই" [সূরা হুজুরাতঃ১০] আয়াতের এটাই মর্মকথা। অপরদিকে যারা ঈমান ও সৎকর্মশীলতা হতে বঞ্চিত, তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয়।

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۗ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٤٨

৪৮. বলা হল, 'হে নূহ্! অবতরণ করুন আমাদের পক্ষ থেকে শান্তি ও কল্যাণসহ এবং আপনার প্রতি ও যে সব সম্প্রদায় আপনার সাথে রয়েছে তাদের প্রতি; আর কিছু সম্প্রদায় রয়েছে আমরা তাদেরকে জীবন উপভোগ করতে দেব, পরে আমাদের পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে[১];

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝٤٩

৪৯. 'এসব গায়েবের সংবাদ আমরা আপনাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি, যা এর আগে আপনি জানতেন না এবং আপনার সম্প্রদায়ও জানত না। কাজেই আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য[২]।'

---

(১) এখানে আদ জাতি এবং তাদের কাছে হূদ আলাইহিসসালামের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা কিছু দিন দুনিয়ার নে'আমত ভোগ করার পর আবার অবাধ্যতার কারণে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল। অনুরূপভাবে পরবর্তী প্রত্যেক নবী ও তাদের জাতি যেমন সালেহ ও সামূদ জাতিও এ আয়াতে উল্লেখিত সম্প্রদায় বলে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, নূহ আলাইহিসসালামের সন্তানগণ যেহেতু পরবর্তী যাবতীয় সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ তাই পরবর্তী সময়ে যারাই শির্ক ও অন্যায় করেছে এবং তাদের কাছে প্রেরিত নবীদের বিরোধিতা করে আল্লাহ্‌র শাস্তির হকদার হয়েছে, তাদের সবাইকে এ আয়াতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের কল্যাণকর পরিণাম তো যারা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে, তাঁর ফরযকৃত বিষয়সমূহ আদায় করে, অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে তাদেরই জন্য। তারাই আখেরাতে যাবতীয় নে'আমত পেয়ে সফল হবে। দুনিয়াতেও তারা তাদের চাওয়া বিষয়াদি প্রাপ্ত হবে। যেভাবে শেষ পর্যন্ত নূহ ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা আল্লাহর নির্দেশ মানার মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করে দুনিয়াতে সফলতা লাভ করেছিলেন এবং ধ্বংস থেকে নাজাত পেয়েছিলেন। আখেরাতে তাদেরকে আল্লাহ্ যা দিবার দিলেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। আর যারা মিথ্যারোপ করেছিল তাদেরকে ডুবিয়েছিলেন এবং তাদের সবাইকে ধ্বংস করেছিলেন। [তাবারী] ঠিক তেমনি আপনি ও আপনার সাথীরাও সাফল্য লাভ করবেন এবং আপনাদেরও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

পঞ্চম রুকূ'

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. 'আর আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম[১] তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যা রটনাকারী[২]।

يَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

৫১. 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক আছে তাঁরই কাছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না[৩]?

---

(১) সূরা হূদের ৫০ হতে ৬০ পর্যন্ত ১১ আয়াতে বিশিষ্ট নবী হূদ আলাইহিসসালামের আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নামেই সূরার নামকরণ হয়েছে। এ সূরার মধ্যে নূহ আলাইহিসসালাম হতে মূসা আলাইহিসসালাম পর্যন্ত সাত জন আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুসসালাম ও তাদের উম্মতগণের কাহিনী কুরআন পাকের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে উপদেশ ও শিক্ষামূলক এমন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে যা যে কোন অনুভূতিশীল মানুষের অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া ঈমান ও সৎকর্মের বহু মূলনীতি এবং উত্তম পথনির্দেশ রয়েছে। যদিও এ সূরার মধ্যে সাত জন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সূরার নামকরণ করা হয়েছে হূদ আলাইহিস সালাম এর নামে। যাতে বোঝা যায় যে এখানে হূদ এর ঘটনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ অন্যান্য যেসব মাবুদদের তোমরা বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করো তারা আসলে কোন ধরনের প্রভুত্বের গুণাবলী ও শক্তির অধিকারী নয়। বন্দেগী ও পূজা লাভের কোন অধিকারই তাদের নেই। তোমরা অযথাই তাদেরকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছো। তারা তোমাদের আশা পূরণ করবে এ আশা নিয়ে বৃথাই বসে আছো। তোমরা আল্লাহকে ছাড়া অন্য ইলাহ গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যাচারই করে যাচ্ছ। তিনি ছাড়া তো কোন সত্যিকার ইলাহ নেই [তাবারী; কুরতুবী; সা'দী]

(৩) অর্থাৎ তোমরা কি বিবেক বুদ্ধি খাটাবে না যে, আমি যে দিকে আহ্বান করছি তা ভেবে দেখা দরকার এবং তা কবুল করার অধিক উপযোগী, একে বাদ দেয়ার কোন বাঁধা নেই। [সা'দী]

৫২. 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁর দিকেই ফিরে আস। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন। আর তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না[১]।'

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. তারা বলল, 'হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসনি[২],

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ

(১) আল্লাহ পাক হূদ আলাইহিসসালামকে আদ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। দৈহিক আকার আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে 'আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। [সা'দী] হূদ আলাইহিসসালামও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তিনি তাদেরকে মৌলিকভাবে তিনটি দাওয়াত দিয়েছিলেন। এক. তাওহীদ বা একত্ববাদের আহ্বান এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তা বা শক্তিকে ইবাদত উপাসনা না করার আহ্বান। দুই. তিনি যে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, তাতে তিনি একজন খালেস কল্যাণকামী, এর জন্য তিনি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চান না। তিন. নিজেদের অতীত জীবনে কুফরী শির্কী ইত্যাদি যত গোনাহ করেছ সেসব থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐসব গোনাহ হতে তওবা কর। যদি তোমরা সত্যিকার তাওবা ও এস্তেগফার করতে পার তবে তার বদৌলতে আখেরাতের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই। দুনিয়াতেও এর বহু উপকারিতা দেখতে পাবে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে যার ফলে তোমাদের আহার্য পানীয়ের প্রাচুর্য হবে, তোমাদের শক্তি সামর্থ্য বর্ধিত হবে। এখানে 'শক্তি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধন বল ও জনবল সবই অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] এর দ্বারা আরো জানা গেল যে তওবা ও এস্তেগফারের বদৌলতে দুনিয়াতেও ধন সম্পদ এবং সন্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

(২) অর্থাৎ আপনি আপনার দাবীর স্বপক্ষে এমন কোন দ্ব্যর্থহীন আলামত অথবা কোন সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে আসেননি যার ভিত্তিতে আমরা নিসংশয়ে জানতে পারি যে, আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন এবং যে কথা আপনি পেশ করছেন তা সত্য। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] এখানে যদি কাফেররা তাদের পক্ষ থেকে দাবীকৃত কোন সুনির্দিষ্ট দলীল-প্রমাণের কথা বলে থাকে তবে সেটাই আনতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।

بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ وَمَا نَحۡنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِينَ ۝٥٣

তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগকারী নই এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীও নই ।

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٖۗ قَالَ إِنِّيٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ۝٥٤

৫৪. 'আমরা তো এটাই বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে(১) ।' তিনি

বরং নবী-রাসূলগণ এমন নিদর্শন নিয়ে আসেন যা দেখে তাদের দাবীর সত্যতা ও বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় । আর যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় এটা যে, তিনি তাদের কাছে এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসেননি যা তার কথার সত্যতার প্রমাণ বহন করবে, তবে তারা মিথ্যা বলেছে । কেননা, প্রত্যেক নবীকেই তার কাওমের কাছে এমন কিছু নিদর্শন দিয়ে পাঠানো হয় যা দেখে কিছু লোক ঈমান আনে । এমনকি যদি তিনি একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য দ্বীনকে নির্দিষ্ট করা, তাঁর কোন শরীক না করা, প্রতিটি ভাল কাজ ও সুন্দর চরিত্রের প্রতি নির্দেশ প্রদান, প্রত্যেক খারাপ কাজ যেমন আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক, অশ্লীলতা, যুলুম, অন্যায় কাজ কর্ম থেকে নিষেধকরণ, তাছাড়া হূদ আলাইহিসসালাম সে সমস্ত অনন্য গুণাবলীর অধিকারী হওয়া, যা কেবল ভাল ও সত্যনিষ্ঠ মানুষদেরই গুণ হয়ে থাকে, এগুলো ছাড়া আর কোন নিদর্শন না এনে থাকেন তাও তার সত্যবাদিতার জন্য নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট । বরং বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে অলৌকিক কিছুর চেয়েও এগুলো বেশী প্রমাণবহ । মু'জিযার মত কিছুর চেয়ে এগুলোর দাবী বেশী । তাছাড়া একজন লোক, যার কোন সাহায্য-সহযোগিতাকারী নেই, অথচ সে তার কাওমের মধ্যে চিৎকার করে আহ্বান করছে, তাদেরকে ডাকছে, তাদেরকে অপারগ করে দিচ্ছে এটা অবশ্যই তার সত্যতার উপর স্পষ্ট নিদর্শন । তিনি তাদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন যে, "নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা শরীক কর, 'আল্লাহ্ ছাড়া । সুতরাং তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর; তারপর আমাকে অবকাশ দিও না ।" এটা তাদের সামনে ঘোষণা করছেন, যারা তার শত্রু, যাদের রয়েছে প্রচুর ক্ষমতা ও প্রভাব । তারা চাচ্ছে যে কোনভাবে হোক তার কাছে যে আলো আছে সেটা নিভিয়ে দিতে, অথচ তিনি তাদের কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করে, তাদের শক্তি-সামর্থ্যকে গুরুত্ব না দিয়ে এ ঘোষণা দিয়েই চলেছেন । আর তারা তার কোন ক্ষতি করতে অপারগ হয়ে থাকল, এতে অবশ্যই বিবেকবান-জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে । [সা'দী; ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারেজুস সালেকীন: ৩/৪৩১]

(১) হূদ আলাইহিসসালামের আহ্বানের জবাবে তার দেশবাসী মুর্খতা সুলভ উত্তর দিল যে, আপনি তো আমাদেরকে কোন মু'জিযা দেখালেন না । শুধু মুখের কথায় আমরা নিজেদের বাপ দাদার আমলের উপাস্য দেব-দেবীগুলোকে বর্জন করবো না এবং

বললেন, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা শরীক কর[১],

---

আপনার প্রতি ঈমানও আনব না। বরং সন্দেহ করছি যে আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। তাই আপনি এমন অসংলগ্ন কথা বলেছেন। অর্থাৎ আপনি কোন দেবদেবী, বা কোন মহাপুরুষের আস্তানায় গিয়ে কিছু বেয়াদবী করেছেন, যার ফল এখন আপনি ভোগ করছেন। এতে বুঝা গেল যে, তারা এক ধরনের অজানা ভয় করছিল – যা এক ধরনের শির্ক। সুবহানাল্লাহ! কিভাবে তারা এতবড় একজন বিবেকবান মানুষকে বিবেকহীন বলে অপবাদ দিলো। যদি আল্লাহ্ বর্ণনা না করতেন তবে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের নিঃস্বার্থ ও ভালো লোকের ব্যাপারে এ কথা বলা অত্যন্ত বেমানান। কিন্তু হূদ আলাইহিস সালাম সম্পূর্ণভাবে নিজেকে এর থেকে বিমুক্ত ঘোষণা করেছেন এভাবে যে, এ ব্যাপারে আমার ভরসা আছে যে আমাকে কোন কিছু পেয়ে বসে নি। আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি আর তোমরাও সাক্ষী থেকো যে, আমি তোমাদের শরীকদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। [সা'দী] বর্তমানে অনেক মানুষ তাদের পীর বা কবরের মানত বন্ধ করলে বা তাদের কবর পুজার বিরোধিতা করলে কোন কারণে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন এ ধরনের কথা বলে থাকে। তারা বলে যে, অমুক লোককে অমুক পীরের বদদো'আয় ধরেছে। অমুক কবরের শাপে অমুক ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে শির্ক। এটাকেই বলা হয়, ভয়ের মাধ্যমে শির্ক করা। এ ধরনের অজানা ভয়ই বর্তমানে অধিকাংশ শির্কের কারণ।

(১) অর্থাৎ তাদের কথার উত্তরে হূদ আলাইহিসসালাম নবীসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমরা যদি আমার কথা না মান তবে শোন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাস্যদের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ। এখন তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের এবং আমার উপর আক্রমনের চেষ্টা করে দেখ আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না। এত বড় কথা আমি এজন্য বলছি যে আমি আল্লাহর তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি; যিনি আমার এবং তোমাদের একমাত্র পালনকর্তা। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা সরল পথে রয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর যাবতীয় ফয়সালা, তাকদীর, তাঁর যাবতীয় শরী'আত ও নির্দেশ, তাঁর সমস্ত প্রতিদান প্রদান, সওয়াব দান এবং শাস্তি প্রদানে ন্যায়, ইনসাফ, প্রজ্ঞা ও প্রশংসাপূর্ণ পথেই রয়েছেন। তার কোন কাজ তাকে প্রশংসাপূর্ণ সেই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে না। [সা'দী]

সমগ্র জাতির মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান ধারণায় আঘাত হানা সত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী

৫৫. ‘আল্লাহ্ ছাড়া। সুতরাং তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর; তারপর আমাকে অবকাশ দিও না[১]।

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٥٥﴾

৫৬. আমি তো নির্ভর করি আমার ও তোমাদের রব আল্লাহ্‌র উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়[২]; নিশ্চয় আমার রব আছেন সরল পথে[৩]।

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ ۢبِنَاصِيَتِهَا ۚ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾

জাতির মধ্যে কেউ তার একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল না। আসলে এটা হূদ আলাইহিস্‌সালামের একটি মু‘জিযা। এর দ্বারা একে তো তাদের এ কথার জবাব দেয়া হয়েছে যে, আপনি কোন মু‘জিযা প্রদর্শন করেননি। দ্বিতীয়তঃ তারা যে বলত তাদের কোন কোন দেব-দেবী আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত করে দিয়েছে তাও বাতিল করা হল। কারণ দেব-দেবীর যদি কোন ক্ষমতা থাকত তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা তাকে জীবিত রাখত না।

(১) তারা যে কথা বলে আসছিল যে, আপনার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই –এর জবাবেই একথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ আমার এ সিদ্ধান্তও শুনে রাখো, আমি তোমাদের এসব উপাস্যের প্রতি চরমভাবে বিরূপ ও অসন্তুষ্ট।

(২) পূর্বোক্ত বাক্যে তাদের দাবী ‘আপনার ওপর আমাদের কোন দেবতার অভিশাপ পড়েছে’ –তাদের এ বক্তব্যের জবাবেই একথা বলা হয়েছে। এর অর্থ প্রতিটি সৃষ্টিই তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন। আরবরা ‘ললাটের চুল’ কারো হাতে থাকা বলে কর্তৃত্ব থাকার কথা বুঝায় [তাবারী; মুয়াসসার] তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেটাকে ঘুরান, যেখান থেকে ইচ্ছা নিষেধ করেন। কেননা কেউ কারো ললাটের চুল ধরে ফেললে সে তার কর্তৃত্বাধীন হয়ে যায়। তাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ঘুরাতে পারে। [কুরতুবী] সুতরাং তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। [কুরতুবী] অর্থাৎ সমস্ত জীব-জন্তুই যেহেতু তাঁর পূর্ণ কব্জায় সেহেতু তারা কিভাবে মুমিনের প্রতি কুদৃষ্টি বা অভিশাপ দিতে পারে? যারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ই দেখা-শুনা করবেন। এটাই তো স্বাভাবিক। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে এর অর্থ, তাঁর মুঠিতেই সমস্ত সৃষ্টিজীবের ভাগ্য নিহিত। [কুরতুবী] এ ব্যাপারে আরো দেখুন সূরা ইউনূস ৭১ আয়াত।

(৩) অর্থাৎ তিনি যা কিছু করেন ঠিকই করেন। তাঁর প্রত্যেকটি কাজই সহজ সরল। তিনি পূর্ণসত্য ও ন্যায়ের মাধ্যমে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব করে যাচ্ছেন। তুমি পথ ভ্রষ্ট ও অসৎকর্মশীল হবে এবং তারপরও আখেরাতে সফলকাম হবে আর আমি

৫৭. 'অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যা সহ তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি, আমি তো তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি; এবং আমার রব তোমাদের থেকে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না[১]। নিশ্চয় আমার রব সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।'

فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾

৫৮. আর যখন আমাদের নির্দেশ আসল তখন আমরা হূদ ও তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

সত্য-সরল পথে চলবো ও সৎকর্মশীল হবো এবং তারপরও ক্ষতিগ্রস্ত ও অসফল হবো, এটা কোনক্রমেই সম্ভবপর হতে পারে না। তিনি যে সমস্ত নির্দেশ দেন তা তাদের প্রতি দয়াবশত: প্রদান করেন। তাদের প্রয়োজন পূরণার্থে, তাঁর নিজের কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। তিনি দয়া-দাক্ষিন্য, ইহসান ও রহমতের নিমিত্তে তাদেরকে সেগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নিজের কোন প্রয়োজনে তা করেন নি। বান্দারা তাঁর কাছে কিছু পাবে সে হিসেবে তিনি দিচ্ছেন ব্যাপারটি এরকম নয়। বরং সম্পূর্ণরূপে ন্যায়, ইনসাফ, হিকমত ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যাকে যা দেবার তিনি দেবেন [ইবনুল কাইয়্যেম, মিফতাহু দারুস সা'আদাহ: ২/৭৯; মাদারেজুস সালেকীন, ৩/৪২৫]

(১) 'আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনছিনা' তাদের একথার জবাবে এ উক্তি করা হয়েছে। হূদ আলাইহিসসালাম বললেন, তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক তবে জেনে রাখ যে পায়গাম পৌছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। অতএব তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব ও গযব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর আমার রব তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদ করাবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি করছ না। আমার পালনকর্তা সবকিছু লক্ষ্য রাখেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপের তিনি খবর রাখেন।

করলাম তাদেরকে কঠিন শাস্তি হতে(১) ।

৫৯. আর এ ‘আদ জাতি তাদের রবের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল এবং অমান্য করেছিল তাঁর রাসূলগণকে(২) এবং তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করেছিল ।

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾

৬০. আর এ দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল লা‘নতগ্রস্ত এবং লা‘নতগ্রস্ত হবে তারা কিয়ামতের দিনেও । জেনে রাখ! ‘আদ সম্প্রদায় তো তাদের রবকে অস্বীকার করেছিল । জেনে রাখ! ধ্বংসই হচ্ছে হূদের সম্প্রদায় ‘আদের পরিণাম(৩) ।

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾

(১) কিন্তু হতভাগা দল হূদ আলাইহিস সালাম এর কোন কথায় কর্ণপাত করল না । তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল । অবশেষে প্রচন্ড ঝড় তুফান রূপে আল্লাহর আযাব নেমে এল । সাত দিন আট রাত যাবত অনবরত ঝড় তুফান বইতে লাগল । বাড়ী ঘর ধ্বসে গেল, গাছ পালা উপড়ে পড়ল, গৃহ ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূণ্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে নিক্ষিপ্ত হল, এভাবেই সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পুর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল । ‘আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আযাব নাযিল হয় তখন আল্লাহ তা‘আলা তার চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হূদ আলাইহিস সালাম ও সঙ্গী ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আযাব হতে রক্ষা করেন ।

(২) তাদের কাছে মাত্র একজন রাসূলই এসেছিলেন । কিন্তু যেহেতু তিনি তাদেরকে এমন এক বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন যে দাওয়াত সবসময় সব যুগে ও সকল জাতির মধ্যে আল্লাহর নবীগণ পেশ করতে থেকেছেন, তাই এক রাসূলের কথা না মানাকে সকল রাসূলের প্রতি নাফরমানী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে ।

(৩) ‘আদ জাতির কাহিনী ও আযাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর আপরাপর লোকদের শিক্ষা ও সতর্কীকরণের জন্য এরশাদ করেছেন যে কাওমে ‘আদ আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর রাসূলগণকে অমান্য করেছে, হঠকারী পাপিষ্ঠদের কাজ করেছে । যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে এবং আখেরাতে অভিশপ্ত আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে ।

ষষ্ঠ রুকূ’

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

৬১. আর আমি সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম[১]। তিনি বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন[২]।

---

(১) ৬১ থেকে ৬৮ পর্যন্ত ৮ আয়াতে সালেহ আলাইহিসসালামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যিনি ‘আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা ‘কাওমে সামূদ’ এর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি তার কাওমকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাখান করে বলল “এ পাহাড়ের প্রস্তরখন্ড থেকে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারেন তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাজী আছি? সালেহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মোতাবেক মু‘জিযা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ঈমান আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর তাহলে কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আযাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপরও তারা নিজেদের হঠকারিতা থেকে বিরত হল না। আল্লাহ তা‘আলার তাঁর অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মোতাবেক মু‘জিযা প্রকাশ করলেন। বিশাল প্রস্তরখন্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কথিত গুণাবলী সম্পন্ন উষ্ট্রী আত্মপ্রকাশ করল। আল্লাহ তা‘আলা হুকুম দিলেন যে, এ উষ্ট্রীকে কেউ যেন কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা হয় তবে তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল, উষ্ট্রীকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ তা‘আলা কঠোরভাবে তাদেরকে পাকড়াও করলেন। সালেহ আলাইহিসসালাম ও তার সঙ্গী ঈমানদারগণ নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হল।

(২) প্রথম বাক্যাংশে যে দাবী করা হয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, এটি হচ্ছে সেই দাবীর সপক্ষে যুক্তি। মুশরিকরা নিজেরাও স্বীকার করতো যে, আল্লাহই তাদের স্রষ্টা। এ স্বীকৃত সত্যের ওপর যুক্তির ভিত্তি করে সালেহ আলাইহিস্‌সালাম তাদেরকে বুঝান, পৃথিবীর নিষ্প্রাণ উপাদানের সংমিশ্রণে যখন আল্লাহই তোমাদের অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদমকে এ পার্থিব অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তিনিই যখন এ পৃথিবীর বুকে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করেছেন, তখন তিনি ছাড়া আর কে বন্দেগী লাভের অধিকার পেতে পারে? সুতরাং তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না [সা‘দী]

কাজেই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর আর তাঁর দিকেই ফিরে আস। নিশ্চয় আমার রব খুব কাছেই, ডাকে সাড়া প্রদানকারী(১)।'

৬২. তারা বলল, 'হে সালেহ্! এর আগে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল(২)।

قَالُوا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَآ

(১) অর্থাৎ তিনি তাঁর অতি নিকটে যে তাঁকে কোন কিছু চাওয়ার জন্য ডাকে, বা তার ইবাদতের মাধ্যমে তাঁকে আহ্বান করে। তিনি তার ডাকে সাড়াও দেন। প্রার্থিত বিষয় তাকে দান করেন, ইবাদত কবুল করেন, সাওয়াব দেন পূর্ণরূপে। এখানে জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য দু'ধরনের, এক. ব্যাপক, দুই. বিশেষ। ব্যাপক নৈকট্য হচ্ছে, তিনি তাঁর জ্ঞানে সবার নিকটে, সমস্ত সৃষ্টি জগত সে হিসেবে তার নিকটে। আর এটাই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, "আর আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর" [সূরা কাফ: ১৬] আর বিশেষ নৈকট্য হচ্ছে, তিনি তার ইবাদতকারী, যাচঞাকারী, যারা তাকে ভালবাসে তাদের নিকটে থাকেন। আর এ নৈকট্য সম্পর্কে অন্যত্রও তিনি বলেছেন, "আর সিজ্‌দা করুন এবং আমার নিকটবর্তী হোন" [সূরা আল-আলাক:১৯] অনুরূপ সূরা হূদের আলোচ্য আয়াত। তাছাড়া আরও এসেছে, "আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৬] এ ধরনের নৈকট্য এমন যে, আল্লাহ্‌র বিশেষ দয়া, দো'আ কবুল হওয়া, উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া এর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এজন্যই এ আয়াতের শেষে 'মুজীব' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। [সা'দী; ইবন তাইমিয়্যা, মাজমু' ফাতাওয়া: ৫/৪৯৩]

(২) অর্থাৎ "তাওহীদের দাওয়াত ও প্রতিমা পুজা থেকে আমাদের বারণ করার আগ পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আমাদের উচ্চাশা ছিল যে, আপনি আগামীতে আমাদের নেতৃত্ব দান করবেন।" [কুরতুবী] তারা এটাই বলতে চাচ্ছিল যে, আপনার বুদ্ধিমত্তা, বিচারবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, গাম্ভীর্য ও মর্যাদাশালী ব্যক্তিত্ব দেখে আমরা আশা করেছিলাম আপনি ভবিষ্যতে একজন বিরাট নামীদামী ব্যক্তি হবেন। একদিকে যেমন বিপুল বৈষয়িক ঐশ্বর্যের অধিকারী হবেন তেমনি অন্যদিকে আমরাও অন্য জাতি ও গোত্রের মোকাবিলায় আপনার প্রতিভা ও যোগ্যতা থেকে লাভবান হবার সুযোগ পাবো। কিন্তু আপনি এ তাওহীদ ও আখেরাতের নতুন ধূয়া তুলে আমাদের সমস্ত আশা-আকাংখা বরবাদ করে দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বাল্যকাল হতেই নবীগণকে যোগ্যতা ও উন্নত স্বভাব চরিত্রের অধিকারী করে থাকেন। যার

أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছ ‘ইবাদাত করতে তাদের, যাদের ‘ইবাদাত করত আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা?[১] নিশ্চয় আমরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি সে বিষয়ে, যার প্রতি তুমি আমাদেরকে ডাকছ।’

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

৬৩. তিনি বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে জানাও, আমি যদি আমার রব প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি

ফলে সবাই তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো। কিন্তু নবুওয়াতের দাবী ও মুর্তি পুজা থেকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেসব লোক তার বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করেছিল। তাদের প্রত্যাশার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে যখন তিনি তাওহীদ ও আখেরাত এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর দাওয়াত দিতে থাকলেন তখন তারা তাঁর ব্যাপারে কেবল নিরাশই হলো না বরং তাঁর প্রতি হয়ে উঠলো অসন্তুষ্ট। তারা বলতে লাগলো, বেশ ভালো কাজের লোকটি ছিল কিন্তু কি জানি তাকে কি পাগলামিতে পেয়ে বসলো, নিজের জীবনটাও বরবাদ করলো এবং আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাও ধূলায় মিশিয়ে দিল। [দেখুন, তাবারী; সা'দী] আররের মুশরিকরাও অনুরূপ করেছিল। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের কথা ঘোষণা করার পূর্বে সমগ্র আরববাসী তাকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করত এবং ‘আল-আমীন’ উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু যখনই তিনি এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানালেন তখনই তারা বিরোধিতা করতে লাগল।

(১) সালেহ আলাইহিস্‌সালাম বলেছিলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত মাবুদ নেই এবং এর যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে বসবাস করিয়েছেন। এর জবাবে এ মুশরিকরা বলছে, এদের ইবাদাতও পরিত্যাগ করা যেতে পারে না। কারণ বাপ-দাদাদের আমল থেকে এদের ইবাদাত হতে চলে আসছে। তাছাড়া আপনি আমাদেরকে যে দিকে আহ্বান করছেন সেটা নিয়ে আমরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে আছি। তারা যেন এটা বুঝাতে চাচ্ছে যে, যদি আমরা আপনার কথার সত্যতা জানতে পারতাম তবে অবশ্যই আপনার অনুসরণ করতাম। এটা অবশ্যই তাদের মিথ্যা কথা। কারণ, পরবর্তী আয়াতে সালেহ আলাইহিস সালাম তাদের কাছে বিষয়টি আরও খোলাসা করে বর্ণনা করেছেন। আসলে তারা এ সমস্ত মিথ্যাচার করেই যাচ্ছিল। [সা'দী]

আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ[১] দান করে থাকেন, তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে, আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই? কাজেই তোমরা তো শুধু আমার ক্ষতিই বাড়িয়ে দিচ্ছ[২] ।

৬৪. ‘হে আমার সম্প্রদায়! এটা আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ । সুতরাং এটাকে আল্লাহ্‌র জমিতে চরে খেতে দাও । এটাকে কোন কষ্ট দিও না, কষ্ট দিলে আশু শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে ।’

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾

৬৫. কিন্তু তারা এটাকে হত্যা করল । তাই তিনি বললেন, ‘তোমরা তোমাদের ঘরে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও । এটা এমন এক প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবার নয়[৩] ।’

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ۗ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾

৬৬. অতঃপর যখন আমাদের নির্দেশ

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

(১) অর্থাৎ আমি আমার দাবীর ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর আছি । আর আমাকে আমার রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দেয়া হয়েছে । তা হচ্ছে নবুওয়াত ও রিসালাত । [সা‘দী]

(২) অর্থাৎ যদি আমি আমার কাছে আসা স্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে এবং আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন সেই জ্ঞানের বিরুদ্ধে নিছক তোমাদের খুশী করার জন্য গোমরাহীর পথ অবলম্বন করি তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমরা আমাকে বাঁচাতে পারবে না । আমি যদি তোমাদেরকে হক ও একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে দাওয়াত না দেই, তবে তোমরা এর দ্বারা আমার কোন উপকার করতে পারবে না । [ইবন কাসীর] বরং এভাবে তোমরা তো আমাকে কল্যাণের পথ থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিবে এবং অনিষ্টতাই বৃদ্ধি করবে । [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ তারা যখন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে উষ্ট্রীকে হত্যা করল তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হল যে, মাত্র তিন দিন তোমাদিগকে অবকাশ দেয়া হল এ তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে । আর সেটা ঘটবেই । [মুয়াসসার]

بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

আসল তখন আমরা সালেহ্ ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা করলাম সে দিনের লাঞ্ছনা হতে। নিশ্চয় আপনার রব, তিনি শক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. আর যারা যুলুম করেছিল বিকট চীৎকার তাদেরকে পাকড়াও করল; ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল(১);

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾

৬৮. যেন তারা সেখানে কখনো বসবাস করেনি। জেনে রাখ! সামূদ সম্প্রদায় তো তাদের রবের সাথে কুফরী করেছিল। জেনে রাখ! ধ্বংসই হল সামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।

সপ্তম রুকূ'

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর অবশ্যই আমাদের ফিরিশ্‌তাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্‌রাহীমের কাছে এসেছিল(২)। তারা বলল, 'সালাম।'

(১) অর্থাৎ ঐ পাপিষ্ঠদেরকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন এসে পাকড়াও করল। এ ছিল জিবরীল আলাইহিস সালামের গর্জন, যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ বা কোন জীবজন্তুর নেই। এরূপ প্রাণ কাঁপানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, 'কাওমে সামূদ' ভয়ঙ্কর গর্জনে ধ্বংস হয়েছিল। অপর দিকে সূরা আ'রাফ এর ৭৮ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, "অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল"। এতে বোঝা যায় যে ভূমিকম্পের ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। মুফাসসিরগণ বলেনঃ উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোন বিরোধ নেই। হয়ত প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল। এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধ্বংস হয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে ইবরাহীম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামের একটি ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেয়ার জন্য তার কাছে কতিপয় ফেরেশ্‌তাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা ইবরাহীম আলাইহিসসালামের স্ত্রী সারা

তিনিও বললেন, 'সালাম[1] ।' অতঃপর

নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য একান্ত উদগ্রীব ছিলেন কিন্তু উভয়ে বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যতঃ সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তারা অচিরেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন। তার নামকরণ করা হল ইসহাক। আরো অবহিত করা হল যে, ইসহাক আলাইহিসসালাম দীর্ঘজীবি হবেন, সন্তান লাভ করবেন তার সন্তানের নাম হবে 'ইয়াকুব' আলাইহিসসালাম। উভয়ে নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

ফেরেশতাগণ মানবাকৃতিতে আগমন করায় ইবরাহীম আলাইহিসসালাম তাদেরকে সাধারণ আগন্তুক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। ভূনা গোসত সামনে রাখলেন। কিন্তু তারা ছিলেন ফেরেশ্‌তা, পানাহারের উর্ধ্বে। কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তারা সেদিকে হাত বাড়ালেন না। এটা লক্ষ্য করে ইবরাহীম আলাইহিসসালাম আতঙ্কিত হলেন যে, হয়ত এদের মনে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। ফেরেশতাগণ ইব্‌রাহীম আলাইহিসসালামের অমূলক আশঙ্কা আন্দাজ করে তা দূর করার জন্য স্পষ্টভাবে জানালেন যে "আপনি শঙ্কিত হবেন না।" আমরা আল্লাহর ফেরেশ্‌তা। আপনাকে একটি সুসংবাদ দান করে ও অন্য একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি। তা হচ্ছে লুত আলাইহিসসালামের কাওমের উপর আযাব নাযিল করা। ইবরাহীম আলাইহিসসালামের স্ত্রী 'সারা' পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিলেন। বৃদ্ধকালে সন্তান লাভের সুখবর শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন এহেন বৃদ্ধ বয়সে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে। আর আমার এ স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন তুমি আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করছ? তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। তোমাদের পরিবারের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রভূত রহমত এবং অফুরন্ত বরকত রয়েছে।

(১) আলোচ্য আয়াত থেকে ইসলামী আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় গুরত্বপূর্ণ হেদায়াত পাওয়া যায়ঃ

তারা সালাম বললেন, তিনি বললেনঃ সালাম।" এ দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলিমদের পারস্পারিক সাক্ষাৎ মোলাকাতের সময় পরস্পরকে সালাম করা কর্তব্য। আরো জানা গেল যে, আগন্তুক ব্যক্তি কথা বলার আগেই প্রথমে সালাম করবে। [সা'দী]

পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের বিশেষ কোন বাক্য উচ্চারণ করে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার রীতি পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষা অনন্য ও সর্বোত্তম। কেননা, সালামের সুন্নাত সম্মত বাক্য السلام عليكم। এখানে সর্বপ্রথম 'আসসালাম' আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম হওয়ার কারণে আল্লাহর যিকির করা হল, সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য সালামতি ও নিরাপত্তার দো'আ করা হল, নিজের পক্ষ হতে জান মাল ইজ্জতের নিরাপত্তার

বিলম্ব না করে তিনি এক কাবাবকৃত বাছূর নিয়ে আসলেন।

৭০. অতঃপর তিনি যখন দেখলেন তাদের হাত সেটার দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করলেন এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতি সঞ্চার হল[১]। তারা বলল, 'ভয় করবেন না, আমরা তো

فَلَمَّا رَاٰۤ اَيۡدِيَهُمۡ لَا تَصِلُ اِلَيۡهِ نَكِرَهُمۡ وَاَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيۡفَةً ؕ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ اِنَّاۤ اُرۡسِلۡنَاۤ اِلٰى قَوۡمِ لُوۡطٍ ؕ

প্রতিশ্রুতি দেয়া হল। এর দ্বারা আরও প্রমাণিত হলো যে, সালাম দেয়ার এ নীতি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময়েও ছিল। [সা'দী]
এখানে পবিত্র কুরআনে ফেরেশ্‌তাদের পক্ষ হতে 'সালাম' এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তরফ হতে শুধু 'সালাম' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য এখানে উভয়ক্ষেত্রে সুন্নত মোতাবেক সালামের জবাবের পূর্ণ বাক্যই বোঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজের আচরণের মাধ্যমে সালামের পূর্ণ বাক্য শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ 'আসসালামু আলাইকুম' বলবে তদুত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ 'ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলবে। এ আয়াতেও প্রথম সালাম প্রদানের বাক্যটি ক্রিয়ামূলক বাক্য আর তার উত্তরে প্রদত্ত বাক্যটি বিশেষ্যমূলক বাক্য। বিশেষ্যমূলক বাক্য বেশী অর্থবহ। সেজন্য সালামের জওয়াব সালাম থেকেও বেশী থাকতে হয়। [সা'দী]

(১) তাদেরকে ভয় পাবার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি মত আছেঃ
একঃ কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে এ ভয়ের কারণ ছিল এই যে, অপরিচিত নবাগতরা খেতে ইতস্তত করলে তাদের নিয়তের ব্যাপারে ইবরাহীমের মনে সন্দেহ জাগে এবং তারা কোন প্রকার শত্রুতার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে কিনা–এ চিন্তা তাঁর মনকে আতংকিত করে তোলে। কারণ আরব দেশে কোন ব্যক্তি কারোর মেহমানদারীর জন্য আনা খাবার গ্রহণ না করলে মনে করা হতো সে মেহমান হিসেবে নয় বরং হত্যা ও লুটতরাজের উদ্দেশ্যে এসেছে। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]
দুইঃ কথা বলার এ ধরণ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, খাবারের দিকে তাদের হাত এগিয়ে যেতে না দেখে ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা ফেরেশতা। আর যেহেতু ফেরেশতাদের প্রকাশ্যে মানুষের বেশে আসা অস্বাভাবিক অবস্থাতেই হয়ে থাকে, তাই ইবরাহীম মূলত যে বিষয়ে ভীত হয়েছিলেন তা ছিল এই যে, তাঁর পরিবারের সদস্যরা বা তাঁর জনপদের লোকেরা এমন কোন দোষ করে বসেনি তো যে ব্যাপারে পাকড়াও করার জন্য ফেরেশতাদের এই আকৃতিতে পাঠানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾

লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।'

৭১. আর তাঁর স্ত্রী দাঁড়ানো ছিলেন, অতঃপর তিনি হেসে ফেললেন[১]। অতঃপর আমরা তাকে ইস্‌হাকের ও ইস্‌হাকের পরবর্তী ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম[২]।

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۭ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عَجِیْبٌ ﴿٧٢﴾

৭২. তিনি বললেন, 'হায়, কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হব আমি, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এ আমার স্বামী বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার[৩]!'

---

(১) এ থেকে বুঝা যায় ফেরেশতার মানুষের আকৃতিতে আসার খবর শুনেই পরিবারের সবাই পেরেশান হয়ে পড়েছিল। এ খবর শুনে ইবরাহীমের স্ত্রীও ভীত হয়েছিলেন। তারপর যখন তিনি শুনলেন, তাদের গৃহের বা পরিবারের ওপর কোন বিপদ আসছে না। তখনই তার ধড়ে প্রাণ এলো এবং তিনি আনন্দিত হলেন। [বাগভী; কুরতুবী] অথবা তিনি আযাব নাযিল হওয়া এবং কাওমে লূতের গাফিলতির ব্যাপারটি জেনে হেসে দিলেন।[বাগভী] অথবা তিনি হেসেছিলেন সন্তানের সুসংবাদ শোনার পর। তখন অবশ্য আয়াতের শব্দের মধ্যে আগ-পিছ হয়েছে ধরে নিতে হবে। [বাগভী; কুরতুবী] অথবা তিনি ও তার স্বামী উভয়েই মেহমানের খিদমতে নিয়োজিত আছেন তারপরও তারা খাচ্ছেন না, এ কথাটি তিনি হেসে হেসেই বলেছিলেন। [ইবন কাসীর]

(২) ফেরেশতাদের ইবরাহীমের পরিবর্তে তাঁর স্ত্রী সারাকে এ খবর শুনাবার কারণ এই ছিল যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন। তার দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরার গর্ভে সাইয়্যিদিনা ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত সারা ছিলেন সন্তানহীনা। তাই তাঁর মনটিই ছিল বেশী বিষন্ন। তাঁর মনের এ বিষন্নতা দূর করার জন্য তাঁকে শুধু ইসহাকের মতো মহান গৌরবান্বিত পুত্রের জন্মের সুসংবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং এ সংগে এ সুসংবাদও দেন যে, এ পুত্রের পরে আসছে ইয়াকূবের মতো নাতি, যিনি হবেন বিপুল মর্যাদা সম্পন্ন পয়গম্বর। [কুরতুবী]

(৩) ﴿يٰوَيْلَتٰٓى﴾ শব্দটি সাধারণত কোন দুর্ভোগে পড়লে মানুষ ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এর মানে এ নয় যে,সারা এ খবর শুনে যথার্থই খুশী হবার পরিবর্তে উল্টো একে দুর্ভাগ্য মনে করেছিলেন। বরং আসলে এগুলো এমন ধরনের শব্দ ও বাক্য, যা মেয়েরা সাধারণত কোন ব্যাপারে অবাক হয়ে গেলে বলে থাকে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] এ ক্ষেত্রে নিছক বিস্ময় প্রকাশই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

قَالُوٓا۟ أَتَعۡجَبِينَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۖ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٞ مَّجِيدٞ ۝٧٣

৭৩. তারা বলল, ‘আল্লাহ্‌র কাজে আপনি বিস্ময় বোধ করছেন? হে নবী পরিবার! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণ[১]। তিনি তো প্রশংসার যোগ্য ও অত্যন্ত সম্মানিত[২]।’

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنۡ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلرَّوۡعُ وَجَآءَتۡهُ ٱلۡبُشۡرَىٰ يُجَٰدِلُنَا فِي قَوۡمِ لُوطٍ ۝٧٤

৭৪. অতঃপর যখন ইব্‌রাহীমের ভীতি দূরীভূত হল এবং তার কাছে সুসংবাদ আসল তখন তিনি লূতের সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমাদের সাথে বাদানুবাদ করতে লাগলেন[৩]।

---

(১) এর মানে হচ্ছে, যদিও প্রকৃতিগত নিয়ম অনুযায়ী এ বয়সে মানুষের সন্তান হয় না তবুও আল্লাহর কুদরতে এমনটি হওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপারও নয়। আর এ সুসংবাদ যখন তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে তখন তোমার মতো একজন মুমিনা মহিলার পক্ষে এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। [তাবারী; কুরতুবী] মুজাহিদ বলেন, তখন সারার বয়স ছিল ৯৯ বছর। আর ইবরাহীমের বয়স ছিল ১০০ বছর, সে হিসেবে ইবরাহীমের বয়স তার স্ত্রী অপেক্ষা ১ বছর বেশি। [বাগভী; কুরতুবী] ইবন ইসহাক বলেন, তার বয়স ১২০ বছর এবং তার স্ত্রীর ৯০ বছর। এতে আরও মতামত রয়েছে। [বাগভী; কুরতুবী]

(২) বরকত শব্দের অর্থ, বৃদ্ধি ও প্রাচুর্যতা। এখানে যে বরকতের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে পরবর্তী সমস্ত নবী-রাসূল ইবরাহীমের বংশধরদের থেকেই হয়েছে। [কুরতুবী] এ আয়াতে বর্ণিত রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ থেকে ইবন আব্বাস মত নিয়েছেন যে, সালামের সর্বশেষ শব্দ হবে, ‘বারাকাতুহু’ [মুয়াত্তা মালিক: ২/৯৫৯; কুরতুবী]

(৩) ইবরাহীম আলাইহিসসালাম ফেরেশতাদের সাথে কি নিয়ে ঝগড়া করলেন তা অবশ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি। তবে সূরা আল-আনকাবূতের ৩১-৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, “যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ সুসংবাদসহ ইব্‌রাহীমের কাছে আসল, তারা বলেছিল, ‘আমরা এ জনপদবাসীকে ধ্বংস করব, এর অধিবাসীরা তো যালিম।’ ইব্‌রাহীম বললেন, ‘এ জনপদে তো লূত রয়েছে।’ তারা বলল, ‘সেখানে কারা আছে, তা আমরা ভাল জানি, আমরা তো লূতকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই, তাঁর স্ত্রীকে ছাড়া; সে তো পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।’ এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইবরাহীম আলাইহিসসালামের ঝগড়ার বিষয় ছিল যে, যদি কাওমে লূতকে ধ্বংস করা হয় তবে লূতের কি অবস্থা হবে? সে তো মুমিন, তাকে কিভাবে বাঁচানো যায়? তখন ফেরেশ্‌তাগণ ইবরাহীম আলাইহিসসালামকে আশ্বস্ত করলেন যে, আপনার ঘাবড়াবার কারণ নেই। আমরা তাকে ও ঈমানদারদের রক্ষা করবই।

৭৫. নিশ্চয় ইব্‌রাহীম অত্যন্ত সহনশীল, কোমল হৃদয়[১], সর্বদা আল্লাহ্‌ অভিমুখী।

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ ۝٧٥

৭৬. হে ইব্‌রাহীম! আপনি এটা থেকে বিরত হোন[২]; নিশ্চয় আপনার রবের বিধান এসে পড়েছে; আর নিশ্চয় তাদের প্রতি আসবে শাস্তি যা অনিবার্য।

يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَآ ۖ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۝٧٦

৭৭. আর যখন আমাদের প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ লূতের কাছে আসল তখন তাদের আগমনে তিনি বিষণ্ন হলেন এবং নিজকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলেন এবং বললেন, ‘এটা বড়ই বিপদের দিন[৩]!’

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝٧٧

(১) সূরা আত-তাওবার ১১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এর বিস্তারিত আলোচনা চলে গেছে।

(২) অর্থাৎ লূতের কাওমের ব্যাপারে আপনার বিবাদ পরিত্যাগ করুন। [কুরতুবী] কারণ, তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়ে গেছে। [ইবন কাসীর]

(৩) আলোচ্য আয়াতসমূহে লূত আলাইহিসসালাম ও তার দেশবাসীর অবস্থা ও দেশবাসীর উপর কঠিন আযাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। লূত আলাইহিসসালামের কাওম একে তো কাফের ছিল অধিকন্তু এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল যা পূর্বে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়নি, বন্য পশুরাও যা ঘৃনা করে। অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের মৈথুন করা। ব্যাভিচারের চেয়েও ইহা জঘন্য অপরাধ। এ জন্যই তাদের উপর এমন কঠিন আযাব নাযিল হয়েছে যা অন্য কোন অপকর্মকারীদের উপর কখনো নাযিল হয়নি। লূত আলাইহিসসালামের ঘটনা যা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা‘আলা জিবরাঈল আলাইহিসসালাম সহ কতিপয় ফেরেশতাকে কওমে লূতের উপর আযাব নাযিল করার জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে তারা ফিলিস্তীনে প্রথমে ইবরাহীম আলাইহিসসালামের সমীপে উপস্থিত হন। আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন জাতিকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করেন তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আযাবই নাযিল করে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও ফেরেশতাগণকে নওজোয়ানরূপে প্রেরণ করেন। লূত আলাইহিসসালাম ও তাদেরকে মানুষ মনে করে তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ মেহমানের আতিথেয়তা নবীর নৈতিক দায়িত্ব। পক্ষান্তরে

وَجَآءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِى ضَيْفِىٓ ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কাছে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসল এবং আগে থেকেই তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল[১]। তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র[২]।

দেশবাসীর কু-স্বভাব তার অজানা ছিল না। উভয় সংকটে পড়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন "আজেকের দিনটি বড় সংকটময়"। লূত আলাইহিসসালামের স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচারন করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুদর্শন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন লূত আলাইহিসসালামের গৃহে উপনীত হলেন তখন তার স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদের খবর দিল যে আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন করেছেন। [কুরতুবী]

(১) লূত আলাইহিসসালামের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হল। আল্লাহ্ বলেনঃ "তার কওমের লোকেরা আত্মহারা হয়ে তার গৃহপানে ছুটে এল। এর আগে থেকেই তারা কু-কর্মে অভ্যস্ত ছিল"। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জঘন্য কু-কর্মের প্রভাবে তারা এতদূর চরম নির্লজ্জ হয়েছিল যে, লূত আলাইহিসসালামের মত একজন সম্মানিত নবীর গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল।

(২) এ আয়াতে কন্যা বলে কাদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে,

একঃ হতে পারে লূত সমগ্র সম্প্রদায়ের মেয়েদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ নবী তার সম্প্রদায়ের জন্য বাপের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। আর সম্প্রদায়ের মেয়েরা তাঁর দৃষ্টিতে নিজের মেয়ের মতো হয়ে থাকে। প্রত্যেক নবী নিজ উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য এবং উম্মতগণ তার সন্তানস্বরূপ। যেমন কুরআনের সূরা আহযাবের ৬ষ্ঠ আয়াতের সাথে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্বেরাতে وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ বাক্যও বর্ণিত আছে। যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র "উম্মতের পিতা" বলে অভিহিত করা হয়েছে। সে হিসাবে লূত আলাইহিসসালামের কথার অর্থ হল, তোমরা নিজের কদাচার হতে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে কওমের কন্যাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈধভাবে স্ত্রী রূপে ব্যবহার কর। [তাবারী; কুরতুবী]

দুইঃ আবার এও হতে পারে যে, তাঁর ইঙ্গিত ছিল তাঁর নিজের মেয়েদের প্রতি। "এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতর" –একথা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি তাদের কাছে তার মেয়েদের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। লূতের বক্তব্যের পরিষ্কার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ যে জায়েয পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন সেই পদ্ধতিতেই নিজেদের যৌন কামনা পূর্ণ করো এবং এ জন্য মেয়েদের অভাব নেই। [কুরতুবী]

কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন সুবোধ ব্যক্তি নেই?'

৭৯. তারা বলল, 'তুমি তো জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই; আমরা কি চাই তা তো তুমি জানই[১]।'

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِىْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٧٩﴾

৮০. তিনি বললেন, 'তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের[২]!'

قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْۤ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿٨٠﴾

---

(১) এরপর লূত আলাইহিসসালাম তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে বললেন "আল্লাহকে ভয় কর" এবং কাকুতি মিনতি করে বললেন "আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না"। তিনি আরো বললেন "তোমাদের মাঝে কি কোন ন্যায়নিষ্ঠ ভাল মানুষ নেই?" আমার আকুল আবেদনে যার অন্তরে এতটুকু করুণার সৃষ্টি হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে শালীনতা ও মনুষ্যত্বের লেশমাত্রও ছিল না। তারা একযোগে বলে উঠল "আপনি তো জানেনই যে, আপনার বধু কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই । আর আমারা কি চাই তাও আপনি অবশ্যই জানেন"।

(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা লূত আলাইহিসসালামের উপর রহমত করুন। তিনি নিরুপায় হয়ে সুদৃঢ় জামাতের আশ্রয় কামনা করেছিলেন।" [বুখারীঃ ৩৩৮৭, মুসলিমঃ ১৫১] আর তাই লূত আলাইহিসসালামের পরবর্তী প্রত্যেক নবী সম্ভ্রান্ত শক্তিশালী বংশে জন্মগ্রহন করেছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কোরাইশ কাফেরগণ হাজার রকম অপচেষ্টা করেছিল কিন্তু তার হাশেমী গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে তাকে আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে, যদিও ধর্মমতের দিক দিয়ে তাদের অনেকেই ভিন্নমত পোষন করত। এ জন্যই সম্পূর্ন বনি হাশেম গোত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শামিল ছিল। যখন কোরাইশ কাফেররা তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের দানা পানি বন্ধ করে দিয়েছিল।

قَالُوۡا یٰلُوۡطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنۡ یَّصِلُوۡۤا اِلَیۡکَ فَاَسۡرِ بِاَہۡلِکَ بِقِطۡعٍ مِّنَ الَّیۡلِ وَ لَا یَلۡتَفِتۡ مِنۡکُمۡ اَحَدٌ اِلَّا امۡرَاَتَکَ ؕ اِنَّہٗ مُصِیۡبُہَا مَاۤ اَصَابَہُمۡ ؕ اِنَّ مَوۡعِدَہُمُ الصُّبۡحُ ؕ اَلَیۡسَ الصُّبۡحُ بِقَرِیۡبٍ ﴿۸۱﴾

৮১. তারা বলল, 'হে লূত! নিশ্চয় আমরা আপনার রব প্রেরিত ফিরিশ্‌তা। তারা কখনই আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না[১]। কাজেই আপনি রাতের কোন এক সময়ে আপনার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়ুন[২] এবং আপনাদের মধ্যে কেউ পিছন দিকে তাকাবে না, আপনার স্ত্রী ছাড়া[৩]। তাদের

(১) লূত আলাইহিসসালাম এক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলে উঠলেন হায়! আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতাম, অথবা আমার আত্মীয় স্বজন যদি এখানে থাকত যারা এই যালেমদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতো তাহলে কত ভালো হতো। ফেরেশতাগণ লূত আলাইহিসসালামের অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন এবং বললেনঃ আপনি নিশ্চিত থাকুন আপনার দলই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। আমরা মানুষ নই বরং আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশ্‌তা। তারা আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না বরং আযাব নাযিল করে দুরাত্মা দুরাচারদের নিপাত সাধনের জন্যই আমরা আগমন করেছি। তারপরও লূত আলাইহিসসালাম তাদের বাঁধা দিতে থাকলেন। কিন্তু তারা কোন বাঁধাই মানল না। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম বের হয়ে তাদের মুখের উপর তার ডানা দিয়ে এক ঝাপটা মারলেন। আর তাতেই তারা অন্ধ হয়ে গেল। তারা যখন ফিরছিল তারা পথ দেখতে পাচ্ছিল না। [ইবন কাসীর] এ কথাই আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর অবশ্যই তারা লূতের কাছ থেকে তার মেহমানদেরকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করল, তখন আমরা তাদের দৃষ্টি শক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং ভীতির পরিণাম।" [সূরা আল-কামারঃ ৩৭]

(২) তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে লূত আলাইহিসসালামকে বললেন- আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ এখান থেকে অন্যত্র সরে যান এবং সবাইকে সতর্ক করে দিন যে, তাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ, অন্যদের উপর যে আযাব আপতিত হবে, তাকেও সে আযাব ভোগ করতে হবে।

(৩) এর এক অর্থ হতে পারে যে, আপনার স্ত্রীকে সাথে নেবেন না। এ হিসেবে তিনি তাকে সাথে নিয়ে বের হননি। [কুরতুবী] দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না। [কুরতুবী] আরেক অর্থ হতে পারে যে, সে আপনার হুশিয়ারী মেনে চলবে না। সুতরাং সে তাদের সাথে বের হবার পর যখন একটি পাথর পতনের শব্দ শুনে লূতের হুশিয়ারী না মেনে পিছনের দিকে তাকায় এবং বলে উঠে,

যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। নিশ্চয় প্রভাত তাদের জন্য নির্ধারিত সময়। প্রভাত কি খুব কাছাকাছি নয়?'

৮২. অতঃপর যখন আমাদের আদেশ আসল তখন আমরা জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পোড়ামাটির পাথর,

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ۙ﴿۸۲﴾

৮৩. যা আপনার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল[১]। আর এটা যালিমদের থেকে দূরে নয়[২]।

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿۸۳﴾

হায় আমার জাতি! সে তাদের জন্য সমবেদনা জানাচ্ছিল। আর তখনি একটি পাথর এসে তাকে আঘাত করে এবং সে মারা যায়। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] এটি এক মর্মন্তুদ শিক্ষণীয় ঘটনা। এ সূরায় লোকদেরকে একথা শিক্ষা দেবার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন বুযর্গের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং কোন বুযর্গের সুপারিশ তোমাদের নিজেদের গোনাহের পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারে না।

(১) উক্ত আযাবের ধরন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- যখন আযাবের হুকুম কার্যকরী করার সময় হল, তখন আমি তাদের বসতির উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করালাম, যার প্রত্যেকটি পাথর চিহ্নিত ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি পাথরকে কি ধ্বংসাত্মক কাজ করতে হবে এবং কোন্ পাথরটি কোন্ অপরাধীর উপর পড়বে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল। [তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ লূত আলাইহিস সালাম এর নাফরমান জাতির পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য ইরশাদ হয়েছে, পাথর বর্ষণের আযাব বর্তমান কালের যালেমদের থেকেও দূরে নয়। বরং কুরাইশ কাফেরদের জন্য ঘটনাস্থল ও ঘটনাকাল খুবই কাছে এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠরাও যেন নিজেদেরকে এহেন আযাব হতে দূরে মনে না করে। আজ যারা যুলুমের পথে চলছে তারাও যেন এ আযাবকে নিজেদের থেকে দূরে না মনে করে। [ইবন কাসীর] লূতের সম্প্রদায়ের উপর যদি আযাব আসতে পেরে থাকে তাহলে তাদের উপরও আসতে পারে। লূতের সম্প্রদায় আল্লাহর আযাব ঠেকাতে পারেনি, এরাও পারবে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে এসেছে, 'তোমাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা লূতের সম্প্রদায়ের মত কাজ করতে পাবে, তাদের মধ্যে যারা তা করবে এবং যাদের সাথে তা করা হবে তাদের উভয়কে হত্য করবে'। [আবু দাউদ: ৪৪৬২]

অষ্টম রুকূ'

৮৪. আর মাদ্‌ইয়ানবাসীদের[১] কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম[২]। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, আর মাপে ও ওজনে কম করো না; নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে কল্যাণের মধ্যে দেখছি[৩], কিন্তু আমি তোমাদের উপর আশংকা করছি এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তি।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا تَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

৮৫. 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপো ও ওজন করো, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে

وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে শু'আইব আলাইহিসসালাম ও তার কাওমের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। তারা কুফরী ও শেরেকী ছাড়া ওজনে-পরিমাপে লোকদের ঠকাতো। শু'আইব 'আলাইহিসসালাম তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং ওজনে কম-বেশী করতে নিষেধ করলেন। আল্লাহর আযাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও না-ফরমানীর উপর অটল রইল। ফলে এক কঠিন আযাবে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেল।

(২) মাদইয়ান আসলে একটি শহরের নাম। বলা হয়ে থাকে, মাদইয়ান ইবন ইবরাহীম তার পত্তন করেছিলেন। [দেখুন, কুরতুবী] উক্ত শহরের অধিবাসীগণকে মাদইয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু "মাদইয়ান" বলা হত। আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট নবী শু'আইব আলাইহিসসালাম উক্ত মাদইয়ান কওমের সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন তাই তাকে "তাদের ভাই" বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর] এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন, যেন তার সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তার হেদায়াত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

(৩) তোমাদের মধ্যে জীবন-জীবিকা ও রিযকের প্রাচুর্যতা দেখতে পাচ্ছি। তাই আমি ভয় পাচ্ছি যে, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র হারামকৃত জিনিসের সীমালঙ্ঘন কর তাহলে তোমাদের এ নে'আমত আর অবশিষ্ট থাকবে না। তোমাদের থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে। [ইবন কাসীর]

বেড়িও না[১] ।

৮৬. 'যদি তোমরা মুমিন হও তবে আল্লাহ্ অনুমোদিত যা বাকী থাকবে তা তোমাদের জন্য উত্তম; আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই[২] ।'

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيۡكُمۡ بِحَفِيۡظٍ ۝٨٦

(১) এখানে শু'আইব আলাইহিসসালাম নিজ জাতিকে প্রথমে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। কেননা, তারা মুশরিক ছিল। কোন কোন মুফাসসির বলেন, তারা গাছপালার পুজা করত। এজন্যই মাদইয়ানবাসীকে আসহাবুল-আইকা বা জঙ্গলওয়ালা উপাধি দেয়া হয়েছে। আর কোন কোন মুফাসসিরের মতে তাদের বাসস্থানে গাছপালার অবিচ্ছিন্ন ছায়া বিরাজ করছিল বলে তাদেরকে "আসহাবুল আইকাহ" বলা হয়েছে। এহেন কুফরী ও শেরেকীর সাথে সাথে আরেকটি মারাত্মক দোষ ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় কালে ওজন-পরিমাপে হের-ফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করত। শু'আইব আলাইহিস সালাম তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কুফরী ও শেরেকীই সকল পাপের মূল। যে জাতি তাতে লিপ্ত, তাদেরকে প্রথমেই তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়। সাধারণত: ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও কায়-কারবারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী এর প্রমাণ। তবে শুধু দুটি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কুফরীর সাথে সাথে তাদের বদ-আমলেরও দখল ছিল। প্রথম, লূত আলাইহিসসালাম এর জাতি যাদের কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় শু'আইব আলাইহিসসালামের জাতি। যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য কুফরী ও মাপে কম দেয়াকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায় যে, পুংমৈথুন ও মাপে কম দেয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কারণ তা এমন দুটি কাজ যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত হয় এবং সারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

(২) অর্থাৎ ওজন-পরিমাপে হের-ফের করার হীন মানসিকতা দুর করার জন্য শু'আইব আলাইহিসসালাম প্রথমে তার জাতিকে নবীসুলভ স্নেহ ও দরদের সাথে বললেন, বর্তমানে আমি তোমাদের অবস্থা খুব ভাল ও স্বচ্ছল দেখছি। তোমাদের রিযক ও জীবন-জীবিকায় রয়েছে প্রাচুর্য। [ইবন কাসীর] হাসান বসরী বলেন, তাদের জিনিসপত্রের দাম ছিল খুব সস্তা। [কুরতুবী] সুতরাং প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করার মত কোন কারণ দেখি না। তাই আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করার জন্য হলেও তোমাদের পক্ষে তাঁর কোন সৃষ্ট জীবকে ঠকানো উচিত নয়। তোমরা যদি আমার কথা না শোন, আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহর আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে আখেরাতের আযাব

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۭ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿۸۷﴾

৮৭. তারা বলল, ‘হে শু‘আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যার ‘ইবাদাত করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও[১]?

বুঝানো হয়েছে, দুনিয়ার আযাবও হতে পারে, আবার দুনিয়ার আযাব বিভিন্ন প্রকারও হতে পারে। তন্মধ্যে এক আযাব হচ্ছে, তোমাদের স্বচ্ছলতা খতম হয়ে যাবে [ইবন কাসীর] তোমরা অভাবগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে। তোমাদের জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে। [কুরতুবী]

তিনি আরো বললেনঃ মানুষের পাওনা ঠিকমত ওজন করে পুরোপুরি দিয়ে দেয়ার পর যে লভ্যাংশ উদ্বৃত্ত থাকে, তোমাদের জন্য তাই উত্তম। [তাবারী] পরিমাণে স্বল্প হলেও আল্লাহ তা‘আলা তার মধ্যে বরকত দান করবেন, যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর। আর যদি অমান্য কর, তবে মনে রেখ তোমাদের উপর কোন আযাব অবতীর্ণ হলে, তা থেকে তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয়। তোমাদের উপর আমার কোন জোর নেই। আমি তো শুধু একজন কল্যাণকামী উপদেষ্টা মাত্র। বড় জোর আমি তোমাদের বুঝাতে পারি। তারপর তোমরা চাইলে মানতে পারো আবার নাও মানতে পারো। আমার কাছে জবাবদিহি করার ভয় করা বা না করার প্রশ্ন নয়। বরং আসল প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করা। [ইবন কাসীর] আল্লাহর কিছু ভয় যদি তোমাদের মনে থেকে থাকে তাহলে তোমরা যা কিছু করছো তা থেকে বিরত থাকো। এভাবে তিনি তাঁর সুললিত বর্ণনা ও অপূর্ব বাগ্মীতার মাধ্যমে নিজ জাতিকে বোঝানো এবং সৎপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

(১) এত কিছু শোনার পরেও তার কওমের লোকেরা পূর্ববর্তী বর্বর পাপিষ্ঠদের ন্যায় একই জবাব দিল। তারা নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর নবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে বললঃ আপনার নামায কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পুজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যার পুজা করে আসছে। আর আমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার অধিকারী না থাকি? কোনটা হালাল কোনটা হারাম তা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করে সব কাজ করতে হবে? শু‘আইব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সারাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি অধিকাংশ সময় নামায ও নফল এবাদতে মগ্ন থাকেন। [কুরতুবী] তাই তারা তার মূল্যবান নীতি বাক্যসমূহকে বিদ্রুপ করে বলতো- আপনার নামায কি আপনাকে এসব কথাবার্তা শিক্ষা দিচ্ছে? হাসান বসরী বলেন, অবশ্যই তার সালাত তাকে আল্লাহ্ তা‘আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে নিষেধ করছে। [ইবন কাসীর] তাদের এসব মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, এরা দ্বীনকে শুধু কতিপয় আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে

তুমি তো বেশ সহিষ্ণু, সুবোধ!'

৮৮. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আমি যদি আমার রব প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর কাছ থেকে আমাকে উৎকৃষ্ট রিয্ক[১] দান করে থাকেন (তবে কি করে আমি আমার কর্তব্য হতে বিরত থাকব?) আর আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি আমি নিজে তার বিপরীত করতে ইচ্ছে করি না[২]। আমি তো

قَالَ يٰقَوۡمِ اَرَءَيۡتُمۡ اِنۡ كُنۡتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّىۡ وَرَزَقَنِىۡ مِنۡهُ رِزۡقًا حَسَنًا ؕ وَمَاۤ اُرِيۡدُ اَنۡ اُخَالِفَكُمۡ اِلٰى مَاۤ اَنۡهٰٮكُمۡ عَنۡهُ ؕ اِنۡ اُرِيۡدُ اِلَّا الۡاِصۡلَاحَ مَا اسۡتَطَعۡتُ ؕ وَمَا تَوۡفِيۡقِىۡۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَاِلَيۡهِ اُنِيۡبُ ۝٨٨

সীমাবদ্ধ মনে করতো। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোন দখল দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন-সম্পদ যেমন খুশী তেমন ভোগ দখল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। [মুহাম্মাদ আল-মাক্কী: আত-তাইসীর ফী আহাদীসিত তাফসীর ৩/১৩৯] সুফিয়ান আস-সাওরী বলেন, তারা এটা বলেছিল যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকতে। [ইবন কাসীর]

এ থেকে একথাও আন্দাজ করা যেতে পারে যে, জীবনকে ধর্মীয় ও পার্থিব এ দু'ভাগে ভাগ করার চিন্তা আজকের কোন নতুন চিন্তা নয় বরং আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে শু'আইব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ও এ বিভক্তির উপর ঠিক তেমনিই জোর দিয়েছিল যেমন আজকের যুগে পাশ্চাত্যবাসীরা এবং তাদের প্রাচ্যদেশীয় শিষ্যবৃন্দ জোর দিচ্ছেন।

(১) রিয্ক শব্দটি এখানে দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, সত্য-সঠিক জ্ঞান, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এ শব্দটি থেকে সাধারণত যে অর্থ বুঝা যায় সেটি অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবন যাপন করার জন্য যে জীবন সামগ্রী দান করে থাকেন। প্রথম অর্থটির প্রেক্ষিতে এর অর্থ হচ্ছে নবুওয়াত ও রিসালত। [ইবন কাসীর] আর দ্বিতীয় অর্থের প্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে, হালাল রিযক। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ শু'আইব আলাইহিস সালাম বলছেন যে, আমার আল্লাহ্ যদি আমাকে হালাল রিযিক দিয়ে থাকেন তাহলে তোমাদের নিন্দাবাদের কারণে এ অনুগ্রহ কি করে বিগ্রহে পরিণত হবে? আল্লাহ যখন আমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন তখন তোমাদের ভ্রষ্টতা ও হারাম খাওয়াকে আমি সত্য ও হালাল গণ্য করে তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হই কেমন করে?

(২) অর্থাৎ একথা থেকেই তোমরা আমার সত্যতা আন্দাজ করে নিতে পারো যে, অন্যদের আমি যা কিছু বলি আমি নিজেও তা করি। এমন নয় যে, তোমাদেরকে যা থেকে

আমার সাধ্যমত সংস্কারই করতে চাই। আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে; আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী।

৮৯. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এমন অপরাধ না করায় যার ফলে তোমাদের উপর তার অনুরূপ বিপদ আপতিত হবে যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর অথবা হূদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালেহের সম্প্রদায়ের উপর; আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে দূরে নয়।

وَيٰقَوۡمِ لَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شِقَاقِيۡۤ اَنۡ يُّصِيۡبَكُمۡ مِّثۡلُ مَاۤ اَصَابَ قَوۡمَ نُوۡحٍ اَوۡ قَوۡمَ هُوۡدٍ اَوۡ قَوۡمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوۡمُ لُوۡطٍ مِّنۡكُمۡ بِبَعِيۡدٍ ﴿٨٩﴾

৯০. 'আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে ফিরে আস; আমার রব তো পরম দয়ালু, অতি স্নেহময়(১)।'

وَاسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَيۡهِ ؕ اِنَّ رَبِّيۡ رَحِيۡمٌ وَّدُوۡدٌ ﴿٩٠﴾

নিষেধ করছি আমি নিজে তার বিরোধিতা করে তা গোপনে করে যাচ্ছি। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ যদি আমি তোমাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহর পূজা বেদীতে যেতে নিষেধ করতাম এবং নিজে কোন বেদীর সেবক হয়ে বসতাম তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা আমার কথার বাইরে চলার মত দলীল-প্রমাণাদি পেয়ে যেতে। যদি আমি তোমাদের হারাম জিনিস খেতে নিষেধ করতাম এবং নিজের কারবারে বেঈমানী করতে থাকতাম তাহলে তোমরা অবশ্যি এ সন্দেহ পোষণ করতে পারতে যে, আমি নিজের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঈমানদারীর দাবি করছি। কিন্তু তোমরা দেখছো, যেসব অসৎকাজ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করছি। আমি নিজেও সেগুলো থেকে দূরে থাকছি। যেসব কলংক থেকে আমি তোমাদের মুক্ত দেখতে চাচ্ছি আমার নিজের জীবনও তা থেকে মুক্ত। তোমাদের আমি যে পথের দিকে আহবান জানাচ্ছি আমার নিজের জন্যও আমি সেই পথটিই পছন্দ করেছি। এসব জিনিস একথা প্রমাণ করে যে, আমি যে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি সে ব্যাপারে আমি সত্যবাদী ও একনিষ্ঠ।

(১) অর্থাৎ তোমরা ইস্তেগফার ও তাওবা কর। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। মহান আল্লাহ নির্দয় নন। নিজের সৃষ্টির সাথে তাঁর কোন শত্রুতা

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۫ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿٩١﴾

৯১. তারা বলল, ‘হে শু'আইব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না[১] এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম, আর আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও[২]।’

নেই। তোমরা যতই দোষ করো না কেন যখনই তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসবে তখনই তাঁর হৃদয়কে নিজেদের জন্য প্রশস্ততর পাবে। কারণ নিজের সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার অন্ত নেই। এ বিষয়বস্তুটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত দিয়ে সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি একটি দৃষ্টান্ত এভাবে দিয়েছেন যে, তোমাদের কোন ব্যক্তির উট যদি কোন বিশুষ্ক তৃণপানিহীন এলাকায় হারিয়ে গিয়ে থাকে, তার পিঠে তার পানাহারের সামগ্রীও থাকে এবং সে ব্যক্তি তার খোঁজ করতে করতে নিরাশ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের নীচে শুয়ে পড়ে। ঠিক এমনি অবস্থায় সে দেখে তার উটটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় সে যে পরিমাণ খুশি হবে আল্লাহর পথভ্রষ্ট বান্দা সঠিক পথে ফিরে আসার ফলে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশী খুশী হন। [দেখুন, বুখারী: ৬৩০৮; মুসলিম: ২৭৪৪]

(১) শু'আইব কোন বিদেশী ভাষায় কথা বলছিলেন তাই তারা বুঝতে পারছিল না, এমন কোন ব্যাপার ছিল না। অথবা তাঁর কথা কঠিন, সূক্ষ্ম বা জটিলও ছিল না। কথা সবই সোজা ও পরিষ্কার ছিল। সেখানকার প্রচলিত ভাষায়ই কথা বলা হতো। তাহলে তারা কেন বুঝলো না? এর দু'টি কারণ হতে পারে। এক. তাদের মানসিক কাঠামো এত বেশী বেঁকে গিয়েছিল যে, শু'আইব আলাইহিস সালামের সোজা সরল কথাবার্তা তার মধ্যে কোন প্রকারেই প্রবেশ করতে পারতো না। তাদের চিন্তাধারা থেকে ভিন্নতর কিছু শোনার কারণে তারা বলতে থাকে যে, এসব আবার কেমন ধারার কথা! তারা বলল যে, আমরা বুঝিনা। তারা এটা অপমানসূচক তাদের নবীকে বলেছিল। দুই. অথবা তারা সত্যি সত্যিই বুঝতে চেষ্টা করছিল না। তাদের বক্তব্য হলো, আপনি আমাদেরকে পুনরুত্থান, ও হাশর-নশরের মত গায়েবী বিষয় বলছেন, এমন কিছুর উপদেশ দিচ্ছেন যা আগে আমরা বুঝিনি। [কুরতুবী]

(২) একথা অবশ্যি সামনে থাকা দরকার যে, এ আয়াতগুলো যখন নাযিল হয় তখন হুবহু একই রকম অবস্থা মক্কাতেও বিরাজ করছিল। সে সময় কুরাইশরাও একই ভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্ত পিপাসু হয়ে উঠেছিল। তারা তাঁর

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاۗءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۭ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٩٢﴾

৯২. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী শক্তিশালী? আর তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ পিছনে ফেলে রেখেছ। তোমরা যা কর আমার রব নিশ্চয় তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰي مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۭ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۭ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿٩٣﴾

৯৩. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।'

وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ۙ

৯৪. আর যখন আমাদের নির্দেশ আসল তখন আমরা শু'আইব ও তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে রক্ষা করেছিলাম। আর যারা যুলুম করেছিল বিকট চীৎকার তাদেরকে আঘাত করল, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে নতজানু অবস্থায় পড়ে রইল[১]।

জীবননাশ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু শুধু বনী হাশেম তাঁর পেছনে ছিল বলেই তাঁর গায়ে হাত দিতে ভয় পাচ্ছিল। কাজেই শু'আইব আলাইহিস সালাম ও তার কওমের এ ঘটনাকে যথাযথভাবে কুরাইশ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সামনের দিকে শু'আইব আলাইহিস সালামের যে চরম শিক্ষণীয় জবাব উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মধ্যে এ অর্থ লুকিয়ে রয়েছে যে, হে কুরাইশের লোকেরা! তোমাদের জন্যও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে এ একই জবাব দেয়া হলো।

(১) কওমের লোকেরা একথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল, আপনার গোষ্ঠী-জাতির কারণে আমরা এতদিন আপনাকে কিছু বলিনি। নতুবা অনেক আগেই প্রস্তর

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

৯৫. যেন তারা সেখানে কখনো বসবাস করেনি। জেনে রাখ! ধ্বংসই ছিল মাদ্‌ইয়ানবাসীর পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল সামূদ সম্প্রদায়।

নবম রুকূ’

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾

৯৬. আর অবশ্যই আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম,

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾

৯৭. ফির‘আউন ও তার নেতৃবৃন্দের কাছে। কিন্তু নেতৃবৃন্দ ফির‘আউনের কর্যকলাপের অনুসরণ করেছিল। আর ফির‘আউনের কার্যকলাপ সঠিক ছিল না।

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾

৯৮. সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের সামনে থাকবে[১]। অতঃপর সে তাদেরকে আগুনে উপনীত করবে। আর যেখানে তারা উপনীত হবে তা উপনীত হওয়ার কত নিকৃষ্ট স্থান!

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾

৯৯. আর অভিশাপ তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল এ দুনিয়ায় এবং কিয়ামতের দিনেও। কতই না নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যা তাদেরকে দেয়া হবে!

আঘাতে আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম। এরপরে শু‘আইব আলাইহিসসালামের কোন কথা যখন তারা মানল না, তখন তিনি বললেনঃ ঠিক আছে, তোমরা এখন আযাবের অপেক্ষা করতে থাক।’ তারপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুসারে শু‘আইব আলাইহিসসালামকে এবং তার সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালামের এক ভয়ঙ্কর হাঁকে অবশিষ্ট সবাই এক নিমেষে ধ্বংস হল।

(১) অর্থাৎ সে তাদের সামনে সামনে জাহান্নামে যাবে। কারণ সে তাদের নেতা। [কুরতুবী]

ذٰلِكَ مِنۡ اَنۡۢبَآءِ الۡقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيۡكَ مِنۡهَا قَآٮِٕمٌ وَّحَصِيۡدٌ ﴿١٠٠﴾

১০০. এগুলো জনপদসমূহের কিছু সংবাদ যা আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করছি। এ গুলোর মধ্যে কিছু এখনো বিদ্যমান এবং কিছু নির্মূল হয়েছে।

وَمَا ظَلَمۡنٰهُمۡ وَلٰكِنۡ ظَلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ فَمَاۤ اَغۡنَتۡ عَنۡهُمۡ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىۡ يَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ شَىۡءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمۡرُ رَبِّكَ‌ؕ وَمَا زَادُوۡهُمۡ غَيۡرَ تَتۡبِيۡبٍ ﴿١٠١﴾

১০১. আর আমরা তাদের প্রতি যুলুম করিনি কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। অতঃপর যখন আপনার রবের নির্দেশ আসল, তখন আল্লাহ্‌ ছাড়া তারা যে ইলাহ্‌সমূহের ‘ইবাদাত করত তারা তাদের কোন কাজে আসল না। আর তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের অন্য কিছুই বৃদ্ধি করল না।

وَكَذٰلِكَ اَخۡذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الۡقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ‌ ؕ اِنَّ اَخۡذَهٗۤ اَلِيۡمٌ شَدِيۡدٌ ﴿١٠٢﴾

১০২. এরূপই আপনার রবের পাকড়াও! যখন তিনি পাকড়াও করেন অত্যাচারী জনপদসমূহকে। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক, কঠিন[১]।

اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنۡ خَافَ عَذَابَ الۡاٰخِرَةِ‌ ؕ ذٰلِكَ يَوۡمٌ مَّجۡمُوۡعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوۡمٌ مَّشۡهُوۡدٌ ﴿١٠٣﴾

১০৩. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন তার জন্য যে আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে[২]। সেটি এমন এক দিন, যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে; আর সেটি

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অত্যাচারীকে পৃথিবীতে সুযোগ ও অবকাশ দিয়ে থাকেন। আবার যখন তাকে ধরেন তখন আর ছাড়েন না। বর্ণনাকারী সাহাবী আবু মূসা আশ‘আরী বলেনঃ তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ “এরূপই আপনার প্রতিপালকের শাস্তি! তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন ওরা যুলুম করে থাকে। নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন।” [বুখারীঃ ৪৬৮৬, মুসলিমঃ ২৫৮৩]

(২) অর্থাৎ ইতিহাসের এ ঘটনাবলীর মধ্যে এমন একটি নিশানী রয়েছে যে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, আখেরাতের আযাব অবশ্যি আসবে এবং এ সম্পর্কিত নবীদের দেয়া খবর সত্য। তাছাড়া এ নিশানী থেকে সেই আখেরাতের আযাব কেমন কঠিন ও ভয়াবহ হবে সেকথাও জানতে পারবে। ফলে এ জ্ঞান তার মনে ভীতির সঞ্চার করে তাকে সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে।

এমন এক দিন যেদিন সবাইকে উপস্থিত করা হবে[১];

১০৪. আর আমরা তো কেবল নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যই সেটা বিলম্বিত করছি।

وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعۡدُوۡدٍؕ ۝١٠٤

১০৫. যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না[২]; অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ হবে সৌভাগ্যবান[৩]।

يَوۡمَ يَاۡتِ لَا تَكَلَّمُ نَفۡسٌ اِلَّا بِاِذۡنِهٖۚ فَمِنۡهُمۡ شَقِيٌّ وَّسَعِيۡدٌ ۝١٠٥

---

(১) অর্থাৎ সেদিন আগের পরের সবাইকে একত্রিত করা হবে। কেউই বাকি থাকবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ "আর আমি তাদের সবাইকে জমায়েত করেছি, তাদের কাউকেই ছাড়িনি। [সূরা আল-কাহাফঃ৪৭]

(২) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেনঃ "সেদিন রূহ্ ও ফিরিশ্‌তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবে না এবং সে সঠিক বলবে।" [সূরা আন-নাবাঃ ৩৮] অর্থাৎ সেদিনের সেই আড়ম্বরপূর্ণ মহিমান্বিত আদালতে অতি বড় কোন গৌরবান্বিত ব্যক্তি এবং মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতাও টুঁ শব্দটি করতে পারবে না। আর যদি কেউ সেখানে কিছু বলতে পারে তাহলে একমাত্র বিশ্ব-জাহানের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মহান অধিকারীর নিজের প্রদত্ত অনুমতি সাপেক্ষেই বলতে পারবে।

(৩) উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ যখন এ আয়াত "তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ হবে ভাগ্যবান" নাযিল হলো তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! তা হলে কি জন্য আমল করব? যে ব্যাপারে চুড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গেছে সেটার জন্য আমল করব নাকি চুড়ান্ত ফয়সালা হয়নি এমন বস্তুর জন্য আমল করব? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "হে উমর! বরং যে ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং কলম দিয়ে লিখা হয়ে গেছে এমন বিষয়ের জন্য আমল করবে। তবে যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সেটাকে সহজ করে দেয়া হবে।" [তিরমিযীঃ৩১১১] অর্থাৎ তাকদীরের খবর আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। যদি সে ঈমানদার হিসেবে লিখা হয়ে থাকে তবে তার জন্য সৎকাজ করা সহজ করে দেয়া হবে। আর যদি বদকার ও কাফের হিসেবে লেখা হয়ে থাকে তবে সে ভাল কাজ করতে চাইবে না, ভাল কাজ করা তার দ্বারা সহজ হবে না। তাই প্রত্যেকের উচিত ভাল কাজ করতে সচেষ্ট হওয়া। কারণ ভাল কাজের প্রতি প্রচেষ্টাই তার ভাগ্য ভাল কি মন্দ হয়েছে তার প্রতি প্রমাণবহ। তা না

১০৬. অতঃপর যারা হবে হতভাগ্য তারা থাকবে আগুনে এবং সেখানে তাদের থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ,

فَاَمَّا الَّذِیۡنَ شَقُوۡا فَفِی النَّارِ لَهُمۡ فِیۡهَا زَفِیۡرٌ وَّ شَهِیۡقٌ ۙ﴿۱۰۶﴾

১০৭. সেখানে তারা স্থায়ী হবে[১] যতদিন আকাশমণ্ডলী ও যমীন বিদ্যমান থাকবে[২] যদি না আপনার রব

خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الۡاَرۡضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّکَ ؕ اِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیۡدُ ﴿۱۰۷﴾

করে নিছক তাকদীরের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে বুঝতে হবে যে, সে অবশ্যই হতভাগা, তার তাকদীরে ভালো লিখা হয়নি। যা অধিকাংশ দুর্ভাগা মানুষ সবসময় করে থাকে। তারা ভাগ্যকে অযথা টেনে এনে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে এবং ভাগ্য নিয়ে অযথা বাদানুবাদ করে। অপরপক্ষে, যাদের ভাগ্য ভাল, তারা তাকদীরের উপর ঈমান রাখে কিন্তু সেটাকে টেনে এনে হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে ভাল কাজ করতে সদা সচেষ্ট থাকে। তারপর যদি ভাল কিছু পায় তবে বুঝতে হবে যে, প্রচেষ্টা করার কথাও তার তাকদীরে লিখা আছে। আর যারা সৎ কাজের চেষ্টা না করে অযথা তাকদীর নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদের সম্পর্কে বুঝতে হবে যে, তারা সৎকাজের প্রচেষ্টা করবে না এটাই লিখা হয়েছিল সে জন্য তারা দুর্ভাগা। তাকদীর সম্পর্কে এটাই হচ্ছে মূল কথা। [দেখুন, শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন: আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ ২/৪১৩-৪১৪]

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত্যুকে হাশরের মাঠে একটি সাদা-কালো ছাগলের সূরতে নিয়ে আসা হবে তারপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবেন, হে জান্নাতবাসী! ফলে তারা ঘাড় উঁচু করবে এবং তাকাবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি এটাকে চিন? তারা বলবেঃ হ্যাঁ, এটা হলো, মৃত্যু। তাদের প্রত্যেকেই তা দেখেছে। তারপর আহ্বানকারী আহ্বান করে ডাকবেন, হে জাহান্নামবাসী! তখন তারা ঘাড় উচু করে তাকাবে। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা কি এটাকে চিন? তারা বলবে, হ্যাঁ, আর তারা প্রত্যেকে তা দেখেছে, তারপর সেটাকে জবেহ করা হবে। তারপর বলবেনঃ হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে তোমরা এখানে থাকবে সুতরাং কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী! স্থায়ীভাবে এখানে থাকবে সুতরাং কোন মৃত্যু নেই। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ তাদেরকে সতর্ক করে দিন পরিতাপের দিন সম্বন্ধে, যখন সব সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এখন তারা গাফিল এবং তারা বিশ্বাস করে না। (সূরা মারইয়ামঃ৩৯) [বুখারীঃ ৪৭৩০]

(২) এ শব্দগুলোর অর্থ আখেরাতের আসমান ও যমীন হতে পারে। এ জন্যই হাসান বসরী বলেন, সেদিন আসমান ও যমীন তো পরিবর্তিত হবে। আর সে আসমান ও যমীন স্থায়ী হবে। তাই তাদের অবস্থারও পরিবর্তন হবে না। [ইবন কাসীর] অথবা এমনও হতে পারে যে, প্রতিটি জান্নাত ও জাহান্নামেরই আলাদা আসমান ও যমীন রয়েছে সে

অন্যরূপ ইচ্ছে করেন[১]; নিশ্চয় আপনার রব তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন।

১০৮. আর যারা ভাগ্যবান হয়েছে তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, যতদিন আকাশমণ্ডলী ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, যদি না আপনার রব অন্যরূপ ইচ্ছে করেন[২]; এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ۝١٠٨

অনুসারে এটা বলা হয়েছে। এটি ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত। [ইবন কাসীর] অথবা এর অর্থ যতক্ষণ আসমান আসমান থাকবে আর যতক্ষণ যমীন যমীন থাকবে। আর আখেরাতে সেটা অপরিবর্তনীয়। এটি আব্দুর রহমান ইবন যায়দ বলেছেন। [ইবন কাসীর] অথবা নিছক সাধারণ বাকধারা হিসেবে একে চিরকালীন স্থায়িত্ব অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ তাদেরকে এ চিরন্তন আযাব থেকে বাঁচাবার মতো আর কোন শক্তিই তো নেই। তবে আল্লাহ নিজেই কিছু ইচ্ছে করেন সেটা ভিন্ন। এখান প্রশ্ন হচ্ছে, কাফেরের আযাব তো কখনো শেষ হবে না, তা হলে এখানে ব্যতিক্রম কি হতে পারে? এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। তবে সবেচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে তাই যা ইমাম ইবন জারীর তাবারীসহ অধিকাংশ সত্যনিষ্ঠ আলেম গ্রহণ করেছেন। আর তা হচ্ছে, এখানে গোনাহগার ঈমানদারদের কথা বলা হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে নবী-রাসূল, ফিরিশতা ও মুমিনদের সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম থেকে বের করবেন। তারপর রহমতের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে এমন লোকদেরকে বের করবেন, যাদের অন্তরে সামান্যতম ঈমানও অবশিষ্ট ছিল। এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত এসেছে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তাদের জান্নাতে অবস্থান করাও এমন কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় যে তা আল্লাহকে এমনটি করতে বাধ্য করে রেখেছে। বরং আল্লাহ যে তাদেরকে সেখানে রাখবেন এটা হবে সরাসরি তাঁর অনুগ্রহ। যদি তিনি তাদের ভাগ্য বদলাতে চান, তা করার পূর্ণ ক্ষমতা তাঁর আছে। [ইবন কাসীর] তাই তাদেরকে সর্বদা তাঁর জন্য তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করার ইলহাম করা হবে, যেমনি তাদেরকে নিঃশ্বাস নেয়ার ইলহাম করা হবে। [ইবন কাসীর] হাসান বসরী ও দাহহাক বলেন, এখানেও ব্যতিক্রম বলে গোনাহগার ঈমানদারদের বোঝানো হয়েছে। কারণ তারা কিছু সময় জাহান্নামে অবস্থান করবে তারপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। [ইবন কাসীর]

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ۚ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ۚ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ﴿١٠٩﴾

১০৯. কাজেই তারা যাদের ‘ইবাদাত করে তাদের সম্বন্ধে সংশয়ে থাকবেন না, আগে তাদের পিতৃপুরুষেরা যেভাবে ‘ইবাদাত করত তারাও তাদেরই মত ‘ইবাদাত করে[১]। আর নিশ্চয় আমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি দেব---কিছুমাত্র কম করব না।

দশম রুকূ’

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١٠﴾

১১০. আর অবশ্যই আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। আর আপনার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মীমাংসা তো হয়েই যেত[২]। আর নিশ্চয় তারা এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে

---

(১) এর অর্থ এ নয় যে, এ মাবুদদের ব্যাপারে সত্যিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল। বরং আসলে একথাগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে সাধারণ মানুষকে শুনানো হচ্ছে। [কুরতুবী] এর অর্থ হচ্ছে, এরা যে এসব মাবুদের ইবাদত করছে এবং এদের কাছে প্রার্থনা করছে ও ভিক্ষা চাচ্ছে, নিশ্চয়ই এরা কিছু দেখে থাকবে যে কারণে এরা এদের থেকে উপকৃত হবার আকাংখা পোষণ করে–কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির মনে এ ধরনের কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। সত্যি কথা হচ্ছে এই যে, এদের যাবতীয় ইবাদত, নযরানা ও প্রার্থনা আসলে কোন অভিজ্ঞতা ও সত্যিকার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নয় বরং এসব কিছু করা হচ্ছে নিছক অন্ধ অনুসৃতির ভিত্তিতে। এসব বেদী ও আস্তানা পূর্ববর্তী জাতিদেরও ছিল। কিন্তু যখন আল্লাহর আযাব এলো তখন তারা ধ্বংস হয়ে গেলো এবং বেদী ও আস্তানাগুলো কোন কাজে লাগলো না।

(২) এ পূর্ব সিদ্ধান্ত বা বাক্য সম্পর্কে দু’টি মত প্রসিদ্ধ। এক. পূর্ব থেকেই তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অবকাশ প্রদানের সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের উপর আযাব এসে যেতো। দুই. অথবা পূর্ব থেকেই যদি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত না থাকত যে, তিনি নবী-রাসূল প্রেরণ না করে কাউকে শাস্তি দিবেন না, তাহলে অবশ্যই তাদের উপর শাস্তি আপতিত হতো। যেমন আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন, “আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত শাস্তি প্রদানকারী নই” [সূরা আল-ইসরা: ১৫] [ইবন কাসীর]

নিপতিত[১]।

১১১. আর নিশ্চয় আপনার রব তাদের প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দেবেন। তারা যা করে তিনি তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত;

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾

১১২. কাজেই আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন তাতে অবিচল থাকুন এবং আপনার সাথে যারা তাওবা করেছে তারাও[২]; এবং তোমরা সীমালংঘন

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

(১) অর্থাৎ এ কুরআন সম্পর্কে আজ বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলছে, নানা রকম সন্দেহ-সংশয় পোষণ করছে, এটা কোন নতুন কথা নয়। বরং এর আগে মূসাকে যখন কিতাব দেয়া হয়েছিল তখন তার ব্যাপারেও এ ধরনের বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল। [কুরতুবী; সা'দী] কাজেই হে নবী! এমন সহজ, সরল ও পরিষ্কার কথা কুরআনে বলা হচ্ছে এবং তারপরও লোকেরা তা গ্রহণ করছে না—এ অবস্থা দেখে আপনার মন খারাপ করা ও হতাশ হওয়া উচিত নয়।

(২) ইস্তেকামত শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ডান বা বাম কোনদিক একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে থাকা। [কুরতুবী] মূলতঃ এটা সহজ কাজ নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকল মুসলিমকে তাদের সর্বকার্যে সর্বাবস্থায় ইস্তেকামত অবলম্বন করার জন্য এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'ইস্তেকামত' শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা, সর্বাবস্থায় দ্বীনের পথে সঠিকভাবে চলার অর্থ হচ্ছে- আকায়েদ, ইবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা নীতি-নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁরই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোন ক্ষেত্রে, কোন কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানে বামে ঝুঁকে পড়া ইস্তেকামতের পরিপন্থী। দুনিয়ায় যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তেকামত হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকায়েদ অর্থাৎ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইস্তেকামত না থাকলে, মানুষ বিদ'আত হতে শুরু করে কুফরী ও শেরেকী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন পরিবর্জনকারী পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে, তা তার নিয়ত যতই ভাল হোক না কেন। অনুরূপভাবে নবী ও রাসূল আলাইহিমুসসালামগণের প্রতি শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা স্পষ্ট ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা। তেমনি কোন রাসূলকে আল্লাহ্‌র

গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দেয়াও চরম পথভ্রষ্টতা। ইয়াহূদী ও নাসারারা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য কুরআনে করীম নির্দেশিত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথের মধ্যে কোনরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তেকামতের আদর্শ হতে বিচ্যুত করে, অনুরূপভাবে তার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কোন বাড়াবাড়ি বা পরিবর্ধনও মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে বিদ'আত ও নিত্য নতুন সৃষ্ট পথ ও মত হতে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন এবং বিদ'আতকে চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। [দেখুন, আবু দাউদঃ ৪৬০৭] অতএব, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোন কার্য সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত হিসাবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ তাহকীক করে জানতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম উক্ত কার্য ঐভাবে করেছেন কি না? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত কাজে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করা কক্ষনো ঠিক হবে না। কারণ, আকায়েদ, ইবাদাত, মু'আমালাত তথা লেন-দেন, আখলাক বা স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন করীম নির্দেশিত মূলনীতিগুলিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবে রূপায়িত করে একটা সুষ্ঠু সঠিক মধ্যপন্থার পত্তন করেছেন। বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ক্রোধ, ধৈর্য, মিতব্যয় ও দানশীলতা, জীবিকা উপার্জন, আল্লাহর উপর নির্ভরতা, আবশ্যকীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে এক নজীরবিহীন মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। তা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। তা থেকে বিচ্যুত হলেই সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সারকথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে দ্বীনের অনুশাসন মেনে চলাই ইস্তেকামতের তাফসীর। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাকাফী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে আরজ করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন যেন আপনার পরে আমার কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়।" তিনি বললেনঃ "আল্লাহর প্রতি ঈমান আন, তারপর ইস্তেকামত অবলম্বন কর"। [মুসলিমঃ ৩৮] উসমান ইবন হাদের আল-আযদী বলেন, আমি ইবন আব্বাসের কাছে প্রবেশ করে তার কাছে অসীয়ত চাইলে তিনি বললেন, 'তুমি তাকওয়া অবলম্বন কর এবং ইস্তেকামত গ্রহণ কর। অনুসরণ কর এবং বিদ'আত থেকে দূরে থাক। [সুনান দারমী: ১৪১] [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ইবন তাইমিয়্যা: আল-ইস্তিকামাহ ১/৩-৩২]

মূলত: ইস্তেকামতই সবচেয়ে দুস্কর কার্য। এজন্যই সালফে-সালেহীন বলতেন যে, কারামতের চেয়ে ইস্তেকামতের মর্যাদা ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বকার্যে ইস্তেকামত অবলম্বন করে, যদি জীবনভর তার দ্বারা কোন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত

করো না[১]। তোমরা যা কর নিশ্চয় তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা।

১১৩. আর যারা যুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; পড়লে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে[২]।

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

না হয়, তথাপি তার মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন "পূর্ণ কুরআনের মধ্যে এ আয়াতের চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর কোন হুকুম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয় নি।" তাই ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মতে রাসূলের বাণী "সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে।" এ সূরার ইস্তেকামতের নির্দেশই ছিল তার বার্ধক্যের কারণ। [কুরতুবী]

(১) ইস্তেকামতের আদেশ দানের পর আল্লাহ্ বলেনঃ 'সীমালজ্ঘন করো না। এখানে সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধু ক্ষান্ত করা হয় নি। বরং তার নেতিবাচক দিকটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, আকায়েদ, ইবাদত, লেন-দেন ও নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করো না। কেননা, এটাই পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফাসাদের মূল কারণ। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন আনুগত্যের সময় শরী'আত নির্ধারিত সীমা লজ্ঘন না করে। যেমন কেউ সাওম পালন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে সেটাকে সবসময়ের জন্য করে নিল। আবার কেউ রাতে সালাতে দাঁড়াতে গিয়ে ঘুম বন্ধ করে দিল। যে বস্তু হালাল করা হয়েছে কেউ তা পরিত্যাগ করে দিল। [ফাতহুল কাদীর] যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'অথচ আমি সাওম পালন করি, সাওম পালন থেকে বিরতও হই, রাতে সালাতের জন্য দাঁড়াই, সালাত থেকে বিরত হয়ে ঘুমও যাই। আর বিয়ে-শাদীও করি। অতঃপর যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়।' [বুখারী: ৫০৬৩; মুসলিম: ১৪০১]

(২) এ আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলা হচ্ছেঃ "ঐসব পাপিষ্ঠদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।" এখানে তাদের প্রতি সামান্যতম ঝোঁকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তাদের প্রতি আস্থা বা সম্মতি জ্ঞাপন করাও নিষেধ করা হয়েছে। এই ঝোঁকা ও আকর্ষণের অর্থ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই। বরং প্রত্যেকটি উক্তিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঠিক। ইবন আব্বাস বলেন, যালেমদের চাটুকার হবে না। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, তাদের শির্কী কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতিত্ব করবে না। [ইবন কাসীর] কাতাদাহ বলেন, এর অর্থঃ "পাপিষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না,

এ অবস্থায় আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

১১৪. আর আপনি সালাত কায়েম করুন[১] দিনের দু প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে[২]। নিশ্চয় সৎকাজ

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى

তাদের কথামত চলবে না।" [মা'আনিল কুরআন লিন নাহহাস; কুরতুবী] ইবন জুরাইজ বলেন, এর অর্থঃ "পাপিষ্ঠদের প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হবে না। [কুরতুবী] আবুল 'আলিয়া বলেনঃ "তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তা পছন্দ করো না।" [কুরতুবী; ইবন কাসীর] 'সুদ্দী' বলেনঃ "যালেমদের চাটুকারিতা করবে না।" ইকরিমা বলেনঃ "তাদের আনুগত্য করবে না।" [বাগভী] ইবন যায়দ বলেন, তাদের কুফরী কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করা পরিত্যাগ করবে না। [তাবারী] ইবন আব্বাস থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, তোমরা যালেমদের পক্ষ নিও না। তাদের সাহায্য নিও না, তাহলে মনে হবে যেন তোমরা তাদের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সাথে সন্তুষ্ট রয়েছে। [ইবন কাসীর] তাছাড়া বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে, লেবাস-পোশাকে, চাল-চলনে তাদের অনুকরণও এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে। ইবন যায়দ বলেন, এখানে যালেম বলে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। [তাবারী] কিন্তু মুমিনদের মধ্যে যারা যালেম হবে তাদের সাথে সম্পর্ক বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভরশীল হবে। [ফাতহুল কাদীর] যদিও সত্যনিষ্ঠ আলেমদের মধ্যে অনেকেই এ আয়াতটিকে সবার ক্ষেত্রেই ব্যাপক বলে মন্তব্য করেছেন। [দেখুন, ইবন তাইমিয়্যা, মাজমু' ফাতাওয়া: ১৩/২০৩; মিনহাজুস সুন্নাহ: ৬/১১৭]

(১) আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে তাকে ও তার সমস্ত উম্মতকে নামায কায়েম রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য ফরয সালাত। [কুরতুবী] আর ইকামতে সালাত অর্থ, পূর্ণ পাবন্দীর সাথে নিয়মিতভাবে সালাত সম্পন্ন করা। কোন কোন আলেমের মতে সালাত কায়েম করার অর্থ, সমুদয় সুন্নত ও মুস্তাহাবসহ আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ, মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায পড়া। আবার কারো কারো মতে, জামাতের সাথে আদায় করা। মূলতঃ এটা কোন মতানৈক্য নয়। আলোচ্য সবগুলোই একামতে সালাতের সঠিক মর্মার্থ। সূরা আল-বাকারার ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তার বিস্তারিত আলোচনা চলে গেছে।

(২) নামায কায়েম করার নির্দেশ দানের পর সংক্ষিপ্তভাবে নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "দিনের দু'প্রান্তে অর্থাৎ শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামায কায়েম করবেন।" দিনের দু'প্রান্তের নামাযের মধ্যে প্রথমভাগের নামায সম্পর্কে সবাই একমত যে, সেটি ফজরের নামায। [তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] কিন্তু শেষ প্রান্তের নামায সম্পর্কে ইবন আব্বাস বলেন তা মাগরিবের নামায। [তাবারী;

لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়[১]।

কুরতুবী; ইবন কাসীর] হাসান বসরী, কাতাদাহ ও দাহহাক আসরের নামাযকেই দিনের শেষ নামায সাব্যস্ত করেছেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] অবশ্য এখানে একটি মত এটাও রয়েছে যে, দিনের দু'প্রান্ত বলে, যোহর ও আসরের সালাত বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] রাতের কিছু অংশের নামায সম্পর্কে ইবন আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, এটি হচ্ছে, এশার নামায। হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, কাতাদাহ, যাহ্হাক প্রমুখ তফসীরকারকদের অভিমত হচ্ছে যে, সেটি মাগরিব ও এশার নামায। [ইবন কাসীর] অতএব এ আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাযের বর্ণনা পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল যোহরের নামায। এ ব্যাপারে ইবন কাসীর বলেন, এটি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার আগের নির্দেশ। আর তখন দু' ওয়াক্ত নামাযই ফরয ছিল। সূর্যোদয়ের আগের নামায এবং সূর্যাস্তের আগের নামায। আর রাতের বেলা রাসূল ও উম্মতের উপর কিয়ামুল লাইল করা ফরয ছিল। [ইবন কাসীর] অথবা যোহরের সালাতের ব্যাপারে কুরআনের অন্যত্র যা এসেছে তা থেকে প্রমাণ নেয়া যায়, তা হচ্ছে, ‘‘নামায কায়েম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে।” [সূরা আল-ইসরাঃ ৩৮]

(১) এখানে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে তার উপকারিতাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে “পুণ্যকাজ অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়”। এখানে পুণ্যকাজ বলতে অধিকাংশ আলেমদের নিকট সালাত বোঝানো হয়েছে। [দেখুন, তাবারী] যদিও সালাত, রোযা, হজ, যাকাত, সদকাহ, সদ্ব্যবহার প্রভৃতি যাবতীয় সৎকাজই উদ্দেশ্য হতে পারে। [কুরতুবী] তবে নিঃসন্দেহে এর মধ্যে সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রে-গণ্য। অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গোনাহ শামিল রয়েছে। কিন্তু কুরআন এবং রাসূলের বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা সগীরা গোনাহ বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ, বিশেষ করে নামায সগীরা গোনহসমূহ মিটিয়ে দেয়। এ হিসেবে ইমাম কুরতুবী বলেন, আয়াতটি পুণ্যকাজের ব্যাপারে ব্যাপক হলেও গোনাহ ক্ষমা করার ব্যাপারে বিশেষভাবে বিশেষিত। অর্থাৎ সগীরা গোনাহের সাথে সংশ্লিষ্ট। [কুরতুবী] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সৎকাজের দ্বারা পাপ ক্ষমা হয় এ কথা কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “তোমরা যদি বড় (কবীরা) গোনাহসমূহ হতে বিরত থাক তাহলে তোমাদের ছোট ছোট (সগীরা) গুনাহগুলি মিটিয়ে দেব”। [সূরা আন-নিসাঃ ৩১] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুম'আ পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং এক রমযান দ্বারা পরবর্তী রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় সগীরা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে’। [মুসলিমঃ ২৩৩] অর্থাৎ কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গোনাহ নামায, রোজা, দান-সাদকাহ ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করার ফলে আপনা-আপনিও মাফ হয়ে যায়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে

উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা[১] এক উপদেশ।

১১৫. আর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, কারণ নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহসানকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না[২]।

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

প্রমাণিত হল যে, নেক কাজ করার ফলেও অনেক গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, "তোমাদের থেকে কোন মন্দ কাজ হলে পরে সাথে সাথে নেক কাজ কর, তাহলে উহার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।" [তিরমিযীঃ ১৯৮৭, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ১৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ "কোন এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুমু দিয়ে ফেলল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এ কথা উল্লেখ করলো। তখন তার এ ঘটনা উপলক্ষে উক্ত আয়াত নাযিল করা হলো। অর্থাৎ আপনি সালাত কায়েম করুন দিনের দু প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকাজ অবশ্যই অসৎকাজ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য এক উপদেশ"। তখন লোকটি জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহ্র রাসূল! এ হুকুম কি কেবল আমার জন্য, না সকলের জন্য? তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের যে কেউ নেক আমল করবে, এ হুকুম তারই জন্য"। [বুখারীঃ ৪৬৮৭] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে যদি কোন নদী থাকে আর দৈনিক পাঁচবার তাতে গোসল করা হয় তাহলে তার কি কোন ময়লা বাকী থাকবে?" সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ "তার কোন ময়লাই অবশিষ্ট থাকবে না"। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটাই হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। আল্লাহ্ এর মাধ্যমে গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। [বুখারীঃ৫২৮, মুসলিমঃ ২৭৬৩] তবে মনে রাখতে হবে যে, সৎকাজ দ্বারা শুধুমাত্র সগীরা বা ছোট গুণাহ মাফ হয়। কবীরা গুণাহের জন্য তাওবা জরূরী। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে, 'যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে'। [মুসলিম: ২৩৩]

(১) "এটা শব্দ দ্বারা কুরআন মজীদের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে [কুরতুবী] অথবা ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি-নিষেধের প্রতিও ইশারা হতে পারে। [বাগভী] সে মতে আয়াতের মর্ম হচ্ছে-এই কুরআন অথবা এতে বর্ণিত হুকুম-আহকামসমূহ ঐসব লোকের জন্য স্মরণীয় হেদায়েত ও নসীহত, যারা উপদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। তবে এ কুরআন থেকে হেদায়াত নিতে হলে নফসকে বশ করা এবং সবর করার প্রয়োজন পড়ে। তাই পরবর্তী আয়াতে সবরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [সা'দী]

(২) বরং তারা যা আমল করে তন্মধ্যে যা উত্তম হয় তা তিনি কবুল করেন এবং সেটার প্রতিদান তিনি তাদেরকে তাদের আমলের চেয়েও উত্তমভাবে প্রদান করেন। তাই যখনই কারও মনে শিথিলতা আসে, তখনই এ সওয়াবের প্রতি দৃষ্টি দানের মাধ্যমে নিয়মিত সবর করার প্রতি উৎসাহ আসবে। [সা'দী]

১১৬. অতএব তোমাদের পূর্বের প্রজন্মসমূহের মধ্যে এমন প্রজ্ঞাবান কেন হয়নি, যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে নিষেধ করত? অল্প সংখ্যক ছাড়া, যাদেরকে আমরা তাদের মধ্য থেকে নাজাত দিয়েছিলাম[১]। আর যারা যুলুম করেছে তারা বিলাসিতার পেছনে পড়ে ছিল, আর তারা ছিল অপরাধী।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৭. আর আপনার রব এরূপ নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করবেন অথচ তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী[২]।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮. আর আপনার রব ইচ্ছে করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধকারীই রয়ে গেছে[৩],

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٨﴾

(১) এখানে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আযাব নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে তা থেকে আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ 'আফসোস, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে দায়িত্বশীল বিবেকবান কিছু লোক কেন ছিল না, যারা জাতিকে ফাসাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত? তাহলে তো তারা সমূলে ধ্বংস হত না। তবে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছিল, যারা নবীদের যথার্থ অনুসরণ করেছে এবং তারাই আযাব হতে নিরাপদ ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে অপকর্মে মেতে উঠেছিল। [দেখুন, মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ তারা যদি যালেম না হবে তবে তাদেরকে তিনি কেন ধ্বংস করবেন? যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "আর আমরা তাদের প্রতি যুলুম করিনি কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।" [সূরা হূদ: ১০১] [ইবন কাসীর]

(৩) এর অর্থ তারা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসে বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত হবেই। [ইবন কাসীর] তবে যাদেরকে আপনার প্রভু রহমত করেছেন তাদের ব্যাপারটি ভিন্ন। তারা হচ্ছেন রাসূলের প্রকৃত অনুসারী। যারা রাসূলের নির্দেশ অনুসারে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে ছিল, রাসূল যা জানিয়েছেন সেটা অনুসারে তারা চলেছে। তারপর যখন তাদের কাছে

১১৯. তবে তারা নয়, যাদেরকে আপনার রব দয়া করেছেন এবং তিনি তাদেরকে এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন। আর 'আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই', আপনার রবের এ কথা পূর্ণ হয়েছে(১)।

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

১২০. আর রাসূলদের ঐ সব বৃত্তান্ত আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করছি, যা দ্বারা আমরা আপনার চিত্তকে দৃঢ় করি, এর মাধ্যমে আপনার কাছে এসেছে সত্য এবং মুমিনদের কাছে এসেছে উপদেশ ও স্মরণ।

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১. আর যারা ঈমান আনে না তাদেরকে বলুন, 'তোমরা স্ব স্ব অবস্থানে কাজ করতে থাক, আমরাও কাজ করছি।

وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴿١٢١﴾

সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন, তখন তার অনুসরণ করেছে, তাকে সত্য বলে মেনেছে, তাকে সাহায্য করেছে। এভাবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা লাভ করেছে। আর তারাই হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত দল। [ইবন কাসীর]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাত ও জাহান্নাম তাদের প্রভুর দরবারে বিবাদ করবে। জান্নাত বলবেঃ হে রব! আমার কাছে শুধু দূর্বল ও পতিত লোকজনই প্রবেশ করছে। আর জাহান্নাম বলবে, হে রব! আমাকে অহংকারীদের দ্বারা প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে বলবেনঃ "তুমি আমার রহমত, আর জাহান্নামকে বলবেনঃ তুমি আমার আযাব। যাকে ইচ্ছা সেখানে পৌঁছাব। তবে তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করার দায়িত্ব আমারই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তবে জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের কাউকে সামান্যতম যুলুমও করবেন না। আর জাহান্নামের জন্য তিনি কিছু সৃষ্টি করবেন যা দ্বারা তিনি তা পুরা করবেন। তারপরও সে বলতে থাকবেঃ আর বেশী আছে কি? তিন বার বলবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ জাহান্নামে তাঁর পবিত্র পা রাখবেন ফলে তা পূর্ণ হয়ে যাবে। তার একাংশ অপরাংশের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। এবং বলবেঃ কাত্ব, কাত্ব, কাত্ব। (অর্থাৎ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার শব্দ)। [বুখারীঃ ৭৪৪৯]

১২২. 'এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।'

وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েব আল্লাহ্‌রই মালিকানায় এবং তাঁরই কাছে সবকিছু প্রত্যাবর্তন করানো হবে। কাজেই আপনি তাঁর 'ইবাদাত করুন এবং তাঁর উপর নির্ভর করুন। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আপনার রব গাফিল নন[১]।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٣﴾

(১) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আপনার উপর যারা মিথ্যারোপ করছে তাদের কোন কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌র কাছে গোপন নেই। তিনি তাদের অবস্থা, কথা সবই জানেন। সে অনুসারে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে এর প্রতিফল পূর্ণরূপেই প্রদান করবেন। আর অবশ্যই আল্লাহ্ আপনাকে ও আপনার দলকে দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য করবেন। [ইবন কাসীর]

১২- সূরা ইউসুফ



সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

নামকরণঃ এ সূরার নাম সূরা ইউসুফ। কারণ পুরো সূরা জুড়ে আছে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা।

আয়াত সংখ্যাঃ ১১১।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরা ইউসুফ মক্কায় নাযিল হয়েছে। [কুরতুবী] ইবন আব্বাস ও কাতাদা বলেন, এর চারটি আয়াত মাদানী। [কুরতুবী]

সূরার কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

এ সূরায় ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই উল্লেখিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনীরই বৈশিষ্ট্য। [কুরতুবী] এ ছাড়া অন্যসব আম্বিয়া 'আলাইহিমুস্ সালাম-এর কাহিনী ও ঘটনাবলী সমগ্র কুরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সুন্দর কিচ্ছা শোনানোর আব্দার করলে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইউসুফ নাযিল করেন। [মুস্তাদরাক হাকেমঃ ২৩৪৫, সহীহ্ ইবন হিব্বানঃ ৬২০৯, আল-আহাদীসুল মুখতারাঃ ১০৬৯]

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত(১)।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۟ۗ

২. নিশ্চয় আমরা এটা নাযিল করেছি(২) কুরআন হিসেবে আরবী ভাষায় যাতে

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

---

(১) অর্থাৎ এগুলো কুরআনের আয়াত। [ইবন কাসীর] সে গ্রন্থ যা হালাল ও হারামের বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা করে। মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য হেদায়াত ও সঠিক পথের দিশা জানিয়ে দেয়। [বাগভী; মুয়াসসার] কাতাদা বলেন, এ কুরআন অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী। আল্লাহ্ তাঁর হেদায়াত ও পথের দিশা তাতে বর্ণনা করেছেন। [তাবারী]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কুরআন নাযিল হয়েছে রামাদান মাসের চব্বিশ দিন গত হওয়ার পর'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১০৭]

তোমরা বুঝতে পার(১)।

৩. আমরা আপনার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি(২), ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে এ কুরআন পাঠিয়ে; যদিও এর

نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ اَحۡسَنَ الۡقَصَصِ بِمَاۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ ۖ وَاِنۡ كُنۡتَ مِنۡ قَبۡلِهٖ

(১) অর্থাৎ আমি একে আরবী কুরআন হিসেবে নাযিল করেছি, হয়ত এতে তোমরা বুঝতে পারবে। আল্লাহ্ তা'আলা আরবদের ভাষায় এ কাহিনী নাযিল করেছেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সততা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাহিনীতে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশাবলীকে চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ার পেছনে একটি কারণ হচ্ছে, আরবী ভাষা সবচেয়ে প্রাঞ্জল ভাষা এবং সবচেয়ে প্রশস্ত ভাষা। তাই আল্লাহ্ চাইলেন যে, তার সবচেয়ে সম্মানিত কিতাবটি সবচেয়ে মহৎ ভাষায় নাযিল করবেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাসূলের কাছে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ফিরিশতার মাধ্যমে। আর তাও সংঘটিত হয়েছিল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভূমিতে। অনুরূপভাবে তার নাযিল হওয়াও শুরু হয়েছিল বছরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাসে। আর তা হচ্ছে রামাদান। তাই এ কুরআন সবদিক থেকেই পরিপূর্ণ। তাই এরপরই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, "আমরা আপনার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে এ কুরআন পাঠিয়ে" অর্থাৎ এ কুরআন আপনার কাছে ওহী করার কারণেই তা বলা সম্ভব হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ "আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর অনেকদিন থেকে বিভিন্ন আয়াত নাযিল করছিল, তখন সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমাদেরকে কোন কিছ্ছা শোনাতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন এবং ইউসুফ আলাইহিসসালামের কাহিনী শোনান।" [ইতহাফ আল খিয়ারাহঃ ১/২৩৮, ১৬২ মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৩৪৫, ইবনে হিব্বান -আলইহসান- ৬২০৯, দিয়া আল মাকদেসীঃ আল-মুখতারাহঃ১০৬৯]
এ কাহিনীকে উত্তম কাহিনী বলার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে। কারও কারও মতে, কারণ এতে রয়েছে শিক্ষা, উপদেশ, হিকমত বা প্রজ্ঞা যা অন্য কোন কাহিনীতে নেই। কারও কারও মতে, কারণ এতে রয়েছে উত্তম কথোপকথন, ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর তার ভাইদের অত্যাচারের বিপরীতে সবর ও তাদেরকে ক্ষমার বর্ণনা। কারও কারও মতে, কারণ এতে রয়েছে নবীদের কথা, সৎলোকদের কথা, ফিরিশতাদের কথা, শয়তানের কথা, জিন, মানব, জন্তু জানোয়ার, পাখি, রাজা-বাদশাদের চরিত, ব্যবসায়ী, আলেম, জাহেল, পুরুষ, মহিলাদের কথা। মহিলাদের বাহানা ও তাদের ষড়যন্ত্রের কথা। [ফাতহুল কাদীর]

لِمِنَ الْغٰفِلِيْنَ۝

আগে আপনি ছিলেন অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত[১]।

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يٰٓأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سٰجِدِيْنَ۝

৪. স্মরণ করুন, যখন 'ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিলেন, 'হে আমার পিতা! আমি তো দেখেছি এগার নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদকে, দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজ্‌দাবনত অবস্থায়[২]।'

---

(১) অর্থাৎ আমি এ কুরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি নাযিল করে আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর এভাবে আমরা আপনার প্রতি আমাদের নির্দেশ থেকে রূহ ওহী করেছি; আপনি তো জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি ! কিন্তু আমরা এটাকে করেছি আলো যা দ্বারা আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে হেদায়াত দান করি" [সূরা আশ-শূরা:৫২] [সা'দী] এতে নবুওয়াতের দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। কেননা, তিনি পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞও ছিলেন। সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যম আল্লাহ্‌র শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আল্লামা ইবন কাসীর এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যনির্দেশ করেছেন। তা হচ্ছে, যেহেতু এ কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছেন সেহেতু এ কিতাব নাযিল হওয়ার পর অন্য কোন কিতাবের প্রয়োজন নেই। কারণ, একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোন এক কিতাবী লোক থেকে একটি প্রাচীন গ্রন্থ পেয়ে তা নিয়ে এসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠ করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! তোমরা কি পেরেশান হয়ে গেছ? পরিণাম বিবেচনা না করে যা-তা করে বেড়াবে? যত্র-তত্র ঢুকে যাবে? যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, অবশ্যই আমি এটাকে শুভ্র,স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হিসেবে নিয়ে এসেছি। তোমরা তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো না, ফলে তারা তোমাদেরকে কোন হক কথা জানাবে আর তোমরা মিথ্যা মনে করবে, আবার কোন বাতিল কথা জানাবে আর তোমরা সেটাকে সত্য মনে করবে। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, যদি মূসা জীবিত থাকতেন তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না।' [ইবন আবী আসেম: আস-সুন্নাহ ১/২৭]

(২) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'কারীম ইবনে কারীম ইবনে কারীম ইবনে কারীম হল ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিমুস্ সালাম। অর্থাৎ চার পুরুষ

৫. তিনি বললেন, 'হে আমার বৎস! তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বলো না[১]; বললে তারা তোমার

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ

ধরে সম্মানিত হচ্ছেন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম।' [বুখারীঃ ৩৩৯০, ৪৬৮৮] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সবচেয়ে সম্মানিত কে? তিনি বললেনঃ তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হল যে বেশী তাকওয়ার অধিকারী। লোকেরা বললঃ আমরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করছি না, তখন তিনি বললেনঃ তাহলে সবচেয়ে সম্মানিত হলেন আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ। তার পিতা একজন নবী ছিলেন, আর তার দাদাও একজন নবী, যেমনিভাবে তার পরদাদাও নবী। [বুখারী ৩৩৫০, মুসলিমঃ ২৩৭৮]

ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম তার পিতাকে বললেনঃ পিতঃ! আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরো দেখেছি যে, তারা আমাকে সিজ্‌দা করছে। এটা ছিল ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর স্বপ্ন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ এগারটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর এগার ভাই, সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা। তিনি আরো বলেনঃ নবীদের স্বপ্ন ছিল ওহীর নামান্তর। [তাবারী; ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, 'নেক স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ স্বপ্ন দেখবে তখন সে যেন তা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চায় এবং তার বাম দিকে থুথু ফেলে। ফলে সেটা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' [বুখারী: ৬৯৮৬]

(১) আয়াতে ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, হিতাকাংখী ও সহানুভূতিশীল নয়- এরূপ লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়। এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয়- এমন ব্যক্তির কাছেও স্বপ্ন ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কষ্টদায়ক বিপজ্জনক স্বপ্ন কারো কাছে বর্ণনা করতে নেই। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'স্বপ্ন পাখির পায়ের সাথে থাকে যতক্ষণ না সেটার ব্যাখ্যা করা হয়। যখনই সেটার ব্যাখ্যা করা হয়, তখনই সেটা পড়ে যায়। তিনি আরও বলেন, স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। তিনি আরও বলেছেন, স্বপ্নকে যেন কোন বন্ধু বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও কাছে বিবৃত করা না হয়।' [ইবন মাজাহ: ৩৯১৪; মুসনাদ:৪/১০] অন্য হাদীসে এসেছে, 'তোমাদের কেউ যখন কোন পছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন যাকে মহব্বত করে তার নিকট বলে। আর যখন কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার অন্য পার্শ্বে শয়ন করে এবং বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে, আল্লাহ্‌র কাছে এর অনিষ্ট হতে আশ্রয় চায়, কাউকে এ সম্পর্কে কিছু না বলে, ফলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' [মুসলিম:২২৬২] অন্যান্য হাদীসের

عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে[১]। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু[২]।'

বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র দয়া ও সহানুভূতির উপর ভিত্তিশীল -আইনগত হারাম নয়। সহীহ্ হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, ওহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 'আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার তরবারী 'যুলফিকার' ভেঙ্গে গেছে এবং আরো কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি।' এর ব্যাখ্যা ছিল হামযা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-সহ অনেক মুসলিমের শাহাদাত বরণ। এটা একটা আশু মারাত্মক বিপর্যয় সম্পর্কিত ইঙ্গিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন। [মুস্তাদরাক হাকেমঃ ২৫৮৮, মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৭১]

(১) এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, মুসলিমকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের কোন মন্দ অভ্যাস কিংবা খারাপ উদ্দেশ্য প্রকাশ করা জায়েয। এটা গীবত কিংবা অসাক্ষাতে পরনিন্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ আয়াতে ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে বলে দিয়েছেন যে, ভাইদের পক্ষ থেকে তার প্রতি শত্রুতার আশংকা রয়েছে। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ বৎস! তুমি এ স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ্ না করুন, তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। কেননা, শয়তান হল মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত করে দেয়। নবীগণের সব স্বপ্ন ওহীর সমপর্যায়ভুক্ত। সাধারণ মুসলিমদের স্বপ্নে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কারো জন্য প্রমাণ হয় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যখন সময় ঘনিয়ে আসবে (কেয়ামত নিকটবর্তী হবে) তখন মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন প্রায়ই সত্য হবে। আর মুমিনের স্বপ্ন নবুয়তের চল্লিশতম অংশ, আর যা নবুওয়াতের এ অংশের স্বপ্ন, তা মিথ্যা হবে না। বলা হয়ে থাকে, স্বপ্ন তিন প্রকার। এক প্রকার হচ্ছে মনের ভাষ্য, আরেক প্রকার হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি জাগ্রত করে দেয়া। আর তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে- আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে তবে সে যেন তা কারো কাছে বিবৃত না করে; বরং উঠে এবং সালাত আদায় করে।' [বুখারীঃ ৭০১৭]

অপর হাদীসে এসেছে, "যতক্ষন পর্যন্ত স্বপ্নের তা'বীর করা না হয় ততক্ষণ তা উড়ন্ত অবস্থায় থাকে, তারপর যখনি তা'বীর করা হয় তখনি তা পতিত হয় বা ঘটে যায়"। [মুসনাদে আহমাদ ৪/১০, আবু দাউদঃ ৫০২০, তিরমিযীঃ ২২৭৮, ইবনে মাজাহঃ ৩৯১৪]

এখানে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ-এর অর্থ কি? এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম

৬. আর এভাবে আপনার রব আপনাকে মনোনীত করবেন এবং আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা[১] শিক্ষা দেবেন[২] এবং

وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ

ছ'মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ষান্মাসিকে জিবরাঈলের মধ্যস্থতায় ওহী আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নুবয়তের ৪৬তম অংশ। [কুরতুবী] এখানে আরও জানা আবশ্যক যে, হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুয়তের অংশ, কিন্তু নবুওয়াত নয়। নবুওয়াত আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'ভবিষ্যতে 'মুবাশ্শিরাত' ব্যতীত নবুয়তের কোন অংশ বাকী নেই। সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ 'মুবাশ্শিরাত' বলতে কি বুঝায়? উত্তর হলঃ সত্য স্বপ্ন।[বুখারীঃ ৬৯৯০] এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়াত কোন প্রকারে অথবা কোন আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশ্শিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়। তবে সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া এটুকু বিষয়ই কারো সৎ, দ্বীনী এমনকি মুসলিম হওয়ারও প্রমাণ নয়। তবে এটা ঠিক যে, সৎ ও নেক লোকদের স্বপ্ন সাধারণতঃ সত্য হবে -এটাই আল্লাহ্র সাধারণ রীতি। ফাসেক ও পাপাচারীদের সাধারণতঃ মনের সংলাপ ও শয়তানী প্ররোচনা ধরণের মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব। মোটকথা, সত্য স্বপ্ন সাধারণ মুসলিমদের জন্য হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সুসংবাদ কিংবা হুশিয়ারীর চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে না। এটা স্বয়ং তাদের জন্য কোন ব্যাপারে প্রমাণরূপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যও নয়।

(১) উপরে বর্ণিত অর্থটি মুজাহিদ ও অন্যান্য তাফসীরকারক বর্ণনা করেছেন। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ সত্য কথার ব্যাখ্যা। সে হিসেবে আসমানী কিতাবসমূহের সঠিক ব্যাখ্যাও হতে পারে। [সা'দী]

(২) অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, আয়াতটি ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর পূর্ব কথার পরিপূরক বাক্য অর্থাৎ ইয়া'কূব আলাইহিস সালাম নিজেই বলছেন, হে ইউসুফ! তুমি তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের বলো না। কেননা, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। যেভাবে তুমি স্বপ্নে তোমাকে সম্মানিত দেখেছ, এভাবে আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করবেন নবী হিসেবে এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে। অনুরূপভাবে তোমার উপর তাঁর নেয়ামত পরিপূর্ণ করবেন। [বাগভী; ইবন কাসীর] অথবা এ আয়াতটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি প্রদত্ত সুসংবাদ অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে কতিপয় নেয়ামত দানের ওয়াদা করেছেন। প্রথম, আল্লাহ্ স্বীয় নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজির জন্য আপনাকে মনোনীত করবেন। মিসর দেশে রাজ্য, সম্মান ধন-সম্পদ লাভের মাধ্যমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা

اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۟

আপনার প্রতি ও ইয়া'কূবের পরিবার-পরিজনদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন[১], যেভাবে তিনি এটা আগে পূর্ণ করেছিলেন আপনার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর[২]। নিশ্চয় আপনার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়[৩]।

দ্বিতীয় রুকূ'

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ۟

৭. অবশ্যই ইউসুফ এবং তাঁর ভাইদের[৪] ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য অনেক

সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। [কুরতুবী] তবে প্রথম তাফসীরটি বেশী যুক্তিযুক্ত। এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যা আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন ব্যক্তিকে দান করেন। সবাই এর যোগ্য নয়। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ্ এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। [দেখুন, কুরতুবী]

(১) তৃতীয় ওয়াদা ﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনার প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করবেন। এতে নবুওয়াত দানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যসমূহেও এর প্রতি ইঙ্গিত আছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনার ভাইদেরকে আপনার প্রতি মুখাপেক্ষী বানাব। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন, আপনাকে প্রতিটি বিপদ থেকে উদ্ধার করব। [কুরতুবী] তবে আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে বুঝা যায় যে, এখানে নবুওয়াতই বুঝানো হয়েছে।

(২) অর্থাৎ যেভাবে আমি স্বীয় নবুওয়াতের নেয়ামত আপনার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পূর্ণ করেছি। এখানে নেয়ামত বলতে অন্যান্য নেয়ামতের সাথে সাথে নবুওয়াত ও রেসালাতই উদ্দেশ্য। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ﴿اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিজ্ঞ। তিনি ভাল করেই জানেন কার কাছে ওহী পাঠাবেন, কাকে রাসূল বানাবেন। কে নবুওয়াত ও রিসালাতের অধিক উপযুক্ত। [ইবন কাসীর]

(৪) আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফসহ ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর বারজন পুত্র সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর উপাধি ছিল 'ইসরাঈল'। তাই বারটি পরিবার সবাই 'বনী-ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বিনইয়ামীন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাত্রেয় ভাই। [বাগভী; কুরতুবী; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১/৪৫৫]

নিদর্শন রয়েছে(১)।

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۝٨

৮. স্মরণ করুন, তারা বলেছিল, 'আমাদের পিতার কাছে ইউসুফ এবং তার ভাই তো আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে(২)।

(১) এ আয়াতে বর্ণিত নিদর্শনসমূহ কি? এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে। এক. এতে রয়েছে উপদেশ ও শিক্ষা। দুই. আশ্চর্যজনক কথাসমূহ। তিন. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ। কারণ, তিনি এ ঘটনা জানতেন না, যদি তার কাছে ওহী না আসে তো তিনি তা কিভাবে জানালেন? চার. এর অর্থ হচ্ছে, যারা প্রশ্ন করে জানতে চায় এবং যারা জানতে চায় না তাদের সবার জন্যই রয়েছে নিদর্শন। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এ কাহিনীর মধ্যে অনেক প্রকার শিক্ষা রয়েছে। যেমন, এতে রয়েছে ভাইদের হিংসা, তাদের হিংসার পরিণতি, ইউসুফের স্বপ্ন এবং এর বাস্তবায়ন, কুপ্রবৃত্তি থেকে, দাসত্ব অবস্থা, বন্দিত্ব অবস্থা ইত্যাদিতে ইউসুফের সবর, বাদশাহী প্রাপ্তি, ইয়া'কূবের পেরেশানী, তার ধৈর্য। শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত অবস্থায় উপনীত হওয়া ইত্যাদি সবই এখানে নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে। [বাগভী] তাই এ সূরায় বর্ণিত ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয়; বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দেশাবলী রয়েছে।

(২) এখানে ضلال বলে পথভ্রষ্টতা বুঝানো হয়নি। বরং কোন বিষয়ের আসল জ্ঞানের অভাব বুঝানো উদ্দেশ্য। কুরআনের অন্যত্রও এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভ্রাতারা তার পিতাকে এ সূরার অন্যত্র বলেছিল, "আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো পুরাতন জ্ঞানহীনতাতেই আছেন।" [৯৫] তাছাড়া অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ বলেছেন যে, "আর আপনাকে তিনি (আল্লাহ্) পেয়েছেন (এ বিষয়ে) জ্ঞান-হীন, তারপর তিনি আপনাকে পথ দেখিয়েছেন।" [সূরা আদ-দোহা: ৭] এখানে অর্থ হবে, যে সমস্ত জ্ঞান ওহী ব্যতীত পাওয়া যায় না সেগুলোতে আপনি জ্ঞানী ছিলেন না। তারপর আল্লাহ্ আপনাকে এ কুরআন ওহী করার মাধ্যমে সেগুলোর প্রতি দিক-নির্দেশ করেছেন এবং আপনাকে তা জানিয়েছেন। সে হিসেবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এ নয় যে, তারা ইয়া'কূব আলাইহিস সালামকে দ্বীনীভাবে ভ্রষ্ট বলছেন, কারণ এটা বললে কাফের হয়ে যাবে। বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো, তাদের পিতা তাদের ধারণা মতে বাস্তব অবস্থা বুঝতে অক্ষম,

٩ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ

৯. 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা কোন স্থানে তাকে ফেলে আস, তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে(১) ।'

প্রতিটি বস্তুকে তার সঠিক স্থানে স্থান দেন নি। নতুবা কিভাবে তিনি দশজনকে ভাল না বেসে দু'জনকে ভালবাসলেন? দশজন তো দু'জনের চেয়ে বেশী উপকারী ও তার কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বেশী দক্ষ। [আদওয়াউল বায়ান]

এ আয়াত থেকে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ভ্রাতারা পিতা ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-কে দেখল যে, তিনি ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তারা পরস্পর বলাবলি করলঃ আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বিনইয়ামীনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ আমরা দশজন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হল এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। আমাদের পিতা আসলে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নন। তার উচিত আমাদেরকে প্রাধান্য দেয়া। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউসুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূর দেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

(১) এ আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ মত প্রকাশ করল যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বললঃ তাকে কোন অন্ধকুপের গভীরে নিক্ষেপ করা হোক- যাতে মাঝখান থেকে এ কন্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কুপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গোনাহ্ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তাওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে পারবে। আয়াতের ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। [কুরতুবী] অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর পিতা-মাতার কাছে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। কাউকে আর প্রাধান্য দেয়ার বিষয় থাকবে না। [কুরতুবী]

ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ভ্রাতারা যে নবী ছিল না, উপরোক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ। কেননা, এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবীরা গোনাহ্ করেছে। একজন নিরপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা এবং তাকে কষ্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও অসৎ চক্রান্ত ইত্যাদি। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿١٠﴾

১০. তাদের মধ্যে একজন বলল, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না এবং যদি কিছু করতেই চাও তবে তাকে কোন কূপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে[১]।'

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ﴿١١﴾

১১. তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আপনার কি হলো যে, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে নিরাপদ মনে করছেন না, অথচ আমরা তো তার শুভাকাংখী?

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. 'আপনি আগামী কাল তাকে আমাদের সাথে পাঠান, সে সানন্দে ঘোরাফেরা করবে ও খেলাধুলা করবে[২]। আর

---

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বললঃ ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে, কুপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পথিক যখন কুপে আসে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোন দূরদেশে যেতে হবে না। কোন কাফেলা আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেবে। কারো কারো মতে এ অভিমত প্রকাশকারী সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ছোট ভাই বিনইয়ামীনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিলঃ আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না। [তাবারী; কুরতুবী]

(২) এ আয়াতে ইয়াকুব 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে আনন্দ-ভ্রমণ এবং স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি। তিনি শুধু ইউসুফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্ততঃ করেছেন, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এতে বোঝা গেল যে, তাদের আনন্দ-ভ্রমণ ও খেলাধুলা শরী'আতের সীমার মধ্যে ছিল। [কুরতুবী] আর খেলা-ধুলা বিধিবদ্ধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয়, বরং সহীহ্ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় শরী'আতের সীমা লঙ্ঘন বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে শরী'আতের বিধান লঙ্ঘিত হতে পারে এমন কোন কিছুর মিশ্রণও উচিত নয়।

আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী হব ।'

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَٰفِلُونَ ﴿١٣﴾

১৩. তিনি বললেন, 'এটা আমাকে অবশ্যই কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে, আর তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে ।'

قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿١٤﴾

১৪. তারা বলল, 'আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত ।'

فَلَمَّا ذَهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓا۟ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

১৫. অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হল, আর এ অবস্থায় আমরা তাকে জানিয়ে দিলাম, 'তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা অবশ্যই বলে দেবে'; অথচ তারা তা উপলব্ধি করতে পারবে না(১) ।

---

(১) এ আয়াতের বিভিন্ন প্রকার অর্থ করা হয়ে থাকেঃ

১) ইবনে আব্বাস বলেন, ভাইয়েরা যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কুপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি ভাইদের কাছে তাদের এ কুকর্মের কথা ব্যক্ত করবে । তারা তখন তোমার অবস্থানের ব্যাপারটি সম্পর্কে কিছু কল্পনাই করতে পারবে না । [ইবন কাসীর]

২) কাতাদাহ্ বলেনঃ এ আয়াতের অর্থ- আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে কুপের মধ্যে ওহী প্রেরণ করে জানালেন যে, আপনি অচিরেই তাদেরকে এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করবেন । অথচ ইউসুফের ভাইয়েরা সে ওহী সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলনা । [ইবন কাসীর]

৩) ইমাম কুরতুবী বলেনঃ এ ওহী সম্পর্কে দু'প্রকার ধারণা সম্ভবপর । (এক) কুপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তার সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্য এ ওহী আগমন

وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾

১৬. আর তারা রাতের প্রথম প্রহরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে আসল।

قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَٰدِقِينَ ﴿١٧﴾

১৭. তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম[১] এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী হই।'

وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

১৮. আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। তিনি বললেন, 'না, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে।

করেছিল। (দুই) কুপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে ভবিষ্যত ঘটনাবলী বলে দিয়েছিলেন। এতে আরো বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমন পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি তাদেরকে তিরস্কার করার সুযোগ পাবে; অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ।

(১) ইবনুল আরাবী 'আহ্কামুল কুরআন গ্রন্থে বলেনঃ পারস্পরিক (দৌড়) প্রতিযোগিতা শরী'আতসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জিহাদেও কাজে আসে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তাছাড়া ঘোড়দৌড়ও প্রমাণিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তা করেছেন। [দেখুন, বুখারী: ২৮৭৯; মুসলিম: ১৮৭০] সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া' জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। [দেখুন, মুসলিম: ১৮০৭; মুসনাদে আহমাদ: ৪/৫২] উল্লেখিত আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা আসল ঘোড়দৌড়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এছাড়া সাধারণ দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েয। কিন্তু পরস্পর হার-জিতে কোন টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা কুরআনুল কারীমে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। [আহকামুল কুরআন; অনুরূপ দেখুন, কুরতুবী]

কাজেই উত্তম ধৈর্যই আমি গ্রহণ করব। আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল[১]।'

১৯. আর এক যাত্রীদল আসল, অতঃপর তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পাঠালে সে তার পানির বালতি নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, 'কী সুখবর! এ যে এক কিশোর![২]' এবং তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল[৩]। আর তারা

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ⑲

(১) অর্থাৎ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ভ্রাতারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বাঘই তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম ঠিকই বুঝলেন যে, ইউসুফকে বাঘে খায়নি; বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় খাড়া করেছে। এখন আমার জন্য উত্তম এই যে, ধৈর্য্যধারণ করি এবং তোমরা যা বল, তাতে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করি।

(২) ঘটনাচক্রে একটি কাফেলা এ স্থানে এসে যায়। কোন কোন তাফসীরে বলা হয়েছেঃ এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। [কুরতুবী] তারা পানি সংগ্রহকারীকে কুপে প্রেরণ করল। লোকটি এই কুপে পৌঁছলেন এবং বালতি নিক্ষেপ করলেন। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম সর্বশক্তিমানের সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যত মাহাত্ম্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণগত উৎকর্ষের নিদর্শনাবলী তার মাহাত্ম্যের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কুপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অল্পবয়স্ক, অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে লোকটি সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলঃ ﴿يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ﴾ -আরে, আনন্দের কথা- এ তো বড় চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'আমি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক তাকে দান করেছেন।' [মুসলিমঃ ১৬২]

(৩) অর্থাৎ তারা তাকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করে গোপন করে ফেলল। উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে এ কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল; কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করল যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে

যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত[১] ।

২০. আর তারা তাকে বিক্রি করল স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে[২] এবং তারা ছিল তার

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝٢٠

ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করা যায় । সমগ্র কাফেলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে অংশীদার হয়ে যাবে । এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ভ্রাতারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাকে পণ্যদ্রব্য করে নিল । এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ ভ্রাতারা নিজেরাই ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিল । [তাবারী; কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল । উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা কি করবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রেতা কাফেলা কি করবে, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল । তিনি তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়ারও শক্তি রাখতেন । কিন্তু বিশেষ কোন রহস্যের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এসব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করেননি; বরং নিজস্ব পথে চলতে দিয়েছেন । এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটার প্রতি ইঙ্গিত করলেন যে, আপনার কাওম আপনার উপর যে নির্যাতন চালাচ্ছে তা আমার অজানা নয়, আমি এটার প্রতিকার করতে পারি । কিন্তু আমি তাদেরকে ছাড় দেই । তারপর উত্তম পরিণাম আপনার জন্যই হবে । আর তাদের বিচার আপনিই করবেন । যেমনটি ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর তার ভাইদের প্রাধান্য ও বিচারের ভার পড়েছিল । [ইবন কাসীর]

(২) আরবী ভাষায় شَراء শব্দ ক্রয় করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয় । এ স্থলেও উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে । যদি সর্বনামকে ইউসুফ ভ্রাতাদের দিকে ফেরানো হয়, তবে বিক্রয় করার অর্থ হবে এবং কাফেলার লোকদের দিকে ফেরানো হলে ক্রয় করার অর্থ হবে । [ইবন কাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা বিক্রয় করে দিল কিংবা কাফেলার লোকেরা ইউসুফকে খুব সস্তা মূল্যে অর্থাৎ নামে মাত্র কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল । আয়াতে বর্ণিত بَخْسٍ এর দু'টি অর্থ হতে পারেঃ (এক) খুব কম মূল্যে; [তাবারী] কারণ তারা বাস্তবিকই তাকে খুব কম মূল্যে বিক্রয় করেছিল । (দুই) অন্যায় বা নিকৃষ্ট বিক্রয় সম্পন্ন করল; কারণ তারা স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করেছিল । স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করা হারাম । [কুরতুবী] ইমাম কুরতুবী আরও বলেনঃ আরব বণিকদের অভ্যাস ছিল, তারা মোটা অঙ্কের লেন-দেন পরিমাপের মাধ্যমে করত এবং চল্লিশের উর্ধ্বে নয়, এমন লেন-দেন গণনার মাধ্যমে করত । তাই دَرَاهِمَ শব্দের সাথে مَعْدُودَةٍ (গুণাগুনতি) শব্দের প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে, দিরহামের পরিমাণ চল্লিশের

ব্যাপারে অনাগ্রহী[১]।

তৃতীয় রুকূ'

২১. আর মিসরের যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, 'এর থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা কর, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে বা আমরা একে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি[২]।' আর এভাবেই

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۡ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾

কম ছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বর্ণনায় এসেছে, বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছিল এবং দশ ভাই দুই দিরহাম করে নিজেদের মধ্যে তা বন্টন করে নিয়েছিল। [কুরতুবী]

(১) এর দু'টি অর্থ হতে পারে- (এক) ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফ-এর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ছিল, তাই তারা এত কমদামে বিক্রয় করে দিয়েছিল। [ইবন কাসীর] ইউসুফকে কম মূল্যে বিক্রয় করার কারণ আবার দু'টি হতে পারে। প্রথমতঃ এ কারণে যে, তারা এ মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। দ্বিতীয়তঃ তাদের আসল লক্ষ্য তার দ্বারা টাকা-পয়সা উপার্জন করা ছিল না; বরং পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়াই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। তাই শুধু বিক্রয় করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা আশংকা করছিল যে, কাফেলার লোকেরা তাকে এখানেই ছেড়ে যাবে এবং অতঃপর সে কোন রকমে পিতার কাছে পৌঁছে আগাগোড়া চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। তাই তাফসীরবিদ মুজাহিদের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। যখন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল, তখন তারা কিছুদূর পর্যন্ত কাফেলার পিছনে পিছনে গেল এবং তাদেরকে বললঃ দেখ, এর পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিও না; বরং বেঁধে রাখ। [কুরতুবী; সা'দী] (দুই) এ আয়াতের আরেকটি অর্থ হতে পারে যে, কাফেলার লোকেরা ইউসুফের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিচ্ছিল না, কেননা, কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর মূল্য আর কতই হতে পারে? [ফাতহুল কাদীর] কাফেলা বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে মিশর পর্যন্ত পৌঁছে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে বিক্রি করে দিল।

(২) অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে মিসরে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বললঃ ইউসুফের বসবাসের সুন্দর বন্দোবস্ত কর। ইবনে কাসীর বলেনঃ যে ব্যক্তি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছেন। প্রথম- আযীযে মিসর। তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দ্বারা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর গুণাবলী অবহিত হয়ে

আমরা ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম[১]; এবং যাতে আমরা তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই[২]। আর আল্লাহ্ তাঁর কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[৩]।

স্ত্রীকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়- ঐ কন্যা, যে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে তার পিতাকে বলেছিলঃ "পিতঃ, তাকে কর্মচারী রেখে দিন। কেননা, উত্তম কর্মচারী ঐ ব্যক্তি, যে সবল, সুঠাম ও বিশ্বস্ত হয়।" [আল-কাসাসঃ ২৬] তৃতীয়- আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, যিনি ফারূকে আযম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছিলেন। [তাবারী; ইবনে কাসীর]

(১) অর্থাৎ যেভাবে ইউসুফকে কুপ থেকে বের করে আযীযে মিসর পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম তেমনিভাবে তাকে আমি যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) ﴿وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾ -এখানে শুরুতে واو কে عطف এর অর্থে নিলে এ অর্থেরই একটি বাক্য উহ্য মেনে নেয়া হবে। অর্থাৎ আমি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে প্রতিষ্ঠিত করেছি। যাতে তিনি এ সময়টুকুতে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। আহকাম বিষয়ক ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিষয়ক সব জ্ঞান অর্জন করার সুযোগই তিনি লাভ করতে পারবেন। সুতরাং এভাবে তাকে আমরা বাক্যাদির পরিপূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। [সা'দী] অথবা এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ হিসেবে এসেছে অর্থাৎ তাকে আমি যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি, যার ভূমিকা হিসাবে আমি তাকে স্বপ্নের তা'বীর শিক্ষা দিয়েছি। [বাগভী] বস্তুতঃ তিনি এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। অথবা ইয়া'কূব আলাইহিস সালামের পূর্ব ঘোষিত বাণী, 'আল্লাহ্ আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন' এ কথাটির সত্যয়ণ হিসেবে আমি আপনাকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কর্মে প্রবল ও শক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। [ইবন কাসীর] কেউই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে গিয়ে কোন কাজ হাসিল করতে পারে না। কোন কিছু করতে হলে তিনি তো শুধু বলেন 'হও' আর সাথে সাথে তা হয়ে যায়। [কুরতুবী] এর উদাহরণ হিসেবে কেউ কেউ বলেন, ইয়া'কূব আলাইহিস সালাম চেয়েছিলেন যেন ইউসুফের স্বপ্ন তার ভাইয়েরা না জানে, কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন যে, তারা জানুক, সুতরাং তাই হয়েছে। ইউসুফের ভাইয়েরা চেয়েছিল ইউসুফকে হত্যা করতে, কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন যে, সে বেঁচে থাকবে এবং কর্ণধার হবে, বাস্তবে হয়েছেও তাই। ইউসুফের ভাইয়েরা চেয়েছিল ইয়া'কূবের মন থেকে ইউসুফের কথা ঘুচে যাক কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন যে, তা জাগরুক থাকুক।

২২. আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল তখন আমরা তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম[১]। আর এভাবেই আমরা ইহসানকারীদেরকে পুরস্কৃত করি[২]।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

সুতরাং ইয়া'কূব সর্বক্ষণ ইউসুফের কথাই বলেছিল। তারা চাইলো যে, তাদের পিতাকে চোখের পানি দিয়ে ধোঁকা দিবে, কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন যে, ইয়া'কূব তাদের কথায় বিশ্বাস করবেন না, ফলে তাই হলো। আযীয পত্নী চেয়েছিল ইউসুফকে দোষারোপ করতে কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন যে, তিনি দোষমুক্ত ঘোষিত হবেন, ফলে আযীযের মুখ থেকে আযীয পত্নীই দোষী সাব্যস্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ পেলেন। ইউসুফ চাইলেন যে, শরাব পরিবেশনকারী তার কথা বাদশাহকে বলে তাকে বিমুক্ত করে দিক, কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন যে, শরাব পরিবেশনকারী তা ভুলে যাক, ফলে তাই হলো। এসবই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছায় প্রবল। [কুরতুবী]

কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ আলাইহিস সালামের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অত্যন্ত প্রবল। তিনি নিজে ইউসুফের কর্মকাণ্ডগুলো নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তার কোন ব্যাপার অন্যের উপর ন্যস্ত করেন নি। যাতে করে তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রকারীর যড়যন্ত্র সফল হতে না পারে। [বাগভী]

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য বোঝে না। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে অধিকাংশ বলে সকল মানুষকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ, কেউই গায়েব জানে না। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে অধিকাংশই উদ্দেশ্য, কারণ, কোন কোন নবী-রাসূলকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন কাজের হিকমত সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবহিত করেন। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে অধিকাংশ মানুষ বলে মুশরিক এবং যারা তাকদীরের উপর ঈমান রাখে না তাদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম পূর্ণ শক্তি ও যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও বুৎপত্তি দান করলাম। 'শক্তি ও যৌবন' কোন বয়সে অর্জিত হল, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আর ইলম বা বুৎপত্তি দান করার অর্থ এস্থলে নবুওয়াত দান করা। [ইবন কাসীর] মূলতঃ কুরআনের ভাষায় সাধারণভাবে এমন শব্দের মানে হয় "নবুওয়াত দান করা"। ফায়সালা করার শক্তিকে কুরআনের মূল ভাষ্যে বলা হয়েছে "হুকুম"। এ হুকুম অর্থ কর্তৃত্বও হয়। [কুরতুবী]

(২) আমি ইহসানকারীদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যন্ত পৌঁছানো ছিল ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সদাচরণ, আল্লাহ্ ভীতি ও সৎকর্মের পরিণতি। এটা শুধু

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْۤ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৩. আর তিনি যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিলেন সে তাকে কুপ্ররোচনা দিল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল, আর বলল, 'আস(১)।' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি(২), নিশ্চয় তিনি আমার মনিব;

তারই বৈশিষ্ট নয়, যে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার লাভ করবে। সুতরাং যেভাবে আমি ইউসুফকে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পার করে সফলতা দিয়েছি তেমনি আপনাকেও হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার কাওমের মুশরিকদের শত্রুতা থেকে নাজাত দেব এবং আপনাকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করব। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ যে মহিলার গৃহে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম থাকতেন, সে তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং তার সাথে কু বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাকে ফুসলাতে লাগল। সে গৃহের সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাকে বললঃ শীঘ্রই এসে যাও, তোমাকে বলছি। ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ শব্দের এক অর্থ, আমার কাছে এস, তোমার কাজ সম্পাদনের জন্য। দ্বিতীয় অর্থ, আমি তোমার জন্য প্রস্তুত। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আযীযে মিসরের স্ত্রী। কিন্তু এস্থলে কুরআন 'আযীয-পত্নী' এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে 'যার গৃহে সে ছিল' -এ শব্দ ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরো অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে- তারই আশ্রয়ে থাকতেন। তার আদেশ উপেক্ষা করা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। [ইবনুল কাইয়্যেম, রাওদাতুল মুহিব্বীন: ২৯৭-৩০০] আর এজন্যই ঐ সমস্ত লোকদেরকে কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করবে বলে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যারা সুন্দরী-ধনী মহিলার কুপ্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। এবং তাঁকে ভয় করে বলে ঘোষণা দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সাত শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা আরশের নীচে ছায়া দেবেন। তন্মধ্যে ঐ ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন, যাকে কোন ধনাঢ্য-পদস্থ-সুন্দরী মহিলা খারাপ কর্মকাণ্ডের আহ্বান জানালে সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে ঘোষণা দিয়ে তা হতে দূরে থাকে। [বুখারীঃ ৬৬০]

(২) এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন নবীসুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের উপর ভরসা করেননি। এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। বস্তুতঃ গোনাহ্ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন হল আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাওয়া।

তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় যালিমরা সফলকাম হয় না(১)।'

২৪. আর সে মহিলা তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং তিনিও তার প্রতি আসক্ত(২) হয়ে পড়তেন যদি

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ

(১) তিনি নবীসুলভ বিজ্ঞতা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং সেই মহিলাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা। তিনি বললেনঃ ﴿إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ তিনি আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন। মনে রেখো, অত্যাচারীরা কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না। বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমার স্বামী আযীযে-মিসর আমাকে লালন-পালন করেছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আমি তার ইয্‌যতে হস্তক্ষেপ করব? এটা জঘন্য অনাচার, অথচ অনাচারীরা কখনো কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না। [কুরতুবী] এভাবে তিনি যেন স্বয়ং সেই মহিলাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েকদিন লালন-পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরো বেশী স্বীকার করা দরকার। এ ব্যাখ্যা অনুসারে সমস্যা হলো, এখানে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম আযীযে-মিসরকে স্বীয় 'রব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সম্ভবত এর কারণ, এখানে ربي বলে سيّدي বা আমার মনিব বোঝানো হয়েছে। তখন সাধারণ নিয়মানুসারে তা ব্যবহার করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এর দ্বারা বাহ্যিক নেয়ামতের মালিক বোঝানো উদ্দেশ্য। কারণ মূলতঃ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম তখন দাস হিসেবেই আযীযে-মিসরের ঘরে অবস্থান করছিলেন। সে হিসেবে তিনি আযীযের স্ত্রীকে এ কথার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন যে, আমার উপর আমার মনিবের অনেক নেয়ামত রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি আমাকে লালন করছেন, আমার পক্ষে আমার মনিবের খেয়ানত করা সম্ভব নয়। আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর হচ্ছে, এখানে إِنَّهُ শব্দের সর্বনামটির দ্বারা আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌কেই 'রব' বলেছেন। বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই দিয়েছেন। সেমতে তাঁর অবাধ্যতা সর্ববৃহৎ যুলুম। এরূপ যুলুমকারী কখনো সফল হয় না। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, উল্লেখিত মহিলাটি অর্থাৎ আযীয-পত্নী তো পাপকাজের কল্পনায় বিভোরই ছিল, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মনেও মানবিক স্বভাববশতঃ কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় যুক্তি-প্রমাণ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্দরুন সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন।

إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

না তিনি তার রবের নিদর্শন দেখতে পেতেন(১)। এভাবেই (তা হয়েছিল), যাতে আমরা তার থেকে মন্দকাজ ও

এ আয়াতে هَمَّ শব্দটি (মনে উদিত হওয়ার অর্থে) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম ও আযীয পত্নী উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। কেবলমাত্র কোন খারাপ কাজের কথা মনে উদিত হলেই গোনাহ্ হয় না। [ইবনুল কাইয়্যেম, রাওদাতুল মুহিব্বীন: ২৯৮] মোটকথা, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম থেকে এমন কিছু হয়নি যা গোনাহ্ বলে বিবেচিত হতে পারে। [ইবন তাইমিয়্যা: মাজমু' ফাতাওয়া] বরং আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর নবী ইউসুফকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তাদেরকে বলেনঃ আমার বান্দা যখন কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে, তখনি তা লিখে ফেলো না, যতক্ষণ সে তা করে না বসে। তারপর যদি আল্লাহ্র ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং যদি পাপকাজটি করেই ফেলে তবে একটি গোনাহ্ই লিপিবদ্ধ কর। আর যদি কোন সৎকাজের ইচ্ছা করে কিন্তু তা করল না, তবুও তার জন্য একটি নেকী লিখে দাও। তারপর যখন সে তা সম্পাদন করে তখন তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ বর্ধিত করে লিখে দাও।' [বুখারীঃ ৭৫০১, মুসলিমঃ ১২৮] মোটকথা এই যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর অন্তরে যে কল্পনা অথবা ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল, তা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এর বিপক্ষে কাজ করার দরুন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার মর্যাদা আরো বেড়ে গেছে। [ইবনুল কাইয়্যেম, রাওদাতুল মুহিব্বীন:২৯৮] কোন কোন মুফাস্সিরের মতে ﴿لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ﴾ এ অংশটি পরে উল্লেখ করা হলেও তা আসলে অগ্রে রয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মনেও কল্পনা সৃষ্টি হত, যদি তিনি আল্লাহ্র প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্তু পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে বেঁচে গেলেন। এ বিষয়বস্তুটি সঠিক, কিন্তু কোন কোন তাফসীরবিদ এ অগ্র-পশ্চাৎকে ব্যাকরণিক ভুল আখ্যা দিয়েছেন। [তাবারী; ইবন কাসীর; ইবন তাইমিয়্যা, মাজমু' ফাতাওয়া ১০/১০১, ২৯৬-২৯৭, ৭৪০]

(১) স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল কুরআনুল কারীম তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তাফসীরবিদ ইবনে কাসীর সেসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ কুরআনুল কারীম যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম এমন কিছু দেখেছেন, যদ্দরুন তার মন থেকে সীমালংঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরিত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল তা নিশ্চিতরূপে নির্দিষ্ট করা যায় না।

অশ্লীলতা দূর করে দেই[১]। তিনি তো ছিলেন আমাদের মুখলিস বা বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

২৫. আর তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল, আর তারা দু'জন স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার কাছে পেল। স্ত্রীলোকটি বলল, 'যে তোমার পরিবারের সাথে মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ বা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে?'

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

২৬. ইউসুফ বললেন, 'সে-ই আমাকে কুপ্ররোচনা দিয়েছে।' আর স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং সে পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾

২৭. আর তার জামা যদি পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং সে পুরুষটি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ

(১) অর্থাৎ তার রবের প্রমাণ দেখা ও গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া আমার দেয়া সুযোগ ও পথ প্রদর্শনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। কেননা, আমরা নিজের এ নির্বাচিত বান্দাটি থেকে অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা দূর করতে চাচ্ছিলাম। যেভাবে আমরা তাকে এ অশ্লীলতা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম তেমনি আমরা তাকে এর পরেও অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা থেকে ফিরিয়ে রাখব। [ইবন কাসীর]

كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

হয়েছে তখন সে বলল, 'নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো ভীষণ[১]।'

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. 'হে ইউসুফ! তুমি এটা উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; তুমিই তো অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত[২]।'

চতুর্থ রুকূ'

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٠﴾

৩০. আর নগরের কিছু সংখ্যক নারী বলল, 'আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস হতে অসৎকাজ কামনা করছে, প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে, আমরা তো তাকে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যেই নিপতিত দেখছি।'

(১) আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আযীযে-মিসর যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেল এবং বুঝল যে, তার পত্নীরই দোষ ও ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম পবিত্র। তদানুসারে সে তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললঃ ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ﴾ অর্থাৎ এসব তোমার ছলনা। তুমিই নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বোঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা, তারা বাহ্যতঃ কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি ও আল্লাহ্‌ভীতির অভাববশতঃ তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে থাকে। আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, নারীদের ষড়যন্ত্র শয়তানের ষড়যন্ত্রের চেয়েও মারাত্মক। কারণ, নারীদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় তোমাদের ষড়যন্ত্র তো ভীষণ।" পক্ষান্তরে শয়তানের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল" [সূরা আন-নিসা: ৭৬] [আদওয়াউল বায়ান] তবে এখানে সব নারী বোঝানো হয়নি, বরং ঐসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা এ ধরণের ছল-চাতুরীতে লিপ্ত থাকে।

(২) আযীয-মিসর তার স্ত্রীর ভুল বর্ণনা করার পর ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে বললঃ ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا﴾ অর্থাৎ ইউসুফ, এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো না, যাতে বেইয্‌যতি না হয়। অতঃপর তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললঃ ﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ অর্থাৎ ভুল তোমারই। তুমি নিজে ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾

৩১. অতঃপর স্ত্রীলোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল[১] এবং তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করল। আর তাদের সবাইকে একটি করে ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলল, 'তাদের সামনে বের হও।' অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল[২] ও নিজেদের হাত কেটে ফেলল এবং তারা বলল, 'অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশ্‌তা[৩]।'

(১) অর্থাৎ আযীয-পত্নী মহিলাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠাল। এখানে মহিলাদের কানাঘুষাকে আযীয-পত্নী مكر অর্থাৎ চক্রান্ত বলেছে। অথচ, বাহ্যতঃ তারা কোন চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে। [কুরতুবী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে চক্রান্ত বলে উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে সমস্ত মহিলারা ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্যের কথা শুনতে পেয়ে তাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। তখন তারা কানঘুষা শুরু করে দিল যাতে তাকে দেখতে সমর্থ হয়। এটাই হচ্ছে তাদের চক্রান্ত। [ইবন কাসীর]

(২) মূল শব্দ যা ব্যবহার হয়েছে, তার অর্থ দাঁড়ায়, "তারা তাকে খুব বড় করল"। কিন্তু কিসে তাকে বড় করল? মূলত, তার সৌন্দর্যই তাকে তাদের দৃষ্টিতে বৃহৎ আকারে প্রতিভাত হলো, এজন্য আয়াতের অর্থ করা হয়েছে, তার সৌন্দর্যে তারা অভিভূত হল। এ অর্থের সপক্ষে আয়াতের পরবর্তী বাক্য "এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফিরিশ্‌তা"। কারণ ফেরেশ্‌তাদের সৌন্দর্য সর্বজনস্বীকৃত। অন্য অর্থ হচ্ছে, তার মর্যাদা তাদের কাছে অনেক গুণ বেড়ে গেল। তারা তাকে উচ্চ মর্যাদাশীল মনে করল। [মুয়াসসার]

(৩) এ আয়াত থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, তাদের মধ্যেও ফিরিশ্‌তার উপর বিশ্বাস ছিল। অনুরূপভাবে এ আয়াত থেকে আরও জানতে পারি যে, ইউসুফ আলাইহিসসালাম অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন। ইসরা ও মিরাজের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউসুফ আলাইহিসসালাম সম্পর্কে বলেনঃ "তারপর আমি আচানকভাবে ইউসুফকে দেখতে পেলাম। তাকে সৌন্দর্যের অর্ধেকটাই দেয়া হয়েছে।" [মুসলিমঃ ১৬২]

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ ؕ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. সে বলল, 'এ-ই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। আমি তো তার থেকে অসৎকাজ কামনা করেছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে; আর আমি তাকে যা আদেশ করেছি সে যদি তা না করে, তবে সে অবশ্যই অবশ্যই কারারুদ্ধ হবে এবং অবশ্যই সে হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে[১]।'

(১) আযীয-পত্নী বললঃ দেখে নাও, এ ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করতে। বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পন করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে। কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ আযীয-পত্নী এখানে "কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে" একথা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, সে বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে তার আরো একটি মহা সৌন্দর্য রয়েছে, আর তা হল, আত্মিক পবিত্রতা। যা তোমরা দেখতে পাওনি। [ইবন কাসীর]

আযীয-পত্নী যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কোন কোন তাফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে বলতে লাগলঃ তুমি আযীয-পত্নীর কাছে ঋণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়। পরবর্তী আয়াতের কোন কোন শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়; যেমন, يَدْعُوْنَنِيْ এবং كَيْدَهُنَّ এগুলোতে বহুবচনে কয়েকজনের কথা বলা হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীস থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে, এ আমন্ত্রিত মহিলাগুলো ইউসুফ আলাইহিসসালামকে তার সঙ্কল্প থেকে টলাতে চেষ্টা করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যু শয্যায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে সালাতের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। কিন্তু কয়েকজন এ মন্তব্য করল যে, আবু বকর নরমদিল মানুষ। তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্না চেপে রাখতে পারবেন না। সুতরাং উমর বা অন্য কাউকে সালাতের ইমামতির জন্য নির্দেশ দেয়া হোক। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার নির্দেশ দিলেন আর তিনবারই তাকে একথা জানানো হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ "তোমরা তো দেখছি ইউসুফের সেসব সঙ্গীনিদের মতই। আবুবকরকে বল যেন মানুষদের নিয়ে সালাতে ইমামতি করে।" [বুখারীঃ ৬৪৬, মুসলিমঃ ৪২০]

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. ইউসুফ বললেন, 'হে আমার রব! এ নারীরা আমাকে যার দিকে ডাকছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে বেশী প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব(১)।'

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٤﴾

৩৪. সুতরাং তার রব তার ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. তারপর বিভিন্ন নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল যে, তাকে অবশ্যই কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতে হবে।

পঞ্চম রুকূ'

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۭ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّىْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّىْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۭ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর তার সাথে দুই যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে আমাকে দেখলাম, আমি মদের জন্য আংগুর নিংড়াচ্ছি', এবং অন্যজন বলল, 'আমি স্বপ্নে আমাকে

---

(১) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম দেখলেন যে, আযীয-পত্নীর চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে আরয করলেনঃ হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে, এর চাইতে জেলখানাই আমার অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি আমার থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবতঃ আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলব। এ থেকে আরো জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই গোনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে না। আরো জানা গেল যে, প্রত্যেক গোনাহ্‌র কাজ মূর্খতাবশতঃ হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গোনাহ্‌র কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং মূর্খতা ও মূর্খ ব্যক্তি নিন্দনীয়। [কুরতুবী]

দেখলাম, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা থেকে খাচ্ছে। আমাদেরকে আপনি এটার তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা তো আপনাকে মুহসিনদের অর্ন্তভুক্ত দেখছি(১)।'

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا
بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي
رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ

৩৭. ইউসুফ বললেন, 'তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসার আগে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব(২)। আমি যা তোমাদেরকে বলব

---

(১) কারাগারে ইউসুফকে কোন দৃষ্টিতে দেখা হতো এ থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। ওপরে যেসব ঘটনার কথা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো সামনে রাখলে ব্যাপারটা আর মোটেই বিস্ময়কর মনে হয় না যে, এ কয়েদী দুজন ইউসুফের কাছেই-বা এসে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলো কেন এবং তাঁকে "আমরা আপনাকে মুহসিন হিসেবেই পেয়েছি" বলে সম্মান করলো কেন। জেলখানার ভেতরে বাইরে সবাই জানতো, এ ব্যক্তি কোন অপরাধী নয়, বরং একজন অত্যন্ত সদাচারী পুরুষ। কঠিনতম পরীক্ষায় তিনি নিজের আল্লাহভীতি ও আল্লাহর হুকুম মেনে চলার প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি রাতে ইবাদত করতেন, খুব কান্নাকাটি করতেন। তার কারণে কারাগারেও মানুষের মধ্যে পবিত্রতা ফিরে আসল। আজ সারাদেশে তাঁর মতো লোক একজনও নেই। এ কারণে শুধু কয়েদীরাই তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো না বরং কয়েদখানার পরিচালকবৃন্দ এবং কর্মচারীরাও তাঁর ভক্তদলে শামিল হয়ে গিয়েছিল। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা এই যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর নিষ্পাপ চরিত্র ও পবিত্রতা দিবালোকের মত ফুটে উঠা সত্ত্বেও আযীযে-মিসর ও তার স্ত্রী লোক-নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আ ও বাসনার বাস্তব রূপায়ণ ছিল। কেননা, আযীযে-মিসরের গৃহে বাস করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম কারাগারে পৌঁছলে সাথে আরো দু'জন অভিযুক্ত কয়েদীও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাত এবং অপরজন বাবুর্চি ছিল। তাদের বিরুদ্ধে বাদশাহ্‌র খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগ ছিল। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম

بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

তা, আমার রব আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে বলব। নিশ্চয় আমি বর্জন করেছি সে সম্প্রদায়ের

কারাগারে প্রবেশ করে নবীসুলভ চরিত্র, দয়া ও অনুকম্পার কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমত তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট করে অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং আল্লাহ্‌র ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। তার এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তার ভক্ত হয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে জানি। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদী একদিন বললঃ আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ বলেনঃ তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ প্রকৃত স্বপ্ন ছিল না। শুধু ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মহানুভবতা ও সততা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বপ্ন রচনা করা হয়েছিল। [দেখুন, কুরতুবী]

মোটকথা, তাদের একজন অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাত, সে বললঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আঙ্গুর থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয় জন অর্থাৎ বাবুর্চি বললঃ আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভর্তি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা উভয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল। এখানে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে; কিন্তু তিনি নবীসুলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ও দ্বীন প্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন যে, যা কিছুই তোমরা স্বপ্নে দেখ না কেন আমি তার তা'বীর জানি। তোমাদের কাছে প্রাত্যহিক যে খাবার আসে তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে তোমাদের স্বপ্নের তা'বীর বলে দেব। [ইবন কাসীর; সা'দী] কোন কোন মুফাস্‌সির এর অর্থ করেছেন ভিন্ন রকম। তারা বলেনঃ এর অর্থ আমি তোমাদের যাবতীয় স্বপ্নের তা'বীর বলে দিতে পারি। তারপর তিনি একথার প্রতি তাদের আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু'জিযা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্য প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোন জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে বলে দেই। তারা বলল, বলে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের জন্য এরকম এরকম খাবার আসবে। বাস্তবেও তাই ঘটে। আর এটা ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাকে গায়েবী বিষয় জানিয়ে দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। [কুরতুবী]

ধর্মমত যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে না। আর যারা আখিরাতের সাথে কুফরীকারী'।

৩৮. 'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌হাক এবং ইয়া'কূবের মিল্লাত অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের জন্য সংগত নয়। এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۗ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯. 'হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব উত্তম, না মহাপ্রতাপশালী এক আল্লাহ্?

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

৪০. 'তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলো নামের 'ইবাদাত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠাননি। বিধান দেয়ার অধিকার শুধু মাত্র আল্লাহ্‌রই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাঁকে ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত না করতে, এটাই শাশ্বত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না[১]।

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

(১) এখানে যে কাহিনীটি বর্ণনা করা হয়েছে এ ভাষণটি হচ্ছে তার প্রাণ। এটি কুরআনেরও তাওহীদ সম্পর্কিত সর্বোত্তম ভাষণগুলোর অন্যতম। ইউসুফের নিজের একটি নবুওয়াত মিশন ছিল এবং তার দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ তিনি কারাগারেই শুরু করে দিয়েছিলেন। এ প্রথম তিনি লোকদের সামনে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করেন। প্রথমেই তিনি বলেন যে, হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব উত্তম, না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? যিনি তাঁর সম্মান ও মাহাত্ম্য দিয়ে সবকিছুর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন? তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, যেগুলোর তোমরা ইবাদাত করো এবং যাদেরকে তোমরা ইলাহরূপে নাম দিয়েছ, সেটা নিতান্তই তাদের

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿٤١﴾

৪১. 'হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের দুজনের একজন তার মনিবকে মদ পান করাবে[১] এবং অন্যজন[২] শূলবিদ্ধ হবে; অতঃপর তার মস্তক হতে পাখি খাবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে[৩]।'

মূর্খতা। তারা নিজেরাই সেগুলোর নাম রেখেছে। তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেছে মাত্র। এ ব্যাপারে তাদের কাছে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন প্রমাণ নেই। তারপর তিনি বললেন, রাজত্ব ও হুকুম সবই একমাত্র আল্লাহ্‌র। আর তিনি তাঁর বান্দাদের সবাইকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কারও যেন ইবাদাত করা না হয়। তারপর তিনি বললেন, এই যে বস্তুটির দিকে আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি, আল্লাহ্‌ জন্য তাওহীদ, একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য নিষ্ঠাসহকারে আমল করা সেটাই তো সরল সোজা প্রকৃত দ্বীন। যা গ্রহণ করার নির্দেশ আল্লাহ্‌ দিয়েছেন। যার জন্য তিনি দলীল-প্রমাণাদি নাযিল করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না বলেই শির্কে লিপ্ত হয়। [ইবন কাসীর] ইবন জারীর বলেন, তিনি যখন দেখলেন যে, তারা তাকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে প্রশ্ন করছে তখন এটাকেই তাদেরকে তাওহীদ ও ইসলামের দিকে দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি দেখতে পেলেন যে, তাদের প্রকৃতিতে কল্যাণ গ্রহণের ও শোনার প্রবণতা রয়েছে। আর সেজন্যই যখন তিনি তার দাওয়াত ও নসীহত শেষ করলেন, তখনি তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যার দিকে মনোনিবেশ করলেন। দ্বিতীয়বার প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকলেন না। [তাবারী]

(১) প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেনঃ তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকুরীতে পুনর্বহাল হবে। অপরজনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূলে চড়ানো হবে। পাখিরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে।

(২) ইবনে কাসীর বলেনঃ উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাত, সে মুক্ত হয়ে চাকুরীতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুর্চিকে শূলে চড়ানো হবে। কিন্তু ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম নবীসুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাদের অমুককে শূলে চড়ানো হবে -যাতে সে এখন থেকেই চিন্তান্বিত না হয়ে পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে। সবশেষে বলেছেনঃ আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা নিছক অনুমানভিত্তিক নয়; বরং এটাই আল্লাহ্‌র অটল ফয়সালা।

(৩) যেসব মুফাস্‌সির তাদের স্বপ্নকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলেছেন, তারা একথাও বলেছেন

৪২. আর ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করলেন, তাকে বললেন, 'তোমার মনিবের কাছে আমার কথা বলো', কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দিল; কাজেই ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রয়ে গেলেন(১)।

وَقَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ؔ

ষষ্ঠ রুকূ'

৪৩. আর রাজা বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী, তাদেরকে

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّىْۤ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ

যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তখন তারা উভয়েই বলে উঠলঃ আমরা কোন স্বপ্নই দেখিনি, বরং মিছামিছি বানিয়ে বলেছিলাম। তখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ ﴿قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ﴾ - তোমরা এ স্বপ্ন দেখে থাক বা না থাক, এখন বাস্তবে তাই হবে, যা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরী করার যে গোনাহ্ করেছ, এখন তার শাস্তি তা-ই, যা ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতের দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকে,
এক. বন্দী দু'জনের মধ্যে যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ যখন তুমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌঁছবে, তখন বাদশাহ্‌র কাছে আমার বিষয়েও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মুক্ত হয়ে লোকটি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কথা ভুলে গেল। এ হিসাবে فَاَنْسٰهُ এর মধ্যে ব্যবহৃত সর্বনামটি দ্বারা সেই বন্দী লোকটিকে বুঝানো হবে। ফলে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মুক্তি আরো বিলম্বিত হয়ে গেল এবং এ ঘটনার পর আরো কয়েক বছর তাকে কারাগারে কাটাতে হল। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]
দুই. মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ ইউসুফ আলাইহিসসালাম বন্দীর প্রভু বা রাজার কাছে তার কথা উল্লেখ করার কথা বলেছিলেন। এতে করে তিনি যেহেতু তার প্রভু রাব্বুল আলামিনকে ভুলে গিয়েছিলেন এর শাস্তি স্বরূপ তাকে বেশ কয়েক বছর জেলে কাটাতে হয়েছে। এ হিসাবে فَاَنْسٰهُ শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত সর্বনামটি দ্বারা ইউসুফ আলাইহিসসালামকে বুঝানো হবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]
আয়াতে ﴿بِضْعَ سِنِيْنَ﴾ বলা হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বোঝায়। কোন কোন মুফাস্সির বলেনঃ এ ঘটনার পর আরো সাত বছর তাকে জেলে থাকতে হয়েছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۭ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿٤٣﴾

সাতটি দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে সভাষদগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।'

قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তারা বলল, 'এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই(১)।'

وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿٤٥﴾

৪৫. আর সে দুজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হল সে বলল, 'আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। কাজেই তোমরা আমাকে পাঠাও(২)।'

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মুক্তির জন্য একটি উপায় সৃষ্টি করলেন। বাদশাহ্ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং সভাষদদের একত্রিত করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। স্বপ্নটি কারো বোধগম্য হল না। তাই সবাই উত্তর দিলঃ ﴿اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ﴾ এখানে أَضْغَاث শব্দটি ضغث এর বহুবচন। এর অর্থ এমন পুঁটলী, যাতে বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা ও ঘাসখড় জমা থাকে। [কুরতুবী] অর্থ এই যে, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরণের। এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম। [কুরতুবী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, তাদের এ উত্তরের মাধ্যমে তারা অজ্ঞতা ও তার উপর নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেয়ার মত দু'টি ভুলই করেছিল। [সা'দী]

(২) এ ঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বললঃ আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। তখন সে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর গুণাবলী, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, তাকে কারাগারে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হোক। বাদশাহ্ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে উপস্থিত হল। [ইবন কাসীর] কুরআনুল কারীম এসব ঘটনাকে একটি মাত্র শব্দ فَأَرْسِلُونِ দ্বারা বর্ণনা করেছে। এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর নাম উল্লেখ, সরকারী মঞ্জুরী অতঃপর কারাগারে পৌঁছা এসব ঘটনা আপনা-আপনি বোঝা যায়।

৪৬. সে বলল, 'হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী[১]! সাতটি মোটাতাজা গাভী, সেগুলোকে সাতটি দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন[২], যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি ও তারা জানতে পারে[৩] ।'

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّيٓ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝٤٦

৪৭. ইউসুফ বললেন, 'তোমরা সাত বছর একাধারে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কাটবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে, তা ছাড়া বাকী সবগুলো শীষসহ রেখে দেবে;

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۝٤٧

(১) মূল ভাষ্যে الصديق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । এ শব্দটি আরবী ভাষায় সর্বোচ্চ মানের সততা ও সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় । বিশেষ করে যার কথা ও কাজ সত্য ।[ইবন কাসীর] এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, কারাগারে অবস্থান কালে এ ব্যক্তি ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্র জীবন ও চরিত্র দ্বারা কী বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল! দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরও এ প্রভাব কেমন অটুট ছিল! তাই লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর صديق অর্থাৎ কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে । অতঃপর দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন । তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন । কেন তার কথা বাদশাকে বলতে ভুলে গিয়েছিল সে ব্যাপারে কোন তিরস্কার না করেই । অনুরূপভাবে তাকে এখান থেকে বের করে নিতে হবে এমন কোন শর্ত না দিয়েই । [ইবন কাসীর]

(২) স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ্ সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখেছেন । এগুলোকেই অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে । তিনি আরো গমের সাতটি সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন ।

(৩) অর্থাৎ আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে অচিরেই আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব । এতে সম্ভবতঃ তারা আপনার জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে অবগত হবে । অথবা এর অর্থ- যাতে জনগণ এ স্বপ্নের তা'বীর জানতে পারে । কেননা, তারা তা জানার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছে । [কুরতুবী]

ثُمَّ يَأْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. 'এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর[১], এ সাত বছর, যা আগে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকেরা তা খাবে; শুধুমাত্র সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে, তা ছাড়া[২] ।

ثُمَّ يَأْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. 'তারপর আসবে এক বছর, সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ ফলের রস নিংড়াবে[৩] ।'

---

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ কুরাইশরা যখন ইসলাম গ্রহণ করতে গড়িমসি করল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর বদদোয়া করে বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমাকে তাদের ব্যাপারে ইউসুফ আলাইহিসসালামের সাত বছরের মত সাত বছর দিয়ে যথেষ্ট করুন । ফলে কুরাইশগণ এমন এক দুর্ভিক্ষে পতিত হলো যে, সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল । এমনকি তারা হাঁড় খেতেও বাধ্য হয় । অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তাদের কোন কোন লোক ক্ষুধার তাড়নায় আকাশের দিকে তাকালে শুধু ধোঁয়ার মত অস্বচ্ছ দেখতে পেত । আল্লাহ্ বলেনঃ "সুতরাং অপেক্ষা করুন সেদিনের যেদিন আকাশ সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে" । আল্লাহ্ বলেনঃ "অবশ্যই আমরা কিছু সময়ের জন্য আযাবকে উঠিয়ে নেব কিন্তু তোমরা ফিরে আসবে" । কিয়ামতের দিনের পরে কি তাদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে? ধোঁয়া চলে গেছে তবে আল্লাহ্র পাকড়াও বাকী আছে । [বুখারীঃ ৪৬৯৩, মুসলিমঃ ২৭৯৮]

(২) কারণ সেটা তোমরা তোমাদের বীজ হিসেবে রেখে দিবে । অর্থাৎ তা খেয়ে ফেলো না । কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন যে, এগুলো তোমরা না খেয়ে জমা রাখবে । [কুরতুবী]

(৩) আয়াতে يعصرون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । এর শাব্দিক মানে হচ্ছে 'নিংড়ানো' । এখানে এর মাধ্যমে পরবর্তীকালের চতুর্দিকের এমন শস্য শ্যামল তরতাজা পরিবেশ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যা দুর্ভিক্ষের পর রহমতের বৃষ্টিধারা ও নীল নদের জোয়ারের পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে । জমি ভালোভাবে পানিসিক্ত হলে তেল উৎপাদনকারী বীজ, রসাল ফল ও অন্যান্য ফলফলাদি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ভালো ঘাস খাওয়ার কারণে গৃহপালিত পশুরাও প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয় । অর্থাৎ প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব-সঞ্চিত শস্য ভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে । বাদশাহ্ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তিশালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে । তাই ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন

সপ্তম রুকূ'

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

৫০. আর রাজা বলল, 'তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস[১]।' অতঃপর যখন দূত তার কাছে উপস্থিত হল তখন তিনি বললেন, 'তুমি তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি! নিশ্চয়

যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্য ভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে; যদিও বছর এমন কোন বস্তু নয় যা কোন কিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব-জন্তুতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব-সঞ্চিত শস্য ভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ্‌র স্বপ্নে বাহ্যতঃ এটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভাল ফলন হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম আরো কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম এভাবে জানতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর যখন সর্বমোট সাতটি, তখন আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। কাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করেছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তার জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ পায় এবং তার মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছর যে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে -যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে- অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না। [কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত]

(১) ঘটনার গতিধারা দেখে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে এবং বাদশাহ্‌কে তা অবহিত করেছে। [কুরতুবী] বাদশাহ্ বৃত্তান্ত নিশ্চিন্ত ও ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন। [ইবন কাসীর] কিন্তু কুরআনুল কারীম এসব বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার মনে করেনি। কারণ, এগুলো আপনা থেকেই বোঝা যায়। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ﴾ অর্থাৎ বাদশাহ্ আদেশ দিলেন যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে আসো। অতঃপর বাদাশাহ্‌র জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌঁছল। [ইবন কাসীর]

আমার রব তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত(১)।'

৫১. রাজা নারীদেরকে বলল, 'যখন তোমরা ইউসুফ থেকে অসৎকাজ কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের কি হয়েছিল?' তারা বলল, 'অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি।' আযীযের স্ত্রী বলল, 'এতদিনে সত্য প্রকাশ হল, আমিই তাকে প্ররোচনা দিয়েছিলাম, আর সে তো অবশ্যই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ قُلْنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ ۚ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٰٔنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٥١

(১) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহ্‌র প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাজের প্রশংসা করে বলেনঃ যদি ইউসুফের মত আমি এত বছর জেল খাটতাম, তারপর আমার কাছে বের হওয়ার আহ্বান আসত তাহলে আমি সে ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতাম। [বুখারীঃ ৬৯৯২, মুসলিমঃ ১৫১] এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলতঃ নিজেকে নম্রভাবে পেশ করে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এর চেয়ে বেশী কষ্টের শি'আবে আবী তালেবে কাটিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও আপোষ করেননি।

আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম দূতকে উত্তর দিলেন, তুমি বাদশাহ্‌র কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে ঐ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ্ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কি না এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না? এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম এখানে হস্তকর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, আযীয-পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি; অথচ সে-ই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলাবাহুল্য, এতে ঐ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম আযীযের গৃহে লালিত-পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। [কুরতুবী]

৫২. এটা এ জন্যে যে, যাতে সে জানতে পারে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।'

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর আমি নিজকে নির্দোষ মনে করিনা, কেননা, নিশ্চয় মানুষের নাফস খারাপ কাজের নির্দেশ দিয়েই থাকে(১), কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার রব দয়া করেন(২)। নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٣﴾

---

(১) এখানে আযীয-পত্নী কর্তৃক ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর নির্দোষিতা ঘোষিত হয়েছে। অর্থাৎ আযীয-পত্নী তখন বললেনঃ "এখন সত্য প্রকাশিত হয়েছে, আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম, অবশ্যই সে (ইউসুফ) সত্যবাদীদের অন্তর্গত। আর এটা আমি এ জন্যই বলছি, যাতে করে সবাই জানতে পারে যে, আমি তার (ইউসুফের) অনুপস্থিতিতে তার প্রতি কোন মিথ্যা ও খেয়ানতের অপবাদ দিচ্ছি না। [ইবনুল কাইয়্যেম: রাওদাতুল মুহিব্বীন: ২৯৯] আর অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা যারা খেয়ানত করে তাদের চক্রান্ত সফল হতে দেন না। আর আমি আমার নিজ আত্মাকে নির্দোষ বলছি না। আত্মা তো খারাপ কাজের নির্দেশই দেয়, অবশ্য যাদেরকে আল্লাহ্ করুনা করেছেন, তাদের কথা ভিন্ন। নিঃসন্দেহে আমার রব অতীব ক্ষমাশীল, দয়াময়।" এ তিনটি আয়াতই আযীয-পত্নী বলেছিল। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর আত্মা নফ্সে আম্মারা বা খারাপ কাজের আদেশদানকারী আত্মা নয়। এ ব্যাপারে সত্যান্বেষী আলেমগণ সবাই একমত। সুতরাং এখানে আযীয-পত্নী নিজ আত্মার কথাই বলেছে। আর তার আত্মা অবশ্যই নফ্সে আম্মারা ছিল, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর আত্মা নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর; ইবনুল কাইয়্যেম, রাওদাতুল মুহিব্বীন, ২৯৯-৩০০]

(২) মানব মন আপন সত্তার দিকে মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ্ ও আখেরাতের ভয়ে মনের আদেশ পালনে বিরত থাকে, তখন তা لَوَّامَة হয়ে যায়। অর্থাৎ মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারকারী ও মন্দ কাজ থেকে তাওবাকারী এবং যখন কোন মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌঁছিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে মন্দ কাজের কোন স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা مُطْمَئِنَّة হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন। পুণ্যবানরা চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে এ স্তর অর্জন করতে পারে। [ইবনুল কাইয়্যেম, আর রূহ: ২২০]

৫৪. আর রাজা বলল, 'ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস; আমি তাকে আমার নিজের জন্য আপন করে নেব।' তারপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, 'আজ আপনি তো আমাদের কাছে মর্যাদাশীল, আস্থাভাজন(১)।'

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ﴿٥٤﴾

(১) অর্থাৎ বাদশাহ্ যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর দাবী অনুযায়ী মহিলাদের কাছে ঘটনার তদন্ত করলেন এবং আযীয-পত্নী ও অন্যান্য সব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ্ নির্দেশ দিলেনঃ ইউসুফ ('আলাইহিস্ সালাম)-কে আমার কাছে নিয়ে আসো- যাতে তাকে একান্ত উপদেষ্টা করে নেই। নির্দেশ অনুযায়ী তাকে সসম্মানে কারাগার থেকে দরবারে আনা হল। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ ও আলোচনার ফলে তার যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ্ বললেনঃ আপনি আজ থেকে আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং বিশ্বস্ত। অর্থাৎ আপনার কথা গ্রহণযোগ্য এবং আপনি এমনই বিশ্বস্ত যে আপনার পক্ষ থেকে কোন গাদ্দারীর ভয় নেই। [কুরতুবী, সংক্ষেপিত] এটা যেন বাদশাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে, আপনার হাতে যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সোপর্দ করা যেতে পারে। স্বপ্ন এবং অনাগত পরিস্থিতির ব্যাপারে বাদশাহ্ বললেনঃ এখন কি করা দরকার? ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ প্রথম সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও রাখতে হবে। এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীর কাছে প্রচুর শস্যভাণ্ডার মজুদ থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিন্‌দেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। কারণ এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূরদেশ অবধি বিস্তৃত। ভিন্‌দেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারী ধনভাণ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগত হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ্ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেনঃ এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে? ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম বললেন, জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি জ্ঞান আছে। [কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত] যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা জরুরী, সেখানে সেই পরিমাণ

৫৫. ইউসুফ বললেন, 'আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।'

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

৫৬. আর এভাবে ইউসুফকে আমরা সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছে অবস্থান করতে পারতেন। আমরা যাকে ইচ্ছে তার প্রতি আমাদের রহমত দান করি; এবং আমরা মুহসিনদের পুরস্কার নষ্ট করি না[১]।

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের পুরস্কারই উত্তম[২]।

وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

ব্যয় করব এবং এক্ষেত্রে কোন কম-বেশী করব না। حفيظ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং عليم শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা।

(১) অর্থাৎ আমি ইউসুফকে বাদশাহ্‌র দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও উচ্চ পদমর্যাদা দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারি করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা, স্বীয় রহমত ও নেয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করি এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেনঃ এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দ্বারা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান জারি করা এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কোন সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহ্‌কে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তার অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্‌ও মুসলিম হয়ে যান। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আখেরাতের প্রতিদান ও সওয়াব তাদের জন্য দুনিয়ার নেয়ামতের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, যারা ঈমানদার এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। এখানে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার জন্য আখেরাতে যা সঞ্চিত রেখেছেন তা পার্থিব রাষ্ট্রক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করা থেকে উত্তম। [ইবন কাসীর] কেননা, দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ ধ্বংসশীল, আর আখেরাতের সম্পদ চিরস্থায়ী। [কুরতুবী] সুতরাং জেনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ আখেরাতে যে পুরষ্কার দেবেন সেটিই সর্বোত্তম প্রতিদান এবং সেই প্রতিদানটিই মুমিনের কাংখিত হওয়া উচিত।

অষ্টম রুকূ'

৫৮. আর[১] ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তার কাছে প্রবেশ করল[২]। অতঃপর তিনি তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না।

وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٨﴾

(১) এখানে আবার সাত আট বছরের ঘটনা মাঝখানে বাদ দিয়ে বর্ণনার ধারাবাহিকতা এমন এক জায়গা থেকে শুরু করে দেয়া হয়েছে যেখান থেকে বনী ইসরাঈলের মিসরে স্থানান্তরিত হবার এবং ইয়াকূব আলাইহিসসালামের হারানো ছেলের সন্ধান পাওয়ার সূত্রপাত হয়। মাঝখানে যেসব ঘটনা বাদ দেয়া হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের রাজত্বের প্রথম সাত বছর মিসরে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। এ সময় তিনি আসন্ন দুর্ভিক্ষ সমস্যা দূর করার জন্য পূর্বাহ্নে এমন সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যার পরামর্শ তিনি স্বপ্নের তা'বীর বলার পর বাদশাহকে দিয়েছিলেন। এরপর শুরু হয় দুর্ভিক্ষের যামানা। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াতে ইউসুফ-ভ্রাতাদের খাদ্যশস্যের জন্যে মিসরে আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, দুর্ভিক্ষ শুধু মিসরেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং দূর-দূরান্ত অঞ্চল এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তিনের একটি অংশ। এ এলাকাটিও দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। সাথে সাথেই মিসরের এ সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর কানে এ সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের বাদশাহ্ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে বললেনঃ তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে আসো। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিনইয়ামীন ছিলেন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সহোদর। ইউসুফ নিখোঁজ হওয়ার পর ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর স্নেহ ও ভালবাসা তার প্রতিই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার জন্য তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌঁছল। তারা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে চিনল না; কিন্তু ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে ঠিকই চিনে ফেললেন। এরপর যে কোনভাবেই হোক ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম তাদের কাছ থেকে তাদের আরেক ছোট ভাইয়ের তথ্য উদঘাটন করলেন। তারপর ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন। বন্টনের ব্যাপারে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর রীতি ছিল এই যে, একবারে কোন এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯. আর তিনি যখন তাদেরকে তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলেন তখন তিনি বললেন[১], 'তোমরা আমার কাছে তোমাদের পিতার পক্ষ থেকে বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে আস[২]। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম

(১) ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানার পর তার মনে এরূপ আকাঙ্খার উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পুনর্বার আসুক। এজন্যে একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং ভাইদেরকে বললেন, তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের সে ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কিভাবে পুরোপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি। এরপর একটি সাবধান বাণীও শুনিয়ে দিলেন, তোমরা যদি ভাইকে সাথে না আন, তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব না। কেননা, আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ। এভাবে তোমরা আমার কাছে আসবে না। অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্যবাবদ যে নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলংকার জমা দিয়েছিল, সেগুলো গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, যাতে বাড়ী পৌঁছে যখন তারা আসবাবপত্র খুলবে এবং নগদ অর্থ ও অলংকার পাবে, তখন যেন পুনর্বার খাদ্যশস্য নেয়ার জন্য আসতে পারে। মোটকথা, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তার সাক্ষাত ঘটার সুযোগ উপস্থিত হয়। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. তোমরা তোমাদের পিতার কাছ থেকে আরেকজনকে নিয়ে আস, যাতে তোমরা আরও এক বোঝা বেশী নিতে পার। তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, মিশরে আমি সুন্দরভাবে সওদার ওজন প্রদান করে থাকি। [তাবারী] তাছাড়া আরেকটি অনুবাদ হচ্ছে, তোমরা তোমাদের পিতার পক্ষীয় ভাই অর্থাৎ তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে আস। তোমরা তো দেখছ যে আমি পূর্ণ মাপ প্রদান করে থাকি। মাপে কম দেই না। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] কোন কোন তাফসীরে এসেছে যে, তারা কথায় কথায় তাদের অপর ভাইয়ের কথা ইউসুফের কাছে বর্ণনা করেছিল। তিনি তাদেরকে সেটার সত্যতা নিরূপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যাতে করে তার আপন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায় [যামাখশারী; ফাতহুল কাদীর]

অতিথিপরায়ণ(১) ।

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾

৬০. ‘কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে না নিয়ে আস তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার ধারে-কাছেও আসবে না ।

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾

৬১. তারা বলল, ‘তার ব্যাপারে আমরা তার পিতাকে সম্মত করানোর চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব ।’

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. ইউসুফ তাঁর কর্মচারীদেরকে বললেন, ‘তারা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার পর তারা তা চিনতে পারে, যাতে তারা আবার ফিরে আসে(২) ।’

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে আসল, তখন তারা বলল, ‘হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে । কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা পরিমাপ করে রসদ পেতে পারি । আর আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী ।’

---

(১) এর দুই অর্থ হতে পারে, এক. আমি সুন্দর অতিথি পরায়ণ । দুই. আমার এখানে মানুষ নিরাপদ । [কুরতুবী]

(২) এর কারণ কারও কারও মতে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভয় পাচ্ছিলেন যে, তাদের সম্ভবতঃ পুনরায় ক্রয় করার মত অর্থ-কড়ি থাকবে না । ফলে তারা আর আসবে না । কারও কারও মতে, তিনি ভাইদের কাছ থেকে টাকা নিতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন । কারও কারও মতে, তিনি জানতেন যে, তারা যখন দেখবে যে এ টাকা তাদেরই, যা তারা পণ্যের বিনিময়ে দিয়েছিল, তখন সেটা ফেরৎ দেয়ার জন্য হলেও মিশর আসবে । [ইবন কাসীর]

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে সেরূপ নিরাপদ মনে করব, যেরূপ আগে নিরাপদ মনে করেছিলাম তোমাদেরকে তার ভাই সম্বন্ধে? তবে আল্লাহ্ই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু[১]।'

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল তখন তারা দেখতে পেল তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এটা আমাদের দেয়া পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। আর আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে

(১) এ আয়াতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও বললঃ আযীযে মিসর ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোটভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বিনইয়ামীনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করবেন -যাতে ভবিষ্যতেও আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরোপুরি হেফাজত করব। তার কোনরূপ কষ্ট হবে না। পিতা বললেনঃ আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? উদ্দেশ্য, এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস! একবার বিশ্বাস করে বিপদ ভোগ করেছি, ইউসুফকে হারিয়েছি। তখনও হেফাজতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই প্রয়োগ করেছিলে। এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নবীসুলভ তাওয়াক্কুল এবং এ বাস্তবতায় ফিরে গেলেন যে, লাভ-ক্ষতি কোনটাই বান্দার ক্ষমতাধীন নয় -যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়ে গেলে তা কেউ টলাতে পারে না। তাই বললেন, তোমাদের হেফাজতের ফল তো ইতিপূর্বে দেখে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ্র হেফাজতের উপরই ভরসা করি এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। মোটকথা, ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম বাহ্যিক অবস্থা ও সন্তানদের ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর ভরসা করলেন না। তবে আল্লাহ্র ভরসায় কনিষ্ঠ সন্তানকেও তাদের সাথে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন।

খাদ্য-সামগ্রী এনে দেব এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং আমরা অতিরিক্ত আরো এক উট বোঝাই পণ্য আনব; ঐ পরিমাণ শস্য অতি সহজ[১]।'

৬৬. পিতা বললেন, 'আমি তাকে কখনোই তোমাদের সাথে পাঠাবো না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেই[২], অবশ্য যদি তোমরা বেষ্টিত হয়ে পড় (তবে ভিন্ন কথা)।'

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

(১) এতক্ষন পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আসবাবপত্র তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হল এবং দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ পরিশোধিত মূল্য আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তখন তারা অনুভব করতে পারল যে, এ কাজ ভূলবশতঃ হয়নি; বরং ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই ﴿رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ বলা হয়েছে। অতঃপর তারা পিতাকে বললঃ ﴿مَا نَبْغِي﴾ অর্থাৎ আমরা আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার যাওয়া দরকার। কারণ, এ আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আযীযে মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই কোন আশঙ্কার কারণ নেই; আমরা পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য আনব, ভাইকেও হেফাজতে রাখব এবং ভাইয়ের অংশের বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। ভাইকে নেয়ার বিনিময়ে যা পাব তা অত্যন্ত সহজেই পাচ্ছি। এ দুর্ভিক্ষের দিনে এত সহজে খাবার পাওয়া বিরাট ব্যাপার। [ইবন কাসীর] তাছাড়া এ বাড়তি পরিমাণ খাদ্যশস্য দেয়া আযীযের জন্যও কঠিন কিছু নয়। [ফাতহুল কাদীর; মুয়াসসার] আবার আপনার জন্যও এ সামান্য সময় আমাদের ছোট ভাইটিকে ছেড়ে থাকা কষ্টের হবে না। আমাদের বর্তমান খাদ্য শস্যের পরিমাণও কম সুতরাং বাড়িয়ে আনতে পারলেই লাভ বেশী।

(২) এসব কথা শুনে পিতা উত্তর দিলেন, আমি বিনইয়ামীনকে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র কসমসহ এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার আমাকে দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে সাথে নিয়ে আসবে। ঐ অবস্থা ব্যতীত, যখন তোমরা সবাই কোন বেষ্টনীতে পড়ে যাও। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেনঃ এর অর্থ এই যে, তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। [কুরতুবী] কাতাদাহ্‌র মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়। [ইবন কাসীর]

তারপর যখন তারা তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করল তখন তিনি বললেন, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ্ তার বিধায়ক[১]।'

৬৭. আর তিনি বললেন, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে[২]। আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের বিপরীতে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। হুকুমের মালিক তো আল্লাহ্‌ই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾

(১) অর্থাৎ ছেলেরা যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা-অঙ্গীকার করল অর্থাৎ সবাই কসম করল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ বিনইয়ামীনের হেফাজতের জন্য হলফ নেয়া-হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ্ তা'আলার উপরই তার নির্ভর। তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারো হেফাযত করতে পারে এবং দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। [কুরতুবী] নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্তিগত সামর্থাধীন কোন কিছুই নয়।

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে ইউসুফ-ভ্রাতাদের দ্বিতীয়বার মিসর সফরের কথা বর্ণিত হয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস্সালামের পরে তার ভাইকে পাঠাবার সময় ইয়াকুব আলাইহিস্সালামের মন কত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। নানা সন্দেহ ও আশংকা তার মনে জেগে ওঠা বিচিত্র নয় এবং সর্বদাই এ চিন্তায় তিনি পেরেশান হয়ে গিয়ে থাকবেন যে, আল্লাহই ভালো জানেন এখন এ ছেলের চেহারাও আর দেখতে পাবো কি না। তাই তিনি হয়তো নিজের সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি না রাখতে চেয়েছিলেন। তখন ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ করার জন্য একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগার ভাই শহরের একই প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর প্রাচীরের কাছে পৌঁছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো। এর কারণ কি, আল্লাহ্ তা বর্ণনা করেননি। তবে অনেকে মনে করেন- এরূপ উপদেশ দানের কারণ এই আশঙ্কা ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, সুঠামদেহী, সুদর্শন এবং রূপ ও ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং ভাই ভাই, তখন কারো বদ নজর গেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়ত কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে। [কুরতুবী]

করি। আর আল্লাহ্‌রই উপর যেন নির্ভরকারীরা নির্ভর করে[১]।'

৬৮. আর যখন তারা তাদের পিতা যেভাবে আদেশ করেছিলেন সেভাবেই প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমের বিপরীতে তা তাদের কোন কাজে আসল না; ইয়া'কূব শুধু তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করছিলেন[২] আর অবশ্যই তিনি আমাদের দেয়া শিক্ষায়

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

(১) ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম একদিকে কুদৃষ্টি অথবা হিংসা, অথবা সন্দেহভাজন মনে করার আশঙ্কাবশতঃ ছেলেদের একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যদিকে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ করাও জরুরী মনে করেছেন। তা হচ্ছে, কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার যে তদবীর আমি বলেছি, আমি জানি যে, তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। আদেশ একমাত্র আল্লাহ্‌রই চলে। তবে মানুষের প্রতি বাহ্যিক তদবীর করার নির্দেশ আছে। তাই এ উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তদবীরের উপর ভরসা করি না; বরং আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করি। তাঁর উপরই ভরসা করা এবং বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীরের উপর ভরসা না করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য। যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে তাদের সম্পর্কে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সুসংবাদ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। আর তারা হলেন সে সমস্ত লোক যারা (তাদের অসুস্থতার সময়) কারও কাছে ঝাড়ফুক চায় না, লোহা গরম করে ছেঁক দেয় না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না এবং সর্বদা তাদের প্রভুর উপর ভরসা করে। [বুখারীঃ ৬৪৭২]

(২) এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ছেলেরা পিতার আদেশ পালন করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। ফলে পিতার নির্দেশ কার্যকর হয়ে গেল। অবশ্য এ তদবীর আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশকে এড়াতে পারত না, কিন্তু পিতৃ-সুলভ স্নেহ-মমতার চাহিদা ছিল যা, তা তিনি পূর্ণ করেছেন। পূর্ব আয়াতের শেষ ভাগে ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে, ইয়াকূব বড় বিদ্বান ছিলেন, কারণ, আমি তাকে বিদ্যা দান করেছিলাম। এ কারণেই তিনি শরী'আতসম্মত ও প্রশংসনীয় বাহ্যিক তদবীর অবলম্বন করলেও তার উপর ভরসা করেননি। বরং কৌশল ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য স্থাপন করেছেন।

জ্ঞানবান ছিলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই জানে না[১]।

নবম রুকূ'

৬৯. আর তারা যখন ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল, তখন ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখলেন এবং বললেন, 'নিশ্চয় আমি তোমার সহোদর, কাজেই তারা যা করত তার জন্য দুঃখ করো না[২]।'

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. অতঃপর তিনি যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন তিনি তার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র[৩]

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ

(১) আলোচ্য দু'আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ ও মাসআলা জানা যায়- (এক) বদ নযর লাগা সত্য। [দেখুন- বুখারীঃ ৫৭৪০, মুসলিমঃ ২১৮৭] সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করার ন্যায় এ থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করাও সমভাবে শরী'আতসিদ্ধ। (দুই) যদি অন্য কারো কোন গুণ অথবা নেয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং নযর লেগে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তা দেখে بَارَكَ اللهُ অথবা ﴿مَا شَاءَ اللهُ﴾ বলা দরকার, যাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়। (তিন) নযর লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরী'আতসম্মত যে কোন তদবীর করা জায়েয। তন্মধ্যে দো'আ, কুরআন-হাদীসভিত্তিক ঝাড়-ফুঁক দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম। [কুরতুবী, সংক্ষেপিত]

(২) অর্থাৎ মিসরে পৌঁছার পর যখন সব ভাই ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর দরবারে উপস্থিত হল এবং তিনি দেখলেন যে, ওয়াদা অনুযায়ী তারা তার সহোদর ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছে, তখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম ছোট ভাই বিনইয়ামীনকে বিশেষভাবে নিজের সাথে রাখলেন। যখন উভয়েই একান্তে গেলেন, তখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম সহোদর ভাইয়ের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে বললেনঃ আমিই তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ। এখন তোমার কোন চিন্তা নেই। অন্য ভাইগণ এযাবত আমার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে, তজ্জন্যে মনোকষ্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। [ইবন কাসীর]

(৩) কুরআনুল কারীম এ পাত্রটিকে এক জায়গায় السِّقَايَةَ শব্দের দ্বারা এবং অন্যত্র ﴿صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾ [সূরা ইউসুফঃ ৭০ ও ৭২] শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করেছে। السِّقَايَةَ শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং صُوَاعَ শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۝

রেখে দিলেন[১]। তারপর এক আহ্বায়ক চিৎকার করে বলল, 'হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয় চোর[২]।'

[ইবন কাসীর] একে مَلِكٌ তথা বাদশাহ্‌র দিকে নির্দেশিত করার ফলে আরো জানা গেল যে, এ পাত্রটি বিশেষ মূল্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান ও মর্যাদাবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহ্‌র সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ্ নিজে তা দ্বারা পান করতেন। [বাগভী]

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বিনইয়ামীনকে রেখে দেয়ার জন্য ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম একটি কৌশল ও তদবীর অবলম্বন করলেন। যখন সব ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেয়া হল, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হল। বিনইয়ামীনের খাদ্যশস্য যে উটের পিঠে চাপানো হল, তাতে একটি পাত্র গোপনে রেখে দেয়া হল।

কোন কোন মুফাসসির মনে করেন, সম্ভবত পেয়ালা রেখে দেবার কাজটা ইউসুফ আলাইহিস্‌সালাম নিজের ভাইয়ের সম্মতি নিয়ে তার জ্ঞাতসারেই করেছিলেন। [বাগভী] আগের আয়াতে এ দিকে প্রচ্ছন্ন ইংগিত রয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস্‌সালাম দীর্ঘকালীন বিচ্ছেদের পর যালেম বৈমাত্রেয় ভাইদের হাত থেকে নিজের সহোদর ভাইকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। ভাই নিজেও এ যালেমদের সাথে ফিরে না যেতে চেয়ে থাকবেন। কিন্তু ইউসুফের নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে তাকে আটকে রাখা এবং তার মিসরে থেকে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আর এ অবস্থায় এ পরিচয় প্রকাশ করাটা কল্যাণকর ছিল না। তাই বিনইয়ামীনকে আটকে রাখার জন্য দু'ভাইয়ের মধ্যে এ পরামর্শ হয়ে থাকবে। যদিও এর মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য ভাইয়ের অপমান অনিবার্য ছিল, কারণ তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা হচ্ছিল, কিন্তু পরে উভয় ভাই মিলে আসল ব্যাপারটি জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলেই এ কলংকের দাগ অতি সহজেই মুছে ফেলা যেতে পারবে। [দেখুন, বাগভী]

(২) অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর জনৈক ঘোষক ডেকে বললঃ হে কাফেলার লোকজন! তোমরা চোর। এখানে ثُمَّ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি; বরং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর করা হয়েছে- যাতে কেউ জালিয়াতির সন্দেহ না করতে পারে।[বাগভী] মোটকথা, ঘোষক ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাফেলাকে চোর আখ্যা দিল। তাদের এ ঘোষণার যৌক্তিক কারণ ছিল। কেননা, ঘটনার যে সরল আকৃতিটি সহজেই চোখে ধরা পড়ে তা হচ্ছে এই যে, পেয়ালাটি হয়তো নীরবে রেখে দেয়া হয়েছিল, পরে সরকারী কর্মচারীরা সেটি খুঁজে না পেলে অনুমান করা হয়েছিল, এটা নিশ্চয়ই সেই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত কোন লোকের কাজ যারা এখানে অবস্থান করেছিল। সুতরাং কর্মচারীরা সেটা না জেনেই তাদেরকে চোর বলেছিল। [ফাতহুল কাদীর]

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ۝٧١

৭১. তারা ওদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমরা কী হারিয়েছ[১]?'

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ۝٧٢

৭২. তারা বলল, 'আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি; যে তা এনে দিবে সে এক উট বোঝাই মাল পাবে[২] এবং আমি সেটার জামিন[৩] ।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى

৭৩. তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা

(১) অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতাগণ ঘোষণাকারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললঃ তোমরা আমাদেরকে চোর বলছ। প্রথমে একথা আমাদের বল যে, তোমাদের কি বস্তু চুরি হয়েছে?

(২) আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য মজুরী কিংবা পুরস্কার নির্ধারণ করে যদি এই মর্মে ঘোষণা দান করা হয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে এই পরিমাণ মজুরী কিংবা পুরস্কার পাবে, তবে তা জায়েয হবে; যেমন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বস্তু ফেরত দেয়ার জন্য এ ধরনের পুরস্কার-ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। [কুরতুবী]

(৩) ঘোষণাকারীগণ বললঃ বাদশাহ্‌র পানপাত্র হারিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর জামিন। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন অন্যজনের পক্ষে আর্থিক অধিকারের জামিন হতে পারে। [কুরতুবী] সাধারণ ফেকাহ্‌বিদদের মতে এ ব্যাপারে বিধান এই যে, প্রাপক আসল দেনাদার কিংবা জামিন এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একজনের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে। যদি জামিনের কাছ থেকে আদায় করা হয়, তবে সে দেনা পরিমাণ অর্থ আসল দেনাদারের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। [কুরতুবী] ফুদালাহ ইবন উবাইদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "আমি জামিন, আর জামিন যিনি তিনি দায়িত্বগ্রহণকারী। যারা আমার উপর ঈমান এনেছে, আত্মসমর্পন করেছে এবং হিজরত করেছে, তাদের জন্য জান্নাতের প্রান্তে একটি এবং জান্নাতের মধ্যভাগেও একটি ঘরের আমি জামিন হলাম বা দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। অনুরূপভাবে যারা আমার উপর ঈমান এনেছে, আত্মসমর্পন করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে, তাদের জন্য জান্নাতের প্রান্তে একটি এবং জান্নাতের মধ্যভাগে একটি ও জান্নাতের উঁচু কামরায় একটি ঘরের আমি জামিন হলাম বা দায়িত্ব গ্রহণ করলাম, যারা এ কাজ করেছে এমনভাবে যে, যত ভাল কাজ আছে তা করতে কোন প্রকার কসূর করেনি এবং যত খারাপ কাজ আছে তা থেকে পলায়ন করতে যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তার মৃত্যু যেখানেই হোক না কেন। [নাসায়ীঃ ৬/২১, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৭১]

الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَٰرِقِينَ ﴿٧٣﴾

তো জান যে, আমরা এ দেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই[১]।'

قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَٰذِبِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. তারা বলল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তার শাস্তি কী?'

قَالُوا۟ جَزَٰٓؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِى رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তারা বলল, 'এর শাস্তি যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই তার বিনিময়।' এভাবে আমরা যালেমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি[২]।

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ

৭৬. অতঃপর তিনি তার সহোদরের মালপত্র তল্লাশির আগে তাদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগলেন[৩], পরে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের করলেন[৪]। এভাবে

(১) অর্থাৎ শাহী ঘোষক যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা উত্তরে বললঃ তোমরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছ যে আমরা এখানে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই। কেননা, তারা তাদের ভাল দিকগুলো দেখেছে, যাতে বোঝা যায় যে, আমরা এ খারাপ গুণের উপযুক্ত লোক নই। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ ইউসুফ ভ্রাতাগণ বললঃ যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হবে; সে নিজেই দাসত্ব বরণ করবে। আমরা চোরকে এমনি ধরণের সাজা দেই। উল্লেখ্য, এ ভাইয়েরা ছিল ইবরাহিমী পরিবারের সন্তান। কাজেই চুরির ব্যাপারে তারা যে আইনের কথা বলে তা ছিল ইবরাহিমী শরীয়াতের আইন। এ আইন অনুযায়ী চোরের শাস্তি ছিল, যে ব্যক্তির সম্পদ সে চুরি করেছে তাকে তার দাসত্ব করতে হবে। উদ্দেশ্য, ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর শরী'আতেও চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে সে চোরকে গোলাম করে রাখবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ সরকারী তল্লাশীকারীরা প্রকৃত ষড়যন্ত্র ঢেকে রাখার জন্য প্রথমেই অন্য ভাইদের আসবাবপত্র তালাশ করল। প্রথমেই বিনইয়ামীনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের সন্দেহ না হয়। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৪) অর্থাৎ সব শেষে বিনইয়ামীনের আসবাবপত্র খোলা হলে তা থেকে শাহী পাত্রটি বের হয়ে এল। তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেঁট হয়ে গেল। তারা বিনইয়ামীনকে খারাপ কথা বলতে লাগল। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

আমরা ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম[১]। রাজার আইনে তার ভাইকে আটক করা সংগত হতোনা, আল্লাহ্ ইচ্ছে না করলে। আমরা যাকে ইচ্ছে মর্যাদায় উন্নীত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী[২]।

(১) অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে কৌশল করেছি। এ সমগ্র ধারাবাহিক ঘটনাবলীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইউসুফের সমর্থনে সরাসরি কোন কৌশলটি অবলম্বন করা হয়েছিল তা অবশ্যি এখানে ভেবে দেখার মতো বিষয়। একথা সুস্পষ্ট যে, পেয়ালা রাখার কৌশলটি ইউসুফ নিজেই করেছিলেন। এটাও সুস্পষ্ট, সরকারী কর্মচারীদের চুরির সন্দেহে কাফেলাকে আটকানোও একটি নিয়ম মাফিক কাজ ছিল, যা এ ধরনের অবস্থায় সব সরকারী কর্মচারীই করে থাকে। তাহলে আল্লাহর সেই কৌশল কোনটি? উপরের আয়াতের মধ্যে অনুসন্ধান চালালে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন জিনিসই এর ক্ষেত্র হিসেবে পাওয়া যেতে পারে না যে, সরকারী কর্মচারীরা নিয়ম বিরোধীভাবে নিজেরাই সন্দেহপূর্ণ অপরাধীদের কাছে চুরির শাস্তি জিজ্ঞেস করলো এবং জবাবে তারাও এমন শাস্তির কথা বললো যা ইবরাহিমী শরীয়াতের দৃষ্টিতে চোরকে দেয়া হতো। এর ফলে দু'টি লাভ হলো। প্রথমত ইউসুফ ইবরাহিমী শরী'আতকে কার্যকর করার সুযোগ পেলেন এবং দ্বিতীয়ত নিজের ভাইকে হাজতে পাঠাবার পরিবর্তে তিনি নিজের কাছে রাখতে পারলেন। তিনি বাদশাহ্র আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। কেননা, মিসরের আইনে চোরের এই শাস্তি ছিল না। কিন্তু তারা এখানে ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর শরী'আতানুযায়ী চোরের বিধান জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বিনইয়ামীনকে আটকে রাখা বৈধ হয়ে গেল। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

(২) অর্থাৎ আমি যাকে ইচ্ছা, উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় ইউসুফের মর্যাদা তার ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরেই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা জ্ঞান ও ঈমানের দিক দিয়ে সৃষ্টজীবের মধ্যে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে থাকি। [কুরতুবী] হাসান বসরী বলেন, একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, তার তুলনায় আরো অধিক জ্ঞানী থাকে। মানবজাতির মধ্যে যদি কেউ এমন হয় যে, তার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর জ্ঞান সবারই ঊর্ধ্বে। [ইবন কাসীর]

قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭. তারা বলল, 'সে যদি চুরি করে থাকে তবে তার সহোদরও তো আগে চুরি করেছিল[১]।' কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলেন এবং তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না; তিনি (মনে মনে) বললেন, 'তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যা বলছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ই অধিক অবগত[২]।'

قَالُوا۟ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

৭৮. তারা বলল, 'হে 'আযীয, এর পিতা তো অত্যন্ত বৃদ্ধ; কাজেই এর জায়গায় আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখছি মুহসিন ব্যক্তিদের একজন[৩]।'

(১) অর্থাৎ সে যদি চুরি করে থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে! তার এক ভাই ছিল, সেও এমনিভাবে ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই নয়- বৈমাত্রেয় ভাই, তার এক সহোদর ভাই ছিল, সে-ও চুরি করেছিল। ইউসুফ-ভ্রাতারা এখন স্বয়ং ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। [তাবারী; ইবন কাসীর; সা'দী]

(২) অর্থাৎ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম মনে মনে বললেনঃ তোমাদের স্তর ও অবস্থাই মন্দ যে, জেনেশুনে ভাইদের প্রতি চুরির দোষারোপ করছ। আরও বললেনঃ তোমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জানেন। [তাবারী; ইবন কাসীর] কুরতুবী বলেন, প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবতঃ জোরেই বলেছেন। [কুরতুবী]

(৩) ইউসুফ ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোন চেষ্টাই সফল হচ্ছে না এবং বিনইয়ামীনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই; তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর পিতা নিরতিশয় বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি, আপনি খুবই অনুগ্রহশীল। এ ভরসায়ই আমরা এ প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথবা অর্থ এই যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অথবা এ অনুগ্রহ আমাদের উপর আপনার থাকবে। [কুরতুবী]

৭৯. তিনি বললেন, 'যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরূপ করলে তো আমরা অবশ্যই যালেম হয়ে যাব[১]।'

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

দশম রুকূ'

৮০. অতঃপর যখন তারা তার[২] ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হল, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে বয়সে বড় ব্যক্তিটি বলল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং আগেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে অন্যায় করেছিলে। কাজেই আমি কিছুতেই এ দেশ থেকে যাব না যতক্ষন না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন বা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন ফয়সালা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِیْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِیْٓ اَبِیْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِیْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮১. 'তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল, 'হে আমাদের

اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ

(১) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেনঃ যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমাদের নেই; বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে আমরা তোমাদের সাথে আমার কৃত চুক্তি অনুযায়ী যালেম হয়ে যাব। [কুরতুবী] কারণ, তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে-ই তার শাস্তি পাবে।

(২) অর্থাৎ যখন তারা তাদের ভাই বিন ইয়ামীনকে ছাড়িয়ে নেয়ার যাবতীয় প্রচেষ্টা করে নিরাশ হয়ে গেল এবং বুঝতে পারল যে, আযীয মিশর কোনভাবেই তাকে ছাড়বে না। তখন তারা পরবর্তী করণীয় নিয়ে শলা পরামর্শের জন্য একত্রিত হলো। [সা'দী; মুয়াসসার]

سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَٰفِظِينَ ﴿٨١﴾

পিতা! আপনার পুত্র তো চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম[১]। আর আমরা তো গায়েব সংরক্ষণকারী নই[২]।

وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. 'আর যে জনপদে আমরা ছিলাম সেখানকার অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি[৩]।'

(১) অর্থাৎ বড় ভাই বললেনঃ আমি তো এখানেই থাকব। তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল যে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি, তা আমাদের প্রতক্ষ্যদৃষ্ট চাক্ষুষ ঘটনা। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে।

(২) অর্থাৎ আমরা আপনার কাছে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বিনইয়ামীনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থা বিচারে। গায়েবী অবস্থা আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরূপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা ভাই বিনইয়ামীনের যথাসাধ্য হেফাযত করেছি, যাতে সে কোন অনুচিত কাজ করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ করবে, আমাদের জানা ছিল না। [ইবন কাসীর]

(৩) ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে একবার পিতাকে ধোঁকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই অধিক জোর দেয়ার জন্য বললঃ আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে যে শহরে আমরা ছিলাম (অর্থাৎ মিসর), তথাকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং আপনি ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যারা আমাদের সাথেই মিসর থেকে কেনান এসেছে। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি সৎ ও সঠিক পথে থাকে; কিন্তু ক্ষেত্র এমন যে, অন্যরা তাকে অসৎ কিংবা পাপকাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অন্যরা কু-ধারণার গোনাহ্য় লিপ্ত না হয়। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের আলোকে বিনইয়ামীনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের জন্য জনপদ অর্থাৎ

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

৮৩. ইয়া'কূব বললেন, 'না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে(১), কাজেই উত্তম ধৈর্যই আমি গ্রহণ করব; হয়ত আল্লাহ্ তাদেরকে একসঙ্গে আমার কাছে এনে দেবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾

৮৪. আর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'আফসোস ইউসুফের জন্য।' শোকে তার চোখ দুটি সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন সংবরণকারী(২)।

মিসরবাসীদের এবং যুগপৎ কাফেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি উম্মুল-মু'মিনীন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির মাথায় দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেনঃ আমার সাথে সাফিয়্যা বিন্‌তে হুয়াই রয়েছে। ব্যক্তিদ্বয় আরয করলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সম্পর্কেও কেউ কু-ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় গমন করে। কাজেই কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া বিচিত্র নয়। [বুখারীঃ ৭১৭১, মুসলিমঃ ২১৭৪]

(১) ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর নিকট ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম বিশ্বাস করতে পারলেন না; যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন। অর্থাৎ তোমরা মনগড়া কথা বলছ। কিন্তু আমি এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্য উত্তম। তারপর তিনি বললেন, আশা করি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবাইকে অর্থাৎ ইউসুফ, বিনইয়ামীন এবং যে ভাই মিসরে রয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন এবং বললেনঃ ইউসুফের জন্য বড়ই পরিতাপ। এ ব্যাথায় ক্রন্দন করতে করতে তার চোখ দু'টি শ্বেতবর্ণ ধারণ করল। অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল।

৮৫. তারা বলল, 'আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো ইউসুফের কথা সবসময় স্মরণ করতে থাকবেন যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষ হবেন, বা মারা যাবেন[১]।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝٨٥

৮৬. তিনি বললেন, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্র কাছেই নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহ্র কাছ থেকে তা জানি যা তোমরা জান না[২]।

قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٨٦

তাফসীরবিদ মুকাতিল বলেনঃ ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। [বাগভী] ﴿فَهُوَ كَظِيْمٌ﴾ অর্থাৎ অতঃপর তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারো কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। [ইবন কাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তার মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারো কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না। এ কারণেই كظم শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের কোন কিছু প্রকাশ না পাওয়া। [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা সত্ত্বেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগলঃ আল্লাহ্র কসম, আপনি তো সদাসর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনার শরীর দুর্বল হয়ে শক্তি নিঃশেষ হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয় মরেই যাবেন। [ইবন কাসীর] প্রত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণতঃ সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ-বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতই রয়েছেন এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ রয়েছে। আপনি নিজের উপর থেকে বিষয়টাকে একটু হাল্কা করুন। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম ছেলেদের কথা শুনে বললেনঃ "আমি আমার ফরিয়াদ ও দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য কারো কাছে করি না; বরং আল্লাহ্র কাছে করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। সাথে সাথে এ কথাও প্রকাশ করলেন যে, আমার স্মরণ করা বৃথা যাবে না। আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না"। এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে- (এক) আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন। (দুই) আমি জানি যে, আল্লাহ্ তা'আলা কায়মনো বাক্যে দো'আকারীর দো'আ ফেরৎ দেন না। (তিন) আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জানি যে, ইউসুফ জীবিত। (চার) অথবা, আমি জানি যে, ইউসুফের স্বপ্ন সত্য হবে। (পাঁচ) অথবা, আমি মুসীবতে ধৈর্য ধারণ করার কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন কিছু আশা করি, যা তোমরা কর না। [ফাতহুল কাদীর]

৮৭. 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের সন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ আল্লাহ্‌র রহমত হতে কেউই নিরাশ হয় না, কাফির সম্প্রদায় ছাড়া[১]।'

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَا۟يْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮. অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল তখন তারা বলল, 'হে 'আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা তুচ্ছ পুঁজি নিয়ে এসেছি[২];

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾

(১) অর্থাৎ বৎসরা, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, কাফের ছাড়া কেউ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। ইতিপূর্বে কখনো তিনি এমন আদেশ দেননি। এটা তাকদীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া তাকদীরে ছিল না। তাই এরূপ কোন কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মূহুর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এর উপযুক্ত তদবীরও মনে জাগিয়ে দিলেন। উভয়কেই খোঁজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হল। এটা বিনইয়ামীনের বেলায় নির্দিষ্টই ছিল; কিন্তু ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে মিসরে খোঁজ করার বাহ্যতঃ কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও উপস্থিত করে দেন। তাই এবার ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম সবাইকে খোঁজ করার জন্য ছেলেদেরকে আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। সুদ্দী বলেন, যখন তার ছেলেরা তাকে বাদশার বিভিন্ন গুণাগুণ বর্ণনা করল তখন তিনি আশা করলেন যে, এটা যদি তার ছেলে ইউসুফ হতো! [বাগভী; কুরতুবী]

ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোন বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর ও আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম ও অন্যান্য নবীগণের অনুসরণ করা।

(২) অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতারা যখন পিতার নির্দেশ মোতাবেক মিসরে পৌঁছল এবং আযীযে-মিসরের সাথে সাক্ষাত করল, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দারিদ্র্যতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগলঃ হে আযীয! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এমনকি এখন খাদ্যশস্য কেনার

আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন(১); নিশ্চয় আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদের পুরস্কৃত করেন(২) ।'

জন্য আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই । আমরা অপারগ হয়ে কিছু অকেজো বস্তু খাদ্যশস্য কেনার জন্য নিয়ে এসেছি । আপনি নিজ চরিত্রগুণে এসব অকেজো বস্তু কবূল করে নিন এবং এর পরিবর্তে আমাদেরকে পুরোপুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন, যা উত্তম মূল্যের বিনিময়ে দেয়া হয় । আগে যেভাবে প্রদান করতেন । [ইবন কাসীর] বলাবাহুল্য, আমাদের কোন অধিকার নেই । আপনি সদকা মনে করেই দিয়ে দিন । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সদকাদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন । অকেজো বস্তুগুলো কি ছিল, কুরআন ও হাদীসে তার কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই । তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ । [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] কুরআনে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে مُزْجَاةٍ । এর আসল অর্থ এমন বস্তু, যা নিজে সচল নয়; বরং জোরজবরদস্তি সচল করতে হয় । [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) এখানে সদকা শব্দ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে- কারো কারো মতে এখানে সদকা দ্বারা দানকেই বোঝানো হয়েছে । কারণ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বে অন্যান্য নবীদের উপর তা হারাম ছিল না । [ইবন কাসীর] অপর কোন কোন মুফাস্সির এখানে সদকা দ্বারা দান উদ্দেশ্য না নেয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন । তাদের মতে এখানে সদকা শব্দ দ্বারা সত্যিকারের সদকা বোঝানো হয়নি; বরং কারবারে সুযোগ-সুবিধা ও ছাড় দেয়াকেই 'সদকা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে । কেননা, তারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের সওয়াল করেনি; বরং কিছু অকেজো বস্তু পেশ করেছিল । অনুরোধের সারমর্ম ছিল এই যে, এসব স্বল্প মূল্যের বস্তু রেয়াত করে গ্রহণ করুন । [কুরতুবী]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা সদকাদাতাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন । এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদকার এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, যা মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায় এবং তা হচ্ছে বিপদাপদ দূর হওয়া । অপর একটি প্রতিদান শুধু আখেরাতেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ জান্নাত । এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপ্য । এখানে আযীযে-মিসরকে সম্বোধন করা হয়েছে । ইউসুফ-ভ্রাতারা হয়তবা তখনো পর্যন্ত জানত না যে, তিনি ঈমানদার না কাফের । তাই তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে ইহকাল ও পরকাল -উভয়কালই বোঝা যায় । এছাড়া এখানে বাহ্যতঃ আযীযে-মিসরকে সম্বোধন করে বলা উচিত ছিল যে, 'আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দেবেন ।' কিন্তু তারা হয়ত জানত না যে, আযীযে-মিসর ঈমানদার । তাই সদকাদাতা মাত্রকেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এরূপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন- এমন বলা হয়নি । [কুরতুবী]

৮৯. তিনি বললেন, 'তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ[১]?'

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾

৯০. তারা বলল, 'তবে কি তুমিই ইউসুফ?' তিনি বললেন, 'আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহোদর; আল্লাহ্ তো আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন[২]। নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্যধারণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহসিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন

قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۭ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِيْ ۡ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۭ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾

(১) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম ভাইদের এহেন মিসকীনসুলভ কথাবার্তা শুনে এবং দুরাবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে বিধি-নিষেধ ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তাদের কথাবার্তা শুনে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের স্মরণ আছে কি? তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমাদের মূর্খতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভাল-মন্দের বিচার করতে পারতে না? এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ-ভ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের ঘটনার সাথে আযীযে-মিসরের কি সম্পর্ক! এ আযীযে-মিসরই স্বয়ং ইউসুফ নয় তো! এরপর আরো চিন্তা-ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরো তথ্য জানার জন্য বললঃ ﴿ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ﴾ সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ? ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। ভাইয়ের প্রসঙ্গ জুড়ে দেয়ার কারণ, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দু'জনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল, তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। [বাগভী; ইবন কাসীর]

(২) এরপর ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। তিনি আমাদেরকে নাজাত ও কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। [কুরতুবী] তিনি আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ-সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয়ই যারা পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

না[১] ।’

৯১. তারা বলল, ‘আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা তো অপরাধী ছিলাম ।’

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿٩١﴾

৯২. তিনি বললেন, ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ভর্ৎসনা নেই । আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু[২] ।’

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾

(১) এর দ্বারা জানা যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এবং বিপদে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন, এ দু’টি গুণ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয় । কুরআনুল কারীম অনেক জায়গায় এ দু’টি গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছে । বলা হয়েছে, যেমন, অর্থাৎ তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে শত্রুদের শত্রুতামূলক কলা-কৌশল তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে পারবে না । [সূরা আলে-ইমরানঃ ১২০]

(২) এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া ছাড়া ইউসুফ-ভ্রাতাদের উপায় ছিল না । সবাই একযোগে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন । তুমি এরই যোগ্য ছিলে । আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম । আল্লাহ্ মাফ করুন । উত্তরে ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম নবীসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগও নেই । তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা । এ হচ্ছে তার পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ । এটা চরিত্রের উচ্চতম স্তর যে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেননি, বরং এ কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে তিরস্কার করা হবে না । অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করুন । তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যেদিন আল্লাহ্ রহমতকে সৃষ্টি করেছেন, সেদিন তাকে একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন । তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগই তাঁর নিকট রেখে দিয়েছেন । আর বাকী একভাগ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিজীবকে দিয়েছেন । যদি কোন কাফের আল্লাহ্‌র নিকট যে রহমত আছে, তার পরিমাণ সম্পর্কে জানতো তাহলে সে জান্নাতের ব্যাপারে নিরাশ হতো না । অপরপক্ষে কোন মুমিন যদি আল্লাহ্‌র কাছে যে শাস্তি রয়েছে তার পরিমান সম্পর্কে জানতো, তবে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ মনে করতো না । [বুখারীঃ ৬৪৬৯]

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার চেহারার উপর রেখো; তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো[১]।'

এগারতম রুকূ'

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾

৯৪. আর যখন যাত্রীদল বের হয়ে পড়ল তখন তাদের পিতা বললেন, 'তোমরা যদি আমাকে বৃদ্ধ-অপ্রকৃতস্থ মনে না কর তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি[২]।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

৯৫. তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো আপনার পুরোন বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন[৩]।'

---

(১) অর্থাৎ আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দাও। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সক্ষম হবেন। পরিবারের অন্যান্য সবাইকেও আমার কাছে নিয়ে আসো, যাতে সবাই দেখা-সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে পারি; আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হতে পারি।

(২) অর্থাৎ কাফেলা শহর থেকে বের হতেই ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম নিকটস্থ লোকদেরকে বললেনঃ তোমরা যদি আমাকে বোকা না মনে কর, তবে আমি বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার বর্ণনা অনুযায়ী আট দিনের দূরত্ব ছিল। [তাবারী] হাসান বসরীর বর্ণনা মতে দশ দিনের, অপর বর্ণনায় একমাসের রাস্তা ছিল। [কুরতুবী] ইবন জুরাইজ বলেন, আশি ফারসাখের রাস্তা ছিল। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ উপস্থিত লোকেরা বললঃ আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো সেই পুরোনো ভ্রান্ত ধারণায়ই পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে। ইবন কাসীর বলেন, তারা তাদের পিতার সাথে এমন কথা বললো যা কোন পিতার সাথে বলা যায় না। আল্লাহ্‌র কোন নবীর সাথে বলাই যায় না। কুরতুবী বলেন, যারা এ কথা বলেছিল তারা ঘরের অন্যান্য লোকেরা। ছেলেরা বলেনি। কারণ, তারা তখনও কেন'আনে ফিরে আসেনি। পরবর্তী আয়াত থেকে তা বুঝা যাচ্ছে।

৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হল এবং তাঁর চেহারার উপর জামাটি রাখল তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন[১]। তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা জানি তা তোমরা জান না?'

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلۡبَشِيرُ أَلۡقَىٰهُ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ فَٱرۡتَدَّ بَصِيرٗاۖ قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٩٦

৯৭. তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী[২]।'

قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ ٩٧

৯৮. তিনি বললেন, 'অচিরেই আমি আমার রবের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

قَالَ سَوۡفَ أَسۡتَغۡفِرُ لَكُمۡ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٩٨

৯৯. অতঃপর তারা যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন তিনি তার পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং বললেন, 'আপনারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন[৩]।'

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَبَوَيۡهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ٩٩

---

(১) অর্থাৎ যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌঁছল এবং ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর জামা ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে এল।

(২) বাস্তব ঘটনা যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফের ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললঃ আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফেরাতের দো'আ করুন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে তাদের মাগফেরাতের জন্য দো'আ করবে, সে নিজেও তাদের অপরাধ মাফ করে দেবে।

(৩) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম পরিবারের সবাইকে বললেনঃ আপনারা সবাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী অভাব অনটন থেকে মুক্ত হয়ে, নির্ভয়ে, অবাধে মিসরে প্রবেশ করুন। [তাবারী] উদ্দেশ্য এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে স্বভাবতঃ যেসব বিধি-নিষেধ থাকে আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত। [বাগভী; কুরতুবী]

১০০. আর ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে[১] উঁচু আসনে বসালেন এবং তারা সবাই তার সম্মানে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ল[২] । তিনি বললেন, 'হে আমার পিতা! এটাই আমার আগেকার স্বপ্নের

وَرَفَعَ اَبَوَيۡهِ عَلَى الۡعَرۡشِ وَخَرُّوۡا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاۡوِيۡلُ رُءۡيَاىَ مِنۡ قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّىۡ حَقًّا ؕ وَقَدۡ اَحۡسَنَ بِىۡۤ اِذۡ اَخۡرَجَنِىۡ مِنَ السِّجۡنِ وَجَآءَ بِكُمۡ مِّنَ الۡبَدۡوِ مِنۡۢ بَعۡدِ

(১) এখানে أَبَوَيْهِ (পিতা-মাতা) উল্লেখ করা হয়েছে। তাই অনেকের মতেই ইউসুফের মাতা জীবিত ছিলেন। [ইবন কাসীর] তবে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মাতা তার শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম মৃতার ভগ্নিকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতাই ছিলেন। [বাগভী; কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ পিতা-মাতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন আর ভ্রাতারা সবাই ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সামনে সিজ্‌দা করলেন। এ "সিজদাহ" শব্দটি বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে। এমনকি একটি দল তো এ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে বাদশাহ ও পীরদের জন্য "আদবের সিজদাহ" ও "সম্মান প্রদর্শনের সিজদাহ"-এর বৈধতা আবিষ্কার করেছেন। এর দোষমুক্ত হবার জন্য অন্য লোকদের এ ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে যে, আগের নবীদের শরী'আতে কেবলমাত্র ইবাদাতের সিজদা আল্লাহ ছাড়া আর সবার জন্য হারাম ছিল। এ ছাড়া যে সিজদার মধ্যে ইবাদাতের অনুভূতি নেই তা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্যও করা যেতে পারতো। তবে মুহাম্মাদী শরীয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য সব রকমের সিজদা হারাম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে "সিজদাহ" শব্দটি বর্তমান ইসলামী পরিভাষার অর্থে গ্রহণ করার ফলেই যাবতীয় বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ হাত, হাঁটু ও কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে দেয়া। অথচ সিজদাহর মূল অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র ঝুঁকে পড়া। আর এখানে এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ অর্থই ইমাম বাগভী পছন্দ করেছেন। এখানে আরও জানা আবশ্যক যে, কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার, কাউকে অভ্যর্থনা জানাবার অথবা নিছক কাউকে সালাম করার জন্য সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ার রেওয়াজ প্রাচীন যুগের মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ ধরনের ঝুঁকে পড়ার জন্য আরবীতে "সিজদাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়। সেটাও এ শরী'আতে মনসূখ বা রহিত। [কুরতুবী] এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, বর্তমানে ইসলামী পরিভাষায় "সিজদাহ" বলতে যা বুঝায় এ সিজদাহর অর্থ তা নয়। ইসলামী পরিভাষায় যাকে সিজদা বলা হয়, সে সিজদা আল্লাহর পাঠানো শরী'আতে তা কোনদিন গায়রুল্লাহর জন্য জায়েয ছিল না। হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'কোন মানুষের জন্য অপর মানুষকে সিজ্‌দা করা বৈধ নয়।' [নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা: ৯১৪৭; ইবন আবী শাইবাহ, হাদীস নং: ১৭১৩২]

أَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخْوَتِيْ ؕ إِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ إِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠٠﴾

ব্যাখ্যা[১]; আমার রব এটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার রব যা ইচ্ছে তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়[২]।'

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۟ أَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾

১০১. 'হে আমার রব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক।

(১) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সামনে যখন পিতা-মাতা ও এগার ভাই একযোগে সিজ্‌দা করল, তখন শৈশবের স্বপ্নের কথা তার মনে পড়ল। তিনি বললেনঃ পিতঃ, এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যাতে দেখেছিলাম যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সিজ্‌দা করছে। আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি এ স্বপ্নের সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন।

(২) এরপর ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম পিতা-মাতার কাছে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করে বললেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন কারাগার থেকে আমাকে বের করেছেন এবং আপনাকে বাইরে থেকে এখানে এনেছেন; অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল"।
ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর দুঃখ-কষ্ট যথাক্রমে তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। (এক) ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। (দুই) পিতা-মাতার কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ এবং (তিন) কারাগারের কষ্ট। আল্লাহ্‌র মনোনীত নবী স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার থেকে কথা শুরু করেছেন। ভ্রাতারা যে তাকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তা উল্লেখ করেননি, কারণ, তিনি তা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেয়া সমীচীন মনে করেননি। [কুরতুবী]
ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম তারপর বললেন, 'আমার পালনকর্তা যে কাজ করতে চান, তার তদবীর সূক্ষ্ম করে দেন। নিশ্চয় তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।' তিনি তাঁর বান্দার স্বার্থ যাতে রয়েছে তাতে তাকে এমনভাবে প্রবেশ করান যে, কেউ তা জানতে পারে না। [কুরতুবী]

আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন[১] ।'

১০২. এটা গায়েবের সংবাদ যা আপনাকে আমরা ওহী দ্বারা জানাচ্ছি[২]; ষড়যন্ত্র কালে যখন তারা মতৈক্যে পৌঁছেছিল, তখন আপনি তাদের সাথে ছিলেন না[৩] ।

ذٰلِكَ مِنۡ اَنۡۢبَآءِ الۡغَيۡبِ نُوۡحِيۡهِ اِلَيۡكَ‌ۚ وَمَا كُنۡتَ لَدَيۡهِمۡ اِذۡ اَجۡمَعُوۡۤا اَمۡرَهُمۡ وَهُمۡ يَمۡكُرُوۡنَ ۝١٠٢

(১) পিতা-মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শান্তি এল, তখন সরাসরি আল্লাহ্‌র প্রশংসা, তাঁর কাছে দো'আয় মশগুল হয়ে গেলেন এবং বললেনঃ "হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন । হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! আপনিই দুনিয়া ও আখেরাতে আমার কার্যনির্বাহী । আমাকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন ।" 'পরিপূর্ণ সৎ বান্দা' নবীগণই হতে পারেন । এ দো'আয় 'খাতেমা বিলখায়ের' অর্থাৎ অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে যত উচ্চ মর্যাদাই লাভ করুন এবং যত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদাই তাদের পদচুম্বন করুক, তারা কখনো গর্বিত হন না; বরং সর্বদাই এসব অবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার অথবা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা করতে থাকেন । তাই তারা দো'আ করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ্-প্রদত্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, বরং সেগুলো আরো যেন বৃদ্ধি পায় ।

(২) বলা হয়েছে, এগুলো গায়েবের সংবাদ, যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি । এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে-ইমরানের ৪৩তম আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে । সূরা হূদের ৪৯ তম আয়াতে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনা প্রসঙ্গেও তাই বলা হয়েছে । এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবীগণকে গায়েবের সংবাদ বলে দেন । বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম নবী মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এসব গায়েবের সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী নবীগণের তুলনায় বেশী । এ কারণে তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে । 'কিতাবুল-ফিতান' শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সম্বলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীসের গ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে । এ সমস্ত গায়েবের জ্ঞান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে দান করেছেন ।

(৩) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনী পুরোপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ١٠٣

১০৩. আর আপনি যতই চান না কেন, বেশীর ভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয়[১]।

وَمَا تَسۡـَٔلُهُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٤

১০৪. আর আপনি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবি করছেন না। এ (কুরআন) তো সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।

বারতম রুকূ'

وَكَأَيِّن مِّنۡ ءَايَةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ يَمُرُّونَ عَلَيۡهَا وَهُمۡ عَنۡهَا مُعۡرِضُونَ ١٠٥

১০৫. আর আসমান ও যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে; তারা এ সবকিছু দেখে, কিন্তু তারা এসবের প্রতি উদাসীন।

وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ١٠٦

১০৬. তাদের বেশীর ভাগই আল্লাহ্‌র

আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এই কাহিনী ঐসব গায়েবী সংবাদের অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্য কলা-কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল। এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক বলে দেয়া আপনার নবুওয়াত, রিসালাত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। [ইবন কাসীর] কেননা, কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারো কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেননি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা কারো কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

(১) অর্থাৎ আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী এ ঘটনাগুলো এজন্যই জানিয়েছেন যাতে এর দ্বারা মানুষের জন্য শিক্ষণীয় উপকরণ থাকে এবং মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার নাজাতের মাধ্যম হয়। তারপরও অনেক মানুষই ঈমান আনে না। এ জন্যই আল্লাহ্ বলেন যে, আপনার ঐকান্তিক ইচ্ছা যতই থাকুক না কেন অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর যদি আপনি যমীনের অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে" [সূরা আল-আন'আম: ১১৬] [ইবন কাসীর] সুতরাং অধিকাংশ মানুষ ঈমান না আনলে আপনার কিছু করার নেই। আপনি চাইলেই কাউকে হিদায়াত দিতে পারবেন না। [কুরতুবী]

উপর ঈমান রাখে, তবে তাঁর সাথে (ইবাদতে) শির্ক করা অবস্থায়(১)।

১০৭. তবে কি তারা আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে বা তাদের অজান্তে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ হয়ে গেছে(২)?

أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

---

(১) এখানে এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছেঃ ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করে, তারাও শির্কের সাথে করে। তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে রব, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা স্বীকার করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইবাদাত করার সময় আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্যদেরও ইবাদাত করে। [তাবারী; কুরতুবী; বাগভী; ইবন কাসীর; সা'দী] তাদের ঈমান হল আল্লাহ্‌র প্রভূত্বের উপর, আর তাদের শির্ক হল আল্লাহ্‌র ইবাদাতে। এ আয়াতের মধ্যে ঐ সমস্ত নামধারী মুসলিমও অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহ্‌র ইবাদাতের পাশাপাশি পীর, কবর ইত্যাদির ইবাদাতও করে থাকে।

ইবনে কাসীর বলেনঃ যেসব মুসলিম ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শির্কে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি তোমাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শির্ক। সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেনঃ রিয়া (লোক দেখানো ইবাদাত) হচ্ছে ছোট শির্ক। [মুসনাদে আহমাদ ৫/৪২৯] এমনিভাবে অন্য এক হাদীসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম করাকেও শির্ক বলা হয়েছে। [সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ১০/১৯৯, হাদীস নং ৪৩৫৮] আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মান্নত করা এবং যবেহ্ করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে আরও এসেছে, 'মুশরিকরা তাদের হজের তালবিয়া পাঠের সময় বলত: 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা, ইল্লা শারীকান হুয়া লাকা তামলিকুহূ ওমা মালাক। (অর্থাৎ আমি হাযির আল্লাহ্ আমি হাযির, আমি হাযির, আপনার কোন শরীক নেই, তবে এমন এক শরীক আছে যার আপনি মালিক, সে আপনার মালিক নয়) এটা বলত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ শির্কী তালবিয়া পড়ার সময় যখন তারা ('লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা) পর্যন্ত বলত, তখন তিনি বলতেন যথেষ্ট এতটুকুই বল। [মুসলিম: ১১৮৫] কারণ এর পরের অংশটুকু শির্ক। তারা ঈমানের সাথে শির্ক মিশ্রিত করে ফেলেছে। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করত এবং পারিপার্শ্বিক শহর

১০৮. বলুন, 'এটাই আমার পথ, আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি ডাকি জেনে-বুঝে, আমি[১] এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও[২]। আর

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۗ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۗ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

ও স্থানসমূহের ইতিহাস পাঠ করত, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, নবীগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। কওমে-লূতের জনপদসমূহকে উল্টে দেয়া হয়েছে। কওমে-'আদ ও কওমে সামূদকে নানাবিধ আযাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেয়া হয়েছে। দুনিয়াতে তাদের উপর এ ধরনের আযাব আসার ব্যাপারে তারা কিভাবে নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবছে? আর আখেরাত তা তো তাদের কাছে হঠাৎ করেই আসবে। যখন তারা সেটার আগমন সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না। ইবন আব্বাস বলেন, যখন আখেরাতের সে চিৎকার আসবে তখন তারা বাজারে ও তাদের কর্মস্থলে কাজ-কারবারে ব্যস্ত থাকবে। [বাগভী]

(১) অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমার তরীকা এই যে, মানুষকে সম্পূর্ণ জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতে থাকব -আমি এবং আমার অনুসারীরাও। এটাই আমার পথ, পদ্ধতি ও নিয়ম যে আমি আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই একমাত্র তিনিই মা'বুদ, তাঁর কোন শরীক নেই, এ সাক্ষ্য দানের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাব। জেনে বুঝে, বিশ্বাস ও প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হয়ে এ পথে আহ্বান জানাবো। অনুরূপভাবে যারা আমার অনুসরণ করবে তারা সবাই এ পথের দাওয়াত দিবে। যে পথে তাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত দিয়েছেন। তারাও এটা করবে সম্পূর্ণরূপে জেনে-বুঝে, শরী'আত ও বিবেক অনুমোদিত পদ্ধতিতে। [ইবন কাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোন চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। আমার উপর যারা ঈমান আনবে এবং আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে তারাও এ দাওয়াতের কাজ করবে। [বাগভী]

(২) 'যারা আমার অনুসরণ করেছে' এখানে 'তার অনুসরণকারী কারা তা নির্ধারণে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, এতে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জ্ঞানের বাহক। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ সাহাবায়ে কেরাম এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাদের অন্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাদের মধ্যে লৌকিকতার নাম-গন্ধও নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রাসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্য মনোনীত করেছেন। তোমরা তাদের চরিত্র অভ্যাস ও তরীকা আয়ত্ত কর। কেননা, তারা সরল পথের পথিক। কলবী ও ইবনে যায়েদ বলেনঃ এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণের দাবী করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তার দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানো এবং

আল্লাহ্‌ কতই না পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই[১]।'

১০৯. আর আমরা আপনার আগেও জনপদবাসীদের মধ্য থেকে[২] পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম[৩],

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوۡحِىۡۤ اِلَيۡهِمۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡقُرٰى ؕ اَفَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَيَنۡظُرُوۡا

কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা। [বাগভী; কিওয়ামুস সুন্নাহ আল-ইস্ফাহানী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ: ৪৯৮]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ শির্ক থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শির্ককেও যুক্ত করে দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শির্ক থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহ্‌র দাস এবং মানুষকেও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই।

(২) এ আয়াতেই ﴿اَهۡلِ الۡقُرٰى﴾ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সাধারণতঃ শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকেই রাসূল প্রেরণ করেছেন; কোন গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরিত হননি। কারণ, সাধারণতঃ গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব-প্রকৃতি ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাতপদ হয়ে থাকেন। [ইবন কাসীর] ইয়াকুব 'আলাইহিস্‌ সালামও শহরবাসী ছিলেন, কিন্তু কোন কারণে তারা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। তাই কুরআনের সূরা ইউসুফেরই ১০০ নং আয়াতে তাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতে কাফেরদের একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে, যেখানে তারা ফিরিশতার উপর এ কুরআন নাযিল হলো না কেন তা জিজ্ঞেস করেছিল। উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, আমি তো কেবল নগরবাসী পুরুষদেরকেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি। [কুরতুবী]

(৩) এ আয়াতে নবীগণের সম্পর্কে رِجَالًا শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, নবী সবসময় পুরুষই হন। নারীদের মধ্যে কেউ নবী বা রাসূল হতে পারে না। মূলত: এটাই বিশুদ্ধ মত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন নারীকে নবী কিংবা রাসূল হিসেবে পাঠাননি। কোন কোন আলেম কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার দাবী করেছেন; উদাহরণতঃ ইব্রাহীম 'আলাইহিস্‌ সালাম-এর বিবি সারা, মূসা 'আলাইহিস্‌ সালাম-এর জননী এবং ঈসা 'আলাইহিস্‌ সালাম-এর জননী মরিয়ম। এ তিন জন মহিলা সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশে ফিরিশ্‌তারা তাদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছে কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোন বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপকসংখ্যক আলেমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরোক্ত তিন জন মহিলার

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٠٩

যাদের কাছে ওহী পাঠাতাম। তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? ফলে দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল? আর অবশ্যই যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই উত্তম[১]; তবুও কি তোমরা বুঝ না?

حَتّٰۤى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّیَ مَنْ نَّشَآءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝١١٠

১১০. অবশেষে যখন রাসূলগণ (তাদের সম্প্রদায়ের ঈমান থেকে) নিরাশ হলেন এবং লোকেরা মনে করল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের কাছে আমাদের সাহায্য আসল। এভাবে আমরা যাকে ইচ্ছে করি সে নাজাত পায়। আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমাদের শাস্তি প্রতিরোধ করা হয় না।

لَقَدْ كَانَ فِیْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ؕ

১১১. তাদের বৃত্তান্তে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা[২]।

মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বোঝা যায় মাত্র। এই ভাষা নবুওয়াত ও রেসালাত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। [ইবন কাসীর]

(১) বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী। আসল চিন্তা আখেরাতের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। আরো বলা হয়েছে যে, আখেরাতের সুখ-শান্তি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ আল্লাহ্‌র নিষেধকৃত যাবতীয় বিষয় থেকে নিজেকে হেফাযত করে শরী'আতের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা।

(২) অর্থাৎ নবীদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। এর অর্থ সমস্ত নবীর কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চতম শিখরে কিভাবে পৌঁছে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে।

مَا كَانَ حَدِيثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١١١﴾

এটা কোন বানানো রচনা নয়। বরং এটা আগের গ্রন্থে যা আছে তার সত্যায়ন[১] ও সব কিছুর বিশদ বিবরণ, আর যারা ঈমান আনে এমন সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

---

(১) অর্থাৎ এ কুরআন কোন মনগড়া কথা নয়। এর পূর্বে যা ছিল সেগুলোর মধ্যে যা যা সত্য সেগুলোকে এ কুরআন সমর্থন করে আর যেগুলো পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে সেগুলোকে অস্বীকার করে। [ইবন কাসীর] অথবা এ কাহিনী কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা, তাওরাত ও ইঞ্জিলে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। [কুরতুবী]

১৩- সূরা আর-রা'দ,
৪৩ আয়াত, মাদানী



।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ্-লাম-মীম্-রা, এগুলো কিতাবের আয়াত, আর যা আপনার রব হতে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা সত্য(১); কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই ঈমান আনে না(২) ।

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِیْۤ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ①

২. আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া(৩), তোমরা

اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ

(১) আয়াতের প্রথমে "এগুলো কিতাবের আয়াত আর যা আপনার রব হতে আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে তা সত্য" বলে কি বুঝানো হয়েছে তাতে দু'টি মত রয়েছে। এক, এখানে "এগুলো কিতাবের আয়াত" বলে কুরআনের পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবসমূহকে বুঝানো হয়েছে, [তাবারী; বাগভী] আর তখন "আর যা আপনার রব হতে আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে" বলে কুরআনকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।[তাবারী] দুই, এখানে "এগুলো কিতাবের আয়াত" বলে কুরআনুল কারীম আল্লাহ্‌র কালাম এবং "আর যা আপনার রব এর পক্ষ হতে আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে" বলে কুরআনই বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] সে মতে আয়াতের অর্থ এই যে, এই কুরআনে যেসব বিধি-বিধান আপনার প্রতি নাযিল হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত। সেগুলোকে আঁকড়ে ধরুন।[বাগভী]

(২) যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আর আপনি যতই চান না কেন, বেশীর ভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয়" [সূরা ইউসুফ: ১০৩]

(৩) আয়াতের এক অনুবাদ উপরে করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহকে কোন খুঁটি ব্যতীত উপরে উঠিয়েছেন, তোমরা সে আসমানসমূহকে দেখতে পাচ্ছ। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন এক সত্তা, যিনি আসমানসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আসমানসমূহকে এ অবস্থায়ই দেখ। এ অর্থের স্বপক্ষে আমরা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র দেখতে পাই সেখানে বলা হয়েছে, "আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পড়ে না যায় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া।"[সূরা আল-হাজ্জঃ৬৫] তবে আয়াতের অন্য এক অনুবাদ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহকে অদৃশ্য ও অননুভূত স্তম্ভসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ অনুবাদটি ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদা রাহেমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে।[তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] তবে ইবন কাসীর প্রথম তাফসীরকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ

তা দেখছ[১]। তারপর তিনি 'আর্‌শের উপর উঠেছেন[২] এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন[৩]; প্রত্যেকটি

(১) কুরআনুল কারীমের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন এ আয়াতে تَرَوْنَهَا বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে ﴿وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ [সূরা আল-গাশিয়াহ্ঃ ১৮] বলা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনায় এটা এসেছে যে, যমীনের আশেপাশে যা আছে যেমনঃ বাতাস, পানি ইত্যাদি প্রথম আসমান এ সবগুলোকে সবদিক থেকে সমভাবে বেষ্টন করে আছে। যে কোন দিক থেকেই প্রথম আসমানের দিকে যাত্রা করা হউক না কেন তা পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বে রয়েছে। আবার প্রথম আসমান বা নিকটতম আসমানের পুরূত্বও পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বের মত। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় আসমানও প্রথম আসমানকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছে। এ দুটোর দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বের মত। আবার দ্বিতীয় আসমানের পুরূত্বও পাঁচশত বছরের রাস্তার মত। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানও তদ্রূপ দূরত্ব ও পুরুত্ব বিশিষ্ট। এ আসমানসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজস্ব ক্ষমতাবলে কোন প্রকার বাহ্যিক খুঁটি ব্যতীতই ধারন করে রেখেছেন। সেগুলো একটির উপর আরেকটি পড়ে যাচ্ছেনা এটা একদিকে যেমন তাঁর মহা শক্তিধর ও ক্ষমতাবান হওয়া নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে অন্যদিকে আসমান ও যমীন যে কত প্রকাণ্ড সৃষ্টি তার এক প্রচ্ছন্ন ধারণা আমাদেরকে দেয়। [ইবন কাসীর] মহান আল্লাহ্ বলেন, "মানুষকে সৃষ্টি করা অপেক্ষা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।" [সূরা গাফেরঃ ৫৭] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং তাদের মত পৃথিবীও, তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। [সূরা আত-ত্বালাকঃ ১২] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাত আসমান ও এর ভিতরে যা আছে এবং এর মাঝখানে যা আছে তা সবই কুরসীর মধ্যে যেন বিস্তীর্ণ যমীনের মধ্যে একটি আংটি আর কুরসী হলো মহান আরশের মধ্যে তদ্রূপ একটি আংটি স্বরূপ যা এক বিস্তীর্ণ যমীনে পড়ে আছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আর আরশ তার পরিমাণ তো মহান আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নির্ধারণ করে বলতে পারবে না। [তাবারী]

(২) এর ব্যাখ্যা সূরা বাকারাহ এবং সূরা আল-আ'রাফে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে সংক্ষেপে এখানে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ আরশের উপর উঠার ব্যাপারটি তাঁর একটি বিশেষ গুণ। তিনি আরশের উপর উঠেছেন বলে আমরা স্বীকৃতি দেব। কিন্তু কিভাবে তিনি তা করেছেন তা আমাদের জ্ঞানের বাইরের বিষয়।

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে। আজ্ঞাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে তিনি সৃষ্টিকুলের উপকারের

لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ۝

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে[১]। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন[২], যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার[৩]।

জন্য, তাঁর বান্দাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিয়োজিত করেছেন, মূলতঃ প্রতিটি সৃষ্টিই স্রষ্টার আজ্ঞাধীন। [কুরতুবী] যে কাজে তাদেরকে আল্লাহ্ নিয়োজিত করেছেন তারা অহর্নিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু কোন সময় তাদের গতি চুল পরিমাণও কম-বেশী হয়নি। তারা ক্লান্ত হয় না এবং কোন সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। [কুরতুবী]

(১) আয়াতে উল্লেখিত أجل শব্দটির মূল অর্থঃ সময়। তবে অন্যান্য অর্থেও এর ব্যবহার আছে। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ বর্ণনায় কয়েকটি মত রয়েছেঃ
এক, এখানে ﴿أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ বা সুনির্দিষ্ট মেয়াদ বলতে বুঝানো হয়েছে যে, চাঁদ ও সূর্য কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে চলতে থাকবে। যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে, চাঁদকে নিষ্প্রভ করা হবে, তারকাসমূহ আলোহীন হয়ে পড়বে আর গ্রহ নক্ষত্রগুলো খসে পড়বে, তখন পর্যন্ত এগুলো চলবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ" [সূরা ইয়াসীনঃ ৩৮] এখানে গন্তব্য বলে সুনির্দিষ্ট সময়ও উদ্দেশ্য হতে পারে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]
দুই, কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক গ্রহের জন্যে একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সব সময় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে। চন্দ্র নিজ কক্ষপথ এক মাসে এবং সূর্য এক বছরে অতিক্রম করে। [কুরতুবী]
তিন, অথবা আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ সেগুলোকে সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানের প্রতি ধাবিত করান। আর সে গন্তব্যস্থান হলো আরশের নীচে। এ ব্যাপারে সহীহ হাদীসে বিস্তারিত এসেছে সূরা ইয়াসীনে যার বর্ণনা আসবে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তিনি আয়াতসমূহকে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। এর মানে, আল্লাহ্ তা'আলা অপার শক্তির নিদর্শনাবলী তিনি বর্ণনা করছেন। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ তিনি বিস্তারিত প্রমাণ পেশ করছেন যে, যিনি পূর্ব বর্ণিত কাজগুলো করতে পারেন তিনি অবশ্যই মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় আনতে সক্ষম। [কুরতুবী] এগুলো আরও প্রমাণ করছে যে, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাঁর সৃষ্টিকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۖ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ③

৩. আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন[১] এবং তাতে সুদৃঢ়পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং সব রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়[২]। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন[৩]।

কায়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে আখেরাত ও কেয়ামতে বিশ্বাসী হও এবং সত্য বলে মেনে নাও। [বাগভী] কেননা, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর আখেরাতে মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহ্‌র শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভব হবে না।

(১) পূর্বের আয়াতে উপরস্থিত আসমানের নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছেন। আর এখানে নিচের বা যমীনের নিদর্শনাবলী বর্ণনা করছেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন। ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। [ফাতহুল কাদীর] কুরআনুল কারীম সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সম্বোধন করে। বাহ্যদর্শী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্ট জীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পর্বত-শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য কোন চৌবাচ্চা নেই এবং তা তৈরি করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কুপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

(২) অর্থাৎ এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল-ফসল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফল-ফসলের দু'প্রকার সৃষ্টি করছেনঃ লাল-হলুদ, টক-মিষ্টি। [বাগভী] তবে এর অর্থ দুই না হয়ে একাধিক হতে পারে যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হবে। তাই বিষয়টি اثْنَيْنِ زَوْجَيْنِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি ফলই দু' প্রকার হয়, রঙের দিক থেকে যেমন, সাদা-কালো, অথবা স্বাদের দিক থেকে যেমন, মিষ্টি-টক, অথবা আকৃতির দিক থেকে যেমন, বড়-ছোট, অথবা অবস্থাগত দিক থেকে যেমন, গরম ও ঠাণ্ডা। [ফাতহুল কাদীর] কারও কারও মতে, زَوْجَيْنِ এর অর্থ নর ও মাদী হওয়া [কুরতুবী]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। অর্থাৎ দিনের আলোর পর রাত্রি

নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য(১) ।

৪. আর যমীনে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড(২), আঙ্গুর বাগান, শস্যক্ষেত্র, একই মূল থেকে উদগত বা ভিন্ন

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ

নিয়ে আসেন; যেমন কোন উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে কালো করে দেয়া হয় । ফলে স্বচ্ছ শুভ্র উজ্জ্বল থাকার পর সেটা অন্ধকার কালোতে রূপান্তরিত হয় । [ফাতহুল কাদীর] আবার আরেক অর্থে, তিনি এ দু'টিকে এমন করেছেন যে, এর প্রত্যেকটি অপরটিকে তাড়িয়ে বেড়ায় । [ইবন কাসীর] একটি যাওয়ার সাথে সাথে আরেকটি আসবেই । এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও তাদের বাসস্থান যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন তেমনি তিনি সময়ও নিয়ন্ত্রণ করেন ।

(১) উপরে বিশ্ব-জাহানের যে নিদর্শনাবলীকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে সেগুলোতে কেউ চিন্তাভাবনা করলে অবশ্যই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাবে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পরিচালক একজনই আর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন, আল্লাহর আদালতে মানুষের হাযির হওয়া এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব খবর দিয়েছেন সেগুলো সবই সত্য । [বাগভী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নতুন করে অন্য আরেক প্রকার নিদর্শন পেশ করছেন । [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ সারা পৃথিবীকে তিনি একই ধরনের একটি ভূখণ্ড বানিয়ে রেখে দেননি । বরং তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য ভূখণ্ড, এ ভূখণ্ডগুলো পরস্পর সংলগ্ন থাকা সত্ত্বেও আকার-আকৃতি, রং, গঠন, উপাদান, বৈশিষ্ট, শক্তি ও যোগ্যতা এবং উৎপাদনে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে । এ গুলোর কোনটি এমন যে, তাতে শস্য উৎপন্ন হয় আবার কোন কোনটি একেবারে অকেজো ভূমি যাতে কোন কিছুই উৎপন্ন হয়না অথচ এ দু'ধরনের ভূমিই পাশাপাশি অবস্থিত । [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এ বিভিন্ন ভূখণ্ডের সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে নানা প্রকার বিভিন্নতার অস্তিত্ব এত বিপুল পরিমান জ্ঞান ও কল্যাণে পরিপূর্ণ যে, তা গণনা করে শেষ করা যেতে পারে না । এ ভুখণ্ড লাল, অপরটি সাদা, কোনটি হলুদ, কোনটি কালো, কোনটি পাথুরে, কোনটি সমতল, কোনটি বালুময়, কোনটি দো-আঁশ, কোনটি মিহি, অথচ সবগুলোই পাশাপাশি । প্রতিটি তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আছে । এসব কিছুই প্রমাণ করছে যে, একজন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ক্ষমতাধর সত্তা রয়েছেন যিনি এগুলো করেছেন । তিনিই একমাত্র ইলাহ, তাঁর কোন শরীক নেই । তিনিই একমাত্র রব, তিনি ব্যতীত আর কোন রব নেই । [ইবন কাসীর] তাছাড়া কোন কোন ভুমি পাশাপাশি নয় অথচ তাদের মধ্যে একই ধরণের শক্তি, যোগ্যতা পাওয়া যায় । এখানে 'পাশাপাশি নয়' এ কথাটি উহ্য থাকতে পারে । [ফাতহুল কাদীর]

وَّاحِدٍ ۙ وَّنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٤﴾

ভিন্ন মূল থেকে উদগত খেজুর গাছ[১] যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর স্বাদ-রূপের ক্ষেত্রে সেগুলোর কিছু সংখ্যককে আমরা কিছু সংখ্যকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি[২]। নিশ্চয় বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন[৩]।

---

(১) কিছু কিছু খেজুর গাছের মূল থেকে একটি খেজুর গাছ বের হয় আবার কিছু কিছুর মূল থেকে একাধিক গাছ বের হয়। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে আল্লাহর তাওহীদ এবং তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শনাবলী দেখানো ছাড়া আরো একটি সত্যের দিকেও সূক্ষ্ম ইশারা করা হয়েছে। এ সত্যটি হচ্ছে, আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের কোথাও এক রকম অবস্থা রাখেননি। একই পৃথিবী কিন্তু এর ভূখণ্ডগুলোর প্রত্যেকের বর্ণ, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলাদা। একই জমি ও একই পানি, কিন্তু তা থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল ও ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছ কিন্তু তার প্রত্যেকটি ফল একই জাতের হওয়া সত্ত্বেও তাদের আকৃতি, আয়তন, স্বাদ, গন্ধ, রূপ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। একই মূল থেকে দু'টি ভিন্ন গাছ বের হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজের একক বৈশিষ্টের অধিকারী। যে ব্যক্তি এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে সে অবশ্যই এতে একজন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সত্তার কার্য সক্রিয় আছে দেখতে পাবে। যিনি তার অসীম ক্ষমতায় এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেছেন সেভাবে সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা সবশেষে বলেছেন যে, নিশ্চয় বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য এতে রয়েছে প্রচুর নিদর্শন। [ইবন কাসীর]

(৩) বলা হচ্ছে, এই যে পরস্পর পাশাপাশি দু'টি ভুমিতে আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেন, তন্মধ্যে একই ফল একই জমিতে একই পানি দ্বারা উৎপন্ন করি তারপরও সেটার স্বাদ দু'রকমের হয়। একটি মিষ্ট অপরটি টক। একটি অত্যন্ত উন্নতমানের অপরটি অনুন্নত পর্যায়ের। একটি চিত্তাকর্ষক অপরটি তেমন নয়। এসব কিছুতে কেউ চিন্তা, গবেষণা ও বিবেক খাটালে যে কেউ অবশ্যই মেনে নিতে বাধ্য হবে যে, এর বিভিন্নতার প্রকৃত কারণ এক মহান প্রজ্ঞাময় সত্তার শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, সাধারণত: যে কারণে ফল-ফলাদিতে পার্থক্য সূচিত হয় তা দু'টি। এক. উৎপন্নস্থানের ভিন্নতা, দুই. পানির গড়মিল। কিন্তু যদি জমি ও পানি একই প্রকার হয়, তারপর যদি সেটাতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ফল পরিলক্ষিত হয় তবে বিবেকবান মাত্রই এটা বলতে বাধ্য হবে যে, এটা সেই অপার শক্তি ও আশ্চর্যজনক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। [ফাতহুল কাদীর]

মুজাহিদ বলেন, এটা মূলত: আদম সন্তানদের জন্য একটি উদাহরণ, তাদের মধ্যে

৫. আর যদি আপনি বিস্মিত হন, তবে বিস্ময়ের বিষয় তাদের কথা[১]ঃ ‘মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নূতন জীবন লাভ করব[২]?’

وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ

নেককার ও বদকার হয়েছে অথচ তাদের পিতা একজনই। হাসান বসরী বলেন, এ উদাহরণটি আল্লাহ্ তা‘আলা আদম সন্তানদের হৃদয়ের জন্য পেশ করেছেন। কারণ, যমীন মহান আল্লাহ্‌র হাতে একটি কাদামাটির পিণ্ড ছিল। তিনি সেটাকে বিছিয়ে দিলেন, ফলে সেটা পরস্পর পাশাপাশি টুকরায় পরিণত হলো, তারপর তাতে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলো, ফলে তা থেকে বের হলো, ফুল, গাছ, ফল ও উদ্ভিদ। আর এ মাটির কোনটি হল খারাপ, লবনাক্ত ও অস্বচ্ছ। অথচ এগুলো সবই একই পানি দিয়ে সিক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষও আদম আলাইহিস সালাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর আসমান থেকে তাদের জন্য স্মরণিকা (কিতাব) নাযিল হলো, কিছু অন্তর নরম হলো এবং বিনীত হলো, আর কিছু অন্তর কঠোর হলো এবং গাফেল হলো। হাসান বসরী বলেন, কুরআনের কাছে কেউ যখন বসে তখন সে সেখান থেকে বেশী বা কম কিছু না নিয়ে বের হয় না। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “আর আমরা নাযিল করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত , কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে” [সূরা আল-ইসরা: ৮২] এতে অবশ্যই বিবেকবানদের জন্য প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। [বাগভী]

(১) এ আয়াত ও পরবর্তী দুটি আয়াতে কাফেরদের মৌলিক তিনটি সন্দেহ ও তার উত্তর দেয়া হয়েছে। সন্দেহগুলো হচ্ছে, এক. মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব কিতাব অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ। কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন, “আর কাফিররা বলে, ‘আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব যে তোমাদেরকে বলে, ‘তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও অবশ্যই তোমরা হবে নতুনভাবে সৃষ্ট!” [সূরা সাবাঃ ৭] দুই. তাদের দ্বিতীয় সন্দেহটি হচ্ছে, যদি বাস্তবিকই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে থাকেন, তবে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? তিন. কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক মু‘জিযা দেখেছি; কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু‘জিযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এ সন্দেহ তিনটির উত্তর আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য ৫ নং আয়াত এবং পরবর্তী ৬ ও ৭ নং আয়াতে প্রদান করেছেন।

(২) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, কাফেররা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর প্রমাণসমূহ দেখে তিনি যা ইচ্ছে করতে সক্ষম এটার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য, তারপর তারা স্বীকার করছে যে,

এরাই তারা, যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে[১] আর এরাই তারা,

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

তিনিই সবকিছু প্রথম সৃষ্টি করেছেন, অথচ তিনি যখন প্রথম সৃষ্টি করেছেন তখন তারা কিছুই ছিল না। এতকিছুর পরও যদি কাফেররা প্রতিটি সৃষ্টিকে পুনর্জীবনের বিষয়টির উপর মিথ্যারোপ করে তবে আপনি অবশ্যই আশ্চর্য হবেন। কিন্তু তার চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে, এটা কি সম্ভবপর? [বাগভী; ইবন কাসীর] কুরআনুল কারীম এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। তবে যেটা অন্য আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টির চাইতে অনেক বড় ব্যাপার। আর যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে পারেন তার জন্য দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অনেক সহজ। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, আপনি আশ্চর্য হবেন যে, কাফেররা আপনার সুস্পষ্ট মু'জিযা এবং নবুওয়াতের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুওয়াত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে? কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে, এটা কি সম্ভবপর? [বাগভী] কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য, যে সত্তা প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তাঁর পক্ষে পুনর্বার অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? আশ্চর্যের বিষয়, কাফেররা একথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হেকমতসহ আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে? আল্লাহ্ বলেন, "আর তারা কি দেখে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম? অবশ্যই হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" [সূরা আল-আহকাফ: ৩৩] সত্যি বলতে কি, কাফেররা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহ্‌র শক্তিকে বুঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদু'ভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন। মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও কাফেরদের পক্ষে নবুওয়াত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেয়ামতের পুনর্জীবন ও হাশরের দিনকে অস্বীকার করা।

(১) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার পরিণতি সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, তারা

যাদের গলায় থাকবে শিকল[১]। আর তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

৬. আর তারা ভালোর পূর্বেই মন্দের জন্য তাড়াহুড়ো করছে। অথচ তাদের আগে শাস্তির অনুরূপ বহু (শিক্ষণীয়) দৃষ্টান্ত গত হয়েছে[২]। আর নিশ্চয় আপনার

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۗ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ

এর মাধ্যমে তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে। [ইবন কাসীর] কারণ, আখেরাতে মানুষকে পুনর্বার নিয়ে আসা আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণ। তাদের আখেরাত অস্বীকার ছিল মূলত আল্লাহ, তাঁর শক্তিমত্তা ও জ্ঞান অস্বীকারের নামান্তর। এজন্য তারা কাফের হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

(১) দুনিয়াতে তারা যেহেতু কুফরী করেছে সেহেতু তাদেরকে আখেরাতে এর পরিণতি ভোগ করতেই হবে। আখেরাতে তাদের পরিণতি হচ্ছে, তাদের গলায় থাকবে শেকল পরানো। গলায় শেকল পরানো থাকা কয়েদী হবার আলামত। তাদের গলায় যে শেকল পরানো হবে তা হবে আগুনের শিকল। [মুয়াসসার] তাদেরকে তা দিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। [ইবন কাসীর]

(২) কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল, যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে থাকেন, তবে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? কখনো তারা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বলতে থাকেঃ "হে আমাদের রব! এখনই তুমি আমাদের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দাও। কিয়ামতের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রেখো না।" [সূরা সোয়াদঃ ১৬]। আবার কখনো বলতে থাকেঃ "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথাগুলো পেশ করছে এগুলো যদি সত্যি হয় এবং তোমারই পক্ষ থেকে হয় তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল করো।" [সূরা আল-আনফালঃ ৩২]। আবার কখনো তারা রাসূলকেই এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে বলতে থাকেঃ "তারা বলে, 'ওহে যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ। 'তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের কাছে ফিরিশ্‌তাদেরকে উপস্থিত করছ না কেন?' আমরা ফিরিশ্‌তাদেরকে যথার্থ কারণ ছাড়া নাযিল করি না; ফিরিশ্‌তারা উপস্থিত হলে তারা অবকাশ পাবে না।" [সূরা আল-হিজরঃ ৬-৮] এ আয়াতে কাফেরদের পূর্বোক্ত কথাগুলোর জবাব দিয়ে বলা হয়েছেঃ এ মূর্খের দল কল্যাণের আগে অকল্যাণ চেয়ে নিচ্ছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এদেরকে যে অবকাশ দেয়া হচ্ছে তার সুযোগ গ্রহণ করার পরিবর্তে এরা এ অবকাশকে দ্রুত খতম করে দেয়ার এবং এদের বিদ্রোহাত্মক কর্মনীতির কারণে এদেরকে অনতিবিলম্বে পাকড়াও করার দাবী জানাচ্ছে। অন্যত্র

لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ রব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের যুলুম সত্ত্বেও এবং নিশ্চয় আপনার রব শাস্তি দানে কঠোর[১]।

৭. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'তার রবের কাছ থেকে তার উপর

বলা হয়েছেঃ "তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি নির্ধারিত কাল না থাকত তবে শাস্তি অবশ্যই তাদের উপর আসত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই।" [সূরা আল-আনকাবূতঃ ৫৩-৫৪] আরো এসেছে, "যারা এটা বিশ্বাস করে না তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়।" [সূরা আশ-শূরাঃ ১৮]। মোটকথাঃ তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার কাছে বিপদ নাযিল হওয়ার তাগাদা করে যে, আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আযাব এনে দিন। এতে বুঝা যায় যে, তারা আযাব আসাকে খুবই অবাস্তব অথবা অসম্ভব মনে করে। এটা ছিল তাদের অবিশ্বাস, কুফরি, অবাধ্যতা, বিরোধিতা ও অস্বীকৃতির চরম পর্যায়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফেরদের উপর অনেক আযাব এসেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। তাদেরকে এর মাধ্যমে আল্লাহ্ পরবর্তীদের জন্য উদাহরণ, উপদেশ হিসেবে রেখে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] এমতাবস্থায় তাদের উপর আযাব অবাস্তব হল কিরূপে? এখানে مثلات শব্দটি مثلة -এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। [ফাতহুল কাদীর]

(১) বলা হয়েছে, "মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও আপনার রব তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল"। মানুষের শত অন্যায়কেও তিনি ক্ষমা করেন। যদি তিনি ক্ষমাশীল না হতেন তবে কারোই রেহাই ছিল না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ্ তো আছেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা ফাতিরঃ ৪৫] আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, তিনি যে শুধু ক্ষমাশীল তা-ই নয় বরং তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর বান্দাকে আশা ও ভীতির মধ্যে রাখেন। [যেমন, সূরা আল-আন'আমঃ ১৪৭, সূরা আল-আ'রাফঃ ১৬৭, সূরা আল-হিজরঃ ৪৯-৫০] যাতে করে মানুষের জীবনে ভারসাম্য বজায় থাকে। শুধু আশার বাণী শুনতে শুনতে মানুষ সীমালজ্ঘন করতে দ্বিধা করবে না। আবার শুধু ভয়-ভীতির কথা শুনতে শুনতে মানুষের জীবন দূর্বিষহ হয়ে উঠবে না। এটাই আল্লাহ্ তা'আলা চান। সে জন্য তিনি যখনই কোন আশার কথা শুনিয়েছেন সাথে সাথেই ভয়ের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। মূলতঃ আশা ও ভীতির মাঝেই হলো ঈমানের অবস্থান। [ইবন কাসীর]

رَبِّهٖ ۭ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন[১]?' আপনি তো শুধু সতর্ককারী, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক[২]।

দ্বিতীয় রুকূ'

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۭ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝

৮. প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ্ তা জানেন[৩] এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক

---

(১) কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রাসূলের কাছে বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এখানে তারা এমন নিশানীর কথা বলতে চাচ্ছিল যা দেখে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর রাসূল হবার উপর ঈমান আনতে পারে। এটা ছিল মূলত: তাদের গোঁড়ামী। যেমন এর পূর্বেও তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করার অযথা আব্দার করেছিল। তারা আরও বলেছিল যে, আপনি মক্কার পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দিন। সে পাহাড়ের জায়গায় নদী-নালার ব্যবস্থা করে দিন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর আমাদেরকে নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে শুধু এটাই বিরত রেখেছে যে, তাদের পূর্ববর্তীগণ তাতে মিথ্যারোপ করেছিল।" [সূরা আল-ইসরা: ৫৯] [ইবন কাসীর] মু'জিযা প্রকাশ করা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন। তিনি কারো দাবী ও ইচ্ছা পূরণ করতে বাধ্য নন। এ জন্যই বলা হয়েছেঃ ﴿اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ অর্থাৎ আপনার কাজ শুধু আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা।

(২) আয়াতের কয়েকটি অর্থ করা হয়ে থাকে। এক. আপনি তো একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী আর প্রতিটি কাওমের জন্য রয়েছে হিদায়াতকারী নবী, যিনি তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করবেন। [বাগভী; ইবন কাসীর] দুই. আপনি তো একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী এবং প্রতিটি কাওমের জন্যও আপনি হিদায়াতকারী অর্থাৎ আহ্বানকারী। [বাগভী; ইবন কাসীর] তিন. সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, এর অর্থ আপনি তো একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী। আর সত্যিকার হিদায়াতকারী তো আল্লাহ্ তা'আলাই। [বাগভী; ইবন কাসীর] প্রথম মতটিকে ইমাম শানকীতী প্রাধান্য দিয়ে বলেন, এর সমার্থে অন্যত্র এসেছে, "আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য আছে একজন রাসূল" [সূরা ইউনুস: ৪৭] আরও এসেছে, "আর এমন কোন উম্মত নেই যার কাছে গত হয়নি সতর্ককারী" [সূরা ফাতির : ২৪] আরও এসেছে, "আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম" [সূরা আন-নাহল: ৩৬] [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) এর অর্থ হচ্ছে, মায়ের গর্ভাশয়ে ভ্রুণের অংগ-প্রত্যংগ, শক্তি-সামর্থ, যোগ্যতা ও

বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

৯. তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ(১)।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾

মানসিক ক্ষমতার যাবতীয় হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে, তা ছেলে কি মেয়ে, সুশ্রী কি কুশ্রী, সৎ কি অসৎ তা সবই আল্লাহ্ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যেহ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এক বা একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোন সময় দ্রুত কোন সময় দেরীতে তাও আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। [আদওয়াউল বায়ান]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আলেমুল গায়েব'। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ও সেসবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যা কিছু গর্ভাশয়ে রয়েছে। [সূরা লোকমানঃ ৩৪] আমরা যদি সূরা লোকমান এর এ আয়াতটির সাথে আলোচ্য সূরার ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ আয়াতকে একসাথে মিলিয়ে তাফসীর করি তাহলে বর্তমান কালের এ আয়াত সংক্রান্ত অনেক সন্দেহের জবাব দেয়া সহজ হয়ে যাবে। কারণ সূরা লোকমানের আয়াতে যা বলা হয়েছে এ আয়াত তার তাফসীর হতে পারে। ফলে গর্ভাশয়ে অবস্থিত সন্তানের অবস্থা বর্তমানে বিভিন্ন মাধ্যমে জানা গেলেও তা সূরা লোকমান এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি গায়েব এর জ্ঞানের দাবী কেউ করতে পারবে না। বিশেষ করে সহীহ হাদীসে গায়েবের পাঁচটি বস্তু বর্ণনায় যে শব্দ ব্যবহার হয়েছে তাও এ তাফসীর সমর্থন করছে। হাদীসে এসেছে, "পাঁচটি বিষয় হলো সমস্ত গায়েবের চাবিকাঠি, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তা জানে না ... আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস হয় তা জানে না।" [বুখারীঃ ৪৬৯৭] আর এটা সর্বজনবিদিত যে, গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয় বা হবে তা কেউ কোন দিন বলে দিতে পারবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত---যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে।" [সূরা আন-নাজম: ৩২] আরও বলেন, "তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন" [সূরা আলে ইমরান:৬] আয়াতের আরেক অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন কোন মহিলা কোন ধরণের সন্তান গর্ভে ধারণ করবে। তখন ما টি হবে موصولة [আদওয়াউল বায়ান]

(১) আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ যে, তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ ﴿١٠﴾

১০. তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে বা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সবাই আল্লাহ্‌র নিকট সমান[১]।

الْكَبِيْرُ শব্দের অর্থ বড় এবং المتعال -এর অর্থ উচ্চ। তিনি মান মর্যাদার দিক থেকে যেমন সবার উপরে, ক্ষমতার দিক থেকেও সবার উপরে। অনুরূপভাবে তিনি অবস্থানের দিক থেকেও সবার উপরে। [ইবনুল কাইয়েম, মাদারিজুস সালেকীন: ১/৫৫] উভয় শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তিনি সবার চেয়ে বড়, তিনি সবকিছুর উপরে। [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলীর ঊর্ধ্বে। কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি-দোষে তারা আল্লাহ্‌কে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমনসব গুণাবলী সাব্যস্ত করত, যেগুলো তাঁর মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। তিনি সেগুলো থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। [ফাতহুল কাদীর] উদাহরণতঃ ইয়াহূদী ও নাসারাগণ আল্লাহ্‌র জন্য পুত্র সাব্যস্ত করেছে। আরবের মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সাব্যস্ত করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে, ঊর্ধ্বে ও পবিত্র। কুরআনুল কারীম তাদের বর্ণিত গুণাবলী থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্য বার বার বলেছেঃ ﴿سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৯১] -অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব গুণ থেকে পবিত্র যেগুলো তারা বর্ণনা করে। প্রথম ﴿عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾ এবং তৎপূর্ববর্তী ﴿ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ﴾ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় ﴿ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ﴾ বাক্যে শক্তি ও মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার ঊর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও এ জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণভাবে জানেন। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ "তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। [সূরা আল-মুলকঃ ১৩-১৪] আরো বলেছেনঃ "যদি আপনি উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন, তবে তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন।" [সূরা ত্বা-হাঃ ৭] অন্য আয়াতে বলেছেনঃ "এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর আর যা প্রকাশ কর" [সূরা আন-নামলঃ ২৫] অন্যত্র বলেছেনঃ "সাবধান! নিশ্চয়ই ওরা তাঁর কাছে গোপন রাখার জন্য ওদের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে। সাবধান! ওরা যখন নিজেদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে তখন ওরা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন। অন্তরে যা আছে, নিশ্চয়ই তিনি তা সবিশেষ অবহিত।" [সূরা হূদঃ ৫] আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার

১১. মানুষের জন্য রয়েছে তার সামনে ও পিছনে একের পর এক আগমনকারী প্রহরী; তারা আল্লাহ্‌র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে[১]। নিশ্চয় আল্লাহ্

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَآ اَرَادَ

জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যপ্ত। কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত নয়।

(১) مُعَقِّبٰتٌ শব্দটি معقبة এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে معقبة অথবা متعقبة বলা হয়। ﴿مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ এর শাব্দিক অর্থ, উভয় হাতের মাঝখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। ﴿مِنْ خَلْفِهٖ﴾ এর অর্থ পশ্চাদ্দিক। আয়াতের কয়েকটি অর্থ করা হয়ে থাকে।

এক. তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের কারণে তাকে হেফাযত করে। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘুরাফেরা করে- এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফিরিশ্‌তাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মূখে ও পশ্চাদ্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। রাতে তাদের জন্য কিছু পাহারাদার রয়েছে, যেমন রয়েছে দিনে। তারা তাকে বিভিন্ন দুর্ঘটনা থেকে হেফাযত করে। যেমন আরও কিছু ফেরেশতা রয়েছে যারা তার ভাল কিংবা মন্দ আমল হেফাযত করে। রাতে কিছু ফেরেশতা দিনে কিছু ফেরেশতা। তার ডানে বামে দুজন, যারা তার আমল লিখে। ডান দিকের ফেরেশতা তার সৎকর্ম লিখে, আর বাম দিকের ফেরেশতা তার অসৎকর্ম লিখে। আবার দুজন ফেরেশতা রয়েছে যারা তাকে হেফাযত করে, একজন তার সামনের দিকে অপরজন তার পিছনের দিকে। সুতরাং সে দিনে রাতে চার ফেরেশতার মাঝখানে বসবাস করে। যারা পরিবর্তিতভাবে আগমন করে থাকে। দু'জন আমল হেফাযতকারী আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষের হেফাযত করা তাদের দায়িত্ব। আর বাকী দু'জন লিখক। তাদের আমলনামা লিখে। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছেঃ 'ফিরিশ্‌তাদের দু'টি দল হেফাযতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য। উভয় দল ফজর ও আসরের সালাতের সময় একত্রিত হন। ফজরের সালাতের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় নেন এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বুঝে নেন। আসরের সালাতের পর তারা বিদায় হয়ে যান এবং রাতের ফিরিশ্‌তারা

ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ⑪

কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে[১]।

দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন।' [বুখারীঃ ৭৪২৯, মুসলিমঃ ৬৩২]
দুই. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আয়াতের আরেকটি অর্থ বর্ণিত আছে, তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ থেকে তাকে হেফাযত করে।[ইবন কাসীর] অর্থাৎ তাঁর কোন প্রকার আযাব যেমন, জিন ইত্যাদি থেকে তাদেরকে হেফাযত করে। [কুরতুবী] তারপর যখন তার তাকদীর অনুসারে কোন কিছু ঘটার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসে তখন ফিরিশ্‌তাগণ সরে পড়ে। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছুসংখ্যক হেফাযতকারী ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয়, কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয়, ইত্যাদি বিষয়ে ফিরিশ্‌তাগণ তার হেফাযত করেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ তবে কোন মানুষের তাকদীর লিখিত বিপদাপদে জড়িত হওয়ার সময় ফিরিশ্‌তারা সেখান থেকে সরে যায়।' [ইবনে হাজারঃ ফাতহুল বারী ৮/৩৭২] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই একজন ফিরিশ্‌তা এবং একজন শয়তান জুড়ে দেয়া আছে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনার সাথেও? তিনি উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ, তবে আল্লাহ আমাকে তার উপর সহযোগিতা করেছেন, ফলে সে আত্মসমর্পন করেছে, বা আমি নিরাপদ হয়ে গেছি, সে আমাকে ভাল কাজ ছাড়া আর কোন কিছুর নির্দেশ দেয় না।' [মুসলিমঃ ২৮১৪]। মোটকথা এই যে, হেফাযতকারী ফিরিশ্‌তা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিকের বিপদাপদ থেকেই মানুষকে নিদ্রায় ও জাগরণে হেফাযত করে। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তন করে না নেয়।" [বাগভী] তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। এ পরিবর্তন হয় তারা নিজেরা করে, অথবা তাদের উপর যারা কর্তৃত্বশীল তারা করে, নতুবা তাদেরই মধ্যকার অন্যদের কারণে সেটা সংঘটিত হয়। যেমন উহুদের মাঠে তীরন্দাযদের স্থান পরিবর্তনের কারণে মুসলিমদের উপর বিপদ এসে পড়েছিল। ইসলামী শরী'আতে এরকম আরও বহু উদাহরণ রয়েছে। তবে আয়াতের অর্থ এ নয় যে, তিনি কারও কোন গুনাহ ব্যতীত তাদের উপর বিপর্যয় দেন না। বরং কখন কখনও অপরের গুনাহের কারণে বিপর্যয় নেমে আসে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আমাদের মধ্যে নেককাররা থাকা অবস্থায় কি আমাদের ধ্বংস করা হবে? তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, যখন অন্যায় অপরাধ ও পঙ্কিলতা

আর কোন সম্প্রদায়ের জন্য যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছে করেন তবে তা রদ হওয়ার নয়[১] এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই ।

১২. তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী, ভয় ও আশা-আকাংখারূপে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ[২];

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾

বৃদ্ধি পায়' [বুখারী: ৩৩৪৬; মুসলিম: ২৮৮০]
সারকথা এই যে, মানুষের হেফাযতের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফিরিশ্‌তাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে পাপাচার, ভ্রষ্টতা ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে আসে । এ আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না । অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এটা এজন্যে যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি ওদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন, তাতে পরিবর্তন আনবেন; [সূরা আল-আনফালঃ৫৩]

(১) বলাবাহুল্য, যখন আল্লাহ্ তা'আলাই কাউকে আঘাত দিতে চান, বিপদে ফেলতে চান, অসুখ দিতে চান, রোগাক্রান্ত করতে চান, তখন কেউ তার সে বিপদ ফেরাতে পারে না [কুরতুবী] আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থেও কেউ এগিয়ে আসতে পারে না । সুতরাং তোমরা এ ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করো না যে, যাই কিছু করতে থাকো না কেন আল্লাহর দরবারে এমন কোন শক্তিশালী পীর, ফকীর বা কোন পূর্ববর্তী -পরবর্তী মহাপুরুষ অথবা কোন জিন বা ফেরেশতা আছে যে তোমাদের নযরানার উৎকোচ নিয়ে তোমাদেরকে অসৎকাজের পরিণাম থেকে বাঁচাবে । অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে তাঁর শাস্তি রদ করা হয় না ।' [আল-আন'আমঃ ১৪৭] আরো বলেছেন "অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমাদের শাস্তি রদ করা যায় না ।" [সূরা ইউসুফঃ ১১০]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করান । এটা মানুষের জন্য ভয়েরও কারণ হতে পারে । কারণ, এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাইভস্ম করে দেয় । আবার এটা আশার সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনের অবলম্বন । [বাগভী] আল্লাহ্ তা'আলাই বড় বড় ভারী মেঘমালা উত্থিত করেন এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন । কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এখানে মুসাফিরের জন্য কষ্টের ভয় এবং মুকীম বা স্থায়ীভাবে বসবাসকারীর জন্য আশার বৃষ্টি ও রহমতের কারণ বলা হয়েছে । [ইবন কাসীর; আত-তাফসীরুস সহীহ]

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

১৩. আর রা'দ তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে[১] এবং ফেরেশ্‌তাগণও তা-ই করে তাঁর ভয়ে। আর তিনি গর্জনকারী বজ্র পাঠান অতঃপর যাকে ইচ্ছে তা দ্বারা আঘাত করেন[২] এবং তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, আর তিনি শক্তিতে প্রবল শাস্তিতে কঠোর[৩]।

---

(১) অর্থাৎ রা'দ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তাসবীহ্ পাঠ করে এবং ফিরিশ্‌তারা তাঁর ভয়ে তাসবীহ্ পাঠ করে। মুজাহিদ বলেন, রা'দ বলে যদি মেঘের গর্জন বুঝা হয়, তবে এ তাসবীহ্ পাঠ করার অর্থ হবে আল্লাহ্ তাতে জীবন সৃষ্টি করেন। [কুরতুবী] অথবা এটা ঐ তাসবীহ্ যা কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে যে, "সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না" [সূরা আল-ইসরাঃ ৪৪] [ইবন কাসীর] কোন কোন হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ফিরিশ্‌তার নাম রা'দ। [দেখুন, তিরমিযীঃ ৩১১৭] এই অর্থে তাসবীহ্ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

(২) হাদীসে এসেছে, এক প্রতাপশালী লোকের কাছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পাঠালে সে লোক বললঃ কে আল্লাহ্‌র রাসূল? আল্লাহ্ কি? সোনার না রূপার? নাকি পিতলের? এভাবে তিনবার সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠানো লোককে বলে পাঠাল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তার উপর আকাশ থেকে বজ্রপাত করালেন। ফলে তার মাথা গুঁড়িয়ে যায়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [ইবনে আবি আসেমঃ আস্‌সুন্নাহঃ ৬৯২]

(৩) এখানে محال শব্দটি মীমের নীচে كسرة বা যের যোগে। যার অর্থঃ কৌশল, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি [বাগভী] শব্দটির বিভিন্ন অর্থ অনুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, তারা আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিশালী কৌশলকারী। [মুয়াসসার] তাঁর সামনে সবার চাতুরী অচল। যে কোন সময় যে কারো বিরুদ্ধে যে কোন কৌশল তিনি এমন পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারেন যে, আঘাত আসার এক মুহূর্ত আগেও সে জানতে পারে না কখন কোন দিক থেকে তার উপর আঘাত আসছে। এ ধরনের একচ্ছত্র শক্তিশালী সত্তা সম্পর্কে যারা না ভেবেচিন্তে এমনি হালকাভাবে আজেবাজে কথা বলে, কে তাদের বুদ্ধিমান বলতে পারে? তাঁর ক্ষমতা ও কৌশল সম্পর্কে কারও

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ
لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى
الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا دُعَاءُ
الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾

১৪. সত্যের আহ্বান তাঁরই। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে আহ্বান করে, তাদেরকে কোন কিছুতেই তারা সাড়া দেয় না[১]; তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এ আশায় তার দুহাত মেলে ধরে পানির দিকে, অথচ তা তার মুখে পৌঁছার নয়, আর কাফিরদের আহ্বান তো কেবল ভ্রষ্টতায় নিপতিত[২]।

কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তিনি যখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। তাঁর পাকড়াও থেকে কেউই পালিয়ে যেতে পারবে না। [সা'দী] সুতরাং যদি তিনিই কেবল বান্দাদের জন্য বৃষ্টি নিয়ে আসেন, তাদের জন্য রিযিকের মৌলিক ব্যবস্থাপনা করেন, তিনিই যদি তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন, সমস্ত বড় বড় সৃষ্টি যেগুলো বান্দাদের মনে ভীতির উদ্রেক করে এবং বিরক্তির সঞ্চার করে তারাও যদি তাঁকেই ভয় পায়, তবে তো তিনিই সবচেয়ে বেশী শক্তিমান। একমাত্র তিনি ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত। আর তাই পরবর্তী আয়াতে তাকে ডাকার কথা বলা হয়েছে। [সা'দী]

(১) ডাকা মানে নিজের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য ডাকা। এর মানে হচ্ছে, অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ এবং সংকটমুক্ত করার সব ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই কেন্দ্রীভূত। তাই একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা সঠিক ও যথার্থ সত্য বলে বিবেচিত। তাঁর আহ্বানই হক্ক আহ্বান। সে আহ্বানের মূল হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত হক্ক কোন মা'বুদ নেই। ﴿دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾ শব্দের তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এটাই বর্ণিত আছে। [দেখুন, তাবারী]

(২) মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ এর তাফসীরে বলেন, সে লোক মুখে পানির জন্য আহ্বান করছে আর পানির দিকে হাত বাড়াচ্ছে। এভাবে তো আর পানি কখনো মুখে পৌছে না। পানি পৌঁছার জন্য পানিকে আহ্বান না করে তা নিয়ে মুখে দিয়ে দিতে হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, এটা হলো মুশরিকের উদাহরণ। যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে তার উদাহরণ ঐ পিপাসার্ত ব্যক্তির মত যে তার মনে মনে পানির কথা ভেবে দূর থেকে পানি পাওয়ার আশা করে বসে আছে। সে পানি পাওয়ার শত আশা করলেও পানি পেতে পারে না। [তাবারী] তদ্রূপ মুশরিক ব্যক্তিও আল্লাহ্ ছাড়া অপর যাদেরকে ডাকে তাদের কাছে তার মনের যাবতীয় আশা-আকাংখা পূরণের আশা করে বসে আছে। কিন্তু তার আশা তো এভাবে কখনো পূরণ হবার নয়। তাকে তা পূরণ করতে হলে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই যেতে হবে।

১৫. আর আল্লাহ্‌র প্রতিই সিজ্‌দাবনত হয় আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়(১) এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল ও সন্ধ্যায়(২) ।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۩ ﴿١٥﴾

১৬. বলুন, 'কে আসমানসমূহ ও যমীনের রব?' বলুন, 'আল্লাহ্ ।'(৩) বলুন, 'তবে

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۗ قُلْ

---

(১) সিজ্‌দা মানে আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য ঝুঁকে পড়া, আদেশ পালন করা এবং পুরোপুরি মেনে নিয়ে মাথা নত করা । পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর আইনের অনুগত এবং তাঁর ইচ্ছার চুল পরিমাণও বিরোধিতা করতে পারে না –এ অর্থে তারা প্রত্যেকেই আল্লাহকে সিজদা করছে । মুমিন স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে তাঁর সামনে নত হয় কিন্তু কাফেরকে বাধ্য হয়ে নত হতে হয় । কারণ আল্লাহর প্রাকৃতিক আইনের বাইরে চলে যাওয়ার ক্ষমতা নেই । আর তারা নিজেরা স্রষ্টার মুখাপেক্ষী এটা প্রমাণ করছে । [কুরতুবী]

(২) 'তাদের ছায়াগুলো নত হওয়া ও সিজদা করা'র মানে হচ্ছে, ছায়ার সকাল-সাঁঝে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে সিজদা করা । এ এমন একটি আলামত যা থেকে বুঝা যায় যে, এসব জিনিস কারো হুকুমের অনুগত এবং কারোর নিয়ন্ত্রণাধীন । [কুরতুবী] মুফাসসিরগণ বলেন, সিজদাকারীদের কেউ ইচ্ছাকৃত আল্লাহ্‌র সিজদা করে আবার কেউ করে অনিচ্ছাকৃত কিন্তু তাদের ছায়াগুলো ঠিকই ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদা করছে । [বাগভী] মুজাহিদ বলেন, ঈমানদারের ছায়া ইচ্ছাকৃত সিজদা করে, আর সেও তা মেনে নিয়েছে । পক্ষান্তরে কাফেরের ছায়া ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদা করে অথচ সে অপছন্দ করছে । [তাবারী] এ আয়াতের সমার্থে আরো এসেছে, "তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়?" [সূরা আন-নাহলঃ ৪৮]

(৩) উল্লেখ করা যেতে পারে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের রব একথা তারা নিজেরা মানতো । এ প্রশ্নের জবাবে তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারতো না । কারণ একথা অস্বীকার করলে তাদের নিজেদের আকীদাকেই অস্বীকার করা হতো । কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিজ্ঞাসার পর তারা এর জবাব পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছিল । কারণ স্বীকৃতির পর ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাওহীদকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠতো এবং এরপর শির্কের জন্য আর কোন যুক্তিসংগত বুনিয়াদ থাকতো না । তাই নিজেদের অবস্থানের দুর্বলতা অনুভব করেই তারা এ প্রশ্নের জবাবে কিছু বলত না । এ কারণেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা কে? বিশ্ব-জাহানের রব কে? কে তোমাদের রিযিক দিচ্ছেন? তারপর হুকুম দেন, আপনি নিজে নিজেই বলুন আল্লাহ এবং এরপর এভাবে যুক্তি পেশ করেন যে, আল্লাহই যখন

أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়?' বলুন, 'অন্ধ(১) ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো(২) সমান হতে পারে?' তবে কি তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের

এ সমস্ত কাজ করছেন তখন আর কে আছে যার তোমরা বন্দেগী করে আসছো? এখানেও আল্লাহ্ তাদের সেই স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করে তাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই এ কথার স্বীকৃতি আদায় করছেন। কেননা, তারা স্বীকার করে যে, আসমান ও যমীনের রব হচ্ছেন আল্লাহ্, তিনিই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন, এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ্ ছাড়া বহু অভিভাবক ইলাহ গ্রহণ করে সেগুলোর ইবাদাত করছে, অথচ ইলাহগুলো না নিজেদের কোন লাভ-ক্ষতির মালিক, না তাদের ইবাদাতকারীদের। সেগুলো তাদের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। আর তাদের কোন ক্ষতিও দূর করতে পারে না। তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র সাথে এ সমস্ত ইলাহের ইবাদাত করে, আর যে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তার সাথে কাউকে শরীক করে না, আর সে তার রব প্রদত্ত স্পষ্ট আলোতে রয়েছে? [ইবন কাসীর]

(১) এখানে তিনি ঈমানদার ও কাফেরের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, যেভাবে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না তেমনি কাফের ও ঈমানদার সমান হতে পারে না। [বাগভী] মুমিন হক প্রত্যক্ষ করে, পক্ষান্তরে মুশরিক হক দেখে না। [কুরতুবী] অথবা এখানে অন্ধ বলে তারা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইবাদাত করতো তাদের বুঝানো হয়েছে আর চক্ষুষ্মান বলে স্বয়ং আল্লাহকেই বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

(২) আলো মানে সত্যজ্ঞানের আলো। এখানে উদ্দেশ্য ঈমান। [কুরতুবী] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা এ সত্য জ্ঞানের আলো ঈমান লাভ করেছিলেন। আর আঁধার মানে কুফরী। [কুরতুবী] কুফরীতে রয়েছে মূর্খতার আঁধার। নবীর অস্বীকারকারীরা এ আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং আলো ও আঁধার কখনও সমান হতে পারে না। যে ব্যক্তি আলো পেয়ে গেছে সে কেন নিজের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে আঁধারের বুকে হোঁচট খেয়ে ফিরতে থাকবে?

কাছে সদৃশ মনে হয়েছে[১]? বলুন, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা[২]; আর

(১) এ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, যদি দুনিয়ার কিছু জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করে থাকতেন এবং কিছু জিনিস অন্য মাখলুকরা সৃষ্টি করতো আর কোনটা আল্লাহর সৃষ্টি এবং কোনটা অন্যদের এ পার্থক্য করা সম্ভব না হতো তাহলে তো সত্যিই শিরকের জন্য কোন যুক্তিসংগত ভিত্তি হতে পারতো। কিন্তু ব্যাপারটি এ রকম নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর] কারণ, তাঁর হুবহু যেমন কিছু নেই তেমনি তার মতও কিছু নেই। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই, তাঁর অনুরূপ কেউ নেই, তার কোন মন্ত্রী-সাহায্যকারী নেই, তাঁর কোন সন্তান নেই, আর না আছে তাঁর কোন সঙ্গিনী। আল্লাহ্‌র মর্যাদা এ সমস্ত বিষয়াদি থেকে বহু ঊর্ধ্বে। এ মুশরিকরা নিজেরাই স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, এ সমস্ত মাবুদ যাদের ইবাদাত তারা করছে সেগুলো আল্লাহ্‌রই বান্দা, তাঁরই সৃষ্ট, যেমন তারা তাদের শির্কী তালবিয়াতে বলত: 'হাজির, তাঁর কোন শরীক নেই, তবে সে শরীক, যার কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র হাতে, আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব সে শরীকের কাছে নেই।' যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন, "আমরা তো এদের ইবাদত এ জন্যে করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এনে দেবে" [সূরা আয-যুমার: ৩] তারা যেহেতু এ ধরণের বিশ্বাস করে থাকে তাই আল্লাহ্ সেটা অস্বীকার করে বলেছেন যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ নেই যে, সুপারিশ করবে। "আর যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহ্‌র কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না" [সূরা সাবা: ২৩] আরও বলেন, "আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গুণে রেখেছেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে আসবে একাকী অবস্থায়।" [সূরা মারইয়াম: ৯৩-৯৫] সুতরাং এসবই যখন বান্দা ও দাস, তখন বিনা দলীল-প্রমাণে শুধু মতের উপর নির্ভরশীল হয়ে একে অপরের ইবাদত কেন করবে? তারপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের সবাইকে প্রথমজন থেকে শেষজন পর্যন্ত সবাইকে এথেকে সাবধান করে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করতে নিষেধ করার জন্যই পাঠিয়েছেন। ফলে তারা তার রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করল এবং তাদের বিরোধিতায় লিপ্ত হলো, তাই তাদের উপর শাস্তির বাণী যথাযথ ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। "আর আপনার রব কারও উপর যুলুম করেন না" [সূরা আল-কাহাফ: ৪৯] [ইবন কাসীর]

(২) কেননা, কোন বস্তু নিজে নিজেকে সৃষ্টি করেছে সেটা অসম্ভব ব্যাপার। আবার সৃষ্ট কোন কিছু স্রষ্টা ছাড়া এসেছে সেটাও অসম্ভব। তাতে বুঝা গেল যে, একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন। সৃষ্টিতে যার কোন শরীক থাকতে পারে না। কেননা, তিনি এক ও দাপুটে। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও জন্য একক ও মহাদাপুটে গুণ সাব্যস্ত করা যায় না। সৃষ্টিকুল এবং প্রতিটি সৃষ্টির উপরই কোন না কোন নিয়ন্ত্রণকারী দাপট দেখানোর মত সৃষ্টি রয়েছে। তারপর তারও উপর রয়েছে আরেক নিয়ন্ত্রণকারী। কিন্তু তার উপর রয়েছেন সেই মহা দাপুটে সর্বনিয়ন্ত্রণকারী একক সত্তা। সুতরাং দাপট ও

তিনি এক, মহা প্রতাপশালী[১] ।'

১৭. তিনি আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরের আবর্জনা বহন করে। এরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন অলংকার বা তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে কিছু আগুনে উত্তপ্ত করা হয়[২]। এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

তাওহীদ একটি অপরটিকে বাধ্য করে। যা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট। এভাবে বিবেকের শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান করে তাদের কেউই সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। আর এভাবেই তাদের ইবাদাত বাতিল প্রমাণিত হলো। [সা'দী]

(১) মূল আয়াতে 'কাহ্হার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এমন সত্তা যিনি নিজ শক্তিতে সবার উপর হুকুম চালান এবং সবাইকে অধীনস্ত করে রাখেন। যার ইচ্ছার কাছে সমস্ত ইচ্ছাকারী হার মানে। [কুরতুবী] "আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা" একথাটি এমন সত্য যাকে মুশরিকরাও স্বীকার করে নিয়েছিল এবং তারা কখনো এটা অস্বীকার করেনি। "তিনি এক ও মহাপরাক্রমশালী বা মহা দাপুটে" এটি হচ্ছে মুশরিকদের ঐ স্বীকৃত সত্যের অনিবার্য ফল। কারণ যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা নিঃসন্দেহে তিনি এক, অতুলনীয় ও সাদৃশ্যবিহীন। কারণ অন্য যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। এ অবস্থায় কোন সৃষ্টি কেমন করে তার স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা বা অধিকার তথা ইবাদতে তাঁর সাথে শরীক হতে পারে? এভাবে তিনি নিঃসন্দেহে মহাপরাক্রমশালীও। কারণ সৃষ্টি তার স্রষ্টার অধীন হয়ে থাকবে, এটিই স্বাভাবিক। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্রষ্টা বলে মানে তার পক্ষে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করা এবং মহাপরাক্রমশালী সর্বনিয়ন্ত্রক আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে দুর্বল ও অধীনকে সংকট উত্তরণ করাবার জন্য আহ্বান করা একেবারেই অযৌক্তিক প্রমাণিত হলো। [দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ ২/৪৬৪-৪৬৫; মাদারিজুস সালেকীন ১/৪১৪]

(২) অর্থাৎ নির্ভেজাল ধাতু গলিয়ে কাজে লাগাবার জন্য স্বর্ণকারের চূলা গরম করা হয়। কিন্তু যখনই এ কাজ করা হয় তখনই অবশ্যি ময়লা আর্বজনা ওপরে ভেসে ওঠে এবং এমনভাবে তা ঘূর্ণিত হতে থাকে যাতে কিছুক্ষণ পর্যন্ত উপরিভাগে শুধু আর্বজনারাশিই দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়ে থাকেন[১]।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মূলত দু'টি উদাহরণ পেশ করেছেন। একটি পানির, অপরটি আগুনের। এ দুটি উদাহরণে আল্লাহ্ তা'আলা হক্ব যে স্থায়ী এবং বাতিল যে ক্ষণস্থায়ী তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণ দু'টির মধ্যে প্রথমটি হল, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন তখন উপত্যকাসমূহ তাদের নিজের পরিমাণ অনুযায়ী পানি ধারণ করে। যদি উপত্যকাটি বড় হয়, তবে বেশী পানি ধারণ করে। আর যদি ছোট হয় তবে তার নিজের পরিমাণ অনুযায়ী পানি ধারণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান নাযিল করা হয়েছিল এ উপমায় তাকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর ঈমানদার, সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বাভাবিক বৃত্তির অধিকারী মানুষদেরকে এমনসব নদীনালার সাথে তুলনা করা হয়েছে যেগুলো নিজ নিজ ধারণক্ষমতা অনুযায়ী রহমতের বৃষ্টি ধারায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণ করে প্রবাহিত হতে থাকে। তাদের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য আছে। একজনের মনে অনেক জ্ঞান ধারণ করে। আরেক জনের মন বেশী জ্ঞান ধারণ করতে পারে না।' অন্যদিকে সত্য অস্বীকারকারী ও সত্য বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে হৈ-হাংগামা ও উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল তাকে এমন ফেনা ও আবর্জনারাশির সাথে তুলনা করা হয়েছে যা হামেশা বন্যা হবার সাথে সাথেই পানির উপরিভাগে উঠে আসতে থাকে। প্লাবন তার উপরে আবর্জনা বহন করে বলে এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এগুলো মূলতঃ সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তির সমষ্টি। হকের সাথে এগুলোও মানুষের মনে প্রবেশ করে মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করতে চায় কিন্তু অন্তরের আল্লাহ্র ওহীর পরিমাণ অনুসারে দ্রুত অথবা ধীরে ধীরে তারা তাদের ঈমানী জোরে সে সমস্ত সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তিকে দূরীভূত করে দিতে পারে। তখন শুধুমাত্র ঈমান বাকী থাকে। আর যা কুফরী ও সন্দেহ সেগুলো অপসৃত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় উদাহরণটি হল, আগুণে পুড়ে খাটি হওয়ার উদাহরণ। সোনা, রূপা এবং এ জাতীয় ধাতব বস্তু যখনই পোড়ানো হয় তখন তার মধ্যস্থিত যাবতীয় ময়লা ও খাদ আলাদা হয়ে যায়। শুধু খাটি অংশই বাকী থাকে। তেমনিভাবে ঈমান যখন মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তখন যৎসামান্য তাতে ময়লা-আবর্জনা সহ অবস্থান করতে থাকে। তারপর ঈমান ও দলীল-প্রমাণাদি পরপর তার কাছে আসতে থাকে। ধীরে ধীরে তার সমস্ত সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তি দূরীভুত হয়ে সে খাঁটি হয়ে যায়। তার মনে আর কোন পংকিলতা স্থান পায় না।

এ দু'টি উদাহরণের আরেকটি দিক হলো, আল্লাহ্র দরবারে যতক্ষণ কোন আমল খাঁটিভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে না হবে ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। যতক্ষণ সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না থাকবে ততক্ষণ তা দূর করার জন্য সচেষ্ট

১৮. যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, তাদের জন্য রয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান। আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, যমীনে যা কিছু আছে তার সবটুকুই যদি তারা মালিক হতো এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো কিছুও হতো তাহলেও তারা মুক্তিপণস্বরূপ তা দিত[১]। তাদেরই হিসেব হবে কঠোর[২]

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

থাকতে হবে। [ইবন কাসীর; অনুরূপ আরও দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াকে'য়ীন: ১/১১৭; ইগাসাতুল লাহফান: ১/২১; আল-আমসাল ফিল কুরআন: ১১]

(১) আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা সৌভাগ্যশালী এবং দূর্ভাগাদের অবস্থা পরবর্তীতে কেমন তা ব্যাখ্যা করেছেন। একদিকে ঐ সমস্ত লোকগণ যারা তাদের প্রভুর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছে। রাসূলের কথা মেনেছে, তার যাবতীয় কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তাদের পরিণাম হবে ভাল। জান্নাত ও জান্নাতের যাবতীয় নে'আমত তারা পাবে। অপরদিকে ঐসমস্ত লোক যারা তাদের প্রভুর কথা মানেনি। নবী-রাসূলদের কথা শুনেনি। তাদের উপর এমন বিপদ আসবে যার ফলে তারা নিজেদের জান বাঁচাবার জন্য দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়ে দেবার ব্যাপারে একটুও ইতস্তত করবে না। কিন্তু তারা কোত্থেকেই তা দিবে? [দেখুন, সা'দী]

(২) কঠোর বা নিকৃষ্টভাবে হিসেব নেয়া অথবা কড়া হিসেব নেয়ার মানে হচ্ছে এই যে, মানুষের কোন ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা হবে না। তার কোন অপরাধের বিচার না করে তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে না। কুরআন থেকে আমরা আরো জানতে পারি, এ ধরনের হিসেব আল্লাহ তাঁর এমন বান্দাদের থেকে নেবেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে। বিপরীতপক্ষে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত আচরণ করেছে এবং তাঁর প্রতি অনুগত থেকে জীবন যাপন করেছে তাদের থেকে "সহজ হিসেব" অর্থাৎ হালকা হিসেব নেয়া হবে। তাদের বিশ্বস্ততামূলক কার্যক্রমের মোকাবিলায় ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দেয়া হবে। তাদের সামগ্রিক সুকৃতিকে সামনে রেখে তাদের বহু ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করা হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ যখন "যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে সে তার শাস্তি পাবে" এ আয়াত নাযিল হলো, তখন সাহাবায়ে কিরামের কাছে তা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সহজ কর, কাছাকাছি হও, আল্লাহর বিশ্বস্ত ও অনুগত বান্দা দুনিয়ায় যে কষ্টই পেয়েছে,এমনকি তার শরীরে যদি কোন কাঁটাও ফুটে থাকে তাকে তার কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে গণ্য

এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস, আর সেটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

তৃতীয় রুকূ'

১৯. আপনার রব হতে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে কি তার মত যে অন্ধ[১]? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকসম্পন্নগণই[২],

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾

করে দুনিয়াতেই তার হিসেব পরিষ্কার করে দেন। [মুসলিমঃ ২৫৭৪] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, আল্লাহর এ উক্তির তাৎপর্য কি যাতে বলা হয়েছেঃ "যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার থেকে হালকা হিসেব নেয়া হবে।" এর জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, উপস্থাপনা (অর্থাৎ তার সৎকাজের সাথে সাথে অসৎকাজগুলোর উপস্থাপনা আল্লাহর সামনে) অবশ্যি হবে কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তার ব্যাপারে জেনে রাখো, সে ধ্বংস হবে" [বুখারীঃ ১০৩, মুসলিমঃ ২৮৭৬]

(১) অর্থাৎ যারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে যা এসেছে তা হক্ক বলে ঈমান এনেছে, তারা এটাও বিশ্বাস করেছে যে, এতে কোন সন্দেহ অসামঞ্জস্যতা নেই। এর একাংশ অন্য অংশের সত্যয়ন করে। কোন প্রকার স্ববিরোধিতা এতে পাওয়া যাবে না। এর যাবতীয় সংবাদ বাস্তব, যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ইনসাফে পূর্ণ। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রবের বাণী পরিপূর্ণ।" [সূরা আল-আন'আমঃ ১১৫] অর্থাৎ সংবাদ প্রদানে বস্তুনিষ্ঠ এবং আদেশ-নিষেধে ইনসাফপূর্ণ। যারা কুরআনকে এ ধরনের বিশ্বাস করে তারা কি ঐ লোকের মত হতে পারে যে, অন্ধই রয়ে গেছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা নাযিল হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হয়নি এমনকি বোঝার চেষ্টাও করেনি? এ দু'ব্যক্তির নীতি দুনিয়ায় এক রকম হতে পারে না এবং আখেরাতে তাদের পরিণামও একই ধরনের হতে পারে না। তাই তো আল্লাহ্ অন্যত্র বলেনঃ "জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।" [সূরা আল-হাশরঃ ২০] [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর পাঠানো এ শিক্ষা এবং আল্লাহর রাসূলের এ দাওয়াত যারা গ্রহণ করে তারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় না বরং তারা হয় বিবেকবান, সতর্ক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ ছাড়া দুনিয়ায় তাদের জীবন ও চরিত্র যে রূপ ধারণ করে এবং আখেরাতে তারা যে পরিণাম ফল ভোগ করে পরবর্তী আয়াতগুলোতে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

২০. যারা[১] আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার | الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۝٢٠

(১) এ আয়াতে সত্যিকার বুদ্ধিমান লোকদের পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে যাদের জন্য সুউত্তম পরিণাম রয়েছে, এ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে, 'তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে।' অর্থাৎ তারা মুনাফিকদের মত নয় যারা কোন অঙ্গীকার করলে সেটা ভঙ্গ করে, ঝগড়া করলে গালি-গালাজ করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, কেউ আমানত রাখলে খিয়ানত করে। [ইবন কাসীর] তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করে, বান্দার সাথে কৃত অঙ্গীকারও পূর্ণ করে। [ফাতহুল কাদীর]

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে 'তারা কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।' ঐ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন নবীর সাথে সম্পাদন করে এবং ঐ সব অঙ্গীকারও বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে। সেগুলো তারা ভঙ্গ করে না। অনুরূপভাবে অঙ্গীকারের মধ্যে তাও পড়ে যা করার জন্য আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেমন, ফরয ও ওয়াজিব কাজসমুহ। অনরূপভাবে তাও এর অন্তর্ভুক্ত যা নিজেরা নিজেদের উপর বাধ্য করে নিয়েছে যেমন, মানত। [ফাতহুল কাদীর] কাতাদা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গীকার ঠিক রাখা এবং ভঙ্গ না করার কথা কুরআনে বিশোর্ধ স্থানে উল্লেখ করেছেন। [তাবারী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে সৃষ্টির প্রারম্ভে যা আদমের পিঠে নেয়া হয়েছিল। [কুরতুবী]

তৃতীয় গুণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। আয়াতের প্রকাশ্য ভাষ্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা একটি সাধারণ নির্দেশ। সে অনুসারে এটার অর্থ এমন সব সম্পর্ক, যেগুলো সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের সামগ্রিক জীবনের কল্যাণ ও সাফল্য নিশ্চিত হয়। যেগুলোকে আল্লাহ্ ঠিক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কর্তন করতে নিষেধ করেছেন। তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা নিঃসন্দেহে এর অন্তর্ভুক্ত। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি এবং তাদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে। [কুরতুবী]

চতুর্থ গুণ হচ্ছে, তারা তাদের রবকে ভয় করে। যে ভয় তাদেরকে কর্তব্য কর্ম করতে এবং যা নিষেধ করেছে তা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। [ফাতহুল কাদীর] অথবা আল্লাহ্ যে সম্পর্ক ঠিক রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে তাদের রবকে ভয় করে। [কুরতুবী]

পঞ্চম গুণ হচ্ছে, তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 'মন্দ হিসাব' বলে কঠোর ও পুংখানুপুংখ হিসাব বুঝানো হয়েছে।

ষষ্ঠ গুণ হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ

করে। প্রচলিত কথায় কোন বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। কারণ, আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া; বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। এ কারণেই এর তিনটি প্রকার বর্ণনা করা হয়। (এক) صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ- অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং (দুই) صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ- অর্থাৎ গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা। (তিন) صَبْرٌ عَلَى الْأَقْدَارِ বিপদাপদে নিজের ঈমানের উপর অটল থাকা। [ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন: ২/১৫৫] আয়াতে সবরের সাথে ﴿ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। শুধুমাত্র যারা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই সবর করবে তাদেরই এ সওয়াব। [ফাতহুল কাদীর] সত্যিকার অর্থে যারা প্রথম ধাক্কায় সবর ধরতে পেরেছে তারাই প্রকৃতভাবে সবরকারী। কেননা, যারা সবর করেনি তারাও কোন না কোন সময় সবর করতে বাধ্য হয়। আর এ ধরনের যেহেতু অপারগ অবস্থায় সেহেতু তা গ্রহণযোগ্য নয়। যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা দেন না। সুতরাং এখানে যে সবরের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তা হচ্ছে, তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও আকাংখা নিয়ন্ত্রণ করে, নিজেদের আবেগ, অনুভূতি ও ঝোঁক প্রবণতাকে নিয়ম ও সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে, আল্লাহর নাফরমানিতে বিভিন্ন স্বার্থলাভ ও ভোগ-লালসা চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ দেখে পা পিছলে যায় না এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার পথে যেসব ক্ষতি ও কষ্টের আশংকা দেখা দেয় সেসব বরদাশ্‌ত করে যেতে থাকে। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে মুমিন আসলে পুরোপুরি একটি সবরের জীবন যাপন করে। কারণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এবং আখেরাতের স্থায়ী পরিণাম ফলের প্রতি দৃষ্টি রেখে এ দুনিয়ায় আত্মসংযম করতে থাকে এবং সবরের সাথে মনের প্রতিটি পাপ প্রবণতার মোকাবিলা করে। [দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন, মানযিলাতুস সাবর]

সপ্তম গুণ হচ্ছে, 'সালাত কায়েম করা'। এর অর্থ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে যেভাবে আল্লাহ্ তা ফরয করেছেন সেভাবে সময়মত আদায় করা। এখানে ফরয সালাতই উদ্দেশ্য। আবার ব্যাপক সালাতও উদ্দেশ্য হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

অষ্টম গুণ হচ্ছে, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিয্ক থেকে কিছু আল্লাহ্র নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে চান না; বরং নিজেরই দেয়া রিয্কের কিছু অংশ তোমাদের কাছে চান। এটা দেয়ার ব্যাপারে স্বভাবতঃ তোমাদের ইতস্ততঃ করা উচিত নয়। এখানে অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সাথে ﴿سِرًّا وَّعَلَانِيَةً﴾ শব্দ দু'টি যুক্ত হওয়ায় বুঝা যায় যে, দান-সদকা সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয়; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এ জন্যই আলেমগণ বলেন যে, যাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেয়াই উত্তম

পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভংগ করে না,

২১. আর আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের রবকে এবং ভয় করে হিসাবকে,

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْۤءَ الْحِسَابِ ؕ۲۱

২২. আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভাল কাজের দ্বারা মন্দ কাজকে প্রতিহত করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখেরাতের শুভ পরিণাম।

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۙ۲۲

এবং গোপনে দেয়া সমীচীন নয়- যাতে অন্যরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল দান-সদকা গোপনে দেয়াই উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

নবম গুণ হচ্ছে, তারা মন্দকে ভাল দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দের জবাবে মন্দ ব্যবহার করে না। অর্থাৎ তারা মন্দের মোকাবিলায় মন্দ করে না বরং ভালো করে। তারা অন্যায়ের মোকাবিলা অন্যায়কে সাহায্য না করে ন্যায়কে সাহায্য করে। কেউ তাদের প্রতি যতই জুলুম করুক না কেন তার জবাবে তারা পাল্টা জুলুম করে না বরং ইনসাফ করে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে যতই বিশ্বাস ভঙ্গ করুক না কেন জবাবে তারা বিশ্বস্ত আচরণই করে থাকে। এর সমার্থে পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াত এসেছে। [যেমন, সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৯৬, সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৪] কোন সময় কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্ন সহকারে অধিক পরিমাণে ইবাদাত করে। ফলে গোনাহ্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেনঃ 'পাপের পর পূণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দেবে।' [মুস্তাদরাকে হাকেম ১/১২১ নং ১৭৮]

২৩. স্থায়ী জান্নাত(১), তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও(২)। আর ফেরেশ্‌তাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে,

جَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَهَا وَمَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَاَزۡوَاجِهِمۡ وَذُرِّیّٰتِهِمۡ وَالۡمَلٰٓئِكَةُ یَدۡخُلُوۡنَ عَلَیۡهِمۡ مِّنۡ كُلِّ بَابٍ ﴿۲۳﴾

২৪. এবং বলবে, 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; আর আখেরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম(৩)!'

سَلٰمٌ عَلَیۡكُمۡ بِمَا صَبَرۡتُمۡ فَنِعۡمَ عُقۡبَی الدَّارِ ﴿۲۴﴾

---

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তাদের জন্যই রয়েছে আখেরাতের সাফল্য। আয়াতে বর্ণিত دار শব্দের অর্থ এখানে আখেরাত। [ফাতহুল কাদীর] আর এ আয়াতের প্রথমেই আখেরাতের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতে আদনে তারা থাকবে। عدن শব্দের অর্থ স্থায়ী আবাস। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে তাদেরকে বহিস্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। [ইবন কাসীর] কেউ কেউ বলেনঃ জান্নাতের মধ্যস্থলের নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের। [ফাতহুল কাদীর] দাহ্‌হাক বলেনঃ عدن হলো জান্নাতনগরীর নাম। যাতে রাসূল, নবী, শহীদ এবং হেদায়াতের ইমামগণ থাকবে। মানুষজন থাকবে তাদের চার পাশে। আর অন্যান্য জান্নাতসমূহ এর চারপাশে থাকবে। [ইবন কাসীর]

(২) এরপর তাদের জন্য আরো একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ নেয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদেরকে এর উপযুক্ত হতে হবে। এর ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলিম হওয়া। [ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপ-দাদা ও স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের আমল যদিও এ স্তরে পৌছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের খাতিরে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌছে দেয়া হবে। [কুরতুবী] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন "এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি একটুও কমাবো না"। [সূরা আত-তূরঃ ২১]

(৩) এরপর তাদের আরও একটি আখেরাতের সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফিরিশ্‌তারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবেঃ সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। [ফাতহুল কাদীর] এটা আখেরাতের কতই না উত্তম পরিণাম। অর্থাৎ তারা তাদেরকে এ সুখবর

২৫. পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্যই রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের মন্দ আবাস[১]।

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

দেবে যে, এখন তোমরা এমন জায়গায় এসেছো যেখানে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান। এখন তোমরা এখানে সব রকমের আপদ-বিপদ, কষ্ট, কাঠিন্য, কঠোর পরিশ্রম, শংকা ও আতংকমুক্ত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তারা হলেন দরিদ্র মুহাজিরগণ। যাদের দ্বারা সীমান্ত পাহারা দেয়া হয়। খারাপ অবস্থায় তাদের সাহায্য নেয়া হয়। তাদের অনেকেই এমনভাবে মারা যায় যে, তাদের মনে অনেক অপূর্ণ বাসনা রয়েই গেছে। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদের বলবেনঃ তোমরা যাও এবং তাদেরকে সালাম-সম্ভাষণ জানাও। ফেরেশ্‌তাগণ বলবেনঃ আমরা আপনার আসমানের বাসিন্দা, আপনার শ্রেষ্ট সৃষ্টির অন্যতম তারপরও কি আপনি আমাদেরকে তাদেরকে সম্মান জানানোর জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ্ বলবেনঃ তারা আমার এমন বান্দা ছিল যারা কেবলমাত্র আমার ইবাদত করত। আমার সাথে সামান্যও শির্ক করেনি। তাদের দ্বারা সীমান্ত পাহারা দেয়া হতো এবং বিপজ্জনক সময়ে তাদের সাহায্য নেয়া হত। তারা এমনভাবে মারা গেছে যে, তাদের মনের বাসনা মনেই রয়ে গেছে তা তারা পূরণ করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাদের কাছে বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাদেরকে সাদর-সম্ভাষণ জানাবে। 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; কত ভাল এ পরিণাম' [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৬৮]

(১) এ আয়াতে সে সমস্ত অপরিণামদর্শী লোকদের আলোচনা করা হচ্ছে, যারা পূর্ববর্তী গুণগুলোর বিপরীত কাজ করে। তাদের জন্য কি শাস্তি রয়েছে তাও বর্ণনা করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] এ সমস্ত অবাধ্য বান্দাদের স্বভাব হলো যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর তা ভংগ করে থাকে। হাদীসে অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে মুনাফিকের একটি আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] অবাধ্য বান্দাদের দ্বিতীয় স্বভাব এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ঐসব সম্পর্ক ছিন্ন করে, যেগুলো বজায় রাখতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। আত্মীয়তার সম্পর্কও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া সমস্ত নবী-রাসূলদের উপর ঈমান আনাও এর অন্তর্ভুক্ত। [কুরতুবী]

২৬. আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছে তার জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করেন এবং সংকুচিত করেন; কিন্তু এরা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত, অথচ দুনিয়ার

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

তৃতীয় স্বভাব এই যে, তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে। তারা কুফরি ও গোনাহ করে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে। [কুরতুবী] যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মানুষের অঙ্গীকারের পরওয়া করে না এবং কারো অধিকার ও সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করে না, তাদের কর্মকাণ্ড যে অপরাপর লোকদের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি-কাটাকাটির বাজার গরম হবে। এটা এক বিরাট ফাসাদ।

আবুল আলীয়া রাহেমাহুল্লাহ বলেন, মুনাফিক শ্রেণীর লোক যখন মানুষের উপর কর্তৃত্ব করে তখন ছয়টি খারাপ অভ্যাস ও কর্ম করে থাকেঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তার বিপরীত কাজ করে, তাদের কাছে আমানত রাখা হলে তা খেয়ানত করে, আল্লাহ্‌র নেয়া অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা কর্তন করে এবং যমীনের মধ্যে বিপর্যয় ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। আর যখন তারা কর্তৃত্বে থাকে না বা অন্যরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে তখন তারা তিনটি কাজ করেঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তার বিপরীত করে এবং আমানতের খেয়ানত করে। [ইবন কাসীর] হাদীসেও তাদের কর্মকাণ্ডের কথা বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি, যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, যখন ওয়াদা করবে তার বিপরীত করবে এবং যখন আমানত রাখা হবে তখন তার খেয়ানত করবে'। [বুখারীঃ ৩৩, মুসলিমঃ ৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যখন অঙ্গীকার করবে তা ভঙ্গ করবে, যখন ঝগড়া করবে গালি-গালাজ করবে'। [বুখারীঃ ৩৪, মুসলিমঃ ৫৮]

অবাধ্য বান্দাদের এই সমস্ত স্বভাব বর্ণনা করার পর তাদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য লা'নত ও মন্দ আবাস রয়েছে। লা'নতের অর্থ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে থাকা এবং বঞ্চিত হওয়া। [কুরতুবী] বলাবাহুল্য, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে থাকাই সর্বাপেক্ষা বড় আযাব এবং সব বিপদের বড় বিপদ। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন অনুগত বান্দাদের প্রতিদান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, তাদের স্থান হবে জান্নাতে, ফিরিশ্তারা তাদেরকে সালাম করে বলবে যে, এসব নেয়ামত তোমাদের সবর ও আনুগত্যের ফলশ্রুতি, তেমনিভাবে এ আয়াতে অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের আবাস অবধারিত। এতে বুঝা যায় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আত্মীয় ও স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অভিসম্পাত ও জাহান্নামের কারণ।

জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র[১] ।

চতুর্থ রুকূ'

২৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'তার রবের কাছ থেকে তার কাছে

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ

(১) এ আয়াতের পটভূমি হচ্ছে, সাধারণ মূর্খ ও অজ্ঞদের মতো মক্কার কাফেররাও বিশ্বাস ও কর্মের সৌন্দর্য বা কদর্যতা দেখার পরিবর্তে ধনাঢ্যতা বা দারিদ্র্যের দৃষ্টিতে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণ করতো । তাদের ধারণা ছিল, যারা দুনিয়ায় প্রচুর পরিমাণ আরাম আয়েশের সামগ্রী লাভ করছে তারা যতই পথভ্রষ্ট ও অসৎকর্মশীল হোক না কেন তারা আল্লাহর প্রিয় । আর অভাবী ও দারিদ্র পীড়িতরা যতই সৎ হোক না কেন তারা আল্লাহর অভিশপ্ত । এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে বলা হচ্ছে, রিযিক কমবেশী হবার ব্যাপারটা আল্লাহর অন্য নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট । সেখানে অন্যান্য অসংখ্য প্রয়োজন ও কল্যাণ-অকল্যাণের প্রেক্ষিতে কাউকে বেশী ও কাউকে কম দেয়া হয় । এটা এমন কোন মানদণ্ড নয় যার ভিত্তিতে মানুষের নৈতিক ও মানসিক সৌন্দর্য ও কদর্যতার ফায়সালা করা যেতে পারে । মানুষের মধ্যে কে চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ অবলম্বন করেছে এবং কে ভুল পথ, কে উন্নত ও সৎগুণাবলী অর্জন করেছে এবং কে অসৎগুণাবলী –এরি ভিত্তিতে তাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আসল মানদণ্ড নির্ধারণ হওয়া উচিত । কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন । যেমন আল্লাহ্ বলেন, "তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্যস্বরূপ যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করি, তা দ্বারা তাদের জন্য সকল মংগল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না ।" [আল-মু'মিনূনঃ ৫৫-৫৬] আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় সামগ্রী যে আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয় তা বর্ণনা করে বলেছেন যে, "দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র ।" অন্যত্র এসেছে, "বলুন, পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তার জন্য আখেরাতই উত্তম । তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না ।" [সূরা আন-নিসাঃ ৭৭] আরো এসেছে, "কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী ।" [সূরা আল-আ'লাঃ ১৬-১৭] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হলো এমন যেন তোমাদের কেউ সমুদ্রে তার এই আঙ্গুল ঢুকিয়ে আনল", তারপর তিনি নিজের তর্জনীর দিকে ইঙ্গিত করলেন । [মুসলিমঃ ২৮৫৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক মরা কান ছোট ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তা দেখিয়ে সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, "আল্লাহ্র শপথ! এ ছাগলটি যেমন তার মালিকের নিকট মূল্যহীন তেমনি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ্র নিকট তার ছেয়েও সামান্য" [মুসলিমঃ ২৯৫৭]

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ

কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন?'[১] বলুন, 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যারা তাঁর অভিমুখী তিনি তাদেরকে তাঁর পথ দেখান[২]।

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ

২৮. 'যারা ঈমান আনে[৩] এবং আল্লাহ্‌র

(১) আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছে করলে তারা যে ধরণের নিদর্শন চাচ্ছে সেটা দিতে পারেন। [ইবন কাসীর] এমনকি হাদীসে এসেছে, 'যখন মক্কার কাফের কুরাইশরা চাইলো যে, আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। আমাদের জন্য ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিন। মক্কার পাশ থেকে পাহাড়গুলো সরিয়ে নিয়ে যান। যাতে সেখানে বাগান ও নদী-নালা পূর্ণ হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের কাছে ওহী পাঠালেন যে, হে মুহাম্মাদ! আপনি চাইলে আমি তাদেরকে তা প্রদান করব। কিন্তু তারপর যদি তারা কুফরি করে তবে তাদেরকে এমন শাস্তি দেব যা আমি সৃষ্টিকুলের কাউকে কোনদিন দেইনি। আর যদি আপনি চান যে, আমি রহমত ও তাওবার দরজা খুলে দেই তবে তা-ই করব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বরং তাদের জন্য রহমত ও তাওবার দরজা খোলা হোক।' [মুসনাদে আহমাদ ১/২৪২] [ইবন কাসীর] সুতরাং নিদর্শন পাওয়াই বড় কথা নয়, হিদায়াত নসীব হওয়াই বড় কথা। তাই তো আল্লাহ্ তাদের জন্য নিদর্শন না দিয়ে রহমত ও তাওবার রাস্তা খোলা রেখেছেন। পরবর্তীতে মক্কাবাসীদের অনেকেই সে রহমতে ধন্য হয়।

(২) অর্থাৎ যে নিজেই আল্লাহর দিকে রুজু হয় না বরং তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, হিদায়াত গ্রহণ করতে চায় না, তাকে জোর করে সত্য-সঠিক পথ দেখানো আল্লাহর রীতি নয়। যারা আল্লাহর পথের সন্ধান করে ফিরছে তারা নিদর্শন দেখতে পাচ্ছে এবং নিদর্শনসমূহ দেখেই তারা সত্য পথের সন্ধান লাভ করছে। তোমাদের কাছে যদি যাবতীয় নিদর্শনও আনা হয় তবুও তোমরা ঈমান আনবে না। [দেখুন, মুয়াসসার; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।" [সূরা ইউনুসঃ ১০১] অন্য আয়াতে এসেছে, "নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে আপনার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না, যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, এমনকি তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে।" [সূরা ইউনুসঃ ৯৬-৯৭] আল্লাহ্ আরো বলেনঃ "আমি তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা পাঠালেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে হাযির করলেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছে না হলে তারা কখনো ঈমান আনবে না; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।" [সূরা আল-আন'আমঃ ১১১]

(৩) অর্থাৎ তারা যে নিদর্শন চাচ্ছে তেমনি কোন নিদর্শন ছাড়াই যারা ঈমান আনে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ ؕ

স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়[১];

الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوۡبٰی لَهُمۡ وَ حُسۡنُ

২৯. 'যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদেরই জন্য রয়েছে পরম আনন্দ[২]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুর স্মরণ অর্থাৎ যিকির করে আর যে করে না তাদের উদাহরণ হলো জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির ন্যায়। [বুখারীঃ ৬৪০৭] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ "যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশতবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে, তার গুনাহ্ যদি সমুদ্রের ফেনাতুল্যও হয় তবুও আল্লাহ্ দয়া করে তা ক্ষমা করে দিবেন। [বুখারীঃ ৬৪০৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, যে ব্যক্তি দিনে একশতবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর' পড়ে সে ব্যক্তি দশটি দাস স্বাধীন করার সওয়াব পাবে, তার জন্য একশ'টি নেকী লিখা হবে এবং তার একশ'টি গুণাহ্ মিটিয়ে দেয়া হবে। ওই দিন সন্ধা পর্যন্ত শয়তান থেকে তার রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হবে এবং তার চেয়ে উত্তম আর কেউ হবে না। তবে যে ব্যক্তি এটা তার চেয়ে বেশী পড়ে সে ব্যতিত"। [বুখারীঃ ৬৪০৩]

(২) মূলে বলা হয়েছে, ﴿طُوۡبٰی لَهُمۡ﴾ বা তাদের জন্য রয়েছে 'তূবা'। এখানে তূবা শব্দ দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এসেছে যে, এর অর্থঃ তাদের জন্য রয়েছে খুশী ও চক্ষু সিক্তকারী। ইকরিমা বলেন, এর অর্থঃ তাদের জন্য যা আছে তা কতইনা উত্তম! দাহ্হাক বলেন, এর অর্থঃ তাদের জন্য ঈর্ষান্বিত হওয়ার মত নেয়ামত। ইবরাহীম নাখ'য়ী বলেন, এর অর্থঃ তাদের জন্য কল্যাণ। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তূবা হলো জান্নাতের একটি গাছের নাম। [ইবন কাসীর] তবে নিঃসন্দেহে এ সমস্তের মূল অর্থঃ জান্নাত। কারণ জান্নাত এ সবগুলোর সমষ্টি। জান্নাতের নে'আমত অগণিত, অসংখ্য। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষে জান্নাতে গমনকারীকে বলবেন, তোমার যাবতীয় আকাংখা আমার কাছে ব্যক্ত কর। সে লোক চাইতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত যখন তার চাহিদা শেষ হয়ে যাবে। তার আর চাওয়ার কিছু থাকবে না তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেনঃ এটা থেকে চাও, ওটা থেকে চাও, এভাবে তাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিবেন। তারপর তিনি তাকে এসব দিয়ে বলবেন। তোমাকে এসবকিছু এবং এগুলোর দশগুণ দেয়া হলো"। [বুখারীঃ ৮০৬, ৮৪৩৭, ৮৪৩৮, মুসলিমঃ ১৮২] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে কুদসিতে এসেছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী, জিন ও মানব সবাই যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কাছে

مَآبِ ﴿٢٩﴾

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِىْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَاۡ عَلَيْهِمُ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

এবং সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল ।'

৩০. এভাবে আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির প্রতি যাদের আগে বহু জাতি গত হয়েছে, যাতে আমরা আপনার প্রতি যা ওহী করেছি, তা তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন। তথাপি তারা রহমানকে অস্বীকার করে[১]।

চাইতে থাক, তারপর আমি তাদের সবাইকে তার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করি, তবে তা আমার রাজত্বের কিছুই কমাবে না। তবে এতটুকু যতটুকু সুঁই সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে কমাতে পারে।' [মুসলিমঃ ২৫৭৭]

(১) অর্থাৎ তাঁর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আছে। তাঁর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছে। তাঁর দানের জন্য অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। তারা নতুন কিছু করছে না, তাদের পূর্বেও আমরা অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি। তারা যেভাবে দয়াময় প্রভুকে ভুলে শাস্তির অধিকারী হয়েছে তেমনিভাবে আপনার জাতির কাফেররাও রহমান তথা দয়াময় প্রভুকে অস্বীকার করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে তাদের শাস্তি অনিবার্য। [এ সংক্রান্ত আরো আয়াত দেখুন, সূরা আন-নাহলঃ ৬৩, সূরা আল-আন'আমঃ ৩৪] আয়াতে বলা হয়েছে, যে তারা "রাহমান"কে অস্বীকার করছে। এখানে মূলতঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে "রাহমান" বা অত্যন্ত দয়ালু এ গুণে গুণান্বিত করতে অস্বীকার করছিল। এটা ছিল আল্লাহ্‌র নাম ও গুণের সাথে শির্ক করা। কুরআনের অন্যত্র স্পষ্টভাবে এসেছে যে, তারা এ নামটি অস্বীকার করত। যেমন, "যখনই তাদেরকে বলা হয়, 'সিজ্‌দাবনত হও 'রহ্‌মান' -এর প্রতি,' তখন তারা বলে, 'রহ্‌মান আবার কে? তুমি কাউকেও সিজ্‌দা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজ্‌দা করব?' এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ৬০] হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ও কাফেররা আল্লাহ্‌র এ গুণটি লিখা নিয়ে আপত্তি করেছিল এবং বলেছিলঃ আমরা রহমানকে চিনি না। [বুখারীঃ ২৭৩১-২৭৩২] অথচ এ নামটি এমন এক নাম যে নাম একমাত্র তাঁর জন্যই ব্যবহার হতে পারে। আর কাউকে কোনভাবেই 'রহমান' নাম বা গুণ হিসেবে ডাকা যাবে না। আর এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলছেন যে, তারা যদিও গোয়ার্তুমি করে এ নামটি অস্বীকার করছে আপনি তাদেরকে এ নামটি যে আমার তা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তুলে ধরুন এবং বলুনঃ 'তিনিই আমার রব ; তিনি ছাড়া অন্য কোন হক্ক ইলাহ্ নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই কাছে আমার ফিরে যাওয়া।' তোমাদের অস্বীকার তার এ নামকে তার জন্য সাব্যস্ত করতে কোন ভাবেই ব্যাহত করতে পারবে না। অন্যত্র বলা হয়েছে, "বলুন, 'তোমরা 'আল্লাহ্' নামে ডাক বা 'রাহমান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাক সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।

বলুন, 'তিনিই আমার রব; তিনি ছাড়া অন্য কোন হক্ক ইলাহ্ নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই কাছে আমার ফিরে যাওয়া।'

৩১. আর যদি কুরআন এমন হত যা দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা যমীনকে টুকরো টুকরো করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত[১], কিন্তু

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ

তোমরা সালাতে স্বর উচ্চ করো না এবং খুব ক্ষীণও করো না; দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো। [সূরা আল-ইসরাঃ ১১০] আল্লাহ্ আরো বলেনঃ "বলুন, 'তিনিই দয়াময়, আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি"। [সূরা আল-মুলকঃ ২৯] আর এ নামটি সবচেয়ে বেশী মহিমান্বিত নাম হওয়াতে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, "আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে 'আব্দুল্লাহ ও আব্দুররাহমান'।" [মুসলিমঃ ২১৩২]

(১) এখানে উত্তর উহ্য আছে। কিন্তু উহ্য পদটি নির্ধারণে বিভিন্ন মত এসেছে।
এক, কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ হবেঃ 'যদি কুরআন এমন হত যা দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা যমীনকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করত না, তারা রহমানের সাথে কুফরী করত'। [কুরতুবী] পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, "আর তারা রহমানের সাথে কুফরী করছে" এ বাক্যটি উপরোক্ত অর্থের স্বপক্ষে জোরালো দলীল।
দুই, কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ হবেঃ 'যদি কোন কুরআন এমন হত যা দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত তা হলে তা এ কুরআনই হতো'। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] কারণ, এ কুরআনে নিহিত রয়েছে চ্যালেঞ্জ। জিন ও মানব এর মত বা এর একটি সূরার মত কিছু আনতে অপারগ। সে হিসেবে কুরআন শব্দ দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবকেই বুঝানো হবে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র 'কুরআন' শব্দটিকে পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ "যেভাবে আমরা নাযিল করেছিলাম বিভক্তকারীদের উপর; যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে।" [সূরা আল-হিজরঃ ৯০-৯১] আবার কোন কোন সহীহ হাদীসেও পূর্ববর্তী কোন কোন কিতাবকে কুরআন নাম দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাঊদ আলাইহিসসালামের উপর পড়াকে এতই সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তিনি তার বাহনের লাগাম লাগানোর নির্দেশ দিতেন। আর তা লাগানোর পূর্বেই তার কুরআন পড়া শেষ হয়ে যেত"। [বুখারী ৩৪১৭] এখানে কুরআন বলে নিঃসন্দেহে তার কাছে নাযিলকৃত

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

সব বিষয়ই আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারভুক্ত(১)। তবে কি যারা ঈমান এনেছে তারা জানে না(২) যে, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে

কিতাব যাবূরকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থের দিক থেকেও পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহকে কুরআন বলা যায়। কারণ, কুরআন শব্দের অর্থ, জমা করা। সে সমস্ত গ্রন্থসমূহে আয়াত জমা করার পর তা কুরআনে পরিণত হয়েছে। [ইবন কাসীর] এ অর্থের আরেকটি দলীল হলোঃ قرآناً শব্দের تنوين কারণ, এ তানভীনকে تنكير হলে তা আমাদের পরিচিত কুরআনকে বুঝানো হয়নি বলেই ধরে নিতে হয়।

(১) মূলতঃ এর কারণ হচ্ছে, সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে। তিনি চাইলে তা হবে আর না চাইলে হবে না। তিনি যার হিদায়াত চান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর তিনি যার ভ্রষ্টতা চান তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারবে না। [ইবন কাসীর] কারণ, তারা যে সব মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেছে, সেগুলো এর চাইতে কম ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আজ্ঞাবহ করার চাইতে অনেক বেশী বিস্ময়কর। এমনিভাবে নিস্প্রাণ কংকরের কথা বলা এবং তাসবীহ্ পাঠ করা কোন মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিকতর বিরাট মু'জিযা। মি'রাজের রাত্রিতে মসজিদুল আক্‌সা, অতঃপর সেখান থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, সুলাইমান 'আলাইহিস্‌সালামের বায়ুকে বশ করার মু'জিযার চাইতে অনেক মহান। কিন্তু যালেমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

(২) আয়াতের মূলশব্দ হচ্ছে, ييأس শব্দটির যে অর্থ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] সে অনুসারে অর্থ হবে, ঈমানদারগণ কি জানে না যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকেই নিদর্শন দেখানো ছাড়াই হিদায়াত দিয়ে দিতে পারেন? [কুরতুবী] তাছাড়া শব্দটির অন্য আরেকটি অর্থ হলো, নিরাশ হওয়া। তখন আয়াতের ভাবার্থ এভাবে বলতে হবে যে, মুসলিমগণ মুশরিকদের হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি? আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকেই হেদায়েত প্রদান করতেন। কারণ, মুসলিমরা কাফেরদের পক্ষ থেকে বার বার নিদর্শন দেখাবার দাবী শুনতো। ফলে তাদের মন অস্থির হয়ে উঠতো। তারা মনে করতো, আহা, যদি এদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া হতো যার ফলে এরা মেনে নিতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! [কুরতুবী] বস্তুত: যারা কুরআনের শিক্ষাবলীতে, বিশ্ব-জগতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে, নবীর পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবনে, সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জীবনধারায় কোন সত্যের আলো দেখতে পাচ্ছে না, তোমরা কি মনে করো তারা পাহাড়ের গতিশীল হওয়া, মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া এবং কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসার মত অলৌকিক ঘটনাবলীতে কোন

لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

সবাইকেই সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন? আর যারা কুফরী করেছে তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, অথবা বিপর্যয় তাদের আবাসের আশেপাশে আপতিত হতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এসে পড়বে(১)। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না(২)।

পঞ্চম রুকূ'

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

৩২. আর অবশ্যই আপনার আগে অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং যারা কুফরী করেছে তাদেরকে আমি

আলোর সন্ধান পাবে? আবুল আলীয়া বলেন, এর অর্থ অবশ্যই ঈমানদাররা তাদের হিদায়াত সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে, তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে তিনি হিদায়াত দিতে পারেন। [ইবন কাসীর]

(১) قَارِعَةٌ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য, আকাশ থেকে শাস্তি নাযিল হওয়া। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া [ইবন কাসীর] অথবা এর অর্থ, বিপদাপদ। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তাদের উপর আপদ-বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ্‌র ওয়াদা কোন সময়ই টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমন কি, পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে। তবে হাসান বসরীর মতে, ওয়াদার অর্থ এ স্থলে কেয়ামতও হতে পারে। [ইবন কাসীর] এ ওয়াদা সব নবীগণের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সেই কেয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফের ও অপরাধী কৃতকর্মের পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করবে।

(২) অর্থাৎ তিনি রাসূলদের সাথে যে সমস্ত ওয়াদা করেছেন সেটা তিনি ভঙ্গ করেন না। তিনি তাদেরকে ও তাদের অনুসারীদেরকে সাহায্য সহযোগিতার যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই ঘটবে। চাই তা দুনিয়াতে হোক বা আখেরাতে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ সেটা বলেছেন, "সুতরাং আপনি কখনো মনে করবেন না যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী" [সূরা ইবরাহীম: ৪৭]।

কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি[১]!

৩৩. তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে তার যিনি পর্যবেক্ষক[২] (তিনি কি এদের অক্ষম ইলাহ্গুলোর মত?) অথচ তারা আল্লাহ্‌র বহু শরীক সাব্যস্ত করেছে। বলুন, তাদের পরিচয় দাও। নাকি তোমরা যমীনের মধ্যে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও যা তিনি জানেন না? নাকি (তোমরা) বাহ্যিক কথা মাত্র জানাচ্ছ? বরং যারা কুফরী করেছে তাদের কাছে তাদের ছলনা[৩] শোভন করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে

أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْأَرْضِ أَم بِظَـٰهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

(১) আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী রাসূলদের সাথে তাদের উম্মতদের কর্মকাণ্ড এবং তাদের সাথে কৃত আল্লাহ্‌র ব্যবহার সম্পর্কে জেনে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা তাদের বর্তমান ছাড় দেয়া অবস্থাকে যেন স্থায়ী মনে করে না নেয়। তিনি কাউকে পাকড়াও করলে তার আর রক্ষা নেই। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্ অত্যাচারীকে ছাড় দিতে থাকেন তারপর যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তার আর পালানোর কোন পথ থাকে না।" [বুখারীঃ ৪৬৮৬, মুসলিমঃ ২৫৮৩]

(২) অর্থাৎ যিনি স্বয়ং প্রত্যেকটি লোকের অবস্থা জানেন। কোন সৎলোকের সৎকাজ এবং অসৎলোকের অসৎকাজ যার দৃষ্টি আড়ালে নেই। তিনি কি ইবাদতের যোগ্য নাকি তারা যাদেরকে ইবাদত করছে তারা? অথচ এসমস্ত উপাস্যগুলো সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। [দেখুন, সা'দী] [এ অর্থে আরো দেখুন সূরা ইউনুসঃ ৬১, সূরা আল-আন'আমঃ ৫৯, সূরা হূদঃ ৬, সূরা আর-রা'দঃ ১০, সূরা ত্বা-হাঃ ৭, সূরা আল-হাদীদঃ ৪]

(৩) এখানে শির্ক ও কুফরকে ছলনা বা প্রতারণা বলা হয়েছে। কারণ তাদের এগুলো নিছক ভ্রষ্টতা ও আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যাচার। [বাগভী; ইবন কাসীর] এর মাধ্যমে কিছু লোক নিজেদেরকে ভ্রান্ত মা'বুদদের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়ে আপন আপন স্বার্থোদ্ধারের কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাছাড়া শির্ক আসলেই একটি আত্মপ্রতারণা। অথবা তাদের কুফরিকেই এখানে প্রতারণা বলা হয়েছে, কারণ রাসূলের সাথে তাদের প্রতারণা ছিল কুফরি। [কুরতুবী]

সৎপথ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে[১], আর আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই ।

৩৪. তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আছে শাস্তি এবং আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর! আর আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করার মত তাদের কেউ নেই[২] ।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾

৩৫. মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার উপমা এরূপঃ তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত[৩],

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۗ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ۗ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ

(১) অর্থাৎ তাদের কাছে যখন কুফরি সুশোভিত হলো এবং তাদের কাছে তাদের কর্মকাণ্ড তথা শির্ক ও কুফরি হক বলে প্রতিভাত হলো, তখন তারা সে দিকে মানুষদেরকে আহ্বান জানাতে থাকল । এভাবে তারা মানুষদেরকে রাসূলদের পথে চলা থেকে বিরত রাখল । অথবা আয়াতের অর্থ, যখন তাদের কাছে তারা যা করছে তা সুশোভিত করা হলো তখন এর দ্বারা তাদেরকে সত্য সঠিক পথে আসা থেকে বিরত রাখা হয়েছে । [ইবন কাসীর] যেমন কুরআনের অন্যত্র এসেছে, "আর আমরা তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম মন্দ সহচরসমূহ, যারা তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল । আর তাদের উপর শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে, তাদের পূর্বে চলে যাওয়া জিন ও মানুষের বিভিন্ন জাতির ন্যায় ।" [সূরা ফুসসিলাতঃ ২৫]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের জন্য দুনিয়াতে যে শাস্তি রেখেছেন তার থেকে আখেরাতের শাস্তি যে কত ভয়াবহ এখানে সে কথাই তুলে ধরেছেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও লি'আনকারী পুরুষ ও মহিলাকে আখেরাতের শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "অবশ্যই দুনিয়ার আযাব আখেরাতের আযাবের চেয়ে অনেক সহজ" [মুসলিমঃ ১৪৯৩] কারণ, দুনিয়ার আযাব যত দীর্ঘ সময়ই হোক না কেন তা তো লোকের মৃত্যুর সাথে সাথে বা দুনিয়ার শেষদিনটির সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে । পক্ষান্তরে আখেরাতের আযাব কোন দিন শেষ হবার নয়, তা চিরস্থায়ী । আবার তার পরিমাণও অনেক বেশী । যার বর্ণনা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র করেছেন । [দেখুন, সূরা আল-ফাজরঃ২৫, ২৬, সূরা আল-ফুরকানঃ ১১-১৫]

(৩) মুত্তাকীদের জন্য কি পুরস্কার রেখেছেন এখানে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । বলা হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত ।

اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۞ | তার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী[১]।

এ নহর সমূহের বিস্তারিত বর্ণনায় এসেছে যে, মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্তঃ তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামের স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?" [সূরা মুহাম্মাদঃ ১৫] অন্যত্র বলা হয়েছে যে, "এমন একটি প্রস্রবণ যা হতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করবে, তারা এ প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছে প্রবাহিত করবে।" [সূরা আল-ইনসানঃ ৬]

(১) জান্নাতের নে'আমতসমূহ সর্বদা থাকবে, তাতে কোন অভাব বা কমতি পরিলক্ষিত হবে না। একথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে, "যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না।"[সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ ৩৩] এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সালাত আদায়ের সময় এগিয়ে গিয়ে কিছু একটা নিতে যাচ্ছিলেন তারপর আবার ফিরে আসলেন। পরে সাহাবায়ে কিরাম সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি জান্নাত দেখেছি, তার থেকে আঙ্গুরের একটি থোকা নিতে চাচ্ছিলাম। যদি তা নিয়ে নিতাম তবে যতদিন দুনিয়া থাকত ততদিন তোমরা তা খেতে পারতে।" [বুখারীঃ ১০৫২, মুসলিমঃ ৯০৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "তাতে কোন কমতি হতো না"। [মুসলিমঃ ৯০৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতবাসীগণ খাবে, পান করবে অথচ তাদের কোন কাশি, থুথু আসবে না, পায়খানা ও পেশাব করবে না। তাদের খাবারের ঢেকুর আসবে যার সুগন্ধ হবে মিস্‌কের সুগন্ধির মতো, দুনিয়াতে যেভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেয় তেমনি তাদেরকে সেখানে তাসবীহ ও পবিত্রতা ঘোষণার জন্য ইল্‌হাম করা হবে।" [মুসলিমঃ ২৮৩৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ইয়াহূদী এসে বলল, হে আবুল কাশেম! আপনি মনে করেন যে, জান্নাতবাসীগণ খানাপিনা করবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "অবশ্যই হ্যাঁ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ! সেখানে জান্নাতবাসীদের প্রত্যেককে খানাপিনা ও কামবাসনার ক্ষেত্রে একশত জনের সমান ক্ষমতা দেয়া হবে।" লোকটি বললঃ যার খানাপিনা আছে তার তো আবার শৌচক্রিয়ারও প্রয়োজন পড়বে। অথচ জান্নাতে কোন ময়লা-আবর্জনা বা কষ্টের কিছু নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তাদের সে প্রয়োজনটুকু শুধুমাত্র একটু ঘামের মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে। যে ঘামের সুগন্ধ হবে মিসকের গন্ধের মত। আর এতেই তাদের পেট কৃশকায় হয়ে যাবে।" [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৬৭]

যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এটা তাদের প্রতিফল আর কাফিরদের প্রতিফল আগুন[১]।

৩৬. আর আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে তাতে আনন্দ পায়[২]।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ۗ قُلْ اِنَّمَآ

আর জান্নাতের ছায়ার ব্যাপারে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার ছায়াও চিরস্থায়ী। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।" [সূরা ইয়াসীনঃ ৫৬] আল্লাহ্ আরো বলেছেনঃ "মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে" [সূরা আল-মুরসালাতঃ ৪১] আরো বলেনঃ "সন্নিহিত গাছের ছায়া তাদের উপর থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে।" [সূরা আল-ইনসানঃ ১৪] আরো বলেছেনঃ "যারা ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকবে এবং তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাব।" [সূরা আন-নিসাঃ ৫৭] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে এমন গাছও আছে, যার ছায়ায় অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বারোহী উন্নত ঘোড়া নিয়ে শত বছর সফর করলেও শেষ করতে পারবে না" [বুখারীঃ ৩২৫১,৩২৫২,৬৫৫৩, মুসলিমঃ ২৮২৬, ২৮২৮]

(১) পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এভাবেই জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতিফলের তুলনামূলক উল্লেখ থাকে। যাতে করে অনুসন্ধিৎসু মন কোনটা ভাল এবং কোনটা মন্দ তা সহজেই বুঝতে পারে। [যেমন, সূরা আল-হাশরঃ ২০, সূরা মুহাম্মাদঃ ১৫]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে জানাচ্ছেন যে, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা যা নাযিল হয়েছে তা দেখে খুশী হয়। এখানে 'যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে' বলে কি বোঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। এক. কিতাবধারী বলে আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তখন অর্থ হবে, কিতাবীদের মধ্যে যারা কিতাবের বিধানকে আঁকড়ে আছে, তার উপর প্রতিষ্ঠিত, তারা আপনার কাছে যা নাযিল হয়েছে অর্থাৎ কুরআন সেটা দেখলে খুশী হয়। কারণ, তাদের কিতাবে এ রাসূলের সত্যতা ও সুসংবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত আছে। [ইবন কাসীর] যেমন, আব্দুল্লাহ ইবন সালাম, সালমান প্রমুখ। [কুরতুবী] দুই. কাতাদা বলেন, এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী তথা সাহাবীদের কথা বলা হয়েছে। তারা কুরআনের আলো নাযিল হতে দেখলেই খুশী হত। [তাবারী; কুরতুবী]

أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهٖۗ إِلَيْهِ أَدْعُوْا وَإِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٦﴾

আর দলগুলোর(১) মধ্যে কেউ কেউ তার কিছু অংশকে অস্বীকার করে। বলুন, 'আমি তো আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করতে ও তাঁর কোন শরীক না করতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। আমি তাঁরই দিকে ডাকি এবং তাঁরই কাছে আমার ফিরে যাওয়া।'

وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّاۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. আর এভাবেই(২) আমরা কুরআনকে নাযিল করেছি আরবী ভাষায় বিধানরূপে। আর জ্ঞান পাওয়ার পরও যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন তবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে(৩) আপনার কোন অভিভাবক

(১) দলগুলো বলে এখানে কাদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে, এক. তারা মক্কার মুশরিক কুরাইশরা এবং ইয়াহূদী ও নাসারাদের মধ্যে যারা ঈমান আনেনি তারা। [কুরতুবী] দুই. অথবা এখানে শুধু ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] তিন. অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যারা জোট বেঁধেছিল তারা সবাই এখানে উদ্দেশ্য। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ যেভাবে আপনার পূর্বে আমরা অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছি এবং আপনার পূর্বে যখনই প্রয়োজন মনে করেছি তখনই কিতাব পাঠিয়েছি সেভাবে আমরা আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি এবং আমরা আপনাকে কুরআন নামক গ্রন্থখানি দিয়েছি, তাকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি। [ইবন কাসীর; মুয়াসসার] এ কিতাব আপনার উপর নাযিল করে আমি আপনাকে সম্মানিত করেছি এবং অন্যদের উপর আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছি। কারণ, এ কুরআনের বৈশিষ্ট্য অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা। এটি এমন যে, "বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না-সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না । এটা প্রজ্ঞাময়, স্বপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪২] [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ যেভাবে প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে তাদের নিজস্ব ভাষায় কিতাব দিয়েছি তেমনি আপনাকে আরবী ভাষায় এ কুরআন প্রদান করলাম। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তি ও পাকড়াও এর বিপরীতে আপনার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। [মুয়াসসার]

ও রক্ষক থাকবে না(১) ।

ষষ্ঠ রুকূ'

৩৮. আর অবশ্যই আমরা আপনার আগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম(২) । আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়(৩) । প্রত্যেক

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

(১) তাদের খেয়ালখুশীর কোন শেষ নেই । তবে বিশেষ করে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা । [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই কারও খেয়াল-খুশী ও কোন মনগড়া মতের অনুসারী হতে পারেন না । এখানে রাসূলের উম্মতদেরকে সাবধান করা হচ্ছে । বিশেষ করে এ উম্মতের আলেম সম্প্রদায়কেই এখানে বেশী উদ্দেশ্য করা হয়েছে । তারা যেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ, কুরআন ও সুন্নাহ বোঝার পর অন্য কোন কারণে সেটা বাস্তবায়ন করতে পিছপা না হয় । অন্য কোন মত ও পথের অনুসারী না হয় । অন্যথা তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ । দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের কোন সাহায্যকারী, উদ্ধারকারী ও অভিভাবক থাকবে না । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হতো এটি তার মধ্য থেকে আর একটি আপত্তির জবাব । তারা বলতো, এ আবার কেমন নবী, যার স্ত্রী-সন্তানাদিও আছে! নবী-রাসূলদের যৌন কামনার সাথে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না কি? এ রাসূলের কি হলো যে, তিনি বিয়ে করেন? [বাগভী; কুরতুবী] নবী-রাসূল সম্পর্কে কাফের ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, তাদের মানুষ না; বরং ফিরিশ্‌তা হওয়া দরকার । ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাদের শ্রেষ্টত্ব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে । কুরআন তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব একাধিক আয়াতে দিয়েছে । হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমি তো সিয়ামও পালন করি এবং সিয়াম ছাড়াও থাকি; আমি রাত্রিতে নিদ্রাও যাই এবং সালাতের জন্যও দণ্ডায়মান হই; এবং নারীদেরকে বিবাহও করি । যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয় । [বুখারীঃ৪৭৭৬, মুসলিমঃ ১৪০১]

(৩) এটিও একটি আপত্তির জবাব । কাফের ও মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিদর্শনের দাবী করত । আগেও সেটার জবাব দেয়া হয়েছে । এখানে আবার সেটার জওয়াব দেয়া হচ্ছে [কুরতুবী] অনুরূপভাবে তারা কুরআনের আয়াত পরিবর্তনের জন্যও প্রস্তাব করত । তারা বলতো আল্লাহ্‌র কিতাবে আমাদের

বিষয়ের ব্যাপারেই নির্ধারিত সময় লিপিবদ্ধ আছে(১)।

অভিপ্রায় অনুযায়ী বিধি-বিধান নাযিল হোক। তারা আব্দার করত যে, আপনি বর্তমান কুরআনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআন নিয়ে আসুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিন অথবা আযাবের জায়গায় রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন। [দেখুন, সূরা ইউনুসঃ১৫] কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত বাক্যে آية শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে। কারণ, কুরআনের পরিভাষায় 'আয়াত' কুরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মু'জিযাকেও। এ কারণেই এ 'আয়াত' শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন তাফসীরবিদ কুরআনী আয়াতের অর্থ ধরে উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোন নবীর এরূপ ক্ষমতা নেই যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন আয়াত তৈরী করে নেবেন। [কাশশাফ; আল-বাহরুল মুহীত; আত-তাহরীর ওয়াততানওয়ীর] তবে অধিকাংশ মুফাসসির এখানে আয়াতের অর্থ মু'জিযা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোন রাসূল ও নবীকে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ক্ষমতা দেননি যে, তিনি যখন ইচ্ছা, যে ধরনের ইচ্ছা মু'জিযা প্রকাশ করতে পারবেন। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; সা'দী] আয়াতের সারবস্তু এই যে, আমার রাসূলের কাছে কুরআনী আয়াত পরিবর্তন করার দাবী অন্যায় ও ভ্রান্ত। আমি কোন রাসূলকে এরূপ ক্ষমতা দেইনি। এমনিভাবে কোন বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবী করাও নবুওয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। সেটা তো আমার কাছে, আমি যখন ইচ্ছা সেটা দেখাই।

(১) এখানে أجل শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ। আর كتاب শব্দটির অর্থ গ্রন্থ অথবা লেখা। বাক্যের অর্থ নির্ধারনে কয়েকটি মত আছেঃ

এক, এখানে শরী'আতের কথাই আলোচনা হয়েছে। তখন অর্থ হবে, প্রত্যেক সময়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কিতাব আছে। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন কখন কোন কিতাবের প্রয়োজন। সে অনুসারে তিনি প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের সময়ে তাদের উপযোগী কিতাব নাযিল করেছেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন কুরআন নাযিল করলেন, তখন সেটা পূর্ববর্তী সবগুলোকে রহিত করে দিয়েছে। [দেখুন, ইবন আবিল ইয, শারহুত তাহাওয়ীয়্যা, ১/১০১-১০২; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

দুই, আয়াতের অর্থ বর্ণনায় প্রসিদ্ধ মত এই যে, এখানে তাকদীরের কথাই আলোচনা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় তার মৃত্যু হবে, তাও লিখিত আছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "আপনি কি জানেন না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ্ তা জানেন। এ সবই আছে এক কিতাবে; নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ।" [সূরা আল-হাজ্জঃ ৭০] [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

৩৯. আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছে তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন[১] এবং তাঁরই কাছে আছে উম্মুল কিতাব[২]।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٣٩﴾

৪০. আর আমরা তাদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তার কিছু যদি আমরা আপনাকে দেখাই বা যদি এর আগে আপনার মৃত্যু ঘটাই[৩]-- তবে আপনার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা, আর হিসাব-নিকাশ তো আমারই দায়িত্ব।

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

৪১. তারা কি দেখে না যে, আমরা এ যমীনকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছে তা পরিবর্তন করে অন্য কিছু নাযিল করেন, আবার যা ইচ্ছে তা ঠিক রাখেন। এটা সম্পূর্ণই তার ইচ্ছাধীন। শরী'আতের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার সম্পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁরই। তবে কোন জিনিস পরিবর্তন করবেন আর কোনটি পরিবর্তন করবেন না, কোন হুকুমকে অন্য হুকুমের পরিবর্তে নাযিল করবেন আর কোনটিকে পুরোপুরি রহিত করবেন সে সবই তাঁর কাছে যে মূল কিতাব আছে সে অনুসারেই হবে। সেখানে কোন পরিবর্তন নেই। [ইবন কাসীর, ইবন আব্বাস ও কাতাদা হতে]

(২) এখানে ﴿اُمُّ الْكِتٰبِ﴾ এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এর দ্বারা লওহে-মাহ্ফুয বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না। চাই সেটা শরী'আত সম্পর্কিত হোক অথবা তাকদীর সম্পর্কিত হোক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তার শরী'আতের মধ্য থেকে যা ইচ্ছা তা রহিত করেন। আর যা ইচ্ছে তা নাযিল করেন। কিন্তু মূলটি উম্মুল কিতাব তথা লাওহে মাহফূযে আছে। সেখানে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই। অনরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির তাকদীর সম্পর্কে লাওহে মাহফূজে যা লিখা আছে তাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ আপনার শত্রুদেরকে যে অপমান ও লাঞ্ছনাজনক শাস্তির ধমক দেয়া হচ্ছে তা যদি দুনিয়াতেই এসে যায় তবে তা হবে দুনিয়াবী শাস্তি। আর যদি আপনাকে তাদের শাস্তি দেখানোর পূর্বেই আমরা মৃত্যু দিয়ে দেই, তবে আপনার দায়িত্ব তো শুধু দাওয়াত প্রচার করে যাওয়া, তারপর আমার কাছেই তাদের হিসাব ও প্রতিফল। [মুয়াসসার]

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

করে আনছি[১]? আর আল্লাহ্ই আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই এবং তিনি হিসেব গ্রহণে তৎপর[২]।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۚ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾

৪২. আর তাদের আগে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করেছিল; কিন্তু সব চক্রান্তই আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা উপার্জন করে তা তিনি জানেন। আর কাফেররা শীঘ্রই জানবে আখেরাতের শুভ পরিণাম কাদের জন্য।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, তুমি আল্লাহ্র পাঠানো নও। বলুন, আল্লাহ্ এবং যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে, তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে

(১) অর্থাৎ আপনার বিরোধীরা কি দেখছে না ইসলামের প্রভাব আরব ভূখণ্ডের সর্বত্র দিনের পর দিন ছড়িয়ে পড়ছে? চতুর্দিক থেকে তার বেষ্টনী সংকীর্ণতর হয়ে আসছে? এখানে যমীন সংকুচিত করার আরেক অর্থ এও করা হয় যে, যমীনের ফল-ফলাদি কমিয়ে দেয়া। আবার কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন, ভাল লোকদের, আলেম ও ফকীহদের প্রস্থান করা। কারও কারও মতে, এর অর্থ কুফরীকারীদের জন্য যমীন সংকুচিত হয়ে ঈমান ও তাওহীদবাদীদের জন্য যমীনকে প্রশস্ত করা হচ্ছে। বাস্তবিকই ধীরে ধীরে ইসলামের আলো আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কুফরী ও শির্কী শক্তির পতন হয়ে গেছে। অনুরূপ আয়াত আরও দেখুন, সূরা আল-আহকাফ: ২৭ [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ নির্দেশ আল্লাহ্র হাতেই। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে যা ইচ্ছা তা নির্দেশ দেন। তিনিই ফয়সালা করেন। যেভাবে ইচ্ছা ফয়সালা করেন। কাউকে মর্যাদায় উপরে উঠান আবার কাউকে নীচু করেন। কাউকে জীবিত করেন, কাউকে মারেন। কাউকে ধনী করেন, কাউকে ফকীর করেন। তিনি ফয়সালা দিচ্ছেন যে, ইসলাম সম্মানিত হবে এবং সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী থাকবে। [ফাতহুল কাদীর] তাঁর নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তাঁর নির্দেশের পিছু নিয়ে কেউ সেটাকে রদ করতে বা পরিবর্তন করতে পারবে না। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। সেটা অনুসারে কাফেরদেরকে তিনি দ্রুত শাস্তি দিবেন আর মুমিনদেরকে দ্রুত সওয়াব দিবেন। [কুরতুবী]

যথেষ্ট[১] ।

(১) অর্থাৎ আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দেবে যে, যা কিছু আমি পেশ করেছি তা ইতিপূর্বে আগত নবীগণের শিক্ষার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আমি আল্লাহরই রাসূল । পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদের মধ্যে যা সত্যনিষ্ঠ তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যয়নকারীরূপে উল্লেখ করেছেন । যেমন কুরআনে এসেছেঃ "আল্লাহ্ বললেন, 'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছে দিয়ে থাকি আর আমার দয়া---তা তো প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছে । কাজেই আমি তা নির্ধারিত করব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে ঈমান আনে । 'যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাঁর উল্লেখ তাওরাত ও ইন্জীল, যা তাদের কাছে আছে তাতে লিখিত পায়" । [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৫৬-১৫৭, আরও এসেছে, "বনী ইস্রাঈলের পণ্ডিতগণ এ সম্পর্কে জানে---এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়?" [সূরা আস-শু'আরাঃ ১৯৭]

১৪- সূরা ইব্‌রাহীম(১), ৫২ আয়াত, মক্কী



।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম্-রা, এ কিতাব, আমরা এটা আপনার প্রতি নাযিল করেছি(২) যাতে আপনি মানুষদেরকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে বের করে আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে(৩), পরাক্রমশালী,

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝١

(১) 'সূরা ইব্‌রাহীম' মক্কায়, হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, মক্কায় হিজরতের পূর্বে নাযিল, না মদীনায় নাযিল হয়েছে। এ সূরার শুরুতে রিসালাত, নবুওয়াত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং এর সাথে মিল রেখেই সূরার নাম 'সূরা ইবরাহীম' রাখা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ এটা ঐ গ্রন্থ, যা আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি। এতে নাযিল করার কাজটি আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করা এবং সম্বোধন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে করার দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, এ গ্রন্থ আল-কুরআন অত্যন্ত মহান। একে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন। এটি আসমান থেকে নাযিল হওয়া কিতাবাদির মধ্যে অতি সম্মানিত গ্রন্থ। তিনি তা নাযিল করেছেন আরব বা অনারব যমীনের অধিবাসী সকল মানুষের কাছে প্রেরিত রাসূলদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তির উপর। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে ناس শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] ظلمات শব্দটি ظلمة এর বহুবচন। এর অর্থ অন্ধকার। এখানে ظلمات বলে কুফর, শির্ক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ আবার কারও কারও মতে, বিদ'আত। অপর কারও মতে, সন্দেহ। পক্ষান্তরে نور বলে ঈমানের আলো বোঝানো হয়েছে। অথবা সুন্নাত বা ইয়াকীন বা দৃঢ়বিশ্বাস বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] ظلمات শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, কুফর ও শির্কের প্রকারভেদ অনেক। অমনিভাবে মন্দকর্মের সংখ্যাও গণনার বাইরে। বিদ'আতের সংখ্যাও অনুরূপভাবে প্রচুর। আর যে সন্দেহ মানব ও জিন শয়তান মানুষের মনে তৈরী করে তা বহু রকমের। পক্ষান্তরে نور শব্দটি একবচনে আনা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এ জন্য আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে বিশ্বের মানুষকে কুফর, শির্ক ও মন্দকর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের রবের আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের

সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে[১],

২. আল্লাহ্‌র পথে---আসমানসমূহে যা কিছু রয়েছে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে তা তাঁরই[২]। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ[৩],

اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٢﴾

৩. যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে অধিক ভালবাসে এবং মানুষকে ফিরিয়ে রাখে আল্লাহ্‌র

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۗ

আলোর দিকে আনয়ন করেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনার জন্য।" [সূরা আল-হাদীদ: ৯] [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলাবাহুল্য তা ঐ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্য এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ। যে সুস্পষ্ট পথ আল্লাহ্ মানুষের চলার জন্য প্রবর্তন করেছেন। যে পথে যেতে এবং যে পথে প্রবেশ করতে তিনি মানুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর] এস্থলে আল্লাহ্ শব্দটি পরে এবং তাঁর আগে তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম عزيز ও حميد উল্লেখ করা হয়েছে। عزيز শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং حميد শব্দের অর্থ ঐ সত্তা, যিনি প্রশংসার হকদার হওয়ার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। [ফাতহুল কাদীর]। তিনি তার যাবতীয় কাজ, কথা, শরী'আত, নির্দেশ, ও নিষেধের ক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং তাঁর যাবতীয় নির্দেশের ক্ষেত্রে সত্যবাদী। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্‌র এ দু'টি গুণবাচক নাম আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং প্রশংসার হকদার হওয়ার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। 'হামীদ' শব্দটির অপর অর্থ, প্রত্যেকের মুখেই তাঁর প্রশংসা, সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় তিনি সম্মানিত। [ফাতহুল কাদীর]

(২) মালিক হিসেবেও এগুলো তাঁর, দাস হিসেবেও এরা তাঁরই দাস, উদ্ভাবক হিসেবেও তিনিই এগুলোর উদ্ভাবক, আর স্রষ্টা হিসেবেও তিনিই তাদের স্রষ্টা। [কুরতুবী] আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের সবকিছু যার, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। [কুরতুবী]

(৩) ويل শব্দের অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়। অথবা শাস্তি ও ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত বাক্য। [কুরতুবী] অর্থ এই যে, যারা কুরআনরূপী নেয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস ও বিপর্যয়, ঐ কঠোর আযাবের কারণে যা তাদের উপর আপতিত হবে। [ফাতহুল কাদীর]

أُولَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ ۝٣

পথ থেকে, আর আল্লাহ্‌র পথ বাঁকা করতে চায়; তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে নিপতিত।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ

৪. আর আমরা প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী[১] করে পাঠিয়েছি[২] তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নবী পাঠিয়েছেন তার উপর তার ভাষায়ই নিজের বাণী নাযিল করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় যেন নবীর কথা বুঝতে পারে এবং যা নাযিল হয়েছে তাও জানতে পারে। [ইবন কাসীর] যাতে করে পরবর্তী পর্যায়ে তারা এ ধরনের কোন ওজর পেশ করতে না পারে যে, আপনার পাঠানো শিক্ষা তো আমরা বুঝতে পারিনি কাজেই কেমন করে তার প্রতি ঈমান আনতে পারতাম। এ উদ্দেশ্যে কোন জাতিকে তার নিজের ভাষায়, যে ভাষা সে বোঝে, পয়গাম পৌঁছানো প্রয়োজন।

(২) আদম 'আলাইহিস্ সালাম জগতে প্রথম মানুষ। তিনি তাকেই মানুষের জন্য সর্বপ্রথম নবী মনোনীত করেন। এরপর পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে হেদায়াত ও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান ও শরী'আত নাযিল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানব জগতের ক্রমঃবিকাশ যখন পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়্যেদুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন, ইমামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সমগ্র বিশ্বের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তাকে যে গ্রন্থ ও শরী'আত দান করা হয়েছে, তাতে তাকে সমগ্র বিশ্ব এবং কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, এ আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছেন কিন্তু অন্য আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানুষের জন্যই রাসূল করে পাঠিয়েছেন। কোন জাতির সাথে সুনির্দিষ্ট করে নয়। যেমন, আল্লাহ্ বলেন, "বলুন, 'হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৮] আরও বলেন, "কত বরকতময় তিনি! যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, সৃষ্টিজগতের জন্য সতর্ককারী হতে।" [সূরা আল-ফুরকান: ১] আরও বলেন, "আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি" [সূরা সাবা:২৮] ইত্যাদি আয়াতসমূহ। যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য, প্রতিটি ভাষাভাষির জন্য। প্রতি ভাষাভাষির কাছে এ বাণী পৌঁছে দেয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের কর্তব্য। [আদওয়াউল বায়ান]

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾

করার জন্য[১], অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[২]।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ

৫. আর অবশ্যই আমরা মূসাকে আমাদের

(১) এ আয়াত এ প্রমাণ বহন করছে যে, যা দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে, ততটুকু আরবী ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন এবং আল্লাহ্‌র কাছেও প্রিয় বিষয়। কেননা এটা ব্যতীত আল্লাহ্‌র কাছে যা নাযিল হয়েছে তা জানা অসম্ভব। তবে যদি কেউ এমন হয় যে, তার সেটা শিক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে না যেমন ছোটকাল থেকে এটার উপর বড় হয়েছে এবং সেটা তার প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। কারণ, তখন সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বাণী থেকে দ্বীন ও শরী'আত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। যেমন সাহাবায়ে কিরাম গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ আমি মানুষের সুবিধার জন্য নবীগণকে তাদের ভাষায় প্রেরণ করেছি- যাতে নবীগণ আমার বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যাধীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলাই স্বীয় শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দেন। সমগ্র জাতি যে ভাষা বোঝে নবী সে ভাষায় তার সমগ্র প্রচার কার্য পরিচালনা ও উপদেশ দান করা সত্ত্বেও সবাই হেদায়াত লাভ করে না। কারণ কোন বাণী কেবলমাত্র সহজবোধ্য হলেই যে, সকল শ্রোতা তা মেনে নেবে এমন কোন কথা নেই। সঠিক পথের সন্ধান লাভ ও পথভ্রষ্ট হওয়ার মূল সূত্র রয়েছে আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান নিজের বাণীর সাহায্যে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং যার জন্য চান না সে হিদায়াত পায় না।

আয়াতের শেষে আল্লাহ্‌র দু'টি মহান গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, বলা হয়েছে, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। এ দু'টি গুণবাচক নাম এখানে উল্লেখ করার পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। যার অর্থ, লোকেরা নিজে নিজেই সৎপথ লাভ করবে বা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, এটা সম্ভব নয়। কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করবেন এবং যাকে ইচ্ছা অযথা পথভ্রষ্ট করবেন এটা তাঁর রীতি নয়। কর্তৃত্বশীল ও বিজয়ী হওয়ার সাথে সাথে তিনি জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞও। তাঁর কাছ থেকে কোন ব্যক্তি যুক্তিসংগত কারণেই হেদায়াত লাভ করে। আর যে ব্যক্তিকে সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত করে ভ্রষ্টতার মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয় সে নিজেই নিজের ভ্রষ্টতাপ্রীতির কারণে এহেন আচরণ লাভের অধিকারী হয়। [দেখুন, সা'দী]

مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

নিদর্শনসহ পাঠিয়েছিলাম[১] এবং বলেছিলাম, 'আপনার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসুন[২], এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিনগুলোর দ্বারা উপদেশ দিন[৩]।'

---

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ আমি মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি স্বজাতিকে কুফর ও গোনাহ্‌র অন্ধকার থেকে দাওয়াত দিয়ে ঈমান ও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে। [বাগভী] এখানে আয়াত শব্দের অর্থ তাওরাতের আয়াতও হতে পারে। কারণ, সেগুলো নাযিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের অন্য অর্থ মু'জিযাও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] মুজাহিদ বলেন, এখানে নয়টি বিশেষ নিদর্শন উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে আল্লাহ্ তা'আলা ন'টি মু'জিযা বিশেষভাবে দান করেন।

(২) এ আয়াতে 'কওম' তথা "সম্প্রদায়" শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়বস্তুটিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে ناس (মানুষ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ ﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ﴾ এতে ইঙ্গিত আছে যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালাম শুধু বনী ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত সমগ্র মানুষের জন্য।

(৩) এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে 'আইয়্যামুল্লাহ্' স্মরণ করান। কিন্তু আইয়্যামুল্লাহ্ কি? أيام শব্দটি يوم এর বহুবচন, এর অর্থ দিন। ﴿اَيّٰمِ اللّٰهِ﴾ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন শাস্তির দিনগুলো, যেমন কাওমে নূহ, আদ ও সামূদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাবলী। [ফাতহুল কাদীর] এসব ঘটনায় বিরাট জাতিসমূহের ভাগ্য ওলট-পালট হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় 'আইয়্যামুল্লাহ্' স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এসব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা এবং হুশিয়ার করা। 'আইয়্যামুল্লাহ্'র অপর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এ জাতির উপর আল্লাহ্‌র যেসব নেয়ামত দিবারাত্র বর্ষিত হয় এবং যেসব বিশেষ নেয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করিয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করুন; উদাহরণতঃ তীহ্ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহারের জন্য মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। [ইবন কাসীর] এগুলো স্মরণ করানোর

এতে তো নিদর্শন[১] রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য[২]।

৬. আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর[৩]

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ

লক্ষ্য হবে এই যে, ভাল মানুষকে যখন কোন অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লজ্জা বোধ করে। এখানে দু'টি অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে। বিশেষ করে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "একদিন মূসা আলাইহিসসালাম তার কাওমকে 'আইয়ামুল্লাহ' সম্পর্কে নসীহত করছিলেন... আর 'আইয়ামুল্লাহ' হলো আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও বিপদাপদ" [মুসলিমঃ ২৩৮০]

(১) এখানে آيات-এর অর্থ নিদর্শন ও প্রমাণাদি। অর্থাৎ এসব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে এমন সব নির্দশন রয়েছে যার মাধ্যমে এক ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর ক্ষমতাবান হওয়ার সত্যতা ও নির্ভুলতার প্রমাণ পেতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] এ সংগে এ সত্যের পক্ষেও অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে যে, প্রতিদানের বিধান পুরোপুরি হক এবং তার দাবী পূরণ করার জন্য অন্য একটি জগত অর্থাৎ আখেরাতের জগত অপরিহার্য।

(২) আয়াতে বর্ণিত صبار শব্দটি صبر থেকে مبالغة এর পদ। এর অর্থ অধিক সবরকারী। شكور শব্দটি شكر থেকে مبالغة এর পদ। এর অর্থ অধিক কৃতজ্ঞ। [ফাতহুল কাদীর] বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আযাব সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত হোক, উভয় অবস্থাতে অতীত ঘটনাবলীতে আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ও অসীম রহস্যের বিরাট শক্তি বিদ্যমান ঐ ব্যক্তির জন্য, যে অত্যন্ত সবরকারী এবং অধিক শোকরকারী। সংক্ষেপে শোকর ও কৃতজ্ঞতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতা এবং হারাম ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করা, মুখেও আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং স্বীয় কাজকর্মকেও তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা। সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, কথায় ও কাজে অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ থেকে বেঁচে থাকা এবং দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌র রহমত আশা করা, আর আখেরাতে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখা। [দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, উদ্দাতুস সাবেরীন]

(৩) অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে 'আইয়্যামুল্লাহ্' বা নেয়ামত ও মুসিবত সম্পর্কে স্মরণ করানোর জন্য এ ভাষণটি প্রদাণ করেছিলেন।[ইবন কাসীর] এ নেয়ামতগুলো স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে, নিয়ামতসমূহের কথা মুখে ও অন্তরে স্বীকার করে নেয়া।[সা'দী] অনুরূপভাবে নেয়ামতগুলোর অধিকার

يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝٦

যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফির‘আউন গোষ্ঠীদের কবল হতে, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে যবেহ্ করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; আর এতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা(১) ।’

দ্বিতীয় রুকূ’

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝٧

৭. আর স্মরণ করুন, যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরো বেশী দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে নিশ্চয় আমার শাস্তি তো কঠোর(২) ।’

ও মর্যাদা চিহ্নিত করে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, সেগুলো যিনি প্রদান করেছেন তাঁর শোকরিয়া আদায় করে তাঁর নির্দেশের বাইরে না চলা । তাঁর বিধানের অনুগত থাকা, ইত্যাদি ।

(১) আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে, بلاء এ শব্দটি বিপরীত অর্থবোধক, এর এক অর্থ, নেয়ামত আর অপর অর্থ, বিপদ বা পরীক্ষা । এ আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, বনী-ইসরাঈলকে নিম্নলিখিত বিশেষ নেয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-কে আদেশ দেয়া হয় । মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর পূর্বে ফির্‘আউন বনী-ইসরাঈলকে অবৈধভাবে দাসে পরিণত করে রেখেছিল । এরপর এসব দাসের সাথেও মানবোচিত ব্যবহার করা হত না । তাদের ছেলে সন্তানকে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা করা হত এবং শুধু কন্যাদেরকে খেদমতের জন্য লালন-পালন করা হত । মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-কে প্রেরণের পর তার দো‘আয় আল্লাহ্ তা‘আলা বনী-ইসরাঈলকে ফির্‘আউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেন । সুতরাং একদিক থেকে তা তাদের পরীক্ষা ছিল অপর দিক থেকে সে পরীক্ষা থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে বিরাট নেয়ামত প্রদান করেন । উভয় অর্থটিই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে । যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, “আর আমরা তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে” [সূরা আল-আ‘রাফ: ১৬৮] [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) تأذن -শব্দটির অর্থ সংবাদ দেয়া ও ঘোষণা করা । [ইবন কাসীর]

৮. আর মূসা বলেছিলেন, ‘তোমরা এবং যমীনের সবাই যদি অকৃতজ্ঞ হও তারপরও আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও সর্বপ্রশংসিত(১) ।

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكْفُرُوٓا۟ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾

৯. ‘তোমাদের কাছে কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নূহের সম্প্রদায়ের, ‘আদের ও সামূদের এবং যারা তাদের পরের? যাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন, অতঃপর তারা তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন করেছিল(২) এবং বলেছিল, ‘যা সহ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا۟ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَرَدُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فِىٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَقَالُوٓا۟ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ وَإِنَّا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾

(১) অর্থাৎ মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম স্বজাতিকে বললেনঃ যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা বসবাস করে, তারা সবাই আল্লাহ্ তা‘আলার নেয়ামতসমূহের নাশোকরী করো, তবে স্মরণ রেখো, এতে আল্লাহ্ তা‘আলার কোন ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার উর্ধ্বে। তিনি আপন সত্তায় প্রশংসনীয়। তোমরা তাঁর প্রশংসা না করলেও সব ফিরিশ্‌তা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর প্রশংসায় মুখর। কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যই। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার জন্য তাকীদ দেয়া হয়, তা নিজের জন্য নয়; বরং দয়াবশতঃ তোমাদেরই উপকার করার জন্য। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আগের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জিন একত্রিত হয়ে তাকওয়ার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এক জনের অন্তরে পরিণত হও তবুও তা আমার রাজত্বের সামান্যতম কিছুও বৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আগের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জ্বিন একত্রিত হয়ে অন্যায়ের দিক থেকে একজনের অন্তরে পরিণত হও তবুও তা আমার রাজত্বের সামান্যতম অংশও কমাতে পারবে না...”। [মুসলিমঃ ২৫৭৭]

(২) এ শব্দগুলোর ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে বেশ কিছু মত দেখা গেছে। কারো কারো মতে, এর অর্থ তারা নবীদেরকে চুপ থাকতে বলেছে। [ইবন কাসীর] অথবা মুখ দিয়ে সেগুলো উড়িয়ে দিয়েছে। [ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি এর অর্থ করেছেনঃ ‘তারা তাদের আঙ্গুলে কামড় দিয়েছে।’ অর্থাৎ তারা যাতে বিশ্বাসী ছিল তাতে কামড়ে পড়ে ছিল, নবী-রাসূলদের কথা শুনেনি। [কুরতুবী] কাতাদা ও মুজাহিদ এখানে এর অর্থঃ ‘রাসূলগণ

তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করলাম। আর নিশ্চয় আমরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি সে বিষয়ে(১), যার দিকে তোমরা আমাদেরকে ডাকছ।'

১০. তাদের রাসূলগণ বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা(২)?

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ

যা নিয়ে এসেছে তারা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করেছে আর মুখে তাদের উপর মিথ্যারোপ করেছে'। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ এমন সংশয় যার ফলে প্রশান্তি বিদায় নিয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যা নিয়ে এসেছ তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করবো না। কারণ, তোমাদের দাওয়াতের ব্যাপারে আমরা শক্তিশালী সন্দেহে নিপতিত। [ইবন কাসীর] আমরা মনে করছি তোমরা রাজত্ব অথবা দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টায় আছ। [কুরতুবী] কিন্তু পরবর্তী আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তারা সম্ভবত: ঈমান ও তাওহীদের ব্যাপারেই সন্দেহ করছিল। [দেখুন, মুয়াসসার] কারণ, রাসূলগণ তাদের কথার উত্তরে বলেছিলেন যে, তোমরা কি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সন্দেহ করতে পার? অথচ তিনিই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন।

(২) আয়াতের অর্থে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। এক. আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে কি সন্দেহ আছে? অথচ মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি ফিতরাতই তাঁর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাঁর স্বীকৃতি দেয়া বাধ্য করছে। সুতরাং যাদের প্রকৃতি ও স্বভাবজাত বিবেক ঠিক আছে তারা অবশ্যই তাঁর অস্তিত্বকে অবশ্যম্ভাবী মনে করে। হ্যাঁ, তবে কখনও কখনও সে সমস্ত ফিতরাতে সন্দেহ ও দ্বিধার অনুপ্রবেশ ঘটে, আর তখনই তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য দলীল-প্রমাণাদির দিকে তাকানোর প্রয়োজন পড়ে। আর এজন্যই রাসূলগণ এমন এক কথা এরপর বলেছেন যা তাদেরকে তাঁর পরিচয় ও তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে দলীল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। রাসূলগণ সেটাই তাদের উম্মতদেরকে বলেছেন যে, আমরা ঐ আল্লাহ্ সম্পর্কে বলছি যিনি "আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা"। তিনিই এ দুটোকে সৃষ্টি করেছেন এবং কোন পূর্ণ নমূনা ব্যতীত নতুনভাবে অস্তিত্বে এনেছেন। কেননা, এ দুটো নব্য হওয়া, সৃষ্ট হওয়া ও আজ্ঞাবহ হওয়া অত্যন্ত স্পষ্ট। সুতরাং এগুলোর জন্য একজন নির্মাতা অবশ্যই প্রয়োজন। আর তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, সবকিছুর ইলাহ ও মালিক। [ইবন কাসীর]

দুই. রাসূলদের একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক যুগের মুশরিকরা আল্লাহর অস্তিত্ব মানতো এবং আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা একথাও স্বীকার

ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوٓا۟ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ⑩

তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন তোমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য। তারা বলল, তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ‘ইবাদাত করত তোমরা তাদের ‘ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও(১)। অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ(২) উপস্থিত কর।

করতো। এরই ভিত্তিতে রাসূলগণ বলেছেন, এরপর তোমাদের সন্দেহ থাকে কিসে? আমরা যে জিনিসের দিকে তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা আল্লাহ তোমাদের বন্দেগীলাভের যথার্থ হকদার। এরপর কি আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ আছে? অর্থাৎ স্রষ্টাকে মেনে নেয়া এটা সৃষ্টিজগতের সবার কাছেই স্বীকৃত ব্যাপার। মুখে যতই অস্বীকার করুক না কেন মন তাদের তা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। কেননা তারা যদি স্রষ্টা না হয়ে থাকে তবে তারা সৃষ্টি, এ দুয়ের মাঝে অবস্থানের সুযোগ নেই। সুতরাং তিনি যদি একমাত্র স্রষ্টা হয়ে থাকেন, একমাত্র তাঁর ইবাদাত করতে বাধা কোথায়? [দেখুন, ইবন কাসীর] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ “ওরা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না ওরা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি ওরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় প্রত্যয়ী নয়।” [সূরা আত-তূরঃ ৩৫-৩৬]

(১) তাদের কথার অর্থ ছিল এই যে, তোমাদেরকে আমরা সব দিক দিয়ে আমাদের মত একজন মানুষই দেখছি। তোমরা পানাহার করো, নিদ্রা যাও, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি আছে, তোমাদের মধ্যে ক্ষুধা, পিপাসা, রোগ, শোক, ঠাণ্ডা ও গরমের তথা সব জিনিসের অনুভূতি আছে। এসব ব্যাপারে এবং সব ধরনের মানবিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে আমাদের সাথে তোমাদের সাদৃশ্য রয়েছে। তোমাদের মধ্যে এমন কোন অসাধারণত্ব দেখছি না যার ভিত্তিতে আমরা এ কথা মেনে নিতে পারি যে, আল্লাহ তোমাদের সাথে কথা বলেন এবং ফেরেশতারা তোমাদের কাছে আসে। তোমরা তো আমাদের কাছে কোন মু‘জিযা নিয়ে আসনি।

(২) অর্থাৎ তোমরা এমন কোন প্রমাণ বা মু‘জিযা নিয়ে আস যা আমরা চোখে দেখি এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করি। যে প্রমাণ দেখে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, যথার্থই আল্লাহ তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন এবং তোমরা যে বাণী এনেছো তা আল্লাহর বাণী।

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ
اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۖ وَمَا كَانَ لَنَآ
اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

১১. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, 'সত্য বটে, আমরা তোমাদের মত মানুষই কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ উপস্থিত করার সাধ্য আমাদের নেই(১)। আর আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনগণের নির্ভর করা উচিত।

وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ۗ
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ۗ وَعَلَى اللّٰهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. আর আমাদের কি হয়েছে যে, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করব না? অথচ তিনিই তো আমাদেরকে আমাদের পথ দেখিয়েছেন(২)। আর তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছ, আমরা তাতে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করব(৩)।

(১) অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমরা তো মানুষই। তবে আল্লাহ নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে আমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। এখানে আমাদের সামর্থের কোন ব্যাপার নেই। এ তো আল্লাহর পূর্ণ ইখতিয়ারের ব্যাপার। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে যা ইচ্ছা দেন। আমাদের কাছে যা কিছু এসেছে তা আমরা তোমাদের কাছে পাঠাতে বলতে পারি না এবং আমাদের কাছে যে সত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে তা থেকে আমরা নিজেদের চোখ বন্ধ করে নিতেও পারি না। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ বা মু'জিযা নিয়ে আসতে পারি না। যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র কাছে আমরা তা চাইব এবং তিনি তা অনুমোদন করবেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে সবচেয়ে সঠিক ও সবচেয়ে স্পষ্ট ও প্রকাশমান পথটির দিশা দিয়েছেন। [ইবন কাসীর]

(৩) এভাবে যখনই কোন নবী বা রাসূল কোন কাওমের কাছে এসেছে তখনই তাদের নেতা গোছের লোকেরা নবী-রাসূলদেরকে বিভিন্নভাবে চাপের মুখে রাখত। কখনও তাদেরকে দেশান্তর করার ভয় দেখাত। আবার কখনও তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হত। যেমন শু'আইব আলাইহিসসালামের কাওম তাকে বলেছিল, "তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা বলল, 'হে শু'আইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবই অথবা

সুতরাং নির্ভরকারীগণ আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করুক।’

তৃতীয় রুকূ’

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحٰٓى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. আর কাফিররা তাদের রাসূলদেরকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে অবশ্যই বহিস্কৃত করব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসবে(১)। অতঃপর রাসূলগণকে তাদের রব ওহী পাঠালেন, ‘যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব;

তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে।’ তিনি বললেন, ‘যদিও আমরা ওটাকে ঘৃণা করি তবুও?” [সূরা আল-আ'রাফঃ ৮৮] লূত আলাইহিসসালামের জাতি তাকে বলেছিলঃ “উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, ‘লূত-পরিবারকে তোমরা জনপদ থেকে বহিষ্কার কর, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।” [সূরা আন-নামলঃ ৫৬] তদ্রূপ অন্যত্রও এসেছে যে, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও তারা অনুরূপ কথা বলেছিল, যেমনঃ “তারা আপনাকে দেশ থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল আপনাকে সেখান থেকে বহিস্কার করার জন্য; তাহলে আপনার পর তারাও সেখানে অল্পকাল টিকে থাকত।”[সূরা আল-ইসরাঃ ৭৬] “স্মরণ করুন, কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার বা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্‌ও কৌশল করেন; আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।” [সূরা আল-আনফালঃ ৩০]

(১) এর মানে এ নয় যে, নবুওয়াতের মর্যাদায় সমাসীন হবার আগে নবীগণ নিজেদের পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের মিল্লাত বা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হতেন। বরং এর মানে হচ্ছে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে যেহেতু তারা এক ধরনের নীরব জীবন যাপন করতেন, তাই তাদের সম্প্রদায় মনে করতো তারা তাদেরই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] তারপর নবুওয়াতের কাজ শুরু করে দেয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা হতো যে, তারা বাপ-দাদার দ্বীন ত্যাগ করেছেন। অথচ নবুওয়াত লাভের আগেও তারা কখনো মুশরিকদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনচ্যুতির অভিযোগ করা যেতে পারে। অথবা আয়াতের অর্থ, তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শের অনুসারী হয়ে যাবে। অথবা কাফেররা এটা দ্বারা নবীদের অনুসারীদের উদ্দেশ্য নিয়েছে। যারা নবীর উপর ঈমান আনার আগে তাদের ধর্মাদর্শে ছিল। নবীকেও তারা নবীর অনুসারীদের সাথে একসাথে সম্বোধন করে নিয়েছে। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

১৪. আর অবশ্যই তাদের পরে আমরা তোমাদেরকে দেশে বাস করাব[১]; এটা তার জন্য যে ভয় রাখে আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির[২] ।

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾

১৫. আর তারা বিজয় কামনা করলো[৩]

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾

---

(১) অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা এ ওয়াদা করেছেন, যেমন বলেছেনঃ "আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য আগেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী ।" [সূরা আস-সাফ্‌ফাতঃ ১৭১-১৭৩] আরো বলেছেনঃ "আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার রাসূলগণও । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী ।" [সূরা আল-মুজাদালাহঃ ২১] আরও এসেছে, "যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে আমরা আমাদের কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি" [সূরা আল-আ'রাফ:১৩৭] আরও এসেছে, "আর তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের" [সূরা আল-আহযাব: ২৭] কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার এবং আখেরাতে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন । [তাবারী]

(২) যদিও আল্লাহ্‌র ওয়াদা সবার জন্যই কিন্তু এর থেকে উপকার ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে শুধু দু'শ্রেণীর লোকেরাই । যারা কিয়ামতের মাঠে তাদের প্রভুর সামনে উপস্থিত হতে হবে এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখার কারণে তাদের মধ্যে ভাবান্তর হয় এবং সে ভয়ে সদা কম্পমান থাকে । আর যারা আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে ভয় করে এবং এটা বিশ্বাস করে যে, তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত হবেই । অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ "তারপর যে সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় । জাহান্নামই হবে তার আবাস । পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে জান্নাতই হবে তার আবাস ।" [সূরা আন-নাযি'আতঃ ৩৭-৪১] আরো বলেছেনঃ "আর যে তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত ।" [সূরা আর-রাহমানঃ ৪৬] আয়াতের অপর অর্থ হচ্ছে, যারা দুনিয়াতে আমার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সাবধান হয়ে এটা বিশ্বাস করে যে, আমি অবশ্যই তাকে দেখছি, তার কর্মকাণ্ড আমার সার্বিক পর্যবেক্ষণে রয়েছে, তারাই ওয়াদা ও ধমকি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে । [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) এ আয়াতে কারা বিজয় কামনা করল এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে । এক, এখানে রাসূলগণই বিজয় কামনা করেছিলেন । দুই, কাফেরগণ উদ্ধত ও কুফরী এবং শির্কী ব্যবস্থাপনার উপর থাকা সত্ত্বেও নিজেদের জন্য বিজয় কামনা করল । [ফাতহুল কাদীর] এ অর্থের সমর্থনে অন্যত্র বর্ণিত একটি আয়াত পেশ করা যায় যেখানে বলা

আর প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল[১]।

১৬. তার সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং পান করানো হবে গলিত পুঁজ[২];

مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾

হয়েছে যে, কাফেররা তাদের দো'আয় বলেছিলঃ "হে আল্লাহ্! এগুলো যদি আপনার কাছ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিন।" [সূরা আল-আনফালঃ ৩২] আবার কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এটি উভয় সম্প্রদায়েরই কামনা হতে পারে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(১) جبار অর্থ, নিজের মতকে প্রাধান্যদানকারী এবং অপরের উপর নিজের মত চাপানোর প্রয়াস যিনি চালান। হক্ক গ্রহণের মানসিকতা যার নেই। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের লোকদের পরিণতি সম্পর্কে বলেছেনঃ "আদেশ করা হবে, তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে, যে কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সংগে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করত তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।" [সূরা ক্বাফঃ ২৪-২৬] তদ্রূপ হাদীসেও এসেছে, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে। তখন সে সমস্ত সৃষ্টিজগতকে ডেকে বলবে, "আমাকে প্রত্যেক সীমালজ্ঘনকারী, উদ্ধতের ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।" [তিরমিযীঃ ২৫৭৪]

(২) আয়াতে এসেছে যে, তাদেরকে صديد পান করানো হবে। صديد শব্দের অর্থ নির্ধারণে কয়েকটি মত রয়েছে। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, পুঁজ ও রক্ত। [তাবারী] কাতাদা বলেন, এর দ্বারা কাফেরদের চামড়া ও গোস্ত থেকে যা গলিত হয়ে বের হবে তাই উদ্দেশ্য। [তাবারী] কারও কারও মতে, এর দ্বারা কাফেরদের পুঁজ ও রক্তের সাথে তাদের পেট থেকে যা বের হবে তা মিললে যা হয় তা বুঝানো হয়েছে। [তাবারী; বাগভী; ফাতহুল কাদীর] মোটকথা, এটা এমন খারাপ পানীয় যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ বলেন, জাহান্নামবাসীদের পানীয় দু'ধরনের, হামীম অথবা গাস্সাক, তন্মধ্যে হামীম হলো সবচেয়ে গরম। আর গাস্সাক হলো সবচেয়ে ঠান্ডা ও ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত গলিত পানীয়। এ আয়াতের সমার্থে অন্যত্র এসেছে, "এটা সীমালংঘনকারীদের জন্য। কাজেই তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।" [সূরা ছোয়াদঃ ৫৭-৫৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ "এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?" [সূরা মুহাম্মাদঃ ১৫] আরো বলেছেন "তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে; এটা নিকৃষ্ট পানীয়! আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আশ্রয়!" [সূরা আল-কাহফঃ ২৯]

১৭. যা সে অতি কষ্টে একেক ঢোক করে গিলবে এবং তা গিলা প্রায় সহজ হবে না। সকল স্থান থেকে তার কাছে আসবে মৃত্যু(১) অথচ তার মৃত্যু ঘটবে না(২)। আর এরপরও রয়েছে কঠোর শাস্তি(৩)।

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

(১) ইবরাহীম আত-তাইমী বলেন, সবদিক থেকে মৃত্যু আসার অর্থ, শরীরের প্রতিটি লোমকুপ থেকে মৃত্যুর কষ্ট আসতে থাকবে। [তাবারী]

(২) আল্লাহ্ বলেন, “এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর।” [সূরা আল-হাজ্জঃ ২১], তারা সেটা গিলতে চেষ্টা করলেও সেটার দুর্গন্ধ, তিক্ততা, ময়লা আবর্জনা ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা গরম হওয়ার কারণে সহজে গিলতে সমর্থ হবে না। এভাবে তার শাস্তি চলতেই থাকবে, তার সমস্ত শরীরে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে কিন্তু মৃত্যু তার আসবে না। তার অগ্র, পশ্চাত, উপর বা নীচ সবদিক থেকে তার শাস্তি এমন হবে যে, এর সবগুলিই তার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তার মৃত্যু হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ “কিন্তু যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না।” [সূরা ফাতিরঃ ৩৬]

(৩) অর্থাৎ এটাই তাদের শাস্তির শেষ নয়। এর পরও তাদের জন্য আরো ভয়াবহ, কঠোর ও মারাত্মক শাস্তি অপেক্ষা করছে। [ইবন কাসীর] অন্যত্র বলেছেনঃ “যাক্কুম গাছ, যালিমদের জন্য আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ, এ গাছ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে, এর মোচা যেন শয়তানের মাথা। তারা এটা থেকে খাবে এবং উদর পূর্ণ করবে এটা দিয়ে। তার উপর তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্বলিত আগুনের দিকে।” [সূরা আস-সাফ্ফাতঃ ৬২-৬৮] এভাবেই তারা কখনো যাক্কুম গাছ থেকে খাবে, আবার কখনো তারা ফুটন্ত পানি পান করবে যা তাদের পেটের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। আবার কখনো তাদেরকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তির দিকে ফেরত পাঠানো হবে। এভাবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে তাদের শাস্তি হতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ “এটাই সে জাহান্নাম, যা অপরাধীরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, ওরা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটোছুটি করবে।” [সূরা আর-রাহমানঃ ৪৩-৪৪] আরো বলেনঃ “নিশ্চয়ই যাক্কুম গাছ হবে---পাপীর খাদ্য; গলিত তামার মত, তাদের পেটে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত। তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, তারপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও- এবং বলা হবে, ‘আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত! ‘এ তো তা-ই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।”[সূরা আদ-দোখানঃ ৪৩-৪৯] আরো বলেনঃ “আর বাম

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٨﴾

১৮. যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করে তাদের উপমা হল, তাদের কাজগুলো ছাইয়ের মত যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়(১)। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এটা তো ঘোর বিভ্রান্তি।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٩﴾

১৯. আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীন যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন(২)? তিনি ইচ্ছে করলে

দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! ওরা থাকবে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কালোবর্ণের ধোঁয়ার ছায়ায়, যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। [সুরা আল-ওয়াকি'আহঃ ৪১-৪৪] আরো বলেনঃ "আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম পরিণাম--- জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল! এটা সীমালংঘনকারীদের জন্য। কাজেই তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।" [সূরা ছোয়াদঃ ৫৫-৫৮]।

(১) উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম বাহ্যতঃ সৎ হলেও তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও অকেজো। তারা দুনিয়াতে যা করেছে সবই বৃথা ও নিষ্ফল হবে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ "আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ২৩] "এ পার্থিব জীবনে যা তারা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, ওটা যে জাতি নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে তাদের শষ্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে।" [সূরা আলে ইমরানঃ ১১৭] "হে মু'মিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, তারপর ওটার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত ওটাকে পরিস্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৬৪]

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে স্বশরীরে আবার পুনরায় নিয়ে আসতে তিনি যে সক্ষম সেটার পক্ষে দলীল পেশ করে বলছেন যে, মানুষ তো কোন ব্যাপার নয়। যে আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা কোন ব্যাপারই নয়। কারণ, মানুষের সৃষ্টির চেয়ে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা বড় ব্যাপার। [ইবন কাসীর]

তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন,

২০. আর এটা আল্লাহ্‌র জন্য আদৌ কঠিন নয়[১] ।

وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝٢٠

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও এটাকে তুলে ধরেছেন । যেমনঃ “তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম? বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । [সূরা আল-আহকাফঃ ৩৩] “মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী । এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি কথা ভুলে যায় । সে বলে, ‘কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে?’ বলুন, ‘তাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ।’ তিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ থেকে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা থেকে প্রজ্বলিত কর । যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ । তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায় । অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হাতেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে ।[সূরা ইয়াসীনঃ ৭৭-৮৩]

(১) অর্থাৎ তোমাদেরকে ধ্বংস করে সেখানে অন্যদের প্রতিষ্ঠিত করা তার জন্য কোন ব্যাপারই নয় । কোন বড় ব্যাপার নয় আবার কোন অসম্ভব ব্যাপার নয় । বরং এটা তার জন্য সহজ । যদি তোমরা তাঁর নির্দেশ অমান্য কর, তখন তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে অন্য কাউকে প্রতিস্থাপন করবেন । [ইবন কাসীর] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ “হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ্, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার যোগ্য । তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন ।” [সূরা ফাতিরঃ ১৫-১৭] “ যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না ।” [সূরা মুহাম্মাদঃ ৩৮] “হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে;” [সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫৪] “হে মানুষ! তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে ও অপরকে আনতে পারেন; আল্লাহ্ তা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম ।” [সূরা আন-নিসাঃ ১৩৩]

وَبَرَزُوۡا لِلّٰهِ جَمِیۡعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِیۡنَ اسۡتَكۡبَرُوۡۤا اِنَّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعًا فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّغۡنُوۡنَ عَنَّا مِنۡ عَذَابِ اللّٰهِ مِنۡ شَیۡءٍ ؕ قَالُوۡا لَوۡ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَیۡنٰكُمۡ ؕ سَوَآءٌ عَلَیۡنَاۤ اَجَزِعۡنَاۤ اَمۡ صَبَرۡنَا مَا لَنَا مِنۡ مَّحِیۡصٍ ﴿٢١﴾

২১. আর তারা সবাই আল্লাহ্‌র কাছে প্রকাশিত হবে[১]। তখন দুর্বলেরা যারা অহংকার করত তাদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে[২]?' তারা বলবে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই অথবা ধৈর্যশীল হই- উভয় অবস্থাই আমাদের জন্য সমান; আমাদের কোন

(১) মূল শব্দ 'বারাযা'। 'বারাযা' মানে সামনে উন্মুক্ত হওয়া। প্রকাশ হয়ে যাওয়া। [কুরতুবী] অর্থাৎ তারা কবর থেকে উন্মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হবে। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর] প্রকৃতপক্ষে বান্দা তো সবসময় তার রবের সামনে উন্মুক্ত রয়েছে। কিন্তু তারা যেহেতু গোনাহ করার সময় মনে করে যে, আল্লাহ্‌র কাছে সেটা গোপন থাকবে, তাই আল্লাহ্ তাদের সে সন্দেহ অপনোদন করে দিলেন। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে উন্মুক্ত হওয়ার অর্থ, কিয়ামতের দিন নেককার-বদকার সমস্ত সৃষ্টির এক প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। তারা সেখানে এমন এক খোলা ভূমিতে একত্রিত হবে যেখানে কেউ নিজেকে গোপন করার কোন সুযোগ পাবে না। [ইবন কাসীর] এ জন্য অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ "মানুষ উন্মুক্তভাবে উপস্থিত হবে আল্লাহ্‌র সামনে যিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী।" [সূরা ইবরাহীমঃ ৪৮]

(২) এটি এমন সব লোকের জন্য সতর্কবাণী যারা দুনিয়ায় চোখ বন্ধ করে অন্যের পেছনে চলে অথবা নিজেদের দুর্বলতাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে শক্তিশালী যালেমদের আনুগত্য করে, তাদের কথামত একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা থেকে দূরে ছিল, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেনি, তাদের জানানো হচ্ছে, আজ যারা তোমাদের নেতা হয়ে আছে আগামীকাল এদের কেউই তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে সামান্যতম নিষ্কৃতিও দিতে পারবে না। কাজেই আজই ভেবে নাও, তোমরা যাদের পেছনে ছুটে চলছো অথবা যাদের হুকুম মেনে চলছো তারা নিজেরাই কোথায় যাচ্ছে এবং তোমাদের কোথায় নিয়ে যাবে।

পালানোর জায়গা নেই ।[১]’

(১) আয়াতদৃষ্টে মনে হয়, এ ঝগড়াটি জাহান্নামে প্রবেশের পরে হবে । যেমন, কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের বর্ণনা এসেছে । বলা হয়েছে, “যখন যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা, যারা অনুসরণ করেছে তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবে এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে । আর তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, ‘হায়! যদি একবার আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো তবে আমরাও তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে’ । এভাবে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী তাদেরকে দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ । আর তারা কখনো আগুন থেকে বহির্গমণকারী নয় ।” [সূরা আল-বাকারাহঃ ১৬৬-১৬৭] আরও এসেছে, “আর যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা যারা অহংকার করেছিল তাদেরকে বলবে, ‘আমরা তো তোমাদের অনুসরণ করেছিলাম সুতরাং তোমরা কি আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ গ্রহণ করবে?’ অহংকারীরা বলবে, ‘নিশ্চয় আমরা সকলেই এতে রয়েছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন ।” [সূরা গাফিরঃ ৪৭-৪৮] আরও বলেন, “অবশেষে যখন সবাই তাতে একত্র হবে, তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, ‘হে আমাদের রব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল ; কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন ।’ আল্লাহ্ বলবেন, ‘প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না ।’ আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে, ‘আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কাজেই তোমরা যা অর্জন করেছিলে, তার জন্য শাস্তি ভোগ কর ।” [সূরা আল-আ'রাফঃ ৩৮-৩৯] আরও এসেছে, “যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, ‘হায়! আমরা যদি আল্লাহ্কে মানতাম আর রাসূলকে মানতাম!’ তারা আরো বলবে, ‘হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল; ‘হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত ।” [সূরা আল-আহযাবঃ ৬৬-৬৮]

কিন্তু বিভিন্ন আয়াতদৃষ্টে মনে হয় যে, হাশরের ময়দানেও তারা ঝগড়া করবে, যেমন কুরআনের অন্যত্র এসেছে, “হায়! আপনি যদি দেখতেন যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, ‘তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম ।’ যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা, যাদেরকে দূর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের কাছে সৎপথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী ।’ যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, ‘প্রকৃত পক্ষে তোমরাই তো দিনরাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, যখন তোমরা

চতুর্থ রুকূ'

২২. আর যখন বিচারের কাজ সম্পন্ন হবে তখন শয়তান বলবে, 'আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি[১], আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে ডাকছিলাম তাতে তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, তোমরা নিজেদেরই তিরস্কার কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। তোমরা যে আগে আমাকে আল্লাহ্‌র শরীক করেছিলে[২] আমি তা অস্বীকার

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾

আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করি এবং তাঁর জন্য সমকক্ষ (শির্ক) স্থাপন করি।' আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং যারা কুফরী করেছে আমরা তাদের গলায় শৃংখল পরাব। তাদেরকে তারা যা করত তারই প্রতিফল দেয়া হবে।" [সূরা সাবাঃ ৩১-৩৩] এ ঝগড়াটি হবে হাশরের মাঠে। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ সত্যবাদী ছিলেন এবং আমি ছিলাম মিথ্যেবাদী। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র।" [সূরা আন-নিসা: ১২০] আরও বলেন, "আর তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও।' আর শয়তান ছলনা ছাড়া তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না।" [সূরা আল-ইসরা: ৬৪]

(২) এখানে আবার বিশ্বাসগত শির্কের মোকাবিলায় শির্কের একটি স্বতন্ত্র ধারা অর্থাৎ কর্মগত শির্কের অস্তিত্বের একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। যাকে 'শির্ক ফিত তা'আহ' বা

করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

২৩. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে স্থায়ী হবে, সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'(১)।

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾

আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্ক বলা হয়। একথা সুস্পষ্ট, বিশ্বাসগত দিক দিয়ে শয়তানকে কেউই আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে শরীক করে না এবং কেউ তার পূজা, আরাধনা ও বন্দেগী করে না। সবাই তাকে অভিশাপ দেয়। তবে তার আনুগত্য ও দাসত্ব এবং চোখ বুজে বা খুলে তার পদ্ধতির অনুসরণ অবশ্যি করা হচ্ছে। এটিকেই এখানে শির্ক বলা হয়েছে। কুরআনে কর্মগত শির্কের একাধিক প্রমাণ রয়েছে। যেমন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে, "তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের "আহবার" (উলামা) ও "রাহিব" (সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী) দেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।" [সূরা আত-তাওবাঃ ৩১] প্রবৃত্তির কামনা বাসনার পূজারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: তারা নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। [সূরা আল ফুরকানঃ ৪৩] নাফরমান বান্দাদের সম্পর্কে এসেছে, "তারা শয়তানের ইবাদাত করতে থেকেছে।" [সূরা ইয়াসীনঃ ৬০] এ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, আল্লাহর অনুমোদন ছাড়াই অথবা আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোন গাইরুল্লাহর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে থাকাও শির্ক। শরী'আতের দৃষ্টিতে আকীদাগত মুশরিকদের জন্য যে বিধান তাদের জন্য সেই একই বিধান, কোন পার্থক্য নেই। [দেখুন, আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস, আশ-শির্ক ফিল উলুহিয়্যাহ ফিত তা'আহ অধ্যায়]

(১) এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, জান্নাতবাসীদের পরস্পর সাদর সম্ভাষন হবে সালাম। [আদওয়াউল বায়ান] আবার কারও কারও মতে, এ সালাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হবে। [বাগভী] অন্যত্র আছে যে, ফেরেশ্‌তাগণ জান্নাতবাসীদেরকে এ শব্দে সাদর সম্ভাষণ জানাবে। যেমনঃ "যখন তারা জান্নাতের কাছে উপস্থিত হবে ও এর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি 'সালাম', তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।" [সূরা আয-যুমারঃ ৭৩] "স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও, এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে, এবং বলবে, 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; কত ভাল এ পরিণাম!"[সূরা আর-রা'দঃ

২৪. আপনি কি লক্ষ্য করেন না আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের[১] তুলনা উৎকৃষ্ট গাছ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উপরে বিস্তৃত[২],

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾

২৩-২৪] "তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ৭৫] "সেখানে তাদের ধ্বনি হবেঃ 'হে আল্লাহ্! আপনি মহান, পবিত্র! এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম' এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবেঃ 'সকল প্রশংসা জগতসমূহের রব আল্লাহ্‌র প্রাপ্য!" [সূরা ইউনুসঃ ১০]

(১) মূল আয়াতে ﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ বলা হয়েছে। "কালেমা তাইয়েবা"র শাব্দিক অর্থ "পবিত্র কথা।" পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এ কালেমা। [বাগভী] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ ﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ হলোঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেয়া আর ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ হলো মু'মিন। [ইবন কাসীর] এরপর ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ﴾ এর অর্থ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মু'মিনের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত। ﴿وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ﴾ অর্থ, এ কালেমার কারণে এর মাধ্যমে মু'মিনের আমল আসমানে উত্থিত হয়। [ইবন কাসীর] আর এ তাফসীরই দাহহাক, সা'য়ীদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমাহ এবং কাতাদা সহ অনেক মুফাসসেরীন থেকে বর্ণিত হয়েছে। যার সারকথা হলো, উত্তম বৃক্ষ হলো মু'মিন যার তুলনা খেজুর গাছের সাথে বিভিন্ন হাদীসে দেয়া হয়েছে। খেজুর গাছ শুধু ভাল কিছুই উপহার দেয়। তেমনি ঈমানদার, শুধু ভালকাজই তার কাছ থেকে আসমানে উঠতে থাকে। সে ভাল কথা, ভাল কাজ করেই যেতে থাকে আর তা দুনিয়াতে হলেও তার ফলাফল নির্ধারিত হয় আকাশে। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রেথিত। ভূগর্ভস্থ ঝর্ণা থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে, দম্‌কা বাতাসে ভূমিসাৎ হয়ে যায় না। ভূপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশ পানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই যে, এর ফল সবসময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক তথ্যনির্ভর উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। [আত-তাফসীরুস সহীহ] এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং চাক্ষুষ দেখা দ্বারাও হয় এবং বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড যে উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয়-সবাই জানে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'কুরআনে উল্লেখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ

এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হান্‌যল তথা মাকাল বৃক্ষ।' [তিরমিযিঃ ৩১১৯, নাসায়ীঃ ২৮২] আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তার কাছে খেজুর বৃক্ষের শাঁস নিয়ে এল। তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে একটি প্রশ্ন করলেনঃ বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মর্দে-মুমিনের দৃষ্টান্ত। (বুখারীর রেওয়ায়েত মতে এ স্থলে তিনি আরো বললেন যে, কোন ঋতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।) বল, এ কোন বৃক্ষ? ইবনে উমর বললেনঃ আমার মন চাইল যে, বলে দেই- খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিশে আবু বকর, উমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাদেরকে চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না। এরপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।' [বুখারীঃ ৭২, ১৩১, ২২০৯, ৪৬৯৮, মুসলিমঃ ২৮১১, মুসনাদে আহমাদঃ ২/১২, ২/৬১]

এ বৃক্ষ দ্বারা মুমিনের দৃষ্টান্ত দেয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড়বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। সাহাবী ও তাবেয়ী; বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলিমদের দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের মোকাবেলায় জান, মাল ও কোন কিছুর পরওয়া করেনি। দ্বিতীয় কারণ তাদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তারা দুনিয়ার নোংরামী থেকে সবসময় দূরে সরে থাকেন যেমন ভূপৃষ্ঠের ময়লা-আবর্জনা উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দু'টি গুণ হচ্ছে ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ﴾ -এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উচ্চে ধাবমান, মুমিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ সৎকর্মও তেমনি আকাশের দিকে উত্থিত হয়। কুরআন বলেঃ ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [সূরা ফাতিরঃ ১০] -অর্থাৎ পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্ তা'আলার যেসব যিক্‌র, তাসবীহ্-তাহ্‌লীল, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি করে, সেগুলো সকাল-বিকাল আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছতে থাকে। চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে দিবারাত্র খাওয়া হয়, মুমিনের সৎকর্মও তেমনি সবসময়, সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি অংশই যেমন উপকারী, তেমনি মুমিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, ওঠাবসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা অনুযায়ী হতে হবে। [দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কে'য়ীন, ১/১৩৩; আল-বাদর, তাআম্মুলাত ফী মুমাসালাতিল মু'মিন বিন নাখলাহ] উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ বাক্যে أُكُلٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্তু এবং حين শব্দের অর্থ প্রতিমুহূর্ত। এটিই সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। [তাবারী] যদিও এখানে অন্যান্য মতও রয়েছে। [দেখুন, তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. যা সব সময়ে তার ফলদান করে তার রবের অনুমতিক্রমে। আর আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমাসমূহ পেশ করে থাকেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ِۨاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

২৬. আর অসৎবাক্যের তুলনা এক মন্দ গাছ যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্নকৃত, যার কোন স্থায়িত্ব নেই[১]।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

২৭. যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন[২]

---

(১) ﴿كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ﴾ এটি কালেমা তাইয়্যেবার বিপরীত শব্দ। এখানে কাফেরদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ ঈমান, তেমনি কালেমায়ে খবীসার অর্থ কুফরী বাক্য ও কুফরী কাজকর্ম। [কুরতুবী] আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর তাফসীরে ﴿كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ﴾ অর্থাৎ খারাপ বৃক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হান্‌যল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। [কুরতুবী] কেউ কেউ রসুন ইত্যাদি বলেছেন। [বাগভী] কুরআনে এই খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশী যেতে পারে না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, এ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। [কুরতুবী] কাফেরের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে, ইবন আব্বাস বলেন, শির্কের কোন মূল নেই, কোন প্রমাণ নেই যে, কাফের তা ধারণ করবে। আর আল্লাহ্ শির্ক মিশ্রিত কোন আমল কবুল করেন না। [তাবারী] অর্থাৎ কাফেরের দ্বীনের বিশ্বাসের কোন শিকড় ও ভিত্তি নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। অনুরূপভাবে এ বৃক্ষের ফল-ফুল অর্থাৎ কাফেরের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্‌র দরবারে ফলদায়ক নয়। গ্রহণযোগ্য নয়। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াত থেকে আমরা আরো যে শিক্ষা পাই তা হলো, মুমিনের ঈমান ও কালেমায়ে তাইয়্যেবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তা হলোঃ মুমিনের কালেমায়ে তাইয়্যেবা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মত একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ্ তা'আলা চিরকাল কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। শর্ত এই যে, এ কালেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে এবং সে অনুসারে আমল করতে হবে। এ কালেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। যখন কোন সন্দেহ আসে তাদেরকে সে সন্দেহ থেকে

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

এবং যারা যালিম আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আর আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা করেন[১]।

উত্তরণ করে দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতি পথনির্দেশ দেয়া হয়। অনুরূপভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যখন দিশেহারা হয়ে যায়, তখনও তাদেরকে নিজের আত্মার অনিষ্টতা ও খারাপ ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে সবকিছুর উপর স্থান দেয়ার তাওফীক দেয়া হয়। আখেরাতেও মৃত্যুর পূর্বমূহূর্তে দ্বীনে ইসলামীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার মাধ্যমে তাকে উত্তম পরিসমাপ্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করা হয়। তারপর কবরে তাকে ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের সহযোগিতা করা হয়, ফলে সে উত্তর দিতে পারে যে, আমার রব আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নবী। [সা'দী] অধিকাংশ মুফাসসির ও মুহাদ্দিস বলেন, এ আয়াত কবরের ফিতনা তথা প্রশ্নোত্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। বস্তুত: কবরের শাস্তি ও শান্তি কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলিমকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হবে, তখন সে সাক্ষ্য দিবে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এবং এটাও বলবে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী- ﴿يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ﴾ -এর উদ্দেশ্য। [বুখারী: ৪৬৯৯, মুসলিম: ২৮৭১] এছাড়া আরো প্রায় চল্লিশ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের। [সা'দী] সাহাবাগণ তাদের তাফসীরে আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে কবরের আযাব সওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন। [বিস্তারিত দেখুন, ইবন কাসীর; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা চান, তাই করেন। তিনি চাইলে কাউকে তাওফীক দেন, কাউকে তাওফীক থেকে বঞ্চিত করেন। কাউকে সুদৃঢ় রাখেন। কাউকে পদস্খলিত করেন। [বাগভী] কাউকে আযাব দেন, কাউকে পথভ্রষ্ট করেন। [কুরতুবী] তাঁর ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ায়, এমন কোন শক্তি নেই। উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ইবন ইয়ামান প্রমুখ সাহাবী বলেনঃ মুমিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তারা আরো বলেনঃ যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার আবাস হবে জাহান্নাম। কারণ, এটাই মূলতঃ তাকদীরের উপর ঈমান। আর যে কেউ তাকদীরের ভাল বা মন্দ হওয়ার উপর ঈমান আনবে না তার ঈমানই শুদ্ধ হবে না। তার আবাস জাহান্নাম হবেই। [ইবনুল কাইয়্যেম, তরীকুল হিজরাতাইন: ১/৮২]

পঞ্চম রুকূ’

২৮. আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ঘরে[১]--

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾

২৯. জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা দগ্ধ হবে, আর কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল!

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

৩০. আর তারা আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ[২] নির্ধারণ করে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য। বলুন, ‘ভোগ করে নাও[৩], পরিণামে আগুনই তোমাদের

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

---

(১) অর্থাৎ “আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আল্লাহ্ তা‘আলার নেয়ামতের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের অনুসারী জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে? তারা জাহান্নামে প্রজ্জ্বলিত হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাস।” অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট এখানে মক্কার কাফেরদের বুঝানো হয়েছে। [বুখারী: ৪৭০০] মুজাহিদ বলেন, এর দ্বারা কুরাইশদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা বদরে মারা গেছে। [ইবন কাসীর] এখানে “আল্লাহ্‌র নেয়ামত” বলে সাধারণভাবে অনুভূত, প্রত্যক্ষ ও মানুষের বাহ্যিক উপকার সম্পর্কিত নেয়ামত বোঝানো যেতে পারে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে নেয়ামত দ্বারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই বোঝানো হয়েছে। তারা তার সাথে কুফরি করে তাদের প্রতি প্রেরিত নেয়ামতকে পরিবর্তন করে নিয়েছে। [বাগভী] মূলত: যাবতীয় কাফের ও মুশরিকরা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও নাফরমানী করেছে।

(২) أَنْدَادًا শব্দটি نِدٌّ -এর বহুবচন। এর অর্থ সমতুল্য, সমান। প্রতিমাসমূহকে أنداد বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। তারা আল্লাহ্‌র সাথে সেগুলোরও ইবাদত করত এবং অন্যদেরকে সেগুলোর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানাত। [ইবন কাসীর] সূরা আল-বাকারাহ এর তাফসীরে এর বিস্তারিত আলোচনা চলে গেছে।

(৩) تمتع শব্দের অর্থ কোন বস্তু দ্বারা সাময়িকভাবে কয়েকদিন উপকৃত হওয়া। আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য ও তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

ফিরে যাওয়ার স্থান ।’

৩১. আমার বান্দাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আপনি বলুন, ‘সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে(১)---সে দিনের আগে যে দিন থাকবে না কোন বেচা- কেনা এবং থাকবে না বন্ধুত্বও(২) ।’

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾

সাল্লাম-কে আদেশ দেয়া হয়েছেঃ আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক; তোমাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের অগ্নি । দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ীত্বের কথা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । [দেখুনঃ সূরা লুকমানঃ ২৪, সূরা ইউনুসঃ ৭০, সূরা আয-যুমারঃ ৮, সূরা আলে ইমরানঃ ১৯৭, সূরা আন-নিসাঃ ৭৭, সূরা আত-তাওবাহঃ ৩৮, সূরা আর-রা'দঃ ২৬, সূরা আন-নাহলঃ ১১৭, সূরা গাফেরঃ ৩৯, সূরা আয-যুখরুফঃ ৩৫, সূরা আল-হাদীদঃ ২০]

(১) এ আয়াতে মুমিন বান্দাদের জন্য বিরাট সুসংবাদ ও সম্মান রয়েছে । প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজের বান্দা বলেছেন, এরপর ঈমান-গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সম্মান দানের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, তারা সালাত কায়েম করুক । এর মানে হচ্ছে, মুমিনদের হতে হবে কৃতজ্ঞ । আর এ কৃতজ্ঞতার বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য এদের সালাত কায়েম এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে হবে । সালাতের সময় অলসতা এবং সালাতের সুষ্ঠু নিয়মাবলীতে ত্রুটি না করা চাই । এছাড়া আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযক থেকে কিছু তাঁর পথেও ব্যয় করুক । ব্যয় করার উভয় পদ্ধতিকেই বৈধ রাখা হয়েছে- গোপনে অথবা প্রকাশ্যে । কোন কোন আলেম বলেন: ফরয যাকাত, ফিৎরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত- যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়, আর নফল দান-সদকা গোপনে করা উচিত যাতে রিয়া ও নাম-যশ অর্জনের মত মনোভঙ্গি সৃষ্টির আশংকা না থাকে । [কুরতুবী] ব্যাপারটি আসলে নিয়তের উপর নির্ভরশীল । যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ও নাম-যশের নিয়ত থাকে, তবে দানের ফযীলত শেষ হয়ে যায়- তা ফরয হোক কিংবা নফল । পক্ষান্তরে যদি অপরকে উৎসাহিত করার নিয়ত থাকে, তবে ফরয ও নফল উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা বৈধ । [দেখুন, তাফসীর ইবন কাসীর ১/৭০১; সূরা আল-বাকারার ২৭১ নং আয়াতের তাফসীর]

(২) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা সালাত কায়েম করতে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে দান

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۳۲

৩২. আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন[১], আর যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন এবং যিনি নৌযানকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে সেগুলো সাগরে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে[২] ।

করাকে দ্রুত করতে বলেছে । [ইবন কাসীর] কারণ, কখন কিয়ামত এসে যায় তখন আর তারা এগুলো করতে সক্ষম হবে না । কারণ সেদিন কোন লেন-দেনের মাধ্যমে নিজের আযাবকে অন্যের কাছে স্থানান্তর করতে পারবে না । অনুরূপভাবে সেদিন কোন বন্ধুও তার জন্য কিছু দিতে পারবে না । [সা'দী] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তা আরো স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেনঃ "হে মু'মিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সেদিন আসার আগে, যেদিন কেনা-বেচা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না এবং কাফিররাই যালিম ।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৫৪]

(১) এ আয়াত এবং এর পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনেকগুলো নেয়ামত স্মরণ করিয়ে মানুষকে 'ইবাদাত ও আনুগত্যের দাওয়াত দিয়েছেন । আল্লাহ্ বলেন, তিনিই এমন সত্তা, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, যাদের উপর মানুষের অস্তিত্বের সূচনা ও স্থায়ীত্ব নির্ভরশীল । এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, যার সাহায্যে হরেক রকমের ফলফলাদি সৃষ্টি করেছেন । যাতে সেগুলো তাদের রিয্‌ক হতে পারে । অথচ তাঁর নিয়ামত অস্বীকার করা হচ্ছে, তাঁর বন্দেগী ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে, তাঁর সাথে জোর করে অংশীদার বানিয়ে দেয়া হচ্ছে । এসব সবই তাঁর দান, যাঁর দানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই ।

(২) আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন । এরা আল্লাহ্‌র নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে । আয়াতে ব্যবহৃত سَخَّرَ শব্দের অর্থ ذَلَّلَ وَيَسَّرَ অনুগত করেছেন এবং উপকৃত হওয়া সহজ করেছেন । অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কিছু জিনিস তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন । তন্মধ্যে কিছু এমন জিনিসও আছে যেগুলো থেকে কল্যাণ লাভ করা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন । সে হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সত্তা যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন । তিনি মেঘ থেকে বৃষ্টি নাযিল করেছেন । যা দ্বারা তিনি মৃত ভূমিকে জীবিত

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে, যারা অবিরাম[১] একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে[২] ।

وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তা থেকে[৩] । তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ

করেছেন। তা থেকে তিনি তোমাদের রিযকের ব্যবস্থা করেছেন। তোমাদের জন্য নৌকা ও জাহাজকে অনুগত ও সহজ করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে সেটি সমুদ্রে তোমাদের উপকারার্থে চলাফেরা করে। আর নদীগুলোকে তোমাদের পান করার জন্য, তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের পানের সুবিধার্থে, তোমাদের ক্ষেত-খামারে পানি দেয়ার স্বার্থে, অনুরূপ তোমাদের যাবতীয় উপকারার্থে অনুগত ও সহজ করে দিয়েছেন। [মুয়াসসার]

(১) অর্থাৎ তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে অনুবর্তী করে দিয়েছি। এরা উভয়ে সর্বদা একই নিয়মে চলাচল করে। دَآئِبَين শব্দটি دَاب থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ অভ্যাস। [কুরতুবী] অর্থাৎ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় চলা এ দু'টির (সূর্য ও চন্দ্র) অভ্যাসে পরিণত করে দেয়া হয়েছে। এর খেলাফ হয় না। কিয়ামত পর্যন্ত এ দু'টি চলতে থাকবে, কোন প্রকার ক্লান্ত না হয়ে। [কুরতুবী] অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আজ্ঞাধীন চলার অর্থে ব্যক্তিগত নির্দেশের অনুবর্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনসমূহকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন ঠিকই; কিন্তু এরূপ অর্থে করেছেন যে, এগুলো সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র অপার রহস্যের অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে। এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মর্জির অধীন। [দেখুন, মুয়াসসার]

(২) এমনিভাবে রাতদিনকে মানুষের অনুবর্তী করে দেয়ার অর্থও এরূপ যে, এগুলোকে মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। [দেখুন, মুয়াসসার] ইবন কাসীর বলেন, রাত ও দিনকে মানুষের জন্য নিয়োজিত করার অর্থ, একটি অপরটি থেকে কিছু অংশ নিয়ে নেয়া। কখনও রাত দিন থেকে নেয় ফলে রাত বড় হয়, আর কখনও দিন রাত থেকে কিছু অংশ নিয়ে নেয় ফলে দিন বড় হয়। অন্য আয়াতেও যেমন বিষয়টি বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, সূরা আল-হাজ্জ: ৬১; সূরা লুকমান: ২৯; সূরা ফাতির: ১৩; সূরা আল-হাদীদ: ৬।

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ঐ সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ।

গুণলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না[১]। নিশ্চয় মানুষ অতি

[আত-তাফসীরুস সহীহ; ফাতহুল কাদীর] তবে আল্লাহ্‌র দান ও পুরস্কার কারো চাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বও তাঁর কাছে চাইনি। তিনি নিজ কৃপায় চাওয়া ব্যতীতই দিয়েছেন। আসমান, যমীন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার প্রার্থনা কে করেছিল? এগুলো চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে দান করেছেন। এ কারণেই কোন কোন মুফাস্‌সির এ বাক্যের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে প্রত্যেক ঐ বস্তু দিয়েছেন, যা চাওয়ার যোগ্য; যদিও তোমরা চাওনি। [বাগভী; কুরতবী; ফাতহুল কাদীর] কিন্তু বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তোমাদের প্রার্থিত প্রতিটি বস্তু থেকে কিছু কিছু তোমাদেরকে তিনি দিয়েছেন। এ অর্থ নেয়া হলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ, মানুষ সাধারণতঃ যা যা চায়, তার কিছু অংশ তাকে দিয়েই দেয়া হয়। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে চাওয়া বলতে প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে বুঝানো হয়েছে, তখন অর্থ হবে, তোমাদের প্রকৃতির সর্ববিধ চাহিদা পূরণ করেছেন। তোমাদের মুখে চাওয়া হোক বা অবস্থায় সে চাওয়া বুঝা যাক। এসব তিনিই দান করেছেন। জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই সরবরাহ করেছেন। তোমাদের বেঁচে থাকা ও বিকাশ লাভ করার জন্য যেসব উপাদান ও উপকরণের প্রয়োজন ছিল তা সবই যোগাড় করে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অথবা সারা বিশ্বের জন্য কোন না কোন উপযোগিতা নিহিত থাকে যা সে জানে না। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ জানেন যে, তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্য অথবা তার পরিবারের জন্য অথবা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপদাপদের কারণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নেয়ামত। কিন্তু জ্ঞানের ক্রুটির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দুঃখিত হয়।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত এত অধিক যে, সব মানুষ একত্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইলে গুণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজের অস্তিত্বই স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ্ তা'আলার অন্তহীন নেয়ামত নিহিত রয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্পূর্ণ দান ও নেয়ামতের গণনা করাও আমাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়। সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত কোনভাবেই আমরা সেটা গণনা করে শেষ করতে পারব না। এই অসংখ্য নেয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য 'ইবাদাত ও অসংখ্য শোকর জরুরী হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবী। মানুষ সে শোকর আদায়ের ব্যাপারে অতিশয় যালেম, কারণ সে এ ব্যাপারে গাফেল থাকে। [ফাতহুল কাদীর] মূলত: মানুষের প্রকৃতিই এই যে, সে অত্যাচারী, যালেম, গোনাহ করার ব্যাপারে অতি উৎসাহী, রবের হক আদায়ে অমনোযোগী, আল্লাহ্‌র নেয়ামতের সাথে অধিক কুফরিকারী। সে শোকরিয়া তো আদায় করেই না, নেয়ামতের স্বীকারোক্তি পর্যন্ত করে না।

মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।

ষষ্ঠ রুকূ’

৩৫. আর স্মরণ করুন[১], যখন ইব্‌রাহীম বলেছিলেন, ‘হে আমার রব! এ

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ

তবে এদের ব্যতিক্রম কিছু লোক আছে যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেছেন, তারা ঠিকই তাঁর শোকর আদায় করতে সচেষ্ট থাকে। রবের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকে এবং সেটা আদায় করতে নিজেকে নিয়োজিত করে। উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র যে নেয়ামত তাঁর বান্দাদের জন্য রয়েছে সেগুলোর সামান্য কিছুর বর্ণনা রয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের আহ্বান জানিয়েছেন। যেভাবে তাঁর নেয়ামত দিন-রাত ব্যাপী তেমনি তার শোকরও দিন-রাত করার জন্য উদগ্রীব করেছেন। [সা’দী] তালক ইবন হাবীব বলেন, বান্দাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত এত বেশী যে বান্দারা সেটা গুণে শেষ করতে পারবে না। তাই তোমরা সকাল-বিকাল তাওবা কর। [ইবন কাসীর] এভাবে আল্লাহ্ তা’আলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকর আদায় করার সাধ্য তার নেই, তখন আল্লাহ্ তা’আলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকর আদায়ের স্থলাভিষিক্ত করে নেন। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের পরে যে দো’আ শিখিয়েছেন, তাতে এসেছে, ‘হে আল্লাহ্! আপনার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, যথেষ্ট হয়েছে না বলে, (অর্থাৎ যে প্রশংসা আমি করছি তা আপনার নেয়ামতের বিপরীতে যথেষ্ট নয় অথবা আমাদের খাবার হিসেবেও যা খেয়েছি সেটাই যথেষ্ট নয় বরং সারা জীবন এ নেয়ামত আমাদের লাগবে) এবং যে নেয়ামত থেকেও বিদায় নিতে পারব না (বা আমরা না নিয়ে পারব না)। আর এ নেয়ামত থেকে অমুখাপেক্ষীও আমরা হতে পারব না।’ [বুখারী: ৫৪৫৮]

(১) সাধারণ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করার পর এবার আল্লাহ কুরাইশদের প্রতি যেসব বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন সেগুলোর কথা বলছেন। এ সংগে একথাও বলা হচ্ছে যে, তোমাদের প্রপিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কোন ধরনের প্রত্যাশা নিয়ে তোমাদের এখানে আবাদ করেছিলেন, তাঁর দোয়ার জবাবে আমি তোমাদের প্রতি কোন ধরনের অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলাম এবং এখন তোমরা নিজেদের প্রপিতার প্রত্যাশা ও নিজেদের রবের অনুগ্রহের জবাবে কোন ধরনের ভ্রষ্টতা ও দুষ্কর্মের অবতারণা করে যাচ্ছো। তিনি তো এ ঘরকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য তৈরী করেছিলেন। এ ইবরাহীম যার জন্য এ এলাকা আবাদ হয়েছে তিনি তো প্রচণ্ডভাবেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাতের বিরোধিতা করে গেছেন। তিনিই তো মক্কার জন্য নিরাপত্তার দো’আ করেছেন। [আল-বাহরুল মুহীত; ইবন কাসীর]

آمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

শহরকে নিরাপদ করুন[১] এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন[২]।

(১) এখানে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দু'টি দো'আ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দো'আঃ ﴿رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا﴾ -অর্থাৎ হে আমার রব! এ (মক্কা) নগরীকে শান্তির আলয় করে দাও। সূরা আল-বাকারায়ও [১২৬ নং আয়াতে] এ দো'আর উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে بلد শব্দটি ألف ও لام ব্যতীত بلدا বলা হয়েছে। এর অর্থ অনির্দিষ্ট নগরী। এর কারণ হিসেবে কোন কোন মুফাস্‌সির যা বলেন তা এই যে, এ দো'আটি যখন করা হয়েছিল, তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দো'আ করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন। এরপর মক্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দো'আটি করেন। কারণ এর পরে তাঁর দু ছেলে ইসমাঈল ও ইসহাকের কথা উল্লেখ করেছেন। যা দ্বারা বোঝা যায় যে, দো'আটি পরেই করা হয়েছে। কারণ ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ইসহাকের চেয়ে তের বছরের বড় ছিলেন। আর প্রথম যখন দো'আ করেছিলেন তখন ইসমাঈল ও তাঁর মা-এ দু'জনই ছিলেন। আর ইসমাঈল তখন ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। [আল-বাহরুল মুহীত; ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, সূরা বাকারার আয়াতে সে দেশ ও দেশের বাসিন্দা সবার নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে এ সূরায় শুধু দেশের নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নির্দিষ্ট করে প্রথমে যে দো'আ করেন তা হচ্ছে, 'একে শান্তির আবাসস্থল করে দিন।' আল্লাহ্ তা'আলা নবীর এ দো'আ কবুল করেছেন। তিনি অন্যত্র বলেন, "তারা কি দেখে না আমরা 'হারাম'কে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চারপাশে যেসব মানুষ আছে, তাদের উপর হামলা করা হয়।" [সূরা আল-আনকাবূত: ৬৭] এখানে লক্ষণীয় যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সবকিছুর আগে নিরাপত্তার জন্য দো'আ করেছেন। কারণ, যদি কোন স্থানে নিরাপত্তার অভাব হয়, সেখানে দ্বীন- দুনিয়ার কোন কাজই সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয় না। [ফাতহুল কাদীর]

(২) দ্বিতীয় দো'আ এই যে, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। নবীগণ নিস্পাপ। কিন্তু এখানে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম দো'আ করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির প্রভাবে নবীগণ সর্বদা শংকা অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দো'আ করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বোঝাবার জন্য নিজেকেও দো'আয় শামিল করে নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর দো'আ কবুল করেছেন। ফলে তার সন্তানরা শির্ক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। [তাবারী; কুরতুবী] তবে তার বংশধরদের মধ্যে মূর্তিপূজা হবে না এমনটি বলা হয়নি এবং ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালামও এমন দো'আ করেননি। কারণ, মক্কাবাসীরা

৩৬. 'হে আমার রব! এ সব মূর্তি তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে(১)। কাজেই যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে আপনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু(২)।

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾

সাধারণভাবে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এরই বংশধর। তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক দো'আকারীর উচিত তার নিজের ও পিতামাতা ও তার সন্তান-সন্ততিদের জন্য এ দো'আ করা। [ইবন কাসীর]

(১) এখানে পূর্ব আয়াতে বর্ণিত দো'আর কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে। ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল। অর্থাৎ মূর্তিগুলো মানুষকে আল্লাহর দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের ভক্তে পরিণত করেছে। মূর্তি যেহেতু অনেকের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে তাই পথভ্রষ্ট করার কাজকে তার কৃতকর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে তথা ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও কৃপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে, তার জন্য আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ মন্দকর্ম নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার কৃপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায়। আর যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফরী ও অস্বীকৃতি নেয়া হয়, তবে কাফের ও মুশরিকের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্য সুপারিশ না করার নির্দেশ ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে পূর্বেই দেয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত করার সঠিক অর্থ হলোঃ নবীসুলভ দয়া প্রকাশ করা। প্রত্যেক নবীর আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, প্রত্যেক কাফের ঈমান আনুক, তাই আল্লাহ্ তা'আলাকে “আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু” -একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেননি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন। ঈসা 'আলাইহিস্ সালামও স্বীয় উম্মতের কাফেরদের সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেনঃ ﴿وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [আল-মায়েদাঃ ১১৮] অর্থাৎ “আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান”। আপনি সবই করতে পারেন। আপনার কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই। [দেখুন, ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ কথা 'হে রব! এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে'

৩৭. ‘হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের কিছু সংখ্যককে বসবাস করালাম[১] অনুর্বর

رَبَّنَآ اِنِّيۡۤ اَسۡكَنۡتُ مِنۡ ذُرِّيَّتِيۡ بِوَادٍ غَيۡرِ ذِيۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَيۡتِكَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا

এ আয়াতাংশ এবং ঈসা আলাইহিস সালামের ‘যদি আপনি তাদেরকে আযাব দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা’ আয়াতাংশ তেলাওয়াত করেন। তারপর তিনি তাঁর দু’হাত উপরে উঠালেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহ্! আমার উম্মত, হে আল্লাহ্! আমার উম্মত, হে আল্লাহ্! আমার উম্মত। আর কাঁদতে থাকলেন। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা জিবরীলকে বললেন, হে জিবরীল তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও, -অথচ তোমার রব জানেন - তাকে জিজ্ঞেস কর, কেন তিনি কাঁদছেন? তখন জিবরীল এসে রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও জিবরীলকে প্রশ্নোত্তর জানালেন। তখন আল্লাহ্ বললেন, জিবরীল যাও, মুহাম্মাদের কাছে এবং তাকে বল, আমরা অবশ্যই আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব এবং আপনার জন্য খারাপ কোন কিছু করব না। [মুসলিম: ২০২]

(১) এখানে ইব্‌রাহীম আলাইহিসসালাম কিভাবে তার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানকে এ মরুপ্রান্তরে রেখে গেলেন সে ঘটনাটি সহীহ বর্ণনার উপর নির্ভর করে বর্ণনা করা প্রয়োজন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ নারী জাতি সর্বপ্রথম ইসমাঈল আলাইহিসসালাম এর মাতা হাজেরা থেকেই কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে। হাজেরা সারা থেকে আপন গর্ভের নিদর্শনাবলী গোপন করার উদ্দেশ্যেই কোমরবন্ধ লাগাতেন। অতঃপর উভয়ের মনোমালিণ্য চরমে পৌঁছলে আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম আলাইহিসসালাম হাজেরা ও তার শিশুপুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে নির্বাসন দানের জন্য বের হলেন। পথে হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম আলাইহিসসালাম তাদের উভয়কে নিয়ে যেখানে কাবাঘর অবস্থিত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং মসজিদের উঁচু অংশে যমযমের উপরিস্থত এক বিরাট বৃক্ষতলে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন জনমানব, না ছিল পানির কোনরূপ ব্যবস্থা। অতঃপর সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। তারপর ইবরাহীম আলাইহিসসালাম নিজ গৃহ অভিমুখে ফিরে চললেন। ইসমাঈলের মাতা তার পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! কোথায় চলে যাচ্ছেন? আর আমাদেরকে রেখে যাচ্ছেন এমন এক ময়দানে, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী না আছে পানাহারের কোন বস্তু। তিনি বার বার এ কথা বলতে লাগলেন। কিন্ত ইবরাহীম আলাইহিসসালাম সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাজেরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এর আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ্ দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ্ আমাদের ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। ইবরাহীমও সামনে চললেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে এসে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী-পুত্র আর তাকে দেখতে

পাচ্ছিল না, তখন তিনি কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত তুলে এ দো'আ করলেনঃ "হে আমাদের রব ! আমি আমার বংশধরদের কিছু সংখ্যককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে, হে আমাদের রব ! এ জন্যে যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" তখন ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে দুধ খাওয়াতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। পরিশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তখন তিনি নিজেও তৃষ্ণার্ত হলেন এবং তার শিশুপুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি দেখতে লাগলেন, শিশুর বুক ধড়ফড় করছে কিংবা বলেছেন, সে জমিনে ছটফট করছে। শিশুপুত্রের দিকে তাকানো তার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থানের সংলগ্ন পর্বত 'সাফা'কেই একমাত্র নিকটতম পর্বত হিসেবে পেলেন তারপর তিনি এর উপর উঠে দাঁড়িয়ে ময়দানের দিকে মুখ করলেন, এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন কাউকে দেখা যায় কি না? কিন্তু না কাউকে তিনি দেখলেন না। তখন দ্রুত সাফা পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। যখন তিনি নিচু ময়দানে পৌঁছলেন তখন আপন কামিজের এক দিক তুলে একজন শ্রান্ত-ক্লান্ত ব্যক্তির ন্যায় দৌড়ে চললেন। শেষে ময়দান অতিক্রম করলেন, মারওয়া পাহাড়ের নিকট এসে গেলেন এবং তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চারদিকে নজর করলেন, কাউকে দেখতে পান কি না? কিন্তু কাউকে দেখলেন না। তিনি অনুরূপভাবে সাতবার করলেন। ... তারপর যখন তিনি শেষবার মারওয়ার পাহাড়ের উপর উঠলেন, একটি আওয়াজ শুনলেন। তখন নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। তিনি কান দিলেন। আবারও শব্দ শুনলেন। তখন বললেন, তোমার আওয়াজ তো শুনছি। যদি তোমার কাছে উদ্ধার করার মত কিছু থাকে আমাকে উদ্ধার কর। অকস্মাৎ তিনি, যমযম যেখানে অবস্থিত সেখানে একজন ফেরেশ্‌তাকে দেখতে পেলেন। সে ফেরেশ্‌তা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন। কিংবা তিনি বলেছেন-আপন ডানা দ্বারা আঘাত হানলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি উপচে উঠতে লাগল। হাজেরা এর চার পাশে বাঁধ দিয়ে তাকে হাউযের আকার দান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তার মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার অঞ্জলি ভরার পরে পানি উছলে উঠতে লাগল। ... তারপর হাজেরা পানি পান করলেন এবং শিশুপুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশ্‌তা তাকে বললেন, ধ্বংসের কোন আশংকা আপনি করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহ্‌র ঘর রয়েছে। এই শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি পুনঃ নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ্ তার পরিজনকে কখনও ধ্বংস করবেন না। ঐ সময় বায়তুল্লাহ জমিন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যার পানি আসতো এবং ডান বাম থেকে ভেঙ্গে নিয়ে যেতো।

হাজেরা এভাবেই দিন-যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত "জুরহুম" গোত্রের একদল লোক তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। কিংবা তিনি বলেছেন, 'জুরহুম'

গোত্রের কিছু লোক 'কাদা' এর পথে এ দিক দিয়ে আসছিল। তারা মক্কার নিচুভূমিতে অবতরণ করল এবং দেখতে পেল কতগুলো পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপরই ঘুরছে। অথচ আমরা এ ময়দানে বহুকাল কাটিয়েছি। কিন্তু কোন পানি এখানে ছিল না। তারপর তারা একজন বা দু'জন লোক সেখানে পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির খবর দিল। সবাই সেদিকে অগ্রসর হলো। বর্ণনাকারী বলেনঃ ইসমাঈলের মাতা পানির কাছে বসা ছিলেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই; আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তবে এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ বলে সম্মতি জানালো। ইবনে আব্বাস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাতার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল, তিনিও মানুষের সাহচর্য কামনা করছিলেন। ফলে আগন্তুক দলটি সেখানে বসতি স্থাপন করলো এবং পরিবার-পরিজনের কাছে খবর পাঠালো, তারাও এসে সেখানে বসবাস শুরু করল। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের কয়েকটি খান্দান জন্ম নিল। ইসমাঈলও বড় হলেন, তাদের থেকে আরবী শিখলেন। জওয়ান হলে তিনি তাদের অধিক আগ্রহের বস্তু ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। যখন তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হলেন, তখন তারা তাদেরই এক মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিল। বিয়ের পরে ইসমাঈলের মাতা মারা গেলেন। ... (ইতিমধ্যে ইবরাহীম আলাইহিসসালাম দু'বার এসে ইসমাঈল ও স্ত্রীর খোঁজ নিলেন এবং এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিলেন)

পুনরায় ইবরাহীম আলাইহিসসালাম আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু দিন এদের থেকে দূরে রইলেন। এরপর আবার তাদের কাছে আসলেন। ইসমাঈল আলাইহিসসালাম যমযমের কাছে একটি গাছের নীচে বসে নিজের তীর মেরামত করছিলেন। পিতাকে যখন আসতে দেখলেন, দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর একজন পিতা-পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাত হলে যা করে তারা তা-ই করলেন। তারপর ইবরাহীম আলাইহিসসালাম বললেনঃ হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজের হুকুম দিয়েছেন। ইসমাঈল আলাইহিসসালাম জবাব দিলেন, আপনার পরওয়ারদিগার আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা করে ফেলুন। ইবরাহীম আলাইহিসসালাম বললেনঃ তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল আলাইহিসসালাম বললেন, হ্যাঁ। আমি অবশ্যই আপনার সাহায্য করব। ইবরাহীম আলাইহিসসালাম বললেন, আল্লাহ্ আমাকে এখানে এর চারপাশ ঘেরাও করে একটি ঘর বানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এ বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন এবং স্থানটি দেখালেন। তখনি তারা উভয়ে কাবা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল আলাইহিসসালাম পাথর যোগান দিতেন এবং ইবরাহীম আলাইহিসসালাম গাঁথুনি করতেন। যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল

উপত্যকায়[১] আপনার পবিত্র ঘরের কাছে[২], হে আমাদের রব! এ

لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ

আলাইহিসসালাম মাকামে ইবরাহীম নামক মশহুর পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম আলাইহিসসালামের জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম আলাইহিসসালাম এর উপর দাঁড়িয়ে ইমারত নির্মাণ করতে লাগলেন এবং ইসমাঈল তাকে পাথর যোগান দিতে লাগলেন। আর উভয়ে এ দো'আ করতে থাকলেনঃ "হে আমাদের রব! আমাদের থেকে (এ কাজটুকু) কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন"। আবার তারা উভয়ে ইমারত নির্মাণ করতে লাগলেন। তারা কাবা ঘরের চারদিকে ঘুরছিলেন এবং উভয়ে এ দো'আ করছিলেনঃ "হে আমাদের প্রভু! আমাদের এ শ্রমটুকু কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-বাকারাহঃ ১২৭), [বুখারীঃ ৩৩৬৪]

(১) ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে শুষ্ক প্রান্তরে ছেড়ে আপনি শামে চলে যান, তখন তিনি আবেদন করেছিলেন যে, তাদেরকে ফলমূল দান করুন; যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মক্কা মুকার্‌রামায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এত অধিক পরিমাণে সেখানে পৌঁছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই সেগুলো পাওয়া দুস্কর।

(২) এ আয়াতাংশ থেকে কেউ কেউ প্রমাণ নিতে চেষ্টা করেছেন যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিত্তি ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। কোন কোন মুফাস্‌সির এ আয়াতের এবং বিভিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে বলেনঃ সর্বপ্রথম আদম 'আলাইহিস্ সালাম বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ করেন। নূহের মহাপ্লাবনের পর ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে এই ভিত্তির উপরেই বায়তুল্লাহ্ পূননির্মাণের আদেশ দেয়া হয়। জিব্‌রাঈল 'আলাইহিস্ সালাম প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। [কুরতুবী] তবে সহীহ কোন দলীল সরাসরি এটা প্রমাণ করে না যে, ইবরাহীম আলাইহিসসালামের পূর্বে কেউ কা'বা ঘর বানিয়েছে। বিভিন্ন দুর্বল বর্ণনায় আদম আলাইহিসসালাম এবং পরবর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু জাতির মক্কায় আসার কথা এসেছে, কিন্তু সেগুলো সহীহ হাদীসের বিপরীতে টিকে না। যেখানে সরাসরি সহীহ হাদীসে এসেছে যে, "প্রথম মাসজিদ বাইতুল্লাহিল হারাম তারপর বাইতুল মাকদিস, আর এ দুয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো চল্লিশ বছরের"। [দেখুনঃ মুসলিমঃ ৫২০] ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম নির্মিত এই প্রাচীর জাহেলিয়াত যুগে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তা নতুনভাবে নির্মান করে। এ নির্মাণকাজে আবু তালেবের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও নবুওয়তের পূর্বে অংশগ্রহণ করেন। [মুসলিমঃ ৩৪০] এতে বায়তুল্লাহ্‌র বিশেষণ مُحَرَّم উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিতও হতে পারে এবং সুরক্ষিতও। বায়তুল্লাহ্ শরীফের মধ্যে উভয় বিশেষণই বিদ্যমান। এটি যেমন চিরকাল সম্মানিত, তেমনি চিরকাল শত্রুর কবল থেকে সুরক্ষিত। [কুরতুবী]

النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾

জন্যে যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে[১]। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন[২] এবং ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করুন[৩], যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে[৪]।

(১) ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম দো'আর প্রারম্ভে পুত্র ও তার জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম সালাত কায়েমকারী করার দো'আ করেন। ইবন জারীর বলেন, এখানে বায়তুল্লাহকে কেন হারাম বা সম্মানিত/সুরক্ষিত করা হয়েছে তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে আর সেটা হচ্ছে, যাতে মানুষ সেখানে সালাত আদায় করতে সমর্থ হয়। [তাবারী; ইবন কাসীর] তাছাড়া সালাত সবচেয়ে উত্তম ইবাদাত। [আল-বাহরুল মুহীত] এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়। যে এ সালাত ঠিকভাবে কায়েম রাখতে পারবে সে দ্বীন কায়েম রাখতে পারবে। [সা'দী] এ থেকে বোঝা গেল যে, পিতা যদি সন্তানকে সালাতের অনুবর্তী করে দেয়, তবে এটাই সন্তানদের পক্ষে পিতার সর্ববৃহৎ সহানুভূতি ও হিতাকাংখা হবে।

(২) أفئدة শব্দটি فؤاد এর বহুবচন। এর অর্থ অন্তর। এখানে أفئدة শব্দটি نكرة এবং তার সাথে من অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, যা تبعيض ও تقليل এর অর্থে আসে। তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ যদি এ দো'আয় 'কিছু সংখ্যক' অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না হত; তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইয়াহূদী, নাসারা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মক্কায় ভীড় করত, যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম দো'আয় বলেছেনঃ কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। যাতে করে শুধু মুসলিমরাই এখানে আসে। [ইবন কাসীর]

(৩) যাতে করে তারা এ ফল-মুল খেয়ে আপনার ইবাদতের জন্য শক্তি লাভ করতে পারে। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ তা'আলা এ দো'আ কবুল করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "আমরা কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমাদের দেয়া রিয্‌কস্বরূপ" [সূরা আল-কাসাস: ৭৫] এ দো'আর প্রভাবেই মক্কা মুকার্‌রামা কোন কৃষিপ্রধান অথবা শিল্পপ্রধান এলাকা না হওয়া সত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোন বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না। এ দোআর বরকতেই সব যুগে সব ধরনের ফল, ফসল ও অন্যান্য জীবন ধারণ সামগ্রী সেখানে পৌঁছে থাকে। [কুরতুবী]

(৪) এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্তানদের জন্য আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দো'আ এ কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়ে কৃতজ্ঞতার সওয়াবও অর্জন করে। এভাবে

رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعۡلَمُ مَا نُخۡفِي وَمَا نُعۡلِنُۗ وَمَا يَخۡفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٣٨

৩৮. 'হে আমাদের রব! আপনি তো জানেন যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি; আর কোন কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে গোপন নেই, না যমীনে না আসমানে(১)।

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلۡكِبَرِ إِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٩

৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইস্‌মা'ঈল ও ইস্‌হাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দো'আ শ্রবণকারী(২)।

সালাতের অনুবর্তিতা দ্বারা দো'আ শুরু করে কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-শান্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলিমের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যান-ধারণার উপর আখেরাতের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং সংসারের কাজ ততটুকুই করা উচিত, যতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দো'আ সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমার আন্তরিক অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। আপনি আমার এ দো'আর উদ্দেশ্য ভাল করেই জানেন। আপনি জানেন যে, আমি এ দো'আ দ্বারা কেবল আপনার জন্য ইখলাস ও সন্তুষ্টিই কামনা করছি। [তাবারী; ইবন কাসীর] 'আন্তরিক অবস্থা' বলতে ঐ দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বোঝানো হয়েছে, যা একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসম্বল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিয়েছিল। [কুরতুবী] আর 'বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন' বলে স্পষ্টত: ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের বিস্তৃতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও আন্তরিক অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে কোন অবস্থাই তাঁর অজ্ঞাত নয়। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি মুখে যা কিছু বলছি তা আপনি শুনছেন এবং যেসব আবেগ-অনুভূতি আমার হৃদয় অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে তাও আপনি জানেন।

(২) এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দো'আর পরিশিষ্ট। কেননা, দো'আর অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দো'আর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম এস্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার একটি নেয়ামতের শোকর আদায় করেছেন, নেয়ামতটি এই যে, ঘোর বার্ধক্যের বয়সে আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবুল করে তাকে সুসন্তান

৪০. 'হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের রব! আর আমার দো'আ কবূল করুন[১]।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾

৪১. 'হে আমাদের রব! যেদিন হিসেব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন[২]।'

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

সপ্তম রুকূ'

৪২. আর আপনি কখনো মনে করবেন না যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল[৩], তবে তিনি

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ

ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান। আপনিই তার হেফাযত করুন। অবশেষে ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ﴾ বলে প্রশংসা বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নিশ্চয় আমার রব দো'আ শ্রবণকারী তথা কবুলকারী।

(১) প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দো'আয় মশগুল হয়ে যানঃ ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ﴾ এতে নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য সালাত কায়েম রাখার দো'আ করেন। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা! আমার দো'আ কবুল করুন। এখানে সালাতে কায়েম রাখার অর্থ, সালাতের হিফাযতকারী এবং এর সীমারেখা যথাযথভাবে কায়েম করা বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দো'আ করলেন, 'হে আমার রব! আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারাজীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। এতে তিনি মাতা-পিতার জন্যও মাগফেরাতের দো'আ করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আযর যে কাফের ছিল, তা কুরআনুল কারীমেই উল্লেখিত রয়েছে। সম্ভবতঃ এ দো'আটি তখন করেছেন, যখন ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে কাফেরদের জন্য দো'আ করতে নিষেধ করা হয়নি। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহ্‌কে গাফেল মনে করো না। এখানে বাহ্যতঃ

فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির(১)।

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾

৪৩. ভীত-বিহ্‌বল চিত্তে উপরের দিকে তাকিয়ে তারা ছুটোছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে উদাস(২)।

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. আর যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে আপনি মানুষকে সতর্ক করুন, তখন যারা যুলুম করেছে তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার ডাকে সাড়া দেব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করব।' তোমরা কি আগে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের

প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে তার গাফলতি ও শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। [ফাতহুল কাদীর] পক্ষান্তরে যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফেলদেরকে শোনানো এবং হুশিয়ার করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফেল মনে করতে পারেন।

(১) অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তাদের সামনে হবে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তারা তা দেখতে থাকবে যেন তাদের চোখের মনি স্থির হয়ে গেছে, পলক পড়ছে না। ঠায় এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তা আরো ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় আসন্ন হলে হঠাৎ কাফিরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম।" [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৯৭]

(২) অর্থাৎ সেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হয়ে থাকবে। ﴿مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ﴾ -অর্থাৎ লজ্জা, ভয় ও বিস্ময়ের কারণে মস্তক উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। ﴿لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾ -অর্থাৎ অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে। ﴿وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ﴾ -অর্থাৎ ভয়ে তাদের অন্তর শূন্য, উদাস ও ব্যাকুল হবে। [কুরতুবী]

পতন নেই[১]?

৪৫. আর তোমরা বাস করেছিলে তাদের বাসভূমিতে, যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল এবং তাদের সাথে আমরা কিরূপ (আচরণ) করেছিলাম তাও তোমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল। আর তোমাদের জন্য আমরা অনেক দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছিলাম[২]।

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ۝

(১) এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন যালিম ও অপরাধীরা অপারগ হয়ে বলবেঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে আরো কিছুদিন সময় দিন। অর্থাৎ দুনিয়াতে কয়েকদিনের জন্য পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত নবীগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের এ অবস্থা বর্ণনা করে বলছেন, "আর আপনি যদি দেখতেন! যখন অপরাধীরা তাদের রবের নিকট অবনত মস্তকে বলবে, 'হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ফেরত পাঠান, আমরা সৎকাজ করব, নিশ্চয় আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী।" [সূরা আস-সাজদাহঃ ১২] আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জবাবে বলা হবেঃ এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও আখেরাত অস্বীকার করে আসছিলে। অন্য আয়াতেও কাফেরদের এ আবদার ও তার জবাব বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, 'হে আমার রব! আমাকে আবার ফেরত পাঠান, 'যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি আগে করিনি।' না, এটা হবার নয়। এটা তো তার একটি বাক্য মাত্র যা সে বলবেই" [সূরা আল-মুমিনূনঃ ৯৯-১০০]

(২) এতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশ। আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরস্পরের মাধ্যমে তোমরা একথাও জান যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আল্লাহ্ তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন কিন্তু এরপরও তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। আল্লাহ্

৪৬. আর তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু তাদের চক্রান্ত আল্লাহ্‌র কাছে রক্ষিত হয়েছে[১], তবে তাদের চক্রান্ত এমন ছিল না যে, পর্বত টলে যাবে[২]।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

বলেন, “এটা পরিপূর্ণ হিকমত, কিন্তু ভীতিপ্রদর্শন তাদের কোন কাজে লাগেনি।” [সূরা আল-কামার:৫] [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ তিনি তাদের যাবতীয় চক্রান্ত বেষ্টন করে আছেন। তিনি সেগুলোকে পুনরায় তাদের দিকে তাক করে দিয়েছেন। আবার তিনি সেগুলোর বিনিময়ে তাদের শাস্তি দিবেন।

(২) অধিকাংশ তাফসীরবিদ ﴿وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ﴾ বাক্যের إن শব্দটি নেতিবাচক অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কূটকৌশল ও চালবাজি করেছে, কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তারা সত্যদ্বীনকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মুসলিমদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে সাধ্যমত কূটকৌশল করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কূটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। তাদের কুটকৌশল এমন বড় কিছু নয় যে, পাহাড় টলে যাবে। সে অনুসারে তাদের যাবতীয় কুটকৌশলের হীনতা ও দূর্বলতা বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে এ অর্থে বলা হয়েছে, “ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করবেন না; আপনি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেন না এবং উচ্চতায় আপনি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবেন না।” [সূরা আল-ইসরাঃ৩৭] [ইবন কাসীর]

আয়াতের দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হলো, “যদিও তাদের কূটকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মোকাবেলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপসৃত হবে” [কুরতুবী] কিন্তু আল্লাহ্‌র অপার শক্তির সামনে এসব কূটকৌশল ব্যর্থ হয়ে গেছে। আয়াতে বর্ণিত শত্রুতামূলক কূটকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কূটকৌশলও হতে পারে। উদাহরণতঃ নমরূদ, ফির'আওন, কওমে-'আদ, কওমে সামূদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবেলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কূটকৌশল করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

আয়াতে উল্লেখিত مكر শব্দের অর্থ কোন কোন মুফাসসিরের মতে, শির্ক ও রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ। [কুরতুবী] অর্থাৎ তাদের শির্ক ও রাসূলের উপর মিথ্যারোপ মারাত্মক আকার ধারণ করলেও আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। অন্য আয়াত থেকেও এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, শির্ক

৪৭. সুতরাং আপনি কখনো মনে করবেন না যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী[১]।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۴۷﴾

৪৮. যেদিন এ যমীন পরিবর্তিত হয়ে অন্য যমীন হবে এবং আসমানসমূহও[২];

یَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَیْرَ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتُ

করার কারণে আকাশ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। [সূরা মারইয়ামঃ ৯০] [ইবন কাসীর]

(১) এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অথবা প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছেঃ "কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খেলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" তিনি নবীগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন। [বাগভী; কুরতুবী] তিনি তাদেরকে দুনিয়াতেও সাহায্য করবেন, আখেরাতেও যেদিন সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াবে সেদিনও তিনি তাদের সাহায্য করবেন। তিনি পরাক্রমশালী কোন কিছুই তার ক্ষমতার বাইরে নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা পূরণে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছেঃ "কেয়ামতের দিন বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেয়া হবে এবং আকাশও। সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হবে।" পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেয়ার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও আকৃতি পাল্টে দেয়া হবে; যেমন কুরআনুল কারীমের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেয়া হবে। এতে কোন গৃহের ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত, গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ﴿لَا تَرٰی فِیْهَا عِوَجًا وَّلَاۤ اَمْتًا﴾ [ত্বাহাঃ ১০৭] অর্থাৎ গৃহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কেয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না, বরং সব পরিস্কার ময়দান হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'কেয়ামতের দিন ময়দার রুটির মত পরিস্কার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে পুনরুত্থিত করা হবে। এতে কারো কোন চিহ্ন (গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি) থাকবে না। [বুখারীঃ ৬৫২১, মুসলিমঃ ২৭৯০] অন্য এক হাদীসে এসেছে,

وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

আর মানুষ উন্মুক্তভাবে উপস্থিত হবে এক, একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ্‌র সামনে।

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর সেদিন আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন পরস্পর শৃংখলিত অবস্থায়(১),

سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾

৫০. তাদের জামা হবে আলকাতরার(২) এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এক ইয়াহূদী এসে প্রশ্ন করলঃ যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেনঃ পুলসিরাতের নিকটে অন্ধকারে থাকবে।’ [মুসলিমঃ ৩১৫] অন্য বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বলেছিলেন, “সিরাতের উপর” [মুসলিম: ২৭৯১] এ থেকে জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এ মর্মে একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ্ তা‘আলাই ভাল জানেন।

(১) অর্থাৎ যেদিন সমস্ত মানুষ মহান বিচারপতি আল্লাহ্‌র সামনে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। তখন যদি আপনি অপরাধীদের দিকে দেখতেন যারা কুফরি ও ফাসাদ সৃষ্টি করে অপরাধ করে বেড়িয়েছে, তারা সেদিন শৃঙ্খলিত অবস্থায় থাকবে। [ইবন কাসীর] এখানে কয়েকটি অর্থ হতে পারে, একঃ কাফেরগণকে তাদের সমমনা সাথীদের সাথে একসাথে শৃংখলিত অবস্থায় রাখা হবে। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, “(ফেরেশ্‌তাদেরকে বলা হবে,) ‘একত্র কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ‘ইবাদাত করত তারা---” [সূরা আস-সাফফাত: ২২] আরও এসেছে, “আর যখন দেহে আত্মাসমূহ সংযোজিত হবে” [সূরা আত-তাকওয়ীর: ৭] যাতে করে শাস্তি বেশী ভোগ করতে পারে। কেউ কারো থেকে পৃথক হবে না। পরস্পরকে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। দুইঃ তারা নিজেদের হাত ও পা শৃংখলিত অবস্থায় জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। [কুরতুবী] তিন. কাফের ও তাদের সাথে যে শয়তানগুলো আছে সেগুলোকে একসাথে শৃংখলিত করে রাখা হবে। [বাগভী; কুরতুবী]এমনও হতে পারে যে, সব কয়টি অর্থই এখানে উদ্দেশ্য।

(২) কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, قطران এর অর্থ প্রচণ্ড গরম তামা। [ইবন কাসীর] কারও কারও নিকট “কাতেরান” শব্দটি আলকাতরা, গালা ইত্যাদির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেগুলোতে সাধারণত আগুন বেশী প্রজ্জলিত হয়।

চেহারাসমূহকে[১];

৫১. যাতে আল্লাহ্ প্রতিদান দেন প্রত্যেক নাফসকে যা সে অর্জন করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসেব গ্রহণে তৎপর[২]।

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝٥١

৫২. এটা মানুষের জন্য এক বার্তা, আর যাতে এটা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনিই কেবল এক সত্য ইলাহ্ আর যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٥٢

(১) এখানে বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মুখ আগুনে আচ্ছন্ন থাকবে। অন্যত্র আরো বলেছেনঃ "আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়" [সূরা আল-মু'মিনূনঃ ১০৪] "হায়, যদি কাফিররা সে সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের মুখ ও পিছন দিক থেকে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না!" [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৩৯]

(২) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. তিনি বান্দাদের হিসেব গ্রহণে দ্রুত তা সম্পন্ন করবেন। কেননা, তিনি সবকিছু জানেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। সমস্ত মানুষ তাঁর শক্তির কাছে একজনের মতই। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের সবার সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।" [সূরা লুকমান: ২৮] দুই. আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, অচিরেই তিনি তাদের হিসেব গ্রহণ করবেন। কারণ কিয়ামত অতি সন্নিকটে। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১] [ইবন কাসীর]



১৫- সূরা আল-হিজ্‌র, ৯৯ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম, আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ①

১. আলিফ-লাম-রা, এগুলো হচ্ছে আয়াত মহাগ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কুরআনের(১)।

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ②

২. কখনো কখনো কাফিররা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত(২)!

---

(১) কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ এ কুরআন হেদায়াত ও সঠিক পথ এবং কল্যাণের রাস্তাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। সুতরাং হেদায়াত চাইলে এ কুরআন অনুসরণের বিকল্প নেই। [তাবারী] এখানে তিনি হালাল, হারাম, হক ও বাতিল স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। [বাগভী]

(২) কখন কাফেরগণ সেটা আকাংখা করবে? কোন কোন মুফাসসির বলেন, তারা এটা মৃত্যুর সময় কামনা করবে। [ইবন কাসীর] তবে এ ব্যাপারে একটি হাদীসের দিকে তাকালে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, সেটা আখেরাতে তারা কামনা করবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “জাহান্নামবাসীরা যখন জাহান্নামে একত্রিত হবে, তারা তাদের সাথে কিছু গুনাহগার মু'মিনদেরকেও দেখতে পাবে, তখন তারা বলবেঃ তোমাদের ইসলাম তোমাদের কোন কাজে আসলো না, তোমরা তো দেখছি আমাদের সাথে জাহান্নামেই রয়ে গেলে। তারা বলবেঃ আমাদের কিছু গুনাহ ছিল যার কারণে আমাদের পাকড়াও করা হয়েছে। তারা যা বলেছে আল্লাহ্ তা শুনলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “তখন কিবলার অনুসারী মুসলিমগণকে বের করার নির্দেশ দেয়া হবে। আর তখন কাফেরগণ আফসোস করে বলবেঃ হায়! আমরা যদি মুসলিম হতাম তাহলে তারা যেভাবে বের হয়ে গেছে সেভাবে আমরাও বের হতে পারতাম। সাহাবী আবু মূসা আল-আশ'আরী বলেনঃ 'আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়লেনঃ “আলিফ-লাম-রা, এগুলো আয়াত মহাগ্রন্থের, সুস্পষ্ট কুরআনের কখনো কখনো কাফিররা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত।”[মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/২৪২] এভাবে কাফেররা যখন প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে তখন লজ্জিত হবে এবং আফসোস করে ঈমান আনার জন্য আকাংখা করতে থাকবে। কিন্তু তাদের সে আকাংখা কোন কাজে লাগবে না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ “আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন তাদেরকে আগুনের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, 'হায়! যদি আমাদেরকে আবার ফেরত পাঠানো হত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।” [সূরা আল-আন'আমঃ ২৭] “ যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি

৩. তাদেরকে ছাড়ুন, তারা খেতে থাকুক[১], ভোগ করতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক[২], অতঃপর

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝٣

হঠাৎ তাদের কাছে যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, 'হায়! এটাকে আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্য আক্ষেপ ।' তারা তাদের পিঠে নিজেদের পাপ বহন করবে; দেখুন, তারা যা বহন করবে তা খুবই নিকৃষ্ট! [সূরা আল-আন'আমঃ ৩১] "যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম!" [সূরা আল-ফুরকানঃ ২৭]

(১) এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফেরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা আখেরাত ও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না । মুমিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরী করে; কিন্তু মৃত্যু ও আখেরাতকে ভুলে এ কাজ করে না । তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না । এখানে দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে, ঈমান ও আনুগত্য ত্যাগ করে, দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন হওয়া, তাওবাহ ও আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন পরিত্যাগ করা এবং মৃত্যু ও আখেরাত থেকে নিশ্চিন্ত দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া । [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বারে দাড়িয়ে বললেনঃ 'হে দামেশ্‌কবাসীগণ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল, হিতাকাঙ্খী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে । তারা প্রচুর ধন-সম্পদ একত্রিত করেছিল, সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোঁকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে । 'আদ জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল । তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল । আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার কাছ থেকে দু'দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হবে?' [ইবনুল মুবারক: আয-যুহদ ৮৪৭; কুরতুবী] হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ 'যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্খার জাল তৈরী করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায় ।' [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ মানুষের আশা-আকাংখা, লোভ-লালসা এতবেশী যে, সে তার পিছনে এতই মগ্ন থাকে যে, তার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ তার আশা পুরোয় না । হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্দর উদাহরণ পেশ করেছেন । আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অচিরেই তারা জানতে পারবে(১)।

৪. আর আমরা যে জনপদকেই ধ্বংস করেছি তার জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ কাল(২)।

وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٞ مَّعۡلُومٞ ۝٤

৫. কোন জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না।

مَّا تَسۡبِقُ مِنۡ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَـٔۡخِرُونَ ۝٥

ওয়াসাল্লাম চার কোন বিশিষ্ট একটি ঘর আঁকলেন। তারপর তার মধ্যভাগ থেকে একটি রেখা এঁকে তা বৃত্তের বাইরে নিয়ে গেলেন। তারপর এ রেখার বাইরের অংশে ছোট ছোট কতগুলো রেখা আড়াআড়ি ভাবে মাঝ বরাবর আঁকলেন এবং বললেনঃ "এটা (মধ্যবিন্দু) হলো মানুষ, আর এর চারপাশে যে রেখা তাকে ঘিরে আছে দেখা যাচ্ছে সেটা তার আয়ূ। আর যে রেখা বাইরের দিকে চলে গেছে সেটা তার আশা-আকাংখা। আর এই যে, ছোট ছোট রেখাগুলো আছে সেগুলো তার বিপদাপদ বালা-মুসিবত। যদি কোন একটি থেকে বেঁচে যায় অপরটি তাকে জাপটে ধরে। তারপর এটা থেকে বেঁচে গেলেও অপরটি তাকে ঠিকই ধরে ফেলে। [বুখারীঃ ৬৪১৭]

(১) অচিরেই তারা জানতে পারবে তাদের ও তাদের কর্মকাণ্ডের পরিণাম কি হবে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতে সে পরিণামটি বলা হয়েছে, "বলুন, 'ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের ফিরে যাওয়ার স্থান।" [সূরা ইবরাহীম: ৩০] আরও এসেছে, "তোমরা খাও এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী, সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।" [সূরা আল-মুরসালাত: ৪৬-৪৭]

(২) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলছেন, তিনি কোন জনপদকে ঐ সময় পর্যন্ত ধ্বংস করেননি যতক্ষণ তাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেন নি। শুধু প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করাই নয় বরং তাদের জন্য একটি সময় অবশ্যই আছে সে সময়ও আসতে হয়েছে। তাদের সে সময়ের আগেও তাদের ধ্বংস করা হবে না, তাদের সে সময়ের পরেও তাদের ধ্বংস বিলম্বিত হবে না। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ কুফরী করার সাথে সাথেই আমি কখনো কোন জাতিকে পাকড়াও করিনি। তাদেরকে শুনবার, বুঝবার ও নিজেকে শুধরে নেবার জন্য অবকাশ দেয়া হবে। যতক্ষন এ অবকাশ থাকে এবং আমার নির্ধারিত শেষ সীমা না আসে ততক্ষন আমি ঢিল দিতে থাকি। এর মাধ্যমে মূলত: মক্কাবাসী কাফেরদেরকে সাবধান করা এবং তাদেরকে তাদের শির্ক, ইলহাদ ও গোয়ার্তুমী থেকে ফেরৎ আসারই আহ্বান জানানো হচ্ছে, যে শির্ক, ইলহাদ ও গোয়ার্তুমীর কারণে তারা ধ্বংসের উপযুক্ত হয়েছে। [ইবন কাসীর] এ তাফসীরের পক্ষে আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র বাণী: "আর আমি যতক্ষণ কোন রাসূল প্রেরণ না করব ততক্ষণ শাস্তিদাতা নই" [সূরা আল-ইসরা: ১৫; অনরূপ দেখুন, সূরা ইউনুস: ৪৯]

৬. আর তারা বলে, 'হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি যিকর[১] নাযিল হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ[২]।

وَقَالُوا يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝٦

৭. 'তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে আমাদের কাছে ফেরেশ্‌তাদেরকে উপস্থিত করছ না কেন?[৩]'

لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٧

৮. আমরা ফেরেশ্‌তাদেরকে যথার্থ কারণ ছাড়া প্রেরণ করি না; আর (ফেরেশ্‌তারা উপস্থিত হলে) তখন তারা আর অবকাশ পেত

مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا إِذًا مُّنظَرِينَ ۝٨

(১) যিকির বা বাণী শব্দটি পারিভাষিক অর্থে কুরআন মজীদে আল্লাহর বাণীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ বাণী হচ্ছে আগাগোড়া উপদেশমালায় পরিপূর্ণ। পূর্ববর্তী নবীদের ওপর যতগুলো কিতাব নাযিল হয়েছিল সেগুলো সবই "যিকির" ছিল এবং এ কুরআন মজীদও যিকির। যিকিরের আসল অর্থ হচ্ছে স্মরণ করিয়ে দেয়া, সতর্ক করা এবং উপদেশ দেয়া।

(২) তারা ব্যঙ্গ ও উপহাস করে একথা বলতো। [সা'দী] এ বাণী যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছে একথা তারা স্বীকারই করতো না। আর একথা স্বীকার করে নেয়ার পর তারা তাকে পাগল বলতে পারতো না। আসলে তাদের একথা বলার অর্থ ছিল এই যে, "ওহে, এমন ব্যক্তি! যার দাবী হচ্ছে, আমার ওপর যিকির তথা আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।" [ইবন কাসীর] এটা ঠিক তেমনি ধরনের কথা যেমন ফের'আউন মূসা আলাইহিসসালামের দাওয়াত শুনার পর তার সভাসদদের বলেছিলঃ "নিশ্চয় যে রাসূল তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে, অবশ্যই সে উন্মাদ।" [সূরা আশ-শু'আরাঃ ২৭]

(৩) তারা বলতঃ তুমি যদি মনে করে থাক যে তোমার কাছে আল্লাহ্‌র বাণী এসেছে তবে একথা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ফেরেশ্‌তাগণ এসে তা প্রমাণ করুন। নতুবা আমরা সেটা বিশ্বাস করছি না। এভাবে ফেরেশ্‌তা নাযিল করার দাবী কাফেরদের চিরাচরিত অভ্যাস। ফেরআউন বলেছিলঃ "মূসাকে কেন দেয়া হল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তার সঙ্গে কেন আসল না ফিরিশ্‌তাগণ দলবদ্ধভাবে?" [সূরা আয-যুখরুফঃ ৫৩] আরবের কাফেররাও বলেছিলঃ "যারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না তারা বলে, 'আমাদের কাছে ফিরিশ্‌তা নাযিল করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রব কে দেখি না কেন?' তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ২১]

না[১] ।

৯. নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক[২] ।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝٩

(১) অর্থাৎ নিছক তামাশা দেখাবার জন্য ফেরেশতাদেরকে অবতরণ করানো হয় না। কোন জাতি দাবী করলো, ডাকো ফেরেশতাদেরকে আর অমনি ফেরেশতারা হাযির হয়ে গেলেন, এমনটি হয় না। যখন কোন জাতির শেষ সময় উপস্থিত হয় এবং তার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা করার সংকল্প করে নেয়া হয় তখনই ফেরেশতাদেরকে পাঠানো হয়। তখন কেবলমাত্র ফায়সালা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে ফেলা হয়। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, এর অর্থ ফেরেশতাগণ রিসালত ও শাস্তি নিয়েই নাযিল হয়ে থাকেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ এই বাণী, যার বাহক সম্পর্কে তোমরা খারাপ মন্তব্য করছ, আল্লাহ্ নিজেই তা অবতীর্ণ করেছেন। তিনি একে কোন প্রকার বাড়তি বা কমতি, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হওয়া থেকে হেফাযত করবেন। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, “বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না---সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, স্বপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।” [সূরা ফুসসিলাত: ৪২] আরও বলেছেন, “নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই। কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন, তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই” [সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৭-১৯]। সুতরাং একে বিকৃত বা এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার সুযোগ ও তোমরা কেউ কোনদিন পাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং এর হেফাযত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। রিসালাত আমলের পর আজ চৌদ্দশ' বছর অতীত হয়ে গেছে। দ্বীনি ব্যাপারাদীতে মুসলিমদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কুরআনুল কারীম মুখস্ত করার ধারা বিশ্বের সর্বত্র পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখো লাখো বরং কোটি কোটি মুসলিম যুবক-বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকা, যাদের বক্ষ-পাঁজরে আগাগোড়া কুরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোন বড় থেকে বড় আলেমের সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষনাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবন ওয়াইনা এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, কুরআনুল কারীম যেখানে তাওরাত ও ইঞ্জীলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছেঃ ﴿بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ﴾ [সূরা আল-মায়েদাঃ ৪৪] অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জীলের হেফাযতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এ কারণেই যখন ইয়াহূদী ও নাসারাগণ হেফাযতের কর্তব্য পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেল। পক্ষান্তরে কুরআনুল কারীম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ অর্থাৎ “আমিই এর সংরক্ষক”

১০. আর অবশ্যই আপনার আগে আমরা আগেকার অনেক সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٠

১১. আর তাদের কাছে এমন কোন রাসূল আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত না।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١١

১২. এভাবেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে তা সঞ্চার করি[১],

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝١٢

১৩. এরা কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে না, আর অবশ্যই গত হয়েছে পূর্ববর্তীদের রীতি[২]।

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣

[সূরা আল-হিজরঃ৯]। সুতরাং এটি কখনও অসংরক্ষিত হওয়ার সুযোগ নেই। [কুরতুবী]

(১) সাধারণত অনুবাদক ও তাফসীরকারগণ এর অর্থ করেছেন: আমি তাকে প্রবেশ করাই বা চালাই। এর মধ্যকার (ه) সর্বনামটিকে বিদ্রূপ এর সাথে এবং (তারা এর প্রতি ঈমান আনে না) এর মধ্যকার সর্বনামটিকে এর সাথে সংযুক্ত করেছেন। তারা এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "আমি এভাবে এ বিদ্রূপকে অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেই এবং তারা এ বাণীর প্রতি ঈমান আনে না।" [সা'দী] যদিও ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী এতে কোন ত্রুটি নেই, তবুও ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী উভয় সর্বনামই "যিকির" বা বাণীর সাথে সংযুক্ত হওয়াই বেশী নির্ভুল বলে মনে হয়। [ফাতহুল কাদীর] আরবী ভাষায় (سلك) শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া অনুপ্রবেশ করানো, চালিয়ে দেয়া বা গলিয়ে দেয়া। যেমন সুঁইয়ের ছিদ্রে সূতো গলিয়ে দেয়া হয়। [কুরতুবী] কাজেই এ হিসেবে আয়াতের অর্থ, ঈমানদারদের মধ্যে তো এই "বাণী" হৃদয়ের শীতলতা ও আত্মার খাদ্য হয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু অপরাধীদের অন্তরে তা বারুদের মত আঘাত করে এবং তা শুনে তাদের মনে এমন আগুন জ্বলে ওঠে যেন মনে হয় একটি গরম শলাকা তাদের বুকে বিদ্ধ হয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। তাদের অন্তরে এ কুরআন ঢুকলেও তা সেখানে স্থান পায় না। সেখান থেকে শুধু মিথ্যারোপই বের হয়। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের রীতি চলে গেছে যে, তারা ঈমান আনেনি। আর আল্লাহ্‌ও তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের উপর আযাব নাযিল করেছেন। সুতরাং বর্তমানকালের কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থাও তদ্রূপ হবে, তারা ঈমান আনবে না, আর আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন। [জালালাইন, আইসারুত তাফাসীর, মুয়াসসার]

১৪. আর যদি আমরা তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেই অতঃপর তারা তাতে আরোহন করতে থাকে,

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫. তবুও তারা বলবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿١٥﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

১৬. আর অবশ্যই আমরা আকাশে বুরুজসমূহ সৃষ্টি করেছি(১) এবং দর্শকদের জন্য সেগুলোকে সুশোভিত করেছি(২);

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭. এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে আমরা সেগুলোকে সুরক্ষিত করেছি;

وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿١٧﴾

১৮. কিন্তু কেউ চুরি করে(৩) শুনতে

اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾

(১) بروج শব্দটি برج এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ও মজবুত ইমারত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ্, প্রমুখ তাফসীরবিদগণ এখানে بروج এর তাফসীরে 'বৃহৎ নক্ষত্র' উল্লেখ করেছেন। [তাবারী] সে হিসেবে আয়াতের অর্থ, আমি আকাশে বৃহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। সাধারণত: সূর্যের পরিভ্রমণ পথকে যে বারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, 'বুরুজ' শব্দটি দ্বারা এখানে তা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে বলে কোন কোন মুফাস্‌সির মনে করেছেন। হাসান বসরী ও কাতাদা এটিকে গ্রহ-নক্ষত্র অর্থে গ্রহণ করেছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অন্য এক স্থানে আকাশকে তারকারাজির সাহায্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার কথা বলেছেন। যেমনঃ "আমি কাছের আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি, [সূরা আস-সাফ্‌ফাতঃ ৬] "আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা" [সূরা আল-মুলকঃ ৫]

(৩) অর্থাৎ যেসব শয়তান তাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকদেরকে গায়েবের খবর এনে দেবার চেষ্টা করে থাকে, যাদের সাহায্যে অনেক জ্যোতিষী, গণক ও ফকির বেশধারী বহুরুপী অদৃশ্য জ্ঞানের ভড়ং দেখিয়ে থাকে, গায়েবের খবর জানার কোন একটি উপায়-উপকরণও আসলে তাদের আয়ত্বে নেই। তারা চুরি-চামারি করে কিছু শুনে নেবার চেষ্টা অবশ্যি করে থাকে।

চাইলে(১) প্রদীপ্ত শিখা(২) তার

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “মাঝে মাঝে ফিরিশ্‌তারা আকাশের নীচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আসমানের সংবাদাদী নিয়ে পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত এবং গণকদের কাছে তা গোপনে পৌঁছিয়ে দিত। গণকরা এগুলোর সাথে শত মিথ্যা নিজেদের পক্ষ থেকে জুড়ে দিয়ে তা বলে বেড়ায়”। [বুখারীঃ ৩২১০, ২২২৮] পরে উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আল্লাহ্ যখন আসমানে কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন তখন ফেরেশ্‌তাগণ তার নির্দেশের আনুগত্য স্বরূপ তাদের ডানাগুলোকে মারতে থাকে তাতে পাথরের উপর জিঞ্জির পড়ার মত শব্দ অনুভূত হয়। তারপর যখন তাদের অন্তর থেকে ভয়ভীতি দূর হয় তখন তারা বলতে থাকেঃ তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? তারাই আবার বলেঃ হক্ক বলেছেন, তিনি বড়, মহান। কান লাগিয়ে কথাচোরগণ এ কথোপকথন শুনতে পায়। আর এসব কান লাগিয়ে শ্রবণকারীগণ একটির উপর একটি থাকে। বর্ণনাকারী সুফিয়ান তার হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলেন। তিনি তার ডান হাতের আঙ্গুলগুলোকে ফাঁক করলেন এবং একটির উপর আর একটি স্থাপন করলেন। তারপর কখনো কখনো উজ্জল আলোর শিখা সে কান লাগিয়ে শ্রবণকারীকে তার সাথীর কাছে কথা পৌঁছানোর পূর্বেই আঘাতে করে জালিয়ে দেয়। আবার কখনো কখনো আলোর শিখা তার কাছে পৌঁছার আগেই সে তার নীচের সাথীকে তা পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে পৌঁছাতে পৌঁছাতে যমীন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তারপর যাদুকর বা গণকের মুখে রেখে দেয়। তখন সে যাদুকর তথা গণক সে সংবাদের সাথে শতটি মিথ্যা মিশ্রিত করে বর্ণনা করে। আর এভাবেই তার কোন কোন কথা সত্যে পরিণত হয়। তারপর লোকেরা বলতে থাকেঃ সে কি আমাদেরকে বলেনি যে, অমুক অমুক দিন এই সেই হবে, তারপর আমরা কি সঠিক পাইনি? আসলে সেটা ছিল ঐ বাক্য যা আসমান থেকে শোনা গিয়েছিল। [বুখারীঃ ৪৭০১]

(২) شهاب এর আভিধানিক অর্থ উজ্জ্বল আগুনের শিখা। এখানে বলা হয়েছে, ﴿شِهَابٌ مُّبِينٌ﴾ কুরআনের অন্য জায়গায় এজন্য ﴿شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [সূরা আস-সাফ্‌ফাতঃ ১০] আবার কোথায়ও বলা হয়েছে, ﴿شِهَابًا رَّصَدًا﴾ [সূরা আল-জিনঃ ৯] আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ জাহেলিয়াত যুগে অর্থাৎ ইসলাম-পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে? তারা বললেনঃ আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে কোন ধরণের অঘটন ঘটবে অথবা কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেনঃ এটা অর্থহীন ধারণা। কারো জন্ম-মৃত্যুর সাথে

পশ্চাদ্ধাবন করে।

১৯. আর যমীন, এটাকে আমরা বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি; এবং আমরা তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্‌গত করেছি সুপরিমিতভাবে[১],

وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْۢبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ⑲

২০. আর আমরা তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাদের রিযিকদাতা নও তাদের জন্যও[২]।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ⑳

২১. আর আমাদের কাছেই আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমরা তা পরিজ্ঞাত পরিমানেই নাযিল করে থাকি[৩]।

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ㉑

এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্য নিক্ষেপ করা হয়। [মুসলিমঃ ২২২৯]

(১) এর দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকেঃ এক অর্থ. প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। এ সব উৎপন্ন বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশেষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। দুই. যমীনে তিনি এমন জিনিস তৈরী করেছেন যা ওজন করা যায় এবং পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। [ইবন কাসীর]

(২) আর তিনি সেখানে তাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন যাদেরকে তোমরা রিযিক দাও না। যেমন দাস-দাসী, কর্মচারী, সন্তান-সন্ততি তাদের রিযক তো আল্লাহ্ই প্রদান করেন। অথবা আয়াতের অর্থ, আর এ যমীনের মধ্যে আমরা তোমাদের জন্য যেমন রিযিক রেখেছি তেমনি তাদের জন্যও রিযিক রেখেছি। তখন যমীনে যেগুলো আছে সবই এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমন, সমস্ত প্রাণী। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এখানে এ সত্যটি সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া হয়েছে যে, সবকিছুর খযীনা তো তাঁর কাছেই। خزينة বলা হয় এমন স্থানকে যেখানে মূল্যবান সামগ্রী হেফাযত করা হয়। খযীনা বলে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, যত কিছু হওয়া সম্ভব সবই তাঁর কাছে। তিনিই সেগুলোকে পরিমানমত অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে বৃষ্টি বোঝানো হয়েছে। কারণ, বৃষ্টির কারণে সেগুলো উৎপন্ন হয়। [ফাতহুল কাদীর] সুতরাং বায়ু, পানি, আলো, শীত, গ্রীষ্ম, জীব, জড়, উদ্ভিদ তথা প্রত্যেকটি জিনিস, প্রত্যেকটি প্রজাতি, প্রত্যেকটি শ্রেণী ও প্রত্যেকটি শক্তির জন্য একটি সীমা নির্ধারিত রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর নির্ধারিত সীমার বাইরে কেউ পেতে পারে না। আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন, "আর যদি আল্লাহ্

২২. আর আমরা বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু পাঠাই, তারপর আকাশ হতে পানি নাযিল করে তা তোমাদেরকে পান করতে দেই(১); অথচ তোমরা নিজেরা তা ভাণ্ডারে জমাকারী নও(২)।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾

তাঁর বান্দাদের রিয্‌ক প্রশস্ত করে দিতেন তবে তারা যমীনে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছেমত পরিমাণেই নাযিল করে থাকেন । নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও সর্বদ্রষ্টা” [সূরা আশ-শূরা:২৭]

(১) আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কুদরত কিভাবে সমুদ্রের পানিকে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌঁছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি বাতাস পাঠান, সেগুলো আকাশ থেকে পানি বয়ে নিয়ে যায়। তারপর মেঘের উপর দিয়ে যাওয়ার পরে সেটা এমনভাবে পড়ার মত হয় যেমন দোহানোর আগে জন্তুর দুধ পড়ার অবস্থা হয়। দাহহাক বলেন, আল্লাহ্ মেঘমালার উপর বায়ু পাঠান তখন সেটা এমনভাবে সেটাকে পরাগায়ণের মত করে যে, তা পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। [ইবন কাসীর] এর ব্যাখ্যা এভাবে করা যেতে পারে যে, তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেন। বাষ্পে বৃষ্টির উপকরণ বায়ু সৃষ্টি হয় এবং তা উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালার পানিভর্তি জাহাজে পরিণত করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এসব পানি পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌঁছে দিয়ে থাকেন। এরপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেয়ার আদেশ হয়েছে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তারা এই উড়ন্ত মেঘমালা থেকে সেখানে সে পরিমাণ পানি বর্ষণ করছে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ “তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক। তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তূন, খেজুর গাছ, দ্রাক্ষা এবং সব রকমের ফল। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।” [সূরা আন-নাহলঃ ১০-১১] “তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি--- যা দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে তা পান করাই।” [সূরা আল-ফুরকানঃ ৪৮-৪৯]

(২) এ আয়াতের দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকেঃ একঃ তোমরা এ পানির কোন ভাণ্ডারের মালিক নও যে তোমরা চাইলেই তা পাবে। এটা তো শুধু আমার পক্ষ থেকে দান করা। [ফাতহুল কাদীর] এ আয়াতে আল্লাহ্‌র কুদরতের ঐ ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী ও হিংস্র জানোয়ারদের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِۦ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَٰرِثُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. আর আমরাই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমরাই চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَـْٔخِرِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. আর অবশ্যই আমরা তোমাদের মধ্য থেকে যারা অগ্রগামী হয়েছে তাদেরকে জানি এবং অবশ্যই জানি তাদেরকে যারা পশ্চাতে গমনকারী[১]।

ও ধৌতকরণ এবং খেত-খামার ও উদ্যান সেচের জন্য বিনামূল্যে পানি পেয়ে যায়। কুপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারো কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। এক ফোঁটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং কারো কাছে তা দাবীও করা হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরা কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি ওটা বর্ষণ করি? [সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ ৬৮-৬৯]

দুই, দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে পানি নাযিল করান তা নাযিল করার পর তোমরা ইচ্ছে করলেই তা সংরক্ষন করে রাখতে পার না। [ফাতহুল কাদীর] যতক্ষন আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যবস্থা করে না দিবেন। কারণ তা নাযিল হওয়ার পর নষ্ট করে দেয়া, ব্যবহার উপযোগী না থাকা অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহ্ বলেন, "আমি ইচ্ছে করলে ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?" [সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ৭০] আরো বলেনঃ "এবং আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; তারপর আমি তা মাটিতে সংরক্ষিত করি; আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম।" [সূরা আল-মুমিনূনঃ ১৮] আরো বলেনঃ "অথবা তার পানি ভূগর্ভে হারিয়ে যাবে এবং তুমি কখনো সেটার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।" [সূরা আল-কাহফঃ ৪১] আরো বলেনঃ "বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি?" [সূরা আল-মুলকঃ ৩০]

(১) এখানে সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদদের পক্ষ থেকে اَلْمُسْتَقْدِمِينَ (অগ্রগামী দল) এবং اَلْمُسْتَأْخِرِينَ (পশ্চাদগামী দল) -এর তাফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে।

১) কাতাদাহ্ ও ইকরিমা বলেনঃ যারা পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে তারা অগ্রগামী। আর যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি, তারা পশ্চাদগামী।

২) ইবনে আব্বাস ও দাহ্হাক বলেনঃ যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা পশ্চাদগামী। [ফাতহুল কাদীর]

৩) মুজাহিদ বলেনঃ পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং উম্মতে মুহাম্মাদী পশ্চাদগামী। [ফাতহুল কাদীর]

৪) কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ ইবাদাতকারী ও সংকর্মশীলরা অগ্রগামী আর

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحۡشُرُهُمۡ ؕ اِنَّهٗ حَكِيۡمٌ عَلِيۡمٌ ﴿٢٥﴾

২৫. আর নিশ্চয় আপনার রব তাদেরকে সমবেত করবেন; নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ(১)।

তৃতীয় রুকূ'

وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ صَلۡصَالٍ مِّنۡ حَمَاٍ مَّسۡنُوۡنٍ ﴿٢٦﴾

২৬. আর অবশ্যই আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত কাদার শুষ্ক ঠনঠনে কালচে মাটি হতে(২),

গোনাহ্‌গাররা পশ্চাদগামী। [তাবারী; বাগভী]

(৫) সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, কুরতুবী, শা'বী প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে যারা সালাতের কাতারে অথবা জিহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগিয়ে থাকে তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পেছনে থাকে এবং দেরী করে, তারা পশ্চাদগামী। [ইবন কাসীর; বাগভী]

বলাবাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লেখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাদগামীতে পরিব্যপ্ত।

(১) অর্থাৎ তার অপার কর্মকুশলতা ও প্রজ্ঞার বলেই তিনি সবাইকে একত্র করবেন। আবার তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তার নাগালের বাইরে কেউ নেই। বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন মানুষের মাটি হয়ে যাওয়া দেহের একটি কণাও তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি আখেরাতের জীবনকে দূরবর্তী ও অবাস্তব মনে করে সে মূলত আল্লাহর প্রজ্ঞা ও কুশলতা সম্পর্কে বেখবর। আর যে ব্যক্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, মরার পরে যখন আমাদের মৃত্তিকার বিভিন্ন অণু-কণিকা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তখন আমাদের কিভাবে পুনর্বার জীবিত করা হবে, সে আসলে আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। এজন্যই যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহ্‌র কুদরতের সাথে শির্ক করে। এটা শির্ক ফির রবুবিয়াহ। [দেখুন, আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস]

(২) মানুষের আদি উৎস সম্পর্কে কুরআন বলছে, সরাসরি মৃত্তিকার উপাদান থেকে তার সৃষ্টিকর্ম শুরু হয়। ﴿صَلۡصَالٍ مِّنۡ حَمَاٍ مَّسۡنُوۡنٍ﴾ "শুকনো কালো ঠনঠনে পচা মাটি" শব্দাবলীর মাধ্যমে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে। حمأ বলতে আরবী ভাষায় এমন ধরনের কালো কাদা মাটিকে বুঝায় যার মধ্যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যাকে আমরা নিজেদের ভাষায় পংক বা পাঁক বলে থাকি অথবা অন্য কথায় বলা যায়, যা মাটির গোলা বা মন্ড হয়ে গেছে। [সা'দী] مسنون শব্দের দুই অর্থ হয়। একটি অর্থ, পরিবর্তিত, অর্থাৎ এমন পচা, যার মধ্যে পচন ধরার ফলে চকচকে ও তেলতেলে ভাব সৃষ্টি হয়ে গেছে। [সা'দী] আর দ্বিতীয় অর্থ, চিত্রিত। অর্থাৎ যা একটি নির্দিষ্ট আকৃতি ও কাঠামোতে রুপান্তরিত

২৭. আর এর আগে আমরা সৃষ্টি করেছি জিনদেরকে অতি উষ্ণ[১] নির্ধুম আগুন থেকে।

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

২৮. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশ্‌তাদেরকে বললেন, নিশ্চয় আমি গন্ধযুক্ত কাদার শুষ্ক ঠন্‌ঠনে কালচে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি;

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٨﴾

২৯. অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করব[২] তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়ো[৩],

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٢٩﴾

হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] صلصال বলা হয় এমন পচা কাদাকে যা শুকিয়ে যাওয়ার পর ঠনঠন করে বাজে। [এর জন্য আরও দেখুন, বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] এ শব্দাবলী থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, গাঁজানো কাদা মাটির গোলা বা মন্ড থেকে প্রথমে প্রথম মানুষকে বানানো হয় এবং তা তৈরী হবার পর যখন শুকিয়ে যায় তখন তার মধ্যে প্রাণ ফুঁকে দেয়া হয়।

(১) سموم বলা হয় গরম বাতাসকে। [বাগভী] আর আগুনকে সামুমের সাথে সংযুক্ত করার ফলে এর অর্থ হয় আগুনের প্রখর উত্তাপ। [সা'দী] কুরআনের যেসব জায়গায় জিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াত থেকে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে যায়।

(২) এ থেকে জানা যায়, মানুষের মধ্যে যে রুহ ফুঁকে দেয়া হয় অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চার করা হয় তা মূলতঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকৃত রুহ বা নির্দেশ বিশেষ। এ সম্পর্কটি সম্মানের জন্য করা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌র কোন অংশ সৃষ্টির কারো কাছে নেই। [ফাতহুল কাদীর] মূলত: সৃষ্টির মধ্যে যেসব গুণের সন্ধান পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটিরই উৎস ও উৎপত্তিস্থল আল্লাহরই কোন না কোন গুণ। যেমন হাদীসে বলা হয়েছেঃ "মহান আল্লাহ রহমতকে একশো ভাগে বিভক্ত করেছেন। তারপর এর মধ্য থেকে ৯৯ টি অংশ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এবং মাত্র একটি অংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। এই একটি মাত্র অংশের বরকতেই সমুদয় সৃষ্টি পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়। এমনকি যদি একটি প্রাণী তার নিজের সন্তান যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এ জন্য তার ওপর থেকে নিজের নখর উঠিয়ে নেয় তাহলে এটিও আসলে এ রহমত গুণের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি" [বুখারী ৬০০০, মুসলিমঃ ২৭৫২]

(৩) এ সিজদা কোন ইবাদতের সিজদা ছিল না বরং সম্মানসূচক ছিল [বাগভী; ফাতহুল

৩০. অতঃপর ফেরেশ্‌তাগণ সবাই একত্রে সিজ্‌দা করল,

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. ইবলীস ছাড়া, সে সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।

إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبٰٓى أَن يَكُونَ مَعَ السّٰجِدِينَ ﴿٣١﴾

৩২. আল্লাহ্ বললেন, 'হে ইবলীস! তোমার কি হল যে, তুমি সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?'

قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السّٰجِدِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. সে বলল, 'আপনি গন্ধযুক্ত কাদার শুষ্ক ঠন্‌ঠনে কালচে মাটি হতে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজ্‌দা করার নই।'

قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُۥ مِن صَلْصٰلٍ
مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. তিনি বললেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কারণ নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত;

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৫. আর নিশ্চয় প্রতিদান দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রইল লা'নত।

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلٰى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾

৩৬. সে বলল, হে আমার রব! যেদিন তাদের পুনরুত্থান করা হবে সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের একজন,

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮. সুনির্দিষ্ট সময় আসার দিন পর্যন্ত।

إِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾

৩৯. সে বলল, 'হে আমার রব! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন সে জন্য অবশ্যই আমি যমীনে মানুষের কাছে পাপকাজকে শোভন করে তুলব এবং

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى
الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

কাদীর] যেমনটি আমাদের সালামের বেলায় হয়ে থাকে। যার প্রকৃত স্বরূপ কেমন ছিল তা আমরা জানি না। [আল-মানার]

অবশ্যই আমি তাদের সবাইকে বিপথ গামী করব[১],

৪০. তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া[২] ।

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝٤٠

৪১. আল্লাহ্‌ বললেন, এটাই আমার কাছে পৌঁছার সরল পথ ।

قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝٤١

৪২. বিভ্রান্তদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে সে ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকবে না[৩];

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝٤٢

---

(১) অর্থাৎ যেভাবে তুমি এ নগণ্য ও হীন সৃষ্টিকে সিজদা করার হুকুম দিয়ে আমাকে আপনার হুকুম অমান্য করতে বাধ্য করেছো ঠিক তেমনিভাবে এ মানুষদের জন্য আমি দুনিয়াকে এমন চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর জিনিসে পরিণত করে দেবো যার ফলে তারা সবাই এর দ্বারা প্রতারিত হয়ে আপনার নাফরমানী করতে থাকবে, আখেরাতের জবাবদিহির কথা ভুলে যাবে। অথবা আয়াতের অর্থ, নাফরমানিকে তাদের কাছে এমন চিত্তাকর্ষক করে তুলব যে, তারা আপনার নির্দেশ ভুলে যাবে। [ফাতহুল কাদীর] ইবলীসের এ ঘোষণা কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এসেছে। [যেমন, সূরা আল-আ'রাফঃ ১৬-১৭, সূরা আন-নিসাঃ ১১৮, সূরা আল-ইসরাঃ ১৬২] শয়তান তার এ সমস্ত দাবীকে অনেকটাই সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেনঃ "তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল"। [সূরা সাবাঃ ২০]

(২) এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ, তোমার জোর খাটবে শুধুমাত্র এমন বিপথগামীদের ওপর যারা তোমাকে অনুসরণ করবে। আমার সত্যিকার বান্দাদের উপর তোমার কোন জোর খাটবে না। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যারা ইখলাসের সাথে ইবাদাত করবে, অন্য কোন দিকে তাকাবে না, তাদের উপর তোমার কোন প্রভাব কাজ করবে না। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানী কারসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বর্ণিত আদমের কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুরআন বলেঃ ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ [সূরা আলে-ইমরানঃ ১৫৫] এ থেকে জানা যায়া যে, সাহাবায়ে কেরামের উপরও শয়তানের ধোঁকা এক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দাদের

৪৩. আর নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সবারই প্রতিশ্রুত স্থান,

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪. 'সেটার সাতটি দরজা আছে(১), প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্য (শয়তানের অনুসারীদের) নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে(২) ।'

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

চতুর্থ রুকূ'

৪৫. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও প্রস্রবণসমূহের মধ্যে ।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

উপর শয়তানের আধিপত্য বিস্তৃত না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তিস্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য বিস্তৃত হয় না যে, তারা তাদের নিজ ভ্রান্তি কোন সময় বুঝতেই পারেন না; ফলে তওবা করার শক্তি হয় না কিংবা কোন ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্ করে ফেলেন । উল্লেখিত ঘটনাবলী এ তথ্যের পরিপন্থী নয় । কারণ, আদম ও হাওয়া তওবা করেছিলেন এবং তা মাফ করা হয়েছিল । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে, তাছাড়া এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসও রয়েছে । [দেখুনঃ সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৪৬৬৩] এ গুলো অপরাধ অনুসারে শাস্তি দেয়ার জন্য একই জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর । আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জাহান্নামের দরজা সাতটি, সেগুলো একটির উপরে আরেকটি । প্রথমটি পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয়টি তারপর তৃতীয়টি, এভাবে সবগুলো পূর্ণ হবে । ইকরিমা বলেন, জাহান্নামের সাত দরজার অর্থ, সাত তলা । ইবন জুরাইজ বলেন, প্রথমটি জাহান্নাম, দ্বিতীয়টি লাযা, তৃতীয়টি হুতামা, চতুর্থটি সা'য়ীর, পঞ্চমটি সাকার, ষষ্ঠটি জাহীম, আর সপ্তমটি হা-ওয়ীয়াহ । [ইবন কাসীর]

(২) যেসব গোমরাহী ও গোনাহের পথ পাড়ি দিয়ে মানুষ নিজের জন্য জাহান্নামের পথের দরজা খুলে নেয় সেগুলোর প্রেক্ষিতে জাহান্নামের এ দরজাগুলো নির্ধারিত হয়েছে । যেমন কেউ নাস্তিক্যবাদের পথ পাড়ি দিয়ে জাহান্নামের দিকে যায় । কেউ যায় শির্কের পথ পাড়ি দিয়ে, কেউ মুনাফিকীর পথ ধরে, কেউ প্রবৃত্তি পূজা, কেউ অশ্লীলতা ও ফাসেকী, কেউ জুলুম, নিপীড়ন ও নিগ্রহ, আবার কেউ ভ্রষ্টতার প্রচার ও কুফরীর প্রতিষ্ঠা এবং কেউ অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের প্রচারের পথ ধরে জাহান্নামের দিকে যায় । আবার জাহান্নামেও তাদের শাস্তির পর্যায় হবে ভিন্ন ভিন্ন । হাদীসে এসেছে, "তাদের কাউকে কাউকে আগুন দু গোড়ালী পর্যন্ত আক্রমন করবে । আবার কারো কারো হবে কোমর পর্যন্ত । আর কারো কারো গর্দান পর্যন্ত পাকড়াও করবে" । [মুসলিমঃ ২৮৪৫]

ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা শান্তিতে নিরাপত্তার সাথে এতে প্রবেশ কর(১) ।'

وَنَزَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنۡ غِلٍّ إِخۡوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٖ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর আমরা তাদের অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করব(২); তারা ভাইয়ের মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে(৩),

(১) এখানে জান্নাতীদের সওয়াবকে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র আরো বিস্তারিতভাবে এসেছে, কোথায়ও বলা হয়েছে, " নিশ্চয় সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে, উপভোগ করবে তা যা তাদের রব তাদেরকে দেবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।" [সূরা আয-যারিয়াতঃ ১৫-১৯] এ আয়াতগুলোতে তাদের জান্নাতে যাওয়ার কিছু কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র আরো বলেছেনঃ "মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে--- উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তারা পরবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে; আমি তাদেরকে সংগিনী দান করব আয়তলোচনা হূর, সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন- আপনার রব নিজ অনুগ্রহে। এটাই তো মহাসাফল্য।"[সূরা আদ-দুখানঃ ৫১-৫৭]

(২) অর্থাৎ সৎ লোকদের মধ্যে পারস্পারিক ভুল বুঝাবুঝির কারণে দুনিয়ার জীবনে যদি কিছু মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করার সময় তা দূর হয়ে যাবে এবং পরস্পরের পক্ষ থেকে তাদের মন একেবারে পরিস্কার করে দেয়া হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "মু'মিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার পর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি পুলের কাছে আটকানো হবে। সেখানে দুনিয়াতে তাদের একজন অপরজনের উপর যে সমস্ত অত্যাচার করেছে সেগুলোর কেসাস নেয়া হবে। তারপর যখন তারা সম্পূর্ণভাবে সাফ ও স্বচ্ছ হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে ঢুকার অনুমতি দেয়া হবে। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তাদের প্রত্যেকে দুনিয়ায় তাদের অবস্থানস্থলের চেয়েও বেশী ভালোভাবে জান্নাতে তাদের অবস্থানস্থলের পথ পেয়ে যাবে।" [বুখারীঃ ৬৫৩৫]

(৩) বলা হচ্ছে যে, জান্নাতবাসীগণ আসনে অবস্থান করবে। একে অপরের মুখোমুখি হয়ে আনন্দিত অবস্থায় বসবে। কুরআনের অন্যত্র এ আসনগুলোর বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে; এবং অল্প সংখ্যক

৪৮. সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিস্কৃতও হবে না[১]।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে। স্বর্ণ-খচিত আসনে ওরা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।" [সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ১৩-১৬] আরো বলা হয়েছে, "ওরা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে।" [সূরা আর-রাহমানঃ ৭৬] আরো বলা হয়েছে, "সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা, প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র, সারি সারি উপাধান, এবং বিছানা গালিচা"। [সূরা আল-গাশিয়াহঃ ১১-১৬]

(১) এ আয়াত থেকে জান্নাতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জানা গেলঃ
প্রথমতঃ সেখানে কেউ কোন ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করবে না। অন্য আয়াতেও তা বলা হয়েছে, "যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।" [সূরা সাবাঃ ৩৫] দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই, বিশেষ আরাম এমনকি চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোন না কোন সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতা অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক না কেন।
দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নেয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোন সময় হ্রাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিস্কৃতও করা হবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ﴾ অর্থাৎ, "এ হচ্ছে আমাদের রিয্‌ক, যা কোন সময় শেষ হবে না। [সূরা সোয়াদঃ ৫৪] আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ অর্থাৎ, তাদেরকে কোন সময় এসব নেয়ামত ও সুখ থেকে বহিস্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিপরীত। এখানে যদি কেউ কাউকে কোন বিরাট নেয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয়, তবুও সদাসর্বদা এ আশঙ্কা লেগেই থাকে যে, দাতা কোন্ সময় আবার নারাজ হয়ে তাকে বের করে দেয়। নিম্নলিখিত হাদীস থেকেও এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেনঃ "জান্নাতবাসীদেরকে বলে দেয়া হবে, এখন তোমরা সবসময় সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। এখন তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না। এখন তোমরা চির যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। এখন হবে চির অবস্থানকারী, কখনো স্থান ত্যাগ করতে হবে না।" [মুসলিমঃ ২৮৩৭] এর আরো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এমন সব আয়াত ও হাদীস থেকে যেগুলোতে বলা হয়েছে জান্নাতে নিজের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্য মানুষকে কোন শ্রম করতে হবে না। বিনা প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রম ছাড়াই সে সবকিছু পেয়ে যাবে।

৪৯. আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয় আমিই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٤٩

৫০. আর নিশ্চয় আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি!

وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۝٥٠

৫১. আর তাদেরকে বলুন, ইব্‌রাহীমের অতিথিদের কথা,

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۝٥١

৫২. যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম', তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আমরা তোমাদের ব্যাপারে শংকিত।

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۝٥٢

৫৩. তারা বলল, 'ভয় করবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি(১)।'

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝٥٣

৫৪. তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ(২)?'

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ۝٥٤

তৃতীয়তঃ আরেকটি সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নেয়ামত শেষ হবে না এবং জান্নাতীকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ট হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়? কুরআনুল কারীম এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাকচ করে দিয়েছেঃ ﴿لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [সূরা আল-কাহ্‌ফঃ ১০৮] অর্থাৎ, তারাও সেখান থেকে ফিরে আসার বাসনা কোন সময়ই পোষণ করবে না।

(১) অর্থাৎ ইসহাক আলাইহিস্ সালামের জন্মের সুসংবাদ। কারণ ইসমাঈল আলাইহিসসালাম এর পূর্বেই অন্য স্ত্রীর ঘরে দুনিয়ায় এসেছিলেন। [ইবন কাসীর]

(২) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ প্রশ্নটি ছিল অতিশয় আশ্চর্য থেকে। তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আর আমার স্ত্রীও বৃদ্ধা সুতরাং কিভাবে আমাদেরকে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন? [বাগভী]

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তারা বলল, 'আমরা সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি; কাজেই আপনি হতাশ হবেন না।'

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তিনি বললেন, 'যারা পথভ্রষ্ট তারা ছাড়া আর কে তার রবের অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. তিনি বললেন, 'হে প্রেরিত(ফেরেশ্‌তা) গণ! তোমাদের আর বিশেষ কি উদ্দেশ্য আছে?'

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. তারা বলল, 'নিশ্চয় আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে---

اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তবে লূতের পরিবারের বিরুদ্ধে নয়[১], আমরা তো অবশ্যই তাদের সবাইকে রক্ষা করব,

اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে নয়; আমরা স্থির করেছি যে, নিশ্চয় সে পিছনে অবস্থানকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত।'

পঞ্চম রুকূ'

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ۨالْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. অতঃপর ফেরেশ্‌তাগণ যখন লূত পরিবারের কাছে আসল,

قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. তখন লূত বললেন, 'তোমরা তো অপরিচিত লোক'।

قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. তারা বলল, 'না, তারা যে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল আমরা আপনার কাছে

(১) এখানে পরিবারবর্গ বলে লূত আলাইহিস সালাম, তার পরিবারের ঈমানদার ও তার অনুগামী, অনুসারী সকল মুমিনকেই বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] এর থেকে আরও বোঝা গেল যে, 'آل' শব্দটি أهل থেকেও ব্যাপক।

তা'ই নিয়ে এসেছি;

৬৪. আর আমরা আপনার কাছে সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী;

وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. কাজেই আপনি রাতের কোন এক সময়ে আপনার পরিবারবর্গকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন এবং আপনি তাদের পিছনে চলুন[১]। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনে না তাকায়[২]; তোমাদেরকে যেখানে যেতে বলা হয়েছে তোমরা সেখানে চলে যাও[৩]।'

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. আর আমরা তাকে এ বিষয়ে ফয়সালা জানিয়ে দিলাম যে, নিশ্চয় তাদেরকে ভোরে সমূলে বিনাশ করা হবে।

وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰۤؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. আর নগরবাসী উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হল।

وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٦٧﴾

---

(১) অর্থাৎ নিজের পরিবারবর্গের পেছনে পেছনে এ জন্য চলুন যেন তাদের কেউ থেকে যেতে না পারে। তাদের হেফাযত করা সম্ভব হয়। [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও যুদ্ধে যোদ্ধাদের পিছনে থাকতেন। দূর্বলদের হাঁকিয়ে নিয়ে যেতেন, আর পথের বাহনের অভাবীকে বহন করে নিয়ে যেতেন। [দেখুন, আবু দাউদ: ২৬৩৯]

(২) অর্থাৎ যখন তোমরা শব্দ শুনবে তখন তোমরা পিছনে তাদের দিকে তাকিও না। তাদের আযাবে তাদেরকে থাকতে দাও [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এটা ছিল কাওমে লূতের ঈমানদারদের চিহ্ন যে তারা পিছনে ফিরে তাকাবে না। [বাগভী]

(৩) মনে হয় যেন তাদের সাথে এমন কেউ ছিল যে তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। [ইবন কাসীর] ইবন আব্বাস বলেন, তাদেরকে শাম দেশে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। মুকাতিল বলেন, যগর নামক স্থানে তাদের যাওয়ার নির্দেশ ছিল। কেউ কেউ বলেন, জর্দান। [বাগভী]

৬৮. তিনি বললেন, নিশ্চয় এরা আমার অতিথি; কাজেই তোমরা আমাকে বেইয্‌যত করো না ।

قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَآءِ ضَيْفِى فَلَا تَفْضَحُونِ ۝٦٨

৬৯. আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমাকে হেয় করো না।’

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ۝٦٩

৭০. তারা বলল, আমরা কি দুনিয়াসুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করিনি?

قَالُوٓا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَٰلَمِينَ ۝٧٠

৭১. লূত বললেন, একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তবে আমার এ কন্যারা রয়েছে(১) ।

قَالَ هَٰؤُلَآءِ بَنَاتِىٓ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ۝٧١

৭২. আপনার জীবন(২), নিশ্চয় তারা তাদের নেশায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছিল ।

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝٧٢

৭৩. অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় প্রকাণ্ড চীৎকার তাদেরকে পাকড়াও করল;

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۝٧٣

(১) সূরা হূদ-এর ৮৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

(২) এ কালেমাটির দু’টি অর্থ রয়েছে, কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন এই যে, এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শপথ করেছেন । এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে । ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত এমন কোন আত্মা সৃষ্টি ও পয়দা করেন নি । আমি আল্লাহকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারও নামে শপথ করতে শুনিনি । [ইবন কাসীর] এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর যে কোন সৃষ্টজীবের কসম বা শপথ করতে পারেন । কারণ এর মাধ্যমে তিনি সেটাকে সম্মানিত করেন । কিন্তু বান্দার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমেই শপথ করা যায় । নতুবা তা শির্কে পরিণত হয় ।

তাছাড়া, কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াতের অর্থ করেছেন যে, এখানে শপথ উদ্দেশ্য নয় । বরং এটা আরবী ব্যবহার বিধির একটি নিয়ম । এটা দ্বারা কসম বা শপথ উদ্দেশ্য না হয়ে কথায় জোর দেয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । [তাবারী]

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

৭৪. তাতে আমরা জনপদকে উল্টিয়ে উপর-নীচ করে দিলাম এবং তাদের উপর পোড়ামাটির পাথর-কংকর বর্ষণ করলাম।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর নিশ্চয় তা লোক চলাচলের পথের পাশেই বিদ্যমান[১]।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ﴿لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾ শব্দটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. মুজাহিদ ও দাহহাক বলেন, এর অর্থ চিহ্নিত জনপদে পরিণত হয়েছে। কাতাদা বলেন, স্পষ্ট পথে। কাতাদা থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, যমীনের এক প্রান্তে। [ইবন কাসীর] ইবনে কাসীর আরও বলেন, এই সাদূম জনপদটিতে যে বিপদ ঘটে গেছে, যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন পরিবর্তন ঘটেছে, পাথর নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তা পঁচা দুর্গন্ধময় খারাপ সাগরে পরিণত হয়েছে, যা আজও একই অবস্থায় বিদ্যমান। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা তো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাক সকালে ও সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা বোঝ না?" [সূরা আস-সাফফাত: ১৩৭-১৩৮] কারণ, আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এ জনপদ অবস্থিত। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন, এগুলোতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এসব জনপদ সম্পর্কে আরো বলেছেন যে, ﴿لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ অর্থাৎ এসব জনপদ আল্লাহ্‌র আযাবের ফলে জনশূন্য হওয়ার পর সামান্য কিছু ছাড়া বাকীগুলো পুনর্বার আবাদ হয়নি।
এ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়ীকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষার উপকরণ করেছেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আলাহ্‌র ভয়ে তার মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারীর উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। [দেখুন, ইবন হিব্বান: ৬১৯৯] তার এ কর্মের ফলে একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা এই যে, যেসব স্থানে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা খুবই পাষাণ হৃদয়ের কাজ। বরং সেগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, সেখানে পৌঁছে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির কথা চিন্তা করতে হবে এবং অন্তরে তাঁর আযাবের ভীতি সঞ্চার করতে হবে।
কুরআনুল কারীমের বক্তব্য অনুযায়ী লূত 'আলাইহিস্ সালামের ধ্বংসপ্রাপ্ত

৭৭. নিশ্চয় এতে মুমিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮. আর 'আইকা'বাসীরা[1]ও তো ছিল সীমালংঘনকারী,

وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾

৭৯. অতঃপর আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, আর এ জনপদ দু'টিই প্রকাশ্য পথের পাশে অবস্থিত।

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾

ষষ্ঠ রুকূ'

৮০. আর অবশ্যই হিজ্‌রবাসীরা[2] রাসূলের

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾

জনপদসমূহ আজো আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট নীচের দিকে একটি বিরাট এলাকা নিয়ে রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে বিশেষ এক প্রকার পানি সাগরের আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণী জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যেই একে 'মৃত সাগর' ও 'লূত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তেল জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান এবং লবনের পরিমাণও; তাই এতে কোন সামুদ্রিক প্রাণী জীবিত থাকতে পারে না।

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালান-কোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। আখেরাত থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। তারা নিছক তামাশা হিসেবে এসব এলাকা দেখার জন্য গমন করে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কুরআনুল কারীম অবশেষে বলেছেঃ ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ অর্থাৎ, এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুমিনদের জন্য শিক্ষাদায়ক। একমাত্র ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

(১) আইকাবাসীগণ শু'আইব আলাইহিস্‌সালামের উম্মত। তাদের প্রকৃত পরিচয় কি তা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আস-শু'আরাতে তাদের কর্মকাণ্ড ও তাদের উপর আপতিত আযাবের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। [সূরা আস-শু'আরাঃ ১৭৬-১৯১]

(২) তারা হলো সালেহ আলাইহিস্‌সালামের জাতি। তারা যা যা করত এবং তাদের উপর কি কি আযাব এসেছিল তা এস্থান ছাড়াও কুরআনের অন্যান্য স্থানে আলোচনা

প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল;

৮১. আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিল।

وَاٰتَیۡنٰهُمۡ اٰیٰتِنَا فَکَانُوۡا عَنۡهَا مُعۡرِضِیۡنَ ﴿۸۱﴾

৮২. আর তারা পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করত নিরাপদে।

وَکَانُوۡا یَنۡحِتُوۡنَ مِنَ الۡجِبَالِ بُیُوۡتًا اٰمِنِیۡنَ ﴿۸۲﴾

৮৩. অতঃপর ভোরে বিকট চীৎকার তাদেরকে পাকড়াও করল।

فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّیۡحَۃُ مُصۡبِحِیۡنَ ﴿۸۳﴾

৮৪. কাজেই তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি[১]।

فَمَاۤ اَغۡنٰی عَنۡهُمۡ مَّا کَانُوۡا یَکۡسِبُوۡنَ ﴿۸۴﴾

৮৫. আর আসমান, যমীন ও তাদের মাঝে অবস্থিত কোন কিছুই যথার্থতা ছাড়া সৃষ্টি করিনি[২] এবং নিশ্চয় কিয়ামত আসবেই। কাজেই আপনি পরম সৌজন্যের সাথে ওদেরকে ক্ষমা করুন[৩]।

وَمَا خَلَقۡنَا السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَمَا بَیۡنَهُمَاۤ اِلَّا بِالۡحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَۃَ لَاٰتِیَۃٌ فَاصۡفَحِ الصَّفۡحَ الۡجَمِیۡلَ ﴿۸۵﴾

করা হয়েছে। [দেখুন, সূরা আল-আ'রাফঃ ৭৩-৭৮, সূরা হূদঃ ৬১-৬৮, সূরা আস-শু'আরাঃ ১৪১-১৫৯]

(১) অর্থাৎ তারা পাহাড় কেটে কেটে তার মধ্যে যেসব আলীশান ইমারত নির্মাণ করেছিল। তারা যে সমস্ত ক্ষেত-খামার, ফল-ফলাদির জন্য উষ্ট্রীটি হত্যা করেছিল, যাতে তাদের পানিতে ঘাটতি না পড়ে, তাদের এ সমস্ত সম্পদ যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসল তখন তাদেরকে কোন প্রকারে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। [ইবন কাসীর]

(২) পৃথিবী ও আকাশের সমগ্র ব্যবস্থা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাতিলের ওপর নয়। বিশ্ব জাহান আল্লাহ্ তা'আলা অনাহূত সৃষ্টি করেন নি। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা বলেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?' সুতরাং আল্লাহ্ মহিমান্বিত, প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোন হক্ক ইলাহ্ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব।" [সূরা আল-মুমিনূন: ১১৫-১১৬] তারপর কিয়ামত সংঘটিত হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী সেটা বলেছেন।

(৩) কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াতের নির্দেশ হলো, সৌজন্যমূলকভাবে তাদেরকে

৮৬. নিশ্চয় আপনার রব, তিনিই মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী(১) ।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

৮৭. আর আমরা তো আপনাকে দিয়েছি পুনঃ পুনঃ পঠিত সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন(২) ।

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

ক্ষমা করে দেয়া । এ নির্দেশ পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে । এখন শুধু "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং "মুহাম্মাদুররাসূলুল্লাহ" এ কালেমাই তাদের থেকে গ্রহণ করা হবে । [তাবারী] আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, সুতরাং আপনি তাদেরকে সুন্দরভাবে এড়িয়ে যান । [জালালাইন]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা যে আখেরাতের পূনর্বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন তাই প্রমাণ করছে । কারণ তিনি যদি মহান স্রষ্টাই হয়ে থাকেন তবে তার জন্য পূনর্বার সৃষ্টি করা কোন ব্যাপারই নয় । তদুপরি তিনি সর্বজ্ঞানী । তিনি জানেন যমীন তাদের কোন অংশ নষ্ট করেছে এবং তা কোথায় আছে । সুতরাং যিনি মহাস্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী তিনি অবশ্যই পূনরায় সবাইকে সৃষ্টি করতে পারবেন । অন্য আয়াতে আমরা এ কথারই প্রতিধ্বনি পাচ্ছি । যেখানে বলা হয়েছেঃ "যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ । তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়" । [সূরা ইয়াসীনঃ ৮১-৮২]

(২) অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত । এর প্রমাণ হলো আবু সাঈদ আল-মু'আল্লা বর্ণিত হাদীস । তিনি বলেনঃ আমি সালাত আদায় করছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছ দিয়ে গমন করার সময় আমাকে ডাকলেন । আমি আসলাম না । সালাত শেষ করে তার কাছে আসলে তিনি বললেনঃ আমার ডাকে সাড়া দিতে তোমাকে কে নিষেধ করল? আমি বললামঃ আমি সালাত আদায় করছিলাম । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "আল্লাহ্ কি বলেননিঃ হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিও"? তারপর তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা কি তা জানিয়ে দেব না? তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদ থেকে বের হতে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বললেনঃ "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" এটাই "সাব'উল মাসানী" বা সাতটি আয়াত যা বার বার পড়া হয়, এবং কুরআনে কারীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে ।" [বুখারীঃ ৪৭০৩] অন্য বর্ণনায় আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "উম্মুল কুরআন" বা সূরা আল-ফাতিহা হলো "সাব'উল মাসানী" এবং মহান কুরআন । [বুখারীঃ ৪৭০৪]

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি আপনি কখনো আপনার দুচোখ প্রসারিত করবেন না(১)। তাদের জন্য আপনি দুঃখ করবেন না(২); আপনি

তবে কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন দু'শ আয়াত বিশিষ্ট সাতটি বড় বড় সূরা। অর্থাৎ আল-বাকারাহ, আলে ইমরান, আন-নিসা, আল-মায়েদাহ, আল-আন'আম, আল-আ'রাফ ও ইউনুস অথবা আল-আনফাল ও আত্‌তাওবাহ। [বাগভী; ইবন কাসীর] কিন্তু পূর্ববর্তী আলেমগণের অধিকাংশই এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে সূরা ফাতিহার কথাই বলা হয়েছে। যা সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীসের ভাষ্যসমূহ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, এখানে মহান কুরআন বলেও সূরা আল-ফাতিহাকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। সে হিসেবে সূরা ফাতেহাকে 'মহান কুরআন' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা এক দিক দিয়ে সমগ্র কুরআন। কেননা ইসলামের সব মূলনীতি এতে ব্যক্ত হয়েছে। [কুরতুবী] যদিও কোন কোন মুফাসসিরের মতে, কুরআনকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করার অর্থ হলো, "আমরা আপনাকে সাব'উল মাসানী" সূরা ফাতেহা এবং পূর্ণ কুরআন দান করেছি। তখন দু'টির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হবে।

(১) একথাটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথীদেরকে সান্তনা দেবার জন্য বলা হয়েছে। তখন এমন একটা সময় ছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথীরা চরম দুরবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন। অন্যদিকে কুরাইশ সরদাররা পার্থিব অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে সবরকমের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিল। এ অবস্থায় বলা হচ্ছে, আপনার মন হতাশাগ্রস্ত কেন? আপনাকে আমি এমন সম্পদ দান করেছি যার তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তুচ্ছ। আপনাকে কুরআন প্রদান করে আমরা মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছি।

(২) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের অবাধ্যতায় হতাশ ও পেরেশান না হতে বলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদেরকে দাওয়াত দিয়েই যাচ্ছিলেন কিন্তু তারা নিজেদের সম্পদ ও প্রতিপত্তিতে এতই মগ্ন ছিল যে, হক্কের বাণী তাদের কানে প্রবেশ করতো না। তারা ঈমান আনছিল না। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারপরনাই পেরেশান হয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সান্তনা দিচ্ছেন যে, আপনার এত পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আপনি সাথে নিয়ে এগিয়ে চলুন এবং বলুন যে, আমি তো প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র। হেদায়েতের চাবিকাঠি তো আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যাকে চান হেদায়াত দান করবেন।

মুমিনদের জন্য আপনার বাহু নত করুন,

৮৯. এবং বলুন, 'নিশ্চয় আমিই প্রকাশ্য সতর্ককারী।' وَقُلْ إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

৯০. যেভাবে আমরা নাযিল করেছিলাম বিভক্তকারীদের উপর[১]; كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

৯১. যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত ٱلَّذِينَ جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে উম্মতের হেদায়াতের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহের কারণে নিজেকে আফসোস করে ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেছেন। [দেখুন, সূরা আল-কাহফঃ ৬, সূরা আশ-শু'আরাঃ ৩, সূরা ফাতিরঃ ৮, সূরা আন-নাহলঃ ১২৭, সূরা আল-মায়িদাহঃ ৬৮] তারপরও তারা যে নিজেদের কল্যাণকামীকে নিজেদের শত্রু মনে করছে, নিজেদের ভ্রষ্টতা ও নৈতিক ত্রুটিগুলোকে নিজেদের গুণাবলী মনে করছে, নিজেরা এমন পথে এগিয়ে চলছে এবং নিজেদের সমগ্র জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যার নিশ্চিত পরিণাম ধ্বংস এবং যে ব্যক্তি তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখাচ্ছে তার সংস্কার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম চালাচ্ছে, তাদের এ অবস্থা দেখে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।

(১) সেই বিভক্তকারী দল বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত বর্ণিত হয়েছে। কারও কারও মতে এখানে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নবীদের বিরোধিতার জন্য, তাদের উপর মিথ্যারোপ করার জন্য, তাদের কষ্ট দেয়ার জন্য পরস্পর শপথ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। যেমন সালেহ আলাইহিস সালামের লোকেরা এরকম করেছিল। "তারা বলল, 'তোমরা আল্লাহ্র নামে শপথ গ্রহণ কর, 'আমরা রাতেই শেষ করে দেব তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে; তারপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত করে বলব যে, 'তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি" [সূরা আন-নামল: ৪৯] কারও কারও মতে, এখানে বাস্তবিকই সালেহ আলাইহিস সালামের কাওমের সে লোকদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] মুকাতিল বলেন, মক্কার কুরাইশদের মধ্যে ষোলজন এ জঘন্য কাজটি করেছিল। তারা পরস্পর শপথ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মানুষকে দূরে রাখছিল। [বাগভী] কারও কারও মতে, এখানে শব্দটি 'ভাগ-ভাটোয়ারা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কুরআনকে বলত, জাদু। কেউ বলত, কবিতা। কেউ বলত, মিথ্যা। আর কেউ বলত পূর্ববর্তীদের কাহিনী। কারও কারও মতে, এখানে ইয়াহূদী নাসারাদেরকে বুঝানো হয়েছে। [বাগভী] তাদেরকে বিভক্তকারী এ অর্থে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর দীনকে বিভক্ত করে ফেলেছে। তার কিছু কথা মেনে নিয়েছে এবং কিছু কথা মেনে নেয়নি। [বাগভী]

করেছে[১]।

৯২. কাজেই শপথ আপনার রবের! অবশ্যই আমরা তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই,

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾

৯৩. সে বিষয়ে, যা তারা আমল করত।

عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪. অতএব আপনি যে বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫. নিশ্চয় আমরা বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য যথেষ্ট[২],

إِنَّا كَفَيْنَـٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿٩٥﴾

৯৬. যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্ নির্ধারণ করে। কাজেই শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

---

(১) عضين শব্দের অর্থ করা হয়েছে, বিভক্ত। শব্দটির অন্য অর্থঃ জাদু, গল্প। [বাগভী] এ অর্থের সমর্থনে সীরাত গ্রন্থে এসেছে যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ কুরাইশের এক সমাবেশে হাজির হয়ে বললঃ হজ্জের মওসুম শুরু হয়ে গেছে। চতুর্দিক থেকে মানুষ এখন তোমাদের কাছে আসবে। এদিকে তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ) সম্পর্কে তারা জেনে গেছে। তাই তোমরা তার ব্যাপারে একজোট হয়ে একটি মত পোষণ কর। তারা বললঃ তুমিই বল। সে বললঃ তোমরাই বল। তখন তারা বললঃ আমরা বলব সে গণক। তখন সে বললঃ সে গণক নয়। তখন তারা বললঃ আমরা বলব সে পাগল। সে বললঃ না, সে তো পাগল নয়। তারা বললঃ আমরা বলব সে কবি। সে বলল, না সে কবিও নয়। তারা বললঃ আমরা বলব সে যাদুকর। সে বললঃ না, সে যাদুকরও নয়। তখন তারা বললঃ তাহলে আমরা কি বলব? সে বললঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তার কথায় আছে মাধুর্য, তোমরা যা-ই বল না কেন বুঝা যাবে যে তোমাদের কথাই বাতিল। তবে তার কথা যাদুকরের কাছাকাছি। এ কথার উপরই সবাই সেখান থেকে চলে গেল। আর এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করলেনঃ "যারা কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়েছে, কাজেই শপথ আপনার রবের! আমরা তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই, সে বিষয়ে, যা তারা করে।" [বাগভী; সীরাতে ইবনে হিশাম]

(২) এ বাক্যে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নেতা ছিল পাঁচ ব্যক্তি- আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে এয়াগুস, ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিলা। [বাগভী]

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭. আর অবশ্যই আমরা জানি, তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়;

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮. কাজেই আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং আপনি সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন(১);

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿٩٩﴾

৯৯. আর আপনার মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনি আপনার রবের ‘ইবাদাত করুন(২)।

---

(১) অর্থাৎ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, কেউ যদি শত্রুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা‘আলার তাসবীহ্‌ ও ইবাদাতে মশগুল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ্‌ তা‘আলা স্বয়ং তার কষ্ট দূর করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই করতেন। হাদীসে এসেছে, “যখনই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজে সমস্যা অনুভব করতেন তখনই সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন” [আবুদাউদঃ ১৩১৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৮৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেনঃ হে আদম সন্তান! দিনের প্রারম্ভে চার রাক‘আত সালাত আদায়ে অপারগ হয়ো না। কারণ এতে করে আমি তোমাকে শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট করব।” [আবু দাউদঃ ১২৮৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৮৬]

(২) এখানে কুরআন ব্যবহার করেছে يقين শব্দটি। সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম শব্দটির তাফসীর করেছেনঃ মৃত্যু [বুখারীঃ ৪৭০৬] কুরআন ও হাদীসে ‘ইয়াকীন’ শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহার হওয়ার বহু প্রমাণ আছে। পবিত্র কুরআনে এসেছেঃ “তারা বলবে, ‘আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, ‘আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না, এবং আমরা বিভ্রান্ত আলোচনাকারীদের সাথে বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। ‘আমরা কর্মফল দিন অস্বীকার করতাম, শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে মৃত্যু এসে যায়।” [সূরা আল-মুদ্দাসসিরঃ ৪৩-৪৭] অনুরূপভাবে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মায‘উন এর মৃত্যুর পর তার সম্পর্কে বলেছেনঃ “কিন্তু সে! তার তো يقين তথা মৃত্যু এসেছে, আর আমি তার জন্য যাবতীয় কল্যাণের আশা রাখি। [বুখারীঃ ১২৪৩] সুতরাং বুঝা গেল যে, এখানে يقين শব্দের অর্থ মৃত্যুই। আর এ অর্থই সমস্ত মুফাসসেরীনদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। সে হিসেবে প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদত করে যেতে হবে। যদি কাউকে ইবাদত থেকে রেহাই দেয়া হতো তবে নবী-রাসূলগণ তা থেকে রেহাই পেতেন কিন্তু তারাও তা থেকে রেহাই পাননি।

তারা আমৃত্যু আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছেন এবং করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যদি কেউ এ কথা বলে যে, মারেফত এসে গেলে আর ইবাদতের দরকার নেই সে কাফের। কারণ সে কুরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মাতের বিপরীত কথা ও কাজ করেছে। এটা মূলতঃ মুলহিদদের কাজ। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

১৬- সূরা আন-নাহ্‌ল, ১২৮ আয়াত, মক্কী



।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আল্লাহ্‌র[১] আদেশ আসবেই[২];

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَٰنَهُ

(১) এ সূরা নাহ্‌লকে বিশেষ কোন ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ বিষয়বস্তু দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কেয়ামত ও আযাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে জয়ী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়াহুড়া করো না। [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) অর্থাৎ তা একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে। তার প্রকাশ ও প্রয়োগের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। ব্যাপারটা একেবারেই অবধারিত ও সুনিশ্চিত অথবা একান্ত নিকটবর্তী এ ধারণা দেবার জন্য ব্যাক্যটি অতীতকালের ক্রিয়াপদের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

তবে এ “আদেশ বা ফায়সালা” কি ছিল এবং কোন আকৃতিতে এসেছে? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছেঃ

কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন যে, এখানে ‘আল্লাহ্‌র নির্দেশ’ বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। এর এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কেয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে পৌঁছাও দূরবর্তী কোন বিষয় নয়। অথবা, তা অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে অতীতকালের পদ ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, “মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে” [সূরা আল-আম্বিয়া: ১] আরও এসেছে, “কিয়ামত কাছাকাছি হয়েছে, আর চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে” [সূরা আল-কামার: ১] [ইবন কাসীর]

কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ ‘আল্লাহ্‌র নির্দেশ’ বলে এখানে আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ সম্পর্কিত, হালাল হারাম সম্বলিত বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এখানে “আল্লাহর নির্দেশ” বলে তাদের উপর যে শাস্তি আসার কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করাতেন তা বুঝানো হয়েছে। আযাবের ব্যাপারে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের সবরের পেয়ালা কানায় ভরে উঠেছিল এবং শেষ ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এসে গিয়েছিল বলেই অতীতকালের ক্রিয়াপদ দ্বারা একথা বলা হয়েছে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ①

কাজেই তা[১] তাড়াতাড়ি পেতে চেয়ো না। তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যা শরীক করে তিনি তা থেকে ঊর্ধ্বে[২]।

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ②

২. তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে[৩] স্বীয় নির্দেশে রূহ[৪] -ওহীসহ ফিরিশ্‌তা- পাঠান এ বলে যে, তোমরা সতর্ক কর, 'নিশ্চয় আমি ছাড়া কোন

(১) কাফের মুশরিকগণের চিরাচরিত নিয়ম ছিল যে, তারা আল্লাহর আযাবকে কামনা করত, তারা ভাবত যে আল্লাহর আযাব যদি আসবে তবে আসে না কেন? কিন্তু আল্লাহর নিয়ম হলো, তিনি কোন জাতিকে ধ্বংস করার পূর্বে তাকে প্রচুর সময় দেন। এ ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখ করেছেন। [দেখুন, সূরা আল-আনকাবূতঃ ৫৩, ৫৪] [ইবন কাসীর]

(২) এখানে তাদের শির্ক বলতে, তারা যে আযাব তাড়াতাড়ি চাচ্ছিল, অথবা কিয়ামত তাড়াতাড়ি চাচ্ছিল তা-ই বোঝানো হয়েছে। কেননা এর দ্বারা তারা মূলত: আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছে, এটা কুফরী ও শির্ক। তারা মনে করছে যে, আল্লাহ্ এটা করতে সম্ভব নন। তিনি সেটা করতে পারবে না। আর অপারগতা মূলত: বান্দাদের গুণ। বান্দাদের গুণকে আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করা শির্ক। এ হিসেবে তারা শির্কে লিপ্ত হয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর] নতুবা আল্লাহর সাথে কারো শরীক হবার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর সত্তা এর অনেক উর্ধ্বে এবং এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। মোট কথাঃ তারা যে শির্ক করছে আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া এই আয়াতের সারমর্ম।

(৩) এখানে যার প্রতি ইচ্ছা বলে তাঁর নবী-রাসূলদের বুঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] [এ ব্যাপারে আরো দেখা যেতে পারে সূরা আল-হাজ্জঃ৭৫, সূরা গাফেরঃ১৫, ১৬]

(৪) আয়াতে روح শব্দ বলে ইবনে আব্বাসের মতে ওহী বুঝানো হয়েছে। যা নবুওয়াতের রূহ। এ রূহ বা প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত হয়েই নবী কাজ করেন ও কথা বলেন। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক জীবনে প্রাণের যে মর্যাদা এ ওহী ও নবুওয়াতী প্রাণসত্তা নৈতিক জীবনে সেই একই মর্যাদার অধিকারী। ওহী দ্বারা মুমিনদের প্রাণ উজ্জীবিত হয়। এ ওহীর একটি হচ্ছে কুরআন। দ্বীনে কুরআনের মর্যাদা যেমন শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক। [ফাতহুল কাদীর] তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ওহীর জন্য 'রূহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [দেখুনঃ সূরা আস-শূরাঃ ৫২] কোন কোন তাফসীরবিদগণের মতে রূহ শব্দ দ্বারা এখানে হেদায়াত বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] অবশ্য দু' অর্থের মধ্যে বৈপরীত্য নেই।

সত্য ইলাহ্‌ নেই'(১); কাজেই তোমরা আমার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন কর(২) ।

৩. তিনি যথাযথভাবে(৩) আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারা যা শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে(৪) ।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ③

(১) এ আয়াতে ইতিহাসগত দলীল দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত হয়েছে যে, আদম 'আলাইহিস্‌ সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রাসূলই আগমন করেছেন তিনি জনসমক্ষে তাওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন । [দেখুন সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২৫] অথচ বাহ্যিক উপায়াদীর মাধ্যমে এক জনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্যজনের মোটেই জানা ছিল না । চিন্তা করুন, হাজার হাজার নবী-রাসূল, যারা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, তারা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতঃই মানুষ একথা বুঝতে বাধ্য হয় যে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না । বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এককভাবে এ যুক্তিটিই যথেষ্ট ।

(২) এই বাক্যের মাধ্যমে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, নবুওয়াতের রূহ যেখানেই যে ব্যক্তির ওপর অবতীর্ন হয়েছে সেখানেই তিনি এ একটিই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন যে সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এবং একমাত্র তাঁকেই ভয় করতে হবে, তিনি একাই এর হকদার । তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় এমন কোন সত্তা নেই যার অসন্তুষ্টির ভয়, যার শাস্তির আশংকা এবং যার নাফরমানির অশুভ পরিণামের ভয় করা যাবে । তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না ।

(৩) এখান থেকে আবার তাওহীদের দলীল-প্রমাণাদি পেশ করা হচ্ছে । [ফাতহুল কাদীর] প্রথমে আসমান ও যমীনকে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে যথার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন সেটা বর্ণনা করছেন । অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন কোন খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি । বরং এগুলোর সৃষ্টির পিছনে অনেক হিকমত রয়েছে । এগুলোর সৃষ্টি হক কারণেই হয়েছে আর তা হচ্ছে এগুলো আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও কুদরাতের উপর প্রমাণ বহন করে । আর বান্দাদের তাঁরই ইবাদাত করতে হবে যিনি সৃষ্টিকুলকে মৃত্যুর পর জীবিত করতে সক্ষম । অথবা এগুলো নিজেরাই প্রমাণ করবে যে, এগুলো ধ্বংসশীল । [ফাতহুল কাদীর] তাছাড়া এগুলো সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ্‌র এক মহান উদ্দেশ্য হলোঃ যারা খারাপ কাজ করেছে তাদেরকে শাস্তি আর যারা ভাল কাজ করেছে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন । [দেখুনঃ সূরা আন-নাজমঃ ৩১] [ইবন কাসীর]

(৪) আল্লাহ্‌র সাথে যাদেরকে শরীক করা হয়, তারা কোনভাবেই আল্লাহ্‌র সমকক্ষ হতে পারে না । তিনি তাদের শরীক করা থেকে অনেক উর্ধ্বে, অনুরূপভাবে কোন শরীকের শরীক হওয়া থেকেও তিনি অনেক ঊর্ধ্বে । [ফাতহুল কাদীর] তিনি সর্বদিক থেকে

৪. তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন(১); অথচ দেখুন, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী(২)!

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤﴾

ঊর্ধ্বে। সম্মানের দিক থেকে ঊর্ধ্বে তিনি, অবস্থানের দিক থেকেও তিনি আরশের উপর। সবকিছুর উপরে তাঁর অবস্থান, আর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক থেকেও তার সমকক্ষ কেউ নেই।

(১) শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সে শুক্র হচ্ছে পুরুষ ও মহিলার সম্মিলিত বীর্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে" [সূরা আল-ইনসান:২] অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলার বীর্যের সংমিশ্রণে। এটা জানার পর আরও একটি জিনিস জানা দরকার, তাহচ্ছে অন্যত্র আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে বীর্য সেটির একটি বের হয় পিঠ থেকে, সেটি পুরুষের শুক্র, অপরটি বের হয় বুকের উপরের পাঁজর থেকে, সেটি মহিলার শুক্র। আল্লাহ্ বলেন, "অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে! তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে, এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পিঞ্জরাস্থীর মধ্য থেকে।" [সূরা আত-তারেক: ৫-৭]

(২) যেহেতু মানুষ সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট, তাই প্রথমেই মানুষ সৃষ্টির বিবরণ দিয়ে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও কুদরতের আলোচনা শুরু করা হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর] 'মানুষ প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী' এর দুই অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত এখানে এ দুই অর্থই প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ একটি তুচ্ছ শুক্রবিন্দু থেকে এমন মানুষ তৈরী করেছেন যে বিতর্ক ও যুক্তি প্রর্দশন করার যোগ্যতা রাখে এবং নিজের বক্তব্য ও দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে। [কুরতুবী] দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এই দুর্বল মানবকে যখন বল ও বাক্‌শক্তি দান করা হলো, তখন সে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেই বিতর্ক উত্থাপন করতে লাগলো। যে মানুষকে আল্লাহ শুক্রবিন্দুর মত নগণ্য জিনিস থেকে তৈরী করেছেন তার অহংকারের বাড়াবাড়িটা দেখ, সে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার মোকাবিলায় নিজেকে পেশ করার জন্য বিতর্কে নেমে এসেছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] সে হিসেবে মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে, বড় বড় বুলি আওড়ানোর আগে নিজের সত্তার দিকে একবার তাকাও। কোন আকারে কোথা থেকে বের হয়ে তুমি কোথায় এসে পৌঁছেছো? কোথায় তোমার প্রতিপালনের সূচনা হয়েছিল? তারপর কোন পথ দিয়ে বের হয়ে তুমি দুনিয়ায় এসেছো? তারপর কোন পর্যায় অতিক্রম করে তুমি যৌবন বয়সে পৌঁছেছো এখন নিজেকে বিস্মৃত হয়ে কার মুখের ওপর কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছো? [এ ব্যাপারে সূরা ফুরকানঃ ৫৪, ৫৫ এবং সূরা ইয়াসীনঃ ৭৭-৭৯ আয়াতসমূহ দেখুন] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের এস্বভাবটি ব্যাখ্যা করেছেন। একবার তিনি তার হাতের তালুতে থুতু ফেললেন, তারপর তাতে তার তর্জনী রেখে বললেনঃ "মহান আল্লাহ্ বলেন, হে বনী আদম! কিভাবে তুমি আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ তোমাকে

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

৫. আর চতুষ্পদ জন্তুগুলো, তিনি তা সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে। এবং সেগুলো থেকে তোমরা আহার করে থাক[১]।

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

৬. আর তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে তাদেরকে চারণভূমি হতে ঘরে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তাদের সৌন্দর্য উপভোগ কর[২]।

আমি এ ধরণের হীনতা থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর যখন তোমার রূহ ওখানে (তিনি তার কণ্ঠনালির দিকে ইঙ্গিত করলেন) পৌঁছে, তখন তুমি বলঃ আমি সাদকা করব। তখন কি তার আর সদকার সময় বাকী আছে?" [ইবনে মাজাহঃ ২৭০৭; মুসনাদে আহমাদঃ৪/২১০]

(১) এখানে ঐসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের উপকারার্থে বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। যেমন, উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অধিকাংশ ক্ষেত্রে أنعام দ্বারা উট বোঝানো হয়ে থাকে। [কুরতুবী] এরপর এ সমস্ত জন্তু দ্বারা যে সব উপকার হয় তন্মধ্যে দু'টি উপকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] (এক) ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ অর্থাৎ এসব জন্তুর পশম দ্বারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয়, টুপি ও বিছানা তৈরী করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল করে। [তাবারী] (দুই) ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ অর্থাৎ মানুষ এসব জন্তু যবেহ্ করে খাদ্যও তৈরী করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য তৈরী করে। [ইবন কাসীর] অন্যান্য সাধারণ উপকার বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে- ﴿وَمَنَافِعُ﴾ বা 'উপকারাদী' অর্থাৎ জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া, অস্থি ও পশমের মধ্যে আরো অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। কারও কারও মতে এর দ্বারা এগুলোকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] তবে সম্ভবত: এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ঐসব নবাবিস্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোষাক, ঔষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতেও কিয়ামত পর্যন্ত আবিস্কৃত হবে।

(২) কাতাদা বলেন, যখন এগুলো বড় স্তন, লম্বা চুঁটিসহ চলে তখন তোমরা সেগুলো দেখে আনন্দে আপ্লুত হও। আর যখন মাঠে চরতে যায় তখনও তোমরা সেগুলো দেখে খুশি হও। [তাবারী]

৭. আর তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন দেশে যেখানে প্রাণান্ত কষ্ট ছাড়া তোমরা পৌঁছতে পারতে না[১]। তোমাদের রব তো অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু[২]।

وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَكُمۡ إِلَىٰ بَلَدٖ لَّمۡ تَكُونُواْ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلۡأَنفُسِۚ إِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ٧

৮. আর তোমাদের আরোহনের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা[৩] এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা জান না[৪]।

وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗۚ وَيَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٨

(১) এখানে এসব জন্তুর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের ভারী জিনিষপত্রকে দূর-দূরান্তের শহরে পৌঁছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিষপত্রের পৌঁছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। কারণ, এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিস্কৃত যান-বাহন অকেজো হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে আজো কাজে লাগায়। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন সূরা আল-মু'মিনূনঃ ২১, ২২, গাফেরঃ ৭৯-৮১]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ যেহেতু দয়ালু ও রহমতের আধার তাই তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এগুলোকে সৃষ্টি করে তোমাদের করায়ত্ব করে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] এ ব্যাপারে কুরআনের অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে। [দেখুনঃ সূরা আয-যুখরুফঃ ১২-১৪]

(৩) উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার পর ঐসব জন্তুর কথা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপন করা উপযুক্ত মনে করা হয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে সওয়ারী ও বোঝা বহনের উদ্দেশ্যে। বলা হয়েছে, আমি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও। আর তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। [তাবারী]।

(৪) অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ জিনিস এমন আছে যা মানুষের উপকার করে যাচ্ছে। অথচ কোথায় কত সেবক তার সেবা করে যাচ্ছে বরং কি সেবা করছে সে সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। সওয়ারীর তিনটি জন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত পদবাচ্যে ব্যবহার করে বলা হয়েছে- ﴿وَيَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ -অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যেগুলো তোমরা জান না। যেমন, কীট-পতঙ্গ ও যমীনে অন্যান্য প্রাণী। যেগুলো যমীনের নীচে থাকে বা শুষ্ক স্থানে বা সমুদ্রে অবস্থান করে। যেগুলো মানুষ দেখতে

৯. আর সরল পথ আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায়[১], কিন্তু পথগুলোর মধ্যে বাঁকা পথও আছে[২] । আর তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের সবাইকেই সৎপথে পরিচালিত করতেন ।

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٩

পায়নি বা শুনতেও পায়নি । [কুরতুবী] কারও কারও মতে এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে জান্নাতীদের জন্য এবং জাহান্নামে জাহান্নামীদের জন্য যা সৃষ্টি করবেন বা করেছেন তা-ই বুঝিয়েছেন । [কুরতুবী] তাছাড়া সম্ভবত: এখানে ঐসব নবাবিস্কৃত যানবাহন ও গাড়ী বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না; যেমন, রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি ।

(১) ﴿قَصْدُ السَّبِيْلِ﴾ শব্দের অর্থঃ সরল পথ, মধ্যম পথ । এমন পথ যা উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেয় । [কুরতুবী] এর দ্বারা এখানে ইসলাম, হক্ক পথ বুঝানো হয়েছে । [কুরতুবী] পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুনিয়ার বাহ্যিক পথসমূহের বর্ণনার পর এ আয়াতে দ্বীনি পথের কথা আলোচনা করা হচ্ছে । দুনিয়াতে যেমন চলার পথ আল্লাহর সৃষ্টি তেমনি আখেরাতের পথে কিভাবে চলতে হবে তাও মহান আল্লাহ্ শিখিয়ে দিচ্ছেন । তিনি জানাচ্ছেন যে, হক পথ হচ্ছে সেটিই যা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায় । [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও এসেছে, "আল্লাহ্ বললেন, এটাই আমার কাছে পৌঁছার সরল পথ ।" [সূরা আল-হিজর: ৪১] আরও বলেন, "আর এ পথই আমার সরল পথ । কাজেই তোমরা এর অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না , করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে ।" [সূরা আল-আন'আম: ১৫৩] । অথবা আয়াতের অর্থ, হক পথ বর্ণনা করা আল্লাহ্র যিম্মায় । তিনি সেটা রাসূল, দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে বর্ণনা করেন । [কুরতুবী; মুয়াসসার, আত-তাফসীরুস সহীহ] দুনিয়াতে যেমন অনেক পথ আছে কিন্তু সব পথই গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারে না শুধু সে পথই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাবে যে পথের সন্ধানদাতা সে পথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তেমনিভাবে দ্বীনি ব্যাপারেও অনেকে অনেক পথের দিকে আহ্বান জানাবে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার প্রদর্শিত পথ ছাড়া অপরাপর কোন পথই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে সহযোগিতা করতে পারবে না । [সা'দী]

(২) তাওহীদ, রহমত ও রবুবীয়াতের যুক্তি পেশ করতে গিয়ে এখানে ইঙ্গিতে নবুওয়াতের পক্ষেও একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে । এ যুক্তির সংক্ষিপ্তসার হচ্ছেঃ দুনিয়ায় মানুষের জন্য চিন্তা ও কর্মের অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং কার্যত আছেও । যেমন, ইয়াহূদীবাদ, নাসারাবাদ, মজুসীবাদ ইত্যাদি । [ইবন কাসীর] এসব পথ তো আর একই সংগে সত্য হতে পারে না । সত্য একটিই । বাকীগুলো সঠিক পথ নয় । বরং বাঁকা পথ । সেগুলো দ্বারা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছা যায় না । আর এসব পথে মানুষ হিদায়াতও পায় না । এসব পথে চলে হক পথে আসাও সম্ভব হয় না । [কুরতুবী]

দ্বিতীয় রুকূ’

هُوَ الَّذِيٓ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمۡ مِّنۡهُ شَرَابٌ وَّمِنۡهُ شَجَرٌ فِيۡهِ تُسِيۡمُوۡنَ ⑩

১০. তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক(১)।

يُنۡۢبِتُ لَكُمۡ بِهِ الزَّرۡعَ وَالزَّيۡتُوۡنَ وَالنَّخِيۡلَ وَالۡاَعۡنَابَ وَمِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ ⑪

১১. তিনি তোমাদের জন্য তা(২) দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তূন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর এবং সব রকমের ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন(৩)।

---

(১) পূর্বের আয়াতসমূহে আলাহ্ রাব্বুল আলামীন যমীনে যে সমস্ত প্রাণী চলাফেরা করে তাদেরকে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন সে ঘোষণা দিয়েছেন। এখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি নাযিল করার মাধ্যমে মানুষের কি উপকার সাধিত হয় সেটা বর্ণনা করছেন। [ইবন কাসীর] এর মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে পানি। তিনি আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেন সেগুলোকে তিনি সুমিষ্ট করেছেন, লবনাক্ত করেন নি। [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে মানুষের জন্য বৃক্ষের ব্যবস্থা করেছেন। شجر শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোন কোন সময় এমন প্রত্যেক বস্তুকেও شجر বলা হয় যা ভূ-পৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] কেননা, এর পরেই জন্তুদের চলার কথা বলা হয়েছে। ঘাসের সাথেই এর বেশীর ভাগ সম্পর্ক। تُسِيمُونَ শব্দটির অর্থ জন্তুকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্য ছেড়ে দেয়া। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] অর্থাৎ তোমাদের জন্য এমন গাছের ব্যবস্থা করেছেন যাতে তোমাদের জীব-জন্তু চরে বেড়াতে পারে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ একই পানি দিয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা বহু প্রকার ফল-ফলাদি, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদে ও গন্ধে, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিতে উৎপন্ন করেন এটা নিশ্চয়ই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন সূরা আন-নামলঃ ৬০]

(৩) এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলার নেয়ামত ও অভিনব রহস্য সহকারে জগত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ্ তা‘আলার তাওহীদ যেন চোখের সামনে ফুটে উঠে। এ কারণেই নেয়ামতগুলোর উল্লেখ করে বার বার এ বিষয়ের প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তাশীলদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও বৃক্ষ এসবের ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ্ তা‘আলার কারিগরি ও রহস্যের

১২. আর তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন(১), সূর্য

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্য কণা কিংবা আঁটি মাটির নিচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরূহে পরিণত হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেরঙয়ের ফুল-ফল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোন কৃষক-ভূস্বামীর কর্মের দখল নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। তিনি একই পানি দ্বারা সেগুলোকে উৎপন্ন করেন, অথচ সেগুলোর প্রকার, স্বাদ, গন্ধ, রং, প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এগুলো সবই প্রমান করছে যে, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "নাকি তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও যমীন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, তারপর আমরা তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার গাছ উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা (আল্লাহ্‌র) সমকক্ষ নির্ধারণ করে।" [সূরা আন-নামল:৬০]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর কিছু নেয়ামত হিসেব করে দেখিয়ে দিচ্ছেন। [ইবন কাসীর] আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ বর্ণনা করছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ নেয়ামত নিয়োজিত করেছেন। এগুলোতে যে বিরাট উপকারিতা রয়েছে সেটা তিনি ব্যতীত কেউ পুরোপুরি জানে না। বিবেকবানদের কাছে এগুলোই স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে যে, তিনি একজনই একমাত্র ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত। সে পাঁচটি নেয়ামত হচ্ছে, রাত, দিন, সূর্য, চন্দ্র ও তারকা। কুরআনে বারবার এ নেয়ামতগুলোকে নিয়োজিত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে এগুলো উল্লেখ করে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। যেমন, " নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন ; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ কত বরকতময়!"[সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪] আরও বলেছেন, "আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।" [সূরা ইবরাহীম: ৩৩] আরও বলেছেন, " আর তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত, তা থেকে আমরা দিন অপসারিত করি, তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। আর চাঁদের জন্য আমরা নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মন্‌যিল; অবশেষে সেটা শুষ্ক বাঁকা, পুরোনো খেজুর শাখার আকারে ফিরে যায়।" [সূরা ইয়াসীন: ৩৭-৩৯] আরও বলেন, "আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা

وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ﴿۱۲﴾

ও চাঁদকে; এবং নক্ষত্ররাজিও তাঁরই নির্দেশে নিয়োজিত। নিশ্চয় এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন(১)।

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوْمٍ یَّذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. আর তিনি তোমাদের জন্য যমীনে যা সৃষ্টি করেছেন, বিচিত্র রঙের করে, নিশ্চয় তাতে সে সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে(২)।

وَهُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَی الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ

১৪. আর তিনিই সাগরকে নিয়োজিত করেছেন(৩) যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) গোশ্‌ত খেতে পার এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে

এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।" [সূরা আল-মুলক: ৫] অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথনির্দেশ পায়" [সূরা আন-নাহল:১৬] [আদওয়াউল বায়ান]

(১) এখানে বলা হয়েছে যে, দিনরাত ও তারকারাজি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক প্রমাণ রয়েছে। যারা আল্লাহ্ যে সমস্ত ব্যাপারে সাবধান করতে চেয়েছেন সেগুলো বুঝে, যাদেরকে আল্লাহ্ সেটা বুঝার তাওফীক দিয়েছেন তাদের জন্য এতে আল্লাহর প্রচণ্ড ক্ষমতা ও অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) আসমানের বিভিন্ন চিহ্ন ও নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানানোর পর এখানে মাটিতে যে আশ্চর্যজনক বিষয়াদি ও বিভিন্ন বস্তু রয়েছে যেমন, জীবজন্তু, খনিজসম্পদ, উদ্ভিদরাজি ও নিশ্চল রং-বেরং এর ও বিভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টিসমূহ রয়েছে, সেগুলোর যে উপকারসমূহ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে এর মধ্যে অবশ্যই তাদের জন্য প্রমাণ রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। যারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ স্মরণ করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়। [ইবন কাসীর]

(৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের উপকারের জন্য কি কি নিহিত রয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ টাটকা গোশ্‌ত লাভ করে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

تَشْكُرُوْنَ ﴿١٤﴾

পরে থাক[১]; এবং তোমরা দেখতে পাও, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে[২] এবং এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর;

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. আর তিনি যমীনে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে যমীন তোমাদের নিয়ে হেলে না যায়[৩] এবং স্থাপন করেছেন

(১) এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার। ডুবুরীরা সমুদ্র থেকে মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী বের করে আনে। حِلْيَةً এর শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য। এখানে ঐসব রত্নরাজি ও মণিমুক্তা বোঝানো হয়েছে, যা সমুদ্রগর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলঙ্কার তৈরী করে বিভিন্ন পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলঙ্কার মহিলারা পরিধান করে থাকে; কিন্তু কুরআন পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে تَلْبَسُوْنَهَا বলেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহিলাদের অলঙ্কার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এটা সমুদ্রের তৃতীয় উপকার। فُلْكَ শব্দের অর্থ নৌকা। مَوَاخِرَ শব্দটি ماخرة এর বহুবচন। مخر এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ ঐসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে দূর-দূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরান্তে সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানী করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, সমুদ্রপথের ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক।

(৩) رَوَاسِى শব্দটি رَاسِيَة এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। تميد শব্দটি ميد থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূ-মণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেননি। তাই এটা কোন দিক দিয়ে ভারী এবং কোন দিক দিয়ে হাল্কা হয়েছে। অন্যথায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের অস্থিরভাবে আন্দোলিত হওয়া। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন- যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। তাই এখানে ﴿اَنْ تَمِيْدَ﴾ এর পূর্বে كَرَاهِيَة বা أن এর পরে لا শব্দটি উহ্য ধরে নিয়ে অর্থ করতে হবে। [ফাতহুল কাদীর] এ আয়াত থেকে জানা যায়, ভূপৃষ্ঠে পর্বত শ্রেণী স্থাপনের

নদ-নদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার[১];

১৬. এবং পথ নির্দেশক চিহ্নসমূহও। আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথনির্দেশ পায়[২]।

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُوۡنَ ﴿١٦﴾

উপকারিতা হচ্ছে, এর ফলে পৃথিবীর আবর্তন ও গতি সুষ্ঠ ও সুশৃংখল হয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ের এ উপকারিতা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, পাহাড়ের অন্য যে সমস্ত উপকারিতা আছে সেগুলো একেবারেই গৌণ। মূলত মহাশূন্যে আবর্তনের সময় পৃথিবীকে আন্দোলিত হওয়া থেকে রক্ষা করাই ভূপৃষ্ঠে পাহাড় স্থাপন করার মুখ্য উদ্দেশ্য। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) অর্থাৎ নদ-নদীর সাথে যে পথ তৈরী হয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে পার্বত্য এলাকাসমূহে এসব প্রাকৃতিক পথের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। অবশ্যি সমতল ভূমিতেও এগুলোর গুরুত্ব কম নয়। উপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধার কথা এখানেও সমীচীন মনে হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মন্‌যিলে-মকসুদে পৌঁছার জন্য ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে وَعَلَامَاتٍ অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্য পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। [ইবন কাসীর] বলাবাহুল্য, ভূ-পৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হতো তবে মানুষ কোন গন্তব্যস্থানে পৌঁছার জন্য পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত।

(২) অর্থাৎ দিনের বেলায় পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য তিনি যেমন কিছু নিদর্শন রেখেছেন, তেমনি রাতের বেলায় পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য রেখেছেন তারকাসমূহ। দিনের বেলায় বিভিন্ন নিদর্শন দেখে আর রাতের বেলায় তারকাদের অবস্থান দৃষ্টে মানুষ বলতে পারে যে, তার গন্তব্যস্থল কোথায় হতে পারে। [জালালাইন, মুয়াসসার] আল্লাহ সমগ্র যমীনকে একই ধারায় সৃষ্টি করেননি। বরং প্রত্যেকটি এলাকাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। এর অন্যান্য উপকারিতার মধ্যে একটি অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের পথ ও গন্তব্য আলাদাভাবে চিনে নেয়। সুতরাং তারকারাজি সৃষ্টি করার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাস্তার পরিচয় লাভ। এগুলোর দ্বারা কোন প্রকার ভাগ্য বা সৃষ্টিজগতের পরিচালনার নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করা কুফরী। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা এ তারকাসমূহ তিনটি কারণে সৃষ্টি করেছেন, আকাশের সৌন্দর্য, শয়তানদের বিতাড়নকারী এবং কিছু আলামত যা দ্বারা পথের দিশা পাওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং যে কেউ এর বাইরে অন্য কিছু দিয়ে এগুলোর ব্যাখ্যা

১৭. কাজেই যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না[১]?

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾

১৮. আর তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গুণলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু[২]।

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯. আর তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা ঘোষণা কর আল্লাহ্ তা জানেন।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

করবে সে অবশ্যই ভুল করবে, তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, এবং এমন বস্তুর পিছনে অযথা দৌড়াবে যার ব্যাপারে তার কোন জ্ঞান নেই।' [বুখারীঃ ৬/৩৪১]

(১) অর্থাৎ যদি তোমরা একথা মানো (যেমন বাস্তবে মক্কার কাফেররাও এবং দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিকরাও মানতো) যে, একমাত্র আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা বরং এ বিশ্বজগতে তোমাদের উপস্থাপিত শরীকদের একজনও কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি, তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টি করা ব্যবস্থায় অস্রষ্টাদের মর্যাদা কেমন করে স্রষ্টার সমান হতে পারে? যদি তা না হয় তবে তাঁর ইবাদাত ব্যতীত অন্যের ইবাদাত কেন করা হবে? তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, তাঁর সাথে এই যে মূর্তিগুলোর ইবাদাত করা হয় সেগুলোও তো সৃষ্ট। সেগুলো কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। যারা সেগুলোর ইবাদাত করে তাদের জন্যও এরা সামান্যতম লাভ বা ক্ষতি বয়ে আনতে পারে না। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার পরপরই তাঁর ক্ষমাশীল ও করুণাময় হবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর যে নেয়ামত মানুষের উপর আছে তা দাবী করছে যে মানুষ সর্বদা তাঁর শোকরগুজার হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর অপার মহিমায় তাদের অপরাধ মার্জনা করেন। যদি তোমাদেরকে তাঁর প্রতিটি নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করতে বাধ্য করা হতো, তবে তোমরা কেউই সেটা করতে সক্ষম হতে না। যদি এ ধরণের নির্দেশ আসতো তবে তোমরা দুর্বল হয়ে যেতে এবং তা করা ছেড়ে দিতে। আর যদি তিনি এর জন্য তোমাদেরকে আযাব দিতেন তবে তিনি যালেম বিবেচিত হতেন না। কিন্তু আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন, অল্প কিছুরই শাস্তি দিয়ে থাকেন। [ইবন কাসীর] তোমরা যদি তাঁর কোন কোন নেয়ামতের শোকর আদায় করতে কিছুটা কসূর করে ফেল, তারপর তাওবাহ করো এবং তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির দিকে ফিরে আসো তবে তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন। তাওবাহ ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তো তোমাদের জন্য অতিশয় দয়ালু। [তাবারী]

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. আর তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়[১]।

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব এবং কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সে বিষয়ে তাদের কোন চেতনা নেই[২]।

তৃতীয় রুকূ’

اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, কাজেই যারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাদের অন্তর অস্বীকারকারী[৩] এবং

---

(১) আগের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, এ সমস্ত উপাস্যগুলো নিজেরা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। এ আয়াতে তা আরও স্পষ্ট বর্ণনা দিচ্ছে যে, কাফেরদের উপাস্যগুলো ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নয়। কারণ, সেগুলো কাউকে সৃষ্টি যেমন করতে পারে না। তেমনি নিজেরাও অন্যদের দ্বারা সৃষ্ট। পূর্বের আয়াতে শুধু তাদের ভাল গুণ অস্বীকার করা হয়েছিল। এখানে ভাল গুণ অস্বীকার করার সাথে সাথে খারাপ গুণও সাব্যস্ত করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ অতি ভক্তের দল এসব সত্তাকে সংকট নিরসনকারী, অভিযোগের প্রতিকারকারী, দরিদ্রের সহায়, ধনদাতা এবং আরো কত কিছু মনে করে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ডাকতে থাকে। অথচ এরা আসলে মৃত নিশ্চল বস্তু এগুলোতে কোন রূহ নেই। এগুলো কোন কথা শুনে না, দেখে না, বুঝেও না। আরও অতিরিক্ত হচ্ছে যে, এগুলো জানে না কখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তাহলে তাদের কাছে কিভাবে কোন উপকারের আশা করা যেতে পারে? কিভাবে সওয়াব ও প্রতিদানের আশা তাদের কাছে করা যায়? এটা তো শুধু তার কাছ থেকেই জানা যায় যে সবকিছু জানে এবং সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। [ইবন কাসীর]

(৩) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জানাচ্ছেন যে, একমাত্র এক ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আর এটাও জানাচ্ছেন যে, কাফেররা তা অস্বীকার করে। তাদের মধ্যে ওয়ায নসীহত ও স্মরণ কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। তারা হক গ্রহণের বদলে শুধু অহংকারই করে বেড়ায়, কোন সঠিক কিছু মেনে নেয়াকে তারা অনেক বড় করে দেখে। অস্বীকার তাদের প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] তারা এ জন্য প্রায়ই শুধু আশ্চর্যবোধ করত। তারা বলতঃ "তিনি কি সমস্ত ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে ফেলেছেন? এটা তো এক আশ্চর্য বস্তু"। [সূরা ছোয়াদঃ ৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেনঃ "শুধু এক আল্লাহ্‌র কথা

তারা অহংকারী[১]।

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ۝٢٣

২৩. নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ঘোষণা করে। নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٢٤

২৪. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন? তখন তারা বলে, পূর্ববর্তীদের উপকথা![২]'

বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উপাস্যগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।" [সূরা আয-যুমারঃ ৪৫]

(১) তাদের অহংকারের কারণে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন। সূরা গাফেরের ৬০ নং আয়াতেও আল্লাহ্ তা উল্লেখ করেছেন। [ইবন কাসীর] হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যার অন্তরে সামান্যতম অহংকারও থাকবে সে জান্নাতে যাবে না। আর যার অন্তরে সামান্যতম ঈমানও থাকবে সে জাহান্নামে থাকবে না। একলোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন লোক যদি চায় যে তার কাপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক? তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সুন্দর তিনি সুন্দর পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে হককে না মানা ও মানুষকে হেয় করে দেখা।' [মুসলিমঃ ৯১]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের চর্চা যখন চারদিকে হতে লাগলো তখন মক্কার লোকেরা যেখানেই যেতো সেখানেই তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো, তোমাদের ওখানে যে ব্যক্তি নবী হয়ে এসেছেন তিনি কি শিক্ষা দেন? কুরআন কোন ধরনের কিতাব, তার মধ্যে কি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে মক্কার কাফেররা সবসময় এমন সব শব্দ প্রয়োগ করতো যাতে প্রশ্নকারীর মনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি যে কিতাবটি এনেছেন সে সম্পর্কে কোন না কোন সন্দেহ জাগতো অথবা কমপক্ষে তার মনে নবীর বা তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে সকল প্রকার আগ্রহ খতম হয়ে যেত। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন, সূরা আল-ফুরকানঃ ৫] এভাবেই তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যাচার করতো এবং তার সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী সম্পূর্ণ অসার অলীক বাতিল কথাবার্তা বলতো। কেননা যারাই হকের বিপরীতে কথা বলবে, তারা যত প্রকারের কথাই বলুক না কেন, সবই ভুল ও অসার হতে বাধ্য। তারা বলত, জাদুকর, কবি, গণক, পাগল। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের সবচেয়ে

২৫. ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পাপের বোঝা পূর্ণ মাত্রায় এবং তাদেরও পাপের বোঝা যাদেরকে তারা অজ্ঞতাবশত বিভ্রান্ত করেছে[১]। দেখুন, তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট!

لِيَحْمِلُوٓا۟ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾

চতুর্থ রুকূ'

২৬. অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীগণ চক্রান্ত করেছিল; অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি আসল এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধি করতে পারেনি[২]।

قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

বড় শিক্ষক ওলীদ ইবন মুগীরা আল-মাখযুমী যা বলেছিল তাতেই সবাই একমত হয়েছিল। আল্লাহ্ বলেন, "সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল। সুতরাং ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত করল! তারপরও ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল! তারপর সে তাকাল। তারপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। তারপর সে পিছন ফিরল এবং অহংকার করল। অতঃপর সে বলল, 'এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির: ২৪] অর্থাৎ বলা হয়ে থাকে যে, তার আনিত বিষয় জাদু। শেষপর্যন্ত তারা এটার উপর পরস্পর একমত হয়ে চলে যায়। [ইবন কাসীর]

(১) যারাই কারো পথভ্রষ্টতার কারণ হবে তারাই ভ্রষ্টদের যাবতীয় পাপের ভাগী হবে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ বলেন "তারা তো বহন করবে নিজেদের ভার এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা ; আর তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।" [সূরা আল-আনকাবূত: ১৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "কেউ ভালো কাজের সূচনা করলে যত লোক এর উপর আমল করবে তত লোকের আমলের সমপরিমান সওয়াব তার জন্য লিখা হবে, আর কেউ মন্দ কাজের সূচনা করলে যত লোক এ কাজ করবে ততলোকের কাজের সমপরিমান গুণাহ তার জন্য লিখা হবে। অথচ তাদের গুণাহের সামান্যতমও কমতি করা হবেনা"। [মুসলিমঃ ১০১৭]

(২) এ আয়াতে কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এর দ্বারা নমরূদকে বুঝানো হয়েছে। যে

২৭. পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন[১] এবং তিনি বলবেন, কোথায় আমার সেসব শরীক[২] যাদের সম্বন্ধে তোমরা ঘোর বিতণ্ডা করতে? যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۷﴾

নিজেকে ইলাহ বলে দাবী করেছিল এবং আকাশে উঠার জন্য সিঁড়ি স্থাপন করেছিল। সে সিঁড়ির মুলোৎপাটিত করা হয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তাকে সামান্য একটি মশা দিয়ে শাস্তি দিয়েছিলেন। যা তার নাকের ছিদ্র পথে ঢুকে গিয়েছিল। তারপর চারশ' বছর পর্যন্ত সে এ শাস্তি ভোগ করেছে। তার কাছে ঐ ব্যক্তি বেশী দরদী বলে বিবেচিত হতো যে দু'হাতে হাতুড়ি দিয়ে তার মাথায় পেটাতো। সে চারশ' বছর মানুষকে পদানত করে রেখেছিল। তাই আল্লাহ্ তাকে চারশ' বছর পর্যন্ত হাঁতুড়ির পেটা খাইয়েছেন। তারপর আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু দেন। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির অবশ্য বলেন যে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য বুখতনাসর। [ইবন কাসীর] তার সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা ইয়াহূদী ও নাসারাদের গ্রন্থে এসেছে। অবশ্য অধিকাংশ মুফাসসির বলেনঃ এখানে কোন সুনির্দিষ্ট লোক না বুঝিয়ে যারাই আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কুটকৌশল অবলম্বন করেছিল তাদের সবার জন্য উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] বিভিন্ন সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছেন। [দেখুন, সূরা ইবরাহীমঃ ৪৬, সূরা নূহঃ ২২, সূরা সাবাঃ ৩৩]

(১) তাদের গোপন ষড়যন্ত্রসমূহ ফাঁস করে দিয়ে তাদেরকে লজ্জিত করবেন। অনুরূপ কথা সূরা আত-তারেক এর ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, "যে দিন গোপন তথ্যসমূহ ফাঁস করে দেয়া হবে সেদিন তাদের কোন শক্তি বা সাহায্যকারী থাকবে না"। অথচ তারা দুনিয়াতে এ শক্তি-সামর্থ্য ও সাহায্যকারীর কারণে গর্ব ও অহংকার করে বেড়াত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক গাদ্দার তথা বিশ্বাসঘাতকের পিছনের অংশে তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ একটি পতাকা লাগিয়ে দেয়া হবে। তাতে বলা থাকবেঃ এটা অমুকের পুত্র অমুকের গাদ্দারীর প্রমাণপত্র"। [বুখারী: ৩১৮৭; মুসলিম:১৭৩৬] এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ষড়যন্ত্রকারী, চক্রান্তকারী ও ধোঁকাবাজের যাবতীয় গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে তাকে অপমানিত করবেন।

(২) এখানে শরীকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার মূল কারণ হচ্ছে ধমকি প্রদান। কারণ, সেদিন আল্লাহ্ তা'আলার সম্মান, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা সবাই সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। আর তখন প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্‌র সাথে যে শরীক নির্ধারণ করেছিলাম তা ছিল বোকামী। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

তারা বলবে[১], আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের উপর--

২৮. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্‌তাগণ তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করা অবস্থায়; তখন তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে, ‘আমরা কোন মন্দ কাজ করতাম না।’[২] অবশ্যই হ্যাঁ, নিশ্চয় তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত।

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ ۚ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. কাজেই তোমরা দরজাগুলো দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ী হয়ে। অতঃপর অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছিল তাদেরকে বলা হল, ‘তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন’? তারা বলল,

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾

---

(১) এখানে আল্লাহ্‌র দ্বীনের জ্ঞানীদের সম্মানিত করা হয়েছে। যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে সমস্ত দলীল-প্রমাণাদি স্থাপন করা শেষ হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র আযাবের বাণী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, আর কাফেররা ওজর আপত্তি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, তখন জানবে যে, তাদের পালানোর কোন জায়গা নেই। তখন দ্বীনের জ্ঞানীরা এ কথা বলবে। তারা বলবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের উপর-- [ইবন কাসীর] তারা হলো আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানী। যারা দুনিয়াতে হক্ক কথা বলতে কখনো পিছপা হতো না তারা আখেরাতেও হক্ক কথা বলার সুযোগ পাবে। এটা তাদের জন্য বড় সম্মানের বিষয়। [ইবন কাসীর]

(২) এটা তাদের মিথ্যাচার। অন্য আয়াতে এসেছে, তারা বলবে “আল্লাহর শপথ আমরা কখনো মুশরিক ছিলাম না” [সূরা আল-আন‘আমঃ ২৩] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ “যে দিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সবাইকে, তখন তারা আল্লাহ্‌র কাছে সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের কাছে করে” [সূরা আল-মুজাদালাহঃ ১৮] তাদের মিথ্যাচারের কারণে আল্লাহ্ তা‘আলা বলছেন যে, তোমাদের কথা সঠিক নয়; বরং তোমরা যাবতীয় মন্দ কাজ করতে। আল্লাহ্ তা‘আলা তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

'মহাকল্যাণ[১]।' যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে এ দুনিয়ায় মঙ্গল এবং আখিরাতের আবাস আরো উৎকৃষ্ট। আর মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম[২]!

৩১. সেটা স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে; তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা যা কিছু চাইবে তাতে তাদের জন্য তা-ই থাকবে[৩]। এভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদেরকে,

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ لَهُمۡ فِيۡهَا مَا يَشَآءُوۡنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجۡزِى اللّٰهُ الۡمُتَّقِيۡنَ ۙ﴿۳۱﴾

(১) ঈমানদারগণ তাদের কাছে যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে তাকে বিরাট নেয়ামত জ্ঞান করে। তারা কাফেরদের মত এটা বলে না যে, পূর্ববর্তীদের গাঁথা। বরং তাদের কাছে এটা এক মহাকল্যাণের বস্তু, রহমত ও উত্তম জিনিস যারা তার অনুসরণ করবে ও তার উপর ঈমান আনবে। তারপর তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঈমানদারদের জন্য যে পুরস্কার রয়েছে তা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে এ দুনিয়ায় মংগল এবং আখিরাতের আবাস আরো উৎকৃষ্ট। আর মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।" [সূরা আন-নাহল: ৯৭] ইবন কাসীর বলেন, যে কেউ দুনিয়াতে উত্তম আমল করবে, আল্লাহ্ তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে তার আমলটি সুন্দর করে দিবেন।

(২) এ আয়াতের সমার্থে আরো কিছু আয়াত রয়েছে। [দেখুনঃ সূরা ইউনুসঃ ২৬, সূরা আন-নাহলঃ ৯৭, সূরা আল-কাসাসঃ ৮০, সূরা আলে ইমরানঃ ১৯৮, সূরা আল-আ'লাঃ ১৭, সূরা আদ-দোহাঃ ৪]

(৩) এ হচ্ছে জান্নাতের আসল পরিচয়। সেখানে মানুষ যা চাইবে তা পাবে। তার ইচ্ছা ও পছন্দ বিরোধী কোন কাজই সেখানে হবে না। দুনিয়ার কোন প্রধান ব্যক্তি, কোন প্রধান নেতা এবং কোন বিশাল রাজ্যের অধিকারী বাদশাহও কোন দিন এ নিয়ামত লাভ করেনি। দুনিয়ায় এ ধরনের নিয়ামত লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক অধিবাসীই সেখানে আনন্দ ও উপভোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। তার জীবনে সর্বক্ষণ সবদিকে সবকিছু হবে তার ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী। তার প্রত্যেকটি আশা সফল হবে, প্রত্যেকটি কামনা ও বাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং প্রত্যেকটি ইচ্ছা ও আকাংখা বাস্তবায়িত হবে। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন সূরা আয-যুখরুফঃ ৭১]

٣٢ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

৩২. ফিরিশ্‌তাগণ[১] যাদের মৃত্যু ঘটায় উত্তমভাবে। ফিরিশ্‌তাগণ বলবেন, তোমাদের উপর সালাম! তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর[২]।

٣٣ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

৩৩. তারা তো শুধু তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা আসার প্রতীক্ষা করে অথবা আপনার রবের নির্দেশ আসার। তাদের পূর্ববর্তীরা এরূপই

---

(১) এ আয়াত এবং এর পরবর্তী যে আয়াতে মৃত্যুর পর মুত্তাকী ও ফেরেশতাদের আলাপ আলোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো কুরআন মজীদের এমন ধরনের আয়াতের অন্যতম যেগুলো সুস্পষ্ট ভাবে কবরের আযাব ও সওয়াবের প্রমাণ পেশ করে। সূরা আল-মু'মিনের ৪৫-৪৬ আয়াতে এসবের চাইতে বেশী সুস্পষ্ট ভাষায় বর্‌যখের আযাবের কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ ফির'আউন ও ফির'আউনের পরিবারবর্গ সম্পর্কে বলেছেন, একটি কঠিন আযাব তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। সকাল-সাঁঝে তাদেরকে আগুনের সামনে নিয়ে আসা হয়। তারপর যখন কিয়ামতের সময় এসে যাবে তখন হুকুম দেয়া হবে– ফির'আউনের পরিবারবর্গকে কঠিনতম আযাবের মধ্যে ফেলে দাও।" এখানে এটা বিশ্বাস করা জরুরী যে, কবরের শাস্তি শুধু রূহের উপর হবে না। বরং রূহ এবং দেহ উভয়টির উপরই হবে। কিয়ামতের মাঠে এবং এর পরবর্তী জীবন হবে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের যার সাথে দুনিয়ার জীবনের কোন তুলনাই চলে না। সেখানে সবকিছুর গতি প্রকৃতি ভিন্ন হবে।

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর সময় ঈমানদারগণের যে অবস্থা হয় এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাদেরকে কিভাবে সাদর সম্ভাষণ জানায় তা বর্ণনা করছেন। অনুরূপ আয়াত কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এসেছে। [দেখুনঃ সূরা ফুসসিলাতঃ ৩০-৩২] তবে একথা জানা আবশ্যক যে, সৎকাজ করা জান্নাতে যাওয়ার কারণ। কিন্তু শুধুমাত্র সৎকাজই মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না, যতক্ষন তার সাথে আল্লাহ্‌র রহমত না থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ তার কাজের বিনিময়ে নাজাত পাবে না। লোকেরা বললঃ আপনিও পাবেন না? তিনি বললেনঃ না, আমিও না। তবে আল্লাহ্ যদি তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখেন। সুতরাং সঠিক এবং কর্তব্যনিষ্ঠভাবে কাজ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করো, সকাল বিকাল এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। এসব কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। মধ্যম পন্থাই তোমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছাবে। [বুখারীঃ ৬৪৬৩]

করত[১]। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেননি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করত।

৩৪. কাজেই তাদের উপর আপতিত হয়েছে তাদেরই মন্দ কাজের পরিণতি এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছে তা-ই, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾

পঞ্চম রুকূ'

৩৫. আর যারা শির্ক করেছে, তারা বলল, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন কিছুর 'ইবাদাত করতাম না[২]। আর কোন কিছু তাঁকে ছাড়িয়ে

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

(১) এর অর্থ হচ্ছে, যতদূর বুঝবার ব্যাপার ছিল আপনি তো প্রত্যেকটি সত্যকে উন্মুক্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যুক্তির সাহায্যে তার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছেন। বিশ্বজাহানের সমগ্র ব্যবস্থা থেকে এর পক্ষে সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন। কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য শির্কের ওপর অবিচল থাকার কোন অবকাশই রাখেননি। এখন এরাই একটি সরল সোজা কথা মেনে নেবার ব্যাপারে ইতস্তত করছে কেন? এরা কি মউতের ফেরেশতার অপেক্ষায় আছে? এ ফেরেশতা সামনে এসে গেলে তখন জীবনের শেষ মুহূর্তে কি এরা তা মেনে নেবে? অথবা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আযাব সামনে এসে গেলে তার প্রথম আঘাতের পর তা মেনে নেবে? কাতাদাহ বলেন, ফিরিশতার আগমন বলে এখানে মৃত্যু নিয়ে ফিরিশতাদের আগমন বোঝানো হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ বলে কিয়ামতের দিনের কথা বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে কাফের মুশরিকদের একটি বড় সন্দেহের উল্লেখ করে তা অপনোদন করেছেন। সন্দেহটি হলোঃ যদি আল্লাহ্ আমাদের কর্মকাণ্ড অপছন্দ করতেন তবে অবশ্যই তার জন্য শাস্তি বিধান করতেন এবং আমাদেরকে তা করতে দিতেন না। যেহেতু তিনি আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন না এবং আমাদেরকে শির্ক করতে দিচ্ছেন তা দ্বারা বুঝা গেল যে, আমাদের কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট আছেন। তাই আমাদেরকে আর কোন দাওয়াত গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দাবী খণ্ডন করে বলেনঃ ﴿ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ অর্থাৎ তাদের দাবীর মত দাবী তাদের পূর্বেকার কাফের মুশরিকগণও করেছিল। তাদের কাছে এটার ব্যাপারে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই। তারা তাদের মনগড়া কথাকে

হারামও ঘোষণা করতাম না'[১]। তাদের পূর্ববর্তীরা এরূপই করত। রাসূলদের কর্তব্য কি শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেয়া নয়?[২]।

চালিয়ে নিচ্ছে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা দু'ধরনের। এক ধরনের ফয়সালা আছে যাকে বলা হয় জাগতিক ফয়সালা, যার বাইরে কেউ যাবার অধিকার রাখে না। যেমন, জীবন -মৃত্যু, রোগ-শোক ইত্যাদি। এ ধরনের ফয়সালার সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নির্ভর করে না। আরেক ধরনের ফয়সালা আছে যাকে বলা হয় শর'য়ী ফয়স-ালা। যেমন ঈমান আনা, ভাল কাজ করা ইত্যাদি। এ ধরনের ফয়সালার সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে। এ ধরনের ফয়সালার ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষ ইচ্ছা করলে ঈমান আনতে পারে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করে। আবার কুফরীও এখতিয়ার করতে পারে যাতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহ্ মানুষকে যে সীমিত স্বাধীনতা দিয়েছেন তার কারণেই তাকে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্র শরী'আত অনুসারে চলার জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়ে তাঁর পথের দিশা দেন। তিনি তাদেরকে সে পথ মানতে বাধ্য করে দেন না। কারণ, বাধ্য করে দিলে তাকলীফ থাকে না। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রয়োজন পড়তো না। নবীদের কাজ তো শুধু হক পথকে মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। এর পর যারা ঈমান আনবে তারা জান্নাতি হবে আর যারা ঈমান আনবে না তারা জাহান্নামি হবে। সুতরাং এখানে কাফেরদের উত্থাপন করা কুটতর্কের কোন অর্থ নেই। তারা অন্যান্য ব্যাপারে এ ধরনের কুটতর্ক মানে না, শুধু ঈমান ও নতুন আইন প্রবর্তনের ব্যাপারে তা পেশ করে থাকে। তাদেরকে যদি গালি দেয়া হয় বা তাদের কাবাকে কেউ ধ্বংস করতে আসে তবে তা প্রতিহত করতে সদা প্রস্তুত থাকে। তখন একথা বলে না যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুসারে হচ্ছে। শুধু ঈমান ও আল্লাহ্র আইনের ব্যাপারেই তারা এরকম করে থাকে। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, মাজমু' ফাতাওয়া: ৮/২৫৬-২৬১; ১০/৩৪; ২০/৬৫; মিনহাজুস সুন্নাহ: ৩/৬০]

(১) যেমন তারা বিভিন্ন জন্তুকে ছেড়ে দিত এবং এগুলোকে খাওয়া ও ধরা-ছোঁয়া হারাম ঘোষণা করত। যেমন, বাহীরা, সায়েবা, ওয়াসীলা ইত্যাদি। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন সূরা আল-আন'আমঃ ১৩৮ এবং সূরা আল-মায়েদাঃ ১০৩]

(২) এটা কাফেরদের সন্দেহের উত্তর। বলা হয়েছে যে, তোমাদের দাবী যে আল্লাহ্ চাইলে আমরা তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করতে সক্ষম হতাম না, যদি তিনি চাইতেন তবে তিনি আমাদের এ কাজ অস্বীকার করেন না কেন? আমাদের কুফর, শির্ক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেন না কেন? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের কার্যাবলীকে কঠোরভাবে ঘৃণা করেছেন এবং শক্তভাবে নিষেধ

করেছেন। আর সে জন্যই তিনি প্রতি জাতিতে প্রতি প্রজন্মে, প্রতি গোষ্ঠীতে তাঁর নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন। তারা সবাই একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদাত না করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক" এভাবে মানুষের কাছে তিনি রাসূলদেরকে পাঠিয়েই চলেছেন, যখন থেকে বনী আদমের মধ্যে শির্কের উৎপত্তি হয়েছে। কাওমে নূহের মধ্যে। যখন তাদের কাছে নূহকে তিনি পাঠিয়েছিলেন। আর তিনি ছিলেন যমীনের অধিবাসীদের কাছে পাঠানো প্রথম রাসূল। এ রাসূলদের পাঠানোর ধারা তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে শেষ করেন। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর অবশ্যই আমরা প্রতিটি উম্মতে রাসূলদেরকে এ বলে পাঠিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর"। সুতরাং মুশরিকদের পক্ষে এটা বলা কিভাবে সঙ্গত হবে যে, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন কিছুর 'ইবাদাত করতাম না । আর কোন কিছু তাঁকে ছাড়িয়ে হারামও ঘোষণা করতাম না'। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র শরী'আতগত ইচ্ছা তোমাদের সাথে নেই। কেননা তিনি তাঁর রাসূলদের মুখে তোমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন। আর যদি বল প্রকৃতিগত ইচ্ছা যা নির্ধারিত থাকার কারণে তোমরা শির্ক ও কুফরি ও অন্যান্য অন্যায় কাজ করতে সমর্থ হও, তবে এটা থেকে তোমাদের দলীল নেয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামও সৃষ্টি করেছেন, জাহান্নামের বাসিন্দা শয়তান ও কাফেরদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি বান্দাদের কুফরীতে সন্তুষ্ট নন। এর মধ্যে তাঁর বিশেষ হিকমত ও রহস্য রয়েছে। [ইবন কাসীর] রহস্যের তাগিদে তাদেরকে জোর করে ঈমানদার ও পরহেযগার বানানো সঠিক ছিল না। সুতরাং কাফেরদের একথা বলা যে, 'আমাদের ধর্মমত আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধ্য করেন না কেন', একটি বোকামী ও হঠকারিতা প্রসূত প্রশ্ন বৈ নয়। শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আরও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদের দাবী যে, 'আমাদের কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌র মনঃপুত: না হলে আল্লাহ্ কেন আমাদের কর্মকাণ্ড অস্বীকার করেন না' এ কথাটি মোটেই ঠিক নয়। কারণ, নবী পাঠিয়ে তোমাদের কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করা হয়েছে। সর্বোপরি তোমরা যখন রাসূলদের সাবধানবাণী অনুসারে শির্ক, কুফর ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত হলে না, তখন তিনি তোমাদের উপর শাস্তি নাযিল করেন। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হিদায়াত দিয়েছেন, আর তাদের কিছু সংখ্যকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল; কাজেই তোমরা যমীনে পরিভ্রমণ কর অতঃপর দেখে নাও মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে?" অর্থাৎ তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যারা আমার রাসূলদের নির্দেশের বিরোধিতা করেছিল এবং হকের উপর মিথ্যারোপ করেছিল তাদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। "আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম"। [সূরা মুহাম্মাদ: ১০]

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর[১]। অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হিদায়াত দিয়েছেন, আর তাদের কিছু সংখ্যকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল; কাজেই তোমরা যমীনে পরিভ্রমণ কর অতঃপর দেখে নাও মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে[২]?

“আর এদের পূর্ববর্তীগণও অস্বীকার করেছিল; ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার প্রত্যাখ্যান (শাস্তি)।” [সূরা আল-মুলক: ১৮] [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াত থেকে একটি সত্য স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক নবীর মিশনই ছিল তাওহীদের। সবাই তাওহীদের আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাগুত ও শির্ক থেকে তাদের উম্মতদেরকে সাবধান করে গেছেন। এ ব্যাপারে প্রত্যেকের দাবী ছিল এক। কোন হেরফের ছিল না। আদম, নূহ, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকেই তাওহীদ তথা একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় উপাস্য পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের কেউই নিজেকে বা অপর কোন সৃষ্টিকে ইলাহ বলে ঘোষণা দেননি। নাসারাদের ত্রিত্ববাদ ঈসা আলাইহিসসালামের দাওয়াত নয়। [সমস্ত নবী-রাসূলদের দাওয়াত যে একই ছিল এবং আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক প্রত্যেক জাতির নিকট নবী-রাসূল পাঠানোর বিষয়ে আরো দেখুন, সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২৫, সূরা আয-যুখরুফঃ ৪৫]

(২) অর্থাৎ নিশ্চয়তা লাভ করার জন্য অভিজ্ঞতার চাইতে আর কোন বড় নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নেই। এখন তুমি নিজেই দেখে নাও, মানব ইতিহাসের একের পর এক অভিজ্ঞতা কি প্রমাণ করছে? আল্লাহর আযাব কার ওপর এসেছে-ফেরাউন ও তার দলবলের ওপর, না মূসা ও বনী ইসরাঈলের ওপর? সালেহকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের ওপর, না তাঁকে যারা মেনে নিয়েছিল তাদের ওপর? হূদ, নূহ ও অন্যান্য নবীদেরকে যারা অমান্য করেছিল তাদের ওপর, না মু'মিনদের ওপর? এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলোর ফল কি এই দাঁড়িয়েছে যে, আমার ইচ্ছার কারণে যারা শির্ক করার ও মনগড়া শরী‘আত গঠনের সুযোগ লাভ করেছিল তাদের প্রতি আমার সমর্থন ছিল? বরং বিপরীত পক্ষে এ ঘটনাবলী সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণ করছে যে,

إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. আপনি তাদের হিদায়াতের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হলেও[১] আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তাকে হিদায়াত দেন না এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও নেই[২]।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

৩৮. আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না[৩]। অবশ্যই

উপদেশ ও অনুশাসন সত্ত্বেও যারা এসব গোমরাহীর ওপর ক্রমাগত জোর দিয়ে চলেছে। আমার ইচ্ছাশক্তি তাদেরকে অপরাধ করার অনেকটা সুযোগ দিয়েছে। তারপর তাদের নৌকা পাপে ভরে যাবার পর ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন জ্বালালো। আর আগুন যখন তার চারপাশ আলোকিত করল, পতঙ্গ এবং যে সমস্ত প্রাণী আগুনে ঝাঁপ দেয় সেগুলো ঝাঁপ দিতে লাগল। তখন সে ব্যক্তি সেগুলোকে আগুন থেকে ফিরাবার চেষ্টা করল, তা সত্ত্বেও সেগুলো আগুনে পুড়ে মরে। তদ্রূপ আমিও তোমাদের কোমরের কাপড় ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তোমরা তাতে পতিত হও।" [বুখারীঃ ৬৪৮৩]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় উম্মাতের হেদায়াতের জন্য ব্যস্ত থাকতেন। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, আপনি চাইলেই যে, তারা হেদায়াত পেয়ে যাবে এমনটি নয়। হেদায়াত দেয়ার মালিক আল্লাহ্। তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করবেন। কিন্তু তাঁর চিরাচরিত নিয়ম হলো, তিনি তাদেরকেই হেদায়াত দেন যারা হেদায়াত পাওয়ার জন্য আগ্রহী। অপরপক্ষে যারা হেদায়াতের পথ থেকে দূরে থাকা বেশী পছন্দ করছে, হেদায়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তাদেরকে তিনি হেদায়াত করেন না। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন, সূরা আল-মায়েদাহঃ ৪১, সূরা হুদঃ ৩৪, সূরা আল-আ'রাফঃ ১৮৬, সূরা ইউনুসঃ ৯৬-৯৭]

(৩) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, বনী আদম আমাকে গালি দেয় অথচ তাদের পক্ষে আমাকে গালি দেয়া উচিত নয়। আবার তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাও তাদের জন্য উচিত নয়। তাদের গালি হলো তারা আমার ব্যাপারে বলে যে, আমার সন্তান আছে, আর আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হলো এটা বলা যে, তিনি (আল্লাহ্) যেভাবে আমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবেন না।" [বুখারীঃ ৩১৯৩]

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

হ্যাঁ, তাঁর নিজের উপর কৃত প্রতিশ্রুতি তিনি সত্যে রূপ দেবেন। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই জানে না[১]।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯. যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করছে, তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার জন্য এবং কাফিরদের জানার জন্য যে, নিশ্চয় তারা ছিল মিথ্যাবাদী[২]।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

৪০. আমরা কোন কিছুর ইচ্ছে করলে সে বিষয়ে আমাদের কথা তো শুধু এই যে, আমরা বলি, 'হও'; ফলে তা হয়ে যায়[৩]।

---

(১) জানেনা বলেই রাসূলদের বিরোধিতা করে এবং কুফরিতে নিপতিত হয়। [ইবন কাসীর] তারা এটাও জানে না যে, পুনরুত্থান ও হিসেব নেয়া তাঁর পক্ষে একেবারেই সহজ। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ বক্তব্য থেকে মৃত্যুর পরের জীবন এবং শেষ বিচারের দিনের জন্য মানুষের পুনরুত্থানের রহস্য ও হিকমত বর্ণনা করা হচ্ছে। [ইবন কাসীর] দুনিয়ায় যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, সত্য সম্পর্কে অসংখ্য মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এ ধরনের মতবিরোধের ক্ষেত্রে বিবেকের দাবী এই যে, এক সময় না এক সময় সঠিক ও নিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হোক যথার্থই তাদের মধ্যে হক কি ছিল এবং বাতিল কি ছিল, কে সত্যপন্থী ছিল এবং কে মিথ্যাপন্থী। এ দুনিয়ায় এ যবনিকা সরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাই এমন যে, এখানে সত্য কোনদিন পর্দার বাইরে আসতে পারে না। কাজেই বিবেকের এ দাবী পূরণ করার জন্য ভিন্ন আরেকটি জগতের প্রয়োজন। আর সেটাই হচ্ছে আখেরাত। [এ বিষয়টির দিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন, দেখুন সূরা আত-তূরঃ ১৪-১৬, সূরা আল-কামারঃ ৫০, সূরা লুকমান ২৮] তাছাড়া আরও একটি কারণে মানুষের পুনরুত্থান প্রয়োজন বলে এখানে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, এ সমস্ত কাফের ও মুশরিকরা শপথ ও কসম করে কিয়ামতের আগমন ও সেখানে মানুষের পুনরুত্থানের বিষয়টি অস্বীকার করছে, সুতরাং কিয়ামত ও পুনরুত্থান হলে কারা তাদের শপথে মিথ্যাবাদী ছিল সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে। [ইবন কাসীর] তখন তাদের বিচার করা হবে। যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে। [ইবন কাসীর] [এ ব্যাপারে দেখুন সূরা আন-নাজমঃ ৩১]

(৩) অর্থাৎ লোকেরা মনে করে, মরার পর মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করা এবং সামনের

ষষ্ঠ রুকূ'

৪১. আর যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র পথে হিজরত[১] করেছে[২],

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا

পেছনের সমগ্র মানব-কূলকে একই সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করা বড়ই কঠিন কাজ। অথচ আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। নিজের কোন সংকল্প পূর্ণ করার জন্য তাঁর কোন সাজ-সরঞ্জাম, উপায়-উপকরণ ও পরিবেশের আনুকুল্যের প্রয়োজন হয় না। তাঁর প্রত্যেকটি ইচ্ছা শুধুমাত্র তাঁর নির্দেশেই পূর্ণ হয়। বর্তমানে যে দুনিয়ার অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, এটিও নিছক হুকুম থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং অন্য দুনিয়াটিও মুহূর্তকালের মধ্যে শুধুমাত্র একটি হুকুমেই জন্ম লাভ করবে। যখন তিনি 'হও' বলবেন তখনি তা হয়ে যাবে। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর আমাদের আদেশ তো কেবল একটি কথা, চোখের পলকের মত।" [সূরা আল-কামার: ৫০] [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) هجرة আভিধানিক অর্থ ত্যাগ করা। আল্লাহ্‌র জন্য দেশ ত্যাগ করা ইসলামে একটি বড় 'ইবাদাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'হিজরতের পূর্বে মানুষ যেসব গোনাহ্ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়'। [মুসলিম:১২১] হিজরত কোন কোন অবস্থায় ফরয, ওয়াজিব এবং কোন কোন অবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম হয়ে থাকে।

(২) কোন কোন মুফাসসির বলেন, যেসব মুহাজির কাফেরদের অসহনীয় জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা থেকে হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করেছিলেন এখানে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] অপর কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতে মদীনায় হিজরতকারী সাহাবীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যেমন, বিলাল, সুহাইব, খাব্বাব, আম্মার প্রমূখ। [কুরতুবী] তবে যারাই হিজরত করেছে এবং করবে আয়াত তাদের সবাইকে শামিল করে। [কুরতুবী] এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত মুমিন বান্দাদের ফযিলত সম্পর্কে জানাচ্ছেন যারা আল্লাহ্‌র পথে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য যুলুম, নির্যাতন, কষ্ট ও জাতির পক্ষ থেকে পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার পর হিজরত করেছে। যারা তাদেরকে ঈমান থেকে কুফরি ও শির্কের দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য পরীক্ষায় ফেলেছে, ফলে তারা তাদের জন্মভূমি ও বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার জন্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব। তার একটি দুনিয়াতেই তারা পাবে, আর সেটি হচ্ছে প্রশস্ত রিযিক ও স্বচ্ছন্দ জীবন। [সা'দী] আল্লাহ্ তা'আলা মদীনাকে তাদের জন্য কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন। উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তারা মহানুভব, সহানুভূতিশীল প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তারা শত্রুদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্য লাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছুদিন অতিবাহিত হতেই তাদের সামনে রিয্‌কের দ্বারা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যারা ছিলেন ফকীর, মিসকীন, তারা হয়ে গেলেন বিত্তশালী, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

আমরা অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দেব; আর আখিরাতের পুরস্কার তো অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। যদি তারা জানত!

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. যারা ধৈর্য ধারণ করে ও তাদের রবের উপর নির্ভর করে।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর আপনার আগে আমরা ওহীসহ কেবল পুরুষদেরকেই[১] পাঠিয়েছিলাম[২], সুতরাং তোমরা

বিজিত হয়। তাদের চরিত্র মাধুর্য ও সৎকর্মের কীর্তি আবহমান কাল পর্যন্ত শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাদেরকে এবং তাদের বংশধরদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা অসামান্য ইয্‌যত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। [ফাতহুল কাদীর] আর দ্বিতীয়টি আখেরাতের সওয়াব। যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সওয়াবের তুলনায় সেটি অনেক বড়। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই সফলকাম। তাদের রব তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং এমন জান্নাতের যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী নেয়ামত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে আছে মহাপুরস্কার।" [সূরা আত-তাওবাহ: ২০-২১] যদি তারা জানতে পারত যে যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে তাদের এত বড় সওয়াব রয়েছে তবে কেউই ঈমান ও হিজরত থেকে পিছপা হতো না। [সা'দী]

(১) এ আয়াত থেকে আকীদার একটি বিরাট মূলনীতি প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী-রাসূল হিসেবে একমাত্র পুরুষদেরকেই বাছাই করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কুরআনের তিনটি স্থানে সরাসরি এ ঘোষণা দিয়েছেন, [সূরা ইউসুফঃ ১০৯, সূরা আন-নাহলঃ ৪৩, সূরা আল-আম্বিয়াঃ৭] সুতরাং কোন মহিলাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী-রাসূল করে পাঠাননি। কারণ নবুওয়ত ও রিসালাতের গুরুদায়িত্ব কেবলমাত্র পুরুষরাই বহন করতে পারে।

(২) এখানে মক্কার মুশরিকদের একটি আপত্তি উদ্ধৃত না করেই তার জবাব দেয়া হচ্ছে। এ আপত্তিটি ইতোপূর্বে সকল নবীর বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীনরাও তাঁর কাছে বারবার এ আপত্তি জানিয়েছিল। এ আপত্তিটি ছিল এই যে, আপনি আমাদের মতই একজন মানুষ, তাহলে আল্লাহ আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন আমরা একথা কেমন করে মেনে নেবো? আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ আপত্তি ও তার উত্তর এ আয়াত সহ কুরআনের

জ্ঞানীদেরকে(১) জিজ্ঞেস কর যদি না জান,

৪৪. স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ(২)। আর আপনার প্রতি আমরা কুরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে(৩),

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾

বিভিন্ন স্থানে দিয়েছেন। [দেখুনঃ সূরা ইউনুসঃ ২, সূরা ইউসুফঃ ১০৯, সুরা আল-হিজরঃ ৯, সূরা আল-ইসরাঃ ৯৩-৯৫, সূরা আল-ফুরকানঃ ২০, সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৮, সূরা আল-আহকাফঃ ৯, সূরা আল কাহ্‌ফঃ ১১০]

(১) অর্থাৎ জ্ঞানী সম্প্রদায়, আহলি কিতাবদের আলেম সমাজ এবং আরো এমন সব লোক যারা নাম-করা আলেম না হলেও মোটামুটি আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা এবং পূর্ববর্তী নবীগণের জীবন বৃত্তান্ত জানেন। কুরআনের অন্য আয়াতেও এ নির্দেশটি ঘোষিত হয়েছে। যেমন, "আপনার আগে আমরা ওহীসহ পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম; সুতরাং যদি তোমরা না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৭]

(২) আয়াতের এ অংশটুকু পূর্ববর্তী আয়াতের "আমরা পাঠিয়েছিলাম" এর সাথে সংশ্লিষ্ট। [ইবন কাসীর] তখন আয়াতের পূর্ণ অর্থ হবেঃ "আমরা আপনার পূর্বেই শুধুমাত্র পুরুষ মানুষকেই ওহী দিয়ে পাঠিয়েছিলাম, তাদেরকে পাঠিয়েছিলাম স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহকারে"। আয়াতের অপর অর্থ হচ্ছে যে, এ আয়াতটি পূর্বোক্ত আয়াতের 'তোমরা যদি না জান' কথার সাথে সংশ্লিষ্ট। তখন অর্থ হবে, যদি তোমরা স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থ সম্পর্কে না জান তবে পূর্ববর্তী যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এ আয়াতে ذكر এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে কুরআনুল কারীম। [ইবন কাসীর] আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদের কাছে কুরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। কারণ, আপনি আপনার কাছে যা নাযিল হয়েছে সেটা সম্পর্কে ভাল জানেন। আর আপনি এটার উপর অত্যন্ত যত্নবান। আপনি এটার অনুসরণ করেই যাচ্ছেন। এটা এজন্যে যে, আমরা জানি আপনি সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টি এবং আদম সন্তানদের সর্দার বা নেতা। সুতরাং যা সংক্ষিপ্ত হিসেবে আছে তা আপনি তাদের কাছে বিবৃত করুন, যা তাদের কাছে খটকা লাগে তা বর্ণনা করুন। যাতে তারা তাদের নিজেদের জন্য দেখে-শুনে হিদায়াত গ্রহণ করতে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা লাভ করতে পারে। [ইবন কাসীর] সুতরাং আপনি তাদের কাছে এ কিতাবের প্রতিটি বিধি-বিধান, ওয়াদা ও ধমকি সবই আপনার কথা ও কাজের মাধ্যমে বর্ণনা করে দিন। এতে বুঝা গেল যে,

তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা করে।

৪৫. যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না অথবা তাদের উপর আসবে না শাস্তি এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধিও করবে না[১]?

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. অথবা চলাফেরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? অতঃপর তারা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না? নিশ্চয়

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন বর্ণনাকারী। তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ কিতাবের যাবতীয় সংক্ষিপ্ত হুকুম সালাত, যাকাত ইত্যাদি যে সমস্ত আহকাম বিস্তারিতভাবে আসেনি সেগুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবেন। [কুরতুবী]

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, আখেরাতের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌র আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমরা যে মাটির উপর বসে আছ, তার অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন করে দেয়া যেতে পারে; কিংবা কোন ধারণাতীত জায়গা থেকে তোমরা আযাবে পতিত হতে পার; যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসজ্জিত বীরযোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোন আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাও; যেমন কোন দূরারোগ্য প্রাণঘাতী রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে অথবা উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিষের সাথে আঘাত লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পার, কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আযাব না এসে টাকা-পয়সা, স্বাস্থ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। [এ ধরনের আয়াত আরো দেখুন, সূরা আল-মুলকঃ ১৬, ১৭, সূরা আল-আ'রাফঃ ৯৭, ৯৮] [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

তোমাদের রব অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু[১]।

৪৮. তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া[২] ডানে ও বামে ঢলে পড়ে একান্ত অনুগত হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়?

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর আল্লাহ্‌কেই সিজ্‌দা করে যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যমীনে, যত জীবজন্তু আছে সেসব এবং ফিরিশ্‌তাগণও, তারা অহংকার করে না।

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন আযাব বর্ণনা করার পর সর্বশেষে বলা হয়েছে ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ এতে আল্লাহ্‌র দয়ালু হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হুশিয়ারী প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে থাকে, যাতে গাফেল মানুষ হুশিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়। তবে তা শুধুমাত্র গোনাহ্‌গার ঈমানদারদের ব্যাপারে। কিন্তু যারা কাফের তাদের জন্য দুনিয়ার আযাবের সাথে আখেরাতের আযাবও অপেক্ষা করছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আল্লাহ্‌র চেয়ে বড় সহিষ্ণু আর কেউ নেই যে খারাপ শোনার পরও ধৈর্যধারণ করে, তারা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে তারপরও তিনি তাদেরকে রিযিক দেন এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করেন। [বুখারীঃ ৬০৯৯] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অবশ্যই আল্লাহ্ যালেমকে ছাড় দিতেই থাকেন, তারপর যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন সে তার ধরা থেকে পালানোর কোন পথ পায় না, তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেনঃ “এরূপই আপনার রবের শাস্তি! তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন ওরা যুলুম করে থাকে। নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন” [সূরা হুদঃ ১০২]। [মুসলিমঃ ২৫৮৩] অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা হজ্জের ৪৮ নং আয়াতেও এটা উল্লেখ করেছেন।

(২) অর্থাৎ দেহ বিশিষ্ট সমস্ত জিনিসের ছায়া থেকে এ আলামতই জাহির হচ্ছে যে, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, জন্তু-জানোয়ার বা মানুষ সবাই একটি বিশ্বজনীন আইনের শৃংখলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার ক্ষেত্রে কারোর সামান্যতম অংশও নেই। কোন জিনিসের ছায়া থাকলে বুঝতে হবে, সেটি একটি জড় বস্তু। আর জড় বস্তু হওয়ার অর্থ হলো, সেটি একটি সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার অনুগত গোলাম। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ছায়ার সিজদা সংক্রান্ত আলোচনা এর পূর্বে সূরা আর-রা'দের ১৫ নং আয়াতে করা হয়েছে।

৫০. তারা ভয় করে তাদের উপরস্থ[1] তাদের রবকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা করে ।

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ﴿٥٠﴾

সপ্তম রুকূ'

৫১. আর আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ করো না[2]; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ্[3] । কাজেই তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর ।'

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾

(১) এ আয়াত এবং এ ধরণের অসংখ্য আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে সুউচ্চে অবস্থান করছেন । তিনি তাঁর আরশের উপর আছেন । এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা । এর বাইরের যাবতীয় আকীদা বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা ।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে সাক্ষ্য দিল, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল । আর নিশ্চয় ঈসা আলাইহিসসালাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল এবং সে কালেমা যা তিনি মারইয়ামকে পৌঁছিয়েছেন ও তাঁর পক্ষ থেকে একটি 'রূহ' মাত্র । জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তার আমল যাই হোক, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন । আর অন্য সনদে জুনাদা এ কথাগুলো বাড়িয়ে বলেছেন , জান্নাতের আট দরজার যে কোন দরজা দিয়েই সে চাইবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন । [বুখারীঃ ৩৪৩৫]

(৩) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে তাঁর সাথে আর কাউকে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ না করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন । সাথে সাথে এ ঘোষণাই দিচ্ছেন যে, তিনিই একমাত্র ইলাহ্ । তারপর তাদেরকে তাঁকেই একমাত্র ভয় করার জন্য আদেশ দিচ্ছেন । কেননা, ভাল-মন্দ তাঁর হাতেই । তিনি ব্যতীত আর কেউ কারো ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না । এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছেন । [দেখুনঃ সূরা আয-যারিয়াতঃ ৫০, ৫১] অনুরূপভাবে একাধিক ইলাহ্ বিবেকের দাবীতেও অগ্রহণযোগ্য । আল্লাহ্ বলেনঃ "যদি এতদুভয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আরও অনেক ইলাহ্ থাকত তাহলে তা ধ্বংস হয়ে যেত" । [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২২] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ "আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ্ নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত । তারা যা বলে তার থেকে আল্লাহ্ কত পবিত্র!" [সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৯১]

وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. আর আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং সার্বক্ষণিক আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য[১]। তারপরও কি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও তাকওয়া অবলম্বন করবে?

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর তোমাদের কাছে যে সব নিয়ামত রয়েছে তা তো আল্লাহ্‌রই কাছ থেকে; তারপর যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে ডাক[২]।

ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. তারপর যখন আল্লাহ্ তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদের একদল তাদের রবের সাথে শির্ক করে[৩]---

(১) এ আয়াতের একটি অনুবাদ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাতাদাহ থেকে বর্ণিত। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কোন কোন মুফাসসির বলেন, وَاصِبًا এর অর্থ হচ্ছে, واجبًا বা বাধ্যতামূলকভাবে। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির واصِبًا এর অর্থ হচ্ছে, التَّعَبُ وَالإِعْيَاءُ বা ক্লান্তক্লিষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেই যেতে হবে, যদিও বান্দা সেটা করতে ক্লান্ত-ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। [কুরতুবী] আর যদি واصبًا শব্দের অর্থ خالصًا ধরা হয় [কুরতুবী] তখন এর অর্থ হবে "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সেগুলোর ইবাদত একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে"। তখন আয়াতটির সমার্থবোধক হবে আল্লাহ্‌র বাণীঃ "তারা কি আল্লাহ্‌র দ্বীন ব্যতীত অন্য কিছু খুঁজে ফিরছে? অথচ আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পন করেছে" [সূরা আলে ইমরানঃ ৮৩] তাছাড়া আয়াতটির নির্দেশসূচক অর্থও করা যায়। অর্থাৎ তোমরা একমাত্র তাঁকেই ভয় কর এবং তাঁরই আনুগত্য কর। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ "সাবধান দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই খালেস করে নাও" [সূরা আয-যুমারঃ ৩]

(২) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও দেখা যেতে পারে, সূরা আল-ইসরাঃ ৬৭।

(৩) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জানাচ্ছেন যে, বনী আদম যখন দুঃখ কষ্ট পায় তখন আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খালেস করে আহ্বান করতে থাকে, তারপর যখন আল্লাহ্ তাদের কষ্ট দূর করে দেন, বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেন, তখন তাদেরই একদল অর্থাৎ কাফের শ্রেণী সবচেয়ে স্বল্পতম সময়ে আগের অবস্থান কুফর ও অবাধ্যতায় ফিরে যায়। কুরআনের অন্যত্রও বলা হয়েছে, "তিনিই তোমাদেরকে

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য। কাজেই তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর আমরা তাদেরকে যে রিয্‌ক দান করি তারা তার এক অংশ নির্ধারণ করে[১] তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে তারা কিছুই

জলে-স্থলে ভ্রমণ করান। এমনকি তোমরা যখন নৌযানে আরোহন কর এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বেরিয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদিক থেকে উত্তাল তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা নিশ্চিত ধারণা করে যে, এবার তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে, তখন তারা আল্লাহকে তাঁর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে ডেকে বলেঃ 'আপনি আমাদেরকে এ থেকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখন তারা যমীনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করতে থাকে।" [সূরা ইউনুস: ২২] অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে সাথে কোন বুযর্গ বা দেব-দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতারও নযরানা পেশ করতে থাকে এবং নিজেদের প্রত্যেকটি কথা থেকে একথা প্রকাশ করতে থাকে যে, তাদের মতে আল্লাহর এ মেহেরবানীর মধ্যে উক্ত বুযর্গ বা দেব-দেবীর মেহেরবানীও অন্তর্ভুক্ত ছিল বরং তারাই মেহেরবানী করে আল্লাহকে মেহেরবানী করতে উদ্বুদ্ধ না করলে আল্লাহ কখনোই মেহেরবানী করতেন না। বর্তমানেও অধিকাংশ পথভ্রষ্ট মানুষ এ ধরণের শির্ক করে থাকে। তারা তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য পীর-ফকীর, দরগাহর মেহেরবানী বা সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত আছে বলে বিশ্বাস করে থাকে।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের ঘৃণ্যতম আচরণের বর্ণনা দিচ্ছেন, যারা আল্লাহ্‌র সাথে মূর্তি, দেবতা, সমকক্ষের ইবাদত করে থাকে। তারা আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিকের একাংশ তাদের সেসব প্রতিমা, মূর্তির জন্য নির্ধারণ করে "নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র জন্য এবং এটা আমাদের শরীকদের জন্য'। অতঃপর যা তাদের শরীকদের অংশ তা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না এবং যা আল্লাহ্‌র অংশ তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছায়, তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট!" [সূরা আল-আন'আম: ১৩৬] অর্থাৎ তাদের জন্য নযরানা, ভেট ও অর্ঘ্য পেশ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের উপার্জন ও কৃষি উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ তাদের উপাস্যদের জন্য আলাদা করে রাখতো। তারপর আল্লাহ্‌র অংশের উপর সেগুলোকে প্রাধান্য দিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা নিজের আত্মার শপথ করে বলছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে তাদের এ মিথ্যাচারের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। [ইবন কাসীর]

জানে না[১]। শপথ আল্লাহ্‌র! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

৫৭. আর তারা নির্ধারণ করে আল্লাহ্‌র জন্য[২] কন্যা সন্তান[৩]--- তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত। আর তাদের জন্য তাই যা তারা কামনা করে[৪]!

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾

(১) যে তারা কোন লাভ কিংবা ক্ষতি করতে পারে। [তাবারী] অথবা আয়াতের অর্থ, আর তারা এমনসব উপাস্যদের জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিকের অংশ নির্ধারণ করে রাখে, যারা তাদের এ অংশ রাখা সম্পর্কে কিছুই জানে না। [সা'দী; মুয়াসসার] অথবা, তারা এমন সব উপাস্যের জন্য রিযিকের কিছু অংশ নির্ধারণ করে রাখে যাদের বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের দু'টি বদ-অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। প্রথমতঃ তারা নিজেদের ঘরে কন্যাসন্তানের জন্মগ্রহণকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করার কারণে তার যে বে-ইজ্জতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে নিস্কৃতি লাভ করবে। উপরন্তু মূর্খতা এই যে, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলে যে, ফিরিশ্‌তারা হলো আল্লাহ্ তা'আলার কন্যা। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) আরব মুশরিকরা আল্লাহ্‌র বান্দা ফিরিশতাদেরকে মেয়ে বলত। তারপর সেগুলোকে আল্লাহর মেয়ে বলত। এরপর সেগুলোর ইবাদাত করতো। এভাবে তারা তিনটি স্থানেই ভুল করতো। প্রথমত: তারা আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে ভুল করেছিল। অথচ তাঁর কোন সন্তান নেই। তারপর তাঁকে সন্তান-সন্ততির মধ্যে তাদের নিকট যেটা খারাপ সেটা দিত। অর্থাৎ মেয়ে সন্তান। কারণ তারা এটা নিতে রাযী নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন, "তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান? এ রকম বন্টন তো অসংগত।" এ আয়াতেও বলেছেন যে, "আর তারা তাঁর জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে, তিনি কতই না পবিত্র" তাদের এ সমস্ত মিথ্যাচার ও অসত্য ও মনগড়া কথা হতে। "সাবধান! তারা তো মনগড়া কথা বলে যে, 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' তারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কিরূপ বিচার কর?" [সূরা আস-সাফফাত: ১৫১-১৫৪] [ইবন কাসীর]

(৪) অর্থাৎ পুত্র। আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করলেও নিজেদের জন্য কন্যা সন্তান

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

৫৮. তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়[১]।

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানির কারণে সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও কি তাকে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে[২]।

চায় না। কন্যা সন্তান তাদের জন্য অসম্মানজনক। তাদের জন্য পুত্র সন্তানই তারা কল্যানজনক মনে করে। এভাবেই তারা নিজেদের জন্য পুত্র সন্তান আর আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করার মাধ্যমে এক অন্যায় ভাগ-বাটোয়ারায় লিপ্ত। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "তোমরা আমাকে জানাও 'লাত' ও 'উয্‌যা' সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্পর্কে ? তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান? এ রকম বন্টন তো অসংগত। এগুলো কিছু নাম মাত্র যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে" [সূরা আন-নাজম:১৯-২৩]

(১) এর বিপরীতে ইসলাম কন্যা সন্তানকে আখেরাতের নাজাতের অসীলা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ এক মহিলা তার দু'টি মেয়ে সন্তান সহ আমার কাছে এসে কিছু চাইল। সে আমার কাছে মাত্র একটি খেজুরই পেল। আমি তাকে তাই দিলাম। সে তা গ্রহণ করে তা দু'ভাগে ভাগ করে দু' মেয়েকে দিল। নিজে কিছুই খেল না। তারপর সে দাঁড়িয়ে গেল এবং বের হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে প্রবেশ করলে আমি তাকে ঐ মহিলা এবং তার মেয়েদের সম্পর্কে জানালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "যে কেউ মেয়েদের নিয়ে দুঃখ কষ্টে পড়বে এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যাবহার করবে, সেগুলো তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। [বুখারীঃ ১৪১৮, মুসলিমঃ ২৬২৯]

(২) মুগীরাহ ইবনে শু'বা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযথা মানুষের গায়ে পড়ে কথা বলা ও মতভেদ করা, বিনা প্রয়োজনে অধিক প্রশ্ন করা, অনর্থক ধন-সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। মায়েদের অবাধ্য হতে, কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে, অধিকারীর অধিকার প্রদানে অস্বীকার করতে এবং অনধিকারভাবে অধিকার চাইতেও নিষেধ করেছেন।" [বুখারীঃ ৭২৯২]

সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট!

৬০. যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না যাবতীয় খারাপ উদাহরণ (গুণাগুণ) তাদেরই, আর আল্লাহ্‌র জন্যই যাবতীয় মহোত্তম গুণাগুণ(১) আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়(২)।

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

অষ্টম রুকূ'

৬১. আর আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না(৩); কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً

(১) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর যাবতীয় নাম ও গুণই সুন্দর ও মহোত্তম। তাঁর জন্য কোন প্রকার খারাপ নাম ও গুণ সাব্যস্ত করা জায়েয নেই। তবে এতে অবশ্যই ঈমান রাখতে হবে যে, কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহর জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাগুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে তা অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তার প্রত্যেকটিই সুন্দর। [দেখুন, উসাইমীন: আল-কাওয়া'য়িদুল মুসলা]

(২) আয়াতের শেষে আল্লাহর দু'টি গুণবাচক নাম ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে রাখা আল্লাহ্ তা'আলার রহস্যের মোকাবেলা করার নামান্তর। কেননা, নর ও নারীর সৃষ্টি আল্লাহ্‌র একটি সাক্ষাত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি। তিনি এমন প্রবল পরাক্রমশালী যে, তাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। সুতরাং তারা যতই তাঁর দিকে মিথ্যা কথা ও কাজ সম্পর্কযুক্ত করুক না কেন, এটা তাঁর কোন ক্ষতি করবে না। তিনি তাঁর প্রতিটি কাজ ও কথায় হিকমতপূর্ণ। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা জানিয়ে দিচ্ছেন। তা হচ্ছে, তিনি যদি মানুষকে তাদের অত্যাচার-অনাচারের কারণে পাকড়াও করতেন তবে যমীনের বুকে কোন প্রাণী রাখতেন না। এখানে প্রাণী বলে কাফের উদ্দেশ্য নেয়া হলে কোন সমস্যা নেই। কারণ, তিনি তাদেরকে অবকাশ দেয়ার শাস্তি দিবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি প্রাণী বলে যমীনে বিচরণশীল সব প্রাণীই উদ্দেশ্য হয় তবে আল্লাহ্‌র পাকড়াও দ্বারা কেবল মানুষই ধ্বংস হতো না বরং তাদের সহ যমীনের উপর যত প্রাণী আছে সবাইকে তা পেয়ে বসত। ফলে যমীন প্রাণীশূণ্য হয়ে পড়ত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু। তিনি তাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ

وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝٦١

কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল আগাতে বা পিছাতে পারে না।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۗ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ۝٦٢

৬২. আর যা তারা অপছন্দ করে তা-ই তারা আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে। তাদের জিহ্‌বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, মঙ্গল তো তাদেরই জন্য[১]। নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আছে আগুন, আর নিশ্চয় তাদেরকেই সবার আগে

দিয়ে থাকেন। যাতে যারা তাওবা করার করতে পারে, আর যারা অন্যায়কারী তাদের অন্যায় কাজের পরিপূর্ণতা লাভ করে। [ফাতহুল কাদীর] এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কাফেরকে ধ্বংস করার পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণীদেরকে কেন ধ্বংস করা হবে, অথচ তাদের কোন গোনাহ নেই? এর উত্তরে কোন কোন মুফাসসির বলেন, যালেমকে তার শাস্তি বিধান করতে ধ্বংস করবেন। আর যদি অন্যান্য প্রাণী হিসাব-নিকাশ আছে এ রকম হয় তবে তাদের সওয়াব পূর্ণ করার জন্য, আর যদি হিসাব-নিকাশ নেই এ রকম প্রাণী হয়, তবে যালেমদের যুলুমের কু-প্রভাবের কারণে। [ফাতহুল কাদীর] এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মানুষ অন্যায়ের কারণে অন্যান্য প্রাণীজগতকেও কষ্টে নিক্ষেপ করে। আর যদি ভাল কাজ করে তখন অন্যান্য প্রাণীকুলও তাদের ভালকাজের সুফল ভোগ করে। এ জন্যই যারা দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী তাদের জন্য পানির মাছ এবং আকাশের পাখিও দো'আ করে। কারণ তারা দ্বীনি জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে অন্যায় আচরণ থেকে নিজেরা দূরে থাকবে অন্যদেরকেও দূরে রাখবে। ফলে আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হওয়ার কারণ হবে। যা মানুষ ও সবার জন্য সমভাবে আসে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের গুনাহ্‌র কারণে তাদেরকে অনাবৃষ্টির মাধ্যমে শাস্তি দেন। এ শাস্তি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীজগত সবাইকে শামিল করে। তাই মানুষের উচিত যাবতীয় অন্যায়-অনাচার থেকে দূরে থাকা। যাতে তাদের আচরণে এমন প্রাণীদের কষ্ট না হয় যারা কোন অন্যায় করেনি। [কুরতুবী; ইবনুল কাইয়্যেম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ: ১/৬৫]

(১) কাফের-মুশরিকদের অভ্যাস যে, তারা নিজেরা অন্যায় কাজ করার পরও বলে থাকে যে, আমরা দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী হবো। এটা তাদের আত্মপ্রসাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা তাদের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ স্বভাবের কথা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করে তা খণ্ডন করেছেন। [দেখুনঃ সূরা হুদঃ ৯-১০, সূরা ফুসসিলাতঃ ৫০, সূরা মারইয়ামঃ ৭৭-৭৮, সূরা আল-কাহ্ফঃ ৩৫,৩৬]

তাতে নিক্ষেপ করা হবে[১]।

৬৩. শপথ আল্লাহ্‌র! আমরা আপনার আগেও বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি; কিন্তু শয়তান ঐসব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; কাজেই সে-ই আজ[২] তাদের অভিভাবক আর তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৪. আর আমরা তো আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং যারা ঈমান আনে এমন সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ[৩]।

وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. আর আল্লাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে তিনি ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾

---

(১) مُفْرَطُوْنَ শব্দটি যদি فرط বা অগ্রগামী শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে তার অর্থ হবেঃ তারা সবার আগে জাহান্নামে পতিত হবে। অনুবাদে তাই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া কোন কোন মুফাসসিরের মতে, শব্দটির অর্থঃ তাদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে ছেড়ে রাখা হবে। [তাবারী; কুরতুবী]

(২) আজ বলে দুনিয়ার জীবনেও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার আখেরাতের জীবনেও উদ্দেশ্য হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অন্য কথায় এ কিতাব নাযিল হওয়ার কারণে এরা একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে। তাওহীদ ও পুনরুত্থানের বিভিন্ন অবস্থা ও শরী'আতের বিধানের মধ্যে যে সব মতবাদ ও ধর্মে এরা বিভক্ত হয়ে গেছে সেগুলোর পরিবর্তে সবাই একমত হতে পারে এ কুরআনের কাছে ফিরে আসার মাধ্যমে। [ফাতহুল কাদীর] এখন এ নিয়ামতটি এসে যাওয়ার পরও যারা অতীতের অবস্থাকেই প্রাধান্য দিয়ে যাওয়ার মত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছে তাদের পরিণাম ধ্বংস ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু নয়। এখন যারা এ কিতাবকে মেনে নেবে একমাত্র তারাই সত্য-সরল পথ পাবে এবং তারাই অঢেল বরকত ও রহমতের অধিকারী হবে।

করেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা কথা শোনে[১]।

নবম রুকূ'

৬৬. আর নিশ্চয় গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তার পেটের গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে[২]

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

(১) অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন দ্বারা কুফরীর কারণে মৃত অন্তরসমূহকে জীবিত করেন। সেভাবে তিনি যমীনকে তার মৃত্যুর পর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে জীবিত করেন। [ইবন কাসীর] এর দ্বারা তিনি একদিকে তাঁর অপার শক্তি, তাওহীদের উপর প্রমাণ পেশ করছেন। কারণ, তাদের উপাস্যগুলো এটা করতে সক্ষম নয়। [কুরতুবী] অপর দিকে আল্লাহ যে মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষকে পুনর্বার জীবিত করবেন সেটার পক্ষেও প্রমাণ পাওয়া গেল। [ফাতহুল কাদীর]

(২) গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিস্কার দুধ বের করা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নীচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চালায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে। [ইবন কাসীর] প্রকৃতিতে এমন কে আছে যে চতুষ্পদ জন্তুরা যে খাবার খায়, যে পানীয় গ্রহণ করে সেটাকে দুধে রুপান্তরিত করতে পারে? [সা'দী] এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার করা দ্বীনদারীর পরিপন্থী নয়। [কুরতুবী] তবে শর্ত এই যে, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা যখন আহার করবে তখন বলবে, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَارْزُقْنَا خَيْراً مِنْهُ (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরও উত্তম খাদ্য দিন। অন্য বর্ণনায়, ভবিষ্যতে আরও উত্তম রিযিক দিন।) আর যখন তোমাদেরকে দুধ পান করানো হয়, তখন বলবে, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরো বেশী দান করুন।) (এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি।) কারণ, মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোন খাদ্য নেই। [আবুদাউদঃ ৩৭৩০, তিরমিযীঃ ৩৪৫৫, ইবনে মাজাহঃ ৩৩২২]তাই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন্য থেকে সে লাভ করে।

তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যকর।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

৬৭. আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক[১]; নিশ্চয় এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন[২]।

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ۝

৬৮. আর আপনার রব মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন[৩], 'ঘর তৈরী কর পাহাড়ে, গাছে ও মানুষ যে মাচান তৈরী করে তাতে;

ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۭ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ

৬৯. 'এরপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু খাও, অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ কর[৪]।' তার

---

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্‌ এরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরী করে। এর একটি হলো- মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো উত্তম জীবনোপকরণ অর্থাৎ উত্তম রিয্‌ক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরের তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজবুতও করে নেয়া যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তদ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। [দেখুন, সা'দী]

(২) অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে سَكَر এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃষ্টি করে। আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় নাযিল হয়েছে। মদের নিষেধাজ্ঞা এর পরে মদীনায় নাযিল হয়েছে। আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় মদ নিষিদ্ধ ছিল না। মুসলিমরা সাধারণভাবে তা পান করত। [ইবন কাসীর]

(৩) অহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন সূক্ষ্ম ও গোপন ইশারা, যা ইশারাকারী ও ইশারা গ্রহনকারী ছাড়া তৃতীয় কেউ টের পায় না। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে এ শব্দটি ইলকা বা মনের মধ্যে কোন কথা নিক্ষেপ করা ও ইল্‌হাম বা গোপনে শিক্ষা ও উপদেশ দান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে ওহী করার অর্থ ইলহাম, হিদায়াত ও ইরশাদ। [ইবন কাসীর]

(৪) 'রবের সহজ পথ' এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. তুমি অনুগত হয়ে সে পথে চল

شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾

পেট থেকে নির্গত হয় বিভিন্ন রং এর পানীয়(১); যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য(২)। নিশ্চয় এতে রয়েছে

যে পথ তোমার রব তোমাকে শিখিয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন। রবের রাস্তা বলা হয়েছে এজন্যে যে, সে রবই তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ পথে চলা শিখিয়েছেন। সুতরাং তুমি তোমার রবের শিখিয়ে পথগুলোতে বিভিন্ন স্থানে রিযিকের খোঁজে বেরিয়ে পড়। পাহাড়ে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে। অথবা আয়াতের অর্থ, হে মৌমাছি! তুমি যা খেয়েছ তা তোমার রবের নির্দেশক্রমে ও তাঁর শক্তিতে তোমার শরীরের মধ্য দিয়ে মধু তৈরীর প্রক্রিয়া পরিণত কর। অথবা আয়াতের অর্থ, হে মৌমাছি! যখন তুমি দূরে কোন স্থানে মধু আহরণের জন্য যাবে, তখন সেটা সংগ্রহ করে আবার তোমার গৃহে ফিরে আস, তোমার প্রভুর শিখিয়ে দেয়া পথসমূহ অবলম্বন করে। পথ হারিয়ে ফেলো না। [ফাতহুল কাদীর] মূলত: তিনটি অর্থই উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব।

(১) এখানে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রুতি বর্ণনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে, তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাবও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণতঃ তরল আকারে থাকে, তাই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যেও আল্লাহ্র একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক কারিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তুর দুধ ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্তু মৌমাছির মধু সাদা, হলুদ, লাল ইত্যাদি বহু রঙের হয়ে থাকে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ এবং তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে কোন এক সাহাবী তার ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেনঃ অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি আবারো একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এল যে, অসুখে কোন পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেনঃ صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ অর্থাৎ আল্লাহ্র উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। যাও তাকে মধু খাইয়ে দাও, তারপর লোকটি গিয়ে মধু খাওয়ানোর পর সে আরোগ্য লাভ করল। [বুখারীঃ ৫৭১৬, মুসলিমঃ ২২১৭] এখানে আল্লাহর উক্তি সত্য এবং পেট মিথ্যাবাদী হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, ঔষধের দোষ নাই। রুগীর বিশেষ মেজাযের কারণে ঔষধ দ্রুত কাজ

চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন(১) ।

করেনি । এরপর রুগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে । তবে সমস্ত রোগের জন্য সরাসরি মধু ব্যবহার করতে হবে তা এ আয়াতে বলা হয়নি । আবার কখনো কখনো বিভিন্ন উপাদানের সাথে মিশে তা আরোগ্য দানকারী প্রতিষেধকে পরিণত হয় । অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা দু'টি আরোগ্যকে আঁকড়ে ধরবে, কুরআন এবং মধু" [ইবনে মাজাহঃ ৩৪৫২, মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/২০০] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর হাদীসে বলেনঃ "তিনটি বস্তুতে আরোগ্য রয়েছে, শিঙ্গা, মধু এবং আগুনের ছেঁক । তবে আমি আমার উম্মাতকে ছেঁক দিতে নিষেধ করি" [বুখারীঃ ৫৬৮০, মুসলিমঃ ২২০৫] তবে আলোচ্য আয়াতে شفاء শব্দটি থেকে মধু যে প্রত্যেক রোগের ঔষধ, তা বোঝা যায় না । কিন্তু شِفَاءٌ শব্দের تنوين যা تعظيم এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বোঝা যায় যে, মধুর নিরাময় শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরণের । যদিও কোন কোন আলেম বলেনঃ মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক । তারা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তারা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও । এ কারণেই হয়তঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মধু পছন্দ করতেন [দেখুনঃ বুখারীঃ ৫৪৩১, ৫৬১৪, মুসলিমঃ ১৪৭৪, আবুদাউদঃ ৩৭৫১, তিরমিযীঃ ১৮৩২, ইবনে মাজাহঃ ৩৩২৩, মুসনাদে আহমাদ ৬/৫৯] ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তার শরীরে ফোঁড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন । এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কি মধু সম্পর্কে ﴿فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ﴾ বলেননি? অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "এতে (অর্থাৎ মধুতে) মৃত্যু ছাড়া আর সব রকমের রোগের আরোগ্য রয়েছে" । [ইবনে মাজাহঃ ৩৪৫৭] আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরো জানা গেল যে, ঔষধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ । [কুরতুবী]
কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা একে নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন । অন্যত্র বলা হয়েছে– ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [আল-ইসরাঃ ৮২] । হাদীসে ঔষধ ব্যবহার ও চিকিৎসার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে । মোটকথা, চিকিৎসা করা ও ঔষধ ব্যবহার করা যে বৈধ, এ বিষয়ে সকল আলেমেই একমত এবং এ সম্পর্কে বহু হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে ।

(১) নিশ্চয় এ ছোট প্রাণীটিকে সঠিক পথে সহজভাবে চলার ইলহাম করা, বিভিন্ন গাছ থেকে মধু নেয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া, তারপর সেটাকে মোমের মধ্যে ও মধুর জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে রাখা যা অন্যতম উত্তম বস্তু হিসেবে বিবেচিত । অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে বড় নিদর্শন রয়েছে । যা তার সৃষ্টিকর্তার মহত্বতার উপর প্রমাণবহ । এর দ্বারা তারা এটার উপর প্রমাণ গ্রহণ করবেন যে, তিনি সব করতে সক্ষম, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী, দাতা, দয়ালু । [ইবন কাসীর]

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

৭০. আর আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে প্রত্যাবর্তিত[১] করা হবে নিকৃষ্টতম বয়সে[২]; যাতে জ্ঞান লাভের পরেও তার সবকিছু অজানা হয়ে যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পূর্ণ ক্ষমতাবান[৩]।

---

(১) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে তাঁর কর্মকাণ্ড কিভাবে সম্পন্ন করেন সেটা বর্ণনা করছেন। তিনিই তাদেরকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দিয়েছেন। তারপর তাদেরকে মৃত্যু প্রদান করেন। তাদের মধ্যে আবার কাউকে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হওয়া পর্যন্ত ছাড় দেন। যেমন, অন্য আয়াতেও বলেছেন, "আল্লাহ্, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলতা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি ; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষম।" [সূরা আর-রূম: ৫৪] [ইবন কাসীর] এখানে ﴿مَّنْ يُّرَدُّ﴾ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে এক প্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে কোনরূপ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিল না। তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠা-বসা করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যৌবন দান করেছেন। এটা ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমান্বয়ে তাকে বার্ধক্যের স্তরে পৌঁছে দেন। এ স্তরে তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের ঐ সীমায় প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যা ছিল শৈশবে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, তারপর আমরা তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি---।" [সূরা আত-তীন: ৪-৫] [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) ﴿اَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ বলে বার্ধক্যের সে বয়স বোঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেনঃ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْءِ العُمُرِ، وَ فِي رواية : مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلى أَرْذَلِ العُمُرِ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছেঃ অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। [বুখারীঃ ৪৭০৭] ﴿اَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ এর নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই। তবে উল্লেখিত সংজ্ঞাটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কুরআনও এর প্রতি ﴿لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا﴾ বলে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ যে বয়সে হুঁশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে জানা বিষয়ও ভুলে যায়। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী। তিনি জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন

দশম রুকূ'

৭১. আর আল্লাহ্‌ জীবনোপকরণে তোমাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাসদাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ হতে এমন কিছু দেয় না যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়[১]। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করছে[২]?

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ فِى الرِّزۡقِ‌ۚ فَمَا الَّذِيۡنَ فُضِّلُوۡا بِرَآدِّىۡ رِزۡقِهِمۡ عَلٰى مَا مَلَـكَتۡ اَيۡمَانُهُمۡ فَهُمۡ فِيۡهِ سَوَآءٌ‌ ؕ اَفَبِنِعۡمَةِ اللّٰهِ يَجۡحَدُوۡنَ‏ ﴿٧١﴾

এবং শক্তি দ্বারা যা চান, করেন। তিনি ইচ্ছা করলে শক্তিশালী যুবকের উপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে একশ' বছরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্ত সমর্থ যুবক করে রাখেন। এসবই লা-শরীক আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্ষমতাধীন।

(১) প্রথম থেকে সমগ্র ভাষণটিই চলছে শির্ককে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও তাওহীদকে সত্য প্রমাণ করার জন্য এবং সামনের দিকেও এ একই বিষয়বস্তুই একের পর এক এগিয়ে চলছে। এখানে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদে যখন নিজেদের গোলাম ও চাকর বাকরদেরকে সমান মর্যাদা দাও না –অথচ এ সম্পদ আল্লাহর দেয়া– তখন তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহর সাথে তাঁর ক্ষমতাহীন গোলামদেরকেও শরীক করা এবং ক্ষমতা ও অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহর এ গোলামদেরকেও তাঁর সাথে সমান অংশীদার গণ্য করাকে তোমরা কেমন করে সঠিক মনে করো? [ইবন কাসীর] কুরআনের অন্যত্র এ একই যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদের সামনে একটি উপমা তোমাদের সত্তা থেকেই পেশ করেন। আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তাতে কি তোমাদের গোলাম তোমাদের সাথে শরীক আছে? আর এভাবে শরীক বানিয়ে তোমরা ও তারা কি সমান সমান হয়ে গিয়েছ? এবং তোমরা কি তাদেরকে ঠিক তেমনি ভয় পাও যেমন তোমাদের সমপর্যায়ের লোকদেরকে ভয় পাও? এভাবে আল্লাহ খুলে খুলে নিশানী বর্ণনা করেন তাদের জন্য যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।" [সূরা আর-রূম: ২৮] দু'টি আয়াতের তুলনামূলক আলোচনা করলে পরিষ্কার জানা যায়, উভয় স্থানেই একই উদ্দেশ্যে একই উপমা বা দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এদের একটি অন্যটির ব্যাখ্যা করছে।

(২) এখানে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকারের অর্থ, আল্লাহ্‌ই মানুষকে নে'য়ামত দান করেছেন। তিনি চান এর জন্য মানুষ একমাত্র তাঁকেই স্মরণ করুক, তাঁরই কাছে কৃতজ্ঞ হোক।

৭২. আর আল্লাহ্ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন[১] এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন[২] এবং

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ

আল্লাহর নিয়ামতের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকৃতির এই তাৎপর্যটি অনুধাবন করার পর এ বাক্যাংশের অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এরা যখন প্রভু ও গোলামের পার্থক্য ভাল করেই জানে এবং নিজেদের জীবনে সর্বক্ষণ এ পার্থক্যের দিকে নজর রাখে তখন একমাত্র আল্লাহর ব্যাপারেই কি এরা এত অবুঝ হয়ে গেছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সাথে শরীক ও তাঁর সমকক্ষ মনে করছে? আল্লাহ্র দেয়া ক্ষেত-খামার ও পশুসম্পদের একটি অংশ শুধু তারা আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করে থাকে। এভাবে তারা আল্লাহ্র নেয়ামতকে অস্বীকার করে তার সাথে অন্যকে শরীক করে। হাসান বসরী বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ মূসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে লিখা চিঠিতে লিখলেন, 'আর আপনি দুনিয়াতে আপনাকে প্রদত্ত রিযিক নিয়ে তুষ্ট থাকুন। কেননা, দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের কারও উপর অপর কাউকে রিযিকের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। এটা মূলত: পরীক্ষা, এর মাধ্যমে তিনি সবাইকে পরীক্ষা করেন। যার জন্য রিযিকে প্রশস্তি প্রদান করেছেন তাকে পরীক্ষা করেন যে, সে এর দ্বারা কিভাবে আল্লাহ্র শোকর আদায় করে, আল্লাহ্ তার উপর এর মধ্যে যে হক ফরয করেছেন সেটা কিভাবে আদায় করে।' [ইবন কাসীর]

(১) আয়াতে একটি প্রধান নেয়ামত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পরের ভালবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং মাহাত্ম্যও অব্যাহত থাকে। যদি অন্য প্রজাতি থেকে তা নির্ধারণ করতেন তবে তাদের মধ্যে এরকমের মিল-মহব্বত থাকত না। সুতরাং তাঁর রহমতের এক নিদর্শনস্বরূপ তিনি আদম সন্তানকে পুরুষ ও নারী এ দু'ভাগে সৃষ্টি করেছেন। আর নারীদেরকে পুরুষদের স্ত্রী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন। এ বাক্যে পুত্রদের সাথে পৌত্রদের উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়ীত্বের ব্যবস্থা হয়। কোন কোন মুফাসসির আয়াতে উল্লেখিত حفدة শব্দের অর্থ করেছেনঃ খাদেম ও সাহায্যকারীগণ। এ অর্থ শব্দের আভিধানিক অর্থের সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত حَفَدَةً শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, সেবক। অবশ্য এ অর্থ পূর্ববর্তী তাফসীর অর্থাৎ যারা শব্দটির অর্থ "নাতি" করেছেন তার বিপরীত নয়। কারণ, আরবগণ তাদের ছেলে ও

اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন[১]। তবুও কি তারা বাতিলের স্বীকৃতি দিবে[২] আর তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে[৩]?

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর তারা ইবাদাত করে আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর, যেগুলো আসমান ও যমীন হতে তাদের কোন জীবনোপকরণের মালিক নয় এবং হতেও সক্ষম

নাতিদের দ্বারাই খেদমত গ্রহণ করে থাকেন। [ইবন কাসীর] সন্তানদের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-মাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য। তাই এক হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এসেছে, "তোমার সন্তান সে তো তোমার দাস তথা খাদেম" [আবু দাউদঃ ২১৩১] কোন কোন মুফাসসির حَفَدَةً শব্দের অর্থ করেছেন, শ্বশুরগোষ্ঠী, জামাতা ইত্যাদি। এ অর্থেও শব্দটি আভিধানিক অর্থের সাথে মিল আছে, কারণ মানুষ তাদের জামাতা ও শ্বশুরগোষ্ঠি দ্বারা সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে থাকে। [ইবন কাসীর]

(১) এখানে ﴿وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ﴾ বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাও সরবরাহ করেছেন।

(২) 'বাতিলকে মেনে নেয়ার অর্থ, মূর্তি, প্রতিমা, দেব-দেবী ইত্যাদিকে মেনে নেয়া। [ইবন কাসীর] তারা মনে করে যে, তাদের দেব-দেবী তাদের ক্ষতি কিংবা উপকার করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ তারা তাদের সম্পর্কে এ ভিত্তিহীন ও অসত্য বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের ভাগ্য ভাঙ্গা-গড়া, আশা-আকাংখা পূর্ণ করা, সন্তান দেয়া, রুজি-রোজগার দেয়া, বিচার-আচার ও মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ করানো এবং রোগ-শোক থেকে বাঁচানোর ব্যাপারটি কতিপয় দেব-দেবী, জিন এবং অতীতের বা পরবর্তীকালের কোন মহাপুরুষ যেমন নবী- রাসূল, পীর-ফকীর ইত্যাদির হাতে রয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে বাতিল বলে তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যে সমস্ত পবিত্র বস্তু হারাম করে সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যেমন বাহীরা, সায়েবা ইত্যাদি। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ এরা আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামতকে গোপন করে এবং সেগুলোকে অন্যদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে তার ওপর তাঁর দয়া প্রদর্শন করে বলবেন, আমি কি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করিনি? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উট অনুগত করে দেই নি? আমি তোমাকে নেতৃত্ব ও আরামে চলাফেরা করতে দেইনি? [মুসলিম: ২৯৬৮]

নয়[১]।

৭৪. কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ স্থির করো না[২]। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫. আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন[৩] অন্যের

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى

(১) অর্থাৎ তোমাদের জন্য বৃষ্টি নাযিল করা, ফসল উৎপন্ন করা, গাছ-গাছালির ব্যবস্থা করা, এগুলো কিছুরই তারা মালিক নয়। তারা যদি এগুলো করতে চায়ও তারপরও তারা তা করতে সক্ষম হবে না। এজন্য আল্লাহ্ এরপরই বলেছেন, "কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ স্থির করো না।" তিনি জানেন ও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন হক ইলাহ নেই, অথচ তোমরা তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করছ। [ইবন কাসীর]

(২) 'আল্লাহর জন্য সদৃশ স্থির করো না'- মুফাসসির যাজ্জাজ এর তাফসীরে বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত পেশ করো না। কেননা, তিনি এক, তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। আর তারা বলত যে, জগতের মা'বুদ এতই মহিয়ান যে তাকে আমাদের কেউ ইবাদত করতে পারে না। সুতরাং তারা মূর্তি-প্রতিমা, দেব-দেবী ও তারকারাজির মাধ্যম গ্রহণ করত। যেমন সাধারণ ছোট ছোট লোকেরা বাদশার দরবারে যেতে বড় বড় লোকদের দ্বারস্থ হয়ে থাকে। আর এ বড় বড় লোকগুলো বাদশার খেদমত করে, সুতরাং তাদের কথা শুনবে। এ আয়াতে তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ আল্লাহকে দুনিয়ার রাজা-মহারাজা ও বাদশাহ-শাহানশাহদের সমপর্যায়ে রেখে বিচার করো না। রাজা-বাদশাহদের অনুচর, সভাসদ ও মোসাহেবদের মাধ্যম ছাড়া তাদের কাছে কেউ নিজের আবেদন নিবেদন পৌঁছাতে পারে না। ঠিক তেমনি আল্লাহর ব্যাপারেও তোমরা এ ধারণা করতে থাকো যে, তিনি নিজের শাহী মহলে ফেরেশতা, আউলিয়া ও অন্যান্য সভাসদ পরিবৃত হয়ে বিরাজ করছেন এবং এদের মাধ্যমে ছাড়া তাঁর কাছে কারোর কোন কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। আলোচ্য বাক্যটি তাদের সন্দেহের মূল উপড়ে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সৃষ্টজীবের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা-কল্পনার অনেক ঊর্ধ্বে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করতে নিষেধ করার কারণ হিসেবে বলেছেন যে, আল্লাহ্ জানেন তোমাদের উপর কি ইবাদাত করণীয়, তোমরা জান না তিনি ব্যতীত অন্যদের ইবাদত করলে কি কঠিন পরিণতির সম্মুখীন তোমাদের হতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ যদি উপমার সাহায্যে কথা বুঝতে হয় তাহলে আল্লাহ সঠিক উপমা দিয়ে তোমাদের সত্য বুঝিয়ে দেন। তোমরা যেসব উপমা দিচ্ছো সেগুলো ভুল। তাই তোমরা সেগুলো থেকে ভুল ফলাফল গ্রহণ করে থাকো। তোমরা সঠিক উপমা দিতে জান না। আল্লাহ্ নিজেই তোমাদেরকে উপমা শিখিয়ে দিচ্ছেন। [ফাতহুল কাদীর]

شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে আমরা আমার পক্ষ থেকে উত্তম রিয্‌ক দান করেছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা কি একে অন্যের সমান(১)? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য(২); বরং তাদের অধিকাংশই জানে না(৩)।

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এ উদাহরণটি আল্লাহ্ তা'আলা কাফের ও মুমিনের জন্য প্রদান করেছেন। ইবনে জরীর তাবারীও তা পছন্দ করেছেন। যে দাস কিছুরই ক্ষমতা রাখে না সে হচ্ছে কাফের। আর যাকে উত্তম রিযিক দেয়া হয়েছে আর সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে সে হচ্ছে মুমিন। মুজাহিদ বলেন, এ উপমাটি মূর্তি-প্রতিমা ও আল্লাহ্ তা'আলার জন্য পেশ করা হয়েছে। এ দু'টি কি সমান? যখন তাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট, বোকা ছাড়া সবাই তা বুঝতে সক্ষম, তখন বলা হল যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। [ইবন কাসীর] কিন্তু তারা অধিকাংশই জানে না। যদি তারা জানত তবে যার জন্য ইবাদাত করা হক ও যথাযথ তাঁরই ইবাদাত করত, আর যিনি তাদেরকে এত এত নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন তাঁর নেয়ামতের স্বীকৃতি তারা দিত। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আলহাম্‌দুলিল্লাহ বা সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। এটা বলার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি মত রয়েছে। এক. কারণ, তিনিই তো সব নেয়ামত প্রদান করেছেন, তাঁর বান্দাদের কেউই তা দেয় নি। সুতরাং যারা মৌলিকভাবে অথবা মাধ্যম হয়ে কোনভাবেই কোন নেয়ামত দেয়নি তারা কিভাবে প্রশংসা পেতে পারে? দুই. সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্যে এ কারণে যে, তিনিই তাঁর বন্ধুদেরকে তাওহীদের মত নেয়ামত প্রদান করেছেন। তিন. অথবা এখানে নির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছে যে, আপনি বলুন, আল-হামদুলিল্লাহ। তখন নির্দেশটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং যারাই এ নেয়ামত উপলব্ধি করতে পারবে তাদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চার. অথবা যে উদাহরণ পেশ করা হলো তা যে কত জোরালো, তার মোকাবিলায় যে তারা কোন কিছুই দাঁড় করাতে পারবে না, দলীল-প্রমাণের সে শক্তি অনুভব করে আল-হামদুলিল্লাহ বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এখানে তাদেরকে 'জানে না' বলার কারণ হয়ত এই যে, তারা তাদের উপর যা কর্তব্য তা না জানার কারণে সত্যিকারেই জাহেল বা মূর্খে পরিণত হয়েছে। অথবা তারা হক জেনেও ইচ্ছাকৃত বিরোধিতা করার জন্য তা মেনে নিচ্ছে না। এতে করে তারা যাদের জ্ঞান নেই, তাদের কাতারে নেমে গেছে। [ফাতহুল কাদীর]

৭৬. আর আল্লাহ্ আরো উপমা দিচ্ছেন দু ব্যক্তিরঃ তাদের একজন বোবা, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার অভিভাবকের উপর বোঝা; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে কোন কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে না; সে কি সমান ঐ ব্যক্তির, যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে[১]?

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

এগারতম রুকূ'

৭৭. আর আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবী বিষয় আল্লাহ্‌রই। আর কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায়[২], অথবা তা থেকেও সত্বর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾

৭৮. আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তিনি তোমাদেরকে

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এ উদাহরণটি আল্লাহ্ তা'আলা মূর্তি-প্রতিমা ও তাঁর নিজের ব্যাপারে পেশ করেছেন। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ মূর্তিগুলো বোবা, কথা বলে না, কল্যাণ ও অকল্যাণ কোন প্রকার কথাই বলে না, কোন কিছুর উপরই তাদের ক্ষমতা নেই, কথায়ও নয়, কাজেও নয়। তদুপরি সে তার অভিভাবকের উপর নির্ভরশীল। তাকে কোথাও পাঠানো হলে সে কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তার চেষ্টাতেও সফল হয় না। এমতাবস্থায় যার হচ্ছে এ ধরণের অক্ষমতার গুণ সে কি তার মত যে, ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলে, আর যে সঠিক পথের উপর আছে? [ইবন কাসীর]

(২) উপরোক্ত দু'টি উদাহরণ পেশ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা এখানে নিজের প্রশংসা করছেন যে, তিনিই শুধু গায়বের সংবাদের মালিক। তিনি ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না। আসমান ও যমীনে যা বর্তমানে গায়েব আছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনের খবরও তিনিই জানেন; বান্দাদের কাছে তা গায়েব রাখা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর(১)।

(১) অর্থাৎ এমন সব উপকরণ যার সাহায্যে তোমরা দুনিয়ার সব রকমের জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করে দুনিয়ার যাবতীয় কাজ কর্ম চালাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছো। জন্মকালে মানব সন্তান যত বেশী অসহায় ও অজ্ঞ হয় এমনটি অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে হয় না। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপকরণাদির (শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বিবেক ও চিন্তাশক্তি) সাহায্যেই সে উন্নতি লাভ করে পৃথিবীর সকল বস্তুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার এবং তাদের ওপর রাজত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করে। আয়াতের শেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অর্থ, এগুলোকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে কাজে লাগানো। সুতরাং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি যাতে হয় তাই শুধু সে করবে। এক হাদীসে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, "মহান আল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমার বান্দার উপর যা আমি ফরয করেছি তা ছাড়া আমার কাছে অন্য কোন প্রিয় বস্তু নেই যার মাধ্যমে সে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে। আমার বান্দা আমার কাছে নফল কাজসমূহ দ্বারা নৈকট্য অর্জন করতেই থাকে, শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালবাসি। তারপর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যার দ্বারা সে শুনে, তার দৃষ্টি শক্তি হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধারণ করে আর তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলে। তখন আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে তা অবশ্যই দেব, আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে অবশ্যই উদ্ধার করব"। [বুখারীঃ ৬৫০২] হাদীসের অর্থ হচ্ছে, বান্দাহ যখন একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে এবং যাবতীয় কাজ আল্লাহ্‌র জন্যই করে, তখন তার সমস্ত কর্মকাণ্ড একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায়। সে তখন এর বাইরে চলতে পারে না। সে যা শোনে তা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই শোনে। যা দেখে তা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই দেখে, অর্থ্যাৎ তার শরী'আতের অনুমোদন ছাড়া কিছুই দেখে না। অনুরূপভাবে তার যাবতীয় চলা-ফেরা, ধর-পাকড় কেবলমাত্র আল্লাহর আনুগত্য অনুসারে হয়। তাঁর সাহায্যেই অনুষ্ঠিত হয়। আর যখন বান্দা এরকম হয়, তখন আল্লাহ্‌ও তার ডাকে সাড়া দেন। তার যাবতীয় কাজ সফল হতে থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কাছে সবসময়ই চায় তাঁর বান্দাগণ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। অন্য আয়াতেও সে কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, "বলুন, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তকরণ। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। বলুন, 'তিনিই যমীনে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।" [সূরা আল-মুলকঃ ২৩-২৪] [ইবন কাসীর]

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯. তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই সেগুলোকে ধরে রাখেন না। নিশ্চয় এতে এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান আনে[১]।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم

৮০. আর আল্লাহ্ তোমাদের ঘরসমূহকে করেছেন তোমাদের জন্য আবাসস্থল[২]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে একটু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। যেখানে পাখি আসমান ও যমীনের মাঝখানে ভাসমান হয়ে থাকে। কিভাবে তিনি সেটাকে দু'ডানা মেলে শূণ্যে ভেসে বেড়াতে দিয়েছেন। এগুলোকে তো আল্লাহই কেবল তাঁর কুদরতে ধারণ করে রাখেন। (তিনিই তো তাদেরকে ডানা মেলা ও বন্ধ করা শিখিয়েছেন। তারা সেভাবে ডানা মেলে ও বন্ধ করে যেমন কোন সাঁতারু পানিতে সাতার কাটার সময় করে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]।) সেখানে তিনি এমন শক্তির উদ্ভব করেছেন যে, তারা উড়ে বেড়াতে পারে। অনুরূপভাবে তিনি বাতাসকে নিয়োজিত করেছেন সেগুলোকে বহন করতে। আর পাখিও অনুরূপভাবে বাতাসে চলাফেরা করতে পারে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ নেয়ামতের কথা ও তাঁর কুদরতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উপরে পাখিদের প্রতি, যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্ই তাদেরকে স্থির রাখেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা আল-মুলক: ১৯] এ সবকিছুতে অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে। [ইবন কাসীর] এসবই আল্লাহ্র একত্ববাদ ও তাঁর অপার ক্ষমতার উপর প্রকৃষ্ট প্রমান। কিন্তু তারাই শুধু তা দেখতে পায় ও বুঝতে পারে যারা আল্লাহর উপর এবং তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে প্রেরিত শরী'আতের উপর ঈমান রাখে। [ফাতহুল কাদীর] যারা তাঁর এ সমস্ত নিদর্শন বুঝতে পারে তারা শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে যিনি তাদেরকে এ নেয়ামত দান করেছেন সে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

(২) এখানেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নেয়ামতের কিছু বর্ণনা দিচ্ছেন। [ফাতহুল কাদীর] তিনি তাঁর বান্দাদের উপর যে নেয়ামত দান করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, তিনি তাদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করেছেন, যেখানে তারা বসবাস করে, আশ্রয় গ্রহণ করে, নিজেদেরকে অপরের কাছ থেকে গোপন রাখতে সমর্থ হয়, যত প্রকারের উপকার লাভ করা যায় এর মাধ্যমেই তাই তারা গ্রহণ করে। এ ঘর ছাড়াও তিনি তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য থেকে চামড়ার ঘরেরও ব্যবস্থা করেছেন। (অর্থাৎ পশুচর্মের তাঁবু। আরবে এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।) এগুলোকে তোমরা সফর অবস্থায় বহন

مِّنۡ جُلُوۡدِ الۡاَنۡعَامِ بُيُوۡتًا تَسۡتَخِفُّوۡنَهَا يَوۡمَ ظَعۡنِكُمۡ وَيَوۡمَ اِقَامَتِكُمۡ ۙ وَمِنۡ اَصۡوَافِهَا وَاَوۡبَارِهَا وَاَشۡعَارِهَاۤ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيۡنٍ ۝٨٠

এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুর চামড়ার ঘর তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা সেটাকে সহজ মনে করে থাক তোমাদের ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে(১)। আর (ব্যবস্থা করেছেন) তাদের পশম, লোম ও চুল থেকে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার-উপকরণ(২)।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمۡ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمۡ

৮১. আর আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে(৩) তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার

করা তোমাদের জন্য হাল্কা বোধ করে থাক। এগুলোকে তোমরা তোমাদের সফরে ও স্থায়ী অবস্থানস্থলে ব্যবহার করতে পার। [ইবন কাসীর] তাছাড়া তিনি তোমাদের জন্য ভেড়ার পশম, উটের লোম ও ছাগলের চুলেরও ব্যবস্থা করেছেন। যা তোমাদের সম্পদ ও উপভোগ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। ঘরের আসবাব ও কাপড় হয়েছে। ব্যবসায়ী সম্পদ হয়েছে। সুনির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত তোমরা এগুলো ভোগ করতে পার। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, অথবা পুরনো হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অথবা আমৃত্যু বা কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা এগুলো ভোগ করতে পার। [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ যখন কোথাও রওয়ানা হয়ে যেতে চাও তখন তাকে সহজে গুটিয়ে ভাঁজ করে নিয়ে বহন করতে পারে। আবার যখন কোথাও অবস্থান করতে চাও তখন অতি সহজেই ভাঁজ খুলে খাটিয়ে ঘর বানিয়ে ফেলতে পারো। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, জীব-জন্তুর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল। এতে জন্তুটি যবেহ্‌কৃত হওয়া অথবা মৃত হওয়ারও কোন শর্ত নেই। এমনিভাবে যে জন্তুর পশম বা চামড়া আহরণ করা হবে, সেটির গোশ্‌ত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোন শর্ত নেই। সব রকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের উপর জন্তুর মৃত্যুর কোন প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েয হয়ে যায়। তবে শূকরের চামড়া ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য। [কুরতুবী]

(৩) এ আয়াতে আরও কিছু নেয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন। পূর্ববর্তী আয়াতে তাঁবুবাসীদের বর্ণনা চলে গেছে। কিন্তু এমনও এক রয়েছে যাদের কোন তাঁবু নেই। তাদের পাকা ঘরের ব্যবস্থাও নেই, যার ছায়ায় তারা আশ্রয় নিতে পারে, দারিদ্রতা কিংবা অন্য কোন

مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

ব্যবস্থা করেছেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের; তা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে[১] এবং তিনি

কারণে। তখন তাকে কোন গাছ বা দেয়াল অথবা আকাশের মেঘের ছায়ায় বা অনুরূপ কিছুর নিচে থাকতে হয়, তাই আল্লাহ্ তা'আলা এদিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলছেন যে, "আর আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন"। কাতাদা বলেন, এর অর্থ গাছ। [ইবন কাসীর] তবে পূর্বে উল্লেখিত সবগুলোর ছায়াই এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] তারপর মুসাফিরকে যেহেতু কখনও কখনও এমন কোন কিছুর আশ্রয় নিতে হয়, যেখানে সে অবস্থান করবে, আবার তার কাছে এমন কিছুও থাকতে হয় যা দ্বারা সে প্রচণ্ড তাপ ও খরা থেকে নিজেকে রক্ষা করবে, সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ্ বলেন, "আর তিনি তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন"। [ফাতহুল কাদীর] পাহাড়ে তারা কিল্লা ও দূর্গ বানায় [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে সেখানে তাদের জন্য রয়েছে গিরিগুহাসমূহ যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারে। বিপদাপদ ও লোকচক্ষু থেকে আড়াল করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] আর তিনি "তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের; তা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্য এমন কিছু যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। যেমন বর্ম ও লোহার অন্যান্য যুদ্ধের কাপড়। [ইবন কাসীর]

(১) ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাবার কথা না বলার কারণ সম্পর্কে কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এ সূরার শুরুতে ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ বলে পোষাকের সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা এবং উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিল। তাই এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে। অথবা একটির কথা বলায় অপরটি এমনিতেই এসে যাবে এজন্য ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়নি। অথবা, কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখা হয়েছে। আরব হলো গ্রীষ্মপ্রদান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] কাতাদাহ্ বলেন, এ সূরাকে 'সূরাতুন নি'আম' বা নেয়ামতের সূরা বলা হয়। আতা আল-খুরাসানী বলেন, কুরআন আরবদের জ্ঞান অনুসারে নাযিল হয়েছে। তুমি কি দেখনা আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর দিকে যেখানে বলা হয়েছে, "আর আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন" অথচ সমতল ভূমিতে আরও বড় ও বেশী ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্

ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্য বর্মের, তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবেই তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেছেন[১] যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

৮২. অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনার কর্তব্য তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾

৮৩. তারা আল্লাহ্‌র নি'আমত চিনতে পারে; তারপরও সেগুলো তারা অস্বীকার করে[২] এবং তাদের অধিকাংশই

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾

করে রেখেছেন কিন্তু সেটা উল্লেখ করেন নি। কেননা, তারা ছিল পাহাড়ী জাতি। অনুরূপভাবে তুমি দেখ না আল্লাহ্‌র বাণীর দিকে যেখানে বলা হয়েছে, "আর (ব্যবস্থা করেছেন) তাদের পশম, লোম ও চুল থেকে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার-উপকরণ" অথচ এর বাইরে আরও যে সমস্ত সামগ্রী তিনি মানুষের জন্য রেখেছেন তা অনেক বেশী কিন্তু তারা ছিল মেষপালক, পশমের বাড়িতে অবস্থানকারী গোষ্ঠী। তদ্রূপ তুমি কি দেখ না আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি, যেখানে তিনি বলেছেন, "আকাশে অবস্থিত মেঘের পাহাড়ের মধ্যস্থিত শিলাস্তূপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা" [সূরা আন-নূর:৪৩] কারণ, তারা এটা নিয়ে আশ্চর্যবোধ করে। অথচ আল্লাহ্ যে বরফ নাযিল করেন তা আরও বড় ব্যাপারে ও অধিকহারেই। কিন্তু তারা সেটা জানত না। সেরকমই তুমি দেখবে আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি লক্ষ্য করলে, যেখানে বলা হয়েছে, "এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের; তা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে" অথচ ঠাণ্ডার ব্যাপারে তাঁর ব্যবস্থাপনা আরও বড় ও বেশী। কিন্তু তারা যেহেতু গরম এলাকার লোক, তাই তাদের কাছে গরমটাই উল্লেখ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) নিয়ামত পূর্ণ বা সম্পূর্ণ করার মানে হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ জীবনের প্রতিটি বিভাগে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন এবং তারপর একটি প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেন। তিনি সম্পূর্ণ তাঁর রহমতের কারণে এখানে সেখানে মানুষের উপর তাঁর নেয়ামত দিয়েই যাচ্ছেন। এভাবে তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) মক্কার কাফেররা একথা অস্বীকার করতো না যে, এ সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহ তাদের প্রতি করেছেন। কিন্তু তাদের আকীদা ছিল, তাদের বুযর্গ ও দেবতাদের হস্তক্ষেপের ফলে তাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ করা হয়েছে। আর একারণেই তারা এসব অনুগ্রহের জন্য

কাফির[১]।

বারতম রুকূ'

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আর যেদিন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করব[২] তারপর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে না ওযর পেশের অনুমতি দেয়া হবে[৩], আর না তাদেরকে (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে।

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সময় ঐসব বুযর্গ ও দেবতাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো বরং তাদের প্রতি কিছুটা বেশী করেই প্রকাশ করতো। একাজটিকেই আল্লাহ নেয়ামতর অস্বীকৃতি এবং অকৃতজ্ঞতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) বলা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই কাফের। এখানে অধিকাংশ বলে সকলকেই বোঝানো হয়েছে। অথবা অধিকাংশ লোক বলে তাদের মধ্যকার বয়স্ক লোকদের বোঝানো হয়েছে। কারণ, তাদের মধ্যে শিশু সন্তানরাও রয়েছে। অথবা এর অর্থ, তাদের অধিকাংশই সাধারণ লোক, তারা তাদের বিবেক খরচ করে আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে গবেষণা করতে শিখেনি। তারা যদি সত্যিকারভাবে নেয়ামতসমূহ উপলব্ধি করতে পারত তাহলে বুঝতে পারত যে, যিনি নেয়ামত দিয়েছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত অন্য কারও নয়। ফলে তারা নেয়ামতের শুকরিয়া না করে কাফির হয়েছে। আর বাকী মুশরিকরা যারা নেতৃত্বে আছে তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করছে। [ফাতহুল কাদীর; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) অর্থাৎ সেই উম্মতের নবী। [ইবন কাসীর] তিনি তাদের পক্ষে ঈমান ও সত্যায়ণের সাক্ষী হবেন। আর তাদের বিপক্ষে কুফরি ও মিথ্যারোপের সাক্ষী হবেন। [ফাতহুল কাদীর] তিনি সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি তাদেরকে তাওহীদ ও আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তাদেরকে শির্ক ও মুশরিকী চিন্তা-ভাবনা, ভ্রষ্টাচার ও কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন এবং কিয়ামতের ময়দানে জবাবদিহি করার ব্যাপারে সজাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি তাদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন।

(৩) কেননা তারা নিজেরাও জানে যে, তারা যে সমস্ত ওযর আপত্তি পেশ করবে সবই বাতিল, অসার ও মিথ্যা। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা সেটা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "এটা এমন এক দিন যেদিন না তারা কথা বলবে, আর না তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে ওযর পেশ করার।" [সূরা আল-মুরসালাত: ৩৫-৩৬] [ইবন কাসীর]

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫. আর যারা যুলুম করেছে, তারা যখন শাস্তি দেখবে তখন তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না[১] এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬. আর যারা শির্ক করেছে, তারা যখন তাদের শরীকদেরকে দেখবে তখন বলবে, 'হে আমাদের রব! এরাই তারা যাদেরকে আমরা আপনার শরীক করেছিলাম, যাদেরকে আমরা আপনার পরিবর্তে ডাকতাম;' তখন শরীকরা এ কথা মুশরিকদের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী।'

وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ۖ وَضَلَّ

৮৭. সেদিন তারা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করবে[২] এবং তারা যে

---

(১) আয়াতের অর্থ, যখন মুশরিকরা আযাব পাবে, তখন তা তাদের থেকে সামান্য সময়ের জন্যও বন্ধ করা হবে না। আর তাদের কাছে সে আযাব পৌঁছতে দেরীও হবে না। বরং তাদেরকে দ্রুত সেটা গ্রাস করবে। হাশরের মাঠ থেকে পাকড়াও করে হিসাব বাদেই জাহান্নামে নিয়ে যাবে। [ইবন কাসীর] যেমন হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের মাঠে জাহান্নামকে এমতাবস্থায় নিয়ে আসা হবে যে, এর সত্তর হাজার লাগাম থাকবে, প্রত্যেক লাগামের সাথে থাকবে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা। [মুসলিম:২৮৪২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তখন জাহান্নাম থেকে এমন কিছু ঘাড় বের হবে যেগুলো সমস্ত সৃষ্টির উপর থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাবে। সেগুলো বলতে থাকবে, আমার উপর এমন প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী, দুর্দান্ত প্রতাপশীলের ভার ন্যস্ত হয়েছে যে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ সাব্যস্ত করবে।' [মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৩৬] তারপর জাহান্নাম তাদেরকে ঝাপটে ধরবে এবং হাশরের মাঠের অবস্থান থেকে খুঁজে খুঁজে নিবে যেমন কোন পাখি কোন দানাকে খুঁজে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "দূর থেকে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার। এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় সেটার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। বলা হবে, আজ তোমরা এক ধ্বংসকে ডেকো না, বরং বহু ধ্বংসকে ডাক।" [আল-ফুরকান: ১২-১৪] [ইবন কাসীর]

(২) কাতাদা ও ইকরিমা বলেন, সেদিন তারা সবাই আনুগত্য করবে ও সবকথা মেনে

عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ۝

মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে[১]।

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ۝

৮৮. যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আমরা তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব[২]; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰۤؤُلَآءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ۝

৮৯. আর স্মরণ করুন, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মতের কাছে, তাদের থেকে তাদেরই বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উত্থিত করব[৩] এবং আপনাকে আমরা তাদের উপর সাক্ষীরূপে নিয়ে আসব[৪]। আর

নিবে। তখন সবাই শ্রোতা ও আনুগত্যকারী হয়ে যাবে। [ইবন কাসীর] তারা যে সেদিন কত বেশী শুনবে আর কত বেশী দেখবে! সেটা আশ্চর্যের বিষয়। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ আরও বলেন, “আর আপনি যদি দেখতেন! যখন অপরাধীরা তাদের রবের নিকট অবনত মস্তকে বলবে, ‘হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ফেরত পাঠান, আমরা সৎকাজ করব, নিশ্চয় আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী।” [আস-সাজদাহ: ১২] আরও বলেন, “চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারকের কাছে সবাই হবে নিম্নমুখী” [ত্বা-হা: ১১১]

(১) অর্থাৎ তা সবই মিথ্যা প্রমাণিত হবে। দুনিয়ায় তারা যেসব নির্ভর বানিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের ওপর ভরসা করতো, সেসব অদৃশ্য হয়ে যাবে। কোন অভিযোগের প্রতিকারকারীকে সেখানে অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য পাবে না। কোন সংকট নিরসনকারীকে তাদের সংকট নিরসন করার জন্য সেখানে পাওয়া যাবে না। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ একটা আযাব হবে কুফরী করার জন্য এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়ার জন্য হবে আর একটা আযাব। এ শাস্তির ধরন সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ সেগুলো হবে এমন বিচ্ছু-সাপ, যার আক্রমনাত্মক দাঁতগুলো লম্বা খেজুর গাছের মত। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৫৫-৩৫৬]

(৩) তারা প্রত্যেক উম্মতের নবীগণ। কিয়ামতের দিন তারা তাদের উম্মতের উপর সাক্ষ্য হবেন। তারা সাক্ষ্য দেবেন যে, তারা উম্মতের কাছে রিসালাত পৌঁছিয়েছেন, তাদেরকে ঈমানের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। [কুরতুবী]

(৪) এ আয়াতাংশটি সূরা আন-নিসার ৪১ নং আয়াতের সমার্থবোধক। সেখানে এর বিষয়বস্তুর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি(১) প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ(২), পথনির্দেশ, দয়া ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ ।

তেরতম রুকূ’

৯০. নিশ্চয় আল্লাহ্ আদল (ন্যায়পরায়ণতা)(৩), إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ

(১) আয়াতের প্রথমাংশে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাশরের মাঠে সাক্ষ্য বানানোর কথা ঘোষণা করার পর দ্বিতীয়াংশে কুরআন নাযিল করার কথা উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যিনি আপনাকে কিতাব দিচ্ছেন এবং আপনার উপর তা প্রচার-প্রসার করা ফরয করে দিয়েছেন তিনিই আপনাকে এ ব্যাপারে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন । এ ব্যাপারে কুরআনের আরও আয়াত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় ।[দেখুনঃ সূরা আল-আ'রাফঃ ৬, সূরা আল-হিজ্‌রঃ ৯২-৯৩, সূরা আল-মায়েদাহঃ ১০৯, সূরা আল-কাসাসঃ ৮৫]

(২) ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কুরআন আমাদেরকে সবকিছুর জ্ঞান বর্ণনা করেছে এবং সবকিছু জানিয়েছে । মুজাহিদ বলেন, হালাল ও হারাম জানিয়েছে । তবে ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথাটি বেশী ব্যাপক । কেননা কুরআন প্রতিটি উপকারী জ্ঞানসমৃদ্ধ, যা গত হয়েছে সেটার সংবাদ এবং যা আসবে সেটার জ্ঞান । আর প্রতিটি হালাল ও হারাম । তেমনিভাবে মানুষ তাদের দুনিয়া ও দ্বীনের ব্যাপারে তাদের জীবিকা ও পুনরুত্থান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এতে পাবে । অন্তরসমূহের জন্য এতে রয়েছে হেদায়াত এবং মুসলিমদের জন্য এতে রয়েছে রহমত ও সুসংবাদ ।[ইবন কাসীর] ইমাম আওযা'য়ী বলেন, আয়াতের অর্থ, আমরা কুরআনকে সুন্নাহ দ্বারা সবকিছুর স্পষ্টব্যাখ্যারূপে নাযিল করেছি । [ইবন কাসীর] মোটকথা: কুরআন এমন প্রত্যেকটি জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে, যার ওপর হিদায়াত ও গোমরাহী এবং লাভ ও ক্ষতি নির্ভর করে, যা জানা সঠিক পথে চলার জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং যার মাধ্যমে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে । বস্তুত কুরআনুল কারীমে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে । যেসব মূলনীতির আলোকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস মাসআলা বর্ণনা করেছেন । কুরআনেই সেটা করতে রাসূলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে । [ফাতহুল কাদীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বলেছেন, 'জেনে রাখ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং কুরআনের অনুরূপও দেয়া হয়েছে ।' [মুসনাদে আহমাদ ৪/১৩০]

(৩) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতে জানিয়েছিলেন যে, কুরআনে সবকিছুর বর্ণনাই স্থান পেয়েছে, সে কথার সত্যায়ণ স্বরূপ এ আয়াতে এমন কিছু আলোচনা করছেন যা সমস্ত বিধি-বিধানের মূল ও প্রাণ ।[ফাতহুল কাদীর] তন্মধ্যে প্রথম নির্দেশ

ইহসান (সদাচরণ)[১] ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের[২] নির্দেশ দেন[৩] এবং

ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

হচ্ছে, তিনি আদলের নির্দেশ দিচ্ছেন। মূলত: عدل শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এ অর্থের দিক দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও عدل বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাস্‌সির এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভেতরে সমান হওয়া দ্বারা عدل শব্দের তাফসীর করেছেনে। ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। কারও মতে আদল হচ্ছে, ফরয। কারও নিকট, আদল হচ্ছে, ইনসাফ। তবে বাস্তব কথা এই যে, عدل শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তার আভিধানিক অর্থই গ্রহণ করা। যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কেননা কোন কিছুতে বাড়াবাড়ি যেমন খারাপ তেমনি কোন কিছুতে কমতি করাও খারাপ। [ফাতহুল কাদীর]

(১) আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে, ইহসান করা। বস্তুত: الإحسان -এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। যা ওয়াজিব নয় তা অতিরিক্ত প্রদান করা। যেমন, অতিরিক্ত সাদকা। [ফাতহুল কাদীর] ইমাম কুরতুবী বলেনঃ 'আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরোক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রসিদ্ধ 'হাদীসে জিবরীল'-এ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহ্‌সানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে 'ইবাদাতের ইহ্‌সান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি এ স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক 'ইবাদাতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কাজ দেখছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতের এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ। আত্মীয়দের দান করা। কি বস্তু দেয়া, এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে,"আত্মীয়কে তার প্রাপ্য প্রদান কর।" [সূরা আল-ইসরাঃ ২৬] বাহ্যতঃ আলোচ্য আয়াতেও তাই বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিতে হবে। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, মৌখিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা: তাদের যা প্রয়োজন তা প্রদান করা। [ফাতহুল কাদীর] ইহ্‌সান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বোঝাবার জন্য একে পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে। এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেনঃ সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেনঃ অশ্লীলতা, যাবতীয় মন্দ কাজ এবং যুলুম ও উৎপীড়ন। এ আয়াত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এটি হচ্ছে কুরআনুল কারীমের ব্যাপকতর অর্থবোধক একটি আয়াত। [ইবন কাসীর] কোন কোন সাহাবী এ আয়াত

তিনি অশ্লীলতা[১], অসৎকাজ[২] ও সীমালঙ্ঘন[৩] থেকে নিষেধ করেন;

وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٩٠

শ্রবণ করেই মুসলিম হয়েছিলেন। উসমান ইবনে মযউন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'শুরুতে আমি লোকমুখে শুনে ঝোঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল ছিল না। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তার উপর ওহী নাযিলের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ্‌র দূত এসেছিল এবং এই আয়াত আমার প্রতি নাযিল হয়েছে।' উসমান ইবনে মযউন বলেনঃ এই ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩১৮]

(১) ওপরের তিনটি সৎকাজের মোকাবিলায় আল্লাহ তিনটি অসৎ কাজ করতে নিষেধ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, "ফাহশা"। যার অর্থ অশ্লীলতা-নির্লজ্জতা। কথায় হোক বা কাজে। [ফাতহুল কাদীর] প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। সব রকমের অশালীন, কদর্য ও নির্লজ্জ কাজ এর অন্তর্ভুক্ত। এমন প্রত্যেকটি খারাপ কাজ যা স্বভাবতই কুৎসিত, নোংরা, ঘৃণ্য ও লজ্জাকর। তাকেই বলা হয় অশ্লীল। যেমন কৃপণতা, ব্যাভিচার, উলঙ্গতা, সমকামিতা, মুহাররাম আত্মীয়কে বিয়ে করা, চুরি, শরাব পান, ভিক্ষাবৃত্তি, গালাগালি করা, কটু কথা বলা ইত্যাদি। এভাবে সর্ব সমক্ষে বেহায়াপনা ও খারাপ কাজ করা এবং খারাপ কাজকে ছড়িয়ে দেয়াও অশ্লীলতা-নির্লজ্জতার অন্তর্ভুক্ত। যেমন মিথ্যা প্রচারণা, মিথ্যা দোষারোপ, গোপন অপরাধ জন সমক্ষে বলে বেড়ানো, অসৎকাজের প্ররোচক গল্প, নাটক ও চলচ্চিত্র, উলংগ চিত্র, মেয়েদের সাজগোজ করে জনসমক্ষে আসা, নারী-পুরুষ প্রকাশ্যে মেলামেশা এবং মঞ্চে মেয়েদের নাচগান করা ও তাদের শারীরিক অংগভংগীর প্রদর্শনী করা ইত্যাদি।

(২) নিষিদ্ধ দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, 'মুনকার' তথা দুষ্কৃতি বা অসৎকর্ম। যা এমন কথা অথবা কাজকে বলা হয় যা শরী'আত হারাম করেছেন। যাবতীয় গোনাহই এর অন্তর্ভুক্ত। কারও কারও মতে এর অর্থ শিক। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) নিষিদ্ধ তৃতীয় জিনিসটি হচ্ছে, بغي -শব্দের আসল অর্থ সীমালঙ্ঘন করা, [ফাতহুল কাদীর] কারও কারও মতে, যুলুম। কারও কারও মতে, হিংসা-দ্বেষ। মোটকথা: এর দ্বারা যুলুম ও উৎপীড়ন বোঝানো হয়েছে। নিজের সীমা অতিক্রম করা এবং অন্যের অধিকার লংঘন করা ও তার ওপর হস্তক্ষেপ করা। তা আল্লাহর হক হোক বা বান্দার হক। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে فحشاء ও بغي ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে فحشاء কে পৃথক ও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর ।

৯১. আর তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের জামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না[১] । নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা কর ।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

৯২. আর তোমরা সে নারীর মত হয়ো না[২], যে তার সূতা মজবুত করে পাকাবার পর সেটার পাক খুলে নষ্ট করে দেয় । তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য ব্যবহার করে থাক, যাতে একদল অন্যদলের চেয়ে বেশী লাভবান হও । আল্লাহ্ তো এটা দিয়ে শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন[৩] ।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

---

(১) আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, কোন ব্যাপারে শপথ করার পর তা রক্ষা করা জরুরী । কিন্তু যদি কেউ কোন কাজ করবে না বলে অথচ কাজটি হালাল ও ভাল । তখন কাজটি করা সুন্নাত, আর তার উচিত শপথের কাফ্ফারা দেয়া । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আল্লাহ চাহে তো যখনই এমন কোন কাজের শপথ করি তারপর এর বিপরীতে এর চেয়ে ভাল দেখি তখনই আমি ভাল কাজটি করি এবং শপথের কাফ্ফারা দেই [বুখারী: ৬৬২১; মুসলিম: ১৬৪৯]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে কাসীর এবং সুদ্দী বলেনঃ এখানে মক্কার এমন এক বেঅকুফ নারীর কথা বলা হচ্ছে, যে কাপড় বুননের পর তা আবার খুলে ফেলত । মুজাহিদ, কাতাদা এবং ইবনে যায়েদ বলেনঃ এটা একটি উদাহরণ যা ঐ সমস্ত লোকদের ক্ষেত্রে পেশ করা হয়, যারা কোন পাকাপাকি শপথ করার পর তা ভঙ্গ করত । ইবনে কাসীর এ দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন ।

(৩) এখানে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, প্রত্যেকটি অঙ্গীকার আসলে অঙ্গীকারকারী ব্যক্তি ও জাতির চরিত্র ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা স্বরূপ । আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গীকার পূর্ণ করার কথা বলে মানুষদেরকে পরীক্ষায় ফেললেন । [তাবারী] সা'ঈদ ইবন জুবাইর বলেন, এখানে পরীক্ষার বিষয় হচ্ছে, 'বেশী লাভবান হতে দেখা ।'

আর অবশ্যই আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তা তোমাদের কাছে স্পষ্ট বর্ণনা করে দেবেন যাতে তোমরা মতভেদ করতে ।

৯৩. আর ইচ্ছে করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথে পরিচালিত করেন । আর তোমরা যা করতে সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে[১] ।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪. আর পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না; করলে, পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে; আর তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি ।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٤﴾

[ইবন কাসীর] কারণ, সাধারণত জাহেলী যুগে মানুষ বেশী লাভবান হওয়ার আশায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করত । মোটকথা: আল্লাহ্ দেখতে চান কারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় । যারা এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে তারা আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না । আখেরাতের ময়দানে তিনি তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া মতবিরোধকে বর্ণনা করে, তাদের প্রত্যেককে তার আমল অনুসারে ভাল-মন্দ প্রতিফল দেবেন । [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই মানুষকে নির্বাচন ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন । তাই দুনিয়ায় মানুষদের পথ বিভিন্ন । কেউ গোমরাহীর দিকে যেতে চায় এবং আল্লাহ গোমরাহীর সমস্ত উপকরণ তার জন্য তৈরী করে দেন । কেউ সত্য-সঠিক পথের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে এবং আল্লাহ তাকে সঠিক পথনির্দেশনা দানের ব্যবস্থা করেন । এ জন্যই হাদীসে এসেছে, “তোমরা কাজ করে যাও, কেননা যার জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে ধরনের কাজ করা সহজসাধ্য করে দেয়া হবে” । [বুখারীঃ ৪৯৪৭, মুসলিমঃ ২৬৪৭] সুতরাং বান্দার দায়িত্ব হলোঃ ভালো পথে চলার জন্য চেষ্টা করা এবং সে পথের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সার্বক্ষনিক দো'আ করা ।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. আর তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না[১]। আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে শুধু তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম---যদি তোমরা জানতে!

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহ্ কাছে যা আছে তা স্থায়ী[২]। আর যারা ধৈর্য ধারণ করেছে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে তারা যা করত তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব[৩]।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

৯৭. মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন[৪] দান করব।

---

(১) এর অর্থ এই নয় যে, বড় লাভের বিনিময়ে তা বিক্রি করতে পারো। এখানে 'সামান্য মূল্য' বলে দুনিয়ার মুনাফাকে বোঝানো হয়েছে। এগুলো পরিমাণে যত বেশীই হোক না কেন, আখেরাতের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ সামান্যই বটে। [ইবন কাসীর] যে ব্যক্তি আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ, অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট নেয়ামত ও ধন-সম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করা কোন বুদ্ধিমান পছন্দ করতে পারে না।

(২) অর্থাৎ যা কিছু তোমাদের কাছে রয়েছে (এতে পার্থিব মুনাফা বোঝানো হয়েছে) তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে (এতে আখেরাতে জান্নাতের সওয়াব ও আযাব বোঝানো হয়েছে) তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে সবরের পথ অবলম্বনকারীদের বলে এমন সব লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও নিষেধ পালন করতে জীবনের যাবতীয় কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। কাফেরদের বিরুদ্ধে ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ করেছে। এ পথে যত প্রকার কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তা সবই যারা বরদাশ্‌ত করে নিয়ে আনুগত্যের উপর অটল থাকে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাস্‌সিরের মতে এখানে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বলতে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্থ করেছেন স্বল্পে তুষ্টি। দাহহাক বলেন, হালাল রিযক ও দুনিয়াতে ইবাদাত করার তাওফীক। কোন

أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব ।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ

৯৮. সুতরাং যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন[১] তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে

কোন মুফাস্‌সিরের মতে এর অর্থ আখেরাতের জীবন । হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেন, জান্নাতে যাওয়া ব্যতীত কারোই জীবন স্বাচ্ছন্দময় হতে পারে না । সঠিক কথা হচ্ছে, হায়াতে তাইয়্যেবা এসব অর্থের সবগুলোকেই শামিল করে । [ইবন কাসীর] প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ীও এরূপ অর্থ নয় যে, সে কখনো অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না । বরং অর্থ এই যে, মুমিন ব্যক্তি কোন সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দু'টি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না । এক- অল্পেতুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায় । দুই, তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটর ও অসুস্থতার বিনিময়ে আখেরাতে সুমহান, চিরস্থায়ী নেয়ামত পাওয়া যাবে । কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এর বিপরীত । সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে তার জন্য সান্ত্বনার কোন ব্যবস্থা নেই । ফলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে । প্রায়শঃ আত্মহত্যা করে । পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়, তবে লোভের আতিশয্য তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "সে ব্যক্তি অবশ্যই সফলকাম হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, চলনসই মত রিয্‌ক দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছে তাতেই সে তুষ্ট হয়েছে । [মুসলিমঃ ১০৫৪] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও দো'আ করতেনঃ "হে আল্লাহ্ আমাকে যা রিয্‌ক দিয়েছেন তাতে তুষ্ট করে দিন এবং তাতে আমার জন্য বরকত দিন আর আমার অনুপস্থিতিতে যে কাজ হয় তা ভালভাবে শোধ করুন ।" [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৫৬]

(১) কোন কোন মুফাসসির এ আয়াত এবং এর পূর্বের আয়াতসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলেনঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে । শয়তানের প্ররোচনায়ই মানুষ এসব বিধি-বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে । তাই এই আয়াতে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে । প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কুরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ রয়েছে । ইমাম তাবারী বলেন, সর্বসম্মত মত হচ্ছে যে, এ নির্দেশটি মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয় । কুরআন তেলাওয়াতের প্রথমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাওয়ার কারণ হচ্ছে, যাতে শয়তান কুরআন তিলাওয়াতের সময় কোন প্রকার ঝামেলা করতে না পারে । কোন প্রকার

الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۞

আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করুন[১];

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۞

৯৯. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই[২]।

إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ

১০০. তার আধিপত্য তো শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে

সন্দেহে নিপতিত করতে না পারে এবং চিন্তা ও গবেষণা থেকে দূরে না রাখে। [ইবন কাসীর]

(১) এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, মুখে শুধুমাত্র "আউযুবিল্লাহ" উচ্চারণ করলেই হয়ে যাবে। বরং এ সংগে কুরআন পড়ার সময় যথার্থই শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার বাসনা পোষণ করতে হবে এবং কার্যত তার প্ররোচনা থেকে নিস্কৃতি লাভের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে আ'উযুবিল্লাহ্ পড়া সুন্নত নয়। [ইবনুল কাইয়্যেম: ইগাসাতুল লাহফান] সে ক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ্ পড়া উচিত। তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আ'উযুবিল্লাহ্‌র শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কারো অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, "আ'উযুবিল্লাহি মিনাস শায়তানির রাজীম" পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়। [দেখুনঃ বুখারী: ৩২৮২; মুসলিম: ২৬১০] পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবায়িস' পাঠ করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। [দেখুনঃ বুখারী: ১৪২; মুসলিম: ৩৭৫]

(২) এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোন মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতাবশতঃ কিংবা কোন স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তারই দোষ। তাই বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে (কেননা, তিনিই সৎকাজের তাওফীকদাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী) এ ধরণের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। সুফিয়ান সাওরী বলেন, এর অর্থ, যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে শয়তান তাদেরকে এমন গোনাহে লিপ্ত করতে পারে না যা থেকে সে তাওবাহ করে না। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ, যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে শয়তান তাদের কাছে কোন প্রমাণ দিয়ে টিকে থাকতে পারে না। কারও কারও মতে, এ আয়াতটি অন্য আয়াত "তবে আমার মুখলিস বান্দাদের ব্যতীত" [সূরা আল-হিজর: ৪০;সূরা ছোয়াদ: ৮৩] এর অর্থের অনুরূপ। [ইবন কাসীর] (সূরা আল-হিজরের তাফসীরে এর ব্যাখ্যা গত হয়েছে।)

بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ۟

গ্রহণ করে[১] এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে ।

চৌদ্দতম রুকূ'

وَاِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝١٠١

১০১. আর যখন আমরা এক আয়াতের স্থানে পরিবর্তন করে অন্য আয়াত দেই--- আর আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন যা তিনি নাযিল করবেন সে সম্পর্কে--, তখন তারা বলে, 'আপনি তো শুধু মিথ্যা রটনাকারী', বরং তাদের অধিকাংশই জানে না ।

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝١٠٢

১০২. বলুন, 'আপনার রবের কাছ থেকে রূহুল-কুদুস[২] (জিব্‌রীল) যথাযথ ভাবে একে নাযিল করেছেন, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং হিদায়াত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ ।'

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, যারা শয়তানের অনুসরণ করে তাদেরকেই সে পথভ্রষ্ট করে । অন্যরা বলেন, এর অর্থ, যারা তাকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের উপরই তার প্রভাব কার্যকরী হয় । [ইবন কাসীর] আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আর যারা তার সাথে শরীক করে, তাদের উপরও তার ক্ষমতা কার্যকর থাকে । এর আরেক অর্থ হচ্ছে, যারা শয়তানের আনুগত্যের কারণে মুশরিক হয়েছে তাদের উপরও শয়তানের প্রভাব কার্যকর । [ইবন কাসীর]

(২) "রুহুল কুদুস" এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে 'পবিত্র রূহ' বা 'পবিত্রতার রূহ' । পারিভাষিকভাবে এ উপাধিটি দেয়া হয়েছে জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে । এখানে অহী বাহক ফেরেশতার নাম না নিয়ে তার উপাধি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতাদেরকে এ সত্যটি জানানো যে, এমন একটি রূহ এ বাণী নিয়ে আসছেন যিনি সকল প্রকার মানবিক দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি মুক্ত । তিনি একটি নিখাদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রূহ । আল্লাহর কালাম পূর্ণ আমানতদারীর সাথে পৌঁছিয়ে দেয়াই তার কাজ । তিনি যে যথার্থ কাজই করেন এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নির্দেশেরই পূর্ণ বাস্ত বায়ন করেন তা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন । [দেখুনঃ সূরা আল-বাকারাহঃ ৯৭, সূরা আস-শু'আরাঃ ১৯২-১৯৪], সূরা ত্বা-হাঃ ১১৪]

১০৩. আর আমরা অবশ্যই জানি যে, তারা বলে, 'তাকে তো কেবল একজন মানুষ[১] শিক্ষা দেয়।' তারা যার প্রতি এটাকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য ঝুঁকছে তার ভাষা তো আরবী নয়; অথচ এটা (কুরআন) হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষা।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾

১০৪. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, তাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

১০৫. যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, তারাই তো শুধু মিথ্যা রটনা করে, আর তারাই মিথ্যাবাদী[২]।

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

---

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মক্কার কাফেররা তাদের মধ্য থেকে কারো সম্পর্কে এ ধারণা করতো। এক হাদীসে তার নাম বলা হয়েছে 'জাবর'। সে ছিল আমের আল হাদ্‌রামীর রোমীয় ক্রীতদাস। অন্য এক বর্ণনায় খুয়াইতিব ইবনে আবদুল উয্‌যার এক গোলামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তার নাম ছিল 'আইশ বা ইয়া'ঈশ'। তৃতীয় এক বর্ণনায় ইয়াসারের নাম নেয়া হয়েছে। তার ডাকনাম ছিল আবু ফুকাইহাহ্। সে ছিল মক্কার এক মহিলার ইহুদী গোলাম। অন্য একটি বর্ণনায় বিল্'আম নামক একটি রোমীয় গোলামের কথা বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] মোটকথা: এদের মধ্য থেকে যেই হোক না কেন, মক্কার কাফেররা শুধুমাত্র এক ব্যক্তি তাওরাত ও ইন্‌জিল পড়ে এবং তার সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতও হয়েছে শুধুমাত্র এটা দেখেই নিসংকোচে এ অপবাদ তৈরী করে ফেললো যে, আসলে এ ব্যক্তিই এ কুরআন রচনা করছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নামে নিজের পক্ষ থেকে এটিই পেশ করছেন। এভাবে মক্কার কুরাইশ কাফেররা সামান্য কিছু তাওরাত ও ইনজিল পড়তে পারতো এমন একজন অখ্যাত দাসকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত মহান ব্যক্তিত্বের মোকাবিলায় যোগ্যতর বিবেচনা করছিল। তারা ধারণা করছিল, এ দুর্লভ রত্নটি ঐ কয়লা খণ্ড থেকেই দ্যুতি লাভ করছে। কাফের কুরাইশদের এ ধারণাটি নিশ্চয় হাস্যকর। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যে কিছু মিথ্যা বানিয়ে বলা সম্ভব

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهٖٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْإِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬. কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি(১); তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য(২) করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত(৩) ।

নয় তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ্ বলছেনঃ ঐ সমস্ত লোকেরাই শুধু মিথ্যা বানিয়ে বলতে পারে যারা আল্লাহ্‌র আয়াত ও নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান রাখে না। [ইবন কাসীর] নবী-রাসূলগণ তো এ রকম নয়! তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী ও তাঁর আয়াতসমূহে ঈমান রাখে এবং সেগুলোর প্রতি ঈমানের জন্য মানুষকে আহ্বান করতে থাকে। রাসূল নবুওয়াতের আগেও কোনদিন মিথ্যা বলেননি, তাহলে তার প্রতি এ অপবাদ কেন? এ ব্যাপারটিই রোম সম্রাটকে নাড়া দিয়েছিল। তিনি তৎকালিন কাফের সর্দারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'তোমরা কি তাকে ইতোপূর্বে এ কথা (নবী হওয়ার) দাবী করার পূর্বে কখনো মিথ্যার অপবাদ দিতে? সে জবাবে বলেছিলঃ না, তখন হিরাক্লিয়াস বলেছিলঃ সে মানুষের সাথে মিথ্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বলার মত কাজে জড়াতে পারে না।' [বুখারীঃ ৭]

(১) দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানেই মুরতাদের জন্য রয়েছে শাস্তি। মুরতাদ আখেরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে। দুনিয়াতে তার শাস্তি হলোঃ মৃত্যুদণ্ড। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে তার দ্বীন (ইসলাম) পরিবর্তন করে তাকে তোমরা হত্যা কর"। [বুখারীঃ ৬৯২২] এটা এ জন্যই যে, সে হক্ক দ্বীনের প্রতি অপবাদ দিচ্ছে। যে শুধু নিজেকে ধ্বংস করছেনা তার সাথে হাজারো মানুষের মনে দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এতে করে সে মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা হয়নি। সে বুঝে-শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছে সুতরাং এর বিপরীতটি তার থেকে গ্রহণ করা যাবে না।

(২) إكراه-এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত নয়। আয়াতের অর্থ হচ্ছে এমন জোর-জবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম করে দেয়। এমন জবরদস্তির অবস্থায় অন্তর ঈমানের উপর স্থির ও অটল থাকার শর্তে মুখে কুফরী কালেমা উচ্চারণ করা জায়েয। [কুরতুবী]

(৩) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে

পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণ করে, তবে তাতে কোন গোনাহ্ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফরী কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে নাযিল হয়, যাদেরকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী অবলম্বন করতে বলেছিল। যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তারা ছিলেন আম্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়্যা, সুহায়েব, বেলাল এবং খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম। তাদের মধ্যে ইয়াসির ও তার স্ত্রী সুমাইয়্যা কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং সুমাইয়্যাকে দুই উটের মাঝখানে বেঁধে উট দু'টিকে দু'দিকে হাঁকিয়ে দেয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ দু'জন মহাত্মাই ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেন। [দেখুন, বাগভী; কুরতুবী]

তবে আয়াতের অর্থ এ নয় যে, প্রাণ বাঁচাবার জন্য কুফরী কথা বলা বাঞ্ছনীয়। বরং এটি নিছক একটি "রুখ্সাত" তথা সুবিধা দান ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি অন্তরে ঈমান অক্ষুণ্ন রেখে মানুষ বাধ্য হয়ে এ ধরনের কথা বলে তাহলে তাকে কোন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না। অন্যথায় 'আযীমাত' তথা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ঈমানের পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষের এ রক্তমাংসের শরীরটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও সে যেন সত্যের বাণীরই ঘোষণা দিয়ে যেতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে এ উভয় ধরনের ঘটনার নজির পাওয়া যায়। একদিকে আছেন খাব্বাব ইবনে আর্ত রাদিয়াল্লাহু, আনহু তাঁকে জ্বলন্ত অংগারের ওপর শোয়ানো হয়। এমনকি তাঁর শরীরের চর্বি গলে পড়ার ফলে আগুন নিভে যায়। কিন্তু এরপরও তিনি দৃঢ়ভাবে ঈমানের ওপর অটল থাকেন। বিলাল হাবশীকে রাদিয়াল্লাহু আনহু লোহার বর্ম পরিয়ে দিয়ে কাঠফাটা রোদে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। তারপর উত্তপ্ত বালুকা প্রান্তরে শুইয়ে দিয়ে তার ওপর দিয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তিনি 'আহাদ' 'আহাদ' শব্দ উচ্চারণ করে যেতেই থাকেন। [দেখুনঃ ইবনে মাজাহঃ ১৫০] আর একজন সাহাবী ছিলেন হাবীব ইবন যায়েদ ইবন আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহু। মুসাইলামা কায্যাবের হুকুমে তাঁর শরীরের প্রত্যেটি অংগ-প্রত্যংগ কাটা হচ্ছিল এবং সেই সাথে মুসাইলামাকে নবী বলে মেনে নেবার জন্য দাবী করা হচ্ছিল। কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি তার নবুওয়াত দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করছিলেন।এভাবে ক্রমাগত অংগ-প্রত্যংগ কাটা হতে হতেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। অন্যদিকে আছেন আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু। আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর চোখের সামনে তাঁর পিতা ও মাতাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে দিয়ে শহীদ করা হয়। তারপর তাকে এমন কঠিন অসহনীয় শাস্তি দেয়া হয় যে,শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তিনি কাফেরদের চাহিদা মত সবকিছু বলেন। এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হন এবং আরয করেনঃ "হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে মন্দ এবং তাদের উপাস্যদেরকে ভাল না বলা পর্যন্ত তারা আমাকে ছেড়ে দেয়নি ।"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন "তোমার মনের অবস্থা কি?" জবাব দিলেন "ঈমানের ওপর পরিপূর্ণ নিশ্চিত ।" একথায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "যদি তারা আবারো এ ধরনের জুলুম করে তাহলে তুমি তাদেরকে আবারো এসব কথা বলে দিয়ো" ।[মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৫৭, বাইহাকীর আস-সুনানুল কুবরা ২/২০৮-২০৯] ।

তবে ঈমানের উপর অবিচল থাকার কিছু নিদর্শন সাহাবাদের জীবনীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী সময়েও পাওয়া যায় । প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফাহ আস-সাহমীকে রোমের নাসারাগণ কয়েদ করে তাদের রাজার কাছে নিয়ে গেলে তাদের রাজা তাকে বললঃ নাসারাদের দ্বীন গ্রহণ কর, আমি তোমাকে আমার রাজত্বের ভাগ দেব এবং আমার কন্যাকে তোমার সাথে বিয়ে দেব । তিনি তাকে বললেনঃ যদি আমাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন থেকে বিচ্যুত হওয়ার বিনিময়ে তুমি যা কিছুর মালিক তা এবং আরবদের সমস্ত সাম্রাজ্যও দাও, তবুও আমি ক্ষণিকের জন্যও তা করব না । রাজা বললঃ তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব । তিনি বললেনঃ তুমি সেটা করতে পার । তারপর রাজা তাকে শূলে চড়াবার আদেশ করল । এরপর তীরন্দাযদের তাকে কাছ থেকে তার হাত ও পায়ের পার্শ্বে তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিল । রাজা তখনও তাকে নাসারাদের দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকল । তিনি অস্বীকার করতে থাকলেন । রাজা তাকে শূল থেকে নামানোর নির্দেশ দিলেন । তারপর একটি বড় ডেকচি আনার নির্দেশ দিলেন, তাতে পানি দিয়ে গরম করা হলো, তারপর তার সামনেই একজন মুসলিম কয়েদীকে এনে তাতে ফেলা হলো, ক্ষনিকেই কয়েদীটি হাড্ডিতে পরিণত হলো । এমতাবস্থায়ও তার কাছে নাসারাদের দ্বীন গ্রহণের দাওয়াত দেয়া হলো কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন । তখন তাকে এ ডেকচির মধ্যে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হলো । তারপর তাকে যখন নিক্ষেপ করার জন্য উপরে উঠানো হলো তখন তিনি কাঁদলেন । তখন রাজা আশ্বস্ত হলো এবং তাকে ডাকল । তখন তিনি বললেনঃ আমি তো এজন্যই কেঁদেছি যে, আমার আত্মাতো একটি মাত্র যা এ মূহূর্তে ডেকচিতে আল্লাহর ওয়াস্তে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, আমার আকাংখা হলো যে, হায়! যদি আমার শরীরের প্রত্যেক পশমের পরিমাণ আত্মা হতো এবং সবগুলি আত্মা আল্লাহর জন্য এধরনের শাস্তি পেত । কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, রাজা তাকে কয়েদ করে রেখে তাকে কয়েকদিন কোন খাবার সরবরাহ করা থেকে বিরত থাকল । তারপর তাকে মদ এবং শুকরের গোস্ত দেয়া হলো । কিন্তু তিনি এর কাছেও ঘেষলেন না । তখন রাজা তাকে ডেকে বললোঃ তোমাকে খেতে বারণ করেছে কিসে? তিনি তখন বললেনঃ যদিও

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। আর আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. এরাই তারা, আল্লাহ্ যাদের অন্তর, কান ও চোখ মোহর করে দিয়েছেন। আর তারাই গাফিল।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত যে, তারাই আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٠﴾

১১০. তারপর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, নিশ্চয় আপনার রব এ সবের পর, তাদের প্রতি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পনরতম রুকূ'

يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. স্মরণ করুন সে দিনকে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি-তর্ক নিয়ে উপস্থিত হবে এবং প্রত্যেককে সে যা আমল করেছে তা পরিপূর্ণরূপে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

আমার জন্য এ অবস্থায় এ দু'টো বস্তু খাওয়া বৈধ তবুও আমি তোমাকে আমার বিপদগ্রস্ততা থেকে খুশী হতে দিতে পারি না। তখন রাজা তাকে বললোঃ তাহলে তুমি আমার মাথায় চুমু খাও, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব। তিনি বললেনঃ আমার সাথী সমস্ত মুসলিম কয়েদীকেও ছেড়ে দেবে? রাজা বললোঃ হ্যাঁ। তখন তিনি রাজার মাথায় চুম্বন করলেন। রাজা তাকে ছেড়ে দিল এবং তার সাথের সমস্ত মুসলিম কয়েদীকেও ছেড়ে দিল। তারপর যখন তিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে ফিরে আসলেন তখন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ "প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফার মাথায় চুমু খাওয়া। আর সেটা আমার দ্বারা শুরু হোক। এ কথা বলে তিনি দাঁড়ালেন এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফার মাথায় চুমু খেলেন। রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম ওয়া আরদাহুম। [ইবন কাসীর]

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. আর আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের[১] যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সবদিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ। তারপর সে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করল[২],

(১) এখানে যে জনপদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে তাকে চিহ্নিত করা হয়নি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ এখানে নাম না নিয়ে মক্কাকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। [তাবারী] এ প্রেক্ষিতে বিচার করলে এখানে ভীতি ও ক্ষুধা দ্বারা জনপদটির আক্রান্ত হবার যে কথা বলা হয়েছে সেটি হবে মক্কার দুর্ভিক্ষ, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত মক্কাবাসীদের ওপর জেঁকে বসেছিল। অথচ মক্কা ছিল শান্তির নগরী, কিন্তু তাদের অপরাধের কারণেই তাদেরকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। [দেখুনঃ সূরা আল-কাসাসঃ ৫৭, সূরা ইব্‌রাহীমঃ ২৮-২৯]

তবে এ আয়াতের একটি তাফসীর উম্মুল মুমেনীন হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি হজ্জে ছিলেন। তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মদীনায় তার গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ ছিলেন। তিনি যাকেই পেতেন তাকেই উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। অবশেষে একদিন তিনি দু'জন সওয়ারী দেখে উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। তখন তিনি বললেনঃ যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এটাই হলো সে জনপদ যার কথা আল্লাহ্‌র বাণী "আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সবদিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ। তারপর সে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করল" এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে মূলে كفر শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এ কুফরী আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী ও আল্লাহ্‌র নেয়ামতের সাথে কুফরী উভয়টিই উদ্দেশ্য হতে পারে। [ইবন কাসীর] কারণ, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরি করেছিল, তাঁর রাসূলদের সাথে কুফরি করেছিল। তাছাড়া তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকেও অস্বীকার করেছিল। আল্লাহ্‌র নেয়ামত অস্বীকারের উদাহরণ হিসেবে এক হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের কুফরীকে ব্যবহার করেছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলো, আমি দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তারা কুফরী করে"। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে? তিনি বললেনঃ "তারা স্বামীর প্রতি কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যদি তুমি এক যুগ ধরে তাদের কারও উপকার

ফলে তারা যা করত সে জন্য আল্লাহ্ সেটাকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের[১]।

১১৩. আর অবশ্যই তাদের কাছে এসেছিলেন এক রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে[২],

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ

কর, তারপরও সে তোমার কোন ত্রুটি দেখলে বলে, আমি তোমার কাছ থেকে কখনও ভাল কিছু পাইনি" । [বুখারীঃ২৯]

(১) এ আয়াতে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদনের জন্য 'লেবাস' শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোষাক আস্বাদন করানো হয়েছে। অথচ পোষাক আস্বাদন করার বস্তু নয়। কিন্তু এখানে লেবাস শব্দটি পুরোপুরি পরিবেষ্টনকারী হওয়ার কারণে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষুধা ও ভীতি তাদের সবাইকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়, ক্ষুধা এবং ভীতিও তাদের উপর তেমনিভাবে চেপে বসে। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি কোন কোন তাফসীরবিদের মতে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। এর সম্পর্ক বিশেষ কোন জনপদের সাথে নয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ একে মক্কা মুকার্‌রমার ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়ের মত দূর্ভিক্ষের দো'আ করেছিলেন। [দেখুন, বুখারী: ৪৮২১; মুসলিম: ২৭৯৮] ফলে মক্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুণ দুর্ভিক্ষে পতিত ছিল। এমনকি, মৃত জন্তু, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। এছাড়া মুসলিমদের ভয়ও তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অবশেষে মক্কার সর্দাররা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরয করল যে, কুফরী ও অবাধ্যতার দোষে পুরুষরা দোষী হতে পারে, কিন্তু শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য মদীনা থেকে খাদ্যসম্ভার পাঠিয়ে দেন। আবু সুফিয়ান কাফের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অনুরোধ করেন যে, আপনি তো আত্মীয় বাৎসল্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দূর্ভিক্ষ দূর করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করুন। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য দো'আ করেন এবং দূর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়। [ইবন কাসীরঃ আস-সীরাতুন নাবওয়ীয়্যাহ, ২/৯১]

(২) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাদের রাসূল ছিল তাদের মধ্য থেকে অত্যন্ত পরিচিত জন। এমন নয় যে, তারা তাকে চিনত না বা তার সম্পর্কে কিছু জানে না। [ফাতহুল কাদীর] এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের আরো বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। [দেখুনঃ সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৪, সূরা আত-তালাকঃ ১০-১১, সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৬৯]

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١١٣﴾

কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল যুলুমকারী।

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

১১৪. অতএব আল্লাহ্ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্র যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে তোমরা খাও এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ‘ইবাদাত করে থাক।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِۦ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. আল্লাহ্ তো শুধু মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যা যবেহ্‌কালে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে তা-ই তোমাদের জন্য হারাম করেছেন[১], কিন্তু কেউ অবাধ্য বা সীমালংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(১) এ আয়াতে ব্যবহৃত إنما শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে উল্লেখিত চারটিই। এর চাইতে আরো অধিক স্পষ্টভাবে ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [আল-আন‘আমঃ ১৪৫] আয়াত থেকে জানা যায় যে, এগুলো ছাড়া অন্য কোন বস্তু হারাম নয়। অথচ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরো বহু বস্তু হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। এ সংশয়ের জবাব আলোচ্য আয়াতসমূহের বর্ণনাভঙ্গি চিন্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম বস্তুসমূহের তালিকা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং জাহেলিয়াত আমলের মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু হারাম করে নিয়েছিল, অথচ আল্লাহ্ তদ্রূপ কোন নির্দেশ দেননি, সেগুলো বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের হারাম কৃত বস্তুসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে শুধু এগুলোই হারাম। অথবা আয়াতে যেগুলো হারাম করা হয়েছে, তারপরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাদীসে বেশ কিছু জিনিস হারাম করেছেন সেগুলো এর সাথে যুক্ত হবে। [কুরতুবী, সূরা আল-আন‘আমের ১৪৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়]

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৬. আর তোমাদের জিহ্‌বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা রটনা করার জন্য তোমরা বলো না, ‘এটা হালাল এবং এটা হারাম’[১]। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফলকাম হবে না।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۱۷﴾

১১৭. তাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্যই এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৮. আর যারা ইয়াহূদী হয়েছে আমরা তো শুধু তা-ই হারাম করেছি (তাদের উপর) যা আপনার কাছে আমরা আগে উল্লেখ করেছি[২]। আর আমরা তাদের উপর কোন যুলুম করিনি, কিন্তু তারাই যুলুম করত নিজেদের প্রতি।

---

(১) এ আয়াতটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, হালাল ও হারাম নির্দিষ্ট করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। অন্য যে ব্যক্তিই বৈধতা ও অবৈধতার ফায়সালা করার ধৃষ্টতা দেখাবে সে নিজের সীমালংঘন করবে। নিজের হালাল ও হারাম করার স্বাধীন ক্ষমতাকে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ বলে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি এ ধরনের বিধান তৈরী করে তার এ কাজটি দু'টি অবস্থার বাইরে যেতে পারে না। হয় সে দাবী করছে যে, যে জিনিসকে সে আল্লাহর কিতাবের অনুমোদন ছাড়াই বৈধ বা অবৈধ বলছে তাকে আল্লাহ বৈধ বা অবৈধ করেছেন। অথবা তার দাবী হচ্ছে, আল্লাহ নিজের হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা প্রত্যাহার করে মানুষকে স্বাধীনভাবে তার নিজের জীবনের শরীয়াত তৈরী করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এ দু'টি দাবীর মধ্য থেকে যেটিই সে করবে তা নিশ্চিতভাবেই মিথ্যাচার এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ ছাড়া আর কিছুই হবে না। আল্লামা ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ যে কোন বিদ‘আতকারীও এ আয়াতের হুকুমের আওতায় পড়বে। কারণ তারাও আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন কিছু হালাল বা হারাম ঘোষণা করছে।

(২) তাদের উপর যা হারাম করা হয়েছে তা সূরা আল-আন‘আমে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এসবকিছুই তাদের যুলুমের কারণে। [দেখুনঃ সূরা আল-আন‘আমঃ ১৪৬, সূরা আন-নিসাঃ ১৬০] আল্লাহ্‌ তাদের উপর কোন যুলুম করেন নি।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾

১১৯. যারা অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে, তারা পরে তওবা করলে ও নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য আপনার রব অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

ষোলতম রুকূ'

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

১২০. নিশ্চয় ইব্‌রাহীম ছিলেন এক 'উম্মাত'[২], আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত, একনিষ্ঠ[৩] এবং তিনি ছিলেন না

---

(১) আয়াতে جهل শব্দ নয় বরং جهالة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। جهل শব্দটি علم এর বিপরীত অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে جهالة এর অর্থ হয় মূর্খসুলভ কান্ড, যদিও তা বুঝে-শুনে করা হয়। এজন্যই কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী বলেন, যাবতীয় গুণাহই মানুষ মূর্খসুলভ কাণ্ডের কারণে করে থাকে। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে أمة বা উম্মত শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ দল ও সম্প্রদায়। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। [ইবন কাসীর] তখন অর্থ হবে, ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় ও কওমের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি একাই ছিলেন একটি উম্মাতের সমান। যখন দুনিয়ায় কোন মুসলিম ছিল না তখন একদিকে তিনি একাই ছিলেন ইসলামের পতাকাবাহী এবং অন্যদিকে সারা দুনিয়ার মানুষ ছিল কুফরীর পতাকাবাহী। আল্লাহর এ একক বান্দাই তখন এমন কাজ করেন যা করার জন্য একটি উম্মাতের প্রয়োজন ছিল। তিনি এক ব্যক্তি মাত্র ছিলেন না,ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। 'উম্মত' শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুসৃত নেতা ও গুণাবলীর আধার এবং যিনি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেন। অধিকাংশ মুফাস্‌সির এখানে এ অর্থই নিয়েছেন। [তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] মাসরূক রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে এ আয়াত পড়লে তিনি আমাকে বললেনঃ মু'আয ছিলো ﴿أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ﴾ এ কথা তিনি বারবার বললেন। শেষে বললেনঃ তোমরা কি أمة শব্দের অর্থ জান? যিনি মানুষকে ভাল ও কল্যাণ শিক্ষা দেয়। আর قانت হলো যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৫৮]

(৩) ইব্‌রাহীম আলাইহিসসালাম অনুগত-আজ্ঞাবহ এবং একনিষ্ঠ এ উভয় গুণেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সবার অনুসৃত ব্যক্তিত্ব, সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এক বাক্যে তার প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তার দ্বীনের অনুসরণকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইয়াহূদী, নাসারা ও মুসলিমরা তো তার প্রতি

মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত;

১২১. তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ্ তাঁকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে(১) ।

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

১২২. আর আমরা তাঁকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল । আর নিশ্চয় তিনি আখিরাতে সৎকর্মপরায়ণদের দলভুক্ত(২) ।

وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. তারপর আমরা আপনার প্রতি ওহী করলাম যে, 'আপনি একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের মিল্লাত (আদর্শ)অনুসরণ করুন; এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না ।

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. শনিবার পালন তো শুধু তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করেছে । আর যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত আপনার রব তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের বিচার-মীমাংসা করে দেবেন(৩) ।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

অগাধ শ্রদ্ধা রাখেই, আরবের মুশরিকরা মূর্তিপূজা সত্বেও এ মূর্তিসংহারকের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার দ্বীনের অনুসরণকে গর্বের বিষয় গণ্য করত ।

(১) অর্থাৎ ইসলামের পথে, দ্বীনে হকের পথে [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ তাওহীদের পথে, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং তাঁরই পছন্দকৃত শরী'আতের উপর তাকে পরিচালিত করেছেন ।

(২) অর্থাৎ দুনিয়াতে একজন মুমিনের যা প্রয়োজন আমি তাকে তার সবই দান করেছিলাম । [ইবন কাসীর] মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ দুনিয়াতে কল্যাণ দানের অর্থঃ সৎ প্রশংসাসূচক বাণী । সবাই তার সম্মান করে, তাকে ভাল বলে জানে । [ইবন কাসীর]

(৩) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্ আমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে শুক্রবার সম্পর্কে অজ্ঞতায় রেখেছিলেন । ফলে ইয়াহূদীগণ শনিবারকে

১২৫. আপনি মানুষকে দা'ওয়াত[1] দিন আপনার রবের পথে হিকমত[2] ও সদুপদেশ[3] দ্বারা এবং তাদের সাথে

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ

গ্রহণ করে। আর নাসারাগণ রবিবারকে গ্রহণ করে। এভাবে তারা কিয়ামতের দিনও আমাদের পিছে থাকবে। আমরা দুনিয়াবাসীদের দিক থেকে সবশেষে হলেও কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির আগে বিচারকার্য সম্পন্নকৃত হবো। [মুসলিমঃ ৮৫৬]

(১) دعوة এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো, আহ্বান করা। নবীগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করা। এরপর নবী ও রাসূলগণের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কুরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষ পদবী হচ্ছে- আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী হওয়া। এক আয়াতে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে- ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾ [আল-আহ্‌যাবঃ ৪৬] এবং অন্য এক আয়াতে আরো বলা হয়েছে- ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ [আল-আহ্‌কাফঃ ৩১] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পদাংক অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়া উম্মতের উপরও ফরয করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে- ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে কল্যাণের প্রতি দাওয়াত দেবে (অর্থাৎ) সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে।" [আলে-ইমরানঃ ১০৪] অন্য আয়াতে আছে- ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ -অর্থাৎ "কথা-বার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়?" [ফুস্‌সিলাতঃ ৩৩]

(২) 'হেকমত' শব্দটি কুরআনুল কারীমে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে কোন কোন মুফাস্‌সির হেকমতের অর্থ নিয়েছেন কুরআন, কেউ কেউ বলেছেন, কুরআন ও সুন্নাহ্। [তাবারী] আবার কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। [ফাতহুল কাদীর] আবার কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে বিশুদ্ধ ও মজবুত সহীহ কথাকে হেকমত বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) ﴿وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ – وعظ – موعظة -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়। [ফাতহুল কাদীর] উদাহরণতঃ তার কাছে কবুল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা কর। [ইবন কাসীর] الْحَسَنَةِ -এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই- শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন। موعظة -শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকর ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমান বোধ করে। এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্য حسنة শব্দটি

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

তর্ক করবেন উত্তম পন্থায়[1]। নিশ্চয় আপনার রব, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি বেশী জানেন এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি ভালভাবেই জানেন।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. আর যদি তোমরা শাস্তি দাও[2], তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে।

সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ দাওয়াত দেবার সময় দুটি জিনিসের প্রতি নজর রাখতে হবে। এক, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং দুই,সদুপদেশ। এ দু'টিই মূলত: দাওয়াতের পদ্ধতি। কিন্তু কখনও কখনও দা'য়ী-র বিপক্ষকে যুক্তি-তর্কে নামাতে হয়। তাই কিভাবে সেটা করতে হবে তাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) ﴿وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾- جادل শব্দটি مجادلة ধাতু থেকে উদ্ভূত। مجادلة বলে এখানে তর্ক-বিতর্ক বোঝানো হয়েছে। ﴿بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ -এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। কুরআনুল কারীমের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, 'উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক' শুধু মুসলিমদের সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহ্‌লে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কুরআন বলে যে, ﴿وَلَا تُجَٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ [আল-'আনকুবূতঃ ৪৬] -অন্য আয়াতে মূসা ও হারূন 'আলাইহিমাস্ সালাম-কে ﴿فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا﴾ [ত্বাহাঃ ৪৪] নির্দেশ দিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, ফির'আওনের মত অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

(২) ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ বাক্যে প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দানকারীদেরকে আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ, কিন্তুএই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু যুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশী হতে পারবে না। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, 'এক ইয়াহূদী এক মেয়েকে দুই পাথরের মাঝে রেখে হত্যা করে, মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিভিন্ন জনের জিজ্ঞাসা করা হলে সে এক ইয়াহূদীর প্রতি ইঙ্গিত করে। সে ইয়াহূদীকে নিয়ে আসা হলে সে তা স্বীকার করে। ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে ইয়াহূদীকে দুই পাথরের মাঝখানে বেঁধে হত্যা করার আদেশ করেন।' [বুখারীঃ ৬৮৮৪, মুসলিমঃ ১৬৭২]

তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য সেটা অবশ্যই উত্তম[১]।

১২৭. আর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন[২], আপনার ধৈর্য তো আল্লাহ্‌রই

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

(১) আয়াতের শেষে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে, কিন্তু সবর করা উত্তম। ওহুদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবীর শাহাদাত বরণ এবং হামযা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে হত্যার পর তার লাশের নাক-কান কর্তনের ঘটনা দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। সাহাবায়ে কেরাম (আনসারগণ) বললেনঃ আমরা যদি তাদের উপর জয়লাভ করি, তবে তাদেরকে দেখিয়ে দেব। তারপর যখন মক্কা বিজয়ের দিন আসল, তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন- "যদি শাস্তি দিতে চাও তবে ততটুকুই দেবে, যতটুকু তোমরা শাস্তি ভোগ করেছ। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তবে তা ধৈর্যশীলদের জন্য অনেক উত্তম (কল্যাণকর)।" তখন এক লোক বললঃ আজকের পরে কুরাইশদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ চারজন ব্যতীত আর সবাইকে ছেড়ে দাও। [মুস্তাদরাকে হাকীমঃ ২/৩৫৮-৩৫৯, তিরমিযিঃ ৩১২৯, নাসায়ীঃ ২৯৯] এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবর করেছিলেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় নাযিল হয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, আয়াতগুলো বার বার নযিল হয়েছিল। প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার নাযিল হয়েছে।

(২) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা, তার মহত্ত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই বলা হয়েছে- ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ -অর্থাৎ আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না, সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহ্‌র সাহায্যে হবে। অর্থাৎ সবর করা আপনার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশী ধৈর্যশীল ছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। এ সময় এক লোক এসে বললঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এ ভাগ-বাটোয়ারায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য নয়। কথাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কঠিন ভাবে প্রতিক্রিয়া করল। তার চেহারার রং বদলে গেল। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তারপর তিনি বললেনঃ "মূসাকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি সবর করেছেন। [বুখারীঃ ৬১০০]

وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

সাহায্যে। আর আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে আপনি মনঃক্ষুণ্ণও হবেন না।

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন(১)।

(১) এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দু'টি গুণে গুণান্বিত। তাকওয়া ও ইহ্‌সান। তাকওয়ার অর্থ হারাম কাজ পরিত্যাগ করা এবং ইহ্‌সানের অর্থ সৎকাজ করা। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ যারা শরী'আতের অনুসারী হয়ে নিয়মিত হারাম কাজ পরিত্যাগ করে, আর সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার সান্নিধ্য (সাহায্য) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার? আল্লাহ্‌ তা'আলার এ সঙ্গ শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্য বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট। এ সঙ্গের অর্থ সাহায্য-সহযোগিতা ও তাওফীক দান করা। [বাগভী] নতুবা তিনি আরশের উপরই আছেন। তিনি কারও গায়ের সাথে লেগে নেই। ঈমানদারগণ আল্লাহর সান্নিধ্য ও সঙ্গ দ্বারা ধন্য হওয়ার কথা আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে। [দেখুনঃ সূরা আল-আনফালঃ ১২, সূরা ত্বা-হাঃ ৪৬, সূরা আত-তাওবাহঃ ৪০, সূরা আস-শু'আরাঃ ৬২] এ ছাড়া আরেক ধরনের সঙ্গ আছে যা আল্লাহর সাথে সমস্ত সৃষ্টির সম্পর্ক। সেটার অর্থঃ তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন ও শক্তিতে তিনি সবার সাথে আছেন। সবাই তার মুঠোয়। কেউ তার আয়ত্ব ও জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়। এ ধরনের সঙ্গ কোন প্রকার সম্মানের বিষয় নয়। এ বিষয়টিও আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন। [দেখুনঃ সূরা আল-হাদীদঃ ৪, সূরা আল-মুজাদালাহঃ ৭, সূরা ইউনুসঃ ৬১] [উসাইমীন, আল-কাওয়া'য়িদুল মুসলা]

فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

মাক্কী ও মাদানীর বর্ণনাসহ সূরাসমূহের নামের তালিকা

إنّ وزارة الشّؤون الإسلاميّة والدّعوة والإرشاد

في المملكة العربيّة السّعوديّة

المشرفة على مجمّع الملك فهد

لطباعة المصحف الشّريف في المدينة المنوّرة

إذ يسرّها أن يصدر المجمّع هذه الطّبعة من القرآن الكريم

وترجمة معانيه وتفسيره إلى اللّغة البنغاليّة

تسأل الله أن ينفع بها النّاس

وأن يجزي

خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أحسن الجزاء على جهوده العظيمة في نشر كتاب الله الكريم

والله وليّ التّوفيق

রাজকীয় সৌদি সরকারের দাওয়াহ্, ইর্শাদ, ও
ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মদীনা
মুনাওয়ারাস্থ বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স
পবিত্র কুরআনুল কারীমের এই বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত
তাফসীর প্রকাশ করতে পেরে আনন্দবোধ করছে।
মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি এর দ্বারা সবাইকে
উপকৃত করুন এবং আল্লাহর পবিত্র কালাম প্রচারে
খাদেমুল হারামাইন আশ্-শারীফাইন বাদশাহ সালমান
ইবন আব্দুল আযীয আলে সাউদ-এর এই বৃহৎ প্রচেষ্টার
জন্য তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন, আর আল্লাহ্ই
একমাত্র তাওফীক দাতা।



ص.ب ٦٢٦٢ - المدينة المنورة
www.qurancomplex.gov.sa
contact@qurancomplex.gov.sa



---

www.qurancomplex.gov.sa

contact@qurancomplex.gov.sa

ح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٤٠هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
القرآن الكريم وترجمة معانيه وتفسيره إلى اللغة البنغالية.
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة، ١٤٤٠هـ

٢مج

١٥٠٤ص؛ ١٤×٢١سم

ردمك: ٦-٥٨-٨١٨٧-٦٠٣-٩٧٨ (مجموعة)
٣-٥٩-٨١٨٧-٦٠٣-٩٧٨ (ج١)

١- القرآن - ترجمة - اللغة البنغالية ٢- القرآن - تفسير أ.العنوان

ديوي ٢٢١٫٤٩١٤٤ ١٤٤٠/٧٤٩

رقم الإيداع: ١٤٤٠/٧٤٩
ردمك: ٦-٥٨-٨١٨٧-٦٠٣-٩٧٨ (مجموعة)
٣-٥٩-٨١٨٧-٦٠٣-٩٧٨ (ج١)

